দেবতা ও অনুচরবর্গ

অজন্তা প্রাচীর-চিত্র

JUNO PRINTING WORKS—CAL.

পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড | চৈত্র, ১৩৩৯ | চতুর্থ সংখ্যা

বিশ্বমানব

শ্রীতারকচন্দ্র রায়, বি-এ

বসা'য়ে তোমারে পূর্ণ ব্রহ্মের আসনে
তাঁরি তরে উৎসারিত ভক্তি প্রেম মোর—
যদি নাহি পারি আমি অর্পিতে তোমারে,
হে বিশ্বমানব তুমি ক্ষমিও আমারে।
জাতের বন্ধন ভাঙ্গি তুমি মানবেরে
চাও নিতে যাঁর কাছে, স্বার্থের শৃঙ্খল
বিচূর্ণ করিয়া যাঁর সিংহাসন পাশে
নিতেছ টানিয়া তারে, প্রকৃতির প্রাণ
যিনি অনুস্যূত জড়ে, জীবের হৃদয়ে
অধিষ্ঠিত নিত্য যিনি চৈতন্য স্বরূপ,
মানব চৈতন্যে যাঁর বিচিত্র প্রকাশ
জ্ঞান প্রেম ভক্তি রূপ—সান্ত ক্ষুদ্র যদি—
জ্ঞাত পদার্থের মাঝে তবু সর্ব্বোত্তম,
তুমি যাঁর অপূর্ণ প্রকাশ তাঁরি লাগি'
পিপাসিত চিত্ত মোর। তাঁরি লাগি যোগী
কঠোর সংযম ব্রত করিয়া পালন,
যুগ যুগ তপস্যায় করেছে যাপন।
তাঁরি লাগি রুধিরাক্ত ছুরিকার তলে
অবিচল রহি নর দিয়াছে পাতিয়া
উচ্চশির, সহিয়াছে অশেষ যন্ত্রণা।
নিজ হস্তে নিজ পুত্রে করেছে হনন
তবু ছাড়ে নাই তাঁরে। তাঁরি তরে বীর
প্রবেশিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড মাঝে
সহিয়াছে অবিচারে সুতীব্র দহন,
জপি তাঁরি নাম, সুখে ত্যজিয়াছে প্রাণ।
মানব সমাজদেহী সীমাবদ্ধ তুমি ;
ব্রহ্মাণ্ডের অংশ মাত্র অধিকারভূমি
তব, অবসান সমাজ-চৈতন্য মাঝে।
সীমা মাঝে আর্ত্তনাদ করে চিত্ত মোর,
ছুটিয়া যাইতে চায় অসীমের পারে
অল্প জ্ঞান অল্প প্রেমে তৃপ্তি নাহি তার,
ভূমার লাগিয়া তাই নিত্য পিপাসিত।

বলাগড়-পরিচয়

শ্রীআনন্দলাল মুখোপাধ্যায়

মহারাজ বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা প্রচলন করেন। উৎসাহ, অরবিন্দ, মহেশ্বরাদি নবগুণসম্পন্ন উনবিংশতি ব্রাহ্মণকে তিনি কুলীনরূপে স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিয়াছিলেন। উৎসাহের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষে বলরাম ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন।

বল্লাল সেন গত হইলে তদীয় পুত্র লক্ষ্মণ সেন মহারাজা হ'ন। "ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশ' হইতে জানিতে পারা যায়, লক্ষ্মণ সেনের প্রথম সমীকরণের প্রথম ব্যক্তি বল্লাল-পূজিত উৎসাহের প্রথম পুত্র আয়িত। বিশ্ব-কোষে লিখিত হইয়াছে—"মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের মধ্যবর্ত্তী কালে ১১৮০ খৃষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষ আয়িত সম্মানিত হ'ন।" লক্ষ্মণ সেনের সভায় বল্লাল-পূজিত বহুরূপাদি সপ্তদশ, গরুড়ের দুই পুত্র বাদলি ও পণ্ডিত এবং উৎসাহের দুই পুত্র আয়িত ও অভ্যাগত উপস্থিত ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে গরুড় ও উৎসাহ ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন।

মহারাজা লক্ষ্মণ সেন দুইবার সমীকরণ করেন। তিনি স্বয়ং কায়স্থ-কুলীন পুরবসুর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন (ঘটক-চূড়ামণি) এবং তাঁহার তিন পুত্র ছিল,—মাধব সেন, কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন। লক্ষ্মণ সেনের পর কোন ব্যক্তি বঙ্গ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহা স্পষ্টতঃ বলা কঠিন। বসুজ মহাশয়, কুলাচার্য্য গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন,—"এখন মনে হইতেছে যে, লক্ষ্মণ সেনের পর তৎপুত্র দনুজ মাধব বা দনৌজা মাধব বঙ্গাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।" ব্রাহ্মণগণের সমীকরণ তালিকা এই মতই পোষণ করে। মহারাজা দনৌজা মাধবের সভায় কুলাচার্য্য হরি মিশ্র বিদ্যমান ছিলেন। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণ-কাণ্ডে কথিত হইয়াছে,—"হরি মিশ্র লিখিয়াছেন মহারাজা দনৌজা মাধব পিতামহকে পরাজয় করিবার ইচ্ছায় রাজ-সম্মান ও ধনদ্বারা ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধ-স্থাপন করিয়াছিলেন।" মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের সমীকরণ-তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া ধ্রুবানন্দ মিশ্র লিখিয়াছেন—"ইদানীং দনুজ মাধবস্য সভাশ্রিতা কুলীনাঃ নিগদ্যন্তে দনুজ-মাধব কুলীন ব্রাহ্মণগণের চারিবার সমীকরণ করে (তালিকাভুক্ত সংখ্যা ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ)। আইন-ই আকবরী গ্রন্থোক্ত মাধুসেন এবং মাধব সেন ও দনুজ মাধ অভিন্ন। মাধব সেন ব্রাহ্মণ-ভক্ত ও ধার্ম্মিক ছিলেন।

শ্রীকর চট্টজ বহুরূপ মহারাজা বল্লাল সেন-কর্তৃক উৎসাহের সহিত ও লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক উৎসাহ-পুত্র আয়িতের সহিত সম্মানিত হ'ন; দনুজ মাধবের প্রথম সমীকরণে বহুরূপজ গোবিন্দ ও দ্বিতীয় সমীকরণে আয়িতজ উদ্ধব উল্লিখিত হইয়াছেন। মহাবংশ হইতে জানা যায় (ভুবন প্রসিদ্ধ) উদ্ধব মুখ উক্ত বহুরূপ চট্টের কন্যাকে বিবাহ করেন দ্রষ্টব্য এই যে, উৎসাহ তৎপুত্র আয়িত ও পৌত্র উদ্ধব বহুরূপ চট্টের সমকালে বিদ্যমান ছিলেন। দনুজ মাধবের পর সেন রাজগণ পুনর্ব্বার সমীকরণে অপারগ হইয়াছিলেন তালিকাভুক্ত সপ্তম সমীকরণ কুলাচার্য্যগণের প্রথম; এই সমীকরণে উদ্ধবজ শিয়ং ও তালিকাভুক্ত ১৪শ সমীকরণে শিয়-পুত্র নৃসিংহ ওঝা সম্মান লাভ করেন।

কবি কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে কথিত হইয়াছে:—

"পূর্ব্বেতে আছিলা বেদানুজ মহারাজা।
তার পাত্র ছিল নারসিংহ ওঝা॥"

অত্র, দনুজ মাধব উপলক্ষিত নহেন, তাহা হইতেই পারে না। উদ্ধব ও দনুজ মাধব সমসাময়িক ব্যক্তি; উদ্ধবের পৌত্র নৃসিংহ ওঝা, এই দুই জনের মধ্যে আনুমানিক অর্দ্ধ-শতাব্দী কাল কল্পনা হয়। দনুজ মাধব চারিবার সমীকরণ করেন, তাহার কোনটীতেই মুখ শিয় বা তৎপুত্র নৃসিংহ উল্লিখিত হ'ন নাই। ১৪শ সমীকরণোক্ত নৃসিংহের পূর্ব্বেই দনুজ মাধব পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করেন। (১২২৩ খৃষ্টাব্দে) মহারাজা দনুজ মাধবের পরবর্ত্তী কালেই বংশজ-সমাজের উৎপত্তি হয়; প্রথম বংশজগণ—বন্দ্য রুদ্র, লখাই ও রত্নাকর, মুখ উৎসাহের পৌত্র গাভো ও প্রপৌত্র পশো।

রাজন্য-কাণ্ডে বিবৃত হইয়াছে, বিশ্বরূপের পর লক্ষ্মণ নারায়ণ ও তৎপরে মধুসেন রাজত্ব করেন। ঘটকবর্গের কোনও কোনও কারিকায় পাওয়া যায়,—

"বল্লাল হইতে রাজ্য সুষেণেতে যায়।
মানের সহিত কাম কুলীনে কাটায়॥
সুষেণের রাজ্য যবে যবনে লইল।
কুলীন সম্প্রদায় মধ্যে উৎপাৎ ঘটিল॥
হিন্দুরাজ্য শেষ হ'ল যবনের বলে।
স্বপরিবারেতে রাজা গেলা নীলাচলে॥"

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের মূল বিবরণে কথিত হইয়াছে, রাজা নৌজার জীবনান্তে, লক্ষ্মণের পুত্র (?) লাক্ষ্মণেয় রাজ্য-ভার গ্রহণ করেন। সুষেণ ও লক্ষ্মণ নারায়ণ অভিন্ন; ইনি দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন নামেও পরিচিত। রাজন্য-কাণ্ডে কথিত হইয়াছে—"মধুসেন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সংগৃহীত পুথির মধ্যে পাওয়া যায়—"পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরম সৌগত মধুসেন ১১৯৪ শকে বা ১২৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে আধিপত্য করিতেছিলেন।" মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি-আই-ই মহাশয়ের আবিষ্কৃত 'পঞ্চরক্ষা' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায়—"পরমেশ্বর পরম সৌগত পরমরাজাধিরাজ শ্রীমদ্ গৌড়েশ্বর দেবকানাং প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে যত্রাঙ্কেনাপি শকনরপতে। শকাব্দাঃ ১২১১ ভাদ্র দি ৩॥" নারায়ণ পত্রিকা (২য় বর্ষ) হইতে রাখালদাস উদ্ধৃত করিয়াছেন—"তোগ্রলের বিদ্রোহ দমন করিতে বলবন্ যখন বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন তখন দনুজ রায় নামে সুবর্ণ গ্রামের একজন রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। (ইলিয়ট্-লিখিত ভারতের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড; ১১৬ পৃঃ) তাহার পূর্ব্বে ১২১১ শকাব্দে ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে মধুসেন নামক একজন নরপতি জীবিত ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গের সেন-বংশীয় রাজা।" সুতরাং ইহা স্বীকার্য্য যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে গৌড়েশ্বর মধুসেন এবং সোনার গাঁয়ে দনুজ রায় বিদ্যমান ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বার্ণির লিখিত তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী গ্রন্থে জানা যায় যে, সোনার গাঁয়ে পরাক্রান্ত নরপতি দনুজ রায় বিদ্যমান ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট্ বলবন্ বিদ্রোহী তোগ্রলকে শাসনবাধ্য করিবার নিমিত্ত ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে আগমন করেন এবং রাজা দিনাজ রায়ের সহিত সন্ধি-স্থাপন ও তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ওয়াইজ্ বলেন, (জে, এ, এস্, বি—১৮৭৪) সোনার গাঁও তোগ্রলের বাধ্য ছিল। তোগ্রলের মৃত্যু হইলে সম্রাট্ বলবন্ তাঁহার পুত্র বগড়া খাঁকে (নসীরুদ্দীন বঙ্গের শাসন-ভার অর্পণ করেন। বগড়া খাঁ লক্ষ্মণৌটীতে বাস করিতেন।" ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে লক্ষ্মণৌটীতে মুনীস্-উদ্দীন তোগ্রল ও সোনার গাঁয়ে দিনাজ রায় রাজত্ব করিতেছিলেন; মধুসেন দেব সম্ভবতঃ বিক্রমপুরের অধিপতি ছিলেন। দিনাজ রায়ের পর লক্ষ্মণ নারায়ণ (সুষেণ, দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন) ও মধুসেনের পর দ্বিতীয় বল্লাল সেন উক্ত দুই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'ন।

অধ্যাপক ব্লকম্যান বলিয়াছেন, "খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বল্লালের বংশধরগণ বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন; তৎপরেই সম্রাট্ বলবনের দ্বিতীয় পুত্র সোনার গাঁ অধিকার করিয়াছিলেন। মুদ্রাতত্ত্ববিৎ স্বর্গীয় রাখালদাস বাবু লিখিয়াছেন—বলবনের মৃত্যুর পরে লক্ষ্মণাবতীর অধিকারী বলবন্-বংশীয় রাজগণের বিবরণ রিয়াজ্-উস্-সালাতিন ব্যতীত মুসলমান-রচিত অন্য কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। (শমস্ উদ্দীনের) দ্বিতীয় পুত্র গিয়াস্ উদ্দীন বাহাদুর শাহ সম্ভবতঃ জয় করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মণাবতীতে ৭১১-৭১২ হিজরায় (১৩১১-১৩১২ খৃষ্টাব্দে) নিজনামে মুদ্রা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সুতরাং মধুসেন ও দনুজরায়কে সমকালীন তৎপরে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন ও দ্বিতীয় বল্লাল সেনকে স্বীকার করিলে সর্ব্বদিকে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। সেন রাজগণ কখনও কাহারও সাহায্য লাভ করেন নাই; উপরন্তু চতুর্দ্দিক হইতেই বহিঃশত্রু-কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইতে-ছিলেন। পরমার, চেদী, চান্দেল্ল প্রভৃতি রাজগণ সেন-রাজকে সহায়তা করিবার সুযোগ পান নাই। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই প্রাচীন কামরূপরাজ বর্ব্বর আহম জাতির করকবলিত হইয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন। পূর্ব্ব ও দক্ষিণে মগজাতি এবং পশ্চিমে মুসলমানগণের দ্বারা পর পর আক্রান্ত হইয়া সেনরাজগণ ক্রমশঃ হীনবল এবং সেই অনুপাতেই গর্গ যবন সম্প্রদায় প্রতাপশালী হইতেছিল। আরাকাণবাসী মগ জলদস্যুগণের অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গ

ভীষণ অরণ্যে পরিণত হয়; প্রতিবেশী গঙ্গবংশীয় কলিঙ্গরাজ সুবিধা পাইয়া দক্ষিণ বঙ্গের পশ্চিমাংশ অধিকার করেন। মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই সেনরাজগণের তিরোধান হয়। দ্বিতীয় বল্লাল সেনের পর বিক্রমপুরে অন্য হিন্দু স্বাধীন রাজার নাম পাওয়া যায় না। গিয়াসউদ্দীনের বিদ্রোহকালে, দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন নিরুপায় হইয়া—

"বিনা যুদ্ধে যবনেরে রাজ্য সমর্পিয়া।
নীলাচলে গেলা রাজা স্বগণ লইয়া॥"

গীয়াস্উদ্দীনকে পরাজিত করিয়া তাতার খাঁ (১৩২৩-১৩২৪ খৃষ্টাব্দ) সোণার গাঁ অধিকার করেন। এই সময় সোণার বাংলা তিন ভাগে বিভক্ত হয়:—লক্ষ্মণাবতী বা পশ্চিম বঙ্গে নাসিরুদ্দীন, সুবর্ণগ্রাম বা পূর্ব্ববঙ্গে তাতার খাঁ এবং সপ্তগ্রাম বা দক্ষিণ বঙ্গে ইজ্জাদ্দীন রাহিয়া খাঁ শাসন-কর্ত্তা ছিলেন এবং ফুলিয়া গ্রামে নৃসিংহের পুত্র গঙ্গেশ্বর ও পৌত্র মুরারি ওঝা বিদ্যমান ছিলেন।

বল্লালপূজিত মুখ উৎসাহের বৃদ্ধ প্রপৌত্র নৃসিংহ ওঝা ও চট্ট হলায়ুধ সমপর্য্যায়-ভুক্ত ব্যক্তি। কুলীন নির্ব্বাচনকালে বল্লাল-সভায় চট্ট অরবিন্দ ও মুখ উৎসাহ বিদ্যমান ছিলেন; লক্ষ্মণ সেনের সভায় অরবিন্দের সহিত উৎসাহ পুত্র আয়িত উপস্থিত হ'ন। ইহা হইতে অনুমান হয়, নৃসিংহ ওঝা চট্ট হলায়ুধের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইলেও তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; ইনি হলায়ুধের পিতামহ গুাকরের কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নৃসিংহের বৃদ্ধপ্রপিতামহ উৎসাহ; উৎসাহের অধস্তন দ্বাবিংশতি পুরুষে, নৃসিংহ-লক্ষ্মীধর বলরাম ঠাকুরের ধারায় কানাইলাল ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতি তিন পুরুষে শত বৎসর পরিকল্পনায় ১২৮৩ খৃষ্টাব্দে নৃসিংহের এবং ১৪১৬-৭ খৃষ্টাব্দে অনিরুদ্ধজ লক্ষ্মীধর ও বনমালিজ কৃত্তিবাসের জন্মকাল পাওয়া যায়। নৃসিংহ ও হলায়ুধ সমপর্য্যায়ভুক্ত অথচ নৃসিংহ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; কাজেই, ১২৮৩ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বেই নৃসিংহের জন্মকাল স্বীকার্য্য। সুতরাং ইহা নিষ্পন্ন হয় যে, নৃসিংহ রাজা দনুজ রায়ের পাত্র ও চট্ট হলায়ুধ দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক ছিলেন। (কারিকায় উক্ত হইয়াছে—দ্বিতীয় লক্ষ্মণ যবে হলায়ুধ পায়। লক্ষ্মণে লক্ষ্মণা ভেদ লক্ষ্মণ মিশায়॥) শমস্ উদ্দীনের কালেই (গিয়াস্ উদ্দীনের বিদ্রোহ) নৃসিংহ ওঝা বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া রাঢ়ে আগমন ও ফুলিয়া গ্রামে বসতি করেন। ব্রাহ্মণ কাণ্ডে কথিত হইয়াছে, "প্রায় ঐ সময়ে, অনেক প্রধান কুলীন পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া আবার রাঢ়ে নানাস্থানে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন। যেমন, মহাদেব বন্দ্যের পৌত্র লেঙ্গ্ড়ী ও ভেঙ্গ্ড়ী বাবলা গ্রামে, মকরন্দ বন্দ্যের পুত্র দাসো কাঠাদিয়া ও বিনায়ক নপাড়ায় আসিয়া বাস করেন।"

কয়েকজনের বংশলতার একাংশ মাত্র উদ্ধৃত করা হইল:—

বল্লালসভা:	মুখ উৎসাহ	চট্ট অরবিন্দ	বন্দ্য মহেশ্বর
লক্ষ্মণ সেন সভা:	আয়িত	ঐ	ঐ
দনুজমাধবের সভা:	উদ্ধব	আয়িত	মহাদেব
বিশ্বরূপ সেনের কাল,	শিয়	গুাকর	দুর্ব্বলি
দনুজ রায়ের কাল	নৃসিংহ	ধনঞ্জয়	লেঙ্গ্ড়ী ও
দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন	গর্ভেশ্বর	হলায়ুধ	ভেঙ্গ্ড়ী

আয়িতজ উদ্ধব ও মহেশ্বরজ মহাদেব, উদ্ধরজ শিয় ও মহাদেবজ দুর্ব্বলি এবং আয়িতের প্রপৌত্র, শিয়র পুত্র নৃসিংহ ও অরবিন্দের পৌত্র গুাকর কুলবন্ধ ছিলেন। নৃসিংহ ওঝা একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন; চারিজন কুলীন ব্রাহ্মণ তাঁহার সভাসদ্ ছিল। রাজা দনুজরায়ের পরই সুবর্ণগ্রাম তথা পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমানা-ধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

গরিষ্ঠকুল মুখবংশে উৎসাহের অধস্তন গঙ্গানন্দ ভট্টা-চার্য্য পর্য্যন্ত বেলরাম ঠাকুরের পূর্ব্বতন ধারায় সকলেই সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। মহারাজা বল্লাল সেনের সভায় উৎসাহ, লক্ষ্মণ সেনের সভায় আয়িত, দনুজ মাধবের সভায় উদ্ধব, তদনন্তন ৭ম সমীকরণে 'মুখবংশদিনেশ' শিয়, ১৪শ সমীকরণে রাজা দনুজ রায়ের পাত্র সভাসদ্গণ-বেষ্টিত পণ্ডিত নৃসিংহ ওঝা, ২১ম সমীকরণে 'মুখবংশাব্জ ভাস্করঃ' গর্ভেশ্বর, ৩৪ম সমীকরণে 'সূর্য্য-সম মহা তেজস্বী' মুরারি ওঝা, ৫৩ম সমীকরণে 'যশস্বী' সহোদরদ্বয় অনিরুদ্ধ ও বনমালি, ৭৩ম সমীকরণে 'শ্যামলঃ শুদ্ধকীর্ত্তিঃ' লক্ষ্মীধর ও ধিতো এবং খুল্ল-তাত ভ্রাতৃদ্বয় বনমালিজ (কৃত্তিবাসের সহোদরদ্বয়) শান্তি ও মাধব, ৮৬ম সমীকরণে লক্ষ্মীধরজ দুর্গাবর ও ধীর মনোহর,

ধিতো-পুত্র যুধিষ্ঠির এবং শান্তি-পুত্র ভরত, ১০৭ম সমীকরণে 'নানাশাস্ত্রবেত্তা ধার্ম্মিক' সুষেণ, 'কুলানন্দেন নন্দিত' জগদানন্দ, ও 'সকলমুখজলাম্ভোধিসম্ভূত চন্দ্রঃ মুখকুলসরসী সারসঃ' শিবমূর্ত্তিস্বরূপ গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য। এই কালেই ঘটকবিশারদ দেবীবর গঙ্গানন্দের অনুরোধে মেল প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। শেষোক্ত ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ কুল ফুলিয়া মেলের প্রকৃতিরূপে গণ্য হ'ন। মালাধরী চন্দ্রাপতি ও শতানন্দ খানী মেলও এই বংশের অপর তিন জনকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রচারিত হয়। ন্যায়পরায়ণ য়ুসুফ শাহের রাজত্ব-কালে গঙ্গানন্দ জন্মগ্রহণ করেন (আনুমানিক ১৪৭২ খৃষ্টাব্দ, হুসেন শাহের কালে গঙ্গানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুষেণ পণ্ডিত প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করিয়াছিলেন।

বঙ্গের আদি কবি লিখিয়াছেন—

"মুখটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে।"

কৃত্তিবাস বঙ্গের আদি কবি। তাঁহার আত্মবিবরণী মধ্যে পাওয়া যায়—বেদানুজ মহারাজার পাত্র নৃসিংহ ওঝা ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার সংসার ধনধান্যে পুত্র-পৌত্রে সুশোভিত ছিল। নৃসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর মহাশয়; তৎসুত—মুরারি, সূর্য্য ও গোবিন্দ। জ্ঞানবান্ কুলজ্ঞ মুরারির সাত পুত্র—জ্যেষ্ঠ ভৈরব রাজসভায় পূজিত ছিলেন; (অপর পুত্র) বনমালি ব্রাহ্মণের অধিকারভুক্ত বঙ্গদেশে গাঙ্গুলী-কুলে বিবাহ করেন। বনমালীর ছয় পুত্র—'সতত সানন্দ' কৃত্তিবাস, মৃত্যুঞ্জয়, শান্তি, মাধব, শ্রীধর ও চতুর্ভুজ এবং এক কন্যা ছিল। সূর্য্য পণ্ডিতের দুই পুত্র—বিভাকর ও নিশাপতি; বিভাকর স্বীয় পিতৃতুল্য পণ্ডিত ছিলেন এবং নিশাপতির দ্বারে সর্ব্বদা সহস্র লোক সমবেত থাকিত। নিশাপতিকে রাজা গৌড়েশ্বর প্রসাদী ঘোড়া এবং পাত্র-মিত্র সকলে থাষা জোড়া দিয়াছিলেন। নিশাপতির পুত্র—গোবিন্দ, জয়, আদিত্য, বসুন্ধর, বিদ্যাপতি ও রুদ্রওঝা। ভৈরবের পুত্র গজপতির কীর্ত্তি বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

[সহোদরগণের নামাতিরিক্ত কবি তাঁহার আত্মীয়-বিশিষ্ট কয়জনের নাম ও পরিচয় দিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ও খুল্লতাতগণ,—সৌরি, মদন, অনিরুদ্ধ, মার্কণ্ড ও ব্যাসের নাম নাই, অথচ পিতামহ স্থানীয় সূর্য্য পণ্ডিতের পৌত্রগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভৈরব-পুত্র গজপতির ভ্রাতৃত্রয় শ্রীপতি, হেরম্ব ও বামন রচনার মধ্যে স্থান লাভ করেন নাই।]

মুরারির জ্যেষ্ঠ পুত্র ভৈরব কোন্ রাজ সভায় সমাদৃত ছিলেন, তাহা নিরূপিত হওয়া কঠিন। 'প্রণম কিংবা কৈলা ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী'—মুরারী ওঝা পূর্ব্বদেশীয় বটু গাঙ্গুলীর সহিত কুলবদ্ধ ছিলেন। রাজা গৌড়েশ্বর ও তাঁহার পাত্র-মিত্রগণের দ্বারা নিশাপতি বিশেষরূপেই সম্মানিত হন। নৃসিংহের অধস্তন চতুর্থ পুরুষে সূর্য্যের পুত্রদ্বয় বিভাকর ও নিশাপতি এবং বনমালি, অনিরুদ্ধ ও ভৈরব ১৩৮০ খৃষ্টাব্দের অগ্রপশ্চাৎ কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। নিশাপতি 'রাজা গৌড়েশ্বর' গণেশের সভায় এবং ভৈরব তৎকালীন প্রাদেশিক কোনও রাজ-সভায় সম্মানিত হ'ন। রাজা গণেশ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে; 'পঞ্চ গৌড় চাপিয়া' গৌড়েশ্বর রাজা, কবি এস্থলে তাহা বলেন নাই। রাজা গণেশ বাহুবলে গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন কি না তাহা অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয় নাই। বিবিধ ঐতিহাসিক মত দৃষ্ট হয়; সুলতান শাহাব্উদ্দীন্ বায়াজিদ শাহ উপাধি-ভূষিত হইয়া ১৩৯৮—১৪০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ২য়—রাজা গণেশ (১৪০৯—১৪১৪ খৃষ্টাব্দ) বহুক্ষমতাপন্ন ও প্রভাবান্বিত সামন্তরাজ ছিলেন; স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ তিনি কখনও নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন নাই। ৩য়—গৌড়-রাজ্য পরাক্রান্ত রাজা গণেশের বশীভূত ছিল। ৪র্থঃ—সুলতান শাহাব্উদ্দীন বায়জিদ্ শাহ সুলতান শমস্উদ্দীনের নামান্তর মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে, রাজা গণেশ গৌড়েশ্বর পদভূষিত হইয়া রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন; তাঁহার অবিদ্যমানে পুত্র যদু (জিতমল্ল) রাজ্যাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। বনমালির পুত্র কৃত্তিবাস বিদ্যাচর্চ্চার জন্য বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন; নিকট আত্মীয় ভৈরব, বিভাকর প্রভৃতির নিকট শিক্ষালাভ না করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে 'উদ্মাকার' গুরুর সদনে আশ্রয় লইবার কি কারণ হইতে পারে; গুরুর নিকট বিদায় লইয়া 'রাজ-পণ্ডিত' হইবার আশায় তিনি যে রাজার সভায় উপস্থিত হন তাহার বিস্তৃত বিবরণমধ্যে বলিয়াছেন, "পঞ্চ গৌড় চাপিয়া রাজা গৌড়েশ্বর।" ইতিহাসে পাওয়া যায়, চন্দ্রদ্বীপের রাজা

দনুজমর্দ্দন দেব যদুকে পরাস্ত করিয়া পঞ্চ গৌড় অধিকার (১৪১৮ খৃঃ অঃ) ও নিজ নামে মুদ্রা মুদ্রিত করেন। দনুজমর্দ্দন দেবের পর তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রদেব গৌড়রাজ্য লাভ করেন। রাজা গণেশের পুত্র বিধর্ম্মী যদুর সহিত সংগ্রামে মহেন্দ্রদেব পরাস্ত ও নিহত হ'ন। যদু পুনরায় গৌড়রাজ্য অধিকার করিলে মহেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমা-বল্লভ দেব চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন (বাঙ্গালার ইতিহাস)। নৃসিংহের অধস্তন চতুর্থ পুরুষে লক্ষ্মীধর ও কৃত্তিবাস আনু-মানিক ১৪১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; বিশ্বকোষ মহাগ্রন্থেও ইহাই অনুমিত হইয়াছে। কৃত্তিবাস সপর্য্যায়ভুক্ত সহোদরগণের অতিরিক্ত কাহারও নাম করেন নাই; গজপতির নামোল্লেখ করিয়াছেন অথচ তাঁহার ভ্রাতাগণের নাম দেন নাই। বিশিষ্ট নিশাপতিকে উল্লেখ করিয়া তাঁহার পুত্রগণের নাম দিয়াছেন কিন্তু কাহাকেও বিশেষিত করেন নাই। কৃত্তিবাসের জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা হালদার উপাধি-ভূষিত লক্ষ্মীধর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন; সম্ভবতঃ তাঁহার বৈশিষ্ট্য লাভের পূর্ব্বেই কবি ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড লেখার সময়ই তিনি জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়েন; মূল গ্রন্থ হইতেই ইহা অবগত হওয়া যায়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—৪র্থ সংস্করণ) লিখিয়াছেন,—"কৃত্তিবাসের রামায়ণের একখানি প্রাচীন অরণ্য-কাণ্ডের পুঁথির ভণিতায় লিখিত আছে; তিনি অরণ্যকাণ্ড লেখার সময়ই রোগজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং তিনি দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। "অপর পক্ষে, রাজা দনুজ মর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের পর অপর কোনও হিন্দু রাজা গৌড়েশ্বর-পদ-মর্য্যাদা লাভ করেন নাই। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হয় কবি কৃত্তিবাস রাজা দনুজমর্দ্দনদেব কিম্বা মহেন্দ্রদেবের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।' চন্দনচর্চ্চিত ও পুলকিত, 'সতত সানন্দ' কৃত্তিবাসের লেখনী-নিঃসৃত যৌবন সম্ভব গর্ব্ব তাঁহার যৌবনোদ্গমের পরিচায়ক। 'এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ "তৎকালে তিনি বিদ্যাচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন; আনুমানিক ৬ বৎসর কাল বিদ্যাচর্চ্চায় অতিবাহিত হইয়া থাকিলে, ১৪০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্মকাল ধার্য্য হয়। বনমালির প্রথম পুত্র কৃত্তিবাস, অনিরুদ্ধের তৃতীয় পুত্র লক্ষ্মীধর; কৃত্তিবাস জ্যেষ্ঠ এবং লক্ষ্মীধর কনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া প্রতীত হয়। আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী তিথি, পূর্ণ মাঘ মাস। তিথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥" শ্রীযুক্ত দীনেশবাবুর মতে 'পূর্ণ' পাঠটী ঠিক নহে। মোটামুটী ভাবেতারিখ গণনার একটী প্রথা আছে, তদনুযায়ী ১৪০১ খৃষ্টাব্দে ঐ তিথি বার পাওয়া যাইবে।

ক্রমশঃ

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ

(নর্ম্মা)
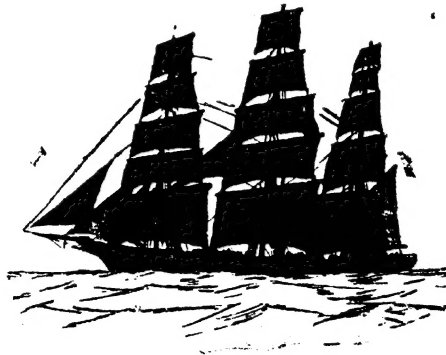
শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ রায়, বি-এ

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অর্থ কদলীও হয়।

কেন হয়, জানা দরকার! অঙ্গুলি-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সকলের অপেক্ষা স্থূল ও খর্ব্ব, অর্থাৎ বামন। বামন দেখিলেই হাসি পায়। কোন বস্তুবিশেষের সঙ্গে উপমা করিবার ইচ্ছাও জাগে। কেহ কেহ মর্কটের সঙ্গে তুলনা করেন, কেহবা হনুমানের সঙ্গেও করিয়া থাকেন। বামন-বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়া আদি মানবেরও ইচ্ছা হইয়াছিল কোন বস্তুর সহিত তুলনা করিতে। অনেক জিনিসের সঙ্গেই তুলনা করা যাইত, তথাপি কেন যে কদলীর সহিত তুলনা করা হইল —ইহাই ভাবিবার বিষয়।

প্রত্যেক অঙ্গুলি বিভিন্ন অর্থে ও কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। তর্জ্জনী উঠাইলে প্রহারের কথা মনে হয়। মধ্যমা দ্বারা দন্তধাবন করা হয়। অনামিকা অঙ্গুরী ধারণ করে। কনিষ্ঠা বিবাহের সময় প্রিয়াকে ধারণ করে। আর অঙ্গুষ্ঠ উচ্চে ধরিলে 'কাঁচা কদলী' বা 'কচু'র কথা মনে হয়। যিনি অঙ্গুষ্ঠ দেখান এবং যাঁহাকে দেখান হয়, তাঁহারা উভয়েই কেন যে কেশাকেশি, দন্তাদন্তিতে প্রবৃত্ত হন—ইহাই আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্যের কিছুই নাই; কারণ স্বয়ং সৃষ্টি-কর্ত্তা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য অঙ্গুলীতে যেমন চারিটী করিয়া হাড় আছে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে তাহা নাই। মাত্র তিনটী হাড় ইহাতে আছে। ভগবান যদি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মহিমাই না অনুভব করিবেন, তবে কেন এই স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করিলেন!

পিতামহ ব্রহ্মা যেদিন অণ্ড সৃষ্টি করেন, সেই হইতে আজি পর্য্যন্ত সকলেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া আসিতেছেন।

একটু ভুল হইল। সকলেই দেখান নাই। সমগ্র ঋগ্বেদে একবারও অঙ্গুষ্ঠের নাম বা ইঙ্গিত নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ঋগ্বেদের যুগে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইবার প্রথা ছিল না, প্রথাটী ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী যুগের।

অথর্ব্ববেদের যুগে রীতিমত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান হইতেছিল। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঘটিত কয়েকটী ঘটনায় সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশে বিশাল চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া যায়। গুম্ফ-শ্মশ্রু-সমন্বিত অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহগণ একদা সোমরস সেবন করিতে করিতে প্রশ্ন তুলিলেন,—"এই অঙ্গুলি কে সৃষ্টি করিল।" * তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত সকলেই ব্যাকুলস্বরে প্রশ্ন করিতেছে, "এই অঙ্গুলি কে সৃষ্টি করিল? কে সেই মহাপুরুষ যাঁহার মস্তকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইবার কথা সর্ব্বপ্রথম খেলিয়াছিল?"

ভারতবর্ষের ইতিহাসটা বড়ই খাপছাড়া। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ইতিহাসটা তাই ভাল করিয়া ধরা যায় না। অথর্ব্ববেদ হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া আবার যখন ইহাকে দেখা গেল, তখন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বড়ই পরিচিত হইয়া গিয়াছে।

দেবী ধারিণীর কোপে পড়িয়া মালবিকা সারভাণ্ড-গৃহে নিক্ষিপ্তা হইলেন। প্রিয়ার বিরহে রাজার নয়নের কোলে কালি পড়িল, ক্ষৌরকার্য্যের অভাবে গোঁফ-দাড়ী খোঁচা খোঁচা হইয়া উঠিল। আহারে রুচি নাই, বিহারে স্পৃহা নাই, শয্যায় ঘুম নাই। সে এক মহা সমস্যা। বিদূষক জিজ্ঞাসা করিল,—"সখে, কি হইয়াছে?" রাজা বলিলেন, "আর ভাই সে কথা বল কেন। মালবিকার অভাবে ইন্দ্রিয়ের সব কয়টী দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে।" বিদূষক উত্তর দিল, "এই কথা, আমি ভাবি অন্য কিছু! আচ্ছা দেখ, তোমার মালবিকাকে উদ্ধার করিতে পারি কি পারি না!"

তারপর কি করিয়া বিদূষক সর্পদংশনের অছিলায় অঙ্গুষ্ঠে পৈতা জড়াইয়া দেবী ধারিণী হইতে সারভাণ্ড-গৃহের চাবী উদ্ধার করিয়া মালবিকাকে মুক্ত করিল—তাহার পুনরুক্তি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। †

নাটকের এই জটিল মুহূর্ত্ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে সরল হইয়া গেল; সুতরাং যাঁহারা জটিলতা হইতে মুক্তি পাইতে চান, তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান অভ্যাস আরম্ভ করুন।

বিদূষকের অঙ্গুষ্ঠে পৈতা জড়ান আর কিছুই নহে, দেবী ধারিণীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনমাত্র! কালিদাসের যুগে লোকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইত কি না জানি না। তবে কালিদা

* অথর্ব্ববেদ। ১০।২।১

† মালবিকা অগ্নিমিত্র।

দেখাইতেন, ইহা সুনিশ্চয়! উপরের ঘটনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়।

এই প্রসঙ্গে বলা ভাল কবি ভাসেরও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান অভ্যাস ছিল।

কেহ কেহ সামনাসামনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া থাকেন, কেহ বা আবার পরোক্ষেও দেখাইয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র শেষের দলের।

পোষ্ট্‌মাষ্টারবাবু কিছুতেই গোবিন্দলালের ঠিকানা জানাইবেন না। মাধবীনাথ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। মনে মনে বলিলেন, "তবে রে বিটলে!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "ডাকবাবু, ঐ চৌকীদার দেখিতেছেন তো। আমারই কথায় ও আসিয়াছে। লাখ লাখ টাকা খরচ করিয়া আপনাকে চোর বানাইয়া জেল দিব!" ভয়ে ও আতঙ্কে ডাকবাবুর প্রচুর ঘর্ম্মপাত হইয়া গেল। বুকের যন্ত্রপাতি সহসা রুদ্রতালে নাচিয়া উঠিল। অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কায় গোবিন্দলালের ঠিকানা জানাইয়া তিনি খোলসা হইলেন। এই ঘটনা বিশেষ কিছুই নয়, ডাকবাবুকে মাধবীনাথের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন মাত্র! সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের অভ্যাসও প্রমাণিত হয়।

'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলা ও সেখজী, 'আনন্দমঠে'র শান্তি ও সাহেবের 'ঘটনা হইতে—বঙ্কিমের এই অভ্যাস সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়।

সচরাচর লোকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া মুখেও কিছু বলিয়া থাকে, যেমন—"কাঁচকলা" বা "কচু" অথবা এইরকম কিছু। কিন্তু এমন লোকও আছেন, যাঁহারা শুধু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন। মুখে আর কিছু বলেন না।

রবীন্দ্রনাথ এই দলের। তাঁহার উপদেশ এই, "নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি," অর্থাৎ শুধু দেখাইয়াই ক্ষান্ত হও, মুখে আর কিছু বলিও না।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান অন্যায় নয়। সকলেরই অভ্যাস করা উচিত। এই অতি প্রাচীন প্রথা কালক্রমে যদি লোকের বিস্মরণ হইয়া যায়, তাই সময় থাকিতেই কেহ কেহ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। মহিমা প্রচার করে কে? যিনি অনুভব করিতে পারেন, তিনিই!

পূর্ব্বে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মানবদেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতই সুগন্ধ বিতরণ করিত। ইহার দুর্গন্ধ সৃষ্টি করিল কঠোপনিষদের কাঠুরিয়াগণ!

একদা ইহারা সুন্দরবনে কাঠ কাটিতে আসিলে, খর্ব্বাকৃতি বঙ্গবীরগণ দা, কোঁচা, খুন্তি, প্রভৃতি লইয়া ইহাদিগকে তাড়া করিল। ইহাদের আক্রমণে কাঠুরিয়ারা বেশ আমোদ অনুভব করিল। কিন্তু যখন আমোদ শেষ-সীমায় উঠিল, তখন দুই একটাকে চপেটাঘাত করিয়া তাহারা বলিল, "এঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষঃ" তার আবার ইয়ে! যা যাঃ!" (কঠোপনিষদ)

সেই হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের এত হতাদর। ক্ষুদ্র বলিয়াই কি এত হতাদর? বোধহয় তাহাই হইবে। ছোট'র আদর কেহ করে না। দিয়াশলাই'এর কাঠিকেও কেহ আদর করে না। এই কাঠিই কিন্তু বিড়ি ধরাইয়া দেয়। মানুষ তাই খাইয়াই আরাম পায়!

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে অনাদর করা ঠিক নয়! এই অঙ্গুষ্ঠ কি না করিতে পারিয়াছে? অমন যে সর্ব্বশক্তিমান ইন্দ্র, তাঁহাকে পর্য্যন্ত এ সৃষ্টি করিয়াছে!

মনে কি পড়ে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বালখিল্য মুনিদের কথা? মনে কি পড়ে সামান্য গোষ্পদ জলে তাঁহাদের হাবু-ডুবু খাওয়া?

যদি মনে পড়ে, তবে সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের ইন্দ্র সৃষ্টি করার কথাও মনে করা উচিত!

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা গেল, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইবার প্রথা আদিম কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে উপেক্ষা করা ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর কি ঠিক হইবে?

আজ রাষ্ট্র রাষ্ট্রকে, সমষ্টি সমষ্টিকে, ব্যষ্টি ব্যষ্টিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে বলিয়া আমরা মস্তিষ্ক উত্তপ্ত করিতেছি। করা কি ঠিক হইতেছে? দেবতুল্য মহর্ষিগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ যাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই, আজও যাহাকে পথে-প্রান্তরে দেখা যাইতেছে, তাহাকে অবজ্ঞা করা কি উচিত?

অবজ্ঞা করিবেনই বা কি প্রকারে? এক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতে হইবে! অন্য উপায় নাই!

দশম বার্ষিক প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলন

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশন এ বৎসর প্রয়াগে বড়দিনের সময় হইয়াছিল। বঙ্গদেশের বাহিরে বাঙ্গালী এই মিলন-ক্ষেত্রে দেখাইয়াছে বাঙ্গালী শিক্ষায়, সামাজিকতায়, শিল্পে ও জাতীয় বিশিষ্টতায় কতদূর বাঙ্গালীর ধারাকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছে ও কি ভাবে অন্যান্য দেশবাসীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় কৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে। জাতির স্বরূপ চিনিতে পারা যায় তাহার কৃষ্টি দ্বারা। উহা জাতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। সেইজন্য এইরূপ সাহিত্য সম্মিলন জাতির গৌরব বৃদ্ধি করে।

এই প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচয় লওয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। আজ দশ বৎসর ধরিয়া প্রবাসের নানা শহরে—যেমন কাশী, কানপুর, দিল্লী, নাগপুর, মিরাট লাহোর, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানে—সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া প্রবাসী বাঙ্গালীদের সাহিত্য-আলোচনা ও সাধনার সম্যক্ পরিচয় দিবার সুযোগ দিয়া আসিতেছে।

এ বৎসর প্রয়াগের প্রায় বার শত নরনারী মিলিত হইয়া কি উদ্যমের সহিত এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিল তাহা দেখিলে প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয় পুলকে ভরিয়া ওঠে।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় প্রতিনিধিদের সেবা-কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর অনুকরণীয়।

মূল সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোন লিখিত অভিভাষণ পাঠ না করিয়া বক্তৃতায় বাঙ্গালীর নিরক্ষরতার কথা মর্ম্মগ্রাহী ভাষায় প্রকাশ করেন। জাতির উন্নতি, জাতির লোক-শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সেইজন্য তিনি দেশে বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় যাহাতে বহুল পরিমাণে স্থাপিত হয় তাহার জন্য সকলকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন।

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-শাখার সভাপতি হইয়া একটী সুলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি সাহিত্যে দুর্নীতি যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহার জন্য যুক্তিপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেন।

মহিলা-বিভাগের সভানেত্রী হইয়াছিলেন শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ও কলা-বিভাগের সভানেত্রী হন শ্রীযুক্তা সরলা দেবী। সরলাদেবী বাদ্যযন্ত্র ও গানের দ্বারা বাঙ্গালার সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। প্রবাসী মহিলাদের উৎসাহও বাঙ্গালী মহিলাদের অনুকরণীয়। প্রায় ছয় শত মহিলা নিত্য উপস্থিত থাকিতেন এবং আলোচনায় যোগদান করিতেন।

ইতিহাস-শাখায় সভাপতি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় হিন্দু-শিল্পের অধঃপতন সম্বন্ধে ও আর্য্য-সভ্যতার উপর অনার্য্য সভ্যতায় প্রভাব-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন।

অর্থনীতি বিভাগের সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগীশচন্দ্র সিংহ মহাশয় একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সম্মিলন অন্তে বৌদ্ধ-যুগের প্রসিদ্ধ স্থান 'ভাটা', 'কৌশাম্বী দেখিতে প্রতিনিধিগণ গিয়াছিলেন। এ প্রকার সম্মিলনে জাতির প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়।

সপ্তম বার্ষিক-প্রবাসী সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণ
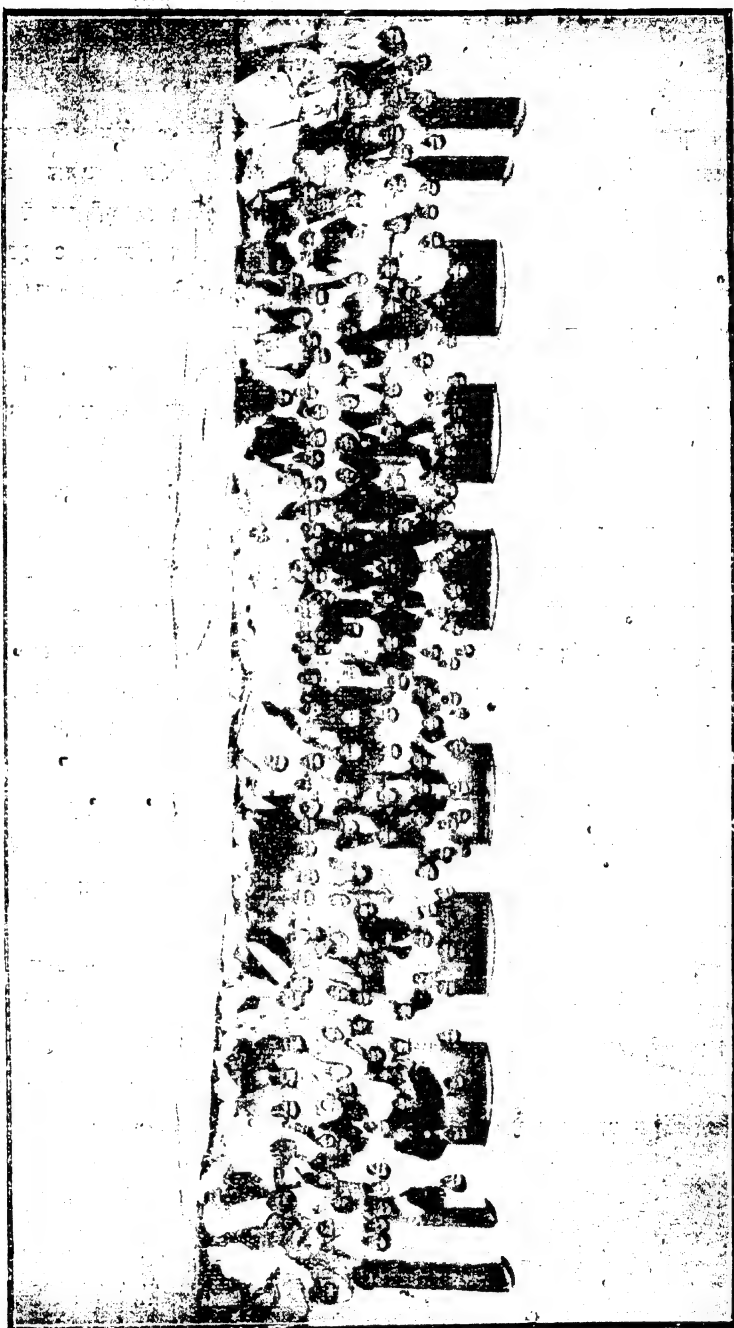
বৌদ্ধ শিল্পকলার আদর্শ ও অজন্তা গুহা

শ্রীঅজিত ঘোষ

বৌদ্ধ শিল্পকলার নিদর্শন জগতে অতুলনীয়। ভারতীয় শিল্প-কলার ক্রমোন্নতির যুগে বৌদ্ধ স্থাপত্যকলা যেরূপ পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, চিত্র-কলাও তেমনই বৌদ্ধযুগে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। এ-গুলির আবিষ্কার দর্শক ও বিশেষজ্ঞদের অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল বৰ্দ্ধিত করিয়াছে এবং প্রমাণ করিয়াছে, ভারত যে শুধু তাহার ভাস্কর্য্য ও স্থপতি-শিল্পে চরমোন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা নহে, চিত্র-কলায়ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক ও শিল্প-রসিকের নিকট চিত্রগুলির মূল্য বড় কম নয়।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কোন জিনিস অধিকদিন স্থায়ী হয় না, গ্রীষ্মের প্রকোপে সেগুলি বিবর্ণও হইয়া যায়। ভারতের শিল্পিগণ যে সমস্ত শিল্প-সম্ভার রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের অনেকই কালের গর্ভে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অল্পস্বল্প যাহা কালগতিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহাই অতীত ইতিহাসের এক উজ্জ্বল পৃষ্ঠা আমাদের সম্মুখে খুলিয়া দিয়াছে। ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতি ও সভ্যতার পরিচয় এগুলি হইতে পাওয়া যায়। যত্ন ও মনোযোগিতার অভাবেও অনেক নষ্ট হইয়াছে। এই শিল্প-সভ্যতার পরবর্ত্তীযুগে উপযুক্ত শিল্প-রসিকের একান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে উহার উপর জনসাধারণের দৃষ্টি ও অনুরাগ কমিয়া আসা অস্বাভাবিক নয়। মুসলমান-আক্রমণ ও আধিপত্য এগুলির যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে। মুসলমানেরা ভারতে পদার্পণ করিবার পর হইতেই এ-গুলির উপর অত্যাচার চলে। ফলে ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্য্যের প্রাচীন নিদর্শনগুলি লুপ্ত এবং স্থলবিশেষে ভগ্ন ও বিকৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

খৃষ্টজন্মের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই (অনেকের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের মধ্যভাগ হইতে) ভারতের এই মহিমময় শিল্পপদ্ধতি গড়িয়া উঠে। মহারাজ অশোকই ইহার প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা। প্রস্তরের উপর কারুকার্য্য মূর্ত্তিগঠন প্রভৃতি তো হইতই, উপরন্তু তখন হইতেই ভারতে পাহাড় কুঁদিয়া বৌদ্ধদের বিহার ও চৈত্য নির্ম্মাণের সূত্রপাত হয়। জগতে এ-গুলির সমকক্ষ গুহা-মন্দির উৎকীর্ণ শিলালিপি বা শিলা-লেখ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এ গুলির কারুকার্য্য এত সুন্দর যে, পাশ্চাত্ত্য বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, পাথরের উপর এমনভাবে জীবন্ত মূর্ত্তি অন্য কোন দেশের শিল্পী ক্ষোদিত করিতে পারে নাই। আজ কত শত বৎসর অতীত হইয়াছে—পাহাড় কাটিয়া এই সমুদয় মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, বহুদিনের অযত্নে সেগুলি নষ্ট হইবারই কথা কিংবা পাহাড় ধ্বংস হইতে পারে; কিন্তু সেগুলি এমনই সুনিপুণভাবে গঠিত হইয়াছে যে, বহুস্থানে মন্দিরের স্তম্ভ প্রভৃতি ছাদের অবলম্বন ভগ্ন হওয়ায়ও পাহাড় ধ্বসিয়া পড়ে নাই বা পাহাড়ের বুকের উপর ক্ষোদিত কীর্ত্তিও নষ্ট হয় নাই। শিল্পীর শিল্প রহিয়াছে কিন্তু শিল্পী নাই, তাঁহারা চির-অতীতের কোলে আত্ম-গোপন করিয়াছেন। এই সমস্ত শিল্পী আপনাদের সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া জন্মভূমির উপর যে অকৃত্রিম ভালবাসা ও অনুরাগে ইহাদের গঠন-কার্য্যে তৎপর হইয়াছিলেন, তাহা কল্পনা করাও যায় না। সারা ভারতবর্ষে স্থাপত্যের এত নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু তাহার কোথাও শিল্পীদের নাম পাওয়া যায় না—পাওয়া যায়, হয় তো কাহার পরিকল্পনা বা পৃষ্ঠপোষকতায় নির্ম্মিত হইয়াছে, কিংবা কে করাইয়াছেন। ইহাতে সহজেই অনুমিত হয় যে, ভারতীয় শিল্পিগণ নিজ নামের জন্য মোটেই লালায়িত ছিলেন না—কর্ত্তব্যই তাঁহাদের অনুপ্রেরণা দিত। এইস্থানে আমরা তখনকার ভারতের ভাবধারার একটী সুন্দর চিত্র পাই। তখন যে ভাবধারা ভারতে বিদ্যমান ছিল বর্ত্তমানে তাহা বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে—সম্ভবতঃ বিদেশীয় প্রভাবেই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাহাড় কুঁদিয়া চৈত্য বা বিহার নির্ম্মাণ বৌদ্ধদের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। এইস্থানে চৈত্য ও বিহার সম্বন্ধে দুই একটা একান্ত প্রয়োজনীয় কথা বলাও আবশ্যক মনে করি। ধর্ম্মসঙ্ঘ বৌদ্ধদের ধর্ম্মের একটী

অঙ্গ। বৌদ্ধরা ছিলেন সাত্ত্বিক, অর্থাৎ তাঁহাদের উপাসনা ব্রাহ্মণ বা জৈনদিগের মত ব্যক্তিগত ছিল না, সকলে একসঙ্গে মিলিয়া উপাসনা করিতেন। এই উপাসনা-পদ্ধতি ধর্ম্ম-সভারই অনুরূপ। বৌদ্ধরা উহাকে বলিতেন—চৈত্য। এই চৈত্য বা ধর্ম্মসভা এরূপ সম্মানার্হ ছিল যে, বুদ্ধদেব বা বৌদ্ধধর্ম্মের মতই পূজিত হইত।

বৌদ্ধধর্ম্মের মতে যে সমস্ত গৃহস্থ ত্রিশরণগত হইয়া বুদ্ধদেবের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন তাঁহারা কেবলমাত্র উপাসকরূপে গণ্য হইতেন। কিন্তু যাঁহারা 'আগার' পরিত্যাগ করিয়া 'অনাগারী' হইতেন, তাহারা পরিগণিত হইতেন ভিক্ষুরূপে। ভিক্ষু ও উপাসকের মধ্যে মাত্র

গৌতমের প্রতি সদলবলে মারের আক্রমণ
(অজন্তার ১নং গুহার চিত্র ;
গ্রিফিথ্‌সের চিত্র হইতে)

ইহাই যে পার্থক্য তাহা নহে. ভিক্ষুগণ একেবারে ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেন আর উপাসকগণ গৃহস্থ থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেন। একই সঙ্ঘে উপাসনা করিতে বসিলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রক্ষিত হইত। উভয়ের জীবনধারা বিভিন্ন হওয়ায় চৈত্যের আসনেরও স্বাতন্ত্র্য হইয়াছিল। ইহাতে চৈত্যের নির্ম্মাণ-পদ্ধতিরও অল্পবিস্তর স্বাতন্ত্র্য ঘটিয়াছিল। সাধারণতঃ উপাসনা-মন্দিরের ভিতরটা একটা লম্বা হলঘরের মত। ইহার একপ্রান্ত অর্দ্ধবৃত্তাকার। ভিতরে স্তম্ভের উপর ছাদ। এই স্তম্ভগুলি ও বাহিরের ভিত্তি-প্রাচীরের মধ্যে একটা অর্দ্ধবৃত্তাকার পথ— তাহাতে উপাসকগণ প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেন। এই পথকে বলা হইত প্রদক্ষিণ পথ। দুই স্তম্ভ-শ্রেণীর মধ্যস্থ স্থান ভিক্ষুদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত। তাঁহাদের সম্মুখে থাকিত—চৈত্য। এই চৈত্যই বৌদ্ধদের উপাসনার আদর্শ।

অজন্তার অর্ঘ্যবহনকারীদের চিত্র

চৈত্যের সহিত বিহারের পার্থক্য এই যে, চৈত্য উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইত আর বিহার পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-সঙ্ঘের ভক্তগণ-কর্তৃক বাসস্থানের জন্য ব্যবহৃত হইত। বিশেষতঃ ভিক্ষুগণ উহা অধিকার করিতেন।

অসিত ও বুদ্ধ (অজন্তার ১৬নং গুহার চিত্র)

বৌদ্ধযুগে ভারতের সর্ব্বত্রই এইরূপ চৈত্য ও বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধরা শান্তিপ্রিয়, তাই শান্তির জন্য অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহারা স্থির করিলেন, লোকলোচনের অন্তরালে এমন কোন নির্জ্জন স্থানে তাঁহাদের ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যেখানে বিশ্বের কোলাহল ও অশান্তিময় জীবনযাত্রা তাঁহাদের ধর্ম্মাচরণে কোনওরূপ বাধা দিতে পারিবে না। পাহাড় কুঁদিয়া ধর্ম্মমন্দির

প্রতিষ্ঠার ইহাই সূত্রপাত হইল। মানসিক আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্যময় স্থানের সন্ধান চলিতে লাগিল।
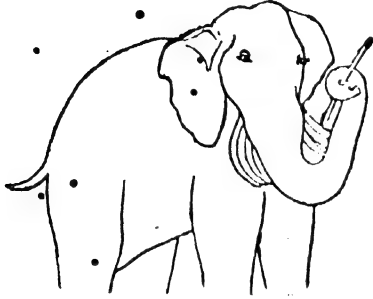
অজন্তার ছদ্দন্ত হস্তী (চীনা ভাষায় ইহাকে 'শি-উ-চি' বলা হয়)

নির্জ্জন পাহাড়ের কোলে প্রকৃতি যেখানে তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য উজাড় করিয়া দিয়াছে, সেইখানেই চৈত্য-গুহা ও বিহার নির্ম্মিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এইরূপ অসংখ্য গুহামন্দির গড়িয়া উঠিল।

এই সমুদয় গুহামন্দির নির্ম্মিত হইবার আর একটী বিশেষ কারণ আছে। ইহা দেশের বিভিন্ন আবহাওয়া হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই; গুহামন্দিরগুলি সম্পূর্ণরূপে আবহাওয়া ও ভূতত্ত্বের সহিত সম্পর্কিত। আমাদের দেশে রৌদ্রের প্রখরতা যখন খুবই বাড়ে, তখন মানুষের প্রাণ উত্তাপের স্বল্পতা কামনা করে। ইহা ভিন্ন বর্ষা, শীত—সকল সময়ে মানুষকে অল্পবিস্তর অতিষ্ঠ হইতে হয়। তাই ছাত্র ও সন্ন্যাসী, উভয়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে এমন ভাবে এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ষার অবিরল ধারা ও গ্রীষ্মের অসহনীয় উত্তাপ হইতে বিহারবাসী ভিক্ষু, ছাত্র ও চৈত্যের উপাসকবর্গকে রক্ষা করিতে ইহারা ছিল অদ্বিতীয়। ধর্ম্মের কঠোর সাধনার অনুভূতি যে শুধু উহাদের মধ্যে বিকশিত হইয়াছিল তাহা নহে, বুদ্ধদেবের চরণে মানব আপনাকে পরহিত-ব্রতে উৎসর্গ করিবার জন্য এখানে শিক্ষালাভ করিত—
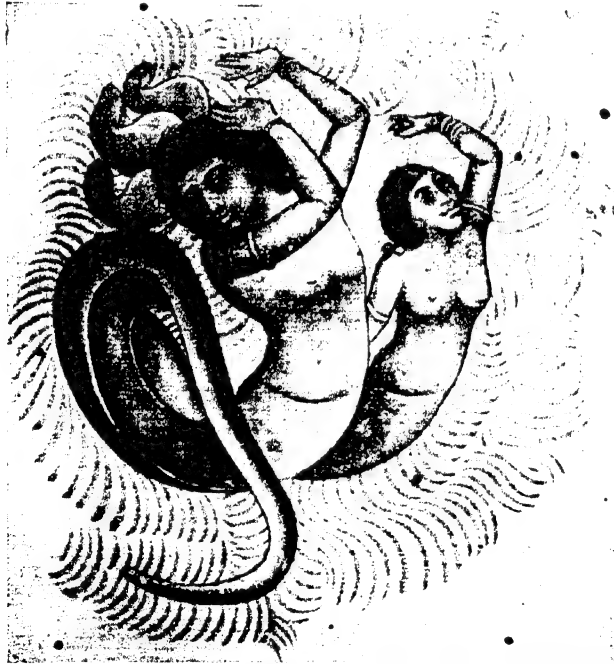
জলমধ্যে নাগ ও নাগিনী (অজন্তার ২নং গুহার প্রাচীর-চিত্র ; গ্রিফিথসের অঙ্কিত চিত্র হইতে)

ভক্তিরসধারা ইহাদের মধ্যে এখানে পরিস্ফুট হইত। প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় কলাশিল্পী হ্যাভেল সাহেব বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্যদের নিকট এই গুহামন্দিরগুলি অদ্ভুত লাগিলেও ভারতবাসীর নিকট উহারা একাধারে ভোগীর বিলাসস্পৃহা, শিল্পীর তক্ষণকুশলতা ও ব্যক্তি অথবা সঙ্ঘের বিশিষ্ট ভক্তি-প্রবণতার পরিচয়স্থল।

অজন্তা, বাঘ, নাসিক, জুনির, কার্লি, আঙ্গাই, ভাজা, বেদসা, পত্তদখল ইলোরা, এলিফ্যাণ্টা ও মহাবল্লিপুর—এই সমস্ত গুহামন্দিরের নিদর্শন। ইহাদের মধ্যে অজন্তা গুহাই সর্বশ্রেষ্ঠ, ইলোরায়ও আমরা শিল্পীর অসাধারণত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই কিন্তু অজন্তার চিত্রকলার দৃষ্টান্ত শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বাঘগুহাতেও আমরা চিত্র-কলার প্রভূত নিদর্শন পাই। বস্তুতঃ বাঘ ও অজন্তার চিত্র-কলার

নাগের পশ্চাদ্ভাগ (অজন্তার ২নং গুহার চিত্র)

মত এ শ্রেণীর এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর নাই। উভয়স্থানেই প্রকৃতির অত্যাচারে অনেক কিছুই লুপ্ত হইয়াছে। যাহা আছে, তাহাই ভারতীয় চিত্র-শিল্পের অপূর্ব্ব পরিচায়ক। বর্ত্তমানে বিশেষতঃ বাঙ্গালী শিল্পিগণ তাহারই অনুকরণে ভারতীয় চিত্র-শিল্পের পুনরুদ্ধারে প্রয়াস পাইতেছেন। ইহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন; ইহা আমাদের প্রকৃতই আনন্দের বিষয়।

ভারতের এই প্রাচীন চিত্র-সম্ভার সমস্তই ধর্ম্মসম্বন্ধীয়। বুদ্ধদেবের জীবন-কথা, ধর্ম্মের কথা, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গল্প-উপকথায় চিত্র ইহাতে অঙ্কিত। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ জাতকের বিষয় গুলিও অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ অজন্তার প্রাচীর গাত্রে সে সমুদয় চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। এই জাতকগ্রন্থ বৌদ্ধদের দ্বারা বিশেষরূপে আদৃত হইত। ঈ-চিঙ্গ তাঁহার বিবরণে বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে এই গ্রন্থের সমধিক আদর ছিল। আর্য্যশূরের লিখিত বিষয় হইতেই অনেক চিত্র অজন্তার প্রাচীর-গাত্রে স্থান পাইতে দেখা যায়। মূলতঃ গুহামন্দিরের এই চিত্রগুলি চিত্তবৃত্তি ও অনুভব-প্রবণতার প্রকৃষ্ট আদর্শ।

এই সমস্ত চিত্রকলায় আর একটী জিনিস আমরা বেশ লক্ষ্য করি। তৎকালীন ভারতের সমাজ, নীতি, আচার-ব্যবহার, কৃষি, সাধারণের গৃহস্থ-জীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির চিত্রও এগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি হইতে আমরা প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভারতের

গরুড়ের চিত্র (অজন্তার ১৭নং গুহা হইতে)

সাধারণ জীবনধারার সুন্দর পরিচয় পাই। এতদ্ব্যতীত বিদেশীয় প্রভাবও এই সমস্ত গুহামন্দিরগুলিতে পরিলক্ষিত হইয়াছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক র‍্যাল্ফ ও গ্রিফিথ চোখে এই সত্য প্রথম ধরা পড়ে। উদাহরণস্বরূপ তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে এইরূপ পাওয়া যায়—কোথাও তাঁহারা বলিতেছেন, "এই একটী সুন্দর ম্যাডোনার মুখ, আর এইগুলি দেখুন হিন্দুর মুখ, বিদেশীর নহে।" আবার আর এক স্থানে বলিতেছেন, "এইখানে দেখুন একজন কৃষ্ণকায় আবিসীনীয় রাজা বিছানার উপর বসিয়া আছেন, তাঁহার অলঙ্কারগুলি

লক্ষ্য করুন। আর ঐ যে স্ত্রীলোকটী তাঁহার বাম হাঁটুর উপর বসিয়া আছে, যাহাকে তিনি আলিঙ্গন করিয়াছেন, ও আপনি বা আমার মতনই সুন্দর। এই লোকগুলি কি আদিম কঙ্গিয়াবাসী ক্রীতদাস?" আবার বলা হইয়াছে, "এইস্থানে তিনটী সৌন্দর্য্যের নিদর্শন পরিস্ফুট হইয়াছে, একটী আফ্রিকাদেশীয়, একটী তাম্রবর্ণ ও আর একটী ইউরোপীয় অঙ্গরাগ। হাঁ, তাহাদের কিরূপভাবে সমাবেশ করা হইয়াছে! এই দেখুন একটী সুন্দর লোক—একজন কঞ্চুক।" আর এক স্থানে তাঁহারা বলিতেছেন, "আমরা কতবারই এই তিনটী সৌন্দর্য্যের নিদর্শন পাইতেছি! এখন এইটী আমরা যতগুলি দেখিয়াছি তাহাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ-গুলি তিনটী মনুষ্য-চিত্র; তাহারা চীনদেশীয়। তাহাদের চুল লক্ষ্য করুন। মেয়েদের চুলগুলি বেণীবদ্ধ-

এই চিত্রগুলি অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে এগুলির উপর বিদেশী প্রভাব পড়িয়াছিল।

সম্ভবতঃ তখনকার ভারতবাসীরা সারা পৃথিবী ঘুরিতেন, এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ঘুরিয়া তাঁহারা সকল দেশের স্থাপত্য-শিল্পের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। উহার নিদর্শন কোন কোন ভারতীয় শিল্পীর তুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সামাজিক জীবনের চিত্রসমূহেও যে আদর্শ আনীত হইয়াছে, তাহাও তদানীন্তন ভারতের নিজস্ব ও বাহির হইতে সংগৃহীত ভাব হইতে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঘ ও অজন্তা চিত্র-কলারই জন্য প্রসিদ্ধ। তবে বাঘের অপেক্ষা অজন্তারই শিল্প-নৈপুণ্য বেশী—শিল্প-সম্ভারের পরিমাণও অধিক; সুতরাং বাঘের
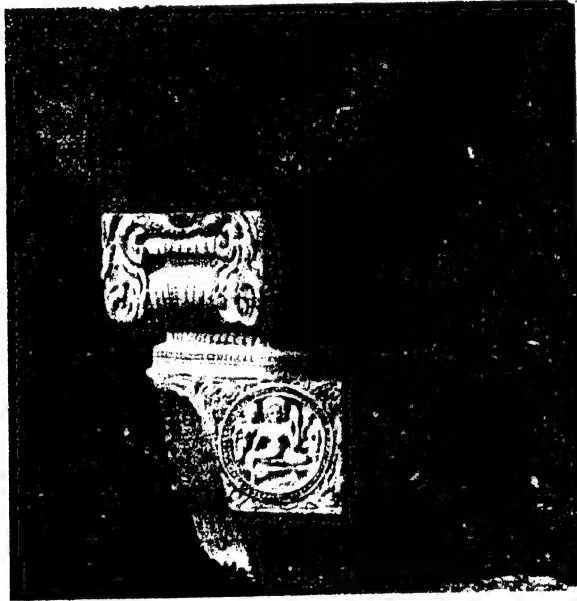
অজন্তার স্তম্ভশীর্ষের কারুশিল্প

কাঁধে থাকাইয়া মুখের উপর দিয়া ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহারা ঠিক হ্যাম্পটন-কোর্টের অনুরূপ।"

য়্যাল্‌ফ্‌ ও গ্রিস্‌লি অবশ্য এই সমুদয় বিদেশী ছবিগুলির সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন নাই। তাহা হইলেও

অপেক্ষা অজন্তারই কদর বেশী। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি এই অজন্তা সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অজন্তা চিত্র-কলার অধিকাংশ চিত্রই বৌদ্ধদিগের। কিন্তু যে শিল্পিগণ এগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, আমাদের

মনে হয় ইঁহারা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন প্রকৃত শিল্পী, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী না হইয়া অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারেন। অজন্তার চিত্রগুলিতে ভালরূপে লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে বাস্তবিকই উহার সমস্ত বৌদ্ধ-শিল্পীদের নহে, এ কথা বহু ঐতিহাসিকও ইতিপূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন। আমরা এই চিত্র সমূহের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু চিত্রের নিদর্শন পাইয়াছি। দশাবতার মূর্ত্তিতে শিবের তাণ্ডব নৃত্য, হরগৌরী প্রভৃতি ইহার উদাহরণ-স্বরূপ। অজন্তার একটী জিনিস বেশ লক্ষিত হয় যে, এখানকার শিল্পীরা যে কেবল চিত্র আঁকিয়াই ক্ষান্ত হইতেন তাহা নহে, তাঁহারা তাঁহাদের চিত্রের মধ্যে এমন একটী ভাব ও অভিব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তুলিতেন যাহাতে সে চিত্র দেখিলে ভিতরের রহস্য সহজেই উদ্ঘাটিত হইত। ভারতীয় চিত্র-কলার ইহাই বৈশিষ্ট্য। চিত্রের অন্তরের ভাব-ব্যঞ্জনা চিত্রের বাহিরের ভাব-ভঙ্গীতে প্রকাশিত। আর এরূপ করিতে তাঁহারা যেন সিদ্ধহস্ত ছিলেন—অঙ্কিত চিত্রে শিল্পীর চেষ্টার অনুমাত্র চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ এমন একটী স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ও সুষমা সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, দেখিলে স্তম্ভিত না হইয়া থাকা যায় না।

বৌদ্ধগণ প্রেমবিষয়ক চিত্র মোটেই পছন্দ করিতেন না। কিন্তু অজন্তায় এ শ্রেণীর চিত্র স্থান পাইয়াছে। বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্মাচারীদের নীতি-শিক্ষা দিবার জন্যই সে-গুলি অঙ্কিত হইয়াছিল। এই প্রেমমূলক চিত্রগুলি অতি সুন্দর, উহাদের প্রতিটী ভাব যেন বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছে। এই ভাবের অভিব্যক্তি বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়া পারমার্থিক ভাব সূচিত করিয়াছে।

অজন্তার চিত্রসমূহের সমস্তই প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত। গুহার ভিতরের ভিত্তি-প্রাচীর, ছাদ প্রভৃতি সমস্তই চিত্রিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ চিত্রই নষ্ট হইয়াছে—তাহা দেখিলে কষ্টের সীমা থাকে না।

ইউরোপীয়েরা যখন প্রথম এই চিত্র-কলা সম্বন্ধে সংবাদ পায়, তখনই তাহারা এখানে আসিয়া চিত্রগুলির অনেক প্রতিলিপি লইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের মধ্যে অনেক প্রতিলিপি বিলাতের "ক্রিষ্টাল প্যালেসে" পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। অন্যান্য যাঁহারা প্রতিলিপি লইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বোম্বাই আর্ট স্কুলের গ্রিফিথস্ সাহেব ও তাঁহার ছাত্রগণ, মিসেস্ হেরিংহাম, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর অন্যতম। এই প্রতিলিপিগুলি বিলাতের 'সাউথ কেনসিংটনে'র 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম' ও ভারতের অন্যান্য মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

অজন্তার স্তম্ভশীর্ষে কারুশিল্পের আর একটী নিদর্শন

ক্রমশঃ

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

রাজসিংহ

—শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ'-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিলে প্রথমে দেখা যায় যে, গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকের তুলনায় রাজসিংহ উপন্যাসখানির প্রসিদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম। 'রাজসিংহ' বইখানি পাঠ করিলে প্রথমেই মনে হয় যে, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ প্রভৃতির লেখকের পক্ষে রাজসিংহ বইখানি ঠিক যেন উপযুক্ত হয় নাই, কোথায় যেন কিসের একটা অভাব থাকায় বইখানি গ্রন্থকারের স্বভাবিক প্রতিভার স্পর্শ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে ; অথচ রাজসিংহের ভিতর উপাখ্যান এবং চরিত্র-বিশ্লেষণ, ইতিহাস এবং বিস্ময়কর বা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনারও অভাব নাই। তবে অন্যান্য উপন্যাস হইতে যে পার্থক্যটুকু প্রথমেই চোখে পড়ে তাহা এই যে, গ্রন্থকার উপন্যাসখানিকে আধুনিক ইংরেজী উপন্যাসের ছাঁচে না ঢালিয়া পুরাণ, ইতিহাস বা রূপকথার মতন করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। এখানে যেন গ্রন্থকার ঠাকুরমার আসন গ্রহণ করিয়া কৌতূহলী শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধনপূর্ব্বক রূপনগরের রাজা বিক্রম শোলাঙ্কির গল্প বলিতেছেন। সমস্ত উপন্যাসের ভিতর দিয়া নায়িকার বিরহ ও নায়কের বীরত্ব বর্ণনা করিয়া গ্রন্থের শেষে নায়কের জয়লাভ, নায়ক-নায়িকার মিলন ও অত্যাচারী মুসলমানের লাঞ্ছনা বর্ণন করিয়া উপসংহারে নিজের সাফাই গায়িয়া পাঠকের নিকট হইতে গ্রন্থকার বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। উপরন্তু উপন্যাসের মাঝে মাঝে ইতিহাসকে তিনি এরূপ প্রাধান্য দিয়াছেন যে, তাহাতে যেন মনে হয় উপন্যাসের পরিবর্ত্তে ইতিহাস পাঠ করিতেছি। মধ্যে রাজসিংহের পত্র লিখিবার সময় গ্রন্থকার ইতিহাস লইয়া এরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন যে, তিনি একেবারে টড হইতে কয়েক লাইন ইংরেজী লইয়া উপন্যাসের ভিতর তুলিয়া দিয়াছেন। (পঞ্চম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) বোধ হয় ইতিহাসকে এত প্রাধান্য দিতে গিয়া গ্রন্থকার ভাষার প্রতি অবহিত হইতে পারেন নাই। রাজসিংহের ভাষার ভিতর সে সম্মোহনশক্তি নাই যাহা 'আনন্দমঠে'র পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে, সে বৈচিত্র্য নাই যাহা সীতারামের পাঠককে তন্ময় করে। রাজসিংহ বইখানি ঐতিহাসিকের প্রাণহীন ঘটনাবিন্যাসের ভাষায় পৌরাণিক গল্পের ছাঁচে লেখা হইয়াছে। আরও এক কথা, আধুনিক কথা-সাহিত্যের মধ্যে আর একটা বড় জিনিস এই যে, গ্রন্থকার পাঠকের মনকে যথেষ্ট কল্পনা করিবার অবকাশ দিয়া থাকেন, কিন্তু রাজসিংহে সেই অবকাশের অত্যন্ত অভাব। মুসলমানকে হটাইয়া দিয়া রাজসিংহ তাঁহার নবপরিণীতা রূপনগরী পত্নী লইয়া বাস করিতে লাগিলেন ; এইখানে আসিয়া গ্রন্থকার তাঁহার পাঠকবর্গের নিকট বিদায় লইলেন, পাঠক ও যথারীতি নিশ্চিন্ত মনে পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন। পুস্তকের উপাখ্যান পুস্তকেই সন্নিবিষ্ট রহিল, নায়ক-নায়িকা পাঠকের সহিত অভিন্নহৃদয় হইয়া উপন্যাসের উত্থান-পতনের সহিত পাঠকের মনের ভিতর তুফান তুলিতে সমর্থ হইল না। 'কপালকুণ্ডলা' বা 'দুর্গেশনন্দিনী'র শেষ পরিচ্ছেদ শেষ করিবার সময় গ্রন্থকার পাঠকের মনে একটা দীর্ঘশ্বাসকে এরূপ চিরস্থায়ী করিয়া যান যে, পাঠক সহজে ঐ উপন্যাস পাঠের বেদনাকে বিস্মৃত হইতে পারে না। কিন্তু 'রাজসিংহে'র পরিসমাপ্তি যেরূপ কোন পরিচ্ছেদের ভিতর দিয়া হয় নাই, তৎপরিবর্ত্তে আছে একটী উপসংহার। উপসংহারে ধর্ম্মের গুণগান করিতে গিয়া সাধারণ পাঠকের নিকট পুস্তকের সংস্কার-সাধন করা হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, উপসংহারের বক্তব্যটুকু পুস্তকের প্রারম্ভে ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট করিলে মন্দ হইত না।

তবে গ্রন্থকারের মতে 'রাজসিংহ' উপন্যাসখানি প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই দিক্ দিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায়, ঐতিহাসিক এবং কাল্পনিক চরিত্রগুলির একত্র সমাবেশে গ্রন্থকার খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর রাজপুতনা এবং দিল্লী-আগ্রার বেশ একখানি সুন্দর চিত্রের অবতারণা এবং গল্পের ভিতর দিয়া আমাদিগকে সেই যুগের ঘটনার সহিত পরিচিত করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উপন্যাস হিসাবেও বইখানির বেশ একটা অভি-নবত্ব আছে। 'বীরবালা চঞ্চলকুমারীর বীরানুরাগ,

স্ব-জাত্যাভিমান,দস্যু মাণিকলালের কৃতজ্ঞতা, দরিয়ার মর্ম্ম-ভেদিনী জ্বালা, ঔরঙ্গজেবের ন্যায় কূটনীতিদগ্ধ হৃদয়েরও স্পষ্টবাদিনী নির্ম্মলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব' ইহার কোনটাই পুরাতন বা অর্থহীন নয়। প্রত্যেক চরিত্রই উপন্যাসের ভিতর কৃতিত্বের সহিত আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছে। ইহা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থ সংস্করণের পরিবর্ত্তনগুলি সত্যই একটা লক্ষ্য করিবার জিনিস। সকলেই জানেন, উপন্যাসখানি প্রথমেই একটা ছোট গল্পের আকারে লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার নিজে সেই পুস্তকখানিকে 'ক্ষুদ্র কথা-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন এবং পরে সেই ছোট গল্পেরই বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া কেবলমাত্র সন্নিবেশে উপন্যাসখানি উপস্থিত আকার ধারণ করাইয়াছেন। এক-কথায় এই উপন্যাসখানি প্রথমে তাহার অতি আবশ্যকীয় মূল ঘটনাটুকু লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং গৃহের বৈচিত্র্যহীন প্রাচীর যেমন এক একখানি চিত্রকে ভূষণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আপনার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে, রাজসিংহ উপন্যাসও তেমনি মবারক, দরিয়া, উদীপুরী ও জেব্‌উন্নিসার কাহিনী বা নির্ম্মলকুমারীর সহিত বাদসাহের কথোপকথন কেলের অঙ্গীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে বলিতে পারি না, বোধ হয় প্রাচীরের সহিত চিত্রের যে মিলন তাহা অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইতে পারে নাই।

১২৮৪ সালের বঙ্গদর্শনের চৈত্র সংখ্যায় রাজসিংহ উপন্যাসখানি প্রথম গল্পাকারে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। বসুমতী বা 'গুরুদাস-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে আমরা রাজ-সিংহের চতুর্থ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণই দেখিতে পাই। এই চতুর্থ সংস্করণ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় প্রকাশিত রাজসিংহের শেষ সংস্করণ। প্রকাশের তারিখ ১০ই আগষ্ট, ১৮৯৩।

এই সংস্করণে উপন্যাসখানি মোটের উপর সাতটী খণ্ডে বিভক্ত, প্রত্যেক খণ্ডে আবার পরিচ্ছেদ ভাগ আছে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিবার সময় লেখক বোধহয় গল্পটীকে এইরূপ খণ্ড এবং পরিচ্ছেদে ভাগ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন; কারণ গল্প আরম্ভের সময় (১২৮৪, বঙ্গদর্শন, চৈত্র সংখ্যা) প্রথম খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদে এইরূপ লেখা দেখিতে পাওয়া যায়, তবে পরে আর কোন খণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায় না।" বঙ্গদর্শনের রাজসিংহ আঠারটী পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রাজসিংহ-সম্বন্ধে জীবনীবৃত্তকার শচীশবাবু তাঁহার 'বঙ্কিম-জীবনী' পুস্তকের ২১০ পৃষ্ঠায় (তৃতীয় সংস্করণ) লিখিয়াছেন, "রাজসিংহ ১২৮৬ সালের চৈত্রে আরম্ভ হয়, বঙ্গদর্শনে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই" এবং ৩০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "রাজসিংহ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইতে হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল"। এইরূপ লেখার কোন কারণ আমরা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। বঙ্গদর্শন ১২৮৪ সালের চৈত্র সংখ্যায় রাজসিংহ আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু অতঃপর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গদর্শন ১২৮৫ সালের ভাদ্র সংখ্যায় গল্পটী সম্পূর্ণ হয়। বঙ্গদর্শন ১২৮৪ সালের চৈত্র সংখ্যায় রাজসিংহের প্রথম চারিটী পরিচ্ছেদ, ১২৮৫ সালের বৈশাখে পঞ্চম হইতে অষ্টম, জ্যৈষ্ঠে নবম হইতে একাদশ, আষাঢ়ে দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ, শ্রাবণে পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ, এবং ভাদ্রে সপ্তদশ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে রাজসিংহ উপন্যাস সম্পূর্ণ হয়। শচীশবাবু তাঁহার 'জীবনী'-পুস্তকের ভিতরেই লিখিয়াছেন (পৃঃ ৩০৪) যে, "রাজসিংহ উপন্যাস প্রকাশিত হইতে হইতে বন্ধ হওয়ার জন্য শ্রদ্ধেয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় একদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আপনার এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করা হইতেছে না কেন? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমার সৃষ্ট চরিত্র-গুলিতে এখনকার ছেলে-পিলে মাটী হইতেছে, তাই ডাকাত মাণিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না। তাহাতে না কি শ্রীশ বাবু এবং চন্দ্রশেখরবাবু বলিয়াছিলেন, মাণিক-লালের মতন দু'একটা ডাকাতের চিত্র দেশের সম্মুখে ধরলে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না এবং ইহার কিছুদিন পরেই রাজসিংহের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়"। এই সমস্ত বিবৃতির কোন কারণ আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রথমতঃ রাজসিংহ প্রকাশের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গদর্শনের কোন মাসেই বাদ পড়ে নাই, দ্বিতীয়তঃ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত গল্প ও প্রথম সংস্করণের গল্প এই দুইয়ে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই।

রাজসিংহ উপন্যাসখানি ঐতিহাসিক। চতুর্থ সংস্করণের

বিজ্ঞাপনে (ভূমিকায়) বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখিয়াছেন, 'পূর্ব্বে আমি কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম, বা চন্দ্রশেখরকে ঐতিহাসিক বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম,' এবং আরও লিখিয়াছেন 'এ পর্য্যন্ত (ঐতিহাসিক) উপন্যাস প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই'। বাস্তবিক অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত রাজসিংহের পার্থক্য বহুবিধ। প্রথমতঃ অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষা ঔপন্যাসিকত্বের দিকেই গ্রন্থকারের অধিক লক্ষ্য থাকে, চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনাবৈচিত্র্য ইত্যাদির দিকে লেখকের যতটা দৃষ্টি থাকে ইতিহাসের লক্ষ্য খুঁটিনাটির দিকে তাহার তিলার্দ্ধও থাকে না। তবুও এই জাতীয় পুস্তককে ঐতিহাসিক বলা হয় এই কারণে যে, উপন্যাসের বর্ণিত প্রধান ঘটনাগুলি ইতিহাসের অন্তর্গত। কিন্তু রাজসিংহ এই জাতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে। রাজসিংহের উদ্দেশ্য উপন্যাস-রচনা মাত্র নহে। হিন্দুদিগের প্রাচীন গৌরব, তাহাদিগের বীর্য্য, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণাবলী যাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে এবং যাহা ইতিহাসের বৈচিত্র্যহীন কাহিনীর মধ্যে কেবলমাত্র ঐতিহাসিক-দিগের নিজস্ব সম্পত্তিরূপে বিরাজিত, এইরূপ সত্যকে জনসাধারণের নিকট প্রচার করিয়া পাঠককে প্রাচীন হিন্দুর সহিত পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যে এই রাজসিংহ উপন্যাসের অবতরণা করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুগণের বলবীর্য্য, তাহাদের সত্যনিষ্ঠা, সমাজশাসন, রাজ্যপালন, ইত্যাদি বিষয়ের প্রবন্ধ রচনার পর এই রাজসিংহ প্রণয়নের একটা সার্থকতা পাওয়া যায়। এ যেন কতকগুলি তথ্য-বিবৃতির পর সেই তথ্যগুলি সত্য যে তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য একটী উদাহরণ দেওয়া মাত্র; প্রাচীন হিন্দুগণের সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ঐগুলির নিকট প্রমাণ-হিসাবে ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়া উজ্জ্বল করিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত পাঠকের সম্মুখে দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলিয়া ধরা। গ্রন্থকার তাঁহার চতুর্থ-সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, ভারতকলঙ্ক নামক প্রবন্ধে তিনি যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহারই উদাহরণস্বরূপ তিনি রাজসিংহকে প্রয়োগ করিতেছেন; কিন্তু শুধু ভারতকলঙ্ক কেন, রাজসিংহ উপন্যাসখানি বঙ্কিমবাবুর রচিত ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অধিকাংশ প্রবন্ধেরই উদাহরণস্থল বলিলে বিশেষ অন্যায় হয় না। অবশ্য উপন্যাসকে মনোরম করিবার উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির সহিত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কাল্পনিক নায়কনায়িকাদের ভেজাল চালাইয়াছেন বটে, কিন্তু এই কাল্পনিক নায়কনায়িকাদেরও তিনি এমন সুনিপুণভাবে সেকালের ছাঁচে ঢালিয়াছেন যে, তাহাতে ঐতিহাসিক আবহাওয়ার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। (অবশ্য কাহারও কাহারও মতে ডাকাত মাণিকলাল ও তাহার উপযুক্ত নায়িকা নির্ম্মলকুমারী রাজপুত না হইয়া একেবারে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে এবং বিক্রম-শালাঙ্কির পুরোহিত মিশ্র ঠাকুরও রাজস্থানে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অধিক ভীরুতার পরিচয় দিয়াছেন; এই সমস্ত মন্তব্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব)। উপস্থিত রাজসিংহ উপন্যাস-সম্বন্ধে এককথায় এইটুকুমাত্র বলা যায় যে, এই পুস্তকের উদ্দেশ্য রাজপুত তথা হিন্দুদিগের জাতীয় ইতিহাসের একটা উজ্জ্বল পৃষ্ঠাকে সাধারণের গ্রহণযোগ্যভাবে প্রকাশিত করা; ঐতিহাসিক ঘটনাকে ইতিহাসের জটিলতা হইতে মুক্ত করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার সাধারণ পাঠকবর্গের হস্তে রাজসিংহকে উপহার দিয়াছেন।

ইতিহাসই যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, এরূপ উপন্যাস লিখিতে গিয়া লেখক গোলে পড়িয়াছেন ঐতিহাসিক তথ্য লইয়া। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সত্যতা নির্দ্ধারণ করা যে কত দুরূহ ব্যাপার তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রথমতঃ সেকালের বিশেষ কোন বিবরণী ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যায় না, আর যেটুকুও আছে তাহাও আবার ভুলে পরিপূর্ণ। কোথাও বা ঐতিহাসিকের অনিচ্ছাকৃত ভুল, কোথাও বা স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতি। উপরন্তু আমরা এই ১৯৩৩ সালে ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে তাহার অধিকাংশই অজ্ঞাত বা অনাবিষ্কৃত ছিল। যে কয়েকখানি ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি তাঁহার উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 'টডের রাজস্থানই ছিল

প্রধান। সম্রাট আলমগীরের সহিত রাণা রাজসিংহের মনান্তর এবং যুদ্ধের কারণ দর্শাইতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাহার রাজসিংহে যে তিনটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার তিনটীই টডের ঐ রাজস্থান হইতে গৃহীত হইয়াছে। কারণ তিনটী সংক্ষেপে এই—

(১) রাণা রাজসিংহ কর্ত্তৃক যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্র অজিৎসিংহকে আশ্রয়প্রদান—মারবারের রাজা যশোবন্ত সিংহ প্রথমে ঔরঙ্গজেবের বিপক্ষতাচরণ করিলেও পরে তাহার পরম উপকারী অমিতবিক্রম সেনাপতিরূপে গণ্য হইয়াছিলেন কিন্তু অন্যদিকে ঔরঙ্গজেবও তাহার ভয়ে হিন্দুদিগের উপর যথেষ্ট অত্যাচার চালাইতে সাহস পাইতেন না। এজন্য বুদ্ধি করিয়া সম্রাট্ তাহাকে কাবুলের বিদ্রোহ দমন করিতে প্রেরণ করেন এবং সেখানে (অনেকেই সন্দেহ করেন) ঔরঙ্গজেবের অনুচরেরা না কি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিষপ্রয়োগে যশোবন্তকে হত্যা করে। যশোবন্তের রাণী গর্ভবতী অবস্থায় যশোবন্তের সহিত কাবুল গিয়াছিলেন এবং যশোবন্তের মৃত্যুর পর অজিৎসিংহ ভূমিষ্ঠ হ'ন। ঔরঙ্গজেব অজিৎসিংহকে তাহার নিকট প্রেরণ করিবার জন্য যশোবন্তের রাণীর উপর পরোয়ানা পাঠান, কিন্তু রাণী ঔরঙ্গজেবের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া মন্ত্রিপুত্র দুর্গাদাস রাঠোরের সাহায্যে রাজসিংহের রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রাজসিংহের উপর শিশুপুত্রের ভার অর্পণ করিয়া রাজসিংহের সাহায্যার্থ তুর্কীর বিপক্ষে সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য নিজের দেশে চলিয়া যান। অজিৎকে আশ্রয় দেওয়ায় রাজসিংহের উপর ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।

(২) টডের মতে উহাদের মনোমালিন্যের দ্বিতীয় কারণ জিজিয়া-কর—ঔরঙ্গজেব নিজের মুসলমান প্রজা এবং ওমরাহ বর্গের নিকট অধিক প্রিয় হইবার জন্য হিন্দুদিগের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন এবং সম্রাট্ আকবর কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ জিজিয়া করের পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। এই জিজিয়া করের পুনঃ প্রবর্ত্তনে হিন্দু প্রজারা সম্রাটের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল এবং রাণা রাজসিংহ হিন্দুদিগের মুখপাত্রস্বরূপ সম্রাট্ আলমগীরকে জিজিয়া কর বন্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের ফলে আর কিছু হউক আর না হউক, সম্রাটের সহিত রাণার মনোমালিন্য আরও কিছু বর্দ্ধিত হইয়াছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয় নাই।

(৩) তৃতীয় কারণ টড যাহা দেখাইয়াছেন তাহাতেই প্রথম যুদ্ধের সূত্রপাত। টডের মতে তৃতীয় কারণ—ঔরঙ্গজেব রূপনগরের রাজকন্যার রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে দুই সহস্র সেনা রূপনগর-রাজ্যে প্রেরণ করেন। তাহাদের সঙ্গে ছিল রাজকুমারীকে দিল্লীতে পাঠাইবার পরোয়ানা। মুসলমানের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়াই হউক কিংবা রাণার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াই হউক রূপনগরের তেজস্বিনী রাজকুমারী তাহাদের কুলপুরোহিতের মারফৎ সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া রাণার নিকট প্রেরণ করেন। ঐ পত্র হইতে টড তাহার পুস্তকে দুইছত্র অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। তাহার অনুবাদ হয় এইরূপ 'রাজহংসী কি সারসের অঙ্কশায়িনী হইবে, রাজপুতকুমারী কি মর্কটমুখ বর্ব্বরের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইবে'। এই পত্রের শেষে রাজকুমারী আত্মহত্যার ভয় পর্য্যন্ত দেখাইয়াছিলেন। এই পত্র পাইয়া রাণা তাহার কয়েকজন বাছাই করা পদাতিক সৈন্য লইয়া আরাবল্লী পর্ব্বতের পাদদেশ অতিক্রম করিয়া রূপনগর রাজ্যের দিকে অগ্রসর হ'ন এবং সম্রাটের বাহিনীকে মধ্যপথে আক্রমণ করিয়া রূপনগরের কন্যাকে অপহরণ করিয়া নিজের রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই ঘটনাটুকুই অবলম্বন করিয়া তাহার উপন্যাস রচনা করেন। ইহার পর সম্রাট্ আলমগীরের সহিত রাজসিংহের যে সকল যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়াছিল তাহার সমস্ত কাহিনীই প্রায় বঙ্কিমচন্দ্র টড্ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইরূপে দেখিতে পাই যদিও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পুস্তকের প্রধান ঘটনাটীর জন্য ঐতিহাসিক টডের নিকটই সমধিক ঋণী তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, অন্যান্য বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য গ্রন্থকারকে অন্যান্য প্রাচীন ইতিহাস অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। টডকৃত ইতিহাসের পরেই যাহার নাম তিনি করিয়াছেন তাহা অর্মের ইতিহাস। অর্মের (বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে বাংলায় অর্ম বলিয়াছেন, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি পুস্তকের প্রণেতা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ইহাকে অর্ম্ম বলিয়াছেন, আমরা

অর্ম্ম বলিব) ইতিহাসে রূপনগর-রাজকন্যার বিষয় কোনরূপ উল্লেখ না থাকিলেও রাজসিংহের সহিত ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধ বর্ণনা বিশদ্-ভাবেই দেওয়া আছে। যুদ্ধের বর্ণনায় বঙ্কিম-চন্দ্র টড ও অর্ম্ম উভয়কেই অনুসরণ করিয়াছেন এবং নিজের আবশ্যকমত ঔপন্যাসিক কাহিনীকে মনোরম ও পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য যাহার যতটুকু আবশ্যক ততটুকু লইয়া বাকীটুকু বর্জ্জন করিয়াছেন। রাজসিংহের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য (অর্ম্মের মতে ১৬৭৮ খৃঃ) ঔরঙ্গজেব যে বিরাট্ আয়োজন করিয়াছিলেন ও বাংলাদেশ হইতে রাজকুমার আকবরকে, সুদূর কাবুল হইতে অপর পুত্র আজিমকে, এমন কি দাক্ষিণাত্য হইতে মহারাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধে রত রাজসিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী মাজুমকে পর্য্যন্ত আনাইয়া ও তৎসঙ্গে আপনার বিরাট্ শক্তি লইয়া সম্রাট্ আলমগীর যে আপনার অধীনস্থ ভুঁইয়ারাজ রাজসিংহের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এ সমস্ত ঘটনাই টড্ এবং অর্মের প্রায় সমানভাবেই বর্ণিত আছে। রাণাও এই সম্রাটের বিরাট্ শক্তিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য যে ভাবে নিজের ব্যূহরচনা করিয়াছিলেন তাহা টড্-বর্ণিত রাজস্থানের অনুসারেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধের বর্ণনা করিতে গিয়া টড্ বলিয়াছেন 'শক্তবৎ সেনাপতি গরীব দাসের পরামর্শানু-যায়ী পর্ব্বতবেষ্টিত গিঁরো নামক ডিম্বাকৃতি স্থানের ভিতর রাজসিংহ কুমার আকবরকে সসৈন্যে অবরোধ করিয়াছিলেন এবং মহানুভব কুমার জয়সিংহ দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের মুক্তিদান না করিলে নিরুপায় কুমার বাহাদুরকে অনাহারে সসৈন্যে অবরুদ্ধ স্থানে মরণকে আলিঙ্গন করিতে হইত। এইখানে বঙ্কিমচন্দ্র টড্কে গ্রহণ না করিয়া অর্মের অনুযায়ী নিজের উপন্যাসে ঘটনা সন্নিবেশ করিয়াছেন। অর্মের মতে 'ঔরঙ্গজেব নিজের সৈন্যসামন্ত লইয়া কোনরূপ ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত অধিত্যকার মধ্যে প্রবেশ করিলে সহসা অভাবনীয়ভাবে রাজপুতগণ একরাত্রির মধ্যে বড় বড় পাথর ও গাছ দিয়া উপত্যকার প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া ফেলিল এবং নিজেরা পর্ব্বতের চূড়া হইতে উপত্যকার বন্ধমুখ রক্ষা করিতে লাগিল। ঔরঙ্গজেবের উদীপুরী মহিষী (অর্ম ইহাকে কির্কেশীয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন) পর্ব্বতের অপর অংশে অবরুদ্ধ হ'ন এবং পাছে উদয়পুরীর উপর কোন অত্যাচার করা হয়, এই ভয়ে উদীপুরী-মহিষীর রক্ষীগণ রাজপুতদিগের নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছিল। দুইদিন ধরিয়া এইরূপে অবরুদ্ধ রাখিবার পর রাজসিংহ কৃপাপরবশ হইয়া এই সর্ত্তে বাদসাহকে মুক্তি দেন, যে, তিনি তাঁহার (রাজসিংহের) রাজ্য মধ্যে গোহত্যা করিতে দিবেন না ; এই সঙ্গে রাজসিংহ তাঁহার উদীপুরী-মহিষীকেও প্রত্যর্পণ করেন। মুক্তিলাভ করিয়া ঔরঙ্গজেব গোহত্যা বন্ধ করিবার সর্ত্তকে একেবারেই গ্রাহ্য করেন নাই এবং উদীপুরীর সহিত নিজের মুক্তিলাভের ব্যাপারটীকে ভীরু রাজপুতগণের ভীরুতার নিদর্শন বলিয়াই গ্রহণ করিয়া-ছিলেন।' অর্ম বর্ণিত এই ঘটনার উপর বঙ্কিমচন্দ্র উদীপুরীর সহিত জেবউন্নিসাকেও বন্দিনী করিয়া উদয়পুরের অন্দরমহলে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং মবারকের সহিত জেবউন্নিসার কল্পিত বিবাহাদি সম্পন্ন করিয়া মনের সাধে সম্রাট আলম-গীরের প্রিয়তমা মহিষী উদীপুরীকে দিয়া রূপনগর রাজ-কন্যার তামাকু সাজাইয়া লইয়াছিলেন। শুধু ইহাই নয়, সম্রাট্ আলমগীরকেও ইম্লিবেগমের নিকট জলভিক্ষা করাইয়াছিলেন। মুক্তি সর্ত্তে অর্মের গোহত্যার উপর রাজসিংহ উপন্যাসে আর দুইটী সর্ত্ত দেখা যায়, দেবালয় ভঙ্গ নিবারণ ও জিজিয়া কর বন্ধ করা এবং উপন্যাসের সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনার জন্য অর্থাৎ মবারকের সহিত জেবউন্নিসার বিবাহব্যাপারে রাজসিংহকে দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আলমগীরকে আর একখানি পৃথক পত্র লিখাইয়াছিলেন। ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা অর্থাৎ দাইসুরী গিরিসঙ্কটে দিলীর-খানের সহিত গোপীনাথ রাঠোর ও রূপনগর রাজ বিক্রম শোলাঙ্কির যুদ্ধ বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র টড্কে অনুসরণ করিয়াছেন এবং অর্মের অনুযায়ী ইহাও বলিয়াছেন যে, সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব একবার বিপন্মুক্ত হইয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করা অযৌক্তিক বিবেচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান হইতে আকবর ও আজিমকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

এই তো গেল রাজসিংহের মোটামুটী ঐতিহাসিক ঘটনা। রাজসিংহ উপন্যাসের ঘটনা-বিন্যাসের জন্য বঙ্কিম-চন্দ্র যেমন টড্ ও অর্মের নিকট ঋণী তেমনি এই উপন্যাস-বর্ণিত ছোট ছোট খুঁটীনাটীগুলিকে ইতিহাসের রূপ দিবার

জন্য গ্রন্থকারকে অন্যান্য ঐতিহাসিকের নিকট, হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। আমরা এইবার রাজসিংহ উপন্যাসে সেই সকল ঐতিহাসিকের দানের পরিমাণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা পাইব।

রাজসিংহ গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র তিনজন ঐতিহাসিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে টড ও অর্ম সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে ; যাঁহার সম্বন্ধে এখনও কিছু বলা হয় নাই তিনি মনুষী। বঙ্কিমচন্দ্র ইঁহাকে বাংলায় মনুষী বলিয়াছেন, আমাদের মনে হয় ইঁহার নামের উচ্চারণ হওয়া উচিত মানুকচী। ১৪ বৎসর বয়সে ইনি একাকী স্বদেশ হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে তুরস্ক ও পারস্য অতিক্রম করিয়া ১৬৫৭-৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং বহুকাল ধরিয়া দিল্লী ও আগ্রার বাদশাহদিগের অধীনে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ইঁহার লিখিত বিবরণ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া জেসুইট্ পাদ্রী ফ্রান্সিস্ কাত্রু '১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে তাইমুরের রাজ্যস্থাপনের কাল হইতে ১৬৫৭ (?) ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন আরোহণের সময় অবধি' মোগল-সাম্রাজ্যের একটা মোটামুটী ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই মানুকচীর বিবরণ অবলম্বনে লিখিত কাত্রুর ইতিহাস হইতে মোগল বাদশাহদিগের রঙমহালের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত রঙমহালের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় স্থানে স্থানে উহা যেন কাত্রু লিখিত বিবরণীরই অনুবাদ। তাতারী রক্ষিণী এবং রৌশনারা সম্বন্ধে কাত্রু ঠিক ঐরূপই লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া ঔরঙ্গজেবের রাজসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস হইতে আমরা যে বর্ণনা পাই (সপ্তম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ) তাহা যেন অবিকল মানুকচীর নিজের লিখিত বিবরণী হইতে গৃহীত বলিয়াই মনে হয়। প্রভেদ এই যে, মানুকচী-বর্ণিত যুদ্ধযাত্রাটী ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক কাশ্মীর-অভিযানের ব্যাপার লইয়া লিখিত, আর এখানে যেন গ্রন্থকার সেটীকে রাজসিংহের বিপক্ষে চালাইয়া দিয়াছেন।

মানুকচী ব্যতীত বার্ণিয়ার, ট্যাভার্নিয়ার প্রভৃতি অন্যান্য পরিব্রাজকদিগের লিখিত ইতিবৃত্ত হইতেও গ্রন্থকার আবশ্যক মত ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন। রাজসিংহে বর্ণিত প্রত্যেক ছোট ছোট ঘটনার অধিকাংশই প্রায় ইতিহাস হইতে গৃহীত। উপন্যাসের ষষ্ঠ খণ্ডের চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে উদীপুরীকে চঞ্চলকুমারীর নিমন্ত্রণ-পত্র প্রদান করিয়া যোধপুরীর খোজার সহিত রঙমহালের বাহিরে আসিবার সময় নির্ম্মলকুমারী যে ঔরঙ্গজেবের নিকট হাতে হাতে ধরা পড়িয়াছিলেন, এ ঘটনাটী পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের নিছক কল্পনা হইতে উদ্ভূত হয় নাই। বার্ণিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে ইহার অনুরূপ ঘটনাই পাওয়া যায়। সম্রাট্ ভগিনী রৌশনারা কোন একটী যুবককে অবৈধভাবে নিজের মহলে লুকাইয়া রাখিয়া একদিন রাত্রিকালে একজন বিশ্বাসী দাসীর দ্বারা রঙমহালের বাহিরে ছাড়িয়া দিতে পাঠাইয়াছিল, কিন্তু পথিমধ্যে যে-কোন কারণেই হউক সেই দাসী ভীত হইয়া পলায়ন করে এবং সেই যুবকটী সম্রাট্ আলমগীরের হস্তে পতিত হয় ও সম্রাট্ কর্ত্তৃক তাহার আগমন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়াও কোন কিছু বিবরণ প্রকাশে বিরত থাকে। (আর্চিবল্ড-কৃত বার্ণিয়ারের ইংরেজীঅনুবাদ, পৃঃ ১৩২)। এই জিনিসই যেন রূপান্তরিত হইয়া রাজসিংহের ভিতর স্থান পাইয়াছে। এইরূপ ছোট ছোট নিদর্শন উপন্যাসের ভিতর আরও পাওয়া যায়। জিজিয়া করের পুনঃ প্রবর্ত্তনে দেশের হিন্দু প্রজাগণ শুক্রবার দিন ঔরঙ্গজেবের মসজিদ্ গমনের পথে ঐ কর রদ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে সমবেত হইয়াছিল, কিন্তু ঔরঙ্গজেব তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই, এ বিষয়ে উপন্যাসের পঞ্চম খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "দুনিয়ার বাদশাহ আজ্ঞা দিলেন, হস্তিগুলা ইহাদিগকে পদতলে দলিত করুক। সেই বিষম জনমর্দ্দ হস্তি পদতলে দলিত হইয়া নিবারিত হইল"। এ ভাষা পড়িলেই যেন মনে হয় ইংরেজীর অনুবাদ। ঠিক অনুবাদ না হইলেও এই কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে প্রকাশিত এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের ইতিহাসে পাওয়া যায়(এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইংরেজী; ১৮৮৯, পৃঃ ৬৩৮) *

* অন্যান্য ঘটনাও ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন হইতে অনেক সময়ে গৃহীত হইয়াছে। যেখানে কাত্রু লিখিয়াছেন, ঔরঙ্গজেবের তিন ভগিনী বেগম সাহেব, রৌশনরা ও মেহের-উন্নিসা এবং এলফিন্‌ষ্টোন লিখিয়াছেন দুই ভগিনী বাদশা বেগম ও রৌশনরা, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র দুই ভগিনীই গ্রহণ করিয়াছেন ; মেহেরউন্নিসার বিষয় উল্লেখ করেন নাই।

এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস হইতে ছোট ছোট কাহিনী সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার তাহার উপন্যাসে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পুস্তকের প্রত্যেক পরিচ্ছেদ লইয়া স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করিবার সময় আমরা ঐ বিষয় দেখাইতে চেষ্টা করিব।

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের চরিত্র ইতিহাসে যেরূপ আছে সেই ভাবেই তিনি বর্ণন করিয়াছেন। এই চরিত্র বর্ণনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কোন একখানি ইতিহাসকে অনুসরণ করেন নাই। কাফ্রু এল্‌ফিন্‌ষ্টোন এবং সমসাময়িক ভ্রমণকারীদিগের ইতিবৃত্ত হইতে আখ্যায়িকা গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া ঔরঙ্গজেবের চরিত্র-বর্ণনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কাফ্রুর নিকট সমধিক ঋণী। দারা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ কিছুই বলেন নাই; কেবল এক জায়গায় বলিয়াছেন, প্রবাদ আছে দারাও না কি শেষে খৃষ্টিয়ান হইয়াছিল (দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদ)। দারা সম্বন্ধে এই কাহিনীটী অর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মে জন্মগ্রহণ করিয়া দারার অপরাধ ছিল এই যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি তাঁহার নিজের যুগোচিত ভাব ধরা হইতে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি মুজামা অল্ বরহৈর নামক একখানা পুস্তক লিখিয়া হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মের একত্বস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে কাশীতে ব্রাহ্মণদিগের সাহায্যে সংস্কৃত উপনিষদমালার একখানা পারস্য-অনুবাদ সংকলিত করাইয়াছিলেন। এই জন্য ঔরঙ্গজেব ও অন্যান্য ওমরাহবর্গ তাহাকে কাফের বলিয়া অভিযুক্ত করেন ও শেষে দারাকে হত্যা করার পর তাহার পুত্র সুলেমান সেকোর নিকট ঔরঙ্গজেব দারার ধর্ম্মচ্যুতিকেই তাহার মৃত্যুদণ্ডের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উপরন্তু দারা ইউরোপীয় পর্য্যটকদিগকে ভালবাসিতেন ও নিজের অধীনে নিযুক্ত করিতেন বলিয়াও বোধ হয় দারা-সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছিল। মৃত্যুর সময় দারা না কি বলিয়াছিল, 'মহম্মদ আমাকে হত্যা করিল, মৃত্যুর পর যীশুখৃষ্ট আমাকে শাস্তি দিবেন।'

রাজপুতদিগের চরিত্র বর্ণন করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সময় টড্‌কে অনুসরণ করিয়াছেন। চঞ্চলকুমারীর চরিত্রটী টড্ তাঁহার কয়েক লাইনের মধ্যে এমন সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাহার অধিক আর কিছুই জানিবার থাকে না। রাজসিংহ-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র টড্‌কে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন সেইখানে, যেখানে তিনি চঞ্চলকুমারীকে উদয়পুরে আনিয়া বলিতেছেন 'রাজকুমারী তোমার কি অভিপ্রায় পিত্রালয়ে যাইবার অভিলাষ, না এইখানেই থাকিতে প্রবৃত্তি (পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। এই সময় চঞ্চলের নিকট হইতে বিবাহের প্রস্তাব ওঠা সত্ত্বেও রাজসিংহ শান্ত সমাহিতভাবে বিবাহ না করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। এইখানে টডের সহিত উপন্যাসের একটু প্রভেদ আছে। টড লিখিয়াছেন যে, 'রাজসিংহ রাজকুমারীকে, হরণ করিয়া উদয়পুরে যুদ্ধজয়ের পুরস্কারস্বরূপ রাজকন্যাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। এইখানে বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহকে মহাভারতীয় যুগের ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী ক্ষত্রিয়বীরের মত অঙ্কিত করিয়াছেন।

উপস্থিত প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে রাজসিংহ উপন্যাসে অনুসৃত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সত্যতা-সম্বন্ধে আধুনিক মতামত ও ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস হইতে কয়েকটী আবশ্যকীয় তারিখ এইখানেই বলিয়া লইব। শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার দত্ত-গুপ্ত মহাশয় তাঁহার বঙ্কিমচন্দ্র পুস্তকের ৩০৮ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে রাজসিংহের ঐতিহাসিক প্রচ্ছদপটের সত্যতার উপর পুস্তকের মূল্য নির্ভর করিতেছে না, রাজসিংহের ইতিহাস যদি সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়াও প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও উপন্যাসের কোন ক্ষতি হইবে না।' কথাটা অবশ্য যে কোন ঐতিহাসিক উপন্যাসের সম্বন্ধেই বলা যায়; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, গ্রন্থকার নিজে এই উপন্যাসখানি লিখিবার সময় ঐতিহাসিক ঘটনাটী সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ উপন্যাস অপেক্ষা ইতিহাসের দিকেই গ্রন্থকারের সমধিক দৃষ্টি ছিল। সীতারাম ও চন্দ্রশেখরের ভিতর ঐতিহাসিকত্বের অপেক্ষা ঔপন্যাসিকত্বের দিকে অধিক নজর দিয়াছিলেন বলিয়াই উক্ত পুস্তকদ্বয়কে তিনি ঐতিহাসিক শ্রেণীভুক্ত করেন নাই। ঐতিহাসিক ঘটনাকে সাধারণের নিকট সুলভ করাই যে তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'রাজসিংহ' প্রবন্ধের বিষয়ও বলিতে হয় (সাধনা ১৩০০, অথবা আধুনিক সাহিত্য পৃঃ ৯৫)। কবীন্দ্রের

ভাষায় 'ইতিহাস ও উপন্যাসকে একসঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয় বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব্ব করিতে হইয়াছে'। অবশ্য রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিষয় এই মন্তব্য কতকাংশে প্রযোজ্য হইলেও প্রথম সংস্করণের রাজসিংহ উপন্যাসখানিকে ভাল করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, গ্রন্থকার উপন্যাসের অপেক্ষা ইতিহাসকেই সমধিক প্রাধান্য দিয়াছিলেন এবং পাঠককে ঐতিহাসিক কঙ্কালের অসৌষ্ঠবতার হাত হইতে মুক্তি দিবার অভিপ্রায়ে পরবর্ত্তী কালের 'রাজসিংহে' দরিয়া, জেব্‌উন্নিসা, উদীপুরী ইত্যাদি চরিত্রের অবতারণা করিয়া ইতিহাসের শুষ্কতাকে অপেক্ষাকৃত সরস করিবার চেষ্টা করিয়াছে। একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে 'উপন্যাস উপন্যাস, উপন্যাস ইতিহাস নহে' (আনন্দমঠের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা); তবে সেই সঙ্গে এটুকুও স্বীকার করা উচিত যে, উপন্যাস-বর্ণিত ঘটনাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া জানা থাকিলে উপন্যাস-পাঠের আনন্দ আরও বহুগুণ বৰ্দ্ধিত হয়। রাজসিংহের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি মিথ্যা একথা মনে করিয়া উপন্যাসখানি পাঠ করিলে উপন্যাসের মাধুর্য্য অনেকটা নষ্ট হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজসিংহ উপন্যাসের মূল ভিত্তিস্থল আলমগীরের চঞ্চলকুমারীকে প্রার্থনা করিয়া শোলাঙ্কির নিকট পত্র প্রেরণ, চঞ্চলকুমারীর রাজসিংহের নিকট আত্ম-সমর্পণ এবং রাজসিংহের ঐ পত্র অনুসারে রাজকুমারীর প্রার্থনা রক্ষা। এই ঘটনাটী বাদ দিয়া উপন্যাসখানি কোনমতেই দাঁড়াইতে পারে না। এই ঘটনাটী যে গ্রন্থকার টডের রাজস্থান হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উপস্থিত ইহাও বলিতে হয় যে, এই কাহিনীটী এক টড ভিন্ন আর কোন পুস্তকেই পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী কোন ঐতিহাসিকই আজ পর্য্যন্ত শোলাঙ্কি-কন্যার কোন কথাই উত্থাপন করেন নাই। এ সম্বন্ধে টড তাহার রাজস্থান ১ম খণ্ডের ৩৯৬ পৃষ্ঠায় সাফাই গাহিয়া রাখিয়াছেন। চঞ্চলকুমারী-হরণের প্রসঙ্গে টড্ বলিয়াছেন যে, মোগল-ঐতিহাসিক এই সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে সাহস পায় নাই (ভুঁইয়া রাজা রাজসিংহ সম্রাটপত্নীকে অপহরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছে, এ লজ্জা এবং অপমানের কথা মুসলমানের দ্বারা প্রকাশ না পাওয়াই সম্ভব)। টড এই ঘটনাটী সংগ্রহ করিয়াছেন রাজস্থানের চারণগাথা হইতে; রাজবিলাস, রাজপ্রকাশ ইত্যাদি ছোট ছোট পালাগান আজও পর্য্যন্ত রাজস্থানে গীত হইয়া থাকে। এই পালাগানে নাকি বিক্রম শোলাঙ্কির এই কন্যার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এইখানে আরও একটী কথা বলিয়া রাখি—পালাগানে শোলাঙ্কি-কন্যার নাম আছে প্রভাবতী। এই নামের উল্লেখ না করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে নাম দিয়াছেন চঞ্চলকুমারী।

ঐতিহাসিকত্বের দিক দিয়া আর একটী কথা বলা আবশ্যক। টডকে অনুসরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, জিজিয়া কর বন্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া যে পত্রখানি ঔরঙ্গজেবকে পাঠান হইয়াছিল তাহার প্রেরক ছিলেন রাজসিংহ। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। এরূপ একখানি পত্র যে ঔরঙ্গজেবকে প্রেরণ করা হইয়াছিল ইহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং এই পত্রের ভাষাও যে খুব সুন্দর সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। এই পত্রখানি রাউস সাহেব প্রথম ইংরেজীতে অনুবাদ করেন এবং ঐতিহাসিক অর্ম এই পত্রখানি যশোবন্তসিংহের দ্বারা ঔরঙ্গজেবের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া নিজের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেন। কথাটী অবশ্য ভুল, কারণ যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল। অর্মের এই ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়া টড্ ঐ পত্রখানি রাজসিংহের উপর আরোপ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস প্রণয়নকালে 'এই মতই প্রচলিত ছিল এবং ঐ মত গ্রহণ করাতে উপন্যাসের নায়কের চরিত্র আর একটু উজ্জ্বল হইয়াছে। কিন্তু, অধুনা (মডার্ণ রিভিউ, এলাহাবাদ, ১৯০৮, পৃঃ ১১) শ্রদ্ধেয় যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মতে পত্রখানি শিবাজীর জনৈক ব্রাহ্মণ উপদেষ্টা নীলপ্রভু মুন্সীর দ্বারা লিখিত হইয়া শিবাজী কর্ত্তৃক ঔরঙ্গজেবের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

এ তো গেল ছোট ছোট ব্যাপারের কথা, আসল ব্যাপার যুদ্ধ,—যাহা লইয়া গ্রন্থকার এবং পাঠক উভয়েই প্রচুর আমোদ উপভোগ করেন। সেই যুদ্ধের ইতিহাসই আধুনিক

গবেষণার ফলে বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মতে টড এবং অর্ম কোন ইতিহাসই এ বিষয়ে সত্য নয়। এটা ঠিক যে রাজসিংহের সহিত ঔরঙ্গজেবের একটা যুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সে যুদ্ধ সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। প্রবন্ধের অবয়ব বৃদ্ধির ভয়েও বটে, আর কতকটা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আমরা এই যুদ্ধ বর্ণনায় বিরত রহিলাম, কৌতূহলী পাঠক তাহা সরকার মহাশয়ের ঔরঙ্গজেব পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে দেখিতে পাইবেন।

উপসংহারে রাজসিংহের ঘটনাবলীর সহিত সাধারণ ইতিহাসের যোগ সাধন করিবার জন্য কয়েকটী তারিখ প্রদত্ত হইল। এই সঙ্গে ঔরঙ্গজেব তাঁহার হিন্দু প্রজাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন তাহারও কিছু নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

১৫৯২ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের জননী মমতাজমহলের জন্ম হয়।

১৬১২ খৃঃ অঃ সাজাহানের সহিত মমতাজের বিবাহ হয়।

১৬১৫ খৃঃ অঃ ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারার জন্ম হয়।

১৬১৬ খৃঃ অঃ ঔরঙ্গজেবের মধ্যম ভ্রাতা সুজার জন্ম হয়।

১৬৬৯ খৃঃ অঃ ঔরঙ্গজেবের জন্ম হয়।

১৬২৪ খৃঃ অঃ ঔরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদের জন্ম হয়।

১৬৩১ খৃঃ অঃ ঔরঙ্গজেবের কনিষ্ঠা ভগিনী রৌশনরার জন্মের কয়েক ঘণ্টা পরেই মমতাজের মৃত্যু হয়।

১৬৩৫ খৃঃ অঃ দারার জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমানের জন্ম হয়।

১৬৪৪ খৃঃ অঃ ঔরঙ্গজেব গুজরাটে অবস্থান কালে গোরক্ত দ্বারা চিন্তামণির মন্দির কলুষিত করেন।

১৬৫৮ খৃঃ অঃ (২১ এ জুলাই) ঔরঙ্গজেব পিতাকে বন্দী করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন।

১৬৫৯ খৃঃ অঃ ঔরঙ্গজেবের আজ্ঞায় তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারা সেকো ঔরঙ্গজেবের কারাগারে নৃশংসভাবে নিহত হন।

১৬৬০ খৃঃ অঃ ঔরঙ্গজেবের মধ্যম ভ্রাতা সুজা ঔরঙ্গজেব-কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া আরাকানে নৌকাডুবিতে সপরিবারে জলমগ্ন হন।

১৬৬০ খৃঃ অঃ দারার জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান পিতৃব্য ঔরঙ্গজেবের আজ্ঞায় গোয়ালিয়রের কারাগারে বিষপানে নিহত হন।

১৬৬২ খৃঃ অঃ ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ কারাগারে নিহত হন।

১৬৬৬ খৃঃ অঃ আগ্রাদুর্গে ঔরঙ্গজেবের অবরোধ মধ্যে সাজাহানের মৃত্যু হয়।

১৬৬৮ খৃঃ অঃ ঔরঙ্গজেবের হুকুমে সমস্ত হিন্দুর মেলা এবং দেওয়ালী উৎসব বন্ধ করা হয়, এবং সমস্ত হিন্দুকে সরকারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়।

১৬৬৯ খৃঃ অঃ (৯ই এপ্রিল) হিন্দুর মন্দির ও ধর্ম্মস্থান ধ্বংস করিবার জন্য ঔরঙ্গজেব এক আজ্ঞাপত্র প্রকাশ করেন। ফলে গুজরাটের সোমনাথ, কাশীর বিশ্বনাথ ও বুন্দেলার রাজা বীরসিংহ কর্ত্তৃক তেত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত মথুরার কেশব রায়ের মন্দির ধ্বংস করা হয় ঐ সময়েই মথুরাকে ইস্‌লামাবাদ নামে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করা হয়।

১৬৭৮ খৃঃ অঃ (১০ই ডিসেম্বর) জমরুদে (থাইবার গিরি-সঙ্কটে) যশোবন্ত সিংহ দেহত্যাগ করেন।

১৬৭৯ খৃঃ অঃ (ফেব্রুয়ারী মাসে) যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিৎ সিংহ লাহোরে জন্ম গ্রহণ করেন।

১৬৭৯ খৃঃ অঃ (২রা এপ্রেল) ঔরঙ্গজেব জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্ত্তিত করেন। এই সঙ্গে ইহাও উল্লিখিত হ পারে যে দ্রব্যাদি বিক্রয়ের শুল্ক পর্য্যন্ত হিন্দু-মুসলমানকে ভিন্নরূপ দিতে হইত। বিক্রয়ের সময় হিন্দুকে শতকরা পাঁচ টাকা এবং মুসলমানকে শতকরা মাত্র আড়াই টাকা শুল্ক দিতে হইত।

১৬৭৯-৮০ খৃঃ অব্দের মধ্যে উদয়পুরে ১২৩টী, চিতোরে ৬৩ টী, এবং অম্বরে ৬৬টী হিন্দু দেব-মন্দির ঔরঙ্গজেবের আদেশে ধ্বংস করা হয়।

১৬৭৯-৮০ খৃঃ অঃ ঔরঙ্গজেবের সহিত রাজসিংহের যুদ্ধ হয়। (অর্ম ভুল করিয়া যুদ্ধের তারিখ দিয়াছেন ১৬৭৮)

১৬৮১ খৃঃ অঃ মেবারের সহিত ঔরঙ্গজেব সন্ধিস্থাপন করেন।

১৬৮২ খৃঃ অঃ রাণা রাজসিংহ পরলোক গমন করেন ও তাঁহার পুত্র জয়সিংহ মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৬৯৫ খৃঃ অঃ (মার্চ্চ মাসে) এই বলিয়া ঔরঙ্গজেব এক ইস্তাহার জারী করেন যে রাজপুত ব্যতীত কোন হিন্দুই

শহরের ভিতর পাল্কী, হাতী বা ঘোড়ায় চড়িতে পারিবে না এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সেই নব-দীক্ষিত মুসলমানকে হাতীতে চড়াইয়া সমস্ত শহরে শোভাযাত্রা করা হইবে।

১৭০৭ খৃঃ অঃ ঔরঙ্গজেব দেহত্যাগ করেন।

উপরি উক্ত তালিকাটীর তারিখগুলি অধিকাংশই জে এন্ সরকারের এবং ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

বঙ্কিমচন্দ্রের ভবনে বড়লাট-মহিষী

—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ

সেটা ১৮৭৭ সালের ডিসেম্বর মাস কি তাহার পরের জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারি মাস তাহা ঠিক মনে নাই। বারাকপুর (চাণক) তখন নারী-শিক্ষা মিশনের হেড্ কোয়ার্টার ছিল। সেই মিশন-কেন্দ্র হইতে মিসনারি মেমেরা চারিদিকের গ্রামে মেয়ে পড়াইতে যাইতেন; কাঁটালপাড়ায় আমাদের বাড়ীতেও আসিতেন। সেখানে তাঁহাদের ছাত্রী ছিলেন, আমার পিতামহদেবের পৌত্রীরা এবং তাঁহার পৌত্রবধূরা। আমার স্ত্রী শেষোক্তদিগের অন্যতমা ছিলেন। আমার ঠাকুরদাদা মহাশয় মিসনারি মেমদিগের দ্বারা নারী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না; পিতৃব্যদেব বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পিতৃদেব উক্ত পিতামহ-মহাশয়কে বুঝাইয়া সে সম্বন্ধে তাঁহাকে নিমরাজি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঠাকুরদাদা মহাশয় যে কারণেই হউক, সে সব শিক্ষয়িত্রী শ্বেতাঙ্গিনীদের তেমন প্রীতির চক্ষুতে দেখিতেন না। তাঁহার ভয় তো মনে হইত, তাঁহার নাত-বৌরা সুন্দরী, আবার সেকালের পিতামহীদের কথায় "ডাক-সাইটে" সুন্দরী ছিলেন আমার স্ত্রী—কি জানি বাইবেল পড়িয়া যদি কেউ খৃষ্টান হয়? আমাদের বাড়ীর একজন শিক্ষয়িত্রী মেম আমার প্রথম যৌবনের সাহেবি পোষাক-পরা নূতন তোলা একটা ফটোগ্রাফ আগ্রহাতিশয্য দেখাইয়া আমার স্ত্রীর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া যান; স্ত্রী-মহাশয়া সেই দিনই সে কথা ঠাকুরদাদা দেবতার কর্ণগোচর করেন এবং সেই জন্য তৎকর্ত্তৃক তিরস্কৃতাও হন; অধিকন্তু সে দেবতা তাঁহাকে কড়া হুকুম দেন, যেন সে মেমটা আমার সঙ্গে একটা কথাও কহিবার অবসর না পায়, পরন্তু সে রকম কিছু ঘটিলে তাহার জন্য জবাবদিহির দায়ী তাঁহার নাত-বৌকেই হইতে হইবে। বলিতে কি, সেই অবধি আমার উপর বালক ও বৃদ্ধের কড়া পাহারা বসিয়া গেল। আমি ভাবিলাম—ব্যবস্থা মন্দ নয়, ছবিটা দিলেন নাতির গৃহিণী স্বয়ং, কিন্তু ঠাকুরদাদার চোখ পড়িল সে নাতিরই উপর।

উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতে কেহ মনে করিবেন না যে, আমার ঠাকুরদাদা-মহাশয় সেকালের লোকদের মত বাহিরের ব্যাপার-সম্বন্ধে একেবারে পুরাদস্তর অনভিজ্ঞ ছিলেন। এ কথার পোষকে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি জনৈক প্রসিদ্ধ ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন, সুতরাং পারিপার্শ্বিক সকল বিষয়ের খবর তিনি ভালই রাখিতেন।

বিখ্যাত নভেলিষ্ট লর্ড বুল্‌ওয়ার লিটনের পুত্র—দিল্লীতে আধুনিক কালের প্রথম রাজসূয়ের অনুষ্ঠাতা লর্ড লিটন ছিলেন তখন ভারতবর্ষের বড়লাট। সে বৎসর বারাকপুর-মিসন-কেন্দ্রের বালিকা-ছাত্রীদিগকে উক্ত লাট-পত্নী স্বয়ং পারিতোষিক-বিতরণ করিবার সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য উক্ত মিসনের প্রধানা মেম আমাদের বাড়ীর প্রশস্ত চত্বরই ঐ কার্য্যানুষ্ঠান সভার উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচনা করেন। সে সম্বন্ধে তিনি কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া একদিন একটু অধিক বেলা হইলে আমাদের বাড়ী আসিয়া কাকা-মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের খোঁজ করেন, কিন্তু তাঁহার দেখা পান না; একটু পূর্ব্বেই তিনি হুগলী গিয়াছিলেন; তখন তিনি হুগলীর ডেপুটী—নিত্য বাড়ী হইতে তথায় যাতায়াত করিতেন। তিনি বাড়ী না থাকার কথা আমি ঐ মেমকে বলি, তখন আমাদের বাড়ীতে লাট-পত্নীর অতি শীঘ্র আসিবার কথা তিনি আমাকে বলেন। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া আমি নিজে সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ঠাকুরদাদা মহাশয়ের কাছে তাঁহাকে লইয়া যাই। তখন দাদা মহাশয় সে প্রস্তাবে পূর্ণভাবে সম্মত হইতে পারেন

নাই। তাহার অনেকটা কারণ ছিল, সংবর্দ্ধনার আয়োজনের সময়াভাব। যাহা হউক তিনি সে মেমকে অপরাহ্নে আর একবার আসিতে বলেন।

অপরাহ্নে কাকা মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কাছারী হইতে বাড়ী ফিরিবামাত্রেই আমি তাঁহাকে ঐ কথা বলি; তিনি তখনই তাঁহার পিতৃদেবের কাছে যান; উভয়ে কথাবার্ত্তা হইলে স্থির হয় যে, প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুষ্ঠান আমাদের বাড়ীতেই হইবে। তখন সে কার্য্যের ৩।৪ দিন মাত্র বাকি ছিল। পূর্ব্বোক্ত মেম সাহেবেরাও তখন আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

তখনই কাকা মহাশয় পিতৃদেব সঞ্জীবচন্দ্রকে বাড়ী আসিবার জন্য টেলিগ্রাম্ করেন। তিনি তখন বর্দ্ধমানে কার্য্য করিতেন; জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় (শ্যামাচরণ) কার্য্যোপলক্ষে দূরদেশে থাকিতেন। তাঁহার আসা তখন অসম্ভব ছিল, কনিষ্ঠ খুল্লতাত মহাশয় পূর্ণচন্দ্র তখন হুগলীতে কার্য্য করিতেন, তিনিও বাড়ী হইতে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অগ্রজের সহিত যাতায়াত করিতেন।

সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব বাড়ী মেরামতি ও তাহার সাজসজ্জাদি করা আরম্ভ হইল। আমি তখন হুগলি কলেজিয়েট স্কুলে আমার পিতৃব্যপুত্রগণের সহিত পড়িতাম। তখন হুগলী-কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন গ্রিফিথস্ সাহেব—পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ থোয়েট্স সাহেব (পিতৃব্য বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ কলেজে পঠদ্দশার অধ্যাপক) ইহার কিছু পূর্ব্বে বহুমূত্র-রোগে দেহত্যাগ করেন। তখন হুগলী কলেজ অধ্যাপনার গৌরবে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। অধ্যক্ষ গ্রিফিথস্ সাহেব আমাকে বেশ জানিতেন—দেখা হইলে তাঁহার সহিত আমার কিছু-না-কিছু কথা-বার্ত্তা হইত। তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন। পারিতোষিক-বিতরণের দিন বাড়ী সাজাইবার জন্য ভাল ভাল ফুলের আবশ্যক হইয়াছিল। আমাদের কলেজে নানাপ্রকার ফুলের গাছ ছিল, সে সব দেখিবার মত ফুল। উদ্ভিদ্ ও রসায়ন-শাস্ত্রের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ওয়াট্স্ সাহেব তখন ঐ কলেজের অন্যতম অধ্যাপক। তিনি তথায় আসার পর নানা প্রকার নূতন রকমের গাছ রোপণ করিয়া কলেজের বাগানটিকে বেশ একটু বিস্তৃত করিয়াছিলেন। প্রাইজ বিতরণের পূর্ব্বদিন আমি কলেজে যাইয়াই গ্রিফিথস্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া বাড়ী সাজাইবার জন্য তথাকার বাগানের ফুল, লতা-পত্রাদিও সেখানকার মালি দুইজনকে চাইলাম। সাহেব সহাস্যবদনে বলিলেন, "ফুল পাতা প্রভৃতি যত ইচ্ছা লইয়া যাও" আর তখনই দুইজন মালিকে ডাকিয়া পরদিন প্রত্যূষে যাইয়া আমাদের বাড়ী সাজাইবার আদেশ দিলেন; বিস্মিত-নেত্রে তখন সে কলেজের সকলে দেখিল, আমি কলেজের ফুল-বাগান ঐ দুইজন মালির সাহায্যে উজাড় করিতেছি। তখন ছাত্রদের কেহ এই বাগানের একটী মাত্র ফুল তুলিলে তাহার বেশ কিছু জরিমানা হইত। বড় বাজ্‌রার ৪ বাজ্‌রা ফুল প্রভৃতি বোঝাই লইয়া আমি সে দিন বাড়ী ফিরি। পরদিন মালি দুইজন আসিয়া সুন্দরভাবে বাড়ী সাজাইয়া দেয়। তজ্জন্য তাহাদের বিশেষ ভাবেরই পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছিল।

কর্ম্মের দিন প্রাতে অপর পার চুঁচুড়া হইতে গঙ্গা পার করিয়া কয়েকখানা ভাড়াটীয়া গাড়ী আনা হইয়াছিল। তখন কাঁটালপাড়ার সংলগ্ন নৈহাটীতে ভাড়াটীয়া গাড়ীর চলন হয় নাই। গাড়ীগুলা আনীত হইলে সমস্তদিন নানা-স্থানে ছুটাছুটী করিয়াছিল। নিমন্ত্রিত অনেকেই আসিয়াছিলেন। সুসজ্জিত লোকজনে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছিল। অপরাহ্নে যথাকালে আমরা লাট্-পত্নী মহোদয়াকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য ভাটপাড়া বলরাম সরকারের গঙ্গাতারস্থ চাঁদনীওয়ালা বাঁধাঘাটে যাইলাম; এই ঘাটের মত সুন্দর ঘাট আমি কোথাও দেখি নাই। বারাকপুর-লাট-প্রাসাদ হইতে গঙ্গাবক্ষে ষ্টীমার-যোগে লাট-মহিষীর ঐ ঘাটে পৌছিবার কথা ছিল। তাঁহার অবতরণোপযোগী অন্য ঘাট কাছে আর ছিল না। সে ঘাটে বাহিরের লোক কাহাকেও আসিতে দেওয়া হয় নাই, কারণ লাট-মহিষীর আগমন "প্রাইভেট"ভাবে হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু ছোটকাকা মহাশয় ঘাটে নৈহাটীর পুলিস আনাইয়াছিলেন। সব ইন্‌স্পেক্টর দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাহাদের নায়ক ছিলেন। পিতৃদেব ও উক্ত পিতৃব্য মহাশয় এবং আমরা বাড়ীর "পোসাকি" ছেলে ৪।৫ জন ঘাটে উপস্থিত ছিলাম। পিতৃব্যদেব বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ীতেই ছিলেন। ঠিক সময় গঙ্গাবক্ষে আগমনোন্মুখ ষ্টীমারের ধূম দেখা দিল। বাঁশী

দিতে দিতে শনৈঃ শনৈঃ সে ষ্টীমারঘাটে লাগিল। তখন বড়লাট-বাহাদুরের মিলিটারি সেক্রেটারি ফুল-ইউনিফর্ম্ পারহিত লর্ড উইলিয়ম বেরেসফোর্ড এবং বারাকপুর মিশনের লোকজনসহ বড়লাট-পত্নী ঘাটে অবতরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে ঘাটের পার্শ্ব হইতে গগন বিদীর্ণ করিয়া বোমার আওয়াজে স্যালিউট আরম্ভ হইল; ঘাটে দণ্ডায়মান আমরা সকলে মস্তক অবনত করিয়া সেলাম দিলাম; পুলিশ তাহাদের সুন্দর মিলিটারি কায়দায় স্যালিউট দিল। তখন স্মিতমুখী লাট-পত্নী মহোদয়াকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া আমরা ঘাটের সোপানশ্রেণী আরোহণ করিতে লাগিলাম। ঘাটের শেষ সোপান হইতে উপরের চাঁদনীর নিকটস্থ বড় রাস্তা (ফেরি-ফণ্ড) পর্য্যন্ত বিস্তৃত লালসালুর উপর দিয়া লাটমহিষী চলিতে লাগিলেন। রাস্তায় পৌছিয়া সেখানে রক্ষিত যুগলধবল অশ্ব-সংযোজিত বেরুস্ গাড়ীতে তিনি লর্ড উইলিয়ম বেরেস-ফোর্ড সহ উঠিলেন, আমরা অন্য সব গাড়ীতে উঠিয়া পিছনে পিছনে চলিলাম। বাড়ীর দরজার সামনে গাড়ী পৌছিলে লাট-পত্নী মহোদয়া বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হইয়া উঠানে সুসজ্জিত সভারোহণ করিলেন। পিতৃব্যদেব বঙ্কিম-চন্দ্র সম্মুখে দাঁড়াইয়া সংস্কৃত কবিতায় লিখিত সম্ভাষণ (এড্রেস) পাঠ করিলেন, তাহার ইংরেজি ব্যাখ্যাও পড়া হইল, পরে সে সব লাট-মহিষীর হস্তে সমর্পিত হইল। তিনি সামান্য দুই-চারিটী কথা বলিয়া আসন পরিগ্রহণ করিলেন। সভার উদ্দিষ্ট অনুষ্ঠেয় কার্য্য শেষ হইলে লাট-পত্নীকে মিশনের বড় মেম জানাইলেন যে, আমাদের অন্দরের মহিলাগণ তাঁহার দর্শনোৎসুকা, তিনি যেন দয়া করিয়া অন্দর-মহলে গিয়া তাঁহাদের একবার দর্শন দেন। শুনিয়া বড়লাট-মহিষী তখনই হাসিতে হাসিতে আসন হইতে উঠিয়া উপরের সোপান-শ্রেণী আরোহণ করিতে লাগিলেন, সেখানে যাওয়ার সমস্ত পথই সালু মোড়া ছিল। সঙ্গে গেলেন সেই মিশনের বড় মেম, পিতৃব্য বঙ্কিমচন্দ্র আর আমরা বাড়ীর ২।৪ জন ছেলে-ছোকরা। লাট-মহিষা উপরের ঘরে পৌছিলে তথায় উপস্থিত বাড়ীর মহিলাগণ মস্তক অবনত করিয়া সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। সেখানে একটা মার্ব্বেলের গোল টেবিলের উপর রাখা ছিল রিবন দিয়া সুন্দর-ভাবে বাঁধা পিতৃব্য মহাশয়ের লিখিত পুস্তকাবলীর একটা সেট। খুল্লমাতাঠাকুরাণী সেই পুস্তকের সেট্‌টী স্বহস্তে লাট-পত্নীকে উপহার দিলেন; তিনি হসিত বদনে উহা গ্রহণ করিলেন। তখন পিতৃব্য মহাশয় লাট-মহিষী মহোদয়াকে আমাদের বাড়ীর মহিলাদিগের ইংরেজি ভাষায় ও ইংরেজি আদব-কায়দায় অজ্ঞতার কথা বুঝাইয়া বলিলেন ও তাঁহার পুস্তকগুলির সংক্ষিপ্ত ভাবে একটু পরিচয় দিলেন। পরে বলিলেন, তাঁহার কন্যারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূগণ মিশনের মেমদের কাছে সম্প্রতি ইংরেজি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; অতঃপর সেখানে একপার্শ্বে উপস্থিতা কন্যাদের ও ভ্রাতুষ্পৌত্রবধূদিগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। তখন লাট-পত্নীর দৃষ্টি প্রথমেই আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর উপর পড়িল; তাহার পরিহিত ২।৩টী অলঙ্কারে একটু হাত দিয়া লাট-পত্নী দেখিলেন; পরে আর ২।১ জনের গহনাও ঐ ভাবে তিনি দেখিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। তখন সপারিষদ একটু জলযোগ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রার্থনা জানান হইল। তিনি হাসিমুখে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বদলে বাহিরে থাকা গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। গাড়ী ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। আবার পূর্ব্ববৎ বোমার আওয়াজ হইতে লাগিল। তখন অপর মেম প্রভৃতি যাহারা উপস্থিত ছিলেন, বাহিরের বৈঠকখানার হলঘরে তাঁহারা সান্ধ্য-ভোজনে বসিলেন। অন্যত্র হইতে আনীত ইংরেজিখানা ব্যতীত বাড়ীর মহিলাদের প্রস্তুত অনেক রকম খাদ্যাদি পরিবেষণ করা হইয়াছিল। সেখানে আমার বাপ-খুড়ারা উপস্থিত থাকিয়া অতিথিগণের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। তখন নানা প্রকার গল্পে ও মেমদিগের হাসির লহরে সে ঘর প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। খাওয়া-দাওয়া চুকিলে সকলে চলিয়া গেলেন। এ সব দেখিয়া পিতামহ মহাশয়ের গালভরা হাসি আমি সে বয়সে বড়ই উপভোগ করিয়াছি।

যৎকিঞ্চিৎ

পরলোকে

রায় বিহারীলাল মিত্র বাহাদুর

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রায় বিহারীলাল মিত্র বাহাদুর বাগবাজারের সুপরিচিত প্রাচীন মিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

স্বর্গগত রসিকলাল মিত্র ইঁহার পিতা এবং প্রসিদ্ধ গোকুল মিত্র ইঁহার পিতামহ।

ইনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও বাগবাজার একাডেমীতে বিদ্যালাভ করেন।

নিজের বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য্য ও পরিশ্রম দ্বারা জীবনে ইনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি ছাড়া সম্পূর্ণ নিজের একটী সম্পত্তি করিবার বাসনা ইঁহার বহুদিন হইতে ছিল। সে বাসনা তাঁহার অপূর্ণ থাকে নাই!

ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রই সকলের চেয়ে তাঁহার প্রিয় ছিল। "যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে"র ইংরেজী অনুবাদ তাঁহার সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের সম্যক পরিচায়ক।

রায় বিহারীলাল মিত্র বাহাদুর।

সামাজিক উন্নতির জন্য ইনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। বিধবাবিবাহের জন্য ইনি বহু অর্থব্যয় ও শ্রমস্বীকার করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের জন্যও ইনি বিস্তর চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

ইঁহার মত দানশীল মহাত্মা সচরাচর খুব কমই জন্মগ্রহণ করে। ১৯৩০ সালে "সায়েন্স এসোসিয়েশনের" হস্তে ইনি ১০০,০০০ এক লক্ষ টাকা বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে দান করিয়া গিয়াছেন।

মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে ইনি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার-কল্পে ৪৮,০০০ সহস্র টাকা দিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য ইহার পূর্ব্বে এত অধিক অর্থ আর কেহ দান করেন নাই। তাঁহার কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁহার দানের কথা স্মরণ করিয়া সশ্রদ্ধ-চিত্তে তাঁহাকে চিরদিন অভিবাদন করিবে।

কিশোরীলাল ঘোষ

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসেবী কিশোরীলাল ঘোষ মারা গিয়াছেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত থাকা কালে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়। মামলায় মুক্তি পাইয়া তিনি অতি অল্পদিনই জীবিত ছিলেন।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ, বি-এল এবং কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাড্ভোকেট্ ছিলেন। ওকালতী ব্যবসা তিনি বেশী দিন করেন নাই। কিছুদিনের জন্য তিনি পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত "সার্ভেণ্ট" পত্রিকার সহকারী-সম্পাদকের কার্য্য সুচারুভাবে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। "সার্ভেণ্ট" পত্রিকার সংশ্রব ত্যাগ করিয়া তিনি "অমৃতবাজার পত্রিকার" সহকারী-সম্পাদক হ'ন। "ট্রেড ইউনিয়ন্ ফেডারেশন্" ও "ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সমিতির" তিনি বহুদিন ধরিয়া সভাপতি ছিলেন। "মডার্ণ রিভিউ"তে তাঁহার অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। 'মডার্ণ রিভিউ' ব্যতীত "এশিয়াটিক্ রিভিউ" প্রভৃতি বৈদেশিক পত্রিকায়ও তাঁহার যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধসকল বাহির হইয়াছে। অর্থনীতি ও রাজনীতি শাস্ত্রে ইঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল। ইঁহার পাণ্ডিত্যে ও অমায়িকতায় সকলে মুগ্ধ হইতেন।

মীরাট্ ষড়যন্ত্র-মামলার ব্যয়ভার ইঁহাকে বড়ই আর্থিক দুর্গতির মধ্যে ফেলিয়াছিল। অর্থাভাবে ও ব্যাধিতে তাঁহার শেষজীবন বড়ই অশান্তিতে কাটিয়াছে।

এই অশান্তি সত্ত্বেও মৃত্যুর পূর্ব্বে 'মীরাট্ ষড়যন্ত্র-মামলা' ও 'ভারতীয় শ্রমিক-আন্দোলনে'র ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

তিনি আমাদের সোদরোপম কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বি-এ মহাশয়ের মধ্যম জামাতা। সদালাপী ও মিষ্টভাষী কিশোরীলাল আমাদের আনন্দবর্দ্ধক ছিলেন। এরূপ একজন জ্ঞানী, সুশিক্ষিত ও জনপ্রিয় সংবাদপত্রসেবীকে হারাইয়া দেশবাসী আজ ম্রিয়মাণ।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

গত ৮ই ফাল্গুন খ্যাতনামা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ মৈত্র রংপুরে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

অতি অল্পকালের মধ্যেই ইনি সাহিত্যে বিশেষ নাম করিয়াছিলেন। "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় 'দধিকর্দ্দম' শীর্ষক রসনিবন্ধগুলির রচয়িতা ইনিই ছিলেন। ইঁহার সরস ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ সহজেই অন্তরে প্রবেশ করিত। "শনিবারের চিঠিতে" 'দিবাকর শর্ম্মা' ছদ্মনামে তাঁহার যথেষ্ট শ্লেষ ও ব্যঙ্গ-রচনা বাহির হইয়াছে। তাঁহার 'দিবাকরী' ও 'বাস্তবিকার' তাঁহাকে বাঙ্গালা-সাহিত্যে সুপরিচিত করিয়াছিল।

তিনি ছিলেন একজন অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেমিক। তাঁহার "থার্ডক্লাশে"র গল্পগুলিতে এই স্বাদেশিকতা ও দৈনন্দিন জীবনের দুঃখকষ্ট অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। "শনিবারের চিঠিতে" তিনি নিয়মিত হাস্য-রসাত্মক রচনা ও কবিতা দিতেন।

অধুনা ষ্টার থিয়েটারে "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" নামে তাঁহার একখানি রসনাট্য অভিনীত হইতেছে। এই শ্রেণীর নির্ম্মল হাস্যরসপূর্ণ নাটক-নাটিকার মধ্যে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহা আপনার একটা স্থান করিয়া লইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র কেবলমাত্র সাহিত্যিক ছিলেন না। অনুন্নত জাতির জন্য নিরলস সেবা ও হিন্দু-সংগঠনের জন্য ক্লান্তিহীন পরিশ্রম—তাঁহার জীবন-ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৪ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গলার বাণী-মন্দির এক অকৃত্রিম পূজারীকে হারাইল।

——:*:——

ছাত্রগণের স্বাস্থ্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-কল্যাণ-কমিটীর রিপোর্টে প্রকাশ যে, প্রতি ছয় জন ছাত্রের মধ্যে একজনের 'টিউবারকুলিসের' লক্ষণ দেখা যায়। অধিকাংশ ছাত্রই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে নানাপ্রকার ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছে। অনেকেরই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ও শ্বাস-যন্ত্রের পীড়া আছে। কমিটীর বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী কয়েকজন আরোগ্যলাভ করিয়াছেনও বলিয়া কমিটীর রিপোর্টে প্রকাশ।

অদূর ভবিষ্যতে যাহাদিগকে রাষ্ট্র ও সমাজ-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে হইবে তাহাদের নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত দেহ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে চলিবে কেন?

স্বাস্থ্য-চর্চ্চা বিষয়ে বাঙ্গালী ছাত্র সাধারণতঃ উদাসীন। এই উদাসীনতা ভাল নয়। আমরা এমন একটা যুগের ইঙ্গিত এখন হইতেই দেখিতে পাইতেছি যে-যুগে মস্তিষ্কের চালনা জনিত শ্রম অপেক্ষা কায়িক পরিশ্রমই জনসাধারণকে অধিক ভাবেই করিতে হইবে। সে যুগের বড় বেশী দেরী নাই। বাঙ্গালীর দারিদ্র্যের ধুয়া তুলিয়া কেহ কেহ ছাত্রগণের এই উদাসীনতা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন। ইহা আমরা স্বীকার করি না। বাঙ্গালী কৃষক কি সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোক হইতে বেশী পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে?

অখিল বঙ্গ শরীর চর্চ্চা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

দেশের ছাত্রগণের শারীরিক দৌর্ব্বল্যের পরিচয় পাইয়া যখন জানা গেল, ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের সন্নিকটে বিশাল একটী শরীর-চর্চ্চা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা চলিতেছে,—তখন বড়ই আনন্দ অনুভূত হইল। এই শিক্ষা-

প্রতিষ্ঠানটী নির্ম্মাণ করিতে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। হ্যালিডে পার্কের সান্নিকটেই একটী স্থান কলিকাতা কর্পো-রেশনের নিকট হইতে ৯৯ বৎসরের জন্য লিজ্ লওয়া হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানে শরীর-চর্চ্চার যাবতীয় যন্ত্রপাতি থাকিবে।

বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা

বোম্বে কাউন্‌সিলে "হুইপিং বিল" নামে একটী বিল পাশ করিয়াছেন। দাঙ্গাকারীকে বেত্রাঘাত করাই এই বিলের উদ্দেশ্য। বেত্রাঘাতে দাঙ্গাকারী যদি শান্ত ও সংযত হয়—তবে এই বিলের বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু কেবলমাত্র বেত্রাঘাতেই যে দাঙ্গাকারীর চৈতন্য হইবে তাহা তো মনে হয় না। বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা সভ্য জগতে—সভ্য জগতে কেন, জগতের সর্ব্বত্র এক সময়ে না এক সময়ে প্রচলিত ছিল, কিন্তু কৈ সেই সেই দেশের দোষীরা তো সায়েস্তা হয় নাই!

কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়াছেন, বেত্রাঘাত প্রথা অতি নিষ্ঠুর প্রথা। মানুষের বর্ব্বরতা ইহাতে প্রকাশ পায়। কথাটী স্বীকার করি। কিন্তু যাহারা নিষ্ঠুর ও বর্ব্বরের মত লুট ও খুন-জখম করে, তাহাদিগকে এই শাস্তি দিলে কি কিছু বেশী অন্যায় করা হইবে? শিক্ষা দেওয়া যদি দণ্ডের মাপকাঠি হয় তা হইলে বলিতে পারা যায়, ইহার প্রয়োগে দোষীরা শিক্ষা পাইলে পাইতেও পারে।

বাঙ্গলায় কৃষি-কলেজ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলায় একটী কৃষি-কলেজ স্থাপনের জন্য একটী কমিটি গঠন করিয়াছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার যুবকগণ কৃষি-শিক্ষা পাইয়া যাহাতে জীবিকানির্ব্বাহে সমর্থ হয়—ইহাই ঐ প্রস্তাবিত কলেজের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সম্পর্কে স্যার ডেনিয়েল হ্যামিল্টন্ বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাইয়াছেন যে, এই কাজের জন্য তিনি তাঁহার সুন্দরবনস্থ জমিদারী বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত আছেন। স্যার ডেনিয়েল্ গোসাবাতে একটী কৃষি-প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় যদি গোসাবাতে প্রস্তাবিত কৃষি-কলেজ খুলিতে চাহে, তবে কলেজের জন্য কয়েকটী সাধারণ ইমারত নির্ম্মাণের ব্যয়ভার করিতেও তিনি প্রস্তুত আছেন।

বাঙ্গলায় একটী কৃষি কলেজ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গালী ছাত্র পুষাতে গিয়া অর্থাভাবে শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। অথচ যে যুগের সূচনা এখন হইতে দেখা যাইতেছে—সে যুগে এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শতকরা আশীজন যে অনুভব করিবে—ইহা বলা বাহুল্য।

দিঘাপতিয়ার পরলোকগত রাজা রাজসাহীতে একটী কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর অর্থ দিয়া গিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। সে অর্থ আজও আছে কি না, এবং থাকিলে তাহার কি ভাবে ব্যবহার হইতেছে জানিতে ইচ্ছা হয়। লক্ষ্মীর বরপুত্র তাঁহার সুযোগ্য বংশধরদিগের কি কর্ত্তব্য নয় যে স্বর্গতঃ রাজবাহাদুরের অভিলাষকে কার্য্যে পরিণত করা।

—:•:—

সুখ দেবী

সুখ দেবী ঢাকা জেলার ধামরাই থানার অন্তর্গত কাঁটাহাটী গ্রামের পঁচিশ-বর্ষ বয়স্কা বিধবা যুবতী। গত ৬ই আশ্বিন শামসুদ্দিন নামক জনৈক দুর্ব্বৃত্ত তাহার সতীত্ব-হরণের চেষ্টা করে। সুখ দেবী ইহাতে বাধা দিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়া নরপশুকে রামদাও দিয়া আঘাত করে। ঐ আঘাতের ফলে শামসুদ্দিনের মৃত্যু ঘটে। শামসুদ্দিনের আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া সুখ দেবীকে যথেষ্ট প্রহার করে। পুলিশও তাহার বিরুদ্ধে খুনের চার্জ্জ দাখিল করে।

ঢাকা সেশন্‌স্ আদালতে সুখ দেবীর বিচার হয়। বিচারে জজ ও জুরীগণ একমত হইয়া সুখ দেবীকে মুক্তি দিয়াছেন। জনৈক মুসলমান জুরী সুখদেবীর এই শোকাবহ ঘটনায় বিচলিত হইয়া বলিয়াছেন—"সতীত্ব রক্ষার জন্য সুখ দেবীর প্রাণপণ চেষ্টা পুরস্কারের যোগ্য।"

সুখ দেবীর নাম যে চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার এই ঘটনায় একটু নূতনত্ব আছে। প্রথমতঃ কোন জুরী এ পর্য্যন্ত কোন ধর্ষিতা নারীকে পুরস্কৃত করিবার কথা বলে নাই এবং দ্বিতীয়তঃ কোন মুসলমান জুরী ইতিপূর্ব্বে কোন ধর্ষিতা হিন্দুনারীর জন্য বিচলিত হ'ন নাই।

আশা করি সুখ দেবীর এই সদ্দৃষ্টান্ত বাঙ্গালার যে কোন সম্প্রদায় জাতি বা বর্ণের নারীকে আত্মরক্ষার জন্য এইরূপ কার্য্য করিতে অগ্রসর করিবেন।

সুখদেবীকে পুরস্কৃত করিবার জন্য একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। যাহার যাহা সাধ্য নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন,—

১। শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, সলিসিটর, টেম্পল চেম্বারস্, কলিকাতা ও ২। শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, ৬নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র এই সমিতির সেক্রেটারী।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মৃতিকল্পে

মহাত্মা রামমোহন রায়ের শত-বার্ষিকী আগামী সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হইবে। এই শত-বার্ষিকী উৎসব কিরূপে সম্পন্ন হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সিনেট হাউসে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে এক প্রাথমিক সভা হয়। উৎসবের উদ্যোক্তা ও কর্ম্মিগণ ঐ সভায় নির্দ্ধারিত হইয়াছেন।

ওয়ারেণ্ হেষ্টিংসের স্মৃতিরক্ষা

ওয়েষ্টমিন্ষ্টার হলে যে স্থানে ওয়ারেণ্ হেষ্টিংসের বিচার হইয়াছিল, সেইস্থানে সত্বরই নিম্নের লিপিটী খোদিত হইবে—

"১৭৮৮ হইতে ১৭৯৫ সাল পর্য্যন্ত এই স্থানে ওয়ারেণ্ হেষ্টিংসের বিচার হইয়াছিল। সকল অভিযোগ হইতেই তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।"

দীর্ঘ একশত চল্লিশ বৎসর পরে হেষ্টিংসের প্রতি হঠাৎ এতটা প্রীতি জাগিয়া উঠিল কেন তাহা তো বুঝা গেল না!

হেষ্টিংসের মৃত্যুর পর এতাবৎ কাল যে সকল পুঁথি পুস্তক ও দলিল দস্তাবেজ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐগুলি পূর্ব্বে পাওয়া গেলে এই লিপি খোদিত হইত কি না সন্দেহ।

পাহাড়পুরে নূতন আবিষ্কার

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বৌদ্ধমঠ ছিল সোমপুরম্। ইহারই বর্ত্তমান নাম পাহাড়পুর। যিনি তিব্বতে বৌদ্ধমত প্রচলন করান, সেই দীপঙ্কর এই পাহাড়পুরে ছিলেন।

যে স্থানে মঠটী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারই সন্নিকটে একটী "ভিটা" ছিল। লোকে তাহাকে বলিত সত্যপীরের ভিটা। এই ভিটা খুঁড়িয়া এইস্থানে বৌদ্ধদের তারা দেবীর মন্দির বাহির হইয়াছে।

এই মন্দির আবিষ্কার হওয়াতে অনেক সুবিধা হইয়াছে। নালন্দার একটী শিলালিপিতে এই মন্দিরের কথা উল্লিখিত আছে। এইস্থানে বুদ্ধমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে অনেকগুলি মৃন্ময় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রাগুলিতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সার কথা লিখিত আছে।

সরণিকা

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা

শুব্ধ দুপুর, নিঠুর নিদাঘ, অনল বরষে মাঠে,
ক্লান্ত কৃষক বোঝা লয়ে শিরে চলে ওপারের হাটে,
সম্মুখে তার আঁকা বাঁকা পথ গগনে গিয়াছে মিশি
নাহি গাছপালা, ধূ ধূ করে মাঠ, জলিছে সকল দিশি,
ঘর্ম্মের ধারা ভিজায়েছে তার জীর্ণ বসনখানি.
তীব্র বাতাস ঢালে দেহে তার অনলের কণা আনি।
চলিয়াছে ধীরে ধীরে,
পীড়িত চিত্তে নিঠুর বোঝা বহি সকাতর শিরে,
মাঝে মাঝে তার স্খলিত চরণ আতুর হইয়া থামে,
কভু প্রাণপণে সহৃতা-গুণে ছুটে দক্ষিণে বামে
সম্মুখে পিছে দগ্ধ বালুকা রাঙা মাটী তারে হাসে
তবু নিজ মনে চলে সে আপনি দুর্দম অভিলাষে
তৃষায় অধীর শুষ্ক তালুকা,—নিঃশ্বাস ঘন বহে,
বিবিধ ভাবনা মনে জাগি তার সরল বক্ষে দহে
বেদনা-মলিন আঁখি,—
ঝর ঝর ঝর অশ্রুর ধারা ফেলিছে নীরবে থাকি,
গুরুভারে দেহ অবশ তথাপি চলে উদরের লাগি
পূর্ব্বের কোনো কৃত কর্ম্মের বুঝি হয়ে ফলভাগী ;
নির্জ্জীব-পদ চলিতে না পারে, নামাতে না পারে বোঝা
নিঃশেষ তার সকল শক্তি, শির নাহি রহে সোজা
দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল ধরণী 'পরে
ফুরালো নিমিষে কেনা-বেচা তার ভবহাটে চিরতরে।
মায়ামৃগ-তৃষ্ণিকা,—
নাচিতে নাচিতে টেনে দিল তার জীবনের যবনিকা।

——:*:——

সৃষ্টি-সমস্যা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে সৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছে। তত্র অকস্মাৎ কারণ সলিলের ক্ষুদ্রাংশে ক্ষুদ্র হিরণ্য খণ্ড দেখা যায়, সেই খণ্ড দ্বিধা খণ্ডিত হইলে উর্দ্ধার্দ্ধ আকাশ-কটাহ ও নিম্নার্দ্ধ পঞ্চভূত গঠিত জগৎ পাওয়া যায়, এই আকাশ ও জগতের নানা বিভাগ কল্পিত হইয়া ভূর্ভুবঃ স্বর্লোক এবং মহঃ জন তপঃ ও সত্য লোকে এবং তল-বিতল-রসাতলাদি পাওয়া যায়। কারণ-সলিলের অবশিষ্ট অংশ বহু বিস্তৃতই থাকিয়া যায়, সেখানে কোন লোক নাই। অনন্ত বিশাল "কারণের" সীমা শাস্ত্রকারগণের মতে মনুষ্য-দৃষ্টির অগোচর।

"সচ্চিৎ ও আনন্দ, নর ও নারী, গাঢ়ালিঙ্গনে কুঞ্জভবনে সুষুপ্ত অথবা সংপরিষ্বক্ত; উভয়েই "আত্মহারা" তখন, সুতরাং একতত্ত্ব অদ্বয় ব্রহ্ম। আনন্দটী উপাধি, চিৎবস্তু সৎ হইবার জন্য একটা রকমে থাকিতে বাধ্য হয়। রকমটা আনন্দ। চিৎ আনন্দে থাকেন, কখনও অব্যক্ত সুষুপ্তির আনন্দে, কখনও বা ব্যক্ত জাগ্রৎ স্বপ্নের আনন্দে।" রাধা-ঠাকুরাণীর কথা—পৃ ২১৩।

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ। আনন্দাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়স্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিঃ সংবিশন্তীতি" তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। ("ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ, সেই আনন্দস্বরূপ হইতেই, এই সমস্ত প্রাণিবর্গ জাত হইয়াছে, এই আনন্দ কর্তৃকই জীবসকল জীবিত আছে, এবং সেই আনন্দেতেই পুনরাবর্ত্তিত ও লীন হইয়া থাকে।")

এই আনন্দেই লীলাময়ের লীলা। একবার নিস্ত্রৈগুণ্যে রাসলীলা, আবার ত্রিগুণে ঐশ্বর্য্যলীলা—তাই ব্রহ্মের আনন্দ বা হ্লাদিনী শক্তিটীও দ্বিভাবযুক্তা। যখন ঐশ্বর্য্যের বিকাশ তখন কামময়ী, যখন মাধুর্য্যের বিকাশ তখন প্রেমময়ী। আবার ঐশ্বর্য্যে "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"

আমরা বলি যে "কারণের সুষুপ্তি রূপটাই ব্রহ্ম-নির্ব্বিশেষ, জাগ্রৎ রূপটী ব্রহ্মলোক এবং স্বপ্নলোকটী জগৎ লোক। জগৎটী ব্রহ্মের বাহিরে 'কল্পিত হয় কিন্তু ব্রহ্মের তো বহির্দ্দেশ নাই, যেহেতু ব্রহ্ম অনন্তব্যাপী, সমগ্র দেশটাই ব্রহ্ম ও নিত্যলোক, তদতিরিক্ত স্থান কিছুই নাই।"

ঠাকুরাণীর কথা—পৃ ২০৪।২০৫

তাই এখানে 'প্রেমের' অভাব।

জগৎ জড়, জীব জড়াত্মক, কারণ জড়দেহের সংস্পর্শে দেহী হইয়াছে। দেহাত্মবোধরূপ মিথ্যাজ্ঞানে জীব

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ—৬ষ্ঠ প্রপাঠক), সেই ব্রহ্ম এইরূপে ঈক্ষণ করিলেন যে (আমি) বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপত্তি প্রাপ্ত হইব। যখন সৃষ্টি বিধান করেন তখন মাতৃকাময়ী, বাৎসল্যময়ী। ঐশ্বর্য্যলীলা গুণময়, তাই ইহা কামব্যঞ্জক। মাধুর্য্যলীলা নিস্ত্রৈগুণ্য তাই তাহা কামগন্ধ বিবর্জ্জিত কেবল বিশুদ্ধ প্রেমময়।

"সোহমাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রাঃ মাত্রাশ্চ পাদা—অকার উকারো মকার" ইতি ॥ ৮ ॥

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।

সেই আত্মা (ওঁকার অক্ষরকে বা মাত্রাকে অধিকার করিয়া অবস্থিতি করেন, আত্মার যে পাদ তাহাই ওঁকারের মাত্রা এবং ওঁকারের যে মাত্রা তাহাই আত্মার পাদ, সে মাত্রা এই যে, অকার, উকার, মকার) অর্থাৎ সৎ, চিৎ, আনন্দ। চিদানন্দের সৎএর অধিষ্ঠানে ত্রিগুণময়ী ঐশ্বর্য্য বা কামলীলা সৃষ্টি, স্থিতি লয়। আর বিশুদ্ধ চিদানন্দে নিস্ত্রৈগুণ্য মাধুর্য্য বা রাসলীলা।

আর আর নিম্ন পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

১৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—২য় ভাগ—১৮২ পৃঃ

১৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—২য় ভাগ—১৮৫ পৃঃ

৩য় ভাগ—২৬৭ পৃঃ

অভিভূত। তাই এখানে সেই পুরাতন কথা,পরস্পর স্বার্থান্ধতা, কেবল আদান ও প্রদান, আদানস্বরূপ প্রদান অর্থাৎ "দিলে নিলে বদল পেলে, ফুরিয়ে গেল প্রেম পিয়াসা"— প্রকৃত 'প্রেম' নাই। ২১।

জড় 'ভোগ্য'। জীবরূপে ব্রহ্মই তাহার 'ভোক্তা'। ২২।

যেখানে ভোগ্য-ভোক্তা সম্বন্ধ সেখানে পরস্পর স্বার্থ লইয়া কথা, সেখানে কেবল আদানপ্রদানেরই ব্যাপার মাত্র—যেমন আদান তেমনি প্রদান। ইহাই কামময়ী কামরাধার স্বরূপ। ইহাতেই জীব মোহিত হইয়া আছে। অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। ২৩।

"কামবিকান্তা কামেশী কামলালসবিগ্রহা।"

"কামেশ্বরী কামকলা। কামশাস্ত্রবিনোদা চ কামশাস্ত্র-প্রকাশিনী ॥"

ইতি নারদ পঞ্চরাত্রে রাধিকা সহস্রনাম ৭ম অধ্যায়ঃ।

"প্রেমপ্রিয়া প্রেমরূপা প্রেমানন্দ-তরঙ্গিণী। প্রেমহরা প্রেমদাত্রী প্রেমশক্তিময়ী তথা। কৃষ্ণ প্রেমবতী ধন্যা কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণী। ব্রহ্মস্বরূপা পরমা নির্লিপ্তা নিগুর্ণাপরা" ঐ ৭।২ অঃ।

"পরং প্রধানং পরমাত্মানমীশ্বরম্। সর্ব্বাদ্যং সর্ব্বপূজ্যঞ্চ নিরীহং প্রকৃতেঃ পরমা মহদ্বিষ্ণোঃপ্রসূঃ সা চ মূলপ্রকৃতি-রীশ্বরী।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—৪৫ অঃ।

"জগন্মাতা চ প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চ জগৎপিতা। আদৌ পুরুষমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ প্রকৃতিমুচ্চরেৎ। 'রা' শব্দোচ্চারণাদেব স্ফীতো ভবতি মাধবঃ। 'ধা' শব্দোচ্চারতঃ পশ্চাদ্ধাবত্যেব সসম্ভ্রমঃ"—ঐ ৫২ অঃ।

"বুদ্ধিঃ স্থিতিঃ স্থানরূপা সর্ব্বকারণকারণা। অপূর্ব্বা ব্রহ্মরূপা চ ব্রহ্মাণ্ডপরিপালিনী। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমধ্যস্থা ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডরূপিণী ॥ পরং প্রধানং পরমং পরমাত্মানমীশ্বরম্। মহদ্বিষ্ণোঃ প্রসূঃ সা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী। মানিনীং রাধিকাং সন্তঃ সদা সেবন্তি নিত্যশঃ। পরিপূর্ণা পূর্ণতরা তথা হৈমবতী গতিঃ। বিদ্যার্থি বিদ্যামায়া চ বিদ্যা বিদ্যা-স্বরূপিণী"—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ৪৫ অঃ।

কিন্তু এমনি করুণাময়ের লীলা যে 'জীব' চিরকাল, অনন্তকাল ধরিয়া এইরূপ অভিভূত থাকিতে পারে না। শিশু খেলা করে, মাকে ছাড়িয়া, একেবারে যেন ভুলিয়া, খেলায় বিভোর হইয়া থাকে; কিন্তু যখনই

১৭। "কামঃ ইমান্ লোকান্ প্রচ্যাবয়ন্তে"—যাজ্ঞবল্ক্য (গায়ত্রীহৃদয়)

"রাসক্রীড়াকরী রাসবাসিনী রাসসুন্দরী। সদা কৃষ্ণ-প্রিয়া সাধ্বী শ্রীকৃষ্ণানন্দদায়িনী ॥ রাসপ্রিয়া রাসগম্যা রাসাধিষ্ঠাত্রীদেবতা। রসিকা রসিকানন্দা স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা। রাসমণ্ডলস্থা রাসমণ্ডলশোভিতাঃ রাসমণ্ডলসেব্যা রাসক্রীড়া মনোহরা।"—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ১৭ অঃ।

"পুরা নন্দেন দৃষ্টাহং ভাণ্ডীরে বটমূলকে। ময়া চ কথিতো নন্দো নির্বিঘ্নশ্চ ব্রজেশ্বরঃ। অহমেব স্বয়ং রাধা ছায়ারায়াণকামিনী 'রা' শব্দশ্চ মহদ্বিষ্ণো বিশ্বানি যস্য লোমসু। বিশ্বপ্রাণিষু বিশ্বেষু, 'ধা' ধাত্রী মাতৃবাচকঃ। ধাত্রী মাতাহমেতাসাং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী। তেন রাধা সমাখ্যাতা হরিণা চ পুরা বুধৈ।"—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ১১০ অঃ।

"গায়ত্রী বেদমাতা চ বেদাতীত বিহত্তমা। জননী জন্ম শূন্যা চ জন্মমৃত্যুজরাপহা। গতির্গতিমতাং ধাত্রী ধাত্রানন্দ-প্রদায়িনী। ব্রহ্মাণ্ড গোচরা ব্রহ্মরূপিণী ভবতারিণী। চৈতন্যরূপা চৈতন্যপ্রিয়া চৈতন্যরূপিণী। প্রণবা প্রণবেশী চ প্রণবার্থস্বরূপিণী"—নারদ পঞ্চরাত্রে রাধিকা সহস্রনাম। "পাবনানি জগন্মাতুর্জ্জগতাং গূঢ়রূপিণী" ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ১৭ অ। "নিত্যরাধা নন্দঘোষ দেখেছিলেন গোপাল কোলে। প্রেমরাধা বৃন্দাবনে লীলা করে-ছিলেন। কামরাধা চন্দ্রাবলী। কামরাধা প্রেমরাধা আরও এগিয়ে গেলে নিত্যরাধা। প্যাঁজ ছাড়িয়ে গেলে প্রথমে লাল খোলা, তারপর ঈষৎ লাল, তারপর সাদা, তারপর আর খোলা পাওয়া যায় না। ঐটী নিত্যরাধার স্বরূপ— সেখানে নেতি, নেতি, নেতি বিচার বন্ধ হ'য়ে যায়। নিত্য রাধাকৃষ্ণ আর লীলা রাধাকৃষ্ণ। যেমন সূর্য্য আর রশ্মির। নিত্য সূর্য্যের স্বরূপ লীলা রশ্মির স্বরূপ"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ৩য় খণ্ড ২৬৩।২৬৪ পৃঃ, ২য় খণ্ড ১৮৫ পৃঃ

"রাধিকাকে কেন যোগমায়া বলে না? রাধিকা

তাহার 'ক্ষুধা' পায়, তখনই মার কথা মনে পড়ে, তখনই সে 'মা যাব' বলিয়া ব্যাকুল হয়। আর খেলায় সে আনন্দ পায় না, তখন মার কাছে যাইবে বলিয়া ব্যগ্র হয়, তাই 'মা' 'মা' বলিয়া রোদন করিতে থাকে। 'মা'ও শুনিলেই ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লন, তাহাতে তাহার সব দুঃখ নিবারণ হয়, সব অভাব দূর হয়। ২৪।

বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রেমময়ী, যোগমায়ার ভিতরে তিনগুণই আছে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, শ্রীমতীর ভিতর বিশুদ্ধ সত্ত্ব বই আর কিছুই নাই। সচ্চিদানন্দ নিজে রসাস্বাদন করতে রাধিকার সৃষ্টি করেছেন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের অঙ্গ থেকে রাধা বেরিয়েছেন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই আধার। আর নিজেই শ্রীমতীরূপে 'আধেয়'—নিজের রস আস্বাদন করতে—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দকে ভালবেসে আনন্দ সম্ভোগ করতে"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৩য় ভাগ—২০৬ পৃঃ।

এই আদ্যাশক্তি আর পরব্রহ্ম অভেদ। একটীকে ছেড়ে আর একটীকে চিন্তা করবার যো নাই। যেমন জ্যোতিঃ আর মণি। মণিকে ছেড়ে মণির জ্যোতিকে ভাববার যো নাই; আবার জ্যোতিকে ছেড়ে মণিকে ভাববার যো নাই। * * যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব করেন, তাঁকে শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী। * * * মা!—কি মা? জগতের মা। যিনি জগৎ সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন। যিনি তাঁর ছেলেদের সর্ব্বদা রক্ষা করছেন * * *"

ঐ ২য় ভাগ ৮৫। ৮৬। ৮৭ পৃঃ।

১৮। গায়ত্রী-হৃদয়—যাজ্ঞবল্ক্য কৃত।

১৯। 'কাম' ও মায়ায় বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। এই মায়াই কামরূপী হইয়া জীবকে মোহিত করে। জীবের অজ্ঞান উৎপাদন করে।

'কাম'কে শাস্ত্রে—"মোহনো মোহকো মোহো মোহবর্দ্ধন এব চ" বলা হইয়াছে। আবার 'মায়াকে' শাস্ত্রে 'মা'শ্চ মোহার্থ বচনো 'যা'শ্চ প্রাপণবাচনঃ। তং প্রাপয়তি যা নিত্যং সা 'মায়া' পরিকীর্ত্তিতা" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ২৭ অঃ) আবার গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।" গীতা—৭।১৫—আবার তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন—"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ধূমেনাব্রিয়তে-বহ্নির্যথাদর্শো মলেনচ। যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা। কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥" ৩৭। ৩৮। ৩৯।

জীবেরও ভোগ্য-ভোক্তা সম্বন্ধ দূরীভূত হইলে তবে 'প্রেমের' সন্ধান মেলে। তখন 'কাম'ও মোড় ফিরিতে থাকে। যখন সেই বিশ্বজননীর কথা মনে পড়ে, তখন জীব সেই অনন্তের দিকে ছুটিতে থাকে, সেই ভূমার দিকে দৌড়ায় এবং ক্রমে ভোগ্যের ত্যাগে ভোক্তার মিথ্যাজ্ঞান অপনোদিত হইয়া নিজ স্বরূপে পৌঁছায়। তখন 'প্রেমরাধার'

শ্রীমদ্ভাগবতে 'কামের' স্থিতি শরীরের মধ্যে 'হৃদয়ে' ("হৃদি কামা") বলিয়াছেন। আবার গীতায় ভগবান্ মায়ার স্থানও হৃদয়ে বলিয়াছেন। গীতা ১৮। ৬১।

আবার কামের অন্য নাম 'মোহ', মোহ অর্থে 'অবিদ্যা' (মোহঃ অবিদ্যা ইতি মেদিনী)—'অবিদ্যা' অর্থে 'মায়া' (অবিদ্যা মায়া ইতি বেদান্তে)—অতএব 'মায়া' ও 'কাম' একই বলা যাইতে পারে।

"মীয়তে পরিচ্ছিদ্যতে অনয়েতি মায়া"।

"মায়া মেঘো জগন্নীরং বর্ষত্বেষ যথা তথা।" পঞ্চদশী কূটস্থ-দীপ।

"মায়ামেতামহং কৃত্বা যক্ষ্যামি ত্রিদশান্ সদা"

"মায়াং সাংবর্ত্তকাং গৃহ্য পুরয়াম্যখিলং জগৎ"—বরাহ পুং—মায়াচক্র।

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া"—গীতা

"মাহেশ্বরী তথা মায়া তস্যা নির্ম্মাণশক্তিবৎ।
বিদ্যতে মোহ শক্তিশ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ" পঞ্চদশী ৪।১১।১২

"অনয়া বৃত স্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখিত্ব দুঃখিত্বাদি সংসার সম্ভাবনাপি ভবতি।"—বেদান্তসার।

সখীরূপে পরব্রহ্মের নিত্যলীলায় রসময়ের রাসক্রীড়ায় যোগদানে বিশ্বপ্রেমিকের প্রেমসায়রে পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া যায়। 'কামের' এইরূপে 'প্রেমে' পরিণতি, কাম-রাধার প্রেমারাধা-প্রাপ্তি সেই মদনমোহনের সহিত 'প্রেম-ক্রীড়া' রাসবিলাস 'রাসলীলা'—ইহাই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের স্বরূপের নিত্যলীলা। ইহাই ব্রহ্মের স্বভাব। এই স্বভাবেই তিনি নিত্য বিরাজিত। ২৫।

আবার এই লীলা, এই মধুর নিত্য লীলাটী সম্যক পরিস্ফুটনের জন্যই সৃষ্টির বিধান, নিত্যরাধার মাতৃকাশক্তির আবির্ভাব, ঐশ্বর্য্যময়ী শক্তির স্ফূর্ত্তি ঐশী শক্তির অভিব্যক্তি; কারণ ঐশ্বর্য্যের গরিমার মধ্য দিয়া না পেঁাছিলে মাধুর্য্যের মধুরিমায় রসময়ের আনন্দরসের সম্যক উপলব্ধি হয় না। হিমগিরির স্নিগ্ধ রসময়ী সুশীতল স্পর্শানুভূতির সার্থকতা কোথায় যদি শুষ্ক মরুভূমির প্রখরতার মধ্য দিয়া দগ্ধ হইতে হইতে তথায় যাইতে না পারি। ২৬।

তাই আনন্দময়ের স্বভাবসুলভ মধুরানন্দের প্রেম-লীলার সম্যক্ পরিস্ফুটনের জন্যই ঐশ্বর্য্যের বিকাশ, সৃষ্টির বিধান।

যেমন ব্রহ্মরূপী গৃহস্থ সংসারী জীবের সংসার-যাত্রা যদি কেবল গৃহ-কর্ত্তা ও গৃহ-লক্ষ্মীতেই পর্য্যাপ্ত হয়, তাহাতে যেমন গৃহানন্দ ফুটিয়া উঠে না, সংসার মরুময় বলিয়াই যেন বোধ হয়। সেখানে যেমন পুত্র চাই, কন্যা চাই, জামাতা, জ্ঞাতি, ভ্রাতা-ভগিনী, আত্মীয়-কুটুম্ব, সুহৃৎ, বান্ধব, প্রতিবেশী সবই চাই, ঐ বৃক্ষ-লতা, তরু, পুষ্প বাটিকা ইত্যাদি সকল বস্তুই চাই, তাহা না হইলে যেমন সংসার মানচ্ছানা, সক-

---

"সৃষ্টিকালে ভগবান্ আদৌ মায়াং প্রকাশয়মাস। সা দ্রষ্টুশ্চানুসন্ধানরূপা কার্য্যকারণরূপা চ। সত্বরজস্তমো-গুণময়ী। অস্যাঃ শক্তিদ্বয়ম্ আবরণং বিক্ষেপশ্চ। তস্যাঃ মায়য়া মহত্তত্ত্বং জাতম্। তস্মাদহঙ্কারঃ। তস্মাৎ পঞ্চভূতম্। তস্মাৎ ব্রহ্মাণ্ডম্"? ইতি শ্রীভাগবতম্।

পরমাত্মা দ্বয়ানন্দ পূর্ণঃ পূর্ব্বং স্বমায়য়া।
স্বয়মেব জগদ্ভূত্বা প্রাবিশত জীবরূপতঃ॥

পঞ্চদশী। নাটকদীপঃ।

"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্
তস্যাবয়ব ভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৪। ১০

"এই জগতের উপাদান যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি তাহাকেই ব্রহ্মের মায়াশক্তি বলিয়া জানিবে, এবং সেই মহেশ্বরকেই মায়াশক্তিমান্ (মায়াশক্তির আশ্রয়) বলিয়া জানিবে। সেই মায়া শক্তিরই বিভিন্ন অবয়বের দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত।"

"সত্ত্ব রজ তম এ তিন গুণ 'মায়া' হইতে উৎপন্ন। 'মায়া' কি? কামনা। যতদিন তিন গুণের মধ্যে থাকিবে ততদিন 'কাম' তাহারই আধিপত্য করিবে। এজন্য ত্রিগুণাতীত হইয়া সিদ্ধ যোগীগণ অনায়াসে কামকে জয় করেন"—শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রদত্ত উপদেশামৃত।

২০ "প্রেমই ব্রহ্মানন্দ—কামকে শাস্ত্রে "ব্রহ্মানন্দ সহোদর বলিয়াছে।" মাত্রা স্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখ-দুঃখদা—গীতা ২য় অঃ। ২৪।

২১। 'প্রেম' ১ম উচ্ছ্বাস (মৎকৃত) 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' মাসিক পত্রিকা, পৌষ ১৩৩৪ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

২২। মুণ্ডকোপনিষৎ—৩য় মুণ্ডকে—১ম খণ্ড-২য় অঃ।

ঈশোপনিষৎ—১। কঠোপনিষৎ—২ অঃ। ১। ৫

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—প্রকৃতি খণ্ড ২৩ অঃ। গীতা ৯। ২০-২১।

২৩। গায়ত্রী হৃদয়—যাজ্ঞবল্ক্য কৃত।

২৪। "ছেলে চুষী নিয়ে যতক্ষণ চোষে, ততক্ষণ মা আসেনা। লাল চুষী। খানিকক্ষণ পরে চুষী ফেলে চীৎকার করে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আসে" —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২য় ভাগ—১৯৩ পৃঃ।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥"

কঠোপনিষৎ ২য়ঃ। ৩। ১০

["পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া যখন আত্মাতে অবস্থিত হয়, বুদ্ধি যখন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত না থাকিয়া পরমাত্মার তত্ত্বানুসন্ধানে তৎপর হয়, তখনই পরমা গতি লাভ হইয়া থাকে। এই শ্রেষ্ঠা গতিই জীবকে দুঃখসঙ্কুল ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ করিয়া প্রকৃত সুখের অধিকারী করে।

দিকে সর্ব্ব সৌন্দর্য্যেও ফুটিয়া উঠে না, সেইরূপ লীলাময়ের নিত্য রস-বিলাস 'প্রেমলীলার' পরম সহায় স্বরূপ 'আত্মা' বহু না হইলেও রসময়ের প্রেমরস সর্ব্বাঙ্গীন ফুটিয়া উঠে না। তাই বিশ্ব নিয়ন্তার বিশ্বসৃষ্টি, তাই সৃষ্টির 'আত্মা' সেই নিত্য-রাধাসম্ভূত মাতৃকা শক্তির অভিব্যক্তি।

২৭। সেই ব্রহ্মময়ী মাতৃকাশক্তি নিত্য প্রণব ও ব্যাহৃতি-যুক্ত এবং সেই প্রণবেরই ব্যাহৃতিতেই এই বিশ্ব-জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। ২৮। সে ব্যাহৃতি (প্রণবের উচ্চারণ) নিত্য, নিত্য ব্রহ্মশক্তি হইতে উঠিতেছে, সে ব্যাহৃতির বিরাম নাই। তাই সে শক্তি, সেই অনন্ত ব্রহ্মশক্তি উদ্ভূত 'ধ্বনি' জগতে নিত্য স্বতঃই অনু-প্রবিষ্ট হইয়া ওতঃপ্রোত ভাবে বিশ্ব-নিয়ন্তার অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া খেলিতেছে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-রূপ শ্রুতিবাক্যের সার্থকতা নিষ্পন্ন করিতেছে।

এইরূপে মহামায়ী ব্রহ্মময়ী মাতৃকা শক্তি উদ্ভূত এই বিশ্বজগৎ ব্রহ্মের 'কার্য্য' মাত্র। কার্য্য অচেতন। ২৯। তাই তাহার জগৎটাও অচেতন, তাই ইহা অজ্ঞান-আবরণযুক্ত এবং সেই কারণে ইহা 'অবিদ্যা' মায়া বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। দুষ্ট ছেলের মাকেও লোকে দুষ্ট বলিয়া থাকে। সন্তানের দোষ গুণ প্রসূতিতে আরোপিত হয়। তাই সেই আদ্যাশক্তি 'অবিদ্যা'-প্রসবিনী বলিয়া তাঁহাকেও 'অবিদ্যা' উপাধি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। 'অবিদ্যা' অখ্যাতি লাভ করিলেও তিনি বস্তুতঃ স্বরূপে অচেতন, অজ্ঞান নন। তাঁর প্রসূত সৃষ্টি অচেতন, তাই অজ্ঞান এবং অচেতনের 'মা' বলিয়া তাঁহাকেও অচেতন, অজ্ঞান বলে কিন্তু তিনি পূর্ণ জ্ঞানময়ী চৈতন্যস্বরূপা।

কার্য্য দেখিয়া কারণের নামকরণ হয়, যে হেতু কারণে কার্য্য অব্যক্ত থাকে। ৩০ কার্য্য কারণ অভিন্ন, তাই এই নিয়মে ব্রহ্মময়ী মাতৃকা শক্তিকেও অবিদ্যা বলা হয়। কারণে ত্রিগুণ অধিষ্ঠিত কিন্তু অপ্রকাশিত; কার্য্যে ত্রিগুণের বিকাশ, অভিব্যক্তি। ত্রিগুণ অচেতন, তাই তাহা হইতে

২৫। "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—গীতা—৭।১৪

শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৯ প্রহ্লাদকর্ত্তৃক শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেবের স্তব দ্রষ্টব্য। "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতা। অথ মর্ত্ত্যো মৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইতি।" বৃহদারণ্যক উপনিষৎ "অর্থাৎ যে কালে হৃদয়াশ্রিত কামনা সকল প্রলীন হয়, আত্মাই একমাত্র কমনীয় পদার্থ এই জ্ঞান সূর্য্যের প্রখরকরে ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার বিষয় বাসনা সমূলতঃ বিশীর্ণ হয়, তৎকালে মানব মরণধর্ম্মা হইয়াও বর্ত্তমান শরীরেই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। [অবিদ্যা লক্ষণ অনাত্মবিষয়ক কামই মৃত্যু, অনাত্মবিষয়ক কামনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই মানব নানা বেশে বিবিধ দেশে ভ্রমণ করে, পুনঃ পুনঃ জন্মাদি ভাববিকারে বিকৃত বা পরিবর্দ্ধিত হয়]"

"তদনারম্ভ আত্মস্থে মনসি শরীরস্য দুঃখাভাব সংযোগঃ" "অর্থাৎ বিষয়ান্তর হইতে উপরত মন যখন আত্মস্থ হয় তখন ইহার নিরোধ পরিণাম হইতে থাকে, মন এইকালে সর্ব্বদুঃখহর অনাবস্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাকে 'যোগ' বলে। [ভগবান্ পতঞ্জলি দেবের "যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ"—এই অমূল্য সূত্রটির ইহাই তাৎপর্য্য। কামনা শূন্য হইতে না পারিলে মানব কদাচ ঈপ্সিততম অবস্থাতে উপনীত হইতে পারিবে না, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। জড় বিজ্ঞান দ্বারাও ইহা সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইতে পারে।]"

রাসলীলা—

"ত্রয়স্ত্রিংশে ততো গোপী-মণ্ডলী মধ্য গোহরি, প্রিয়াস্তা রময়ামাস হ্লাদিনী বনকেলিভিঃ"—ইতি ভাগবত-টীকায়াং শ্রীধরস্বামী ১০।৩১।১।

"তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ। স্ত্রী-রত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্য বদ্ধবাহুভিঃ॥ রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ। যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ॥ যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্ বিমানশত সঙ্কুলম্। দিবৌকসাং সদারাণামত্যোৎসুক্য ভৃতাত্মনাম্। ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ। জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্ত দয়শোঽমলম্। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে—১০।৩৩।২, ৩, ৪। অর্থাৎ—"সেই স্থানে ভগবান্ গোবিন্দ পরমা-নন্দিত নিজানুবর্ত্তী নারীকুলশিরোমণি গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া 'রাসলীলা' আরম্ভ করিলেন।

াম্ভূত বলিয়া সৃষ্টিও অচেতন। কিন্তু স্বরূপতঃ 'ব্রহ্ম-প্রকৃতি' অচেতন নহে। তাহা হইতে পারে না। তিনি সচ্চিদানন্দ-ময়ী।

'ব্রহ্মপ্রকৃতি' আদিরূপা সনাতনী মাতৃকাশক্তি 'ত্রিগুণ-ময়ী'। সেই ত্রিগুণ মহাহলাহল গরলস্বরূপ কিন্তু তাঁহাতেই নিহিত ও অধিষ্ঠিত। গোখুরা সাপের বিষ তাহারই ভিতর থাকে কিন্তু তাহাতে তাহার নিজের কিছুই হয় না, সে তাহাতে নির্লিপ্ত। ব্রহ্মের স্বরূপ শক্তি নিহিত ত্রিগুণ, কিন্তু তাহা তাঁহাকে স্পর্শ করে না, করিতে পারে না, তিনি নির্লিপ্ত। যখন আদ্যাশক্তি মাতৃকাময়ী সেই গরলরূপ 'ত্রিগুণ' কেবলমাত্র প্রণবের ব্যাহৃতির—উচ্চারণের) দ্বারা উদ্গীরণ করেন তাহাতেই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রচিত হয়। সে গরল তাঁহাকে কিছু করে না, করিতে পারে না, কারণ আদ্যাশক্তি মা মহামায়া তাহার অর্থাৎ ঐ ত্রিগুণের অতীত। কেবল তাঁহার এই সৃষ্টিতেই ত্রিগুণ সম্ভূত বলিয়া ত্রিগুণরূপ গরল ওতঃপ্রোত ভাবে রহিয়াছে। এই ব্রহ্মশক্তি মাতৃকাময়ীর ত্রিগুণাত্মক নাদ বা অনাহত ধ্বনিরই ব্যাহৃতি হইতে বিশ্বের সৃষ্টি হইতেছে। এই নাদ বা অনাহত ধ্বনিরূপ স্পন্দনই ৩১ সৃষ্টির

২৬। আমাদের অনেক তপস্বী মনে করেন সাধনায় জ্ঞান ও কর্ম্মই যথেষ্ট। কিন্তু বিধাতার রচনায় তিনি দেখিয়েছেন, শুধু স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া নয়, রসেই সৃষ্টির সম্পূর্ণতা। মরুর মধ্যে যা কিছু শক্তি সমস্ত বিরোধের শক্তি; বিনাশের শক্তি। রস যখন সেখানে আসে তখনি প্রাণ আসে, তখন সবশক্তি সেই রসের টানে ফুল ফোটায়, ফল ধরায়, সৌন্দর্য্যে কল্যাণে সে উৎসবের রূপ ধারণ করে"—কবীন্দ্র রবীন্দ্র (জাভাযাত্রীর পত্র—বিচিত্রা। পৌষ ১৩৩৪)

"...গোবিন্দ চক্ষুর জল ঘুচায় না, মুছায়। নিত্য সঙ্গ দেয় না, বিরহ বিষে কাতরা করিয়া পরে বারংবার সঙ্গদান করিয়া অশ্রুলাঞ্ছিত গোপী-বদন নিজ পটাঞ্চলে স্বহস্তে মুছাইয়া দেয়। প্রবীণ যথা কোনও অমঙ্গল বস্তু প্রার্থনা করিলে শিশুকে দেয় না, তদ্বৎ গোপী নিত্য মিলন চাহে বটে, কিন্তু রসপ্রবীণ রসচতুর জানে যে তাহা কল্যাণকর সুখ-দনক নহে; গোপীকে নিত্য মিলন দেয় না, বিরহে কাঁদায় ও পরে মিলিত হইয়া আদরের সহিত নিজে গোপীর বদন পদ্মহস্তে ধরিয়া মুছায়।

"বিরহপীড়ার হৃৎকম্পান্দোলনই, ঠিক তদবস্থ থাকিয়াই সুখ মিলনের হৃৎ-কম্পান্দোলনে পরিণত হয়" —অভয়ের কথা শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোঃ—১১২ পৃঃ

"রাধাগোবিন্দ নিত্যতৃপ্ত; লীলা করিয়া তাঁহাদের কান নিজ তৃপ্তি সম্পাদন করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। প্রশ্ন উঠে যে, তবে লীলার হেতু কি? হেতুটী তাঁহাদের অসীম করুণা। এই যে রাধার কয়ে পরাজিত গোবিন্দের আনন্দ লীলা, ইহার উদ্দেশ্য এই যে হতভাগ্য জীবের সৌভাগ্য হউক, জীব এই মধুর হইতে আলোকিক প্রীতিদেবীর জয়লীলা রস চর্চ্চা ও আস্বাদন করুক। হে জীব, তুমি তরুণ যুগলের এই করুণ ব্যবহার স্মরণ করিয়া নিত্য কৃতজ্ঞ হও ও রাধাগোবিন্দের নিত্য জয় গান কর"।

ঐ—১৭৬ পৃঃ

'অহংকারে' জগৎ সৃষ্টি, তাই বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্ব-রচনার চাবিকাটি বা কীলক 'অহংকার'। তাহা না হইলে এক বহু হইয়া লীলা করিতে পারেন না। এই অহংকারেই জীবের স্বাধীনতা, তাহারই প্রকোপ আবার এই অহংকার-প্রসূত মিথ্যাজ্ঞানে মানুষ জীব মনে করে—"আমি সকল বিষয়ে কর্ত্তা, আমার উন্নতি আমিই জগতে করতে পারি", এই অভিমানটী থাকতে মানুষ ভগবানের দিকে তাকায় না। এই অভিমানটী নষ্ট করবার জন্যই এই অবস্থা আসা প্রয়োজন। মানুষ যে কিছু নয়, মানুষের যে কিছুই করবার সাধ্য নাই, এটী বেশ বুঝতে হবে, না হ'লে ভগবানের দিকে কেহ দৃষ্টিও করবে না, উন্নতিও হবে না— * * * গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম করতে বলেছেন। এই সংগ্রাম সাধক মাত্রেরই জীবনে আসবে। নানা প্রকার দুরবস্থায় পড়ে, প্রলোভনের সহিত সাধক সংগ্রাম করতে থাকবে। এই সংগ্রামে

একমাত্র আদি উপাদান স্বরূপ, সেই উপাদানেই ব্রহ্ম সৃষ্টির উপাদান কারণ। সেই ধ্বনি মাতৃকা-শক্তির শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতির বহিরধিষ্ঠানে, এবং পরে সেই প্রকৃতিতে ঈক্ষণের দ্বারা এবং তাহার স্পন্দনে নানা পরিণামে বিশ্বসৃষ্টি হইতেছে আবার সেই ধ্বনিই তাঁহাতে যাইয়াই মিলিয়া যাইতেছে। যেমন উর্ণনাভ নিজের মুখনিঃসৃত তন্তু হইতেই তাহার জাল প্রস্তুত করিয়া তাহাতেই অধিষ্ঠিত থাকে, এবং পরে তাহাই গ্রাস করে ব্রহ্ম মহাশক্তি স্বমুখ পঙ্কজ-নিঃসৃত প্রণবধ্বনির ব্যাহৃতির দ্বারা বিশ্বরচনা করিয়া তাহাতেই অধিষ্ঠিত আছেন এবং কালে তাহারই ধ্বংস করেন; সেই ধ্বনি-সম্ভূত প্রকৃতির আপন স্পন্দনরূপ স্থূল বিকার পরিণামে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাদি ক্ষেত্র, ও ক্রমে তাহা হইতেই সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচিত হইতেছে এবং তাহাতেই বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টি বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিতেছে। ৩২ এ সৃষ্টি স্রষ্টার মাতৃকাশক্তি সম্ভূত, অনন্ত, অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্য, অনাদি কাল হইতে বিরাজমান। এক্ষণে এই সৃষ্টিরূপ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে তাহাই দেখা যাউক।

বিশ্বজননী ব্রহ্মময়ী মাতৃকাশক্তি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আদিতে কেবল মাত্র ব্রহ্মস্বরূপস্থঃ প্রণবের ব্যাহৃতিরূপ ধ্বনির স্পন্দনে ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতির অধিষ্ঠানদ্বারা ও তাহাতেই ঈক্ষণে তাহারই বিকারে গঠিত করিয়াছেন। এ স্পন্দন কার্য্য মাত্র; তাই ইহা অচেতন। কিন্তু অচেতন হইলেও তাহাতে যে শক্তি, যে ব্রহ্মতেজ ওতঃপ্রোত ভাবে খেলিতেছে, সেই ব্রহ্মশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা একজন আছেনই। এই দেবতা কিরূপ? বিশ্বজগৎ ব্রহ্মময়ীর ঐশ্বর্য্যের বিলাস।

সাধক কখনও বা প্রলোভনকে পরাস্ত করবে, আবার কখনও বা প্রলোভনে সাধককে পরাজয় করবে। এই বিষম সংগ্রামে অনেক কাল সাধককে কাটাতে হয়। এ সময়ে একমাত্র গুরুদত্ত নামকেই অস্ত্র করে অত্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক রিপুকুলের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করতে হয়। সংগ্রামের অবস্থার ন্যায় এমন ভয়ানক অবস্থা সাধক-জীবনে আর নাই। বারম্বার প্রাণপণ চেষ্টা করেও সাধক যখন নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর প্রলোভন ও রিপুগণ দ্বারা পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হ'তে থাকে, তখন তার আর ধৈর্য্য থাকে না। সাধন ভজনে কিছুই হয় না, সাধন ভজন সমস্তই বৃথা, সাধক এরূপ মনে করে একেবারে নাস্তিকের মত হয়ে পড়ে। যারা দু'চার ধাক্কা খেয়েই একেবারে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে, তাদের ভোগ শেষ হতে কাল বিলম্ব হয়। আর যারা পুনঃ পুনঃ পড়েও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে—সংগ্রামে নিবৃত্ত হয় না, খুব শীঘ্রই তাদের ভোগ শেষ হয়ে যায়। যার যেমন প্রকৃতি, সে সেই মত সংগ্রাম করতে পারে। কেহ কম, কেহ বেশী, কিন্তু অবশেষে সকলকেই এই যুদ্ধে পরাস্ত হতে হ'বে। যুদ্ধে প্রতিপদে পরাস্ত হয়ে হয়ে যখন একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়বে, হাড়মুড় ভেঙ্গে একেবারে চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে চারিদিকে অন্ধকার দেখবে তখন সাধক বুঝবে যে তার ক্ষমতায় আর কিছুই হবার নয়; সে নিতান্তই অসার। একটী সামান্য বিষয়েও তার কিছুই করবার সামর্থ্য নাই। তখনই সে নিজেকে যথার্থ হীন, পতিত, অধম জ্ঞান করে প্রবল শক্তিশালীর দিকে তাকাবে। অন্তরের সহিত তার আশ্রয় নিবে। তাঁরই উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করে, যথার্থ কৃপাপ্রার্থী হবে। নিজের কোন ক্ষমতা নাই, নিজকে অসার হতে অসার জেনে একান্ত ভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হলেই "ভক্তিযোগ" আরম্ভ হয়, তখন আর সাধকের কোন প্রকার ইচ্ছা, চেষ্টা বা স্বাধীনতা থাকে না। সমস্তই ভগবান করেন, পরিষ্কার জেনে সম্পূর্ণরূপে তাঁরই কৃপার উপর নিজকে ছেড়ে দেয়। ভক্ত নিজকে ভগবানের চরণে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করলে ভগবৎ কৃপায় তখন তার নিকটে নানাতত্ত্ব প্রকাশিত হতে থাকে। এই সব তত্ত্ব প্রকাশের অবস্থাই "জ্ঞানযোগ"। গীতাতে যে 'কর্ম্মযোগ', 'ভক্তিযোগ' ও 'জ্ঞানযোগের' বিষয় বলেছেন, তার তাৎপর্য্য এই। তীব্র তপস্যা, কঠোর বৈরাগ্য ও প্রাণপণ সাধন ভজন করেও যে যথার্থ অবস্থা কিছুই লাভ হয় না। তাঁর কৃপা ব্যতীত যে কিছুই হবে না, এটী পরিষ্কার রূপে বুঝাবার জন্যই সাধন ভজন। নিজের চেষ্টা, সাধ্য সমস্তই অসার। একমাত্র তাঁর কৃপাই সার।" শ্রীশ্রী"সদ্গুরুপ্রসঙ্গ" (প্রভুপাদ মহাত্মা শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত) ৩য় খণ্ড ৩০৫-৩০৬ পৃঃ।

পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষ বাক্যগুলিতেই লীলার উদ্দেশ্য

সে ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী পরম ঐশ্বর্য্যশালিনী, এবং সৃষ্টি ভোগ্য বলিয়া সে দেবী ভোগবিলাসিনী, এবং সৃষ্টিতে আকর্ষণা শক্তি বিদ্যমান বলিয়া তিনি জগজ্জন-মনোমোহিনী।

যেখানে ঐশ্বর্য্য সেখানে আসক্তি, যেখানে আসক্তি সেখানে 'কাম' বর্ত্তমান। 'কাম' না হইলে আসক্তি হয় না। তাই এই আসক্তিই 'মায়া'। তাই সে দেবতা কাম-রূপা মায়াবিনী। তাই তাঁহাকে ভুবনমোহিনী, কাম-বিলাসিনী, ঐশ্বর্য্য-বিভাবিনী মহামায়া বলা হয়।

তাই সৃষ্টি-স্বরূপ এই অচেতন প্রকৃতিই গীতায় 'ক্ষেত্র' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দৈবতাই সেই "মম মায়া দুরত্যয়া" অর্থাৎ ব্রহ্ম-শক্তির দুরন্ত মহামায়া ইঁহারই ভুবনমোহিনী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি।

ব্রহ্মের এবম্ভূত সগুণ পরিণামই তাঁহার বিশ্বমোহিনী আবরণী বা মোহিনী শক্তি 'মহামায়া ৩৩ এবং এই মায়াই ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যবিধায়িনী, তাই তাঁহার ঐশ্বর্য্য-লীলা-সাধনের পরম সহায়। এই মহামায়াই 'কামরাধা' যাঁহার প্রকোপে বিশ্ব মোহিত হইয়া রহিয়াছে।

উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। অহংকারেই সৃষ্টি ও ভোগ, পরে বৈরাগ্য, আবার সেই অহংকারেরই নিরসনে পুনর্ম্মিলন—ইহাই বিশ্বনিয়ন্তার লীলা।

২৭। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"প্রণবেন ব্যাহৃতিভিঃ প্রবর্ত্ততে তমসস্ত পরমজ্যোতিঃ। কঃ পুরুষঃ। স্বয়ম্ভু বিষ্ণুরিতি সংসর্গতঃ গায়ত্রী হৃদয়।

২৮। মৎকৃত—"সৃষ্টিসমস্যা—জড়জগৎ (জড়ের সৃষ্টির মূলকারণ)"—দ্রষ্টব্য

২৯। এই প্রবন্ধের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩০। "কারণভাবাৎ কার্য্যভাবঃ"—বৈশেষিকদর্শন ৪।১।৩ অর্থাৎ কারণবস্তু কার্য্যবস্তুর ভাবে সমন্বিত হয় যে হেতু কারণভাব হইতে কার্য্যভাবের সৃষ্টি।

"কারণভাবাচ্চ"—অর্থাৎ উপজাত বস্তুমাত্রেই তৎ-কারণরূপ বস্তুর ধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে দেখা যায় সুতরাং কারণ-বস্তুতে শক্তিরূপে কার্য্যবস্তু অব্যক্তভাবে বর্ত্তমান থাকে। সাংখ্যদর্শন—১।১১৮

"শক্তস্য শক্য কারণাৎ"—অর্থাৎ যে বস্তুতে যেরূপ শক্তি আছে, সেই বস্তু তাহার অনুরূপ শক্তিসম্পন্ন হেতু হইতেই উৎপন্ন হয়"—সাংখ্যদর্শন—১।১১৭

"ত্রিগুণাচেতনত্বয়োঃ"—অর্থাৎ ত্রিগুণত্ব ও অচেতনত্ব প্রভৃতি সামান্য ধর্ম্ম কার্য্য কারণ উভয়েরই আছে, তদ্দ্বারা কার্য্যকে কারণেরই অনুরূপ পদার্থ বলিয়া জানা যায়। —সাংখ্যদর্শন—১।১২৬

৩১। "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ, তথাক্ষরবৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্"—মুণ্ডকোপনিষৎ।

অর্থাৎ যেরূপে মাকড়সা (অন্য উপাদানের সাহায্য না পাইয়া স্বয়ং) সূত্র উৎপাদন করিয়া জাল প্রস্তুত করে অর্থাৎ গ্রাস করে সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইতেছে এবং ব্রহ্মেই বিলীন হইতেছে।

৩২। ব্রহ্মস্বরূপ প্রণবের ব্যাহৃতির দ্বারা অপরা জড় প্রকৃতির বাহ্য অধিষ্ঠান সম্পাদন হইলে পরে ব্রহ্মের 'ঈক্ষণ''-দ্বারা প্রকৃতি ক্ষোভিত হইলে "মহত্তত্ত্ব" এবং ক্রমে সেই স্পন্দনেই "অহঙ্কারতত্ত্বের" সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাহা হইতেই অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হয়। আবার এই আকাশ বা অধ্বরের (ইথর) কম্পনে একদিকে তেজের উত্তাপ, আলোক-তাড়িত ও চুম্বক প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে, অপরদিকে এই আকাশের বা অধ্বরেরই কম্পনকৌশলে ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উদজান (হাইড্রোজেন) এবং তাহা হইতেই ক্রমে লৌহ, পারদ প্রভৃতি স্থূল মৌলিকপদার্থের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে তাহাদেরই পরস্পর সমবায়ে জল, বায়ু, মাটি অতিস্থূল যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং তাহা হইতেই সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারকাদি সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে।

৩৩। "সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য আত্মভূতে ইবা বিদ্যা কল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চে বীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতিচ শ্রুতিস্মৃত্যোরভি-লপ্যেতে," অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের আত্মভূত নাম ও রূপ কল্পিত অনির্ব্বচনীয় সংসার প্রপঞ্চের বীজস্বরূপ ইহাই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়াশক্তি 'প্রকৃতি' ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়—শারীরক ভাষ্য—২য় অঃ। ১ম পাদ ১৪ সূত্র।

ছড়া

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীইন্দুবিকাশ বসু এম্-এ, বি-এল্

১০১

আড়াই আঙ্গুল দড়ি,
সৃষ্টি জুড়ে বেড়ি।

১০২

কপালে নেইক সুখ,
বিধাতা বৈমুখ।

১০৩

হাতে কড়ি পায়ে বল,
তবে যাই নীলাচল।

১০৪

ছিল না ঝারি, হ'য়েছে ঝারি,
ঝায়ে ঝিয়ে জল পিয়ে পিয়ে মরি।

১০৫

হঁাচি, টিকটিকী, বাধা,
যে না মানে সে গাধা।

১০৬

কাজ সেরে বসি,
শত্রু মেরে হাসি।

১০৭

এয়ো স্ত্রী
শতেক শ্রী।

১০৮

আপন বুদ্ধিতে ফকির হই,
পরের বুদ্ধিতে বাদশা নই।

১০৯

শুনতে বটে শ্বশুর বাড়ী
বড় সুখের ঠাঁই,
কিন্তু সেথা ঝাঁটা বই
আর কিছু নাই।

১১০

বউমা ক্ষীর রইল খাবে,
যদি খাবে তো যমের বাড়ী যাবে।

('বউ-কাঁট্‌কী' শাশুড়ী লোকের সামনে বউকে
ক্ষীর খাইতে বলিয়া আড়ালে
শাসাইতেছে—যেন না খায়)

১১১

আপন চেয়ে পর ভাল,
পর চেয়ে জঙ্গল ভাল।

১১২

মায়ের হাড় যদি মাটীতে থাকে পোঁতা,
মাটী থেকে বলে—"বাছা আমার কোথা?"

১১৩

লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে যায়,
দেখিয়ে খেলে উপ্‌চে যায়।

১১৪

কাছের গোড়ায় শোয়,
কানের গোড়ায় কয়,
তার কথা কি কখন
নিষ্ফল হয়?

(অর্থাৎ স্ত্রীর বাক্য)

৭১৫

আঠে পিঠে দড়,
তবে ঘোড়ায় চড়।

৭১৬

পিত্তি মেরে খান,
কষ্ট দিয়ে দান।

(উপরি উক্ত অবস্থায় খাওয়া বা দান করা
সুখের নয়)

৭১৭

যতক্ষণ শ্বাস,
ততক্ষণ আশ।

৭১৮

মাসী বড় রসালা;
জন পাঁচ ছয় কুটুম দেখে
খুদে জল ঢালালা,
আমার মাথা খেও বাপু
আমার মাথা খেও,
পথে আছে শালুক ডাঁটা
জল খেয়ে যেও।

৭১৯

নিত্য রোগা দেখে কে?
নিত্য নাই তায় দেয় কে?

৭২০

আম শুকালে আমসী,
যৌবন ফুরালে কাঁদতে বসি।

৭২১

খেতে পায় না পচা পুঁটী,
হাতে পরে হীরের আংটী।

৭২২

দ্বিতীয় পক্ষের মাগ,
সোঁদর বনের বাঘ

৭২৩

এই যে দন্ত,
জোরমন্ত,
পড়লে হবে বুড়ী।
এই যে কেশ,
দেখতে বেশ,
পাকলে শণের নুড়ী।

৭২৪

গতর খাটাও, গতর খাটাও
সোণার মত জ্বলে,
গতর পোষ, গতর পোষ,
রাঙের মত গলে।

৭২৫

গড়তে পারেন না একখান,
ভাঙ্গতে পারেন সাতখান।

৭২৬

মনের অগোচর পাপ নাই,
মার অগোচর বাপ নাই।

৭২৭

অকালে খেয়েছ কচু,
মনে রেখ কিছু কিছু।

৭২৮

ধনীর চিন্তায় ধর ছাপ্তি,
নির্ধনের মাথায় মার লাথি।

৭২৯

গতরের নাম আদরমণি,
গতর থাকলে যথা তথা পাই রমণী।

৭৩০

ঘরের ভাত দিয়ে শকুনী পোষে,
গোয়ালের গরু ঠেকে বসে।

৭৩১

ঝোলেতে শম্বরী
আন কাঁকড়ার তরকারী
খেয়ে মুখের তার করি ॥

৭৩২

সে ঐ লোক সবই জানে,
মাছ থাকতে কাঁটা আনে।

৭৩৩

সকল দিন যায় হেসে খেলে,
সন্ধ্যা বেলা বৌ কাপাস ডলে।

৭৩৪

পরিতে হবে শাঁখা,
তবে কেন মুখ বাঁকা?

৭৩৫

যেমন গাবর,
তেমন থাপড়।
(গাবর—চণ্ডাল)

৭৩৬

হলুদ জব্দ শীলে,
মেয়ে জব্দ শ্বশুরবাড়ী গেলে।

৭৩৭

পেলাম থালে, দিলাম গালে,
পাপ পুণ্যি নেই কোন কালে।

৭৩৮

টাকা তুমি যারে বাঁকা,
তার বৃথাই জনম রাখা।

৭৩৯

পট্টবস্ত্রে গুঞ্জফল মূল্য নাহি হয়,
ছিন্নবস্ত্রে মতির মূল্য নাহি হয় ক্ষয়।

৭৪০

জাড়, জাড়, জাড়—
বুড়ার ভাঙ্গে ঘাড়,
জোয়ানের ভাঙ্গে ঠ্যাং,
ছেলেকে করে কোলা ব্যাঙ।

৭৪১

দেবের জন্য দেবী গড়ে,
ভূতের জন্য পেত্নী গড়ে।

৭৪২

পৌষের শীত মোষের গায়,
মাঘের শীত বাঘের গায়।

৭৪৩

পরের লেজে পা পড়লে
তুলো পানা ঠেকে;
নিজের লেজে পা পড়লে
কেঁক্ করে ডাকে।

৭৪৪

যার মনটী যেমন,
সে সবায় দেখে তেমন।

৭৪৫

মেয়ে যেন ঢং,
তেলাকুচো সং।

৭৪৬

ফাগুনে আগুন, চৈতে মাটী,
বাঁশ রেখে বাঁশের পিতাম'কে কাটি।

৭৪৭

কন্যা চিনি হাসে,
মুক্তা চিনি ভাসে,
হাতী চিনি দাঁতে,
মরদ চিনি বাতে।

৭৪৮

যারে নাহি মারি হাতে,
তারে কিন্তু মারি ভাতে।

৭৪৯

পায়ের যুগ্যি মানুষ নয়,
গায়ে হাত দিয়ে কথা কয়।

৭৫০

এক পোয়া দুধের ছানা—
কেবা কত খায়,
কত নর্দ্দমা দিয়ে যায়।
উপেন, বিপিন খাবে,
খোষ্ঠ আমার কোলের ছেলে,
তাকেও একটু দিতে হবে,
কামিনী রাঁড় মেয়ে,
তাকেও একটু দিতে হবে,
বড়-বৌ পরের মেয়ে,
তাকেও একটু দিতে হবে,
কর্ত্তা বুড়ো মানুষ,
তাকেও একটু দিতে হবে;
আমি পোড়া গিন্নী-মানুষ,
দই না হ'লে হয় না।

৭৫১

পোড়া কপালে সুখ নাই,
বিয়ে বাড়ীতে ভাত নাই।

৭৫২

গড় করি মল্লিকা ফুল
তোর পীরিতে থেকে,
রাংএর টেকোয় হাত দিলে পর
ধ্যাক্ ক'রে যাও বেঁকে।

৭৫৩

যাচ্‌লে জামাই খায় না
পমামাছের মুড়া,
শেষকালেতে পায় না
চেঁকশালের কুঁড়া।

৭৫৪

ফুলে নেই গন্ধ,
চোখ থাকতে অন্ধ।

৭৫৫

যদি বর্ষে ফাগুনে,
শস্য বাড়ে তিগুণে।

৭৫৬

একে পেলে আরে চায়,
খেতে পেলে শুতে চায়।

৭৫৭

ঝাড়ের সব সমান,
কেউ ভালগিরি, কেউ লাঠান।

৭৫৮

পায় না পচা পুঁটী,
খেতে চায় রুই ভেট্‌কী।

৭৫৯

জীয়ন্ত দিলিনি তুড়ে,
ম'লে দিবি গাছের মুড়ে।

৭৬০

নিত্য কুঁদুলী বউ ছিল,
সেই যে ছিল ভাল,
বছর অন্তর কুঁদুলী বউ হ'য়ে
প্রাণটা আমার গেল।

৭৬১

ঢোঁড়া, ঢোঁড়া লাউয়ের পাতা,
তোমার ভাইয়ের গোপা মাথা।
(পাছে ননদ লয় এই ভয়ে ভাজ দিব্য
দিয়া রাখিতেছে)

৭৬২

শাশুড়ী বাঘিনী
ননদিনী নাগিনী।

৭৬৩

চরণামৃত কি অমৃত !
খেয়ে দেখি না—জল পদাখ !

৭৬৪

যেদিকে জল পড়ে,
সেদিকে ছাতা ধরে।

৭৬৫

মার গলায় দিয়ে দড়ি,
বৌকে পরাই ঢাকাই শাড়ী।

৭৬৬

একে পায়,
আরে চায়।

৭৬৭

বাপ রাজা তো রাজার ঝি,
ভাই রাজা তো আমার কি ?

৭৬৮

উড়ে এল চিল,
জুড়ে নিল বিল।

৭৬৯

মিথ্যে কথার কি কেত্তা !
আজব সরে কোল্‌কেতা !

৭৭০

ঝিয়ের কোলে ছেলে দিয়ে,
বউ যায় লড়ায়ে খেয়ে।

৭৭১

রাজার বাড়ী ঘুড়ী,
এক বিয়ানে বুড়ী।

৭৭২

জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ,
যাইরে কোথায় বাপরে বাপ।

৭৭৩

এগোলেও মাপাক্তির ঝি,
পেছলেও মাপাক্তির ঝি।
(মাপাক্তির ঝি—পাজী মায়ের মেয়ে)

৭৭৪

ছেলে ছেলে করবি,
এমন ছেলে পাবি যে জলে পুড়ে মরবি।

৭৭৫

মানুষের বাছা ছ'মাস পচা,
গরুর বাছা ভুলে নাচা।

৭৭৬

ভোজনে না আছে তৃপ্তি,
নয়নে না আছে সুপ্তি।

৭৭৭

পরের ধন পাই,
কসি খুলে খাই।
(কসি—পেটের কাপড়)

৭৭৮

পিতৃমুখী কন্যা সুখী,
মাতৃমুখী পুত্র সুখী।

৭৭৯

লোকে বলে আছে ভাল,
শালুক খেয়ে দাঁত কাল।

৭৮০

রান্নার গন্ধে জিভে আসে জল,
খিচুড়ী আর মাংস ছ্যাঁক্ কল্ কল্।

৭৮১

এখন কি ক'রে এত হ'লে মনভোলা,
বিদায় করেছ আগে হাতে দিয়ে খোলা।

৭৮২

মোল্লা থেকে পুরোহিত,
চুকনা থেকে পুঁটি,
বিরোধ ভাজিয়া যেতে
করে ছোটাছুটী।

৭৮৩

ব'সে খেলে কুলায় না,
ক'য়ে খেলে ফুরায় না।

১৮৪

হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়াছে বিচ্ছেদের বাণ,
সমুদায় সহ্য করে হয়েছি পাষাণ।

১৮৫

মুখেতে তোমার কিছু বুঝিতে না পারি,
বুকের ভিতর রাখ হারামের ছুরি।

১৮৬

বার কাঁদি নারিকেল,
তের কাঁদি কলা,
আজ রাণীর উপবাসের পালা।

১৮৭

সকল ব্রত করলে যশী,
বাকী আছে ভীম-একাদশী।

১৮৮

যার কর্ম্ম তারে সাজে,
অন্য লোকের লাঠি বাজে।

১৮৯

ঠেক্‌নে সে ঠর্‌খানা,
বড়ি ঘর কি বাৎ ছিপানা।

১৯০

সকল গুণ আছে পুতে,
হাঁড়িতে খায়, শেয়ে—তে।
(শেয়ে=শয্যায়)

১৯১

ইহাও বিশ্বাস পায়,
হাটেও চোখ বেচা যায়।

১৯২

ক্যাঙকুড়ী ব্যাঙকুড়ী পরমেশ্বরী,
বেরিয়ে এস মা নমস্কার করি।

(শৃগাল কর্কটকে খাইবার নিমিত্ত মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া গর্ত্তের বাহির করিবার প্রয়াস পাইতেছে; কিন্তু ধূর্ত্ত কর্কট তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিতেছে)—

মাথায় ব্যথা গায়ে জ্বর,
ঐখানে ব'সে নমস্কার কর।

১৯৩

দোদেল বান্দা, কল্‌মা চোর,
না পায় বেহেস্ত, না পায় গোর

১৯৪

আহ্লাদী লো ঝি,
তোকে ঝোড়া ঢাকা দি,
তোকে উদ্‌বেগালে খাউ,
মোর মনের দুঃখ যাউ।

১৯৫

চাচা আপন চাচী পর,
চাচীর মাইয়া বিয়া কর।

১৯৬

মাগ মরা, গরু হারা, গায়ে দাদ যার,
সদাই বিরস মন, সুখ নাই তার।

১৯৭

রঙ্গ গেল ঢঙ্গ হ'য়ে,
রস গেল দূর,
নির্ধনের হাতে প'ড়ে
দর্প হ'ল চুর।

১৯৮

একে গোরা গা,
তায় পোয়ের মা।
(সেজন্য গর্ব্বিতা)

১৯৯

ছেলে, মেটেলী, ঢোঁড়া
আনি আমি জোড়া জোড়া;
কেলে খরিশ দেখলে পরে
অমনি পটোল তোলা।

৮০০

মুখ ছেলসে, কান তুলসে,
ভেতর বুঁদে, দিবল ঘোমটা নারী,
আর পানা পুকুরের ঠাণ্ডা জল বড়ই অন্ধকারী।

গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন ও বৌদ্ধ-প্রভাব

শ্রীহেমন্তকুমার চক্রবর্ত্তী

সৃষ্টিকার্য্য সমাপ্তির পর 'প্রভু নিরঞ্জন' হরগৌরীকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে আদেশ করেন। হরগৌরী পৃথিবীতে চলিয়া আসিলে মীননাথ এবং হাড়িফা তাঁহাদের সেবা করেন। একদিন মহাদেব ক্ষীরোদসাগরে টঙ্গীতে বসিয়া দুর্গাকে জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন। এই উপদেশের নাম মহাজ্ঞান। দৈবক্রমে মীননাথ "বোগাল" মৎস্যের রূপে টঙ্গীর নিম্ন ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি শিবের মহাজ্ঞানের তত্ত্ব শুনিতে পান; শিব তাহাকে অভিশাপ দেন "এককালে হৌক বিস্মরন"।

সাধক এবং সিদ্ধদিগের ত্রাণের জন্য সকলের আদ্য গুরু শিব ক্ষীরোদসাগর হইতে কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। হাড়িফা পূর্ব্বদিকে, কানফা দক্ষিণে, গোরক্ষনাথ পশ্চিমে এবং মীননাথ উত্তরে যোগসাধন করিতে চলিয়া যান। হরগৌরী একত্র উপবিষ্ট হইয়া একদিন সৃষ্টি-স্থাপনের পরামর্শ করিতেছেন। ভবানী বলেন—তোমার শিষ্যগণকে যোগ পরিত্যাগ করিয়া "আজ্ঞা কর গৃহবাস করউক সকলে"। মহাদেব তদুত্তরে বলেন—তাহাদের মনে কাম ক্রোধ লোভ নাই। ভবানী বলেন—আমি কটাক্ষে সকলের মনকে জয় করিতে পারি, স্ত্রীলোকের মায়ায় মুগ্ধ না হয় এমন পুরুষ জগতে দুর্ল্লভ। শিবঠাকুর বলিলেন—'আচ্ছা তুমি আমাদিগের সাধুদিগের পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহাদের মন টলাইতে পার কি না।'

শিবঠাকুর তখন সকল সিদ্ধদিগকে ডাকিয়া আনিলেন, দুর্গা ভুবনমোহন বেশে রূপসী স্ত্রীলোক সাজিয়া সকলের নিকট উপস্থিত হন। প্রথম ভুলিলেন গুরু মীননাথ, তিনি মনে মনে ভাবিলেন—"এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক পাইলে আমি গৃহবাসী হইয়া সুখ-শয়নে কালাতিপাত করি।" দেবী বলিলেন তাহাই হউক। তুমি কদলী-পত্তন দেশে যাও, তথায় আমার মত ষোলশ সুন্দরী আছে, তাহাদিগকে পাইবে। মীননাথ চলিয়া গেলেন। এইরূপে হাড়িফা রাণী ময়নামতীকে লাভের আশায় ঝাটা ও হাড়ি হস্তে মেহেরকুলে চলিয়া গেলেন। কানফাও অপর একদেশে চলিয়া গেলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথ অচল অটল; গোরক্ষনাথ দেবীকে মাতৃভাবে পাইবার অভিলাষ করিলেন। দেবী আরও অনেক প্রকারে গোরক্ষনাথকে ভুলাইতে চেষ্টা করিয়া, যোগভ্রষ্ট করিতে বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হন—সংসারে এমন একজন লোকও আছে, স্ত্রীলোকের মায়া যাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। এক নবীন যোগী একদিন গোরক্ষনাথকে স্মরণ করাইয়া দেন যে তাহার গুরু কালীপত্তনে ষোলশ রূপসী নারীর মোহে মহাজ্ঞান হারাইয়া এবং সর্ব্ব প্রকারে শ্রীহীন হইয়া মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত, গোরক্ষনাথ তখনই কালীপত্তনে যাত্রা করেন, তথায় মীননাথের সাক্ষাৎ লাভ দুঃসাধ্য। অন্য কোনও যোগী মীননাথকে তাঁহার ষোলশ রূপবতী স্ত্রীলোকদের অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এই ভয়ে মীননাথের আদেশ ছিল যে কোনও যোগী তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিলেই অচিরে তাঁহার বিনাশ সাধন করিতে হইবে। মীননাথের সান্নিধ্য লাভে কোনও প্রকারেই সফল মনোরথ না হইয়া গোরক্ষনাথ এক সুন্দরী স্ত্রীলোক সাজিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। মৃদঙ্গের বোল মীননাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। অনেক চেষ্টার পর গোরক্ষনাথ সফলতা লাভ করিলেন। গোরক্ষনাথের প্রশ্নে মীননাথের চেতনা ফিরিয়া আসিল। পুস্তকের নাম মীনচেতন ও গোরক্ষ বিজয়।

খৃষ্টীয় ৭ম হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের ধর্ম্মেতিহাস শৈবধর্ম্ম-কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রাসের ইতিহাস, কি ভাবে সমগ্র ভারতব্যাপী সুবিস্তৃত বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের ত্রিসীমা হইতে বিতাড়িত হইয়া চীন ও জাপানের সীমান্তে আশ্রয় লয় এবং কি ভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম পৌরাণিক ধর্ম্মের সংমিশ্রণে শৈবধর্ম্মরূপ রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ হিন্দুত্বের অঙ্গীভূত হইয়া যায় তাহা বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে শৈবধর্ম্মাবলম্বী সেন রাজগণ

"পুষ্পাঞ্জলি"

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাল রাজগণের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া বঙ্গদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ইতিহাসেও শৈবধর্ম্মের ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ অবনতি এবং শৈবধর্ম্মের ক্রমবিকাশের যুগ; এই যুগের সাহিত্যেও একাধারে বৌদ্ধধর্ম্ম ও শৈবধর্ম্মের প্রভাব দৃষ্ট হয়, পরবর্ত্তী যুগে একমাত্র ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য ব্যতীত বাঙ্গলা সাহিত্যে কোথাও বৌদ্ধধর্ম্মের সামান্য চিহ্ন মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না।

পৌরাণিক ধর্ম্মের অপর দুই শাখা—শাক্ত ও বৈষ্ণব শৈবধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করিয়া স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং কালক্রমে সাহিত্যে শৈবধর্ম্মের প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়। সমাজে ধর্ম্মপ্রভাব সাহিত্যের উপরও চিহ্ন অঙ্কিত করে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে দেখিতে পাই—১২শ শতাব্দীর পর বৌদ্ধধর্ম্ম সমাজের নিম্নস্তরের ভিতর বিভিন্ন পরিণতি লাভ করিয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

এই যুগের গোরক্ষবিজয়ের কবি একদিকে যেমন শিবঠাকুরকে মানুষের সুখ-দুঃখে, হাস্যপরিহাসের হর্ষ-বিষাদের সহিত জড়ীভূত করিয়া লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়াছেন, আর একদিকে তেমনি শূন্যবাদকেও অবজ্ঞায় দূরীভূত করিতে চাহেন নাই, প্রভু নিরঞ্জন অপরাপর সৃষ্টির সহিত শিবঠাকুরের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে আদেশ দেন। গোরক্ষবিজয়ের কবি প্রভু নিরঞ্জনের পার্শ্বে শিবঠাকুরের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বঙ্গদেশে এই দুই ধর্ম্মপ্রভাবের পৌর্ব্বাপর্য্যের সামঞ্জস্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

কবি প্রথম সৃষ্টি-প্রণালী বর্ণন করিতেছেন—

গাছ মধ্যে বীজ, যেন বীজ মধ্যে গাছ,
এই মত ব্রাহ্মজ্ঞান শুন মহারাজ।

তারপর হরগৌরী সৃষ্ট হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন—'মীননাথ হাড়িফা এ করন্ত চাকরি; মীননাথের চাকরি করে জাতি গোরখাই, হাড়িফার সেবা করে কানফা জাগাই"। শিবঠাকুরের মাহাত্ম্য কবি এইখানেই শেষ করেন নাই—

"আদ্যগুরু মহাদেব পাছে আর সব
সাধন্ত নকল সিদ্ধা তরিবারে ভব।"

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সমস্ত ভারতবর্ষ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, জ্ঞান ও ত্যাগের আদর্শ, বুদ্ধের অমৃতবাণী, ভারতবর্ষকে কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কালক্রমে বিকৃত-আদর্শ বৌদ্ধধর্ম্ম বীভৎসতা ও কদাচারে পরিণত হইয়া শঙ্করাচার্য্যের দুন্দুভিধ্বনিতে ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং সমাজের ও ও জাতির জীবনে শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়া জীবন নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল। ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-প্রভাবে শক্তিহীন হইয়া পড়ায় পরপর মুসলমান-আক্রমণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই বিক্ষিপ্ত ধ্বংসশীল জাতিকে একত্রীভূত করিয়া সমাজগঠন ও সমাজকে শক্তিশালী করার জন্য সকলের গৃহবাস প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল:

"একদিন হরগৌরী একত্রে বসিল।
সৃষ্টি স্থাপন হেতু কহিতে লাগিল॥
ভবানী বলেন দেব শুন সাবধানে।
তোহ্মার শিষ্যগণের কথা না শুন কারনে॥
সর্ব্ব মুক্তা দেব তুমি সৃষ্টির কারন।
গঙ্গা আদি দুই নারী করহ গ্রহন॥
ধ্যায়ানে সাধিয়া জোগ কিবা পাইব ফল।
আজ্ঞা কর গৃহবাস করউক সকল॥"

এই বৌদ্ধযুগের আবহাওয়ার ভিতর পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া শিবঠাকুর জাতির জীবনে খুব প্রতিপত্তি বা সমাদর লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই যুগের শিবঠাকুর দেবতার মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে জাতির জীবনে আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী কাব্যের চণ্ডী কিংবা পদ্মার মত নিজের পূজা প্রচার কিংবা ভক্তের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা এবং বিদ্রোহীর শাস্ত-বিধানের জন্য উদ্যম অথবা শক্তি শিবঠাকুর কিংবা গৌরীর আছে বলিয়া মনে হয় না—

হেন কালে ভবানী ভাবিয়া নিজ কাজ
আহ্মিহ না পারিলাম গোর্খেরে দিবারে যে লাজ
... ...
জতিনাথ স্থানে দেবী লজ্জা যে পাইল
... ...
শিবের বচন শুনি গোর্খ যে হাসিলা—

ভাঙ্গ ধুতরা খাও কি বলিব তোরে
কথাত হারাইছ নারী ধর আসি মোরে"

আমরা পুর্ব্বে বলিয়াছি, বৌদ্ধ আর শৈবধর্ম্মের বিপ্লবের যুগ এই পুস্তকের রচনাকাল। যতি গোরক্ষনাথ বৌদ্ধভিক্ষুর আদর্শ সন্ন্যাসী, আর শিবঠাকুর ও গৌরী পুনর্ব্বার সৃষ্টি-স্থাপনে কিংবা সমাজ-সংগঠনে প্রয়াসী, এই যুগ বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির যুগ, ধর্ম্মজীবনে অবনতি আসে রিপুর প্রাবল্যে, বৌদ্ধধর্ম্মে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর একত্র অবস্থানে সমাজের উচ্চস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নস্তর পর্য্যন্ত অবনতির ধারা বহিয়া গেল, সেই অবনতির প্রবাহে রমণীর মোহে ভাসিয়া গেল মীননাথ, হাড়িফা ও কানুফা, কিন্তু ধর্ম্মের অবনতির সময়ও এমন একজনও মানুষ দেখা যায় যিনি সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের অভ্রভেদী শৃঙ্গের মত উন্নত শিরে বিরাজমান থাকিয়া জাতির জীবনকে আবার উন্নতির পথে ফিরাইয়া নেন; সেই শক্তিশালী পুরুষ গোরক্ষনাথ, রমণীর কটাক্ষ তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না, বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর অতুল শক্তিতে হরগৌরী পর্য্যুদস্ত। "গোর্থের দেখিয়া কোপ যম কাঁপে ডরে"। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর হুঙ্কারে যমের ভুবনও টলমল করিয়া উঠে। এই শক্তিশালী পুরুষ পুনর্ব্বার সন্ন্যাস-ধর্ম্মের জয়পতাকা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সন্ন্যাসের নিকট সংসার-ধর্ম্ম ভাসিয়া গেল, মীননাথ মহাজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া রমণীর মোহপাশ সবলে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, এই সন্ন্যাস-ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাই কবির উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। গুরুকে পুনর্ব্বার মহাজ্ঞান ফিরাইয়া দেওয়ার প্রসঙ্গে কবি রমণীর মোহ এবং রমণীর মোহে মানবের ভীষণ পরিণতির কথা বিশদভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেন।

"চর্ম্ম দড়ি হইল গুরু মনে চাহ ভাবি
সিসিরের জল জেন হরি নিল রবি
মির্ত্তুকালে কেহ না যাইব তোহ্মার সনে"

একদিকে রমণীর মোহ, নবদণ্ড-ছত্র, সুবর্ণ মন্দিরে সুবর্ণ পালঙ্ক, আর একদিকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উপদেশ "চৈতন্যের দড়ি দিয়া ঘোড়া কর বন্দি", আর মৃদঙ্গের "কায়া সাধ" বোল, কবি দেখাইলেন রিপুর প্রাবল্য জ্ঞান-বলে তিরোহিত হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইল। পরিশেষে কবি 'মহাজ্ঞানে'র—যে জ্ঞান সংসার ভুলাইয়া দেয়, যে জ্ঞান মায়ামোহ পরিত্যাগ করিয়া সংসারের বহু উর্দ্ধে থাকিয়া অপূর্ব্ব জ্যোতিতে ফুটিয়া উঠিবার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার অবকাশ দেয়, যে জ্ঞান জীবন-মরণ, সুখ-দুঃখ হর্ষ-বিষাদ হাসি-ক্রন্দন তৃপ্তি-অতৃপ্তি প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বহু উর্দ্ধে রাখিয়া জীবকে স্বর্গীয় জ্যোতিতে পরিস্ফুট করিয়া তোলে, কবি বুদ্ধের সেই মহাজ্ঞানের স্বরূপ অঙ্কিত করিলেন, ষোলশ রূপসী সুন্দরী পরিবৃত কদলীপত্তনের উল্লেখে কবি খৃষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের একটী আলেখ্য পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল প্লাবনে, সন্ন্যাসের আদর্শে দেশের জাতীয় জীবন কি ভাবে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, যেখানে পুরুষের চিহ্নমাত্রও নাই এমন এক নারীরাজ্যের কল্পনায় আমরা তাহা সুন্দর রূপেই দেখিতে পাই।

"কদলীতে দেখে জুবতী সব প্রজা ;
স্ত্রীরাজ্য হএ সে জে স্ত্রী হএ রাজা"
মনুজ গমনে তবে তথাতে গমন ;
ছিঙ্গার করিব জথ কদলির গণ"

এই শক্তিহীনতাই পরবর্ত্তী যুগের মুসলমান-প্রাধান্যের অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

পরবর্ত্তী যুগে সংস্কৃতবিদ্‌গণ প্রাদেশিক ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিলে, বাঙ্‌লা ভাবে ও ভাষায় দ্রুত পরিবর্ত্তনের দিকে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ সংস্কৃত-সাহিত্যের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল। বাঙ্‌লার হস্তলিখিত পুথিগুলি লেখকদিগের হস্তে পর পর বিশুদ্ধ হইয়া পড়ায় পুস্তকের সঠিক কালনিরূপণ দুঃসাধ্য হইলেও পুস্তকের ভাষা ও ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত না হওয়ায়, গোরক্ষ-বিজয়ের রচনা-কাল দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী মনে করা অসমীচীন নহে।

গ্রন্থের অনেক স্থলেই প্রাদেশিক উচ্চারণের ধ্বন্যাত্মক শব্দের বানান পরিলক্ষিত হয়, 'য'র স্থানে 'জ' এবং 'জ'র স্থানে 'য' এর কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না—যুআয় (যুয়ায়), কৈন্যা (কন্যা), জথ (যত), খিতি (ক্ষিতি), উজ্জ্বলা (উজ্জ্বলা), সোন্দরি (সুন্দরী), য়ামি (আমি), হাবিলাস

অভিলাষ); খেমাই (ক্ষমা), মোধ্যে, মোদ্ধ (মধ্যে), বএস (বয়স), দোআরি (দ্বারী), মুরুক্ষ (মূর্খ), বিধ বৃদ্ধ), নিঃস্যাস (নিশ্বাস), লৈক্ষ (লক্ষ), উফাএ (উপায়), দুতিয়া (দ্বিতীয়া)

উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের সর্ব্বনামগুলি সর্ব্বত্র আহ্মি তুহ্মি বা তোহ্মি আহ্মরা বা আহ্মারা, তোহ্মরা বা তোহ্মারা, উত্তম পুরুষে নাম পুরুষের ক্রিয়া ব্যবহার সর্ব্বত্র।

অনুজ্ঞা-বোধক ক্রিয়াপদগুলির রূপজ বানান লক্ষ্য করিবার যোগ্য—কহিঅ বা কহিয়, বলিয়. ডুবাঅ, বুলিঅ, জানিঅ বা জানিয়, চাঅ, দেহ,

নিম্নোক্তরূপ প্রাচীন ক্রিয়াপদ—

(ক) উত্তমপুরুষে দেখম, জানম, কহম—কহিএ, করিএ—পাইলু, পড়িলু, শুনিলু—জাইমো দিমো, দিমু—যাইবাম, দিবামো ইত্যাদি।

(খ) মধ্যমপুরুষে—জানাস, শিখায়সি,—ডুবালা, সুখালা—জানহ, করহ।

(গ) নাম পুরুষে—নাচন্ত, নাচেন্ত বাহেন্ত, বোলন্ত, হওন্ত, অচ্ছন্ত—বোলএ, আছএ, পাএ বা পায়ে, হএ—নাচয়, ঘময়, জর্ম্মায়ে—ভেল, কইল।

অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির অন্তে য় বা আ উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইহার, ইহা, এই, যে বা যেই, সে বা সেই, প্রভৃতি শব্দগুলি এহার, এহা, এহি, জেএ, সেএ প্রভৃতিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রশ্নবোধক 'কি'র স্থানে 'নি'র ব্যবহার দেখা যায়—চিননি, পারিবা নি

আজ আমরা যেখানে 'ও' ব্যবহার করি সেখানে প্রাচীনকালে 'হ' ব্যবহৃত হইত—আহ্মিহ, তবেহ, সেহ, স্বপনেহ, ক্রিয়াপদে 'ক' প্রয়োগ—ভাঙ্গিবেক, নিবেক, লইলেক—পা, মা, গা, ভাব প্রভৃতি শব্দগুলির পাঅ বা পাও, মাঅ বা মাও বা মাই, গাঅ বা গাও প্রভৃতির ব্যবহার প্রণিধানযোগ্য।

কতকগুলি শব্দ নিম্নলিখিতরূপ পাওয়া যায়—

ঝাটাই (ঝটিতি), জোগাই (যোগী), ঝিয়াই (ঝি) সিধাই (সিদ্ধা), খেমাই (ক্ষমা), মনাই (মন), মিনা'ই (মীননাথ), গোরথাই (গোরক্ষ)।

পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংলিঙ্গ বিশেষণ—'তুহ্মি যতি সতি হেন নিশ্চয় জানিল" হইতে শব্দটী হোন্তে, হোতে, হন্তে, হৈতে রূপে ব্যবহৃত।

ন স্থানে ল ব্যবহার—লাড়ি (নাড়িয়া), লোয়াএ (নোয়ায়)।

কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দে আ বা য়া যোগ করিয়া সম্প্রসারিত—'হস্তিআ (হস্তী), নাটুআ, নাটুয়া, নাটোআ (নট)।

অন্যান্য বিশেষ বিশেষ শব্দ—

উয়ারি বা উআরি 'উয়ারি মেহারি' অর্থে বাড়ী ঘর বুঝাইয়াছে বলিয়া মনে হয় "ঢেকা মারি কৈল নিয়া বাহির উয়ারি"।

রাউল—একশ্রেণীর বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। এই গ্রন্থে রাউল শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। তাহাদের পুত্র-কলত্রাদি ছিল, তাহা হইলে মনে হয় তাহারা "গৃহস্থ যোগী" ছিল।

মেথলি—ইহার পাশাপাশি 'কাঁথা'র উল্লেখ থাকিলেও শব্দটী কাঁথা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

খাওআ বা খাওা—পেটুক।

উপমার বহুল প্রচারের অভাব হইলেও মাঝে মাঝে দেখা যায়—

১। "চন্দ্র সূর্য্য জেন মত পৃথিবী বেহারে।"

২। "ধিরে ধিরে চলি জাএ মউর গমনে"

৩। মৈশ্চের গোরেত দিলা পহরি উন্দুর
বিলাসে পহরি দিলা ঘন পত্র দুগ্ধ
সুথারের হস্তে তুমি সমর্পিলা তরু
ব্যাঘ্রের সমুখে জেন সমর্পিলা গরু
ডাকাইতের হাতে গুরু সমর্পিছ ধন
সাপের মুখেত দিলা বেঙ্গ ততক্ষণ
শুকরের হাতে তুমি সপিআছ গেন্ডা
মানকচু সাজিআছ জথ সব সেন্ডা
ধান্সের গোলাতে মুসিক পহরি থুইলা
কাকের মুখে সমর্পিলা রওম সব কলা
মৈশ্চ সমর্পিলা জেন চণ্ডালের হাতে

"সুখুনা কাষ্ঠ সমর্পিলা অনল সাক্ষ্যেতে
যে কিছু আছিল ধন বনিজ্ঞ করিতে
সকল হারাইলা গুরু গেল হস্ত হোতে"

সংস্কৃত প্রভাব ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। এ যুগের ভাষা আড়ম্বরবিহীন এবং অনেক স্থানেই সরল ও মর্ম্মস্পর্শী।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—গোরক্ষবিজয় পুঁথিখানির আদি কবির মূল রচনা খৃষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর। তখন কোন পুথি লেখা হইত না। এই গাথাগুলি বাঙলার অশিক্ষিত জনসম্প্রদায় দেশদেশান্তরে গাহিয়া বেড়াইত। চৈতন্যের ভাগবতের বর্ণনায় বুঝা যায় সেই সময় পালরাজগণের সম্বন্ধে গাথাগুলি এবং মঙ্গলচণ্ডীর গীত, বিষহরির গীত প্রভৃতি বাঙলায় খুব জনপ্রিয় ছিল। মহীপাল ও যোগীপালের গীত অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু গোপীচাঁদের অনেক গাথা পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে সত্যনারায়ণের পুথি, শনির পুথি এখনও গাহিবার প্রথা আছে। ময়মনসিংহে গ্রাম্য সুললিত ছন্দে লিখিত পল্লী-জীবনের মনোরম ছবিপূর্ণ অনেক গাথা আজও এক সম্প্রদায় গাহিয়া বেড়ায় এবং তাহাদের অনেকগুলি সম্প্রতি সংগৃহীত হইয়া শিক্ষাভিমানীর আদরের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে। গোরক্ষবিজয়ও এই শ্রেণীর একটী গান। পরবর্ত্তী যুগে বিভিন্ন লেখক এই গানগুলি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া নিজ নামের ভণিতা যোগ করিয়া দিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত চার জন পুথিলেখকের ভণিতাযুক্ত পদ পাওয়া গিয়াছে। দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে কাহা দ্বারা এই গান প্রথম রচিত হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধান বৃথা। আমরা পুথিলেখকের নাম পাইয়াছি, রচনাকারের নহে। এই সকল পুথিলেখকগণ দেশ ও কালভেদে ভাষার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া মূল রচনাকে রূপান্তরিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত করিয়াছেন। সকল পুথি মিলাইয়া দেখিলে অনেক স্থানে ছত্রে ছত্রে মিল পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে মনে হয় সকল পুথি এক মূল রচনার অনুকরণে লেখা। যে কারণে "ফয়েজুল্লাকে" পুথিলেখক এবং "কবীন্দ্রকে" নকল কারক বলিয়া বলা যায় ঠিক সেই কারণেই "ফয়জুল্লাকে" পুথি নকল কারক মনে করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে আমাদিগকে অনেক স্থলেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। অনেক স্থলেই সাহিত্যের গুরুত্ব অপেক্ষা ঐতিহাসিক গুরুত্বই প্রাচীন পুথিগুলির অধিক। অক্লান্ত ভাবে বহুযুগ কৃচ্ছ্র সাধনের পর নিজকে হয় তো সংযমী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের আদর্শ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু কোন্ অজানা মুহূর্ত্তে যে নন্দনের অপ্সরার চঞ্চল নূপুর-ধ্বনি প্রাণে মত্ত হাওয়ার ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করিয়া মাতন লাগাইয়া দিবে, আর লালসার দীপ্ত শিখায় বহু যুগের সাধনা বিফল হইয়া যাইবে তাহা কি সেই যুগের ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রেরও জানা ছিল? ভাগবতকার বোধ হয় ঠিক এই কারণেই ষোল শত রমণীর মধ্যে "নিষ্কাম কর্ম্ম" মন্ত্র-স্রষ্টা ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের আসন নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। ঝঞ্ঝার ভিতরই যার পরিপুষ্টি হঠাৎ হাওয়ার পরশ সেই ফুলকে বৃন্তচ্যুত করিতে পারে না। মহাজ্ঞানের অধিকারী হইয়াও সাধক মীননাথ রমণীর কটাক্ষকে জয় করিতে পারিল না।

—:•:—

শিশুরা কেন নখ কামড়ায়?

কোন ফরাসী চিকিৎসকের মতে শিশুদের মধ্যে ক এবং গ (B and D) ভিটামিনের অভাব হইলেই উহারা এইরূপ করে। মানসিক দৌর্ব্বল্য, শারীরিক অসুস্থতাও সময়ে সময়ে এইরূপ করায়।

—•—

সাধারণ

(গল্প)

শ্রীমতী বীণা রায়

নবীন বৈরাগী কুসুমপুরের জমীদারের পাইক। রাত্রি দশটা হইতে ভোর ছয়টা পর্য্যন্ত সে বাড়ী থাকিতে পারিত। তা'ছাড়া সমস্ত দিবস সে প্রজাদের বাড়ী বাড়ী খাজানার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইত। পিছনে থাকিত তাহার কুকুর ভোলা। নবীনের মত ভোলাও দশের নিকট পরিচিত। প্রত্যূষে জমীদার বাড়ী যাইবার পথে, বাড়ীর বাহির হইয়া নবীন ডাক দিত—"আ' ভোলা, ভোল্, তু—" অমনি ভোলা যেখানেই থাকুক, তৎক্ষণাৎ আসিয়া প্রভুর পদানুসরণ করিত। নবীন যখন খাজানার জন্য প্রজার সহিত ধস্তাধস্তি করিত, ভোলা তখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। কাজ শেষ হইলে, লাঠিটা হাতে লইয়া নবীন ডাক দিত—"আয়—"। আবার ভোলা তাহার পিছনে চলিত। বাজে কুকুরের মত ঝগড়া ও কাম্ড়াকাম্ড়ি করিবার অবসর ভোলার ছিল না। তাহার মনিব হুজুরের চাকর, সে-ও হুজুরের চাকরের চাকর। ফল কথা দুইজনে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।

একমাত্র মা বাড়ীতে। মা ছাড়া আর একটী নারীর সহিত নবীনের পরিচয় ছিল। সে হরিদাসী বৈরাগী। দুইজনে ভেক্ লওয়ার প্রস্তাবনা চলিতেছে। এই শুভ-কার্য্যের অন্তরায় হইয়াছে হরিদাসীর অস্বাভাবিক দাবী। নেহাৎ মন্দ নয়, আট গণ্ডা টাকা! নবীনের অত পুঁজি নাই। তবে আর মাস পাঁচ ছয় খাটিলেই টাকাটা উঠিবে। নবীন প্রত্যহই হরিদাসীর নিকটে যায়, আশা—হরিদাসীর দাবী কিছু কমে যদি! কিন্তু হরিদাসী বড় কঠিন মেয়ে, কড়ায় গণ্ডায় প্রাপ্য বুঝিয়া লইতে চায়।

সকালে জমীদার-বাড়ী যাইবার পথে নবীন হরিদাসীর বাড়ী হইয়া যাইত। বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া নবীন হাঁকিত—"কৈ গো! বাড়ীর সব কোথায় গেলে?"

"কে গো," বলিয়া হরিদাসী সদর দরজা খুলিয়া নবীনকে দেখিয়াই "ও-মা তুমি"—বলিয়া জিভ কাটিয়া অন্তরালে চলিয়া যাইত। ভিতরে গিয়া দুইজনে কথাবার্ত্তা প্রায়ই এই ধরণের হইত।

নবীন—কি, আজ সকাল থেকেই কাজে লেগেছ?

হরি—না, সকাল আর কৈ?

নবীন—হাতে খুব কাজ না কি?

হরি—না, বেশী আর কি। এই চাড়িখানেক সেদ্ধ ধান ভানতে হ'বে, আর ঐ কোণটায় বেড়ার মাটী লাগাতে হ'বে, আর ঐ কাঁথাটা সারতে হ'বে—

নবীন—চোতেলি হ'বে? কি মনে হয়!

হরি—কি জানি, ভগবান্ কি করে!

নবীন—আচ্ছা, তা'হলে আসি?

হরি—সন্ধ্যেয় আসছ তো?

নবীন—বেশী দেরী না হয় তো আসব?

হরি—আচ্ছা।

নবীন—আচ্ছা আসি!

রাত্রিতে ফিরিবার পথে নবীন হরিদাসীর বাড়ী হইয়াই আসিত। নবীনের জন্য হরিদাসী দাওয়ায় একখানা আসন পাতিয়া রাখিত এবং তামাক টিকে প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিত। নবীন আসিয়াই কলিকার পর কলিকা তামাক খাইত। এই সময় তাহাদের কথাবার্ত্তা একটু অন্য ধরণের হইত। হরিদাসীই প্রথমে আরম্ভ করিত, কারণ নবীন বড় ক্লান্ত হইয়া আসিত।

হরি—আজ কোন্ গাঁয়ে গেছ্‌লে?

নবীন—এই ধারে কাছেই! তা হরি, তুই টাকাটা একদম কমাবি না, এ কেমন হয়। ধর্, বিয়েই যদি হয়, তখন তুই আর আমি তো পর রব না। এ একটু বুঝে দেখলেই তো পারিস্!

হরি—না বাপু, কদ্দিন আর তোমাকে ব'লব। টাকাটা আমার চাই-ই!

নবীন—তোর বাপু কেমন ঐ এক গোঁ

হরি—তা' যাই বল বাপু !

নবীন—আচ্ছা, টাকার কথা না হয় থাক্! ধর্ টাকাটা যদি না-ই দিতে পারি, ধর্ যদি তা-ই হয়, তা হ'লে অ্যাদ্দিনের ভালবাসাটার কি হ'বে ?

হরি—যাও !

নবীন—ঐ তো ! কাজের কথা বললেই "যাও" ! তোকে আর শেখান গেল না হরি ! কদ্দিন না বলেছি যে ভালবাসাটাই আসল, ও টাকা-ফাকা কিছু না। একেবারে বুঝ্বি নে, আমি আর কি বল্ব বল্ !

এইরূপ দুই চারিটী কথার পর নবীন বিদায় লইত। এই কথোপকথনের সময়টুকু ভোলার অসহ্য লাগিত। সে আর তার মনিব বেশ আছে। মধ্য হইতে একটা নারীর দরকার কেন ? তবে তাহার সান্ত্বনা এই, তাহার মনিব তাহার কোন অনিষ্ট করিবে না। তাহার মনিব অবতার-বিশেষ, সাধারণের সঙ্গে তুলনাই চলিতে পারে না।

এই সময় আইন-অমান্য আন্দোলনের ঢেউ হঠাৎ আসিয়া তাহাদের একটানা দিনগুলিকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে দিন মধুনগরের হাটে কয়েক জন বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া, নবীনের বুকের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যে বিষম তোলপাড় করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি নবীন জাগিয়া কাটাইল। পরদিন প্রাতে কংগ্রেস্ অফিসে গিয়া প্রতিজ্ঞা-পত্রে নাম-স্বাক্ষর করিয়া ফিরিবার পথে হরিদাসীর বাড়ী গেল। হরিদাসী তখন দ্বার নিকাইতেছিল। নবীনকে দেখিয়া বলিল—"বোস"। "হুঁ" বলিয়া নবীন ধপ্ করিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—হরি, আমি ভলেন্টিয়ার হ'য়ে যাচ্ছি।

হরি—ওমা ! সে কি ! কবে ?

নবীন—সোমবারে যাব ; বিষ্টু যাবে, শীতল যাবে, ডাক্তারবাবুও বোধ হয় যাবে।

হরি—সত্যি ?

নবীন—কংগ্রেসে নাম লিখিয়ে এই আস্ছি।

দুই জনে কিছুকাল নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কিছু পরে নবীন ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

সোমবারে নবীন তাহার মা, হরিদাসী, ও ভোলার নিকট বিদায় লইয়া সোদপুর যাত্রা করিল। সোদপুরে নবীন রীতিমত তক্লী কাটিতে লাগিল এবং নুন তৈয়ারী শিক্ষা পাইতে লাগিল। নবীনের কার্য্যে কর্ত্তৃপক্ষের সকলেই সন্তুষ্ট। দিন সাতেক পরে নবীন তাহার মাতার নিকট এক পত্র দিল। পত্রটী এইরূপ—

মা,

এখানে রংপুরের এক বাবু এমন গান করে যে কি বলব। বাবু বিয়ে পাশ। তাও দেশের জন্য কষ্ট করে। আমাকে ভাববে না। ভোলা কেমন আছে। তুমি কেমন আছ। আজ আর লিখব না।

ইতি নবীন।

হরিদাসীকেও সে অনুরূপ একখানি পত্র দিল। কেবল ভোলার কথাটুকু বাদ দিয়া, এই কথাগুলি যোজনা করিয়া দিল—

"এখন বেশী কাজ করবে না। চত্তিরের গরমে শরির নষ্ট হ'বে জানবে"।

সোদপুরে দুই সপ্তাহ থাকিবার পর, তাহাদের নূতন দলকে মহিষবাথানে পাঠান হইল। মহিষবাথানের আব্হাওয়া তখন অত্যন্ত গরম। কাজের আর অন্ত নাই। দ্বিতীয় দিন হইতেই নবীন কাজে লাগিল। একদিন লবণ তৈয়ারী হইবার সময় উত্তপ্ত জল তাহার গায়ে পড়িয়া ফোস্কা উঠিল। শিবীর ভগ্ন হওয়ায়, এক রাত্রি বৃষ্টিতে কাটাইয়া তাহার নিউমোনিয়া হইল। কংগ্রেস্ হাঁসপাতালে তখন বিশেষ স্থানাভাব। রোগীর আর অন্ত নাই। চার পাঁচ দিন ঐ হাঁসপাতালে কাটাইবার পর, তাহাদের কয়জনকে পিছাবনী হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইল। এই হাঁসপাতালে তত ভীড় ছিল না। মাসখানেক পর সে সুস্থ হইল। পর দিন বাড়ীতে এই পত্র গেল—

মা !

বহুদিন সমাচার পাই নি। আমার একটু অসুক হইয়াছিল। ও কিছু না। হাঁসপাতালের ডাক্তারবাবু খুব ভাল ফুটবল খেলা জানে। মেঠেল পাইয়াছে। আর যে নার্স আছে তার কথা আর কি বলব'। মেলা পয়সা। এক বালুস্তরের মেয়ে। আমার সঙ্গে কত

গল্প করে। ভোলা কেমন আছে। দেখিও বসন্তের কুকুরের কাছে যেন সে না যায়। হরি কেমন আছে। তুমি কেমন আছ। এখন মিটিংএ যাব। ইতি নবীন।

হরিদাসীকেও সে ঐরূপ একখানি পত্র দিয়া সভাতে গেল। সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে, অন্যান্য কর্ম্মীর সহিত নবীনও ধৃত হইল। তাহার একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। দিন কয়েক পরেই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কারণ জেলে স্থান ছিল না এবং নবীনও বিশেষ অপরাধে অপরাধী ছিল না। সে কেবল বলিয়াছিল—

"ভাই সব, পালিও না।"

একদিন দ্বিপ্রহরে নবীন বসিয়া তকলী কাটিতেছিল। মাঝে মাঝে গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছিল—

"গান্ধী গেল নুন কোরতে

সমুদ্দুরের ধারে,

ওরে ভাইরে, ভাইরে—"

এমন সময় সে একখানা পত্র পাইল। মায়ের নিকট হইতে আসিয়াছে। পত্রে লিখিত ছিল—

বাবা নবিন,

অকিলবাবুর সাতে যে অসুদ পাঠাইআছি বোধ হয় পাইআছ। ভোলার কান সেদিন যগিশ্শরের কুকুর কামড়াইআছে জানিবা। এখোন একটা খারাপ কতা আছে বতস তাহাতে মোন খারাপ করিবে না। এক বেটা বোষ্টম হরিদাসির কাছে ভিরিআছে। আমি বকিলাম। বলিলাম তুমি দেশের জন্যে কষ্ট করিতেছ আর সে কতা রাখিতেছে না। তাহাতে বলিল হ্যাঁ রাখিনাতো কি হইবে। আরো বলিল যে তুমি নাই সেজন্যে তাহার মোন ঘুরিয়াছে। বতস মোন খারাপ করিবেনা। এঁদুরের সোভাব সে কাগজ কাটেই জানিবা। আমি এখোন পূজা দিতে যাইব জানিবা। ইতি তোমার মা।

তকলীটা রাখিয়া নবীন "ওঃ" বলিয়া উঠিল। পাশেই একজন কর্ম্মী ছিল। বিস্মিত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি অ্যাঁ ?"

নবীন বলিল—"বোষ্টমি ভাগ্ গিয়া"।

সে বলিল—"এই! আমি ভাবি বুঝি কেউ মারা গেল। এর জন্য কি মন খারাপ করে। মেয়েদের বিশ্বেস নেই ভায়া বুঝলে। ওরা এই এদের মত। কখন মারে কিছুই ঠিক নাই। যাক্, আজ নুন তৈরী ক'টা থেকে হবে ?"

নবীন—সাড়ে তিনটে থেকে।

কর্ম্মী—কড়াই ধরবে কে ?

নবীন—হরিপদ আর গোঁসাই

কর্ম্মী—তাই, ওরা অদ্ভুত! অত যে গরম তা কিছুই নয়। ওদের কিছুতেই ফোস্কা পড়ে না।

সেদিন লবণ তৈয়ারী করিবার চেষ্টায় নবীন ও আরও সতের জন ধৃত হইল। বিচারে ছয় মাসের কারাদণ্ড হইল। জেলে কাজ-কর্ম্ম বিশেষ নাই। কেবল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ও মারামারি। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঘরে বন্ধ করিয়া দেয়—এই যা অসুবিধা। সে প্রথমে দমদমা জেলে আসিল। সেখান হইতে বহরমপুরে স্থানান্তরিত হইল। মুক্ত হইবার এক মাস পূর্ব্বে তাহাকে রাজসাহী জেলে বদলী করা হইল। রাজসাহীতে একদিন তাহাদিগকে বেগুনের চারা লাগাইতে বলা হইল। যুক্তি করিয়া তাহারা চারাগুলি উল্টা করিয়া পুঁতিয়া দিল। ইহার পর হইতে তাহাদিগকে আর কাজ দেওয়া হয় নাই। জেল হইতে মুক্ত হইয়া বাড়ীতে সে এই পত্র দিল—

মা, তোমার পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। অবশ্য হরি যাহা বুঝে তাহাই সে করিবে। আমার একটু দুঃখ হইয়াছিল। ভোলার কাণ যোগ্যেশ্বরের কুকুর কামড়াইয়াছে লিখিয়াছ। ভোলা তাহার কি করিয়াছে লিখ নাই। তাহা লিখিবে। আমি এখন মেদিনীপুর যাইব। ইতি

নবীন।

মেদিনীপুরে তখন কর-বন্ধ-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। সে অভয়-আশ্রমে দিনকত কাটাইবার পর একদিন মেদিনীপুর যাত্রা করিল। সেখানকার অধিবাসীদের সাহস ও ধৈর্য্য দেখিয়া তাহার মনে নূতন এক প্রেরণা জাগিল। রৌদ্র ও জল গ্রাহ্য না করিয়া সে গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরিতে লাগিল। প্রতি গ্রামে তাহারা সাত দিন করিয়া থাকিত। তারপর নূতন দল আসিলে সে স্থান ছাড়িয়া যাইত।

এক গ্রামে করদাতাদের সম্মুখে সত্যাগ্রহ করায়, সে

ধৃত হইল। প্রথমে সে মেদিনীপুর জেলে গেল, পরে ফরিদপুরে স্থানান্তরিত হইল। অবশেষে গান্ধী-আরউইন্ চুক্তি সংঘটিত হইলে সে জেল হইতে মুক্ত হইল।

চৈত্রের এক প্রান্তে সে গ্রামে ফিরিয়া আসিল। পরিচিত পথ-ঘাট কিছুই বদলায় নাই। দুই একটা অপরিচিত মুখ মাঝে মাঝে দেখা যায় মাত্র। পরিচিত যাহাদের সঙ্গে দেখা হইল, সকলেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—"নবীন ফিরলি"! প্রত্যেকের কথাতেই সে মাত্র দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। ক্রমে সে নিজগৃহে উপস্থিত হইল। আসিবার সংবাদ পাইয়া তাহার মা ঘর-বাহির করিতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই ছুটিয়া জড়াইয়া ধরিয়া মস্তক চুম্বন করিয়া বলিল—

"বাবা ফির্‌লি! গয়াদা' যে সে দিন বল্‌ছিল 'বুড়ী তুই কাঁদিস কেন, তুই তো বীরের মা?' তা' সত্যিই, আমি বীরেরই মা বটে!"

নবীনের এদিকে কাণ ছিল না। পরিচিত একটা শব্দ, পদযুগলে একটা মনোরম অনুভূতি—ইহারই জন্য সে দিকে দিকে অস্থির দৃষ্টিপাত করিতেছিল। অবশেষে সত্যই যখন প্রার্থিতের দর্শন মিলিল না, তখন নবীন জিজ্ঞাসা করিল—"মা, ভোলা?"

মাতা বলিল—"আয় বাছা, আগে ঠাণ্ডা হয়ে নে। খাওয়া-দাওয়া কর্, পরে সে সব শুনিস্"!

ভাবী অমঙ্গলের স্পন্দন যেন নবীনের সকল দেহে খেলিয়া গেল। কংগ্রেসের দেওয়া ঝুলি সে কাঁধ হইতে ভূমিতে নামাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—"মা, ভোলা কৈ?"

"আয় বাছা আগে খেয়ে নে। পরে সে সব হবে!"

নবীন তথাপি জিজ্ঞাসা করিল—

"ভোলা কোথায় মা? কি হয়েছে তার!"

"কি আর হবে বাবা! খায় না, দায় না, ঐ এক রকম হয়ে গেল। ডাক্‌লে আসে না, নড়েও না। দিনরাত্তির শুয়েই থাকত। এম্‌নি হ'তে হ'তে একদিন মারা গেল।"

"কি" বলিয়া নবীন মাতার দিকে এক পদ অগ্রসর হইল—"কি বল্‌লে"!

"মারা গেল, আর কি হবে বাবা! আয় উঠে আয়।"

নবীনের চক্ষু সহসা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। অশ্রু-কুয়াসার ভিতর দিয়া প্রাণপণেসে মায়ের দিকে তাকাইয়া বিকৃত স্বরে বলিল—"মারা গেল!" তাহার সকল শরীর কাঁপিতেছে। অর্থ-হীন দৃষ্টি মায়ের প্রতি নিবদ্ধ। ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায়, কোথায় সে?"

"ঐ খেজুর গাছের নীচেই বাছা তাকে কবর দেওয়া হ'য়েছে!"

"খেজুর গাছের নীচে, খেজুর গাছের নীচে" বলিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে নবীন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিল। নীরব, নিস্পন্দ! কোনই সাড়া নাই! কেবল বিস্ফারিত দুইটী আঁখি। যেন বিভীষিকা দেখিতেছে!

তাহার মাতাও তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিছুকাল পরে মৃদুস্বরে বলিল—"নবীন বাবা!" তারপরে নিকটে গিয়া তার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—"আয় বাবা খাওয়া শেষ করে যা!"

একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নবীন বলিল—"চল যাই"

কিন্তু মাতার মুখের দিকে সে আর তাকাইল না। কারণ যে অশ্রু-ধারা বাঁধনহারা হইয়া তাহার গাল বহিয়া নামিতেছিল, তাহা সে দেখাইতে চাহিতেছিল না।
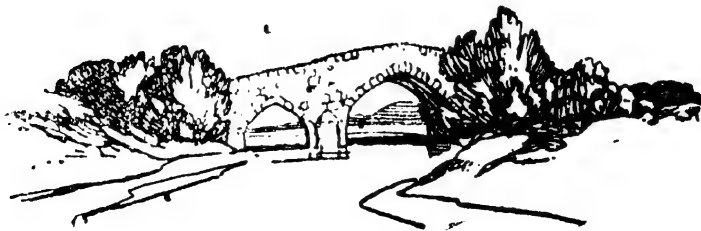
গানে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত

শ্রীসুরেশচন্দ্র কবিরত্ন, সাহিত্যবিশারদ

রবীন্দ্রনাথ—

মনে করিবেন না ভারতের ত্রিমূর্ত্তি বা ত্রিদেবের অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বরের কথা বলা হইতেছে। বঙ্গের বর্ত্তমান সঙ্গীত সাহিত্যের ত্রিমূর্ত্তি বা ত্রিদেবের কথা আলোচিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত, এই কবিত্রয়কে আমরা ত্রিমূর্ত্তি আখ্যা প্রদান করিয়াছি। তিন জনেই প্রায় সমসাময়িক।

সঙ্গীত রচনায় বাঙ্গলা বিশ্বের দরবারে আসন পাইয়াছে। শস্যশ্যামলা বাঙ্গালার আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে এমন একটী বৈশিষ্ট্য আছে যাহা সঙ্গীত রচনার অতিশয় উপোযোগী। সঙ্গীতের ভিত্তি ভাব ও রস। সেই ভাব ও রস বাঙ্গালায় পূর্ণ বিকসিত হইয়াছে। সেই ভাব ও রসের মূর্ত্ত বিগ্রহের নাম শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীগৌরাঙ্গকে বাঙ্গালার প্রাণধর্ম্মের পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্প বলিলেও ভুল বলা হয় না। যে ভাবরাজি ও রসপ্রবাহ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে কেন্দ্র করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহাই আবার সঙ্গীতরূপে বৈষ্ণব-কবিগণের কণ্ঠ-বীণায় বিচিত্র সুরে ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। যদি কেহ বাঙ্গালা জাতির বৈশিষ্ট্য জানিতে চাহেন তবে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন ও বৈষ্ণব কবির সঙ্গীতই তাঁহার প্রধান অবলম্বন। বাঙ্গালার স্বভাবধর্ম্মের মধ্যে একটা অতি করুণ বিরহের সুর বিদ্যমান আছে। কীর্ত্তনের সুরে তাহাই পরিপূর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভাব ও রসের ন্যায় ব্যক্তি বা জাতির জীবনে একটা তত্ত্বের দিক থাকে। সেই তত্ত্বের মধ্যেও সেই জাতির স্বভাবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। একজন মহাপুরুষ বাঙ্গালার এই তত্ত্বচিন্তাকে সঙ্গীতে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিলেন। ইনি সাধক কবি রামপ্রসাদ। সাধক কবি জাতির স্বভাবধর্ম্মের উপযোগী এক সুললিত সহজ সুর আবিষ্কার করিলেন। সেই প্রসাদী সুর সহজতর হইয়া আর এক সুরের সৃষ্টি করিল। তাহার নাম বাউল সুর। বাঙ্গালার কীর্ত্তনীয়া যখন ঘরে ঘরে "নবীন কিশোরী, মেঘের বিজুরী, চমকি চলিয়া গেল" গাহিয়া বাঙ্গালীর রসানুভূতিকে জাগাইয়া তুলিতেছিল, বাঙ্গালার ভিখারী তখন দ্বারে দ্বারে বাউল সুরে "অরূপের রূপের ফাঁদে প'ড়ে কাঁদে প্রাণ আমার দিবা নিশি" গান করিয়া বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক চেতনাকে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। সুতরাং বাঙ্গালার প্রাণধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া দুইটী সঙ্গীত-পদ্ধতি পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, একটী কীর্ত্তন, অপরটী সাধন-সঙ্গীতের একটী পদ্ধতি যাহা হইতে এক দিকে রাম-প্রসাদী গান ও অপর দিকে বাউল গানের শাখা সৃষ্ট হইয়াছে।

বাঙ্গালার কবি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় যতই শিক্ষিত হউন, দেশের স্বভাবধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এই দুইটী সঙ্গীতের ধারা তাঁহার সঙ্গীত রচনার গতিকে সর্ব্বপ্রথম নিয়ন্ত্রিত করিবে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের ভাব-প্রভাবে প্রণোদিত হইয়া সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করেন। প্রাচীন সমাজভুক্ত না হইলেও রক্তগত সংস্কার ও জাতিগত প্রতিভাবলে তিনি রাধা-কৃষ্ণপ্রেম-রসবিহ্বলা শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির বাঙ্গালার প্রাণস্পন্দন অনুভব করিয়াছিলেন। সেই অনুভূতি হইতেই "ভানুসিংহের পদাবলী" প্রভৃতি বৈষ্ণবভাবাত্মক সঙ্গীত সৃষ্ট হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে। নবীন ব্রাহ্ম যুবক হইয়াও শ্যামসুন্দর-প্রণয়-রস-বিভোরা স্বদেশের স্বভাব-ধর্ম্মের প্রেরণায় তিনি গাহিয়াছেন—

"আও আও সজনিবৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ
ভানুসিংহ বন্দিছে।"

বৈষ্ণব সঙ্গীতের পর বৈরাগীর বাউল সুর ভাবুক

রবীন্দ্রনাথের চিত্ততন্ত্রীকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালার স্বচ্ছ আকাশ ও স্নিগ্ধ জল ও স্রোতের মত এই সহজ সুরটীতে কবি বাংলা মায়ের আকুল আহ্বান শুনিতে পাইয়াছেন। তাই এই সুরেই কবি তাঁহার স্বদেশী যুগের জাতীয় সঙ্গীতগুলি রচনা করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন বাঙ্গালীকে কিছু বলিতে হইলে কীর্ত্তনের সুরে বা বাউল সুরে বলিলে তাহার প্রাণে যত শীঘ্র আঘাত করিবে অন্য প্রকারে তাহা তত সহজে হইবে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলির মধ্যে পাশ্চত্য কবির ভাবের প্রেরণা ও প্রতিচ্ছবি থাকিতে পারে, কিন্তু সঙ্গীতে তিনি বাঙ্গালার পুরাতন বাণী নবভাবে ও নূতন ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার সে প্রয়াস সার্থক হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গানে বাঙ্গালী তাহার যুগ-যুগান্তরের সাধনা-লব্ধ সত্যকেই সহজে দেখিতে পাইতেছে। যে ভাবের স্রোত একদিন বিশালাক্ষীর মন্দির-দ্বারে আঘাত করিয়াছিল, তাহাই যুগোপযোগী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে আমরা সেই ভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই বলিয়াই তাহা আমাদিগকে এত মুগ্ধ করিতে পারে।

বাঙ্গালীর ন্যায় "রাধাভাব" বস্তুটীকে আর কেহ আয়ত্ত করিতে পারে নাই। এ ভাবের আর একটী নাম মধুর ভাব। বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য তাহার এই ভাব-বিকাশের পক্ষে সহায় হইয়াছে। বৃন্দাবনের কৃষ্ণার্পিতচিত্তা গোপাঙ্গনা এই মধুর-ভাবের জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেও ইহার মূর্ত্ত বিগ্রহ বাঙ্গালার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। চণ্ডীদাসের গানে ও শ্রীচৈতন্যের জীবনে আমরা এই ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। বাঙ্গালার আত্মা এই ভাবের ভিতর দিয়াই তাহার ঈপ্সিতকে অনুসন্ধান করিয়াছে। বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথও এই মধুর ভাবের উপাসক, এই মধুর-ভাবের কবি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বিশ্বাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মানবাত্মার বা শ্রীরাধিকার মিলনাকাঙ্ক্ষার বাণী ছন্দে ও সুরে মন্দ্রিত হইয়া উঠিয়াছে। মধুর ভাবের উপাসক রবীন্দ্রনাথ সেই বিশ্বাত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে,
ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হ'তে চিত্তে বিহার
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে।"

"নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে" এই বাক্যটীতে মধুর ভাবাত্মক লীলা-তত্ত্বের সমগ্র রহস্যটীই নিহিত আছে, লীলারসবিদ্ বৈষ্ণব-সাধকেরা সে রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

চিরকাল ধরিয়া মাধুর্য্যামৃতসিন্ধু নিখিলাত্মা শ্রীভগবানের বংশী আমাদিগকে আকুল স্বরে আহ্বান করিতেছে, ভক্ত ও ভাবুকেরা ভাবকর্ণে রস-রহস্যময় ভগবানের সেই বিশ্বচিত্তাকর্ষিণী বাঁশরী শুনিতে পান। ভাবুকশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ রহস্যময়ের সেই সঙ্গীতময় আহ্বান শুনিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার "অন্তরবাসিনী বিরহিণী রাধা" সেই আহ্বানে আকুল হইয়া গায়িয়াছিল—

"কি সুর বাজে আমার প্রাণে, আমি জানি মনই জানে।
কিসের লাগি সদাই জাগি, কাহার কাছে কি ধন মাগি,
তাকাই কেন পথের পানে, আমিই জানি মনই জানে।
দ্বারের পাশে প্রভাত আসে, সন্ধ্যা নামে বনের বাসে,
সকাল-সাঁঝে বংশী বাজে, বিকল করে সকল কাজে,
বাজায় কে যে কিসের তানে, আমিই জানি মনই জানে।"

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মধুর মুরলীমন্ত্রে ব্রজাঙ্গনার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেন। তাহারা জল আনিবার ছলনা করিয়া মিলনাকাঙ্ক্ষায় কলসীকক্ষে যমুনাতটে গমন করিত। দিনান্তের শান্ত ছায়ালোক ধরার বুকে ছড়াইয়া পড়িলে দিগন্তের কোল হইতে অনন্তের আহ্বান আসিয়া আমাদের অন্তরাত্মাকে নিত্য তেমনই আকুল করিয়া তুলে।

"আর নাই রে বেলা, নাম্‌ল ছায়া, ধরণীতে,
এখন চল রে ঘাটে কলসখানি ভ'রে নিতে।
জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যা-গগন আকুল করে,
ওরে ডাকে আমায় পথের পরে সেই ধ্বনিতে।
এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা-যাওয়া,
প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ উতল হাওয়া,
জানি না আর ফিরব কি না, কার সাথে আজ হবে চিনা
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে।"

কবি এখানে দ্বাপরের মুরলীমন্দ্রাকুলা পূর্ব্বরাগ-বিহ্বলা গোপাঙ্গনার ভাষাতেই অনন্তের আহ্বানে স্বীয় অন্তরের বিরহ-ব্যাকুলতার বাণীকে অভিব্যক্তি প্রদান করিয়াছেন। পার্থক্যের মধ্যে কবি 'বেণু'র স্থানে 'বীণা' ও 'কদম্বমূলের' স্থানে 'তরণী' কল্পনা করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-প্রতিভা বিভিন্ন রূপে ফুটিয়া উঠিয়াও পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে গীতি কবিতায়। তাঁহার অন্তরতম স্বরূপ বা প্রকৃতি সঙ্গীতেই অভিব্যক্ত। মানব-চিত্তের বিরহানুভূতি ও মিলনানন্দ উভয়কেই রবীন্দ্রনাথ ভাব-গভীর ও স্নিগ্ধ মধুর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। চিন্তাশীল কবি চিরজীবন রূপের মধ্যে অরূপকে এবং প্রকৃতির মধ্যে পুরুষকে অনুসন্ধান করিয়াছেন। জগৎ জুড়িয়া যে অনন্ত সঙ্গীত সমুত্থিত হইতেছে, কবি যেন দিব্য কর্ণে তাহা শুনিয়াছেন। কবি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সত্য-শিব-সুন্দরের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া গায়িয়াছেন—

"শান্ত হওরে মম চিত্ত নিরাকুল, শান্ত হওরে ওরে দীন,
হের চিদম্বরে, মঙ্গলে সুন্দরে, সর্ব্বচরাচর লীন!
শুনরে নিখিল হৃদয়-নিস্যন্দিত, শূন্যতলে উথলে
জয়-সঙ্গীত!
হের বিশ্ব চির প্রাণ-তরঙ্গিত, নন্দিত নিত্য নবীন।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিব। কবি পরম দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"আমারে কর তোমার বীণা, লহ গো লহ তুলে,
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে।"

কিংবা

"প্রতিদিন তব গাথা গাবি আমি সুমধুর
তুমি মোরে দেহ কথা, তুমি মোরে দেহ সুর।"

দেবতা কবির সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। কবির শান্ত-সুন্দর জীবনটী একখানি বীণাযন্ত্রে পরিণত হইয়াছে, যাহা হইতে নিত্য নব নব সুরে নব নব ছন্দে বন্দনা-গীতি উত্থিত হইয়া বিশ্ব-দেবতার সিংহাসন তলকে মুখরিত করিয়া রাখিতেছে এবং শুধু বাঙ্গালীর নহে বিশ্ববাসীর কর্ণ-কুহরে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়াছে। চিন্তাশীল কবির প্রত্যেক গভীর চিন্তা সঙ্গীত রূপে ঝঙ্কৃত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে বিশ্ব-বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের ন্যায় বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যকেও ক্লাসিক ও রোমান্টিক দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে। কবি-গুণাকর ভারতচন্দ্র বাঙ্গালার ক্লাসিক-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তে আসিয়া বাঙ্গালার ক্লাসিক যুগের প্রায় শেষ হইয়াছে। গুপ্ত কবির একজন শিষ্য তাঁহার পরেও প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে কাব্য রচনা পূর্ব্বক যশস্বী হইয়াছিলেন। আমরা কবি রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানের কথা বলিতেছি। মাইকেল মধুসূদন বঙ্গীয় কাব্য জগতে রোমান্টিক যুগের প্রবর্ত্তক। রবীন্দ্রনাথে আসিয়া এই "রোমান্টিসিজ্‌ম্‌" বা ভাব-প্রাধান্য পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া "মিষ্টিসিজ্‌ম্‌" বা রহস্য-প্রাধান্যের আকৃতি ধারণ করিয়াছে। 'ক্লাসিক'-যুগের বৈশিষ্ট্য, ভাব অপেক্ষা ভাষার কারুকার্য্য বা শব্দ-সংযোজন কৌশলের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখিত। ক্লাসিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবিরা সকলেই সুনিপুণ শব্দ-শিল্পী ছিলেন। তারপর রোমান্টিক যুগের প্রবর্ত্তনের পর কাব্য-জগতে ভাষার উপর ভাবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই ভাব ক্রমশঃ নিবিড়তর হইয়া তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া "মিষ্টিসিজ্‌ম্‌" রূপে পরিণত হইল। সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়াই এখন কাব্য-জগতে এই রহস্যবাদের যুগ চলিতেছে। রবীন্দ্র-গুরু বিহারীলাল বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে এই মিষ্টিসিজ্‌মের আভাস প্রথম লইয়া আসেন। রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় রহস্য-লোকের বিচিত্র সৌন্দর্য্য আনিয়া বঙ্গীয় কাব্য-লক্ষ্মীর বরাঙ্গকে অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা পাশ্চাত্য কবির আদর্শে রচিত হইলেও তিনি তাঁহার প্রাচীন ভাব-ভাণ্ডার হইতে সঙ্গীতের আদর্শ ও প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতের মধ্যে আমরা যে "মিষ্টিসিজ্‌ম্‌" বস্তুটী প্রাপ্ত হই উহা পাশ্চাত্য কাব্যের নহে, বৈষ্ণব-সাহিত্য ও উপনিষদ্ হইতে এই ভাব তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে।

উপনিষদে ও আরণ্যকে প্রাচীন ঋষিরা সত্য ও শাশ্বত তত্ত্ব সমূহকে রহস্যময়ী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাল্যকাল হইতেই এই ভাব-গম্ভীর তত্ত্ব-বাণী-সমূহ প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের বহু সঙ্গীতে আমরা প্রাচীন ভারতের সেই

জ্ঞান-গম্ভীর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। বিশ্ব-বৈচিত্র্য-দর্শনে বিস্ময়রসমগ্ন চিন্তাশীল মানবের চিরন্তন প্রার্থনা ও কামনাও তাঁহারি বহু সঙ্গীতে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। আবার কতকগুলি সঙ্গীত বিশ্বদেবতার উদ্দেশে ভক্ত ও ভাবুকের ভাব-গভীর ছন্দ-সুন্দর আত্ম-নিবেদন। ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, রস-তৃষাতুর আনন্দ-বুভুক্ষু, মুক্তিকামী মানবাত্মার অন্তরতম প্রদেশের রহস্যময়ী বাণীকে ভাষায় অভিব্যক্ত করিতে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কবি অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

ভারত চিরকাল প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করিয়াছে, মোক্ষের সন্ধানে সাদরে দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছে, যুগে যুগে তাহার কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইয়াছে "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতম্ গময়"। রবীন্দ্রনাথও ভারতের সেই চিরন্তন প্রার্থনাকে রূপান্তরিত করিয়া গায়িয়াছেন—

"অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে!
নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর কর হে
জাগ্রত কর, উদ্যত কর, নির্ভয় কর হে!"

যখন সমগ্র পৃথিবী অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ও আত্ম-বিস্মৃত সেই প্রাচীনতম যুগেও ভারতের ঋষি গুরু গম্ভীরকণ্ঠে গায়িয়াছিলেন—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ
কবয়ো বদন্তি॥"

মানবাত্মা যে পথ দিয়া অন্ধকারের পরপারে গমন করিয়া তাহার চির-বাঞ্ছিতকে লাভ করিবে সে পথ চিরদিনই অতিশয় দুঃখসঙ্কুল ও দুর্গম। এই দুঃখসঙ্কুল দুর্গম পথের উপর দিয়াই প্রেম-মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া আনন্দময়ের সহিত মিলিত হইতে হয়, সেখানে যাইবার অন্য কোন পন্থা বিদ্যমান নাই। বর্ত্তমান যুগের রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাচীন ঋষি-কণ্ঠোচ্চারিত উদ্বোধিনী বাণীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গায়িয়াছেন—

"জাগ নির্ম্মল নেত্রে, রাত্রির পরপারে।
জাগ অন্তর-ক্ষেত্রে, মুক্তির অধিকারে।
জাগ দুর্গম যাত্রী দুঃখের অভিসারে।
জাগ স্বার্থের প্রান্তে প্রেম মন্দির দ্বারে।"

ভগবানের দয়া দুঃখরূপে আসিয়া ভক্তকে পরীক্ষা করে। ভগবানের দুঃখের মুখোস-পরা রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া যাহারা ভয় পায় তাহারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। সে মুখোসের অন্তরালে যে মমতা-মধুর মুখখানি লুকাইয়া থাকে তাহার দর্শন লাভের সৌভাগ্য তাহাদের ঘটে না। সেই 'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং' মুখের অভ্যন্তরে ভক্ত ভাব-নেত্রে "সৌম্যা-সৌম্যতরাশেষা সৌম্যেভ্য-স্বতিসুন্দরী" মাতৃমূর্ত্তিকে দেখিতে পান। ভক্ত রবীন্দ্রনাথ ভগবানের সেই ভৈরব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভাবভরে গায়িয়াছেন—

"দুঃখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে,
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করি ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে, স্বামি, তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণ রূপে আসিলে, সখা, চরণে ধরি মরিব হে।"

আনন্দময় চিরসুন্দর ভগবান নিবিড় দুঃখান্ধকারের মধ্য দিয়াই আমাদের নিকট শুভাগমন করেন। দুঃখাগ্নির তীব্র তাপে আমাদের অন্তরের আবর্জ্জনারাশি নিঃশেষে দগ্ধ হইলে সেই নির্ম্মল হৃদয়ে সত্য-শিব-সুন্দর আবির্ভূত হন। তাই কবি গায়িয়াছেন—

"কত কালের ফাগুন দিনে, বনের পথে,
সে যে আসে আসে আসে!
কত শ্রাবণ অন্ধকারে, মেঘের রথে,
সে যে আসে আসে আসে।
দুঃখের পরে পরম দুঃখে
তারি চরণ বাজে বুকে,
"সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয় পরশমণি।"

সত্যই তিনি আসিতেছেন! যুগে যুগে পলে পলে দিবা-রজনী তিনি ক্রমশঃ নিকট হইতেই নিকটতর হইতেছেন! আমরা তাঁহার দিকে চলিয়াছি, তিনি আমাদের দিকে আসিতেছেন! এক পরম শুভমুহূর্ত্তে সেই প্রেম-

ময়ের সঙ্গে আমাদের অতি মধুর মিলন-লীলা সঙ্ঘটিত হইবে। আমাদের জীবনস্রোত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়া সেই মহান্ মিলন মুহূর্ত্তের আশায় ব্যাকুল বেগে বহিয়া চলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত রচনায় সাধারণতঃ ভাষা অপেক্ষা ভাবের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখিয়াছেন। তবে যেখানে তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন ভাষা অনুগতা দাসীর ন্যায় তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছে। ভাবকে খর্ব্ব করিয়া ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাঁহার কোনও কোনও সঙ্গীতে ভাব, ভাষা ও ছন্দ তিনই পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত অপূর্ব্ব শোভায় বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। যথাঃ—

"তুমি সুন্দর হৃদি-রঞ্জন, তুমি নন্দন ফুলহার।
তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার।
নীল অম্বর চুম্বননত, চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘে'রি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে অনিবার।" ইত্যাদি

ভাষার এইরূপ ঐশ্বর্য্য ও ঝঙ্কার বৈষ্ণব-পদাবলী ব্যতিরেকে অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথের সম-সাময়িক একজন কবি সঙ্গীতে এইরূপ ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা তাঁহার কথা পরে বলিব। "জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা" সঙ্গীতটীও রবীন্দ্র-নাথের শব্দ-সংযোজন নৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। ভাষার উপর কবির কতদূর অসাধারণ অধিকার তাহা আমরা তাঁহার কতকগুলি কবিতা হইতেই বুঝিতে পারি। সঙ্গীতের মধ্যে তিনি সাধারণতঃ সরল ভাষায় সহজ ভঙ্গীতে অন্তরতম প্রদেশের গভীরতম অনু-ভূতিকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন; একখানি জাতীয় সঙ্গীতে কলা-কুশলী কবি ভাবের স্রোতে ছন্দের তালে তালে ভাষাকে নৃত্য করাইয়া ভুবন-মোহিনী ভারত মাতার মহিমময়ী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন—

"অয়ি ভুবন মনোমোহিনি!
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্য করোজ্জ্বল ধরণী,
জনক-জননী-জননী!
নীল-সিন্ধু-জল ধৌত চরণতল,
অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র তুষার-কিরীটিনী!"

বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেম ও ভগবৎ প্রেমের সমপর্য্যায়ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের চখে দেশমাতৃকায় ও বিশ্বজননীতে কোনও পার্থক্য নাই। তাই তিনি স্বদেশা-নুরাগে তাঁহার স্বভাবসুলভ সহজ ভাষায় গাহিয়াছেন :—

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচলপাতা।"

ক্রমশঃ

যবনিকা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীহরিপদ গুহ

—চব্বিশ—

বিনোদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া পথে ভোলানাথবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইল। কিরণের এইরূপ নীচ ব্যবহারে সেও খুব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে দেখিলাম; হইবারই কথা। সত্যই কিরণের মন যে এত ছোট তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই; সমস্ত অন্তরটা তাহার প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল।

ভোলানাথবাবু বলিলেন, 'নিমন্ত্রণ করে এ'ভাবে আমাদের অপমান করবার কি প্রয়োজন ছিল? বিনোদের এমন কোন মারাত্মক অসুখ নয় যে, বাজার থেকে দু'টো মিষ্টি আর এনে দেওয়া যায় না? সে নিজে তো কোন ব্যবস্থাই আমাদের জন্য করলে না, হিরণ যদিও বা কিছু আয়োজন করলে, কোথায় তার কাছে সে কৃতজ্ঞ থাকবে, না উল্টে তাকেই আবার অপমান।'

মানুষ এমনই অকৃতজ্ঞ বটে!

আমি ম্লান কণ্ঠে বলিলাম, 'হঠাৎ আমাদের আস্‌তে বলে, কেন যে সে এ'রকম ব্যবহার করলে বুঝ্‌তে পারলুম না ভোলানাথবাবু। তার চিঠি পেয়ে বাড়ীতে মিথ্যা কথা বলে আমাকে এখানে আস্‌তে হ'য়েছে; নইলে আরও দশ-বার দিন আমি সেখানে থেকে আস্‌তে পারতুম।'

ভোলানাথবাবু বলিলেন, 'আমি তো ভাই, এদের কাছে জীবনে আর কিছু খাব না কোন দিন।' বলিয়া তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

মামীমার স্নেহ-শীতল-বক্ষ হইতে এ'ভাবে হঠাৎ চলিয়া আসায় আজ আমার সত্যই খুব অনুশোচনা হইতেছিল। সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল—কিরণের উপরে। ছিঃ ছিঃ এত নীচ সে! ভাবিয়া দেখিলাম—ওদের কাছে আর না যাওয়াই উচিত।

সংসারে মানুষ চেনা কঠিন।

দারুণ আঘাতে মনটা আমার একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি বিছানা করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

কত কথাই আজ মনে পড়িতেছিল; মল্লিকা, যে আমার জীবনে প্রথম-সূর্য্যোদয়ের মত আসিয়াছিল; মুহূর্ত্তের জন্য আঁধার মনের কক্ষগুলি উজ্জ্বল করিয়া দিয়া অস্তমিতা হইয়া গেল। কতই বা বয়স তাহার? ইহারই মধ্যে সে কি অভিনয়ই না করিল। নারী এমনই রহস্যময়ী বটে।

তারপর ধূমকেতুর মত আসিল কিরণ। দু'দিনের পরিচয় তাহার সহিত, ইহারই মধ্যে সে আমাকে মুগ্ধ করিয়া আপন করিয়া লইল। তারপর ভোলানাথবাবুর গল্প লেখার পর হইতে ধীরে ধীরে সে কেমন সরিয়া পড়িতে লাগিল। পর-পর সবগুলি ঘটনা বায়স্কোপের ছবির মত আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

পুরুষ এমনই মূর্খ। পতঙ্গের মত, যে আগুনে পুড়িয়া মরে, তাহারই পিছনে ছুটিয়া যায়।

বার বার ঠকিয়াও কিন্তু আমার শিক্ষা হইতেছিল না। নহিলে সামান্য একখানি চিঠিতেই নিজেকে এমন করিয়া হারাইয়া ফেলিব কেন? কি প্রয়োজন ছিল, তাড়াতাড়ি এখানে ছুটিয়া আসিবার? নিজেরও তো বোন ছিল, কই, সে তো আমাকে আহ্বান করে নাই। তবে কেন অমন করিয়া আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া মরি?

কিরণের কাছে তো আমি কোন অপরাধই করি নাই; তবে কেন সে আমাকে এমন করিয়া অপমান করিল?

আগের দিন ট্রেণে ঘুমাইতে পারি নাই, ভাবিয়াছিলাম—দিবানিদ্রা দিয়া শরীরটা একটু ভাল করিয়া লইব, বন্ধ

সাধ্য-সাধনা করিয়াও কিন্তু ঘুমাইতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

কিরণের এই অপমানটা কিন্তু আমার কাছে 'শাপে বর' হইয়াছিল। এতদিন যেমন পড়িতে পারি নাই, এ কয়দিন তেমনই খুব মনোযোগের সহিত পড়িয়াছিলাম; অবশ্য পরে ইহার ফলও বেশ ভালই হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে আমি আর বিনোদদের বাড়ী যাই নাই, আর যাইবার কোন মোহও ছিল না।

একদিন পথে ভোলানাথবাবুর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। এতদিন বিনোদের বাড়ী যাই নাই বলিয়া তিনি বহু অনুযোগ করিয়া বলিলেন, 'যাবেন না কেন মণিবাবু? আমিও তো যাচ্ছি, যা নিয়ে অপমান, কিছু না গেলেই হলো!'

আমি কোনই উত্তর দিলাম না, মুখ টিপিয়া একটু হাসিলাম মাত্র। এত শীঘ্র এবং এত সহজে যে, ভোলানাথ-বাবু অতবড় অপমানটা ভুলিয়া যাইতে পারিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া আমার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

তাহার কাছেই খবর পাইলাম—হিরণরা চলিয়া গিয়াছে। বিনোদ বেশ ভালই আছে, আমি না যাওয়ায় সে খুব দুঃখিত। বৌদি এখনো আসেন নাই, তাঁহার মায়ের অসুখ না কি খুব বাড়িয়াছে।

বৌদির জন্য সময় সময় মনটা কেমন করিয়া ওঠে। তিনি সত্যই আমাকে অন্তরের সহিত স্নেহ করেন। আমিও তাঁহাকে মনে প্রাণেই শ্রদ্ধা করি। আজ যদি বৌদি এখানে থাকিতেন, তবে হয় তো আমার অন্তর-বেদনা একটু লাঘব হইত।

আমার অনাদৃত উপেক্ষিত জীবনে শুধু এই একজনকেই পাইয়াছিলাম, যাঁহার স্নেহধারা হইতে আমি বঞ্চিত হই নাই।

সেদিন বিনোদ আসিয়া ধরিয়া বসিল, 'যা হ'য়ে গেছে, ভুলে যাও ভাই, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি! যেতেই হ'বে তোমায়—আমাদের ওখানে!'

বিব্রত হইয়া পড়িলাম।

বিনোদকে আঘাত দিতে ইচ্ছা হইল না। বলিলাম, 'এখন মানসিক অবস্থা বড় চঞ্চল, কিছুদিন যাক্ ভাই!'

সে আর অনুরোধ করিল না।

লক্ষ্য করিলাম—আমি আবার তাহাদের ওখানে যাইব শুনিয়া আনন্দে তাহার মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

—পঁচিশ—

বছরখানেক পরের কথা।

ইহারই মধ্যে অনেকখানি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। আমি প্রথম বিভাগে আই এ পাশ করিয়া বি এ পড়িতেছিলাম।

মল্লিকাদের আর কোন খবরই আমি রাখি নাই; রাখা প্রয়োজন মনে করি নাই।

বিনোদ এবং বৌদির অনুরোধে বার কয়েক তাহাদের বাড়ী গিয়াছিলাম, কিন্তু নিজেকে কিছুতেই আর পূর্ব্বের মত মিশ খাওয়াইতে পারি নাই। ফলে, তাহাদের কাছে খালি অবহেলাই পাইয়া আসিয়াছি। তা' ছাড়া ভোলানাথ-বাবু এবং আমাকে তাহারা বিভিন্ন ভাবে দেখিত। কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ দুই জনে? তাহার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে আমার হিংসা হইত। এ'ভাবে আর কতদিন চলে? কাজেই সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া একদিন আমি সরিয়া পড়িলাম। কোন আকর্ষণই আমাকে আর ফিরাইতে পারে নাই। তাহাদের অভিনয় শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমি সেখানে যবনিকা ফেলিয়া দিয়াছিলাম।...

সে'দিন ট্রামে হঠাৎ মল্লিকার বাবার সঙ্গে দেখা। আমি তাঁহাদের ওখানে আর যাই না বলিয়া তিনি খুব দুঃখ করিলেন। তারপর তিনি ব্যথা-ভরা কণ্ঠে যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। পলাশ না কি আর কোথায় বিবাহ করিয়া বিলাত চলিয়া গিয়াছে। উপযুক্ত পাত্রের অভাবে মল্লিকার বিবাহ এখনও হয় নাই।

একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক এত নীচ হইতে পারে! মাতাপিতার সামান্য একটু ভুলে, সংসারে এই রকম কতই না ক্ষোভের কারণ ঘটিতেছে। মল্লিকার আর কি দোষ দিব? মা-বাপের উৎসাহ না পাইলে, সে অতটা সাহস পাইত না, ইহা অতি সত্য কথা। স্ত্রী-পুরুষে এভাবে

মেলা-মেশা যে, কি ভীষণ তাহা অনেক পিতামাতাই বোঝেন না।

মল্লিকার জন্য মনটা বড়ই বেদনাতুর হইয়া উঠিল।

নামিবার সময় তিনি তাঁহাদের বাড়ী একদিন যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়া গেলেন।

মল্লিকার স্মৃতিটা নূতন করিয়া আমার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছিল। পলাশ যে এত হীন, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া একটী বালিকার সর্ব্বনাশ করিয়া গেল, ইহা ভাবিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মনে মনে স্থির করিলাম—একদিন মল্লিকার সহিত দেখা করিয়া তাহার মনের কথাটা জানিয়া লইলে হয় না? পরমুহূর্ত্তেই ভাবিলাম, আমার কি মাথা ব্যথা, দরকার কি আমার আবার সেখানে যাইবার!

যে কারণেই হউক, মল্লিকা পলাশকে অন্তরের সহিতই গ্রহণ করিয়াছিল, মন-প্রাণ দিয়াই ভালবাসিয়াছিল কিন্তু প্রতিদানে সে তাহার কাছে খুব শিক্ষাই পাইল!

ইদানীং আমি আর কোথাও বড় একটা বাহির হইতাম না; আমার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া হোষ্টেলের বন্ধুর দল মধ্যে মধ্যে টিপ্পনী কাটিত। কি করিব? হাসি মুখেই আমাকে তাহাদের সমস্ত বিদ্রূপ-বাণ সহ্য করিতে হইত!

মল্লিকা এবং কিরণদের সঙ্গ-সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া আমার দিন একরকম বড় মন্দ কাটিতেছিল না। প্রথম দিনকতক খুবই কষ্ট হইয়াছিল, একা-একা মোটেই ভাল লাগিত না। সর্ব্বদা বেজার হইয়া থাকিতাম।

দুই-একদিনের মধ্যেই কিন্তু আমি পথের সন্ধান পাইলাম। আঘাত পাইয়া আমার লেখনীর উৎস খুলিয়া গিয়াছিল, কাজেই মনের গতি ফিরাইয়াছিলাম ঐদিকে। গল্পে এবং কবিতায় খাতার পাতাগুলি ভরিয়া ফেলিয়াছিলাম। লেখা প্রকাশের জন্য এখন আর ব্যস্ত ছিলাম না; নীরবে শুধু লিখিয়াই যাইতেছিলাম।

কিরণ এবং বৌদিকে লইয়া ভোলানাথবাবুও 'কল্লোলিনী'র প্রায় প্রতি সংখ্যা ভরিয়া তুলিতেছিলেন। কিরণকে দিয়া জোর করিয়া গল্প লেখাইয়া, নিজে সংশোধন করিয়া 'কল্লোলিনী'তে প্রকাশ করিতেছিলেন। নানা কৌশলে মায়াজাল বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে তিনি সকলের চিত্তই জয় করিয়া লইতেছিলেন।

ভোলানাথবাবু ছলনার দ্বারা আমার যতই অপকার করিয়া থাকুন না কেন এক বিষয়ে তিনি আমার উপকার করিয়াছিলেন যথেষ্ট। আমি খুব সরল এবং সহজভাবেই সকলের সঙ্গে মিশিতেছিলাম; তিনিই আমাকে মানুষ চিনিবার কৌশলটুকু শিখাইয়া দিয়াছিলেন। এইখানেই তিনি মস্ত ভুল করিয়াছিলেন। নিজেকে আমার কাছে ধরা দিয়া ফেলিয়াছিলেন।

দু'দিনেই কিন্তু আমার চক্ষু খুলিয়া গিয়াছিল, ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম,—তাহার গলদ কোথায়?

কিরণের 'মনের কথা' সুরুচি মধ্যে মধ্যে বিনোদদের বাড়ী বেড়াইতে আসিত। ভোলানাথবাবুর শ্যেন-দৃষ্টি পড়িয়াছিল তাহারই উপরে। কিরণকে দূতী করিয়া, তাহার সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টায় তিনি ব্যস্ত ছিলেন। ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে গোপন ছিল না; সেইজন্য তিনি এই সময়ে আমার সঙ্গে মিশিবার খুবই চেষ্টা করিতেন।

এক সময়ে তিনি গল্পে আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া আমাকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে হেয় করিবার যে জঘন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার ভয়, পাছে এই সুযোগে আমিও তাহার প্রতিশোধ লই। আমি কিন্তু সে'দিক দিয়া মোটেই গেলাম না। যখন ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল হইয়া আসিতেছিল, তখন একদিন আমিই সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়া তাহার পথ প্রশস্ত করিয়া দিলাম।

তাঁহার একটা মহা ভাবনা কাটিয়া গেল, তিনি উল্লসিত হইয়া উঠিলেন।

যবনিকার অন্তরালে তাহাদের যে লীলাখেলার সুরু হইল তাহার শেষ কোথায় কবে কি ভাবে হইবে কে জানে!

—ছাব্বিশ—

গ্রীষ্মের ছুটীতে সুষমা-মণ্ডিত ছায়া-শীতল গ্রামখানিতে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।

মনে মনে আশা করিয়াছিলাম—মামীমার স্নেহ-শীতল

মঙ্গল-স্পর্শে আমার বঞ্চিত-তৃষিত-হৃদয়ে হয় তো একটু শান্তি পাইব ! কিন্তু এ'কি হইল ? মামীমা যেন আমার কাছে আর সঙ্গে আসিতে চান্ না, নিজেকে সর্ব্বদা দূরে দূরে রাখিয়া চলেন। আমি কিন্তু কারণটা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কেন এমন হইল, কে জানে ? মনে হইল :—

—'অভাগা যেদিকে চায়,
সাগর শুকায়ে যায় ।'—

সুখদা সকল বিষয়ে আমার তদারক করিত। সে একদিন ফিস্ ফিস্ করিয়া আমাকে বলিল, 'তোমার যে ভাই হ'বে, মা-ঠাকরুণ তোমার কাছে বেরোয় না ; তার বড় লজ্জা করে কি না !'

মামীমার এই পরিবর্ত্তনের কারণটা জানিতে পারিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম। মনে মনে খুব উল্লাসিত হইয়া উঠিলাম। মামাবাবুকে এই জন্যই আজকাল এত প্রফুল্ল দেখি ! আনন্দেরই কথা বটে !

একটী পুত্র লাভের জন্য মামা-মামী কত কাণ্ডই না করিয়াছিলেন ; কিছুতেই যখন কিছু হইল না, তখনই তাঁহারা আমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন দারুণ হতাশায় তাঁহারা তখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন। এতদিন পরে অধিক বয়সে মামীমা যখন সন্তান-সম্ভাবিতা হইলেন, তখন তাঁহাদের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

ঈশ্বরের কি অদ্ভুত লীলা ! যখন দেন এমন করিয়া দেন, কাহারও যাচ্‌ঞার অপেক্ষাই আর রাখেন না।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমার ঘরে শুইয়া কি একখানি বই পড়িতেছিলাম ; ধীরে ধীরে শচীনের মা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে আমার পাশটীতে বসিয়া পড়িয়া কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিল, 'এবার্ তোমার আদর ঘুচ্‌ল মণি ! আমাদের আর কি ? আজ আছি, কাল নেই। তোমার মামীমা তো পোয়াতি। মাস ছয়েক ধরে কি কাণ্ডই না হচ্ছে ! একজন সন্ন্যাসী এসে, কত পুজো-অর্চ্চা, জপ-তপ করে বলে গেছে—ছেলে না কি হ'তেই হ'বে তোমার মামীর। একেই বলে, সাক্ষাৎ দেবতা ! হলোও তো তাই। দুটো মাস যেতে না যেতেই সন্ন্যাসীর কথা সত্য হলো।'

আমি হাসিয়া বলিলাম ; 'বেশ তো ভালই হ'য়েছে, মামীর মনে কি কম কষ্ট ছিল !'

শচীনের মায়ের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

সে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল ; 'সে কি রে মণি, আমাকে যে তুই অবাক করলি ? তোর কি অবস্থা হ'বে—কিছু বুঝ্‌তে পারচিস্ ?'

আমি মনে মনে একটু বিরক্তই হইয়াছিলাম ; এই অপ্রিয় আলোচনাটা আমার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, 'বোঝবার আর কি আছে ? মামীমার যদি দুটী ছেলে থাক্‌ত, একটীকে কি আর তিনি ফেলে দিতে পারতেন ?

শচীনের মা হাসিল। তারপর গম্ভীর ভাবেই বলিল ; 'নিজের ছেলে আর পরের ছেলে, অনেক তফাৎ রে মণি ! একদিন আমার কথা তুই বুঝ্‌তে পারবি, দেখিস।' বলিয়া গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

আমি স্তব্ধ হইয়া বিষয়টা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। মামীমা কি সত্যই আমাকে একেবারে পর করিয়া দিতে পারিবেন ? এতদিনকার এত স্নেহ-যত্ন ভালবাসা সব কি তিনি ভুলিয়া যাইতে পারিবেন ? অসম্ভব ! আর যদি সত্যই তিনি সব ভুলিয়া যান, তাহাতে আমার দুঃখ করিবার কি আছে ? তিনি আমাকে যাহা করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। এতটাই বা কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে ? এমনই কত কি ভাবিতেছিলাম।

হঠাৎ একদিন আমার মা-বাবা আসিয়া উপস্থিত। মামীমা যে সন্তান-সম্ভাবিতা এই শুভ-সংবাদটা গোপন ছিল না ; অত দূরে তাঁহাদের কানে গিয়াও পৌছিয়াছিল ; তাই তাঁহারা আনন্দের আতিশয্যে এখানে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন।

এতদিন পরে তাঁহাদের দেখিয়া মামা-মামী খুব খুসী হইলেন, আমি মনে মনে উল্লসিত হইয়া উঠিলাম। মা আমার কাছে আসিয়া বলিলেন ; 'কিরে মণি' কেমন

আছিস্ অনেক খানি বড় হ'য়েছিস যে? ভুলেও কি একবার মা-বাপের কাছে যেতে নাই রে?'

কথাটা আমাকে আঘাত করিল।

ভুল কাহার? তাঁহারা তো সন্তানের সমস্ত দাবী-দাওয়া শেষ করিয়া দিয়াছেন। এতদিনের মধ্যে কোন খবরই লন নাই আমার! আজ এ'কথা বলিলে চলিবে কেন?

তাঁহাকে বলিব র আমার কি আছে? চুপ করিয়া রহিলাম। অভিমানে আমার সমস্ত অন্তর ভরিয়া গেল।......

মামীমার সন্তান হইবে জানিয়া মা মুখে খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেও মনে মনে কিন্তু একেবারে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছিলেন। তাঁহার এতদিনের সঞ্চিত আশা-মুকুল এমনই করিয়া ঝরিয়া পড়িবে তাহা কে জানিত?

মা-বাবার গোপনে অনেক কথাই হইত। সে'দিন স্পষ্ট শুনিলাম—মার কি একটা কথার উত্তরে বাবা বলিতেছেন 'নিরাশ হ'বার এখনো কোন কারণ নেই! ছেলে হয় কি মেয়ে হয় তারো কিছু এখনও ঠিক্ নেই, তারপর বেঁচে-বর্ত্তে থাকে তবে তো?'

মা বলিলেন; 'আমি সেই জল-পড়ার ব্যবস্থাটাও করেছি, দেখা যাক্ কি হয়।'

আমি একেবারে শিহরিয়া উঠিলাম। স্বার্থের জন্য মানুষ এমন হইতে পারে? দারুণ বিতৃষ্ণায় অন্তরটা আমার ভরিয়া গেল। এ বড় হওয়ার অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া খাওয়াও শ্রেয়। মা-বাবার এ ব্যবহারে আমার মন একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মনে মনে স্থির করিলাম—কিছুতেই এতবড় অঘটন ঘটিতে দিব না। যেমন করিয়াই পারি, তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতে হইবে।......

মার সঙ্গে শচীনের মায়ের খুব ভাব হইয়া গেল; গঙ্গা-যমুনার মতই দুইজনে মিশিয়া গিয়াছিলেন। রাত-দিন দুইজনে গোপনে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি সব কথা হইত!

তাঁহাদের এই গোপন পরামর্শের ইতিহাস আর কেহ না জানিলেও আমি জানিতাম; এবং জানিতাম বলিয়াই মনে মনে শিহরিয়া উঠিতাম। সুদক্ষ-ডিটেকটিভের মতই আমি তাঁহাদের গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলাম।

স্থির করিলাম এই অপ্রিয় আলোচনার এখানেই করিয়া দিব। শুধু এইটুকু বলিয়া রাখি,—আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। মামীমার অনাগত শিশুটীকে নষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা একজন মুসলমান ফকিরের শরণাপন্ন হইয়া তাহার কাছ হইতে জল পড়া আনিয়া মামীমার শয্যার কাছে রাখিয়া আসেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, মামীমা রাত্রিতে জল খান। আমি গোপনে সেই জল ফেলিয়া দিয়া কলসীর জলে গ্লাসটী পূর্ণ করিয়া রাখি। তাঁহারা কিন্তু ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারেন নাই; কাজেই তাঁহারা তাঁহাদের সাফল্যের গৌরবে মনে মনে খুবই খুসী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরেই মা-বাবা চলিয়া গেলেন; যাইবার পূর্ব্বে আমাকে অনেক হিতোপদেশ দিয়া গেলেন। যাক্ সে সব কথা এখানে উল্লেখ না করাই সমীচীন।

—সাতাশ—

সকাল বেলা বাহিরের ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, নিতাই আসিয়া জানাইয়া গেল—মামীমা ডাকিতেছেন।

হঠাৎ মামীমার ডাকের কারণটা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; কাগজটা রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলাম।

মামীমা আমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; তাঁহার হাতে একখানি খাম। আমাকে দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'ওরে মণি, মল্লিকার মা চিঠি লিখেছে, তোর সঙ্গে ওর মেয়ের বিয়ে দিতে চায়; এই নে পড়ে দেখ্।' তারপর তিনি আপন মনে গজ্ গজ্ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'লজ্জা করে না লিখ্‌তে? ছেলে কি আমার জলে পড়েছে? যে, ওর ওই পটের বিবির সঙ্গে বিয়ে না দিলেই নয়? ভাল ছেলে পেয়েছিল, যাক্ না তার কাছে এখন, আবার এখানে আসে কোন্ সাহসে?' মামীমা আপন মনে এমনই কত কি বকিয়া যাইতেছিলেন।

চিঠিখানা পড়িলাম। মল্লিকার মা সকাতরে বহু অনুনয় করিয়া মল্লিকাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। পলাশের সঙ্গে মল্লিকার যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল, আদ্যন্ত সমস্ত ইতিহাসটা জানিয়া কোন ক্রমেই তাহাকে আর গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু তবু তাহার জন্য বড় দুঃখ হইল। উপায় কি? আমি মনে মনে যে মায়াপুরী রচনা করিয়াছিলাম, তাহা সে নিজেই ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।

মামীমা বলিলেন, 'পড়লি তো, দেখ্ কি সাহস মল্লিকার মার। ঐ ভ্রষ্টা মেয়েকে নিয়ে এখন আমার বউ করতে হ'বে? দেখ্ না কেমন শুনিয়ে এর জবাব লিখে দি। আস্পর্দ্ধা তো কম নয় তার।'

আমি চিঠিখানি তাঁহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিলাম। অতীতের অনেক কথাই মানস পটে ভাসিয়া উঠিয়া আমাকে বেদনাতুর করিয়া তুলিতেছিল।

মল্লিকার বিবাহের বয়স হইয়াছিল অনেকদিন; শুধু পলাশের আশায় থাকিয়াই এতদিন তাহার বিবাহ হয় নাই। নহিলে পূর্ব্বে অনেক ভাল ভাল স্থান হইতে তাহার সম্বন্ধ আসিয়াছিল, তাহার পিতা ইচ্ছা করিয়াই তখন তাহার বিবাহ দেন নাই। তারপর পলাশের সঙ্গে যে কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল, ইহার জন্য দায়ী তো তাহার মাতা-পিতাই। অতটা বাড়াবাড়ি কোন ক্রমেই উচিত হয় নাই তখন, এখন তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেই হইবে।

এমনই কত কথা আপন মনে ভাবিয়া যাইতেছিলাম। মল্লিকাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেও তাহার মধুর স্মৃতি কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছিলাম না। একদিন অযাচিত ভাবে সে যে অসীম ভালবাসা দিয়াছিল, তাহা একেবারে ভুলিয়া যাওয়া সুকঠিন, একটা দুঃস্বপ্নের মতই মনটা সময় সময় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত।

শচীনের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! রাইমণির মৃত্যুর পর তাহার অনুশোচনা দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম—এইবার বোধ হয় সে ভালর দিকে যাইবে, স্বভাবের পরিবর্ত্তন নিশ্চয়ই হইবে।

কিন্তু আমার ভুল ধারণা। দুইদিন যাইতে না যাইতেই তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা আবার প্রকাশ হইয়া পড়িত, সে দ্রুত পাপের পথে ছুটিয়া চলিল। ইদানীং সে আমার সঙ্গে বড় একটা দেখা-শোনা করিত না, সর্ব্বদা নিজেকে আড়ালে রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করিত।

তাহার সহিত মিশিতে আমারও আর আগ্রহ ছিল না। মনে মনে তাহাকে ঘৃণাই করিতাম। বিতৃষ্ণায় সারা অন্তর আমার ভরিয়া গিয়াছিল।

আমার সমস্ত অনুরোধ, উপদেশ উপেক্ষা করিয়া সে অসুন্দরকেই বরণ করিয়া লইয়াছে, যত সব ছোট লোকেরাই হইয়াছে—তাহার সঙ্গী-সাথী। তাহার উপর কোন ক্রমেই সহানুভূতি থাকিতে পারে না।

তাহার ব্যবহারে মামাবাবুর মাথা কাটা যাইত। প্রজারা যখন মধ্যে মধ্যে শচীনের বিরুদ্ধে নালিশ জানাইয়া যাইত, মামাবাবু লজ্জায় একেবারে মরিয়া যাইতেন। প্রথম প্রথম তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন বটে; কিন্তু এখন কিছু বলিতে মামাবাবুরই কেমন লজ্জা বোধ হইত, বাধ-বাধ লাগিত।

সে'দিন মামাবাবু খুব দুঃখের সহিতই শচীনের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। নায়েব-গোমস্তারা খাজনা আদায় করিতে গিয়া শচীনকে সেখানে যে অবস্থায় দেখিয়া আসে, তাহাতে তাঁহাদেরই লজ্জা করে। এমনই কত কি।

সে এখন শাসনের বাহিরে। কোন প্রকার শাসনকেই সে আর গ্রাহ্য করে না। তাহার মাকে সে কোন দিনই ভয় করে নাই, এখনো করে না।

মামাবাবু মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন—এ'কটা দিন গেলে, উহাদের এখান হইতে একেবারে সরাইয়া দিবেন। প্রয়োজন হয়, মাসিক কিছু সাহায্য করিলেই চলিবে। ঐ কুলাঙ্গারকে রাখিয়া কোন ক্রমেই নিজের মান-সম্ভ্রম নষ্ট করা চলে না।

শচীনের মা মধ্যে মধ্যে আমার কাছে পুত্রের জন্য দুঃখ করিতে আসিয়া মায়া-কান্না জুড়িয়া দিত। তাহার কান্না আর শেষ হইতে চাহে না। আমি বিব্রত হইয়া পড়িতাম। বুঝাইয়া তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতাম।

একটু শান্ত হইয়াই সে মামীমার কথা তুলিত। তার ধারণা ছিল—মামীমার অনাগত শিশুটাই আমার কণ্টক। তাহাকে নিপাত করিলেই আমি সুখী হইব। তাই সে আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি-চুপি বলিত,—'তুই নিশ্চিন্ত থাকিস মণি, তোর কোন ভয় নেই। ঐ পাপ দূর হ'বেই; তুই দেখে নিস্! আমায় কিন্তু ভুলিস্ নি শেষে?'

প্রথম প্রথম চুপ করিয়া থাকিতাম; কিন্তু ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। একদিন আর পারিলাম না, তীব্র স্বরেই প্রতিবাদ করিয়া তাহাকে বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিয়াছিলাম। তাহার পর হইতেই সে আমার কাছে আর বড় আসিত না।......

মামীমা এখন হইতেই অনাগত শিশুটীর জন্য একটী নূতন সংসার পাতিতেছিলেন। ছোট ছোট পোষাক, কাঁথা ও খেলনায় দুই তিনটী আলমারী একেবারে বোঝাই করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ছেলে কিংবা মেয়ে হইবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই, কাজেই সমস্ত জিনিস দুই সেট্ করিয়া হইয়াছিল। মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশে মামীমার অন্তর ভরিয়া গিয়াছিল।

আনন্দ হইবারই কথা। কত আরাধনার পর আজ তাঁহার সকল আশা সফল হইতে চলিয়াছে। খোকা কিংবা খুকী হইলে কি বলিয়া ডাকিবে, এখন হইতে তাহার জন্য সুন্দর সুন্দর নাম কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

শিশুকে ঘুম পাড়াইবার জন্য এখন হইতে গুণ গুণ করিয়া ছড়া বলিতে থাকিতেন।

শচীনের মা হাসিত। আড়ালে বলিত—'কি ঘেন্নার কথা গো! বুড়ো মাগীর রকম দেখে হাসি পায়, আমরা যে লজ্জায় মরে যাই একেবারে।'

এমনই কত কি!......

—আটাশ—

কলেজ খুলিবার আর দেরী ছিল না।

একদিন নিভৃতে সুখদাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলাম—সে যেন শচীনের মায়ের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে।

সুখদা তাঁহাকে একটু সন্দেহের চ'খেই দেখিত কাজেই হাসিয়া বলিল, 'আমাকে কিছু বল্‌তে হ'বে না!'

তার পরই আমি কলিকাতায় চলিয়া আসি।

* * *

বিনোদ মাঝে মাঝে আমার কাছে আসিত। এখন সে আর আমাকে তাহাদের বাড়ী যাইবার জন্য কোন অনুরোধই করিত না।

আমি বাঁচিয়া গিয়াছিলাম।

তাহাদের বাড়ীর খবরটা কিন্তু সবই আমার কানে আসিত। তাহারই মুখে শুনিলাম—বৌদিদি এখন পিত্রালয়েই আছেন; তাঁহার মায়ের অসুখ আবার বাড়িয়াছে। ভোলানাথবাবু আজকাল বড় একটা তাহাদের বাড়ী যান না।

আমি খালি শুনিয়াই যাইতাম, তাহাকে কোন প্রশ্নই করিতাম না।

বিনোদেরও এই সময় লেখার ঝোঁক পড়িয়াছিল একটু বেশী। নূতন কিছু লিখিলেই সে আমার কাছে লইয়া আসিত।......

সে'দিন কলেজ হইতে ফিরিয়াই মামাবাবুর একখানি চিঠি পাইলাম।

চিঠিখানি পড়িয়াই মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। মামাবাবু লিখিয়াছেন,—শচীন সিন্দুক হইতে পাঁচ হাজার টাকা লইয়া উধাও হইয়া গিয়াছে। এখনও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাহার মা কান্নাকাটী করিতেছে, এবং কেলেঙ্কারীটা আরও প্রকাশ হইয়া পড়িবে বলিয়া পুলিশে খবর দেওয়া হয় নাই। শচীন একাই যায় নাই, যাবার পর হইতে তারক দাসের বিধবা পুত্রবধূ মালতীরও কোন সন্ধান নাই। কয়েকদিন ধরিয়া শচীনকে তাহাদের বাড়ীর কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে অনেকে দেখিয়াছিল।

ব্যাপারটা জলের মতই পরিষ্কার। মালতী যে শচীনের সঙ্গেই গিয়াছে সে বিষয় আর কোন সন্দেহই রহিল না।

লজ্জায়, ঘৃণায় মামাবাবু কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিতেছিলেন না। শচীন যে এমন করিয়া কলঙ্ক

কালিমা লেপিয়া যাইবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। টাকার জন্য তাঁহার তত দুঃখ হইতেছিল না, যত দুঃখ হইতেছিল—এই অপমানজনক ঘৃণিত নারী-হরণের জন্য।

গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল—জমীদারের আত্মীয় শচীন মালতীকে কুলের বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে।......

পত্রখানি পড়িয়া আমার চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা তপ্ত-অশ্রু আপনা হইতেই গড়াইয়া পড়িল! মামাবাবুর অবস্থাটা আমার চোখের সম্মুখে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল।

শচীনকে আমি অনেক করিয়া বুঝাইয়াছিলাম, সে কোন উপদেশই শুনিল না। পাপের চরমে গিয়া পৌঁছিল। রাইমণির মৃত্যুর পর তাহার আত্মগ্লানি দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, বুঝি সে এইবার মানুষ হইবে!

মনুষ্যত্বের খুবই পরিচয় দিল সে।

মালতীকে লইয়া যদি সে কলিকাতাতেই আসিয়া থাকে, ঠিকানা জানা না থাকিলে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব। এত বড় শহরে কোথায় তাহার খোঁজ করিব?

পথ চলিবার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া চলিতাম,—যদি শচীনের দেখা পাওয়া যায়।

শচীনের কোনই সংবাদ পাওয়া যায় নাই; মামাবাবুর অতগুলি টাকা তো গিয়াছেই, তাহার উপরে অমন একটা বিশ্রী কাণ্ড, তবুও তাঁহার শান্তি নাই; শচীনের মায়ের জ্বালায় অস্থির। রাতদিন তাহার বিলাপ করিয়া কান্না লাগিয়াই আছে। মামাবাবু একেবারে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সেদিন মামীমার একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম। তাহাতে জানিলাম—শচীনের মা না কি তাহার গুণধর পুত্রের এই কাণ্ডের জন্য মামীমাকে দায়ী করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সহিত বিবাদ করে। বলে—তাঁরই আদরে পুত্রটী বিগড়াইয়া গিয়া এমন অঘটন ঘটাইল। কি কুক্ষণে সে এখানে আসিয়াছিল ইত্যাদি—

আমার হাসি পাইল। বাংলায় একটা কথা আছে "চোরের মায়ের বড় গলা।" কথাটা বাস্তবিকই ঠিক্।

পরিশেষে মামীমা বাড়ী পাঠাইয়া লিখিয়াছেন,—'শচীনের মাকে এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে শীঘ্রই এখান হইতে চলিয়া যাইবে।'

কি জানি কেন, সে মামীমার কাছ হইতে চলিয়া যাইবে শুনিয়া আমার খুব আনন্দ হইল।

সে চলিয়া গেলে আর যাহাই হউক, অন্ততঃ মামীমার অনাগত শিশুটীর যে কোন অমঙ্গল হইবে না, এ অতি সত্য কথা।

সেদিন পথে ভোলানাথবাবুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। তিনি আর আমাকে ছাড়িতে চাহেন না। অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন। তাঁহারই কাছে শুনিলাম, হিরণদি'রা এখানে আসিয়াছেন; রসময়বাবুর কলিকাতায় কোন একটা কলেজে কাজ হইয়াছে, তাহারা মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে থাকে। ভাই-ফোঁটার ঐ কাণ্ডের পর তাঁহার সহিত আমার আর দেখা হয় নাই; হিরণদি ভোলানাথবাবুকে বার বার অনুরোধ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন আমি যেন তাহাদের সহিত দেখা করি।

একদিনের পরিচয় হিরণদির সঙ্গে; তাহাতেই তিনি কি অযাচিত স্নেহই না দিয়াছিলেন! অত আদর আপ্যায়ন ভুলিবার নহে। মনে মনে স্থির করিলাম—একদিন গিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া আসিতে হইবে। নহিলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হয়।

বিনোদদের কথা উঠিতেই ভোলানাথবাবুর ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, 'ওদের ব্যবহারে সত্যি ঘৃণা ধরে গেছে, ওরা এত দাম্ভিক আর ওদের মন এত ছোট যে, যাঁর একটুও মনুষ্যত্ব আছে, সে সেখানে কিছুতেই যেতে পারে না! ওরা লোককে খাইয়ে দাইয়ে মান করে করুণ করছে। তা'ছাড়া বিনোদ একটা ইডিয়ট্, ওর নিজের কোন মতামত নাই। হেসে হেসে সেদিন আমায় বললে আমি নাকি ওদের বাড়ী 'ভাগিনী-প্রেম' করতে যাই কথাটা শুনে অবাক্ হ'য়ে গেলুম। এত নীচ ও!'

আমিও কম বিস্মিত হইলাম না।

হঠাৎ ভোলানাথবাবু এত বীতরাগ হইয়া উঠিলেন কেন বুঝিলাম না।

কোন জিনিসেরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। ভোলানা

বাবুই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সদিনই বুঝিয়াছিলাম, ইহার বিষময় ফল একদিন তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে।

হইলও তাহাই।

অত প্রেম কোথায় গেল এখন?

মানুষ চেনা কঠিন।

ভোলানাথবাবু কিরণকে অত স্নেহ করিয়া কেমন করিয়া যে অত শীঘ্র ভুলিয়া গেলেন, বুঝিতে পারিলাম না। এখন আবার নূতন করিয়া আসন পাতিয়া লইয়াছেন হিরণদি'র ওখানে।

—উনত্রিশ—

সে'দিন আমার নামে লাল খামে শুভ-বিবাহ লেখা একখানি চিঠি আসিয়া উপস্থিত; বুঝিতে পারিলাম না, কোথা হইতে আসিল এখানি। তাড়াতাড়ি খামের মুখটা ছিঁড়িয়া ফেলিতেই দুই খানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। একখানি ছাপান নিমন্ত্রণ পত্র, আর একখানি লিখিয়াছে মল্লিকার পিতা। মল্লিকার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, আমাকে যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করা হইয়াছে। সময় অভাবে তিনি নিজে আসিতে পারিলেন না।

মহা ভাবনায় পড়িয়া গেলাম।

কি করিব? আমার সেখানে যাওয়া উচিত কি না কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

মনে মনে যাইবার ইচ্ছা ছিল খুবই, কিন্তু লজ্জাও হইতেছিল বড় কম নয়!

যাহা হউক, ভাবিয়া স্থির করিলাম—বিবাহের সময় একবার আমাকে যাইতেই হইবে। মল্লিকাকে কিছু উপহার দিয়া আসিতে হইবে।

অনেক কিছুই ভাবিতেছিলাম।

কি রকম বর হইবে কে জানে? মল্লিকা যে ভাবে মানুষ হইয়াছে, পাত্রের সহিত তাহার মিল হইলে হয়?

পলাশের ব্যাপারটা গোপন থাকিবে না, একদিন প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। তখন তাহার সহিত কি রকম ব্যবহার করিবে সে, তাহাও কিছু বলা যায় না।

ভাবনার অন্ত ছিল না।

তাহাকে একদিন মনে-প্রাণেই ভালবাসিয়াছিলাম, শুধু তাহাদের ছলনায়, কতগুলি অপ্রিয় ঘটনায় সব ওলট-পালট হইয়া যায়। উল্কার মত পলাশ আসিয়া আমাদের মিলন-ডোর ছিন্ন করিয়া দিয়া বুদ্‌বুদের মত কোথায় বিলীন হইয়া গেল। নহিলে......

স্মৃতির দাহনে একেবারে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিলাম।

বিবাহের দিন সন্ধ্যার পর মল্লিকাদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। আলোক-মালায় বাড়ীখানি বেশ সুসজ্জিত হইয়াছে দেখিলাম, কিন্তু মল্লিকার মনের আঁধার দূর হইয়াছে কি না কে জানে?

বর তখনও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই।

মল্লিকার বাবা আমাকে সাদরে ডাকিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। আরো আগে না আসার জন্য আমাকে মৃদু তিরস্কার করিয়া অনুযোগ করিলেন।

একটা বাজে কারণ দেখাইয়া আমি হাসিতে লাগিলাম।

মল্লিকার মা আজ খুবই আদর করিলেন; বুঝি তাহার নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পলাশের মোহে আকৃষ্ট না হইলে, আমাকেই জামাতা করিয়া লইতে পারিতেন, সামান্য একটু ভুলের জন্য জীবন-নাট্যের দৃশ্যের কত ওলট-পালটই না হইয়া গেল।

সংসারে এ'রকম ঘটনা কতই না ঘটিতেছে, সামান্য একটুখানি ভুলের জন্য কত জীবন মরুভূমি হইয়া যাইতেছে।

মল্লিকা ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তাহার মুখখানি বড়ই মলিন, বেদনা-কাতর বলিয়া মনে হইল। সে নিজেকে চিন্তা-সাগরে ডুবাইয়া দিয়াছিল। আমি যে কখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, তাহা সে লক্ষ্যই করে নাই, চমক ভাঙ্গিল তাহার মায়ের ডাকে।

তিনি বলিলেন, 'মল্লিকা তোর মণিদা' এসেছে দেখ্। আমি বলেছি না, সে আসবেই।'

মল্লিকা তাহার ডাগর চোখ দু'টী তুলিয়া আমার দিকে চাহিল, কালো কালো তারা দু'টী উজ্জ্বল হইয়া

মুহূর্ত্তে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। ক্ষীণ হাসির রেখাটী অধরে বিলীন হইয়া গিয়া কান্নায় মুখখানি কালীমাখা হইয়া চোখ দু'টী জল ভরে ছল ছল করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে মুখ নামাইয়া লইল।

তাহার অন্তর-বেদনা বুঝিতে পারিলাম, এবং সেই জন্যই বুঝি আঘাতটা খুব জোরের সহিতই আমার হৃদয়ে গিয়া প্রতিহত হইল। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতই সচকিত হইয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছিলাম, কিন্তু মুহূর্ত্তে নিজেকে সংযত করিয়া লইলাম; ভুলিয়া গেলাম সমস্ত অতীত।

মীনা করা একটা সোনার ক্রচ ও সেণ্ট্, সোপ, স্নো ইত্যাদি যে সকল উপহার লইয়া গিয়াছিলাম তাহা তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, 'অতীতকে একেবারে ভুলে গিয়ে, ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তুলো মল্লিকে। নারীর গৌরবটুকু অক্ষুন্ন রেখ এই আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ! সুখী হয়ো তুমি।'

আমার বুকের ভিতর তুফান উঠিয়া একটা মহা-আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছিল। নিজেকে কিছুতেই আর স্থির রাখিতে পারিতেছিলাম না। একটা দম্‌কা হাওয়ার মত ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

জীবন-নাট্যের একটা অঙ্ক শেষ হইবার পূর্ব্বেই যবনিকা ফেলিয়া দিলাম।

একটু পরেই বরযাত্রি-সহ বর আসিয়া উপস্থিত হইল। বর দ্বিতীয় পক্ষের হইলেও বয়স তাহার চাল্লিশের উর্দ্ধে নহে, গৌরকান্তি, বলিষ্ঠ দেহ, চোখে উজ্জ্বল দীপ্তি, সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তাহার নাম নিবারণ, বেনারসে সে কি একটা স্কুলে মাষ্টারী করে। আগের পক্ষের কোন সন্তানাদি নাই। মনে হইল মল্লিকা সুখী হইবে।

নিবারণ কোন দিক্ দিয়াই তাহার অনুপযুক্ত নহে। মল্লিকা যে সুখী হইতে পারিবে ইহা ভাবিয়াও অনেকটা শান্তি পাইলাম।

অনেক রাত্রিতে বেশ নির্ব্বিঘ্নেই নিবারণের সঙ্গে মল্লিকার বিবাহ হইয়া গেল।

শরতের প্রথম বর্ষণের পরে আকাশ যেমন মেঘশূন্য নির্ম্মল হইয়া যায়, শুভদৃষ্টির সময় মল্লিকার মুখখানিও হইল তেমনই হাস্যোজ্জ্বল, মনোরম।

কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে আর এখন, সামান্য এই সময়টুকুর ব্যবধানেই কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!

নারী এমনই রহস্যময়ী বটে!

আমার বুকের রক্ত টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া হৃদপিণ্ডটাকে যেন একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিতেছিল। একটা হৃদয়ে যে কি দারুণ ব্যথার বোঝা সঞ্চিত হইয়া রহিল, এক অন্তর্যামী ব্যতীত কেহই তাহা বুঝিল না।

বাসরঘর হইতে তরুণীদের কল-কোলাহল ও মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি ভাসিয়া আসিয়া সমস্ত বাড়ীখানি একেবারে মুখর করিয়া তুলিয়াছিল। বার বার মনে হইতেছিল, এমন আনন্দের দিনে আজ নিজেকে কেন এখানে টানিয়া আনিয়াছিলাম! আহারে আর প্রবৃত্তি ছিল না; ভদ্রতার খাতিরে পাতায় বসিতেই হইল আমাকে। হোষ্টেলে ফিরিলাম গভীর রাত্রে। অতীতের ক্ষীণ স্মৃতিগুলি আজ আমার চ'খের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া ভাসিয়া উঠিয়া আমাকে যেন ব্যঙ্গ করিতেছিল।...

বিনোদ সে'দিন কতকগুলি নূতন লেখা দেখাইতে আনিয়াছিল। দিনদিনই তাহার লেখার উন্নতি হইতেছিল; কাজেই আমি মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসাই করিলাম। খুসীতে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল।

ভোলানাথবাবুর উপর সেও বড় কম বীতরাগ নহে। নিজেই সে'দিন তাহার কথা তুলিয়া বলিল 'ভোলানাথ-বাবুর মত ভদ্রবেশী চামার খুব কমই দেখেছি, মণি। সেদিন তাকে বেশ কড়া কড়া দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছি। আমার কাছে তো কেউ যায় না, যায় তারা কিরণের কাছে। তাই কি একটা কথার পরে ভগিনী-প্রেম বল্‌তেই সে একেবারে চটে আগুন। মুখের উপরেই শুনিয়ে দিলুম—সত্য কথাই বলেছি, তা নয় তো আর কি? তারপর থেকে সে আর আমাদের ওখানে বড় একটা যায় না; হিরণদি'রা এখানে এসেছে, তাদের কাছেই আড্ডা পেতেছে আবার। এমন ইতরকে ভদ্র-

পরিবারে মিশ্‌তে দেওয়াই উচিত নয়। এরা স্ুঁচ হ'য়ে ঢুকে ফাল হ'য়ে বেরোয়।' বিনোদ ক্রোধে একেবারে ফাটিয়া পড়িতেছিল। একটু পরে সে আবার বলিতে লাগিল 'সুরুচিকে দেখেছ তো? দু'একদিনের আলাপ বই তো নয়, এরি মধ্যে তাকে এক লম্বা চিঠি লেখা হ'য়েছে। সে রেগে টঙ্‌। আমাদের সেদিন অনেক কথা শুনিয়া দিয়ে গেল। বলে—যেরকম বাঁদরাম করেচে, ওসব লোককে 'হুইপ্‌' করা উচিত। এমনই কত কি?' সে'দিন রাগের মাথায় বিনোদ আমাকে অনেক কথাই বলিয়া ফেলিল। ভোলানাথবাবুরও ঠিক্‌ এই অবস্থাই হইয়াছিল সে'দিন। বুঝিলাম—তাহাদের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে; তাহারই 'রি-এ্যাকসন্‌' (প্রতিক্রিয়া) এটা।

সুরুচিকে লইয়া ভোলানাথবাবু যে রকম ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত একটা অঘটন কিছু না ঘটিলে, সবদিক দিয়াই ভাল হয়।

—ত্রিশ—

শনিবার দিন বেড়াইতে বেড়াইতে রসময়বাবুর বাড়ীর দিকে চলিয়াছিলাম, হিরণদি'র সহিত দেখা করিতে। অনেকদিন হইতেই তাঁহার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কিছুতেই সময় করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না।

আমাকে দেখিয়া রসময়বাবু ও হিরণদি' খুব উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। বিনোদের বাড়ীর ভাইফোঁটার সেই অপ্রিয়-ঘটনার পর ইঁহাদের সঙ্গে এই প্রথম দেখা। আমার খুবই সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল; কি বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না।

রসময়বাবু তাহার স্বভাব-সুলভ হাস্য-কৌতুকদ্বারা মুহূর্ত্তে সব জড়তা দূর করিয়া দিয়া বেশ সহজভাবেই কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

হিরণদি' জলখাবার ও চা দিয়া গেলেন; খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্পও চলিতে লাগিল। হিরণদি' ভোলানাথবাবুর কাছ হইতে সব কথাই জানিয়া লইয়াছিলেন। আমি আর বিনোদদের বাড়ী যাই না শুনিয়া তিনি খুব দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'কিরণ ছেলেমানুষ, তার কথায় রাগ করো না ভাই! তার হ'য়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, যেয়ো তুমি তাদের ওখানে!'

আমার চোখ-মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, 'না, না সে'জন্য নয়, সময়ও পাই না, ভালও লাগে না, তাই আর ঐদিকে যাওয়া ঘটে ওঠে না। তা' ছাড়া বিনোদ আমার কাছে প্রায়ই আসে, দেখা-শোনা ধরতে গেলে রোজই হয়।'

হিরণদি' হাসিয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, 'বেশ ভাই, শুনে খুব খুসী হলুম যে তুমি রাগ করো নি।'

সে'দিন আর বিশেষ কোন কথা হইল না।

আমি বিদায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

মাঝে মাঝে যাইবার জন্য রসময়বাবু অনুরোধ করিলেন।

আমি হাসিয়া সম্মতি জানাইলাম।

হিরণদি' সহাস্যবদনে প্রশ্ন করিলেন, 'কবে আসছ আবার?'

আমি উত্তর দিলাম, 'তারিখ বলতে পারছি না, ধূমকেতুর মত সহসাই হয় তো একদিন এসে হাজির হ'ব! সন্ধান যখন পেয়েছি, আর কি রক্ষে আছে আপনাদের?'

তাহারা হাসতে লাগিলেন।

সে'দিন 'গ্লোবে' গিয়াছিলাম কি একখানি ভাল বই দেখিতে। ভোলানাথবাবুর সঙ্গে সেখানে দেখা হইয়া গেল। তিনি আমারই পাশের চেয়ারে বসিয়াছিলেন। 'সো' আরম্ভ হইবার তখনও দেরী ছিল।

তাঁহার সহিত গল্প আরম্ভ ক'রয়া দিলাম।

হিরণদি'র ওখানে যে গিয়াছিলাম, তাহাও তাঁহাকে জানাইয়া দিলাম।

হঠাৎ একসময়ে ভোলানাথবাবু আমাকে প্রশ্ন করিলেন যে, বিনোদের সঙ্গে শীঘ্র দেখা হইয়াছে কি না?

আমি জানাইলাম, 'হ'য়েছিল, সে তার নূতন লেখা দেখাতে এসেছিল।'

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমার কথা কিছু বল্লে না কি ?'

তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, 'বিশেষ কিছু নয় আপনি আর যান না, সে কথাই বলছিল।'

তিনি একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, 'যাব কি ? ওর মত একটা অভদ্র ইডিয়ট, যে ভাল করে লোকের সঙ্গে কথা কইতে জানে না, তার কাছে কি অপমান হ'তে যাব ?'

আমি মুখ টিপিয়া একটু হাসিলাম।

তিনি আমাকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, 'কি, হাসলেন যে ?'

আমি হাসিয়াই জবাব দিলাম, 'সে বল্‌ছে আপনাকে অভদ্র, আপনি বলছেন তাকে। আপনাদের কি হ'য়েছে, আপনারাই জানেন।'

তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, 'সে আমাকে অভ বলেছে না কি ?'

আমি বলিলাম, 'না বললে কি আমি বানিয়ে বলছি ?

'ইডিয়টটাকে আমি এমন শিক্ষা দিতে পারি যে সে জীবনে ভুলবে না। নেহাৎ বন্ধুত্বের খাতিরেই কিছু করছি না। আমায় চেনে না সে, নইলে 'ভগিনী-প্রেম' বুঝিয়ে দিতে পারতুম তাকে। তারই প্যাঁচে, তাকে জব্দ করতুম।' বলিয়া তিনি হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

একটু পরেই 'সো' আরম্ভ হইল, কাজেই আর কোন কথা হইল না।

'ইন্টারভ্যালে'র সময় ভোলানাথবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'বিনোদদের সমস্ত 'মিষ্ট্রী' আমি আবিষ্কার করেছি, দরকার হ'লে সব প্রকাশ করে তাকে আমি নাস্তানাবুদ করে ছাড়ব।'

তিনি হাসিয়া উঠিলেন। কি বিকট সে হাসি! আমি চকিত হইয়া উঠিলাম।

'সো' শেষ হইলে বেশ তৃপ্তির সহিতই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

'রসময়বাবুদের ওখানে মাঝে মাঝে যাবেন তো ? সেখানেই দেখা হ'বে আশা করি! আচ্ছা গুড্‌বাই।' বলিয়া তিনি বাসে গিয়া উঠিলেন।

হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিয়া মামাবাবুর একখানি চিঠি পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, 'মামীমা গতকল্য একটী পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়াছেন, নব-জাত শিশু এবং মামীমা বেশ সুস্থই আছেন, কোন চিন্তার কারণ নাই। পরিশেষে জানাইয়াছেন যে, কয়েকদিন হইল—শচীনের মা তাহাদের দেশে চলিয়া গিয়াছে।

মা এবং শচীনের মায়ের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া মামীমার পুত্র হইয়াছে শুনিয়া খুসীতে আমার সারা অন্তর ভরিয়া উঠিল। শচীনের মা চলিয়া গিয়াছে শুনিয়াও কম আনন্দ হয় নাই।

ক্রমশঃ

হুগলীর কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

ত্রিবেণী সপ্তগ্রামের সন্নিকটস্থ গ্রাম হইলেও তাহা সংলগ্ন অভিন্ন স্থান রূপে "শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে" বর্ণিত য়াছে। নিত্যানন্দ প্রেম নাম প্রচার করিতে সপ্তগ্রামে সেন। বৃন্দাবন দাস তদুপলক্ষে "শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে" রূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

কথোদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ সহে॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত ঋষি স্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম॥
সেই গঙ্গা ঘাটে পূর্ব্ব সপ্তঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ-চরণ॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম॥
প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী ঘাট সকল ভুবনে।
সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় যাঁহার দর্শনে॥

কান্যকুব্জের প্রিয়ব্রত রাজার সপ্তমহর্ষিসন্তান গ্নিধ্র, রম্যক, ভদ্রাশ্ব, স্বরবান্, বরাট, সবন ও াতিমন্ত সরস্বতীতীরে তপস্যা করিয়া শ্রীগোবিন্দ রণারবিন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহাভারতে ত্রিবেণী দক্ষিণ প্রয়াগ বলিয়া উল্লিখিত ইয়াছে। রঘুনন্দনের "প্রায়শ্চি-ত্ততত্ত্বে" দক্ষিণ প্রয়াগ মুক্তবেণী সপ্তগ্রামাখ্য দক্ষিণ দেশে বলিয়া উল্লিখিত াছে। মহাভাগবতপুরাণে উক্ত হইয়াছে, হরিদ্বার ইতে দেবী সুরধুনী যাত্রা করিলে তৎসমভিব্যাহারে প্তর্ষি মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং শিষ্ঠ বঙ্গে শুভাগমন করিয়া ত্রিবেণী সপ্তগ্রামে নদীতীরে াম্র-কাননে অবস্থান করিয়া দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত ইয়াছিলেন। দেবদুর্লভ দেবী সুরধুনীকে দর্শন করিয়া তাঁহারা শঙ্খধ্বনিসহ সম্বর্দ্ধনা করিয়া দেবীর প্রীতি সাধন করেন। *

কেহ কেহ বলেন সপ্তগ্রাম বলিলে পূর্ব্বে নিম্নলিখিত সাতটী গ্রামের সমষ্টি বুঝাইত—:—সপ্তগ্রাম, বংশবাটী, শিবপুর, বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর ও শঙ্খনগর। ত্রিবেণী সপ্তগ্রামেরই অঙ্গীভূত ছিল, উহার পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। নরহরি চক্রবর্ত্তী "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

সপ্তগ্রাম দেখি প্রণময়ে দূর হইতে॥
সপ্তঋষি তপস্যার স্থান শোভাময়।
শ্রীগঙ্গা যমুনা সরস্বতী ধারাত্রয়॥
সপ্তগ্রাম দর্শনে সকল দুঃখ হরে।
যথা প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দ বিহরে॥

ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহল যাত্রাকালীন পথের বিবরণে সপ্তগ্রাম-সম্বন্ধে কবি মুকুন্দরাম "চণ্ডী" গ্রন্থে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেনঃ—

সপ্তগ্রামের বণিক সব কোথায় না যায়।
ঘরে বসি থাকে সুখে নানা ধন পায়॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ অতি অনুপম।
সপ্তঋষির শাসন বোলায় সপ্তগ্রাম॥
কান্তারের বচনে করিয়া অবগতি।
ত্রিবেণীতে স্নান দান করিল শ্রীপতি॥

ত্রিবেণী পাশ্চাত্য দেশেও এককালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। প্লিনি, টলেমি প্রভৃতি ত্রিবেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাট্ ফারোক্‌শিয়ারের নিকট ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে যখন দূত প্রেরণ করেন, তখন ত্রিবেণীতে মহা সমারোহে

---

* তত্র সপ্তর্ষয়ো বীক্ষ্য গঙ্গাং দেবসুদুর্ল্লভাং।
অভ্যর্চ্চয়ামাসু সানন্দা শঙ্খশব্দেন নারদ॥ ইত্যাদি
মহাভাগবত পুরাণ।

তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা হয়। হুগলী কাউন্সিলের সভাপতি রবার্ট হেজেস এবং চারিজন সদস্য অভ্যর্থনা করিবার জন্য ত্রিবেণীতে আগমন করেন। দূত ছিলেন কুঠিয়াল জন সারিমান্ এবং ডাক্তার উইলিয়াম হ্যামিল্টন্ সার্জ্জন। হ্যামিল্টন্ সম্রাট্ ফারোকশিয়ারকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিয়া কোম্পানীর বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার পথ উন্মুক্ত করিয়া লন।

পর্য্যটক ষ্টাবরিনাস ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে নওসরাই হইতে পদব্রজে ত্রিবেণীতে আগমন করেন। তিনি পথে একটী মসজিদ ও সমাধি স্থান দেখিয়া লিখিয়াছেন সম্ভবতঃ সেইটী গাজী দরাফ। তিনি ত্রিবেণীকে "তারবুনী" আখ্যা দিয়াছেন। এখনও সাধারণ লোকে "তিরপুনি" বলিয়া থাকে।

কিংবা নরাধম কালাপাহাড় কর্ত্তৃক বা কালের ব প্রভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে ?

ত্রিবেণীর একটী সুবৃহৎ মন্দির মুসলমানা মসজিদে পরিণত হইয়াছে সেইটী পূর্ব্বোক্ত "দরাফ"। গাজী দরাফ পূর্ব্বে যে হিন্দু দেবমন্দির ছি বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। চারিটী প্রশস্ত প্রা চতুর্দ্দিকে সুবৃহৎ দেবমন্দির সমূহ বিরাজ করিত।

কয়েকটী ভগ্ন সোপান অতিক্রম করিয়া প্রথম প্র প্রবেশ করিলে উত্তর দিকে দুইটী প্রকোষ্ঠ-সম্বলিত এ মন্দিরের ভগ্নাংশ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রবেশ-দ্বার ও এ প্রশস্ত প্রস্তর ফলকে গ্রথিত। দেবালয়ের গঠন প্রণ দৃঢ়তা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। মুসলমান আক্র অত্যাচার এবং সর্ব্বধ্বংসী কালকে উপেক্ষা করিয়া অ

সরস্বতী নদী

মুসলমান অধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে ত্রিবেণী উড়িষ্যার কেশরী বংশের নৃপতিদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল। নরপতি মুকুন্দদেব ত্রিবেণী ঘাট ও "বেণীমাধব" শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় ত্রিবেণীর ন্যায় মহাপুণ্যক্ষেত্রে একটীও উল্লেখযোগ্য দেবালয় নাই। ত্রিবেণী এবং সরস্বতীর তীরে অনেক দেব-মন্দির ছিল, তবে কি সেগুলি বিধর্ম্মিগণ

সেই প্রাচীর অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। স্থানে স্থানে সরাইয়া দ্বারগুলি মিশরদেশীয় দ্বারের ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছে। দ্বারের প্রত্যেকদিকের অভ্যন্তর-ভাগ ছয় পরিমিত লম্বা এক এক খণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত।

প্রথম প্রকোষ্ঠের একটী সুবৃহৎ গবাক্ষ ভাগীরথীর লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে। গবাক্ষের বহির্ভাগের কারু পরিষ্কার ও সুন্দর। সেই প্রকোষ্ঠে পূর্ব্ব খাদিমা

সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রাঙ্গণের সম্মুখে আর একটী প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গঠন প্রণালী ভিন্ন প্রকারের। মুসলমানদিগের কঠোর হস্তে এই মন্দিরটী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে। কয়েকটী মন্দির স্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সেগুলি প্রাচীন কালের বলিয়া স্পষ্টই অনুভূত হয়। একটী স্তম্ভে দেবনাগরী অক্ষর ক্ষোদিত রহিয়াছে। বহুকষ্টে তাহার পাঠোদ্ধার করা যায়। মার্শম্যান সাহেব অনুমান করেন মন্দিরটী ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দদেব-কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। মার্শম্যান সাহেবের অনুমান যে ঠিক নহে, ক্ষোদিত লিপিগুলি হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। জাফর খাঁ বা দরাফ খাঁর সমাধি স্তম্ভ—৭১৩ হিজরী বা ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। মন্দিরগুলি কিরূপে সমভিব্যবহারে লইয়া চাকলা মুকস্সুসাবাদ, পরগণা কোন-ওয়ার পর্ত্তুপের অন্তর্ভুক্ত মুস্তর্গাও হইতে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচারার্থ এই স্থানে আগমন করেন। দরাফ খাঁ মহানাদের অধিপতি মান নৃপতিকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। হুগলীর রাজা ভূদেবের সহিত এক যুদ্ধে মান নৃপতি হত হন। তাঁহার দেহ ত্রিবেণীতে সমাহিত হয়। শাহ জাফর খাঁ গাজীর পুত্র আগোয়ান খাঁ সরকার সপ্তগ্রামের অধীন হুগলীর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া জয়লাভ করেন। আগোয়ান খাঁ রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং রাজাকে সবংশে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। রাজকন্যা এবং আগোয়ান খাঁ ত্রিবেণীতেই মৃত্যুমুখে পতিত ও সমাহিত হন। ফিরোজ শাহ ইঁহাদিগকে "খাঁ" উপাধি প্রদান করেন।

সরস্বতী-সঙ্গম

মুসলমানদিগের হস্তগত হইল তৎসম্বন্ধে নানা প্রবাদ-মূলক গল্প প্রচলিত আছে। মসজিদে অদ্যাপি যে কুর্চীনামা (বংশ তালিকা) রক্ষিত আছে তাহা হইতে জানা যায় যে শাহ জাফর খাঁ গাজী তদীয় ভাগিনেয় শাহ সুফীকে

দরাফ খাঁ অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে তন্মধ্যে একটী এখানে সন্নিবিষ্ট করা হইল।

বহুকাল পূর্ব্বে হুগলির বালী নামক স্থান ভীষণ জঙ্গলে

পূর্ণ ছিল; মধ্যে মধ্যে গভীর রাত্রিতে সেই জঙ্গল হইতে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইত। রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে তাহা প্রতিধ্বনিত হইত। শব্দ কোথা হইতে আসিতেছে কেহ স্থির করিতে পারিত না। এই শব্দ উপলক্ষ্য করিয়া লোকে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। কল্পনাবলে অনেক অলৌকিক ও অদ্ভুত গল্পের সৃষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমে তাহা স্থানীয় ফৌজদার বা নবাবের কানে উঠিল। তিনি সহরী কোত-ওয়ালকে সতর্ক থাকিয়া কোথা হইতে শঙ্খ ধ্বনিত হয়, অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। কয়েক রজনী বিশেষ লক্ষ্য করার পর সেই জঙ্গলের ভিতর হইতে শব্দ আসিতেছে বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল কিন্তু সে জনশূন্য কণ্টকাকীর্ণ বন-মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। সেই হিংস্র-জন্তু-সমাকুল স্থানে কোনও মানব থাকিতে পারে না—নিশ্চয়ই ইহা কোনও ভৌতিক কাণ্ড হইবে—এই স্থির করিয়া তিনি নবাবকে তাহা জানাইলেন। তাহাতে কিন্তু নবাবের কৌতূহল নিবৃত্ত হইল না। তিনি সেই জঙ্গল পরিষ্কার করিতে বলিলেন। জঙ্গল পরিষ্কার হইলে দেখা গেল যে, সেখানে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী স্তিমিতনেত্রে ধ্যানে নিমগ্ন। নবাব সন্ন্যাসীকে দর্শন করিতে গেলেন—সন্ন্যাসী বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য যোগ-মগ্ন। তিনি সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। দ্বিতীয় দিবসেও ঐরূপ হইল। তৃতীয় দিবস রজনীতে যখন তিনি সেখানে গেলেন তখন সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে। তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়া নবাব পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ সেই জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নবাব সেখানে তাঁহার বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ক্রমে সাধুর যশঃ সৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অনেক রাজা জমাদার তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন ও তাঁহাকে প্রণামীস্বরূপ অর্থ ও ভূমি উপহার দিতে লাগিলেন ক্রমে সেই অর্থে একটা বড় আখড়া নির্ম্মিত হইল। সেই আখড়ায় জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম এবং রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপিত হইল। ভূমির আয় হইতে দেবসেবার কার্য্য চলিতে লাগিল। বালীর এই আখড়া "বড় আখড়া"

মুকুন্দদেবের ঘাট ও শ্মশান

নামে আজিও পরিচিত। ক্রমে এই আখড়ার শাখা প্রশাখা নানা পল্লীতে বিস্তৃত হইতে লাগিল। বাঁশবেড়িয়ার নিকট খামারপাড়া পল্লীতে বহুদিন হইতে একটী আখড়া ছিল; সেই আখড়াটীও এই বড় আখড়ার সহিত সংযুক্ত হয়।

বড় আখড়ার প্রতিষ্ঠাতার নাম চতুর্দ্দশ বাবাজী। তাঁহার সমাধিস্থানে প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে এবং এখনও লোকে তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করে। তাঁহার দেহান্তে তাঁহাকে মন্দিরপার্শ্বে সমাহিত করা হয়। চতুর্দ্দশ বাবাজী লোকান্তরিত হইলে তাঁহার স্থানে রামকৃষ্ণ দাস আখড়ার মহান্ত পদে ব্রতী হন। খামারপাড়ার আখড়া ভিখারী দাস মহান্ত কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। পরে দানপত্রের দ্বারা তাহা বড় আখড়ার সহিত যুক্ত হয়।

ভিখারী দাস একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। ত্রিবেণী মুকুন্দদেবের ঘাটের দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গা-সরস্বতী সঙ্গমের অনতিদূরে কৃষ্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত কতকগুলি সুবৃহৎ দেবমন্দির ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ত্রিবেণী মুসলমান রাজ্যভুক্ত হয়। ত্রিবেণী-বিজয়ী মুসলমান সেনাপতি জাফর খাঁ বা দরাফ খাঁ ত্রিবেণী অঞ্চলের শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতেন। তিনি হিন্দু দেবালয়গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তদুপরি মসজিদাদি নির্ম্মাণ করেন। সেগুলি পরে "গাজী দরাফ্" নামে পরিচিত হয়। দরাফ হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী হইলেও একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। প্রবাদ, মানুষ কেন হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। একটী বৃহৎ শার্দ্দূল না কি ছিল তাঁহার বাহন। তিনি সেই শার্দ্দূলের উপর আরোহণ করিয়া যথেচ্ছা গমনাগমন করিতেন। দরাফ খাঁ আসিতেছেন শুনিলে লোকে ভয়ে পথ ছাড়িয়া পলায়ন করিত। দরাফ খাঁ এবং ভিখারী দাসের সম্বন্ধে একটী অলৌকিক আখ্যায়িকার কথা এখনও অনেকের মুখেই শোনা যায়। সেই আখ্যায়িকাটী এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল:—খামারপাড়া আখড়ার মহান্ত ভিখারী দাসের অলৌকিক শক্তির কথা শুনিয়া দরাফ্ তাঁহার সাহস পরীক্ষার জন্য সেই বৃহৎ শার্দ্দূলারোহণ করিয়া একদিন প্রাতঃকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ভিখারী দাস তখন ঘরের রোয়াকে বসিয়া দাঁতন করিতেছিলেন। দূর হইতে দরাফকে দেখিয়া তিনি ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন ও তিনবার গৃহ প্রাচীরে আঘাত করিলেন। অমনি মনে হইল গৃহসমেত তিনি রাস্তার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া দরাফ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। দরাফ শার্দ্দূল হইতে নামিলেন, ভিখারী দাসও রোয়াক

ত্রিবেণী—গাজী দরাফ

হইতে নামিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তা[illegible] পর উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলে দরাফ বলিলেন, "বা[illegible] বশে আনিয়া আমার যে গর্ব্ব হইয়াছিল আজ তাহা [illegible] হইল"।

এই ঘটনার পরেই তিনি হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীক[illegible] করিয়া তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। শঙ্করাচার্য্য[illegible] বাল্মীকির ন্যায় তাঁহার রচিত সংস্কৃত ছন্দের গঙ্গা স্তোত্র অতি শ্রুতিমধুর ও উচ্চভাব পূর্ণ। তিনি পরিশে[illegible] মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী সাধন-ভজ[illegible]

করিতে থাকেন। তাঁহার গঙ্গামাহাত্ম্য-উপলব্ধি সম্বন্ধে আর একটী গল্প আছে। একদা জাফর সন্ধ্যার সময় এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সে সময় তিনি বৃক্ষোপরি দুইজন অশরীরী আত্মার কথোপকথন শুনিতে পান। একজন অপরকে বলিতেছিল, "তুমি তো শীঘ্রই অন্য লোকে চলিয়া যাইবে; আমি একা থাকিব কি করিয়া?" অপর জন বলিল, "তোমায় একা থাকিতে হইবে না—অমুক
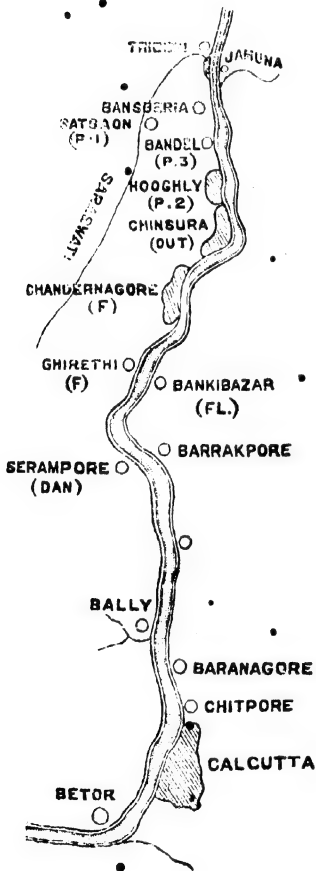
মানচিত্র

ব্রাহ্মণের গোরক্ষক কল্য বৃষশৃঙ্গে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, অপঘাত মৃত্যু জন্য সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া এই খানে আশ্রয় লইবে।" জাফর ব্রাহ্মণকে গিয়া সাবলম্বে সতর্ক করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণও গোরক্ষককে সারাদিন বাটীর বাহির হইতে দিলেন না—কিন্তু ঘটনাচক্রে সে সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহ হইতে বহির্গত হইবামাত্র, জাফর কৌতূহল পরবশ হইয়া সন্ধ্যার পর সেই বৃক্ষতলে আসিয়া অশরীরী আত্মাদের কথোপকথনে জ্ঞাত হইলেন যে বৃষের শৃঙ্গে গঙ্গা মৃত্তিকা লাগিয়াছিল, সে জন্য গঙ্গামাহাত্ম্যে সে উদ্ধার লাভ করিয়াছে। প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার পর হইতেই জাফর গঙ্গাদেবীর কৃপা-লাভের আশায় সাধনা আরম্ভ করেন।

তাঁহার সাধনায় তুষ্ট হইয়া গঙ্গাদেবী সলিল হইতে উত্থিত হইয়া সশরীরে ভক্ত জাফরকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। জাফর খাঁ দেবীর কৃপায় হিন্দু শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি মনের আবেগে যে স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি ভক্তির সহিত পঠিত ও গীত হইয়া থাকে।

দরাফ খাঁর স্তোত্রের এই কয় ছত্র কে না জানে?

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্ত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাম্
তদপি তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্॥

জাফর খাঁ বা দরাফ খাঁর স্থাপিত কুঠার পূর্ব্বোক্ত মসজিদের পূর্ব্বদিকের গবাক্ষের বহির্ভাগে স্থাপিত আছে।

এই কুঠারকে লোকে "গাজীর কুড়ুল" বলে। এই কুড়ুল উপলক্ষে এ অঞ্চলে একটা প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। অলস ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া লোকে বলে "যেন গাজীর কুড়ুল, নড়ে চড়ে, পড়ে না।"

শিশুর মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া ঘুম পাড়াইবার জন্য এদেশের জননীগণ "বর্গী এল দেশে" ইত্যাদি শ্লোকটী সুর করিয়া গায়িয়া থাকেন। শ্লোকটী নিতান্ত কল্পনাপ্রসূত নহে—প্রকৃতই বর্গীদের অত্যাচারে এ প্রদেশ একদিন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—এমন কি বঙ্গের নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাহাদিগকে "চৌথ" বা বঙ্গদেশের এক চতুর্থাংশ রাজস্ব প্রদান করিয়া দেশে শান্তিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্গীরা কয়েকবার হুগলী, সপ্তগ্রাম আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াছিল, কিন্তু ত্রিবেণী প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা বংশবাটীতে রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয়ের দুর্গাভ্যন্তরে

ধনরত্নের সহিত আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কয়েকবারই রক্ষা পাইয়াছিল। *

ত্রিবেণীতে পূর্ব্বে বহু পণ্ডিতের বসবাস ছিল। গত শতাব্দীর উজ্জ্বল রত্ন পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি বংশবাটীর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইঁহার অপূর্ব্ব স্মরণশক্তি ছিল। একদা ত্রিবেণীর ঘাটে জগন্নাথ আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলেন। সেই সময় ভিন্ন-ভাষী দুইজন য়ুরোপীয় গোরার দ্বন্দ্ব হয়। তাহারা পরস্পরকে গালি দেয়। আদালতে নালিশ হইলে জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চাননকে সাক্ষ্য দিতে হয়। তিনি উভয়ের পর পর কথাগুলি ভাষা না জানিয়াও কেবল স্মরণশক্তিবলে যথাযথ বর্ণনা করিতে পারিয়াছিলেন। জজের ও লোকের বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা বহু ভাষাভিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ সার উইলিয়াম জোনস্ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে ত্রিবেণীতে তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তাঁহার অনুরোধে শাস্ত্রানুসারে বিধি-ব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্ট তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে মাসিক তিনশত টাকা বৃত্তি দিতেন। আমাদের ঐতিহাসিক সমিতির অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট কিছুদিন হইল তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের আবাস-গৃহে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একখানি প্রস্তরফলক সন্নিবেশিত করিয়াছেন। *

* Hunters' statistical Acount of Bengal Vol, VII and Gazetteer of Indian Vol I.

* Government of Bengal, Political Department, Political Branch No. 12484 p. Memorandum Cal, the : 21st September, 1928.

সান্-বাথের অপকারিতা

রৌদ্র-স্নানের উপকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্টই শোনা যায়। সম্প্রতি একজন ফরাসী চিকিৎসক এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"ইহাতে দেহকে দুর্ব্বল করায়। শক্তি বিন্দুমাত্র বাড়ে না। উপরন্তু হৃদ্-প্রদাহ বৃদ্ধি পাইয়া নানাবিধ আকস্মিক আঘাত পাইবার সম্ভাবনা। অতিরিক্ত রৌদ্রেও হৃদ্ যন্ত্রের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। যাহারা মূত্রাশয়ের ব্যাধিতে কষ্ট পান, তাঁহারা ইহাতে বিশেষরূপ অনিষ্ট পাইবেন। যাঁহারা দাদ বা কাউরে ভুগিতেছেন, তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।"

প্রিয়তমা

বন্দে আলী মিয়া

রাতশেষে আজ প্রিয়তমা মোর
ফিরিয়া এসেছে ঘরে
ওরি পথ চেয়ে দিন গুণেছিনু
সারাটী জীবন ধরে,—
এতদিন পরে এসেছে সে হেথা
আপনি এসেছে আজ
তারি লেগে বুঝি নিখিল ভুবন
পরেছে মোহন সাজ।
শিশির চুবানো ভোরের বেলায়
আল্‌তা তাহার মুছে মুছে যায়
নদীর চরায় ভুঁই চাপা মেয়ে-
বসে রয় ওরি তরে।

এসেছে সে হেথা সাথে লয়ে তার
রৌদ্র-বরণা হাসি
বলাকার সারি মালিকা তাহার
আকাশে বেড়ায় ভাসি'।
সজিনার ফুলে ঝলিছে ঝালর
ঢলিছে উহারে ঘিরে
জাগিয়া উঠেছে অশোক-বকুল
বনের বক্ষ চিরে।
মেঘের তরীতে নীল নভ গাঙে
উদয়াচলের আলো তায় রাঙে
সিক্ত পাতায় কাঁপিছে নয়ন
—ঝাউ বনে বাজে বাঁশী।

চূড়ায় চূড়ায় হিম অচলের
যে গান জাগিয়া রয়
তার স্বরধ্বনি বুকের মাঝারে,
হানে মোরে বিস্ময় ;—
ধুতুরা ফুলের ভরিয়া গেলাস
পান করি আজ আঁখি-নির্য্যাস
তারি ঘোর লাগে মনের কোণেতে
ব্যথা জাগে সুমধুর,
ওরি সাথে শুনি ফিরে চলা তার
বিসর্জ্জনের সুর।

মরু

(বড় গল্প)

শ্রীহাসিরাশি দেবী

(১)

ওরা সবাই যেন শুধু খাটবার জন্যই জন্ম নিয়েছে।

দিন নাই, রাত্রি নাই, শুধু কাজ ক'রে, আর ঐ ঘরেই বাস করে, সবাই মিলে কলরবও করে, যেন ও-থেকে বাইরে বিশ্রাম করাটাও ওদের পক্ষে অনাবশ্যক। এমনি ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করতেই ওরা এই দুনিয়ার সরাইখানায় এসেছে, আবার এমনি ক'রেই অকস্মাৎ একদিন এখান থেকে বিদায় নেবে। ওদের আবাসস্থল,—এই লম্বা একটানা স্যাঁৎসেতে ঘরগুলো যে কতদিন হ'তে এইখানেই মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, তার হিসাব ওরা রাখে না, রাখে বাস করার খবর।

এই আশ্রিতদের মধ্যে মথুরও একজন। এই ব্লকেরই চার নম্বর কোয়ার্টার নিয়ে সে থাকে। বয়স তার পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কাছে পৌছেছে, দেখতে মন্দ নয়, তবে এখনও কুমার,—বিবাহে নাকি ইচ্ছা নাই। উপস্থিত— নিজের বলতেও কেউ নাই, গেল বৎসরে মা-ও চিত্রগুপ্তের খাতায় নাম লিখিয়েছেন, তাই নিজেকেই হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয়।

এ ব্লকের মধ্যে মথুরই না কি রাসভারী লোক, অন্ততঃ পাশের ঘরের ফকির তো তাই বলে এবং এই নিয়ে নাকি একদিন তার সঙ্গে তার অতিবড় বন্ধু কুঞ্জনেরও হাতাহাতি হ'বার উপক্রম হ'য়েছিল, একথাও সে কথায় কথায় মথুরকে জানিয়ে দেয়।

একটু হেসে মথুর বলে—

"জবাব দিস্ কেন? যে যা বলে বলতে দেনা।"

ফকির তার শির-ওঠা সরু সরু হাত পা নেড়ে কোটরাবিষ্ট চোখ দুটো বিস্ফারিত করে বলে ওঠে—

"বল কি দাদা! ওরা সবাই মিলে তোমার নামে যা-তা ব'লে যাবে, আর আমি তাই মুখ বুজে সইব? সে আর যে সয় সইবে, এ শর্ম্মার দেহে একছিটে রক্ত থাকতে, সে তা পারবে না।"

বার দুই শূন্যে ঘুসি ছুড়ে ফকির ঠাণ্ডা হয়; তার পরে অন্যমনস্ক মথুরের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—"কলকেয় আগুন দেব দাদা?"

মথুর তেমনি স্বরেই বলে—"দে।"

দু' চার টান টানবার পরে ফকির উঠে দাঁড়ায়; অতি ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ হাত দু'খানা একসঙ্গে কপালে ঠেকিয়ে সপ্রতিভের হাসি হেসে বলে—"আজ তা হ'লে আসি দাদা।"

মথুর বলে,—"আচ্ছা।"

তার পরে ফকির চন্দ্র তিন লাফে পথটুকু পার হয়ে নিজের ঘরে ওঠে, আলো জ্বেলে রান্না চড়িয়ে হয় গান গায়, নয় তো সকালের রান্না ভাত কলাইকরা, রংচটা থালার উপরে ঢালতে ঢালতে চীৎকার করে বলে—"আর এ হাড়ির জোয়াল বইতে পারি নে,—জানলে দাদা, এবার বোন্‌টাকে দেখছি আনতেই হবে, নইলে রাঁধবে কে? আবার ভাবি আন্‌বই বা কি! কি খাওয়াব সেটাও তো ভাববার কথা। মিস্ত্রীর কাজ করে যা মাইনে পাই তাতে একজন, বড় জোর দু'জনের কষ্টে চলতে পারে, কিন্তু সে তো আর একা নয়, তার একটা ছেলেও আছে যে। তাই ভাবি—।"

মথুরের তরফ থেকে জবাব আসে—"ভাব্‌বার কথাই তো।"

উৎসাহিত ফকির বলে—"বাপ্ যে করে ইহকালের সবে সম্বন্ধ চুকিয়েছিলেন, তা জানি নে দাদা; আর সে সম্বন্ধেও একটা মস্ত বড় ব্যাপার আছে, আচ্ছা সে একদিন তোমায় সব খুলে ব'লব এখন।"

ব'লে মনে মনে কি কতকগুলো কথা যেন ভেঁজে নেয়,

তার পরে আবার গলার স্বর পঞ্চমে চড়িয়ে সুরু করে—

"সে কথা নয় বাদই দিলাম; পরে—মা মারা যাবার সময় যখন ঐ বোনটীকে আমায় দিয়ে যান, তখন ও সবে সাত বছরের। সেই থেকে ওকে এগার বছরেরটী ক'রে, আমার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করে' জানলে দাদা, ওর তবে বিয়ে দেই। ভাবলাম, পাত্তর ভাল,—একটা পাশও যে-কালে ক'রেছে, সেকালে আমার পক্ষে হীরে কুড়িয়ে পাওয়া।

"তারপরে—বুঝলে দাদা! বিয়ে তো দিলাম, বোনও আমার শ্বশুর বাড়ী ঘর করতে গেল; কিন্তু গেলে হ'বে কি, জামাইয়ের অত্যাচারে দেহে ওর আর কিছু রইল না, তবু ও মুখ বুজেই সয়ে ছিল, কিন্তু আমি আর সইতে পারলাম না, একদিন জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বোনটাকে নিয়ে চলে এলাম। ওদিকে দেনার দায়ে, অপমানের জ্বালায় জ্বলে শেষে একদিন জামাইও গলায় দড়ী দিল।"

এই পর্য্যন্ত বলেই সে একটুখানি থামে, তারপরে আবার ব'লে যায়:—"বোনটা আমার কেঁদে কেঁদে পাগলের মত হ'য়ে গেল, তখন ঐ হতভাগা ছেলেটা ওর কোলে। যাক্, যদি একটু শান্তি পায় ভেবে একদিন ওর কথাতেই ওকে ওর শ্বশুরবাড়ী রেখে এলাম। সেই থেকে প্রায় তিন বছর—এই তিন বছর আর তাকে আনতেও যাই নি, দেখিও নি, জানলে দাদা! তাই ভাবছি এবার একবার তাকে আনব কি না!—"

কথাটা সে এইখানেই শেষ ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাসও চেপে গেল ব'লে মনে হ'ল।

তারপরে তার থাওয়ার পালা।

এ ব্লকে বাঙালী ছাড়া অন্য জাতও আছে, তবে তারাও যেন হাব-ভাবে, কথায়-বার্ত্তায় প্রায় বাঙালীই হ'য়ে পড়েছে। এমনি একটী বিদেশী পরিবার থাকে ঐ সাত নম্বরে। পরিবার বলতে বোঝায় স্বামী আর স্ত্রীকে।

স্বামী লক্ষ্মীকান্তর সঙ্গে স্ত্রী ভানুমতীর চীৎকার, গালা-গালি প্রভৃতি প্রায় প্রত্যহই কানে আসে; আর তার পরেই শুনতে পাওয়া যায় লক্ষ্মীকান্ত'র তর্জ্জন-গর্জ্জন ও ভানুমতীর রোদন ধ্বনি।

লক্ষ্মীকান্ত চীৎকার করে:—হারামজাদী, মনে করেছিস্ আমি বেঁচে থাকতে তুই মেয়েছেলে হ'য়ে আমার ওপরে মোড়লী করবি, নয়! আর আমি মরদ হ'য়ে সইব? প্রাণ থাকতে নয়, একথা জেনে রাখিস্। সাধে মনে হয় এক ঘুসিতে তোর ঐ দুপাটি দাঁতকে দাঁত সাফ ক'রে দেই? হারা—ম্—জা-দী!

পশ্চিমে ওদের পূর্ব্ব পুরুষের বাস থাকলেও ওরা অনেক দিন থেকে বাংলায় বাস ক'রছে, তাই কথা-বার্ত্তা, হাব-ভাব সবই বাঙালীর মত।

ঝগড়া মারামারির কারণটাও সামান্য:—লক্ষ্মীকান্ত'র তাড়ি খাওয়ার পয়সার অভাব, তাই এই কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি।

দশ নম্বরের নুটবিহারীর বৌ বার হ'য়ে এসে দাঁড়ায়। এদের সকলের মধ্যে তারই আর্থিক অবস্থা একটু স্বচ্ছল, সন্তানহীনা নুটু গৃহিণীর গায়েও যা হোক্ দু'পাঁচখানা সোনা-রূপোর গহনা আছে।

স্ফীতোদরা নুটুবিহারীর গৃহিণীকে গজেন্দ্রগমনে সম্মুখে এসে দাঁড়াতে দেখেই লক্ষ্মীকান্ত আরও চীৎকার ক'রে বৌয়ের কুকার্য্যের শাস্তিদানে উৎসাহের আশায়।

হাত নাড়ার সঙ্গে ফাঁদি নথ নেড়ে প্রৌঢ়া নুটু গৃহিণী বলে, "থাম্‌কা এমন ঝগড়া ঝাঁটি বাধিয়েছ কেন গা বাছা। দুঃখের ভাত সুখ ক'রে খেতেও কি লোককে শেখাতে হয়?"

লক্ষ্মীকান্ত বলে, "তুমি জান না মাসী, বৌটা ভারী উড়নে; যা দু'পয়সা ঘরে রেখে যাব',—ফিরে এসে তার আর টিকিটি পর্য্যন্ত দেখতে পাব না। কাঁহাতক এ অত্যাচার সহ্য করি বলো তো শুনি! রাগ হয় না—"

সমব্যথীর মত মাসী ব'লে ওঠে:—"আহাঃ! তা তো হ'বেই বাছা, সে তো হওয়ার কথাই; হাজার হোক্ ব্যাটাছেলে!—বাইরের কাজ থেকে ফিরে ঘরে যদি একটু না শান্তি পায়, তো মন টিকবে কেন?"

উৎসাহিত লক্ষ্মীকান্ত আরও গোটা দুই কিল চড় বৌয়ের উপরে বসিয়ে দিয়ে বলে—

সাধে মনে হয়—"শালীকে খুন্ ক'রে যদি ফাঁসি যেতে হয় সেও—বি-আচ্ছা, তবু—ওর মুখ আর দেখব' না!"

বে-গতিক দেখে স'রে প'ড়বার মতলবে অন্যদিকে পা বাড়িয়ে দোক্তাসহ গোটাকতক পান মুখ-গহ্বরে ফেলে দিতে দিতে মাসী বলে :—"যা হ'য়েছে, হ'য়েছে; আজকের মত' কসুর মাফ কর' লক্ষ্মীকান্ত অন্যদিন না হয়—"

অসময়ের মহাজন মাসীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে লক্ষ্মীকান্ত উদ্যত মুষ্টি ফিরিয়ে এনে বলে, "এ শুধু তোমারই কথায় মাসী এবারের মত ওর জান্ বাঁচল' জেন', নইলে আমি এই তোমার নামে দিব্যি ক'রে বলতে পারি, আজ ওকে খু—ন্ ক'রে ফেল্‌তাম; তাতে নালিশ, পুলিশ, যে যা পারে ক'রে নিত, আর এ লক্ষ্মীকান্ত ও দেখত' কার দৌড় কত;—বুঝলে মাসী!"

মাসী কি ব'ল্‌তে যেতেই বাধা দিয়ে হাত নেড়ে ব'লে ওঠে—"আর কি জান? কথায় আছে মুগুর নইলে কুকুর সোজা হয় না, এও হ'য়েছে ঠিক্ তাই।"

কথাটা ব'লে ইঙ্গিতে রোরুদ্যমানা ভানুমতীকে দেখিয়ে দিয়ে দাঁত বের ক'রে হাসে; যেন কুণ্ঠার আবরণও সে পুড়িয়ে ফেলেছে! মাসী হাসিতে যোগ দিতেই আবার বলে :—"কিন্তু একটা কথা—মাসী"

মাসী কথাটার অর্থ বোঝে, তাই সহজে উত্তর দিতে চায় না, শেষে বলে, "বল।"

একটু ইতঃস্তত ক'রে লক্ষ্মীকান্ত বলে ওঠে—"বলছিলাম কি এই-গে তোমার হ'য়ে,—মানে, হাতটায় এখন কিছু নেই, বুঝলে না?...তাই, এই তো তোমায়—বলছিলাম কি...যে" মাসীর হাসির অভাব হয়; তবে—মাসীর নেক্‌নজর আছে ব'লতে হ'বে, কারণ সহজে সে লোক ফেরায় না। বলে—"কিন্তু বেশী তো এখন হাতে নেই—বাছা।"

লক্ষ্মীকান্তর তখন নেশার টানে প্রাণটা শুকিয়ে টা টা ক'রছে; সবিনয়ে হাত দুটো জোড় ক'রে বলে ওঠে—'যা হোক—যা তোমার দয়া-ধর্ম্মে লাগে তাই হাত তুলে দিও তখে।"

মাসী বলে "তবে তাই।"

দর্ বাড়াবার জন্যে গম্ভীরস্বরে লক্ষ্মীকান্ত বলে, "কিন্তু মাইনে না পেলে শুধতে পারব' না মাসী, মেসোকে ব'লো।"

মাসীর পানের ছোপে রাঙা টুকটুকে পুরু ঠোঁটের ওপরে বিদ্যুতের মত এতটুকু খুশীর হাসি খেলে গেল। বলে "আচ্ছা, সে হ'বে'খন! মাসী তোমার তেমন মেয়ে নয় বাছা, যে দু'দিনে টাকার তাগাদা লাগাবে! যত দিনে হয় তুমি দিও, তবে সুদটার হিসেব জান তো?..."

লক্ষ্মীকান্ত সোৎসাহে বলে "সেজন্যে তুমি ভেব না মাসী। লক্ষ্মীকান্তর যে কথা সেই কাজ, হাতিকা দাঁত, আর মরদ্‌কা বাৎ,—একথা সে জানে।"

"আচ্ছা।" বলে মাসী চ'লে যায়।

ফিরে এসে লক্ষ্মীকান্ত তখন ভানুমতীর মান ভাঙ্গায়, খাওয়া-দাওয়া করে, হয় তো বা প্রহারের স্থানটাতে গরম তেল মালিশও ক'রে দেয়।

এমনি ক'রে দিন যায়।

(২)

দিন দু'য়েকের ছুটী নিয়ে ফকির গিয়েছিল তার বোনকে আনতে।

সে দিন বিকেলে ফিরে,—বারান্দায় মথুরকে বসে দেখেই গাড়ী থেকে নেমে এগিয়ে এল; পায়ের ধুলো নিয়ে হাসিমুখে ব'লে উঠ্‌ল—"সরোকে নিয়ে এলাম দাদা!"

কুণ্ঠিত মথুর পা সরিয়ে নিতে নিতে ব'লল, "তাই না কি? বেশ! বেশ!! তারপর?—এখন আর পাঠাচ্ছ না তো!" পথশ্রমে শুষ্ক ঠোঁট দুটোকে লালায় একটু ভিজিয়ে নিয়ে ফকির বলে উঠল "রাম কহ—; সে ছোট লোকের বাড়ী আবার বোনকে পাঠাব ভেবেছ, কখন নয়। একে এই খরচ-পত্তর ক'রে নিয়ে আসা, মেহনতের তো কথাই নাই,—তার ওপরে বোনটার যে হাল হ'য়েছে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না দাদা; আচ্ছা, তাও নয় সইলাম, কিন্তু শেষে ওর শ্বশুর বেটা বলে কি না পাঠাব না!"

বললাম—'বটে!' আচ্ছা দেখাই যাক—ছিদেম মোড়লের পো ফকিরেরই বাঁ বুকের পাটা কত বড়, আর ঐ বুড়োরই বা দৌড় কতখানি। বৎস—, ঐ পর্য্যন্ত,—

জান্‌লে দাদা শেষে বল্‌লাম, লিখে দাও আমার বোনের যদি কোনওরকমে প্রাণের হানি হয় তো তুমি দায়ী ; বিয়ে দিয়েছি বলে তো বোনটাকে আমার জীবন-সর্ত্তে বিক্রী করিনি! তাও বুড়ো তাই-ই লিখে দিতে এসেছিল—কিন্তু বুড়ী লিখতে দিলে না ; কেঁদে কেটে, বুড়োর হাত ধ'রে বললে—আমার ছেলেই যখন গেছে, তখন ছেলের বৌ নাতিতে আমার দরকার ?—" আমি বল্‌লাম—"সাঁচ্চাবাৎ হ্যায় !—এর পরেই একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে চ'লে এলাম।"

এই পর্য্যন্ত বলে ফকির নিজের রসিকতায় নিজেই উৎফুল্ল হ'য়ে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠ্‌ল।

মথুর কি উত্তর দেবে ভেবে পেলেনা ; মুখের উপরে শুষ্ক হাসি টেনে এনে ব'লে উঠ্‌ল, "তারপরে ?...ভাগনেটী ভাল আছে তো ?"

"তা তোমাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে ভালই বলতে হ'বে দাদা। তাকে আন্‌তুম কিন্তু আনলুম না এই ভেবে, যে ভাগনে তো শুধু একা আমারই নয়, আমায় যখন ভাই বলেছ তখন ও তোমারও ভাগ্‌নে। তাই ভাবলুম যে, আমার আগে তোমারই গিয়ে একবার দেখে আসা উচিত নয় কি ?"—

লজ্জিত মথুর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল—"তাতো একশো বার, হাজার বার !"

এমন নির্ব্বিচারে যে পরের সঙ্গে আত্মীয় সম্বন্ধ পাতিয়ে নেয়, তাকে ব্যথা দিতেও প্রাণে বাজে যে! কিন্তু ফকির তা বোঝে না, হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠে বললে—

"দাদা আমার ভোলানাথ্‌। এতটুকুও দুই দুই নেই ; শুধু এরই জন্যেই তো মনে হয় যে—"

সস্নেহ তিরস্কারের স্বরে মথুর ব'লে উঠল, "তুই থাম্‌ তো ফক্‌রে !"

হাসিমুখে ফকির জবাব দিল,—"তা তুমি যাই কেন ব'ল না দাদা, আমি কিন্তু তোমার কথা জীবনে ভুলব'না, যদি কখনও চাক্‌রী ছেড়ে ভিন্নদেশে যাই, তা হ'লেও তোমায় ভাব্‌ব।

"তবে আমার ভাবনাটাই বা কিসের ?" ব'লতে ব'লতে মথুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তখুনি বার হ'য়ে এল ; কোঁচার খানিকটা অংশ খুলে গায়ে জড়াতে জড়াতে ব'ল্‌লে, "চল্‌—"

পাঁচ সাত পা পার হ'তেও হয় না, তিন কি বড় জোর চার পা পার হ'য়েই ফকিরের ঘর। বারান্দায় মাদুর পেতে মথুরকে ব'সতে ব'লে সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চ'লে গেল ; মথুর শুনতে পেলে ফকির তার বোনকে উদ্দেশ ক'রে ব'লছে—কাপড়-চোপড় আব ছাড়তে হবে না, ঘরের মানুষ উনি, লজ্জা কিসের ? খোকাকে নিয়ে আয়।"

একটু পরে ফকিরের সঙ্গে যে শ্যামাঙ্গী তরুণীটী বাহিরে এসে সঙ্কুচিত ভাবে মথুরের পদধূলি নিয়ে ক্রোড়স্থিত শিশুপুত্র এবং নিজের ললাটে স্পর্শ করালে, তার শান্ত সৌন্দর্য্যের দিকে তাকিয়েই মথুর মুখ ফিরিয়ে নিলে। ক্ষণিকের জন্য তার সমস্ত চিত্তটাকে অতীতের কতকগুলো স্মৃতি এসে ওলোট-পালট ক'রে দিয়ে গেল ; আশীর্ব্বাদের কথাও সে উচ্চারণ ক'রতে পারল না, শুধু হাতের টাকাটা নিঃশব্দে খোকার হাতে তুলে দিলে।

ফকির "হাঁ হাঁ ক'রে উঠল,—এ আবার কি কাণ্ড বল দিকি দাদা, তোমার কি সব তাতেই এই রকম ? না, না, এ হ'তেই পারে না ; থাক্‌ থাক্‌—"

মথুর উঠে দাঁড়িয়েছিল ; ব'ললে,—"ও কিছু নয় ফক্‌রে, বকিস্‌ নে। ভাগ্‌নে তো আমারও ; ওটা ওর খাবারের জন্যেই দিয়ে গেলাম মনে করিস্‌—" সে নিজের বাসার দিকে পা বাড়াচ্ছিল।

বাধা দিয়ে ফকির ব'লে উঠলে—"কিন্তু তোমারও তো যাওয়া হ'তে পারে না, দাদা,—বোস ; একেবারে চা খেয়ে যাবে, সরো চা চাপিয়েছে! আর আমার চায়ের নেশাটার কথা জান তো,—তাই ও গাড়ী থেকে নামতে না নামতেই ব'ললাম, আগে চা'য়ের ব্যবস্থাটা দেখ্‌ দেখি দিদি, নইলে তোর দাদার যে জিভের সঙ্গে প্রাণটাও শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে উঠল।"

সে হাসতে লাগল।

মথুর অন্যদিকে তাকিয়ে আড়ষ্টের মত' দাঁড়িয়েছিল,—সরো তার এই কুণ্ঠা বুঝে যেন নিজের দিক থেকেই তার

এই জড়তার জাল ছিঁড়বার জন্যে ব'লে উঠল—"দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবু দাদা, ব'স ; আমার চা হ'ল ব'লে।"

সে খোকাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে ঘরে যেতেই ফকির খোকার হাত থেকে যেন ছোঁ মেরে টাকাটা তুলে নিলে। জামার বুক পকেটে রাখতে রাখতে ব'লে উঠল—"কি রকম ওর আক্কেল, দেখলে দাদা, ছেলেটার হাতে টাকাটা যে তুই রেখে গেলি, হারালে কি ক'রবি বল তো ?—ওর সব ভাল কেবল এই অন্যমনস্কতাটাই ওকে মাটি ক'রেছে,—আর ঐ জন্যেই, মাইরি বলছি দাদা, ওকে আমি দেখতে পারি নে।

মথুর উত্তর দিতে পারল না, চুপ করে ব'সে নখ দিয়ে মেঝের উপর আঁক কাটতে লাগল।

ফকির নিজের গায়ের পাঞ্জাবীটা খুলে দেয়ালের হুকে টাঙাতে টাঙাতে ব'ললে,—"কিন্তু কি ক'রব বল, মায়ের পেটের বোন, ফেলতেও তো পারি নে।"

একখানা পাখা হাতে ক'রে এসে সে মথুরের পাশে ব'সে প'ড়ল।

ঘর্ম্মাক্ত মুখখানা কোঁচার খুঁটে মুছে ফেলে হাওয়া কর'তে ক'রতে ব'লল,—গায়ের ঢাকাটা খুলে ফেল না দাদা, যে গরম, বাপ,—

মথুর কি উত্তর দিল ভাল বোঝা গেল না ; ফকির আর তাকে ডাকতে সাহসও ক'রল না, উঠে—তামক সেজে এনে মথুরের হাতে দিয়ে আবার হাওয়া ক'রতে লাগল।

সরোর ছেলেটা আড়ষ্টের মত একদিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল—তাকে দুহাতে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ফকির তার রুক্ষ চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যে কলাই করা দু'টো কাপে চা এল। একটা কাপ মথুরের দিকে এগিয়ে দিয়ে, আর একটায় চুমুক দিতে দিতে ফকির ব'লে উঠল,—"তোর চা আছে তো ?—"

সরো চ'লে যাচ্ছিল ; থেমে, মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিল—"চা তো আমি খাই নে !"

ফকির হাতের কাপটা নামিয়ে রেখে প্রথমে কিছুক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে সরোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল,—তারপরে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে ব'লল—"কিন্তু ওসব তোমার চ'লবেনা সরো। চা তোমাকে খেতেই হবে, কারণ এখানে,—মানে এই শহরে চা না খেলে শরীর টেঁকে না ; শেষে যদি তোমার অসুখ-বিসুখ হয়, তখন তোমায় দেখবে কে, আর আমিই বা খাব কোথায় ? ওসব চাল্ তোমার শ্বশুরবাড়ীর জন্যে রেখে এখানে আমার মতে চল দেখি, সবদিকে ভাল হ'বে।

সরোর উজ্জ্বল মুখখানা মলিন হ'য়ে গেল ; একটু হাসির রেখা ঠোঁটের উপর টেনে এনে উত্তর দিল—"কিন্তু বিধবার তো শুনেছি ও সমস্ত খেতে নেই !"

ফকির মাদুরের উপর সজোরে একটা চাপড় মেরে ব'লে উঠল,—"কে বলে নেই ; আলবৎ আছে। যে বলে নেই তাকে একবার দেখতে পেলে আমি—"

সে থেমে গেল। মুখের ভাবটা তার এমন হ'য়ে উঠল যে দেখলে তার প্রতিশোধের কল্পনা অনুভবে বুঝেও ভয় হয়। একটু থেমে বলল—"বিধবা হ'য়েছে বলে কি তার খাওয়া-দাওয়া, সাধ-আহ্লাদ সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে হ'বে ? তুমি কি বল দাদা ?" ব'লে সে মথুরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে মথুরও যেন এতক্ষণ পরে বলার মত একটা কিছু কথা খুঁজে পেলে। বললে—"আমি তো মানি নে।"

সোৎসাহে ফকির ব'লে উঠল, "ঠিক বলেছ, কিন্তু তোমার চা-টা যে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে এল হে—"

কাপটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে তার উদর শূন্য করল।

প্রসঙ্গটা পুরা দমে চল্‌বার উপক্রম হ'তে দেখে, মলিন মুখে সুরো সরে গেল।

মথুর বলে উঠল—"যারা এই সব নিয়মগুলো ক'রে রেখে গেছে, তারা নিজেদের দিক দিয়ে তো করে নি, ক'রেছে ঐ মেয়ে জাত-গুলোর জন্যে, কিন্তু নিজেদের উপরে যদি এমনি একটা কিছু নিয়ম রেখে পুরুষানুক্রমে মেনে আসতেন তা হ'লেও নয় বুঝতাম—"

ফকির ব'লে উঠল—"সে নেওয়া ব'ললেই নেওয়া নয় দাদা, বাপ বাপ ডাক ছাড়তে হ'বে। পুরুষ আর মেয়েদের মধ্যে আরও একটা প্রভেদ দেখ দেখি,—পুরুষের বৌ ম'রলে দু'টো কেন আবার দশটা বিয়ে করতে পারে, আর মেয়েরা বিধবা হ'লে, বিয়ে তো দূরের কথা সবই প্রায় ত্যাগ ক'রতে হ'বে, তা ছাড়া

মাসে দুটো করে উপোস। একি কম কথা, না সহ্য করা যায়? এ কিন্তু আমি সইতে পারব' না দাদা, সে কথা তোমায় ব'লে দিচ্ছি। আমি যে মাছের ঝোল দিয়ে দিব্যি দু'বেলা পেট ভ'রে ভাত খাব, আর ও-যে মুখটা শুকিয়ে বেড়াবে, এ আমি প্রাণ থাকতে দেখতে পারব না। আমি ওসব নিয়ম উলটে দেব, ওকে উপোস দিতে তো দেবই না, তা ছাড়া ওর আবার আমি বিয়েও দেব।"

মথুর চমকে উঠল, কিন্তু কোন জবাব দিল না।

ফকির নিজের খেয়ালেই বলে চলল, "সে হ'বে নাই বা কেন, কিসের জন্যে? কিসের জন্যেই বা সমাজের এ অত্যাচার সইব? আমার নিজের দিক দিয়েই দেখ না দাদা, বিয়ে ক'রেছিলাম, বছর খানেক যেতে না যেতে বৌ পটল তুলবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিজ্ঞা ক'রে ফেললাম বিয়েই আর করব না। বিয়ের পাটই চুকিয়ে দিয়েছি, আর কথা কিসের। ছেলেপুলেও নেই, এখন এ সারা জীবনটা আমি কাটাই কা'দের নিয়ে বল তো? সংসার ব'লতেও কিছু চাই তো, এই জন্যেই ইচ্ছে আছে ভাগ্‌নেটাকে আর কাছ ছাড়া ক'রব না।" ব'লতে ব'লতে মুখ নত ক'রে সে সরোর ছেলের ললাটে গভীর স্নেহে একটা চুম্বন-রেখা এঁকে দিয়ে, মুখ তুলে ব'লতে সুরু ক'রল—"আর গিয়ে,—সরোকেও আমি আর এ বেশে এ হালে দেখতে পারি নে দাদা, তা যাই বল, ওর আবার আমি বিয়ে দেব, বয়েসই বা এখন ওর কত, সতের, কি বড় জোর আঠার, এর বেশী তো একটী দিনও নয়।"

উৎসাহ-ভরা চোখে সে মুখ তুলে মথুরের দিকে তাকাতেই দেখলে সে তার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। ফকিরকে তাকাতে দেখে ব'ললে, "এখন উঠি তা হ'লে।"

কথার খেই ছেড়ে দিয়ে ফকির প্রশ্ন ক'রলে, "আবার আসছ কখন, শুনি?—"

"আমি?—"ব'লে কি একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিল, "তুমিই না হয় সন্ধ্যার পরে ওখানে যেয়ো এখন, আমার আবার রান্নার পাট আছে তো?"

ফকির বলে উঠল—"দুত্তোরি রান্না। রান্নার নিকুচি ক'রেছে। আরে—না হয় এখানেই খাবে, সরো রাঁধছে।"

মথুর কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়লো—"না, না।"

ফকির দাবীর স্বরে বলে উঠল—"না আবার কি? ও-সব আর চ'লতে দিচ্ছি নে দাদা, বোন্‌কে এনেছি, ভাইরাই যদি রেঁধে খাবে তবে বোনের আর কাজটা রইল কি বল তো? আর কি জান, আমি নেমেই ওকে তোমার খাবার কথাও বলেছি কি না, তাই তুমি না খেলেও ও বড় দুঃখ ক'রবে।"

অনেকখানি খুশী হ'য়ে মথুর বেরিয়ে গেল।

(৩)

সামনের ঘরটায় একটী নূতন ছোক্‌রা এসেছে। প্রায়ই সে ফকিরের বাসার দিকে চেয়ে,—বারান্দায় বসে গান গায়—

"যায় ডুবে যৌবনের তরী অকূল তুফানে—
জোয়ারের ঢেউ লেগেছে রাখতে পারি নে।"

মথুর লক্ষ্য করেছে, কিন্তু ফকির তা ইচ্ছে ক'রেও খেয়াল করেনা; হেসে উত্তর দেয়—

"মেয়েদের সব কথায় কান দিতে গেলে চলে না দাদা, ওসব ছেড়ে দাও।"

মথুর মুখে কিছু বলে না, কিন্তু মনে মনে ওর উপরে রুষ্ট হয়। একবার তার বলতে ইচ্ছে করে—"অত আপন-ভোলা হওয়া ভাল নয় ফকির,—শেষে পস্তাবে।"

কিন্তু ওকে বলে কোনও ফল নেই ভেবে চুপ ক'রে যায়, নিজেও ভাবে—যাক্‌গে।

ফকিরের কাজ দশটা থেকে পাঁচটা, আর মথুর যায় সাড়ে দশটায়, আসে সাড়ে চারটেয়।

সেদিন ফকির কাজে যাবার পরে সরো তার ভিজে কাপড়খানা শুকাতে দিতে বাইরে নেমেছিল,—নিজের বাসায় মথুরও কাজে যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি ক'রছিল; হঠাৎ কা'নে এল, ওবাসার বারান্দা থেকে নবাগত ছোক্‌রাটী গান ধ'রেছে—

"যায় ডুবে যৌবনের তরী অকূল তুফানে,
জোয়ারেরই ঢেউ লেগেছে রাখতে পারি নে।"

অসহ্য একটা উত্তেজনায় মথুরের সমস্ত শরীরের রক্ত

যেন চঞ্চল হ'য়ে উঠল; হাতের জামাটা বিছানার উপর ফেলে সে বার হ'য়ে এসে ছোক্‌রাটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ব'লে উঠল; "মশায়ের এই পেশা না কি?"

ছোক্‌রাটীর গান থেমে গেল; সম্মুখে হঠাৎ কৃতান্তের মত মথুরকে এসে দাঁড়াতে দেখে একটু ভড়কেও গেল বোধ হয়, কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। উঠে এসে চোখ-মুখ গরম ক'রে উল্টো প্রশ্ন ক'রল "তার মানে?"

ক্রোধকম্পিত স্বরে মথুর জবাব দিল "মানে খুবই সোজা; ভদ্রলোকের বৌ ঝি বাইরে বার হ'লে নির্লজ্জের মত তাকিয়ে থেকে খেউড় গাওয়া! কিন্তু ওসব এখানে চ'লবে না মশাই, সোজা ব'লে দিচ্ছি; এটা গরীব লোকদের পাড়া হলেও ভদ্রপাড়া, বুঝে সুঝে চ'লতে পারেন তো চলবেন, নইলে পাত্‌তাড়ি গুটোতে হবে।"

ছোক্‌রাটী দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। বুক ফুলিয়ে ব'লল,—"তেরিয়া মেজাজ নিয়ে এসেছেন যে, মারবেন না কি, না আপনিই আমায় বাসা থেকে তাড়িয়ে দেবেন মশাই, শুনতে পাই না? কিন্তু এটাও আপনার জেনে আসা উচিত ছিল যে এটা কারও বাবার বাড়ী নয়, এটা কোম্পানীর ব্লক—বুঝলেন? না বুঝে থাকেন তো মাথায় তেলজল দিয়ে বুঝুন গে।"

মথুরের হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হ'য়ে উঠছিল; চড়াস্বরে ব'লল,—"ঠাণ্ডা গরমের ধার ধারি না মশাই,—তবে এটা জানি যে, ভদ্রলোকের মেয়েছেলের দিকে যে লক্ষ্য করে, তার অপরাধের গুরুত্ব ঘা কতক দিয়ে বোঝাতে হয়।"

"বটে?—তাই না কি? কই, বোঝাও না—" ব'লতে ব'লতে ছোক্‌রাটী হাতের আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে আসতেই মথুরের একটা চড় খেয়ে উল্টে বেড়ার উপরে গিয়ে প'ড়ল।

সমস্ত পাড়াটায় এই খবরটায় প্রচার হ'তেই লোকজন জমা হ'য়ে গেল।

কোম্পানীর তৈরী ব্লক,—লম্বা একটানা; দেখতেও ঠিক একরকম, প্রভেদ পাওয়া যায় শুধু নম্বরে; তবে ব্লকের মাঝখানের জায়গাটুকু দিয়ে একখানা গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে, লাল কাঁকর ঢাকা আছে।—ঠিক এমন সময়ে দেখা গেল একখানা মোটর হর্ণ দিতে দিতে ছুটে আসছে, মুহূর্ত্তে পথের জনতা স'রে গেল, কিন্তু উঠল একটা আর্ত্তরব,—"গেল! গেল!"

সচকিত জনমণ্ডলী চলন্ত মোটরের দিকে ছুটে আসতেই সরো নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে প'ড়তে প'ড়তে রয়ে গেল। পাশ দিয়ে ভোঁ ভোঁ শব্দ ক'রতে ক'রতে মোটরটা বার হ'য়ে যেতে, কতকটা প্রকৃতিস্থ হ'য়ে যে মথুরের দিকে এগিয়ে এসে বলল,—"ঘরে চল বাবুদা—।"

মায়ের বুকের মধ্যে মুখ রেখে সরোর ছেলে খাঁদু তখনও ভয়ে কাঁপছিল। মুখটা বার করে ক'রে মথুরের দিকে তাকিয়ে আধ আধ স্বরে সেও মায়ের কথার পুনরাবৃত্তি ক'রলে "ঘরে—চল।"

মথুরের মুখখানা সরোকে দেখে আরও ভার হ'য়ে উঠল; গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন ক'রলে—"তুমি এখানে কেন?"

সরো ব'লল,—"ঘরে চল।"

মথুর তার কথা কানে তুললে না; সরোর কাতর কণ্ঠস্বর, করুণ দৃষ্টি যেন তাকে স্পর্শও ক'রতে পারে নি, এমনি একটা উপেক্ষার হাসি হেসে সে সরোর কাছ ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে সেইখানে দাঁড়াল, যেখানে তার ও সরোর নাম এক সঙ্গে মিশিয়ে কয়েকজন একটা বিশ্রী কথার সৃষ্টি ক'রছিল। কপালের উপর পর্য্যন্ত মাথার কাপড়টাকে নামিয়ে দিয়ে সরো মথুরের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নির্ব্বাক-বিস্ময়ে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ তার চরিত্র সম্বন্ধে একটা কথা কানে আসতেই মুহূর্ত্তের জন্য যেন পাথর হ'য়ে গেল, তারপর ধীরে ধীরে বাসার দিকে পা বাড়ালেও কখন যে বাসায় পৌঁছে ধুলাভরা বারান্দায় লুটিয়ে প'ড়েছিল সেদিকে তার খেয়াল ছিল না, খাঁদুর কান্নায় খেয়াল হ'ল ওর কণ্ঠস্বর তখন সপ্তম পর্দ্দায় উঠেছে বোধ হয়। চীৎকার ক'রে সরো ওকে তাড়া দিয়ে উঠল—"দূর হ' আপদ,—তোর মা ম'রেছে।"

খাঁদু আরও জোরে চীৎকার ক'রে উঠল, "ওমা! মা গো!"

ঠিক এমনি সময়ে বাইরে থেকে দরজায় করাঘাত প'ড়ল, "সরো!"

কণ্ঠস্বর মথুরের।

সরোর সমস্ত দেহ-মনে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিল।

মনে হ'ল ঐ লোকটা একাই যেন তার সমস্ত অখ্যাতির মূল! ও যদি আজ এখানে না থাকত, তা হ'লে কারো কিছু বলারই বা সাধ্য থাকৃত কোথায়?

স্নান-সিক্ত যে চুলগুলো বুকে, পিঠে, বাহুতে প'ড়ে লুটোপুটি খাচ্ছিল সেগুলোকে তুলে দুই হাতে উঁচু ক'রে জড়াতে জড়াতে সরো চড়া সুরে উত্তর দিল, "কেন, কি ব'লছ?"

বাইরে থেকেই মথুর প্রশ্ন ক'রলে, "খোকা কাঁদছে কেন, তাই জিজ্ঞাসা ক'রতে এসেছি।"

সরো আরও একপর্দ্দা কণ্ঠস্বর চড়িয়ে উত্তর দিল, "ও মরবে কি না, তাই; কিন্তু তুমি—তুমি আবার এলে কেন? যাও—তুমি যাও।"

"আমি অন্য কিছুর জন্যে আসি নি সরো, খাঁদু কেঁদেছিল বলে তাই"—এই বলে সে চলে গেল।

সরো জাফরী আঁটা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিল। মথুরকে চ'লে যেতে দেখে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে আবার শুয়ে প'ড়ল, খাদু তখন চুপ ক'রেছে।

সরো বাহুর উপরে মাথা রেখে শুয়েছিল, কখন যে দুই চোখের কোণ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়েছিল সেদিকে তার লক্ষ্য ছিল না, কতক্ষণই বা এমনি ক'রে কেঁদেছিল তাও তার ঠিক ছিল না। চোখ মেলতেই দেখলে—শরতের উজ্জ্বল রৌদ্র কখন ছাদ, প্রাচীর ডিঙিয়ে বাইরের বাঁধান জায়গাটীতে এসে পড়েছে।

সরো উঠে বসল, মনে পড়ল খাঁদুকে এখনও কিছু খাওয়ান হয় নাই; নিজেরও রান্নাভাত ঘরে হয় তো ঢাকা না দেওয়াই পড়ে আছে।

খেতে যখন হ'বেই তখন আর দেরী ক'রে লাভ কি? খাঁদুকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সরো দাঁড়াল। ছেলের ধূলি-ধূসরিত দেহ আঁচলে মুছিয়ে, কপালে একটী চুমু দিয়ে সস্নেহে তার মাথাটা বুকের মধ্যে একবার চেপে ধরে রান্না ঘরের দিকে পা বাড়াল।

কিন্তু খেতে বসেই মনে হ'ল যেন অখাদ্য। ভাত, তরকারী, এমন বিস্বাদ হ'য়ে উঠেছে যে আর কিছুতেই গলা দিয়ে নামতে চায় না।

তাড়াতাড়ি খাওয়ার পাট শেষ ক'রে সে উঠে দাঁড়াতেই বাইরে থেকে দরজা নাড়বার শব্দ এল, সঙ্গে সঙ্গে মুটু-গৃহিণীর গলা শোনা গেল—"সরো, দোরটা খুলে দে না—লো!"

তাড়াতাড়ি মুখ-চোখটাকে ধুয়ে দরজা খুলে সরো একখানা আসন পেতে দিয়ে বল্‌ল, "বোস মাসী।"

মাসী আসনখানা বাঁ হাতে তুলে ফেলে মেঝের উপরেই বসে পড়ল; দরদভরা স্বরে জবাব দিল, "ভাবলাম একবার দেখে আসি সরোকে, কদিন তো দেখি নি!"

কথার ইঙ্গিতটা সরোর এমন একটা স্থানে আঘাত করল যে সে হঠাৎ জবাব দিতে পারলে না। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে উত্তর দিল "বেশ করেছ!"

মাসী প্রশ্ন করল, "খাওয়া হ'ল?"

অন্যমনা সরো উত্তর দিল, "হলো এই একরকম।"

"বাইরে বুঝি তখন কাপড় শুকোতে দিতে গিয়েছিলে, তাই ঝগড়া হ'ল?"

সরোর মেজাজ একেই ভাল ছিল না, তবু মনের তিক্ততা চেপে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

মাসী হাত নেড়ে মুখচোখের অপূর্ব্ব ভঙ্গী ক'রে বলে উঠল, "তবু ধন্যি মেয়ে বলি বাছা তোকে, যে ছোঁড়ার হাসি ঠাট্টাতেও এতদিন গা দিস্ নি। আমরা হ'লে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্দি হ'তাম; অত খাতির কিসের?"

সরো উত্তর দিল, "সেও আমি জানি।"

চাপা দেওয়া সত্ত্বেও তার কণ্ঠে যে সুর উছলে উঠল, তাতে একটু বিস্মিত না হয়ে মাসী থাকতে পারল না। প্রশ্ন করল, "শরীর খারাপ করেছে বুঝি?"

ধীর স্বরে সরো জবাব দিল, "না।"

মাসী একটু ইতস্ততঃ ক'রে আবার সেই কথারই সুর টেনে ধরল, "তবু বাহাদুর বলি ওই মথরো ছোঁড়াকে, আবাগের ব্যাটাকেও বোধহয় আজ মেরে গুঁড়োই করে দিত, কি করবে ফকরে তো কিছু দেখ্‌বে না, শুনবেও না; কাজেই ওই কাণ্ড চোখে দেখেও কি আর চুপ ক'রে থাকে বল!"

সরোর মনে পড়ল—মথুরের সেই উগ্রমূর্ত্তি।

বুকের মধ্যটা কে যেন দুই হাতে মুচড়ে ধরতেই মুখ থেকে অজ্ঞাতে একটা অর্দ্ধস্ফুট স্বর বার হ'য়ে এল, "আঃ।"

মাসী মুখ তুলে তাকাল; কিন্তু হঠাৎ ও বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন করবার তার ইচ্ছে হ'ল না। আঁচলে একদিকের একটা খুঁট খুলে পান দোক্তা মুখে দিতে দিতে প্রশ্ন করল, "কি রান্না করলে গো?"

সরো উত্তর দিলে, "বিশেষ কিছু নয়, ডাল, ভাত আর একটা তরকারী।"

মাসী এইখানেই কথাবার্ত্তার শেষ ক'রে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। একবার এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "ফকরে এলে নয় আমিও তাকে এ সম্বন্ধে দুটো বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলব এখন। হাজার হোক 'সোমত্ত' মেয়ে ঘরে, বিধবাই নয় হ'ল, বয়েসকাল তো তা ব'লে আর ফুরিয়ে যায় নি! তাকে লক্ষ্য করে অমন হাসি-মস্কারাটাও তো আর—"

সরো আর সহ্য করতে পারল না। হাত দুটো একত্র ক'রে বলে উঠল, "ক্ষান্ত দাও মাসী, তোমাকে আর দয়া ক'রে ও বিষয়ে দাদাকে কিছু বলতে হ'বে না; যা বলবার তা আমিই বলব এখন, তুমি যাও।"

"মুহূর্ত্তে মাসীর মুখখানা লাল হ'বার সঙ্গে সঙ্গে ভার হয়ে উঠল, "বটে? আমায় যেতে বলা! কেন, আমি তোর বাড়ীতে পাত পাড়তে এসেছি না কি লো, যে এত কথা। কিন্তু এটাও জেনে রাখিস সরো, তোর ভাই মোটা মাইনের চাকুরে নয়, মাসকাবারের সময় হাত পেতে গিয়ে দাঁড়াতেও হয় এই দীনু সরকারের মেয়ের দরজায়—সত্যি কি না তবুও জিজ্ঞেস করে নিস।"

সরো চুপ করিয়া দাঁড়িয়ে রইল; একটা কথায় যে এত কাণ্ড হ'তে পারে সেটা তার ধারণার বাইরে ছিল। বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখল মাসী হাত নেড়ে বলতে বলতে চলে গেল, "ওসব মেয়েদের দেখলেই জানা যায়, নইলে, ঠাট্টা-তামাসা করতেই বা লোকের সাহস হ'বে কেন? কই, আমাদের তো কেউ করে না!"

ফকির বাসায় ফিরতেই সরো হঠাৎ উচ্ছ্বসিত রোদন চাপতে চাপতে বলে উঠল, "আমায় আমার শ্বশুরবাড়ী রেখে এস দাদা, আর আমার এ জ্বালা সয় না।"

বিস্মিত ফকির পায়ের জুতা খুলে ছাতিটা হুকের গায়ে টাঙাতে টাঙাতে প্রশ্ন ক'রলে,—"কি হ'য়েছে শুনি?"

"শুনবে আবার কি? শুনবার কিছু নেই,—আমি যাব; এখানে আর থাকব না।"

চোখে আঁচল দিয়া সরো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সারাদিন খাটুনির পরে ক্লান্ত-দেহ ফকিরের শুকন মুখখানা আরও খানিকটা শুকিয়ে উঠল। কলসী থেকে নিজেই এক গ্লাস জল গড়িয়ে এক নিঃশ্বাসে উদরস্থ করে বলে উঠল, "দিনরাত প্যান্ প্যান্ করিস নে সরো, ভাল লাগে না।"

অনেকটা আশা নিয়েই সরো ফকিরের উপর অভিমান ক'রেছিল, এই নিষ্ঠুর আঘাতে সমস্ত আশাই যেন তার এক মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল; আর একটী কথাও না বলে সে ধীরে ধীরে সেখান হ'তে সরে গেল।

ক্রমশঃ

নূতন ধরণের পয়ার

শ্রীরমেশ বসু, এম্-এ

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পয়ার ছন্দের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। দীর্ঘ বর্ণনা সাধারণতঃ পয়ার ছন্দেই গ্রথিত হইত। সঙ্গীতের প্রয়োজনবশতঃ এই ছন্দকে কখনও হ্রস্ব কখনও দীর্ঘ করা হইত। 'মঙ্গল'-গানগুলিতে এই প্রথা বরাবরই চলিতেছে—এখনও সত্যনারায়ণের পাঁচালী ও মনসা-মঙ্গলের পয়ার গীত হয়। কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণব-চরিত গ্রন্থগুলি গীত হইত বলিয়া জানা যায় না। এই সকল গ্রন্থে সাধারণ পয়ার ছন্দই দেখা যায়।

এইখানে পয়ার ছন্দ সম্বন্ধে সাধারণভাবে দুই একটা কথা বলিলে আমাদের বক্তব্য অনেকটা পরিষ্কার হইবে। পয়ার ছন্দ দুইটী পদদ্বারা গঠিত। ইহার দুইটী পদই আবার দুই অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক পদে সাধারণতঃ চৌদ্দটী অক্ষর থাকে। শ্বাসপতনের তারতম্যের জন্য পয়ারের চরণগুলির মধ্যে বিচিত্রতা সম্পাদিত হয়। ৬, ৭ বা ৮ অক্ষর পরে যতি পড়ে। পূর্ব্বকালে পয়ারের অক্ষর গণনার অপেক্ষা পড়িবার ঝোঁকের দ্বারাই ছন্দের নিয়ম রক্ষা হইত। এইজন্য দেখা যায় যে পয়ারের যে কোন অংশ যেমন খুসি ৬, ৭ বা ৮ অক্ষরে গঠিত হইতে পারিত—কিন্তু পড়িবার সময় কোন ব্যাঘাত হইত না :—

(৮) গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে। (৬)
(৭) পশুপক্ষী হইতে অধম বলি তারে ॥ (৭)

—চৈতন্য ভাগবত-আদি-১০ অঃ (বসুমতী সং পৃঃ ৭৭)

প্রাচীন সাহিত্যে পয়ারের দুইটী পদের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার করিলে দেখা যায় যে মিত্রাক্ষর ছন্দের অনুরোধেই দুই পদের যা কিছু সম্পর্ক। মিলের অনুরোধ ভিন্ন একটী পদ আরেকটী পদের অপেক্ষা রাখে না। সে মিলও কেবল শেষ পদটীতে কোনমতে একবর্গীয় বর্ণের সমাবেশ-দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। আবার কোন কোন স্থলে এরূপ মিলেরও অভাব দেখা যায় :—

(ক)

(৮) কোথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়ি-দম্ভ। (৬)
(৭) ...তৃণ হইতে অধিক হইলা বিপ্র নম্র ॥ (৭)

চৈ, ভা, আ। ৯ অঃ (বসু-সং-পৃঃ ৭৬)

(খ) অতএব পদাতিক সকল ভাবক।
এই সে কারণে 'হরি হরি' করে জপ ॥

চৈ, ভা, আ। ৫ অঃ (বসু-সং-পৃঃ ৩৫৪)

উপরে যে দুইটী পয়ার উদ্ধৃত হইল তাহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যাইবে যে পয়ার ছন্দে যে মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা যে ভাবেই হউক বজায় থাকা চাই। এই মাত্রা বজায় রাখিবার জন্য শব্দকে যেমন ইচ্ছা হ্রস্ব বা দীর্ঘ করা যাইতে পারে, যেমন—হৈতে, হইতে, কৈরিলা, কৈলা, হৈলা, হইলা ইত্যাদি।

এখন, বর্ত্তমান প্রবন্ধের বক্তব্য আরম্ভ করা যাক্। পয়ার লইয়া আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে উপরি-নির্দ্দিষ্ট সাধারণ পয়ার ভিন্ন সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটী পয়ার ছন্দ প্রাচীন কালে খুব অল্প পরিমাণে প্রচলিত ছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ বৈষ্ণব-চরিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে এই নূতন ধরণের পয়ার দৃষ্ট হয়। এই পয়ারের বিশেষত্ব এই যে ইহার দুই পদের মধ্যে একটা যে বন্ধন আছে তাহা স্পষ্ট ধরা পড়ে—প্রথম পদটীর শব্দবিন্যাস ও অর্থের আপেক্ষিকতা পদটী শেষ হইয়া গেলেই নিরস্ত হয় না। সেই জন্য পরবর্ত্তী পদটীর সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী পদের শব্দগত ও অর্থগত অন্বয় অচ্ছেদ্যভাবে দৃষ্ট হয়। এইরূপ পয়ারের দুইটী পদ কেবল শেষ মিলটীর জন্যই একটী ছন্দের অধীন বলিয়া মনে হয় না। এই ছন্দের নিয়মে প্রথম পদটী যেন দ্বিতীয় পদটীর প্রথমাংশ পর্য্যন্ত দৌড়িয়া চলে। ইংরেজী ছন্দ-শাস্ত্রানুসারে যাহাকে run on line বলে এই নূতন ধরণের পয়ারও ঠিক তাই। ইহার প্রথম পদটী পরবর্ত্তী পদের এতটা অপেক্ষা রাখে যে ইহাকে স্বতন্ত্র ভাবে পাঠ করা যায় না, এবং পাঠ করিলেও অর্থবোধের সুগমতা হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলনের কিছুদিন পর যেমন মিত্রামিত্রাক্ষর ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে,

এই নূতন পয়ারও ক্ষুদ্রায়তন দুইটী পদের মধ্যে অনেকটা সেই ধরণের ছন্দ। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের একঘেয়ে ছন্দ সেকালে হয় তো ততটা কানে লাগিত না, কারণ তখন উহাতে গানের সুর যোগ করা থাকিত—কিন্তু এখন শুধু পড়িতে-হয় বলিয়া শীঘ্রই হয়রাণ করিয়া ফেলে।

এই স্থানে ছন্দের কতকগুলি উদাহরণ সংগৃহীত হইল,—

১। "নিমাঞি-পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি।
আসিয়া আছেন" সর্ব্বদিগে হইল ধ্বনি॥
—চৈ, ভা, আ।১০ অঃ (বসু-সং-পৃঃ-৭৯)

২। হরিদাস-স্মরণেও এই দুঃখ সর্ব্বথা।
ছিণ্ডে সেইক্ষণে, হরিদাসের কি কথা॥
—চৈ, ভা আ।১১ অঃ (ঐ—৯৩)

৩। "নিমাঞি পণ্ডিত আজি নগরে নগরে।
নাচিলেন" ধ্বনি হৈল প্রতি ঘরে ঘরে॥
—চৈ, ভা, ম।২৩ অঃ (ঐ—২৪৬)

৪। প্রভু বোলে "আজি আমি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
মজ্জন করিব" এত বলি চলি যায়॥
—চৈ, ভা, আ।১ অঃ (ঐ—২৮২)

৫। বিপ্র বোলে "প্রভু মোর এক নিবেদন।
আছে, তাহা কহোঁ যদি থানি দেহ মন॥
—চৈ, ভা, অং।৩অঃ (ঐ—৩১৭)

৬। "বিষে হয় জীর্ণদেহ হয় ত অমর।
অমৃত-প্রভাবে, এবে শুনহ উত্তর॥"
—চৈ, ভা, অং।৩ অঃ (ঐ—৩১৭)

৭। ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রসাদ।
ভাঙ্গিলেক, কত কত করিলে প্রমাদ॥
—চৈ, ভা, অং।৪ অঃ (বসু-সং-পৃঃ ৩২২)

৮। কোন দিগ হৈতে কোন বিশ্বাস নস্কর।
আসিয়াছে, তার পদাতিক বহুতর॥
—চৈ, ভা অং।৫ (ঐ—৩৫৪)

৯। "সর্ব্ব মহাপাতকীও তোমার শরণ।
লইলে, খণ্ডয়ে তার সকল বন্ধন॥"
—চৈ, ভা, অং।৫ (ঐ—৩৫৭)

১০। "আমার মায়ের ছয় পুত্র পাপী কংশে।
মারিলেক, সেই পাপে সেহো মৈল শেষে॥
—চৈ, ভা, অং।৭ (ঐ—৩৬২)

১১। আই দরশনে শ্রীপণ্ডিত দামোদর।
আসিছিলা, আই দেখি চলিলা সত্বর॥
—চৈ, ভা অং।৯ (ঐ—৩৭০)

১২। পণ্ডিত গোসাঞি যেই সন্দেশ কহিল।
দাস গদাধর প্রতি, তাহা পাশরিল॥
—অনুরাগবল্লী-২য় মঞ্জুরী (পত্রিকা প্রেস-সং-পৃঃ ২৩)

১৩। কৃষ্ণের আদেশে চলিলেন সত্যভামা।
সুভদ্রা লইয়া যথা পার্থ মহাধাম॥
—কাশীরাম দাস। (মহাভারত)

এই পয়ারগুলির সম্বন্ধে বিশেষভাবে দুই একটী কথা বলা দরকার। যে সব স্থান হইতে এইগুলি সংগ্রহ করা হইল তাহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী পয়ারগুলির সঙ্গে এগুলির বিভিন্নতা স্পষ্টই ধরা পড়িয়া যায়। এগুলিকে ঠিক অন্য-গুলির মত পড়া যায় না। প্রথম পদ পড়া শেষ হইয়া গেলেও পরবর্ত্তী পদের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকে।

উদ্ধৃত পয়ারগুলির আর একটী বিশেষত্ব এই যে এগুলি কোন ব্যক্তির মুখের কথা তুলিয়া দেখাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে—এই জন্যই বোধ হয় পয়ার ছন্দের ধরা-বাঁধা ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে নাই। যে সব কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখান দরকার, সেগুলির সংখ্যা কিছু বেশী হইয়া পড়ায় পূর্ব্বের পদটী পরের পদের কতকাংশ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। চেষ্টা করিয়া এই অগ্রগামী শব্দটী বা শব্দগুলিকে পূর্ব্বপদে বজায় রাখিতে পারিলে সাধারণ পয়ার হইতে এই ধরণের পয়ারের বিচিত্রতার কোন কারণ থাকে না। নীচে একটী উদাহরণ

দেওয়া গেল। উদ্ধৃত ৫নং পয়ারের অগ্রগামী 'আছে' শব্দটীকে পূর্ব্বপদে রাখিয়া দিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

বিপ্র বোলে "আছে মোর এক নিবেদন।
তাহা কহোঁ যদি প্রভু খানি দেহ মন॥"

এখানে শব্দ চালাচালি করায় প্রথম পদটীর আর দৌড়াইবার আশঙ্কা মোটেই নাই—উহার একেবারে "স্থানে-স্থির' অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে।

পয়ারের সাধারণ নিয়ম অনুসারে উহার দুইটী পদ স্ব-তন্ত্র, এবং দুই পদেই বিভিন্ন ক্রিয়াপদ থাকে বলিয়া পরস্পর অন্যটীর উপর নির্ভর করে না। এই জন্যই একটানাভাবে পড়িয়া যাইতে কোনই ক্লেশ হয় না—অর্থ-বোধেও বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু উদ্ধৃত পয়ারগুলির প্রথম পদের ক্রিয়াপদগুলি সরিয়া আসিয়া দ্বিতীয় পদের দলে পড়িয়া গিয়াছে—দুই পদের জন্য নির্দ্দিষ্ট দুইটী বিভিন্ন ক্রিয়া পদই পয়ারের দ্বিতীয় পদে ভিড় করায় প্রথম পদটীকে আর সাধারণ পয়ারের মত স্ব-তন্ত্র ও অনিরপেক্ষ থাকিতে দেয় নাই।

এখানে যে ধরণের পয়ারের বিষয় লিখিত হইল, এরূপ পয়ার প্রাচীন সাহিত্যে বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইহা পয়ারের পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয়। কারণ সাধারণ পয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই একঘেয়ে মনে হয়। কিন্তু এই নূতন ধরণের পয়ার ছন্দটী যদি প্রাচীন সাহিত্যে চলিত তাহা হইলে আমরা অতি পূর্ব্বকালেই বোধ হয় এখনকার মিত্রামিত্রাক্ষর ছন্দের সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও প্রকাশ-ক্ষমতার সন্ধান পাইতাম। এই নূতন ধরণের পয়ারে "রাইমের" বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়া ভাবকেও প্রকাশিত হইবার সুযোগ দিত।

আলোচনা

দ্বিজ ক্ষেত্রনাথের বাঙ্গালা "হরিভক্তিবিলাস"

এক শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত একখানি বাঙ্গালা পুঁথির শেষে পাইতেছি, 'ইতি হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ সম্পূর্ণ'। বৎসরের নির্দ্দেশে মোটেই আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই, কারণ উহার পরেই পুনরায় 'ইতি' সংযোগে তারিখটী স্পষ্ট করিয়া দেওয়া আছে, 'ইতি সন ১২৩৭ সাল তারিখ ২২ চৈত্র।' পুঁথিখানি যখন হস্তলিখিত তখন উহার একজন লিপিকর অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তাঁহার নাম প্রকাশে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, বোধ করি যশের আকাঙ্খার অভাবে। কিন্তু ওরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই যে তাহা কিছুমাত্র পূর্ণ হইত, এরূপ কল্পনার হেতু নাই; বরঞ্চ তিনি পুঁথিতে বানানগুলিকে যেরূপ যথেচ্ছ ও নৃশংসভাবে সংহার করিয়াছেন, তাঁহাতে তাঁহার অপযশ হইবারই কথা। নামটা গোপন করিয়া ভালই করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের নাম 'শ্রীক্ষেত্রনাথ দ্বিজ', উপাধি ছিল 'তর্কবাগীশ'। পুঁথিতে দুইবার উপাধির উল্লেখ আছে, অতএব ও বিষয়ে ভুল নাই। কোনও 'তর্কবাগীশ' উপাধি-গ্রস্ত কবি যতই মূর্খ হউন, সামান্য সামান্য বানানে এমন বৃহৎ বৃহৎ ভুল করিতে পারেন না, করাও অসম্ভব। সুতরাং পুঁথিখানি গ্রন্থকারের স্বহস্ত-লিখিত নয়, এবং তাহা হইলে তাঁহার বয়স পুঁথির অপেক্ষা প্রাচীন। কবির অপর পরিচয়ের মধ্যে কেবল দেখা যায়, তিনি ছিলেন 'রায়ান-নিবাসী'। বর্দ্ধমানের 'রায়না' জানি, কিন্তু 'রায়ান' কোথায়?

শুনিয়াছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায়

'দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ'-বিরচিত একখানি ধর্ম্মায়নের পুঁথি আছে। কবির নামে মিলিতেছে, উভয়ের দ্বিজত্বেও মিল আছে, কিন্তু সে পুঁথি দেখি নাই, সুতরাং সহসা বলিতে পারিনা উভয়ে এক কি না।

দ্বিজ ক্ষেত্রনাথের 'হরিভক্তিবিলাস', বেঙ্কট-নন্দন শ্রীল গোপাল ভট্টের নামে প্রচারিত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আদি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিগ্রন্থ 'হরিভক্তিবিলাসে'র, নামান্তরে 'ভগবদ্ভক্তিবিলাসে'র ভাষানুবাদ। প্রথমে একটী, কচিৎ দুইটী সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত, পরে তাহার অনুবাদ বা ফলিতার্থ প্রদত্ত। এমনই ভাবে পুঁথিখানি বাইশ পাতায় শেষ হইয়াছে, যদিও প্রথম পাতাখানি ব্যতীত আর সমস্তগুলিই উভয়পৃষ্ঠে লিখিত। বলা বাহুল্য, তেতাল্লিশ পৃষ্ঠায় লিখিত পুঁথি সংস্কৃত-'হরিভক্তি-বিলাসে'র ন্যায় বিপুলায়তন গ্রন্থের মাত্র একাংশের অনুবাদ ব্যতীত হইতে পারে না। গোপাল ভট্টের গ্রন্থ কুড়িটী বিলাসে বা অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, তন্মধ্যে প্রথম দশটী বিলাসে বৈষ্ণবের দিনকৃত্য-বিধি নিরূপিত আছে। পরে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বিলাসে পক্ষকৃত্য ও চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ বিলাসে মাসকৃত্যের কথা। দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ এই দ্বাদশ হইতে ষোড়শ অবধি অধ্যায়গুলির অনুবাদ দিয়াছেন। তাহাও আবার সবটার নয়, কেবল অবশ্য-করণীয় ও অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিধিগুলির। অনুবাদের উদ্দেশ্য কি জানিনা, কিন্তু সংস্কৃতানভিজ্ঞ বৈষ্ণবের পক্ষে এই অনুবাদের মূল্য যথেষ্ট।

বৈষ্ণবীয় সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দৈনিক পূজা-অর্চ্চনা ও উপাসনা ব্যতীত একাদশী-ব্রত পালন অপেক্ষা বোধ হয় শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য আর নাই। বাঙ্গালার সাধারণ হিন্দু-ঘরে এই ব্রত-পালন প্রায়শঃ নব-উপবীতী, বৃদ্ধ ও বিধবাদিগের মধ্যে আবদ্ধ, কিন্তু বৈষ্ণবেরা বলেন না একাদশী ব্রত ও পারণ বিধি প্রত্যেকেরই পালনীয়, অষ্টম-বর্ষীয় বালক হইতে অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ যে কেহ ইহা পালনে বিমুখ হইবেন, তাঁহারই পাতক হইবে। পুরুষের পালন করিতে হইবে, নারীরও করিতে হইবে, সধবা-বিধবা বিচার নাই। কেবল কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে একান্ত অশক্ত ব্যক্তি ইহার দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, যথা অতি রুগ্ন, অতি জরাতুর ইত্যাদি। দ্বিজ ক্ষেত্রনাথের পুঁথি এই একাদশী, ব্রতবিধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পুঁথির সংস্কৃত শ্লোকগুলি উদ্ধার করিয়া লাভ নাই, বরং তাহাতে পরলোকগত লিপিকারের লজ্জার যথেষ্ট কারণ হইবে, শুদ্ধ অনুবাদাংশ হইতে স্থল-বিশেষ উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণবদিগের একাদশী-ব্রত বিধির কিছু পরিচয়—তথা কবির রচনার নমুনা দিতেছি :—

"একাদশী তিথি হয় দ্বিবিধ প্রকার।
সংপুর্ন্না নাম এক বিদ্ধা নাম আর॥
সে বিদ্ধা দ্বিবিধা হয় পূর্ব্বাপর ভেদে।
পুর্ব্ব বিদ্ধা ত্যাজ্যা ব্রতে সাস্ত্রের নিষেধে॥
পর বিদ্ধা গ্রাহ্যা হয় সর্ব্বথা জানিবা।
সংপুর্ন্না লক্ষণে অতিসয় মন দিবা॥
একাদশী ভিন্না তিথির সংপুর্ন্না নিশ্চয়।
সুর্য্যোদয়াবধি হঞা পর সুর্য্যোদয়॥
ব্যাপি যদি থাকয়ে সংপুর্ন্না নাম তবে।
একাদশী সংপুর্ণা নাম ভীষ্ম মতে হবে॥

* * * *

সুর্য্যোদয়ের পুর্ব্বকালে মুহুর্ত্ত দ্বিতে (?)।
একাদশী আরম্ভ হইলে সংপুর্ন্না নাম হয়॥
পররাত্রি শেষ ব্যাপে অরুণ উদয়ে।
এতাদৃশী একাদশী ব্রত যোগ্যা হয়ে॥

* * *

সংপুর্ন্না একাদশী বাঢ়ি পরদিনে জাগে।
পরাহে হইবে ব্রত দ্বাদশী সংযোগে॥
দ্বাদশীর যোগে একাদশী পুজ্যা হয়।
দ্বাদশী ব্রতেতে তাহা পাবে পরিচয়॥
দ্বাদশী কেবল বাঢ়ে ত্রয়োদশী দিনে।
তথাপি সংপুর্ন্না ত্যাগ বঞ্জুলী লক্ষণে॥
পক্ষান্তের বৃদ্ধি যদি প্রতিপৎ দিনে।
সংপুর্ন্না তেজিয়ে পক্ষ বর্দ্ধনীর গুণে॥
তিথি ত্রয় ক্রমে যদি পুর্ন্না নাম হয়।
পক্ষান্তের বৃদ্ধি যদি তাহে নাহি রয়॥
তবে একাদশী ব্রত একাদশী দি(নে)।
দ্বাদশীর আদ্য পাদে পারণ বর্জ্জনে॥

গৃহস্থ সন্ন্যাসি ভেদে সকাম নিস্কামে।
এ সকল ব্যবস্থা ভেদ আছে স্থানে স্থানে ॥
নিষ্কাম বৈষ্ণবগণে তাহা নাহি হয়।
অবৈষ্ণবপুরো তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥
সকাম যদ্যপি কে (অ) কেহো বৈষ্ণবের গণ।
বিহিত ভৈক্ষণ কিছু করিবে কোণ পন (?) ॥
শয়ন বোধণ মধ্যে কৃষ্ণা একাদশী।
গৃহীজন তাহাতেও হবে উপবাশী ॥
শয়ণ বোধণ আর পার্শ পরিবর্ত্তণে।
এ তিন বিশেষ ব্রতে না কর ভক্ষণে ॥

কৃষ্ণপক্ষ তিথি আর তিস্পৃশা লক্ষণে।
পুত্রবান গৃহি জনের ব্রতের বর্জ্জনে ॥
নিষেধ বচন সেহ বিষ্ণুজনে নয়।
বৈষ্ণবের একাদশী ব্রত নিত্য হয় ॥
ব্রতদিনে যদি পিতার শ্রাদ্ধ কৃত্য হয়।
পারণ দিবসে তাহা করিবে নিশ্চয় ॥
অন্য শাস্ত্র মতে যদি কেহ শ্রাদ্ধ করে।
তিন জন জান তবে নরক ভিতরে" ॥ ইত্যাদি।

তথাধিকারিনির্ন্নয় :—

"অষ্টবর্ষাধিক জন ব্রতের অধিকারি।
অশীতি বর্ষ পর্য্যন্ত নহে ব্যভিচারি ॥
সর্ব্ববর্ন্নে নিত্য হয় একাদশী ব্রত।
এ ব্রত লঙ্ঘণে দোষ লেখে বহুমত ॥
ত্রিষ বর্ষাধিক পিত্রাধিদেহ যার।
নিরন্তর ব্যাধি পিড়া পরিভুত আর ॥
অনুকুলে পত্র কাশী (?) ব্রত এ সভার।
সাঙ্গো পাঙ্গে সুভক্তজনে করে ব্যবহার ॥
ব্রত পুর্ব্বাপর দিনে নিয়ম অপার।
সে সকল লিখিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার" ॥ ইত্যাদি।

দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ যে কেবল হরিভক্তিবিলাসের উপর নির্ভর করিয়াছেন তাহা নহে, ভাদ্রকৃত্য প্রসঙ্গে একস্থানে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন :—

"রাধাবল্লভী সংপ্রদায়ি সকল বৈষ্ণবে।
শ্রীরাধিকা জন্মতিথি ব্রত মহোৎসবে ॥
সেই অনুসারে সর্ব্ববৈষ্ণবের গণ—।
জন্মাষ্টমী সমভাবে করে আরাধণ ॥
ভবিষ্য পুরাণে বাক্য করয়ে প্রমাণ।
হরিভক্তি বিলাসে নাহিক এসব আক্ষাণ ॥"

কবি রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিতেছেন, অতএব সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন না। তাঁহার পুঁথির শেষ হইয়াছে কার্ত্তিককৃত্য বিধিতে। কার্ত্তিক বৈষ্ণবদিগের নিকট পুণ্যতম মাস, ক্ষেত্রনাথের ভাষায় "কার্ত্তিকে সব প্রিয় মাসের উত্তম"। ইহার কারণও কবি জানাইয়াছেন, "রাধিকার প্রিয়মাস কার্ত্তিক জানিবে।" কার্ত্তিকের কতকগুলি সাধারণ কৃত্য কবির কথায় জানাইতেছি :—

"আশ্বিনের শুক (ক্ল) পক্ষ একাদশী আদি।
কার্ত্তিকের শুক্লা একাদশী অবধি ॥
এক মাস মুখ্য কার্ত্তিক নিয়ম।
আর এক বিধি হয় পুর্ন্নিমান্ত ক্রম ॥
তৃতীয় প্রকার হয় সংক্রান্তী অবধি।
ভক্তগণে হয় নিত্য কার্ত্তিকের বিধি ॥
কার্ত্তিক নিয়ম যদি না করে কোন জন।
অনেক দোশ হয়া আছে শারেনিথন (?) ॥
শক্তি অনুসারে সর্ব্ব বৈষ্ণবের গণ।
কার্ত্তিকের ব্রত কিছু করিবে গ্রহণ ॥

* * *

কার্ত্তিকে সব প্রিয় মাসের উত্তম।
প্রাতঃস্নান কৃষ্ণকথা কির্ত্তন নিয়ম ॥
গাতাপাঠ ভাগবত পাঠের নিশ্রবন।
কৃষ্ণের নিয়ম বিধি করিবে কির্ত্তন ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন আর—কেষব পুজন।
হবিষ্যান্ন ব্রহ্মপত্রে প্রসাদ ভোজন ॥

পলাসের পত্র শপ্ত ভোজনের পাত্র।
শূদ্রজন বজ্জি-(বর্জ্জি)-বেক তার মধ্য পত্র ॥

* * * *

অরুণ উদয়ে উঠি নিত্যকৃত্য করি।
প্রাতঃস্নানে বিধি হয় সোময়রি (স্মরি) শ্রীহরি ॥
সাধু সেবা গোগ্রাস দান কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
বিশেষে করিবে কৃষ্ণচরণ অর্চ্চন ॥

* * * *

কার্ত্তিকে নিয়ম করি গীতা পাঠ করে।
পুন না আইসে সেই সংসার ভিতরে ॥
গজেন্দ্র মোক্ষণ কিম্বা সহস্রনাম পাঠ।
পুন না দেখএ সেই সংসারের নাট ॥" ইত্যাদি।

তারপর অশক্ত জনের প্রতি বিধির কিছু পরিচয় :—

"প্রাতঃস্নান তুলসী সেবা শেষরাত্রি জাগরণ।
উদ্যাপন দীপদান ব্রতের লক্ষণ ॥
পঞ্চাঙ্গ করয়ে ব্রত জেবা শক্ত জন।
অশক্ত করএ পরদীপ সংরক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণ ভোজন, শেষ সংপুর্ন্ন কারণে।
অশক্তিতে ব্রত হেতু সেবে গোব্রাহ্মণে ॥
তদভাবে অশ্বথ্যের বটের সেবণ।
তথাপি কার্ত্তিক ব্রত হয় সংরক্ষণ ॥"

তৎপরে কার্ত্তিকে দীপদানমাহাত্ম্যের কথা :—

"কোটী ২ সহস্র পাপ পাপি যদি করে।
কার্ত্তিকে প্রদীপ দানে পাপ জায় দূরে ॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে আর নর্ম্মদা কুরুক্ষেত্রে।
কোটী গুণ ফল হয় দীপ দান মাত্রে ॥
তৈলে কিম্বা ঘৃতে জার প্রদীপ উজ্বল।
কার্ত্তিকে তাহার কিবা অশ্বমেধ ফল ॥
কার্ত্তিকে প্রদীপ দানে সন্তুষ্ট কেশব।
অতএব দীপদান করিবে বৈষ্ণব ॥
সমেরু (সুমেরু ?) সমান যদি করে পাপরাসি।
কার্ত্তিকে প্রদীপ দানে সকল বিনাশি ॥
কার্ত্তিকে প্রদীপ দানে মহিমা অনন্ত।
সকল লিখিতে হৈলে বাঢ়ে বহু গ্রন্থ ॥
মন্দির উপরিভাগে কলস উপরি।
দীপ দাণ করে জেবা সন্তোষে শ্রীহরি ॥
গো কোটি দান কিম্বা সর্ব্বস্য করে দান।
কদাচ নহে শীঘর দীপের সমান ॥
দীপমালা করে যেই বিষ্ণুর আলয়ে।
একাদশী দ্বাদশী ততোঽধিক হয়ে ॥
দীপ সম সথ্য বর্ষ বিষ্ণুলোকে বাস।
তার বংশে কভু নহে নরকে নিবাস ॥

* * * *

ইহার পরে যথাক্রমে আকাশ-প্রদীপ-দানমাহাত্ম্য, কার্ত্তিক কৃত্য-(বিশেষ) বিধি, কার্ত্তিকে কৃষ্ণ ত্রয়োদশী কৃত্য, কৃষ্ণচতুর্দ্দশীকৃত্য, অমাবস্যাকৃত্য, প্রতিপদ্‌কৃত্য, যমদ্বিতীয়া-কৃত্য, শুক্লাষ্টমীকৃত্য, প্রবোধিনীকৃত্য, প্রবোধনকালনির্ণয়, প্রবোধন বিধি ও ভীষ্মপঞ্চকাদি (অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের শুক্লাত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চতিথি) ব্রত, এবং অধিমাস বা মলমাস (বৎসরের বর্দ্ধিত মাস)—এইগুলির কথা।

পরিশেষে দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ সনাতন গোস্বামী-প্রণীত হরিভক্তিবিলাসের টীকার উল্লেখ করিয়া বলেন,

"মূল টীকা দেখি যথামতি ভাষাছন্দে।
শ্রীক্ষেত্রনাথ দ্বিজ করিল প্রবন্ধে।"

পুঁথির বর্ণবিন্যাস-সম্বন্ধে একটী অতি প্রয়োজনীয় কথা বলা দরকার যে, কতকগুলি 'ষ' এর মাথায় একটী ফোটা বসান আছে। 'ষ' এর মাথায় ফোটা আশ্চর্য্যজনক কিন্তু এই বিশেষত্ব সর্ব্বত্র বা সকলগুলিতে দেখা যায় না। 'য়' এর সর্ব্বত্রই একটী হেলানিয়া রেখা।

শ্রীনলিনী নাথ দাশ গুপ্ত এম্ এ

পুস্তক পরিচয়

আমি ও আমার দেহ—

অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্-এ প্রণীত—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্, বেদান্তরত্ন রচিত মুখবন্ধ সহ—প্রকাশক শ্রীঅবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, থিয়োসফিক্যাল্ পাব্লিশিং হাউস্, বেঙ্গল, ৪।৩এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—পৃঃ ৮৵+২৩৩—মূল্য পাঁচসিকা মাত্র ;

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহোদয়ের নাম সাহিত্যসেবিগণের নিকট অপরিচিত নহে। বাঙলার বহুসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার নাম ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত। কাব্য, নাটক, সঙ্গীত, ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি এযাবৎ কাল বহু আলোচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনগুলিতেও তাঁহার অসাধারণ অধিকার। তাঁহার আজীবন দর্শন আলোচনার ফল এই গ্রন্থখানিতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। গ্রন্থখানির ভূমিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন স্বনামধন্য বেদান্তরত্ন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। এরূপ পুস্তক যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে—এরূপ আশা করা বোধ অনুচিত নহে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সে পূর্ণ হয় নাই।

মূল গ্রন্থখানি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার মহোদয় গ্রন্থমধ্যে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে 'আমি' ও 'আমার দেহ' সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ। 'আমার দেহ'টাই 'আমি' নহি—এই 'দেহ' 'আমার' অধিষ্ঠান মাত্র। প্রকৃত 'আমি' অর্থাৎ দেহী বা জীবাত্মা চৈতন্যস্বরূপ, আর 'আমার দেহ' হইতেছে জড় পরমাণু পুঞ্জের সমষ্টি মাত্র। 'আমি' অমর, কিন্তু 'আমার দেহ' মরণধর্ম্মী। মাননীয় গ্রন্থকার মহোদয় আরও দেখাইয়াছেন যে, এই 'আমি' প্রকৃতপক্ষে অশরীরী হইলেও ব্যবহারদশায় পঞ্চকোষাবৃত হইয়া নানালোকে বিচরণ করে। তিনি প্রথম সাতটী অধ্যায়ে এই পঞ্চকোষ ও সপ্তলোকের যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহা মূলতঃ হিন্দুশাস্ত্রানুগ। তবে এই সকল দুরূহ তত্ত্ব সাধারণের বোধোপযোগী করিবার নিমিত্ত তিনি মধ্যে মধ্যে পাশ্চাত্ত্য দর্শন, তত্ত্ববিদ্যা, জড়বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার আলোচনা বেশ মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য জড়বিজ্ঞানের অনুপপত্তি কোথায় ও হিন্দুদর্শনের শ্রেষ্ঠতা মনিতে হইবে কেন—তাহাও বসু মহাশয় সাধারণ পাঠকবর্গকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। পঞ্চকোষ ও সপ্তলোকের নিগূঢ় রহস্য যে সাধনাবলে আয়ত্ত করা যায়, গ্রন্থকার মহোদয় সে সাধনপথেরও মধ্যে মধ্যে আভাস প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে তাঁহার অষ্টম অধ্যায়টী—যাহাতে তিনি 'আমি'র স্বরূপ বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই 'আমি' বা আত্মস্বরূপের নির্দ্ধারণে তিনি প্রাচীন ঋষিপ্রবর্ত্তিত পথই অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই আত্মা শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি—এ সকল হইতে পৃথক্—এ সকলের অতীত ; এমন কি পাশ্চাত্ত্য মতের Soulও এ আত্মপদার্থ নহে। এ সম্বন্ধে তিনি সুফী, বৈষ্ণব ও মিষ্টিক সম্প্রদায়ের সাধকগণের মতের সহিত উপনিষদ্ মতের একটা সামঞ্জস্য করিতেও প্রয়াস পাইয়াছেন। অবশ্য আমরা সকল স্থলেই তাঁহার সহিত একমত হইতে না পারিলেও তাঁহার আলোচনার পদ্ধতি ও হিন্দুশাস্ত্রের উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে।

কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়ের মুখবন্ধ পাঠে আমরা ততোধিক হতাশ হইয়াছি। কেবল নূতন কিছু একটা করিবার আগ্রহে তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি কিরূপে এরূপ একটা পূর্ব্বাপর সঙ্গতিশূন্য ভূমিকা লিখিলেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কুলাইল না। প্রথমতঃ, তিনি যে যে স্থলে উপনিষদ্ বা গীতাদি শাস্ত্র হইতে 'কোটেশন' তুলিয়াছেন, সেগুলিকে যথাযথ উদ্ধৃত করেন নাই। 'কোটেশন' গুলি সবই বিসন্ধিদোষদুষ্ট ; কোনটিতে বা ভুল সন্ধিও করা হইয়াছে, যথা—"প্রাজাপত্যো ততো মহান্" (পৃঃ। ১৵০)। ইহা যে মুদ্রাকরপ্রমাদ হইতে পারে না, তাহা বুদ্ধিমান্ পাঠকমাত্রেই অনুভব

করিবেন। যখন আমরা কোনও বচন উদ্ধার করি, তখন উহা যথাযথ ভাবে উদ্ধার করাই যে কর্ত্তব্য,—ইহা বোধ হয় বুঝাইয়া দিবার কোন প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ 'কোটেশন'গুলির প্রাঞ্জল অনুবাদ সঙ্গে সঙ্গে না দিলে যে সাধারণ পাঠকের নিকট উহা চির দুর্ব্বোধ থাকিয়া যায়, তাহা সাধারণ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। তৃতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত মত অবলম্বনে (পঞ্চ কোষের পরিবর্ত্তে) ছয়টি কোষের উল্লেখ করা আমাদিগের মতে উচিত হয় নাই। চতুর্থতঃ, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় এই "তিন কোশ মিলিয়া জীবের কারণ শরীর" (পৃঃ ||/•)—এইরূপ উক্তির প্রমাণ কোথায়? আমাদিগের মনে হয় এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার মহাশয়ের মতই অপেক্ষাকৃত সমীচীন ও প্রামাণিক—"কারণ শরীর অর্থে আনন্দময় কোষকে বুঝায়, বিজ্ঞানময় কোষকে বুঝায় না। ...প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ সূক্ষ্ম শরীরের অন্তর্গত। স্থূল শরীর অন্নময় কোষেরই নামান্তর মাত্র (পৃঃ ১৪১, ফুটনোট)। উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত ভূমিকার মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে বিচারের ভার সুধীসমাজের উপরই অর্পণ করা গেল। মুখবন্ধটী বাদ দিলে গ্রন্থখানি বেশ সুন্দর হইয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

চিত্রপ্রভা—(হরিদীক্ষিত কৃত 'লঘু শব্দরত্নে'র টীকা) ভাগবত হরিশাস্ত্রি প্রণীত মহামহোপাধ্যায় ততো সুব্বারায় শাস্ত্রি-কৃত টীপ্পনী সহ সম্পাদিত—অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ কৃত মুখবন্ধ এবং নরসিংহ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষা সমিতির সভাপতি এস্, টি, জি বরদাচারি-কৃত ভূমিকা সহ সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রদত্ত বোব্বিলি মহারাজের এণ্ডাউমেণ্ট ফণ্ড হইতে প্রকাশিত—অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থমালার প্রথম সংখ্যা—পৃঃ ৭+৪৫০—মূল্য ৪৲ টাকা।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রোভাইস্ চ্যান্সেলর বোব্বিলির অধিপতি মহারাজ শ্রীরাও স্যার বেঙ্কট শ্বেতাচলপতি রঙ্গ রাও বাহাদুর জি, সি, বি, ই—তেলেগু ও সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন। এই এণ্ডাউমেণ্টের ফলে সম্প্রতি অন্ধ্র-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ "চিত্রপ্রভা" গ্রন্থখানিকে তাঁহাদের সংস্কৃত গ্রন্থমালার প্রথম সংখ্যারূপে প্রকাশিত করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে ভট্টোজিদীক্ষিতের (খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দী) "সিদ্ধান্ত কৌমুদী" প্রায় সমগ্র ভারতেই অধীত হইয়া থাকে। "সিদ্ধান্ত কৌমুদী"র উপর ভট্টোজি স্বয়ং "প্রৌঢ় মনোরমা" নামে একখানি টীকা রচনা করেন। ভট্টোজির পৌত্র ও ভানুজির পুত্র হরিদীক্ষিত (খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দী) "প্রৌঢ় মনোরমা"র উপর" (লঘু) শব্দরত্ন" নামে টীকা লিখিয়াছেন। "চিত্রপ্রভা"—"শব্দরত্নের" কারকপ্রকরণের শেষ পর্য্যন্ত অংশের টীকা। ইহার রচয়িতা ভাগবত হরিশাস্ত্রী দাক্ষিণাত্যের একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। খৃঃ ১৮১১ অব্দে তিনি পূর্ব্বগোদাবরী জেলার অন্তর্গত 'দক্ষারামম্' এর নিকটবর্ত্তী 'ভীমক্রোশ পালেম্ নামক একটী গণ্ডগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ভূমিকায় উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি প্রথমে দাক্ষিণাত্যে যজুর্ব্বেদ ও কাব্য অধ্যয়ন করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতগণের শিক্ষায় সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তিনি বারাণসীধামে আসিয়া তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ কাশীনাথ শাস্ত্রীর নিকট ষোড়শ বৎসর ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া বিজয়নগরের মহারাজ স্যার বিজয়রাম গজপতিরাজ তাঁহাকে স্বীয় সভাপণ্ডিতের পদে বরণ করেন। তদানীন্তন যুবরাজ (পরে মহারাজ স্যার আনন্দ গজপতিরাজ) তাঁহার ছাত্র। মহারাজই প্রথমে তাঁহার গুরুর রচিত "বাক্যার্থচন্দ্রিকা" (নাগেশ ভট্টের "পরিভাষেন্দুশেখরের" টীকা) খৃঃ ১৮৮৭ অব্দে প্রকাশিত করিয়া সাধারণের নিকট তাঁহার প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। বিগত ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিতপ্রবর হরি শাস্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে।

হরি শাস্ত্রী নাগেশ ভট্টের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তাই "চিত্রপ্রভা"র বহুস্থলে তিনি নাগেশের (খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর) উপর কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। জনশ্রুতি আছে যে, নাগেশই স্বয়ং "শব্দরত্ন" রচনা করিয়া গুরুভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ গ্রন্থখানি স্বীয় গুরু হরিদীক্ষিতের নামে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এ জনশ্রুতির মূলে কোন সত্য থাকুক বা

না থাকুক, "শব্দরত্ন", নাগেশের মতই সমর্থন করে। অথচ তাহার টীকা "চিত্রপ্রভা" নাগেশের মত খণ্ডনে তৎপর। এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থখানির সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় তাতা শুব্বারায় শাস্ত্রী (ইনি নাগেশের সম্প্রদায়ভুক্ত) তাঁহার "লঘুটীপ্পনী"তে নাগেশের মতের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থকর্তা ও গ্রন্থসম্পাদক উভয়েই প্রগাঢ় পণ্ডিত ও পরস্পর বিরুদ্ধ-সম্প্রদায়ের লোক। উভয়ের বিচারবহুল যুক্তিপূর্ণ বাদানুবাদে সটীপ্পন টীকাখানি যে সুধীসমাজের পরম উপভোগ্য হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

গ্রন্থকলেবরে দুই চারিটী বর্ণাশুদ্ধি পরিলক্ষিত হইল। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশে এই প্রথম উদ্যম। এ অবস্থায় গ্রন্থখানিকে নির্ভুল ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য ছাপার কার্য্যে আরও অধিক মনোযোগ প্রদান করা উচিত ছিল। গ্রন্থখানির বাঁধাই ও কাগজ ভাল। আশা করি, পণ্ডিতসমাজে গ্রন্থখানি আদর লাভ করিবে।

শ্রীঅশোকনাথ বেদান্ততীর্থ

মায়ের ছেলে—উপন্যাস। শ্রীবিভা দেবী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপঞ্চানন বাগ্‌চী এণ্ড কোং। মূল্য—২৲টাকা।

গ্রন্থকর্ত্রী এই বইখানি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আর একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন, সেখানি 'জন্মান্তরে'। সেখানি পড়িয়া আমাদের ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু 'মায়ের ছেলে' পাঠকবর্গের নিকট আরও সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমরা মনে করি, কারণ এই উপন্যাসখানিতে চরিত্র-অঙ্কন ও ঘটনাসমাবেশের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে।

লেখিকার লিখন-ভঙ্গী সরল ও সুন্দর। অন্ততঃ তাঁহার ভাষায় কোথাও আড়ষ্টতা অথবা অযথা বাক্যচ্ছটার প্রয়োগ নাই। ইহা নূতন প্রচেষ্টার পক্ষে সত্যই প্রশংসার বিষয়। বইখানি মূলতঃ সাহিত্যজীবন লইয়া লেখা। সাধারণ সমাজে ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নিত্য যে ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহার মধ্যে যদি অন্তর্নিহিত সমস্যা থাকে তবে বইখানিকে সমস্যামূলক বলা যাইতে পারে। নতুবা ইহাতে সমস্যার কোনও বালাই নাই। এই উপন্যাসটী কেবল চমকপ্রদ কাহিনী নয়, ইহাতে অস্বাভাবিক উপায়ে রোমান্‌স্‌ ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াসও নাই। স্বামী ও স্ত্রী, মা ও ছেলে, এমনি সাধারণ নর ও নারীর বাস্তব জীবন ঘিরিয়া একটী সুন্দর কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বামীর ভালবাসা হারাইয়াও হিন্দু স্ত্রী কিরূপে অক্ষয় স্মৃতি ও প্রেমের পূজা করিয়া জীবন কাটাইতে পারে, 'মায়ের ছেলের' মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাই। আধুনিক যুগে এ আদর্শ অধিকাংশ লোকের মনোমত না হইতে পারে। প্রেম ও যৌনজীবনে পুরুষের মত নারীর সমান স্বাধীনতা আছে কি না তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদের স্থান ও অবসর আছে। কিন্তু লেখিকা সাম্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি সমস্যার তুলনামূলক বিচারের ধার দিয়াও যান নাই, বরং সে দ্বন্দ্ব ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া গিয়াছেন। বইখানি পড়িলে এই কথা স্বতঃই মনে হয় যে তিনি স্থিতিশীল হিন্দু সমাজের আদর্শে বিশেষ আস্থা রাখেন! সমাজে কখনও ত্রুটী-বিচ্যুতির ফল আপাত-মধুর হইলেও পরিণামে অশুভ। সেই হিসাবে কমলা আদর্শ পত্নী, অনিলও আদর্শ মায়ের ছেলে। শিক্ষিতা বাঙালী মেয়ে নলিনী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও হরেন্দ্রের প্রতি অনুরক্তা এবং তাহার সান্নিধ্য কামনা করে। কিন্তু লেখিকা এই অন্যায়, তথা অবৈধ প্রণয়কে কোনখানেই প্রশ্রয় দেন নাই। যে ভাবে তিনি পতি-প্রেম ও পুত্র-স্নেহের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে তিনি রক্ষণশীল সমাজের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন, এটুকু নিঃসংশয়ে বলা যায়।

প্রশ্ন কিন্তু এই যে, সদ্‌গুণরাশির আদর্শ চিত্র হিসাবে নিখুঁত হইলেও উহা সম্ভব কি না এবং সম্ভব হইলেও সাহিত্যে তাহার সার্থকতা কিসে? আখ্যায়িকার প্রধান চরিত্র অনিলের জীবনে মায়ের আশীর্ব্বাদের যে প্রভাব দেখান হইয়াছে তাহা অনেকের নিকট একটু অস্বাভাবিক ঠেকিতে পারে। মায়ের স্নেহ ও শুভেচ্ছা প্রতি পুত্রেরই কাম্য বস্তু ও অক্ষয় সম্পদ। কারণ বোধকরি পৃথিবীতে এই একটী জিনিস আছে যাহা সত্যকার পবিত্র ও নিষ্কলুষ। কিন্তু মায়ের আদেশে ও আশীর্ব্বাদে অন্ধ বিশ্বাস রাখিলে আধুনিক যুগে পুত্রকে যে নামে অভিহিত হইতে হয় তাহার একমাত্র ইংরেজী প্রতিশব্দ "মাদার্স ডার্লিং।"

এগুলিতে লেখিকার ত্রুটীর উল্লেখ করা হইতেছে না,

কোনও সত্য অথবা তথ্যের যে অপর একটী রূপ আছে এবং তাহা যে অনেক সময়ে রচয়িতার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে, ইহাই বলা আমাদের উদ্দেশ্য।

উপন্যাসের শেষভাগে অনিলের অভূতপূর্ব্ব দ্রুত উন্নতি ও ভাগ্যবিবর্ত্তন এবং নলিনীর শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়। জীবনের অন্যবিধ ঘটনার আবর্ত্তনে ও সংঘর্ষের ফলে চরিত্রগুলি হয় তো অন্যরূপ ধারণ করিতে পারিত। তবে আনন্দের বিষয় যে আধুনিক শিক্ষার কুফল লেখিকাকে ভাবাইয়াছে বটে কিন্তু তাঁহাকে নিতান্ত একদেশদর্শিনী করিতে পারে নাই। বই-খানি পড়িবার সময় সেই ভয় প্রধান হইয়াছিল, কিন্তু পড়িবার পর মনে হইল যে লেখিকা সঙ্কীর্ণমনা নহেন। যদি কোনও স্থানে তাঁহার ব্যক্তিগত সংস্কার প্রকট হইয়া থাকে, তাহার কারণ বোধ হয় তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। শিক্ষিত সমাজের বিলাস-প্রিয়তা সম্ভবতঃ তাঁহাকে একটু বেশী মাত্রায় অবহিত করিয়া থাকিবে।

যে তিনটী প্রধান গুণ 'মায়ের ছেলে'তে লক্ষ্য করিয়াছি সেগুলির মধ্যে প্রথমটী লেখিকার ভাষার সারল্য ও প্রাঞ্জলতা। কোনও বিশেষ রীতি অবলম্বন না করিয়াও তাঁহার ভাষা অনাড়ম্বর, লঘুতা-বিহীন ও বর্ণনায় প্রোজ্জ্বল হইয়াছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে, মানবচরিত্রের অপরিসীম সম্ভাবনায় তাঁহার বিশ্বাস। মানুষের মনকে কোনও বাঁধা-ধরা পথে চিরকাল নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর নয়; মানবনীতিকেও দুর্ভেদ্য প্রাকারে আবদ্ধ রাখা যায় না। কখন্ কোন্ গুপ্তপথে সে বাহির হইয়া সংস্কার-বিরুদ্ধ কাজ করিয়া বসে তাহার ঠিক নাই। এই কারণে আদর্শচ্যুতি সমাজে অনিবার্য্য। হরেন্দ্রের মত লোকের পক্ষে বিবাহিত হইয়াও অকারণে পতিপ্রাণা স্ত্রীকে ত্যাগ করা এমন কিছু বিরল ঘটনা নয়; আর তাহাতে বিচলিত হইবারও কোনও কারণ নাই। সুতরাং এই দৃষ্টান্তকে একেবারে অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট বলা যায় না। প্রত্যেক সাধারণ ও নিরীহ মানুষের মধ্যেও বিবেকবুদ্ধিবিহীন কাজ করিবার মত যথেষ্ট প্রবৃত্তি ও সম্ভাবনা আছে। শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও একথা সমান ভাবেই সত্য। তবে প্রভেদ এই যে শিক্ষাভিমানী পুরুষ আপন দুষ্কৃতিকে সূক্ষ্ম বিচার ও বুদ্ধি বৃত্তির অনুশীলন দিয়া আচ্ছন্ন করিয়া লয়। পরস্ত্রীতে আসক্তি আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং অনৈতিক বলিয়া তাহাকে বাস্তব দৃষ্টির অগোচর বলা যায় না।

লেখিকা কোনও চরিত্রকেই অবিমিশ্র মন্দ করিয়া আঁকেন নাই। ভাল ও মন্দ—উভয়ের সংমিশ্রণের ফলে চরিত্রগুলি আরও স্বাভাবিক হইয়াছে। বরং 'কমলা' ও 'অনিল' একটু বেশী পরিমাণে ভাল হইয়া পড়াতে অন্য জগতের অধিবাসী হইবার উপযুক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থকর্ত্রীর সর্ব্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য যে সাধারণ বাঙ্গালী সমাজের গুটীকয়েক মানুষের জীবন আঁকিতে গিয়া তিনি বৃথা বাক্যব্যয় ও অযথা উপদেশ দিবার চেষ্টা করেন নাই। উপন্যাসখানি আয়তনে বৃহৎ নয়; সুতরাং পড়িতে বসিলে পাঠকের মন অকারণে পীড়িত হয় না। আসলে লেখিকা নিজের কাজ ভুলেন নাই; গল্প বলিবার প্রথম নিয়মটী তিনি জানেন।

সাহিত্যের প্রাণ কোন্ বস্তুটী তাহা লইয়া প্রচুর তর্ক আছে। কাহারও মতে সেটী ভাষা, কেহ বা বলেন, attitude অথবা একটী বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী। গ্রন্থকর্ত্রীর ভাষাও ভাল, জীবনকে বৃহৎ ও মহৎ করিয়া দেখিবার প্রয়াসও তাঁহার আছে। যাহা তিনি দেখিয়াছেন ও অনুভব করিয়াছেন, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতে আর যাহাই হউক রসহানি বা আন্তরিকতার অভাব হয় নাই।

আলোচ্য উপন্যাসখানি মার্জ্জিত রুচি অনুসারে মুদ্রিত না হইলেও, লেখিকাকে সত্যই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দান করিবে। আমরা তাঁহার লেখনীর নব নব রচনাবলীর সাফল্য-কামনা করি।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

মুসাফির—কবিতার বই। শ্রীদিলীপকুমার দাশগুপ্ত। প্রকাশক—লেখ্য-বাসর। মূল্য—৷৷৹ আনা।

প্রকাশকের নিবেদন হইতে বুঝা যায় যে লেখ্য-বাসরের ইহাই প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ এবং যে সব ছাত্র-ছাত্রীর ছন্দে অনাগত ঊষার অস্পষ্ট পদচিহ্ন বর্তমান, প্রতি তিন

মাসান্তর ইহারা তাঁহাদেরি লেখা প্রকাশ করিবেন। প্রার্থনা করি তাঁহাদের অভিলাষ জয়যুক্ত হউক। সমালোচ্য কবিতা-সমষ্টির মধ্যে সেই অনাগত উষার অস্পষ্ট পদচিহ্ন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে কি না জানি না। বর্ণাশুদ্ধি এবং বানান-বৈচিত্র্য ঘটাইবার চেষ্টার প্রাচুর্য্যে বইখানি ভুলের কালাপাহাড় হইয়া উঠিয়াছে। 'তনিমা-মন' জিনিসটী কি? 'মনের সরসতা' না হয় কষ্ট করিয়া বুঝিলাম। 'অনন্তের অন্তে' কবিতাটী মন্দ লাগিল না, ভাবের অগভীরতা এবং অর্থহীনতায় অন্য সব কবিতাগুলিই একরূপ অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীসুধীরকুমার সেনগুপ্ত।

দৃষ্টিদান—নাটিকা। গ্রন্থকার—শ্রীঅসিতকুমার হালদার। প্রকাশক,—শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ।

ছয়টী অঙ্কে নাটিকাখানি সমাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নাটিকা যে-ভাবে রচিত, আলোচ্য নাটিকাটীও ঐভাবেই রচিত। রবীন্দ্রনাথের নাটক জনসাধারণের প্রাণে আঘাত করিতে পারে না বলিয়া ষ্টেজে আমারা কবির নাটক বেশী দেখিতে পাই না। রবীন্দ্রনাথের নাটকের রস মাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ই অনুভব করিতে পারে। সাধারণ বাঙ্গালীর এই রস অনুভব করিতে অনেক দেরী আছে। আজ হইতে বহুদিন পরে—কবে জানি না—রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিবে! আজ নহে! আলোচ্য নাটিকাও সেইরূপ বহুদিন পরে আদৃত হইবে।

নাটিকাটী সাধারণের জন্য রচিত হয় নাই—মুখবন্ধে লেখক ইহা বলিয়াছেন। এই কথা সমর্থন করি। নাটিকাটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের জন্য রচিত।

লেখকের dramatic insight আছে, কিন্তু তিনি তাহা ফুটাইতে পারেন নাই কতকটা ভাষার দোষে, ভাব-প্রকাশের দোষেও কতকটা বটে। কিন্তু বহুদূরে। অত দূরে গিয়া পাঠকের মনে আঘাত করাকে প্রকৃত আঘাত বলে না।

চিত্রকলা সম্বন্ধে অনেক জানিবার কথা বইখানিতে আছে। এদিক্ দিয়া চিত্রকরও যেমন উপকৃত হইবেন, চিত্রকলাতে আকৃষ্ট প্রাণও সেইরূপ উপকৃত হইবেন।

লেখকের ভাব সুন্দর। কয়েকটীর উদাহরণ দেওয়া গেল। "আনন্দের প্রকাশ পরস্পরের নকল ক'রে হয় না।" "সংযমই স্বাধীনতা।" "শিল্পীরা ভাব-ব্যঞ্জনা করতে হ'লে অনেক জিনিসই প্রচ্ছন্ন রাখেন।" এগুলি নূতন না হলেও পড়িতে মন্দ লাগে না।

পুস্তকের শেষে লেখক বাঙ্গালী চিত্রকর শ্রেষ্ঠ আসন পাইবে, এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এই ইঙ্গিত সফল হউক. ইহাই আমরা কামনা করি।

বৈজয়ন্তী—কবিতার বই। গ্রন্থকার—শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল। শ্রীসুধাংশু শেখর মণ্ডল কর্ত্তৃক রঘুনাথপুর, (বসিরহাট) হইতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

গ্রন্থকারের সুন্দর চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবগুলি স্থানে স্থানে মনোরম। কিন্তু ভাষার দোষে অনেক স্থানে ভাব প্রকাশ পায় নাই। স্থানে স্থানে কিছুই বোধগম্য হয় না। লেখকের শব্দ-চয়ন ভাল হয় নাই। কবিতার মাধুর্য্য সুন্দর সুন্দর শব্দ ব্যবহারে ফুটিয়া ওঠে। আলোচ্য গ্রন্থে কতকগুলি অপ্রিয় ও আপত্তিজনক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার ফলে কবিতা-বিশেষের মাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ছন্দের গরমিলও ঘটিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক কবিতারই শেষের দিকটা অতি অস্পষ্ট, দুর্ব্বোধ্য এবং অস্বাভাবিক হইয়াছে।

কয়েকটী কবিতা একেবারেই কবিতা নয়—বিবরণী মাত্র! "পাখী সব করে রব" কবিতা নয়! বিবরণীতে যদি কবির প্রাণের স্পন্দন পাওয়া না যায়, তবে তাহাকে কবিতা বলিতে পারা যায় না।

"কেন" "তবু" শীর্ষক কয়েকটী কবিতা একেবারেই দুর্ব্বোধ্য

—কামাখ্যা রায়—

পঞ্চপুষ্প

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভাদ্র মাস। শরতের আকাশ নির্ম্মল রৌদ্রে উদ্ভাসিত। শ্যামল ধরণী সবুজ শোভায় হাসিতেছে। নদী-তড়াগ সলিলে পূর্ণ। তরুপত্রে সরস সজীবতা। সকলেই ফুল্ল—পরিপূর্ণতায় সুন্দর। মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়। সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে অনেকটা হেলিয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্ব-আকাশে কয়েক খণ্ড লঘু মেঘ ক্রীড়াচ্ছলে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রবল বাতাস তাহাদের উড়াইয়া অনেক দূর লইয়া ফেলিল। কয়দিন বৃষ্টি হয় নাই। ছোট ছোট চারা গাছগুলা ধূলার রং'এ ধূসর হইয়া উঠিল। কলিকাতা হইতে যে পথটী বরাবর বারাকপুর গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত এক-খানা ছোট 'বেবী অষ্টিন' 'কার' ছুটিয়া চলিয়াছিল; মোটারে আরোহী ছিল আট বছরের একটী ছেলে, সতর-আঠার বছরের এক সুন্দরী তরুণী। গাড়ী চালাইতেছিল মেয়েটা নিজেই। যেরূপ দক্ষতার সহিত সে পথ অতিক্রম করিতেছিল তাহা দেখিলেই এ বিষয়ে তার নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতার দিক হইতে চলিতেছিল বারাকপুরের দিকে। পূর্ণ বেগেই সে গাড়ী চালাইতেছিল। মেয়েটীর চেহারাই তার অভিজাত্যের পরিচয় দিতেছিল। স্থির দীপশিখার মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এক-হারা ছিপছিপে দেহখানি দীপ্ত সুন্দর। মুখশ্রী কমনীয়। দীর্ঘায়তচোখের দৃষ্টি ঈষৎ চাঞ্চল্যময়। বাঙ্গালী গৃহস্থঘরের সাধারণ মেয়েদের অপেক্ষা মেয়েটী একটু যে স্বতন্ত্র প্রকৃতির তাহা তাহার দৃষ্টির অন্তরাল হইতে যেন আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। মেয়েটী অতি সুন্দরী, উহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া সহজে চোখ ফিরাইয়া লওয়া দুরূহ। গাঢ় সবুজ রঙ্গে সরু জরির পাড় বসান রেশমী শাড়ী ও ব্লাউসে তাহাকে মানাইয়াছিলও বড় সুন্দর! পাতা-ঢাকা গোলাপ ফুলটীর মত! হাতে দু'গাছি করিয়া চুড়ী পান্না ও হীরা 'সেট্'-করা। গলায় সেই ধরণেরই একটী নেক্‌লেস্। কানের দুল দুইটার হীরা দু'খানা যেমন বড় তেমনই উজ্জ্বল। তার আকৃতি হইতে বেশভূষা সবই সম্ভ্রান্ত বংশ ও প্রচুর ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছিল। ক্ষাণিক দূর আসিয়া ছেলেটী প্রশ্ন করিল,—"কটা বাজল পূরবী-দি?"

মেয়েটীর নাম পূরবী। বাম হাতের মনিবন্ধটা একবার চোখের কাছে তুলিয়া 'রিষ্ট ওয়াচ'টা দেখিয়া লইয়া সে বলিল—"চারটে"

"মোটে চারটে? তুমি তো খুব শীগ্‌গীর এলে। বাড়ী যেতে আর কতটা দেরী হ'বে আমাদের? সন্ধ্যা হয়ে যাবে না ভাই?"

"হ্যাঃ সন্ধ্যে হবে না আরও কিছু? এখ্‌খুনি গিয়ে পড়ব। বাড়ী গিয়ে চা খাব দেখবি এখন। আমি কেমন 'ড্রাইভ' করতে শিখেছি। তোদের নরহরি পারে এমন? ছাই পারে। একটা মোড় ঘুরতে হ'লে সাড়ে সতর ঘণ্টা দেরী হয়। সে দিন 'বোট্যানিক্যাল গার্ডেন' থেকে ফিরতে—"

কথা শেষ হইতে না হইতে একটা বিরাট্ শব্দে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মোটর খানা সহসা অচল হইয়া একপাশে হেলিয়া পড়িল। প্রসূন চেঁচাইয়া উঠিল "টায়ার বার্ষ্ট। এখন যাবে কি করে পূরবী দি?"

"দাঁড়া না; এখুনি বদলে নিচ্ছি। খানিকটা দেরী করিয়ে দিলে আর কি।"

গাড়ীর দ্বার খুলিয়া ত্রস্তপদে নামিয়াই পূরবীর হাসি-মুখ পাংশু হইয়া গেল; দ্বারের উপর হাত দিয়া সে স্তব্ধ ভাবে চাহিয়া রহিল।

প্রসূন তাগিদ দিল—"দাঁড়িয়ে ভাবছ কি? বদলাও টায়ার।"

পূরবী কথা বলিল না। তার হাতে একটা ধাক্কা দিয়া প্রসূন বলিল, "ও পূরবী দি! ঘুমালে না কি। কি হ'ল তোমার?" তার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল ভাবে পূরবী বলিল,—"কি হ'বে রে প্রসূন। টায়ার তো সঙ্গে নেই আর। আন্‌তে ভুল হয়েছে।"

"সে কি? তা হ'লে হ'বে কি পূরবীদি? বাড়ী যাব কি ক'রে ভাই?"

সে চিন্তা তখন পূরবীর মনেও জাগিয়াছে। কি বলিবে সে ভাবিয়া পাইল না। প্রায় কাঁদিয়াই প্রসূন বলিল—"মা তো বল্লে নরহরিকে সঙ্গে নিতে তুমিই তো জোর করে একা এলে। কি হবে এখন? এই মাঠের মাঝে, রাত্তিরও হবে এখুনি। কোথায় যাব আমরা; কি হবে পূরবীদি বল না।"

বলিবার মত সে কিছু খুঁজিয়া পাইল না; বিহ্বল-ভাবে শুধু চাহিয়া রহিল। কোন উপায় তার মাথায় আসিল না। ধীরে ধীরে দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিল। বড় বড় গাছগুলার আশে পাশে অন্ধকার জমিতে আরম্ভ করিল। প্রসূন কাঁদিতে লাগিল। পূরবী কষ্টে চোখের জল গোপন রাখিলেও তার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল। ধনী পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। আজন্ম সে শহরে বর্দ্ধিত। পিতা দুই বৎসর হইল পরলোকে গিয়াছেন; সখ করিয়া সে মার সহিত কিছুদিন হইতে ব্যারাকপুর বাগান-বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতেছিল জীবনের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য। ত্রিতল বাড়ীর উপরে বসিয়া পল্লীর শোভা নিরীক্ষণ করা বেশ আরামের হইলেও, এখানে-ওখানে বেড়াইয়া পল্লীবাসীদের সহিত আপনাকে মিশাইয়া দেওয়ার সামর্থ্য তাহাদের মত শহুরে জীবের থাকে না। তারও ছিল না। গঙ্গার ধারে প্রকাণ্ড বাড়ীতে বাস করা তৃপ্তিজনক। বাড়ীর বাহিরে পা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। পাড়াগাঁয় বেড়াইবার মত স্থানই বা কোথায়? এক এক দিন মোটর লইয়া নিজেই চালাইয়া লইয়া যাইত। একা যাইতে মা প্রথম প্রথম বারণ করিতেন। শেষে কিছু বলিতেন না। কন্যার শিক্ষার তো ত্রুটি হয় নাই। তাহার সদ্‌ব্যবহারই হউক। একা সে যখন যাইতে ভয় পায় না তখন দরকার কি অন্য লোকের সাহায্যে। পর-নির্ভর হইয়া থাকিবার দিন মেয়েদের চলিয়া গিয়াছে। সকলেরই স্বাবলম্বী হওয়া আজকাল একান্ত প্রয়োজন। কলিকাতায় মাতুলগৃহে আজ সে বেড়াইতে আসিয়াছিল; মাতুলানীর চোখে আধুনিক উন্নতির আলো বড় বেশী লাগে নাই বলিয়াই, তার কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া পূরবী যখন বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিল, তখন তিনি সঙ্গে যাওয়ার জন্য একজন লোক দিতে চাহিলেন। তাঁর সোফার নরহরিকেও ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন। এই এত পথ, অল্প বয়স, একা যাইবে, সঙ্গী একটা শিশু মাত্র, এ কি রকম! বলা তো যায় না। বিপদ-আপদ হইতে কতক্ষণ যে? দিন কাল! মাতুলানীর অমূলক আশঙ্কায় পূরবী হাসিয়া মটিতে লুটাইল। "বাব্বা! মামীমার কি ভয়! একা গেলে কি হ'বে আমার শুনি? পথে বাঘ-ভালুক আছে? আমায় ধরে খেয়ে ফেলবে? না জিন দৈত্য আছে, উড়িয়ে নিয়ে যাবে? কিংবা চোর ডাকাতে মেরে ধরে গয়না কেড়ে নেবে? রোজ আমি এপথে যাই আসি, কিছুই হয় না। আর আজ লোক সঙ্গে নিতে হ'বে। আচ্ছা পরশু যখন প্রসূনকে রেখে যাব, তখন দেখবে আমরা ঠিকগিয়ে পৌছেছিলুম। আবার ফিরেও এলুম বুঝলে মামীমা?" মামীমা বুঝিলেন কিনা ঠিক বুঝা গেল না। মুখখানা অপ্রসন্ন করিয়া রহিলেন।

পূরবী দেখিয়া বলিল—"যদি প্রসূনের জন্য তোমার ভয় হয় তবে না হয় আমি একাই যাই"।

শুনিয়া ব্যস্তভাবে মাতুলানী বলিলেন—,"শোন মেয়ের কথা। ওর জন্যই কি বলছি রে? তোর জন্যে কিছু ভাবনা নেই? ওর চেয়ে তোর চিন্তা বেশী। যা হয় কর বাবু। বল্লে তো তোরা শুনবি না। এখনকার মেয়েরা তো আর মা-বাপের কথামত চলেনা। নিজেরা যা ভাল বোঝে করে।"

"তার কারণ কি জান,মামীমা? তারা বোঝে তোমাদের চেয়েও ভাল।" মাতুলানী আর কথা কহিলেন না। পূরবী প্রসূনকে লইয়া হাসিতে হাসিতে গাড়ীতে উঠিল। সঙ্গে আর টায়ার ছিল কিনা, দেখিয়া লইবার কথা আর তার মনেই পড়িল না।

শঙ্কা-ব্যাকুল চিত্তে পুরবী তেমনই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রসূন বার বার বলিতে লাগিল—"ও পুরবী-দি কি হবে বল না! কেমন করে বাড়ী যাব? এখখুনি যে রাত্রি হ'য়ে আসবে। কোথায় যাব আমরা? কেন তুমি আর কাউকে সঙ্গে নিলে না?"

একে এই বিভ্রাট,তাহাতে বার বার এই একই অনুযোগ; —বিরক্ত হইয়া পুরবী বলিল—"সঙ্গে আর একজন থাকলেই বা কি মুস্কিল আসান হ'ত শুনি? সে কি 'টায়ার' তৈরী করে দিত নাকি তোকে?"

"টায়ার না করুক একটা কিছু ব্যবস্থা তো কর'ত তুমি মেয়ে মানুষ"—।

কথাটায় জ্বলিয়া উঠিয়া পুরবী বলিল—"মেয়ে মানুষ তা কি? মেয়ে মানুষ বলে আমার কিছু ক্ষমতা নেই না?"

"ক্ষমতা থাকে তো দেখাও না সে ক্ষমতা। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? হুঁ। মেয়ে মানুষের শক্তির কথা আমার জানা আছে। ভারী তো। একটু মোটর চালাতে শিখে ভাব যে কি হয়েছি। বাহাদুরী করে কাউকে সঙ্গে না নিয়ে ঘোরা হয়; দেখলে তো মজা আজ। কেউ সঙ্গে থাকলে সে গিয়ে একটা 'ট্যাক্সি'ও তো ডেকে আনতে পারত।"

ক্ষোভে দুঃখে পুরবীর চোখে জল আসিতেছিল। এমন ভুলও হয়! একা হইলে এত ভাবনা ছিল না। না হয় গাড়ী এখানে রাখিয়া সে হাঁটিয়াই যাইত। কিন্তু প্রসূনকে লইয়া তাহা তো সম্ভব নয়। কি কুক্ষণেই যে সে আজ বাড়ীর বাহির হইয়াছিল!

কি একটা শব্দে চকিত হইয়া প্রসূন বলিল,—"ওকি পুরবীদি মোটরের 'হর্ণ' না?"

পুরবীও শুনিয়াছিল। অন্তরকে বিশেষ আশান্বিত হইতে না দিয়া সংশয়ের স্বরে বলিল "না বোধ হয়। অন্য কোন শব্দ হ'বে।"

উৎকর্ণ হইয়া পুনরায় শুনিয়া বালক বলিল,—"নিশ্চয় মোটর।" পুরবী কি বলিতে যাইতেছিল, কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই সম্মুখের পথে এক খানি সুবৃহৎ কাল রংয়ের 'মিনার্ভা' কার দেখা দিল। বাইশ তেইশ বছরের গৌর বর্ণ একটী ছেলে গাড়ী চালাইতেছে। অন্য কোন আরোহী ছিল না, পুরবীদের নিকটে আসিয়া গাড়ী নাগাইয়া সে নামিয়া পড়িল। পথের মাঝে একাকিনী তরুণীকে দেখিয়া সে বিস্ময় বোধ করিয়াছিল। ব্যস্তভাবে পুরবীর সম্মুখে আসিয়া কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিল। সংক্ষেপে কথাটা পুরবী বুঝাইয়া দিয়া বলিল—'কি মুস্কিল দেখুন। কি যে করি!"

একটু ভাবিয়া আগন্তুক বলিল,—"আপনি আমার গাড়ীতে আসুন। এখান থেকে আমাদের বাড়ী কাছেই। সেখানে একটু অপেক্ষা করবেন। আমি বাড়ী গিয়ে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, তারা আপনার গাড়ী ঠিক করে নিয়ে যাবে এখন।"

পুরবী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অপরিচিত যুবকের সহিত যাওয়া সঙ্গত কি না ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অথচ অন্য উপায়ও নাই। সহসা দৈব প্রেরিতের মত যে তাহার সম্মুখে আসিয়াছে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হইবে কি? কিন্তু একেবারে অচেনা অজানা লোকের সঙ্গে যাওয়াও তো সঙ্গত নয়! যুবকের সুন্দর আকৃতি দেখিয়া যদিও কোন হীন সন্দেহ মনে আসে না, তথাপি সুন্দর দেহের অন্তরালে কি আছে তাও তো জানার উপায় নাই। চিত্তের গৌরবদীপ্ত ভাবটা বলিয়া উঠিল—ভয় কি? কি আর করিবে ও? কি এমন শক্তি আছে ওর। আমি কি এতই অক্ষম কোন শক্তিই কি আমার নাই? যাওয়াই যাক্। কিন্তু তথাপি মনের একান্তে সুপ্তপ্রায় নারীত্ব যেন সহসা চেতনা লাভ করিয়া ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করিতে লাগিল একাকী রমণী। যদি কিছু হয়, ওর যদি কোন কুমতলবই থাকে। স্ত্রীলোক কি করিবে সে।

পুরবীর দ্বিধাগ্রস্ত মনের ছায়া মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেদিকে চাহিয়া মৃদু হাসির সহিত যুবক বলিল,—"আমি চোর ডাকাত বা খুনে নই আপনাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলব না, সে ভয় নাও করতে পারেন। যদি ইচ্ছা হয় আমার সঙ্গে চলুন। আমি ভদ্র সন্তান। গৌতম রায় আমার নাম। এই 'কল্পনা-কুটীর' বাড়ীখানায় থাকি। আমার মা, বাবা, ঠাকুর দাদা, ঠাকুমা সবাই সেখানে আছেন। আপনার ভয় পাবার কারণ কিছু নেই। যান তো চলুন!"

অজন্তা প্রাচীর-চিত্র

হরপার্ব্বতী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক

অঙ্কিত চিত্র হইতে

অজন্তা প্রাচীর-চিত্র

সিদ্ধার্থ

JUNO PRINTING WORKS—CAL.

পূরবী অপ্রতিভভাবে বলিল, "না না ভয় পাব কেন? ভয়ের কোন কথা মনে ওঠে নি; দেখিতে পাচ্ছি আপনি ভদ্রলোক। আপনি কি আমায়—তা নয়, তবে কিনা আপনাকে আবার অনর্থক কেন কষ্ট দেব তাই ভাবছিলুম।"

গৌতম মোটরের দ্বার খুলিয়া দিয়া হাসিয়া বলিল—"কোন উপায় যখন নেই তখন কষ্ট একটু পেতে হ'বে বৈ কি। নিন উঠুন।" প্রসূনকে লইয়া পূরবী হৃষ্ট-চিত্তে উঠিয়া বসিল। "কল্পনা-কুটীরে'র মালিকের নাম এবং তিনি যে একজন বিখ্যাত ধনী—এ সংবাদ পর্য্যন্তও তার জানা ছিল। এপথ দিয়া যাওয়া আসা করিতে কল্পনা-কুটীরের সম্মুখ দিয়াই তাহাকে যাইতে হয়। কাজেই তাহার নাম শুনিয়া কোন সন্দেহই তার অন্তরে স্থান পাইল না। গৌতমকেও তার বিশেষ অচেনা বলিয়া বোধ হইল না। মনে পড়িল ও বাড়ীর সম্মুখের উদ্যানে ইহাকেও সে বহু বার দেখিয়াছে। গৌতম চালকের আসনে বসিয়া গাড়ী চালাইল। প্রসুন এতক্ষণে মুক্তির শ্বাস ফেলিল। পূরবীর দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে সে বলিল,—"পূরবী-দি দেখ বাবুটী কি সুন্দর। তোমার চেয়েও অনেক ভাল দেখতে। কি সুন্দর মুখ, রংটা যেন—!"

চাপা গলায় পূরবী ধমক দিয়া উঠিল, "চুপ কর শুনতে পাবে যে, কি আর এমন সুন্দর? ওর চেয়ে অনেক সুন্দর আছে।"

কথাটা প্রসুনের মনঃপূত হইল না। মুখ ফিরাইয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

অনেকক্ষণ হইতে নীরজা শর্ম্মিষ্ঠাকে ডাকিতেছিল। শুনিতে পাওয়া সত্ত্বেও সে একইভাবে জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাগানের দিকে চাহিয়াছিল, না আসিতেছিল নীরজার কাছে, না দিতেছিল তার কথার উত্তর। একটু রাগের সুরে নীরজা বলিল, "তুই শুনতে পাস না শমু, এত যে ডাকছি আমি? আয় এদিকে!" শর্ম্মিষ্ঠা তবুও উত্তর দিল না। নীরজা আবার বলিল—"একা আমি পারছি না শমী। চিঁড়ের পিঠে আর মুগের চপ কটা গড়ে দিয়ে যা।"

মুখ ফিরাইয়া শান্ত কণ্ঠে শর্ম্মিষ্ঠা বলিল—"কেন বার বার বলছ মা? তোমাদের খাবার জিনিসে আমি হাত দিতে পারব না বলেছি তো।"

"কেন পারবি না শুনি?"

"তুমি জান না? একটা নীচ জাতের হাতে কি তোমরা খাও? আমার স্পর্শ করা জিনিস খেতে তোমাদের প্রবৃত্তি হয় কেমন করে তাই ভাবি আমি।"

"ভাববার দরকার তো নেই। বরাবর যখন খেয়ে এসেছি, এখনও খাব। তোর কথা মত তা তো বন্ধ করব না! অনর্থক বিরক্ত করিস না শমু, আয়।"

জোর করিয়া মাথা নাড়িয়া শর্ম্মিষ্ঠা বলিল,—"তুমি যাই বল আমি তোমায় এ অন্যায় করতে দিতে পারব না।"

"দেখ্ শমী বেশী জ্যাঠামী করিস্ না। কি অন্যায়, কি ন্যায় তুই আমার চেয়ে বেশী জানিস না? আমার যদি ইচ্ছা হয়, প্রবৃত্তি হয়, তোর হাতে খেতে। তোর তাতে কি? আয় এদিকে।"

"আমি অন্যায় করতে পারব না মা। তুমি স্নেহে অন্ধ হ'য়েছ, কিছু ভাবছ না, কিন্তু আমি তো তোমার মত পাগল হই নি। ভাবছ মা আমায় তফাৎ রাখলে আমি কষ্ট পাব? না মা। সত্যি বলছি নিজের পরিচয় যখন জেনেছি, তখন এতে একটুও কষ্ট আর হ'বে না।"

নীরজা কথা কহিল না। ষ্টোভের উপর হইতে কড়াইটা নামাইয়া ফুটন্ত ঘৃতের মধ্য হইতে ক্ষীরের সিঙ্গাড়া কখানা ঝাঁঝারি দিয়া ছাঁকিয়া একখানা থালার উপর ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া বলিল,—"রইল এসব পড়ে। পারব না আমি করতে। একা একা এই একরাশ খাবার করা আমার সাধ্যে কুলোবে না। উনি কি গৌতম জল খেতে এলে বলিস, মা খাবার তৈরী করতে পারে নি। পারবে না আর।"

বর্ষা কালের সজল মেঘের মতই আর্দ্র গম্ভীর মুখে নীরজা ঘর ছাড়িবার উপক্রম করিল। তার ও শর্ম্মিষ্ঠার মধ্যে কয়দিন হইতেই এই ব্যাপার চলিতেছে। পরিচয় জানা অবধি শর্ম্মিষ্ঠা যেমন সসঙ্কোচে দূরে সরিয়া থাকিতে চায়, বিপুল স্নেহে নীরজা তেমনই আরও সন্নিকটে তাকে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করে। যদি তার এ যন্ত্রনার কথঞ্চিৎ লাঘব হয়। শর্ম্মিষ্ঠা সাধ্যমত কিছুর মধ্যে ধরা দেয় না।

আপনার মনে আপন ঘরটীতে বসিয়া আকাশ-পাতাল কি ভাবে, সেই জানে। গৌতমের সাড়া পাইলেই দ্বার বন্ধ করে বা অন্য কোথাও সরিয়া যায়। গৌতমের সহিত তার ঘনিষ্ঠতা কেন যে রমাকান্তবাবু বা সুররাণীর প্রেয় নয়, কেন তার গৃহে গৌতমের যাওয়া বারণ, তার প্রকৃত কারণ আজ স্পষ্ট হইয়া চোখের উপর ভাসিয়া উঠায় সঙ্কোচ ও কুণ্ঠার অসহ্য ভারে সে আরও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এ কয় দিন হইতে বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার জন্যই সে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। পারে নাই নীরজা ও বিজনের জন্য। সে সকলের চোখের অন্তরালে সঙ্গোপনে সকল কথা ভাবিবার বা বুঝিবার জন্য একটু বিরল অবকাশ একান্ত আগ্রহে কামনা করিলেও নীরজা ও বিজন তার এ অবস্থায় স্থানান্তরিত করিতে চাহিল না। শুধু তাহাদের জন্যই অন্তরের ব্যথা অন্তরে চাপিয়া বাহিরে আপনাকে সংযত রাখিয়া শর্ম্মিষ্ঠা এখানে থাকিয়া গেল। মুখের উপর হাসির আবরণ যতই টানুক্ অন্তরের গোপন ক্ষত হইতে অবিরাম যে রুধির বাহির হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে নীরজা, বিজন, বা গৌতমের এতটুকু বিলম্ব হয় নাই। রুগ্ন শিশুর হাতে খেলনা দিয়া মা যেমন তার ব্যাধির যাতনা ভুলাইয়া দিতে চান, তেমনইভাবে তাঁহারা তাহাদের অজস্র স্নেহ-মমতার ধারায় তাহাকে সিক্ত করিয়া তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছিল।

সত্য সত্যই নীরজাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া শর্ম্মিষ্ঠা ত্রস্তপদে গিয়া তার হাত ধরিল। বলিল, "বাঃ রে! চার দিকে এসব ছড়িয়ে পালাচ্ছ যে? বাবা, দাদু, গৌতম সব এখনি খাবার চাইবেন। কি দেওয়া হ'বে তাদের শুনি?"

অন্য দিকে চাহিয়া উদাস গম্ভীরভাবে নীরজা বলিল,—"আমি জানি না। একা একা রোজ রোজ এত সব করবার শক্তি আমার নেই।"

"বেশ। বামুন ঠাকুরদের কাকেও ডাক। তুমি দেখিয়ে দাও। তারা করবে।"

"হ্যাঁ! তারা করবে? তা হ'লে কারও মুখে দিতে হ'বে না।"

"তবে কি হ'বে? তুমিই কর না এতদিন তো একাই করেছ।"

"এতদিন করছি বলে চিরদিনই করব? মেয়ে বড় হ'য়ে মাকে সাহায্য তো করে।"

"কিন্তু আমি তো তোমার মেয়ে নই মা।"

সজল চোখে একবার শর্ম্মিষ্ঠার দিকে চাহিয়া নীরজা বলিল, "ঠিক বলেছিস্ রে। আমার কিন্তু সে কথা মনেই থাকে না।" তাহার কণ্ঠে আজ যে সুর ধ্বনিয়া উঠিল তাহাতে শর্ম্মিষ্ঠার দৃঢ়তার আবরণ নিমিষে খসিয়া পড়িল। দুই হাতে নীরজাকে বেষ্টন করিয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "মা, মা, আমার মা! না বুঝে আজ তোমায় কত কষ্টই না দিয়েছি।"

নীরজা গভীর স্নেহে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কোমল স্বরে বলিল, "কেন এমন করে আমায় কষ্ট দিস শর্মা। তুই আমার মেয়ে। যে সব বাজে কথা শুনে অকারণ কষ্ট পাচ্ছিস, সে সব ভুলে যা—ভুলে যা"।

তার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া শর্ম্মিষ্ঠা বলিল,—"ভোলবার তো চেষ্টা করি মা, কিন্তু এ যে ভোলবার জিনিস নয়। ওঃ!"

নীরজা কথার গতি অন্য পথে ফিরাইয়া বলিল—"বেলা গেছে রে। উনি এখনি চা খেতে আসবেন। আমার কিছুই এখন তৈরী হয় নি। একা হাতে কি হয়। তুই আয় মা"।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শর্ম্মিষ্ঠা বলিল—"চল"। নীরজা খুসী হইয়া ষ্টোভে কড়া চাপাইল। শর্ম্মিষ্ঠা নীরবে নতমুখে বসিয়া ভিজা চিঁড়া গুলা লইয়া ছানার সহিত মাখিতে লাগিল।

নিকটেই বিজনের কণ্ঠ শুনা গেল—"শর্ম্মিষ্ঠা তোরা কোথায় রে?"

মুখ তুলিয়া শর্ম্মিষ্ঠা বলিল,—"দেখতে পাচ্ছ না বাবা এই তো"।

"ওঃ" বলিয়া বিজন নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। শর্ম্মিষ্ঠা বলিল,—"আজ তোমার চা খেতে একটু দেরী হ'বে বাবা। আমাদের বড় দেরী হ'য়ে গেছে। একটু বস তুমি। বেশী নয় আধ ঘণ্টা"।

ব্যস্ত ভাবে বিজন বলিল—"না রে। এখন বসব না। বাইরে একটী লোক আছে। আমি বলতে এলুম বাইরেই

আজ খাবার ও চা দিস্ আমার। আর একটা কাপ চা আর কিছু খাবার বেশী পাঠাস্। আর একজন আছে।"

বিজনের বন্ধু-বান্ধব বড় কেহ ছিল না। বাহিরের কাহারও সহিত সে অতি অল্পই মিশিত। সেই জন্য আলাপও বড় কাহারও সঙ্গে নাই। একটু বিস্মিত হইয়া নীরজা বলিল,—"তোমার কাছে আবার কে এল?"

বিজন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শর্ম্মিষ্ঠা বলিল, "আমি বলছি। সেই মিঃ চৌধুরী বুঝি আজ এসে জুটেছে? ও তোমার কাঁধে ভর করল কি ক'রে বাবা? ওকে পেলে কোথায়?"

"ঐ যে সেদিন সুকান্তবাবুর বাড়ী গেছলুম। সেখানে আলাপ হ'ল। তাঁদেরই কে হয় যেন। বেশ ছেলেটী। লেখা পড়ায় ভারী আগ্রহ, নানা বিষয় শিখবার দিকে ভারী ঝোঁক। চমৎকার ছেলে।"

হাসিয়া শর্ম্মিষ্ঠা বলিল, "তোমার মতই বইএর পোকা; কিন্তু তা ছাড়াও তার আরও একটা ভয়ানক দোষ আছে বাবা।"

"দোষ? কি দোষ?" গভীর বিস্ময়ে বিজন শর্ম্মিষ্ঠার দিকে চাহিল।

"দোষ এই তোমার মত নিরীহ লোকটীর কাছে সে বেশ সুযোগ পেয়ে প্রত্যহ অনেক কিছু জেনে যাচ্ছে। আর তোমার শিষ্যের যে স্থান আমারই একচেটে ছিল তার কতকটাও সে যেন অধিকার ক'রেছে।"

"এই কথা। হাঃ হাঃ হাঃ" ঝরণার ধারার মত বিজনের অনাবিল সরল হাসিতে ঘর ভরিয়া উঠিল। তেমনই নির্ম্মল তেমনই পবিত্র।

সত্যি শমু যে আগ্রহ-ভরে শিখতে চায়, তাকে শেখাতেও আমোদ আছে; ছেলেটী এত তন্ময় হ'য়ে, এত সাগ্রহে শেখে কি বলব! তোরই মত প্রায়।"

"যাই হ'ক বাবা, ও যা বকায় তোমায়, দেখে আমার রাগ ধরে; কথায় কথায় এটা কেন অমন হয়? ওটার কি অর্থ? তার কি হ'য়েছিল? কেবল প্রশ্ন, আর প্রশ্ন। সেদিন আমি শুনছিলুম। এত রাগ ধরছিল আমার। কেবল তোমায় বিরক্ত করে ও লোকটা!"

"তা হ'ক, তা হ'ক ওতে আমার কিছু বিরক্তি হয় না রে। অমন ব্যগ্র হ'য়ে ও জানতে চায় তা বলতে কি রাগ হয় রে? জানে না, জানতে চায় বলেই তো জিজ্ঞাসা করে। বেশ ছেলেটী ভারী ভাল।"

মুখ তুলিয়া নীরজা বলিল, "কার কথা বলছ এত, আমি তো কিছু বুঝতে পারলুম না। কে?"

"কে যে আমিও ঠিক জানি না। সুকান্তবাবুদের কে যেন হয়; ওঁদের ওখানেই আলাপ হ'ল সেদিন। সেই থেকে রোজই আসছে, এখানে বসে কিছু পড়াশুনো করে।"

শর্ম্মিষ্ঠা স্মিতমুখে বিজনের দিকে চাহিয়া বলিল, "অর্থাৎ বিনা বেতনে একটী গুরু ঠিক করেছে।"

"হ্যাঁ কি বলিস্ পাগলী? গুরু হ'বার মত সামর্থ্যই বা আমার কই। কিই বা জানি। কিই বা শিখেছি। জগতে জানবার কত কি যে আছে তার কিছুই তো জানতে পারলুম না। কতটুকু শিখলুম—কিছু না।"

গভীর শ্রদ্ধা-ভরা দৃষ্টিতে শর্ম্মিষ্ঠা একবার তাঁর দিকে চাহিল। প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী না হইলে এমন কথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। জ্ঞানীগণের অগ্রগণ্য বরেণ্য নিউটন একদিন তাই বলিয়াছিলেন,—বিশাল জ্ঞান-জলধির কূলে বসিয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র।

নীরজা বলিল, "সেজদির কে? বুঝলুম না তো। কি করে সে?"

"দর্শনের অধ্যাপক। ইউরোপ ঘুরে এসেছে। বয়স খুব অল্প; কিন্তু পাণ্ডিত্য যথেষ্ট। অনেক জানে। আচ্ছা আমি যাচ্ছি তা হ'লে চা-টা পাঠিয়ে দিও, আর শমু তুমি একটু চল তো আমার সঙ্গে! বইখানা কোথা গেল খুঁজে পাচ্ছি না তুমি নইলে সে বার হবে না। একটু খুঁজে দেবে চল। এস এস দেরী ক'র না।"

"আমার যেতে দেরীই হ'বে বাবা। একটু পরে চলবে না?"

"আচ্ছা একটু দেরী হ'লে ক্ষতি নাই। চা-টা ততক্ষণ পাঠিয়ে দাও।" বিজন চলিয়া যাইতেছিল। শর্ম্মিষ্ঠা ডাকিয়া বলিল, "তোমার মিষ্টার চৌধুরীর খাবারটা দোকান থেকেই আনিয়ে দিই; নিজেদের তো অনাচারের সীমা নেই। আমার

তৈরী খাবার খাইয়ে সে ভদ্রলোকের জাত-ধর্ম্মটা নাই বা নষ্ট করলে বাবা ?"

বিজন হাসিয়া বলিল, "সে ভয় তোর নেই। আমার সে খেয়াল আছে। প্রবৃত্তি সকলের সমান নয়। আমি যা ভাল বুঝি, অন্যে সেটা ভাল ভাবে নাও নিতে পারে। সুকান্তিবাবুদের কাছ থেকে তোমার সম্বন্ধে সব কথাই তার জানা আছে। সেদিন তোকে দেখেছেও তো। যদি তার কোন দ্বিধা থাকে ভেবেই এ ক'দিন তাকে চা খেতে আমি বলি নি। আজ চা খাবার সময়ই এসেছে বলেই চায়ের কথা বল্লুম। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বল্লুম আমার বাড়ীর প্রত্যেক জিনিস প্রায় তোর হাতে তৈরী। তার ইচ্ছে হয় খাবে না হয় অন্য ব্যবস্থা করি। তাতে ছেলেটী ভারী অপ্রস্তুত হ'য়ে বললে আমায় এত হীন মনে ভাবছেন কেন? আমার এতে কোন আপত্তি নেই।"

একটু উৎফুল্ল হইয়া নীরজা বলিল, "ছেলেটী সত্যিই তোমার ছাত্রের উপযুক্ত। বড় খুসী হ'লুম তার কথা শুনে।"

"হ্যাঁ তার মতগুলা বেশ উদার। কোন নীচতা তার মধ্যে নেই।"

সহসা একটু ব্যগ্র ভাবে নীরজা প্রশ্ন করিল, "ছেলেটীর অন্য পরিচয় কি ? মা-বাপ আছে ? জান কি ?"

"জানি। অল্প বয়সেই ওর মা-বাপ মারা যায়। বেশ সম্ভ্রান্ত বংশ। অবস্থা ভাল। যথেষ্ট অর্থ আছে। সচ্চরিত্র, বিনয়ী, বিদ্বান্!"

আরও একটু ব্যাকুল আগ্রহের সঙ্গে নীরজা বলিল, "বিয়ে হয়েছে কি না জান ? নাম কি তার ?"

"নাম উৎপল। বিয়ে হয়েছে কি তো তা জানি না।"

পত্নীর আশাদীপ্ত নয়নের দিকে ক্ষণেক চাহিয়া অন্য মনেই বিজন বলিল, "বৃথা দুরাশাকে মনে স্থান দিও না নীরা! নিরাশার ব্যথা তাতে বড় কঠিন হ'য়েই বাজে। উদার মত মুখে দেখান সহজ, কিন্তু কাজে সেটাকে পরিণত করবার শক্তি অল্প লোকেরই থাকে।"

ব্যথা-ভরা একটা দীর্ঘশ্বাস বক্ষে চাপিয়া নীরজা বলিল, "না, আশাকে আর বড় একটা মনে আসতে দিই না। তবুও—যাক্ খাবার হ'য়ে গেল। চাও হ'য়েছে, চাকররা কেউ দিয়ে আসছে বাইরে। তুমিও কি সেখানেই খাবে ?"

"হ্যাঁ। তাকে একলা খেতে দেওয়া ভাল হ'বে না। শমু চল, তা হ'লে তোমার তো এখানে আর কাজ নেই। চল আমার বইটা খুঁজে দেবে। সেটা না হ'লে আমার কিছু হচ্ছে না।"

"তুমি খুঁজে নাও না বাবা। ও লোকটা আছে, আমি আর এখন যেতে পারি না। ও যাক তারপর যাব এখন।"

"আরে ও আছে তা কি ? ও আমার ছাত্র। ঘরের ছেলে ওর কাছে আবার সঙ্কোচ। চল চল পাগলী মেয়ে।"

শর্ম্মিষ্ঠাকে প্রতিবাদের অবকাশ না দিয়াই বিজন তাহাকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইল।

বিজনের পড়িবার ঘরে টেবলের সম্মুখে বসিয়া তন্ময়তার উৎপল কি একখানা বই দেখিতেছিল; তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বিজন বলিল, "কৌটিল্য খানা তোমায় এখুনি দিচ্ছি উৎপল, শমু এসেছে ও এখনি সেখানা খুঁজে বার করবে। বইগুলো কোথায় থাকে আমি তার সন্ধানই পাই না, শমী কিন্তু এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এনে দেয়। ও এখানে না থাকলে আমার তাই এত কষ্ট হয় কি বলব যে।"

বিজনের সাড়া পাইয়া উৎপল উঠিয়া দাঁড়ায়াছিল। কুণ্ঠানমিতা শর্ম্মিষ্ঠার দিকে চাহিয়া যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া মৃদু হাসির সহিত সে বলিল, "আপনাকে আমরা কষ্ট দিলুম।"

প্রতি নমস্কার করিয়া নত মুখে শর্ম্মিষ্ঠা বলিল—"কষ্ট আর কি ?" বই খুঁজিতে অগ্রসর হইয়া সে একটা 'বুককেস্' খুলিল। বিজন ও উৎপল আসন গ্রহণ করিল। একজন ভৃত্য ঘরে আসিয়া দু'জনের সম্মুখে টেবল-ক্লথ ঢাকা দুখানা ছোট 'টিপয়' রাখিয়া গেল, আর একজন দু-কাপ চা ও দুখানা খাবারের রেকাবী তাহার উপর রাখিয়া আদেশের প্রতীক্ষায় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিজন বলিল—"চা খাও উৎপল।"

"এই যে" উৎপল হাত বাড়াইয়া চায়ের কাপটা তুলিয়া লইল, সন্ধ্যার বড় দেরী নাই। উৎপলের সুশ্রী মুখে এক ঝলক লাল আবির কে যেন ছড়াইয়া দিয়াছে। ছেলেটীর বয়স বেশী নয়। সম্পর্কে সে সুকান্তর ভাগিনেয়। তাহারই

কাছ হইতে বিজনের সম্বন্ধে কিছু কিছু তার শুনা ছিল। না দেখিয়াও এই লোকটীর উপর তাই তার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। শর্ম্মিষ্ঠার কথাও সে শুনিয়াছিল। সমাজের তীব্র ভ্রূকুটী উপেক্ষা করিয়া এমনই একটা বালিকাকে শুধু গৃহে নয় অন্তরের মধ্যে তাহার কন্যার স্থান দিয়া তেমনই সমাদরে রাখিয়াছে, জানিয়া সে শ্রদ্ধার মাত্রা তার আরও বাড়িয়াছিল। বিজনের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ সে খুঁজিতেছিল। বিজনের সহিত দু' একটা কথা বলিয়াই উৎপল মনে প্রাণে তার খাঁটি শিষ্য হইয়া পড়িল। অধ্যয়ন স্পৃহা স্বভাবতঃই তার প্রখর। পিতৃসঞ্চিত অগাধ অর্থ স্বত্বেও ইচ্ছা করিয়াই সে অধ্যাপনার কাজ লইয়াছে। ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীতে বছর কত কাটাইয়া আসিয়াছে। অধ্যয়ন-অধ্যাপনাতে তার অধিকাংশ সময় কাটিত। শিখিবারও জানিবার যে ব্যাকুল আগ্রহ তার অন্তরে ছিল বিজনকে দেখিয়া তারা যেন পথ খুঁজিয়া পাইল। এমন উপদেষ্টা, এমন শিক্ষক যদি পাওয়া যায়। ভয়ে ভয়েই সে কথাটা উচ্চারণ করিয়াছিল; বিজন উচ্চ হাসিয়া উত্তর দিল—"আমার কাছে তুমি শিখতে চাও, আমি কি কিছু জানি যে তোমায় শেখাব। আমি যা জানি সে সকলেরই জানা আছে। আমার মত লোক শেখাবে, যে নিজেই জানে না।" তবু উৎপল প্রত্যহই আসিত। বিজনের জ্ঞানের গভীরতায় প্রথম সে বিস্মিত হইল। তারপর বুঝিল এঁর কাছে শিক্ষা পাওয়া শুধু গৌরবের নয় পরম সৌভাগ্যের কথা। বিজনের সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিল তার কাছে আসিয়া বুঝিল, সে কথায় তাহার কণা মাত্র পরিচয়ও দিতে পারে নাই। তার জ্ঞান, তার উদারতা, তার মহত্ত্ব ধারণার অতীত। বিজনের উপর তার শ্রদ্ধা ছিল। গভীর ভক্তিতে তাহা রূপান্তরিত হইয়া গেল, শুধু উপদেষ্টা গুরু বলিয়া নয়, তার মহান্ হৃদয়ের পরিচয়ে। শর্ম্মিষ্ঠা বুঝিল উৎপল বিজনের একান্ত ভক্ত। অপরে আপনার উপাস্যকে ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিতে দেখিলে আপনা হইতেই তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব আসিয়া পড়ে। তাই এই সুদর্শন তরুণটীর উপর শর্ম্মিষ্ঠারও প্রসন্নতার অন্ত রহিল না। বই-খানা বিজনের হাতে দিয়া শর্ম্মিষ্ঠা বলিল—"আমি যাই।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া বিজন বলিল—"তুই পড়বি না।"

"এখন নয়, রাত্রে। এখন যাই।"

বিজন কি বলিতেছিল, দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া গৌতম ভিতরে প্রবেশ করিল। উৎপলকে গৌতম দেখে নাই। পিতার পড়িবার ঘরে অপরিচিত একজন যুবককে দেখিয়া সে যথেষ্ট বিস্ময় বোধ করিল। লোকটীর উপর তত প্রীতিও অনুভব করিল না। বিশেষ করিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে ইহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত অকারণেই তার মনটা কেমন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; তাই নবাগতর সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা মাত্র না দেখাইয়া সে শর্ম্মিষ্ঠার দিকে চাহিয়া বলিল—"মা তোমায় ডাকছেন"

"যাচ্ছি" বলিয়া শর্ম্মিষ্ঠা ঘরের বাহির হইয়া গেল। উৎপলের দিকে চাহিয়া বিজন বলিল—"এ আমার ছেলে গৌতম? গৌতম ইনি অধ্যাপক উৎপল চৌধুরী, ইউনিভারসিটির ফিলজফির 'প্রফেসার'। খুব পণ্ডিত।"

পরিচয় পাইয়াও গৌতম তাহার প্রতি বিশেষ কোন রকম শ্রদ্ধা বা প্রীতি বোধ করিল না। ক্ষুদ্র একটা নমস্কার করিয়া পিতার দিকে চাহিয়া বলিল,—"তুমি একটু বাড়ীর ভেতর যেতে পারবে বাবা?"

"এখনই? কোন বিশেষ দরকার আছে কি?"

"যেতে পারলে ভাল হ'ত। অসুবিধা হয় থাক্। একটু পরেই এস।" গৌতম চলিয়া গেল বিজন কি একটা বই লইয়া তার পাতা খুলিয়া বসিল। উৎপল প্রশ্ন করিল,—"মিঃ রায়! মেয়েটীর বিবাহ বিষয়ে কিছু চেষ্টা আপনি করেছেন কি? ও'র তো বিয়ের বয়স হ'য়েছে।"

"তা হ'য়েছে কিন্তু সে চেষ্টা আমি করি নি। সফল হ'বে না জেনে।

"মিঃ রায়! আমি বলছিলুম আপনি চেষ্টা করুন। অমন সুন্দরী আর এমন শিক্ষিতা।"

ম্লান হাসির সহিত বিজন বলিল,—"তা হ'লেও কেউ ওকে গ্রহণ করবে না; কারণ বেশীর ভাগ লোকের ধারণা যখন ও অপবিত্র তখন ওকে গৃহলক্ষ্মীরূপে ঘরে নিয়ে যাবার মত লোকের সৎসাহস কোথায়; সে হ'বার নয় উৎপল। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই এদের মনের সংকীর্ণতা দেখে। জন্মের

জন্য দায়ী তো ও নয়, নিজে সে পবিত্র, তবুও এতটা ঘৃণা তারা করে কি ক'রে? নিজেরাও হয় তো খুব পবিত্র উন্নত চরিত্র নয়, অন্যায় কাজও জীবনে অল্প-বিস্তর করা আছে, তারাই আবার এদের দেখে বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। জোর গলায় প্রচার করে, সমাজে ওদের স্থান হ'বে না, হ'তে পারে না। যে নিজে জীবনে অন্যায় করে নি, অন্যায়কে প্রশ্রয় সে দিতে পারে না, কিন্তু যারা সহস্র অপরাধের অপরাধী তারা অন্যের বিচার করতে আসে কোন সাহসে? তাও কি ন্যায় বিচার? দোষী কোথায় রইল ঠিক নেই, সামনে এল যে বিচার হল তারই। আমরণ ধরে সে এ শাস্তির বোঝা বয়ে চলুক, তার দোষ যে কতটুকু সে একবার কেউ ভেবেও দেখে না।"

ক্ষুব্ধভাবে বিজনের ব্যথা-ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া উৎপল বলিল—"বাস্তবিক মেয়েটীর জন্য আমার বড় দুঃখ হয়, এমন সুন্দর মধুর কোমল একটা প্রাণ, সমাজের অন্যায় বিচারে ও অত্যাচারে শুকিয়ে ঝরে যাবে?"

"উপায় কি? কোনই তো উপায় নেই। সমাজে থেকে তার বিপক্ষতাচরণ করা তো চলে না, আর ওর জন্য সমাজ ত্যাগ করতেই বা যাবে কে?"

"কিন্তু মিঃ রায়—"অল্প একটু হাসিয়া বিজন বলিল, "উৎপল! আমাকে তুমি 'বিজনবাবু বল। ও বিলিতী সম্ভাষণ গুলো যেন আমাদের কাণে এসে বাজে। তোমাকেও আমি মিষ্টার চৌধুরী না বলে নাম ধরেই ডাকছি। হয় তো এতে তুমি বিরক্ত হচ্ছ। কিন্তু কি করব? ও বিদেশী ধরণটা আমি যেন কিছুতেই ধাতস্থ করে নিতে পারি না। আমায় কেউ ওভাবে ডাকলেও যেমন রাগ হয়, অন্যকে বলতে গেলেও তেমনি মুখে বেধে যায়; আর তুমি আমার ছেলেরই বয়েসী—তাই তোমায়—"

অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া উৎপল বলিল,—"আমায় মাপ করবেন। আমি আর ও কথা উচ্চারণই করব না। বাস্তবিক কথা-বার্ত্তায় চাল-চলনে আমরা এমন বিদেশী-ভাবাপন্ন হ'য়ে পড়েছি, যে নিজেদের মধ্যেও ওদের চাল-চলনগুলার অনুকরণ করি—সে গুলা বর্জ্জন করতে পারি না। এটা আমাদের পক্ষে একটুও প্রশংসার কথা নয়। ঘরে-বাইরে আমরা সাহেব সাজতে গেছি বলেই না এত লাঞ্ছনা সইতে হচ্ছে। সুকান্তবাবু আমার মামা। আপনি তাঁর ছোট ভায়ের মত। আমি আপনাকে ছোট মামা বলেই ডাকব। আপনিও তেমনই স্নেহের চোখে আমায় দেখবেন।"

হাসি মুখে বিজন বলিল—"এ সব গুলো এখন আমাদের দেশে দারুণ অসভ্যতার নিদর্শন বলেই চলে গেছে। যাকে তাকে যা তা বলে ডাকা এ অতি অসভ্যতার পরিচায়ক কিন্তু পূর্ব্বে এদেশের লোক জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ছোট বড় সকলকেই একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে কথা বলত। তুমি ইউরোপ ঘুরে এসেও নিঃসম্পর্কীয় একজনকে মামা বলে ডাকতে কুণ্ঠা বোধ কর না দেখে ভারী খুসী হ'লুম।"

উৎপল মৃদু হাসিয়া বলিল,—"সমুদ্র পেরিয়ে বিলেতে গেছলুম সত্যি, কিন্তু বিলিতী বাঁদর হ'য়ে এসেছি বলেই আপনি কি অনুমান করেন? সেটা আমার প্রতি কিছু অবিচার হবে না মামা?"

বিজনের উচ্চ হাসির ধ্বনিতে ঘর ভরিয়া উঠিল। উৎপলের পিঠে কষাঘাত করিয়া বলিল—"না না এমন অমূলক অনুমান আমি করি নি, আর মামা বলে যখন স্বীকার করে নিলে, তখন আমি তেমনই স্নেহ এবং শুভাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তোমায় আশীর্ব্বাদ করি। চিরদিন দেশের ছেলে বলেই যেন তুমি পরিচয় দিতে পার। দরিদ্র দেশের দরিদ্র সন্তান হ'য়েই তোমার দিন কাটুক। বিদেশী ঐশ্বর্য্যের মোহ যেন তোমার উপর প্রভাব বিস্তার না করে।" উৎপল উঠিয়া তাড়াতাড়ি বিজনের পদধূলি লইয়া ভাবগদগদকণ্ঠে বলিল—"আপনার আশীর্ব্বাদ সার্থক হ'য়ে আমার জীবন ধন্য করুক।"

সে পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ করিলে, বিজন জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বলছিলে যেন তুমি উৎপল?"

"বলছিলুম" উৎপল ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিল, তারপর ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে বলিল,—"আপনার ছেলের সঙ্গে কি ও'র বিয়ে হয় না?"

বিজনের দীপ্ত মুখখানা বেদনার ছায়াপাতে ম্লান হইয়া আসিল। "সে হয় না উৎপল। আমার বাবা, মা বর্ত্তমান। তাঁদের অনিচ্ছায় এ সম্বন্ধে কিছু করতে আমি অক্ষম। চিরজীবনের সংস্কার তাঁরা মন থেকে দূর করতে পারেন নি।

আমার নিজের, গৌতমের মায়ের, এ বিষয়ে কোন আপত্তি দূরে থাক, বরং অত্যন্ত আগ্রহ আছে। কিন্তু তবুও তা পারি না। কি করব? বাবা মার তো অবাধ্য হ'তে পারি না। আমি যে তাঁদের অন্ধের যষ্ঠি—একমাত্র ছেলে। তাঁরা যদি স্পষ্ট মত না দিয়ে অমত না করেন তা হ'লে আমার জীবনের একটা বড় সাধ পূর্ণ হয়।"

"না সে কি ক'রে হয় তা হ'লে। যাক্ আচ্ছা আমি চেষ্টা করব। আমার জানাশুনার মধ্যে, সব জেনেও যদি কেউ ওঁকে গ্রহণ করে।"

"সে হ'বে না উৎপল। অত উদারতা কেউ দেখাবে না। ভিন্ন জাতির মধ্যে বে করতে অনেকে উৎসুক, বিশেষ সমাজের নিম্নস্তরের জাতির কন্যা গ্রহণে কারো কারো আপত্তি না থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে ওরকম অজ্ঞাতকুলশীলাকে—না সে কেউ গ্রহণ করে না। ওর ভাগ্য। চিরদিন এমনই ব্যথার বোঝা বয়ে দিন কাটবে।"

ধীর পদে ঘরে ঢুকিয়া শর্ম্মিষ্ঠা বিজনের পাশে দাঁড়াইল। তাহার দিকে স্নেহস্নিগ্ধ নেত্রে চাহিয়া বিজন বলিল, "এখন পড়বে তো শমু?"

"না বাবা। তাই বলতে এলুম। গৌতম একটী মেয়েকে সঙ্গে করে এনেছে।"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিজন বলিয়া উঠিল, "গৌতম একটী মেয়েকে এনেছে? কার মেয়ে রে? কোথা থেকে আনলে? কি জন্যে আনলে।"

শর্ম্মিষ্ঠা হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই বাবা। তাকে হরণ করে গৌতম আনে নি। পথের মাঝে মোটরের 'টায়ার' 'বার্ষ্ট' হওয়ায় মেয়েটী অত্যন্ত বিপন্ন হ'য়ে পথেই দাঁড়িয়েছিল। বেড়াতে যাবার পথে গৌতম দেখতে পেয়ে সঙ্গে করে এনেছে। নিজেই 'ড্রাইভ' করে আসছিল। সঙ্গে একটী ছোট ছেলে ছাড়া কেউ নেই। গৌতম ও পথে না গেলে তাকে মুস্কিলে পড়তে হ'ত।"

"বেশ হ'ত, ভাল হ'ত। দেখ উৎপল, এই এক হ'য়েছে আমাদের দেশের বাঁদরামি—স্ত্রী-স্বাধীনতা। মেয়েরা স্বাবলম্বী হ'বেন, একা একা পথে চলবেন, চাকরী করবেন, সভায় গিয়ে লেকচার দেবেন। আরও কত কি? কি বলব? দেখি আর গা জ্বলে যায়। স্বাধীনতা মানে কি? এদের ভাষায় স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা; পুরুষদের সঙ্গে অবাধ মেলা-মেশা, তা হ'লেই তাদের সমান অধিকার নেওয়া হ'বে। কি ভুল ধারণা। বিদেশী হাওয়া, বিদেশী শিক্ষা আমাদের এত অন্ধ করেছে যে অতি সুস্পষ্ট জিনিসটা পর্য্যন্ত চোখে পড়ে না। তাই এই অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতাটাই আমাদের বিশেষ কাম্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার মানে কি এই?"

শর্ম্মিষ্ঠা বিজনের পিঠে একটা হাত দিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া বলিল, 'বাবা আমি যাচ্ছি। ততক্ষণ সেই মেয়েটীর সঙ্গে একটু গল্প করি গিয়ে। আজ আর পড়ব না। বুঝলে? আর তোমার ছাত্রও তো একজন হ'য়েছে।" উৎপলের দিকে চাহিয়া সে অল্প হাসিল। উৎপলও হাসিমুখে বলিল, "তাই বলে দয়া করে আপনি যেন আপনার অধিকার ত্যাগ করবেন না। সেটা আমার পক্ষে শাস্তি স্বরূপ হ'বে।"

শর্ম্মিষ্ঠা আর কিছু না বলিয়া হাসিমাখা মুখে ঘর ছাড়িয়া গেল।

বিজন বলিতে লাগিল, "মোটার চালাবে চালাও, তা বলে রমণী যখন, তখন, একা কেন? সঙ্গে লোক রাখ। মেয়েদের বিপদ হ'তে বিশেষ ক'রে এই রকম পরাধীন দেশে, যাদের পুরুষরা পর্য্যন্ত অক্ষম, আত্মরক্ষায় অসমর্থ, সে দেশে বিপদ হ'তে তো বেশী সময় লাগে না। কি সাহসে তারা ঘরের বাইরে সহস্র লালসাময় কলুষ দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়ায়? তাদের দায়িত্ব এতে ক্ষুণ্ণ হয় না কি? এই স্বাধীনতার হাওয়ায় পড়ে নিজেদের তারা কত সুলভ ক'রে ফেলেছে তা কি তারা একবার ভাবে। মেয়েরা শিক্ষিতা হচ্ছে তার ফল কি এই?"

"কিন্তু সকলেই তো প্রায় এইটাই চাইছে—"

"তাদের দুর্ভাগ্য তাই অমন বুদ্ধি তাদের হ'য়েছে। এ দেশের সব চেয়ে গর্ব্ব করবার বিষয় কি জান? এ দেশের নারী। কিন্তু তাদের স্থান আজ কতটা নেমে গেছে সে খোঁজ তারা রাখে কি? বিদেশীর অনুকরণ ক'রে নিজেদের কতটা হেয় অবজ্ঞেয় করে ফেলেছে সে ধারণা তাদের থাকলে তারা আর পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে স্বাধীন হ'তে চায় কি?"

বিজনের দিকে চাহিয়া উৎপল বলিল, "কিন্তু মেয়েদেরও তো শিক্ষা দেওয়া দরকার, আর একেবারে ঘরের মধ্যে রেখে দেওয়াও তো ঠিক নয়।"

"তা তো নয়ই। তাদের বাইরেও আন শিক্ষাও দাও। দিও না উচ্ছৃঙ্খল হ'তে। বাইরে আসুক সংযত সহজ ভাবে, পিতা, স্বামী, পুত্রের সঙ্গে। আর শিক্ষা? শিক্ষা তো খুবই দরকার। কিন্তু স্কুল কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, যাতে শুধু বিলাসিতা, বাইরের আড়ম্বর, স্বার্থপরতা আর চিত্তের সংকীর্ণতা খালি বেড়েই যায় দেখি, তাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে আমি মনে করি না। আমাদের দেশে শিক্ষিতা নারীর অভাব তো নেই। স্কুল কলেজের ছাপ বা 'ডিগ্রী' মারা তাদের অনেকের গায়েই নেই। তাঁদের শিক্ষা কি কারো চেয়ে কম বলে ভাবতে হ'বে।"

"কিন্তু সে রকম ভাবে শিক্ষা দেওয়াই বা হয় কি ক'রে?"

তার ব্যবস্থা করাই আজ দরকার। মানুষ গড়তে হ'বে। সৎশিক্ষায় সৎ উপদেশে এদেশ থেকে এই বিদেশী মোহ সরিয়ে ফেলে, তাদের বিকৃত মনোভাব বদলে দিয়ে নূতন নূতন ভাবে তৈরী করতে হ'বে। মন রইল বিদেশী ভাবে ভরা, করছ সর্বতোভাবে তাদেরই অনুকরণ, দেশের কাজ করবে কোথা হ'তে? মনে প্রাণে দেশেরই মানুষ না হ'তে পারলে দেশের কাজ করবার শক্তি আসবে না, উৎপল! আমাদের ভারী দরকার এখন সুশিক্ষার। যাতে ক'রে ভাল মন্দ চিনবার শক্তিটুকু ফিরে পাওয়া যায়। বিদেশী মোহে নিজেদের কি সর্বনাশ করেছি, অধঃপতনের কোন্ অতল তলে নেমে গেছি সেটুকু যাতে আমরা বুঝতে পারি। এত হীন আমরা যে নিজের দেশের যা কিছু সব খারাপ ভাবি। অপরের যা দেখি, তাই নকল করি। পরের জিনিস, কাজেই সে ভাল। নিজের তাদের যা কিছু সব খারাপ। আজকাল মেয়েদের ভিতর একটা ধুয়া উঠেছে, তারা চায় 'ডাইভোর্স' আইনের এখানে প্রচলন।

"কিন্তু সবাই তো তা চায় নি ছোট মামা।"

"জানি। তবু কেউ কেউ তো চেয়েছে। এর চেয়েও দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের পক্ষে আর কি হ'তে পারে? আর কত অধঃপতন হবে বল। বিবাহ জিনিসটার প্রকৃত অর্থ তারা বোঝে না। জীবন-মরণের অচ্ছেদ্য বন্ধনটা তারা মানে না—দেহ ও জীবনটা তো সর্বস্ব নয়।"

"আপনি কি বলতে চান এটা আধুনিক শিক্ষারই কুফল।"

"হ্যাঁ এটা শিক্ষারই দোষ। শুধু কুশিক্ষার ফলেই তাদের এ মনোভাব। শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, সে শিক্ষায় শিক্ষিত এদেশের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ক'জন? ক'জন সে শিক্ষা পায়? এই শিক্ষারই ফলে এদেশের পুরুষ উন্নতি অপেক্ষা অবনতির পথেই এগিয়ে যাচ্ছে। তা মেয়েরা শিক্ষা পাবে কোথা থেকে? যে শিক্ষা পুরুষকে নৈতিক উন্নতির দিকে না নিয়ে আরও নীচের দিকে নামিয়ে দেয় তার মূল্য কি? শিক্ষা মানে শুধু কতকগুলা বই পড়া বা দেশ-বিদেশের কথা জানাই তো নয়। যাতে মানুষকে উন্নতির স্তরে নিয়ে যায়, যা হ'তে মানুষ নৈতিক বল সঞ্চয় করতে পারে, প্রকৃত শিক্ষা তাই। কিন্তু যে শিক্ষা এখানে দেওয়া হয় তাতে নৈতিক উন্নতি কিছু না হয়ে মানুষ হ'য়ে উঠে উচ্ছৃঙ্খল। তার ফলে দাঁড়ায় দেশব্যাপী দুর্নীতি ও অসংযমের প্রাবল্য। দেশ-বিদেশের মনীষীদের জীবন আলোচনা করে দেখ, নৈতিক সংযমের বলেই তাঁরা এত বড় হ'তে পেরেছেন। উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযমতা মানুষ গড়তে পারে না। বিদেশের অনুকরণে আমরা উচ্ছৃঙ্খলতাকেই বরণ করে নিয়েছি, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিদের ভিতরও সংযমেরও বড় একটী দিক আছে। তার দিকে লক্ষ্যই করি নি। তাদের নকল করেছি সত্য, কিন্তু নিয়েছি শুধু দোষটাই। গুণের দিকে লক্ষ্য করি নি। তাদের ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, একতা. স্বজাতি-প্রেম, সততা—এসবের কতটুকু আমরা নিয়েছি? দোষ, শুধু দেওয়া নয়, একবারে মজ্জাগত হ'য়ে মনের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেছে। সহজেই কি এ তোলা যাবে? অনেক সময়ের দরকার। এই জন্যই দেশের এ অবস্থা।"

"কিন্তু মেয়েরা যে পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার চাইছে—"

বাধা দিয়া অল্প হাসিয়া বিজন বলিল, "দেখ উৎপল 'ডিভিষণ অভ্ লেবার' বলে একটা জিনিস আছে, যেটা না মেনে চললে কোন কাজই সুশৃঙ্খলে চলে না। সব দেশে,

সব জাতির মধ্যে তেমনই স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই যে স্ব স্ব কাজ আছে, তা ত্যাগ করে যদি অন্য কাজ করতে যায় তা হ'লে সব বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়ে। মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার চায়, সে অধিকার না হয় কতকটা পেলে কিন্তু তাতে লাভ কি? না হয় এদিক, না হয় ওদিক। সংসার সমাজ চারদিকেই তাতে শুধু বিশৃঙ্খলাই ঘটে। প্রকৃত উপকার কণামাত্রও হয় না। হ'তে পারে না। তা ছাড়া তারা পুরুষের সঙ্গে সমান হ'তে চায় কোন হিসেবে? সব রকমে অন্যভাবে যারা সৃষ্ট তারা জোর করে পুরুষ হ'ব বললেই কি হ'তে পারে। এই অনধিকার চেষ্টা করতে যাওয়ার ফলেই এই সব বিড়ম্বনা। মেয়েদের সমান অধিকার দেওয়া, নিয়ে এই যে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন চলছে একে খুব ভাল বলে স্বীকার আমি কোন মতেই করতে পারি না। এর যে খুব বেশী প্রয়োজন আছে তাও বলতে পারি না, মেয়েরা শিক্ষিত হ'ক, সংযতভাবেই বাইরেও না হয় আসুক। কিন্তু তাই বলে তাদের স্থান যেখানে, তার বাইরে যাবে কেন? পুরুষের কাজ পুরুষই করুক। নারীরও তো কাজের অভাব নেই। তাঁরা তাই নিয়ে থাকুন। অনধিকারের বিড়ম্বনা ভোগ করা কেন? এর ফল খারাপ ভিন্ন ভাল তো কিছু হচ্ছে না। তারপর যে দেশে যা শোভন। এই যে মনোভাব এখন আমাদের মধ্যে প্রায় বদ্ধমূল হ'য়ে বসেছে, এদেশের মাটির সঙ্গে এটা কোন মতেই খাপ খায় না। জোর ক'রে টেনে আনা জিনিসটার ফ ও তাই এত খারাপ হচ্ছে। তাদের যা বৈশিষ্ট্য সেটা হারালে তার কিছুই থাকে না। বড় দুঃখের কথা আমাদের নিজস্ব সব টুকুই আমরা হারিয়েছি শুধু এই বিকৃত শিক্ষার ফলে তাদেরই অনুকরণ করে।"

বিজনের কণ্ঠে একটা গভীর ব্যথার সুর উঠিল। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো তার বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে কয় মুহূর্ত্ত সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া উৎপল বলিল, "এ মোহ একদিন তো কাটিয়ে উঠতে পারব?"

উৎসাহভরে বিজন বলিল—"নিশ্চয়। অন্ধকার চিরদিন থাকে না। রাত্রির পর দিন আসে। এ সনাতন সত্য। যা গিয়েছে আবার তা ফিরে পাব; তবে কবে, কতদূরে, সেদিন, জানা নেই।"

আরও খানিকটা অন্যমনে নীরব থাকিয়া একটু ক্ষুব্ধস্বরে বিজন বলিল, "বড় আক্ষেপ রয়ে গেল, উৎপল! জীবনে কিছুই করতে পারলুম না। এক একজনকে এক একটা কাজের ভার দিয়ে ভগবান জগতে পাঠান। আবার কাউকে কাউকে কোন কিছুই করবার মত শক্তি দেন না আমি সেই শ্রেণীর লোক। যদি দু'চারজনকেও প্রকৃত শিক্ষায় উপকৃত করতে পারতুম, তা হলে'ও জানতুম, একটা কাজ হ'ল, একা কিছুই আমি করতে পারলুম না। সে শক্তি আমার নেই।"

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে শর্ম্মিষ্ঠা কি প্রয়োজনে নিঃশব্দে এঘরে আসিয়াছিল। তারপর বিজনের কথার মাঝখানে তাহাকে ডাকিতে পারে নাই। নীরবে তাঁর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে এইসব কথার মধ্যে সে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। বিজনের আসনের কতকটা দূরে একখানা চেয়ারে সে বসিয়াছিল একটু 'হোয়াটা নটের পাশে। উৎপল বা বিজন তাহাকে লক্ষ্য করে নাই। বিজনের কথা শেষে উৎপল বলিল, "শক্তির তো আপনার অভাব কিছু দেখছি না। এত গভীর জ্ঞান, শিক্ষা দেবারও—।"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ম্লান হাসির সহিত মাথা হেলাইয়া বিজন বলিল, "না উৎপল। সে ক্ষমতা আমার নেই। প্রথম বয়সে এ চেষ্টা না করেছি এমন নয়, কাজে কিছু করা হয়ে উঠে নি।"

এসময় শর্ম্মিষ্ঠা উঠিয়া দাঁড়াইল। তার দিকে দৃষ্টি পড়িতে আশ্চর্য্যের সহিত বিজন বলিল, "শমু, কখন এলে? দরকার আছে কিছু? কি চাই তোমার"?

"দরকার ছিল একটু। কিন্তু থাক এখন।" শর্ম্মিষ্ঠা বাহির হইয়া গেল তার মুখে গভীর চিন্তা।

ক্রমশঃ

অশ্বঘোষ-কৃত

বুদ্ধচরিতের বঙ্গানুবাদ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

চতুর্থ সর্গ

অনন্তর বিবাহ করিবার জন্য বর উপস্থিত হইলে রমণী-গণ যেরূপ কৌতুকাক্রান্ত হইয়া বর দেখিবার জন্য প্রত্যুদ্‌গমন করে, সেইরূপ সেই নগরের উদ্যান হইতে রাজকুমার আগমন করিলে পুরবাসিনী কামিনীগণ রাজ-নন্দনকে দেখিবার জন্য কৌতূহলবশতঃ চঞ্চলদৃষ্টি হইয়া প্রত্যুদ্‌গমন করিয়াছিল।১

সেই সকল রমণী রাজকুমারের সম্মুখে গমন করিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে কমল-কুট্মল সদৃশ কর-পল্লব দ্বারা শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছিল (অর্থাৎ করযোড়ে দণ্ডায়মান ছিল)।২

ঐ সমস্ত রমণী এই রাজকুমারকে বেষ্টন করিয়া কামাকৃষ্ট মনে অচঞ্চল (স্থির) হর্ষোৎফুল্লনয়নে যেন তাঁহাকে পান করিতে করিতে (অর্থাৎ সতৃষ্ণনয়নে রাজপুত্রকে দেখিতে দেখিতে) দণ্ডায়মান রহিল।৩

স্বাভাবিক অলঙ্কার সমূহের ন্যায় উজ্জ্বল শুভ লক্ষণনিচয় দ্বারা বিরাজিত সেই রাজকুমারকে 'এই রাজপুত্র মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প' এইরূপ প্রমদাবর্গ মনে মনে বিবেচনা করিয়াছিল।৪

রাজপুত্রের সৌন্দর্য্য এবং ধৈর্য্য থাকাতে কোন কোন নারী, সাক্ষাৎ সুধাকর শশধর ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই বলিয়া তাঁহাকে মনে করিল।৫

সেই সমস্ত বনিতা সেই রাজতনয়ের শরীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিগ্রহ করিবার জন্য বিকাশ প্রাপ্ত হইল। পরে পরস্পর নয়ন দ্বারা তাঁহার সমীপে গমন করিয়া বিশেষ রূপে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল।৬

এইরূপে সেই সকল রমণী কেবল মাত্র দৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে দর্শনই করিয়াছিল। এমন কি, রাজকুমারের মাহাত্ম্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া ঐ সকল রমণী কোন বাক্য প্রয়োগ করে নাই, এবং হাস্যও করে নাই।৭

সেই রমণীদিগকে প্রণয়ে ব্যাকুল এবং নিশ্চেষ্ট দেখিয়া বুদ্ধিমান্ ও মহাত্মা পুরোহিতের পুত্র বলিতে লাগিলেন।৮

তোমরা সকলেই নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি কলাবিদ্যায় অভিজ্ঞ হইতেছ; অপরের মনোবৃত্তি গ্রহণ করিতে বিদুষী; তোমরা সকলেই সৌন্দর্য্যে এবং চাতুর্য্যে অনুপম; এবং স্বকীয় বিবিধ সদ্‌গুণ দ্বারা তোমরা সকলেই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছ।৯

তোমরা এই সমস্ত অপূর্ব্ব গুণাবলী দ্বারা সেই সকল উত্তরকুরু প্রদেশ সুশোভিত কর, উত্তর দিকের অধীশ্বর কুবেরের ক্রোড়দেশ পর্য্যন্ত উল্লাসিত কর। কিন্তু সর্ব্ব-প্রথমেই এই ভূমিখণ্ড শোভান্বিত কর।১০

তোমরা গতস্পৃহ মুনিদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ; অপ্সরোগণের পরিজ্ঞাত অমরদিগকেও তোমরা চঞ্চল করিতে সমর্থ।১১

তোমরা অপরের অভিপ্রায়বোধ, অঙ্গভঙ্গী, চতুরতা এবং সৌন্দর্য্যসম্পদ্ দ্বারা স্ত্রীলোকদিগেরও যখন আসক্তি উৎপাদনে সমর্থ হইতেছ, তখন তোমরা সহজেই যে পুরুষদিগের মনে অনুরাগ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে, তাহা কি আর বলিতে হইবে?।১২

তোমরা সকলেই এই প্রকার রমণী এবং তোমরা সকলেই স্ব স্ব গোচরে নিযুক্ত হইয়াছ, তোমাদের এই চেষ্টা এই প্রকার বলিয়া আমি তোমাদের সরলতায় সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না।১৩

তোমাদের এইরূপ চেষ্টা, লজ্জানিমীলিতনেত্রা নব-বিবাহিতা বধূদিগের তুল্য চেষ্টা হইবে? অথবা লজ্জাহীনা গোপাঙ্গনাদিগের তুল্য চেষ্টা হইবে? ।১৪

যদি এই বীর পুরুষ রাজকুমার আপনার সৌন্দর্য্যের প্রভাবে মহানুভাব হইয়া থাকেন, তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগেরও যে মহৎ তেজ আছে, তাহা নিশ্চয় করিতে হইবে।১৫

দেখ, পুরাকালে অমরগণও যাঁহাকে জয় করিতে পারেন

নাই, সেই মহর্ষি কাশি-সুন্দরী বেশবধূর পদাঘাতে তাড়িত হইয়াছিলেন।১৬

পুরাকালে বালমুখ্যা নামে এক রমণী তাহার প্রয়োজন সাধন করিবার নিমিত্ত সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইয়া মন্থান-গৌতম নামক এক সন্ন্যাসীকে ভক্ষ্য দ্বারা প্রাণ-সংহার করিয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল।১৭

বর্ণস্থানা নামে এক উৎকৃষ্ট সতী রমণী, বহুকাল পর্য্যন্ত যিনি তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই দীর্ঘতপা এবং দীর্ঘজীবী মহর্ষি গৌতমকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল।১৮

এইরূপে শান্তা নামে একজন রমণী মুনিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে আশ্রয় করিয়াছিল। ঋষ্যশৃঙ্গ কখন পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করেন নাই, শান্তা শেষে তাঁহাকে অনুরক্ত করিয়া লইয়াছিল।১৯

বিশ্বামিত্র নামে একজন মহর্ষি, দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়া কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তিনি দৃঢ়চিত্ত ছিলেন ; তথাপি ঘৃতাচী নামে একজন অপ্সরা সেই মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে হরণ করিয়াছিল, অর্থাৎ তাঁহার তপোভঙ্গ করিয়াছিল।২০

এইরূপে প্রমদাগণ যখন সেই সমস্ত তপোনিষ্ঠ মহর্ষিগণেরও চিত্তবিকার উৎপাদন করিয়াছিল (অর্থাৎ সকল ঋষিই বিকৃতচিত্ত হইয়াছিলেন)। যাঁহাদের গাত্রের চর্ম্ম-লৌল্য উপস্থিত হইয়াছে, এবং যাঁহারা জরাজীর্ণ বা অত্যন্ত বৃদ্ধ, রমণীগণ যখন এইরূপ ব্যক্তিরও চিত্তের বিকার উৎপাদন করে, তখন এই যুবা রাজকুমারের চিত্তবিকার যে জন্মাইয়া দিবে, তাহা কি আর পুনর্ব্বার বলিয়া দিতে হইবে ? (অর্থাৎ যুবার চিত্ত হরণ করা যুবতীগণের সহজসাধ্য কর্ম্ম)।২১

অতএব যখন এইরূপ ঘটনা নিয়তই ঘটিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়, তখন যে কোন যুবতী যুবতিগণসদৃশ ব্যক্তিকে (অর্থাৎ যুবা ব্যক্তিকে) হরণ করে, এবং যে সকল নারী নিকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট ব্যক্তির অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া থাকে তাহারাই যথার্থ স্ত্রীলোক।২২

এইরূপ উদায়ীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত নারী যেন বাক্য-শরে বিদ্ধ হইয়া রাজকুমারকে হরণ করিবার উদ্দেশ্যে আত্মারূঢ় হইল (অর্থাৎ দৃঢ় পরিকর হইয়াছিল)।২৩

সেই সকল নারী ভ্রূকৌটিল্য, দর্শন, ভাব-ভঙ্গী, হাস্য,এবং সুললিত গমন (গমন ভঙ্গী) দ্বারা যেন ভীত হইয়া চিত্তের চাঞ্চল্যজনক নানাপ্রকার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিল।২৫

মহারাজের আদেশ, রাজকুমারেরও কোমলতা এবং মদ্য ও কামলীলা প্রদর্শন দ্বারা ঐ সকল রমণী অপ্রণয়ী (যে প্রণয় জানে না) রাজকুমারকে শীঘ্র হরণ করিয়াছিল (অর্থাৎ তাঁহার মনোহরণ করিয়াছিল)।২৬

অনন্তর হস্তী যেরূপ করেণু (হস্তিনী) যূথের সহিত মিলিত হইয়া হিমালয় পর্ব্বতের কাননে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজপুত্র যুবতী প্রমদাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।২৭

সূর্য্যদেব অপ্সরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকীয় পুষ্প-কাননে যেরূপ বিরাজ করিয়া থাকেন ; সেইরূপ সেই রাজপুত্র সেই মনোহর পুষ্পোদ্যানে স্ত্রীলোকদিগের অগ্রবর্ত্তী হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন।২৮

সেই পুষ্পোদ্যানে কতিপয় রমণী সুরাপানে নতদেহ হইয়া দৃঢ়, স্থূল, অথচ মনোজ্ঞ স্তন দ্বারা আঘাত করিয়া সেই রাজকুমারকে স্পর্শ করিয়াছিল।২৯

কোন অবশা (লম্বিত) স্কন্ধদেশে নিজ কোমল করলতা কোমল ভাবে অবলম্বন করিয়া, এই রাজপুত্রকে মিথ্যা পতনের ভাণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিল।৩০

অন্য কোন বনিতা লোহিতবর্ণ ওষ্ঠাধরযুক্ত, মদ্যগন্ধ-সুরভিত বদন দ্বারা "তুমি এই গোপনীয় বাক্য শ্রবণ কর"— এই বলিয়া তাঁহার কর্ণপ্রান্তে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিল।৩১

কোন রমণী সরস চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া, "তুমি এই হস্তে চন্দন সেবা কর" এই বলিয়া হস্ত পাইবার অভিলাষে হস্তআলিঙ্গন করিয়া যেন আজ্ঞা করিতে করিতে বলিয়াছিল।৩২

অন্য কোন নারীর বারংবার মদ্যপান ব্যপদেশে নীলাম্বর স্খলিত হইয়া গেল, এবং সেই সময়ে তাহার কটিদেশে সুবর্ণ-নির্ম্মিত কাঞ্চী (চন্দ্রহার) লক্ষিত হইল। তাহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন রাত্রিকালে চপলার বিলাস (বিকাশ) হইতেছে।৩৩

কোন কোন রমণী শব্দযুক্ত স্বর্ণকাঞ্চী দামদ্বারা এই রাজকুমারকে সূক্ষ্ম বসনাবৃত নিতম্ব দেশ দেখাইয়া দিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল।৩৪

অপর অবলাগণ স্বর্ণকুম্ভসদৃশ মনোহর স্তনযুগল প্রদর্শন নিমিত্ত পুষ্পিত সহকার বৃক্ষের শাখা গ্রহণ করিয়া আলম্বন করিয়াছিল।৩৫

অন্য এক নারী পদ্মবন হইতে আগমন করিল। তাহার হস্তে যথেষ্ট পদ্মপুষ্প বিদ্যমান; এবং তাহার নেত্রযুগলও কমল কুসুমের মত অতীব মনোহর। তখন সেই কমল-লোচনা ললনা, কমল-বদন—সেই রাজকুমারের পার্শ্বে পদ্মলক্ষ্মীর ন্যায় (অর্থাৎ পদ্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায়) অবস্থান করিয়াছিল।৩৬

কোন এক রমণী অভিনয় করিতে করিতে অর্থযুক্ত সুললিত গীত করিয়াছিল। 'তুমি বঞ্চিত হইতেছ' এই বলিয়া যেন দৃষ্টিপাত দ্বারা সেই প্রকৃতিস্থ রাজকুমারকে প্রেরণ করিতে লাগিল।৩৭

অন্য এক প্রমদা ভ্রূযুগলরূপ ধনুকের আকর্ষণকারী—সুন্দর মুখদ্বারা বীরপুরুষের লীলাবলম্বন পূর্ব্বক, বেষ্টন করিয়া তাঁহার চেষ্টার অনুকরণ করিয়াছিল।৩৮

কোন এক রমণীর স্তনযুগল স্থূল এবং মনোহর ছিল, এবং পবনভরে তাহার কর্ণকুণ্ডল দুলিতেছিল। সেই নারী 'আপনি আমাকে প্রাপ্ত হউন' এই বলিয়া উচ্চরবে রাজকুমারকে পরিহাস করিয়াছিল।৩৯

সেইরূপ অন্যান্য ললনাগণ রাজকুমার অপসৃত হইলে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছিল; এবং কতিপয় নারী অপর রমণীর বাক্যে মধুরভাবে কুশনিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিল।৪০

কোন এক সুন্দরী প্রতিযোগিতা প্রার্থনা করিয়া, সহকারলতা গ্রহণ পূর্ব্বক মদমত্তা হইয়া, 'এই পুষ্পটী কাহার' এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।৪১

কোন কামিনী পুরুষের ন্যায় গতি আকৃতির গঠন করিয়া এই রাজকুমারকে বলিয়াছিল; সমস্ত রমণী তোমাকে জয় করিয়াছে; হে রাজকুমার! এখন তুমি এই পৃথিবী জয় কর।৪২

ক্রমশঃ

ভুলের শেষে

(গল্প)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়

অসময়ে কলেজ হ'তে এ'সে নিতাই বই খাতাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলে। সমস্ত শরীর দিয়ে অপমানের তীব্র জ্বালা যেন ঝরে পড়ছিল। অসহ্য ক্রোধে তার চোখ-মুখ রক্তবর্ণ হ'য়ে গেছে। কাপড় ও শার্টটা স্থানে স্থানে ছেঁড়া; গালের নীচে একটা ক্ষত স্থান হ'তে তখনও অল্প অল্প রক্ত ঝরে পড়ছে। আঙুল দিয়ে তা মুছে ফেলে সে শার্টটা খুলে ফেলল; তারপর চিৎ হ'য়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

তার কান্না আসছিল। জীবনের এ পথে এমনভাবে যে কেউ তাকে বিঁধতে পারে, সে ধারণা তার ছিল না। সে গাঁয়ের ছেলে, নির্লিপ্তভাবে কলেজের ক্লাস ক'রে যায়, কারও অনিষ্টে থাকে না। কেউ তাকে চিনতও না; কিন্তু আজ সহসা সে-ই হ'য়ে উঠল কলেজের সকলের চোখে একটা জবরদস্ত ছেলে। শান্ত-শিষ্ট ছেলেটা আজ সহসা দেখলে, তার চারিদিকে কতকগুলো রক্তলোলুপ চাহনি; একদণ্ডে এরা যেন তাকে ছিঁড়ে খেতে চায়।

বালিশটা বুকের কাছে আঁকড়ে ধ'রে সে কাঁদতে লাগল। প্রহারের জ্বালায় নয়। ছেলেরা সকলে মিলে নির্ম্মম প্রহারে তাকে জর্জ্জরিত করেছে সত্য; কিন্তু তাতে তাকে তত ব্যথিত করে নি, যত ক'রেছে তার ক্লাসের অসিতা মেয়েটী। তাকে কলেজ হ'তে এক বৎসরের জন্য এক্সপেল করেছে বটে, কিন্তু সে শাস্তি সে অবজ্ঞাই করে যেতে পারত, যদি না অসিতা তাকেই প্রকৃত অপরাধী বলে নির্দ্দেশ ক'রত। নির্দ্দোষ সে, তাই সমস্ত কলেজটার মধ্যে তার এই মর্ম্মান্তিক অপমানের জন্যে আজ সে ফুলে' ফুলে কাঁদতে লাগল।

সেই বিষমক্ষণে, কলেজের প্রকাণ্ড হলঘরের মধ্যে বিচারাধীন সে—একদণ্ড চারিদিকে চেয়ে দেখেছিল। সকলের চোখে কি অপরিসীম ঘৃণা, তাকে ইঙ্গিত ক'রে সকলের কি শ্লেষপূর্ণ বাক্যের ছটা, সকলেই একযোগে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলেছিল। সেই মুহূর্ত্তে সহসা সে যেন বড় নিঃসহায় বোধ করলে, এ সংসারে তার যে কেউ আছে, একথা সে ভাবতে পারল না। এই বিরাট বিপৎপাতে সে মুহ্যমানের মত দাঁড়িয়ে রইল।

সকলের চেয়ে এই কথাটাই তার বড় বেশী বাজছে যে মেয়ে হ'য়ে অসিতা, সত্য জেনেও,—প্রকৃত অপরাধীকে চিনতে পেরেও, তাকেই কেন অপরাধী বলে সকলের সম্মুখে নির্দ্দেশ করলে? নারীর মুখে মিথ্যার এই দিক্‌টা তার কাছে অত্যন্ত কদর্য্যভাবে ফুটে উঠল।

তারপর তার চিন্তা ঘুরে এল তার নিজের প্রতি। সে কি দুর্ব্বল ও নিরুপায়! সে নিজেও তো জানে—কে এই দুষ্কর্ম্ম করেছে, কিন্তু তবু সে-ই নীরবে মাথা পেতে নিল সমস্ত অপবাদটা; শুধু অপবাদ নয়, অপমান, অখ্যাতি—সবই। উপরন্তু ছেলেরা অপরাধীর সমস্ত শাস্তিটুকু কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করলে তারই উপরে। সে কোনই প্রতীকার ক'রতে পারল না। নিজের এই অক্ষমতায় নিজের উপর তার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হ'তে লাগল। তার নির্য্যাতিত অন্তর আজ শুধু চীৎকার করে বলতে চাচ্ছিল—না, না, শুধু ভাল ছেলে হ'য়ে এই দুর্ব্বল দেহটাকে নিয়ে থাকলে এ সংসারে কিছুই করা যাবে না। চাই সাহস, বল ও দৃঢ়তা; তারপর একদিন প্রতিশোধ—এই ছেলেদের। নিষ্ফল আক্রোশে সে ঘরটার ভিতর প্রচণ্ড বেগে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

নিজের সাংসারিক অবস্থার কথা মনে হ'লে তার চোখে জল আসে। ভারী গরীব সে। গত বৎসরে তার বোনের বিয়ের জন্য তার বাবা ঋণগ্রস্ত হ'য়েছেন। তাদের বসত-বাটী দেনার বাঁধা পড়েছে। সে বি-এ পরীক্ষাটা পাশ ক'রে একটা চাকরী করবে—এই আশায় তার মা-বাপ

বুক বেঁধে ব'সে আছেন। কেমন ক'রে আজ সে তাঁদের এত বড় আশা ধূলিসাৎ করে দেবে। সে কলেজের 'ফ্রী' (অবৈতনিক) ছাত্র। 'টিউসন' করে সে তার অন্যান্য খরচ নির্ব্বাহ করে—বাপ-মার নিকট হ'তে কিছু গ্রহণ না ক'রে তাঁদের অক্ষমতার লজ্জা হ'তে নিষ্কৃতি দিয়েছে। কিন্তু আজ সেই আশা ভরসা নির্ম্মূল হওয়ায় আবার তার চোখে জল এল।

ইতস্ততঃ বইগুলিকে টেবিলের উপর গুছিয়ে রেখে সে বাইরে বেড়িয়ে পড়ল, এখনই মেসে ছেলেরা ফিরে আসবে, তার লজ্জাকে এদের হাত হ'তে সে বাঁচাতে চায়। পথের কর্ম্মনিরত জনতার মধ্যে সে আজ কেবলই মিশে যেতে চায়, যেন কেউ আর তার অস্তিত্বকে পৃথক করতে না পারে। কিন্তু কেবলই তার মনে হ'তে লাগল যেন ঠিকমত মিশা যাচ্ছে না, কোথায় যেন বড় ব্যবধান থেকে যাচ্ছে, লোকে যেন এখনই তাকে খুঁজে বে'র ক'রে ফেলবে।

দু'দিন সে কলকাতার নানা স্থানে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়াল। পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করবার সাহস তার নাই। 'টিউসন' করতে যেতেও তার ভয় হ'তে থাকে। সকলকে এড়িয়ে চলবার জন্য তার আগ্রহ বড় কম নয়। এ বিশ্বটা শুধুই যে ফাঁকি, এ তত্ত্ব আজ তার কাছে পরিস্ফুট হ'য়েছে।

'টিউসন'ই এখন তার একমাত্র ভরসা, জীবিকা-নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। তাকে সে অবহেলা করতে পারে না। তাই একদিন চক্ষুলজ্জার দায় এড়িয়ে সে এসে দেখা দিল।

মাস দুই পরে একদিন ছাত্র বলল, "মাষ্টারমশাই, যাবার সময় বাবার সঙ্গে দেখা করে যাবেন।"

নিতাই একবার তার দিকে চেয়ে বললে, "আচ্ছা—"

সে এসে ঘরে দেখা দিল। ভদ্রলোক বললেন, "একটা কথা বলব মনে করেছি—আচ্ছা আপনি নাকি কলেজ ছেড়ে দিয়েছেন।"

নিতাই সবই বুঝলে। এতদিন এর জন্য সে অপেক্ষাও করে আসছে। কিন্তু তবু তার বুকটা একটু কেঁপে উঠল। বলল, "ছেড়ে দিই নি, তারা তাড়িয়ে দিয়েছে।"

ভদ্রলোক একটু বিস্মিত হ'লেন। তিনি ভাবতে পারেন নি, ছেলেটী সত্য কথা স্বীকার করবে। বললেন, "কেন?"

নিতাই একটু বিরক্তমুখে বলল, "আপনি তো সবই জানেন—"

একটু থতমত খেয়ে ভদ্রলোক বললেন, "হুঁ, শুনলাম একটা ছাত্রীকে কি কদর্য্য ইঙ্গিত করেছিলেন—কি সব চিঠি—না কি। সত্যি নাকি?"

"হুঁ সত্যি।"

ভদ্রলোক একদণ্ড নিঝুম থেকে বললেন—"তাই বাড়ীর মেয়েরা বলছিলেন যে—ইয়ে—আর আপনাকে দরকার নাই।"

"আচ্ছা—"বলে নিতাই ঘুরে দাঁড়াল।

ভদ্রলোক বললেন, "শুনুন, এখন আমার হাতে টাকা নেই, টাকাটা কয়েকদিন পরেই নিয়ে যাবেন।"

"আচ্ছা"—নিতাই আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে আসবার জন্য পা বাড়াল।

দ্বারের আড়াল হ'তে কণ্ঠ শুনা গেল, "কেন ভদ্রলোকের ছেলেকে ঘোরাচ্ছ? টাকাটা দিয়ে দাও না?"

ভদ্রলোক তখন ইতস্ততঃ করে বললেন, "তবে একটু দাঁড়িয়েই যান।"

নিতাই দাঁড়াল।

টাকাটা নিয়ে এসে নিতাইয়ের হাতে দিয়ে তিনি বললেন, "মনে করেছিলাম—দু'মাসের টাকা দিয়ে দেব, কিন্তু হাতে কিছুমাত্র টাকা না থাকাতে দিতে পারলাম না। মনে কিছু করবেন না।"

নিতাই আর একবার "আচ্ছা" বলে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে আসতেই পাশের ঘরে তার কলেজের সতীর্থ সুবোধকে দেখে তার বুঝতে কিছু বাকী থাকল না।

তার চোখে মুখে কঠিন হাসি ফুটে উঠল।

(২)

রিক্ত পৃথিবীটার বক্ষে এসে দাঁড়াল সে। মনে হ'ল সমস্ত আঁধার হ'য়ে গেছে। সম্মুখে কি পশ্চাতে আর

কিছুই দেখা যায় না। যেন এক বিরাট শূন্যতা শুধু স্তব্ধ হ'য়ে রয়েছে। এই স্তব্ধতা সে হৃদয়ঙ্গম করলে—মন প্রাণ দিয়ে। তার ভারি ভাল লাগল। সে বিস্ফারিত চোখে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তার হাত পা অসাড় হ'য়ে এল। চোখের পাতা জড়িয়ে এসে তার দৃষ্টি-শক্তিকে সঙ্কুচিত করল। ধীরে ধীরে সে বাসায় ফিরে এল।

সারারাত্রি একটা বিহ্বলতার মধ্য দিয়ে পার হ'য়ে গেল।

ভোরের বাতাস দিব্যি বয়ে যায়। বুঝি তার সেই ছোট গ্রামের স্পর্শ নিয়ে এসেছে; তার মা যেমন তার মাথায় স্নেহ-পরশ বুলিয়ে দেন, তেমনি স্পর্শ দিয়ে তার তন্ত্রীগুলোকে আলোড়িত করছে। সে মাথা পেতে তার পরশ গ্রহণ করল। বাঁশ ঝাড়ের পাশে, তাদের সেই পর্ণকুটীরখানির ছবি তার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল। উঠানে এই ভোরে নেমে এসেছে তার বোনটী—গোময়লিপ্ত ছিন্ন নেকড়া নিয়ে। তারপর তার নিপুণ হস্তে তাকে পবিত্র তক্তকে সুন্দর করে তুলছে। তার পায়ের আলতার দাগ এখনও মুছে' যায়নি। মা পুকুরঘাট হ'তে এইমাত্র বাসন নিয়ে ফিরে এলেন। তাঁর দেহে অর্দ্ধ মলিন জীর্ণ বসন। মুখে তাঁর দৈন্যের চিহ্ন নাই, তৃপ্তির হাসি দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। যে ভিটেটুকু দুদিন বাদে পরের হাতে বিকিয়ে যাবে, তারই জন্য তাঁর কত না দরদ—কত যত্ন! আর তার বাবা! কোন্ সকালে তিনি উঠেছেন—গরু দু'টীকে বিচালি কেটে দিয়ে নিশ্চয়ই এখন তামাক খাচ্ছেন।

নিতাই তার তন্দ্রাঘোরকে জোরে ঝেড়ে ফেল্‌ল। একটু ক্ষীণ হাসি হেসে ছেঁড়া স্লিপার জোড়াটার ভিতর পা দুটোকে ঢুকিয়ে দিয়ে সে নেমে এল। ময়লা শার্টটা পড়ে নিতে সে ভুল করেনি।

তারপর সারাদিনটা ঘুরে বেড়াবার পালা। হয় চাকরি, নয় ছেলেপড়ানর জন্য শহরের প্রান্ত অবধি অনুসন্ধানের নেশা যেন আর কিছুতেই শেষ হ'তে চায় না।

এমনই করে দু'মাস কেটে যাবার পর তার এক বন্ধুর আন্তরিকতায় সে একটা 'টিউসন' যোগার করতে পারল। অনেকদিন পরে সে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌ল।

সাত আট বৎসরের একটী ফুটফুটে মেয়ে ছাত্রী। নিতাই প্রথম হ'তেই তাকে ভালবাসল, তার ছোট বোনের কথা তার মনে হ'ল। তার ব্যথিত হৃদয় এই ছোট চট্‌পটে মেয়েটীকে একেবারে আপন করে নিতে চাইল। তার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত দরদ দিয়ে সে এই মেয়েটীকে আপনার আদর্শের গড়ে তুলতে চায়। প্রথমাবধি সে তার সমস্ত ব্যথা দিয়ে রাণুকে স্পর্শ করল।

অল্পদিনের মধ্যে আশ্চর্য্য ফল ফল্‌ল। রাণু তার এই মাষ্টারকে চিনতে পারল। নিতাইয়ের প্রাণের পরিচয় পেতে তার একদণ্ড বিলম্ব হ'ল না। সে তার মাষ্টারের ছায়ায় ছায়ায় চলতে লাগল।

দিন কুড়িও বোধ করি হয় নি। নিতাই সেদিন রাণুকে পড়াচ্ছিল। এতক্ষণে তার শিক্ষাদান শেষ করে চলে যাবারই কথা, কিন্তু রাণুর স্কুলের ছুটি থাকায়—দেরী হ'লে ক্ষতি নেই বলেই—সে উঠি উঠি করেও উঠতে পারে নি। রাণু দুষ্টামি করেছিল বলে তাকে কাছে ডেকে এনে শাসন করছে—এমন সময় হঠাৎ রাণু 'অসিদি' বলে চীৎকার করে উঠল। নিতাই চমকে উঠে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলে শ্যামবর্ণ পাতলা লম্বা মেয়েটী দ্বারপ্রান্ত অতিক্রম ক'রবার সময় ফিরে দাঁড়াল। তার টানা বড় চোখ দুটো ঘরের ভিতর দৃষ্টি ফেলে স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

রাণু লাফিয়ে এসে বলল, "উঃ অনেকদিন আস নি, অসিদি, তুমি আজ কাল ভারি দুষ্টু হ'য়েছ।"

তার কাণে রাণুর কথাগুলো প্রবেশ করল কিনা বোঝা গেল না! তার দৃষ্টি তখন সম্মুখ হ'তে ফিরে এসে ঘরের মেজেয় আবদ্ধ হ'য়ে গেছে, চোখে মুখে একটা দীনতার ছাপ।

রাণু তাকে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল।

নিতাই বসেই রইল। ছাত্রী যে আর ফিরে আসবে না তা বুঝলে। ছাত্রীর বইগুলো গুছিয়ে রেখে সে বসেই রইল। অসিতা একটা লালপেড়ে মিলের কাপড় পরে এসেছে। গায়ের ব্লাউজটাও শাদা; পায়ের কাছে লাল পাড়টা যেন জল-জল করছিল; পায়ে স্লিপার। বোধ হয় স্নান করেই এসেছে চুলগুলি খোলা, পিঠের উপর ছড়ান। শ্যামবর্ণ—অর্থাৎ একটু কালো, চোখ দুটো টানা বড়—সেই মেয়েটীই

বটে। কলেজের বড় হল ঘরে এই মেয়েটীর সম্মুখে সে সেদিন দৃপ্তচোখে তার দিকে চাইতে গিয়ে তার দৃপ্ত চক্ষু দেখে সে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল আর ফিরেও তাকায়নি।

সিতাই তার সর্বশরীরের মাংসপেশীগুলো পরীক্ষা করে দেখল। এই দুই মাসে, আর্থিক দুরবস্থার মধ্যেও সে বহু যত্নে তার শরীর গঠিত করতে প্রয়াস পেয়েছে। এতদিনে সে তবু সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান্ হ'য়েছে। সে একটু হাসল।

চেয়ারের হাতলের উপর ভর দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

অসিতা উপরে এসে বলল, "মামী, রাণুর জন্য দেখছি মাষ্টার রেখেছ?"

মামী বল্‌লেন, "হুঁ, যে দুষ্টু হয়েছে মেয়ে, কিছু পড়াশুনা করে না। তুই তো অনেকদিন পরে এসেছিস, অসি!"

"হু, শরীরটা বড় ভাল ছিল না মামী।" তারপর জিজ্ঞেস করল, "মাষ্টার কেমন, মামী?"

মায়ের উত্তর দেবার আগেই মেয়ে বলল, "খু-উ-ব ভাল দিদি, তুমি একদিন পড়ে দেখ!"

মা একটু হেসে বল্‌লেন, "ওই দেখ বোকা মেয়ে। তোর মাষ্টার কি তোর দিদিকে পড়াতে পারে?"

মেয়ে ঘোর আপত্তি করে বলল, "না পারে না! তুমি ভারি জান! অমন ভাল মাষ্টার—ব'লে-হু।"

মা আর একটু হেসে বল্‌লেন, "ছাই ভাল—"

মেয়ে বলে উঠল—"না ভাল নয়! তুমি মাষ্টার মশায়কে দেখতে পার না তাই! দাঁড়াও আমি মাষ্টার মশায়কে বলে দেব।"

"বলে দিবি! কি দুষ্টু মেয়ে গো! দেখ অসি! সব গিয়ে ওর মাষ্টারকে বলে দেয়, ভদ্রলোকের ছেলে কি মনে করে বল দেখি। সত্যি অসি মাষ্টার লোক ভালি নয়।"

অসিতা জিজ্ঞেস করল—"কেন?"

"শুনলাম নাকি ছেলেটাকে কলেজ হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

অসিতার মুখ বিবর্ণ হ'তে লাগল। সে সামলাতে চেষ্টা করল; বল্লে, "কেন?"

"ও নাকি কলেজের একটা মেয়ের হাতে কি একটা চিঠি গুঁজে দিয়েছিল, তাতে 'যা তা' লেখা ছিল। ছেলেটা সাহস দেখ।"

অসিতার মুখ পাংশুবর্ণ হ'য়ে গেল। তার ভয় হ'ল—সেই মেয়েটার নাম বুঝি মামী জানেন। সে ভয়ে ভ[য়ে] জিজ্ঞাসা করল, "তারপর?"

"তারপর আর কি। চিঠি পড়ে মেয়েটা কেঁদে ফেলে প্রফেসরকে দেখায়। তারা নাকি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে কি সাঙ্ঘাতিক ছেলে বল দেখি। এসব ছেলেকে কি প্রশ্রয় দিতে আছে! রাণুকে পড়াচ্ছে, আমার ত বা[পু] ভয়ই হয়।"

অসিতা শুষ্ক মুখে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হ'ল তার ক[ণ্ঠ]নালী শুকিয়ে এসেছে। এক গ্লাস জল পেলে যেন তা[র] ভাল হয়। সে ধীরে ধীরে বললে—"তা বটে।"

মামী উৎসাহিত হ'য়ে বল্‌লেন, "কিন্তু তোর মামা ও[র] উপর ভারি খুসি। বলেন যে, যে ছেলে নিজে[র] মুখে সব স্বীকার করেছে, সে কখন ভাল ছেলে না হ'[য়ে] পারে না।"

অসিতা বিস্মিত হ'য়ে বলল, "নিজের মুখে বলেছে?"

"হাঁ, ও যখন প্রথম দিন আসে, ও প্রথমেই বলে [যে] আমার এই অপবাদ, আমাকে রাখবেন কি না। ছেলেটা বলে, ওকে নাকি ভুল করে শাস্তি দিয়েছে। তোর মাম[া] তো একেবারে অবাক্, ভারি খুশী; বললেন, তুমি [যে] নিরপরাধ তা আমি বিশ্বাস করি, তোমাকেই আমি রাখব। তারপর বললেন, "তুমি যদি অন্য কলেজে ভর্ত্তি হ'তে চা[ও] তবে হ'তে পার, আমি সব খরচ দেব। ছেলেটী কি করলে জানিস, অসি! আমি পাশের ঘরে আড়ালে দাঁড়িয়ে স[ব] দেখতে পেলুম, তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল বেরিয়ে এল, সে তোর মামার পায়ে হাত রেখে বললে—আমা[য়] বিশ্বাস করুন, আপনার মেয়েকে আপনি অসঙ্কোচে ছেড়ে দিতে পারেন। তারপর ধীরে ধীরে বলল, আর পড়তে পারব না, কলেজের ছেলেদের কাছে আর মুখ দেখাতে লজ্জা করে। তারা সবাই জানে আমিই অপরাধী।"

অসিতার চোখে জল এল। সে কিছুতেই সামলাতে পারল না। তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে সে চোখ ঢেকে বললে—"ভারি ক্ষিধা পেয়েছে মামী, আমায় খেতে দাও।"

(৩)

শুড্ ফ্রাইডের কয়েক দিন ছুটি অসিতা এই খানেই কাটাবে স্থির করেছে। এমন মাঝে মাঝেই সে তার ছুটিগুলো মামা-মামীর কাছে কাটায়।

অসিতা বই পড়ছিল। পাশের ঘরে দুরন্ত ছাত্রীকে শান্ত ক'রে নিতাই পড়া বলে দিচ্ছে। তার প্রত্যেক কথা, হাসিটুকু পর্য্যন্ত ওঘরে অসিতা চুরি করে শুনছে। বই পড়া একটা ছল মাত্র, মামী হঠাৎ এসে পড়লে তাঁকে ফাঁকি দিবার একটা উপায় আর কি!

এই ঘরে তার মামীও অনেক লুকিয়ে মাষ্টারের পড়াবার কায়দা শুনে গেছেন। আজকাল আর আসেন না। একদিন তিনি শুনেছিলেন, রাণু বল্ছে—"মাষ্টার মশাই, মা লুকিয়ে লুকিয়ে পড়া শোনে মা বলেছে যে আর আপনাকে রাখবেন না।"

লজ্জায় তিনি মরে গিয়েছিলেন, মনে মনে বলেছিলেন "দুষ্টু মেয়ে আজ আসুক ভিতরে, পিটিয়ে লাশ করব। সে দিন থেকেই তিনি আর এ ঘরে সকাল বেলায় আসেন না।

পড়তে পড়তে হঠাৎ রাণু বলে উঠল, "আচ্ছা মাষ্টার মশাই, অসিদি'কে আপনি চেনেন?"

অসিতার কাণ খাড়া হ'য়ে উঠল। সে স্পষ্ট শুনলে, "না, চিনি নে—তুমি বাজে কথা বল না, পড়।"

রাণু পড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আবার বলল, "আচ্ছা অসিদি কালো না মাষ্টার মশাই?"

অসিতা মনে মনে লজ্জিত হ'য়ে উঠল।

নিতাই বলে ফেলল, "না তাঁর চোখ দুটো সুন্দর।"

ছাত্রী লাফিয়ে বলে উঠল,"এই যে বল্লেন—চেনেন না? আপনি ভারি মিছে কথা বলেন!"

নিতাই হেসে বল্লে, "তুমি ভারি দুষ্টু। নাও, পড়।"

ওঘরে অসিতা মিছি মিছি চোখ-মুখ লাল করে ফেল্ল। তার সর্ব্বশরীরে পুলক-সঞ্চার হ'ল।

ছাত্রী আবার একসময়ে ফস্ করে বলে উঠল, "আচ্ছা আপনি অসিদিকে পড়াতে পারেন্ না?"

"কেন বলত?"

"আমি দিদিকে বলছিলাম—মাষ্টার মশায়ের কাছে পড়বে, চল। অতে মা বললে, যে আপনি দিদিকে পড়াতে পারবেন না। আপনি কিছু জানেন না—তাই।"

নিতাই একটু হেসে বলল—"তোমার দিদি কি বললেন?"

দিদি চুপ করে থাকল। বলুন না পারেন কি না?"

"বোধ হয় পারি।"

ছাত্রী চেয়ার হ'তে উঠে বললে, "যাই বলে আসি।"

নিতাই জিজ্ঞাসা করল, "কি বলে আসবে?"

"যে আপনি পড়াতে পারেন।—"

নিতাই মহাব্যস্ত হ'য়ে তার এক হাত ধরে ফেলে বলল, "আরে না, না, ক্ষ্যাপা মেয়ে! আচ্ছা পাগল যা হোক। তোমাকে নিয়ে আর পারি নে। বল এ কথা বলবে না? আমার গা ছুঁয়ে বল।"

"আচ্ছা বলব না।"

"যদি বল, তবে কি হ'বে।"

"তবে—তবে আপনাকে এক পয়সার লজেন্স্ খেতে দেব।"

নিতাই হা, হা করে খানিক হাসল, বলল, "না, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। তুমি ভারি দুষ্টু হয়েছ; তোমাকে যে কি বলব ভেবে পাই না।"

অসিতা অত্যন্ত কৌতুক বোধ করছিল। সেও মুখ টিপে ভারি হাস্‌ল।

তারপর আরও কিছুক্ষণ পরে রাণু সহসা বললে, "আচ্ছা মাষ্টার মশায়,—আপনাকে না কি কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এক মেয়েকে না কি একখানা চিঠি দিয়েছিলেন! কেন মষ্টার মশায়, তাতে কি ছিল?"

নিতাই অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে গেল। বলল, "কে বললে তোমায়?"

"মা অসিদি'কে বলছিল—যে আপনি খুব খারাপ না কি।"

"তোমার দিদি কি বল্লেন?"

"দিদি এমন কিছু বলেন নি, বলল হুঁ তা বটে।"

নিতাই অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে বসে রইল। রাণু তার মুখের দিকে চেয়ে আর কিছু বলতে সাহস করল না। ওঘরে অসিতার বক্ষ দুরু দুরু কেঁপে উঠল। একবার তার

মনে হ'ল সে ছুটে এসে বলে—"না, না সে এমন কথা বলে নি—বলে নি।"

রাণু বই নিয়ে নাড়া চাড়া করতে লাগল। নিতাই তা একবার ফিরেও দেখলে না। সে বসে বসে অনেক কথা ভাবল; তারপর রাণুকে বলল, "তোমার পেনসিলটা আর খাতাটা দাও তো।"

তারপর বসে বসে লিখল, কয়েক লাইন মাত্র। রাণুকে তা' দিয়ে বলল, "আজ তোমার পড়ার মন নেই, তোমার ছুটী; এই চিঠিটা তোমার বাবাকে দেখিও। বুঝলে রাণু—যাও।"

রাণু ভিতরে এলেই অসিতা ছুটে গিয়ে পড়ল, বলল, "দেখি সে চিঠি।"

রাণু সেটা বের করে দিল। অসিতা পড়লে—

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমার চরিত্রের কথা কেমন করিয়া জানি না রাণু জানিতে পারিয়াছে। তাহার কোমল প্রাণে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। তাহা কিছুতেই ঘুচিবার নয়। সে জানিয়াছে, বুঝিয়াছে যে আমার মত খারাপ লোক আর নাই। আমি তাহার শ্রদ্ধা হারাইয়াছি। তাই তাহার কচি মনটার উপর আর আমার গুরুগিরি ফলান উচিত নয়। আমি তাই ছুটি চাহিতেছি, আমাকে মাপ করিবেন। ইতি

বিনীত—নিতাই

অসিতা বলে' উঠল, "যা যা শীগগীর গিয়ে মাষ্টারকে বল গে, যেন মামাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে যায়।"

রাণু ছুটে বার হ'য়ে গেল কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, "মাষ্টার মশাই তো চলে গেছেন।"

অসিতা ইজি চেয়ারটার উপর শুয়ে পড়ল। তার মুখে আর কথা ফুটল না। তার মনে হ'ল যেন তোরই সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে।

(৪)

অসিতার বার বার মনে হ'ল শুধু তারই জন্য নিতাই চলে গেল—অন্য কারণ কেবল যাবার ছল মাত্র। নিতাই যে তাকে ঘৃণা করে এ সন্দেহ তার সেইদিনই ভাল করে হয়েছে,—যেদিন সে তার মামার বাড়ীতে নিতাইয়ের সম্মুখে পড়ে গিয়েছিল। তার মুখে যে ভাবটা ফুটে উঠেছিল তা বুঝবার ক্ষমতা একজন শিশুরও আছে। কলেজের ওই ব্যাপারটার পূর্ব্বে অসিতা নিতাইকে ভাল করে চিনতও না; কিন্তু ঘটনার পরে যখন সে অন্যান্য ছাত্রীদের নিকট শুনলে যে—ছেলেটী ক্লাশের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছেলে—কি পড়ায়, কি ব্যবহারে—নিতাই-ই-যে সেই ছেলে, তখন তার মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হ'য়ে উঠেছিল। মামার বাড়ীতে সহসা সেই নিতাইকে দেখতে পাওয়ায় তার ইচ্ছা হ'য়েছিল তার কৃত অপরাধটা স্বীকার ক'রে ক্ষমা চেয়ে নেবে। কিন্তু নিতাইয়ের গাম্ভীর্য্যের কাছে সে কিছুতেই সাহস ক'রে অগ্রসর হ'তে পারে নি। কলেজের অন্যান্য ছেলেদের হ'তে নিতাইয়ের যে কি পার্থক্য আছে তা সে বুঝলে। নিতাই অন্যান্য ছেলেদের মত ছলে, বলে, কৌশলে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ব্যস্ত হয় না, অসিতাকে সে এখানে এড়িয়ে চলে।

কলেজের ওই ঘটনার পর হ'তে যেমন সে কয়েকদিন লজ্জায় কা'কেও মুখ দেখাতে পারেনি, আজও তার তেমনি লজ্জা হ'তে লাগল। সে অনর্থক কয়েকদিন কলেজ কামাই করল।

তার মামা নিতাইয়ের খুব খোঁজ করলেন, কিন্তু কিছুতে কোথাও তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অসিতা তার মামার কাছে শুনেছে, নিতাই অত্যন্ত গরীব, নিজেকে ভরণ-পোষণ করবার পর্য্যন্ত তার কোন উপায় নেই, তখন সহসা সে দেখলে তার অন্তঃকরণটায় কোথায় যেন বড় খচ খচ করতে লাগল।

কলেজের প্রত্যেক ছেলেই এখন তাকে ভাল ক'রেই চেনে—শুধু চেনে নয়—সেই হ'য়েছে সকলের একমাত্র আলোচনার স্থল এবং যার জন্য সে একজন নির্দ্দোষীর সর্ব্বনাশ করেছে, সেই অবোধকে আজ সে চিনেছে। অসিতা জানে, এই ছেলেটী তাকে কি অপমান করতে চেয়েছিল। কিন্তু যখন কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে সে বিচারপ্রার্থী হ'ল, তখন এই বড়লোক ছেলেটী একটা দল গড়ে কি ভাবে নিতাইকে অপরাধী প্রতিপন্ন করাল। তাকে প্রহারের ভাগার অর্জ্জিত ক'রে, সুবোধের দল একে

পাকড়াও করে প্রিন্সিপালের কাছে নিয়ে যায়। যখন অসিতাকে ডাকা হ'ল, সে সমস্তই আগাগোড়া বুঝে সত্য গোপন করতে বাধ্য হ'ল। ক্লাসের সমস্ত ছেলে যেখানে একজনকে অপরাধী বলে গণ্য করেছে, সে নিজে আর তাকে নির্দ্দোষী বলবার সাহস খুঁজে পেল না।

নিতাইএর কোন সংবাদ না পাওয়ায় অসিতা মনে মনে অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে উঠল। তলে তলে সে সন্ধান নিতে চেষ্টা ক'রল। কিন্তু কোন সুবিধা করতে না পেরে সে অবশেষে এক পন্থা আবিষ্কার করল। সুবোধকে সে প্রথমাবধি চিনত, তাদের বাড়ীর সামনেই সুবোধদের প্রকাণ্ড বাড়ী। তার সঙ্গে কিছুদিন হ'ল সামান্য আলাপও হ'য়েছে। এই ছেলেটার চরিত্রের সমস্ত জেনেও সে তাকেই ডেকে পাঠাল।

সুবোধের সেদিন একটা স্মরণীয় দিনই বটে। সে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠল। অসিতার সঙ্গে দেখা করতে সে একদিনও দেরী করল না। অসিতা বলল, "সুবোধবাবু, বলতে পারেন সেই নিতাইবাবু এখন কি করেন ?"

সুবোধ বোধহয় একটু মনঃক্ষুণ্ণ হ'ল। বললে, "সে তো পড়া ছেড়ে দিয়েছে—লজ্জায় আর কোন কলেজে পড়তে যায় নি।"

অসিতা কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, "আজ কাল কোথায় তিনি আছেন, বলতে পারেন ?"

"ক'লকাতায় নাই তা জানি।"

অসিতা একটু ব্যস্ত হ'য়ে বলল, "কেমন করে জানলেন ?"

সুবোধ এক গাল হেসে বললে, "ওর একটা টিউসনি ছিল তারই সাহায্যে সে কলেজে পড়ত। সেটা আমারই চেষ্টায় গেছে।

অসিতা স্তম্ভিতা হ'য়ে গেল, সে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই ছেলেটার সঙ্গে তার কথা বলবার পর্য্যন্ত আর প্রবৃত্তি থাকল না। সে নমস্কার ক'রে বললে, "আচ্ছা নমস্কার।"

সুবোধ অত্যন্ত দমে গেল, তবু একটু হেসে বলল, "তাকে কি দরকার বলুন তো ?

"আছে, বুঝবেন না আপনি" বলে সে কক্ষ ত্যাগ করে গেল।

মাস তিন কেটে গেছে। অসিতার মনে এই কয় মাস ধরে শান্তি নাই। সে মন সংযত ক'রে কোন কিছু ক'রতে পারে না। মাঝে মাঝে এই নিরুদ্দিষ্ট লোকটার জন্য তার মনে বড় ব্যথা বাজতে থাকে। কেউ তাকে এর কোন সংবাদ দিয়ে একটু সুস্থির ক'রতে পারলে না।

কিছুদিন হ'তেই তার কল্‌কাতার উপর বড় বিরক্ত লাগে। সে বাহিরে কোন দেশে যেতে চায়। অনেক ভেবে চিন্তে সে ঠিক করলে, রাঁচী যাবে। সেখানে তার আর এক মামা, ওখানকার একজন বড় অফিসার। কলেজের ছুটী হ'লে সে একদিন সমস্ত ঠিক ক'রে তার মামাকে চিঠি লিখে দিলে—ষ্টেশনে কাউকে উপস্থিত থাকতে।

সে এর পূর্ব্বে কোন দিন রাঁচী যায় নি।

* * *

রাঁচী এসে অসিতা তার মামার সঙ্গে মটরে কয়েকদিন খুব ঘুরে বেড়াল। মোরাদাবাদের পাহাড়টা, তাদের বাড়ীর কাছেই। রোজ সকালে সে সেইদিকে একাই হেঁটে রওনা হ'ত। জগন্নাথপুরের মন্দিরটা তার কাছে বড় ভাল লাগে। সে রোজই তার মামার সঙ্গে মোটরে এদিকে বেড়াতে আসত।

তার মামা কয়েকদিন হ'ল মফঃস্বলে গেছেন। অসিতা একাই আজকাল মন্দিরে আসে।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। মস্ত চাঁদটা পাহাড়ের ঠিক সম্মুখে দেখা গেল। সমস্ত পাহাড়, মন্দিরটা জ্যোৎস্নায় যেন স্নান করছে। দূরের পাহাড়গুলো অস্পষ্ট, আবছায়ার মত দেখা যায়; যেন একটা মায়ারাজ্যের আবেশ পাওয়া যায়।

অসিতা একদণ্ড স্থির হ'য়ে দাঁড়াল। সে মুগ্ধ বিস্ময়ে চারিদিক চেয়ে দেখল। তার অশান্ত মন কার কোমল করস্পর্শে যেন অচেতন হ'য়ে আসতে চায়। সে ওই পাহাড়ের উপর স্থির হ'য়ে বসল।

ড্রাইভার এসে বললে, "দিদিমণি, রাত হ'য়েছে।"

"চল যাই।" বলে সে উঠে দাঁড়াল। এই বিরাট নিস্তব্ধতা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে; শুভ্র আকাশের দিকে তাকিয়ে সে স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মটরে করে যখন সে ফিরেছে তখন অনেকটা রাত্রি

হ'য়েছে। নীচে অসমান্তর মাঠের মধ্যে মাঝে মাঝে এক একটা গাছ, যেন ছন্নছাড়ার ন্যায়; মাঝে মাঝে কোলেদের বস্তি—তখনও মাদলের শব্দ, আর গানের করুণ সুর ভেসে আসছে। তার মন হালকা হ'য়ে পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নার গগনে ভেসে বেড়াতে চায়।

হঠাৎ মটর থেমে গেল। তার তন্দ্রা কেটে গেল—সভয়ে দেখল কয়েকজন লোক ড্রাইভারটীকে এক আঘাতে অজ্ঞান করে ফেলল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে কার কঠিন হস্তের চাপে তার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। তার মনে হ'ল তারা তাকে টেনে গাড়ীর বার করে নিল এবং উচু রাস্তা হ'তে নীচে বন্ধুর জমির উপর নেমে পড়ল।

তারপর সে অজ্ঞান হ'য়ে গেল।

যখন জ্ঞান হ'ল, দেখলে, সে শয্যায় শুয়ে আছে। কিছুক্ষণ সে কিছু বুঝতে পারলে না। সে বুঝতে পারলে না—কোথায় এসেছে। আস্তে আস্তে তার সব মনে হ'ল। ঘাড়টা ফিরিয়ে সে প্রথমে যাকে দেখতে পেল—তাতে তার চক্ষু বিস্ফারিত হ'য়ে গেল। সে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চক্ষু বুজলে—মনে মনে সে কেবলই আলোচনা করতে লাগল—এ অসম্ভব কেমন ক'রে সত্য হ'তে পারে।

ঘরের এককোণে তার ড্রাইভার বসেছিল। সে এইবার উঠে এসে বললে—"দিদিমণি, এখন বাড়ী যাবেন?"

অসিতা তার দিকে চেয়ে দেখল। নিতাই এই সময়ে বাহিরে গেল দেখে সে বললে, "এ কোথায় এসেছি আমি?"

ড্রাইভার বললে, "দিদিমণি ইনিই তো বাঁচিয়েছেন—গুণ্ডারা আপনাকে নিয়ে সরে পড়ছিল। ইনি সেই সময়ে জগন্নাথপুরের দিকে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘটনাটা জ্যোৎস্নায় দূর থেকে দেখে ছুটে আসেন; তারপর একাই তাদের সবগুলোকে হটিয়ে দেন। কি বলব দিদিমণি, এর গায়ে এত শক্তি যে, এক একটা ঘুসিতেই সকলে ধূলিসাৎ হ'য়েছে—দুটো পর্য্যন্ত মারবার দরকার হয় নি।"

এতদিন মনে মনে যাকে সে চাচ্ছিল, আজ সে তার একেবারে মুঠোর ভিতর! তার লজ্জা হ'তে লাগল—এমন ভাবে তার হাতের মধ্যে এসে পড়া সে বাঞ্ছনীয় মনে করল না। যাকে সে সকলের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করেছে, সেই আজ তার মান-মর্য্যাদা, সতীত্ব রক্ষা ক'রলে। একদণ্ড অসিতা অস্বস্তি বোধ ক'রল—তার কান্না আসতে চাইল।

আর একমুহূর্ত্তও তার এখানে থাকবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু মাথাটা উঠাতে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় সে উঠাতে পারলে না, চারিদিক অন্ধকার দেখলে। সে কিছুক্ষণ সামলে নিয়ে বললে,"আজ আর যেতে পারি নে, কাল এসে নিয়ে যেয়ো—সকালে আসবে।"

"আপনার যাওয়াই বোধহয় উচিত। যাক্ এখন এই বাটী দুধ খেয়ে ফেলুন দেখি!" বলে নিতাই সামনে এসে দাঁড়াল।

অসিতা একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে—তারপর ধীরে ধীরে সেটা নিঃশেষ করলে।

ড্রাইভার বললে,"দিদিমণি—বাড়ীতে মা যে অস্থির হ'য়ে উঠবেন—যদি জিজ্ঞেস করেন—'কোথায় রেখে এলি'?"

কথাটা সঙ্গত। অসিতা একদণ্ড ভেবে বললে, "বলবে যে আমার চেনা জায়গা।" তারপর কি মনে করে বললে, "একটু চিঠি লিখে দিলে হ'ত।"

কথার ইঙ্গিত বুঝে নিতাই তাড়াতাড়ি দোয়াত কলম এনে দিল। কাগজ আসতেই অসিতা বললে, "আমি লিখতে পারব না, আপনি লিখুন।"

নিতাই একটু ইতস্ততঃ ক'রে চিঠি লিখে দিল। ড্রাইভার চলে গেল। নিতাই পুনরায় বললে, "গেলে বোধহয় ভাল করতেন। এ খোলার ঘরে আপনার অত্যন্ত অসুবিধে হবে; সে রকম যত্ন পাওয়ার আশা কম।"

অসিতা আর একবার তার দিকে চাইলে। তারপর গায়ের উপর নিতাইয়ের চাদরখানা টেনে দিল।

নিতাই বললে,"আপনাকে রাঁচীতে যে দেখতে পাব তার আশা করি নি। আর আপনি যে আমাকে চিনতেও পারবেন তাও ভরসা করি নি।"

অসিতার ভারি রাগ হ'ল। অভিমানে তার চোখ ছল ছল করতে লাগল। তারজন্য যে অসিতার চিন্তায় অবধি নাই—এ কথা কেমন ক'রে এই নির্ব্বোধটাকে সে বুঝিয়ে বলে। তাড়াতাড়ি চোখের জল গোপন করবার জন্য সে চাদরটায় আপাদমস্তক আবৃত্ত ক'রে পাশ ফিরে শু'ল।

নিতাই সহসা ভুলে গেল যে সে এখানে এক মহাজনের

দোকানে কুড়ি টাকার চাকরি করে! আসে পাশে সাইকেলে ঘুরে জিনিস সংগ্রহ করাই তার কাজ। তার মনে হ'তে লাগল তার এই সামান্য কুড়েখানি সৌভাগ্যে ভরপুর হ'য়ে উঠেছে। সে আত্মহারা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

(৫)

পরদিন প্রাতে একটু অধিক বেলায় অসিতার নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। এই দেরীতে সে অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সে বাহিরে এল। নিতাই তখন পাউরুটী টোষ্ট ক'রে প্লেটে সাজিয়ে রাখ্‌ছে। ওদিকে উনানের উপর জল গরম হ'চ্ছে। নিতাই তাকে দেখে বললে, "ওদিকে আপনার জন্য টুথপেষ্ট, ব্রাস দেওয়া হ'য়েছে। জলও ঠিক করা আছে। তাড়াতাড়ি সব সেরে নিন। ব্রাসটা নতুন অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারেন।" তারপর সে আপন মনে কাজ করতে লাগল।

অসিতা না পারল একটা কথা বলতে, না পারল এক পা অগ্রসর হ'তে। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে এই লোকটার সেবার সে পরিচয় পেয়েছে। কিন্তু তারপর অকাতরে ঘুমিয়ে সে গোটা রাতটা কাটিয়েছে, এ লোকটী ঘুমিয়েছে, কি জেগেছে তা সে জানে না। কিন্তু আজ আবার কত সকালে হয় তো উঠেছে, উঠেই তার সুবিধের জন্য সমস্ত আয়োজন ক'রে রেখেছে। তার এই নীরব সেবার মধ্যে স্বার্থের গন্ধমাত্র নাই—শুধুই যেন একটা অবিচ্ছিন্ন গতিতে সে কাজ করে চলেছে? অসিতা একদণ্ড পুলকাচ্ছন্ন হ'য়ে রইল।

নিতাই সে দিকে না তাকিয়েই বুঝলে অসিতা দাঁড়িয়ে আছে। বললে, "দাঁড়িয়ে থাকলে ভারি অসুবিধে হ'বে। আমাকে নিজে রান্না করে খেয়ে তবে দোকানে যেতে হ'বে। কাল রাত্রে যেখানে চলেছিলাম, আজ সেখানে না গেলেই নয়। আপনার মটর আসবার আগে এইটুকু ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়।"

অসিতা তারপর সমস্ত সমাধা ক'রে এসে দাঁড়াল। নিতাই তখন চা তৈরী শেষ ক'রেছে। উনানে বোধ করি তখন চা'ল সিদ্ধ হচ্ছে।

"নিন"—বলে সে সমস্ত তার সামনে এগিয়ে দিল। তারপর বললে, "আমি একটু বাইরে যাব—এর মধ্যে মটর এলেই যেন চলে যেয়ো না। কাল শরীরে গ্লানি হ'য়েছে, আজ সকালে এখানে স্নান ক'রে নিলে শরীরটা ভাল হ'বে। আমি জল এনে রাখছি, ইচ্ছা হ'লে স্নান করে নেবেন। এঃ আপনি নাড়াচাড়া কচ্ছেন, খাচ্ছেন না। ওর বেশী যোগাড় করা সাধ্যে কুলোয় নি। যত বাসী আর সস্তা আমি কিনি—তাই খেতেও বিশ্রী। ২০৲ টাকায় নইলে চালাতে পারি নে। আজ একটু অসুবিধা হ'বে বৈ কি?"

অসিতা নিস্তব্ধ হ'য়ে রইল, তার কান্না পেতে লাগল। এমন করে তাকে পরাজিত করতে এর আগে কেউ পারে নি। তার নিজের উপর ভারি রাগ হ'তে লাগল।

নিতাই তার বলিষ্ঠ হাতে দুই বালতি জল এনে রাখল। অসিতা একবার চেয়ে দেখেই চোখ নামালে। নিতাই বললে, "থাকল জল, একটা কাপড়ও রেখে গেলাম। মেয়েদের কাপড় তো পাবেন না। আমি বাজার থেকে একটু ঘুরে আসি।"

আধ ঘণ্টা খানেক পরে সে ফিরে এসে দেখল, অসিতা স্নান করে তার একরাশ চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে। উনানের সম্মুখে বসে সে ডাল চড়িয়ে দিচ্ছে পিছনে দাঁড়িয়ে নিতাই একদণ্ড চুপ ক'রে থাকল। তার ভারি ভাল লাগল। চুল পিঠে ছড়িয়ে দিলে মেয়েদের যে এমন ভাল লাগে তা তার ধারণা ছিল না। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

অসিতা সহসা পিছন ফিরে নিতাইকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভারি লজ্জিত হ'য়ে উঠল। তার হাত থেমে গেল। তার এই লুকিয়ে দেখা ধরা পড়ে গেছে দেখে নিতাইও অপ্রস্তুত হ'য়ে উঠল। সে তার জিভ বার করে দাঁত দিয়ে চেপে ধরল। অসিতার নজরে তাও এড়িয়ে গেল না; সে হেসে ফেললে।

নিতাই এতে একেবারে ঘাবড়ে গেল, রাগও হ'ল। সে তাড়াতাড়ি বললে, মটর ফিরিয়ে দিলেন যে, রাস্তার দেখা হ'ল। আমি বলে দিয়েছি বিকেলে আসতে। আপনি

ঠিক থাকবেন। নিতাই মনে করেছিল, রাগ করে খানিকটা সে বকবে কিন্তু কিছুই আর বলা হ'ল না। বললে, "সরুন, আপনি আজ আমার অতিথি, আপনাকে খাটালে পাপ হ'বে।"

অসিতা বসেই থাকল, নড়বার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

নিতাই বলতে লাগল, "একটা দিন রান্না ক'রে আপনি আমার আর কি সুবিধা করবেন। বরং নিজ হাতে রান্না করে খাওয়ালে আমার ভারি একটা তৃপ্তি হ'বে। জীবনে তবু একটা দিন আমার পরম আনন্দের বস্তু হ'য়ে উঠব।"

অসিতা নিশ্চল হ'য়ে বসেই রইল।

নিতাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "বুঝেছি এই একটা দিনের আনন্দেও আপনার আপত্তি আছে। তবে থাক।" বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে চলে গেল।

কিছুক্ষণ ঘুরে এসে নিতাই দেখলে, সামান্য যা কিছু—রান্না করা শেষ হ'য়ে গেছে। দেখে সে ভারি খুশী হয়ে উঠল। হেসে বলে ফেলল, "না, যা ভেবেছি, তা নয়। আচ্ছা, বড় লোকের ঘরে জন্মে এ সব শিখলেন কি ক'রে!

অসিতা কোন কথাই বললে না, চুপ করে সে তার খাবার জায়গা করে দিল। নিতাই বললে—না, আপনি দেখছি আমার উপর ভারি চটে গেছেন। একটা কথা বলাও দেখছি আপনি দরকার মনে করেন না।

নিতাই একটু গম্ভীর হ'য়ে খেতে বসল। অসিতা সামনে বসে নিপুণ হস্তে পরিবেষণ করতে লাগল। নিতাই ভারি আরাম বোধ করতে লাগল—তাকে সামনে বসে কেউ যে খাওয়াতে পারে এ আশা সে কখনও করে নি। বলল, "দেখুন আপনি কথা বলুন আর নাই বলুন, কিন্তু আমার যে আজ কি আনন্দ হচ্ছে তা প্রকাশ করতে পারি নে। এমন করে সামনে বসে খাওয়ান, বোধ করি আমার কপালেই প্রথম ঘটল। অথচ আমিই হ'লাম আমাদের দলের মধ্যে সব চেয়ে হতভাগ্য। কেমন কি না আপনিই বলুন।"

অসিতা চুপ ক'রেই থাকল।

নিতাই বলে যেতে লাগল, "জীবনে এমন দিন যে কখনও আসবে কে তা জানত! কোনদিন ভাল ক'রে খেতে পাই নে। নিজে রান্না করে খাই; বুঝতেই পারেন কি খাই। কুড়ি টাকা মাইনে বটে, কিন্তু খাটনিটা মোটা মাইনের মত। অত খেটে এসে কিছুই ভাল লাগে না, বেশী দিন না খেয়েই কেটে যায়।"

অসিতা নতমস্তকে বসে রইল।

নিতাই বলতে লাগল, "কিন্তু আশ্চর্য্য দেখুন, এমন অভ্যেস হ'য়ে গেছে যে আর কিছু কষ্ট বোধ হয় না। আজ আমার কিন্তু এত ভাল লাগছে যে সবই শেষ করে ফেলব, আপনার জন্য কিছুই আর রাখব না; তখন কিন্তু মনে মনে আমাকে গাল দিলে চলবে না। ভাবছি তাই, আমাদের মেয়েরা কত লক্ষ্মী। তারা ছুঁয়ে দিলেও যেন সব অমৃত হ'য়ে উঠে।"

হঠাৎ নিতাইয়ের খেয়াল হ'ল যে অসিতা একটা কথাও বলে নি। সে একটু হতাশ হ'য়ে বলল, "নাঃ আপনি ভারি চালাক, আমি কেবলই বকেই যাচ্ছি, আর আপনি শুনেই যাচ্ছেন। আমি আর আপনার সঙ্গে কথা কইব না—এই আমি চুপ করলাম। আপনার রাগ থাকতে পারে আর আমার নেই!"

অসিতা হেসে ফেলল।

"হাসলেন যে বড়। মনে ক'রছেন আমি কথা না বলে থাকতে পারি নে? এমন অপবাদ আমার কোন শত্রুও দিতে পারে না। কলেজে এমন চুপ ক'রে থাকতাম যে আমি বোবা কি না তাই কেউ বলতে পারত না। এই দেখুন আমি চুপ করলাম, কিছুতেই আর কথা বলছি নে।"

অসিতার সব শিরাগুলো যেন হঠাৎ টন্ টন্ করে উঠল; নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে হেসে বললে, "আর একটু ডাল দেব?"

নিতাই এইমাত্র যা প্রতিজ্ঞা করলে তা আর কিছু মনে থাকল না, সে বললে, "তা দিন—বেশ হ'য়েছে ডালটা।"

অসিতা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে হাসতে লাগল, বলল, "কেমন, কথা বলবেন না?"

নিতাই অপ্রস্তুত হ'য়ে বলল, "ওঃ ভুলে গেছলাম, সত্যি বলছি।"

অসিতা হাসতে লাগল।"

* * * *

বেলা তিনটের পর নিতাই এসে হাজির হ'ল বললে, "প্রস্তুত হন, আমি গাড়ী ডেকে আনি।"

অসিতা বলল "গাড়ী ডাকবেন না, আমি যাব না।"

নিতাই অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে অসিতার মুখপানে একবার চাইলে; তার কথার ঠিক তাৎপর্য্যটুকু সে বুঝতে পেরে তেমনি বিমূঢ়ের মতই জিজ্ঞেস্ করলে—"তার মানে?"

"আজ আমি যাব না—আমার ইচ্ছা।"

নিতাই কিছুক্ষণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করতে পারল না; পরে বলল, "তাঁরা কি ভাববে বলুন দেখি!"

অসিতা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে বলল, "আমি আর সে ভয় করি না।"

নিতাই অবাক হ'য়ে বলল, "কিন্তু, কিন্তু—তাঁরা যদি—আমায়—; না, না তা হয় না—" আমার কি? মামা যদি আসেন তবে তাঁকে বলে দেব যে আমাকে আপনই আটকে রেখেছেন!"

"আমি!"

"হাঁ আপনই!' তারপর ফস্ করে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেবলই কাঁদতে লাগল, "আমার সর্ব্বনাশ না করে আপনি ছাড়বেন না তা আমি জানি। যত সহ্য করে যেতে চাই, ততই কেবলই আমাকে জ্বালাতন করে তুলেছেন। আমার আর কোন পথই থাকল না।"

নিতাই এর কিছুমাত্র বুঝতে পারল না, বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল।

"আমি এতই জঘন্য হয়ে গেছি যে আমার মুখ দেখাও পাপ, না? আমার জন্য কলকাতাও ছেড়ে চলে এসেছেন—এত বড় শত্রু আমি! আমি যেখানে থাকি সে স্থানও নরক হ'য়ে যায়; এমনি পাপীয়সী আমি! আমার মরাই ভাল" বলে সে কেবলই কাঁদতে লাগল।

নিতাই নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অসিতা হঠাৎ বলে উঠল, "আমার মুখ দেখতে চান না এই তো আপনার উদ্দেশ্য। আচ্ছা, এ মুখ যদি আমি আর কখন আপনাকে দেখাই—।" বলে সে তার কথা অসম্পূর্ণ রেখেই দ্রুত ঘরের ভিতর প্রবেশ করল এবং চাদরে আপাদ মস্তক আবৃত করে শুয়ে পড়ল।

নিতাই ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকল। এক সময়ে ঘরের ভিতর উঁকি মেরে দেখল, অসিতা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। সে যেন একটা মহা বিপদ হ'তে উদ্ধার হ'ল। যে রকম রাগের মাথায় সে ঘরে প্রবেশ করলে তাতে নিতাই অত্যন্ত ভীত হ'য়ে উঠেছিল,—পাছে সে আত্মহত্যা করে বসে। কিন্তু এখনও সে নিশ্চিন্ত হ'তে পারল না, বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতেও পারল না। মাঝে মাঝেই দরজার কাছে এসে সে পাহারা দিতে লাগল। তারপর এক সময়ে সে চুপি চুপি ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে নিঃশব্দে দা, কাপড়, দড়ি, টুল, লাঠি যা কিছু আত্মহত্যার অস্ত্র, সব সরিয়ে ফেলল। ঘরের ভিতর অল্পান্ধকারের মধ্যে চাদরের ভিতর দিয়ে অসিতা সমস্তই পরিষ্কার বুঝতে পারল। তার চোখ দিয়ে আবার জল পড়তে লাগল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'লে এক সময়ে নিতাই আলো জ্বালিয়ে দিয়ে, একটা খাতা আড়াল দিয়ে অসিতার দিকটা অন্ধকার করে দিল—যাতে তার চোখে আলোর রশ্মি না পড়ে। অসিতা তাও দেখলে।

রাত্রি অধিক হ'লে অসিতা বুঝলে নিতাই রান্না ক'রছে এবং মাঝে মাঝেই সে যে দ্বারপ্রান্তে এসে তাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে তাও অসিতা বুঝতে পারল। এক সময়ে 'মশার' দোহাই দিয়ে সে পাখা দিয়ে তাকে বাতাস করে গেল। কিন্তু অসিতা সেই পড়েই রইল, একটু নড়্‌লও না।

যত রাত্রি বাড়তে লাগল নিতাই ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। বারে বারেই ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আলো নিয়ে একটা বই নিয়ে বসল কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই উস্‌খুস্ ক'রে—অসিতা শুনতে পায় এমন ক'রে—বলল, "যাই খেতে যাই।" মুখে বলল বটে কিন্তু যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এক সময়ে বলল, "শহরে ভারি অসুখ লেগে গেছে, উপোস করলে এখানে ভারি অসুখ করে। আমি একদিন উপোস করে ভারি জব্দ হ'য়েছিলাম। তিনদিন জ্বর ছিল—, এখানকার মশাগুলো এমন, যে কামড়ালেই জ্বর হয়; শরীর ফুলে যায়।" কথাগুলো সে কাকে লক্ষ্য ক'রে বলতে লাগল, ঠিক বোঝা গেল না।

অসিতার চোখে জল এল, তার হৃদয় কেবলই কাঁপতে লাগল।

নিতাই ফিরে এসে বলল, "খাবার জায়গা পর্য্যন্ত ক'রে এসেছি। ওদিকে আলোটায় আবার তেল নেই, নিবে যাচ্ছে। এত রাত্রে তেলও পাওয়া যাবে না। দোকান-গুলো আজকাল বড় তাড়াতাড়ি বন্ধ হ'য়ে যায়। ব্যাটারা এত ঘুমুতেও পারে—!

এতেও কোন ফল হ'ল না দেখে নিতাই অস্থির হ'য়ে উঠল। সে বলতে লাগল, কিছু আমি খাব না, সব পচবে, কাল রাস্তায় ফেলে দেব। আমার তো আজ ইচ্ছাই ছিল না যে কেউ বাড়ী থেকে যায়—আজ মঙ্গলবারে কি কেউ কখন যায়! শুধু একটুকু চালাকি ক'রেছিলাম। ভারি, আমাকে জব্দ ক'রে তো ভারি লাভ হ'বে। চিরকালই তো এমন জব্দ হ'লাম। কেও কোন দিন ফিরেও তাকায় নি। বাবা-মা কলেরায় মারা গেলেন—বোনটা শ্বশুর বাড়ী চলে গেল; মহাজনে বাড়াটা বেচে নিল—আমার এ জগতে আর কেউ নাই।"

তার চোখে জল এল। তার বাপ-মা যে চিরকাল কষ্ট করেই মারা গেলেন; মরবার সময় ছেলের মুখও দেখে যেতে পারেন নি—এ কথা এই বিদেশে হঠাৎ আজ মনে পড়ায় সে চোখে জল রাখতে পারল না। সে অশ্রুভরা কণ্ঠে বলতে লাগল, অপরাধ না হয় ক'রেছি, তাই বলে তার ক্ষমা নাই। আমি আর কখন যেতে বলব না, এই স্যাঁতসেঁতে বাড়ীতে কখন ভদ্র মেয়ে থাকতে পারে তাই না বলেছিলাম—!"

অসিতা আর থাকতে পারল না, ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। নিতাই সাহস পেয়ে তার মুখের উপর হ'তে চাদরটা জোড় করে সরিয়ে দিল, বলল, "মাপ কর অসিতা আর তোমায় যেতে বলব না।"

অসিতা তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে চোখের জলে ধুইয়ে দিতে লাগল।

শেষ

তৈল কূপে অশ্বের পূর্ব্বপুরুষ

লুসিয়ানায় (আমেরিকা) ভূগর্ভে এক তেলের খনিতে কোন এক স্তন্যপায়ী জন্তুর মাথার খুলি পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন ঐ ধরণের জন্তু না কি পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে বাঁচিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত যে সকল জীব-জন্তুর অস্থি পাওয়া গিয়াছে, এইটীর সহিত কাহারও না কি তুলনা হয় না। এটা এত প্রাচীন! চতুষ্পদ, খুরসংযুক্ত স্তন্যপায়ী জন্তুরই বংশের ইহা কেহ হইবে। ইহারা বহুদিন পূর্ব্বে পৃথিবীর বুক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। ইহাদের বংশের কেহ রহিয়াছে কি না সন্দেহ!

জানবার কথা

সাহিত্যের নৈতিক আবহাওয়া

মহাযুদ্ধের পর হইতে সর্ব্বদেশের সাহিত্যে সম্পূর্ণ এক নূতন নৈতিক আবহাওয়া দেখা দিয়াছে। এই নৈতিক আবহাওয়ার মূলনীতি হইতেছে—নিজের প্রবৃত্তিকে বাধা দিও না। সে যাহা করিতে চায়, তাহাই তাহাকে করিতে দাও। কোন কারণে তাহাকে অসন্তুষ্ট রাখিও না। পথে, ঘাটে-মাঠে, আজকাল যে সব উপন্যাস দেখা যায় তাহা যৌন-সমস্যা লইয়াই ভরপুর। মানুষের মধ্যে যে পশু সুপ্ত অবস্থায় আছে, তাহাকে সন্তুষ্ট করা দূষনীয় নয়—ইহাই এই সব উপন্যাসের সব চেয়ে বড় কথা। বিবাহ-বন্ধনকে প্রশংসা করা যায় না; কারণ বন্ধন মাত্রেই মানুষের বর্দ্ধমান বিকাশের পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ। এতদ্ব্যতীত—

—প্রকৃত দাম্পত্য-জীবন সংসারের শান্তি হরণ করিয়া পরিপূর্ণ নিরানন্দের মধ্যে দিন কাটাইতে বাধ্য করায়।

কথাটা কি সত্য!

সত্য নয়। এই সব উপন্যাস পাঠ করিয়া যখন বাস্তবের মধ্যে ফিরিয়া আসা যায়, তখন একবারও তো নভেলের রুচি, ও ভাবধারার সঙ্গে বাস্তবকে খাপ্ খাইতে দেখা যায় না। হইতে পারে মানুষের সুপ্ত বৃত্তি সময়ে সময়ে বিবিধ প্রকার কল্পনা করে, সময়ে সময়ে উহারা প্রবলও হইয়া উঠে—তাই বলিয়া উহারা কি প্রশংসার পাত্র! * *

* * * প্রবৃত্তিতে বাধে বলিয়াই তো অনেক কিছুই আমরা চাহিলেও করিতে পারি না! যে সব বিকৃত রুচি ও ভাবধারাকে উপন্যাসে দেখি, এই প্রবৃত্তিতে বাধে বলিয়াই তো তাহাদিগকে বাস্তব জগতে প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায় না।

* * *

যাহা অবাস্তব, যাহা উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্তিতে বাধে, তাহাকে লোকচক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করান অতি গর্হিত।

—'দি হিবার্ট জারণাল জানুয়ারী', ১৯৩৩

ছন্দ কেবল পদ্যে নয়, গদ্যেও আছে

বাঙ্গালায় যতির অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। দুই যতির মধ্যবর্ত্তী শব্দ-সমষ্টি বা পর্ব্বের মাত্রা অনুসারে বাঙ্গালায় ছন্দোবিচার চলে। পদ্য-ছন্দে ও গদ্য-ছন্দেই এ কথা খাটে। ছন্দোময় গদ্যেরও উপকরণ এক—এক ঝোঁকে (ইম্পালস্) সমুচ্চারিত শব্দ-সমষ্টি অর্থাৎ পর্ব্ব।

যতি মাত্রাভেদে দুই প্রকার—অর্দ্ধ যতি ও পূর্ণ যতি। পদ্যে এক একটী ফ্রেজ্ বা অর্থবাচক শব্দ সমষ্টি লইয়া, কখন কখন বা এক একটী শব্দ লইয়া এক একটী পর্ব্ব গঠিত হয়, এবংবিধ পর্ব্বের পর একটী অর্দ্ধ যতি পড়ে। কয়েকটী পর্ব্ব-সহযোগে গদ্যের এক একটী বৃহত্তর বিভাগ অর্থাৎ বাক্য বা খণ্ডবাক্য হয় এবং তাহার পরে এক একটী পূর্ণযতি পড়ে।

পদ্যের পর্ব্বের ন্যায় গদ্যের পর্ব্বও দুইটী বা তিনটী পর্ব্বাঙ্গের সমষ্টি পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বাঙ্গগুলির পরস্পর অনুপাত ও তুলনা হইতেই এক একটী পর্ব্বের বিশিষ্ট

ছন্দোক্ষণ জন্ম এবং স্পন্দনানুভূতি হয়। বাংলায় পদ্যের ন্যায় গদ্যেও ছন্দের হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে। বাংলা গদ্যে মাত্রাপদ্ধতি পয়ারজাতীয় পদ্যের পদ্ধতির অনুরূপ। ...গদ্যের মাত্রাপদ্ধতি বর্ণমাত্রিক।

পদ্যের পর্ব্বের সহিত গদ্যের পর্ব্বের পার্থক্য এই যে, পদ্যে পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বাঙ্গগুলি হয় পরস্পর সমান হইবে, না হয় তাহাদের মাত্রার ক্রম অনুসারে তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে।

গদ্যে পরস্পর অসমান তিনটি পর্ব্বাঙ্গ লইয়াও পর্ব্ব গঠিত হইতে পারে, পদ্যে তাহা চলে না। * * * অসমান তিনটী পর্ব্বাঙ্গ থাকিলে বৃহত্তম পর্ব্বাঙ্গটা আদি, অন্ত বা মধ্য যে কোনও স্থানে বসান যাইতে পারে।

পদ্য-ছন্দ ও গদ্য-ছন্দের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পার্থক্য এই যে—পদ্যছন্দ ঐক্যপ্রধান এবং গদ্যছন্দ বৈচিত্র্যপ্রধান।

গদ্যে সাধারণতঃ এক একটী বাক্যেই ছন্দের আদর্শের পূর্ণতা হইয়া থাকে, সুতরাং স্তবক-গঠনের প্রয়াস থাকে না। তবে আবেগবহুল গদ্যে কখন কখন পর পর কয়েকটা বাক্য লইয়া একটী ছন্দের আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যায়। এ রকম স্থলে সেই আদর্শ তরঙ্গায়িত ছন্দের আদর্শের অনুরূপ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তরঙ্গায়িত ছন্দই গদ্যের বিশিষ্ট ছন্দ

—পরিচয়, মাঘ, ১৩৩৯

রাশিয়া

নব্য-রাশিয়া জগতের সম্মুখে কৌতূহলের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার প্রতি কার্য্য জগৎ অতি আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছে। সেখানকার অতি তুচ্ছ ঘটনাও ইউরোপের সংবাদ-পত্রে স্থান পায়।

রাশিয়ার বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র কেহ কেহ প্রশংসার চোখে দেখেন, কেহ বা ইহার নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন। নিন্দা-প্রশংসা যতই হোক না কেন, সহজ ব্যাপারটী হইতেছে এই, রাশিয়ার কার্য্যাবলী সত্যই অভিনব ধরণের। অল্প কয় বৎসরের মধ্যে রাশিয়া-সম্বন্ধে এত অধিক পুস্তক, পুস্তিকা, ও প্রবন্ধ বাহির হইবার কারণ হইতেছে এই যে, রাশিয়াতে নূতন সমাজ ও রাষ্ট্র-সংস্কারের প্রচেষ্টা চলিতেছে। সে প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে কি না এবং ভবিষ্যতে তাহার কি হইবে সে সম্বন্ধে আমরা কোন আলোচনা করিব না। আমরা শুধু রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ মূর্ত্তিকে দেখিয়াই ক্ষান্ত হইব।

গত বৎসর রাশিয়ার "ফাইভ্-ইয়ার-প্ল্যান্" শেষ হইয়াছে। এই পাঁচ বৎসরে রাশিয়া তাহার উন্নতির জন্য কি করিল, অথবা এই পাঁচ বৎসরে রাশিয়াতে কি কি নূতন বিষয় ঘটিয়াছে—তাহাই আলোচ্য। দেশকে শ্রমশিল্পাত্মকভাবে ব্যবস্থাবদ্ধ করাই এই প্ল্যানের উদ্দেশ্য ছিল না, যৌথ মূলধন দ্বারা কৃষিকে সংঘবদ্ধ করিয়া নূতন সংস্কারের সৃষ্টি করাও এই প্ল্যানের উদ্দেশ্য ছিল। এক কথায় সম্পূর্ণরূপে দেশকে আত্মনির্ভরশীল করাই সোভিয়েটদের উদ্দেশ্য। এখন দেখিতে হইবে সোভিয়েটদের এই প্ল্যান অনুযায়ী কতটা কাজ হইয়াছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক্ দিয়া এই প্ল্যানের উদ্দেশ্য অতি সরল ছিল। যদি সত্যই দেশে শ্রমশিল্পের উন্নতি করিতে হয়, তবে দুইটী জিনিসের দরকার। প্রথম হইতেছে দেশে যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিবার জন্য উপযুক্ত কল-কারখানা থাকা চাই। এই কল-কারখানা সৃষ্টি করিতে হইলে উপযুক্ত শিল্পী, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির দরকার। নব্য রাশিয়া সেইদিকে তাহার শিক্ষার্থী পাঠাইল। ছাত্রেরা আমেরিকায় গেল, ইংলণ্ডে গেল, জার্ম্মাণীতে গেল, হল্যাণ্ডে গেল। উৎসাহপ্রাপ্ত জাগ্রত জাতি নূতন এক প্রেরণা লইয়া শিখিতে লাগিল। স্বল্প-কাল মধ্যেই ব্যবহারিক বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ একদল লোক দেশে দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠিল। ইন্দ্রজালের মত একটীর পর একটী করিয়া কারখানা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। নিপ্রোস্ট্রোয়তে দেখা দিল বারিধানী এবং হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক ষ্টেশন; ষ্টালিন্‌গ্রাড ও খারকোভ ট্রাক্টর কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল; রোষ্টভ কৃষি-যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিল। ডনেজ বেসিনে সংশোধিত কয়লার খনির প্রাধান্য দিনের পরদিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, বেরেজ্নিকি কেমিক্যাল দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিল, এই প্রকারে প্রত্যেকটী শহর বিভিন্ন জিনিস নির্ম্মাণের জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিল। আজ

রাশিয়ায় কোন নগরের প্রাধান্য অপর হইতে কিছুমাত্র কম নয়। পাঁচ বর্ষের প্ল্যান অনেক আশাই পূর্ণ করে নাই বটে, কিন্তু রাশিয়াকে কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিয়াছে।

কৃষির দিক্ দিয়াও এই প্ল্যান্ কিছু করিয়াছে। স্থানীয় বিশেষ বিশেষ শস্যের মধ্যে চা, তুলা, চিনি এবং তৌ শাঘি (রবারের মত এক প্রকার জিনিস)—এই কয়টাই প্রধান। এই সব শস্য উৎপাদনের জন্য যে সব স্থান নির্দ্ধারিত ছিল, তাহাদের আয়তন বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। চা এবং তৌ-সাঘির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। রাশিয়ায় উপযুক্ত তুলাও জন্মিতেছে। কেবলমাত্র চিনির কোন উন্নতি হয় নাই। ষ্টেটের ফার্ম্ম ৩০, ০০০,০০০ একর জমির উপর আছে। আয়তন প্রায় ইংলণ্ডের সমান! রাশিয়াতে ষ্টেপ বলিয়া এক এক স্থান আছে। ইহাতে কিছুই জন্মায় না। বৈজ্ঞানিক প্রথায় এখন ঐ সব স্থানেও শস্য উৎপন্ন হইতেছে।

প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করিতে গিয়া যাতায়াতের অসুবিধাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। রাশিয়াতে রেলওয়ে সবচেয়ে কম। দেশের অতি কম স্থানেই রেলওয়ে আছে, এবং যে সব স্থানে আছে সেখানে গাড়ী, ইঞ্জিন, লাইন ও লাইনের বাঁধ অতি আশঙ্কাজনক অবস্থায় ছিল। ইহাদের কোনই উন্নতি হয় নাই। গাড়ী ও ইঞ্জিনগুলি একরূপ অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন ইহাদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। নূতন নূতন রেল লাইন হইয়াছে। উন্নত প্রণালীর গাড়ী ও ইঞ্জিন ব্যবহৃত হইতেছে। তবু দেশে আয়তন হিসাবে রেল ল্যাইনের বিস্তৃতি খুব বেশী নয়। আরও অনেক করিবার রহিয়াছে।

পথ-ঘাটের অবস্থা এখনও খারাপ। মোটর গাড়ী একরূপ নাই বলিলেই হয়। মোটর গাড়ী চলিবার পথও নাই। কেবলমাত্র শহরেই বাঁধান রাস্তা আছে। দেশের অন্যান্য প্রদেশে যে সব রাস্তা আছে, তাহাতে পথ চলাই দুষ্কর। মেরামতের অভাবও পথ-ঘাটের দুরবস্থার অন্যতম কারণ।

কুশলী শ্রমিকের অভাবই রাশিয়ার বড় অভাব। বিদেশ হইতে আনীত শিক্ষকগণের সাহায্যে এবং দেশের লোককে শিক্ষার্থীরূপে বিদেশে প্রেরণ করিয়া বল্‌শেভিকগণ এই সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিল। ইহাতে কিছু সুফলও ফলিয়াছে। কিন্তু তবুও অভিজ্ঞ শ্রমিকের অভাব নিতান্তই অনুভূত হইতেছে। মাত্র এই কারণেই কোন কারখানা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে সমর্থ নয়। শ্রমশিল্পের দুরবস্থাও এই কারণ ঘটিয়াছে। বিদেশী পরিদর্শকগণ রাশিয়া-দর্শনে বলিয়া থাকেন, ইউরোপ বা আমেরিকার একজন শ্রমিক যাহা করিতে পারে,রাশিয়ার তাহা তিনজন শ্রমিক সম্পন্ন করে। যন্ত্রাদি ভাল ভাবে ব্যবহৃত হয় না, এজন্য শীঘ্রই নষ্ট হইয়া ব্যবসা তথা ব্যবসায়ীর ক্ষতি করে। কাজকর্ম্মের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নাই। শ্রমিকগণ সকলেই স্ব স্ব প্রধান। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ-বাদী রাশিয়া জনসংঘের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মনিষ্ঠার প্রচলন করিতে পারে নাই। ইহার ফলে উৎপন্ন বস্তুর সীমা ও সংখ্যা অতি অল্প এবং মূল্যও অতিরিক্ত। অতিরিক্ত মূল্য দিয়া বাজে জিনিস কিনিবার দুর্ব্বুদ্ধি একমাত্র স্বদেশপ্রেমিক ছাড়া আর কাহারও হয় না।

রাশিয়ার জমিও একরূপ চাষের অযোগ্য। কতক কতক জায়গা বারমাসই কাদায় ভরা থাকে। ট্রাক্টর ইহার উপর চলিতে পারে না। আবার যে সব জায়গা ষ্টেপ, সেখানে চাষের শত সুবিধা হইলেও ভাল শস্য জন্মিতে পারে না।

কৃষি ও শ্রমশিল্পের এই দুরবস্থার বিষয় যে কোন ভ্রমণকারী অতি সহজেই ধরিতে পারেন। জিনিসটী এতই স্পষ্টরূপে দেখা দেয় যে ইহা লক্ষ্য না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

খাদ্যদ্রব্য ও দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র অতি দুর্ম্মূল্য। শুধু দুর্ম্মূল্য নহে, সচরাচর পাওয়াও যায় না। যাহা খাইয়া সাধারণ লোকজন জীবনধারণ করে, সেই মূল্যে ইউরোপের অন্যান্য দেশে বড়লোকদের খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়।

রাশিয়ার এই দুরবস্থা ঘুচিতে পারে যদি প্রলিটারিয়েট-দের হাত হইতে শাসনক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হয়; কারণ স্বৈরতা ও প্রলিটারিয়েট-শাসন একই কথা। সাধারণ জিনিস-পত্রের মহার্ঘতা ও দুষ্প্রাপ্যতা সমস্ত কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

ইহাতে তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়াছে। চাষ বাসের অসুবিধা

এবং জমির বে-বন্দোবস্ত অবস্থায় তাহারা দিনের পর দিন অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে। ইহাতে তাহারা ক্রুদ্ধও হইতেছে।

শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিতেছে, রাশিয়ার এই বিপ্লবে নূতন কিছুই নাই। ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে নাই। ভূমিকে কেন্দ্র করিয়া যে বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহা ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট রোমের অ্যাণ্টোলাইন-যুগের পরবর্ত্তী শাসনতন্ত্রেরই অনুরূপ। "রেড্ আর্ম্মি" "প্রিটোরিয়ান্ গার্ডের"ই ছায়াবলম্বনে গঠিত। সুতরাং রাশিয়ার বিপ্লবে নূতনত্ব কোথায়? এই ধূয়া তুলিয়া দেশে একদল লোক হৈ হৈ করিতেছে।

রাশিয়ার সম্মুখে এখন দুইটী পথ খোলা রহিয়াছে। প্রথম এই শাসনতন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন কিংবা এই শাসনতন্ত্রেরই অনুসরণ। শাসনতন্ত্র বদলাইলে পৃথিবীর লোক বলিবে—"দেখ 'বলশেভিজম্' টিকিল না।" এই ভাবী টিটকারীর ভয়ে রাশিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কিন্তু বসিয়াও থাকিতে পারিতেছে না; কারণ এ শাসনতন্ত্রের পতন অবশ্যম্ভাবী!

শ্রমশিল্পে রাশিয়া তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে কিন্তু দেশবাসী শ্রমশিল্প সম্বন্ধে অতি অল্পই জানে যদি দেশকে সত্যই উন্নতির পথে অগ্রসর করা সোভিয়ে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে, তবে দেশবাসীকে শিল্পবিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দান করাই তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য। উপযুক্ত শিক্ষা দেশবাসী পায় নাই বলিয়া তাহাদের শিল্পবাণিজ্যের আজ এতই না দুরবস্থা। উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে কেহই উন্নতি করিতে পারে না।

বলশেভিকদের এখন সর্ব্বাগ্রে দুইটী কথা স্মরণ রাখা দরকার। সমাজ বা রাষ্ট্রের উন্নতি করিতে হইলে জনসাধারণের মনে দুইটী ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে প্রথম হইতেছে, নিরুপদ্রব শান্তি; দ্বিতীয়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যখনই কোন রাশিয়ান্ মনে করিবে 'আমি নির্ব্বিঘ্ন অবস্থা বাস করিতেছি এবং আমার ব্যক্তিগত কাজে হাত দেওয়া কেহ নাই, তখনই দেশের প্রকৃত উন্নতি ঘটিবে। প্রকৃত শান্তিও ঐ সময় হইতে আরম্ভ হইবে। ইহার পূর্বে নহে।

আলাপ-আলোচনা

তুর্কী ভাষার পুনর্গঠনে কামালপাশা

কামালপাশা দেশের রাজনীতিরই কেবল উন্নতিসাধনে ব্যস্ত ন'ন—দেশের ভাষাও তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি তুর্কী ভাষার পুনর্গঠনকল্পে পরামর্শ-সভা করিয়াছিলেন। তাহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, জনসাধারণের ব্যবহৃত মৌখিক ভাষার যে সকল শব্দ লিখিত ভাষার অন্তর্গত হয় নাই, সেই সব শব্দ সঙ্কলিত হইবে। দেশের ভাষাকে বড় না করিলে দেশকে যথার্থ বড় করা যায় না, মুস্তাফা কামালপাশার এই উপলব্ধি তাঁর দেশসেবাব্রতের অন্যতম পরিচয়।

প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের প্রতি

৮ই পৌষ প্রাতঃকালে আশ্রমিক সঙ্ঘের অধিবেশনা কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহার অনেকটা অং উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই ই অনুধাবনযোগ্য:—

"এখানকার ছাত্ররা উপাধি নিয়ে চ'লে যাবে, পরী পাশের মন্ত্রে মার্কামারা হয়ে বেরোবে, এর জন্য এখা আমি আমার শক্তি নিয়োগ করি নি। আমি তো যান্ত্রি নই, হাইড্রলিক প্রেসের চাপে যেমন কারখানার মাল তৈ হয়, তেমনি দাগা দেবার যন্ত্র এখানে পাকা হ'য়ে থাক

এ আমার সঙ্কল্প নয়। যাতে প্রাণের ধর্ম্ম নেই, তেমন বিদ্যায়তনে আমার উৎসাহ নেই। আমি ছাত্র-সংখ্যার বৃদ্ধির দাবী রাখিনে, যদি হৃদয়ের প্রেমের সূত্রে ভক্তি ও প্রীতির দ্বারা এই আশ্রম দূরে দূরে ভারতের সকল মানুষকে বাঁধতে পারে, যদি এই আশ্রমে বিশ্বপ্রাণের রূপটি ব্যক্ত হয় তবেই যথার্থ সফলতা লাভ হবে।

* * *

আশ্রমের সেই প্রাণের রূপের পরিচয়সাধনের ভার তোমাদের উপর রয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এখানে এমন একটী কেন্দ্র হোক যেখানে সর্ব্বভারতের সঙ্গে প্রাণের যোগসূত্র গ্রথিত হ'বে, যেখানে মানব-হৃদয়ের একটী মিলন-ক্ষেত্র হ'বে। তোমরা প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা এখানে ফিরে ফিরে এসে এই প্রতিষ্ঠানের মূলগত সেই একান্ত অকৃত্রিম প্রীতিকে ব্যক্ত করেছ। যদি এই আশ্রমের সঙ্গে ছাত্রদের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ প্রবল হয়, সত্য হয়, তাহাই এখনকার ভাবটি দেশে দেশে বিস্তীর্ণ হ'বে এবং আমার জীবনব্যাপী চেষ্টা ও ত্যাগের সার্থকতা হ'বে।

* * *

তোমরা কখনো মনে করোনা যে পরীক্ষায় বেশী মার্কা পেলে বা কর্ম্মজীবনে বেশী খ্যাতি লাভ করলে এর দ্বারা আশ্রমকে যথার্থ বিচার করব। তোমরা জানো, এই অনুষ্ঠানকে অনেক নিন্দা ও বিরুদ্ধতা সহ্য করতে হয়েছে। কারণ বাঙালীর ধর্ম্মই নিন্দাবাদ করা, দেশবাসীর স্বভাব সর্ব্বকর্ম্মে অহেতুকী প্রতিকূলতা করা, চিত্তদৈন্যবশতঃ তারা সকলে প্রচেষ্টাকে ছোট করিতে চায়। তোমাদের এই প্রীতি ও নিষ্ঠায় সহযোগিতাতেই একে বাঁচাবে। তোমরা সকলে সংসার ক্ষেত্রে সম্মান পেতে পারো কিন্তু আশ্রমের প্রতি তোমাদের এই প্রীতি এখানকার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা থাকবে এর ইতিবৃত্তে তোমরা বড় স্থান নেবে।

* * *

ভারতের এই একটি কেন্দ্রে বিদ্যা ও প্রাণের সঙ্গে গভীর যোগসাধনের চেষ্টা হ'য়েছে, আমি আশ্রমের ভিতরকার এই লক্ষ্যটি কখনো ক্ষুণ্ণ হ'তে দিইনি। ৩০ বছরের ঊর্দ্ধ-কাল যে দুঃখ দিয়ে এর আদর্শকে বহন ক'রেছি তার ইতিহাস কোথাও লিপিবদ্ধ থাকবে না, তা তোমরা কেউ জানবে না, অল্প লোকের সঙ্গেই তার পরিচয় আছে। আমার এই দীর্ঘ জীবনের প্রয়াস সার্থক হবে, যদি তোমরা এর অন্তর্নিহিত সত্যটীকে উপলব্ধি করো, শুধু বিধি-বিধানের মধ্য দিয়ে নয়, কিন্তু তোমরা জীবনের যে ছাপ এখান থেকে পেলে তার চিহ্ন দিয়ে তোমাদের শুদ্ধ প্রীতি নিষ্ঠা ও ত্যাগের দ্বারা একে রক্ষা করতে হবে। অন্য বিদ্যালয় শুধু মাইনের দাবী রাখে, এই আশ্রম এখানকার ছাত্রদের কাছে ত্যাগের দাবী করে। তোমাদের সেই কল্যাণ-কামনা ও ত্যাগের দ্বারা এর সত্যটিকে পরিস্ফুট করতে হবে। দূরে নিকটে যে অবস্থায় থাকো মনে রেখো, তোমাদের আত্মদাদের উপর আশ্রমের আদর্শ নির্ভর করছে।

* * *

আমি নিজের জীবনের যা দিয়েছি তার প্রতিদান চাইনি। এই আশ্রমে যে দুর্লক্ষ্য সত্য কাজ করছে— এখানকার পাঠ ও শিক্ষাপ্রণালীর ঊর্দ্ধে যে সত্তা আছে— তোমরা প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা তা গ্রহণের দ্বারা এই আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হও, তোমরা আশ্রমকে এই প্রতিদান করো। (বিশ্বভারতী পৌষ উৎসব সংখ্যাঃ—শ্রীপ্রদ্যোত কুমার সেনগুপ্ত-কর্ত্তৃক অনুলিখিত।)

* * *

গভীর দুঃখের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি—"বাঙালীর ধর্ম্মই নিন্দাবাদ করা, দেশবাসীর স্বভাব সর্ব্বকর্ম্মে অহেতুকী প্রতিকূলতা করা"—ইত্যাদিই কি কবীন্দ্রের মর্ম্মের কথা? এ কথা শুনিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। সেকালে খৃষ্টান পাদ্রীদের মুখে হিন্দু ধর্ম্ম ও বাঙালীর নিন্দা এভাবে শুনিয়াছি, কিন্তু জাতীয় কবির মুখে, যিনি বাঙালী ছাত্রদের চিত্তদৈন্য দূর করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁর প্রাণের কথা, না অনুলেখকের ভ্রমবশতঃ এইরূপ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অভিমান যে অত্যন্ত বেশী তার পরিচয় আমরা বহুবার পাইয়াছি, কিন্তু বলিতে পারি না তাঁহার অভিমানের মাত্রা এতদূর কিসে বর্দ্ধিত হইল।

* * *

বিশ্বভারতীর গোড়ার কথা

বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদসভায় আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ৯ই পৌষ যে অভিভাষণ দিয়াছেন ও যাহা "বিশ্বভারতী

নিউজে" প্রকাশিত হইয়াছে,তাহা হইতে বিশ্বভারতীর জন্মের কাহিনীটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না :—

"আমার মধ্য বয়সে আমি এই শান্তি-নিকেতনে বালকদের নিয়ে এক বিদ্যালয় স্থাপন করতে ইচ্ছা করি। মনে তখন আশঙ্কা ও উদ্বেগ ছিল কারণ কর্ম্মে অভিজ্ঞতা ছিলনা। জীবনের অভ্যাস ও তদুপযোগী শিক্ষার অভাব, অধ্যাপনা কর্ম্মে নিপুণতার অভাব সত্ত্বেও আমার সঙ্কল্প দৃঢ় হ'য়ে উঠল। কারণ চিন্তা করে দেখলেম যে আমাদের দেশে এক সময়ে যে শিক্ষাদান প্রথা বর্ত্তমান ছিল, তার পুনঃ প্রবর্ত্তন বিশেষ প্রয়োজন। সেই প্রথাই যে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এমন অন্ধ পক্ষপাত আমার মনে ছিল না, কিন্তু এই কথা আমার মনকে অধিকার করে যে, মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসংসার এই দুইয়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেচে, অতএব এই দুইকে একত্র সমাবেশ করে বালকদের শিক্ষায়তন গড়লে তবেই শিক্ষার পূর্ণতা ও মানবজীবনের সমগ্রতা হয়। বিশ্বপ্রকৃতির যে আহ্বান, তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে জোর করে শিক্ষার আয়োজন করলে শুধু শিক্ষাবস্তুকেই জমানো হয়, যে-মন তাকে গ্রহণ করবে তার অবস্থা হয় ভারবাহী জন্তুর মতো। শিক্ষার উদ্দেশ্য তাতেই ব্যর্থ হয়।

* * *

* * শিক্ষার আদর্শকেই আমরা ভুলে গেছি। শিক্ষা তো শুধু সংবাদ বিতরণ নয়, মানুষ সংবাদ বহন করতে জন্মায় নি, জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে তাকেই গ্রহণ করা চাই। মানবজীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্ম্মে পূর্ণ ক'রে উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আমার মনে হয়েছিল জীবনের কী লক্ষ্য—এই প্রশ্নের মীমাংসা যেন শিক্ষার মধ্যে পেতে পারি। আমাদের দেশেও পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীতে তার আভাস পাওয়া যায়। তপোবনের নিভৃত তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে যে শিক্ষা-সাধনা আছে তাকে আশ্রয় করে শিক্ষকও ছাত্র জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। শুধু পরা-বিদ্যায় নয়, শিক্ষাকল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্তছন্দজ্যোতিষ প্রভৃতি অপরা বিদ্যার অনুশীলনেও যেমন প্রাচীনকালে গুরু-শিষ্য একই সাধন-ক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিলেন, তেমনি সহযোগিতায় সাধনা যদি এখানে হয় তবেই শিক্ষার পূর্ণতা হবে।

* * *

বর্ত্তমানে সেই সাধনা আমরা কতদূর গ্রহণ করিতে পারি তা বলা কঠিন। আজ আমাদের চিত্তবিক্ষোপের অভাব নেই। কিন্তু এই যে প্রাচীনকালের শিক্ষা-সমবায়, এ কোনো বিশেষ কাল ও সম্প্রদায়ের অভিমত নয়। মানব-চিত্তবৃত্তির মূলে সেই এক কথা আছে, মানুষ বিচ্ছিন্ন প্রাণী নয়, সব মানুষের সঙ্গে যোগে সে যুক্ত, তাতেই তার জীবনের পূর্ণতা, মানুষের এই ধর্ম্ম। তাই যে দেশেই যে কালেই মানুষ যে বিদ্যা ও কর্ম্ম উৎপন্ন করবে সে সব-কিছুতে সর্ব্ব-মানবের অধিকার আছে। বিদ্যায় কোনো জাতিবর্ণের ভেদ নেই। মানুষ সর্ব্বমানবের সৃষ্ট ও উদ্ভূত সম্পদের অধিকারী, তার জীবনের মূলে এই সত্য আছে। মানুষ জন্মগ্রহণ-সূত্রে যে শিক্ষার মধ্যে এসেচে তা এক জাতির দান নয়। কালে কালে নিখিল মানবের কর্ম্মশিক্ষার ধারা প্রবাহিত হয়ে একই চিত্তসমুদ্রে মিলিত হয়েচে,সেই চিত্তসাগর-তীরে মানুষ জন্মলাভ করে, তারই আহ্বানমন্ত্র দিকে দিকে ঘোষিত।

* * *

সর্ব্ব মানবের ত্যাগের ক্ষেত্রে আমরা জন্মেচি। ... এই কথা উপলব্ধি করতে হবে। তবেই আনুষঙ্গিক শিক্ষাকে আমরা পূর্ণতা ও সর্ব্বাঙ্গীনতা দান করতে পারব।

আমার তাই সংকল্প ছিল যে, চিত্তকে বিশেষ জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ না করে শিক্ষার ব্যবস্থা করব। দেশের কঠিন বাধা ও অন্ধ সংস্কার সত্ত্বেও এখানে সর্ব্বদেশের মানব-চিত্তের সহযোগিতায় সর্ব্বকর্ম্মযোগে শিক্ষাসত্র স্থাপন করব। শুধু ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য পাঠে নয়, কিন্তু সর্ব্বশিক্ষার মিলনের দ্বারা এই সত্য-সাধনা করব। এ অত্যন্ত কঠিন সাধনা, কারণ চারিদিকে দেশে এর প্রতিকূলতা আছে। দেশবাসীর যে আত্মাভিমান ও জাতি-অভিমানের সঙ্কীর্ণতা তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে।

* * *

প্রথম যখন অল্প বালক নিয়ে এখানে শিক্ষায়তন খুলি তখনও ফললাভের প্রতি প্রলোভন ছিল না তখন সহায়ক

হিসাবে কয়েকজন কর্ম্মীকে পাই, যেমন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কবি সতীশচন্দ্র, জগদানন্দ—এঁরা তখন একটী ভাবের ঐক্যে মিলিত ছিলেন। তখনকার হাওয়া ছিল অন্যরূপ। কেবল মাত্র বিধিনিষেধের জালে জড়িত হয়ে থাকতেম না, অল্প ছাত্র নিয়ে তাদের সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠযোগে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন সত্য হয়ে উঠত। তাদের সেবার মধ্যে আমরা একটী গভীর আনন্দ, একটী চরম সার্থকতা উপলব্ধি করতেম। ... তখন বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কিত ছিল না, তার থেকে নির্লিপ্ত ছিল। তখনকার ছাত্রদের মনে এই অনুষ্ঠানের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠা লক্ষ্য করেছি!

* * *

এইভাবে বিদ্যালয় অনেকদিন চলেছিল—এর অনেক পরে এর পরিধির বিস্তার হয়। সৌভাগ্যক্রমে তখন স্বদেশবাসীর সহায়তা পাইনি, তাদের অহৈতুকী বিরুদ্ধতা ও অকারণ বিদ্বেষ একে আঘাত করেছে কিন্তু তার প্রতি দৃষ্টিপাত করি নি, এবং এই যে কাজ সুরু করলেম তার প্রচারেরও চেষ্টা করি নি। মনে আছে আমার বন্ধুবর মোহিত সেন এই বিদ্যালয়ের বিবরণ পেয়ে আকৃষ্ট হন, আমাদের আদর্শ তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি বলেন, "আমি কিছু করতে পারলেম না, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী আমার জীবিকা—এখানে এসে কাজ করতে পারলে ধন্য হতাম। তা হোলো না। এবার পরীক্ষায় কিছু অর্জ্জন করেছি তার থেকে কিছু দেব এই ইচ্ছা।" এই বলে তিনি এক হাজার টাকার একটী নোট আমাকে দেন—বোধহয় আমার প্রদেশবাসীর এই প্রথম ও শেষ সহানুভূতি। এই সঙ্গেই উল্লেখ করতে হবে আমার প্রীতিপরায়ণ ত্রিপুরাধিপতির আনুকূল্য, আজও তার বংশে তা প্রবাহিত হয়ে আসচে।"

* * *

—এই অল্প অধ্যাপক ও ছাত্র নিয়ে আমি বহুকষ্টে আর্থিক দুরবস্থা ও দুর্গতির চরমসীমায় উপস্থিত হ'য়ে যে ভাবে এই বিদ্যালয় চালিয়েছি তার ইতিহাস রচিত হয় নি। কঠিন চেষ্টার দ্বারা ঋণ করে প্রতিদিনের প্রয়োজন জোগাতে সর্ব্বদাব্যস্ত হয়ে দিন কাটিয়েছি কিন্তু পরিতাপ ছিল না। কারণ গভীর সত্য ছিল এই দৈন্যদশার অন্তরালে। যাক্ এ আলোচনা বৃথা।

* * *

এই নির্ম্মম বিরুদ্ধতার উপকারিতা আছে। যেমন জমির অনুর্ব্বরতা কঠিন প্রযত্নের দ্বারা দূর করে তবে ফসল ফলাতে হয়, তবেই তার উৎপাদনী শক্তি হয়, তার রস সঞ্চার হয়, দুঃখের বিষয় বাংলার চিত্তক্ষেত্র অনুর্ব্বর, কোনো প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী করবার পক্ষে তা অনুকূল নয়। বিনা কারণে বিদ্বেষের দ্বারা পীড়া দেয় যে দুর্ব্বুদ্ধি, তা গড়া জিনিষকে ভাঙে, সঙ্কল্পকে আঘাত করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে কিছুকে গ্রহণ করে না। এখানকার এই যে প্রচেষ্টা রক্ষিত হয়েচে, তা কঠিনতাকে প্রতিহত করেই বেঁচেচে। অর্থবর্ষণের প্রশ্রয় পেলে হয় তো এর আত্মসত্য রক্ষা করা দুরূহ হত, অনেক জিনিস আসত খ্যাতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে যা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই এই অখ্যাতির মধ্য দিয়ে এই বিদ্যালয় বেঁচে উঠেছে।"

* * *

ইহার পরে যাহা আছে, তাহা বিদ্যালয়ের পরিধির বিস্তৃতির কথা। ইতিহাসের দিক্ থেকে আমরা গোড়ার কথাটাই স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এখানে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আত্মাভিমান অন্ততঃ দুইবার ফুলিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, অনুলেখ প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় তুলিয়াছেন "সৌভাগ্যক্রমে তখন স্বদেশবাসীর সহায়তা পাই নি।" দুএক ছত্র পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় এ সাহায্য—অর্থসাহায্য। সে কথা বাহিরের লোকে কি করিয়া জানিবে; আর শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মোহিত সেন মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত এক হাজার টাকা "বোধহয়" কবীন্দ্রের "প্রদেশবাসীর এই প্রথম ও শেষ সহানুভূতি।" পরছত্রেই ত্রিপুরাধিপতির আনুকূল্যের কথা উল্লেখ আছে। ত্রিপুরা কি কবীন্দ্রের প্রদেশের বাহিরে! বাঙ্গালীর নিকট সহায়তা না পাইয়া তিনি যে এতবড় একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে সত্য কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দেশবাসীর 'অহৈতুক বিরুদ্ধতা ও অকারণ বিদ্বেষে'র নিদর্শন অন্ততঃ আকার-ইঙ্গিতেও দু' একটার উল্লেখ করিলে তো

আমরা পাইয়া ধন্য হইতাম। বাঙ্গালী জাতি যে এত হেয় তা উপলব্ধি করিতে পারিতাম—অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ তাহা করিয়া দিবার সহায়তা করিতে পারিতেন। তাঁর ফাঁকা কথায় কি ঐতিহাসিকের মন লইয়া কোন লোক বিশ্বাস করিতে পারে? পারা উচিত। দেশের লোকের নিকট হইতে ভাল কাজের জন্য রবীন্দ্রনাথ যদি টাকা আদায় না করিতে পারেন তাহা হইলে বলিব রবীন্দ্রনাথের ইহা অক্ষমতারই পরিচায়ক—হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ পণ্ডিতবর মালব্যজী ভারতের নিকট হইতে কোটী কোটী টাকা তুলিয়া হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে জগতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন। আর অন্ততঃ ত্রিশ বৎসরের ভিতর বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে বাঙ্গালী-কর্তৃক 'অহৈতুক বিরুদ্ধতা ও অকারণ বিদ্বেষে'র লিখিত বিবরণ কোথায় পড়িয়াছি বলিয়া তো মনে হয় না।

* * *

দ্বিতীয় কথা, রবীন্দ্রনাথ ঋণ করিয়া বিদ্যালয়কে চালাইয়াছিলেন, মহর্ষির মৃত্যুর পূর্ব্বে না পরে? তাঁহার পিতৃদেবের মৃত্যুর পরে তিনি বঙ্গের প্রবলপ্রতাপান্বিত একজন প্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী। এ কথা কি বিশ্বাস করিতে পারা যায় যে, তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি ঋণ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে হইলে সে কথা সম্ভবপর। যাক্, একটা ভাল কাজ করিয়া—একটা বড় অনুষ্ঠানকে যে তিনি জীবিত রাখিতে পারিয়াছেন ইহাতেও কি কবীন্দ্রের আত্মতৃপ্তি নাই, বাঙ্গালাদেশের শুধু বাঙ্গালাদেশরই বা বলি কেন, জগতের বড় লোকের ছেলেরা তাহাদের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য কত টাকা অপব্যয় করিয়া থাকে, তিনি তো তা করেন নাই। অবশ্য এরূপে সর্ব্বঃস্বান্ত হইয়াও তাঁহার পরিতাপ ছিল না—কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি তাঁর তখন আত্মতৃপ্তিও ছিল না; না হইলে বৃথা আলোচনার উল্লেখ দেখিতেও আমাদিগকে অপ্রিয় কথার অবতারণা করিতে হইত না।

* * *

ব্রহ্মদেশকে আর ভারত হইতে বিচ্যুত করা উচিত নয়

আমরা রাজনৈতিক নহি, সুতরাং সে বিষয়ে আলোচনাও কোনদিন করি না। সুতরাং সে দিক দিয়া নয়, অনেক দিক দিয়া বলিতেছি যে, ব্রহ্মদেশকে আজ আর ভারতের সঙ্গে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা চলে না। ব্রহ্মদেশের লোকও যে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না, তাহার প্রমাণ, ব্রহ্মদেশ গত নির্ব্বাচনে বিচ্ছেদের সমর্থনকারী দলকে পরাভূত করিয়া দিয়াছে। ব্রহ্মদেশের আইন-সভাও ব্রহ্মদেশের ভারত-চ্যুতির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে। আমাদের আশা হইতেছে যে ব্রহ্মের তরফ হইতে এ বিষয়ে উপরোক্ত ঘটনাগুলির দ্বারা যে মত বিঘোষিত হইয়াছে, ভারতের কর্ত্তৃপক্ষরা তাহা মানিয়া লইবেন।

* * *

কৃত্তিবাস স্মৃতি-উৎসব

কৃত্তিবাস যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা কেহ কখনও ভুলিবে না—চিরদিনই বাঙ্গালী তাঁহাকে মনের মন্দিরে রাখিয়া সযত্নে পূজা করিয়া থাকেন। তথাপি যে আমরা তাঁহার স্মৃতি উৎসব করি তাহা এইটুকু প্রমাণ করিবার জন্য যে আমরা নরাধম ও অকৃতজ্ঞ নহি। আগামী ৩০ শে মাঘ ফুলিয়া গ্রামে কৃত্তিবাস স্মৃতি-উৎসব হইয়া গিয়াছে। শান্তিপুর পুরাণ-পরিষদ এই উৎসবের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। এজন্য আমরা এই পরিষদের নিকট ঋণী।

* * *

ভুমিকা

(গল্প)

শ্রীবীরেন্দ্রলাল ধর বি-এ

ডাক্তারবাবুকে প্রায় প্রতিরাত্রেই 'কলে' বাহির হইতে হয়, সে রাত্রেও তখন একটা কলে তিনি যাইতেছিলেন। সোফারকে রাত্রে ডাকাডাকি করিয়া তুলিতে অনেক হাঙ্গামা পোহাইতে হয়, তাই একটু বেশী রাত্রে রুগী দেখিতে বাহির হইলে তিনি নিজেই গাড়ী চালান, ছোট গাড়ি চালাইতেও কোন বেগ পাইতে হয় না।

মোটর ছুটিয়া চলিয়াছে। রাত্রি খুব বেশী না হইলেও বালিগঞ্জের রাস্তা নিথর নিঝুম। একটু আগেই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টিস্নাত কালো পিচ্ঢালা রাজপথের উপর ইলেক্ট্রিকের আলো পিছলাইয়া পড়িতেছে। তাহার বুক দিয়া পথের জল ছিটাইয়া মোটরের চাকা ছল্ ছল্ করিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে। আকাশটা এখন বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, দপ্ দপ্ করিয়া তারাগুলি মাথার উপর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

আরও অনেকটা পথ গেলে তবে ডাক্তারবাবু রুগীর বাড়িতে গিয়া পৌঁছাইবেন। ষ্টেয়ারিংয়ের উপর হাত রাখিয়া ডাক্তারবাবুর মনে জাগে কয়েকখানি বাংলা উপন্যাসের নায়কের কথা। তাহারাও তো বালিগঞ্জের নির্জ্জন পল্লী দিয়া মোটর চালাইতেছিল, সহসা কোথা হইতে একটী বিপন্না মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "আমায় বাঁচান্—রক্ষা করুন।" নায়ক তাহাকে বাঁচাইল, মোটর থামাইয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া আসিল। তারপর রোম্যান্স জমিয়া উঠিল। কিন্তু কই তাহার ভাগ্যে তো এরূপ একবারও ঘটিল না। কতরাত্রেই তো এই বালিগঞ্জের পথ দিয়া একা একা সে মোটর হাঁকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিপন্না তরুণী তো কোনদিন ছুটিয়া আসে নাই। উহা শুধু উপন্যাসেই দেখা যায়, সত্য ভিত্তিহীন!

ডানদিকের ওই পথটী দিয়া গেলে রুগীর বাড়ী একটু শীঘ্র যাওয়া যাইবে বলিয়া সুইচ্ ঘুরাইয়া হেড লাইট্ জালিয়া ডাক্তারবাবু গাড়ি ঘুরাইলেন। গাড়ি ঘুরিতেই হেড লাইটের আলোয় দেখা গেল নির্জ্জন পথ দিয়া একটী সুবেশা তরুণী তাড়াতাড়ি করিয়া এদিকে আসিতেছে। তরুণীকে দেখিয়া ডাক্তারবাবুর মনে চকিতের জন্য উকি মারিল একটু আগের সেই চিন্তাটী—এই তরুণীটাই হয় তো এখনি তাহাকে মোটর থামাইতে মিনতি করিবে, কে জানে?

হইলও তাহাই। মোটরখানি কাছে আসিতেই তরুণী হাত দেখাইয়া মোটর থামাইতে বলিল। ওই ইঙ্গিতটুকুর অপেক্ষায় ডাক্তারবাবু যেন তৈরী হইয়াই ছিলেন, ব্রেক্ কষিতে তাহার এক সেকেণ্ডও দেরী হইল না—মোটর থামিল। ডাক্তারবাবু ইতিমধ্যে মেয়েটীকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন—বিশেষ সুরূপা না হইলেও একেবারে খারাপ দেখিতে নয়। তরুণী একটু কাছে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—বড় বিপদে পড়ে গেছি, যদি আপনি দয়া করে বাসের ষ্ট্রাণ্ডটা পর্য্যন্ত পৌঁছে দেন একটু ক্ষতিস্বীকার করে—

না, না, ক্ষতি আর কি, ভিতরে উঠে আসুন, বলিয়া বাঁ হাত দিয়া পাশের দরজা ডাক্তারবাবু খুলিয়া দিলেন। লোকটীর পাশে গিয়া বসিতে হইবে কেন পিছনে তো কেহ নাই! তরুণী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ডাক্তারবাবুর মুখের পানে একবার তাকাইল, তারপর চাহিল মোটরের পিছনকার সীটের পানে। একটী ডাক্তারী ব্যাগ্ ও একটী ওষুধের বাক্স পিছনের সীটের সবটুকু স্থান দখল করিয়া আছে বসিতে হইলে লোকটীর পাশেই বসিতে হইবে। এই সব ভাবিয়া তরুণী একটু ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন—আমায় ভয় করার মত কিছু নেই, ভিতরে উঠে এসে বসুন। পিছনে যায়গা হবে না ওষুধের বাক্সগুলো রয়েছে, জরুরী 'কেস্' আমি আর বেশী দেরী করতে পারছি না উঠে আসুন—

মেয়েটী এবার মোটরের ভিতরে উঠিয়া আসিল, বসিতে

বসিতে বলিল—ওগুলো ওষুধের বাক্স—আপনি ডাক্তার বুঝি ?

হুঁ বলিয়া বুকের পকেট হইতে একখানি নামের 'কার্ড' বাহির করিয়া তরুণীর দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—এই দেখুন—

কার্ডখানি হাতে লইয়া মোটরের অস্পষ্ট আলোতেই তরুণী পড়িয়া ফেলিল কার্ডের উপরে লেখা নামটা—'ডক্টর এস, দত্ত এম-এস্ সি, এম্-ডি।'

মোটর তখন আবার চলিতে সুরু করিয়াছে।

দুজনেই চুপচাপ। মিনিটখানেক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ডাক্তারের মনে হইল যেন ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গিয়াছে, মেয়েটীর সঙ্গে একটু আলাপ জমাইয়া তুলিবার চেষ্টায় তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল ; কিন্তু কোন দিক দিয়া কথা সুরু করিবে তাহাই হইল সমস্যা। সহসা ডাক্তারবাবুর মাথায় একটা বুদ্ধি জোগাইল, হাতঘড়ির পানে একবার তাকাইয়া লইয়া তিনি যেমন যাইতেছিলেন, সেইদিকেই মোটর ছুটাইয়া দিলেন।

মেয়েটী পথ চিনিত, মোটর ফিরিয়া বাসের ষ্টাণ্ডের দিকে না গিয়া যে পথে যাইতেছিল সেই পথেই চলিয়াছে দেখিয়া তরুণী সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল—বাসের ষ্ট্যাণ্ড তো ওদিকে নয়—

বাসের ষ্ট্যাণ্ডের দিকে তো আমি এখন যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি রুগীর বাসায়, রুগী দেখে ফেরার পথে আপনাকে বাড়ী পর্য্যন্তই না হয় পৌছে দিয়ে আসব—

না না, তার দরকার নেই, আপনি না হয় আমায় এখানেই নামিয়ে দিন, আমি হেঁটেই যাই পথে যদি কোন গাড়ি পাই তো উঠে পড়ব।

হেঁটে গেলে ঘণ্টাখানেকেও এপথে গাড়ী-ঘোড়া পাবেন না, আর রাত তো বড় কম নয় প্রায় সাড়ে বারোটা হ'ল, এত রাত্রে আপনি একলা এখানে এসেছিলেন কেন ?

সে অনেক কথা বলিয়া তরুণী চুপ করিল। কটাক্ষে তাহার মুখের পানে ডাক্তারবাবু একবার তাকাইলেন, তাহার মুখে মানসিক চাঞ্চল্যের ছায়া সুস্পষ্ট।

আবার মিনিটখানে চুপচাপ।

সহসা স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মেয়েটীই প্রথমে কথা বলিল—আপনার রুগীর বাড়ী আর কতদূর ?

এই এসে পড়েছি, আর মিনিট দু'তিন।

আবার মৌনতা।

মোটর ছুটিয়া চলিয়াছে আগের মতই। ডাক্তারবাবু আর একবার তরুণীর মুখের পানে কটাক্ষে তাকাইলেন বাহিরের পানে উদাস দৃষ্টিতে সে তাকাইয়া আছে, দেখিলে মমতা জাগে। হয় তো কোন প্রিয়জনের কাছ হইতে কোন রূঢ় আঘাত পাইয়াছে, তাহারই ব্যথায় চিত্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টি উদাস হইয়া উঠিয়াছে।

থামুন্—থামুন্—

চঞ্চল স্বরে কথা কয়টী বলিয়া তরুণী সহসা বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পিছনের পানে তাকাইল।

ডাক্তার ত্রস্তে ব্রেক কষিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হ'ল ?

আমার হাতের সোনার হাতঘড়িটা খুলে পড়ে গেল, কি করি বলুন তো ?

তার জন্ত কি, এখনি মোটর ঘুরিয়ে নিচ্ছি—কোথায় পড়েছে দেখেছেন তো ?

হ্যাঁ, ও-ই যে ওখানে—বলিয়া তরুণী পিছন দিকের রাজপথে খানিকটা দূরে আঙুল দেখাইয়া দিল।

ডাক্তারবাবু মোটর ঘুরাইয়া সেদিকে অগ্রসর হইলেন। বলিলেন—বলবেন কোথায় পড়েছে—তরুণী ঘাড় নাড়িল, উৎসুক দৃষ্টিতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সামনের রাজপথের পানে তাকাইল। মোটর ধীরে ধীরে খানিকটা চলিয়া আসিবার পর, আগের মতই চঞ্চল স্বরে সে বলিয়া উঠিল—ও—ই—ই !

মোটর থামিল। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কই ? কোথায় বলুন ?

ওই যে পিছনে ফেলে এলুম—ওই—যে—বলিয়া তরুণী আঙুল দেখাইয়া পিছন দিকের পথের উপর একটী চকচকে পীতাভ জিনিস দেখাইয়া দিল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন—আচ্ছা আমি মোটর ঘুরিয়ে নিচ্ছি।

তার চেয়ে আপনি একটু দাঁড়ান আমি কুড়িয়ে আনি, বলিয়া তরুণী মোটরের দরজা খুলিয়া ফেলিল।

সে নামিয়া যায় দেখিয়া ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি নিজেই নামিয়া পড়িলেন। তিনি মোটরের মধ্যে বসিয়া থাকিবেন আর একটী তরুণী মেয়ে মোটর হইতে নামিয়া গিয়া এতটা কষ্ট স্বীকার করিবে ইহা তিনি সহ্য করেন কেমন করিয়া, শিক্ষিত যুবক হইয়া একজন মহিলার মর্য্যাদা রাখিতে পারিবেন না? ডাক্তারবাবু ঘুরিয়া তরুণীর সামনে আসিয়া বলিলেন,—আপনি বসুন, আমিই কুড়িয়ে আনছি—

তরুণীর আর নামা হইল না, চকিতের জন্য তাহার মুখে হাসির আভাস খেলিয়া গেল। ডাক্তারবাবু নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া সেই পীতাভ ঝকঝকে জিনিসটীকে কুড়াইয়া আনিতে গেলেন।

ডাক্তারবাবু হাত-ঘরিটীর খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন আর এক পা আগাইয়া কুড়াইয়া লইবেন এমন সময় মোটর চলিবার মত শব্দ পাইয়া তিনি চমকিয়া উঠিয়া পিছনের দিকে তাকাইলেন, যাহা দেখিলেন, তাহা তিনি কোনদিন কল্পনাও করেন নাই।—দেখিলেন তাহার মোটরখানি চলিতে সুরু করিয়াছে। তবে কি তিনি ছদ্মবেশী মোটর-চোরের হাতে পড়িলেন? তাহার চোখের সামনে তাহার মোটর নিয়ে সরিয়া পড়িবে—ইহা তিনি কোনদিনই সহ্য করিতে পারিবেন না। ক্ষিপ্রহস্তে ঘড়িটী তুলিয়া লইয়া তিনি মোটরের পিছনে ছুটিলেন। কিন্তু উর্দ্ধশ্বাসে মিনিট তিনেক ছুটিয়াও তিনি মোটরের কাছে আসিতে পারিলেন না, মোটরের পিছনকার আলোটী তাহার চোখের সামনেই ক্রমে অস্পষ্টতর হইয়া গেল। ছুটিয়া ছুটিয়া তাহার পা দুখানি যেন দু'মণ ভারী হইয়া উঠিল, আর এক পা অগ্রসর হইতে তাহার ইচ্ছা করিল না, কিন্তু পথের মাঝে বসিয়া থাকিয়া লাভ কি! ভারাক্রান্ত মনে মন্থর গতিতে তিনি চলিলেন। তাহার মনে পড়িয়া গেল এই ধরণের মোটর-চুরীর কথা বিলাতী কাগজে তিনি কতবার পড়িয়াছেন, পূর্ব্ব হইতেই তাহার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। এই নির্জ্জন পথে এত রাত্রে কোথা হইতে তরুণীর আবির্ভাব হইল সে কথাটী তাহার একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল। রোম্যান্স-রোম্যান্স করিয়া তাহার বুদ্ধি কি একেবারে লোপ পাইয়াছিল? মোটরখানি যে দিকে অদৃশ্য হইয়াছিল, সে পথে চলিতে চলিতে ডাক্তারবাবু নানা কথা ভাবিতেছিলেন।

ভাবিতেছিলেন—রুগী দেখিতে গিয়া এখন আর কোন লাভ নাই, 'ষ্টেথ্‌স্‌কোপটী' পর্য্যন্ত মোটরের সেই ব্যাগটীর মধ্যে রহিয়া গিয়াছে, কি দিয়া সে রোগী দেখিবে, শুধু নাড়ী টিপিলেই কি হইল? তার চেয়ে আগে থানায় একবার খবর দেওয়া বেশী যুক্তিযুক্ত। আরেকটু গেলেই একটী পুলিশ-ষ্টেশন পাওয়া যাইবে সেখানে গিয়া সর্ব্বাগ্রে খবর দিতে হইবে, যদি মোটরটী উদ্ধার হয়! কিন্তু এ দেশের পুলিশ কি আর লণ্ডনের মত তৎপর হইবে, তাহারা যে তাহার মোটর উদ্ধার করিতে পারিবে সে বিশ্বাস তাহার নাই। খবর দিতে গিয়া তাহাদের কাছে কৈফিয়তের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িতে হইবে। সব শুনিয়া তাহারা হাসিবে। কাল সকালে কাগজে খবরটা বাহির হইলে সকলেই হাসিবে 'এ্যাড্‌ভ্যান্‌সে' বড় বড় অক্ষরে ছাপা হইবে, 'এ ইয়ং ডক্টর পিকস আপ এ গার্ল ষ্টিলস হিজ কার।' লোকে বলিবে গাধা, দুর্নাম রটিয়া যাইবে! তাহার চেয়ে থানায় সে নাইবা খবর দিল। কিন্তু তাহা হইলে তাহার গাড়ী উদ্ধার হইবে কেমন করিয়া এই তো ছ'মাস হইল পসার একটু জমিয়া উঠিতে সে কত দেখিয়া শুনিয়া নূতন মডেলের ওই বেবি অষ্টিনখানি কিনিয়াছে। একেবারে নূতন অমন সখের গাড়ীখানি বেহাত হইয়া যাইবে। যে গাড়ি টাকা দিয়া কিনিয়া সে চাপিতে পাইল না তাহা এক-জন ফাঁকি দিয়া চাপিবে, আর সে থানায় একটা খবর পর্য্যন্ত দিতে পারিবে না? না, খবর সে দিবেই, তবে কথাটা একটু ঘুরাইয়া বলিলে কেমন হয়? যদি সে বলে কোন রুগী দেখিতে গিয়া দরজায় মোটর রাখিয়া বাড়ির ভিতরে গিয়াছিল, বাহিরে আসিয়া দেখে গাড়ী নেই, তাহা হইলে তো আর নির্ব্বুদ্ধিতার কোন কথা উঠিতেই পারে না। —ইহাই ঠিক থানায় গিয়া সে এই কথাই বলিবে। সাপও মরিবে লাঠিও ভাঙিবে না—মোটরেরও সন্ধান হইবে, অথচ তাহাকে বোকা বলিবার সুযোগ পাইবে না কেহই। কিন্তু যদি তারা সে বাড়ীর ঠিকানা চায়, বা পথের নাম জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে সে

কি উত্তর দিবে? এ রাস্তায় বহুবার মোটরে যাতায়াত করিয়াছে কিন্তু ঐ চওড়া পথটা ছাড়া আশপাশের কোন পথের নাম তো তাহার ভাল জানা নাই; তাহার উপর কোন রুগীর বাড়ীর সে ঠিকানা দিবে? পুলিশ যদি সে বাড়ীতে ফোন করিয়া জানিতে চাহে, তখন তাহার অবস্থা কি হইবে?...

ভাবিতে ভাবিতে ডাক্তারের মাথা গরম হইয়া উঠিল।

চলিতে চলিতে এবার তিনি পথের মোড় ঘুরিলেন। সামনে অনেকটা দূরে একটা আলো দেখা যাইতেছে,—মোটরের পিছনের লাল আলো। ডাক্তারের মনে এবার একটু আশার সঞ্চার হইল। ওই মোটর চালকের কাছে সাহায্য চাহিলে পাইবে নিশ্চয়ই, তাহা হইলে পথটা সুগম হইয়া যাইবে, থানা হইয়া বাড়ী ফিরিতে বেশীক্ষণ সময় লাগিবে না বাড়ী ফিরিয়া সুবোধকে একবার ফোন করিলেই চলিবে, রুগীটাকে দেখিয়া আসিবে। পুর্ব্বেই এ ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, অনর্থক শুধু হায়রাণই সার হইল, কোথায় এতক্ষণ বাড়ীতে আরামে ঘুমাইতেছে, তাহা নয় গাড়ি খোয়াইয়া কর্দ্দমাক্ত পথের কাদা ছিটাইয়া সে হাঁটিয়া চলিয়াছে।

মোটরখানির কাছে আসিতে আসিতে ডাক্তারবাবুর মনে হইল যেন ওই মোটরখানি তাহারই। আরও কাছে আসিয়া তিনি ভাল করিয়াই চিনিতে পারিলেন এ মোটর তাহারই। কিন্তু এখানে মোটর খানি দাঁড়হেঁয়া থাকিবার কারণ কি, আশপাশে তো কাহারও বাড়ি দেখিতেছি না, তবে হয় তো ফেলিয়া রাখিয়া পলাইয়াছে, তা থাক তাহার গাড়ীখানি যে আবার ফিরিয়া পাইয়াছেন ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু ওরকম গাড়ী তো আরও অনেক থাকিতে পারে, নম্বরে না মিলিলে তো কিছুই বলা যায় না। সহসা ডাক্তারবাবু দেখিলেন একটী তরুণী পাশের পথের উপর শায়িত একটী লোককে তুলিয়া আনিয়া কোনও রকমে মোটরের মধ্যে শোয়াইয়া দেবার চেষ্টা করিতেছে। মেয়েটীর পরিচ্ছদ ও আকৃতি তাহার কাছে অত্যন্ত পরিচিত। তাহার পানে পিছন করিয়া আছে, মুখখানি দেখিতে পাইলেই আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু ব্যাপারটা তো কিছুই বোঝা যাইতেছে না, কোন খুন হয় নাই তো? তাহার মোটর, শেষে তাহাকেই না আসামীর কাঠগড়ায় গিয়া দাঁড়াইতে হয়! না, এখানে আর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ঠিক নয়, ডাক্তারবাবু একেবারে তরুণীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন,রাত্রির থমথমে স্তব্ধতাকে সচকিত করিয়া দিয়া বলিলেন—এসব কি ব্যাপার?

তরুণী চমকিয়া উঠিল, কি বলিবে কিছুই যেন ঠিক করিতে পারিল না, নিজের অজ্ঞাতেই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল—আপনি!

—হাঁ, আমিই, কেন চিনতে কষ্ট হচ্ছে না কি? ডাক্তারবাবুর স্বরে শ্লেষের কঠোরতা স্পষ্টই অনুভূত হইল।

—না...হ্যাঁ—

—'না-হ্যাঁ'র কিছু নেই, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আমার মোটরখানি আমি এক্ষুনি চাই। ও কে? আমার মোটরের মধ্যে ও কে?

তরুণী তখন পর্য্যন্ত নিজেকে সামলাইতে পারে নাই, সে কথার জবাব দিবে কি করিয়া, তাহার মুখখানি তখন একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার মুখের পানে তাকাইয়া ডাক্তারবাবুর মনে অনুকম্পা জাগিল। ভাবিলেন সহসা এতটা রূঢ় ভাবে নিজেকে প্রকাশ করিয়া ফেলা হয় তো ঠিক হয় নাই। লোকটীর মুখ দেখিবার জন্য মোটরের ভিতরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি তাকাইলেন—লোকটী পিছনের সমস্ত সিটটী জুড়িয়া পড়িয়া আছে। ঔষধের বাক্স ও ব্যাগ নামাইয়া রাখা হইয়াছে পা রাখিবার জায়গায়। ডাক্তারবাবুর সারা দেহ রাগে জ্বলিয়া উঠিল, লোকটীর মুখ দেখিবার জন্য তিনি মোটরের ভিতরে মাথা ঢোকাইলেন। লোকটীর মুখ একেবারে তাহার অপরিচিত নয়, ভবানীপুরের নাম করা জনৈক ব্যারিষ্টারের পুত্র। এই সেদিনেও তো সে তাহাদের বাড়ীতে রুগী দেখিয়া আসিয়াছে। হঠাৎ ইহার হইল কি? তরুণীর দিকে ফিরিয়া কঠোর কণ্ঠে ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করিলেন—ব্যাপার কি? কি হয়েছে এর?

এবার তরুণী ভীত কণ্ঠে জবাব দিল—বন্ধুর বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে ওরই গাড়িতে ফিরছিলুম। হঠাৎ এখানে মোটর থামিয়ে বিমানদা আমার একখানি হাত চেপে ধরলো নিজেকে তখন বাঁচাবার জন্য ধাক্কা দিয়ে ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমি ছুটতে থাকি, এমন সময় আপনার সঙ্গে

দেখা—সেই ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

এত রাত্রে ওর সঙ্গে একা বাড়ী ফিরছিলে, ও কি তোমার কোন আত্মীয়?

না ওদের পাশেই আমাদের বাড়ী, অনেকদিনের আলাপ তাই—

হুঁ—বলিয়া ডাক্তারবাবু তখন মোটরের ভিতরে উঠিয়া গিয়া অচৈতন্য যুবকটীর সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এবার যুবকটীর মুখে তিনি যেন একটু বিলাতী মদের গন্ধও পাইলেন। তাহা হইলে অচৈতন্য হইবার কারণ আঘাতের গুরুত্ব ততটা নয়, যতটা হইয়াছে মদের নেশায়। এরূপ রোগীর সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিবার কৌশল ডাক্তার বাবুর বিশেষ ভাবেই জানা ছিল। একটু বাদেই বিমান চোখ মেলিল। তাহাকে চোখ মেলিতে দেখিয়া ডাক্তার-বাবু বলিলেন—উঠে বসুন দেখি—

ডাক্তারবাবুর গম্ভীর আদেশের স্বরে সে একটু বিচলিত হইল; চারিপাশে একবার তাকাইয়া লইয়া বলিল—তুমি কে চাঁদ, তোমায় তো চিনি নে—

এবার ডাক্তারবাবুর ধৈর্য্যের সীমা সত্যই ছাড়াইয়া গেল, তিক্ত স্বরে তিনি বলিলেন—একবার থানায় গেলেই চিনবে, মেয়েদের বাড়ী পৌঁছে দেবার নামে পথে মাতলামি করতে পার, আর পুলিশকে চিনতে পার না? এখন সোজা উঠে বাড়ী যাবে, না থানায় জিম্মা করে দিতে হ'বে—

যুবকটীর মাতলামি এবার যেন অনেকটা কমিয়া আসিল তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতে বসিতে বলিল—না, না, অত উপকারে আর দরকার নেই, আমি এবার বেশ যেতে পারব'—

—বেশ তা হ'লে নেমে যাও—

—আমার মোটর থেকে আমিই নেমে যাব—বাঃ—বাঃ—বাঃ—বেশ—তো?

সত্যই কি সে মোটর আনিয়াছিল, ডাক্তারবাবু চারিপাশে একবার তাকাইয়া দেখিলেন। এবার ভাল করিয়া তাকাইতে সামনের পথের ওপাশে গাছের আড়ালে এক-খানি মোটর তাহার চোখে পড়িল, সেদিকে নির্দ্দেশ করিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন—এ মোটর আপনার নয়, আপনার গাড়ী ওই গাছের আড়ালে রয়েছে, নেমে যান—

অদূরে মোটরের পানে একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া বিমান ধীরে ধীরে নামিয়া গেল। সে নামিয়া যাইতে ডাক্তারবাবু কি জানি কি ভাবিয়া মোটরের দরজা খুলিয়া দিয়া তরুণীকে ডাকিলেন—ভিতরে উঠে এস—

তরুণী উঠিয়া আসিল, ডাক্তারবাবুর মুখের উপর সরল সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বিমান দা' বাড়ী যেতে পারবেন তো?

এ প্রশ্ন ডাক্তারের ভাল লাগিল না, বলিলেন—এখন না পারেন, কাল সকালে বাড়ী যাবেন।

ডাক্তারবাবু মোটরে ষ্টার্ট দিলেন। মোটর চলিতে সুরু করিল, তিনি আবার বলিলেন—এমন করিয়া আমায় না জানাইয়া মোটর চুরী করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হ'য়েছে—

আমি বড় ভয় পেয়েছিলুম—তরুণী আস্তে আস্তে বলিল।

স্নেহের স্বরে ডাক্তার বলিলেন—ভয়? গাড়ি চুরী করার সময় তো একটুও ভয় পাও নি?

আমি ভেবেছিলুম আপনার গাড়ী আবার ফেরৎ দিয়ে আসব'। এমন ঘটনা আমার জীবনে কখনও ঘটে নি, বড় ভয় পেয়েছিলুম, কি করা উচিত ঠিক বুঝতে পারি নি। ভেবেছিলুম বিমানবাবুকে পৌঁছে দিয়ে এসে আপনার গাড়ীখানা আপনার বাড়ীর সামনে রেখে আসব'—

তা হ'লে আমার মোটরই বা তোমার দরকার হোল কেন? বিমানবাবুর মোটর তো এখানে ছিল—

সে কথা আমার তখন মনে ছিল না, আমার অন্যায় হ'য়েছে, আমায় মাপ করুন। তরুণীর স্বর কাঁপিয়া উঠিল, ডাক্তার তাহার মুখের পানে তাকাইলেন—তরুণীর চোখের পল্লবগুলি যেন কাঁপিতেছে, এখনি হয় তো অশ্রু গড়াইয়া পড়িবে। বাহিরের পথের আলোর টুকরোগুলি মুখের উপর পড়িয়া মন্দ দেখাইতেছে না। ডাক্তারবাবু তেমনি ভাবেই তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—বাড়ীর ঠিকানাটী বল, সারারাত মোটরে ঘুরে তো কোন লাভ হ'বে না—

একশোর কে রাসবিহারী রোড—

প্রফেসার ললিতবাবু ওই বাড়ীতে থাকেন না

হ্যাঁ, তিনি আমার বাবা—

ওঃ—আমরা যে তাঁর কাছে পড়েছি তিনি আমায় বেশ ভালভাবেই চেনেন্। তোমার নাম কি?

মায়া রায়।

এই পর্য্যন্ত আসিয়াই কথা থামিয়া গেল। ইহার পর আর কি জিজ্ঞাসা করা উচিত ডাক্তারবাবু তাহা ভাবিয়া পাইলেন না, মোটরের ষ্টেয়ারিং ধরিয়া সামনে পথের পানে চাহিয়া মোটর চালাইতে লাগিলেন। তরুণীও আর কোন কথা কহিল না। চুপ করিয়া মোটর চালাইতে চালাইতে কোন এক শুভমুহূর্ত্তে ডাক্তারবাবুর কুমার জীবনে বসন্তের আমেজ লাগিল। কেমন যেন নেশা ধরিল। বার বার তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল মেয়েটীর পানে দেখিতে, অনেকক্ষণ ধরিয়া মেয়েটীর মুখের পানে তাকাইয়া থাকিতে। এখনি তো সে নামিয়া যাইবে খানিকক্ষণ দেখিয়া লইলে ক্ষতি কি আর হয় তো কোনদিন জীবনের পথে সে তাহার সহিত মুখোমুখি হইবে না, হয় তো ভবিষ্যতে পরস্পরকে পরস্পর চিনিতেই পারিবে না, এখন কিছুক্ষণের জন্য তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিলে এমন কি অন্যায় হইবে। কি 'স্মার্ট' এই মেয়েটী—নারীত্বের দুর্ব্বলতা ও যৌবনের স্পর্দ্ধা ইহার মধ্যে সমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এমনি একটী মেয়েকে পাইলে সে তাহার জীবনের নায়িকা করিয়া লইতে পারে।

সহসা তরুণীর কথায় ডাক্তারের চিন্তার জাল ছিঁড়িয়া গেল, মায়া বলিয়া উঠিল—এই তো এসে পড়েছি, এখানেই থামুন

গাড়ীর ব্রেক কষিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন—ভিতরের দরজা পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে আসতে হবে নাকি?

মায়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বলিল—না না, ওই তো বাবার ঘরে আলো দেখতে পাচ্ছি, আমি বেশ যেতে পারব'খন বলিয়া মায়া মোটর হইতে নামিয়া পড়িয়া দু'পা আগাইয়া গিয়া ফিরিয়া বলিল—আপনি আজ যে উপকার করলেন তার কি করে শোধ দোব ভেবে পাচ্ছি নে। কাল বিকালে আপনার এখানে নিমন্ত্রণ রইল আসবেন নিশ্চয়ই—অনুনয়ের দৃষ্টিতে মায়া ডাক্তারবাবুর মুখের পানে তাকাইল।

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা চেষ্টা করব'—

—চেষ্টা করব' বললে চলবে না, ঠিক আসবেন কিন্তু

—আচ্ছা।

মায়া এবার দু হাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার জানাইয়া অগ্রসর হইল, ডাক্তারবাবু কপালে একটী হাত ঠেকাইয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া তাহার গমন পথের পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। আর একটু গিয়া ফটক পার হইয়া মায়া কয়েকটী ফুলগাছের আড়ালে অদৃশ্য হইল। ডাক্তারবাবু আবার মোটরে ষ্টার্ট দিলেন।

—এইখান হইতেই ডাক্তারবাবুর জীবনের রোম্যান্স সুরু হইল।

পরদিন তিনি মায়া রায়ের নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন, সে কথা আমরা জানি। এবং শুধু পরদিন কেন, তারপর হইতে নিয়মিত ভাবে তিনি সেখানে যাতায়াত করিতে থাকেন, তাহাও আমরা জানি। শেষে যখন কয়েক মাস পরে একদিন রঙীন কার্ড লইয়া ডাক্তারবাবু আমাদের বিবাহের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন, তখন ডাক্তারবাবুর জীবনের এই রোম্যান্সটুকুর হিংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি নাই। *

---

* "জর্জ্জ ওয়েস্টন"এর 'বেট্ ইন্ দি ট্রাপ' নামক গল্প অবলম্বনে"।
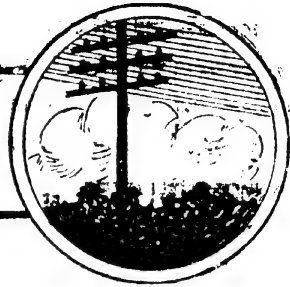
আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি

আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সোমেশচন্দ্র বসু অথবা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্রবন্ধকার লের্ড মেকলের আশ্চর্য্য স্মরণ-শক্তি সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত আছেন। কিছুদিন হইল ডাবলিন শহরে এক অসাধারণ স্মরণ-শক্তিসম্পন্না নারীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার নাম মিনি কুইনা। ইনি একজন সাঙ্কেতিক শব্দ-লিপি বিষয়ে বিশেষজ্ঞা। ইহাকে চাকরীতে পশার জমাইবার জন্য একবার তিনটী বিজাতীয় ভাষা শিক্ষালাভ করিবার প্রয়োজন হয়। ইনি তখন মাত্র তিন সপ্তাহ পরিশ্রম করিয়া ফরাসী, জর্ম্মান ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া ফেলেন। কেবল যে ঐ সমস্ত ভাষায় তিনি কথা কহিতে পারেন তাহা নহে, তিনি ঐ সমস্ত ভাষায় ব্যাকরণ পর্য্যন্তও আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ শক্তি কি করিয়া হইল জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানাইয়াছেন যে, তাঁহার এ শক্তি স্বভাবসিদ্ধ। বাল্যকাল হইতে তিনি যে সমস্ত পুস্তকের কোন অংশ একবার মাত্র চোখ বুলাইয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার আজও মনে আছে। পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, তাঁহার কথা মিথ্যা নয়।

"নৈশ আকাশ-বার্ত্তা"

বিলাতে লণ্ডন শহরে 'নৈশ আকাশ-বার্ত্তা' নামক এক প্রকার সংবাদ-সরবরাহের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

সন্ধ্যার পর হইতে ভোর হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহার সম্বন্ধে সংবাদ দিবার জন্য এই 'নিউজ সারভিস'এর উদ্দেশ্য।

এই সমস্ত সংবাদ মুদ্রিত পত্রাদির দ্বারা লোককে জানান হইবে না। এইজন্য লণ্ডনের 'ট্রাফালগার স্কোয়ার', 'লেষ্টার স্কোয়ার' প্রভৃতি জনবহুল স্থানে বড় বড় ছায়াচিত্র-যন্ত্র বসান হইয়াছে। এই সমস্ত যন্ত্র হইতে নৈশ-আকাশে ছায়াচিত্র ফেলিয়া শহরবাসীকে সংবাদ জানান হইবে। এইরূপ ব্যবস্থায় আর কিছু হউক বা না হউক অতি ব্যস্ত লণ্ডনবাসিগণের সংবাদপত্র পাঠ করিবার সময় অপব্যয় আর করিতে হইবে না।

গৃহ-নির্ম্মাণে কাগজের ব্যবহার

আধুনিক যুগে কাগজ হইতে বহুবিধ দ্রব্যাদি তৈয়ারী হইতেছে। ছোট ছেলে-মেয়েদের জামা, মোটার গাড়ীর চাকা, চা'র চামচ, থালা প্রভৃতি বহুবিধ জিনিস আজকাল কাগজ হইতে তৈয়ারী হইয়াছে।

কিছুদিন হইল গৃহ-নির্ম্মাণ কাজে কন্‌ক্রীট তৈয়ারী করিবার জন্য কাগজ ব্যবহার হইতেছে। বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, এরূপ কন্‌ক্রীট যে অল্পদিনেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে, অধিকন্তু ইহার আর একটী গুণ আছে,—ইহাতে জল লাগিলে কোন ক্ষতি হয় না।

মশক-নিবারণের একটী উপায়

মশক-নিবারণের উপায় লইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে

বহু চেষ্টা হইতেছে। আমেরিকার বিখ্যাত 'জেনারেল ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী'র অধ্যাপক গ্রিহ্ টমষন্ নামক এক ব্যক্তি একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

এই যন্ত্রটীর একটী গুণ এই যে, ইহা হইতে স্ত্রী-মশার ডাকের মত একপ্রকার শব্দ বাহির হইতে থাকে, তাহাতে পুরুষ মশকেরা আকৃষ্ট হইয়া সেইদিকে ছুটিয়া আসে, এবং তখন এই যন্ত্রটীর ভিতর হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি বাহির হইয়া মশকগুলিকে মারিয়া ফেলে।

'মার্শেলিস্'এর নিকটবর্ত্তী নদীর জলাভূমিগুলির নিকটে মশার উপদ্রবের জন্য লোকের বাস অসম্ভব ছিল। সম্প্রতি শ্রীমতী গর্ডন নামক একটী মহিলা একটী মশক-নিবারক এইস্থানে বসাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার যন্ত্রটী একটী উচ্চ নল বিশেষ। এই নলটীর নিম্নদেশে চালিত একটী যন্ত্রের দ্বারা হাওয়ার চাপে মশকগুলিকে নলের ভিতর টানিয়া লওয়া হয়। পরে তাহাদের নলের ভিতরেই নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। মশকগুলিকে নলটীর দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য কয়েকটী আলোক-স্রোতের ব্যবস্থা আছে।

আশ্চর্য্য কাঁচ

জার্ম্মেনীর একটী কারখানায় সম্প্রতি এক আশ্চর্য্য রকমের কাঁচ তৈয়ারী হইয়াছে। এই কাঁচ রবারের ন্যায় বাঁকিয়া যায়। ধাক্কা লাগিলে ভাঙিয়া যায় না। এই কাঁচের শক্তি পরীক্ষার জন্য একখণ্ড কাঁচ লইয়া তাহার উপর তিনজন লোক দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু ইহা ভাঙিয়া যায় নাই, বরং লোহার পাতের মত বাঁকিয়া পড়িয়াছিল। ভবিষ্যতে এ কাঁচ মানবসমাজের বহুবিধ উন্নতি সাধন করিবে সন্দেহ নাই।

তৈলচালিত রেলওয়ে এঞ্জিন

বরাবর আমাদের দেশের রেলপথগুলিতে বাষ্পচালিত এঞ্জিনই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে; সম্প্রতি এ নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হইয়াছে। 'বরদা ষ্টেট রেলপথে' কিছুদিন হইল একপ্রকার তৈল-বৈদ্যুতিক এঞ্জিন প্রচলিত হইয়াছে। এই এঞ্জিনগুলির চেহারা ও আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত বাষ্পচালিত এঞ্জিনগুলির চেহারায় কিছু বিভিন্নতা আছে। এঞ্জিনগুলির পিছনের অংশটী আমাদের বাষ্পচালিত এঞ্জিনগুলির মতই, কিন্তু সম্মুখের অংশটী হুবহু সাধারণ মোটারগাড়ীর এঞ্জিনের ন্যায়। এই এঞ্জিনগুলির শক্তি হইতেছে ২৫০ বি, এইচ, পি—কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে যে যদিও এই এঞ্জিনগুলির শক্তি ২৫০ বি, এইচ, পি—তাহা হইলেও সাধারণ ৪০০ শত বাষ্পচালিত এঞ্জিনের দ্বারা যে কাজ পাওয়া যায় ইহার দ্বারা সেইরূপ বা তদতিরিক্ত কাজ পাওয়া যাইবে। এই এঞ্জিনগুলির ইন্ধন যোগাইবার জন্য ৭॥ পেন্স হইতে ৮ পেন্স পর্য্যন্ত খরচ হয়। কাজেই পূর্ব্বে ব্যবসায়ীদের মালপত্র পাঠাইবার জন্য যাহা খরচ হইত, তাহার অর্দ্ধখরচে আজকাল মালপত্র পাঠান যাইবে।

—বিশ্বদূত

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ-কর্ত্তৃক পঞ্চপুষ্প-প্রেস, ৩১ তেলিপাড়া লেন হইতে মুদ্রিত এবং পঞ্চপুষ্প-কার্য্যালয়,
৩১ তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ, কলিকাতা।

শেষের ডাক

সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত

৭ম বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৪০ | ৪র্থ সংখ্যা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম-এ, পি-আর এস, পি-এচ্-ডি

কয়েক দিন পূর্ব্বে ভারতে এক অসাধ্য সাধিত হইয়াছে। হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর ও কাঞ্চনজঙ্ঘা বিজীত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকের বহু আয়াসপ্রসূত গবেষণার ফলস্বরূপ এরোপ্লেন সাহায্যে কতিপয় সাহসী ইংরাজ মনোরথগতিতে, মানবপদরজ বর্জ্জিত, চিরতুষারমণ্ডিত, মেঘমালান্তরালস্থায়ী পৃথিবীর এই সর্ব্বোচ্চ স্থানগুলির বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে সক্ষম হইয়া একদিকে বিশ্বনিয়ন্তার অপূর্ব্ব স্থষ্টিচাতুর্য্য ও অপরদিকে বিজ্ঞানের অচিন্তনীয় প্রতিভার সাক্ষ্যদান করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে সাহসের প্রতিমূর্ত্তি বহু ইউরোপীয় পর্য্যটক বহুদিন ধরিয়া পদব্রজে এই কার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে গিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন। আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে গৌরীশঙ্করের সর্ব্বোচ্চ স্থানের উপর আরও একশত ফুট উচ্চে, এরোপ্লেনের ইঞ্জিনের ঘর্ঘর শব্দে চিরশান্ত শব্দহীন আকাশমার্গ ধ্বনিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের এই মহান বিজয়বৈজয়ন্তী যাঁহারা আজ স্থাপন করিলেন তাঁহাদিগকে আমি অভিনন্দিত করিতেছি।

কিন্তু মনে রাখিবেন যে এই এরোপ্লেন আবিষ্কার ও তাহাকে (ইংরাজিতে যাহাকে বলে Safe for humanity), মানুষের পক্ষে নির্ভয়গম্য করিতে বহু শত বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার ও পাইলটকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। ইন্‌টারন্যাল কম্বশ্চন ইঞ্জিন ও এরিয়নটিক বিজ্ঞানের সমন্বয়ে আবিষ্কৃত এই এরোপ্লেনের দিগ্বিজয়ের সময়, আমরা মৃত আমেরিকান, জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় শত শত বৈজ্ঞানিককে যেন স্মরণ করিতে বিস্মৃত না হই। কালক্রমে এরোপ্লেন সাহায্যে আকাশমার্গে যাতায়াতই হয়ত সুদূর স্থানে গমনের একমাত্র উপায় হইবে। ইউরোপে ও আমেরিকায় এই প্রকারে গমনাগমন ইতিমধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে, ভারতের পক্ষে সে দিন সুদূর হইবে না। কিন্তু আমরা যেন স্মরণ রাখিতে ভুলি না যে ইহার আবিষ্কারের সহিত ভারতবাসীর কোনও যোগ নাই; ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকবৃন্দই এ গৌরবের অধিকারী।

এরোপ্লেন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটিমাত্র নিদর্শন মাত্র! কত কত অভূতপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যন্ত্রাদি পাশ্চাত্যদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা আপনারা অনেকেই অবগত আছেন, ইহাদের সকলগুলির সন্ধান দেওয়া এখানে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা এই সকল অধিকারের ফলভোগী মাত্র, আবিষ্কারক নই! বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকেরা বলেন যে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, তৎকালীন ইউরোপীয় জ্ঞান অপেক্ষা বিন্দুমাত্র ন্যূন ছিল না, বরং অনেক বিষয়ে উচ্চতর ছিল! ভারতের প্রাচীন লৌহশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমি বুঝিয়াছি যে প্রাচীন ভারতে লৌহ নির্ম্মাণ কৌশল খুব উচ্চদরের ছিল। ইহার সাক্ষ্য স্বরূপ পঞ্চম শতাব্দীর দিল্লীর সুবিখ্যাত লৌহস্তম্ভ, দ্বাদশ শতাব্দীর, ধারের, অধুনা ভগ্ন, লৌহস্তম্ভ। ভুবনেশ্বর কনারক ও পুরীর মন্দিরসমূহে ব্যবহৃত লৌহ নির্ম্মিত কড়ি, বরগা প্রভৃতি বিদ্যমান। অষ্টাদশ শতাব্দীর পর হইতে ভারতের বিজ্ঞানের অন্ধযুগ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সেই সময় হইতে ইউরোপে বিজ্ঞানের আলোচনায় নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এবং উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ অসাধ্য সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহার ফলে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা, পূর্ত্তবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার এই সকল বিজ্ঞানের প্রত্যেকটির মধ্যে কত কত খণ্ডবিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার ইয়ত্তাই করা যায় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরুন, রসায়ন-বিজ্ঞান। ইহা বিষয়ানুসারে জৈব, অজৈব, পদার্থবিদ্যামূলক, প্রাণীবিদ্যামূলক প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত। পূর্ত্ত বিজ্ঞানের—সিভিল, মেক্যানিক্যাল, ইলেক্‌ট্রিকাল, মাইনিং, কেমিক্যাল, নটিক্যাল প্রভৃতি, বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। চিকিৎসাবিদ্যার বিভাগের অন্তই নাই; শরীরবিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা, নিদান, দ্রব্যগুণ, অস্ত্রচিকিৎসা, কায়-চিকিৎসা, জীবাণুবিদ্যা প্রভৃতি ইহার বহু বিভাগ।

বলা বাহুল্য এই সকল বিজ্ঞান ও তাহার বিভাগ-গুলির অধিকাংশ উনবিংশ ও বিংশ এই দুই শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার সমষ্টি মাত্র। এই দুই শতাব্দীর মধ্যে, বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীতে, পাশ্চাত্য দেশসমূহে এই সকল বিজ্ঞানের উপাসকগণ, আমরণ পরিশ্রম করিয়া যে সকল তথ্য ও যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়াছেন সেইগুলির বিবরণ একত্রীভূত হইয়া এক এক বিজ্ঞানের হইয়াছে। আবার এক একটি যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে একটি একটি বিভাগীয় বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পর আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্র, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পর জীবাণুবিদ্যা, পোলারিমিটারের আবিষ্কারের পর স্টিরিও—রসায়ন, প্রভৃতি শাস্ত্রের উৎপত্তি। কোনও কোনও শাস্ত্রের বিভাগগুলির এত বিস্তারলাভ করিয়াছে যে সেই শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞও সকল শাস্ত্রের খবর রাখেন না। মনে করুন, রসায়ন শাস্ত্র। যিনি জৈব রসায়নে বিশেষজ্ঞ তিনি অধিকাংশ স্থলে অজৈব বা পদার্থ-বিদ্যামূলক রসায়নে অল্পাধিক বা প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সেদিন এক ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাক্তার, সামান্য সর্দ্দি কাশির জন্য ঔষধ লিখিয়া দিতে বলাতে বলিলেন 'ওত আমার দ্বারা হইবে না, আমি জানি কেবল স্ত্রীলোকের জরায়ুঘটিত রোগের চিকিৎসা। আর কাহাকেও দিয়া ঔষধটা লিখাইয়া লইবেন।" ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছে প্রায় তদ্রূপই। আজকাল সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া এত অধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যাপৃত হইয়াছেন, যে প্রত্যেক বিভাগীয় বিজ্ঞানই এক একটি প্রকাণ্ড কলেবর ধারণ করিতেছে। বিজ্ঞানের গবেষণা পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপখণ্ডেই প্রায় সীমাবদ্ধ ছিল। ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই ইহার উপাসক ও আবিষ্কারক ছিল। রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে জানি যে ইংরাজের মধ্যে জোসেফ প্রীষ্টলি—অম্লজান, হেনরী কেভেণ্ডিস—জলের যৌগিকত্ব, জন-ড্যালটন্—পরমাণুবাদ, রবার্ট বয়েল ও চার্লস উঁহাদের নামীয় নিয়মাবলী, সার হাম্ফ্রি ডেভী—সোডিয়াম, পোটাসিয়াম প্রভৃতি ধাতু, সেফ্‌টি ল্যাম্প, সার উইলিয়াম র‍্যামজে, তরল বায়ু হইতে আরগন, নিয়ন, জিনন, ক্রীপটন প্রভৃতি গ্যাস, পারকিন—বিবিধ রং, সার ডিমন ডিওয়ার—তরলী-ভূত হাইড্রোজেন প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন। জার্মানীর

প্রথিতযশা, লাভোয়াশিয়ে রসায়নশাস্ত্রে তুলাদণ্ডের প্রয়োগ আনয়ন করিয়া নব্য রসায়নের অন্যতম স্রষ্টারূপে পরিচিত। গেলুসাক—তন্নামীয় নিয়ম, বেকারেল ও রন্‌ট্‌জেন—তন্নামীয় রশ্মি ও সর্ব্বোপরি মাদাম কুরি—রেডিয়াম আবিষ্কার করিয়া রসায়নশাস্ত্রে যুগান্তর আনিয়াছেন। জৈব রসায়নের উৎপত্তি ও প্রতিপত্তি জার্ম্মাণ দেশে, ফ্রেডারিক হ্বোয়েলার ও লিবিগ ইহার জন্মদাতা রূপে পরিচিত হন। বেকুলে—বেঞ্জিনের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া, জৈব রসায়নের এরোমেটিক বিভাগ স্থাপন করেন। রুষিয়ার সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক মেণ্ডেলিয়েফের মৌলিক পদার্থের পিরিয়ডিক বিভাগের উপর আধুনিক অজৈব রসায়ন স্থাপিত। ইটালির এভোগাড্রো ও কানিজারোর নাম আনবিক রসায়নে চিরস্মরণীয় থাকিবে। হলাণ্ডের ভাণ্টহফ, ষ্টিরিও-রসায়নের জন্মদাতা। স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া দেশটি ছোট্ট, কিন্তু এখানে বড় বড় রসায়নিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শীল, বার্গমান, বার্জেলিয়াস, আরহেনিয়াস, নোবেল প্রভৃতির নাম রসায়নশাস্ত্রে চিরপরিচিত; বাহুল্যভয়ে অনেক নামই পরিত্যক্ত হইল।

রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা সকল বিজ্ঞান-শাস্ত্রেই প্রযোজ্য। ইউরোপের অধিকাংশ প্রদেশেই ঐ সকল শাস্ত্রের স্থাপয়িতা ও সংবর্দ্ধকগণের মধ্যে অনেকের নামের গৌরব, ললাটে জয়টীকাস্বরূপে বহন করিতেছে। এখানেও বাহুল্য ভয়ে দৃষ্টান্তসকল পরিত্যক্ত হইল। ইঁহাদের গবেষণাগুলি প্রথমে বৈজ্ঞানিক সভাসমিতিতে পঠিত ও আলোচিত ও পরে বৈজ্ঞানিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়। ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটি, কেমিকেল সোসাইটি, ফ্রান্সি দেশের আকাদেমী দ' সিঁয়াস্ প্রভৃতি সভাসমিতির কীর্ত্তিকলাপ বিশ্ববিশ্রুত। এই সকল সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা হইতে যেগুলি মূল্যবান মৌলিক প্রবন্ধ সেগুলি সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপেই বিবিধ বিজ্ঞানের সৃষ্টি। সেইজন্য বলিতেছিলাম, যে কোনও বিজ্ঞানের ইতিহাস সেই বিজ্ঞানের আবিষ্কারকগণের আবিষ্কারের বিবৃতিমালা মাত্র।

বিজ্ঞানের এই তথ্যমূলক দিক ছাড়া আরও একটা দিক আছে। সেই হিসাবে বিজ্ঞান দ্বিবিধ—শুদ্ধ ও ফলিত। শুদ্ধ বিজ্ঞানের তথ্য ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে অসংখ্য দ্রব্যের নির্ম্মাণ কার্য্য সাধিত হইতেছে। সেগুলির ব্যবহারের দ্বারা দেশের ও জগতের সাংসারিক সুখ সুবিধা এবং তৎসঙ্গে সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে এই ফলিত বিজ্ঞানও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসার লাভ করিয়াছে। ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণাতেও বহু লোক ব্যাপৃত আছেন। তাহার ফলে একদিকে নূতন নূতন ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে এবং অপর দিকে দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীর প্রচলিত পন্থাগুলিরও উন্নততর পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই ফলিত বিজ্ঞান সাহিত্যের আকারও সুবৃহৎ। ইহার দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীগণ জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেশগুলিকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতেছেন। সুবিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিৎ হার্টজ্ সাহেব বেতার বৈদ্যুতিক হিল্লোল আবিষ্কার করিলেন; তাহাই কার্য্যে লাগাইয়া মার্কনি বেতার টেলিগ্রাফের সৃষ্টি করিয়া দেশ বিদেশে মুহূর্ত্তের মধ্যে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। এখন এই বেতার, রেডিও আকার ধারণ করিয়া প্রত্যেক সভ্যদেশে নরনারীর শিক্ষা ও আনন্দদান করিতেছে এবং অধুনা বেতার-টেলিফোন, টেলিভিসান্ প্রভৃতি অত্যদ্ভুত আবিষ্কারের দ্যোতক। সেই সঙ্গে ফলিত বিজ্ঞানের দিক দিয়া বিবিধ ইউরোপীয় কোম্পানী বেতার, রেডিও প্রভৃতি যন্ত্রাদি কোটী কোটী টাকা পরিমাণে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। মাইকেল ফ্যারাডে যখন তাঁহার সামান্য বিজ্ঞানাগারে ইন্‌ডাক্‌শানের দ্বারা চলবিদ্যুৎ আবিষ্কার করিয়াছিলেন তখন কেহই ভাবিতে পারেন নাই যে আধুনিককালের ডাইনামোর দ্বারা প্রস্তুত তড়িতের সাহায্যে চালিত বৈদ্যুতিক আলোকমালা, রেল, ট্রাম, বৈদ্যুতিক বীজনযন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়া মানব সভ্যতার এত প্রসার বৃদ্ধি করিবে ও একই কালে এই সকল নির্ম্মাণ করিয়া পৃথিবীর জাতিবর্গ কোটী কোটী টাকার অর্থের অধিকারী হইবে। সর্ব্বত্রই ফলিত বিজ্ঞানের জন্ম বৈজ্ঞানিকের গবেষণা মন্দিরে। ইহার প্রারম্ভ সর্ব্বত্রই শুদ্ধ বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত কোনও না কোনও

তত্ত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট; পরে ইঞ্জিনিয়ারিং ও কলকব্জার সাহায্যে ইহা দ্রব্য নির্ম্মাণকল্পে নিয়োজিত হইয়া থাকে। সেইজন্য এটা স্মরণ রাখিতেই হইবে যে, ফলিত বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে হইলে স্মরণ রাখিতেই হইবে যে, শুদ্ধ বিজ্ঞানের আলোচনা ও উন্নতি তৎপূর্ব্বেই করিতে হইবে। তবে এটাও ঠিক যে কেবল শুদ্ধ বিজ্ঞান লইয়া থাকিলেই চলিবে না। তাহার তথ্যগুলি 'পুস্তকাস্তুত যা বিদ্যা' হইয়া থাকিলে দেশের ধনবৃদ্ধি এক পয়সা পরিমাণেও হইবে না। যেমন কোনও দেশে শুদ্ধ বিজ্ঞানের উপাসক একদল থাকিবেন, সেইসঙ্গে ফলিত বিজ্ঞানের সাহায্যে, অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবক বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়ীও একদল নিশ্চয়ই থাকিবেন। এই দুইদলের সাহায্য ভিন্ন ফলিত বিজ্ঞানের উন্নতি অসম্ভব।

বাস্তবিক আধুনিক যুগকে যদি বৈজ্ঞানিক যুগ বলা যায় তাহা হইলে ফলিত বিজ্ঞানই সে যুগ আনয়ন করিয়াছে। ফলিত বিজ্ঞান কলকব্জার সাহায্যে দ্রব্য নির্ম্মাণকল্পে বহু দ্রব্য একসঙ্গে নির্ম্মাণ করাতে দ্রব্যগুলি অনায়াস লভ্য ও সুলভ হইয়াছে, mass production আধুনিক ফলিত বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ। যাঁহারা আধুনিক যুগের কলকারখানা স্থাপনের বিরোধী তাঁহারা অনেকে তৎপ্রসূত দ্রব্যাদি সহজলভ্য বলিয়া অনেক সময়ে বিস্মৃত থাকেন যে, সেগুলি কারখানাতেই প্রস্তুত। ইহারা সকলেই রেল বা মোটর গাড়ী নিশ্চয়ই সর্ব্বদাই চড়িয়া থাকেন, কিন্তু সেগুলি কোথায় কিরূপভাবে নির্ম্মিত হয় তাহার সন্ধান বোধ হয় রাখেন না। এগুলির মূলীভূত দ্রব্য হইতেছে লোহ। আধুনিক লৌহ নির্ম্মাণের কারখানা দেখিয়াছেন কি? কি ভীষণরূপ সুবৃহৎ এই সকল ব্লাষ্ট ফার্নেস। এক একটি ফার্নেস হইতে দৈনিক পাঁচ সাত শত টন লৌহ নির্গত হয়। লৌহ গলিয়া যখন এই ফার্নেস হইতে বাহির হয় তখন দেখা যায় যে একটা টকটকে লাল অগ্নির নদী তরঙ্গায়িত হইয়া অবিরলভাবে বহিয়া যাইতেছে। এই লৌহ হইতে মাইল্ড ষ্টীল নির্ম্মিত হয় এবং এই মাইল্ড ষ্টীল হইতে জাহাজ, রেলগাড়ী, মোটরগাড়ীর জন্য লৌহের চাদর, রেল, জয়েষ্ট, ব্রিজের জন্য গার্ডার, রড, তার পেরেক প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। মাইল্ড ষ্টীল প্রস্তুত হয় যে বেসেমার কনভারটার ও ওপন্ হার্থ ফার্নেসে, সেগুলি কি দেখিয়াছেন? বেসেমার কনভারটারে আগুন জ্বলিলে সে আগুন চতুষ্পার্শ্বে বহু মাইল দূর হইতে দৃষ্ট হয়। স্বল্প পরিমাণে এসব কি হয়? আধুনিক ফলিত বিজ্ঞান ও কল কব্জার সাহায্যে বহুল প্রস্তুত প্রক্রিয়া ভিন্ন এ সকল সাধিত হইতে পারে না। পয়সা ফেলিলাম, মোটর গাড়ী কিনিয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইলাম, তখন জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া যাই যে, সেগুলি নির্ম্মিত হইল কি প্রকারে। শুনিয়াছি প্রত্যেক মোটরগাড়ী মধ্যে তিনহাজার খণ্ড কলকব্জা আছে। অথচ সুখিখ্যাত ফোর্ড কোম্পানীর কারখানা এতই প্রকাণ্ড ব্যাপার যে, সেই কারখানা হইতে গড়ে প্রত্যেক তিন মিনিট অন্তর একখানা সম্পূর্ণ মোটরগাড়ী প্রতিনিয়তই বাহির হইয়া আসিতে থাকে।

এখন ভারতবর্ষে এই শুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের চর্চ্চার আধুনিক অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আধুনিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ গত দুই শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপ খণ্ডেই হইয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ স্থাপিত হইলে এই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এদেশে আসে। মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি স্থাপিত হইলে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও পূর্ত্ত বিজ্ঞান এদেশে শিক্ষণীয় বিষয় হয়। জিওলজিক্যাল ও জুওলজিক্যালসার্ভে প্রভৃতি ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের বিভাগগুলি স্থাপিত হইলে ভারতীয় ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্বের গবেষণা আরম্ভ হয়। ভারতীয় ও প্রাদেশিক কৃষি বিভাগগুলি খোলার পর পাশ্চাত্য মতে কৃষির উন্নতি বিষয়ে গবেষণা চলিতে থাকে। এইরূপ বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগের জ্ঞান পাশ্চাত্য দেশসমূহ হইতে এদেশে আসিয়াছে। প্রথমে এদেশে ইহাদের পঠন-পাঠন ও গবেষণা ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষকগণই করিতেন। তারপর ইউরোপ প্রত্যাগত দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদের সহিত এই কার্য্যে জড়িত হন। তৎপরে এখন ইহাদেরই ছাত্র ও শিষ্যবর্গ ভারতের বহু কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বিবিধ বিজ্ঞানের জ্ঞান শুধু প্রদান করি-

াই ক্ষান্ত হন নাই, নানারূপ উচ্চ শ্রেণীর মৌলিক াবেষণার দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন। রসায়ন শাস্ত্রে প্রেসি- ডন্সী কলেজের সার আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার ও বেনারস হিন্দু কলেজের ডাঃ রিচার্ডসন্ সর্ব্বপ্রথম রাসায়নিক াবেষণার যশ অর্জ্জন করেন; তৎপরে সার পি, সি, রায় ও তদীয় ছাত্রবর্গ রাসায়নিক গবেষণায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। এখন ইহা সকল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। পদার্থ বিদ্যায় সার জগদীশ- চন্দ্র বসু ও তৎপরে সার সি, ভি, রমণ প্রমুখ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ মৌলিক গবেষণায় কৃতী হইয়াছেন। এই- রূপে অন্যান্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও গবেষণা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষে মাত্র পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এখন উহার সংখ্যা তেরটি হইয়াছে। সেগুলির প্রত্যেকটিতে বহুবিধ বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ উপাধি পরীক্ষা উপযোগী পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরী বহু ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাদের নির্ম্মাণকল্পে দেশের বহু ধনশালী ব্যক্তি অর্থ দান করিয়াছেন ও করিতেছেন। স্বর্গীয় মিঃ জে, এন, টাটার বহু লক্ষ টাকা দানের ফলে মহীশূরের অন্তর্গত বাঙ্গালোর শহরে একটী প্রকাণ্ড বিজ্ঞানগার স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতায় সার তারকনাথ পালিত ও সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের বদান্যতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞান কলেজ নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারতে বিজ্ঞানের প্রচারকল্পে বিদেশীয়গণের অর্থানুকুল্য ও উল্লেখ- যোগ্য। একজন আমেরিকাবাসীর অর্থ সাহায্যে পুষা শহরে প্রকাণ্ড কৃষিবিদ্যাপীঠ স্থাপিত হইয়াছে এবং রক- ফেলার ট্রাষ্টের বদান্যতায় কলিকাতার হাইজিন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও গবেষণা দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপৃত হইয়াছে এবং কালক্রমে উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে। আমরা ইউরোপের দেড়শত বৎসর পরে এই বিজ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছি; কিন্তু গত বিশ পঁচিশ বৎসর মধ্যে বিজ্ঞান গবেষণায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিক- গণ বিশেষ কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন।

ফলিত বিজ্ঞানের চর্চ্চা দেশে এখনও তেমন ভাবে প্রসার লাভ করে নাই। দুই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত রসায়নের বিভাগ খোলা হইয়াছে, দুই একটা ফলিত রসায়নের পৃথক বিদ্যালয় বা ইনস্‌টিটিউট খোলা হইয়াছে। কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দেশে আছে এবং দেরাদুনে ফরেষ্ট রিসার্চ কলেজে কাজ হইতেছে। জামসেদপুরে টাটা কোম্পানি একটি টেকনিক্যাল ইনস্‌টিটিউট খুলিয়া অল্পসংখ্যক ছাত্রকে ধাতুবিজ্ঞান হাতে কলমে শিখাইয়া লইতেছেন ও পরে তাহাদিগকে কারখানায় ভর্ত্তি করিয়া লইতেছেন। রেল কোম্পানিগুলি কোনও কোনও স্থানে টেক্‌নিক্যাল স্কুল খুলিয়াছেন ও সেখানে হইতে পাশ করা ছেলেদের চাকরি দিতেছেন। ধানবাদে, খনিবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ফলিত বিজ্ঞানের জন্য শিক্ষালয় সম্বন্ধে ইহাই মোটামুটি সংবাদ। এ বিষয়ে অভাবপুরণ করিবার যথেষ্ট স্থান আছে। এ কথা দেশের অনেকে বুঝিতেছেন। সম্প্রতি সেন্ট্রাল প্রভিন্সের স্বর্গীয় রাও বাহাদুর লছমীনারায়ণ ফলিত বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও গবেষণার জন্য কলেজ স্থাপনকল্পে বিশলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। দেশে ফলিত বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও গবে- ষণা যতই বৃদ্ধিলাভ করিবে ততই নানাবিধ শিল্প ও কার- খানা আদি দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে। আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রকার ফলিত বিজ্ঞানের শিক্ষায়তন না থাকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কৃতী ছাত্র ইংলণ্ড, জাপান, জার্ম্মাণি আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গিয়া, ফলিত বিজ্ঞানের জ্ঞান আহরণ করিয়া, দেশে ফিরিয়া আসিয়া, শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার কারখানা খুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার অধিকতর পঠন-পাঠন ও গবেষণা দেশে প্রচলিত না হইলে কল কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে না। আধুনিক কালে কুটীরশিল্প একমাত্র শিল্প নহে। ইহার স্থান সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু কারখানা শিল্পের বহুল প্রচলন ব্যতিরেকে কখনই আমরা পাশ্চাত্য- দেশ সমূহের সহিত শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ সম্বন্ধে প্রতিযোগিতায় সফল হইতে পারিব না। জাহাজ, রেলের ইঞ্জিন, মোটর ডাইনামো, এরোপ্লেন, মোটরগাড়ী, ট্রাম, বেতার যন্ত্র, জলের কল, চিনির কল, কাপড়ের কল, তেলের কল,

পাটের কল, লৌহ, তাম্র, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু, সিমেণ্ট, কাঁচ পোরসিলেন, এসিড, সোডা, এলকোহল প্রভৃতি আধুনিক কালে নিত্য ব্যবহার্য্য অসংখ্য জিনিষ কল কারখানাতেই প্রস্তুত হয়। এই সকল কল কারখানার সরঞ্জাম, মায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, সবই পাশ্চাত্যদেশ হইতে আসে। এ সকল এদেশে প্রস্তুত করিতে হইলে কোটী কোটী টাকার মূলধন, অসামান্য ব্যবসায়-বুদ্ধি ও ফলিত বিজ্ঞান বিশেষতঃ ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার বহুল বিস্তৃতি ও উন্নতিসাধন প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য বিজ্ঞানই পাশ্চাত্যদেশে নবীন সভ্যতার যুগ আনায়ন করিয়াছে। তাহার ফলে উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু ও আজ গৌরীশৃঙ্গ ও কাঞ্চনজঙ্ঘার চির নীরবতা ভগ্ন হইয়াছে। বেতার সাহায্যে মুহূর্ত্তের মধ্যে সংবাদাদি পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রেরিত হইতেছে। নূতন নূতন ঔষধ ও প্রয়োগ প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হওয়াতে মানবের শারীরিক ব্যাধিনিচয় অধিকতর নিশ্চয়-তার সহিত দূরীভূত হইতেছে। দ্রব্যাদি বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হওয়াতে দরিদ্রতম ব্যক্তিরও ব্যবহারে আসিতেছে। ছাপাখানার বহুল উন্নতি সাধিত হওয়াতে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার সহস্রাধিক পরিমাণে সম্ভবপর হইয়াছে। দুঃখ ভিন্ন সুখ হয় না, অন্ধকার ভিন্ন আলোক থাকা সম্ভবপর নহে, সেইজন্য দেখিতে পাই বিজ্ঞান যেমন ক্লোরোফরম প্রভৃতি চৈতন্যলোপকারী ঔষধাদি আবিষ্কার করিয়া মানবদেহে কঠিন অস্ত্রোপচার সম্ভবপর করিয়াছে, অপরদিকে ডিনামাইট, করডাইট, টি, এন, টি, সাবমেরিণ প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া যুদ্ধবিদ্যাকে একান্ত ভয়াবহ ও মারাত্মক করিয়া তুলিয়াছে। তবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে এখন এমনই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রাদি ও বিস্ফোরক আবিষ্কৃত হইতেছে যে কিছুদিন পরে যুদ্ধবিগ্রহ অসম্ভবরূপে হন্তারক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। তাই লিগ অফ্ নেশানস্ প্রভৃতি জাতিসঙ্ঘ পৃথিবীতে চির শান্তি স্থাপনের জন্য বহু চেষ্টা করিতেছেন।

আশা করা যায় এইরূপ সঙ্ঘ ভবিষ্যতে পূর্ণ পরিমাণে সফলকাম হইতে পারিবে এবং এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানবমন জ্ঞানবিজ্ঞানের সেবা করিয়া তাহা হইতে আহরিত শুভ ফলেরই আস্বাদ অনাবিল আনন্দের সহিত চিরদিন উপভোগ করিবে।

তালতলা সাধারণ পাঠাগারের অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান শাখার-সভাপতির-অভিভাষণ।

গান

শ্রীরাসবিহারী মল্লিক

হায় গো—
নিবেই বুঝি প্রাণের প্রদীপ যায় গো!

নাম-না-জানা বঁধুর আশে,
রইনু বসে পথের পাশে,
গহন রাত্তি কাট্‌লো নিরাশায় গো!

শুকিয়ে গেল চিত্ত-গোলাপ,
জাগ্‌চে চোখে মৌন প্রলাপ,
পরাণ তবু চায় সে অজানায় গো!!

দেবালয়

গল্প

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম-এ, ডি-লিট্

হাঁটা স্বরু হয়েছে সেই সকাল থেকে,—পথ তবু শেষ হতে চায় না।

ভাদ্রমাসের খেয়ালী আকাশ; এই মেঘ করে, চার দিক্ আঁধার হয়ে আসে, দেখতে দেখতে আবার চড় চড়ে রোদ ফুটে বেরোয়।

শ্রীধর আর তরলা দুজনেরই গা দিয়ে টস্ টস্ করে ঘাম ঝরছে, কচি ছেলেটার মুখ খানার ওপর যেন আবীরের ঢেউ খেলে' যাচ্ছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে তরলা বললে—ওগো আর কত দূর? চার কোশ পথ কি আর কিছুতেই ফুরোবে না?

হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে শ্রীধর উত্তর দিল প্রায় এসে গেছি তরী, এই মোড়টা ঘুরলেই-মায়ের মন্দিরের চুড়ো দেখতে পাওয়া যাবে।

ঝাউ আর বাদাম গাছের ফাঁক দিয়ে মন্দিরের ধপ-ধপে চূড়াটা দূর থেকেই চোখে পড়ে।

হাতের পুঁটুলিটা মাটীতে নামিয়ে রেখে শ্রীধর সেখানে থেকেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলে—জয় মা রত্নেশ্বরী, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর মা।

তরলাও হাঁটু গেড়ে' বসে বার বার মাটিতে মাথা ঠেকাতে লাগলো; ছোট ছেলেটার মাথাটীও একবার মাটীতে নুইয়ে দিল।

রতন-গাঁর রত্নেশ্বরী কালী ও-অঞ্চলের মধ্যে ভারী জাগ্রত। অনেক দূরের পথ থেকে লোকে এখানে মানত শোধ দিতে আসে। সবাই বলে, সিদ্ধ-পীঠ ভক্তি ভরে ডাকলেই মায়ের কাণে গিয়ে তা পৌঁছোয়।

শনি মঙ্গল বারে খুবই ভিড় লেগে যায়। দোকান পশার, যাত্রী, ভিখারী সব নিয়ে একটা ছোটখাট মেলার মত বসে।

দক্ষিণ-পূব কোণের বাদাম গাছ তলায় নানারকম খেলনার দোকান, তার পাশে খাবারের দোকান দু'তিন

খানা, ও দিকে পাঁপর ভাজা, মুড়ি মুড়কি। ধুচুনি, ডালা কুলো প্রভৃতি নিয়ে কয়েক জন ডোমের মেয়েও এক পাশে বসে গেছে। পুকুরে যাবার পথের পাশে একজন ভিখারী রামপ্রসাদীর সুর ধরেছে। এককোণের একটা দোকানে প্রসাদী মাংস বিক্রী হ'চ্ছে, তার সামনে লেগে গেছে কতকগুলো কুকুরের হুড়োহুড়ি।

মন্দিরের উত্তর পাশের একটা আমগাছ তলার বাঁধানো বেদীর ওপর বসে শ্রীধর গামছাখানি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগলো, এক একবার হাতখানা এগিয়ে ছেলেটীর ও তরলার মুখের উপর হাওয়াটা চালিয়ে দিতে লাগলো।

বটগাছের পাতাগুলো থেকে' থেকে' এক একবার যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ছে, আর ঝাউ গাছের একটানা দীর্ঘশ্বাস চলেছে, সোঁ সোঁ সোঁ।

একটু শ্রান্তি দূর হতেই তরলা বললে আর দেরী করছ কেন? এত খানি বেলা পর্য্যন্ত না খেয়ে খোকন ধনের মুখটী যে একেবারে চুপসে গ্যাছে। চূড়ামণি ঠাকুরের সঙ্গে কথা কয়ে তাড়াতাড়ি মায়ের পূজোটা দেওয়ার ব্যবস্থা করগে।

"এই যাই"—বলে শ্রীধর উঠে পড়লো।

মন্দিরের সিঁড়ির কাছাকাছি যেতেই চূড়ামণি ঠাকুরের গোমস্তা করালী ঠাকুরের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

করালী লোকটীর চেহারা দেখে তার বয়স অনুমান করা শক্ত। তিরিশ বত্রিশ থেকে চল্লিশ বিয়াল্লিশ পর্য্যন্ত যে কোন একটা বয়সই তাকে মানায়। মাথার চুলগুলো দীর্ঘ ও রুক্ষ, চোখদুটি পাতালে যাওয়ার উপক্রম করছে, কিন্তু তার লাল আভা বাইরে এসে ঠিকরে পড়ে। হাত পা গুলোর উপর দিয়ে শিরা উপশিরার রেলের লাইন চলে গেছে। গলায় এক লম্বিত রুদ্রাক্ষের মালা, আর কপালে একটী মস্ত বড় ডগ-ডগে সিন্দুরের ফোঁটা।

মন্দিরের কাজ ও আয় দিন দিন বেড়ে চলেছে। বৃদ্ধ চূড়ামণি একা সব দিক সামলাতে পারেন না। আজ ক'বছর থেকে করালীকে তাই সহকারী নিযুক্ত করেছেন। নিত্যকার মূল পূজা অবশ্য এখনও চূড়ামণি ঠাকুর-ই করেন, তবে বাইবে থেকে যা' আসে তার সব ভা করালীর ওপর।

পূজার ডালি হাতে নিয়ে একব্যক্তির সঙ্গে কথা কা কাটি করতে করতে করালী নীচে নামছিল।

শ্রীধর বুঝলে, দক্ষিণার অল্পতাই এই বচসার কার তার মনটিও অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। তার নিজে পূজাও বড় বেশী নয়। মাত্র এক টাকা সওয়া পাঁচ আন মধ্যেই তাকে সব সারতে হবে। দক্ষিণা না হয় বড় জো চার আনা সে দিতে পারবে।

এই সামান্য পয়সা কটী যোগাড় করতেই তাকে কম কষ্টটা পেতে হয়েছে? নেহাৎ দেবতার ধার, ফে রাখা সঙ্গত নয়, তাই। নইলে এই দুর্বৎসরে তার গরীবের পক্ষে এ টাকাটা খরচ করাও যে কত শক্ত, হয়ত এক দেবতা ছাড়া আর কেউ বুঝতেই পারবে না।

বছর পাঁচ ছয় আগেকার কথা। তরলার বয়স তখ প্রায় সতেরো আঠারো। শ্রীধর তাকে বিয়ে করে তারও প্রায় ছয় সাত বছর আগে। এতদিনের মধ্যে তরলার সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিল না দেখে শ্রীধরের বুে মা একেবারে মুষড়ে পড়ল। তার মত পোড়া কপালী ভাগ্যে নাতির মুখ দেখা বোধ হয় আর ঘটে উঠল ন অনেক দেবতার দুয়ার ধরে ও যখন কিছুতে কিছু হলো ন তখন এই রত্নেশ্বরী মার মাহাত্ম্য শুনে শ্রীধর এসে মান করে—মায়ের দয়ায় তরলার যদি একটী ছেলে হয়, ত তারা স্ত্রী-পুরুষে এসে যথা শক্তি মায়ের পুজো দিয়ে যাবে

শ্রীধরের ইচ্ছা ছিল একটু ঘটা করেই মায়ের পূজা দেয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে তার বৃদ্ধা মাতার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে—সেই জন্য তাকে সমাজের দ্বারস্থ হতে হয়। ক তার একমাত্র সম্বল দু'বিঘা চাষের জমি গ্রামের মহাজ ভূষণ সাহার কাছে বাঁধা পড়ে। আজ তিন বছর জমির ধান পায় না; সুদের দরুণ মহাজন তা' গ্রাস করে

ছেলেটীকে নিয়ে কি ভাবে কায়ক্লেশে যে তাদের কাটছে তা শুধু অন্তর্যামী-ই জানেন।

ছেলে হলে সে মনের আনন্দে তরলাকে এক সোনার বাঁধানো শাঁখা কিনে দিতে চেয়ে ছিল।

গোল গাল হাত ছুটিতে দুগাছি সোনার শাঁখা ভারী সুন্দর মানাবে। সোনার শাঁখা দূরে থাক্, আজ তিন বছরের মধ্যে সে তরলাকে একখানা নক্সা পেড়ে আট-পৌরে শাড়ী পর্য্যন্ত দিতে পারে নি। তরলা অবশ্য কোন দিন কিছু বলে নি, কিন্তু না দিতে পারার দুঃখটা কাঁটার মত শ্রীধরের মনে গেঁথে আছে।

এসব গেল নিজেদের ঘরোয়া কথা। ঠাকুর দেবতার কথা স্বতন্ত্র। তাঁদের মানত রক্ষা না করলে যদি দেবতার রাগ হয়, ছেলেটির যদি ভালমন্দ কিছু হয়!

ভয়ে-ভয়ে শ্রীধর বাপের আমলের একটা ভারী পিতলের গামলা প্রতিবেশী সতু ময়রার কাছে বাঁধা রেখে অনেক কাকুতি মিনতি জানিয়ে মাত্র ছুটী টাকার যোগাড় করেছে।

শেয়ারের গোরুর গাড়াতে এলে মাথা পিছু দু'আনা করে লাগে। এই সামান্য পয়সা কটি খরচ করাও শ্রীধরের পক্ষে বাবুয়ানা। ছেলে কোলে করে বউ-এর হাত ধরে দীর্ঘ আট মাইল রাস্তা সে পায়ে হেঁটেই চলে এসেছে।

করালীঠাকুরের কাছে আসবামাত্রই শ্রীধর তার পায়ের ওপর মাথা রেখে বললে—প্রাতঃ পেন্নাম হই গো দাদা-ঠাকুর, একটা মানত শোধ দিতে এয়েছি।

আগেকার লোকটীর সঙ্গে বচসায় করালীর মনটা কিছু উষ্ণ ছিল। আশীর্ব্বাদের ভঙ্গিতে হাত উঁচু করে বললে—কতকের পূজো?

ভয়ে ভয়ে শ্রীধর বললে: এজ্ঞে, আমরা নিতান্ত গরীব মানুষ, এই এক টাকা সওয়া পাঁচ আনার পূজো; দক্ষিণে আপনাকে চার গণ্ডা পয়সাই দেবো'খন।

করালীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল; মাত্র ।/৫ আনা? কি জন্যে মানত করেছিলি?

সঙ্কোচের সঙ্গে শ্রীধর সকল কথাই খুলে বললে।

গম্ভীর ভাবে করালী বললে হুঁ, মায়ের দয়ায় ছেলে পয়েছিস্, আর এখন মাকে একটাকা সওয়া পাঁচ আনা ভিক্ষে দিতে এসেছিস। তোদের কি ধর্ম্মের ভয়ও একটু নেই? আচ্ছা বেশী না পারিস্ ন'সিকের পূজোটাই না হয় দে, সিধে আর দক্ষিণের বাবদ আমাকে না হয় মাত্র আট আনার পয়সাই দিস্।

শ্রীধর কাকুতি জানিয়ে আরও কি বলতে যাচ্ছিল; করালী কিন্তু সে দিকে কাণ না দিয়ে একেবারে লাফাতে লাফাতে সামনের দিকে ছুটে গেল। নীচেকার কোলাহল মুহূর্ত্তের জন্য শান্ত ভাব ধারণ করলে।

শ্রীধর দেখে, মন্দির-প্রাঙ্গণের বাইরে একখানা বড় পাল্কী এসে দাঁড়িয়েছে, করালী দু'পাশের ভিড় ঠেলতে ঠেলতে সেই দিকেই ছুটে চলেছে।

ক্ষণপরেই করালীর গলায় আওয়াজ পাওয়া গেল কী সৌভাগ্য! আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়। তার পর সব কুশলত? অনেক দিন পরেই হুজুরের পদধূলি এখানে পড়ল; ওরে কে আছিস্। শীগ্গির চূড়ামণি ঠাকুরকে খবর দে, হুজুর আজ সশরীরে এসেছেন।

হুজুর ততক্ষণে তাঁর বিশাল কলেবর নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। বড় বড় দুখানা পাখা নিয়ে ছুটি লোক তাকে হাওয়া করতে লাগল।

একখানা সুগন্ধি রঙিন রুমাল বার করে হুজুর তাঁর বাঘের মুখের মত গোল মুখ খানা থেকে ঘন ঘন ঘাম মুছতে লাগলেন। শিকারী বিড়ালের চোখের মত তার জলজলে চোখ ছুটি চার দিকে ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল।

বাদাম তলায় ডোমের মেয়েরা গায়ের মাথার কাপড় টেনে টুনে ঠিক করে দিল।

বৃদ্ধ চূড়ামণি ঠাকুরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই হুজুরের অভ্যর্থনার আরও ধূম পড়ে গেল।

করালী তাড়াতাড়ি একখানা বড় কার্পেট এনে বারান্দায় বিছিয়ে দিল, আর মন্দিরের ভৃত্য যদু ঘোষ একটা প্রকাণ্ড গড়গড়ার উপর কল্কে বসিয়ে নলটি হুজুরের দিকে এগিয়ে দিল।

ধূম্রপানে হুজুর কিঞ্চিৎ সুস্থ হলে বৃদ্ধ চূড়ামণি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন তার পর হঠাৎ কি মনে করে এদিকে পদার্পণ হল?

উত্তর আর হুজুরকে দিতে হ'ল না, পার্শ্বচরদের মধ্যে এক জন বলে উঠল—মাকে দর্শন করতেই হুজুরের আগমন হয়েছে। তা ছাড়া একটা মানত শোধও আছে। জানেন না ত, একেবারে জোড়া পাঁঠা ষোড়শো-

পচারে. পূজো, জিনিষ পত্তর নিয়ে লোক জন এই এসে পড়ল বলে।

কাজল পুরের মামলাটার দরুণ বুঝি?

হুজুর শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

পার্শ্বচর আবার বলে উঠল: মায়ের ওপর হুজুরের অসীম ভক্তি, তাই মা এই বিপদ থেকে ত্রাণ করলেন —জয় মা রত্নেশ্বরী, তুমিই ভরসা মা।

হয়ত ভক্তিতেই গদ গদ হয়ে লোকটি দুই হাত জোড় করে বার বার কপালে ঠেকাতে লাগল!

কাজল পুরের ব্যপারটি নিতান্ত তুচ্ছ নয়। হুজুর ওরফে রতন গাঁএর এই ক্ষুদ্র জমিদারটি ছিলেন একটী ছোট খাট রাবণ বিশেষ। তাঁর দৌরাত্ম্যে আশে পাশের দশ খানা গাঁয়ের গরীব গৃহস্থের বৌ ঝি নিয়ে বাস করা বিপদ হয়ে উঠেছিল।

জেলার সদরে একটা মোকদ্দমার তদ্বির করে হুজুর নৌকাযোগে গ্রামে ফিরছিলেন।

কাজল পুরের কাছা-কাছি আসতে সন্ধ্যা হয়ে যায়, এই সময়ে হুজুরের চোখে পড়ে একটী মেয়ে, বয়স অল্প, দেখতেও বেশ সুন্দরী, একাকিনী নদীর ঘাটে জল নিতে এসেছে।

হুজুর আন্দাজে বুঝলেন, কোনো গরীব চাষার বৌ। তাঁর ইঙ্গিতে তাঁর সহচরেরা মেয়েটির মুখে কাপড় বেঁধে নৌকায় এনে তুললে। রাতারাতিই নৌকা এসে কাজল-পুরে পৌঁছে গেল।

মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া হল' হুজুরের বাগান বাড়ীতে।

দুচার দিন বাদে একদিন রাত-দুপুরে হুজুরের বাগান বাড়ীকে ডাকাত পড়ল। হুজুর বুঝলেন, এ কাজলপুরের দল, তাঁকে খুন করাই এদের উদ্দেশ্য।

বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ চালিয়ে কোন রকমে সে দিন তিনি প্রাণ বাঁচালেন।

এই ঘটনার পাঁচ ছয় দিন পরে একদিন কাজলপুরের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখলে সেই অপহৃতা বৌটীর মৃতদেহ তারই শশুর বাড়ীর কাছে এক কাঁঠাল গাছে ঝুলচে।

সেপাই শান্ত্রী নিয়ে মহকুমার বড় দারোগা এলেন তদন্ত করতে।

সরকারী লোক জনের যাতে অসুবিধা না হয় তা' দেখবার জন্য হুজুর সশরীরে অকুস্থলে হাজির হলেন।

কাজলপুরের লোকদেরই অনেকের জবানবন্দীতে প্রকাশ পেল; মৃতা বৌটির স্বভাব চরিত্র আদৌ ভাল ছিল না। তার স্বামী তাকে মাঝে মাঝে খুবই মার দিত। হয়ত গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরেই বৌটা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

হুজুরের বাড়ীতে কচি পাঁঠার ঝোলের সঙ্গে খাঁটী বিলাতী পেগ খেয়ে দারোগাবাবু হাসি মুখে বিদায় নিলেন।

একে গ্রামের জমিদার, তার ওপর এমনই প্রবল-প্রতাপ। কি করলে যে হুজুরের কৃপাদৃষ্টি লাভ হবে, তা-ই হয়ে উঠল করালীর একমাত্র চিন্তা।

ছুটাছুটী ও সোরগোল করে সে একাই আসর গরম করে ফেললে।

ছাগ শিশু দুটিকে কোলে করে করালী পুকুর ঘাটের দিকে চলেছে, এমন সময় শ্রীধর এসে আবার ভয়ে ভয়ে বললে, 'দাদা ঠাকুর আমার পুজোটা? ছেলেটা যে ক্ষিদেয় একেবারে নেতিয়ে পড়েছে।

করালী দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল, যা, যা, পথ ছাড়, বেটা ছোটলোক কোথাকার! হুজুরের পুজো এখনও হল না, ও বেটার পুজো হবে আগে! আজ চলে যা, আর একদিন সুবিধে বুঝে আসিস্ এখন।

শ্রীধরের চোখে জল এল। শুধু মানুষের নয়, দেবতার প্রতি ও রুদ্ধ অভিমানে তার বুকখানা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। শুধু গরীব বলেই এত অবহেলা?

ধীরে ধীরে সে স্ত্রী-পুত্রের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

তরলা বললে, কই গো, আর কত দেরী হবে? খোকন যে আর থাকতে পারছে না।

শ্রীধর দেখলে, অনাহারে ও পথ হাঁটার পরিশ্রমে তরলার চোখ দুটিও কেমন ম্লান হয়ে গেছে। ছেলেটি মায়ের কোলে একেবারে এলিয়ে পড়েছে।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সে বললে, আজ [illegible] আর আমাদের পুজো করবে না। যার মনে যা' আছে

তাই হবে, বাপ হয়ে ছেলেকে কি আমি না খেতে দিয়ে মেরে ফেলবো ?

কোঁচার খুঁট খুলে কতক গুলো পয়সা বের করে, শ্রীধর ছুড়ে পুকুরের জলে ফেলে দিল।

তরলা হা হা করে উঠল : ও কি করছ ? তুমি কি পাগল হলে নাকি ? মায়ের পুজো না দিয়ে পয়সা গুলো সব জলে ফেলে দিলে ?

উত্তেজনায় শ্রীধরের তখন সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে। সে বললে —মায়ের পুজো করেও যাদের মন বড় হতে পারে নি, পয়সার লোভে যারা বড় লোকের খোসামোদ করে' তাদের পয়সা দেওয়া, আর জলে ফেলে দেওয়া—ও দুই-ই সমান। মায়ের পুজোর পয়সা আমি ফিরিয়ে নিতে চাইনে, তাই মায়ের পুকুরেই ফেলে দিয়ে গেলাম।

বিস্মিত নির্ব্বাক তরলার হাত ধরে শ্রীধর একরকম জোর করেই তাকে টেনে বাদামতলার মুড়ি মুড়কির দোকানের দিকে এগিয়ে চলল।

ও-দিকে মন্দির প্রাঙ্গণ আট দশটা ঢাকের আওয়াজে জম্ জম্ করছে, আর সেই শব্দ ভেদ করে তীরের মত এসে কাণে বিঁধছে দুটী নিরীহ ছাগ শিশুর করুণ আর্ত্তনাদ —ম্যঁা, ম্যঁা !

ডোমের মেয়ে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দ্বাদশ বরষ দেশান্তরী
　স্বামী তাহার আসবে কি ?
মেঘে ঢাকা দ্বাদশী চাঁদ
　নীলাকাশে ভাসবে কি ?
আদরিণী কন্যা বাপের
　বুকে দারুণ দুঃখ যে,
"সাঙা"র নামে রাঙা করে
　কন্যা তাহার চক্ষু যে।
স্বামীর লাগি ব্রত পারণ
　নিত্য করে চণ্ডী মার।
প্রণামে তার খাল যে হলো
　তুলসী তল বন্দিবার।
ডোমের মেয়ে স্বামীর লাগি
　নিত্য ফেলে নেত্র নীর,
কথা শোনে ভক্তিভরে
　সীতা এবং সাবিত্রীর।
বাহুতে কি শক্তি তাহার
　করেনাক কাউকে ডর,
লাঠীর ঘায়ে মেরেছিল
　একদা সে বনশূকর।
ভদ্র ঘরের কন্যা বধূ
　করে তারে ভক্তি যে.

সবল তাহার বাহু মনে
　সমান ধরে শক্তি সে।
সাধ্বী সতীর পুণ্য বলে
　পল্লী হলো ধন্যা গো.
রূপকে ঘিরে কি তেজ জাগে
　সত্য সে নাগকন্যা গো।
হঠাৎ ঘরে ফিরলো স্বামী
　গ্রাম ভরেছে উল্লাসে
ফিরে এলো কোথায় থেকে
　লখিন্দরের তুল্য সে।
ধন্য মেয়ে তপস্যা তোর
　ধন্য পতি ভক্তি রে,
ধৈর্য্য এবং নিষ্ঠা অপার
　ধন্য অনুরক্তি রে।
আসলো গ্রামের পুরুষ নারী
　আসলো ভেঙ্গে অন্দরই
দেখলে পতির পায়ের কাছে
　মূর্চ্ছা গেছে সুন্দরী।
এত কঠোর এমন কোমল
　কোন বাগানের ফুল ওরা,
ওরাই পারিজাতের জাতি
　ওরাই মোদের 'ফুলরা'।

হরিমতি

শ্রীনকুড়চন্দ্র মিত্র বি-এ

যত রাজ্যের জিনিষ সওদা করিয়া হাতে, বগলে, কাপড়ের খুঁটে বহন করিয়া একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক কোনরকমে ফুট-পাথের ভিড় কাটাইয়া চলিতেছিল,—তাহার অগ্রে অগ্রে একটি পাঁচ বৎসরের বালক একটা টিনের বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে যাইতেছিল। কিয়ৎদুর গিয়া বালক বাঁশি থামাইয়া বলিল—আমি আর হাঁটতে পাচ্চি না, মা তুই কোলে কর।

চ' বাবা, ঐ তো বাড়ী এসে প'ড়েছি।

বালক শুনিল না, বলিল—আমায় কোলে নে, নয়ত আমি আর যাব না। এই আমি রাস্তায় বসলুম—বসলুম-এই—

হতচ্ছাড়া ছেলে যে আমায় দিনরাত জ্বালায়ে খেলে গা, বলিয়া স্ত্রীলোকটি ফুটপাথের একপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল এবং হাতের জিনিষগুলি একে একে নীচে নামাইয়া বালকটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া আবার সেগুলিকে উঠাইতে লাগিল। সকলগুলিকে নিজের অঙ্গে কোনোপ্রকারে ঝুলাইয়া দিয়া সে প্রায় চলচ্ছক্তি-রহিত হইয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কোলে উঠিয়া বালক আবার বাঁশী বাজাইতে লাগিল। তাহার ফুৎকারের গমকে স্ত্রীলোকটির সর্ব্ব-শরীর ভূমি-কম্পের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কয়েক পা অগ্রসর হইয়া সেই স্ত্রীলোক বড় রাস্তা ছাড়িয়া একটি সরু গলি ধরিল,—ছাতাওয়ালাদের বস্তিটা ডিঙাইয়া গলির প্রায় শেষ প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ীর মধ্যে সে বালককে লইয়া প্রবেশ করিল।

স্ত্রীলোকটি এই বাড়ীর ঝি। বালকটি তাহার মনিব-পুত্র। শিবনাথ বাবুর স্ত্রী হেমলতা দুই বৎসর পূর্ব্বে সহসা তিন দিনের জ্বরে স্বামীর কোলে মাথা রাখে। মরিবার সময় সে বাড়ীর এই পুরাতন ঝির হাত ধরিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল—দিদি, পুলিনকে আমি তোমায় দিয়ে গেলাম—দেখো। সেই হইতে হরিমতি পুলিনের মাতৃত্বের পদ গ্রহণ করিয়াছে। শিবনাথের সংসারে স্ত্রী, এই শিশু পুত্র

ও ঝি ছাড়া আর কেহ ছিল না। মরণের সময় হেমলতা হরিমতিকেই পুলিনের ভার দিয়া গিয়াছিল—নতুবা, এই মা-মরা ছেলেটাকে আর দেখিবে কে? শিবনাথের মা বর্ত্তমান থাকিতে তিনি একবার তারকেশ্বরে গিয়া এই ঝিটিকে সঙ্গে লইয়া আসেন। সে আজ পাঁচ-ছয় বৎসরের কথা। হরিমতি নীচু জাতের মেয়ে হইলেও এই কায়স্থের সংসারের আপনাকে বেশ গোছাইয়া-মানাইয়া লইয়াছিল এবং হেমলতাকে সে বাজার-হাট করিয়া, বাসন মাজিয়া, ঘরদোরে ঝাঁটাইয়া, উনান ধরাইয়া, ছেলে গছিয়া, সঙ্গ দিয়া সাহায্য করিত। হরিমতিদের দেশ ঐ তারকেশ্বর লাইনেরই এক গ্রামে। দেশে তাহার বাস্তু একটু ছিল,—আপনার জন বলিয়া কেহ ছিল না। প্রথম বয়সে তাহার নাকি একটি সন্তান জন্মিয়াছিল কিন্তু আঁতুড়-অবস্থাতেই সে মারা যায়। হেমলতার মৃত্যুতে শিবনাথ আর বিবাহ করিবেন না দৃঢ়-সংকল্প হইলেন এবং বন্ধু-বান্ধবদের উপরোধ অনুরোধ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া এক দূর সম্পর্কীয়া জ্ঞাতী খুড়ীকে আনাইয়া সংসারাশ্রম সচল রাখিলেন। এই খুড়ী ও হরিমতি প্রায় এক বয়সী, খুড়ী কিছু ছোট। কচি-ছেলে পুলিনের ভাবনাটাই শিবনাথের সর্ব্ব প্রধান ভাবনা ছিল,—কিন্তু সে যখন হরিমতির একান্ত আপন হইয়া দাঁড়াইল তখন দ্বিতীয়বার বিবাহের কল্পনাকে পর্য্যন্ত তিনি মনে স্থান দিতে চাহিলেন না।

যে দিন পুলিনের মা মারা গেল সেই দিন হইতে হরিমতি এই পুলিনকে আপনার গলার হার করিয়াছে। এক মুহূর্ত্ত সে পুলিনকে না দেখিলে থাকিতে পারে না,—পুলিনকে সে নিজের হাতে নাওয়াইবে, খাওয়াইবে, ধুয়াইবে, মুছাইবে, রাত্রে বুকের মধ্যে পুরিয়া ঘুমাইবে। সারাদিন সে পুলিনকে দেখে, স্পর্শ করে, রাত্রে কোলের কাছে ঘুমাইয়া পড়িলে অন্ধকারে তাহার হাত দু'খানি আপনার বুকের উপর উঠাইয়া লইয়া কত কি ভাবে, এবং নিদ্রিতাবস্থায় তাহাকে স্বপ্ন দেখে! পুলিনও তাহার কাছ-ছাড়া হইতে চাহে না। সে হরিমতিকে মা বলিয়া জানে ও মা বলিয়া ডাকে। যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে ততক্ষণ হরিমতির ছায়ার সহিত এক হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ঘুম পাইলে সে হরিমতির বুকের উপর শয্যা রচনা করিয়া শোয়। পুলিন বাপের কাছেও বড় একটা যায় না। আয় না পুলিন ট্রামে ক'রে তোকে বেড়িয়ে আনি—বলিয়া শিবনাথ তাহাকে ডাকিলেও সে যাইতে চাহে না, বলে মাকে নিয়ে চল তবে যাবো। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা তাহার সহিত সহিত ভাব করিতে চায় কিন্তু সে সব তার ভাল লাগে না,—শুধু মা আর মা। মধ্যে হরিমতি কি একটী বাস্তু-সংক্রান্ত গোলমাল মিটাইতে মাত্র দুই তিন দিনের জন্য পুলিনকে লুকাইয়া দেশে গিয়াছিল। কিন্তু পুলিনের আহার নিদ্রা ত্যাগ ও অবিরাম কান্না-কাটিতে শিবনাথকে পরদিনই গিয়া হরিমতিকে ফিরাইয়া আনিতে হইয়াছিল। জ্ঞাতী খুড়ীটি হরিমতিকে প্রায়ই সাবধান করেন—হরি, এ তোর হ'ল কি? বুড়ো হলি, কোথায় সংসারের মায়া কাটিয়ে দুদণ্ড ভগবানের নাম করবি, না, এই বয়সে নূতন করে ফাঁদে পা! খুড়ীর কথা শুনিয়া হরিমতি সত্যই ভয় পায় এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে বারে বারে কপালে দুই হাত ঠেকাইতে থাকে। সন্ধ্যার সময় সে খুড়ীর পায়ের কাছে বসিয়া ভগবানের চিন্তা সুরু করিয়া দেয়। কিন্তু বাহির ও ভিতর দুই দিক দিয়া পুলিন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে এমনি বিব্রত করিয়া তুলে যে, তাহার ভগবৎ সাধনা আরম্ভেই সমাপ্ত হয়। জীবনের এই শেষ-সীমানায় এই একটা পরের ছেলের জন্য তাহার এতখানি স্নেহ এতকাল ধরিয়া কোথায় যে নিঃশব্দে পড়িয়াছিল তাহা হরিমতি কোনমতে ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারে না!

— ২ —

কিন্তু, দিন যতই কাটিতে লাগিল—হেমলতার স্মৃতিও যতই পশ্চাতে গিয়া পড়িতে লাগিল, শিবনাথ ততই যেন দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার সংসারে আর শান্তি-শৃঙ্খলা নাই, তাঁহার খাওয়া হইতেছে না—কেহ তাহা দেখে না, তাঁহার ঘুম হইতেছে না—কেহ তাহা জিজ্ঞাসা করে না, তাঁহার পরিশ্রমের রোজগার পরেই খাইতে লাগিল, ছেলেটার হেনস্থা না'হক ঠিক মত সে মানুষ হইতেছে না, সংসার সেই যখন তাহাকে করিতেই হইতেছে তখন

মাস্তুল-হীন জাহাজ হইয়া তরঙ্গে ওলট-পালট খাইতে খাইতে ডুবিয়া মরাই বা কেন!

এই সকল ভাবনা চিন্তা ক্রমে ক্রমে শিবনাথকে যেন পাইয়া বসিল। তিনি আপনার অফিসের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কয়েকজনের কথা ভাবিয়া দেখিলেন, তাহারা প্রথম পত্নীর মৃত্যুতে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে বিলম্ব করে নাই। তবু তাহাদের মা বাপ ভাই বোন কেহ না কেহ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু শিবনাথের কে আছে? শিবনাথ তো আর সখের বিবাহ করিতে চাহেন না—এটা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত একটা প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। তিনি কি করিবেন,—উপায়হীন। তবে হ্যাঁ, পুলিন ও তাহার সৎমার সহিত বনিবনাও কিরূপ হইবে—ভবিষ্যতে তাহাদের লইয়া কোন গোল বাধিবে কি না, ইহা একটা ভাবনার কথা বটে। কিন্তু তিনি নিজে শক্ত ও সাবধান থাকিলে সে-সকলের সুযোগ ঘটিবে কি করিয়া? তাছাড়া, তিনি এমন একটি কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিবেন—যে সুশীলা, নম্র-স্বভাবা, কর্ত্তব্য-পরায়ণা ও উদার হৃদয়া হইবে। ধৈর্য্য ও মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি হইয়া সে তাঁহার সংসারের মধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। এই মরুভূমিতে সে সুধা-মন্দাকিনী বহাইবে—তাঁহার বজ্রাহত দগ্ধ হৃদয়ে আবার নব-পল্লব অঙ্কুরিত করিবে। এই দুই দুইটা বৎসর তাঁহার কি কষ্টেই না গিয়াছে! তিনি বলিয়াই এত সহিয়াছেন। এইবার তাঁহার সকল দুঃখের শান্তি হইবে! শিবনাথ সেই লজ্জাময়ী, প্রেমময়ী, দ্রবময়ী কল্পনাময়ী মূর্ত্তিকে নিদ্রায় জাগরণে, বিশ্রামে, কর্ম্মে এমন কি অফিসের ফাইলের পাতায় পাতায় দেখিতে লাগিলেন। এদিকে খুড়ী ও হরিমতীর সহিত তাঁহার তুচ্ছ বিষয় লইয়া ঝগড়া-দাঙ্গা দিন দিনই যেন বাড়িতে লাগিল এবং তাঁহার সকল কথার শেষ কথা আজকাল এই হইয়া দাঁড়াইল—নাঃ এবার আমার বাড়ী ছেড়ে যেতেই হ'ল—আর না!

অবশেষে শিবনাথের বিবাহটা সম্পন্ন হইয়া গেল। নূতন গৃহিণী নবতারাকে ঠিক বালিকা বধূ বলা চলে না—বয়স হইয়াছিল। স্বামীর ঘর করিতে আসিয়া নবতারা তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি বুঝিয়া লইতে অধিক বিলম্ব করিল না।

পুত্র-বর্ত্তমান দোজবরে স্বামীর সংসারে মাথা গলাইবার পূর্ব্বে নবতারা কতকটা প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। সে প্রথমেই পুলিনকে এমনভাবে বুকে আঁকড়িয়া ধরিল যে, শিবনাথ মস্ত একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন বাঁচিলেন। খুড়ীকে সে এমনি ভক্তি-যত্ন আরম্ভ করিল যে, শিবনাথ বিস্ময় ও আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। হরি ঝিকে সে কাছে ডাকিয়া তাহাকে একান্তভাবে পুলিনকেই লইয়া থাকিবার জন্য বলিয়া দিয়া নিজে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম অবিশ্রান্ত ভাবে করিতে লাগিল,—দেখিয়া, শিবনাথ ভাবিলেন, নবতারার মত এমন স্ত্রী সহসা কাহারো ভাগ্যে মিলে না!

মুগ্ধ শিবনাথ একদিন উপর-পড়া হইয়াই নবতারাকে বলিলেন, তুমি এত খাটো কেন, তোমার শরীর ভাল নয়, শেষে কি একটা অসুখে প'ড়ে যাবে।

নবতারা হাসিয়া বলিল, আমার সংসারে আমি খাটবো না তো কে খাটবে?

এই অবিশ্রাম খাটুনির ভিতর দিয়া নবতারা যখন সংসারে ও স্বামীর অন্তরে আপনার আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিল, তখন সে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ী যাইতে চাহিল। হাওড়া-রামকৃষ্ণপুরে তাহার পিত্রালয়। নবতারা পুলিনকে সঙ্গে লইবার জন্য জেদ করিল—পুলিন মাকে ছাড়িয়া গেল না—নবতারা একাই গেল।

প্রায় চারি মাস কাটিয়া যায় তবু নবতারা এমুখো আর হয় না। শিবনাথও একরূপ বাড়ী ছাড়িয়া শ্বশুরের ওখানে গিয়া উঠিয়াছেন—রামকৃষ্ণপুর হইতেই আফিস আনাগোনা করেন। দৈবাৎ বাড়ী আসিলে খুড়ীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—শরীরটা তার শোধরাচ্চে না—আর কিছুদিন সেখানেই থাকুক—এখানে এলে তো আর খাটুনির অন্ত থাকে না। খুড়ী আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকেন।

নবতারা যখন বাপের বাড়ী হইতে পুনরায় স্বামীর ঘর করিতে আসিল তখন তাহার আরো কিছু বয়স বাড়িয়াছে। তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। খুড়ীকে একটা চিপ করিয়া প্রণাম করিয়া সে সরাসরি আপনার ঘরে উপরে উঠিয়া গেল। হরিমতি [illegible]

পুলিনকে লইয়া কোথায় গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিতে নবতারা পুলিনকে বলিল, কি রে পুলিন—কেমন আছিস—আমায় চিন্‌তে পারিস? পুলিন কোনো কথার জবাব না দিয়া হরিমতির হাত ধরিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

নবতারার শরীর নাকি অত্যন্ত খারাপ—ডাক্তার তাহাকে কোন প্রকার পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। কাজেই খুড়ীর রাঁধাবাড়ার কার্য্য ও হরিমতির সমস্ত পাটঝাট পূর্ব্বের মতই চলিতে লাগিল।

এ সংসারে স্বভাবতঃ খুড়ীই প্রধান কর্ত্রী,—তাঁহারই কথায় শিবনাথের সংসার এতদিন চলিয়া আসিয়াছে, আজো সেই নিয়মে চলিতেছে। নবতারা এবার কিন্তু স্থির সংকল্প করিয়া আসিয়াছে যে, তাহার নিজের সংসারে অপরের কর্ত্তৃত্ব সে আর সহিবে না। এবং ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য সে আজকাল খুড়ীর প্রতি কথারই প্রতিবাদ করিয়া থাকে ও জিদের সহিত তাহার সকল ইচ্ছাকে প্রতিহত করিয়া দেয়। অফিসের ভাতের একটু দেরী হইলে বা রান্নার কোনো প্রকার ত্রুটি হইলে সে খুড়ীকে দুই একটা কড়া কথা শুনাইয়া দিতেও ছাড়ে না। খুড়ী বড় চাপা স্ত্রীলোক,—সহসা কোন গোলমাল বাঁধান না; তাছাড়া, এটা পরের সংসার। তিনি বুঝিলেন, এখানকার কর্ত্তৃত্ব তাঁহার তো গিয়াছে, এখানে থাকাও আর যুক্তি-সঙ্গত নয়। একদিন শিবনাথকে একা পাইয়া খুড়ী বলিলেন—বাবা অনেক দিন দেশছাড়া হ'য়েছি, একবার সব দেখে শুনে আসি। খুড়ীর আসল মনোভাবটা শিবনাথের আদৌ অবিদিত ছিল না, তথাপি বলিলেন—যেতে চাও যাও একবার ঘুরে এস। নবতারার স্পষ্ট কথাবার্ত্তায় শিবনাথ বেশ বুঝিলেন যে, খুড়ীকে আর এ বাড়ীতে রাখা চলে না, র'খিলে খুড়ীর সহিত নবতারার প্রকাণ্ড কলহ বিবাদ যে কোনো মুহূর্ত্তে দেখা দিবে। তাই শিবনাথ তাঁহাকে, আবার কিছু দিন পরে আস্‌তে হবে কিন্তু, বলিয়া উপস্থিত বিদায় দিলেন। নিজের মান নিজের কাছে রাখিয়া খুড়ী চিরদিনের মত শিবনাথের সংসার ছাড়িয়া গেলেন। যাইবার সময় হরিমতি আসিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া কাঁদিতে লাগিল। খুড়ী নিজের চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, হরি, তোকে কত রূঢ় কথা বলেছি, কিছু মনে করিস্‌নিরে। পুলিনের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—হরি, তোর এই ছেলেটাকে সাবধানে রাখিস্‌! খুড়ীর এই শেষ কথায় হরিমতি কেমন যেন ভয় পাইয়া শিহরিয়া উঠিল। খুড়ী চলিয়া গেলে, সে কি ভাবিয়া পুলিনকে সজোরে আপনার বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

— ৩ —

নবতারার এক বিধবা মাসী আসিয়া খুড়ীর স্থান গ্রহণ করিল। এই মাসীর কাছেই নাকি নবতারা শৈশবে কাটাইয়াছিল।—মাসী তাহাকে বড়ই ভালবাসে। ছেলেমানুষের উপর হেঁসেল ফেলিয়া দিয়া খুড়ী দেশে চলিয়া গিয়াছে—নবতারার এমন বিপদের কথা শুনিয়া মাসী ছুটিয়া চলিয়া আসিয়াছে এবং খুড়ী কোন্‌-দেশী-মেয়ে-মানুষ বলিয়া সে নবতারার কাছে প্রায় এক সপ্তাহ কাল ধরিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে! মাসীর আর কেহ ছিল না—কেবল একটি ৭।৮ বৎসরের কন্যা। মা ছাড়িয়া থাকে কোথায় তাই তাহাকে সঙ্গে আনিয়াছে।

পুলিনকে দেখিয়া মাসী বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—হাঁ নব, এই বুঝি তোর সতীন ছেলে—ওমা!

হরিমতি দূর হইতে সে কথা শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া পুলিনকে কোলে তুলিয়া লইয়া সরিয়া গেল,—যাইতে যাইতে মাসীর পানে কিছু কড়া-নজরে চাহিয়া গেল। মাসী মুখ ভ্যাঙ্গাইয়া নবতারাকে জিজ্ঞাসা করিল—এ মাগী কে লা! নবতারা বলিল উনি এ বাড়ীর ঝি।

মাসী আসিয়া নবতারার সংসারে একেবারে যেন বুক দিয়া পড়িল। মাথার উপর একটা মেয়ে ক্রমশঃই বিবাহ-যোগ্যা হইয়া উঠিতেছে তাহাকে পার করিবার উপায় এই নবতারা 'ওরফে' শিবনাথ এই কথাটা মাসীর মনে অনুক্ষণ নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছিল। নবতারা ও শিবনাথের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সে সত্যই আপনাকে যেন ঢালিয়া দিল।

পুলিন আজকাল এক নূতন সঙ্গী পাইয়াছে—ঊষারাণী, ঊষারাণী অনেক করিয়া যাচিয়া যাচিয়া তাহার সহিত ভাব করিয়াছে। পুলিন তাহার সহিত মধ্যে মধ্যে পুতুল

খেলে, তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে আসে, ফিরিওয়ালা সাজিয়া দরাদরি করিয়া তাহাকে জিনিষ বিক্রয় করে—দু'টিতে মিলিয়াছে বেশ। কিন্তু পুলিন হরিমতির আদুরে ছেলে, সে একটুতেই উষার উপর চটিয়া যায়, ঝগড়া করে, তাহাকে মারিতে ধরিতে যায়। একদিন পুলিন ঘোড়া হইবার পর উষারাণী আর ঘোড়া হইতে চাহে নাই বলিয়া সে উষার হাতে এমন এক কামড় বসাইয়া দিল যে উষা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—তাহার মা ছুটিয়া আসিল এবং পুলিনের হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিতে টানিতে নবতারার নিকট গিয়া বলিল, দেখ্, দেখ, ছোঁড়ার আস্পদ্ধা দেখ—আই বুড়ো মেয়ের হাত কাম্‌ড়ে রক্ত বার করে দিলে—নব, তুই একে কিছু বল্‌বি নি! নবতারা আপনার ঘরের মেজেয় বসিয়া পশম বুনিতেছিল,—ঘাড় তুলিয়া ভ্রু কুঁচ্‌কিয়া পুলিনকে জিজ্ঞাসা করিল—কেন্‌রে তুই ওকে কাম্‌ড়িচিস্?

পৃথিবীতে পুলিন একমাত্র যদি কাহাকেও ভয় করিত ত সে এই নবতারাকে। সাধ্যমত সে নবতারাকে পরিহার করিয়াই চলিত। কোথা হইতে এই নূতন মানুষটি আসিয়া বাড়ীতে এমন অসীম প্রভুত্ব খাটাইতে আরম্ভ করিল,—যাহার ভয়ে তাহার বুড়ী-ঠাকুর-মা কোথায় পলাইয়া গেল এবং যাঁহাকে দেখিলে হরিমতি কেবলই তাহাকে বলে 'চুপ' 'চুপ' এমন মানুষ তো সামান্য মানুষ নয়—সে ইচ্ছা করিলে হয়ত তাহাকে বেদম প্রহার করিতে পারে এবং তাহাকে তাহার মার নিকট হইতে ছিন্ন করিয়া নিজের কাছে ধরিয়া রাখিতে পারে! নবতারার গলার স্বর শুনিলেও পুলিন যেন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িত।

নবতারা যখন চোখ পাকাইয়া তাহাকে বলিল, কেন ওকে তুই কাম্‌ড়িচিস্—দিনরাত দসিস্তপনা করে বেড়াচ্ছ—বস্ এখানে চুপ করে, তখন সে কথাটি না কহিয়া তৎক্ষণাৎ সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

এই দুপুর বেলাটায় হরিমতি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পুলিন তাহার কোলের কাছে শুইয়া শুইয়া কখন্ যে উঠিয়া গিয়া উষার সঙ্গে খেলা জুড়িয়া দিয়াছিল তাহা সে টেরও পায় নাই। কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভাঙ্গিলে যখন দেখিল পুলিন নাই তখন খুঁজিতে খুঁজিতে নবতারার ঘরে আসিয়া পুলিনকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কি হ'য়েচে রে পুলিন, অমন ক'রে ওখানে ব'সে আছিস্ কেন? আয় শুবি আয়।

নবতারার দৃঢ়স্বরে বলিল, না যাবে না, হরি তুমি ওকে অমন আদর দিয়ে মাটি ক'রনা। হরিমতিকে দেখিয়া পুলিন উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, নবতারা তাহার হাত ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, ব'স্ যাচ্ছিস্ কোথা! পুলিন একবার কাতর নয়নে হরিমতির দিকে চাহিয়া আবার নিস্তব্ধে বসিয়া পড়িল। হরিমতি বুঝিল, পুলিন আজ আবার কি একটা উপদ্রব করিয়াছে।

হরিমতি নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু বারকতক এপাশ ওপাশ করিয়া আবার উঠিয়া নবতারার দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নবতারার মনটা কেমন করিয়া উঠিল, পুলিনকে বলিল, আচ্ছা, যা, আর মারামারি করিসনি।

হরিমতির উপর নবতারার বিরক্তির কারণটা এই ছিল যে, সে পুলিনকে একান্ত আপনার করিয়া লইয়া নবতারার মাতৃত্বের অধিকার হইতে তাহাকে অত্যন্ত দূরে দূরে রাখিয়াছে। নবতারা সেবার যখন বাপের বাড়ী গিয়াছিল তখন পুলিনকে সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিলেন, পুলিন রাজি হয় নাই এবং সেখানে দীর্ঘকালের মধ্যে একদিনের জন্যও পুলিনকে লইয়া যাইতে পারে নাই, ইহাতে তাহার বাপের বাড়ীর আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব মহলে তাহাকে বিশেষ দোষণীয় ও অপদস্থ হইতে হইয়াছিল। হরিমতিই তো তাহার কারণ। ক্রমশঃই পুলিনের বয়স হইতেছে, নবতারা তাহাকে যতই আপনার নিয়মে চালনা করিতে চায়, দেখে হরিমতির নিয়ম ও চালনা ভিন্ন পুলিন আর কিছুই মানিতে প্রস্তুত নয়। নবতারার ইহা অসহ্য। হরিমতি বাড়ীর পুরাতন ঝি বিশেষ পুলিনকে সে শৈশব হইতে মানুষ করিতেছে, তাহাকে কিছু বলাও চলেনা। নবতারা মনে মনে হরিমতির উপর অত্যন্ত চটিয়া যাইতে লাগিল। একমাত্র মাসীর কাছেই নবতারা তাহার মনের এই ঝালটা প্রকাশ

করিতে পাইত ;—শিবনাথের কাছে এ কথার উত্থাপন করিয়া খেলো হইবার লোক সে ছিল না। মাসীও নবতারার কথায় সায় দিয়া বলিত, কথায় বলে না, মায়ের চেয়ে যার বেশী দরদ, সে ডাইন। হরিমতির আবরণ ও অধিকার হইতে পুলিনটাকে তফাৎ করিতে না পারিলে নবতারার যেন আর সোয়াস্তি রহিল না।

শিবনাথকে একদিন নবতারা বলিল, পুলিনটার দিন দিন বয়স হচ্চে, ওর পড়াশুনার একটা বন্দোবস্ত কর—ওকে স্কুলে এবার না হয় ভর্ত্তি ক'রে দাও না। শিবনাথ পরদিনই পুলিনকে কাছাকাছি একটা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। হরিমতি স্বভাতঃই প্রথমটা খুব আপত্তি তুলিল, কিন্তু নবতারার কাছে উহা গ্রাহ্য হইল না, পুলিনও 'না যাবো না' বলিবার উপক্রম করিতেছিল—নবতারার চোখ-রাঙ্গানিতে চুপ হইয়া গেল।

পুলিন আজকাল স্কুলের ছাত্র। হরিমতি প্রতিদিন তাহাকে স্কুলের দোর অবধি পৌছিয়া দিয়া আসে, স্কুলের ছুটির কিছু পূর্ব্বে গেটের সামনে গিয়া অপেক্ষা করে পুলিন বাহিরে আসিলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে। হরিমতি দু রের নিদ্রা ছাড়িয়া দিয়াছে,—ঘুমাইয়া পড়িলে পাছে সে ঠিকমত ছুটির অগ্রে স্কুলে গিয়া হাজির হইতে না পারে। ফিরিবার পথে পুলিন তাহাকে আপনার মনে কত কথাই শুনাইতে থাকে—দেখ মা, আজ আমাদের ক্লাসে একটা ভারি মজা হ'য়েচে। নলিনটা একদিনও পড়া ক'রে আসবে না, আজ যেই মাষ্টার ম'শায় তার কান মলে দিয়েচে সে এমন জোরে কেঁদে উঠেছে—আমি কিন্তু একদিনও মার খাই না। তুই যে রোজ সকালে আমায় পড়তে বসাস, তখন যে আমি পড়া ক'রে নি। স্কুলে আমার সঙ্গে পড়ায় কেউ পারে না। সেদিন যে ছেলেটা আমার একটুকুখানি ভুলে আমার কান ম'লে দিয়েছিল—তোকে সে কথা আমি বলিনি পাছে তুই মনে কষ্ট করিস—আজ কিন্তু আমি তার দুবার কান ম'লে দিয়েচি। মাষ্টার ম'শায় ব'লেচে আমি এবার 'ডবল পেমোসন' পাব। 'ডবল পেমোসন' কি তা জানিস, বলদিকিনি কি। তুই বড্ড বোকা,—ডবল পোমোসন মানে জানিস না। হরিমতি অনেক করিয়া পুলিনকে চুপ করায়—আচ্ছা তাই, আমি বোকা,—তুই এখন চুপ কর্। সারাদিন পড়ে পড়ে মুখ কালিবর্ণ হয়ে গেচে তুই আর বকিস্‌নি। বাড়ী পৌছিয়া হরিমতি পুলিনের হাত মুখ ধুইয়া দিয়া, কাপড় ছাড়াইয়া, খাওয়াইয়া বাড়ীর গলি পথটাতে একটু খেলিতে ছাড়িয়া দেয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আবার তাহাকে ডাকিয়া ঘরে আনে। এই সন্ধ্যার সময়টায় হাতে তাহার কাজ না থাকায় সে পুলিনকে কোলে বসাইয়া, বুকে জড়াইয়া কত আদর করে, কত কথা কহে! সারাদিন ছেলেটা তাহার হৃদয় অন্ধকার করিয়া স্কুলে-স্কুলে থাকে, দিনের শেষে তাহাকে বুকের মধ্যে পাইয়া তাহার আনন্দের আর সীমা থাকে না!

ছেলেবেলা হইতে পুলিনের কিন্তু একটা বড় বদ্ অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—সে যাহা একবার চাহিবে তাহা তাহাকে দিতেই হইবে নতুবা সে কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া একটা হাঙ্গামা বাধাইবে। তাহার বাহনার অন্ত ছিলনা। ইহাঁ লইয়া, হরিমতিকে বিষম মুস্কিলে পড়িতে হইত—মধ্যে মধ্যে মাসীর সহিত তুমুল ঝগড়া বাধিত—নবতারার সহিত কথা কাটাকাটি পর্য্যন্ত হইয়া যাইত! রাত্রে শিবনাথের নিকট এক তরফ হইতে নানাকথা নানাভাবে রঞ্জিত হইয়া পৌছিত।

বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হরিমতির শরীরটা দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল সেজন্য সংসারের কাজেকর্ম্মে তাহার একটু শৈথিল্য আসিয়া পড়িতেছিল। সকালে বাসিপাট সারিয়া ঠিক সময়ে সে বাজার করিয়া ফিরিতে পারিত না, তাহাতে শিবনাথের অফিসের প্রায়ই দেরী হইয়া যাইত—শিবনাথ অত্যন্ত রাগারাগি করিতেন। শিবনাথের সংসারে মাসী স্রেফ রাঁধিয়াই ক্ষান্ত, নবতারা তো কড়ার-কুটিটি নাড়েন না। হরিমতির উপর নবতারা ও মাসীর যত কিছু আক্রোশ তাহা তাহারা মিটাইয়া লয়। হরিমতির কাজের খুঁত ধরিয়া বা তাহার উপর নির্ম্মমভাবে কাজ চাপাইয়া দিয়া। হরিমতি ভাঙা শরীরেও খাটে কম নয়, কিন্তু দিনরাত খিটু খিটু তাহার তাহার ভাল লাগে না। সেজন্য ঝগড়াও বাধিয়া যায়। শিবনাথ ঝগড়ার আসল কারণ কোনোদিনই জানিতে পারিতেন না, কাজেই তিনি সহিয়া সহিয়া একদিন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হরিমতিকে

স্পষ্টই বলিলেন—তোমার আর না পোষায় বাপু, তুমি অন্য জায়গায় কাজ দেখ, এ সব ঝগড়াঝাটি আমার ভাল লাগে না। তুমি যেন বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে।

কথাটা হরিমতিকে বড়ই বাজিল! সে মনে মনে ঠিক করিল, শিবনাথও যখন এমন কথা বলিলেন তখন তাহাকে এখানকার মায়া কাটাইতে হইবে। সে দেশে ফিরিয়া যাইবে-সেখানে থাকিয়া যেমন করিয়া হ'ক জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটাইয়া দিবে। পুলিনটার জন্য ভাবনা? তা সে এখন বড় হইয়াছে,—তা'ছাড়া তার বাপ আছে, মাও আছে। হাজার হই আমি এদের পর। পরকে চিরদিনের জন্য কে কোথায় স্থান দিয়া ধরিয়া রাখে। এই পুলিনই বড় হইয়া হয়ত আমায় আর চাহিবে না। যাক্—পরের ছেলের মায়ায় এতটা বদ্ধ হওয়া কিছু নয়। পুলিনকে আমায় ভুলিতেই হইবে।

কি ভাবিয়া হরিমতি সেদিন আর পুলিনকে কাছে ডাকিল না—কাছে আসিলেও তাহার সহিত বড় একটা কথা কহিল না। পুলিন তাহা দেখিল ও সেও অভিমান ভরে তাহা হইতে তফাতে তফাতে রহিল। নিজেই ভাত খাইয়া সে বইখাতা লইয়া একাই স্কুলে গেল,—বিকালে একাই ফিরিয়া আসিল। বাড়ী ঢুকিবার সময় তাহার জুতার অস্বাভাবিক খট্ খট্ শব্দ হরিমতির কাণে গেল। কিছু-পরে 'মা, আমায় খেতে দিন বলিয়া সে নবতারার ঘরে প্রবেশ করিল, তাহাও হরিমতি শুনিতে পাইল। 'সবই পড়ে রইল তা খেলি কি'--নবতারার একথাও হরিমতির কাণে পৌঁছিল। মুখ ধুইয়া পুলিন আজ আর খেলিতে বাহির হইল না,-- বাড়ীর ছাদে উঠিয়া এক কোণে একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। রাত্রে সে নবতারাকে যখন বলিল, মা, আজ রাত্রে আমার কিছু খেতে ইচ্ছে নেই, আমি আপনার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি গে, তখন হরিমতি আর স্থির থাকিতে পারিল না-- যাচিয়া পুলিনের কাছে গিয়া বলিল, কেন খাবে না?—তুই বা—বলিয়া পুলিন জোর করিয়া নবতারার ঘরে ঢুকিয়া বিছানায় মুখ গুজিয়া শুইয়া পড়িল। হরিমতি তাহাকে বিছানা হইতে উঠাইয়া লইয়া বলিল, আচ্ছা, আর রাগ করতে হবে না, ঢের হ'য়েছে। পুলিন ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হরিমতি তাহাকে অনেক করিয়া শান্ত করিল। রাত্রের আহার শেষ করিয়া পুলিন হরিমতির কাছেই শুইল। নিদ্রিত পুলিনকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া হরিমতি হাপুস নয়নে কাঁদিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে বলিল, ঠাকুর, এ তুমি আমার কি কর্‌লে!

সেদিন স্কুলে যাইবার ইচ্ছাটা পুলিনের আদৌ ছিল না। কারণ সেদিনকার পড়াটা তার কোনমতেই মুখস্থ হইতে চাহিল না। নানা অছিলা করিয়াও সে যখন হরিমতির নিকট হইতে ছুটি পাইল না তখন অগত্যা তাহাকে সময়মত ভাত খাইতে বসিতে হইল। মাসীই রাঁধে ও পরিবেশন করে। রান্নাঘরে ভাত খাইতে খাইতে কি একটা কারণে পুলিন সহসা চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল—আমি আর ভাত খাবো না যা। হরিমতি তখন উপরে কাজে ব্যস্ত ছিল। চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে রে। পুলিন হাত পা ছুড়িতে ছুড়িতে বলিল, আমি বললুম ঝোল দিও না—ও ঝোল দিল কেন? আমি ভাত খাবো না—স্কুলে যাবো না—যা। মাসী হাঁকিয়া উঠিল, ঝোল দিয়ে গিল্‌বি না তো গিল্‌বি কি দিয়েরে ছোঁড়া! পুলিন কাঁদিতে কাঁদিতে চেঁচাইয়া বলিল, বললুম ঝোল দিও না, দিলে কেন? মাসী অত্যন্ত রাগিয়া গিয়া বলিল, বেশ করিচি দিয়িচি—মেরে হাড় গুড়িয়ে দেব জানিস্।

মার্ না দেখি, বলিয়া পুলিন ভাতের থালা হইতে এক মুঠো ভাত হাতে লইয়া ছোড়ে আর কি, এমন সময় হরিমতি তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া দূর হইতে বলিল পুলিন, ভাত ছুড়ো না বাবা।

হরিমতিকে দেখিয়া মাসী একেবারে দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল,—পুলিনের গালে সপ্‌ড়ি হাতে চড় বসাইয়া দিল।

পুলিনও অমনি ভাত ছুড়িয়া রান্না-বান্না সমস্তই নষ্ট করিয়া দিল—মাসীর গায়েও ভাত ছড়াইয়া পড়িল।

সহসা ঘরে আগুন লাগিয়াছে দেখিতে পাইলে ঘরের ভিতরে মানুষ যেমন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া বাহিরে আসে, মাসীও সেইরূপ করিতে করিতে রান্নাঘরের বাহিরে গেল। ইতিমধ্যে নবতারা আসিয়া

পুলিনের কীর্ত্তি সমস্তই দেখিল। পুলিনের হাতটাকে নবতারা সজোরে ধরিয়া তাহাকে টানিয়া উঠানে লইয়া গেল এবং একটা ভাঙা পাখা উঠাইয়া লইয়া এমন প্রহার করিতে লাগিল যে, শেষে মাসীই বলিল যাক্ নব, এবার ছোঁড়াকে ছেড়ে দে, খুব জব্দ হ'য়েছে! নবতারা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে রান্নাঘরের মধ্যে গিয়া হরিমতিকে বলিল—ঝি; তুই যদি আমার ছেলেকে কাছে রাখ্‌বি তো তোকে আমি এই ছেলের দিলেসা দিলুম! তুই আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যা। তুই রাক্ষসি, ছেলেটাকে খাবি তবে ছাড়্‌বি। ঝি ঝিয়ের মত থাক্‌বি। কিছু বলি না ব'লে নাই পেয়ে মাথায় উঠেছ! বলিয়া নবতারা ক্ষিপ্রপদে উপরে উঠিয়া গেল।

হরিমতি কিছুক্ষণ পরে, রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া কোনো কথা না কহিয়া কোনো দিকে না চাহিয়া সোজা সদর দরজা দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় ঝাপসা চোখে একবার চকিতে দেখিতে পাইল—উঠানের উপর রৌদ্রে পড়িয়া তখনো পুলিন রক্তাক্ত কলেবরে বন্দুক-বিদ্ধ অসহায় শাবকের মত গোঙাইয়া গোঙাইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে!

— ৪ —

প্রায় একমাস হইল হরিমতি তাহার গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাহাকে পাইয়া ভারি খুসি হইয়াছে। হরিমতি তাহাদের নিশ্চিন্ত আশ্বাস দিয়াছে যে, সে এইবার তাহার নিজের ভিটায় মরিতে আসিয়াছে—সে আর কোথাও যাইবে না। গ্রামের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে তাহার কিছু টাকা কর্জ্জ দেওয়া ছিল—তাহাই তাহার প্রধান সম্বল। তাছাড়া, পরিশ্রমের গতর তার এখনো, সে ধান ভানিয়', ঘুঁটে বেচিয়া সহজেই দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে।

দেশে ফেরার পর প্রথম কয়েক দিন সে দিবারাত্র পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া কলিকাতার গল্প-গুজব করিয়া এমন একটা সোরগোল তুলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, তাহার খাবার সময়টা পর্য্যন্ত ছিল কিনা তাঁহাই সন্দেহ! তারপর সহসা সে এমনভাবে গা ঢাকা দিয়া নিজের ভাঙা কুঁড়েটার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গেল যে, সবাই অবাক হইয়া বলিল, হরির হ'ল কি, অসুখ-বিসুখে পড়্‌ল নাকি! এখন হরিমতি আর দৈবাৎ ঘরের বাহির হয়। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া বসিয়া উঠানের ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়া ঐ ওধারে অদ্বৈত-গুরুমশায়ের পাঠশালার ছেলেদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে সারাদিন কি যে ছাই পাশ ভাবে, তাহা কেহই ভাবিয়া পায় না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছেলেরা যখন ছুটি পাইলে ডাকহাঁক করিতে করিতে যে যাহার বাড়ী চলিয়া যায় তখন সে উঠিয়া আপনার ঘরের মধ্যে গিয়া আগড় বন্ধ করিয়া দেয়—সারারাতে সে আর দ্বার খুলে না!

হরিমতির ভিটা-সংলগ্ন একটা পানা পুকুর ছিল—উহারই উত্তর পাড়ে তাহার স্বজাতি এক বিধবা বাস করিত। তাহার বাড়ীতে হরিমতি মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইত। এই বিধবার একটি দশ এগার বৎসরের ছেলে ছাড়া আর কেহ ছিল না। হরিমতি যাইলে পরাণ বড়ই ভক্তি করিয়া তাহার মাসীকে বসিতে পিঁড়া আগাইয়া দিত এবং হরিমতির যে কোনো দরকার পড়িলে মাসী যেন তাহাকে ডাকে সেকথা তাহাকে বারে বারে বলিত। কিন্তু, মাসী 'আচ্ছা' 'আচ্ছা' বলিয়া কথাটা যেন উড়াইয়া দিত—পরাণ তাহাতে মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইত। পরের ছেলেকে ভালবাসিয়া হরিমতির নাকি ইতিপূর্ব্বে একটা মস্ত আঘাত প্রাণে বাজিয়াছে, তাই সে পরাণকে আর আপনার হইতে দিতে চাহে না!

কিছুদিন পরে সহসা একদিন রাত্রে হরিমতি কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া পরদিনই প্রত্যুষে কাহাকেও কোনো কথা না বলিয়া একেবারে কলিকাতা রওনা হইল। হাওড়ায় নামিয়া সে কলিকাতার দিকে তাড়াতাড়ি পথ চলিতে লাগিল। হাঁটিয়া হাঁটিয়া সে অবশেষে একটা মোড়ের কাছে আসিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। তারপর, সেই গলি—সেই ছাতাওয়ালাদের বস্তি,—সেই বাড়ী! হরিমতির বুকের ভিতরটা কাঁপিতে লাগিল! দরজায় ঘা' দিতে দরজা খুলিয়া গেল। একজন অপরিচিত পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাকে চাও গা বাছা! হরিমতি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, এ বাড়ীতে শিবনাথবাবু।—পুরুষ বলিল, না, শিবনাথবাবু ব'লে কেউ থাকেন না। আমরা সবে

২।৪ দিন হ'ল এ বাড়ী ভাড়া নিয়েছি। বলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

হরিমতি তখন পাশের এক বাড়ীর দরজার নিকট গিয়া দাঁড়াইতে সে বাড়ীর একটি চেনা চাকরকে দেখিতে পাইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, শিবনাথ-বাবু এই ৭।৮ দিন হ'ল বাড়ী ছেড়ে দিয়ে পশ্চিম গেছেন—তাঁর ছেলের ভারি ব্যামো!

কার ব্যামো?—হরিমতি এমনভাবে হাঁপাইয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করিল যেন সে দুই তিন সেকেণ্ডের মধ্যে দম হারাইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িবে!

চাকরটি কেমন যেন হত-বুদ্ধি হইয়া গিয়া বলিল, কেন, তুমি জান না? পুলিনের!

তারপর?

তারপর—তারপর আর কি,—হঠাৎ ছেলে একদিন স্কুল থেকে জ্বর নিয়ে বাড়ী এলো। জ্বর সর্দ্দি কাসি। অনেকক'রে সর্দ্দি কাসি গুলো একটু কম্‌লো কিন্তু জ্বর আর ছাড়ে না। ডাক্তাররা বল্লে, ছেলেকে হাওয়া খাওয়াতে নে যাও, নয়ত ছেলে আর বাঁচ্‌বে না। জ্বরের সময় ছেলেটা কেবল চেঁচাত, মা কোথায় গেলি—মা তুই আয় গো, আর আমি দুষ্টামি ক'রবো না! তোমার বুঝি সে বড্ডই ন্যাওটো ছিল? আহা, যাবার সময় ছেলেটাকে যখন তার বাপ বুকে ক'রে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লো, তখন দেখি, অমন ছেলে একেবারে ফ্যাকাসে রোগা কাটি—

ওকি, ওকি তুমি অমন ক'রে কাঁপছ কেন, প'ড়ে যাবে যে—বলিয়া চাকরটি পতনোন্মুখ হরিমতিকে ধরিয়া তাড়াতাড়ি সেইখানে বসাইয়া দিল।

হরিমতি আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না ও কিছু নয়। তা তারা কবে ফি'রে আস্‌বে-কোথায় গেছে?

চাকর বলিল, সে সব তো আমরা বল্‌তে পারি না। তা যাক্, হ্যাঁ গা, তুমি কোথায় কাজ ক'রছ?

হরিমতি অন্যমনস্কভাবে বলিল, হাঁ আমি এখনই যাবো -বলিয়া ধীরে ধীরে গলি হইতে বড় রাস্তায় গিয়া পড়িল।

চাকরটা হরিমতির ভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না, তবু তাহার মনটা কি এক অজ্ঞাত সহানুভূতিতে ভারী হইয়া উঠিল।

সেই দিনই দেশে ফিরিয়া হরিমতি দুই তিন দিন আর ঘরের বাহির হইল না—বিধবা প্রতিবেশীটির বাড়ীতে ও গেল না। বিধবা একদিন বিকালে হরিমতির উঠানে দাঁড়াইয়া ডাক দিল—দিদি, কি ক'রছ গো।

হরিমতি ঘরের বাহির হইয়া আসিলে বিধবাটি সহসা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, একি দিদি, তোমার এত অসুখ হ'য়েছে তা তুমি আমায় ডাকনি কেন?

হরিমতি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—কই বোন, অসুখ তো কিছু করেনি।

অসুখ করেনি! চেহারটা হঠাৎ এমন খারাপ হ'য়ে গেছে যে দেখ্‌লে ভয় করে! না, না, দিদি, তোমার নিশ্চয় অসুখ হয়েছে।

হরিমতি আর কোন কথা না কহিয়া চুপ করিয়া গেল একটা মাদুর পাতিয়া দিয়া বিধবাকে বলিল--পরাণের মা, বস্।

না, দিদি, আর বস্‌ব না। পরাণটা আবার জ্বর ক'রে ব'সেছে। এখন একটু সে ঘুমুচ্চে তাই তোমার সঙ্গে একবার দেখা ক'র্‌তে এসেছি। বলিয়া পরাণের মা মাদুরটার উপর বসিল।

দূরে পৈঠার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া হরিমতি বলিল পরাণের কি হ'য়েছে?

কেন বল দিদি, ছোঁড়াটার জ্বর হ'য়েছে। এত সাবধানে রাখি, এত চোখে চোখে রাখি, তবু যে কি ক'রে অসুখ হয়। ছেলেটার একটু কিছু হ'লে দিদি আমার ভাবনার আর সীমে থাকে না। ঐ টুকু ছাড়া আর আমার কে আছে বল্‌দিকি।

হরিমতি একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, অসুখ কি বড় বেশী?

কি জানি দিদি, আজ সকালে মহিম ঠাকুরকে ডেকে হাতটা দেখিয়েছিলুম—বল্লেন, একটু বাতিকমত হ'য়েছে ও আপনিই সেরে যাবে। দিদি, বেশী হ'তে কতক্ষণ বেশী হ'লে ওকি আর আমার বাঁচবে! বলিয়া পরাণের মা চোখে আঁচল তুলিয়া চোখ মুছিল।

পরাণের মা বলিতে লাগিল—দিদি, পরাণ [illegible] বলে কি জান? বলে—মা, আমি বড় হ'লে [illegible]

সব দুঃখ ঘুচোবো। আমি জন খেটে পারি, লাঙ্গল ক'রে পারি যেমন ক'রে হ'ক পয়সা রোজগার ক'রে তোর হাতে এনে দেবো—তুই মজা ক'রে ব'সে ব'সে খাবি আর বাবা তারকনাথকে ডাকবি। কি ব'লব দিদি, আমা-অন্ত যেন ওর প্রাণ। কি মায়াতেই যে ও আমায় ফেলেছে!

স্থির-দৃষ্টিতে হরিমতি মাটির দিকে চাহিয়া আকাশ-পাতাল কি ভাবিতেছিল। পরাণের মা আপনার আবেগেই বলিয়া যাইতেছিল—

এখন ওকে মানুষ ক'রে ওর কোলে মাথা রেখে ম'রতে পারলেই সুখ। কি ক'রে যে মানুষ হবে তাই ভাবি। তুমি শুনলে হাসবে দিদি, এতবড় ছেলে হ'ল এখনো আমি না দেখলে ওর খাওয়া হবে না, ঘুম-নিদ্রে হবে না। এই অসুখ হ'য়েছে—যাই দিদি এইবার হয়ত ছেলেটার ঘুম ভেঙেছে, আর ব'সব না।

পরাণের মা উঠিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া গেল। হরিমতি কাহার কথা ভাবিতে ভাবিতে সহসা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া দাওয়ার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল!

পরাণের জ্বরটা অল্পে গেল না—বেশ বাড়িয়া উঠিল। জ্বরের ঘোরে পরাণ রাত্রে ভুল বকিতে লাগিল।

পরাণের মা কাঁদিতে কাঁদিতে হরিমতির কাছে আসিয়া বলিল, দিদি, পরাণ আর আমার বাঁচলো না!

হরিমতি আশ্বাস দিয়া বলিল, ভয় কি কাঁদিসনি, সেরে যাবে।

পরাণের মা একটু স্থির হইয়া বলিল, দিদি রাত্তিরে সে খিঁচুনি চেঁচামেচি যদি দেখ তো তুমি কি ব'লবে। পাড়ুইদের শ্রীপদ এসে রাত্তিরে থাকে,—সে কি চেপে ধ'রে রাখতে পারে? ছেলেটা আর বাঁচবে না গো। বলিয়া পরাণের মা একবার হাউহাউ করিয়া করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

না, না, কাঁদিসনি। আচ্ছা, তুই এখন ছেলের কাছে থাকগে যা। আমি এই হাতের কাজটা সেরে একটু পরে যাচ্ছি।

পরাণের মা উঠিয়া গেলে হরিমতি হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসিল। সেও কি তবে রাত্রে অমনি করিয়া চেঁচায়, অমনি করিয়া হাত পা ছুঁড়ে! কে তখন তাহাকে দেখে? কে তাহার পাশে বসিয়া রাত্রি জাগে? দুরন্ত বলিয়া কেহ যে তাহাকে ভালবাসে না। তাহার যে মা নাই! তবে কে তাহার সেবা করে? টস্ টস্ করিয়া হরিমতির চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

পরাণের মার বাড়ী গিয়া হরিমতি দেখিল, পরাণ জ্বরের তাড়সে ছটফট করিতেছে—তাহার মা কপালে জলপটি দিয়া মাথায় পাখার বাতাস করিতেছে। হরিমতি বিছানার পাশে বসিয়া পরাণের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ডাকিল—পরাণ! পরাণ রক্তবর্ণ চক্ষে একবার চাহিয়া আবার চক্ষু বুজিল।

হাঁ, বাবা বড্ড কি কষ্ট হচ্ছে?

মাসী-গো, বড্ড কষ্ট!

হরিমতি পরাণের যন্ত্রণা কাতর মুখের দিকে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া পরাণের মুখের উপর সহসা সে কাহার মুখচ্ছবি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল! পরাণের মুখখানি হরিমতি দুইহাতে ধরিয়া আপনার বুকের মধ্যে পুরিয়া গভীর স্নেহে কিছুক্ষণ উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

পরাণ ডাকিল, মাসী!

হরিমতি বলিল, বাবা!

পরাণ আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

পরাণের মাকে হরিমতি বলিল, তোর কি কাজ-টাজ বাকি আছে সেরে নিগে যা, আমি ততক্ষণ বসছি,—সন্ধ্যে হ'য়ে গেল.—যা-যা।

পরাণের মা উঠিয়া গেলে হরিমতি নূতন করিয়া জলপটি পরাণের কপালে দিল এবং আঁচল দিয়া দুই রগের জল মুছিয়া দিল। বাঁহাতে পরাণের একটা হাত আপনার কোলে চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতে মাথায় পাখার বাতাস দিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যে পরাণ স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার প্রদীপ হাতে লইয়া পরাণের মা পরাণের ঘরে প্রবেশ করিলে হরিমতি বলিল, পরাণের মা.

শ্রীপদকে একবার ডেকে আন্‌তে পারিস্। আমার নাম ক'রে বল্‌বি, জ্যাঠাই ডাকছে একবার আয়।

শ্রীপদ আসিয়া বলিল, জ্যাঠাই আমায় ডেকেছ। শ্রীপদ হরিমতিদের পাড়ার ছেলে। হরিমতিকে সে জ্যাঠাই জ্যাঠাই বলিয়া ডাকে। শ্রীপদ ছেলেটি বড় ভাল ছেলে। লোকের আপদে বিপদে সে যাচিয়া আসিয়া সাহায্য করে। বয়স ২০।২২ এর বেশী নয়।

হরিমতি বলিল, বাবা শ্রীপদ, পরাণকে আর এভাবে ফেলে রাখা যায় না। একবার তারকেশ্বর থেকে কোনো বড় ডাক্তার এনে দেখাতে হবে। কি বলিস পরাণের মা।

শ্রীপদ বলিল আন্‌তে আর কি জ্যাঠাই। কিন্তু বড় ডাক্তার এনে দেখাতে গেলে টাকা তো চাই।

হরিমতি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ভাবিস্‌নি শ্রীপদ, সেজন্য তোরা ভাবিসনি। সে আমি যা হয় কর্‌বো। তোকে কিন্তু কালই যেতে হবে। আর দেখ্, আজ রাত্রে তোর আর এখানে আসবার দরকার নেই—রাত জাগ্‌লে ভোরে উঠতে কষ্ট হবে। আমি না হয় আজ রাতটা এখানেই থাক্‌বো।

বেলা প্রায় দুপুরের সময় ডাক্তার আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া কিছু গম্ভীর হইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

ও কিছু নয়, বলিয়া শ্রীপদ পরাণের মাকে বুঝাইল —হরিমতিকে ঠেকাইতে পারিল না।

হরিমতি পরাণের সেবা-শুশ্রূষায় অপনাকে একান্তভাবে নিয়োজিত করিল। দিনের মধ্যে ঘণ্টা খানেক ছুটি লইয়া —তা সে যখনই হ'ক্—সে আপনার ঘরে গিয়া আহার কার্য্যটা চুকাইয়া আসিত। প্রায় প্রতিরাত্রই সে জাগিত —শ্রীপদ রাগারাগি করিলে শুইত বটে কিন্তু ঘুমাইতে পারিত না। পরাণের মা কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিনগুলি অতিবাহিত করিত।

ক্রমেই পরাণের অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। হরিমতি একপ্রকার আহার নিদ্রা ছাড়িয়াই দিল। শ্রীপদর রাগারাগি বা পরাণের মার অনুনয়-বিনয় সে আর শুনিতে চাহিল না। পরের ছেলের জন্য হরিমতির এই অত্যদ্ভুত আচরণ দেখিয়া শ্রীপদ ও পরাণের মা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। হরিমতি কেবল শরীর দিয়া নয়, তাহার সঞ্চিত অনেকগুলি টাকা খরচ করিয়া, বোধ হয় সর্ব্বস্ব দিয়াই পরাণকে বাঁচাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিল। নিজের ছেলের জন্যও কেহ তো এমন করে না! হরিমতির হইল কি?

হরিমতির চক্ষে পরাণ আর পরাণ ছিল না, ছিল আর একজন! সে যখন পরাণের পার্শ্বে বসিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিত, তখন সে পরাণের অস্তিত্ব অনুভব করিত না, করিত আর একজনের। পরাণের মুখে সে আর একজনের মুখচ্ছবি দেখিত, পরাণের কণ্ঠস্বরে সে আর একজনের কণ্ঠস্বর শুনিত, পরাণের দেহস্পর্শে সে আর একজনকে স্পর্শ করিত! পরাণের রোগ-যন্ত্রণার কাতরতা আর একজনের গভীর আর্ত্তনাদ হইয়া তাহার হৃদয় তন্ত্রীতে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিত। পরাণকে বাঁচাইতেই হইবে, নতুবা হরিমতি বাঁচিবে না,—পরাণের মার পরাণ যে আজ হরিমতির ইন্দ্রিয় মনে তাহার সর্ব্বস্ব-ধনের রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে দেখা দিয়াছে!

কি হবে শ্রীপদ, আর একবার যে তোকে তারকেশ্বর যেতে হবে—হরিমতি শ্রীপদর হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শ্রীপদ রোগীর অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল। হরিমতির পীড়াপীড়িতে সে আর একবার তারকেশ্বর গেল। ডাক্তার আসিয়া কিছু কিছু ঔষধ বদ্‌লিয়া দিলেন,—যাইবার সময় শ্রীপদর দিকে চাহিয়া মুখ কুঁচ্‌কিয়া গেলেন।

পরাণের অবস্থা যতই মন্দ হইতে লাগিল, হরিমতি ততই যেন পাগলের মত হইয়া পড়িতে লাগিল। হরিমতিদের পাড়ায় একটি ক্ষুদ্র শিবমন্দির ছিল। হরিমতি ছেলেবেলা হইতে এই ঠাকুরের নিকট কতবার কত প্রার্থনা জানাইয়াছে। আজকাল আরতির সময় হরিমতি প্রত্যহই সেই মন্দিরের রোয়াকের নীচে দাঁড়াইয়া গলায় আঁচল দিয়া হাতজোড় করিয়া বিগ্রহের দিকে চাহিয়া থাকে। চক্ষু দিয়া তাহার অজস্রধারায় জল ঝরিতে থাকে। আরতি শেষ হইলে সে চক্ষু মুছিয়া

মন্দিরের ধূলা কুড়াইয়া লইয়া গিয়া পরাণের মাথায় ঘসিয়া দেয়।

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই পরাণের লক্ষণ বড় খারাপ দেখা গেল। হরিমতির আর মন্দিরে যাওয়া হইল না। পরাণের মা তাড়াতাড়ি শ্রীপদকে ডাকিয়া আনিল। পরাণের মাথার কাছে বসিয়া হরিমতি তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। পরাণের মা মধ্যে মধ্যে উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেছিল,—শ্রীপদ তাহাকে ঘরের বাহিরে লইয়া গিয়া নানাকথা বুঝাইয়া আশ্বাস দিতেছিল। রাত্রি যখন প্রায় ১২টা, হরিমতি শ্রীপদকে পরাণের পাশে বসাইয়া একটি কেরোসিন ডিবা জ্বালিয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিল। শ্রীপদ জিজ্ঞাসা করিল, এত রাত্রে কোথায় যাবে জ্যাঠাই? হরিমতি বলিল, আস্‌ছি।

সেই গভীর রাত্রে ডিবাটি হাতে লইয়া হরিমতি সোজা শিবমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। পৈঠার উপর ডিবা রাখিয়া সে রোয়াকের উপর উঠিয়া রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। দ্বারের চৌকাঠে বার বার মাথা ঠুকিয়া হরিমাত কাঁদিতে কাঁদিতে সেই নিশুতি রাত্রে মন্দির ভিতরের চির জাগ্রত দেবতার নিকট মুমূর্ষু ছেলেটার প্রাণ ভিক্ষা চাহিল। কত মানসিক করিল কত শপথ গ্রহণ করিল, কতভাবে সে নিজের প্রাণকে বলি দিয়া ছেলেটার প্রাণ বাঁচাইতে চাহিল! অনেক ক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া হরিমতি উঠি-। পরাণের নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—পরাণ এখনো ঘুমায় নাই বটে কিন্তু আগের চাইতে অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। হরিমতি কপালে দুইহাত ঠেকাইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল এবং আঁচলে বাঁধা মন্দিরের ধূলি বাহির করিয়া পরাণের গায়ে মাথায় মাখাইয়া দিল। রাত্রিটা এইভাবে প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

কিন্তু সহসা ভোরের সময় রোগী একেবারে যেন মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িল। শ্রীপদ বুঝিল—সব শেষ হইল! পরাণের মা একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল শ্রীপদ হরিমতিকে বলিল, জ্যাঠাই, আর কেন—পরাণ বাঁচলো না! দেখিতে দেখিতে রোগী অধিকতর শব্দে শ্বাস টানিতে লাগিল। হরিমতি পলকহীন শুষ্ক চক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রোগীর শ্বাস শব্দ যখন ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া আসিল, তখনো হরিমতি প্রাণহীন প্রস্তর মূর্ত্তির মত বসিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। কিছু পরে শ্রীপদ পরাণের মুখের উপর কাপড় টানিয়া দিয়া হরিমতির গা ঠেলিয়া দিয়া বলিল জ্যাঠাই! কয়েক মুহূর্ত্ত তেমনি নিঃশব্দে থাকিয়া সহসা হরিমতি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, পুলিনরে—

চীৎকারে পরাণের মা অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়া কয়েকবার 'কি—এঁ্যা এঁ্যা, কি হ'ল কি হ'ল করিয়া আবার নিস্তব্ধ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল!

* * *

সেদিন শিবমন্দিরে, কি কারণে একটা বিশেষ পূজা ছিল। কি ভাবিয়া হরিমতি ১০।১২ দিন পরে এই প্রথম সেই শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। পাড়ার ছেলে মেয়ে স্ত্রী-পুরুষে প্রাঙ্গণটুকু ভরিয়া গিয়াছিল। দেবতাকে প্রণাম করিতে গিয়া হরিমতি অশ্রুভারে যেন আর মাথা তুলিতে পারিল না—সেইভাবেই কতক্ষণ পড়িয়া রহিল। পিছন হইতে সহসা কে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ডাকিল—মা, ওঠ না, আমি যে এসেচি! হরিমতি উঠিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিতেই এমন ভাবে চম্‌কিয়া উঠিল ঠিক যেন সে কোনো মৃত ব্যক্তিকে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল!

পুলিন লাফাইয়া হরিমতির বুকে উঠিয়া পড়িল। দূরে দাঁড়াইয়া শিবনাথ বলিলেন,—পুলিনের মা, এই নাও তোমার ছেলে—যাক'রে ওকে বাঁচিয়েছি! চল, আজই তোমায় আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যেতে হবে। বৌ এসেছে—ঐ ওখানে দাঁড়িয়ে আছে!

আধুনিক সাহিত্য

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ,

The Conquest of Happiness : by Bertrand Russel

বারট্রাণ্ড রাসেল বর্ত্তমান কালের একজন বিখ্যাত লেখক। ইনি অনেক দিন চীন দেশে মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাচ্যদেশ সমূহের সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে সমস্যার উল্লেখ করিতেছি উহা আধুনিক জগতের একটি অন্যতম সমস্যা। সুখ কি এবং কি করিলে সুখ উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এখন এ বিষয়ে সকলেই গভীর গবেষণা করিতেছেন। সমস্যাটী আধুনিক হইলেও উহার প্রাচীনত্ব খুবই অধিক। যেদিন হইতে মানবজাতি স্বাধীন মনোবৃত্তি লাভ করিয়াছে সেইদিন হইতেই সুখ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা চলিতেছে, তবে প্রাচীনকালে অজ্ঞ লোকের সংখ্যা অধিক থাকায় সুখের অনুসন্ধান করিবার লোক সংখ্যা খুবই কম ছিল। এখন অজ্ঞতার পরিমাণ হ্রাস হওয়ার সহিত প্রায় তাবৎ লোকই সুখের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ায় এই গবেষণা কার্য্যে একটু অভিনবত্ব দেখা দিয়াছে।

বর্ত্তমান জগতে ধনিকের সংখ্যা অধিক না হইলেও গ্রাসাচ্ছাদন অর্জ্জনে অক্ষম এমন জনসংখ্যার পরিমাণ প্রাচীন যুগ অপেক্ষা অনেক কম। পূর্ব্বে সাধারণের উপভোগ্য বিলাস, ক্রীড়া-কৌতুক, নাচ-তামাসা খুবই কম ছিল। আধুনিক যুগে উহার ব্যাপকতা এতই বেশী যে সামান্য মাত্র ব্যয় স্বীকার করিলে অনেকেই মনের তৃপ্তিকর নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিতে পারে। কিন্তু তত্রাচ মানবের মনে সুখ-ভাব প্রাচীন কাল অপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

মিঃ বারট্রাণ্ড রাসেল বলেন বর্ত্তমান যুগের প্রতিদ্বন্দ্বীতা তাহার একটী কারণ। গ্রাসাচ্ছাদন অর্জ্জন করিবার অধিকার প্রজা বিশেষের সকলেরই আছে, কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ শুধু অপরকে পরাজয় করিয়া অর্জ্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা আধুনিক যুগের অশান্তির খুব বিশিষ্ট কারণ। প্রত্যেক কর্ম্মীই অপর একজন কর্ম্মীকে জীবন সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া অগ্রসর হইতে চাওয়ায়, পরস্পরের মনের মধ্যে যে ঈর্ষার অগ্নি প্রজ্জলিত হয় তাহাতে মনের তাবৎ শান্তি নষ্ট হইয়া যায়। অতিরিক্ত অর্থ এবং সুখৈশ্বর্য্য Byronic unhappiness নাম দিয়া, বর্ত্তমান জগতের মানবজাতির আর একটী দুঃখের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বায়রণ একজন ধনী অভিজাত ছিলেন, পৃথিবীর তাবৎ আকাঙ্ক্ষিত বস্তুই তাঁহার ইচ্ছামাত্র করতলগত হইত। এইজন্য সকল বস্তুতেই তাঁহার উদাসীনতা আসিয়া পড়ায়, মনের শান্তি নষ্ট হইয়া যায়। কথাটী একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। বর্ত্তমান যুগের যাঁহারা ধনী তাঁহারা প্রাচীন যুগের ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণের তুলনায় খুবই অধিক ক্ষমতাশালী ও ঐশ্বর্য্যবান তাহাতে কি আর কিছু সন্দেহ আছে? সে যুগে লোকেরা হয়ত লক্ষটাকাকেই কুবেরের ভাণ্ডার বলিয়া মনে করিত। বর্ত্তমান যুগে অন্ততঃ পক্ষে এককোটী টাকা সম্পত্তি না থাকিলে কেহই ধনী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না, লক্ষটাকা সামান্য অর্থ মাত্র। সুতরাং ঐশ্বর্য্যের পরিমাণও সেই অনুপাতে অত্যন্ত অধিক। আধুনিক যুগের ধনী ইচ্ছা করিলে এরোপ্লেনে আকাশে যেমন উড়িতে পারেন, আবার একখানি সাব মেরিন ক্রয় করিয়া সেইরূপ সাগরের গভীর তলদেশেও ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন। সুতরাং জগতের দুর্লভ তাবৎ কাম্য বস্তু করতলগত থাকায় তাঁহারা স্বভাবতঃই একটু উৎসাহহীন অবস্থায় জীবন যাপন করেন। ক্লান্তি বর্ত্তমান জগতের আর একটী দুঃখের কারণ। প্রাচীনকালে মানবের দৈনিক পরিশ্রম করিবার একটী নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিত

াবার একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স অতিক্রম করিলে তাঁহারা কল প্রকার কর্ম্মভার অপরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া বসর গ্রহণ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে কর্ম্মের রাম নাই। দৈনিক কর্ম্ম-জীবন যেমন অসীম বলিয়া মনে য়, তেমনি মানবের তাবৎ বয়সই কর্ম্মক্ষম বলিয়া অনেকের রণা। এই কর্ম্মপ্রবণতাই মানব জাতিকে অনেকটা :খ কষ্টের মধ্যে আনয়ন করিয়াছে, পাপের ভয়ও নবকে অনেক সময়ই অস্থির করে। ম্যাকবেথ তাঁহার াজার প্রাণ-বিনাশ করিয়া তাঁহার সিংহাসন অধিকার রিয়াছিলেন, মনের মধ্যে যদি এই দুষ্কর্ম্ম-জনিত গ্লানি ভয় উদিত না হইত, তাহা হইলে ম্যাকবেথ হয়ত খী হইতে পারিতেন। তবে একথা সত্য যে পূর্ব্বাপেক্ষা াধুনিক জগতে পাপের তীব্র জ্বালা অনেকেই অনুভব রেন না, তবে উহার কষাঘাত জীবনে কোন সময়েই হ্য করিতে হয় নাই এমন মানবও খুবই কম দেখিতে াওয়া যায়। বর্ত্তমান জগতে পাপ অপেক্ষাও বেশী ভয়ের ারণ—জনমত। জনমতের উপরই বর্ত্তমান রাষ্ট্র শক্তি প্রতিষ্ঠিত, কাজেই জনমতের ক্ষমতা প্রাচীন যুগ অপেক্ষা র্ত্তমান যুগে যে খুবই বেশী তাহাতে আর সন্দেহ কি?

মিঃ রাসেল মানব কেন অসুখী হয় তাহার যে মস্ত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার প্রধান কারণ গুলি আমরা উল্লেখ করিলাম মাত্র, উহাতে আমাদের মতামত কিছুই সন্নিবেশিত করি নাই। তাহার পর মিঃ রাসেল যে যে উপায় অবলম্বন করিলে মানব সুখী হইতে পারে তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। তিনি বলেন—কি ধনী কি নির্ধন সকল শ্রেণীর মানবেরই কার্য্য করিবার একটা বিশেষ আগ্রহ থাকা প্রয়োজন। কর্ম্ম প্রেরণা বক্ষ মধ্যে ধারণ করিয়া কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিলেই মানব সুখী হইতে পারে। নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ম্ম করিলেও মানব সুখী হয়। স্বার্থে মানব মন কলুষিত হয়! স্বার্থ প্রণোদিত কার্য্যে মনের কলুষতা আনয়ন করে, কিন্তু নিঃস্বার্থ কর্ম্মে মানব হৃদয়ে দেব ভাব আনয়ন করে। কোন কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিয়া উহা সম্পাদন করিতে না পারিলে হতাশ না হইয়া পুনর্ব্বার উহা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করা উচিত। বারংবার যত্নেও সিদ্ধকাম হইতে না পারিলে অদৃষ্টকে বরণ করিয়া লওয়া সুখী হইবার আর একটা পন্থা। আদর্শ স্বামী, পিতা, ভাই হইয়া সংসারের সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধা বা স্নেহের পাত্র হইয়া থাকিতে পারিলেও সুখী হইতে পারা যায়।

মিঃ রাসেল অনেক কথা বলিলেও সুখ যে কি তাহা বলেন নাই। সুখ কি তাহা অনেকেরই ধারণা থাকিলেও উহার সংজ্ঞা প্রদান করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সুখ কি? সাধারণতঃ মানব যাহাতে তৃপ্তি লাভ করে, তাহাকেই সুখ বলে। বুভুক্ষু ব্যক্তি অন্ন-ভোজন করিলেই সুখী হয়। প্রবাসী দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সুখী হয়। নিঃসন্তান সন্তান লাভ করিলে সুখী হয়। নির্ধন ধন প্রাপ্ত হইলে সুখী হয়। সুতরাং যাহার যে বস্তুটী নাই, তাহার প্রাপ্তিতে তাহার মনের মধ্যে যে আনন্দ আনয়ন করে তাহাকে সুখ বলে। সুখের প্রত্যাশী সকলেই, শিশুও নূতন দ্রব্য পাইলে আনন্দিত হয়। বৃদ্ধও তাহার আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য লাভ করিলে তৃপ্তি লাভ করে। সুতরাং মানব জাতিই সুখের উপাসক। কিন্তু সুখের মোহ হইতে মানব-জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য আদিম যুগ হইতে বিবিধ প্রয়াস চলিয়া আসিতেছে, তাহারই একটা সংক্ষেপ ইতিহাস নিয়ে দিতেছি।

প্রাচীন যুগে গ্রীসে সোফিষ্ট নামক একদল জ্ঞানী বাস করিতেন। তাঁহারা তাৎকালীন তাবৎ প্রচলিত আইন-কানুন সমালোচনা করিয়া উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি জানিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। এই জন্য এই শ্রেণীর জ্ঞানীদিগকে সমাজের পরম শত্রু জ্ঞানে অনেক সময়েই তাহাদিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করা হইত। সক্রেটিসকে অনেকেই সোফিষ্ট শ্রেণীতে ফেলেন। সক্রেটিস্ গ্রীসের যুবাগণকে পাপ-পথে চলিবার পরামর্শ দিতেছেন এই অভিযোগ আনয়ন করা হয়। পরে এই অভিযোগই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হয়। সক্রেটিসের মৃত্যুর পর প্রাচীন গ্রীসে দুই শ্রেণীর দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। এক শ্রেণী তাবৎ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু গ্রহণে ও উপভোগে সুখ এই চরম সত্য ঘোষণা করেন, তাঁহাদিগের নাম ইপিকিউরিয়ান, আর একদল মনের শান্ত ভাবকেই সুখের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাবৎ পার্থিব বস্তু ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন,

এই শ্রেণীকে Stoics বা ত্যাগী সন্ন্যাসীর দল বলা হইয়া থাকে। সত্য কথা বলিতে কি মানব কি অব্যক্ত' কারণে ভোগকে একটু বিশেষ ভয়ের চক্ষেই দর্শন করিয়া থাকে। এই জন্যই পৃথিবীর তাবৎ দেশেই অতি প্রাচীন কাল হইতেই ত্যাগের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। সন্ন্যাসীগণ গৃহীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রায় পৃথিবীর তাবৎ প্রচলিত ধর্ম্মই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এই-জন্য মানব জাতি ত্যাগকেই পরম মোক্ষ ও কাম্য বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কার যখন মানবের ভোগ্য বস্তু শুধুই যে অনাবশ্যক রূপে বৃদ্ধি করিয়া দেয় তাহাই নয়, উহার প্রাচুর্য্য ও সংঘটিত করে তখন মানব জাতি নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়ায় আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণ, মিল, কাণ্ট, হেগেল এক নূতন তত্ব প্রচার করেন —তাহা utilinirism or greatest Good to greatest mankind. ইহারা সুখকে Good এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়া পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীকেই এইGood এর সন্ধান দিবার জন্য ব্যগ্র হন। কিন্তু শীঘ্রই লোকে বুঝিতে পারে যে উহা কথার কথা মাত্র। সর্ব্ব সাধারণকে সমভাগে সুখ বাঁটিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। তখন ইউরোপে Hedonism বা আত্ম ভোগ নীতি প্রচারিত হয়। দার্শনিক ক্যাণ্ট Hedonism মানিয়া লইলেও উহার বর্ত্তমান সংজ্ঞা প্রদান করিতে পারেন নাই। আধুনিক দার্শনিকগণ হিডোনিজমকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন, Egoistic Hedonism বা নিজের সুখ ভোগ প্রবৃত্তি এবং universal Hedonism বা বিশ্ব জগতের সাধারণের সুখভোগ প্রবৃত্তি।

Hedonism বা সুখভোগ নীতি প্রচলিত হইলে ধর্ম্ম জগতে এক ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। ধর্ম্মের নেতাগণ এই মনোবৃত্তিকে মহা পাপ বলিয়া উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, নব্য দার্শনিকগণ তখন ধর্ম্ম কি উহার বিশ্লেষণ করিবার জন্য আপনাদিগকে নিযুক্ত করিতে াকেন। তাঁহারা দেখান যে জগতে কোন প্রকার Standard Moral laws নাই। সকল প্রকার নীতিই জাতি বিশেষ বা সময় বিশেষের জন্য রচিত। যে যুগে ইলিয়াড. রচিত হইয়াছিল, সে যুগে সাধারণ সম্পত্তির বিশেষ প্রাদুর্ভাব না থাকায় পরাস্বাপহরণ পাপ বলিয়া সমাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইত না। সতীত্ব সম্বন্ধেও সেরূপ কোন দৃঢ় বন্ধন ছিল না। ঐতিহাসিক যুগে ও আথেন্সের আইন-কানুনের সহিত স্পার্টার আইন-কানুনের অনেক পার্থক্যই লক্ষিত হয়। তাঁহারা এই জন্যই এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ধর্ম্ম-ভাব বা ঐ রূপ কোন মনোবৃত্তি মানবের স্বর্গীয় সৃষ্ট বস্তু নহে। প্রত্যেক মানবেরই নিজের একটী বিশেষ জগৎ আছে। তাহাকে এই জগতের তাবৎ নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে হয়। এই সমস্ত নিয়মাবলী যখন লিপি-বদ্ধ হয় তখনই মানবজাতি সভ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই লিপিবদ্ধ আইনকে তাঁহারা tribal serf বলেন। অর্থাৎ মানব জাতি তখন আপনার স্বার্থকে সমগ্র দলের স্বার্থ অপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করিতে শিক্ষা করে। প্রাচীন কালে এই জন্যই রাজ আইন ও ধর্ম্ম আইন, উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য থাকে না। জাতি ক্রমশঃ যতই সভ্য হইতে থাকে তখন আইনের নীতিকে সমালোচনা করিতে শিক্ষা করিতে থাকে। এই সমালোচনা করিবার প্রবৃত্তিই তখন তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় আইন হইতে ধর্ম্ম জগতের কতকগুলি আইন রচনা করিতে প্রবৃত্ত করে। এইরূপে রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি দুইটি পৃথক বস্তু হইয়া যায়। আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষেও আমরা রাজ-নীতির সহিত ধর্ম্মনীতির বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাই না। জাতির জ্ঞানোন্মেষের সহিত উভয় নীতির মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করা হয়।

এই জন্যই বর্ত্তমান দার্শনিকগণ পাপ বা ধর্ম্ম বলিয়া কোন কিছু স্বীকার করিতে রাজী রহেন। পাপের ভয় মানবকে অনেক সময়ে সৎপথে চালিত করিয়াছে সত্য কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সময়ে তাহাকে বিব্রত করিয়া অসুখী করিয়াছে। Ethical Hedonism এই জন্যই বলিতেছে যে পাপ কিছুই নাই, সুতরাং জীবনে যাহা কিছু উপভোগ্য তাহা উপভোগ করাই জীবনের মূল উদ্দেশ্য। যাঁহারা এখনও ঈশ্বর এবং ধর্ম্ম নাই অনুভব করিতেও ভয় পান, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বর্ত্তমান যুগের দার্শনিকগণ বলিয়াছেন যে জীবন বা [illegible]

র অনেকটা অস্বাভাবিক অবস্থা। কোন দ্রব্য পান্তর প্রাপ্ত হইলে উহার যেমন ক্ষণিক উত্তেজনা হয় মাদের মানব-শরীরের সবলতা ও সজ্ঞান ভাব ও ক সেইরূপ। রস পচিলে উহাতে পোকা হয়, মাটীর ধারণ অবস্থা নষ্ট হইলে উহাতে কেঁচো জন্মিয়া থাকে। য়েকটী প্রাকৃতিক শক্তির অস্বাভাবিক সম্মিলনেই মাদের দেহের সৃষ্টি। এই জন্যই মৃত্যুর অর্থ স্বাভাবিক বস্থায় পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন। জল স্বাভাবিক অবস্থা প্ত হইলে যেমন বিশুদ্ধ হইয়া পোকাহীন হয়, তেমনি মাদের শরীরের পদার্থ গুলির স্বাভাবিক আকার রণের নামই মৃত্যু।

এইরূপ চিন্তা করা বড়ই কঠিন। কোন মানবই হার জীবনের বাহিরে কিছুই নাই স্বীকার করিতে জী নহেন। সম্পত্তির পশ্চাতে যেমন উত্তরাধিকারী কা চাই, সেইরূপ জীবনের পশ্চাতে আর একটি জীবন কা চাই-ই, এই জীবনের নামই অনন্ত জীবন বা রলৌকিক জীবন। আমাদের দেশে একটি প্রবাদ াছে যে পূর্ব্ব-জন্মের ধন ও বিদ্যা পর-জন্মে দর্শাইয়া কে। এইরূপ জ্ঞান লোকসমাজে প্রচলিত না থাকিলে ানব যে কর্ম্মহীন ও উদাসীন হইয়া উঠিবে।

বর্ত্তমান যুগের যুগবার্ত্তা জীবন ও ঈশ্বর অস্বীকার করিয়াছে বলিয়াই তাহারা সর্ব্ব প্রকার সুখকেই জীবনের মোক্ষ লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারিয়াছে। সুখ অর্থে ভোগ হইলেও সুখের ও একটা মূল্য আছে। যে মূল্য দিয়া যে সুখ পাওয়া যায় উহা যদি মূল্যের অনুপাতে কম হয়, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই ত্যজ্য। এই জন্যই রাত্রি জাগরণ করিয়া থিয়েটার, বায়স্কোপ দর্শন করিলে যদি শরীরের ক্লান্তি আসে তবে ঐরূপ করা উচিত নয়। যেরূপ মদ্যপানে শরীরের সুস্থতা ও মনের প্রফুল্লতা রক্ষা করে তাহা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এইরূপ মাত্রা যখন অতিক্রম করিয়া উহা শুধু মাদকতা আনয়ন করিয়া দিয়া শরীর ও মনের ক্লেশকর হয়, তখন উহা পরিত্যাজ্য।

এখন কথা হইতেছে যে বর্ত্তমান নর-নারী জীবনকে কিসের আদর্শ দিয়া উহাকে রচনা করিবে? তাহার উত্তরে বর্ত্তমান কালের দার্শনিকগণ বলিতেছেন যে আপনার সুখান্বেষণে আত্মা নিযুক্ত করিয়া বিশ্বের তাবৎ প্রাণীকে সুখী করিবার প্রচেষ্টা করিলেই মানব তাহার কর্ম্ম ক্ষেত্র সকল সময়েই উন্মুক্ত দেখিতে পাইবে। আপনার আত্মা তাহার নিকট যদি প্রিয় হয়, পৃথিবীর তাবৎ লোকের আত্মাই তাহার নিকট প্রিয় হওয়া উচিত। আপনার স্বাধীনতা ও কর্ম্ম-দক্ষতা যদি তাহার উপাস্য হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর তাবৎ লোকের স্বাধীনতা ও কর্ম্ম-দক্ষতাকে সম্মানের চক্ষে দর্শন করা প্রয়োজন। এতদিন মানব মন সামান্য পরিবার বা রাষ্ট্রের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই পরিবার বা রাষ্ট্রও শত বেষ্টণী যোগে আবদ্ধ ছিল। এই সমস্ত সংস্কার বর্জ্জন করিবার মত মনোবৃত্তি লাভ করিতে যাইয়াই মানব জাতিকে ধর্ম্মের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। ধর্ম্মের গণ্ডি সঙ্কীর্ণ, উহার মনোবৃত্তি একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। বিশাল আকাশ তলে আসিয়া দাঁড়াইলে মনবৃত্তি যেমন অসীম আকার ধরণ করে, সেইরূপ সকল সঙ্কীর্ণতা খসিয়া পড়ে। যাঁহারা ভাবেন বর্ত্তমান মানব ধর্ম্ম ও ঈশ্বর পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে বাঁচিতে পারে তাহারা কি ভাবিতে পারেন যে বর্ত্তমান মানব জাতির যেরূপ ক্ষুদ্র গণ্ডি খসিয়া গিয়াছে সেইরূপ বিশাল কর্ম্ম-ক্ষেত্র তাহার নিকট নূতন তত্ত্ব আনয়ন করিয়া তাহাকে যথেষ্ট মনোযোগ দিবার অবসর প্রদান করিয়াছে?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীপ্রমীলা রায় চৌধুরী

— ১২ —

বিনীতার হঠাৎ উদয় হওয়াটা লতিকার চোখে ভাল লাগে নাই। তার যেন আপনা থেকেই মনে হতে লাগল যে নরেশের সঙ্গে এর যেন কোথায় কি সূত্রে যোগ হয়েছে—সে যোগ ছিঁড়ে ফেলবার ক্ষমতা তার তো নেই-ই কারো আছে কিনা তাই সন্দেহ। বিয়ের আগেই নরেশ তার চারিদিকে এমন গণ্ডী দিয়ে রেখেছিল যে সেখানে সুশ্রী, সুরূপা, অপূর্ব্ব সুন্দরী লতিকার প্রবেশ এক রকম নিষেধ হয়েই পড়ল। আবার কোথা থেকে ধূমকেতুর মত ও এসে হাজির হল? পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে লুকিয়েছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আবার ওর ভাগ্য-গগনে একটা বিপর্য্যয় ঘটাতে ওকে যে ডাকল কে, এর সদুত্তর ভেবে ভেবে লতিকা কিছুই ঠিক করতে পারলেনা।

বিনীতাকে প্রথম সে যেদিন দেখে, সেদিনের কথা মনে পড়ল। নরেশ জেল থেকে ফিরবে। লতিকা মাঝে বাপের বাড়ী গিয়েছিল; ফেরবার সময় শিয়ালদা ষ্টেশনে দেখল তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে।

সুরেশ লতিকাকে নামাতে আসছিল। হঠাৎ প্লাটফরমের শেষ দিকে চেয়ে বল্লে "ওকে বিনীতাদি নাকি?"

ট্রেন তার শেষ গন্তব্য স্থানে এসে পড়ায় লতিকার over carried না-হবার সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে, যেখানে কয়েকটী খদ্দর-পরা মেয়ে, কুলীর মাথায় নিজেদের মোট গুলি তুলে দিচ্ছিল সে সেইখানে গিয়ে হাজির হল। আর একটু এগিয়ে গিয়ে, চশমাটা বেশ করে মুছে নিয়ে সে বল্লে—"নমস্কার বিনীতা দি, আপনি কেত্থেকে!"

পিছন ফিরে দেখে নিয়ে একটী দোহারা গড়নের মেয়ে মুখে আশ্চর্য্য ও হাসি মাখিয়ে বল্লে "আরে কে? সুরেশ নাকি? ওঃ তুমি তো বড্ডই লম্বা হয়ে গ্যাছ দেখ্‌ছি—আমাকেও ছাড়িয়েছ যে! তার পর কি করছ?"

খুব নীচু সুরে সুরেশ বল্লে "আমি তো এই বার 'এ্যাপিয়ার' হব ভাব্‌ছি তা বোধ হয় ঠিক মত হয়ে উঠবেনা।"

"কেন? তৈরী হতে পার নি?"

"নাঃ! দাদা জেলে যাওয়ায় অনেক ফাঁক পড়ে গেছে।"

"ওঃ! নরেশ বাবু জেলে গেছেন? কেন অপরাধ?"

"অপরাধ আর বেশী এমন কি? বক্তৃতা দিয়েছিলেন!"

"তাতেই ধরলে? তারপর বেরোবেন কবে?"

"বেশী দেরী নেই। ২১ দিনের মধ্যেই বেরোবেন।"

"ভালই হল যোগা-যোগ আর বলে কাকে? এলা[illegible] যখন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করেই যাব।"

"আচ্ছা আপনি এখন কোথায় থাকেন বিনীতা দি[illegible] করেনই বা কি?"

মুখে একটু হাসি এনে বিনীতা বল্লে "থাকবা[illegible] জায়গার বিশেষ কোনো স্থির নেই—যখন যেখানে পা[illegible] তখন সেখানে থাকি। কখন সরকারের অতিথিশালাতে[illegible] থাকি। দাদা ডেপুটী হয়েছে কিনা—তাই সেখানে[illegible] থাকা তো আর আমার সম্ভব নয়। আর করি, আপা[illegible] ততঃ অসহযোগ! তারই ফলে সকল দুয়ার বন্ধ থাক[illegible] লেও অতিথিশালা খোলাই থাকে। উদ্বাস্তু হয়ে উঠলে[illegible] সেখানে গিয়ে ঢুকি।"

"আপনি জেলেও গিয়েছেন?"

স্নিগ্ধ স্বরে বিনীতা বল্লে "এ আর নতুন কথা কি[illegible] এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে ভাই? আচ্ছা যা[illegible] আমার কথা বোলো - একদিন গিয়ে দেখা করে আসব। আচ্ছা আসি। বলে হেঁট হয়ে কুলীর মাথার মোট[illegible] দিয়ে তার সঙ্গে চলে গেল।

সুরেশ ধীরে ধীরে যে কামরায় লতিকা [illegible]

থামে এসে দাঁড়াল। দেখলে ভেতরে লতিকা নেই। এতক্ষণ যে গাড়ীতে বসে থাকবার কথা নয় তা বুঝতে পেরে, 'প্রাইভেট কার' যেদিকে থাকে, সেই দিকে পা বাড়াতেই তাদের দরোয়ান এসে ডাকলে। তার সঙ্গে গিয়ে লতিকাকে গাড়ীতে বসে থাকতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে, উঠে বসে গাড়ী চালাবার হুকুম দিলে। গাড়ী চলতে আরম্ভ হল; সে বল্লে "আজ বিনীতাদির সঙ্গে দেখা —জানো বৌদি! সেই যে যার কথা তোমায় একদিন বলেছিলাম!" একটু হেসে লতিকা বল্লে "তাই নাকি? আমি কিন্তু তা হলে তাকে চুরি করে দেখেও নিয়েছি। শুনে পর্য্যন্ত দেখার ইচ্ছে ছিল খুব। বিশেষ ভাল নয় তো দেখতে!"

"তা তো নয়-ই—বিশেষ তোমার কাছে।

সত্যই—বিশেষ তার কাছে। সুরেশ ঠিকই বলেছিল। সেদিনকার প্রত্যেটী কথা তার সামনে যেন ফুটে উঠল।

অন্ধকারে বসে তার মনে যখন এমনিতরো হাজারও ভাবনা ঢেউ খেলে যাচ্ছিল, তখন চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে পাশের বাড়ীর সেই ঘর খানিতে বিজলী বাতি জ্বলে উঠল। তার চোখ সেই ঘর খানিতে যেন আটকে গেল। দেখলে বৌটী ঘরে আলো জ্বালিয়ে, বিছনা ঝাড়ছে। ঝাড়া শেষ হলে, কাপড়ের আলনাটা একটু গোছালে। তার স্বামী তখনও ফেরেনি—ছেলে গিয়েছে বেড়াতে, সেও ফেরেনি। ছেলের জামা, স্বামীর কাপড় সে যে কত প্রীতির সঙ্গে সাজিয়ে রাখলে তা লতিকা ঘরে বসেই অনুভব করলে। যেখানে যেটী রাখলে মানায়, ঠিক তেমনি করে রেখে বৌটী ঘরের ভেতরে যেন লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত আনন্দ-চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে, সে, তার নিজের হাতে সাজানো, গোছানো, পরিপাটী করে বিছানাপাতা ঘরখানির দিকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে চেয়ে দেখলে। পরে আলো নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। লতিকার মনেও যেন ঐ ক্ষুধা জেগে উঠল। বৌটীর ক্ষুধা আছে, সরস খাদ্যও আছে; কিন্তু তার? তার যে শুধু জীবন জোড়াই 'সাহারার' তৃষ্ণা বুকে চেপে নিয়ে বেড়াতে হবে! চোখ দিয়ে অনাহুত অশ্রু ঝরতে লাগল—নিঃশব্দে।

একটু পরেই আবার সামনের ঘরে আলো জ্বলল। এবার বৌটী আর একা নয় কোলে তার ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। সাবধানে, সন্তর্পণে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, তার ছেড়ে-ফেলা জুতা ও জামাগুলি পাট করে রেখে দিলে। বিছানাতে কিছুক্ষণ বসে থেকে সে উঠে দাঁড়াল ও নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবারে আর আলো নিভলনা।

দু'চার মিনিটও হবেনা, সে আবার ফিরে এল। এবারে তার স্বামীও ফিরেছে। তাদের মধ্যে যে কথা হচ্ছিল, তা খুব আস্তে আস্তে হলেও, রাত্রি বেলা ও জানালা দুটি খুব কাছাকাছি বলেই লতিকার তা শুনবার কোন বাধা হলনা। সে শুনলে বৌটী বলছে তার স্বামীকে "ভালই হল—আমি ভাবছিলাম ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল, কে যে ওর কাছে বসে এখন! অমনি তুমি এলে, এখন চট্ করে খেয়ে নিয়ে শুয়ে শুয়ে ছেলে পাহারা দেও, যতক্ষণ আমি না আসি! তার স্বামী একটুও রাগ না করে বল্লে "খাওয়া হয়ে গেলে আবার আসতে দেরী হবে কেন? কি কাজ করা হবে শুনি!"

মুখ খানা ঘুরিয়ে বৌটী বল্লে "আহা! কথার ছিরি দেখ! ঘর সংসারের কাজ যেন একটা তাই আমি ওঁকে নাম করে সেটা বলব। কত কাজ থাকে তা জান! এখনও কি ছেলেমানুষ আছি নাকি আমি যে খেয়েই চুপ্ করে শুয়ে পড়ব?" হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে কাছে এনে স্বামী তাকে ভেঙিয়ে বল্লে "আহা-হা-হা! একেবারে বুড়ী! দেখি তো দাঁত পড়েছে কিনা?" বলে সে তার মুখ খানাকে দুহাতে তুলে ধরলে।

এক ঝটকায় তার হাত থেকে মুখ খানা ঘুরিয়ে নিয়ে বৌ বল্লে "কি রঙ্গ কর দিন রাত! ভাল লাগেনা।"

স্বামী তবুও ব্যঙ্গ ভরে বল্লে "একটুও ভাল লাগেনা? সত্যি বলছ? আচ্ছা যাক্। ভালমত বখ্শিশের আশা থাকলে আমি ছেলের পাহারায় বসতে পারি নইলে ব্যগার খাটা আমার কুষ্ঠিতে নেই।"

"ইস! মুখ খানি খুব আছে! আগে কাজ কেমন দেখি, তবে না, বখশিশ!"

"শোন, শোন, ও বাড়ীর নরেশ বাবু যে ফিরছেন।"

"ফিরছেন নাকি?" বলে বৌটী নরেশের বাড়ীর দিকে চেয়ে দেখলে।

তার রকম দেখে তার স্বামী হেসে বল্লে "তুমি কিচ্ছু খবর রাখনা কেবল বরটীকে আঁচলে বাঁধতেই ব্যস্ত! এই তো পাশের বাড়ীতেই নরেশ বাবুর স্ত্রী আছেন তাঁর সঙ্গে বোধহয় আলাপের চেষ্টাও করনি এতকাল! তা হলেই তো সব জানতে পারতে!"

ঠোঁট উল্টিয়ে সে বল্লে" ঈস্! খেয়ে দেয়ে আমার আর কাজ নেই কিনা তাই কে কখন্ জেলে গেল, কে কবে ফিরবে তারই হিসেব কস্‌তে বসি।"

"চটো কেন? ধরো, তোমার বরই যদি জেলে যায়! কি করবে?"

হটাৎ চটে উঠে বৌটী বল্‌লে "যাবেই বা কেন? যাওয়ার যুক্তি সঙ্গত কারণ চাই তো একটা। বক্তৃতা দিয়েছ? না খদ্দর প্রচার করেছ? অমনি বল্লেই বল? ও সব যারা দিন্ রাত হুজুগ করতে ভালবাসে—তারাই করে আর জেলে যায়।"

লতিকা জান্‌লায় বসে এর প্রত্যেকটী কথাই শুনতে পেলে। ভাবলে "সত্যিই তো তুমি যে সুধা-সাগরে ডুবে আছ, তাতে অন্যের সুখ্ দুঃখের ভাবনা ভাববার সময় কই তোমার? তোমার স্বামী আছে, পুত্র আছে—তাদের স্নেহ মায়ায় গড়া ঘর সংসার আছে—তোমার সময় কই?" এই বৌটীর চোখে নরেশের স্থান যে কোথায় ও কেমন, তা বুঝ্‌তে তার আর বাকী রইল না।

স্ত্রীর কথা শুনে স্বামী হেসে উঠ্‌লো—বল্‌লে "খুব বুঝেছ, বন্দীদের ওপর তোমার খুব সহানুভূতি! তোমার বর জেলে যাবেনা—কি জন্যে যাবে? চিরকাল তোমার আঁচলেই বাঁধা রইলো—নাও, এখন খেতে দেবে না ঝগরাই চালাবে?"

বৌটী এবারে উঠল। জলছড়া দিয়ে মেঝেটা পরিষ্কার করে মুছে ফেলে একখানা হাতে বোনা কার্পেটের আসন পাতলে। খাবার সবই তৈরী ছিল, শুধু লুচি কখানা গরম গরম ভাজবে বলে ষ্টোভ্‌টা জ্বালালে। 'প্রাইমাস্' ষ্টোভ. দু এক মিনিটের মধ্যেই ফোঁ ফোঁ করে গর্জ্জন করে উঠ্‌ল। কথা আর শোনা গেলনা; কিন্তু লুচি ভাজার গন্ধে ও মাঝে মাঝে তাদের সম্মিলিত হাসির শব্দে লতিকা বুঝ্‌লে যে খাওয়া এখনও শেষ হয়নি। জ্বালা ভরা মন নিয়ে লতিকা দেখেই যেতে লাগ্‌ল যে এত অফুরন্ত হাসি, গল্প ওরা পায় কোথা থেকে? স্বামীর প্রিয়া, সন্তানের মাতা, বৌটীকে তার কাছে মহিমাময়ী বলে মনে হতে লাগ্‌ল। তারও সেবিকা প্রাণ, এমনি করে কাউকে বুকের দরদ দিয়ে খাওয়াতে, তার প্রত্যেকটী তুচ্ছ অসুবিধাও দূর করতে উন্মুখ হয়ে উঠল। কিন্তু হায়! সে লোক কই?

লেখিকা—শ্রীহাসিরাশি দেবী

১৩

আঘাত স'য়ে স'য়ে পাথরেও বুঝি ফাটল্ ধ'রে, বুঝি বা চৌচিরও হ'য়ে যায়; কিন্তু মানুষের বুক ফাটে না, ভাঙ্গেও না, যেমন ছিল তেমনি থাকে, তেমনি সব কিছুই তাতে সহ্য হয়, তাই লতিকার বুকও ফাটলো না, ভাঙ্গাতো দূরের কথা।

জানালার ওপোরে ভর দিয়ে সে উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে রইল, তারপরে মেঝের ওপোরে শ্রান্ত ভাবে শুয়ে প'ড়ে একটা নিঃশ্বাস ফেল্লে—

"মাগো:—"

এতবড় সংসারের সমস্ত-কাজ, সমস্ত-ব্যবস্থার ভার যে প্রায় একা তারই হাতে, হয়তো সেই জন্যই এখনি ডাকও প'ড়তে পারে, একথা ভুলে গিয়ে সে ভাবতে সুরু ক'রলে কোথায় তার অতীত, কোথায় বর্ত্তমান, আর কোন অতল অন্ধকারে তার অনাগত ভবিষ্যৎ নিদ্রায় অচেতন!

ভবিষ্যৎকে আজ হাতড়েও দেখা পাওয়া যায় না বটে কিন্তু বর্ত্তমানকে স্পষ্ট দেখা যায়, আর ওরই সঙ্গে জড়িয়ে—উঠে আসে অতীতের জীর্ণ ইতিহাস!

সে ইতিহাস ছেঁড়া যায় না, জীবনান্ত পর্য্যন্ত লুপ্তও হয় না; সে চির জাগ্রত,—তাই বুকের মধ্যে রক্তাক্ষরে দিন রাত্রি জ্ব'লতে থাকে।

যদি মোছা যেত,—যদি তা ছেঁড়া সম্ভব হ'তো, তাহ'লে ওই ওরা দুজন,—যাদের নির্জ্জন আলাপের এতটুকু কথা ছিন্ন মেঘের মতো ভেসে এসে এক নিমেষে তার সমস্ত অন্তরটাকে কালী মাখিয়ে,—সকল সন্দেহের অবসান ক'রে দিয়ে গেল,—তারা কি তবে তাদের ব্যর্থ বাসনার শেষ সুরটুকুকে একেবারে নীরব ক'রে দিত না? হয়তো,—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই দিত, কারণ—বঞ্চিত জীবন বহন করা যে কতখানি কষ্টকর তার সবটা না বুঝলেও কিছুও সে নিজের জীবনে বুঝেছে, আর বুঝেছে ব'লেই মনে হয়, সফলতার ক্ষণমাত্রও কাম্য, কিন্তু ব্যর্থতার দীর্ঘকাল লাভ মৃত্যুর অপেক্ষাও কঠিন শাস্তি, ও শাস্তির যেন মাপ নাই, প্রকাশের ভাষাও খুঁজে পাওয়া কঠিন। শুধু বুকের মধ্যে দিবানিশি ক্রন্দন করে কোন এক অজানা হতভাগ্য,—আর প্রতিক্ষণে বিপ্লবের সৃষ্টি ক'রতে চায় অপূর্ণতার আর্ত্তনাদ!

নরেশ বিনীতার কথার উত্তরে ব'লেছিল

"আমার ইতিহাস যদি শুনতে—"

হাসি আসে। আনন্দের হাসি এ নয়, বিদ্রূপের। মনে হয় বলে—

"একা তোমার জীবনের ইতিহাস হয়তো বিনীতার কাছে মূল্যবান হ'তে পারে, কিন্তু আর কারো কাছে তার বিশেষ মূল্য আছে ব'লে মনে হয় না। বরং মনে হয় তোমার ও বিনীতার মাঝখানে এসে প'ড়ে,—না জেনে সে, এতবড় অন্যায় ক'রে ফেলেছে যে বুঝি তার আর প্রায়শ্চিত্য নাই! তোমাদের এ পথ ছেড়ে যেতে পারলে সেও যেন একটা সুখের না হোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতো। একদিন তারও মনে সাধ জেগেছিল,—আশার মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে ভেবেছিল,—তোমার অতীতের ইতিহাস ছিঁড়ে ফেলে আবার নতুন ক'রে সে লেখা সুরু করাবে! কিন্তু কোথায় তুমি, আর কোথায় সে?

সন্দেহের যবনিকা আজ ভূলুণ্ঠিত!

ওপার স্পষ্ট দেখতে পেয়ে লতিকা যেন কাঁদবার শক্তি পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেললে। নিষ্ফল আক্রোশে মন তার আহত অজগরের মত গর্জ্জন ক'রে উঠলো—

কে কার? সেদিনও যখন স্বামীর মুখে "ভালোবাসি" কথাটা শুনে সে স্বর্গসুখ অনুভব ক'রেছিল,—সে কথা মনে হ'তেই কে যেন তার সমস্ত অঙ্গে আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিলে, ইচ্ছে হ'লো ছুটে গিয়ে টেবিলের ওপোর থেকে নরেশের ফটোখানা নিয়ে ছিঁড়ে ঐ পথের মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, বিপুল জনস্রোতের পদতলে তা দলিত হোক্, লুপ্ত হোক!

অন্তর্যামী বুঝুন, ললাটে তিনি যে বিদ্রূপ-লিপি লিখেছিলেন, সে তার কিছু শোধও নিয়েছে!

দরজা ভেজান ছিল; ওপাশ থেকে একটা মৃদু কণ্ঠস্বর কাণে এলো—

"বৌ-দি!"

"এসো।"

সমস্ত অবসাদ যেন এক নিঃশ্বাসে ঝেড়ে মুছে ফেলে লতিকা উঠে ব'সলো; স্নান-সিক্ত চুল গুলো তখনও শুখায় নাই, তবু সে গুলো জড়িয়ে বেঁধে ফেললে। সুরেশকে প্রবেশ ক'রতে দেখে ইঙ্গিতে একখানা চেয়ার দেখিয়ে ব'ললে

"বোস।"

মেঝের ওপরে ব'সে প'ড়েই সুরেশ প্রশ্ন ক'রলে—

"শুয়ে ছিলে যে?"

তার গলার স্বরটাও যেন আজ কেমন ধারা!

লতিকা দুইচোখে বিস্ময় ভ'রে সুরেশের দিকে তাকালো; শুষ্ক হাসি মুখের ওপোরে টেনে এনে উল্টো প্রশ্ন ক'রলো "তোমার আবার হ'লো কি ঠাকুর পো?"

সুরেশও যেন চেষ্টা করেই হাসলে। উত্তর দিলে—

"আমার? আমার কিছুই তো হয়নি! কিন্তু মনে হয় তোমার—" একটু থেমে যেন স্বরের জড়তাকেই দূর করে প্রশ্ন করলো—"বলছিলাম যে, দিনের বেলায় শোওয়া তো তোমার কুষ্ঠিতে লেখেনি শুনেছি, তাই অসময়ে শোওয়ার কারণ জানতে চাচ্ছিলুম। অন্যায় হ'য়েছে?"

"অন্যায়?"

লতিকা যেন টেনে টেনে হাসতে লাগলো।

একটু-পরে হাসি থামিয়ে, মুখ তুলে সুরেশের দিকে চাইতেই মনে হ'লো ও যেন এতক্ষণ তারই দিকে চেয়ে ছিল; কিন্তু সে দৃষ্টিতে আর কিছু ছিল না, ছিল সমবেদনা জ্ঞাপনের ইচ্ছা।

লতিকা ডাকলো—

"ঠাকুর পো !"

সুরেশ চমকে মুখ ফিরালো—

"কি ব'লছো বৌ দি ?

"না, বিশেষ কিছু বলবার নেই ভাই, শুধু জিজ্ঞেস করছি, যে এতক্ষণ কি তুমি পড়ছিলে ?

"হাঁ, কেন ?"

সুরেশর ব্যথা-ম্লান দৃষ্টির সম্মুখে মুখ তুলে কথা বলতে লতিকার কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, একটু হেসে জবাব দিলে—

"কিছু নয়; আমি গিয়ে দরজা বন্ধ দেখে ফিরেছি কিনা তাই জিজ্ঞেস করছিলাম !"

সুরেশ দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে একটু বেঁকে বস্‌লো, উত্তর দিলে—

"কিন্তু আমিতো জানতে পারিনি, ফিরে এলে কেন ? ডাকলেই তো পারতে !"

"ডেকেই বা কি হ'তো ?"

শুষ্কস্বরে সুরেশ উত্তর দিলে—

"কিছুক্ষণ গল্প, আর কি !"

ক্ষণকাল নীরবে থেকে পরিহাসচ্ছলে লতিকা ব'লে উঠ্‌লো "অর্থাৎ তোমার পড়া কামাই, কেমন ? কিন্তু সেটা ক'রে তোমার এখনকার মূল্যবান সময় নষ্ট ক'রতেও যে কষ্ট হয় ঠাকুর পো ! ঐ কষ্টটুকু যদি না হোত তা হ'লে তো কথাই ছিল না ! কিন্তু সব কাজের আগে শেষের ঐ যে ভাবনা, ঐটা অনেক খানি আনন্দ, অনেক খানি বেদনা মানুষকে এনে দেয়; আর ঐ জন্যেই াশঙ্কা বল, অনুশোচনা বল সব কিছুই মনের ওপোরে াকাধিপত্য স্থাপন করে। কিন্তু তা ব'লে মনে ক'রোনা াকুর পো, যে আমার অনিচ্ছায় ফিরে এসেছিলাম, চ্ছে একটা কিছু ছিল বই কি !

সে নিঃশব্দে হাসতে লাগলো।

একটা কথা ব'লতে গিয়েও সুরেশ থেমে গেল, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আজ যেন এই প্রথম ঘরখানাকে ভালো ক'রে দেখতে লাগলো।

পা-মোছা থেকে আরম্ভ ক'রে দেয়ালে খাটানো ছবি গুলো পর্য্যন্ত সবগুলোই যেন আজ তার কাছে সম্পূর্ণ নূতন।

ব্যঙ্গস্বরে লতিকা প্রশ্ন ক'রলে—

"কই, তোমার দাদা, বিনীতাদির কথা তো জিজ্ঞেস ক'রলেনা ?"

"সুরেশ জবাব দিল—"জানি।"

"জান, তারা চ'লে গেছে ? যাবার সময়ে দেখেছিলে ?" নির্ব্বাকে সুরেশ মাথা নাড়তেই একটু আগের মুখরা লতিকা যেন মুহূর্ত্তের জন্য ভাষা হারিয়ে ফেললে। দুর্ভাগ্যের ভোগ সহ্য করা যায়, কিন্তু তার চেয়েও কষ্টদায়ক হয় সেইটাই অন্যের মুখথেকে শোনা। লতিকার উদ্ধত মন এক নিমেষে আত্ম-অপমানের লাঞ্ছনায় নীড়-ভ্রষ্ট ভীরু-কপোতীর মত আর্ত্তনাদ ক'রে উঠেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

ওর রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে সভয়ে সুরেশ ডাকলে "বৌদি !"

কপালের দুপাশ টিপে ধ'রে অস্পষ্ট স্বরে লতিকা উত্তর দিলে—"হুঁ!"

হাত পাখা খানা টেনে নিয়ে হাওয়া ক'রতে ক'রতে ভীত স্বরে সুরেশ প্রশ্ন ক'রলো—

"কি হ'লো তোমার ?

হাত নেড়ে লতিকা জানালে কিছু হয়নি। একটু পরে যখন মুখ তুলে হাসলে তখন তার বড় বড় চোখ দুটো অসহ্য যন্ত্রণায় লাল হ'য়ে উঠেছে। কপালের ওপোরে এসে পড়া ছোট ছোট চুলগুলোকে পেছ'নে সরিয়ে দিয়ে লতিকা ব'লে উঠলো "ভয় নেই, ম'রবো না; কিন্তু ঠাকুর পো, যদি আগে সবই জানতে তা হ'লে আমায় গোড়ায় বলনি কেন ? আশা যখন ভেঙ্গে যায় তখনকার যন্ত্রণা যে ব'লে বোঝাবার নয় ভাই !"

সুরেশের মুখে কথা ছিল না।

লতিকার মুখের হাসি কথা বলতে বলতে মিলিয়ে এসেছিল, আবার একটু হেসে যেন জোর দিয়েই ব'লে উঠ্‌লো—

"যাক—যা হয়ে গেছে তা আর কোনো [illegible] তার জন্যে দুঃখ করাও সাজেনা; কি বল ?"

উত্তরের আশায় সে যার মুখের দিকে তাকালো তার মুখ থেকে এর একটা জবাবও এলোনা, শুধু নিঃশব্দে সে যে দিকে তাকিয়ে ছিল সেই দিকেই চেয়ে রইল, মুখও ফেরালে না।

সুরেশ নিরুত্তর!

ওর হাত থেকে পাখাটাকে নিয়ে পাশে রেখে লতিকা সোজা হ'য়ে ব'সলো, যেন কিছুই হয়নি এই ভাবে বলে উঠলো—

"এবার ওঠা যাক্, কি বল! বেলাও প'ড়ে এলো—," ও ঘর থেকে সত্যবালার ডাক এলো—

"বৌমা!"

"যাই মা!"

উঠে এসে লতিকা তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতেই ব'লতে গেলেন "নরেশ, বিনুর জলখাবারটা—"

বাধা দিয়ে প্রসন্নমুখে লতিকা উত্তর দিলে—

"ওঁরা তো নেই মা!"

"নেই?"

বিস্মিত সত্যবালা পুত্রবধূর কথাটার পুনরুক্তি ক'রতেই লতিকা বলে উঠল—

"না, তাঁরা অনেকক্ষণ আগেই চ'লে গেছেন।"

সত্যবালার মুখে কথা ফুটলো না; পুত্রবধূর মুখের দিকে এমন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন যে লতিকার মুখ ধীরে ধীরে নত হ'য়ে প'ড়লো!

ঘরের মধ্যে সুরেশ তখন অস্থির চিত্তে দ্রুত পাদ-চারণা ক'রছিল।

১৪

সেদিন সন্ধ্যায় নিজের ঘরে ফিরেই বিনীতার মনে হ'লো এতক্ষণকার ধৈর্য্যের বাঁধ বুঝি এইবার এক নিমেষে ধূলিস্মাৎ হ'য়ে যায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরের কোণে কোণে আধিপত্য বিস্তার ক'রলেও সে আলো জ্বাললে না; বরং দরোজা ভেজিয়ে দিয়ে বিছানার ওপোরে ক্লান্ত দেহ-খানা এলিয়ে দিলে।

বাসায় পৌঁছে দিয়েই নরেশ আজ ফিরে গেছে। বিনীতাও যেমন অন্য দিনের মত আজ তাকে আহ্বান করেনি, সেও তেমনি আসে নি! যাবার সময় আর কথাও হয়নি, কোন প্রয়োজনও ছিল না এমনি ভাবে সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল মনে হ'তেই বিনীতার সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে উঠলো। বিকৃত মনের চারিপাশে লতিকার অসামান্য রূপ যেন আবার নতুন ক'রে আগুন জ্বালিয়ে দিলে!

নিজের ছন্নছাড়া জীবনের সঙ্গে ঐ বধূটির সুখময় গার্হস্থ্য জীবনের মিল যে কতটুকু এইটাই ভাবতে ভাবতে মন তার এমন স্থানে এসে উপস্থিত হ'লো যেখানে নরেশ নাই—,দেশ নাই, কাজ নাই, আছে শুধু সে আর লতিকা। পথ তাদের দুজনেরই ভিন্ন। তাই লতিকা ব'সে আছে সংসারের ছায়াময় উদ্যানে, স্বামী ও তার ভাবী পুত্র কন্যা বেষ্টিত হ'য়ে আর সে বসে আছে রৌদ্র তপ্ত মরুর বক্ষে একা। অশান্তির তৃষায় সে কাতর, তবু ঐ অদূরবর্ত্তিনী লতিকার কাছে এক ফোঁটা শান্তি বারি চাইবার মত তার শক্তি নাই। কারণ দানের ক্ষমতা ওর থাক্‌লেও নেবার ক্ষমতা তো বিনীতার নেই। দাতা দান ক'রতে পারে, কিন্তু নেবারও শক্তি থাকা চাই যে! নরেশ ওর স্বামী, তার কে? ক'দিনে-রই বা পরিচয়?

আকর্ষণ ওর হয়তো দুদিনের হ'তে পারে,—মোহও হয়তো আজ কেটে গেছে, কিন্তু বিনীতা যে আজও কিছু ভোলেনি! মন যে মাঝে মাঝে অশান্ত এই কর্ম্ম কোলাহল কাটিয়ে বিবাগীর মত একখানা শান্তিময় কুটীরের মধ্যে ছুটে যেতে চায়, দুঃখে সুখে মুখো-মুখি কপোত-কপোতীর মত প্রিয়তমের বুকে সোহাগ নীড় রচনা ক'রতে চায়!

দু' ফোঁটা চোখের জল যে কখন গড়িয়ে মাথার বালিশে পড়েছিল সেদিকে তার খেয়াল ছিল না, হঠাৎ বাইরে থেকে বাসার কর্ত্রী করুণাদির ডাক তাকে সচকিত ক'রে তু'ললো—

"বিনীতা—"

তাড়াতাড়ি মুখ খানাকে মুছে ফেলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখলে করুণা একখানা খামে মোড়া পত্র হাতে নিয়ে তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে আসতে দেখেই ব'লে উঠলেন—

"তোমার একখানা চিঠি আছে "

"চিঠি !"

হাত বাড়িয়ে নিয়ে বিনীতা দেখলে দাদার লেখা, তারই পত্র। হাতের মধ্যে চিঠিখানা রেখে সে মুখ তুলে একবার করুণার দিকে দৃষ্টি পাত ক'রলো—

"ঘরে আসবেন না ?

"না, একটু কাজ আছে।"

ব'লে চ'লে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও করুণা ফিরে প্রশ্ন ক'রলেন—

"তোমার শরীর কি অসুস্থ ? ঘরে আলোও তো জ্বালোনি দেখছি !"

বিনীতা শুষ্কহাসি হাসলো ; সহজ স্বরে উত্তর দিল—

"না, অসুখ বিশেষ কিছু নয়, মাথাটা ধ'রেছিল, এখন ছাড়ছে ব'লে আর আলো জ্বালিনি !

চটির চটাপট শব্দ ক'রত ক'রতে করুণা-দি বারান্দা ঘুরে অদৃশ্য হ'তেই বিনীতা ঘরে প্রবেশ করে আলোর সুইচটা টিপে দিতেই সমস্ত ঘরটা আলোকোজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। চিঠিখানা খুলে বিনীতা দেখলে নানা কথার মাঝখানেও দাদা যেন তাকেই বারম্বার ফিরে যেতে অনুরোধ ক'রেছেন! লিখেছেন,—"রাগ বা অভিমান বড়'র ওপোরে করা যায় সত্য, কিন্তু ডাকলে ফিরেও আসতে হয়।"

রাগ ? অভিমান ? দুঃখ ?

হ্যাঁ সে একদিন ভাইয়ের ওপোরে অভিমান ক'রেই চ'লে এসেছে বটে. যেদিন দাদা তাঁর বাল্য বন্ধু অমিয়র সঙ্গে তার বিবাহের ইচ্ছা জানিয়েছিলেন এমন কি জোর জানাতেও তাঁর বাধেনি, সেদিন সে অনিচ্ছা জানিয়েও পরিত্রাণ পাবেনা জেনেই ঘরের সকল বাধা জোর ক'রে ছাড়িয়ে বাইরের এই মুক্ত হাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তারপরে আজ কতদিন, কত মাস, কত বৎসর, চ'লে গেছে তার সংখ্যা ঠিক তার মনে না প'ড়লেও তারপরে দাদার আহ্বান যে আজ এই প্রথম, ফিরে যাবার ডাকও যে এই প্রথম, একথা মনে হ'তে এত দুঃখেও তার হাসি এলো।

মানসচক্ষের সম্মুখে গত জীবনের কয়েকটি ছবি ভেসে উঠ্‌লো—মায়ের অসুখ, নরেশদের পাশের বাড়ী ভাড়া নেওয়া,—ওদের সঙ্গে পরিচয় ; তারপর··· তারপর আরও কত কি !

মাঝের কয়েকটা বৎসরের সুখস্মৃতি এখনও উন্মনা ক'রে তোলে ! শেষের বৎসর কয়টার কথাও মনে পড়ে... জেলখানা ! ··পথ··· !

জীবনের পথে কত কে এসেছে, গেছেও, কে তার হিসাব রাখে ! দুনিয়ার নিয়ম যখন এই-ই, তখন এ নিয়ম ভাঙ্গবার ক্ষমতা মানুষের নেই।

বিনীতাও মানুষ ! রক্ত মাংস গঠিত দেহে ভগবান তারও প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন, কাজেই তারও এ নিয়ম ভাঙ্গবার মত ক্ষমতা নেই ! গতানুগতিতে পা ফেলে তাকেও চ'লতে হবে !

খোলা জানালা দিয়ে বিনীতা বাইরের দিকে চাইলো; বড় বড় বাড়ী, প্রশস্ত রাজপথ বিপুল জন স্রোতের মধ্যের এক জনকেও তার আপন ব'লে মনে হ'লো না, সব যেন সাজান, সবাই যেন পর, যন্ত্র চালিতের মত ওরা যে যার কাজে যাচ্ছে আসছে। যেন তার অদৃষ্টকে বিদ্রূপ ক'রেই ঐ প্রকাণ্ড বড় বড় বাড়ী গুলো, রাজপথ জনস্রোত প্রাণভ'রে হাসা-হাসি ক'রছে !

বিনীতা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো ; ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে খোলা ছাদের ওপোরে এসে দাঁড়াইতেই মুক্ত আকাশের শেষ রক্তিমচ্ছটা এসে তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে প'ড়লো ; শুনলো ওপাশের বাড়ীতে কে গাচ্ছে—

"হেরে কমল মৃণালে কেউ কাঁটা, কেউ কমল,—
কেউ ফুল দলি' চলে কেউ মালা গাঁথে নিতি।"

মনের মধ্যে নরেশের মুখটা যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। ওর সমস্ত সৌন্দর্য্য, গুণ, অর্থ-সম্পদ যেন তাকে এক সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলে বিনীতা তার কাছে কতখানি ছোট ! কতখানি অযাচিত ভাবে সে তাকে একদিন কাছে পেয়ে স্তোক-বাক্যে ভুলিয়েছিল সে তাকে ভালবাসে, জীবনান্ত পর্য্যন্ত এ ভালোবাসার স্মৃতি ওর বুক থেকে মুছবেনা ! বিনীতার সর্ব্বশরীর যেন একবার নিজের ওপোরে গভীর ঘৃণায় শিউরে উঠলো। শুনলে সে গাচ্ছে—

"কেউ জানেনা অরি আলো তার চির দুখের রাতে,—
কেউ দ্বার খুলি জাগে চায় নব চাঁদের তিথি !"

ঠিক এমনি সময়েই দূরের একটি ঘরে ব'সে অন্যমনস্ক নরেশ চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মুখ তুলতেই দেখলে লতিকা কখন ধীরে ধীরে এসে দরোজার ওপোরে দাঁড়িয়েছে, দৃষ্টি তারই মুখের ওপোরে আবদ্ধ!

চ'মকে উঠে নরেশ প্রশ্ন ক'রলে

"তাকিয়ে আছ যে?"—

মুখটাকে একবার নত ক'রে লতিকা আবার তাকালে, একটা ঢোক গিলে উত্তর দিলে

"কিছু নয়।"

"কিছু নয়? তবে?..."

"এমনি,—তোমাকে দেখ ছিলাম!"

অদ্ভুত উত্তর!

নরেশ কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে; চা খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিল, কাপটাকে টেবিলের ওপোরে নামিয়ে রেখে নরেশ আবার ফিরে তাকালো। ডাকলে "শোন!"

লতিকা ধীরপদে নিকটে এসে দাঁড়াতেই তার অসংযত রুক্ষ চুলের দিকে চেয়ে প্রশ্ন ক'রলো

"চুল বাঁধোনি?"

লতিকা ব'সে প'ড়লো। একটু হেসে উত্তর দিলে—

"না। কিন্তু তোমার প্রশ্নটাকে আজ হঠাৎ নতুন ব'লে মনে হ'চ্ছে।" তার কণ্ঠস্বরে যে বিদ্রূপ ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো তা নরেশের অজানা রইল না, কিন্তু সে তাতে অপ্রস্তুত ও হ'লোনা; হয়তো হাসি দিয়ে সমস্ত অপ্রতিভতাকে ঢেকে ফেলে সে সহজ স্বরে উল্টো প্রশ্ন ক'রলো—

"হঠাৎ মনে হবার কারণ?"

কারণটা মুখে এলেও লতিকা সেটাকে মুখের বার ক'রতে পারলে না, একটু এদিক ওদিক ক'রে চঞ্চলস্বরে ব'লে উঠ্‌লো—

"কাজ আছে, যাই।"

নরেশ বারণ ক'রলে না, একবার মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতেই মনে হ'লো ও যেন ইচ্ছে ক'রেই মুখটা ফিরিয়ে নিচ্ছে! নরেশের দৃষ্টির সম্মুখে লতিকার ঐ মুখ ফেরাবার ভঙ্গিটুকু যেন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিয়ে দেখা দিল—ওর অভিমানে ছল ছল চোখ দুটোর গোপন ভাষা স্পষ্ট করে ওকে গভীর লজ্জায় ফেলার ইচ্ছেটা তাকে মুহূর্ত্তের জন্য সব ভুলিয়ে দিলে; হঠাৎ দুই হাতে লতিকার মুখখানা তুলে ধ'রেই সে হেসে উঠলো—

"আরেঃ—যাও কোথায়?"

লতিকার চোখের কোণে যে দুই ফোঁটা জল ছল ছল ক'রছিল, সেটা গড়িয়ে প'ড়তেই সে মুখ সরিয়ে নিলে—

"যাওঃ—

হঠাৎ দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। বিস্মিত, স্তম্ভিত নরেশ প্রথমে কান্নার কারণ কিছু বুঝতে পারলো না, তার পরে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে যখন লতিকার মাথার ওপোরে ধীরে ধীরে নিজের ডান হাত খানায় স্পর্শ ক'রলে তখন ওর কান্নার প্রথম বেগটা থেমে এসেছে।

নরেশ শান্তকণ্ঠে ডাকলে—

"লতিকা!"

লতিকা মুখ তুলবার চেষ্টা ক'রলেও পারিলে না, উত্তর দিল "কেন?"

একটু ইতঃস্তত ক'রে নরেশ প্রশ্ন ক'রলে—

"আমার ব্যবহারে দুঃখ পেয়েছ?"

যেন আরও অনেকগুলো বলবার মতো কথাই সে চেপে গেল এ খবর ব্যথাহত লতিকার কাছেও অজানা রইল না; নতমুখে সে উত্তর দিলে—

"না।"

নরেশ ওকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ওর রুক্ষ অসংযত চুলগুলোর ওপোরে হাত বুলোতে বুলোতে প্রশ্ন ক'রলে—

"তবে?"

"তবে কি?"

"কাঁদলে কেন?"

"এমনি।"

"কিন্তু এমনি তো কেউ কাঁদে না!"

লতিকা নির্ব্বাকে নরেশের বাহুর ওপোরে মাথা রেখে অনুভব ক'রতে লাগলো ওর স্পর্শটুকু!

কতক্ষণ যে এমনি নীরবে কেটেছিল সে হিসাব

কারও ছিল না, হঠাৎ দেখলে ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে সাত্‌টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই চমকে উঠ্‌লো। নরেশ পুনরায় প্রশ্ন ক'রলে "কই, ব'ললে না ?"

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গিয়ে লতিকা উত্তর দিলে—

"কিন্তু ব'লে লাভ ?"

নরেশের ও'ধরে ম্লান হাসি ভেসে উঠ্‌লো ; উত্তর দিলে "না হয় ক্ষতির ভারটা আমিই নেব এখন!"

লতিকা শুধু নিরুত্তরে নরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ; নরেশও ব'লবার মত যেন কোনও কথা খুঁজে পেলে না। শুধু ওর বড় বড়,—সরলতা ভরা চোখ দুটোর দিকে চেয়ে যেন আজ তার প্রথম স্মরণ হ'লো, সে বিনা অপরাধে,—শুধু নিজের শান্তির দিকে চেয়ে এই বালিকাটিরই সর্ব্বনাশ ক'রেছে। ইহ জগতে সে আর কখনো, কারো কাছে, কিছুর বিনিময়েই শান্তির অধিকারিণী হবে না; সুখী তো নয়ই। একা মাত্র তারই অবহেলায় ওর জীবনটা অসময়ে শুকিয়ে উঠবে, দয়ার-পাত্রী হিসাবে শ্বশুরালয়ে অথবা পিত্রালয়ে হোক্ যেখানে আশ্রয় পাবে সেখানে থেকেও সমস্ত-জীবন ভ'র ব'ইতে হবে শুধু অবহেলা,—ঘৃণা !

কারণ—সে স্বামীর যত্ন পায় নাই, এই দুর্ভাগ্যের জন্য।

অনুশোচনার তীব্র কশাঘাতে নরেশ চ'মকে উঠ্‌লো। মনে হ'লো কে যেন দুই হাতে তার হৃৎপিণ্ডটাকে নিংড়ে সমস্ত রক্ত বার ক'রে নিচ্ছে !

মুখটা ক্ষণিকের জন্য বিকৃত হ'য়ে উঠলো। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে সে ব'ললে—

"আমিও সব বুঝি লতিকা, আমিও মানুষ !"

একটু থেমে, একটা ঢোক গিলে পুনরায় ব'লতে সুরু ক'রলে "কন্তু তুমি যদি আমার মত অবস্থায় প'ড়তে, তাহ'লে বুঝতে যে, মানুষ ইচ্ছে ক'রেই তার সুখ শান্তি যা কিছু নিয়ে কেমন ছিনি মিনি খেলছে ! হাসি মুখে এদের যেমন দুঃখের আঘাতও বুকপেতে নিতে হয়, তেমনি সুখের আতিশয্যটাও সময়ে সময়ে অসহ্য-বোধে দূর ক'রে দিতে চায়।"

লতিকা নির্ব্বাক ; তার মুখের দিকে চেয়ে নরেশ ব'লে উঠলো "জানি, তোমার অধিকার, তোমার দাবী তুমি চুল চিরে বখরা ক'রে নিতে চাও, নিজের আধিপত্য ও বিস্তার ক'রতে চাও আমার ওপোরে, কারণ তুমি আমার স্ত্রী ; তোমার ওপোরে যেমন লোকাচার হিসাবে আমার দাবী আমার অধিকার বজায় থাকবে তেমনি আমার ওপোরেও তোমার কিছু কম থাকবেনা, এইটাই তুমি চাও, কিন্তু লতিকা, লৌকিক আচার অনুষ্ঠান ছাড়াও যে আরও একটা কিছু আছে সেটা মানো কি ?"

লতিকার দুই চোখ জলে ভ'রে উঠেছিল; অস্ফুটে ব'ললে "থাক্।"

মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে একটু অসহ্য ভাবে নরেশ ব'লে উঠলো, "না আজ আর "থাক্" নয়! যা এতদিন তোমার কাছে থেকে লুকিয়ে বেড়িয়েছি তা আজ তোমার সম্মুখে স্বীকার ক'রেই আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে চাই; এমন ক'রে দিনরাত লুকোচুরীর খেলা আমি আর খেলতে পারছিনে লতিকা, আমার সমস্ত চেতনা যেন দিন দিন অবসাদে জড়িয়ে আসছে ; আমি আজ সব বলতে চাই বাধা দিওনা—।"

মৃদুস্বরে লতিকা উত্তর দিলে—

"কিন্তু,-আমি সব জানি !"

"জানো ?"

একবার চমকে চেয়েই নরেশ পুনরায় চোখ বন্ধ ক'রলো, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য ; একটু চুপ ক'রে থেকে ব'লে উঠ্‌লো "তবু ব'লবো, তুমি না শুনতে চাইলেও আমি শোনাব যে আমি,—আমি বিনীতাকে ভালোবাসি

একটা বিরাট নিস্তব্ধতায় ঘরটা যেন পূর্ণ হ'য়ে উঠলো যেন এর পরে আর কারও কইবার মত কোনও কথাই রইলনা,—এক নিমেষে ফুরিয়ে গেল।

শতধা বুকখানাকে দুইহাতে চেপে ধ'রে লতিকা উঠে দাঁড়ালো—

"ওগো—"

অচেতনের মত নরেশ শুধু উত্তর দিলে—

"হুঁ !"

লতিকা আবার ব'সে প'ড়লো। নরেশের হাত দুখানাকে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে ব'লে উঠলো

"একটা কথা তবু জানতে ইচ্ছে হয়!"

"বল।"

"বিনীতাকে বিয়ে করনি কেন?"

নরেশের ওষ্ঠাধরে ম্লান হাসির রেখা ভেসে উঠলো; ক্লান্ত দৃষ্টিতে লতিকার মুখের দিকে চেয়ে উত্তর দিল "নানা কারণে।"

লতিকা নিজের অজ্ঞাতেই বোধহয় নরেশের হাত দুখানা শক্ত ক'রে ধরেছিল, ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ কাঙালের মত বলে উঠলো—

"আমার একটা অনুরোধ রাখবে?"

"কি?"

"তুমি বিনীতাকে বিয়ে কর।"

নরেশ অস্বাভাবিক রকম চমকে উঠলো।

হয়তো এতটা শুনবার আশা সে কর নাই,—তাই তার চোখ দুটোও যেন মুহূর্ত্তের জন্য জল্ জল্ ক'রে উঠলো। চকিতে লতিকার হাত দুখানাকে শক্ত ক'রে ধ'রে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে সে বলে উঠলো—

"কিন্তু তুমি সহ ক'রতে পারবে লতিকা?...পারবে? হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লতিকা উঠে দাঁড়ালো; দরজার দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে উত্তর দিলে "পারবো।"

নরেশ বলে উঠলো—

"কিন্তু এই পারানোর'ও তো একটা অধিকার চাই, আমি যদি না তোমার কথামত কাজ ক'রতে পারি?"

লতিকার তরফ থেকে কোনও উত্তর এলোনা, সে দরোজা পার হ'য়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো, একটু পরে দ্রুতপদে বারান্দা অতিক্রম ক'রতে ক'রতে শুনতে পেলে নরেশ ডাকছে—

"শুনে যাও লতিকা,—বেশী নয়, আর একটা কথা –,"

ইচ্ছে থাকলেও লতিকা ফিরতে পারলো না, বিশ্ব সংসার তখন তার দৃষ্টির সম্মুখে আলো আঁধারের মাঝখানে দোল খাচ্ছিল......।

চয়ন

শ্রীসুন্দর মোহন বসু

সকল কাজেই তাঁর উপর নির্ভর কর, তিনিই তোমার পথ দেখিয়ে দেবেন।

... ...

দুঃখের সময় পরকে খুসী করবার চেষ্টা করলে দুঃখ আপনিই পালিয়ে যায়।

... ...

আশা যদি পরিত্যাগ করতেই হয়—ত সব শেষে।

... ...

জিহ্বা, উদর ও লিঙ্গ বশীভূত যার তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজ করতে পারেন।

... ...

শরীর একটি মহাযন্ত্র, কোন ভাল কাজ করতে হলে আগে ভাল শরীর চাই।

দুঃখেতে অভিভূত হয়োনা; দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করো।

... ...

বাসনাই সকল অভাবের জন্মদাতা।

... ...

নীরবতা অনেক সময় সবচেয়ে সঠিক উত্তর।

... ...

মুখে যা বলি তার চেয়ে কাজে যা করি সেই আমাদের প্রকৃত পরিচয়।

... ...

আমরা নিজেরা যা' তাই আমরা বাহিরেও দেখে থাকি।—

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

শ্রীকালিদাস রায়

আপন বিরাট নীড় ?

মেঘাড়ম্বরের পর বৃষ্টিধারার মত যখন সৃষ্টিধারার সূত্রপাত হয় তখন কবি আনন্দলাভ করিতে থাকেন—কিন্তু এ আনন্দও অবিমিশ্র নহে। সৃষ্টির সঙ্গেও একটা উদ্বেগের বেদনা আছে—কবির কল্পনাকে উপাদান আহরণ করিতে এবং হাতে হাতে যোগাইয়া দিতে দারুণ শ্রম করিতে হয়, শব্দনির্ব্বাচনে ও ভাষার পরিপাট্য সাধনে কবি-চিত্তকে যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, উপাদান উপকরণের সন্ধানে, নির্ব্বাচনে, অর্জ্জনে, বর্জ্জনে কবির সৃজনী শক্তি স্বেদাক্ত, তবু সৃষ্টির আনন্দে সকল বেদনা মগ্নপ্রায়। সৃষ্টি যখন পরিপূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে, কবি যখন তাঁহার রচনাকে নিজে আবৃত্তি করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন তখনই তাঁহার সকল ব্যথিত প্রয়াস সার্থক হইয়া উঠে—কবি তখনই পা'ন পরিপূর্ণ আনন্দ অর্থাৎ কবি যখন উপভোক্তা হইয়া আপনার সৃষ্টিকে উপভোগ করেন, তখনই তিনি পান পরিপূর্ণ আনন্দ।

ইহা হইতে বুঝা যায়—কবির সৃষ্টি হইতে রসজ্ঞ পাঠক যে আনন্দ লাভ করেন তাহা কতকটা অবিমিশ্র, কবির ভাগ্যে সে আনন্দ লাভ ঘটিয়া উঠে না।

কবি তাই গাহিয়াছেন—

> শান্তি কোথা মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে ?
> অশান্তি যে আঘাত করে তাইত বীণা বাজে।
> নিত্য র'বে প্রাণপোড়ানো গানের আগুন জ্বালা,
> এইকি তোমার খুসী আমায় তাই পরালে মালা
> সুরের আগুন ঢালা ?

তাই কবি বলিয়াছেন—

> "অলৌকিক আনন্দের ভার
> বিধাতা যাহারে দেন, তার বক্ষে বেদনা অপার
> তার নিত্য জাগরণ, অগ্নিসম দেবতার দান
> ঊর্দ্ধশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।"

অবশ্য কবির বেদনার কথা

পা'ন—সৃষ্টির আনন্দ, উপভোক্তার প্রাপ্য পরিপূর্ণ আনন্দ, সৃষ্টির জন্য আত্মপ্রসাদ,—প্রকাশের পর চিত্তের লঘুতা ও নিশ্চিন্ততার স্বস্তি,—সৃষ্টির প্রতি মাতৃমমতাজনিত তৃপ্তিরস,—বিস্ময়জনিত পুলক,—পাঠকের চিত্তের সহিত আত্মচিত্তের মৈত্রী লাভের আনন্দ,—নিজের উপভোগ্যকে বিশ্বের উপভোগ্য করিয়া তোলার আনন্দ, আনন্দ পরিবেষণের আনন্দ, সর্ব্বশেষে রসজ্ঞ পাঠকের শ্রদ্ধা লাভের ও যশোলাভের আনন্দ। কাজেই কবি যে দারুণ ক্লেশ স্বীকার করেন—তাহার তুলনায় অনেক বেশি আনন্দই লাভ করেন।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আনন্দ বিনা শুল্কে পাওয়া যায় না। তবে রসজ্ঞ পাঠক কাব্যপাঠে যে আনন্দ লাভ করে, তাহার মূল্য সে কি দিল ? কাব্যের রসোপভোগ কতকটা কবির কাব্যকে মনে মনে পুনর্গঠন করা। —এই পুনর্গঠন-ব্যাপারে কিছু ক্লেশ আছে। আর পুনর্গঠন করিয়া লইবার অভ্যাস ও শক্তি আয়ত্ত করিতে পাঠককে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে। কবির তুলনায় অবশ্য এ ক্লেশ যৎসামান্য।

প্রকৃত পক্ষে, পাঠকের আনন্দের মূল্য কবি নিজেই দিয়া রাখিয়াছেন। কবি কেবল আনন্দ দানই করেন না, পাঠক যাহাতে অপেক্ষাকৃত অবিমিশ্র আনন্দ লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য পাঠকের হইয়া নিজে বেদনার মূল্য দিয়া রাখেন। এইজন্যই কবি আত্মত্যাগী মহাপুরুষ, এইজন্যই কবি আনন্দ পরিবেষণের জন্য কেবল কৃতজ্ঞতা মাত্র লাভ করেন না, রসিক হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিও লাভ করেন। সাধক ও জ্ঞানগুরুদের যাহা প্রাপ্য কবি তাহাও কতকটা লাভ করেন।

অনেকে বলেন যত আনন্দই পুরস্কার-স্বরূপ লভ্য হউক, কবি সাধ করিয়া এ বেদনা বরণ করেন না—এ বেদনা

স্বীকার তাঁহার বিধিলিপি,—এ বেদনা-স্বীকারকে তিনি এড়াইতে পারেন না। তিনি ত ভাব বা অনুভূতির উদ্বেলতাকে পুষিয়া রাখিতে পারেন না, তিনি তাহাকে প্রকাশ দান করিতে বাধ্য। যাহা তাঁহাকে বাধ্য করে কাহারও কাহারও মতে তাহা একটা দৈবী শক্তি। এই শক্তি বেদনার প্রবাহেই তাহার প্রকাশ চাহে। আবার কেহবা বলে, ইহা একটা ব্যাধি। বেদনা ঐ ব্যাধিরই বেদনা—আনন্দ ঐ ব্যাধিরই সাময়িক উপশম মাত্র।

বিধির প্রেরণাই হউক, আর ব্যাধির তাড়নাই হউক, কবি সাধ করিয়াই এ বেদনা বরণ করেন,—এই বেদনাতে তাঁহার মনুষ্যত্বের গৌরব। এই বেদনা তাঁহার তপস্যা, কেবল আনন্দ লাভ ও আনন্দদানের আগ্রহই এই বেদনা-স্বীকারের প্রেরণা নয়। এই বেদনার পথেই কাব্যস্রষ্টা বিশ্বস্রষ্টার সমীপবর্ত্তী হইতে চাহে। কবির মনের কথা নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিতে প্রকাশ করা যাইতে পারে—

কুট্মলে নিবদ্ধ ব্যথা গুল্মলতা-বনবিটপীর
ফলের জনম দেয় গন্ধরসে কুসুমে ফুটায়।
শিলাপঞ্জরের ব্যথা অন্তর্গূঢ়,সহিষ্ণু গিরির
কলকল গীতিময় প্রীতিময় নির্ঝরে ছুটায়।
বারিদের বজ্রব্যথা মুহুর্মুহুঃ তাড়িত-তাড়না,
বসুন্ধরা-সঞ্জীবন ধারাসারে ঢালে শান্তিজল।
জীবজরায়ুর ব্যথা শঙ্কাতুর প্রসব-বেদনা
আনন্দ নন্দনে অঙ্ক শিশিসম করে সমুজ্জল।
তোমার অসীম ব্যথা বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বশিল্পিরাজ,
জ্বলিছে অনন্ত জ্বালা বহ্নিকুণ্ড, তোমার অন্তরে,
অনাদি অনন্তকাল ব্যাপি' তাই তব সৃষ্টি-কাজ,
চলিতেছে নব নব অহরহঃ এই বিশ্ব 'পরে।
হে কারুণ্যবিগলিত দীনবন্ধু, নিত্য নব ব্যথা
বক্ষে তব হইতেছে নিত্য নব সৃষ্টিতে প্রকট,
অপূর্ণে করিতে পূর্ণ অভিব্যক্ত তব ব্যাকুলতা,
যুগে-যুগে মুছে-মুছে আঁকিতেছ বিশ্ব-দৃশ্যপট।
অতন্দ্রিত শিল্পিরাজ, ওগো স্রষ্টা, বিশ্বের নিদান,
দীক্ষা দাও শিষ্যে তব পুত্রে তব পিতৃ-ব্যবসায়।
তব বিশ্ব-শিল্পাগারে একপ্রান্তে দাও মোরে স্থান.
দীক্ষা দাও সৃষ্টিকাম বেদনার শোণিত-টীকায়।
দাও ব্যথা অফুরন্ত রুদ্র পিতা, নিত্য নব নব,
আনন্দ-স্বরূপ দিব আমি তায় শিল্প-মহিমায়,
ব্যথার পাষাণে গড়ি শ্রীমন্দির পুরোহিত হবো,
সৃজিতে সৃজিতে স্রষ্টা একদিন লভিব তোমায়।

আবিষ্কারের আনন্দ

Coleridge বলিয়াছেন,

Beauty is harmony and exists in composition. It results from preestablished harmony between Man and Nature.

তাই সৎসাহিত্য সৃষ্টি বা উৎকৃষ্ট শিল্পের অভিব্যক্তি মাত্রই এক একটি আবিষ্কার। আমরা শিল্পীকেই সাধারণতঃ স্রষ্টা বলিয়া থাকি, প্রকৃত পক্ষে তিনি আবিষ্কারক। এই বিশ্বে স্রষ্টা কেবল একজনই আছেন। তিনিই পূর্ব্ব হইতেই ভাবের সঙ্গে ভাবের, রসের সঙ্গে রসের, মানব জীবনের সঙ্গে নিসর্গের, জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অংশের এবং প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সৌষম্য সামঞ্জস্য (Harmony) ও রস-মৈত্রী ব্যবস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। মানুষমাত্রেই জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক ঐ শৃঙ্খলা সামঞ্জস্যকেই খুঁজিতেছে। যিনি খুঁজিয়া বাহির করেন, যাঁহার কণ্ঠ লেখনী তুলিকা বা ছেদনীর মুখে তাহা অভিব্যক্ত হয়—তিনিই শিল্পী, তিনিই আবিষ্কারক, তিনিই স্রষ্টা। এইরূপ ভাগ্যবান পুরুষের সংখ্যা জগতে খুব বেশী নয়, তাঁহারা ক্রান্তদর্শী ঋষির সম্মানও লাভ করেন।

এই আবিষ্কারের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সকল সন্ধিৎসুরই অপূর্ব্ব আনন্দ হয়। যাহাকে সন্ধান করা হইতেছে তাহার আবিষ্কারই বড় কথা—নিজের দ্বারা না হইলেও আনন্দ কম হয় না। যখন তাহা আবিষ্কৃত হইল—তখন সকল আবিষ্কারের মতই আর একজনের সম্পত্তি নয়—নিখিলেরই সম্পত্তি। উহার সম্ভোগে সকলেরই সমান অধিকার।

সকলপ্রকার সৎসাহিত্য বা উৎকৃষ্ট শিল্পের সম্ভোগের মধ্যে আবিষ্কারের একটা বিস্ময়মিশ্র আনন্দের যোগ আছে। আলঙ্কারিকগণ যে রসের স্বরূপ বুঝাইতে বিশেষ ভাবে চমৎকারী, চিত্তবিস্তারী, বিস্ময়াপরপর্য্যায়, অলৌকিক

ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—তাহা ঐ আবিষ্কারের আনন্দ সম্বন্ধে বিশেষভাবেই খাটে। সকল রসের সাহিত্য সম্ভোগের মধ্যে অদ্ভুত রসের একটা আবেষ্টনী থাকিয়া যায়। এই অদ্ভুত রসটি ঐ আবিষ্কারের বৈচিত্র্য ও অপূর্ব্বতাও হইতেই জন্মে।

যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-ভাণ্ডার চিরপরিচিত নিত্যদৃষ্ট জগতের ধূমিধুমের অন্তরালে—বিম্ব-প্রতিবিম্বের ফুলঝুরির লুক্কায়িত ছিল তাহা যদি বর্ণ-রেখা-শব্দাদির শৃঙ্খলার মধ্যে একদিন ফুটিয়া উঠে, তবে কি সহৃদয়-হৃদয়ের পক্ষে কম আনন্দের কথা। একদিন উহার সঙ্গে যেন আমাদের অন্তরের পরিচয় ছিল—উহাকে যেন আমরা জীবনের জটিলতার মধ্যে হারাইয়াছিলাম—আমাদের অন্তর যেন অজ্ঞাতসারে উহাকে খুঁজিতেছিল। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সমক্ষে কত বস্তুই রহিয়াছে,কতবস্তু আবার ক্ষণকালের জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচরের অন্তরালে যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে—কত ভাব চিন্তা অনুভূতির যাতায়াত চলিতেছে আমাদের মনে, তাহাদের জন্য মনে কোন উৎসব হয় না। কিন্তু যাহাকে আমরা খুঁজিতেছি বা যাহাকে আমরা হারাইয়াছি সেই ধনকে আমরা যখন ফিরিয়া পাই—তখন কেবল ফিরিয়া পাওয়া বা আবিষ্কারের আনন্দেই আমাদের মনে মহামহোৎসব হইতে থাকে। তাই সকল রসসম্ভোগে আমরা পাই গভীর নিবিড় বিস্ময়ের আনন্দ—আর আমরা উৎসব করি হারাধনের আবিষ্কারে। "যাহা ছিল চির পুরাতন তারে পাই যেন হারাধন।"

কবির সজ্ঞান প্রয়াস ও বাসনা

কবি চিত্তের যে রসা বেষ্টনীর মধ্যে রহিয়া কবিতা রচনা করেন, সেই রসাবেষ্টনীটিকে লইয়াই কবিতাটি সম্পূর্ণ। কবি আপন রচনাটি যখনই পাঠ করেন--তখনই তাঁহার চিত্তের চারিপাশে সেই মৌলিক রসাবেষ্টনীর আবির্ভাব হয়,সেজন্য নিজের রচনা কবির এত ভাল লাগে। কবিতাটি সুরচিত না হইলেও কবি তাহার মারফতে আপনার রসাবেষ্টনীকে ফিরিয়া পান এবং তাহার সাহায্যেই কবিতার সকল ত্রুটীর ক্ষতিপূরণ করিয়া লন। কবিতার অঙ্গহানিগুলি সঞ্চারিত রসাবেষ্টনীর মধ্যে ডুবিয়া যায়। কবিতাপাঠকালে স্বতই তাঁহার মনের কুহর হইতে অভ্যস্ত পথে মাধুরী-ধারা ঝরিতে থাকে।

কিন্তু পাঠকের মনে কবিতাটিকেই তাহার রসাবেষ্টনীর সৃষ্টি করিতে হইবে। পাঠকের মনেও যদি উহা ঐ ভাবের আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিতে পারে তবেই কবিতারচনা সফল হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কবিতার মধ্যে এমন ইঙ্গিত আভাস দিতে হইবে, এমন শব্দ প্রয়োগ ও অলঙ্কার বিন্যাস করিতে হইবে—এমন শৃঙ্খলা সৌষম্যের সৃষ্টি করিতে হইবে যেন তাহা পাঠ করিয়া পাঠকের মনে কবির নিজ রসাবেষ্টনীও সঞ্চারিত করিতে পারেন। অর্থাৎ কবির রসাবেশের ও রসপরিবেশের পরিপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশ না হইলে পাঠক চিত্তে রসলোক জাগিয়া উঠিবে না। কবির অপ্রবুদ্ধ প্রয়াসে অনায়াসে যে ইহা হইতে পারে না—তাহা নয়, তবে তাহা অনিশ্চিত। সেজন্য সজ্ঞান প্রয়াসের প্রয়োজন। লোকচরিত্রজ্ঞ ও পাঠকচিত্তজ্ঞ কবি নিশ্চয়ই জানেন পাঠক-চিত্তে কিসে রসসঞ্চার হয়। অপরের রচনার কোন কোন বিশিষ্ট সৌষ্ঠব ও কি প্রকারের কৌশল প্রয়োগ তাঁহার নিজের মনে রসসঞ্চার করে, কবির তাহা জানা আছে। অতএব নিজের রসাবেশের স্বতঃস্ফূর্ত্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া কবি কবিতাকে পাঠকচিত্তে রসসঞ্চারের পক্ষে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য সজ্ঞান প্রবুদ্ধ প্রয়াস করিয়া থাকেন।

তাহাতেই সমস্যার সমাধান হইয়া গেল না। পাঠক-চিত্তের 'বাসনার' সঙ্গেও কবিতার সম্বন্ধ আছে। যে আলম্বন, বিভাব, অনুভাব, ভাব বা রূপকে অবলম্বন করিয়া কবিতাটি রচিত, যে যে উপকরণে কবিতাটি গঠিত সেগুলি পাঠকচিত্তেও যদি না থাকে—তবে সজ্ঞান চেষ্টায় কবিতাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়াও লাভ নাই। অনুভূতির রাজ্যে এই সকলের অবস্থিতির নামই 'বাসনা।' কবিতায় রসের ইঙ্গিত দেওয়া চলে—বাসনা দেওয়া চলে না। কবির বাসনা কাব্যে রূপান্তরিত—তাহাই পাঠক-চিত্তে রসসৃষ্টির উপকরণ হইয়া উঠিতে পারে না। মহাকাব্য বা নাটকে কবি পাঠকচিত্তে ধীরে ধীরে বাসনার সৃষ্টি করিয়া ক্রমে রস-সঞ্চার করিতে পারেন। কিন্তু গীতিকাব্যে তাহা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ—যে পাঠকের মেঘদূত পড়া নাই বা মেঘদূত সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই—রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতা, প্রথম শ্রেণীর কবিতা হইলেও, সে পাঠকের চিত্তে রসসঞ্চার করিতে পারিবে না। বাংলার পল্লী-জীবন সম্বন্ধে যাহার কোন ধারণা নাই, সে 'বধূ' কবিতার রস সম্যক্ উপভোগ করিতে পারিবে না। এইরূপে বহু কবিতা সুরচিত হইলেও পাঠক চিত্তে তদনুযায়ী বাসনার অভাবে আদর পায় নাই। পাঠক সাধারণের চিত্তে যে বাসনার অভাব নাই—সেই বাসনাকে অবলম্বন করিয়া যাঁহারা কবিতা লিখেন তাঁহাদের কবিতার রস বোধ করিবার পাঠক যথেষ্টই জুটে। আর যাঁহারা সে খোঁজ রাখেন না—তাঁহাদিগকে অতি অল্পসংখ্যক পাঠক ও নিরবধি কালের দিকেই চাহিয়া থাকিতে হইবে।

রমণীর মন

নাটিকা—

—শ্রীমানিক ভট্টাচার্য্য

২য় অঙ্ক

২য় দৃশ্য।

(চম্পকগ্রাম। এক অট্টালিকার ভিতরের অংশ)

ধরণীধর ও আনন্দময়ী।

আ। দেখ, তোমাকে আমি তখনই বলেছিলাম অধর্ম্ম করে কাউকে বঞ্চিত করলে নিজেই বঞ্চিত হতে হয়।

ধ। কেন, কি বঞ্চিত করতে দেখ্‌লে! কেউ যদি ইচ্ছা করে চলে যায়, তার দায়ী কি আমি?

আ। শুধু পরের দোষ দেখ্‌লে চলে না—নিজের দোষও দেখ্‌তে হয়। কি আদরে তাকে রাখ্‌তে, আর শেষে কি অনাদারই না করেছ। ছেলেমানুষ সে তা সইতে পার্‌বে কেন?

ধ। তাকে কি খেতে পর্‌তে দেওয়া হচ্ছিল না যে তাকে এখান থেকে পালাতে হ'ল। যে অবস্থায় সে তার মায়ের কাছে ছিল তার তুলনায় তাকে তো রাজার হালে রাখা হয়েছিল।

আ। অবস্থার কথা তুলোনা—গরীব না হলে তার মা কি প্রাণ ধয়ে ছেলেকে আমার কাছে দিতে পার্‌ত? তবু তো সে দিদি মায়ের পেটের বোন্; তাতেও কি তার কম দুঃখ হয়েছিল? সে দুঃখেই না সে মন গুমরে গুমরে থেকে শীঘ্র মারা গেল। সে কথা মনে হলে এখনও দুঃখে আমার প্রাণ কেটে যায়।

ধ। তোমার প্রাণ আধপাকা কাঁকুড়ের মত একটু তাত্ লাগ্‌লে ফেটেই আছে তার কি কর্‌ব বল। তাকে তো জোর করে নেয়া হয়নি তার মা তো স্বেচ্ছায় দিয়েছিল।

আ। তোমাকে বলি শোন—নিজেকে নিজে ঠকিও না। প্রথমে ত তাকে মানুষ কর্‌ব বলেই আনা হয়েছিল। তার পর না তুমি জিদ ধরলে যে মন্ত্র পড়ে পোষ্যপুত্র হতে না দিলে তোমার ও সবে দরকার নেই তবে না তার মা অনেক ভেবে শেষে রাজী হল।

ধ। রাজী হয়ে আমার মাথা কিনেছিল আর কি?

আ। আগেকার কথা ভুলে যেওনা। তখনকার দিন একবার মনে করে দেখ। এই আমার এত ঐশ্বর্য্য কে ভোগ করবে এই ভেবে ভেবে তুমি পাগলের মত হয়েছিলে। মনে আছে? প্রথমে তার কি যত্ন কি আদর করেছিলে? দশটা বছর সে আমাদের কাছে থাকল; সে কি একেবারে ভুলে গেল? তার পর ভগবান্ খোকা ধনকে কোলে দিলেন—সেই থেকে তোমার মন ওর উপর একবারে বিষিয়ে উঠল।

ধ। ধর মনেই না হয় থাক্‌ল। কিন্তু সেত স্বেচ্ছায় চলে গেল। যাবার সময় তাকে আমিই তো নগদ ১০ হাজার টাকা দিয়েছি আর তুমি তাকে গোপনে যে কত দিয়েছ তার কি আমি হিসাব রাখ্‌তে পেরেছি।

আ। তবু তার প্রতি যে অবিচার করেছি তার সিকিও দূর হয়নি। সে সব কথা এখন থাক্। তোমার বেশী লোভে আমি খোকাধনকে হারিয়েছি। অরুণ বড় ভাই, খোকাধন ছোট ভাই হয়ে যদি আমার কোল জোড়া হয়ে থাক্‌ত কি ক্ষতি হত তোমার। সে কথা মনে হলে এখনও আমার প্রাণ ফেটে যায়। উঃ বাবারে! খোকা ধনরে! (ফোঁপাইয়া রোদন)

ধ। আচ্ছা! চুপ কর। যা হয়ে গিয়েছে তার উপর আর হাত নেই। এখন কি বল্‌তে চাও বল।

আ। অরুণকে আবার ডাকাও। সে তোমার বড় ছেলে হয়ে থাক। পেটে যে এসেছে সে যদি ছেলে হয় সে তোমার কনিষ্ঠ ছেলে হবে। যদি মেয়ে হয় বিয়ে হবে, উপযুক্ত যৌতুক দিয়ে পরের ঘরে যাবে—বিষয়

সম্পত্তি সব অরুণের এই সংকল্প তোমাকে করতেই হবে। নইলে যে আসছে সেও চলে যাবে। বল করবে—

ধ। (কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) করব।

আ। তবে আজই তার সন্ধানে লোক পাঠাও। সে রাগ করে গেছে, চারদিকে তার জন্য লোক পাঠাও। আমি মেয়ে মানুষ সব বুঝি, যে উপায়ে নিশ্চয়ই তাকে পাওয়া যায় সেই উপায় কর। ম্যানেজারকে ডাক, তিনি হয়ত ভাল উপায় দেখিয়ে দিতে পারেন। মাঝে একবার সে কলকাতা থেকে আমার কাছে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল। হয়ত এখনও সে কল্‌কাতায় আছে। তুমি ম্যানেজারকেই কল্‌কাতায় পাঠাও। তিনি উপযুক্ত ও বিশ্বাসী লোক। তাকে যদি শীগ্‌গির না ফিরিয়ে আন্‌তে পার, আমার খোকাধন যেখানে গিয়েছে আমিও সেইখানে যাব।

ধ। তুমি স্থির হও। আমি ম্যানেজারকে এখানেই ডাকছি। তোমার সম্মুখেই আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। (একজন ভৃত্যের প্রতি) ওরে ম্যানেজার বাবু আফিসে আছেন। এখনি একবার অন্দরে ডেকে দে।

আর কেন কাঁদছ এখনি ত সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বুঝি বা আমার পাপেই এই মনস্তাপ পেয়ে থাকবে।

(ম্যানেজার শিবশরণের প্রবেশ)

শিবশরণ—আমাকে ডেকেছেন ?

ধ। হ্যাঁ, বসুন। দেখুন, এঁর বিশ্বাস হয়েছে যে অরুণকে অনাদর করার ফলেই আমাদের খোকাধন অকালে চলে গেছে। হয়ত আমার দোষেই সবার মনস্তাপ পেতে হয়েছে। এখন অরুণকে খুঁজে বার করতে হবে। আর সে ভার আপনার উপর ন্যস্ত করি এই এঁর ইচ্ছা।

শিব—মা ঠিক কথাই বলেছেন। মায়ের ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ। আমাকে যখনই বল্‌বেন তখনই যেতে প্রস্তুত।

আ—বাবা, অরুণকে খুঁজে বার করার ভার সম্পূর্ণরূপে আপনার, কি উপায়ে অবলম্বন করলে তাকে নিশ্চিত পাওয়া যাবে আপনি সেই উপায় অবলম্বন করুণ। যত লোক লাগে সঙ্গে নিন্। যত অর্থ লাগে তাও সঙ্গে রাখুন। তার উপর শুধু অনাদর নয়, অন্যায় অধর্ম্ম করে এক ঘোর অনর্থ হয়েছে। আর কোন অনর্থ হবার আগে তাকে আপনি নিয়ে আসুন বাবা।

শিব—আমাকে বেশী বল্‌তে হবে না মা—আমার যথাসাধ্য করব। এখুনি দৈনিক ইংরাজি বাংলা খবরের কাগজে ভাল করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি; আর আজই আমি কল্‌কাতা যাচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবই। আমি ব্রাহ্মণ 'আশীর্ব্বাদ করছি মা—আপনার ধর্ম্মবলে আমার সবদিক বজায় হবে।

(শিবশরণের প্রস্থান)

আ—(চক্ষু মুদিয়া) মা মঙ্গলময়ী মঙ্গল কোরো মা মনস্কামনা সিদ্ধ কোরো মা।

৩য় দৃশ্য

সান্ধ্যসম্মিলন: সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ উজ্জ্বলালোকে উদ্ভাসিত। অনেক গুলি তরুণ তরুণী ও যুবক যুবতীর একত্র সম্মিলন। মৃণালিনী তত্ত্ববিধানে ব্যস্ত।

গান

আকাশ হইতে জ্যোছনা নেমেছে
হাসিয়া ধরার পরে;
তাই হের আজি প্রেমের বারতা
রটিতেছে ঘরে ঘরে।
হাতে লয়ে কেহ গাঁথা মালা খানি
কাহারও কণ্ঠে বিদায়ের বাণী,
কেহ বলে তাকে, ভাল মতে জানি
গাঁথা আছে চিরতরে,
পরাণ গুমরি মরে!

১মা—কই এখনও তো তিনি এলেন না!

২য়া—কি আমুদে লোক ভাই! আর এমন কথার শ্রী!

৩য়া—যা করেন যা বলেন তাতেই এমন একটা সৌন্দর্য্য ফুটে উঠে।

৪র্থী—আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি!

৫মী—আচ্ছা তাঁর নাম কি জান কেউ?

৩য়া—ঐটিই শক্ত। শুনেছি তার চাকর বাকর এমন কি বন্ধু বান্ধবেরা পর্য্যন্ত জানে না।

২য়া—কিন্তু আমাদের ড্রাইভার বল্‌ছিল—

১মা—আমাদের খানসামা বলে—

২য়া—তুমি বুঝি চাকরদের সব এই কাজে লাগিয়েছ ?

১মা—ও কথা কেন বলব ভাই। লোকের পাঁচ কথায় থাকবার আমার দরকার নেই। আমি ও ভালও বাসিনে।

২য়া—আমিও ভালবাসিনে ও রকম। পরের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো আমারো পোষায় না ভাই।

মৃ—(স্বগতঃ) মরে যাই! কি সব নিজের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। এখনি যদি এসে পড়েন তো সবাই মিলে একথা তুলে নাচ্‌তে থাক্‌বেন।

১মা—হ্যাঁ ভাই মৃণাল! আজ মুখখানি ভার ভার দেখাচ্ছে কেন ?

মৃ—কই কিছুই ত নয় ভাই।

২য়া—তবু বল্‌লিনি ভাই—কি যেন ভাবছ।

মৃ—এর আর তবু নেই। মাথাই নেই তা ভাব্‌ব কি।

১মা—বুকের ওপর ওটা আবার কি ভাই! বিশ্রী দেখাচ্ছে।

মৃ—ও কিছু নয়। একটা প্রজাপতি দেওয়া সেফ্‌টিপিন বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছে, লাগিয়ে রেখেছি।

২য়া—বেছে বেছে ঐ জায়গাটাতেই নতুন জামার বোতাম ছিঁড়ে গেল! কিন্তু দেখ্‌তে তো ওটা প্রজাপতির মতন দেখাচ্ছে না ঠিক যেন একটা বিকট এইচ্‌ বলে মনে হচ্ছে। এইচ্‌ মানে কি ? (সকলের হাস্য)

মৃ—(স্বগতঃ) (কি হিংসে বাবা)। প্রকাশ্যে এটা প্রজাপতি বল্‌ছি, তোমরা বল্‌ছ এইচ্‌—তার কি করব ?

১মা—প্রজাপতি গায়ে কেন বসে ভাই ?

মৃ—তাকে আদর করে ডাক্‌লেই বসে। তুমি ও ডেক উড়ে এসে তোমার গায়েও বস্‌তে পারে।

১মা—আমরা ডেকে বসাতে চাইনে। কেউ যদি সেধে এসে বসে তবেই তার জায়গা হবে।

(হ-বাবুর আগমন)

১মা—আসুন, আজ আপনার সব চেয়ে দেরি !

২য়া—আমরা কখন থেকে আপনার প্রতীক্ষা করছি !

৩য়া—আপনি আসাতে তবে সম্মিলনের প্রাণ ফিরে এল।

হ-বাবু—আপনাদের অধমের প্রতি অসীম অনুগ্রহ।

৪র্থা—আপনার কথামত রক্তগোলাপের এক একটি গাছ মাঝে মাঝে দিয়েছিলেম। গোলাপগুলি মল্লিকাকুঞ্জের মাঝে ঠিক যেন মরতের মত দেখাচ্ছে।

৫মা—রবিবাবুর সেই 'বসুন্ধরা' ছবিখানি শেষ হয়ে গেছে। একবার আপনাকে গিয়ে দেখ্‌তে হবে।

হ-বাবু—আপনারা আমার প্রতি—

৬ষ্ঠা—সেই নূতন স্বরলিপির বইখানি এসেছে কিন্তু তার শেষের দিকটা আমি আরও করতে পারছিনে। আপনি যদি একবার—

হ-বাবু—আমি সর্ব্বদা—(মৃণালিণীর সেই স্থানে আগমন ও সব কথা ভুলিয়া গিয়া) মৃণাল !

কয়েকটী যুবতী—দেখ ভাই মৃণালিনী! তুমি সব সময়েই ওঁকে একচেটে করে নিতে পাবে না।

অপর কয়েকটী—আমাদের সঙ্গেও ওঁর কথা থাকতে পারে।

অপর—নাঃ এ ভারি অন্যায় কিন্তু।

(যুবতীরা সকলে হ-বাবুকে ঘিরিয়া দাড়াইল, কয়েকটী যুবক অদূরে বসিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল)

১ম—এবার আমাদের দফা শেষ আর কোন সুন্দরীর সঙ্গে চোখাচোখি হবার ও উপায় রহিল না।

২য়—কোন অসুন্দরীকেও পাওয়া যাবে না। সবাই ঐ লোকটার পানেই ছুট্‌বে। আমি ওকে স্পষ্টই আজ বল্‌ব—এ চল্‌বে না।

১ম—মশায় ! আমরাও এখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছি। এই তরুণীদের মধ্যে ছোট তরুণীর সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা আছে।

২য়—দেখুন আমরা মোহমুদ্গর পড়্‌তে কিংবা Love scene দেখ্‌তে আসিনি। আমাদেরও...

হ-বাবু—না, না, আপনারা মোহমুদ্গর পড়্‌বেন

কোন দুঃখে, আপনারা পড়ুন এবং Love scene দেখবার পরিবর্ত্তে Love scene কর্‌তে থাকুন।

২য়—(এক তরুণীর প্রতি) আপনি সেদিন যে বইখানির কথা বলছিলেন—(কোন তরুণী বা মহিলা ফিরিয়াও চাহিল না)

হ-বাবু—(যুবক কয়জনের প্রতি) দেখুন আমার আপনাদের বিরুদ্ধে কোন দুরভিসন্ধি নেই। এই তরুণীরা যদি আমাকে কিছু বল্‌তে চান তা শোনা ত আমার অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করি। আমার জীবনই এঁদের সেবার জন্য ও যাতে এঁরা—আনন্দ বা তৃপ্তি—হ্যাঁ কি বল্‌ছিলেন আপনি?

১ম—(অর্দ্ধাস্ফুস্বরে) ওঃ! যেন কতই ভুলো মন!

হ-বাবু—ভুলো মনের কথা কে বলছিলেন? (একটি তরুণীর প্রতি) আপনি বুঝি? (২য়ার প্রতি) আপনাকে আজ প্রথম দেখছি! কি বল্‌ছিলেন—ভাল? —হ্যাঁ ভুলো মনের কথা। ভুলো মনের জন্য কত জায়গায় কি অপদস্থই হয়েছি। সে সব মনে হলে এখন হাসি পায়। তবু ত শোধরাতে পার্‌লাম না।

২য় ভদ্র—উঃ কি চালবাজ!

১মা তরুণী—গভীর বিদ্যা যাঁদের তাঁদের ওরকম একটু আধটু অমনোযোগিতা দেখা যায়।

২য়া—প্রতিভার ও একটা লক্ষণ।

৩য়া—অসাধারণ গুণের সঙ্গে তুচ্ছ বিষয়ের জ্ঞানের সমন্বয় হয় না, প্রকৃতির এই নিয়ম।

হ-বাবু—কি বলেন আপনারা—কোথায় প্রতিভা? ভুল একটা দুর্ব্বলতা।

২য় পুরুষ—কি ধূর্ত্ত! যেন কত বিনয়ী!

হ-বাবু—সেবার একটা ভুলের কথা বলি শুনুন। সার্ব্বজনীন সমিতির বিশেষ সভায় যোগদান করেছি। সার্ব্বজনীন সমিতির ব্যাপারটা বোধহয় জানেন। এই সভায় সব সম্প্রদায়ের ২টি করে লোক থাকেন। যেমন সর্ব্বজাতির একজন করে সভ্য যথা ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ইত্যাদি, বয়স হিসাবে যেমন প্রতি দশ বছরের একজন করে সভ্য, গুণ হিসাবে যেমন, একজন কবি, একজন নাট্যকার একজন ব্যারিষ্টার, একজন ডাক্তার, একজন ব্যবসাদার, একজন কেরাণী একজন মুটে, একজন গণৎকার, একজন কবিরাজ, ১জন ঔপন্যাসিক ইত্যাদি তারপর অর্থ হিসাবে একজন কোটিপতি, একজন লক্ষপতি একজন বাদসা, একজন রাজা একজন ভিক্ষুক ইত্যাদি। প্রকাণ্ড হল পৃথক পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, কোন খানে গানের বৈঠক, কোন খানে অর্থের, কোন খানে জাতির। যেমন পুরুষদের এই রকম, তেমন নারীদেরও ঐ রকম ব্যবস্থা। কাজেই ভেবে দেখুন সে কি বিরাট ব্যপার! কোথায় কংগ্রেস লাগে আপনার। তারপর প্রত্যেক বৈঠক থেকে এক একজন representative নিয়ে একটী representative বৈঠক বসেছে। ধরুন তাতে থাক্‌লেন একজন পুরুষ কবি ও একজন উপন্যাস লেখিকা, একজন রাজা, একজন বেগম, একজন ব্রাহ্মণ, একজন বৈদ্যজায়া, একজন আশী বছরের বৃদ্ধ, একজন সতরো বছরের তরুণী ইত্যাদি। সকল বৈঠকেই লঘুভোজন, ও চটুল পরিহাস ইত্যাদি হচ্ছে। আহার্য্য পরিমাণে সামান্য, প্রকার বহু; মাঝে মাঝে খাদ্যের আদান প্রদান চল্‌ছে, এ ওকে তুলে দিচ্ছে ও একে তুলে দিচ্ছে। আর একটী সুন্দর প্রথা—মাঝে কয়েকটি শুভ্র পাত্রে শুভ্র ফুল যথা বেলা, চামেলি, মল্লিকা, শ্বেত করবী, গন্ধরাজ ইত্যাদি। সেই ফুল এক মুঠা নিয়ে পরস্পর পরস্পরের মাথায় দিয়ে তবে খাবার দিচ্ছে। আমার পাশেই সর্ব্বে বাগানের রাজা বসে। বয়সে প্রৌঢ় কিন্তু যৌবনের গর্ব্বটুকু ছাড়েন নাই। আমার কপালে দৈব বিপাক। রসগোল্লার চাট্‌নি হয়েছিল, তার আবার চারদিকে চার রকম স্বাদ। ঝোল-টুকুও দুরকম—অম্ল ও অম্লমধুর, দুভাগে ভাগ করা, নাম গঙ্গা যমুনা। আমরা পরস্পর এই চাট্‌নি খাইয়ে দিচ্ছি আর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করছি; করেই যাচ্ছি হঠাৎ এক তীব্র—চিৎকার সঙ্গে সঙ্গে সবাই হ্যাঁ—হ্যাঁ করে উঠল। আমার বাঁ দিকে বসে বেগম—বয়স আন্দাজ উনিশ হবে। তাঁর সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ; তিনি তাঁর মুক্তা চুন বসানো নাগরা জুতো পরা আলতা মাখা পা দিয়ে আমার পায়ের উপর এক মৃদু মধুর চাপ দিতেই আমার জ্ঞান হল। চেয়ে দেখি করছি কি এ! রাজা বেচারির [illegible]

টনির বদলে দিয়াছি একরাশ চামেলি ফুল আর গায়ে মাথায় ফুলের বদলে দিয়েছি চাট্নির গোটাকয়েক রসগোল্লা আর প্রচুর চাট্নির ঝোল। তাকিয়ে দেখি একটা রসগোল্লা আটকে গেছে তার বাবরি চুলে অপরটি তার লম্বা কাণে, আর গোফ, মাথার চুল, জামার হাতা, বুক, কোঁচা কাপড় সব চাট্নির রসে ভিজে। সে যে কি অবস্থা!

১মা—ও—হোঃ হোঃ—সত্যিই কি অবস্থা তখন আপনার। হাসিও পায় দুঃখ ও হয়।

২য়া—উঃ, কেমন মন আপনার, এত বড় একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা কি সহ্য হয়। কিন্তু রাজার অবস্থাটা ভাবলে হাঃ হাঃ (মুখে রুমাল চাপা দিলেন)

৩য়া—অথবা এর জন্য আপনার একটুও দোষ নেই। কিন্তু আর কারো কি চোখ ছিলনা। কিন্তু ঝোলে ভেজা দাড়ি, হিঃ হিঃ।

৪র্থা—বেগম মাগী পা মাড়িয়ে দিয়ে রাজা করেছিলেন আর কি! কিন্তু মুখপুড়ীর মুখে কি হইছিল!

১মা—তার পর কি হল!

১-বাবু—সমিতির সম্পাদক হাঁ হাঁ করে এসে পড়ল। রাজাকে একপ্রকার টেনে নিয়ে গিয়ে পোষাক বদলে দিতে লাগল। বেগম এতক্ষণ হাসি সাম্লেছিলেন। কিন্তু কি করে যে ছিলেন তা তিনিই জানেন। রাজা চলে যেতেই Oh my God, শোভানাল্লা oh my love বলেন আর হেসে কুটি কুটি হয়ে আমার গায়ে লুটিয়ে পড়েন। শেষে হাস্তে হাস্তে বল্লেন ভাই হাঁথি—ও ভাই হাঁথি।

সকলে—এ্যাঁ, এ্যাঁ! হাঁথি কে?

হ-বাবু—বেগম সাহেবের লক্ষ্ণৌএ বাড়ী কিনা তাই হাথিকে হাঁথি বলেন আমার নাম কেনারাম হাতী কিনা।

সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

হ-বাবু—(স্বগতঃ)—হায় হায়। কি সর্ব্বনাশ হ'ল। নিজের সর্ব্বনাশ নিজে কর্লাম। হাঁ—কি বল্ছিলাম ভাল?

১মা—আর মনে থাক্‌তে হবেনা। ছিঃ ছিঃ নাম হাতী!

২য়া—মুখে আন্‌তে লজ্জা করে! হাতী

৩য়া—হাতী আবার মানুষের নাম হয়। একে ফেলা তায় হাতী। সোণায় সোহাগা।

৪র্থা—হাতী—কি বিভৎস নাম রে।

৫মা—কি ঘৃণিত নাম।

ষষ্ঠা—সরে আয় ভাই—এখনি গোদা পা তুলে কারুর ঘাড়ে চাপাবে।

১মা—হাতী—ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

২য়া—মৃণালিনী দেবী মূর্চ্ছা গেছেন। এঁকে কেউ দেখ নাগো।

১মা—ওহে হাতি—একটু হাওয়া ছাড়—নয়ত কুলোর মত কাণ দিয়ে বাতাস কর।

২য়া—নয়ত শুণ্ড দিয়ে একটু চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দাও

৩য়া—আকার সদৃশ প্রাজ্ঞঃ—নামটি কিন্তু বাপ মায়ে ঠিকই রেখেছেন।

হ-বাবু—(একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া) দেখুন আপনিই না একটু আগে আমার বুদ্ধির প্রশংসা করছিলেন! দেখুন। (একবার প্রত্যেকের কাছে যাইতে উদ্যত হইলেন)

১মা—অশেষ বাধিত হলাম। আর দেখুন দরকার নেই এখন আসুন।

২য়া—আপনার অনুগ্রহ মনে থাকবে; কিন্তু আপাততঃ বাজে খরচা হচ্ছে

৩য়া—ধন্যবাদ! যেমন আছি তেমনই ভাল।

৪র্থা—পরিচিত বন্ধু আপনি—এর বেশী প্রত্যাশা করবেন না।

৫মা—যথেষ্ট—হয়েছে বেশী আলাপে কাজ নেই।

ষষ্ঠা—কে এখন আপনার কাছে হাতীর গলার ঘণ্টা হতে যাবে!

এক প্রৌঢ়াকুমারী—বেশী মাখা মাখি করতে আসবেন না। আমাদের হাতী ঘোড়ার দরকার নাই।

হ-বাবু—(হাত দিয়া মুখ চড়াইতে চড়াইতে) ওঃ আমি পাগল হয়ে যাব। এমন অপমান! যার দিকে যাই কেউ ফিরেও তাকায় না সেই বুড়ীর মুখেও এই কথা! ওঃ

(সকলে-হবাবুর দিকে অনুকম্পার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একে একে চলিয়া গেল।)

৪র্থদৃশ্য

রাজপথ

(গিরীন্দ্র ও তাহার বন্ধু অপর একজন ভদ্রলোক)

গি—সত্য বল্‌ছ ?

ব—কেন, তুমি কি মনে কর আমি আর মিথ্যা বল্‌বার জায়গা পেলাম না।

গি—তাহলে বড়ই দুঃখের বিষয়। এ হাসির কথা হ'ত যদি না বন্ধু হাতীর ভাগ্য এর উপর নির্ভর না করত। কবিরা বলেন বটে—নামে কি করে! কিন্তু নামেই অনেক করে। তুমি বিয়ে করবে, ভাবী প্রিয়ার রূপ, বয়স, বর্ণ দেখে তোমার বেশ পছন্দ হ'ল। নাম জিজ্ঞাসা করতে জান্‌লে—পুতনা। অনেকখানি কাব্য মাটি হয়ে যায় বৈকি। এ-দিকে কথা-বার্ত্তা, চেহারা, স্বভাব, অর্থ, বিদ্যা কোনটাতেই কম নয়। কিন্তু নামেই খেয়ে রেখেছে। আচ্ছা সত্যি নাম বলতেই কি সবাই ভয় পেল।

ব—ওঃ সে যে কি ভয়—তা কি বলবো! সামনে ভূত দেখ্‌লেও আজকাল মানুষে বোধ হয় এর অর্দ্ধেক ভয় পায় না। কলেরা বা প্লেগ দেখে মানুষে এত শীঘ্র পালায় না।

গি—নারীর ভাল চোখে দেখার এ একটা প্রান্ত নমুনা বটে। কোন মুহূর্ত্তে যে ভাল চোখ কাল চোখ হয়ে যাবে তা কেউ বল্‌তে পারেনা। আচ্ছা, এখন কোথায় গেলে তাকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে? বন্ধুর মনে একটা বিষম আঘাত লেগেছে। একটু সান্ত্বনার দরকার।

ব—হয় সম্ভ্রান্ত আশ্রমে—না হয় মৃণালিনীর বাড়ী। দুজায়গার এক জায়গায়—পাবেই। (প্রস্থান)

৩য় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

(গান)

সব আশা অবসান
অর্দ্ধপথে থেমে গেল গান।
তাহার উজল আঁখি
প্রেমের কাজল মাখি
আর উদিবে না নীল তারকা সমান।
পুষ্প ঝরে গন্ধ বয়
বায়ু এলে কেঁদে কয়—
নিস্ব আমি, রিক্ত, আমি—
আমি হতমান।
সব আশা আজি অবসান।

(আশ্রমের একটি কক্ষ)

হ-বাবু—আজ আমার সকল আশার সমাধি। আমার বিদ্যা, বিত্ত, রূপ আমার দীপ্ত যৌবন সমস্ত সত্ত্বেও একটা তুচ্ছ নামের জন্য আমার এই দুর্দ্দশা। এ হতাশা আরো তো বার বার হয়েছে। মৃণালিনীকে দেখে সে সব ভুলেছিলাম। এবারকার হতাশা চির তুষারের মত আমার সমস্ত আশার মুকুলকে নষ্ট করে দিয়েছে। মৃণালিনী ছাড়া এ জীবনে কাউকে জীবনসঙ্গিনী করা আমার সম্ভব হবেনা। আমার পুজনীয় পুর্ব্বপুরুষগণ, তোমরা নমস্য—তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা শাস্ত্রে বলে পাপ। কিন্তু এ- উপাধি ছাড়া আর কি কোন উপাধি তোমাদের মনোনীত হয়নি। সিংহকে মানুষ সহ্য করে নিয়েছে—কারণ সেতো শ্বাপদ রাজ। কিন্তু হাতী কুৎসিৎ বিশাল দেহ, তার সেই বিরাট শুণ্ড, সুদীর্ঘ দন্ত তাই হবে মানুষের নাম। তার চেয়ে বটব্যাল বা চাকি বল্লেও তত ক্ষতি ছিলনা। হায় অভাগার পুর্ব্বপুরুষ কোন রাজা মহারাজা বোধ হয় তোমাদের কারও শরীরের শক্তি, ওজন বা আহারের প্রাচুর্য্য দেখে তোমাদের এই উপাধি দিয়েছিলে—আর অদূরদর্শী তোমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাই মেনে নিয়েছিলে, কণ্টকের মুকুট ফুলের মুকুট মনে করে তোমরা মাথায় তুলে নিয়েছিলে; তার ফুলগুলি তার গন্ধ—যদিও তা কোন কালে থেকে থাকে কোথায় কবে মিলিয়ে গিয়েছে। আমাদের মাথায় যখন সে মুকুট অভিসম্পাতের মত পৌছাল তখন সে শুধু তীক্ষ্ণ বিষমুখ কাঁটায় ভরা ফুল তার শুকিয়ে ঝরে কোথায় পড়ে গিয়েছে।

(উত্তেজিত ভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিল—একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিয়া)—ভাগ্যে পরের বাড়ীতে মানুষ হলাম। লেখা-পড়াও কিছু শিখলাম। তার পর যখন ভবিষ্যতে বিপুল সম্পত্তির মালিক হব [illegible]

করছি, তখন ওখান থেকে বিতাড়িত হলাম। মাসীমা গোপনে টাকা দিলেন; তাই নিয়ে ব্যবসা সুরু করতে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। আজ আমার অর্থের অভাব নেই। কিন্তু সুখ কোথায়? মায়ের স্নেহ প্রায়ই মনে নেই মাসীর স্নেহ পেয়েছিলেম; কিন্তু ঘটনা চক্রে তাতেও বঞ্চিত হলাম। বড় আশা ছিল বিবাহ করে সন্তান সন্ততি হবে, তাদের ভাল নাম দেব, ভাল উপাধি দেব। তারা সব দেব শিশুর মত হাসিমুখে শুভ্র সুন্দর বসনে সামনে খেলা করবে। লোকে বল্‌বে খাসা ছেলেমেয়ে গুলি আপনার? আনন্দে গর্ব্বে আমার বুক ভরে উঠ্‌বে। আমি বিনয়ের সহিত বল্‌ব আজ্ঞে হ্যাঁ; আরও দুটী আছে তারা বড়, কদিন হল মামার বাড়ী গেছে। সে কি সুখ, কি গর্ব্ব, কি আনন্দ! আজ যে সব কথা স্বপ্ন—মরীচিকা।

অধ্যক্ষের প্রবেশ।

হ-বাবু—অধ্যক্ষ! আমি আজই চলে যাব। আমার সমস্ত জিনিস গুছিয়ে রাখ্‌বে।

অ—যে আজ্ঞে, কিন্তু আপনি আবার ফিরবেন আশা করি। আপনি থাক্‌লে নির্ভয়ে থাকি। মনে হয় যেন হাতীর আড়ালেই আছি।

হ-বাবু—(স্বগতঃ) পাজী সব শুনেছে—অথচ নেকামী করছে।

অ—আপনাকে যেন একটু কাতর দেখাচ্ছে মনে হচ্ছে যেন কোন দুঃখ পেয়েছেন—কেউ হয়ত অপমান করেছে। তাতে মুষড়াবেন না। মনে রাখবেন—হাতী হাবড়ে পড়্‌লে বেঙেও লাথি মেরে যায়।

হ বাবু—হাবড়ে পড়ার সঙ্গে আমার কি?

অ—কিছুই নয়—ও একটা কথার কথা। ছেলেবেলা থেকে আমার উপমা দিয়ে গুছিয়ে বল্‌বার ক্ষমতা ছিল। পণ্ডিত মশায় বল্‌তেন আমার মাথার খাঁজে খাঁজে মুক্তা বোঝাই।

হ-বাবু—মুক্তা!

অ—আজ্ঞে মুক্তা—যা ভাল ভাল হাতীর মাথায় থাকে। বাবা প্রথমটা আমায় চিনতে পারেন নি—তাই বল্‌তেন হস্তীমূর্খ।

হ-বাবু—(স্বগতঃ) উঃ অসহ্য! এর টিটকারিতো আর সহ্য হয় না। অথচ বল্‌ছে এভাবে—যেন কিছুই জানেনা। এযে মেঘের আড়াল থেকে বাণ নিক্ষেপ। আচ্ছা (প্রকাশ্যে) আচ্ছা অধ্যক্ষ! তোমার বাবার মতামত এখন থাক। আমি একটু ব্যস্ত আছি।

অ—নিশ্চয়ই, আপনিতো ব্যস্ত থাকবেনই কথায় বলে—মোষের শুঁড় বাঁকা যুঝবার সময় একা।

হ-বাবু—মোষের শুঁড়! তার মানে?

অ—শুড় মানে শিং বা মোষ মানে হাতী, আমি এমন বলে থাকি, কথাটা যাই হোক ভাবটা বোঝা গেলেই হল। ভাবটা বুঝতে পাচ্ছেন না?

হ-বাবু—খুব পাচ্ছি। শুঁর মানে সিং মোষ মানে আর কিছু। এ সব নব বোধদয়ের পাঠ—তোমার নব বংশধরদের জন্য রেখে দাও কাজে লাগবে। আপাততঃ দয়া করে আমার জিনিসপত্র গুলি একটু শীঘ্র করে বেঁধে দেবার ব্যবস্থা করে দিলে অতি বাধিত হব।

অ—আজ্ঞে নিশ্চয়ই দেব।—সে কি কথা। কথায় বলে মরদকী বাত্ হাতিকা দাঁত। কথার নড়চড় হবার যো আছে।

(মৃদু হাসিয়া প্রস্থান)

হ-বাবু—ওঃ এর চেয়ে যদি আমি নামহীন থাক্‌তাম তাহলেও ভাল ছিল। না জন্মিলে আরও ভাল হত।

২য় দৃশ্য

মৃণালিনীর গৃহ।

(মৃণালিনী ও তাহার সখী সুহাসিনী)

সু—কি করব ভাই! এত চেষ্টা করেও ঠিক সময়ে আস্‌তে পার্‌লাম না। তোর সয়ার ও কোন দোষ নাই। তিনি ক্রমাগত বলেছেন—এই দেখো নিশ্চয়ই দুই বন্ধুর সয়ার দোষে দেরী হয়েছে। নইলে সই কি তেমন। আর সত্যি ভাই, তুই বল্‌লিও তাই। কিন্তু আসা না আসা যে দুই সমান হল ভাই।

মৃ—কি করব আমার অদৃষ্ট!

সু—অদৃষ্টের দোষ দিস্‌নে। নিজের বুদ্ধির দোষ দে। এ-যে তোর পাগলের মত কাজ করা হয়েছে।

মৃ—পাগলের কাজ কিসে দেখ্‌লে?

সু—তা নয়? বরাবর চিঠিতে লিখছিস্, সে বড় ভাল—বড় মিষ্টি—আমায় বড় ভালবাসে আমিও বাসি। আমার কুমারী থাকার প্রতিজ্ঞা আর রহিল না। আমার কুমারীত্ব বিসর্জ্জন দিতে হইল। এবার যেমন এলাম অমনি কাঁদুনি গাইতে সুরু করে দিলি—বড় দাগা দিয়েছে সে—তার নাম এত বিশ্রী যে লোক সমাজে বলা যায়না। আমি চিরকাল কুমারীই থাকব।

মৃ—আমি কি মিথ্যা বলছি তুই-ই বল।

সু—মিথ্যা নয় হাজার বার মিথ্যা। পদবী হাতী তাতে হয়েছে কি? তার চেহারাটা কি হাতীর মত! কাণ দুটো কি কুলোর মত? বল্ হ্যাঁ?

(মৃণালিনী নিরুত্তর রহিল।)

সু—কেন চুপ করে রইলি কেন? বল্‌তে পারলিনে এ্যাঁ? তা যদি নাহয় তবে বেচারিকে আশা দিয়ে নিরাশ করবি। বিশেষ সে যখন তোর জন্য মরে। তুই নিজে বলেছিলি—সে তোর টাকা চায়না, কিছু চায় না, শুধু তোকে চায় আর এমন লোককে তুই প্রত্যাখ্যান করছিস্?

মৃ—(কাঁদিয়া ফেলিয়া) আমার বড়ই দুর্ভাগ্য। কি করব আমি তুই বল। সবাই যে আমাকে ঠাট্টা করে বলবে—ঐ দেখ হাতীর 'বৌ যাচ্ছে সে আমি সহ্য করতে পারবনা।

সু—দেখ মৃণাল! তোকে ভালবাসি বলে এত বোঝাচ্ছি। একটা বাজে খেয়ালের বশে নিজের জীবন ব্যর্থ হতে দিস্‌নে আর তার সঙ্গে আর একজনের জীবন ব্যর্থ করিস্ নে। বাজে হিংসুক মেয়েদের মতামতের চেয়ে জগতে ঢের দামী জিনিস আছে। তোর গেটের ভিতর একখান গাড়ী ঢুক্‌ল। কার গাড়ী?

একটী লোক সেই গাড়ী হইতে নামিয়া একখানি চিঠি লইয়া মৃণালিনীর সম্মুখে রাখিল। চিঠির উপর সুন্দর হস্তাক্ষরে মৃণালিনীর নাম লেখা।

মৃ—(পড়িতে লাগিল) মৃণাল! তোমাকে আদর করে আমার আশা মিটে নাই—কিন্তু তুমি আমাকে আদর করিবার অধিকার দাও নাই তাই তোমার নামটি শুধু উল্লেখ করিলাম।

তুমি আমাকে বিনাদোষে বা অতি সামান্য দোষে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। জীবনে আমার আর কিছুই চাহিবার নাই। আজই আমি বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া চলিলাম। দেশেও আমার স্থান নাই—সেখানেও যাইব না। ইচ্ছা আছে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইয়া তোমাকে ভুলিব। কতকগুলি জিনিস সঙ্গে আনিয়াছিলাম, সে গুলিতে আমার আর প্রয়োজন নাই। তোমাকে পাইলে সেগুলি নহিলে চলিতনা। সে গুলি তোমার কাছে পাঠাইলাম। আমার শেষ অনুরোধ সে গুলি তুমি গ্রহণ করিও যদি ঘৃণা না হয় ব্যবহার করিও। তোমার স্মৃতিটুকু সম্বল করিয়া আমি তোমার নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলাম। তুমি চির সুখিনী হও।

হতভাগ্য—

মৃণালিনী পত্র পড়িয়া অশ্রু গোপন করিবার জন্য চোখে অঞ্চল দিল। লোকটী গাড়ি হইতে জিনিসগুলি আনিয়া সেখানে রাখিল। একটি বহুমূল্য পিয়ানো, কয়েকখানি সুন্দর ও মূল্যবান ছবি। একছড়া বহুমূল্য অতি সুন্দর মুক্তার মালা।

সু—(পত্র পড়িয়া পত্র বাহকের প্রতি) কোথায় তোমার বাবু যাবেন জান?

পত্রবাহক—আপাততঃ হরিদ্বারে যাবেন।

সু—তার জিনিস পত্র সব চলে গিয়েছে?

পত্রবাহক—সঙ্গে কেবল একটা সামান্য বিছানা একটা বাক্স, ও কয়েকখানা কাপড় ও বই নিয়েছেন।

সু—শুন্‌লাম তাঁর তো অনেক জিনিস পত্র সঙ্গে ছিল।

পত্রবাহক—হ্যাঁ ছিল, সে সব তিনি চাকর বাকর লোকজনদের দিয়ে দিয়েছেন।

সু—কোন ট্রেনে তিনি যাবেন

পত্র—এই বম্বে মেলে। এতক্ষণ তিনি ষ্টেশনে পৌঁছেছেন।

সু—কটায় ছাড়ে? ৫—৩০—এ না?

পত্র—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সু—(ঘড়ি দেখিয়া) আর মাত্র ১২ মিনিট [illegible] আছে—মৃণাল! ওঠ এখন কাঁদার সময় নয়। [illegible] আমাদের বেরুতে হবে; এর উপর শুধু একটা [illegible]

গায়ে দিয়ে নে। (ঘণ্টাধ্বনি করিতে ভৃত্য ছুটিয়া আসিল) ১ মিনিটের মধ্যে গাড়ী নিয়ে এস। (টাইমটেবল টেব্‌লের উপর হইতে লইয়া দেখিল! হর্ণের শব্দ শুনিয়া)

গাড়ি এসেছে যে, (পত্রবাহকের প্রতি) আপনি আমাদের সঙ্গে একটু চলুন অল্প সময়ের মধ্যে আপনার বাবুকে খুঁজে বার কর্‌তে হবে।

(গাড়ীতে আসিয়া বসিল।)

(সোফারের প্রতি,) হাওড়া ষ্টেশন—৯নং প্লাটফরমের কাছে। (গাড়ী ছাড়িয়া দিল।)

৩য় দৃশ্য

হাওড়া ষ্টেশন।

বম্বে মেল। ট্রেণ ছাড়িতে আর মাত্র ৩ মিনিট বিলম্ব

সু—এবার শক্ত হতে হবে মৃণাল! আর মাত্র ৩মিনিট গাড়ী ছাড়্‌তে দেরী। আমি তো চিনিনে তবু তার মুখে যেমন শুনেছি চেষ্টা করে দেখি।

(একবার ঘুরিয়া আসিয়া)

কর্ম্ম—শীঘ্র আসুন মাঝখানে সেকেণ্ড ক্লাসে বসে আছেন। গাড়ীতে আর কেউ নেই আপনি যান্ না।

(মৃণালিনী সুহাসিনীর কাঁধে ভর দিয়া বেগে চলিতে লাগিল ও উক্ত কামরার দুয়ার খুলিয়া কম্পিত বক্ষে ভিতরে প্রবেশ করিল)

হ বাবু—একি! মৃণাল তুমি!

মৃণাল—(কণ্ঠলগ্ন হইয়া) আমায় ক্ষমা কর। আমার জ্ঞান হয়েছে। তোমাকে আমি যেতে দেব না নেমে এস।

হ-বাবু—সত্যি! সত্যি! সত্যি!

মৃ—সত্যি। তুমি নেমে এস—তোমার পায়ে পড়ি। (গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল; গার্ডের বাঁশি বাজিল। দুজনে নামিয়া পড়িল)

৪র্থ দৃশ্য।

মৃণালিনী, হ-বাবু, সুহাসিনী, কর্ম্মচারী।

মৃ—(গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে) (স্বগত:) ওঃ কি ভুলই করেছিলাম। আর একটু হলেই হারিয়েছিলাম

সু—আপনি আমার সখা যাকে চলিত কথায় সয়া বলে—বুঝলেন তো: আপনিই বা কি রকম? সইয়ের মুখে একবার "না" শুনেই আপনি কি বলে বদরিকাশ্রমের পথ ধরলেন! আপনাদের কবিই না বলছেন—

রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন।

হ-বাবু—আর লজ্জা দেবেন না।

সু—তোকে ও আবার বলি সই। এই রূপ, এই গুণ, এই ভালবাসা পেয়েও তুই একটা নাম শুনে ভড়্‌কে গেলি। এই জন্যই না নাট্যকার আর ঔপন্যাসিকেরা রমণীর দুর্ব্বল মন বল্‌বার সুযোগ পেয়েছেন।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃ—গিরীন্দ্র বাবু বলে এক ভদ্রলোক দেখা কর্‌তে এসেছেন

হ-বাবু—গিরীন্দ্র আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু (সুহাসিনী ও মৃণালিনীর দিকে তাকাইয়া) যদি আপত্তি না থাকে ত এইখানে ডাকি?

মৃ—ডাক—এত সব তোমারি।

সু—এই যে মুখ ফুটেছে।

মৃ—অমন যদি বলতো তাহলে একটা কথাও কইব না।

গিরীন্দ্রের একখানা খবরের কাগজ লইয়া প্রবেশ।

হ-বাবু—এস গিরীন্ এস।

গি—(বিস্ময়ের সহিত কিছুক্ষণ থাকিয়া) তোমাদের দেখে খুব যে মনের অমিল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না তবে আমি যে শুন্‌লেম তুমি বিফল মনোরথ হয়ে আজই চলে যাচ্ছ।

হ-বাবু—শুনিছিলে ঠিক ভাই! মৃণাল একরকম তাড়িয়েই ছিলেন। তারপর ভগবানের প্রেরিত হয়ে মৃণালের এই বন্ধু এসে আমার হয়ে ওকালতি করায় তবে আমার মাম্‌লা জিতেছি।

সু—কথাটা আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। জজ্ ও এ দিকে ঢলেছিলেন আগে থেকে। তাই আমার কাজ সহজ হয়েছিল।

গি—খুব সুখী হ'লাম তোমাদের মিলনানন্দকে আর একটু নিবিড় কর্‌বার জন্য একটা সংবাদ এনেছি। এই পড়ে দেখ।

হ-বাবু—(খবরের কাগজের একটা চিহ্নিত অংশ পড়িতে লাগিল)

বাবা অরুণ! তুমি বহুদিন আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছ। শুনিয়াছি তুমি আমাদের দেওয়া নাম অরুণ ত্যাগ করিয়াছ এবং আপনার পুরাতন নাম ও উপাধি গ্রহণ করিয়াছ। তুমি একটা কথা জাননা,—হাতী পদবী গ্রহণ করিবার অধিকার আর তোমার নাই। কারণ তুমি জাননা তুমি শুধু আমার বোনপো নয় আমার পুত্রও। তোমায় যথাশাস্ত্র আমি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই সময় হইতেই তোমার নাম হইয়াছে অরুণ কুমার সিংহ। তুমি অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছ; আর অভিমান রাখিওনা। আমাদের খোকা তোমার ছোট ভাই কবে আমার কোল খালি করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই। এই পত্র পড়িবা মাত্র তুমি চলিয়া আসিবে। তুমি তো জান বাবা আমি একদিনও তোমাকে অযত্ন করি নাই। তোমার মাতা।

হ-বাবু—(সজলনয়নে) মা—মা—তোমাদের কত কষ্ট দিয়েছি মা।

মৃ—এ খবর—আপনি কি হঠাৎ দেখ্লেন?

গি—হ্যাঁ- খানিকটা আগে দেখ্লাম। আরও একটা খবর আছে। ষ্টেশানেই কাগজ কিনে প্রথমেই এই জায়গাটাই নজরে পড়ে গেল। পড়ে বড় আহ্লাদ হ'ল—আপন মনে চেঁচিয়েই বলে ফেলেছি—তা হলে আর এ বিয়ে আটকাবে কিসে? ফ্যালারাম হাতী থেকে যখন অরুণ সিংহ নাম তখন আর পায় কে? পাশে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আমার জোরে কাগজ পরা শুন্ছিলেন। আমাকে এই কথা বলতে শুনেই লাফিয়ে উঠলেন। তখন তাকে সব বলি। তার মুখে শুনলাম তিনি তাঁদের ম্যানেজার শিবশরণ বাবু বাবুকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। আমায় তিনি তখনি কাগজ নিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিলেন। বলে গেলেন তিনি সন্ত্রান্ত আশ্রমে খোঁজ নিয়ে এখনি আবার এই ঠিকানায় আসবেন। দুজাগায় দুজনে গেলে কাজ শীঘ্র মিটবে।

হ-বাবু—দাদা এসেছেন! মৃণাল তুমি যখন ধরা দিয়েছ এখন ওকে একে সব পাব মনে হচ্ছে।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য—আর একটা বাবু এসেছেন।

সকলে—নিয়ে এস এখানে।

ভৃত্যের প্রস্থান ও শিবশরণকে লইয়া প্রবেশ।

হ-বাবু—(উঠিয়া প্রণাম করিয়া)—দাদা!

শিব—এইযে অরুণ। বাঁচা গেল, তোমাকে পেলাম। মা তোমাকে দেখ্বার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছেন। আমি বলে এসেছি—নিশ্চয়ই তোমাকে নিয়ে আসব।

(মৃণাল উঠিয়া প্রণাম করিলেন)

শি—ইনিই বুঝি আমার বৌমা হবেন। লজ্জা কর না মা! আমি সব শুনেছি। দেবীর মত মুখখানি তোমার মা! দেখে বড় সুখী হলাম তোমরা একটু বস। এখনি একবার আসছি। আমার মাকে একটা টেলিগ্রাম করে আসি। তোমাকে পেয়েছি সে খবরও দিই আর তাঁদের আস্তে লিখে দিই। বিয়ে দিয়ে আমার বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে তবে না যাব।

মৃ—আপনি কেন বসুন না আর কোন লোক টেলিগ্রাম করে দিয়ে আসুক।

শিব—সে হয়না মা! আমার মাকে বড় মনমরা দেখে এসেছি। আমি নিজহাতে টেলিগ্রাম না করে এলেত শান্তি পাব না। তোমরা কথাবার্তা কও। আরও ২১টা কাজ আছে। আমি কাজ কটা মিটিয়ে এলেম বলে।

মৃ—আসবেন যেন।

শিব—নিশ্চয়ই! আসব মা! আস্ব—তোমার হাতে খাব। তবে না!

(শিবশরণের প্রস্থান

ভৃত্যের প্রবেশ

(মৃণালের প্রতি)

ভৃ—তিনটী মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

মৃ—এখানে নিয়ে এস।

(মহিলা তিনটির প্রবেশ। ইহাদের তিন জনেই [illegible] দিন সান্ধ্যসভায় ছিলেন)

১মা—মৃণালিনি! কেমন আছ ভাই! [illegible] পেয়েছ।

২য়া—তোমার দুঃখে এই কয়দিন আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা ছিলনা।

(হ-বাবুকে দেখিয়া) একি, হ-বাবু—না না হাতী বাবু যে!

গি—আমার বন্ধু বড়ই দুঃখিত যে হাতী বা হাতীবাবু থেকে ইনি আর আপনাদের আনন্দ বর্দ্ধন করতে পাচ্ছেন না। ওঁর এক মেসো মহাশয় পূর্ব্বেই এঁকে দত্তকপুত্র নিয়েছিলেন। সেই থেকে এঁর নাম অরুণকুমার সিংহ। এঁর মেসো মহাশয় অগাধ সম্পত্তির অধিকারী। আর উনিই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ পরশু হবে। অবশ্য আপনারা সকলে নিমন্ত্রণ পত্র পাবেন। বড়ই দুঃখের বিষয়—আপনাদের এত চেষ্টা সত্বেও বিবাহটা বন্ধ হল না।

১মা—বড়ই সুখী হলাম। অরুণবাবু! (দীর্ঘনিশ্বাস)

২য়া—আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। (চক্ষু অশ্রু সজল হইয়া উঠিল)

৩য়া—(প্রৌঢ়া) ভগবান্ করুন আপনি দীর্ঘকাল সুখশান্তি ভোগ করুন। (রোদন)

১মা—এখন কিছুদিন থাকবেন নিশ্চয়ই।

২য়া—আপনার প্রীতি-স্নিগ্ধ-সঙ্গ হতে বঞ্চিত হব না।

৩য়া—তা হলেই আমরা সুখী থাকব।

হ-বাবু—আপনারা সকলে একত্রিত ভাবে এবং পৃথক পৃথক আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

(৩য়ার প্রতি) আপনার শুভ চিন্তার জন্য চিরঋণী রইলাম। তবে প্রীতি এবং স্নিগ্ধ সঙ্গ সম্বন্ধে মাপ করবেন। কাল পরশুর মধ্যেই আমার সঙ্গ এঁর কাছে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে।

(২য়ার প্রতি) আপনার শিষ্টতার জন্য বিশেষ বাধিত। আপনাকে বন্ধু হিসাবে সম্মান করব—তবে তার বেশী প্রত্যাশা করবেন না।

(১মার প্রতি) আমার দিকে একটু কম মনোযোগ দিলেই অধীন কৃতার্থ হবে। কারণ এখন আমার সম্বন্ধে তিলমাত্র কারো আশা রহিল না।

সকলের প্রতি—আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন! বসুন! বসুন! মৃণাল এঁদের জন্য একটু চা না হয় সরবতের ব্যবস্থা কর।

(মহিলা ৩টি একে একে এক এক প্রকার মুখভঙ্গী করিয়া চলিয়া গেলেন।)

গিরীন্দ্র। ওরা কেউ যে উষ্ণ বা শীতল আতিথ্যের জন্য অপেক্ষা করলেন না।

সু। তা না করুন্। শুভ কাজের সময় এঁদের স্নিগ্ধ দৃষ্টিটুকু না পড়লেই ভাল হয়। ওদের সম্বর্দ্ধনা করা ছাড়া আমাদের এখন ঢের কাজ বাকি আছে।

আগামী সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষের
বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ।

বাঙ্গালী মহিলার বিদেশে অভিজ্ঞতা *

—শ্রীসুধা সেন

গত ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯৩২ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত সমুদ্রপারে আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ইউরোপ বেড়াবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। এখনকার দিনে এই দেশভ্রমণ কিছু একটা নতুন ব্যাপার নয় এবং অনেকের ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করার ফলে সকলেই সে সব পড়ে আনন্দ পান। সেজন্য পথের বর্ণনা বা দেশের কাহিনী বিশদ্‌ভাবে লেখবার দরকার মনে হয়না। নানা-দেশ বেড়িয়ে, আমাদের দেশের বাইরে কত লোকের সঙ্গে পরিচয়ে পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতা, ঐ দেশবাসীর গৃহস্থালী সম্বন্ধে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে সেই কথাই কিছু বলব।

পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতার কথা শুনলে অনেক সময়ে আমাদের দেশবাসীদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ঐ দেশের সভ্যতাকে পদে পদে অনুকরণ করা আমাদের অসম্ভব এবং করা উচিৎও মনে করি না। মানব চরিত্র দোষগুণের সমাবেশ দেখা যায়। তাই নানাদেশের বিদেশী বন্ধুদের ভিতর সৎগুণ দেখে সেই বিষয়ে এবং ঐ সব দেশের জনসাধারণের জন্য নানাপ্রকার সৎপ্রতিষ্ঠানের কথা একটু বলতে ইচ্ছা করে।

আমাদের কাছে মনে হয় বিলাত বা আমেরিকায় গৃহস্থালী বুলি কেউ করে না। কিন্তু সেকথা যে সত্য নয় তা অনেকেই দেখে এসেছেন। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় থাকবার সময় ঐ দেশবাসী কয়েকজনের দ্বারা গৃহস্থের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁদের গৃহস্থালী দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমরা যে কোন অতিথিকেই নিমন্ত্রণ করিনা কেন নিমন্ত্রনের দিন অতিথির অভ্যার্থনার আয়োজনে কত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি—সমস্ত সকালবেলা সেই আয়োজনেই আমাদের কেটে যায় এবং অতিথির চোখের সামনে আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ধরা যাতে না পড়ে তার চেষ্টাতে ব্যস্ত হয়ে উঠি। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বন্ধুদের বাড়ীতে এই লুকোচুরীর ব্যাপার দেখলাম না—তাঁদের সরলব্যবহারে, সুমধুর আতিথ্যে আমি যে বিদেশী একথা ভুলিয়ে দিল। তাঁদের সংসারের সকল রকম ব্যবস্থার কথা আমার কাছে গল্পচ্ছলে বলতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হলেন না। অতি ধনী পরিবারেও দেখলাম আমাদের যেন তাঁদের পরিবারের অন্তর্ভূক্ত একজন বলেই মনে করে আদর যত্ন করলেন। ইউরোপ ভ্রমণের সময় ভাষায় না কুলালেও মুখের মিষ্ট হাসির ভেতরে কতজনের মধুর ব্যবহার পেয়েছি। এই ১০ মাস দেশভ্রমণের সময় সর্ব্বত্রই আমাদের প্রতি সকলের আদর যত্নে ও সরল ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হয়েছি।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার গৃহস্থালীর কাজ অনেক সংক্ষেপে হয়ে যায় তার নানা কারণ আছে। বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত চুল্লী, কাপড় পরিষ্কার করবার সরঞ্জাম, এমন কি ঘর ঝাড়বার যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিশ্রম অনেক লাঘব করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক শক্তি ও গ্যাসের এত বেশী ব্যবহার ও সব দেশে, সেজন্য জন-সাধারণের চেষ্টায় গ্যাস ও বৈদ্যুতিক প্রবাহ আধুনিক-কালে যতদূর সাধ্য কম খরচে পাওয়া যায়। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবনাশক্তিতে এই বৈদ্যুতিক প্রবাহের ব্যবহারে কত রকম যন্ত্রের সৃষ্টি হচ্ছে যার ফলে বাসন পরিষ্কার এবং শুকনো করে মুছে রাখা পর্য্যন্ত মানুষকে হাতে করে করতে হয়না। অবশ্য সে যন্ত্রে আমাদের দেশের কাঁসাপেতলের বাসন পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। ঐ সব দেশেও এ সব ব্যাপার এখনও যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য, জনসাধারণে ব্যবহার করতে পারে না। বৈদ্যুতিক প্রবাহে সাধারণ উত্তাপ একেবারে নিয়ন্ত্রণে করিয়া

* তালতলা সাধারন পাঠাগারের বার্ষিক সাহিত্যের অধিবেশনে পঠিতাংশ।

লোকেরা খাদ্যদ্রব্যাদি বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে, অপচয়ের ভয় তাদের থাকে না। এত রকম সুবিধা তারা পেয়েছে বলে যে ঐ দেশবাসী নারীজাতি সমস্তক্ষণ খাওয়ার ব্যাপারেই দিন কাটায় তা নয়। যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সংসারের কাজ সমাপন ক'রে বাইরের নানা হিতসাধন কার্য্যে সমস্ত মাতৃজাতি নিজেকে ব্যস্ত রাখে। আমেরিকার অনেক গৃহস্থ রান্নার পর্ব্ব উঠিয়ে দিয়েছে নিজেদের সুবিধার জন্য কতকটা, আবার কতকটা নিজের দেশের ব্যবসার উন্নতির জন্য। বিশ্ববিখ্যাত Heinz Factory'র আশীর্ব্বাদে পাশ্চাত্য জগৎ অনুযায়ী একেবার প্রস্তুত কোনও প্রকার খাদ্যদ্রব্যের অভাব আধুনিককালে নেই, কারখানার কৃপায় সকল রকম সুরুয়া থেকে আরম্ভ করে চাটনী আচার পর্য্যন্ত, এমন কি নানাপ্রকার বিলাতী মিষ্টান্ন অর্থাৎ পুডিং সবই টিনে সুরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়। শুধু একটী টিন কাটবার যন্ত্রের আবশ্যক—তাই দিয়ে খুলে গরম করে কাঁচের বাসনে ঢেলে খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। পেন্‌সিলভেনিয়া ষ্টেটের পিট্‌স-বার্গ সহরে এই কারখানাটীর বিরাট ব্যাপার স্বচক্ষে দেখে মোহিত হয়েছিলাম।

আমেরিকায় প্রধান প্রধান সহরে সকলেই প্রায় নিজেদের সংসারে সময় নিক্ষেপ না করে বাইরের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাই তাঁরা হোটেলে থেকে বাইরের সাধারণ ভোজনাগারে তিনবেলা আহারাদি সম্পন্ন করে সকল প্রকার ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছেন। গৃহের সঙ্গে সকল সম্পর্ক কাটিয়ে রাত্রিদিন বাইরে থাকা আমাদের কাছে যেন বিসদৃশ ঠেকে।

সংসারের কাজে সময় সংক্ষেপের দিকে ঐ দেশবাসী সকলেরই দৃষ্টি আছে। তাই দেখলাম নতুন নতুন প্রথায় কত রকম খাদ্যদ্রব্যের সৃষ্টি হচ্ছে, যেমন ময়দায় বিসকুটের উপকরণ মিশিয়ে বিসকুটের আকারে শুধু সেঁকে নেবার অপেক্ষায় বিক্রী করে, গৃহস্থকে তাই কিনে প্রয়োজনমত আগুনে সেঁকে নিয়ে বিস্কুট প্রস্তুত ক'রে নিলেই হল। টাটকা বিস্কুটও খাওয়া হল, কত অল্প সময়ও ব্যয় হল।

সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের নারীজাতি কত অগ্রসর হয়ে কতরকম কাজ করছে দেখলে বোঝা যায় আমরা কত পিছনে পিছিয়ে পড়েছি। ঐ সব দেশে প্রায় কোনও মহিলাই অলসচিত্তে সময় কাটায় না। অবশ্য তাদের জন্য সর্ব্ব-প্রকার কার্য্যক্ষেত্রই প্রসারিত করা আছে—আমাদের মত পদে পদে বাধা তাদের মানতে হয় না। বিদ্যালয়ে দোকানে, অফিসে, আর্ত্তের সেবার জন্য সেবাসদনে সর্ব্বত্রই মেয়েরা কাজ করছে। তাদের কার্য্যতৎপরতা দেখবার জিনিষ।

আমেরিকা ভ্রমণের সময় ইলোসিস্টেট্‌সএর কোনো গ্রামে একটী বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই শিশুদের বিদ্যালয়ে তাদের মুক্তভাব—আমাদের মুগ্ধ করেছিল। বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ের সুচারু বন্দোবস্তে শিক্ষার ব্যবস্থা দেখে বড় আনন্দ হ'ল সঙ্গে সঙ্গে দেখে মুগ্ধ হ'লাম যে শিশুদের মায়েরা শুধু তাদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হননি, তাঁরা নিজেরাও যে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য দায়ী, এই কথাই মনে রেখে বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সভার অনেকেই সভ্য হয়েছেন এবং সকলপ্রকার নিয়মানুসারে কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন। কেহ কেহ বিদ্যালয়ের পরিদর্শকদের পরিদর্শন কার্য্যে সাহায্য করবার ভার নেন। অনেক মেয়েরা বিদ্যালয়ের মধ্যাহ্নভোজনের সময় শিশুদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা দিতে সাহায্য করেন। এগুলি বাস্তবিকই গ্রহণ করবার বিষয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মধুর সম্বন্ধ, পরস্পরের সখ্য ভাব সহজেই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল।

অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় বেড়াবার সময় কয়েকটী শিশু বিদ্যাপীঠ দেখেছিলাম। তার মধ্যে একটি বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। দুই বৎসর থেকে ছয় বৎসর বয়সের ২১০টী ছেলেমেয়ে এখানে শিক্ষা পায়। সপ্তাহে প্রত্যেক শিশুর কাছ থেকে আমাদের দেশের হিসাবে ২৲টাকা করে মাহিনা নিলেও বাকী সমস্ত খরচ সহরের পৌরসভা থেকে চালান হয়। সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ের কার্য্য চলে। শিশুদের শুধু বইএর বিদ্যা নয়, লেখাপড়া শেখানো নয়, সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রতি মিষ্ট ব্যবহার করতে, নিজের যৎসামান্য কার্য্য নিজে করতে, [illegible]

শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুরা সারাদিনের তিনবারের আহার বিদ্যালয়েই খায় এবং দ্বিপ্রহরে দুঘণ্টা বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য ও বন্দোবস্ত করা আছে। শিশুদের মুক্ত বিচরণে আনন্দের হাসি দেখে মনে হয়না যে তারা বিদ্যালয়ে আছে।

এজগতে প্রত্যেক শিশুই তার প্রাপ্য অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে একথা উপলব্ধি করে ভিয়েনার পৌরসভার সভ্যেরা শিশুদের জন্য চিন্তা করেন এবং সকলপ্রকার দুঃস্থ, অসহায় ও পতিত শিশুদের ব্যবস্থার জন্য তারা একটী প্রশস্ত গৃহের দ্বার উন্মুক্ত রেখেছেন। জন্ম থেকে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের এখানে রাখা হয়। তার জন্য যতপ্রকার সুব্যবস্থা করা সম্ভব, তাই করা হয়েছে। জনসাধারণের জন্য এই যে পৌরজনদের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করা, এ ভাবটী খুবই প্রশংসনীয়। আমাদের দেশে সকলেই নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত, দীনদুঃখীর জন্য কে ভাবে? রোগগ্রস্ত বা মানসিক বিকার প্রাপ্ত শিশুদের ঐ সব দেশে কেউ অবহেলা করেনা। প্রাণপণ যত্ন ও সুবন্দোবস্তে তার চিকিৎসা ও শিক্ষার চেষ্টা করা হয়। এরকম চিকিৎসালয় সংযুক্ত কয়েকটী শিক্ষার কেন্দ্র আমেরিকা ও ভিয়েনায় দেখলাম।

গত মহাযুদ্ধের অবসানে ভিয়েনায় বড়ই অবস্থান্তর ঘটেছে। দেশবাসী অধিকাংশই গৃহহারা হয়ে পড়েছিল। তাই সহরের পৌরজনেরা মস্ত মস্ত বাড়ী তৈরী করে ঘরহিসাবে সস্তাদরে গরীব গৃহস্থদের ভাড়া দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এই বাড়ীকে "Tenement house বলে। আমরা আমাদের পথপ্রদর্শক বন্ধুটীর সঙ্গে এইরকম একটী গৃহস্থের বাড়ী অর্থাৎ তিনখানা ঘর দেখতে গেলাম। তাঁরা স্বামী স্ত্রী দুটী ছেলে নিয়ে থাকেন। আমাদের বন্ধুটীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় থাকাতে আমরা গিয়েই উপস্থিত হলাম। তিনখানি ঘর কি পরিষ্কার ভাবেই গোছানো ছিল। গৃহকর্ত্রী তো আমাদের দেখে খুব খুসী। ভাষার অনভিজ্ঞতায় হাস্যবিনিময়ে অভ্যর্থনা শেষ হ'ল। আমাদের দেশের হিসাবে মাসে ওরা মাত্র ১৬৲টাকা দেন। তাইতে যে শুধু তিনখানি ঘর পেয়েছেন তা নয় পৌরসভার ব্যবস্থাতে ঐ বাড়ীর কাছে জনসাধারণের বস্ত্রাদি ধুয়ে দেবার জন্য একটী সাধারণ ধোবাখানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাঁরা এইরকম তিনখানি ঘর নিয়ে থাকেন তাঁরা ঐ ১৬৲টাকার ভিতরেই মাসে দু'ক্ষেপ কাপড় ধুইয়ে নিতে পারেন। কি করে এত কম খরচে সব রকম সুবিধার ব্যবস্থা হ'তে পারে ভেবে পাইনা।

যাহোক নানারকম জনহিত সাধনমণ্ডলীর কার্য্যক্ষেত্র ও নানা প্রকার প্রতিষ্ঠান গুলি দেখে বারে বারেই মনে হয় পাশ্চাত্য জগতের যা কিছু বর্জ্জনীয়, তা দূরে ঠেলে ঐ জগতের সভ্যতার আদর্শ, সুশিক্ষার গুণাবলী গ্রহণ করে আমাদের দেশের জন্য এমন করে আমরা ভাবতে শিখব কবে? কবে সেদিন আসবে যেদিন নিজের এককণা সুখসুবিধাও দেশের কাজে ত্যাগ করতে পারব।

চিত্রকলা

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

ভগবান ও পৃথিবী একসঙ্গে সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া দেখিতে হইলে ভাবপূর্ণ চিত্রের অনুশীলন আবশ্যক।

প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে চিত্র বা প্রতীকের আলোচনা চলিতেছে। বিভিন্ন জাতির প্রতীক হইতে এতদ্দেশীয় প্রতীকের অনেক পার্থক্য আছে। অপর জাতির সাধারণ লোক ভারতীয় চিত্রের গুণগ্রহণ করিতে না পারিয়া অনেক সময় অবজ্ঞাভাব প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তজ্জাতীয় লোকদিগের আদর্শ ও মনোমত হয় না বলিয়া অনেকসময় ভারতীয় চিত্রকলাকে অপূর্ণ ও প্রাথমিক শ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত করে। কিন্তু ভারতীয় চিত্রকলার ভিতর যে একটা বিশিষ্ট প্রাণ নিহত আছে এবং সেই প্রাণের পরিপুষ্টি ও পরিবর্দ্ধনের জন্য ভারতীয়েরা এতাবৎ কাল বিশেষ আয়াস পাইয়াছিল ও সেই প্রাণ বিকাশ করিবার মানসে বহুবিধ প্রযত্ন ও ভাবপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল এবং ভারতীয় চিত্র যে নিজ স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়া উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে ইহাই দেখান এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

অব্যক্তকে ব্যক্ত করা নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণ করিয়া প্রতিবিম্বিত করা এই হইল ভারতীয় চিত্রের আদর্শ। চিদাকাশে নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় তাহা সাধারণ লোক বুঝিতে পারে না কিন্তু চিদাকাশ হইতে মন যখন নামিয়া আসে এবং চিত্ত আকাশে অবস্থান করে তখন চিত্ত আকাশে মূর্ত্তি বা চিত্রই প্রতিফলিত হয়। এই ধ্যান অবস্থায় প্রতিবিম্বিত ভাব বা ইষ্ট বা আত্মদর্শন হয়, তাহাই প্রতিফলিত করা চিত্রের উদ্দেশ্য। অন্য প্রকারে বুঝাইতে হইলে বলিতে হইবে যে চিদাকাশ হইতে মন যখন চিত্ত আকাশে অবস্থান লাভ করে তখনই নির্গুণ সগুণ হইয়া যায়। জটিল দার্শনিক মতের এস্থলে বিশেষ আবশ্যক নাই; কেবল কিঞ্চিৎমাত্র আভাস বর্ণিত হইল; কথা এই যে অব্যক্ত ব্রহ্ম বা ইষ্ট বা ধ্যেয় বস্তুর প্রত্যক্ষ জীবন্ত ভাবকে প্রতিফলিত করাই ভারতীয় চিত্রের আদর্শ।

কোন কোন জাতি প্রকৃতির অনুরূপ আলেখ্য অঙ্কিত করাকেই চিত্রের আদর্শ বলিয়া থাকে। প্রকৃতিতে যে বস্তু যে ভাবে আছে তদ্রূপই দেখান আলেখ্যর উদ্দেশ্য কিন্তু তাহা হইলে ফটোগ্রাফ ও চিত্রের কোনও পার্থক্য থাকেনা। কারণ ফটোগ্রাফ সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অনুরূপ আলেখ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। ফলতঃ ইহা নিতান্ত প্রাণহীন, দাসমনোবৃত্তি চিত্রকলা হইয়া যায়। ভারতবর্ষীয় চিত্রের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে দেবভাব ও সজীব তেজোপূর্ণ প্রাণ দেখান। শিল্পী আত্মসংযম ও ধ্যান নিরত হইয়া নিজের ভিতর প্রাণশক্তি উদ্ভূত করিবে, নিজে সেই অভিষ্ট বস্তু বা ইষ্টকে চিত্ত আকাশে স্পষ্টভাবে দর্শন করিবে এবং সেই অভীষ্ট বা ইষ্ট ধ্যেয় বস্তুকে বর্ণ ও তুলিকার দ্বারা পটে প্রতিবিম্বিত করিবে অর্থাৎ বর্ণ ও তুলিকার দ্বারা নিজ প্রবুদ্ধ প্রাণ বা আত্মন চিত্রফলকে প্রতিবিম্বিত হইবে। শিল্পীর সেই অবস্থায় মন কিরূপ উচ্চঅবস্থায় উঠিয়াছিল এবং কিরূপভাবে ইষ্ট দর্শন হইয়াছিল ইহাই দেখান ভারতীয় চিত্রে আদর্শ।

প্রবুদ্ধ আত্মনকে আকার ইঙ্গিতে ও সাঙ্কেতিক ভাবে অপরকে দেখান এই হইল চিত্রের উদ্দেশ্য। প্রকৃতির অনুরূপ করা বা দাসের ন্যায় অপরের পশ্চাৎ অনুসরণ করা ভারতীয় চিত্রের লক্ষ্য নয়। ভারতীয় চিত্রের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য থাকায় অপর জাতির চিত্র হইতে বিশেষ পার্থক্য আছে। যাঁহারা ভারতবর্ষীয় দর্শন ও জাতীয়ভাব অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই ভারতীয় চিত্রের উৎকর্ষতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। জাতির প্রাণ বা সমগ্র চিন্তাশক্তি চিত্রের চিত্রের ভিতর নিহিত হইয়া থাকে। বর্ণ ও রেখার ভিতর সেই অন্তর্নিহিত ভাবটি বুঝিতে পারিলেই জাতীয় ভাবটি উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

এই নিমিত্ত ভগবান ও সৃষ্টি একসঙ্গে সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া দেখিতে হইলে ভাবপূর্ণ চিত্রের অনুশীলন আবশ্যক।

কোনও সিদ্ধ মহাপুরুষ ধ্যান অবস্থায় নিজের ইষ্টকে চিত্ত আকাশে দর্শন করিয়াছিলেন। ইষ্টদর্শনে বা ধ্যেয় বস্তুর উপলব্ধিতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ হয়। সিদ্ধ মহাপুরুষ নিজ অন্তেবাসিদিগকে তদ্বিষয়ে উপদেশ করেণ যে, সেইরূপ ধ্যান করিলে তদ্দর্শিত চরম অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় ও সেই ধ্যেয় ইষ্ট বস্তুকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে অন্তেবাসিগন নিজ নিজ সাধনাবলে প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিন্তু পরবর্ত্তিকালে সাধারণ লোককে পরিদর্শন করাইবার জন্য প্রাকৃতিক বস্তু, প্রস্তর, মৃত্তিকা বা কাষ্ঠ অবলম্বন করিয়া সেই ধ্যেয় বস্তুর (Conceived concept) বিকাশ করিয়া প্রকাশ হইল। এই হইতেই বহুবিধ প্রতীকের উৎপত্তি হইল। কিন্তু প্রতীকের অবয়ব বা আকৃতি বহুপ্রকার হইলেও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য একই রহিল। ইহাকে প্রতিমার ধ্যান অংশ বলিয়া থাকে। প্রতিমা বা প্রতীকের অবয়ব যে প্রকার হউক না কেন ধ্যান অংশ এক থাকিবে এবং সেই ধ্যান অংশকে মৃত্তিকা, কাঠ বা প্রস্তর দ্বারা প্রতিফলিত করাতেই প্রতীকের উৎপত্তি। বলে যেমন আচার্য্য বা সিদ্ধপুরুষ ধ্যান অবস্থায় নিজের সুষুপ্ত প্রাণকে জাগ্রত করিয়া চিত্ত আকাশে দর্শন করেন এবং পরবর্ত্তিকালে পূজক আত্মপ্রাণ প্রবুদ্ধ করিয়া প্রতিমার ভিতর সন্নিবেশিত করে যাহাকে—যাহাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা বলে—শিল্পীও তদ্রূপ নিজের প্রাণ প্রবুদ্ধ করিয়া অঙ্কিত বস্তুর ভিতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে ইহাকেই বলে জীবন্ত চিত্র। কিন্তু যে স্থলে শিল্পী চিত্রে আপন প্রবুদ্ধ প্রাণ সংযোগ করিতে পারিবে না কেবলমাত্র বর্ণ ও অঙ্গ সৌষ্ঠবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য সমাধান করিতে চেষ্টা করিবে সেই প্রতীকের বিশেষ কোন মূল্য থাকে না, তাহা প্রাণহীন মৃত প্রতীক হইয়া যায়। পূজাতে যেরূপ প্রক্রিয়া করিতে হয় অর্থাৎ প্রাণসঞ্চার করিতে হয় প্রতীকেও শিল্পীকে তদ্রূপ করিতে হইবে এই হইল ভারতীয় চিত্রের বিশিষ্টতা। অঙ্গ সৌষ্ঠব বা বর্ণ নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইবে। ইহা গৌণ উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়; মুখ্য উদ্দেশ্য হইল প্রাণসঞ্চার করা মুখ্য উদ্দেশ্য হইল প্রাণ সঞ্চার হইয়াছে কিনা। সেই ধ্যান অবস্থায় সেই ইষ্ট বা অভীষ্টকে প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে কিনা, বর্ণ ও রেখা দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে কিনা ইহাই হইল ভারতীয় চিত্রের উদ্দেশ্য। এই বিষয়ে ভারতবর্ষীয় চিত্র অপর দেশীয় চিত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং এই বিশেষ ভাবটি পরিজ্ঞাত না হইলে ভারতীয় চিত্রের উৎকর্ষতা বা তারতম্য কেহই বুঝিতে পারিবে না। এইটিই হইল ভারতীয় চিত্রের অন্তর্নিহিত প্রাণ।

প্রতীক বা চিত্র বুঝিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিভিন্ন সময়ে কি ভাবে উঠিয়াছিল এবং তাহাদিগের জাতিগত ভাব কি প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা বিশেষ ভাবে জানা আবশ্যক। বর্ত্তমানকালে যদিও আমরা নানা জাতির চিত্র এবং প্রস্তরমূর্ত্তি পরিদর্শন করিয়া থাকি এবং নানারূপ দোষগুণের ব্যাখ্যা করি কিন্তু সেই সকল জাতির অন্তর্নিহিত মৌলিক ভাব যতক্ষণ না উপলব্ধি করিতে পারি ততক্ষণ তাহাদিগের জাতীয় মাধুর্য্য ও উৎকর্ষতা সম্যক অবগত হইতে পারি না।

বিভিন্ন জাতির প্রতীক

ভারতীয়েরা বহুকাল হইতে এই চিন্তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের চিত্র শব্দে এই বুঝায় যে চিৎ বা ব্রহ্মের অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় পরিণতি। চিৎরূপ আকাশ হইতে চিত্তাকাশে অথবা চিদাকাশ হইতে চিদাভাষ- পরিণতি করিয়া সাধারণের বোধগম্য হয় এইরূপ প্রত্যক্ষরূপই প্রতীক বা চিত্র। এই জন্য প্রত্যেক বিগ্রহ বা মূর্ত্তিগঠনের ভিতরে তাহার বিশেষ ধ্যান বর্ত্তমান। সেই ধ্যান অনুযায়ী বিগ্রহ নির্ম্মাণই শিল্পীর কৃতিত্ব।

এইজন্য বিগ্রহ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে যথা অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থায় পরিণতি অর্থাৎ নির্গুণ হইতে সগুণ অবস্থা কিরূপ ধীরে ধীরে আসে তাহা দেখান প্রথম বিভাগের লক্ষ্য। দ্বিতীয় বিভাগের লক্ষ্য হইল মনকে সগুণ হইতে নির্গুণ অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করা, অর্থাৎ মন সগুণের স্থূল অবস্থা হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম গতিশীল হইয়া কিরূপে নির্গুণ বা চিদাকাশের ভিতর

যায় তাহাই দেখান। এই দুই বিভাগের ভিতরে সকল প্রকার প্রতীককেই আনয়ন করা যাইতে পারে।

ভারতীয় প্রতীকে একটা দেবভাব একটা অতীব পবিত্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বামাচারী সম্প্রদায়ে রুচি-বিগর্হিত অনেক প্রকার প্রতীক দৃষ্ট হয় কিন্তু সেই সকল হইল সাধনসহায় যন্ত্র বা মুদ্রাবিশেষ। সেই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাদর্শ অনুযায়ী সেই সকল যন্ত্র বা উপাসনা প্রণালীরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অপরাপর সম্প্রদায়ের চক্ষে সেই সব প্রতীক অতি বীভৎস বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু চিৎউপাসক সম্প্রদায়ের নিকট সেই সকল যন্ত্র উপাসনার পবিত্র প্রণালীমাত্র। এইজন্য তাহারা ইহাদের মধ্যে দেবভাব বা মহাপবিত্র ভাব ধারণা করে। ভারতীয় যুগল মূর্ত্তির তাৎপর্য্য এই যে লীলা নিত্যকে অনুসরণ করিতেছে এবং নিত্য লীলার নিকটে প্রতিভাত হইতেছে। একজন আশ্রয় পাইয়া পূর্ণ আর অপরজন আশ্রয় দিয়া পরিতৃপ্ত বা পরিপূর্ণ অর্থাৎ বিকাশ নিত্য (displayment বা manifestation) নিত্যকে অনুসরণ করিতেছে এবং সর্ব্বদা অবিভক্ত ও নিত্য (or constant) লীলা (evanasant) কে আশ্রয় দিতেছে, এই হইল ভারতীয় যুগল মূর্ত্তির ভাব। স্ত্রীপুরুষ মিলন সম্ভূত পাশ্চাত্য ভাব এ স্থলেই মোটেই নাই। সর্ব্ববিধ কার্য্যের ভিতর, সকল সময়ের ভিতর সকল উপায় বা প্রক্রিয়ার ভিতর লীলা নিরন্তর নিত্যকে অনুসরণ করিতেছে ইহাই দেখান যুগল মূর্ত্তির আদর্শ। দৈহিকভাব বা পাশ্চাত্য চাঞ্চল্য পরিপূর্ণ কামভাব দেখান এস্থলে আদৌ উদ্দেশ্য নয়। সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্ব সময়ে, সর্ব্বকার্য্যের ভিতর যে দেবভাব হয় ইহা দেখানই যুগল মূর্ত্তির উদ্দেশ্য।

সহজ কথায়, ভারতীয় সমস্ত প্রতীককে দুই শ্রেণীর বলা যায়। এক শিবের ধ্যানীভাব অর্থাৎ সমাধি অবস্থা হইবে, মন দেহেতে কিরূপে আসিতেছে এবং অপর দুর্গার সক্রিয় ভাব অর্থাৎ সাধারণ অবস্থা হইতে মন সমাধির দিকে কিরূপে যাইতেছে। ভারতীয় সব প্রতীকেই এই দুই ভাবের কোনও একটীর আভাস পাওয়া যায়।

অসুর Assyrian জাতির চিত্রের আদর্শ

অসুর (Assyrian) জাতির আদর্শ অন্য প্রকার ছিল। ইরা (ra) এবং অণু (Anu) তাহাদের এই দুই উপাস্য দেবমূর্ত্তি। ra বলিতে পৃথিবী (earth) বুঝায় এবং অণু বলিতে ব্যোম (firmament) বুঝায়।

পরে তাহারা...স্ত্রী ও পুরুষের আকারে পরিবর্ত্তিত হয়। উহাদিগের দর্শন শাস্ত্র ও জাতীয় কলাবিদ্যা এই দুই ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১ম অবস্থায় অর্থাৎ কয়েক শতাব্দীর অন্তে প্রতীকে দেবত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য দুইটী করিয়া পক্ষ সংযোজনা করিয়াছিল। পৃথিবী হইতে স্বর্গ এবং স্বর্গ হইতে পৃথিবী দেবতাদের অনায়াসগম্য করিবার জন্য তাহারা প্রতীক পৃষ্ঠে দুইটী পক্ষ সংযোগ করে। ঐ সময়কার সকল মূর্ত্তি যথা, পক্ষ বিশিষ্ট অশ্ব, পক্ষ বিশিষ্ট সিংহ, দীর্ঘ চঞ্চু পক্ষ বিশিষ্ট মনুষ্য দেখিলে সত্যই মনে হয় সে জাতির ভিতরে একটা নূতন ভাব উদ্ভূত হইয়াছিল। মৎস্যপুরী (Ninevah) হইতে যখন এব্রাহিমকে অপসারিত করা হয় তখন জাতীয় দেবতাদের বিপর্য্যস্ত ভাব ঘটিল। অসুরদিগের (Assyrian) মৎস্য (Ninu) এক বিশেষ দেবতা ছিলেন। এইজন্য রাজধানীকে Ninevah বা নিনুর (Ninu) অর্থাৎ মৎস্য দেবতার পুরী আখ্যা দিল। দিকবাস ইরা ও অণু পরে Adam ও Eve নামে পরিগণিত হইল এবং চঞ্চু ও পক্ষবিশিষ্ট নৃমূর্ত্তিটী স্বর্গীয় দূত Angel নামে অভিহিত হইল। ইহাই পরে আরবদিগের হুর এবং পারস্য জাতির পরী (পর) পক্ষরূপে পরিগণিত হইল। ইহার আর কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। ভারতীয়েরা যোগবলে ইন্দ্রপুরী বা স্বর্গে যাতায়াত করিতেন, এই ছিল তাঁহাদের যথার্থ জাতীয় ভাব কিন্তু অসুর (Semitic) দিগের যোগবলের কোনও প্রকার ধারণাই ছিল না। এইজন্য তাহারা সাধারণ জীবের ন্যায় পাখার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বর্গারোহণের উপায় উদ্ভাবন করে। ভারতীয় প্রতীকের সহিত অসুরদিগের প্রতীকের অসীম পার্থক্য। Senitic দিগের এই পক্ষসংযোগের ভাব ভারতীয়, Greek বা Roman কোনও চিত্রের আদর্শেই দৃষ্ট হয় না।

রোমকজাতি অতি প্রাচীনকাল হইতেই সভ্যতা লাভ করিয়াছিল এবং চিত্রকলা, দর্শন শাস্ত্র ও বহু বিদ্যায় উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। ইহাদিগের উপাস্য ছিল গৃধ্ররাজ (Horus)। ব্যোম বা আকাশকে ইহারা পক্ষী বলিয়া কল্পনা করিত। শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ ইহার দুই ডানা তারকামণ্ডলী ইহার পালকবিশেষ এবং গৃধ্ররাজ শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষকে যথাক্রমে গ্রাস ও উদ্গার করিতেছে। এইভাব লইয়া তাহাদের প্রতীকের উৎপত্তি এইজন্য দীর্ঘচঞ্চু ও দীর্ঘনাসিকা তাহাদের সকল বিগ্রহে দেবভাব ব্যঞ্জক। অসুর জাতির ভিতরে দুই পক্ষ যেমন দেবভাবের পরিচায়ক, রোমক জাতির ভিতরে দীর্ঘ্যচঞ্চু তেমন দেব-ভাবের পরিচায়ক।

Romak
রোমক বা
ইজিপ্সিয়ান
জাতিদের চিত্রের
আদর্শ

এই স্থলে বলা আবশ্যক যে ভারতীয় প্রতীকের প্রাচীনকালে বাহুর বাহুল্য ছিল না। সাধারণতঃ দুই হাত দুই পা থাকিত কিন্তু পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৬।৭ শতাব্দী হইতে বেশ দেখা যায় যে ভারতীয়েরা দেবত্ব জ্ঞাপন করাইবার জন্য হস্তের সংখ্যা বাড়াইতে লাগিল। প্রথমে চতুর্ভুজ তৎপরে ষড়ভুজ অষ্টভুজ, দশভুজ পরিশেষে হয়ত বহুভুজও হইতে পারে। ইহা নিতান্ত আধুনিকভাব, পুরাতন ভাবের সহিত কোনও সম্পর্ক নাই। বোধহয় জাতির মস্তিষ্ক যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, চিন্তশক্তি যখন ক্ষীণ হইয়া গেল, তেজোময় অনন্তভাব ধারণা করিবার আর সামর্থ্য রহিল না তখন হইতেই বাহুর বাহুল্য সন্নিবিষ্ট হইল। রোমক জাতির ভাব স্বতন্ত্র। তাহাদের প্রতীক আলোচনা করিতে হইলে তাহাদের দর্শনশাস্ত্র ও জাতীয় ভাবধারা সম্যক অবগত হওয়া আবশ্যক।

গ্রীকজাতি সভ্যতা হিসাবে খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রতীকের ভিতরেও জাতীয় জাগরণের ইতিহাস ও জাতীয় ভাবধারা সন্নিহিত। অল্প সংখ্যক গ্রীক এক পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতে গেল, তথায় অসভ্য বর্ব্বর জাতি তাহাদের উপনিবেশ অবরোধ করিয়া রাখিল। সর্ব্বদা দ্বন্দ্ব, আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া গ্রীকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। দেশবাসীদিগের মধ্যে বিশেষতঃ যুবকদিগের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় না করিলে আত্মরক্ষা হয় না। দেহ সম্যকরূপে পরিপুষ্ট, দৃঢ় ও সুঠাম না হইলে অস্ত্র সঞ্চালন সম্পূর্ণরূপ প্রদর্শন করা যায় না এ জন্য জাতির যুবক মণ্ডলীর ভিতরে বিশেষ ভাবে দৈহিক বল বৃদ্ধির জন্য হারকিউলিস্ (Hercules) এক দেবতার আবির্ভাব হইল। সেই দেবতার বীরত্ব ব্যঞ্জক মূর্ত্তি বীর যুবকদিগের শক্তি চর্চ্চার আদর্শ হইল। গ্রীক প্রতীকে আমরা দেখিতে পাই দৃঢ়িষ্ট, বলিষ্ঠ, সুঠাম ও পূর্ণাঙ্গ শারীরিক শক্তি যেন পরিস্ফুট হইতেছে। যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব করিতে যেন সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু উচ্চাঙ্গের মনোভাব তাহাদিগের ভিতর বিশেষ কিছু পরিলক্ষিত হয় না। ভারতীয় প্রতীকের বৈশিষ্ট হইতেছে উচ্চাঙ্গের মনোভাব নানা প্রকারে ব্যক্ত করা। সেই ভাব বা আদর্শের অনুযায়ী দৈহিক ভঙ্গী বা পরিবর্ত্তন দেখান হইয়া থাকে। মন উর্দ্ধতনস্তরে উঠিলে দেহ কিরূপ সূক্ষ্ম, কৃশ ও অন্যভাবের হয় তাহাই দেখান হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রীকদিগের প্রকৃতিতে ভারতীয় মনোভাব বিকাশক কোনও লক্ষণ পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। কেবলমাত্র দৈহিক বল ও শরীর চর্চ্চার নানা আদর্শ পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয়েরা মনের উন্নতিকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আবহমানকাল সকল কার্য্য করিয়াছেন। গ্রীক বা হেলেনিজেরা শরীররক্ষা, শরীর চর্চ্চা, শরীর সৌষ্ঠব, শরীরের উন্নতি এই লক্ষ্য করিয়া সকল কার্য্য করিয়াছেন। এই জন্য ভারতীয় ও গ্রীকদিগের ভিতর বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শনশাস্ত্রে উভয়েরই বিশেষ পার্থক্য আছে। ভারতীয়েরা অন্তর্নিহিত ভাব লইল, গ্রীকরা বাহিরের আবরণ বা দেহকেও গ্রহণ করিল। এজন্য ভারতীয়দিগের সহিত গ্রীকদিগকে একভাবে দর্শন করা উচিত নয়। ধ্যানের উচ্চস্তরের কোন আকার গ্রীকদিগের ভিতর নাই। কেবলমাত্র শারীরিক বলবীর্য্য প্রদর্শন করাই ইহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্য পুষ্ট অবয়ব ও অঙ্গসৌষ্ঠব তাহাদের প্রতীকে পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় প্রতীকের সহিত এ আদর্শের কোনও সামঞ্জস্য নাই। একজাতির আদর্শ দিয়া অন্য জাতিকে [illegible]

গ্রীকজাতির
চিত্রের আদর্শ

করা অসঙ্গত। গ্রীকজাতির পক্ষসমর্থকগণ ভারতীয় প্রতীককে যেরূপ হীন চক্ষে দেখিয়া থাকে ও কুৎসা করিয়া থাকে, ভারতের পক্ষসমর্থকগণও গ্রীক প্রতীককে সেইরূপ বালকোচিত উচ্চভাববিহীন বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে, জড়বাদিদিগের শিল্প নৈপুণ্যমাত্র দেবভাবের কোনও লক্ষণ নাই বলিয়া থাকে। উভয় জাতির মধ্যে নিরন্তর এই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতির ভাবের বৈশিষ্ট না জানিলে শিল্প নৈপুণ্যের মাধুর্য্য উপলব্ধি হয় না।

রোমান জাতি অতিশয় চঞ্চল প্রকৃতির ছিল। রাজ্যবিস্তার ও রাজনীতির অনুশীলন করা ইহাদের জাতির লক্ষ্য ছিল। গণসমূহকে কিরূপে সম্ভাষণ করিতে হইবে, গণসভা (Senate) কে কিরূপ যুক্তিতর্ক দিয়া আহ্বান করিলে নিজ মত সমর্থিত হইতে পারে এই সবই ছিল তাহাদের বিশেষ শিক্ষণীয়। রোমান প্রতীকে আমরা দেখিতে পাই যে বক্তা বামহস্ত উত্তোলন করিয়া সম্ভাষণ করিতেছে, বামদিকে মুখ ফিরাইয়া শক্তিপ্রভাবে আপন মনোভাব প্রকাশ করিয়া কথা কহিতেছে। বাম-

রোমান জাতির আদর্শ

দিকে মুখ ফিরাইয়া কথা কহিলে যুক্তিতর্কের দৃঢ়তা জন্মে, বক্তারা আজিও উত্তেজিত হইয়া গণবৃন্দকে যখন সম্ভাষণ করেন তখন সর্ব্বদাই বামহস্ত সঞ্চালন করিয়া থাকেন এবং বামপার্শ্বে বক্রভাবে হেলিয়া সম্বোধন অভিভাষণ করেন কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ডানদিকে ফিরিয়া কথা কহিলে বক্তার সেইরূপ উত্তেজনা দেখা যায় না। রোমান দিগের পক্ষে এইটাই বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়, বাকি অনেক অংশ তাহারা গ্রীকদিগের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করে এবং গ্রীক শিল্পীদের দ্বারাই সব আলেখ্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভারতীয় ভাব হইতে স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং গতি ও ভিন্ন মার্গ হইয়াছিল। ক্ষিপ্রমনোভাব, চিত্তের দৃঢ়তা ও অপরের উপর প্রবল আধিপত্য বিস্তার এই সকল ভাবই রোমান প্রতীকে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়। কারণ রোমানরা সর্ব্ববিজয়ী ও অর্দ্ধ পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা ছিল। ভারতীয়দিগের নম্রভাব তাহাদিগের প্রতীকে দৃষ্ট হয় না। যে যে জাতি যে যে প্রতীকের নির্ম্মাতা সেই সেই জাতির ভাবই তৎপ্রতীকে অন্তর্নিহিত থাকিয়া দর্শকের নিকট নির্দ্দিষ্ট করিয়া ঘোষণা করে।

সুরের আলেখ্য

শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত

বড়পূজার কদিন আগেকার কথা।

রাধে যুগীর টানাটানির সংসার। ছোট একটা দোকান। জিরে গোলমরিচ মশলটা আসটা থাকে, দুচারটা একপয়সা দামের বাঁশী, একখানা গায়ে মাথা নিকৃষ্ট সাবান—গন্ধ তেলের ছোট্ট শিশি একটা। এমনি আরও চার রকমের বেসাতি।

টিনের বাক্সে ভরে নিয়ে রাধে যুগী হাটবারে হাটে যায়, অন্য দিন গ্রামে গ্রামে ঘু.র বেড়ায়। দুচার পয়সা বিক্রি হয়, তাতেই সংসার—তা চলেছে বৈকি, দিনত আর বসে থাকেনা।

পূজা এল। গ্রামের পাটশালাটা বন্ধ হয়ে গেছে—আধক্রোশ দূরের মাইনার স্কুলটাও। রাধে যুগীর বড় টানাটানি। মেয়েটার এইবার বিয়ে দিয়েছে। মেয়েকে কাপড়, জামাইকে ধুতিচাদর আর এক জোড়া জুতা দেওয়া হয়েছে। তাতেই হাতের জমান টাকা সব ফুরিয়ে গেল। জুতা জোড়া না দিলেও চলতো। এমন নয় যে তাদের মত অবস্থার লোকেরা জুত পায় দেয়, এমন নয় যে না দিলে মনোমালিন্য হতে পারত। রাধে তবুও দিয়েছে। পাঁচজন ভদ্রলোকের মধ্যে বাসকরে—দেখছেত সব—তাছাড়া মেয়ে ঐ একটাই।

জুতোজোড়া প্রথম প্রথম দুএকদিন হয়ত জামায়ের পায়ে উঠবেও। তারপর চালের বাতায় গোজা থাকবে। সেখানে শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠবে। শেষে হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হবে—তার খোজই হবেনা। হয়ত কুকুরটাই বা কেটেকুটেই একাকার কোরবে।

সংসারে লোকজন বেশী নেই। একটা ছেলে গিন্নি আর নিজে। তা আর কারো জন্য কিছু কেনা হয়নি। ইচ্ছা করে যে হয়নি তা নয়, টাকার যোগাড় হয়ে ওঠেনি। তবে কদিন যদি দিন নাই রাত নাই দোকান নিয়ে ঘোরা যায় তাহলে হয়তো টাকার যোগার হয়। ছেলের একখানা কাপড় আর গিন্নির একখানা—তার নিজের কিছু লাগবেনা, ওরা পরিলেই হলো। তা গিন্নিটার কি যে মতি গতি, বলে কিনা তোমার একখানা, বিশুর একখানা কেনো, আমি বুড়ী মানুষ, আমার কি ও সব সাজে। শোনো কথা? ওরা গিয়ে—,ছঃ, বছরের দিনে ওরা না পরলে কি চলে! গিন্নিটার ঐ এক দোষ। তবে এক মুস্কিল আছে। যা বিক্রী হবে সবদিয়ে যদি কাপড় কেনা হয়, তাহলে দোকানের জিনিষ যখন ফুরিয়ে যাবে তখন? কি দিয়েই বা আবার সব কেনা হবে। তা যাকগে, একটা কিছু তখন হবেই। পূজার দিনে ছেলেটা বৌটা একখানা নতুন কাপড় পরবে না একটু ভাল খাবেনা, একি হয়! আগে জমিদার বাড়িতে পূজা হত। অষ্টমীর দিনে কত খাওয়া দাওয়া হত ওখানে ভদ্র, অভদ্র গরীব গুরবো সবাই মিলে— কি ফুর্ত্তিই ছিল। আহা, কি দিনই গেছে। এবার কি করে যে কি হবে। এখন আর কিইবা আছে, সবইতো উঠিয়ে দিয়েছে। তা দিকগে, খাওয়ার জন্য এত আর কি ভাবনা! সাবানখানা সে বেচবেনা দশমীর দিন ছেলেকে মাথিয়ে সাহেব কোরবে, তেলটুকু ওর চুলে দেবে, কত গন্ধ বেরোবে! তারপর ছেলের হাতধরে মেলায় যাবে, ঠাকুর দেখবে, বিসর্জ্জন দেখবে। কদমা বাতাসা কিনলেই হোলো, তাই কত খেতে পারবে ওরা।

এবার সে পারলে না, আসছে বার ছেলে বৌকে কত জিনিষ দেবে গিন্নিটায় কিযে দোষ, কিছু কিনে দিতে গেলেই বোলবে—তুমি আর বিশু নাও। এবার প্রথম থেকেই সে রাত দিন বেচা কেনা করবে, অনেক টাকা জমবে তা হলে, সেই টাকা দিয়ে আসছে বার ছেলের জুতো, মোজা, কোট, পাজামা টুপি কিনে দেবে, গিন্নির কাপড় দেবে, সেমিজ দেবে, আরও কত কি দেবে। ঘরখানার উত্তরের বেড়া পড়ে গেছে, চালের খড় খসে খসে শেষ হোয়ে এল প্রায়। সেই সব সে সারবে। আরও কত কি করবে।

রাধে যুগী বেসাতী বোঝাই বাক্সটা ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়ে,—গ্রামের পথে।

নবীন ডাক্তারের অবস্থা ভাল। বাপঠাকুদ্দার জমান অনেক টাকা, জমিজমা লাঙ্গল গরু। একছেলে মাষ্টারি করে, আর একটা পড়ে। নিজে সে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। আর কিছু না হক তেল লবনের খরচটা ওতেই চলে যাচ্ছে।

ছেলেদুটো আজ বাড়ি এসেছে। চিঠি না দিয়েই চলে এসেছে। তা ওদের কি যে স্বভাব—একখানা চিঠি পর্য্যন্ত দিয়ে আসতে পারেনা গেঁ গায়ের ভিতর এ অসময়ে খাওয়ার জিনিষ ভাল মিলবে কোথা। হাটবারতো কাল। সহরে থাকে চিরকাল, এসব যা তা খেতে পারবে কেন? তা ঘরে অবশ্য চিকণ চাল মুগের ডাল তোলা আছে। কিন্তু মাছ চাই পাঁচটা তরকারী চাই, এসব না হলে পাতের কাছেই বা দেওয়া যাবে কেন?

বাড়ীর ছেলে বাড়ি এসেছে, খাওয়ার জিনিষ ভাল না হলে যে বিশেষ কিছু তা নয়। হাসি তামাসায় গল্পে গুজবে ওরা হয়ত জানবেই না যে কি দিয়ে খেল। ভাল মন্দ এসব কথা হয়ত ওদের মনেই হবেনা।

বড়বৌমার গরদের কাপড় খানা নাকি ভাল হয়নি। তা ছেলেরা কিনেছে, ওরা আর কি চেনে। এবার পৌষ মাসে সবাই মিলে কলকাতা যাবো, তখন না হয় আর একখানা—তা আর কি করা যাবে। বড় বৌমা শান্ত মেয়ে ভাল কাপড়খানা নিজের হাতেই ছোট বৌমাকে দিয়েছে কিন্তু হলে কি হয়, নিজের খানা খারাপ হলে মনটা একটু নরম তো হবেই। তা এমন যে কিছু তা নয়। কদিনই বা ওখানা পরবে। কোথায় [illegible] হয়ত দুএকদিন, কিম্বা ঐ রকম আর কোন [illegible]

খানি বেশী দিন বাক্সের মধ্যেই বন্ধ থাকবে, সেই অবস্থায় হয়ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুরস্ত্রীরা পরে ওটা জোরিয়ে দেবে। না হয়ত বা ভদ্রঘরে ঐ জিনিষ পরা উঠে যাবে--ঝি টি কেউ বখশীষ পাবে। তখন অবশ্য আর ওর জন্য দুঃখ থাকবে না। কিন্তু তা হলে কি হয়, কেনার সময় লোকে দেখে শুনেই কেনে!

বড় ছেলেটার কিযে বুদ্ধি! এ বিষয়ে নিয়ে শুনি মাষ্টারী করে। বলে কিনা, দুএকদিনের জন্য যা, তার জন্য এত আরকি! হুঁঃ, এও কি একটা কথা!

হ্যা সেই জমিটার কথা। যদি কেনা হয় তাহলে মন্দ হয় না। ছেলেরা এসেছে, ওরা কি বলে শোনা যাক্‌। যা হোক মা ষষ্ঠীর ইচ্ছায় এখন বড় হয়েছে, ওদের বলা দরকার। ওদের জন্যইত কেনা—ওরা দেখুক শুনুক, পছন্দ হয়—সে যা হয় করলেই হল।

সে আর কদিনইবা। এখন পথচেয়ে বসে থাকা ভিন্ন আর কিছু নয়। এইত দেখতে দেখতে মদন গেল, বিপিনদা গেলেন, সাহাদের কর্ত্তা ও তারই বা আর কদিন ওদের সংসার এখন ওদের বুঝিয়ে দিলেই হল। ছোটছেলেটার পড়াতো এই বছরই শেষ হবে। ওর একটু ভাল রকম কিছু হোক সে যেন দেখে যেতে পারে। আহা, দুইভায়ে রোজগার করবে! তখন নাতিপুতি হবে, সাহাদের কি খাসা ছেলে হয়েছে,—না? তা তার নাতি নাতিনিরা তার চাইতেও ভাল হবে। সে তাদের বুকে করে জড়িয়ে থাকবে দিনরাত।

ও বৌমা, একটা কথা—তোমার খোকোনকে কিন্তু আমি এক দণ্ডও চোখ ছাড়া করতে পারব না, তা বলে রাখছি এখন থেকেই বাবু—হ্যাঁ।

নবীন ডাক্তার ভারি হাসে।

•

জমিদার বাড়ীতে আগে পূজা হত, কদিন ধরে খাওয়া দাওয়া হৈ হায় লেগেই থাকতো। কর্ত্তা মারা যাওয়ার পর আর একটা বছর বোধ করি হয়েছিল, পরে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন ছেলেরা মালিক, তারা কয়েক বছর শুধু গরীব খাইয়েছিল। তারপর তাওযে কবে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে সে খবর গেরস্থ ঘরের লোকেরা বিশেষ জানে না।

বড়ছেলে ওকালোতি পাশ কোরেছে, সেই জমিদারী চালায়। লোক সে ভারি কড়া কিন্তু তাই বলে যে অত্যাচারী তা নয়। মেজোটার কিছু হল না, দিনরাত ছবি আঁকছে। ছোট ছেলে এবার এম, এ, দিয়ে, ব্যারিষ্টারী পড়তে যাবে।

দিনকাল কি আসছে তাত দেখ্‌তে হয়, এখন কি আর ওসব বাজে খরচ করলে চলে! আগে থেকে সাবধান হলে পরে আর ভুগতে হয় না। এইত দেখতে দেখতে কতগুলো জমিদার ডুবে গেল, ও সব বোনেদী চালে কিযে ছাই আছে! পূজা পার্ব্বণটা খাওয়ান দাওয়ান বাধ্য হয়ে উঠিয়ে দিতে হয়। ওসব কাজ যে মন্দ তা নয়—মনে বেশ উৎসাহ পাওয়া যায়। কিন্তু হ'লে কি হবে দিনরাত গণ্ডগোল—একরাশ টাকার শ্রাদ্ধ—একি যা তা হল! হ্যাঃ, ও বাড়িতে হল, দুদিন দেখা গেল, বাড়িতে স্ফুর্ত্তি করে খাওয়া দাওয়া হল—এই বেশ।

বড় মেজোর গ্রাম সয়ে গেছে। ছোটটা একটু আহ্লাদে গোছের, বাবু হয়ে পড়েছে তার এখানে বিশেষ ভাল লাগেনা।

আর উপযুক্ত ঘর কৈ বা আছে গ্রামে,—যার তার সাথেতো কথা হতে পারে না? এক্ বোসেরা আছে,—তা তাদের আবার ছেলেই নেই।

বৌদিরা অবশ্য কলকাতার বড় ঘরের মেয়ে সব, ওদের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা গল্পগুজবে না হয় সময়টা কেটে যায়। বিয়ে করবনা বলা গেল, বিলেত থেকে মেম নিয়ে আসবো ভয় দেখান গেল—তা মেজো বৌদি নেহাৎ যদি না ছাড়—কি নাম বোল্লে তোমার বোনটির অনিলা? বিশ্রি যে ওনামটা—তাহোক, দিয়ো না হয় একদিন ঘুরিয়ে—গাদা গাদা যে গয়না কচ্ছ তোমরা, একসেট্‌ আমার তার জন্য কেরে রেখ ঐ সঙ্গে—বাঃ, তখন তো তোমরাও নেবে সেও নেবে! এখন তোমরা নিচ্ছ সে পাবে না? যাও কথা ব'লব না—নতুন বাড়িটা কোথায় হচ্ছে? প্ল্যান্‌ করলে কে?—তা দেখ বড়বৌদি, তোমার পায়ে পড়ছি, এক কাজ কর ভাই—বলাত যায় না, যদি মেম একটা ঘাড়ে করেই আনি—ঠিক ধরেছ দাদাকে বলে করে একটা ব্যাংলো প্যাটানের—সত্যি বলছি

বড়দাদার মাথা খারাপ হয়েছে আবার জমিদারী কেন কিনেছেন শুনি? ওর চাইতে কলকাতায় যদি কখানা কখানা বাড়ি কিনে রাখেন, হুঁ:—

তা বৌদিদের সঙ্গে সময়টা যাহোক করে কেটে যায়। কিন্তু সব সময় ওসব ভাল লাগবে কেন। মাঝে মাঝে বোসেদের বাড়িতে মিস্ গীতা থাকে। ওর সঙ্গে গল্পে সময় বেশ কাটে। ওই তো বোসেদের সমস্ত সম্পত্তি পাবে। ফাইন্ গার্ল—মারভেলাস। বেথুনে পড়ে, এবার থার্ড ইয়ার হয়েছে এক জায়গায় থাকি, আলাপ পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু দেখা হবার উপায় নেই। কি যে ওদের হোষ্টেলের নিয়ম! এবার যাহোক করে ভিজিটার্স লিষ্টে নাম লিখিয়ে নিতে হবে কিন্তু।

সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। ইঃ, কি ময়লা বাবা রাস্তাটা, এখানে কি মানুষ টিকতে পারে? অসিতরা বোধ হয় রাঁচি হিল-এ লাফালাপি করছে, হয়তো বা হুঁড্রু ফল্স্ এর মুখে বসে বসে রামধনু দেখেছে। ছুটিটা তারা তাহলে এন্‌জয় করলে খুব! শৈলেশটাকে একবার এখানে পেলে হত। রাস্কেল্ সব সময় গ্রামের প্রশংসা করবে। এই কাদা বন দেখলে—ননসেন্স।

গীতা প্রথম বার তার সঙ্গে এক রকম কথাই বলেনি। আর বছর দেখলাম খুব মিশলো। কি স্মার্ট,—ভারি হাসাতে পারে। সার্টের কলার নিয়ে কি ঠাট্টাই করেছিল সত্যি, কলারগুলো বড্ড খারাপ ছিল। আসলে সে কাটারটার যে এনাটমি জ্ঞান নেই, তার হবে কি। এবার কিন্তু—তা আসেইনি বোধ করি।

আচ্ছা ওতো বিলেত গেলেও পারে। বাপের এক মেয়ে, সম্পত্তিটাও পাবে--ফাইন্ হয় কিন্তু তাহলে, না?

আরে, ঘুরতে ঘুরতে দেখছি বোসদের বাড়ির দিকে এসে পড়েছি। সত্যি, ইচ্ছা কোরে আসি নি। পথ ঠিক নেই, কোন পথ ধরতে কোন পথে পথে এসেছি বোধ করি।

সে সোজা রাস্তা দিয়ে চলে যায়, বোসেদের বাড়ির দিকে চেয়ে পর্য্যন্ত দেখে না। একটা ভয় না হয় লজ্জা কি যেন বাধা দিচ্ছিল। পাঁচ মিনিট কিম্বা ছয় মিনিট পরে আবার ঘুরে এই রাস্তা দিয়ে আসে। তারপর আরো কিছুটা সময় বাড়িটাকে কেন্দ্র করে ঘোরা ফেরা করতে করতে, এক সময় হঠাৎ বোসেদের দরজায় অচল হয়ে পড়ে।

"থাম্বা থা হুজুর।" মিস্ গীতা মিত্র এসেছে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর দারোয়ান দিলে সে আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতর ঢোকে।

———

এ সংখ্যায় কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ বুদ্ধদেব বাবুর প্রবন্ধ প্রকাশ করা গেল না। আগামী সংখ্যায় বুদ্ধদেব বাবুর, দিলীপ-কুমারের ও আশালতা দেবীর পত্রাদির, উত্তর প্রকাশিত হইবে।

‘পুরুষ’ প্রগতি
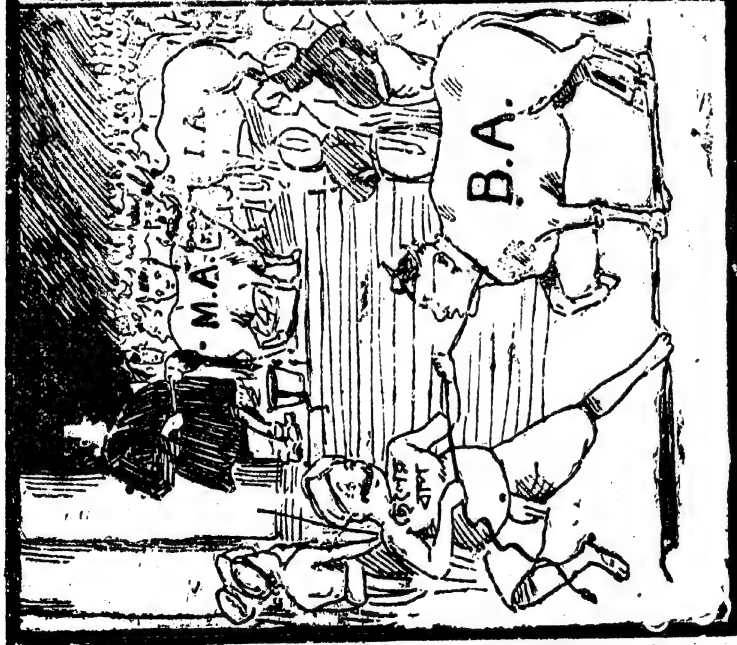
Bridegrooms market—
এখানে সস্তা ‘ও সুলভে’ ‘বর’ পাওয়া যায়

পুরুষত্বের পরাকাষ্ঠা

‘বেদনার মমতাজ’

শ্রীচুনীলাল বন্দোপাধ্যায়

বেদনায় গড়া বেদনায় ভরা মর্ম্মের এই ছবি।
অনুরাগে রাঙা রক্তে আঁকিল উন্মাদ কোন কবি?
বিরহের এই শ্বেত শতদল সান্ধ্য আঁধারে করে ঝল মল
অবাক নয়নে চায় এর পানে গ্রহ তারা শশি রবি,
পাথরে পাথরে কে আঁকিল এই তিলোত্তমার ছবি?

কাঁর আঁখিজল হে তাজ মহল গড়িল তোমার কায়া?
পাথরের গায় কে রচিল হায় “ইন্দ্র ধনুর” মায়া?
কত না পাপিয়া কত বুল বুল আকুল হেনা ও বকুল
কত শরতের চাঁদের কিরণে কত সন্ধ্যার ছায়া,
কত মধু যামিনীর মিলনে বিরহে গড়িল তোমার কায়া!

স্বর্গ হইতে পারিজাত এনে এই ধরণীর গায়।
ফুটায়ে কে দিল “রজনী গন্ধ্যা” সন্ধ্যার মধুবায়।
পাথরে পাথরে এই মায়াপুরী বর্ণে বর্ণে এই লুকোচুরী
এই মধু মাধুরী এই মায়া মৃগী রাখিল কে বেঁধে হায়।
ফুটায়ে কে দিল “রজনী গন্ধ্যা” সন্ধ্যার মধু বায়॥

মনি দীপ জ্বালা অতল আঁধার হায়রে পাতাল পুরী।
কোন্ অপ্সরী অপরূপ ধন্নি সহসা উঠিল ফুড়ি।
প্রথম আলোকে বাড়াইতে মুখ মূক হয়ে আছে হইয়া সে মূক
সেই হতে যেন রয়েছে হেথায় আধো ফোটা এই কুঁড়ি।
সাগর হইতে উর্ব্বশী এসে আজে কি কুড়ায় নুড়ি?

কে রচিল হায় অমর ভাষায় কোন্ সে পিয়ার লেগে?
ফটিকের এই “বিরহ কাব্য” ছন্দের বেগে বেগে।
পাথরে পাথরে এ মহা ভারত এই সুধা আর এই সরবত
মিটাতে নিখিল চিত্তের ক্ষুধা যুগে যুগে রয় জেগে।
ফটিকের এই বিরহ কাব্য ছন্দের বেগে বেগে॥

মোগলের রাজলক্ষ্মী গিয়াছে মোগল রাজ্য ছাড়ি।
কিছু দুর গিয়া আছে দাঁড়াইয়া হেরিতে কবর তারি।
সেই হতে সে যে সেই খানে হায় নত মুখে আছে চেয়ে
যমুনায়—
ছল ছল চোখে ঝল মল করে একটী বিন্দু বারি।
ছাড়িয়াও যেন মোগল লক্ষ্মী যায়নি আজিও ছাড়ি॥

পিয়ার বিরহ বেদনা বিদ্ধ মর্ম্মের এই বানী
শুভ্র হইয়া উর্দ্ধে উঠেছে মহিমার মহারাণী।
ভস্মের মাঝে অগ্নি যেমন লুকাইয়া আছে পেয়ে আবরণ
রয়েছে তেমনি গর্ভে ইহার অগ্নি কনিকা খানি।
উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া শুভ্র হয়েছে জানি।

পিয়ারে অমর করিতে সে নিজে বিরহের বেগে বেগে!
অমর হইয়া পিয়ারি সহিত দেহে দেহে আছে লেগে।
সতী সব মাথে করিয়া ধারণ রজত শুভ্র গিরির মতন
পাথর হয়েছে মহাদেব যেন গৌরীর প্রেম মেগে।
অশ্রু ধৌত মহিমার এই স্বর্গে রয়েছে জেগে!

নারীর কণ্ঠে পড়াইয়া দিল হায় কোন্ মহারাজ।
সাম্রাজ্য তাঁর বিনি ময় করি মনি ময় এই সাজ!
রুদ্ধ করিয়া কালের দুয়ার মহিয়সী করি পিয়ারে তাঁহার
শূন্যে শূন্যে করিল প্রচার নারীর মহিমা আজ।
নারীরে ধন্য করিল যে এই “বেদনার মমতাজ”!

যমুনার কালো জলে যেন হায় বহিছে শোকের গীতা।
নিখিলের প্রেম যজ্ঞের ওযে মানসী স্বর্ণ সীতা।
বিরহের এই সাগরের কুলে নিখিল চিত্ত উঠিতেছে দুলে
জ্বলিতেছে যেন যুগে যুগে এই মহিমার রাজ চিতা।
নিখিলের প্রেম যজ্ঞের ও যে মানসী স্বর্ণ সীতা॥

পিয়ার বেদনা কে দিল জাগিয়ে বিশ্বের চোখে মুখে।
জীবনেরে দিল করিয়া মধুর জীবনের সুখে দুখে।
স্বর্গ হইতে হায় মমতাজ চেয়ে দেখ ওরে চেয়ে দেখ আজ
তোদেরি প্রেম বিরহ মিলন বাজিতেছে বুকে বুকে
ধরণীরে দিল শোক ময় করি তোমাদেরি সুখে দুখে।

সুখ যদি যায় থাকে কেন হায় অতীতের সুখ স্মৃতি।
ঝঙ্কার টুকু রয়ে যায় কেন থেমে যদি যায় গীতি।
গিয়াছে রাজ্য আছে ইতিহাস পাথরের এই দীর্ঘ নিঃশ্বাস
সকরুণ করি নিশার আকাশ মৌন কাঁদনে নিতি।
সব যদি গেছে ও কেন রয়েছে সমাধির এই গীতি॥

বৃহত্তর বাঙলা সাহিত্য লাভের একটি সহজ পন্থা

—শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ, এম্-এ,

সে আজ প্রায় এক যুগের কথা। তখন ইংরাজী ১৯১৭ সাল, বাঙলা ১৩২৪। ঐ বৎসর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তথায় প্রথম শুভপদার্পণ করেন। সেইদিন কবিগুরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে জাপানের উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, জাপানে মাতৃভাষার মধ্যদিয়া য়ুরোপীয় শিক্ষা কিরূপে আপামর সাধারণের মধ্যে বিতরণের উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, আর কিরূপে মাতৃভাষার মধ্যদিয়া তাহারা বিশ্বের জ্ঞানের রস পাইয়াছে ও নূতন যুগের সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্যভাব সমস্ত তাহাদিগের দ্বারে আসিয়া পড়িয়াছে ও সমস্ত জ্ঞানের সম্পদ্ জাপানের চিত্তের মধ্যদিয়া উপনীত হইয়াছে।

ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন লাইব্রেরী হলে কবিগুরু "শিক্ষার বাহন-বিষয়ে" যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতেও এই একই বাণীপ্রচার করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, "আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি, তা'র সমস্ত সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না।"

এই যে নিজের ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষালাভ করা, তাহার প্রধান সহায় হইতেছে বিদেশী সাহিত্যগুলীর ভাষান্তরী করণ বা চলতিভাষায় অনুবাদ। প্রেসিডেন্সি কলেজে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কবিগুরু এইরূপ বলেন, 'আমি সেখানে গিয়ে দেখ্‌লুম্ ছোট ছোট অল্পবয়স্কা দাসী জাপানী ভাষায় এমন সবই পড়ছে যে আমাদের শিক্ষিত লোকও সে সব পড়ে না। আমার বাড়ীর বালিকা দাসী যখন বল্লে যে তার 'সাধনা' পড়্‌তে ভাল লাগে, তখন বিস্মিত হয়ে ছিলুম্। তারপর যখন সে দেখালে যে সাধনার' জাপানী অনুবাদ তার হাতে আছে, তখন আরও বিস্মিত হলুম্।" কবিগুরু বলেন যে, এইরূপে জাপান "মাতৃভাষার মধ্যদিয়া বিশ্বের জ্ঞানের রস পাইয়াছে।" অনুবাদের আবশ্যকতা আমরা জাপানের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারি।

সার্ব্বজনীন শিক্ষার উপর অনুবাদের যে প্রভূত প্রভাব আছে, সে বিষয়ে আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে; কিন্তু প্রসঙ্গ ক্রমে সে বিষয় যতটুকু বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান যে বিশ্বসাহিত্যের সহিত সংযোগ রাখিতে হইলে, অনুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয়। যদি সাহিত্যকে আমরা নিজ নিজ ক্ষুদ্র দেশের গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ রাখিতে না চাহি, তবে আমাদিগকে বিশ্বসাহিত্য হইতে অনুবাদ আরম্ভ করিতে হইবে। জগতের যে কোন সাহিত্যের বিষয় আলোচনা করিলে জানিতে পারা যাইবে, যে সেই সেই সাহিত্য কখনও নিজ নিজ দেশের সীমার মধ্যে থাকে নাই। আমাদের রাজভাষা ইংরাজীর বিষয়ই ধরা যাউক। ইংরাজী সাহিত্য যে পরিমাণে অনুবাদ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়াছে তাহা বিশেষজ্ঞ মাত্রেই জানেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথের যুগে ইংরাজী সাহিত্য-ক্ষেত্র গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের অনুবাদে "পরিপ্লাবিত" হইয়াছিল; সকল অনুবাদই যে উচ্চদরের ছিল তাহা নহে; কিন্তু তথাপি সেক্সপীয়র মার্লো'র উপর তাহাদের প্রভাব অল্পছিলন'; এমন কি এইরূপ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, অনুবাদ সাহিত্য ব্যতিরেকে মহাকবি সেক্স-পীয়রের কাব্যপ্রতিভা হয়ত বা সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়াই উঠিত না। আজ ইংরাজী সাহিত্য শুধু অতলান্তিক মহাসাগরের ক্রোড়ে ক্ষুদ্র ব্রিটেন দ্বীপের সাহিত্য নহে, ইহা জগতের সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার একটি কারণ ইংরাজের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতা হইতে পারে, কিন্তু উহা

পুরাকারণ নহে, ইংরাজের সাহিত্যও দিনে দিনে বৃহত্তর ব্রিটেনের সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। দেশবিদেশের বাণিজ্য সম্ভারে ক্ষুদ্রদ্বীপ ব্রিটেন যেমন এক স্বর্ণ ভূখণ্ডে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ দেশবিদেশের সাহিত্য সম্ভারে পরিপুষ্ট হইয়াও এ্যাংলো-স্যাক্সনগণের যৎসামান্য সাহিত্য আজ বিরাট ইংরাজী সাহিত্যর বর্ত্তমান বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে; অবশ্য ভূরি ভূরি মৌলিক রচনাও আছে; কিন্তু অনুবাদের প্রভাব যে ইংরাজী সাহিত্যের উপর প্রভূত তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

অনুবাদ আমাদের সাহিত্যের অঙ্গে নূতন রক্ত সঞ্চারিত করিয়াছে, আর এই নূতন রক্তের সঞ্চার না হইলে অনেক সময় সাহিত্য পুষ্টি অভাবে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে।

আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যও বলিতে গেলে অনুবাদের দ্বারাই এক প্রকার গঠিত (দীনেশ বাবু তাঁহার "সরল বাঙ্গালা সাহিত্যে") বলিতেছেন যে যদিও বাঙলা ভাষা মূলতঃ প্রাকৃতভাষা, কিন্তু তথাপি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বাঙলা ভাষায় এত অধিক অনুবাদ হয় যে অবশেষে এই প্রাকৃত ভাষাটি প্রায় সংস্কৃত হইয়া দাঁড়ায়। আর এই সংস্কৃত হইতে অনুবাদ আরম্ভ হয় মুসলমান বাদসাহগণের আদেশে ইংরাজী ১৩০০ সাল হইতে "যখন মুসলমানগণ আসিয়া বাঙলা দেশের অনেকটা অংশ দখল" করিয়া লয়। দীনেশবাবু এইরূপ লিখিতেছেন, "বাঙলা ভাষা এই সময় হইতে অর্থাৎ প্রায় ছয়শত বৎসর যাবৎ সংস্কৃত শব্দের দ্বারা পুষ্টিলাভ করিতেছে। এই ভাষা প্রাকৃত হইতে আসিতেছে এবং পূর্ব্বে ইহার নামও ছিল প্রাকৃত ভাষা। কিন্তু এই সংস্কৃত হইতে অনুবাদের দরুণ ইহাতে এত সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়া পড়িয়াছে যে কেহ কেহ ভ্রম করিয়াছেন যে উহা সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ('সরল বাঙ্গলা সাহিত্য," পৃঃ ১০৯)।

এইরূপে দেখিতেছি যে, যে ভাষা পূর্ব্বে প্রাকৃত ভাষার সামান্য একটি প্রাদেশিক শাখামাত্র ছিল, সেইভাষা অনুবাদ সাহায্যে সুসংস্কৃত ও সমৃদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় অনন্ত ভাণ্ডার হইতে ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া ইহা সামান্য প্রাকৃত ভাষার স্তর হইতে উর্দ্ধে উঠিয়াছে।

"দেবভাষা পৃষ্ঠে যা'র, কিসের অভাব তা'র;
কোন্ ভাষে কুঞ্জবনে কোকিল কুহরে,
নিবিড় জলদজাল ঢাকে অম্বরে?"

বর্ত্তমানকালে এক নূতনযুগ আমাদের দ্বারে জাগ্রত। এখন আর বাঙলার সাহিত্যিককে শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরাবৃত্তি করিলে চলিবে না। বহির্জগেতে যে কত অনন্ত বিজ্ঞানের নবারুণোদয় হইতেছে, অসংখ্য জাতির ধারা হু হু করিয়া আপনাদের গন্তব্য পথে বহিয়া চলিতেছে, অসংখ্য চিন্তার ধারার ঘাতপ্রতিঘাত হইতেছে, উত্থান পতন ঘটিতেছে, এ সকলের সহিত বাঙলার সাহিত্যিককে সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। শুধু বাঙলার আব্-হাওয়ার মধ্যে লালিতপালিত ও পুষ্ট হইলে বাঙলার সাহিত্য এই বিংশ শতাব্দীতে একটি সামান্য গ্রাম্য সাহিত্যে পরিণত হইবে। বহির্জগতের চিন্তা ধারার সংযোগ স্থাপন করিতে "অনুবাদ" যেরূপ সাহায্য করিবে, এরূপ সাহায্য আর কোনরূপ উপায় হইতে পাইব না।

একদিন যেরূপ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যস্রোত বাঙলা সাহিত্যের-স্রোতের সহিত মিলিত হইয়া ইহাকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ যদি বর্ত্তমান বিশ্ব সাহিত্য স্রোতের ধারাকে আমাদের বাঙলা সাহিত্যস্রোতের সহিত মিলিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা পুনরায় বাঙলা সাহিত্যের আর এক নূতনরূপ দেখিব। বিশ্ব সাহিত্যস্রোতের সহিত এই মিলন বর্ত্তমানযুগে সূচনা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু এখনও সেই ধারার প্লাবন আসিয়া মিলিত হয় নাই, শুধু অগ্রগামী এলোমেলো বারিধারা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যখন বিশ্ব-সাহিত্যের স্রোতো-ধারার প্লাবন বাংলার শ্যামলক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হইবে, তখন এক নূতনতর বঙ্গসাহিত্যের,—বৃহত্তর বঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে। আমরা এই নিবন্ধ একটি উপমা দিয়া শেষ করিব। এই উপমাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন বাঙলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরবাহাদুর লর্ড লিটন কলিকাতায় সংস্কৃত পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের সভা-পতিরূপে (মার্চ্চ ১৯২৭ সালে)—

"বাঙলা দেশের অধিকাংশ দুইটি বিরাট নদীর পলী মাটিতে গঠিত। দুই নদীরই জন্মস্থান সুদূর উত্তরে। একটি আসিতেছে পূর্ব্বদিক্ হইতে অপরটি আসিতেছে পশ্চিত দিক্ হইতে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহারা মিলিত হইল, অমনি তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইল। গঙ্গানদী কিন্তু ব্রহ্মপুত্রকে উদরসাৎ করে নাই, ব্রহ্মপুত্রও গঙ্গাকে উদরসাৎ করে নাই, কিন্তু প্রথমে পদ্মা নামে, পরে মেঘ্না নামে, একটি নূতন নদী ঐ উভয় নদী হইতেই আপনার জীবনী শক্তিলাভ করিল। দক্ষিণ বঙ্গ এই বিরাট নদীদ্বয়ের অসংখ্য শাখা-উপশাখা দ্বারা উর্ব্বর হইয়াছে, ইহার ভূমিখণ্ড শত শত যোজন হইতে আনীত ও যুগযুগ ধরিয়া সঞ্চিত উক্ত নদীদ্বয়ের শাখা-উপশাখার পলী মাটিতে গঠিত। ঠিক্ এইরূপে আধুনিক ভারতবর্ষও প্রাচীন সভ্যতা ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সংমিশ্রণে গঠিত হইতে পারে।"

আমরাও ঐ সুরে বলি যে, বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য দেশবিদেশের সাহিত্য ধারার সহিত মিশ্রিত হইয়া বাঙলার এক নূতনতর চিন্তাক্ষেত্র গঠন করিবে। বৃহত্তর বঙ্গ-সাহিত্য গঠন করিতে হইলে তাই আমাদর সর্ব্বপ্রথমে "অনুবাদের" আশ্রয় লইতে হইবে, "অনুবাদের" নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিলে চলিবে না। এই প্রসঙ্গে আমরা কবি কালিদাস রায় রচিত "বঙ্গবাসী" শীর্ষক একটি কবিতা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের নিবন্ধ শেস করিব—

"বেদ-বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র আপন অঙ্কে বহিয়া
পিয়ায়েছে তোমা সোমরস-ধারা, জ্ঞান ত্রিদিবের অমিয়া।

মহাভারতের জলধি অতল
চিন্তামণিতে ভরিছে আঁচল,
ঋদ্ধ করেছে রামায়ণী ধারা পতিত পাতকি-পাবনী॥
ইয়োরোপা তোমা আরতি করেছে দিব্য জ্ঞানের আলোকে,
নিশীথ ভানুর প্রেমমণ্ডন অর্ঘ্য পাঠায় পুলকে।
দূর কানাডায় জাগে বিস্ময়
মরুতে মেরুতে তব জয় জয়,
ইরাণ তুরাণ বসরাই গুলে সাজায় বিজয় তরণী॥
আজি কালিদাস ভবভূতি ভাস রুমী জামী গেটে দান্তে
হুগো মিল্টন ওমার হোমার মিলেছে ত্রিদিব প্রান্তে।
তব শির'পরে পুষ্প বরষে
করে কোলাকুলি প্রেমের হরষে।
তব গৌরব-নীতি-মুখরিত আজি দ্যুলোকের নবণী॥"
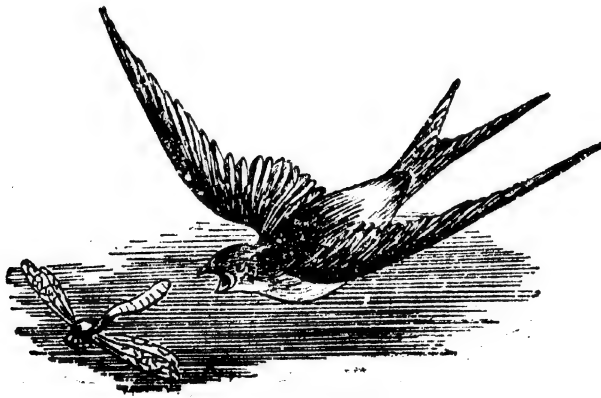
শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

[পূর্ব্বে আমরা পুষ্পপাত্রে বীমা সম্বন্ধে লিখিয়া আসিতেছিলাম কিন্তু নানারূপ কারণে আমরা উহা বন্ধ করিতে বাধ্য হই। পুনরায় এই শ্রাবণের সংখ্যা হইতে লিখিতে আরম্ভ করিলাম—এবার আমরা নিরপেক্ষ ভাবে লিখিতে চেষ্টা করিব যাহাতে পুষ্পপাত্রের সহৃদয় পাঠকবর্গের আন্তরিক উৎসাহে ও সাহায্যে আমাদের বীমা বিভাগ উত্তরোত্তর সাফল্যমণ্ডিত হয়—ইহাই তাঁহাদের নিকট আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।]

বীমা—আজকাল এই পৃথিবীতে প্রায় সকল জাতি শিল্পসাহিত্যে এবং নানারূপ কার্য্যে বড় হইয়া যা'র যা'র প্রাধান্য বিস্তার করিতেছে। উক্ত কার্য্যের মধ্যে বীমার একটী বিশেষ স্থান আছে। আমাদের দেশ জাতিগত ও ব্যক্তিগত ভাবে এই সকল কর্ম্মে কত পিছনে পড়িয়া আছে' উহা আমরা বুঝতে পারি। দারিদ্র্যইতো ইহার প্রধান অন্তরায়। নয় কি? কিসে আমরা জাতিগত ও ব্যক্তিগত ভাবে অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হইতে পারি তাহার নানারকম চেষ্টা চলিতেছে—বীমা ইহাদের একটী আসন লইয়া বসিয়াছে। বীমা জিনিসটী নূতন নয়। যিশুখ্রীষ্টের যুগ হইতে ইহা অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া আসিতেছে। যে যুগে রেল বা ষ্টিমার কিছুই ছিলনা তখন বীমার প্রসার ছিল। আজো যাহা লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন মধুময় করিতেছে—পীড়িতের হাহাকার—অন্নহীনের 'হা অন্ন' হা অন্ন' চীৎকার নিবারণ করিতেছে, বিশ্বের দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথকে সুগম কণ্টকহীন করিতেছে সে কোন মায়াময়, মোহন স্বর্ণকাঠি? সে এই বীমা। আমেরিকা কুবেরের ভাণ্ডার লইয়া আজ বসিয়া আছে—তাহার কারণ আর কিছুই নয়—তাহাদের দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে বীমা কোম্পানী। আমেরিকায় এমন লোক খুব কমই আছে যে বীমা করে নাই। কানাডা, গ্রেটবৃটেন প্রভৃতি সকল দেশেই বীমার বহুল প্রচার আছে

বীমার উপকারিতা

মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী মৃত্যু কখন কাহাকে গ্রাস করে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। মরণ যখন ধ্রুব সত্য তখন সকলকেই তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। যিনি সংসারের উপার্জ্জক যাঁর জন্য সংসার নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইতেছে তাহার জীবন বীমা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাঁহার মৃত্যুর পর শোক সন্তপ্ত পরিবার এক সঙ্গে অনেক গুলি টাকা পাইলে আশু ভয় ভাবনার অনেক লাঘব হয়। আমাদের এই দেশে জীবন বীমার সম্পূর্ণ প্রচার হয় নাই বলিয়া দেশবাসী এর উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

আমাদের দেশবাসী বর্ত্তমানে বৈদেশীক বিলাসীতায় মত্ত তাহারা তাহাদের দেশের বা নিজেদের আর্থিক দুর্গতির কথা একবারও ভাবে না। কিন্তু যখন তাহারা জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়ায়—ভাঙ্গনের কূলে বসিয়া সে হয়তো ভাবে অবিবাহিত কন্যার কথা নাবালক

...র কথা, আর অসহায়া পত্নীর কথা। কথায় বলে 'Life assurance is the cheapest and safest mode of making a definite and assured provision for ones family' আমাদিগের দারিদ্র পাপ দূর করিতে হইলে প্রত্যেককের জীবন বীমা করা উচিৎ।

প্রতিদেশের মাথাপ্রতি কতটাকার জীবন বীমা

পাশ্চাত্য দেশের মাথাপ্রতি কত টাকার জীবনবীমা এবং ভারতে কত তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

দেশের নাম	টাকা
আমেরিকা	৩,০০০৲
কানাডা	১, ৭০০৲
গ্রেটবৃটেন	১, ১০০
নিউজিলাণ্ড	৯০৯৲
অষ্ট্রীয়া	৬০০৲
নরওয়ে	৪৫০৲
সুইডেন	৪২৫৲
নেদার ল্যাণ্ড	৩৯০৲
ডেন মার্ক	৩০০৲
ভারতবর্ষ	৭৲

ইংরাজি ১৯৩১ সালে U. S A. তে মটর দুর্ঘটনায় প্রায় ৫০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতি হইয়াছে। এজেন্টদের ইহাতে শতকরা কত যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা জানিলে আরো বিস্মিত হইতে হয়।

জার্ম্মাণার মটর দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা

জার্ম্মাণীর বোর্ড অফ্ ষ্টাটিষ্টিকস্ হইতে জানিতে পারা যায়, মটর দুর্ঘটনায় ঐদেশে প্রায় ৬,০০০হাজার লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়—এবং প্রায় ৫০,০০০ হাজারের মত আহত হয়।

আইনের কবলে মৃত ব্যক্তি

রামমোহন ব্যানার্জ্জি নামক এলাহাবাদের এক ভদ্রলোক ৪০, ০০০৲ হাজার টাকার জীবন বীমা করে ১০, ০০০৲ হাজার টাকার ৪টা policies এতে Hindusthan Co-operative Insurance Socetyর এলাহাবাদ অফিস হইতে ১৯৩২ সনের হে মাসে। কিছুদিন পরে, তাহার ভ্রাতা ভারত মোহন ব্যানার্জ্জিকে সে তাহার Policies গুলি দান করে এবং সে আম্বালা ক্যান্টনমেণ্টে ফিরিয়া আসে। সেথান থেকে সে আম্বালার নিকট সাহাবাদে গিয়া ডাক্তারী ব্যবসা আরম্ভ করে। সে স্থানে যাবার ৪৫ দিন পরেই সে ধনুষ্টঙ্কার রোগে মারা যায় এইরূপ জনরব ওঠে। রামমোহনের ভ্রাতা ভারতমোহন যাহাকে সে তাহার policies গুলি দান করেছিল সেই ব্যক্তি—তাহার ভ্রাতাকে উক্ত ব্যাধিতে মৃত তাহারই একটী সার্টিফিকেট ডাক্তারের নিকট হইতে লইয়া এমন কি Cremation certificate সাহাবাদ মিউনিসিপ্যাল কমিটী হইতে লইয়াছিল এবং ইহারই বলে সে ঐ সকল Policies অম্বালার সীতা প্রসাদ জৈন এর নিকট বিক্রয় করিয়াছিল—মাত্র আট হাজার টাকায় যদিও একটী Policy নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ঐসকল Policyক্রয় করিয়া সীতাপ্রসাদ উক্ত বীমা কোম্পানীর নিকট টাকা দাবী করে। C. I. Department এর লোক এই সকল সংবাদ পাইয়া, ৬ মাস অনুসন্ধানের পর মথুরায় ডাক্তার রামমোহনের সংবাদ পান। সে স্থানে উক্ত ডাক্তার বিজিন্দ্র নাথ নাম লইয়া শিক্ষকতার কাজ করিতেছিল। C. I. D. Police তাহাকে 2nd may তারিখে গ্রেপ্তার করে। তাহার ভ্রাতা ভারতমোহনকেও পরে পুলিসে গ্রেপ্তার করে, তাহারা বর্ত্তমানে মথুরা জেলে আছে। তাহাদিগকে শীঘ্রই আদালতে লইয়া আসিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনয়ন করা হইবে।

শীতলপ্রসাদ ইতিমধ্যে বীমা কোম্পানীর বিরুদ্ধে ৩০, ০০০৲+২০০০৲হাজার টাকা সুদের দাবী করিয়া অভিযোগ আনিয়াছে। আমরা উদ্বিগ্নচিত্তে ফলাফলের প্রতিক্ষায় রহিলাম।

হিন্দুস্থানের বিজয় বৈজয়ন্তী

আজ আমরা হিন্দুস্থানের উন্নতি দেখিয়া বিস্ময়ে ও

আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। ১৯৩২—৩৩সালে হিন্দুস্থানের সর্ব্ব সমেত কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ কোটি টাকার ও উর্দ্ধে। বাঙ্গালী পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটী আজ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানদিগের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল ইহা গর্ব্বের বিষয় সন্দহ নাই। পাঁচবৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানের এরূপ উন্নতি দেখিয়া বাঙ্গালীর প্রাণে আশা ও ভরষার আলো পড়িয়াছে। এইজন্য সুরেনবাবু ও নলিনীবাবুর নিকট বাঙ্গালী মাত্রেই কৃতজ্ঞ।

স্বদেশী বীমাকোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ

[স্বদেশী বীমাকোম্পানীর নূতন কাজের পরিমান নিম্নে দেওয়া গেল। গতবৎসর যে তালিকা বাহির হইয়াছিল তাহার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে দিন দিন স্বদেশী বীমাকোম্পানীর কাজ বহুলাংশে বাড়িতেছে]

স্বদেশী বীমা কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ

[স্বদেশী বীমা কম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল। গত বৎসরে যে তালিকা বাহির হইয়াছিল তাহার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে দিন দিন দেশী বীমা কম্পানীর কাজ বহুলাংশে বাড়িতেছে।]

No.	Company.	Year Ending.	New Business.
1.	ওরিয়েণ্টাল—	৩১—১২—৩২	৫,৯৪,০০,১২৭৲
2.	হিন্দুস্থান—		২,০০,০০০০০৲
3.	ন্যাশেনাল—	৩১—১২—৩২	১,৫৫,৭৩,৭৮২৲
4.	এম্পায়ার—	২৮—২—৩৩	১,১১,৫৫,০০০৲
5.	নিউ ইণ্ডিয়া—	৩১—৩—৩৩	১,০২,০০,০০০৲
6.	লক্ষ্মী—	৩০—৪—৩৩	৮০,৫০,০০০৲
7.	বম্বে মিউচাল—	৩১—১২—৩৩	৭৫,৬৫,০০০৲
8.	বম্বে লাইফ—	„	৬৩,৪৫,৫০০৲
9.	ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া—	„	৩৭,১৫,০০ ৲
10.	জেনারেল—	„	৩৫,২২,২৫০
11.	এমিথ্যান—	„	৩২,৬৩,১২৫৲
12.	জেনিথ্—	„	২৩,৮৪,৫০০৲
13.	ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট—	„	২০,৮২,০০০৲
14.	পিপলস—	৩১—৩—৩৩	১৩,৫১,৮৩৩৲
15.	ইণ্ডিয়ান মিউচাল—	৩১—১২—৩৩	৬,২৬,৭৫০৲
16.	হিন্দু মিউচাল—	„	৫,৫৩,২৫০৲
17.	পপুবার—	„	৩,০৩,৫০০৲
18.	আরগাম্—	৩১—৩—৩৩	৩,০১,২৫০৲

বিশ্বজগৎ

বি... ...রতীয় আম

এই বৎসর হইতে অন্যান্য রপ্তানির ন্যায় বিলাতে আমের রপ্তানি বিশেষ রকম ভাবে বাড়িয়াছে এমন কি এই বৎসর হইতেই আমের রপ্তানি আরম্ভ হইয়াছে এমন

আম প্যাক্ হইতেছে

কথাও বলা যাইতে পারে। সম্প্রতি ইণ্ডিয়া হাউসের শো কেশে ও আম সাজানো হইয়াছে। শুনিতেছি আমও বিক্রি হইতেছে অনেক, দেখা যাক এবারে দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তারা ভারতীয় আম খেয়ে তৃপ্ত হ'য়ে ভারতকে কি দান করেন।
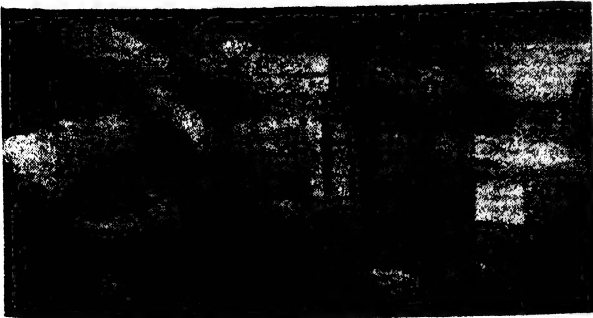
প্যাক্ ক'রার সরঞ্জাম

আম চালানকারী বনিক

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মানুষ

জাক আর্ল ও রজভেল্ট

তিনি জাক আল'—বর্ত্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মানুষ—৮৷৷ফুট লম্বা। সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি ৩ ফুট উঁচু। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও কম লম্বা নন তিনিও প্রায় ৬৷৷ফুট লম্বা তথাপিও এই ছবিতে দেখা যাবে আমেরিকার সভাপতিকে ঐ অতি উচু মানবের সঙ্গে কথা বলতে কত ঘাড় উঁচু করতে হ'য়েছে।

বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী রাফেল

মেডোনা

বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী রাফেলের কথা শিক্ষিত মাত্রেই জানেন। চার শতাব্দী পূর্ব্বে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে রাফেলর জন্ম হয় এবং আজ চার শতাব্দী পরেও রাফেলের নাম তেমনি রসিকজন দের প্রিয়! তার আর্ট ছিল সুগম;

রাফেল

প্রতিভা বাধাহীন। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত চিত্র ম্যাডানো এখনও সেইরূপ সম্মান পাইতেছে।

মাতৃরূপে মেডোনা

আর্থিক সম্মিলনের জের

আর্থিক কনফারেন্সের জের এখনও মিটিল না। স্বার্থের দ্বন্দ্ব যেখানে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দাঁড়ায় সেখানে এইরূপ না হইবে কেন? যে সমস্ত জাতি স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়াছে তাহারা আপনাদের দেশের মুদ্রার যথার্থ মূল্য অপেক্ষা উহার বাজারের মূল্য কমাইয়া দিয়া কৃত্রিম উপায়ে দেশের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইতেছে। মুদ্রার মূল্য বাজার দর অপেক্ষা হ্রাস পাইলে ঐ মুদ্রায় খরিদ দ্রব্য যেখানে মুদ্রার মূল্য অধিক সেখানে বিক্রয় করিলে লাভবান হইতে পারা যায়। এই জন্য এ অবস্থায় রপ্তানি বাণিজ্য কার্য্যে বেশ সুবিধা হয়। ইংলণ্ড, হলাণ্ড, ইটালি ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলির সহিত আমেরিকা খুবই ওত প্রোত ভাবে নানা প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যরূপ সূত্রে আবদ্ধ। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের পর হইতে উক্ত দেশগুলি একের পর একটী করিয়া সকলেই স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়া গতানুগতিকতার স্মরণাপন্ন হয়! আমেরিকা প্রায় দেড় বৎসর কাল স্বর্ণমান বজায় রাখিয়া দেখিল ইউরোপীয় জাতিবৃন্দ তাহাদের মুদ্রা লইয়া জুয়া-খেলা আরম্ভ করিয়াছে। এইজন্যই সে বিরক্ত হইয়া স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য করিতে গেলে—আমরা পূর্ব্বেও দুই একবার বলিয়াছি—দুইটী জিনিষের উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রথমটী জাতির মুদ্রা ও দ্বিতীয়টী জাতির দ্রব্য উৎপাদন করিবার শক্তি। নানা প্রকার যন্ত্র অবিষ্কার হওয়ার সহিত নানাবিধ শিল্প সম্ভার এখন সকল জাতিই প্রস্তুত করিয়া চলিয়াছে। প্রয়োজনাধিক শিল্পের চাহিদা এখন বাজারে নাই। কাজেই এ শিল্প বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য নূতন নূতন পন্থা অন্বেষণ করিতে হইতেছে। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে অনেকেই শুল্কের হার বৃদ্ধি করিয়া দেশের শিল্পকে অপর জাতির শিল্প আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে আরম্ভ করে। উহার ফল এই হইয়া দাঁড়ায় যে আর কোন জাতিই কোন জাতির শিল্প খরিদ করিবার ইচ্ছুক হয়না। এই ব্যবস্থা আর ফলপ্রদ হয়না দেখিয়া ইউরোপের দেউলিয়া জাতিগণ তখন কৃত্রিম উপায়ে তাহাদের মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়া রপ্তানি কার্য্যে প্রসারতা ঘটাইতে থাকে। আমেরিকা এই ব্যাপার বিশেষ মনোযোগ সহকারেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু প্রত্যেক বৎসরেই বহু টাকা মূল্যের স্বর্ণ সমূহ ঋণ পরিশোধ রূপ অর্থ হিসাবে তাহাদের ব্যাঙ্কে আসিয়া স্তূপীকৃত হইতেছিল বলিয়াই সে এবিষয়ে তেমন মনোযোগ দেয়না।

তাহার পর আমেরিকারও পণ্য সমূহের মূল্যের হ্রাস

পাইতে লাগিল। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলির আর্থিক অবস্থা মন্দ হওয়ায়, বেকার সংখ্যার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রনায়ক হুভার ইউরোপীয় জাতিগণকে সাময়িক ভাবে ঋণ মুক্তি (Hoover Moratorium) দিয়া এই আর্থিক বিপ্লব বন্ধ করিবার আশা করিয়াছিলেন। ইউরোপের চতুর রাষ্ট্রবিদগণ তাহা লইয়া অনেক রাজনৈতিক খেলা খেলে। আমেরিকার সাধারণ দৈন্য বাড়িয়াই চলে। এমনকি প্রসিদ্ধ ফোর্ডের কারবারেও ভাঙ্গন ধরিল।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রনায়ক রুজভেল্ট খুব বড় ঔষধ দিয়া দেশের দৈন্যরূপ ব্যাধি দূর করিবার আশা দিয়াই তাঁহার নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। জাতির ভবিষ্যৎ তিমিরাচ্ছন্ন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ভবিষ্যতের আলোক-দাতা বলিয়া খুব উৎসাহে ভোট দিয়া বর্ত্তমান পদে প্রতিষ্ঠিত করে। রুজভেল্ট এখন আমেরিকায় মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়া সমস্ত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্রমিক-দের যাহাতে বেতন বৃদ্ধি হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেননা কোন দেশের মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিতে গেলেই, পণ্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকগণেরই প্রথম কষ্ট হয়। ইহা ছাড়া অর্থ শ্রমিকগণের হস্তে কখনও স্থির থাকিতে পারেনা। তাহা যেমন আসে প্রায় পর মুহূর্ত্তেই চলিয়া যায়। অর্থের যদি এইরূপ কুইক মুভ্‌মেণ্ট (Quick movement) হয় তাহা হইলে মুদ্রার মূল্যের হ্রাস হেতু ঐ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া রাখিবার চেষ্টা আর হয়না। এখন আমেরিকায় ঠিক তাহাই হইয়াছে।

নূতন ব্যবস্থানুযায়ী মুদ্রার মূল্যের হ্রাস হওয়ায় স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট হুকুম জারি করিয়া শ্রমিকদের মাহিনার হার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। উৎপন্ন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় উৎপাদকগণ শ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতেছে। বহির্বাণিজ্যেও বেশ একটু সজীবতা দেখা যাইতেছে। কিন্তু এইরূপ করিতে গেলে একটু বিপদও আছে। দেশের মুদ্রার মূল্য উহার যথার্থ মূল্য অপেক্ষা হ্রাস করিয়া দিলে, বহির্বাণিজ্যে যদি আমদানি রপ্তানি অপেক্ষা অধিক হয়, দেশের বাহিরে গ্রহণ যোগ্য কোন বস্তু দিয়া উহা পরিশোধ করিতে হয়। পৃথিবীর প্রায় বার আনা সুবর্ণ এখন আমেরিকার করতল গত। তাহার বহির্বাণিজ্যে রপ্তানির হার এখনও আমদানির হারের নিকট পরাস্ত স্বীকার করে নাই বরং আশা আছে যে উহার বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে। সুতরাং এস্থলে আমেরিকা কখনই আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যে একটী সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য কোনপ্রকার আন্তর্জাতিক মুদ্রাকে স্বীকার করিয়া লইতে পারেনা। ডলারের সহিত পাউণ্ডের যে গাঁট ছড়া বাঁধিয়া দিবার কথা ছিল, কাজেই এখন তাহা ভুয়াঁ হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমেরিকার রাষ্ট্রবিদগণ ইহাও দেখিতে পাইতেছেন যে ডলারের মূল্য হ্রাস পাইলে তাহাদের যে আন্তর্জাতিক ঋণ দেওয়া অর্থ আছে উহার মূল্য ও বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বৈঠক আর যাহাই করুক, প্রকৃত তত্ত্বের কোন মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা। অদূর ভবিষ্যতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না।

আমেরিকার রাষ্ট্রনায়ক ও তাঁহার উপদেষ্টা

পৃথিবীতে যে কয়জন রাষ্ট্রনায়ক আছেন, আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহাদের অন্যতম। অবশ্য ব্যক্তিগত গুণাবলী দিয়া বিচার করিতে গেলে তাঁহার ক্ষমতা কামাল, মুসোলিনী কিম্বা হিটলার অপেক্ষা যে অধিক তাহা নহে। গত শতাব্দীতে ইংলণ্ড যেমন পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের শীর্ষে অবস্থান করিয়া তাৎকালিক জগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেন, বর্ত্তমান যুগে আমেরিকারও এখন ঠিক সেই অবস্থা। কাজেই গতযুগের তাবৎ ইংরাজ রাষ্ট্র নায়কগণ যেমন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এক একটী বিশেষ 'প্রডেজী' (Prodigy) বলিয়া বিবেচিত হইতেন, বর্ত্তমানে আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কগণও সেইরূপ হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট উইলসন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেসিডেণ্ট হুভার পর্য্যন্ত তাবৎ রাষ্ট্রনায়কই জগতের নিকট অতি মানব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের হাল ছাড়িয়া যেই তাঁহারা সাধারণের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন তখনি তাঁহাদের যে বিশ্বব্যাপী আভা ছিল তাহা কোথা উধাও হইয়া গিয়াছে। কাজেই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ব্যক্তিগত হিসাবে বড় হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমা

পদই যে তাহাকে জগতের নিকট এত বড় করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি শুনা যাইতেছে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাহাকে মন্ত্রণা দিবার জন্য কতকগুলি বিশিষ্ট পণ্ডিতকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে টানিয়া আনিয়া তাঁহার হোয়াইট হাউসে অতিথি করিয়া রাখিয়াছেন। এই সমস্ত মহা পণ্ডিত গণের নাম, মোলি, বালি, ইগ্‌কেল, ডিকিন্স, বুলিট, ও টালওয়েল। এই ধুরন্ধরগণ সকলেই আপনাদের বিদ্যায় বিশেষ দক্ষ। তাঁহারা তাঁহাদের রাষ্ট্রনায়ককে পরামর্শ প্রদান করিয়া জগতের সম্মুখে তাঁহাকে এক মহা মানব করিয়া প্রকটিত করিতেছেন। এই সমস্ত ব্যাক্তিগণের মধ্যে মোলির নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে যে অর্থনৈতিক বৈঠক লণ্ডনে চলিয়াছে, তিনি তাহাতে আমেরিকার পক্ষে কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পার্থক্য

নামকরা অধ্যাপক ইংলণ্ডেও আছেন। কিন্তু ইংলণ্ডে তাঁহাদের তত প্রভাব নাই। ইংলণ্ড ও আমেরিকার রাজনীতি ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য আছে। ইংলণ্ড মুখে যতই উদার নীতির পক্ষপাতী বলিয়া আপনাকে বিশ্বের দরবারে প্রকাশ করুক না কেন আভিজাত্য জ্ঞান তাহাদের অস্থিমজ্জাগত। যে সমস্ত রাজনীতিবিৎ পণ্ডিতগণ পার্লামেন্ট মহাসভায় যোগদান করিয়া রাষ্ট্র-পরিচালন ভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা দেশবাসীর পক্ষে বর্ত্তমান যুগের মহাকুলীন। তাঁহাদের সামাজিক মান মর্য্যাদা অধ্যাপকগণের অনেক উচ্চে। এইজন্যই পাণ্ডিত্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধুরন্ধরগণের তুলনায় হীন হইলেও, চানসেলারের পদ তাঁহারাই পাইয়া থাকেন। আমেরিকার কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। সে দেশের প্রকৃত রাষ্ট্র নায়ক বড় ধনী বা কলকারখানার মালিকগণ। আপনাদের ব্যবসা বাণিজ্যকে জগতের সহিত ঠেলিয়া রাখিয়া এক পংক্তিতে চালাইতে গেলে, বিশ্বের তাবৎ জ্ঞান ভাণ্ডারের সাহায্য লওয়া উচিত। এই জন্যই তথাকার মহাজনগণ তাঁহাদের উপার্জ্জিত অর্থের অনেক ভাগই দেশের নানা প্রকার বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে প্রদান করিয়া উহাদের পুষ্টি সংসাধন করিয়া থাকেন। বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ এই ধনীগণ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া নানা প্রকার তত্ত্বের গবেষণায় নিযুক্ত হন। কথা প্রসঙ্গে এই কথাও অবশ্যই বলিতে হইবে যে বর্ত্তমান রাষ্ট্র নায়ক প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও একজন মহাধনী ব্যক্তি এই ধনী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সাহায্যের জন্য মুখাপেক্ষী। আবার এই ধনীগণই ডেমোক্রাট এবং রিপাবলিক নামে দুইটী দলে বিভক্ত হইয়া রাষ্ট্রের তাবৎ নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যাঁহারা প্রেসিডেন্ট উইলসনের our freedom পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে এই ধনীগণই আমেরিকার রাষ্ট্রনায়ক তৈয়ারী করেন, তাঁহাদের মনের মত না হইলে উদীয়মান বা লব্ধ প্রতিষ্ঠ নেতাগণকে কর্ম্ম ক্ষেত্র হইতে হটাইয়া দেন। এই ধনীগণের সাহায্য পাইয়াই অধ্যাপক উইলসন রাষ্ট্রের নায়ক হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রুজভেল্ট সেই জন্যই বিখ্যাত পণ্ডিতগণের সাহায্য লইতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি আমেরিকায় বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহের প্রতিপত্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খুবই প্রবল।

বিলাতী বৈঠকে ভারত

জয়েন্ট কমিটীর বৈঠকে অনেক সারতথ্যই ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইতেছে। বলডুইন এবং তাঁহার শিষ্যগণ চার্চ্চহীলের দলকে বলিতেছেন—আহা তোমরা অমন করিতেছ কেন? আমরা কি কোন অন্যায় করিতে পারি। দেশভক্তি কি তোমাদেরই একচেটিয়া পেশা। আমরাও কি জানিনা ভারত সাম্রাজ্য হস্তচ্যুত হইলে আমরা অন্নহীন হইয়া পড়িব। তবে তোমরা যেরূপে বলিতেছ উহাকে শাসন করা উচিত ঐরূপেইত এতকাল আমরা শাসন করিয়া আসিলাম। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আবহাওয়া যাইবে কোথায়? তথাকার শিক্ষিত দল কিছু ক্ষমতা পাইবার জন্য অধীর হইয়াছে। একথা সত্য বটে সাধারণ দেশবাসীর সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধই নাই। আমরা যেমন ভারতে পরগাছা রূপে বাস করি তাহারাও তাই করে। তবে তাহারা সেখানে জীবন কাটাইয়া দেয়। তাহাদের লইয়া অর্থ

উপার্জ্জন করে। ভারতের জনসাধারণ এই জন্যই কতকটা তাহাদের বশীভূত: তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে, ভারতে আমাদের যে বিপুল ব্যবসা বাণিজ্য আছে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। মনে করিয়া দেখনা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এ অবধি আমরা যে যে স্থলে হটিয়া গিয়াছি, সে সে স্থল আর কি দখল করিতে পারিলাম? মানচেষ্টার ভারতের বিপুল পণ্য ক্ষেত্র হারাইয়া মুমূর্ষু প্রায়। অতএব তোমরা সাবধান হও—শিক্ষিত ও আমাদের অনুগত সম্প্রদায় গুলিকে লইয়া শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত কর। আমাদের চির সনাতনী নীতি ঠিকই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কথাগুলা ঠিক এইরূপই অবশ্য—দুই দলে ঝগড়ার মুখে যাহা বাহির হইতেছে তাহা যদিও ঠিক এতটা স্পষ্ট নয়।

আমরাও আরও দুই একবার বলিয়াছি হোয়াইট পেপারের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। ইংরাজ কখনই ভারতের রাজদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারেনা। ও'ডায়ার অবশ্যই বলিবেন তাঁহাদের দায়িত্ব খুবই গুরুতর, ভারতের তাবৎ জনসাধারণের অর্থাৎ শতকে ৯০ জনের ভাগ্য স্বয়ং বিধাতা তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, সুতরাং তাহারা তাঁহার নিকট বিশ্বাসঘাতক হইতে পারেন না। আমরা কিন্তু ভাবি যে ইহা ঠিক যে ইংরাজ পণ্য জীবি জাতি। ভারতে তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার করিতেই আসেন, রাজ্য বিস্তারের জন্য নয়। অবশ্য রাজ্য তাঁহাদিগকে হাতে লইতে হইয়াছে তাঁহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতিকর কোন কার্য্যই তাঁহারা করিতে পারেননা। কেননা তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আত্মঘাতী হইতে হইবে। এইজন্যই তাঁহারা আমাদিগকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দিতে পারেন না—তাহার জন্য আশা করা বৃথা।

ডিপ্লোমাসি চলিবে কি?

যে সমস্ত মডারেট ধুরন্ধর গণ ভাবেন যে চালাকি করিয়া অর্থাৎ ডিপ্লোমাসী সাহায্যে ইংরাজ জাতিকে কাহিল করিবেন, তাঁহারা একান্তই ভ্রান্ত, এবং খুবই অনিচ্ছা সত্বে আমাদিগকে একথা বলিতে হয় যে তাঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে শিশু মাত্র। যে ইংরাজ জাতি ডিপ্লোমাসীর সাহায্যে বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়নকে পরাস্ত এব নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, যে ইংরাজ জাতি জার্ম্মান জাতি গগনস্পর্শী গর্ব্ব মাটিতে লুটাইয়া দিয়াছে, যে ইংরাজ জাতি আজিও জগতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ডিপ্লোমাসীর ভেল্কি দেখাইয় সকলকে চমৎকৃত করিতেছে তাহাদিগকে আমরা তাহা দেরই অস্ত্রে পরাস্ত করিব। দুরাশা নয় কি? পঙ্গু পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনের প্রয়াসের ন্যায় অত্যন্ত হাস্যাস্পদ নয় কি

অবশ্য আমরা কোন হতাশার কথা বলিতেছিনা কালের চক্র কোনদিকে ঘুরে এবং এই জগতে সকলে যখন speculation করিয়া চলিয়াছে, সেস্থলে কে কে সফল মনোরথ হইবে তাহা নির্ণয় করিয়া ভবিষ্যৎ বাণী কর বাতুলতা মাত্র। জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমর শুধু এই দেখি যে এখানে চারিদিকেই স্বার্থের তুমু বিদ্রোহ! জাতে, জাতে, পণ্যে পণ্যে মুদ্রায় মুদ্রায় দারু প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই অসামঞ্জস্যের হাত হইতে মুক্তি পাইতে চাহিলে একমাত্র উপায় হইবে বিবিধ স্বার্থ গুলির মধ্যে একটী সমন্বয় করিয়া লওয়া। এই সমন্বয় বিধান করিতে পারিলেই শান্তি আপনা হইতে আসিয়া পড়িবে। অব একথা খুবই স্বীকার্য্য যে এই সমন্বয়ীকরণ ও ক্ষণিক অর্থা টেমপোরারী—পাকা নহে। পাকা বন্দোবস্ত যখন জগতে সাধারণ ধর্ম্ম নহে, তখন এই টেম্পোরারী ব্যবস্থা করিতে পারিলে মন্দ হয় কি? ইংরাজ জনকয়েক সিভিলিয়ানে অন্ন জুটাইয়া দিবার জন্য তাহার বিরাট ভারত সাম্রাজ স্থাপন করিয়া বসে নাই। ব্যবসা-প্রাণ ইংরাজের মু উদ্দেশ্যই ব্যবসার প্রসারণ করা। আমরা যদি তাহাদে সহিত এই আদান-প্রদান কার্য্যে একমত হইতে পারি ইংরাজও মন খুলিয়া খানিক শাসনদণ্ড পরিচালনের ভা আমাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারেন। আমাদের তাহাতে লাভ এই যে আমরা এইরূপ আদান প্রদানে মধ্য দিয়া উহা গ্রহণ করিয়া শক্তি সঞ্চয় ত করিতে পারি আমাদের খানিকটাত শিক্ষা লাভও হইবে। বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় দেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াও মুখ খুলিয়া স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতে পারিতেছেন না।

রাজনীতিক নৃপেন্দ্র নাথ

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার রাজনীতিক্ষেত্রে নূতন অবতীর্ণ হইয়াছেন। আইন ব্যবসায়ে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব তাঁহাকে দেশবাসীর নিকট বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছে। একথাও সত্য যে তাঁহার অসাধারণ মনীষার আমরা সকলেই ভক্ত। তিনি নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে যে সমস্ত বিঘ্ন আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াই, শিশুর সারল্য লইয়া পরম উৎসাহে ইংরাজ ও দেশবাসীর নিকট মীমাংসার জন্য ঘোরাঘুরি করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ উদ্যম দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবেনা মনে হয়। উদ্যম অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু শীঘ্রই তিনি আমাদের দেশের এক শ্রেণীর চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইবেন।

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ কি জানেন না যে রাজ্য শাসন করিতে গেলেই একশ্রেণীর সহানুভূতি শাসকগণকে রক্ষা কবচ রূপে ব্যবহার করিতে হয়। ম্যাকেয়াভেলী হইতে চাণক্য পর্য্যন্ত সকল রাজনৈতিক পণ্ডিতই এই তত্ত্বটীর উপর বিশেষ জোর দিয়া গিয়াছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত ইংরাজ ভারতকে মধ্যবিত্ত গণের সাহায্যে শাসন করিয়া আসিল। তাহার পূর্ব্বে তাহারা দেশীয় নৃপতি-গণের সাহায্যে এদেশে আত্মপ্রতিষ্ঠা বদ্ধ মূল করিয়াছিলেন। এখন মধ্যবিত্ত শ্রেণী শিক্ষিত হওয়ায় তাবৎ ক্ষমতালাভে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। গত লিবারল কনফারেনসের অধিবেশন উন্মুক্ত করিতে গিয়া জনপ্রিয় নেতা যতীন বাবুও বলিয়াছিলেন, আমরা অর্থাৎ ভারতের মডারেটগণ এতাবৎ যাবতীয় রাজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছি; নূতন ব্যবস্থার ফলে অধস্তন সম্প্রদায়গুলির হস্তে রাজ্যশাসন ভার একেবারে গেলে শাসন কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না কি? তাহার উত্তর স্যার নৃপেন্দ্রনাথ বোধ হয় খুব অন্যমনস্ক ভাবে দিয়াছেন। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন ভারতের বিভিন্ন শাসন পরিষদ গুলিতে যে সমস্ত দেশীয় সদস্য ও মন্ত্রীগণ শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেছেন তাঁহারা সরকারের হেডক্লার্ক বা প্রধান কেরাণী ছাড়া আর কিছুই নহে। অর্থাৎ কথা এই যে এযাবৎ যে সমস্ত কার্য্য ভারতবাসী করিয়াছেন উহা প্রকৃত রাজকার্য্য নহে, আজ্ঞাপালন মাত্র। তাহা হইলেই হইল। যতীন বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া এমন নূতন শাসন-তন্ত্র গঠিত হইতে পারে যাহাতে কোন রূপই ত্রুটী লক্ষিত হইবেনা। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা কেহ বলিতেছে অতি সত্য—কেহ বা বিদ্বেষ দেখিতেছে। বৃটনের সৈন্যবল সম্বন্ধে তাঁহার ইঙ্গিতও উপভোগ্য। শেষ বৈঠকে তিনি রাজনীতিক ও বক্তা হিসাবে আসর জমাইলেও শেষ পর্য্যন্ত হয়তো কিছুই হইল না বলিয়া আশাভঙ্গে বিমর্ষচিত্তেই ফিরিতে হইবে এই মনে করিয়া আমরা দুঃখ বোধ করিতেছি।

হতাশের আশা

একশ্রেণীর জীব জগতে দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা হতাশাকেও পরাস্ত করিতে চাহেন। রবার্ট ব্রুসের মতন তাঁহারা কিছুতেই দমিতে চাহেন না। নিত্য নূতন পরাজয়ের মধ্যে তাঁহাদের অভিনব কর্ম্মক্ষেত্র আবিষ্কার করেন—আমাদের মডারেট নেতা স্যার সপ্রু এই শ্রেণীর ব্যক্তি। তিনি লাটসাহেবের সদস্য গিরী পদ ত্যাগ হইতে এ অবধি যে কোন কার্য্যে সরকারের সহিত যে কোন ব্যাপারে সহযোগিতা করিতে যাইতেছেন, তাহাতেই ব্যর্থ মনোরথ হইতেছেন, কিন্তু তাঁহার উৎসাহের শেষ নাই। তিনি কখনই হটিতেছেন না। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে তিনি নাকি ভারতে আসিবার জন্য টিকিট খরিদ করিয়াছেন। দেখা যাক এখানে আসিয়া আবার উৎসাহ সহকারে নূতন কোন্ সাহচর্য্যে যোগদান করেন?

কংগ্রেস কর্ম্মপদ্ধতি

কংগ্রেস কি করিবে! বর্ত্তমানে কোন নীতি অনুসরণ করিবে এই লইয়া অনেকেই মাথা ঘামাইতেছেন। কংগ্রেস কিন্তু এই সম্বন্ধে এপর্য্যন্তও একেবারেই নির্ব্বাক ছিলেন। তাহার পরিচালক শ্রীযুত মদন মোহন অসুস্থ, কর্ম্মী জহরলাল কারাগারে, অন্যতম পরিচালক ও নেতা মহাত্মাজী দুর্ব্বল শরীর; তাঁহার বহুকর্ম্মী এখনও সরকারী জেল গুলিতে কারারুদ্ধ, সুতরাং স্পষ্ট করিয়া কথা কহিবার তাহার ক্ষমতা কোথায়? চুপ করিয়া থাকাই তাহার পক্ষে

স্বাভাবিক ছিল এবং কংগ্রেসও তাই চুপ করিয়াই ছিল। ইহা কংগ্রেসের দুর্ব্বলতা নহে উহাই বরং কংগ্রেসের প্রকৃত কার্য্য পদ্ধতি। কংগ্রেস সমস্ত জাতি লইয়া ব্যবসা করে। তাহার ব্যবস্থা জতির সকলেই মান্য না করুক, সকলের জন্যই করা হইয়া থাকে। সুতরাং এত বড় একটা কঠিন দায়িত্ব যাহাদের স্কন্ধে ন্যস্ত আছে, তাঁহারা কি কোনরূপ অব্যবস্থিত চিত্তের পরিচয় দিতে পারেন? জুলাইয়ের মধ্যভাগে পুণার তিলক মন্দিরে কংগ্রেসকর্ম্মীদের অধিবেশন হইবে—আশা হয় কর্ম্মপদ্ধতি স্থির হইবে।

নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলন

শুনা যাইতেছে যে খুব শীঘ্রই নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলন কলিকাতায় বসিবে, এই নিখিল সম্মিলন কি সব মন্তব্য পাস করেন তাহা অবশ্যই দেখিবার বস্তু হইবে। নারী-প্রগতি লইয়া যাঁহার মস্তিষ্ক পরিচালন করিয়া থাকেন, তাহার কিন্তু নারীজাতির উন্নতির প্রধান অন্তরায় নারী-জাতি নিজেই তাহা স্বীকার করেন না। আমরাত বহুবার বলিয়াছি যে সমস্ত সামাজিক বন্ধন লৌহ শৃঙ্খল রূপে নারী নারী জাতির পদে বাঁধা ছিল, সে সমস্ত গুলিইত একের এক একটা করিয়া সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তবে তাঁহার স্পষ্ট করিয়া আপনাদিগকে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না কেন? এ কথা কি সত্য নহে যে ভারতের বিশেষতঃ বাংলার শিক্ষিত মহিলারাই পুরুষগণ অপেক্ষা অধিকতর Self conscious তাঁহারা মাথা উঁচু করিয়া পুরুষ সমাজে মিশিতে যেনও সঙ্কোচ অনুভব করেন, সেইরূপ পর মুখাপেক্ষী হইয়া এখনও থাকিতে চাহেন। Equality অর্জ্জন করিতে গেলে সর্ব্ব বিষয়েই আপনাকেও তুল্য জ্ঞান করা উচিত। সহশিক্ষা এখনও স্বপ্নবৎ রহিয়া গেল। আমরা শুনিয়াছি সহশিক্ষার বিরুদ্ধে উচ্চ আপত্তি উঠিয়াছিল নাকি মহিলাদের পক্ষ হইতেই প্রথম। সময়ের গুণে এ সব ব্যাপারই অন্যভাবে রূপান্তরিত হইবে তাহা জানি—এবং নারী শিক্ষা সহরে অন্ততঃ যেরূপভাবে বাড়িতেছে তাহাতে ইহার কল এক যুগ মধ্যেই কিরূপ দাঁড়ায় তাহাও দর্শনীয় হইবে। কিন্তু এ সব ছাড়াও সাধারণভাবে নারীদের মধ্যে কতকগুলি একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়ের জ্ঞান ও শিক্ষা প্রচলিত হওয়া একান্ত দরকার। এ সব সম্মিলনের প্রচার বিভাগও ভালমত থাকা আবশ্যক। সম্মিলন আমাদের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

ফিল্ম ব্যবসায়

কোন একটি ব্যবসা লাভ জনক হইলেই, ধনীগণ তাহাকে আপনাদের উপার্জ্জন ক্ষেত্র হিসাবে বরণ করিয়া লইতে থাকেন। বৎসর দশ পূর্ব্বে কলিকাতা সহরে মোট সিনেমা হাউস পঁচিশ বা ত্রিশটীর অধিক ছিলনা। এই ব্যবসা বিশেষ লাভজনক দেখিয়া দেশী হাউসগুলি অসম্ভব রূপ বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে ৭০।৭৫ টিতে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশী ফিল্ম এ দেশের প্রিয় প্রতিপন্ন হওয়া মাত্র ফিল্ম প্রস্তুতকারী ষ্টুডিওর সংখ্যাও বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাডান কোম্পানীরই একটি ষ্টুডিও টালিগঞ্জে ছিল। এখন সেখানে ছয়টি ষ্টুডিও হইয়াছে। সিনেমা ব্যবসার প্রসারণ বা ফিল্ম প্রস্তুতকারী কোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি নিশ্চয়ই সুখবর কিন্তু দেশী ব্যবসায়ীগণ ভুলিয়া যাইতেছেন যে টকীর কার্য্যক্ষেত্রে খুবই অল্প পরিসর। পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে ফলে এই হইবে যে—লাভাংশ ক্রমশঃই কমিয়া আসিবে। তাহার পর এ কথাও মনে রাখা উচিত যে টকী বাজারে আদায় আমেরিকার হলিউডের কারবারে মন্দা পড়িয়াছে। হলিউডের ভিন্ন ভিন্ন ষ্টুডিওগুলি কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে থায় তাহার জন্য যথেষ্ট মাথা ঘামাইতেছে। শুনা যাইতেছে পারামাউনট কোম্পানী ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগুলিতেও তাহাদের অরিজিনাল ফিল্মকে রূপান্তরিত করিবার জন্য ফ্রান্সে এক ষ্টুডিও খুলিয়া বসিয়াছেন। যখন নীরব ছবি ছিল, তখন ভারতবর্ষ হলিউডের এক মস্ত বড় খরিদ্দার ছিল। টকি আবির্ভাবের সহিত এতবড় একটি বাজার হস্তান্তরিত হইলে, তাঁহারা এখানে আসিয়া যে এরূপ একটি ষ্টুডিও খুলিয়া ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তাহাদের ফিল্মকে রূপান্তরিত করিবার ব্যবস্থা না করিবেন তাহা মনে হয় না।

এ ব্যবসার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল, ভারতবাসী প্রাদেশিক-ভাবে এ কার্য্য সুপরিচালিত করিতে পারিলে ভাল।

৺জগদানন্দ

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও বোলপুর শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষ জগদানন্দ রায় আর ইহজগতে নাই। মৃত্যুকালে তাহার মাত্র ষাট বৎসর বয়স হইয়াছিল। বয়স হিসাবে বলিতে গেলে অবশ্যই একথা স্বীকার্য্য বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ এই বয়সেই দেহ রক্ষা করিয়া থাকে, সুতরাং তাঁহার মৃত্যু অকালে ঘটে নাই। তবে এ কথা সত্য যে তাঁহার তিরোধানে বাংলার সাহিত্যসমাজ হইতে উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র খসিল। বর্ত্তমানে বাংলা সাহিত্য খুব সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা বাংলা ভাষার একটি অংশ দেখিয়া থাকেন মাত্র। নাটক, নভেল, কাব্য ইত্যাদি দিক দিয়া জগতের অন্যান্য স্থলে যেরূপ দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে তাহার অনুপাতে না হউক তাহার অনুযায়ী আমাদের সাহিত্যের এই সব শাখার উন্নতি যথাসম্ভব হইয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিভাগে এখনও আমরা শিশুই রহিয়া গিয়াছি, বর্ত্তমান বাংলা ভাষার যখন গঠন এবং সংস্কার আরম্ভ মাত্র হইয়াছে তখন আমাদের অক্ষয় চন্দ্র ও সূর্য্য সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারই ক্ষীণ স্মৃতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ও জগদানন্দ রায় শিবরাত্রির সলিতার মত বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে জ্বালিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানে বাংলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল তাহা যদি পূরণ না হয়, তবে আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিজনকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

বেলডাঙ্গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

বহরমপুর বেলডাঙ্গা হইতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ও মুসলমান জনতা কর্ত্তৃক হিন্দুদের গৃহদাহ, লুঠতরাজ প্রভৃতির যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ। ঘটনার বিবরণ এইরূপ বেলডাঙ্গাতে প্রতি বৎসর হিন্দুদের একটি মেলা হয়—মেলার নানা স্থান হইতে সংকীর্ত্তনের দল আসে ও উৎসবাদি হয়। এবং মেলার সময় চারি পাশের গ্রামসমূহের মুসলমানেরা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া সংকীর্ত্তন ও মেলা ভাঙ্গিয়া দেয়। হিন্দুরা এ কথা তখনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষকে জানায় ও মুসলমান গুণ্ডাদের হাত হইতে ধনপ্রাণ রক্ষার আবেদন করে। ইহা সত্বেও উল্টারথের সময় হইতে মুসলমানেরা পূর্ণ বিক্রমে দলবদ্ধ আক্রমণ চালায়—তাহাতে সরকারী পদস্থ কর্ম্মচারীরাও জখম হইয়াছেন—আর হিন্দুদের বহু আহত ও গ্রামকে গ্রাম লুণ্ঠিত ও অগ্নি দগ্ধ হইয়াছে। সশস্ত্র পুলিশ বন্দুক ছুঁড়িয়াও গুণ্ডা মুসলমানদের বাধা দিতে পারে নাই বলিয়া পলায়ন করাতে সৈন্যদল পাঠাইতে হইয়াছে ব্যাপার এমনি গুরুতর। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ভার গবর্ণ-মেণ্টের—তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে যথাবিহিত সতর্কতা অব-লম্বন করিলে ব্যাপার এমন গুরুতর হইয়া হিন্দুদের এত ক্ষতির কারণ হইতে পারিত না। এই ধরণের দাঙ্গা পর পর বহু ঘটিল অথচ এই অপকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যাপক অপরাধ প্রশমণের কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত সরকার করিতে পারিলেন না ইহা একান্তই ক্ষোভের বিষয়। বেলডাঙ্গা হিন্দু প্রধান স্থান তবু এখানে দলবদ্ধ মুসলমানেরা এমন করিল কাহাদের উস্কানিতে তাহাও অবিলম্বে নির্ণিতা হওয়া দরকার।

—•—

কর্পোরেশন বিল

কর্পোরেশান সম্বন্ধে যে সরকারী বিলটি এবারকার কৌন্সিলে উঠিবার কথা তাহা লইয়া কর্পোরেশনে এক দফা বিতর্কের পর স্থির হইয়াছে এক সপ্তাহ সকল বিলটি ভাল করিয়া পড়িয়া পুনরায় আলোচনা করিবেন। মেয়র শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসুর আলোচনায় দেখা যায় তাঁহারা এখন নিজেরাই ঘর সামলাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন—সুতরাং এই জন-প্রতিষ্ঠানে সরকারের হস্তক্ষেপ একান্তই অহেতুক। কর্পোরেশনের সকল সদস্য একযোগে কর্পোরেশনের অধিকার-সংকোচক এই বিলের যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ করিলে সরকার তাহা শুনিলে ও বিলটি বর্ত্তমানে প্রত্যাহার করিলে ভাল করিবেন মনে হয়।

উদয় শঙ্করের সাধ

বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় নর্ত্তক উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখিবার জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্যালেস অব ভ্যারাইটিসে গিয়াছিলেন। নৃত্যারম্ভের পূর্ব্বে উদয়শঙ্কর বলেন —'আমার জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনজন বিশ্ববিশ্রুত লোককে আমার নাচ দেখাইব। ম্যাডাম প্যাভলোভাকে নাচ দেখাইব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া জানিলাম তিনি আর ইহলোকে নাই। আমার জীবনের ইহা মস্তবড় নৈরাশ্যের বিষয়। তারপর মহাত্মা গান্ধী—গান্ধী গোলটেবলের কাজে লণ্ডনে গেলে তাঁহাকে নাচ দেখাইবার জন্য ইচ্ছা ছিল কিন্তু তিনি এত কর্ম্মব্যস্ত ছিলেন যে আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল না। তার পর আশা করিতেছিলাম যে ভারতে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথকে নাচ দেখাইব —সে আশা আজ সফল হইল।'

নাচ শেষে কবিবর উদয়শঙ্করকে অশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন—'নটরাজ শঙ্কর প্রাচীন ভারতীয় রসধারার উৎস —আমি আশা করি আমাদের এই শঙ্কর হইতে বিলুপ্তপ্রায় ভারতীয় প্রাচীন রসবিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর হইবে।'

—•—

হার হিটলারও জার্ম্মেণী

হার হিটলার ও জার্ম্মেণীর নানা দল সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী নানা খবর রটিতেছিল। হার হিটলারের নাজীদল অন্য কোন দল বা ব্যক্তির প্রাধান্য আদৌ মানিতেছিল না—এজন্য দল ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অনেক ব্যক্তির উপরও অত্যাচার চলিতেছিল। সম্প্রতি শোনা যাইতেছে জার্ম্মেণীর নাজী ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত দলই যথা সেণ্টার পার্টি, পিপলস্ পার্টি সব লোপ পাইল। হার হিটলারের অভিলাষানুযায়ী রাজনীতি ক্ষেত্রে একটিমাত্র দল থাকিবে—এতদিনে তাহা সফল হইল। আশা করা যায় অতি শীঘ্রই হিটলার জার্ম্মেণীর একমাত্র সর্ব্বেশ্বরী ডিক্টেটর হইলেন খবর পাওয়া যাইবে।

—০—

সার রাজেন্দ্রনাথ

সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন এবং ভগবানের সমীপে প্রার্থনা করিতেছেন সার রাজেন্দ্রনাথ আরো বহুকাল [illegible] পুকিয়া কর্ম্মের পথে দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করুন। জীবনে ও ব্যবসায়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতি নীতির অপূর্ব্ব সমন্বয় বিধান করিয়া রাজেন্দ্রনাথ পার্থিব উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। অতি আধুনিক পাশ্চাত্য প্রথায় চালিত দু' তিনটি শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বময় মালিক আজ রাজেন্দ্রনাথ। নানা সৎকার্য্যে রাজেন্দ্রনাথের যোগ আছে—অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপই তিনি। বিশেষত্ব এই বয়সেও তিনি নিজ বৃহৎ ব্যবসায় ও অন্যান্য সব নিজে দেখিতেছেন ও করিতেছেন—এই কর্ম্মবীরের আদর্শ দেশের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া দেশকে নূতন প্রাণ-শক্তি দান করুক—এই উপলক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁহাকে যে অভিনন্দন দিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা মুদ্রিত হইল—

—•—

কর্পোরেশনের মানপত্র

কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যগণের পক্ষ হইতে মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু রৌপ্য পাত্রের উপর বাঙ্গালা ভাষায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত নিম্নোক্ত মান পত্রখানি স্যার রাজেন্দ্রনাথকে অর্পণ করেন :—

বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কে-সি-আই-ই, কে-সি-ভি-ও মহাশয়ের করকমলে—

কর্ম্মবীর, আপনার সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের কেন্দ্রস্থল এই কলিকাতা মহানগরীর পৌরজনের পক্ষ হইতে আমরা আপনার অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে আপনাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

বঙ্গের এক নিভৃত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া আপনি কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনি যেরূপে জ্ঞানার্জ্জন এবং প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাহা বঙ্গদেশ চিরদিন আদর্শস্বরূপ বিদ্যমান থাকিবে।

পাশ্চাত্য প্রথা ও কর্ম্মরীতি অনুসারে পরিচালিত বিভিন্নজাতীয় ব্যবসায়িগণের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতজননীর যে সকল কৃতী সন্তান উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হইয়াছেন আপনি তাঁহাদিগের অন্যতম। আপনার চরিত্রবল, কর্ম্মকুশলতা, একনিষ্ঠা এবং সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা আপনাকে কর্ম্মজগতে উর্দ্ধতম স্থানে লইয়া গিয়াছে।

আপনি দীনের বন্ধু, দেশের ও জাতির গৌরব আমরা আপনার শতায়ু কামনা করিয়া শ্রদ্ধানতশিরে এই অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি, আপনি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। বন্দেমাতরম্

কলিকাতা ১৯শে আষাঢ়, ১৩৪০ সাল

"বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারিই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে-মন্দিরে"

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ, কলিকাতা।

সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত

৭ম বর্ষ	আশ্বিন—১৩৪০	৬ষ্ঠ সংখ্যা

শিশু মঙ্গল

শ্রীঅনুরূপা দেবী

নারীর ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকবার অনেক সভায় এবং সংবাদ পত্রে অনেক কিছুই বলিয়াছি, সে সংবাদ হয়ত অনেকেই জানেন। তদুপলক্ষ্যে অনেকের সঙ্গে অনেক বিতর্কও উপস্থিত হইয়াছে এবং অনেক সমর্থন ও লাভ করিয়াছি, এরূপ হইয়াই থাকে এবং পরেও হইবে। কেন হয় এবং কেন হইবে এসম্বন্ধে যদি কেহ প্রশ্ন করিয়া বলেন তাহা হইলে আমাকে একটুখানি মুস্কিলে পড়িতে হইবে কেননা প্রশ্নটা করা যত সহজ উত্তর দেওয়া তত সোজা নয়। তবে এক কথায় ইহার উত্তর দিতে গেলে এইটুকু বলিলেই চলিবে যে—"ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ"—এ বাক্যটী আজিকার নহে। ইহাতে এইরূপ প্রমাণ হয় যে মানুষের রুচিবিভিন্নতা চিরদিনই ছিল এবং আজও আছে। বৈচিত্র্যময় এই জগতের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যই এই বিচিত্রতা। এর চন্দ্র বিচিত্র, সূর্য্য বিচিত্র। আকাশ, গ্রহ নক্ষত্র খচিত ঐ অসীম আকাশ আরও বিচিত্রতর। ধরণীর ধূলিকণা হইতে উত্তুঙ্গ হিমাচলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ এভারেষ্ট পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই বিচিত্রতার সমাবেশ। প্রাকৃতিক জগতেও যেমন মানুষের মনোজগতেও ঠিক তেমনিই বৈচিত্র্যের যেন অবধি নাই। প্রত্যেক ফুলের দলটী যেমন প্রত্যেকটি হইতে বিভিন্ন প্রত্যেক মানুষের মনটী ঠিক তেমনই। আর এদেশের দার্শনিক এর মীমাংসা করিয়া বলিয়াছেন—"কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্।" এ ক্ষেত্রে আর "কেন?"...এই প্রশ্ন আমলই পায় না। কিন্তু সে কথা যাক্—বিতর্ক থাকুক, জগতের তাহাতে কোন বড় ক্ষতি করিবে না, আসল ক্ষতি ঘটিবে তখনই, যখন তর্ক সিদ্ধান্ত না হইয়া দুরূহ প্রশ্ন সকল আমাদের অন্তরেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। "নানা মুনির নানা মতকে" আমরা হয় আলস্তে নয় ঔদাস্তে উপেক্ষা করি, বিতর্কের দ্বারায় মীমাংসা করিতে চাহি না, বড় জোর করি কৌতুক, যাহার

মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় আমাদের অসংযম এবং যাহার সহায়তায় আমরা প্রচার করি উচ্ছৃঙ্খলতা। সে দিক দিয়া কোন কাজ হয় না, হট্টগোল বাড়িতেই থাকে এবং সাহিত্যিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। তাই আমার মনে হয় আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে যে সকল প্রশ্ন আজ দেখা দিয়াছে তাহার সপক্ষে ও বিপক্ষে বিচার বিতর্ক চলুক, তর্কের স্রোত বয়ে যাক্। নব নব বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করিবার সময় তা বিচার সিদ্ধ করেই গ্রহণ করিতে হয়। সমাজতত্ত্ব ঠিক দর্শন বি ান নহে। কিন্তু ওগুলির সঙ্গে আরও একটী মূলগত সাদৃশ্য যে না আছে তাহাও তো নয়। সকল তথ্যেরই গোড়ার কথা অভিন্ন। বিতর্ক দিয়ে সমাধান না হলে এদের কারুরই মূল ভিত্তি পাকা হয় না। বিতর্ক হোক্ কিন্তু বিতণ্ডার প্রয়োজন দেখি না।

আজ আমি নারীর কথা বলিতেছি না, বলিব তাঁদের শিশুর কথা। কিন্তু যেমন বট বীজকে বাদ দিয়ে বট গাছের কথা বলা যায় না,তেমনি শিশুর কথা বলিতে গেলে তার মা বাপের কথা বাদ দেওয়া অসম্ভব। ল্যাংড়া আমের কলম করিতে হইলে ভাল তাজা ল্যাংড়া আমের গাছ ব্যতীত তা যেমন সম্ভব হয় না তেমনি ভাল ছেলে মেয়ে তৈরি করিতে চাহিলে প্রথমে গড়িতে হইবে ভাল মা বাপ। ভাল বাপ মা গড়িতে গেলেই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া পরে সেই সৎ এবং সতীর কথা অর্থাৎ অসৎ পিতা হইলেও সুসন্তান জন্মাইবে না আর অসতী মা হইলে তো আর রক্ষাই নাই। বাস্তবিক সকল জাতির ইতিহাসেও যেমন, সকল ব্যক্তির ইতিহাসেও তেমনি সর্ব্বত্রই যদি আমরা খুঁজিয়া দেখি তো দেখিতে পাইব "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ।" অসৎ হইতে সত্যের উদ্ভব অসম্ভব। তা হোক সে সৃষ্টিতত্ত্বে হোক সমাজতত্ত্বে। ক্ষেত্র ও বীজ উপযুক্ত না মিলিলে অর্থাৎ অনুর্ব্বর কঙ্করময় মৃত্তিকায় এবং অযত্নরক্ষিত বীজ হইতে জাত ফল ফুল যত ভাল জাতেরই হোক না কেন পরিপূর্ণ শোভা ও সুস্বাদ বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না।—সুসন্তান তৈরি করিতে হইলে সেই সন্তানের পিতৃপিতামহ মাতৃমাতামহীকেও পরিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং সংযম সংযত সুপবিত্রতর জীবন এবং মহত্তম আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁদের ভবিষ্যং বংশধারাকে অক্ষুণ্ণ ও বিশুদ্ধ রক্ষা করিবার জন্য ব্রতপরায়ণ থাকিতে হইবে। শরীরের এবং মনের সকল প্রকার অসংযমকে তাঁদের একান্ত ভাবেই পরিহার করিতে হইবে। বিশুদ্ধ এবং পূতভাবে নিজেদের জীবনকে গঠন করিতে হইবে। তারপর তাঁদের মনে মনে আরাধনা করিতে হইবে তপস্যা করিতে হইবে,—সেই পুত্ররূপী ভগবানকে, যেমন দৈবকী ও কৌশল্যা করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্রের জন্য। কোন ঘরে কখন তিনি জন্মাবেন তার তো কোনই স্থিরতা নাই। আবরণ স্বচ্ছ থাকিলেই আলোক রেখা অতর্কিতে ফুটিয়া উঠে। পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন—প্রত্যেকেরই নিজ নিজ সদ্যজাত সন্তানটীকে শ্রীভগবানের ভবিষ্য অবতার মনে করিয়া তাকে পাবার জন্য নিজেদের বিশুদ্ধ রাখতে সচেষ্ট থাকা উচিৎ এবং ছেলেটীকেও ঠিক সেই দিব্যভাবেই কল্পনা করে তাকে তেমনি করেই গঠিত করে তুলবার জন্য সযত্ন হওয়ার প্রয়োজন। কখন যে কার ঘরে তিনি দেখা দেবেন তার তো কোন নিশ্চয়তাই নেই। যিশুখৃষ্ট কোথায় জন্ম লইয়াছিলেন?—ছুতোরের ঘরেই না। কবীর ছিলেন জোলার ছেলে, রুইদাস মুচি এবং হরিদাস ছিলেন যবন। আধার গুলি যে শুদ্ধ ছিল তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। ভবিষ্যং শিশুর মঙ্গল যদি কাহারও কাম্য থাকে তবে নারীর সতীত্ব বিরোধী মতবাদকে সমুদ্রপারে ফেরৎ পাঠান, নরের উচ্ছৃঙ্খলতাকে সর্ব্বপ্রযত্নে নিরোধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করুন। নিজেদের চারিত্রিক বল দিয়া রক্তের ধারার ভিতর দিয়া সেই পবিত্রতাকে তাদের মধ্যে—পবিত্র জাহ্নবীর সলিলধারার মতই প্রবাহিত করিয়া রাখো, যে পবিত্রতার নিষ্কলুষতাকে সহস্র বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিলেও মাররূপী সয়তানের সয়তানিও প্রনষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। মা এবং বাপ এই দুদিক হ'তে সে যদি তার অস্থিতে অস্থিতে মাংস মজ্জায় পবিত্রতার যোগান পায়, তার প্রত্যেকটী শিরা ধমনি তরল অগ্নিস্রোতের মতই বিশুদ্ধ চরিত্রের এবং পরিশুদ্ধ বুদ্ধির উত্তরাধিকার রক্তস্রোতকে বহন করিবার সৌভাগ্য

শালী হয়, সংসারের যত কিছু পাপ প্রলোভন আছে সে ছেলের কাছে অবনতশির হইতে বাধ্য, সে মেয়ের সম্মুখীন হইতেই দুঃসাহস করে না। যেমন বুদ্ধদেবের কাছে মার পরাজিত হইয়াছিল, যেমন সতী সাবিত্রীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া বিগতায়ু সত্যবানকে যমদূতেরাও গ্রহণ করিবার কথা ভাবিতে সমর্থ হয় নাই। বসন্তের টিকা দেওয়া থাকিলে বসন্ত-বিষের মধ্যেও মানুষ যে নির্ভীকতার সহিত বাস করিতে পারে সে তো আমরা দেখিতেছি। তেমনি এই ছেলেদের পবিত্রতার টিকা দেওয়া হয় যদি; পিতা যার সৎ মা যার সতী সে অসৎ হইবে কেমন করিয়া? অবশ্য যদি পিতৃ পিতামহ মাতৃ মাতামহীও তার তাহাই থাকেন, আবহমান কালাবধি বংশের ধারাকে সযত্নে অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়া থাকে। ল্যাংড়া আমের চারায় ল্যাংড়া আমই ফলে, কিন্তু টক আমের আঁটি পুতিয়া তাহাতে ল্যাংড়া আমের আশা করিলে সে আশা কোন দিনই মিটিবে না, ঘড়া ঘড়া জলই ঢালা যাক্ আর ঝোড়া ঝোড়া সারই দেওয়া হোক। বীজ রক্ষা করাই জাতীয় উন্নতির প্রথম এবং প্রধান কথা। তার উপর অবশ্য পারিপার্শ্বিকতারও আবশ্যকতা নিশ্চয়ই আছে। মা বাপই সন্তানের প্রথম ও প্রধান শিক্ষক। মা বাপ যদি তাদের ছোট বেলায় ছোট ছেলেটী মনে না করিয়া মনে করেন সে তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধর, শাস্ত্রানুশাসন মানিয়া যদি মনে রাখেন পুন্নাম নরকের ত্রাণকর্ত্তা, তবে কখনই তাহার জীবন গঠনে শৈথিল্য করিয়া তার ও নিজবংশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারেন না। বিশেষতঃ মা,—মার কোলে বসিয়াই ছেলে বড় হয়। সেই অসহায় ননীর পুতুলটীকে তিনি নিজের হাতে মাখা ময়দার দলার মতই দলিয়া লইয়া গড়িতে পারেন, অন্য কিছু না গড়িয়া গড়েন যদি সদানন্দ শিবমূর্ত্তি—মা ও ছেলে দুজনকার জীবনই ধন্য হইয়া যায়। তা করেন না, যেমন তেমন করিয়া ছেলে বড় হয় মানুষ হয় না, মানুষ তাকে করা হয় না। "ভূতভয়গ্রস্ত," আলস্যপরতন্ত্র, ঈর্ষা, কুটিলতার পাপ বিষে জর্জ্জরিত কাপুরুষ তৈরি করিয়া মা যদি আশা করেন তার কাছে পৌরুষের, তা কি পাওয়া চলে? মায়ের মধ্যের সৃজনীশক্তি যদি দুর্ব্বল অক্ষম হয়, তাঁর সৃষ্ট জীবটী কেমন করিয়া সবল ও সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টিসম্পন্ন হইবে? তা হয় না, অপবিত্র শোণিত এবং শিক্ষাহীনতা তাকে নীচের দিকেই টানিবে। ছোট ছেলেদের আমরা শেখাই ছোটবেলা হইতে ধূর্ত্ত শৃগালের গল্প। তাদের মিথ্যার প্রতি বিরাগ সত্যানুরাগ প্রবৰ্দ্ধিত করার জন্য চেষ্টা না করিয়া ছোট ছেলে বলিয়া ওসব বিষয়ে বিলক্ষণই "ক্ষমা ঘেন্না" করিয়া থাকি, শুধু তাই নয় আবার প্রোৎসাহিতও করি। ভুলিয়া যাই ছোট যখন বড় হইবে ওর ওই ছোট পাপগুলিও সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর হইয়া উঠিতে বাকি থাকিবে না। ভূমি উষর করিয়া তার উপর বীজ ছিটাইলেই ফসল ফলে না, আবার তাজা বীজ না দিয়া ভূমির উৎকর্ষ করিলেও ভাল ফসল হয় না। শুধু শিক্ষাই যদি মানুষ গড়িতে পারিত, অন্ততঃ অনেক পরিমাণেই আমরা ভাল লোক দেখিতে পাইতাম। ইংলণ্ডের পিউরিটানিক যুগের পর হইতে সেই প্রভাবে প্রভাবিত থাকিয়া ওদেশে অনেক বড় লোক জন্মিয়াছিলেন। আধুনিকতার মন্ত্রসিদ্ধ বর্ত্তমান যুগের তৈয়ান করা জিনিষ এইতো সবে ও দেশের বাজারে আমদানী হইতেছে তার ফলাফলের দিন আজও আসে নাই। আমেরিকাকে গড়িয়াছিল কাহারা সে কথা হয়ত ইতিহাসজ্ঞদের স্মরণই আছে। সেও ঐ পিউরিটানেরা। ফরাসী বিপ্লব সে দেশের উচ্ছৃঙ্খলতার বিষময় ফল। আর রোম সাম্রাজ্য যখন ধ্বংস হয় তখনকার রোমকদের চরিত্র কোন্ অধঃপতনের সীমানায় নামিয়াছিল? যাদের হাতে অতবড় প্রবল পরাক্রান্ত রোম সাম্রাজ্য বিচূর্ণ হইয়া গেল সেই তথাকথিত অসভ্য গথরা যে নারীপূজক অর্থাৎ শক্তিপূজক ছিলেন, নারীর সতীত্বের যে তাঁরা কোন অবস্থাতেই অবমাননা করেন নাই একথা আপনারা অনেকেই জানেন, যাঁরা জানেন না জানিয়া রাখা ভালই। যে সময়ে নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে রোমানদের এমনই শৈথিল্য এবং এত বড় অধঃপতন ঘটিয়াছিল যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী-মহিলাদের প্রতি তাহারা অমানুষিক অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত ছিল না, কিন্তু তাদের বিজেতা ওই দুর্দ্ধর্ষ গথ জাতি এই প্রথম দিনেই তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘোষণা করে যে নারীর প্রতি অত্যাচারে অত্যাচারী কঠোর দণ্ডে

দণ্ডিত হইবে। ভগবান স্খলিত চরিত্র অসংযত্ত অসতী-পুত্র সভ্য জাতিকে সেই সতীপুত্রদিগের হস্তে পরাজিত হইতে বাধ্য করিলেন। ইহাই স্বাভাবিক। এই জন্যই এই বাণী সর্ব্বকালে বিঘোষিত হইতেছে—"যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ"। বল এবং বীর্য্য প্রদান করে সংযমবিশুদ্ধ শোণিত ধারা, তাহা হবিপ্রাপ্ত যজ্ঞানলের মতই তেজোদীপ্ত উর্দ্ধশিখ। মানুষের চিত্তকে তাহা উন্মুক্ত উদার ও দূরদর্শী করে; জটিল কুটিল ভোগস্পৃহ স্বেচ্ছাচারী করিতে পারে না। এদেশের সুক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীরা তাহা জানিতেন তাই বৈবাহিক সম্বন্ধে এবং নারী পুরুষ সম্পর্কে এত বাঁধন-কষণ রাখিয়া সমস্ত জাতটার জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল শিশুগুলিকেই উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁরা জানিতেন সতীপুত্র ব্যতীত সত্যসন্ধ হইতে পারে না; সতীকন্যা নহিলে সাবিত্রী হয় না।

শিশুর মঙ্গল যদি কাহারও অভিপ্রেত থাকে, সমাজে যাহাতে সতীত্বের এবং সততার গৌরব বর্দ্ধিত হয় তাহারই জন্য সচেষ্ট হউন। উহাতেই শিশুর প্রকৃত মঙ্গল ঘটিবে। আর সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শিক্ষার পুনঃ প্রচার যাহাতে আমাদের সমাজে হইতে পারে সেজন্যও সবিশেষ যত্ন করিবার আবশ্যকতা আছে। নিজেরা সৎশিক্ষা না পাইলে ছেলে মেয়েকে কি শিখাইব?

তালতলা পাঠাগারে মহিলা শাখায় পঠিত।

আমার এ গান

শ্রীঅমলা দেবী

তোমার পাতার বুকে আমার এ গান
এঁকে রেখে দিতে হ'বে। কম্পিত পরাণ
অক্ষম লেখন করে, ভাবে মনে মনে
তোমারে তুষিব বন্ধু আজি কোন গানে!
বসন্তের প্রস্ফুটিত অশোক পারুল
সেও আজ ঝরে গেছে। তোমারি এ ভুল
হে মোর অতিথি প্রিয় আজি অবেলায়
আমারে আনিলে ডাকি তোমার খেলায়
দিবসের শেষে। দিনু তব করে
ভুল ত্রুটী নিও ঢাকি সস্নেহ অন্তরে।

আলো-ছায়া

শ্রীপ্রভাদেবী গঙ্গোপাধ্যায়

এক

বার্লিনের কোন ক্ষুদ্র হোটেলের খোলা বারান্দায় মিষ্টার এ, কে, চৌধুরী এম, ডি, ডি-এস-সি ওরফে অমিয় কুমার একখানা ইজি চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়াছিল। সম্মুখে ছোট্ট টিপয়ের উপর তাহার প্রাতঃরাশ—খান কয়েক টোষ্ট, গোটা দুই আধসিদ্ধ ডিম একটু ভেজিটেবল্‌স, এক কাপ চা; বাহিরে রাজপথ যানবাহন ও পাদচারী পথিকের কর্ম্ম কোলাহলে মুখরিত। কিন্তু এসব দিকে তাহার লক্ষ্য ছিলনা। সে তখন ভাবিতেছিল তার নিজেরই কথা।

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার ঘটনা তাহার ব্যথিত মনকে যে নূতন ব্যথার আঘাত দিয়াছে তাহা ভুলিবার নয়। রেবেকা তাহাকে ভালবাসে, সে জানিত, কিন্তু সে যে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিবে ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

দুজনে পার্কে বেড়াইতেছিল। রেবেকা বলিল, "চল অমিয়, এবার বসা যাক।" দুজনে একটু নিরিবিলি ঘাসের সবুজ বিছানায় বসিয়া পড়িল।

আশে পাশে মরশুমি ফুলগুলি স্তবকে স্তবকে ফুটিয়াছে। বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোকে শিশির বিন্দু গুলি ইন্দ্রধনুর রঙে রাঙিয়া উঠিয়াছে। রেবেকা বলিল,"দেখ—দেখ অমিয়, কি সুন্দর!" অমিয় ফিরিয়া চাহিল বটে কিন্তু কথা কহিল না।

একটু থামিয়া রেবেকা বলিল, "ভারতবর্ষে তুমি কি শীগ্‌গিরই ফিরছো অমিয়?"

"কিছু ঠিক্ নেই রেবেকা।"

"আরো ক' মাস কাটিয়ে যাও বরং। ভারতে গেলেই তো আমাদের ভুলে যাবে।"

"না ভুলবোনা। বিশেষতঃ তোমাকে তো নয়ই।"

রেবেকার আঁখিযুগল আনন্দোজ্জল হইয়া উঠিল—

অমিয় দেখিলনা। অমিয়র মনে পড়িল এই ফুল্লাধরা হাস্যাননা স্নেহমায়াময়ী রেবেকার কথা। সে তাহার শুধু সতীর্থা সহচরী নয়—বন্ধু—পরমাত্মীয়। এই স্বজন বান্ধব হীন বিদেশে রেবেকা নহিলে তার চলিত না। রেবেকা তাহাকে মৃত্যুশয্যায় প্রাণ দিয়াছে। অমিয় আবার বলিল, "তোমার উপকার আমি জীবনে ভুলবো না বন্ধু, আমি চির কৃতজ্ঞ—"

শুধু কৃতজ্ঞতা! আর কিছু নয়? একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া রেবেকা বলিল, "সে কথা যাক। চৌধুরী!"

"বল।"

রেবেকা কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল।

অমিয় জিজ্ঞাসা করিল "কি বোলছিলে?"

"না—এমন কিছু নয়। তুমি দেশে গিয়ে কি কোর্‌বে?"

"কিছুই নয় বোধহয়।"

রেবেকা সবিস্ময়ে বলিল, "কিছু নয় কেন? তুমি এম-ডি পরীক্ষা সসম্মানে পাশ কোরেছ! প্র্যাকটিস্ কোরবে না?"

"না, আমার ডাক্তারি শেখা ব্যর্থ হোয়েছে রেবেকা!"

"ব্যর্থ!"

"হ্যা। তুমি জাননা আমার জীবনটাই একটা মস্ত ব্যর্থতা।"

ব্যথাতুর কণ্ঠে রেবেকা বলিল, "এমন কি কেউ নেই যে তোমার ব্যর্থ জীবনকে সফল কোরে তুলতে পারে?"

অমিয় মাথা নাড়িল।

রেবেকা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কম্পিত স্বরে বলিল, "যদি আমি সে ভার নিতে চাই?"

অমিয় চমকিয়া চাহিল। রেবেকার চোখে ওকি দৃষ্টি! এ দৃষ্টি সে পূর্ব্বেও লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু এত স্পষ্ট—এত গভীর ভাবে নয়। অমিয় ডাকিল "বন্ধু!"

রেবেকা উৎসুক নয়ন চাহিল।

"বুঝেছি রেবেকা!—কিন্তু অসম্ভব! তোমার মনে কষ্ট দিতে হোচ্ছে—আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু উপায় নেই।"

"অসম্ভব কেন?"

"বোলেছিতো, আমার জীবনে একটা মস্ত বড় ব্যর্থতা আছে। যদি শুন্‌তে চাও তো একদিন বোল্‌বো।"

কুমারী রেবেকা অমিয়র হাতখানা তাহার দুই হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল। তার পিতা ইহুদি, মাতা জার্ম্মান। জার্ম্মানীর উষ্ণ রক্ত তাহার ধমনীতে প্রবাহিত। সে অশিক্ষিতা বালিকা নয়। অমিয়র সহিত একই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম-ডি ডিগ্রি লাভ করিয়াছে। মন তার স্বাধীন; কোন চির-চলিত প্রথাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া সে স্বাধীনতাকে সে ব্যাহত করিতে চায়না। অমিয়কে সে ভালবাসে এবং তাহার বিশ্বাস অমিয়র ভালবাসাও সে জয় করিয়াছে। কিন্তু শুধু জয় নয়—সে চায় অধিকার।

কুমারী রেবেকা যে মনোরম ভবিষ্যৎ চিত্রখানি আঁকিয়া ধরিল, তাহা অত্যন্ত লোভনীয়। কিন্তু সমস্ত শুনিয়া অমিয় পূর্ব্বের মতই মাথা নাড়িল, "অসম্ভব বন্ধু।"

রেবেকা স্নিগ্ধ প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তবু অসম্ভব! কেন?"

"আমি—আমি বিবাহিত।"

"বিবাহিত!" রেবেকা সর্পিণীর মত গর্জ্জিয়া উঠিল, "তুমি বিবাহিত!"

"হ্যা—রেবেকা।"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া রেবেকা বলিল, "মিষ্টার চৌধুরী, তুমি আমাকে অনর্থক প্রলোভিত কোরেছ। এত খানি প্রলোভিত কোরেছ যে আমি চির-চলিত প্রথাকে পদদলিত কোরে নিজেই তোমার কাছে 'প্রোপোজ' কোত্তে সাহস ক'রেছি। কিন্তু এ অপমান—জানো মিষ্টার চৌধুরী, জার্ম্মান রমণী যেমন ভালবাসতে জানে, তেমনি প্রতিশোধ নিতেও জানে?—অপমানিতা জার্ম্মান রমণী ব্যাঘ্রীর চেয়েও ভীষণা?"

অমিয় ধীরে ধীরে বলিল,—"আমি তো তোমাকে প্রলোভিত কোরিনি বন্ধু! আমি কোনদিন ও ভাবিনি—"

রেবেকা বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "একশো বার কোরেছ। যাক্; সত্য গোপনে কোন লাভ নেই। বিদায় মিষ্টার চৌধুরী!" অশ্বিনীর মত গ্রীবা বাঁকাইয়া রেবেকা ত্বরিত পদে চলিয়া গেল।

অমিয় ডাকিল, "রেবেকা! রেবেকা! শুনে যাও—এক মিনিট—" রেবেকা ফিরিয়াও চাহিল না।

দুই

সশব্দ পাদক্ষেপে সিঁড়ি বাহিয়া এক সুন্দরী যুবতী উন্মুক্ত দরজার কাছে চিত্রার্পিতার মত দাঁড়াইল। অমিয় সভয়ে চাহিয়া দেখিল রেবেকা! কতকগুলি তিক্ত কটু কথা শুনিবার অপেক্ষায় অমিয় প্রস্তুত হইয়া স্পন্দিত বক্ষে বসিয়া রহিল। চিন্তাক্লিষ্ট ম্লানমুখ—সকরুণ চোখ দুটীতে তার ভয় ও বিস্ময় পরিস্ফুট।

কয়েক মুহূর্ত্ত উভয়েই নীরব। রেবেকার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে অমিয়র চোখদুটী নত হইয়া আসিল। রেবেকা দুইপদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া মৃদু হাসিয়া প্রীতিস্নিগ্ধস্বরে ডাকিল, "বন্ধু!"

অমিয় চেয়ার ছাড়িয়া উত্তেজনায় লাফাইয়া উঠিল। অন্ধ কুয়াশা কাটিয়া গিয়া তাহার মুখে তখন জোছনার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

হাস্যাধরা রেবেকা ডান হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া পুনরায় ডাকিল "বন্ধু!"

অমিয় সাগ্রহে হাতখানা তাহার দুইহাতের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া উত্তর দিল "বন্ধু রেবেকা!"

আর একটা নীরব মুহূর্ত্ত। ... ...

অমিয় বলিল "বোসো রেবেকা!" পার্শ্বস্থ ড্রইং রুম হইতে সে একখানা চেয়ার টানিয়া আনিল।

রেবেকা টিপয়ের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখনো প্রাতঃরাশ খাওনি চৌধুরী?"

"না।"

"খেয়ে নাও।"

"তোমাকে কিছু দিতে বলি?"

"না আমি এই মাত্তর খেয়ে আস্‌ছি। ধন্যবাদ।"

অমিয় সুবোধ বালকের মত প্রাতঃরাশ লইয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা তাহ'লে আগের মত তেম্‌নি বন্ধুই রইলুম রেবেকা?"

"হ্যা—ভেবে দেখ্‌লুম, হয়তো আমাকে প্রলুব্ধ করার মধ্যে তোমার ততটা দোষ নাও থাকৃতে পারে।"

"যেটুকু দোষ পেয়েছ তা ক্ষমা কোরেছ তো?"

"ক্ষমা? কই—না! জার্ম্মান রমণী ক্ষমা কোরতে জানে না।"

অর্দ্ধভুক্ত টোষ্টখানা অমিয়র হাত হইতে টেবিলের উপর পড়িয়া গেল।

রেবেকা বলিল, "তুমি বিবাহিত একথাটা আমায় অনেক আগেই জানানো উচিত ছিল।"

অমিয় কম্পিত স্বরে বলিল, "হ্যা, আমি তা স্বীকার কোরছি। কিন্তু অতটা বুঝিনি রেবেকা। আমার জীবন কাহিনী যদি জান্‌তে—"

"তোমার কাহিনীটা শোন্‌বার জন্যই আমি এসেছি অমিয়। তুমি ক্ষমার যোগ্য কিনা সে কথা পরে বিবেচনা কোর্‌বো। বোল্‌বে তো?"

অমিয় সোৎসাহে বলিল, "নিশ্চয়ই, কিছু গোপন কোর্‌বো না। চল, ড্রইংরুমে—"

রেবেকা অর্দ্ধভুক্ত টোষ্টটা কুড়াইয়া অমিয়র মুখের কাছে ধরিয়া হাসিয়া বলিল, "আগে খেয়ে নাও বন্ধু!"

তিন

সভায় স্থির হোলো মেয়েটীর অভিভাবককে সাবধান করা দরকার। কিন্তু এই অপ্রিয় সংবাদ বহন কোরবে কে? কেউ রাজী হোলো না। বন্ধুরা প্রস্তাব কোরলেন লটারী হোক্।

নিশ্বাস বন্ধ কোরে লটারীর ফলাফলের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হোয়ে রইলুম। মনে মনে ডাক্‌লুম, 'হে ঈশ্বর, আমাকে রেহাই দিও।' কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর খেলা! —দৌত্যের ভার পড়্‌লো ঠিক্ আমারই উপর! ... ...

সারারাত ঘুম হোলো না—ছট্‌ফট্ কোরে কাটালুম। কি কোরে কথাটা মহিম বাবুর কাছে উত্থাপন করা যাবে মনে মনে তার অন্ততঃ একশো' রকম রিহার্সেল দিলুম। কিন্তু কোনটাই মনঃপুত হোলো না। ব্যক্তব্যটা যেরূপেই প্রকাশ করা যাকনা কেন মহিম বাবু আর তার মেয়েটিকে তা নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত কোরবেই।

ভোর হোলো। সূর্য্যের সোনালী আভা ক্রমে ক্রমে আকাশ ছেড়ে ভুবনময় ছড়িয়ে পড়লো। চেয়ে দেখলুম মেয়েটি জানালার পাশে এসে তেমনি দাঁড়িয়েছে—ঠিক্ ছবিখানির মত। সুগোল সুগঠিত দেহবল্লরী তার, মুখ খানিতে তার অফুরন্ত লাবণ্য, চোখদুটীতে অপূর্ব্ব সরলতা।

বন্ধুদের কাছে যে কোথায় এর আবিলতাটুকু ধরা প'ড়েছিল বুঝতে পারলুম না।

আড়াল থেকে অনেকক্ষণ সেই রূপসুধা পান কোরলুম। জানালার সামনে দাঁড়াতে আজ আর সাহস হোল না—কি জানি যদি সরে যায়? জানতুম, সে যায় না, আমারই মত নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকতেই ভালবাসে। কিন্তু তবু মন্দ সম্ভাবনাটাই মানুষের মনে আসে আগে। আর হয়তো কোনদিন এমন কোরে দেখা হবে না—আজ যেটুকু পারি প্রাণ ভরে দেখে নি।

তাকে ভাল বেসেছিলুম—সত্যি ভাল বেসেছিলুম।...

বাইরে একটী বন্ধুর গলা শোনা গেল, "অমিয় বাবু ওহে অমিয় বাবু"। তাড়াতাড়ি ঘরের মাঝখানে সরে এলুম। বন্ধুটী সেই মুহূর্ত্তেই ঘরে ঢুকে বল্লেন, 'এই যে! কই মশাই—গেলেন না? যান, যান। আবার এসে দাঁড়িয়েছে দেখেছেন? কি নির্লজ্জ বেহায়া মেয়েটা বলুন তো! গিয়ে সোজা বোলবেন তার বাপকে—দেখুন মহিম বাবু, আপনার মেয়েটী যে সারাদিন আমাদের মেসের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে এটা লক্ষণ ভাল নয়। একটু কড়া শাসন কোরে দেবেন।"

বোল্লুম, "হ্যা তাই বোলবো।"

নিজের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা যদি নিজেই বহন কোরে নিয়ে যেতে হয়, তাহ'লে তার মনের ভাবটা যেমন হয়, আমারও বোধ হয় মনটা ঠিক তেমনি হোয়েছিল। ... ...

মেয়েটী জানালার পাশে ঠিক তেমনি ভাস্কর্য্যের আদর্শ মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়েছিল। চোখে চোখ পড়লো—নিমিষের জন্য।

বুকের ভিতরটা তোলপাড় কোরে উঠলো। কোন রকমে নিজেকে সংযত কোরে পাশ কাটালুম।

মহিম বাবু ড্রইংরুমে একলাটী ব'সে কি বই পড়ছিলেন। আমাকে দেখে সাগ্রহে বোল্লেন "এস, বাবা এস।"

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বোল্লুম, "আপনার মেয়েটীকে প্রায়ই জানালার পাশে দেখতে পাই।"

"হ্যা, ও সারাদিন জানালার ধারে থাকতেই ভালবাসে। তুমি এই মেসেই থাক, না বাবা?"

"আজ্ঞে হ্যা। আপনার মেয়েটীকে—"

মহিম বাবু উৎসুক নয়নে আমার মুখের পানে চাহিলেন, "কি বোলছিলে বাবা? আমার মেয়েটীকে কি?"

যা বোলতে এসেছিলুম তা সব গুলিয়ে গেল। যা বোলতে আসিনি বোল্লুম ঠিক তাই। "আপনার মেয়েটীকে যদি আমায় ভিক্ষা দেন—"

মহিম বাবু এক মিনিট আমার পানে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইলেন। তার পর শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা কোরলেন "তুমি কি পড় বাবা?"

"এবার বি-এস্-সি দোবো।"

"তোমার মত জামাই পাওয়াতো সৌভাগ্যের কথা বাবা। কিন্তু সে সৌভাগ্য তো যুঁইয়ের অদৃষ্টে নেই। তুমি জানো না তাই, জানলে বিয়ে কোর্ত্তে চাইতে না।"

জিজ্ঞাসু নয়নে চাইলুম।

মহিম বাবু সজল নয়নে বোল্লেন, "মা আমার জন্মান্ধ।"

"অন্ধ!"

"হ্যা বাবা। চোখ ঠিকই আছে—কিন্তু দৃষ্টি নেই। দেখে কিছুই বোঝা যায় না—তাই তুমিও বুঝতে পারনি। অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছি—তারাও কোন ত্রুটী ধরতে পারেননি। মা আমার দৃষ্টি হীনাই রয়ে গেল"

বিস্ময়ে স্তব্ধ হোয়ে রইলুম। অমন পদ্মের কুঁড়ির মত বড় বড় চোখদুটিতে দৃষ্টি নেই এও কি সম্ভব?

মহিম বাবু বোলতে লাগলেন, "ওকে পাঁচ বছরের রেখে আমার স্ত্রী মারা যান। সেই থেকে এই বারটা বছর আমিই ওকে কোলে পিঠে কোরে মানুষ কোরেছি। লেখা পড়া, গান বাজনা, সেলাই ফোঁড়, সবই ও জানে—বেশ ভালই জানে। কিন্তু দেখতে পায়না কিছুই। আমি জেনে শুনে কি কোরে ওর বে দি বল?"

মহিম বাবুর দুচোখ বেয়ে অবিশ্রান্ত জল পড়তে লাগলো। দুজনেই অনেকক্ষণ নীরব হোয়ে রইলুম। ...

মেয়েটী হঠাৎ ঘরে ঢুকে চায়ের কাপটা আর খাবারের রেকাবীখানা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে হাসি মুখে জিজ্ঞেস কোরলো, "এতক্ষণ কার সাথে কথা কইছিলে বাবা?"

মহিম বাবু নিজেকে সামলে নিয়ে বোল্লেন, "এই

মেসের একটি ভদ্রলোক মা, কলেজে পড়েন। তোমার সামনেই বোসে আছেন তিনি।"

মেয়েটী দুটী হাত জোড় কোরে নমস্কার জানিয়ে বাল্লে, "আপনি বোসে আছেন বুঝতে পারিনি। কিছু মনে কোরবেন না। আপনার চা নিয়ে আসি?"

কিছু উত্তর দেবার আগেই সে বেরিয়ে গেল। এত কাছ থেকে তাকে দেখা এই প্রথম। তার সান্নিধ্য যেন আমার সারা বুকে একটা কিসের ঝঙ্কার বইয়ে দিচ্ছিলো। ... ...

বোল্লুম, "যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তো আপনার মেয়েটীকে আমার হাতে দিলে আমি সুখীই হব।"

"ও জন্মান্ধ এ জেনেও?"

"আজ্ঞে হ্যা।"

আমার পানে খানিকক্ষণ সবিস্ময়ে চেয়ে থেকে তিনি বাল্লেন, "কিন্তু বাবা, কেউ ওকে অন্ধা বোলে অবহেলা অনাদর কোরলে আমি তা সইতে পারবো না। তুমি যে দুদিন পরে কোরবেনা তার প্রমাণ?"

"যা কোরলে আপনার বিশ্বাস হয় আমি তাই কোরতে রাজি আছি। আপনি জানেন না আমি ওকে—ওকে—"

"বুঝেছি বাবা, তুমি ওকে ভালবেসেছ। কিন্তু ওকে তোমার হাতে ছেড়ে দিয়ে আমিও তো নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারবো না বাবা। আমার যে আর কেউ নেই।"

"আপনার কাছেই থাকবে—যত দিন না নেবার অনুমতি দেন।"

"আচ্ছা ভেবে দেখি। কাল্কে জানাবো তোমায়।"

চেয়ার ছেড়ে উঠলুম। মহিম বাবু সসব্যস্তে বোল্লেন, "না—না, তাকি হয়?—চা খেয়ে যাও। যুথিকা আন্তে গেছে। যদি না খেয়ে যাও—সে মনে কষ্ট পাবে।"

চার

রেবেকা প্রশ্ন কোরলো "সেই মেয়েটীকেই বিয়ে কোরেছিলে বুঝি?"

অমিয় উত্তর দিলো, "হ্যা বন্ধু।"

"কি যেন নাম বোল্লে তার?"

"যুথিকা—ডাক নাম যুঁই।

"জু?" ("Jew?")

"না—যুঁই। যুঁই এক রকম ছোট সাদা ধপধপে ফুল—ভারতে হয়। ভারী উগ্র মিষ্টি গন্ধ তার।"

"তারপর কি হোলো বল।"

দেহের মত মনেও যে তার অতখানি সৌন্দর্য্য সম্ভার লুকিয়ে ছিল, তা আগে বুঝতে পারিনি। যুথিকা যখন তার সুখ—শান্তি—আদর—ভালবাসার অফুরন্ত উৎসের দ্বার ধীরে ধীরে খুলে দিলো তখন শুধু মুগ্ধ নয়, বিস্মিতও হোলুম। স্বামী স্ত্রীর কাছে যা কিছু কামনা করে তার সবই সে হৃদয় উজার কোরে আমায় দিতে লাগলো, যেন আমার তৃপ্তিতেই সে তৃপ্তা,—আমার আনন্দেই সে আনন্দিতা,—আমার সুখেই সে সুখী, আমাকে ছাড়া যেন তার কোন অস্তিত্বই নেই। আমাদের বিবাহিত জীবন এক মহান্ স্বর্গীয় আনন্দে ভরপুর হোয়ে উঠলো। দুটী মাধবী লতার মত পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে আমরা দুটিতে সংসার পথ বেয়ে চল্‌লুম। ... ...

চাঁদেও কলঙ্ক থাকে। তার সদা হাস্যময়ী মুখখানাতেও তেমনি চাঁদের কলঙ্কের মত একটা বিষাদের কালো ছায়া যেন মাঝে মাঝে ভেসে উঠতো। সন্দেহ হোতো হয়তো অজান্তে ব্যথা দিয়েছি তাকে। জিজ্ঞেস কোরতুম, কেন অমন হয়। যুথিকা হাস্‌তো, "ও কিছু নয়গো, তোমার বোঝবার ভুল। আমার মনে আবার বিষাদ কিসের? বালাই!" দুটী বাহু দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে গালের উপর তার নরম গালখানা রেখে যুথিকা প্রমাণ কোর্‌তে চাইতো আমারই ভুল। কিন্তু তবুও আমার সন্দেহ নিরসন হোতনা একেবারে।

বি-এস-সি পাশ করবার দিন কয়েক পরে একদিন যুথিকাকে নিয়ে বটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে গেলুম। ...

আমি তাকে এটা ওটা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিলুম। "ঐযে সামনে দশতলা বাড়ীর মত উঁচু ওটা ওক গাছ—এদেশে বেশী নেই।" "এটা কি জানো? ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা—যাকে জহরী চাঁপা বলে। মস্ত বড় গাছ ফুলে একেবারে ভ'রে যায়। ঐযে নীচে কত প'ড়েছে। খাসা ফুলগুলো—এই নাও।" "ওই যে বাঁদিকে

একটা এলাচ গাছ—যে এলাচ পান দিয়ে দুবেলা খাও গো। দাঁড়াও একটা পাতা ছিঁড়ে দিচ্ছি তোমায়।” “সামনে খানিকদূরে কত সিজন ফ্লাওয়ার ফুঠেছে। এক জোড়া সাহেব মেম পাশাপাশি গা ঘেঁসে বসে আছে দেখ—যেন এক জোড়া সাদা পায়রা।” এমনি কত কি বোলে যাচ্ছিলুম, আর যূথিকাও চঞ্চলা বালিকাটীর মত আমার হাত ধরে পরম উৎসাহে দেখে বেড়াচ্ছিলো। সে যে অন্ধা তা মোটেই মনে হয়নি—মনে হচ্ছিল যেন যুঁই সবই দেখতে পাচ্ছে—ঠিক্ আমারই মত উপভোগ কোরতে পাচ্ছে। মাঝে মাঝে সেও প্রশ্ন কোরছিলো “হ্যাগা, তুমি গার্ডেনে আর কতবার এসেছ?” “আচ্ছা, স্যার বসু যে বলেন গাছের প্রাণ আছে—তবে কি ফুল ছিঁড়লে তারা ব্যথা পায়?” “এখানে নাকি একটা মস্ত বড় পুরোনো বটগাছ আছে—চল না দেখাবে।” “আচ্ছা বট অত বড় গাছ, তার ফল অত ছোট হবার মানেটা কি?” “আঃ খাসা গন্ধটীতো কি ফুল গো?” ... ...

দুজনে অনেকক্ষণ বেড়ালুম। যূথিকা বোল্লে, “আর হাঁটতে পারছিনে গো, চল কোথাও বসিগে খানিকক্ষণ।”

দুজনে বোস্‌লুম। মাথার উপর গাছের ডালে গোটা কয়েক নাম-না-জানা পাখী বিচিত্র সুরে গান গাইছিলো। “পিয়া পিউ” বা ঐরকম ~~কিছু~~, ঠিক ধরা গেল না। কাছে কোথাও কোন অজ্ঞাত স্থান থেকে মৃদু সুগন্ধ বাতাসে ভেসে আস্‌ছিলো—সম্ভবতঃ বিলিতি ফুলের। একটু দূরে গোটা কয়েক তাল গাছ মাথা উঁচু কোরে সগর্ব্বে দাঁড়িয়েছিলো—যেন তারা একটা মস্ত বড় যুদ্ধ জয় কোরে এসেছে। পশ্চিমে-ঢলে-পড়া সূর্য্য থেকে এক ঝলক রশ্মি গাছের ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে এসে যূথিকার সুন্দর মুখখানায় একটা অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়ে তুলেছিলো। ... ...

আমি নীরবে তার মুখখানার পানে চেয়েছিলুম।

যুঁই বোল্লে, “কি দেখছো গো?”

“কিছু দেখছি তোমায় কে বোল্লে?”

“আমার মনে হ’ল যেন তুমি আমার পানে চেয়ে আছ।”

আশ্চর্য্য! অন্ধার অনুভব শক্তি এত প্রখর হয় তা জানতুম না। বোল্লুম, “যুঁই তুমি ভারী সুন্দর!—এক ঝলক্ রোদ পড়ে তোমার মুখখানা যে কত সুন্দর দেখাচ্ছে তা কি বোল্‌বো!”

যূথিকার হাসিমাখা মুখখানায় হঠাৎ ফুটে উঠলো সেই কালো ছায়া!

তার সুগোল নরম হাতখানা চেপে ধোরে বোল্লুম, “আজ আর ফাঁকি দিতে পারবে না যুঁই! তোমার মুখখানা শুকিয়ে গেল কেন আমায় বোল্‌তেই হবে।”

যূথিকা নীরবে নতমুখে তার চাঁপার কলির মত অঙ্গুলে আঁচল জড়াতে লাগলো।

জিজ্ঞেস কোল্লুম, “বল তোমার কষ্ট কিসের—দেখতে পাওনা তাই?”

যুঁই হাসলো, “আমার চোখ নেই, কিন্তু তোমার চোখ দিয়েই তো আমি সব দেখতে পাই গো—তুমি জানো না।”

“তবে কি? বল।”

“শুধু একটা জিনিষ—যা তোমার চোখে দেখা যায় না। যদি বিধাতা শুধু সেটুকু দেখবার ক্ষমতা আমায় দিতেন তো আর কিছুই চাইতুম না।”

“কি জিনিষ? বল যুঁই!”

“তোমার মুখখানা। তোমার অন্তরটা আমি বেশ দেখতে পাই, কিন্তু তোমার বাইরেটা? যখনই তুমি বল আমি সুন্দরী, তখনই ঐ কথাটা আমার বুকে যেন কাঁটার মত বিঁধতে থাকে।”

যূথিকার দুটি চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে প’ড়লো। সান্ত্বনা দেবার মত কোন কথাই খুঁজে পেলুম না। তার অশ্রুসজল মুখখানি আমার বুকে দুহাতে চেপে ধ’রে নিঃশব্দে নির্নিমেষ নয়নে আকাশের পানে চেয়ে রইলুম। হায়রে অন্ধা নারী!

পাঁচ

রেবেকা প্রশ্ন করিল, “যূথিকা জন্মান্ধ?”

অমিয় মাথা নাড়িয়া জানাইল, “হ্যা”।

“দৃষ্টির কোন অনুভূতিই তার কোনকালে ছিল না অমিয়?”

“না বন্ধু! তবে হ্যা সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!”

রেবেকা জিজ্ঞাসু নয়নে চাহিল।

অমিয় বলিল, "যূঁই বলে, যখন তার বয়স বছর দুশেক হবে তখন একবার বড্ড অসুখে ভুগেছিল। সেই সময় একদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে সে নাকি কয়েক মুহূর্ত্ত আবছায়ার মত সব দেখতে পেয়েছিলো··· ···"

রেবেকার চক্ষুদুটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উত্তেজিত স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "পেয়েছিলো ?"

"যূঁই তাই বলে বটে। তবে আমার মনে হয় সেটা স্বপ্ন বা দৌর্ব্বল্য জনিত মানসিক ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়। যূঁই কিন্তু কিছুতেই তা স্বীকার কোরতে চায় না !"

রেবেকা পুনরায় উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "সিমিলার কেস্ !" (similar case !)

অমিয় জিজ্ঞাসা করিল, "কি বোল্লে ?"

রেবেকা সংযত হইয়া বলিল, "কিছু নয় বন্ধু ! তোমার কাহিনীটা শেষ কর। তারপর কি হোলো ?"

অমিয় বলিতে লাগিল, "তার পরকার কাহিনীটা খুবই সংক্ষিপ্ত। সেই দিন সেই ক্ষণে সেই উন্মুক্ত সুনীল আকাশের পানে চেয়ে চেয়েই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোরলুম যে যূঁথিকার সেই দৃষ্টিহীনতার দুঃখ দূর কোরতে প্রাণপণ কোরবো। ··· ···

বড় বড় যে কটী বিশেষজ্ঞ ছিলেন সবাই একে একে মাথা নেড়ে জানালেন, অসম্ভব। তবুও হতাশ হোলুম না। ভাবলুম নিজেই একবার চিকিৎসা শাস্ত্র মন্থন কোরে দেখবো এর প্রতিকার আছে কি না।

মেডিকেল কলেজে ছ'টা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম কোরে ডিগ্রি আর সোনার মেডেল পেলুম বটে, কিন্তু যা চেয়েছিলুম তা পেলুম না। এই সময় বাবা মাকে আর একটি ছোট ভাইকে রেখে দেহত্যাগ কোরলেন। সংসার ঘাড়ে পড়লো। আমার লক্ষ্যপথে চলতে চলতে হঠাৎ বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়ালুম—কটা মাস মানসিক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের ভেতর দিয়ে কেটে গেল। কিন্তু শীগগীরই মনকে স্থির কোরে ফেললুম। বাবা যা কিছু রেখে গিয়েছিলেন শুধু বসত বাটী ছাড়া আর সবই বিক্রী কোরে দিলুম। ভাইটীকে স্কুল বোর্ডিংএ আর মাকে একটী আত্মীয়ের হেপাজতে রেখে সবাইর কাছে বিদায় নিয়ে যূথিকাকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে এলুম এই জার্ম্মানীতে। কিন্তু কই, উদ্দেশ্যতো আমার সফল হোলো না। চিকিৎসা শাস্ত্র মন্থন কোরেও আমার অভিষ্ট বরতো লাভ কোরতে পারলুম না রেবেকা ! সবই যে আমার পণ্ডশ্রম হোলো !"

রেবেকা ধীর কণ্ঠে বলিল "শুধু বই পড়লেইতো শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না বন্ধু, অভিজ্ঞতা তার চেয়েও বেশী মূল্যবান।"

অমিয় কথা কহিল না।

রেবেকা অন্যমনস্কভাবে বলিল, "বার্লিনে অনেক বড় বড় বিশেষজ্ঞ আছেন, তাদের পরামর্শ নিতে পারো। হয় তো এমন কেউ থাকতেও পারেন যিনি—"

"দু চার জনের কাছে গেছ্লুম রেবেকা—কিন্তু কেউ আশা দিলেন না।"

"ডাক্তার হোল্‌ম্‌হজ ?"

"একদিন গেছ্লুম—দেখা পাইনি। আর যাবার ইচ্ছে নেই। কারণ আমি বেশ বুঝেছি বন্ধু, আমার আশা সফল হবার নয়।"

অমিয়র চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। রেবেকা গম্ভীর মুখে কি ভাবিতে লাগিল। ··· ···

কতক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল কেহ তাহার হিসাব রাখিল না। দেয়ালের ঘড়িটা ব্যর্থ প্রয়াসে টিক্ টিক্ করিয়া সাড়া দিতেছিল। ···হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া রেবেকা বলিল "বিদায় মিষ্টার চৌধুরী !"

অমিয় রেবেকার গতিশীলা দেহলতার পানে অশ্রুসিক্ত নয়নে ফিরিয়া চাহিল। দ্বারের বাহিরে গিয়া রেবেকা মিনিট খানেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দাদা তার এরোপ্লেন নিয়ে কাল ভোরে ভারতবর্ষের দিকে রওনা হবেন চৌধুরী। আমিও তার সঙ্গিনী হব। কাজেই হপ্তা তিনেক তোমায় আমায় দেখা হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তুমি যদি যাও তো—"

অমিয় বাধা দিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি যাব না রেবেকা। কবে যে যাবো তারও ঠিক নেই কিছু।"

"বেশ, তা হ'লে একখানা পরিচয় পত্র লিখে রেখো—ওবেলা নিয়ে যাবো'খন। সময় হয়তো যূঁইকে দেখে আস্‌বো। যদি তাকে চিঠি দিতে ইচ্ছা কর, দিও। চললুম অমিয় !"

রেবেকা কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই অমিয় ডাকিল, "রেবেকা শোন।"

রেবেকা ফিরিয়া চাহিল।

অমিয় বলিল, "আমায় ক্ষমা কোরেছ বলে যাও।"

রেবেকা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অমিয় বলিল, "তোমায় যা বোল্‌লুম এসব কথা যুঁইও জানে না। যদি দেখা হয়, তাকে বোলো না কিছু। আমার উদ্দেশ্য গোপন রাখতে পাছে ভুলে যাই সেই ভয়ে বিয়ের কথাটাও তোমায় এত দিন বলিনি। যদি জান্‌তুম একদিন বোল্‌তেই হবে তা হ'লে গোড়াতেই বোলতুম। বল আমায় ক্ষমা কোরেছ?"

রেবেকা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না বন্ধু, আমি স্থির কোরেছি প্রতিশোধ নেবো। এমন প্রতিশোধ নেবো যাতে কোরে—" কথাটা শেষ না করিয়াই সে ত্বরিত পদে চলিয়া গেল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া অন্তরের কথা কিছুই বোঝা গেল না। সে রহস্য করিতেছে কি না ভাবিয়া ভাবিয়া অমিয় যুগপৎ ভীত ও বিস্মিত হইয়া উঠিল।

ছয়

এক দুই করিয়া ছয় সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। রেবেকা ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়াছে অনেকদিন, কিন্তু অমিয়র সাথে দেখা করে নাই। অমিয় সংবাদ লইয়া জানিয়াছে সে বার্লিনে নাই—আশে পাশে কোনও পল্লীগ্রামে বেড়াইতে গিয়াছে।

সেদিনও সন্ধ্যায় সে প্রতিদিনের মত তাহার ড্রইংরুমে একলাটী বসিয়াছিল। ঘরটা তখনো অন্ধকার, কারণ সুইচ টিপিয়া ঘরটা আলোকিত করিবার কোন প্রয়োজন সে অনুভব করে নাই। তাহার ঐকান্তিক সাধনা নিষ্ফল হওয়ায় সে হতাশ হইয়াছিল বটে কিন্তু রেবেকার ঔদাসীন্যও তাহার মনকে বড় কম আহত করে নাই। প্রবাসে রেবেকাই ছিল তার সান্ত্বনার আধার —পরম বন্ধু। সেই বন্ধুহারা হইয়া সে যেন একেবারে নির্জীব নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল।—

আপনার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে অমিয় এত বিভোর হইয়া পড়িয়াছিল যে কখন কে আসিয়া নিঃশব্দে দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়াছিল সে মোটেই তাহা বুঝিতে পারে নাই। মাথার উপরে আলোটা হঠাৎ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেই সে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, রেবেকা। তাহার মুখখানা মুহূর্তের জন্য আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া আবার তখনই ম্লান হইয়া গেল।

রেবেকা ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া ডাকিল "অমিয়।" অমিয় চাহিল—অর্থহীন দৃষ্টি।

রেবেকা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি অসুস্থ অমিয়? বিশ্রী রোগা হ'য়ে গেছ যে!"

অমিয় ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "ও কিছু নয় রেবেকা, অনেক দিন পরে দেখ্‌ছো তাই বোধহয়।

রেবেকা কপালে হাত দিয়া দেখিল, নাড়ীর গতি অনুভব করিল, চোখের পাতা উল্‌টাইল। তারপর পার্শ্বস্থ চেয়ারটা অমিয়র সম্মুখে টানিয়া আনিয়া বসিয়া পড়িল। একটা মৃদু উষ্ণ নিশ্বাস তাহার অজ্ঞাতসারে বুকের মধ্য হইতে বহির হইয়া আসিল।

অমিয় বিদ্রূপ করিল, "ষ্টেথোস্কোপ দোবো?"

রেবেকা বলিল, "দরকার নেই। তোমার অসুখের কারণ আমি টের পেয়েছি বন্ধু!"

অমিয় বিকৃত স্বরে উত্তর দিল, "শুনে কৃতার্থ হোলুম।"

রেবেকা বুঝিল অমিয় রাগিয়াছে। ক্রোধের উৎস কোথায় তাহাও বুঝিল। মনে মনে হাসিয়া বলিল, 'ভারতবর্ষ থেকে ফিরে এসে একটা কাজে এমন জড়িয়ে প'ড়েছিলুম যে তোমার সাথে দেখা করবার মোটেই ফুরসুত পাইনি। তুমি রাগ ক'রেছ, কিন্তু—"

অমিয় বাধা দিল, "আমিতো ওসব শুন্‌তে চাইনি।"

"তা চাওনি বটে। আচ্ছা বেশ শুনোনা। যা বোলতে তোমার কাছে এসেছি তাই বলি। ভারতবর্ষে তোমার যুথিকার সাথে দেখা হ'লো। ভারী চমৎকার মেয়ে সে। আমার সাথে এত ভাব হোয়ে গেছে যে বল্‌বার নয়। তাকে ভালবাসাটাই খুব স্বাভাবিক, না বাস্‌তে পারাটা আশ্চর্য্যের কথা। কিন্তু তার উপর আমার সত্যি হিংসে হয়।"

"যুঁই কেমন আছে? কি বোল্লে সে?"

পুষ্পপাত্র-

সাপুড়ে

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ কলিকাতা।

"শারীরিক ভালই আছে। বোল্লে—সে অনেক কথা তোমায় বোল্‌বোনা। বোলে আমার কি লাভ ?"

অমিয় কথা কহিলনা। কয়েকটী নীরব মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল।

সহসা রেবেকা বলিল, "বেড়াতে যাবে অমিয় ? কাল বিকেলে ?"

অমিয় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মাথা নাড়িল।

"একটা ভারী অশ্চর্য্য জিনিষ দেখাবো ?"

অমিয় বলিল, "দেখ্‌তে চাইনে।"

"চাওনা ?"

"না।"

"কেন ?"

"তোমাকে বিশ্বাস কি ? তুমি সব পারো।"

রেবেকার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, বলিল, "বেশ দেখোনা। চল্লুম বন্ধু, নমস্কার।" রেবেকা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। দুই পা অগ্রসর হইয়া মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, "যুঁই যদি জিজ্ঞেস করে তো বোল্‌বো তুমি তাকে দেখ্‌তে চাওনা।"

অমিয় চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল, রেবেকার একখানা হাত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "যুঁইয়ের কথা কি বোল্‌ছিলে ?"

রেবেকা উত্তর দিল, "উঃ ছাড়্‌। তুমিতো শুন্‌তে চাওনা বন্ধু!"

"না—চাই। বল রেবেকা,—কোথায় সে!"

রেবেকা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল "যুথিকা এই বার্লিনের কাছেই আছে—আমি নিয়ে এসেছি তাকে।" অমিয় সন্দেহোৎসুক নেত্রে চাহিয়া বলিল "নিয়ে এসেছো! কেন ? তোমার উদ্দেশ্য কি।"

রেবেকা হাসিয়া বলিল, "প্রতিশোধ নোবো।" তারপর একটু থামিয়া বলিল, "ভয় নেই অমিয় তুমি যাকে ভালবাসো তাকে—হা, দেখ, তোমার শশুরও সঙ্গে আছেন।"

রেবেকা সত্যই যুথিকার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে অমিয় একথা বিশ্বাস করিতে চাহিলনা। তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া সে ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। বলিল, "কোথায় রেখেছ তাকে ? আমায় নিয়ে চল রেবেকা।"

রেবেকা মৃদু হাসিয়া চেয়ারের হাতলের উপর বসিল। একখানা সুগোল শুভ্র হাত অমিয়র পিঠের উপর রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "এক্ষুনি ? না বন্ধু, আজ থাক্। কাল বিকেলে তৈরি হোয়ে থেকো—নিয়ে যাবো।"

সাত

তরুছায়া শীতল গ্রাম্যপথে মোটরখানা যথা সম্ভব দ্রুতবেগে ছুটিতেছিল।......

রেবেকা বলিল, "মনে থকে যেন অমিয়, শুধু দেখ্‌তে পাবে, কিন্তু একটী কথাও কইতে পাবেনা আজ। এই চুক্তিতে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। যদি ভুলে কিছু বোলে ফেল, আর তোমায় চিন্‌তে পেরে সে হঠাৎ বেশী উত্তেজিতা হোয়ে পড়ে, তবে হয়তো তার ফল খারাপ হোতেও পারে। মামাতো তোমায় নিয়ে যেতেই নিষেধ কোরেছিলেন। অমি অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করেছি।"

অমিয় বলিল, "না, আমি নিঃশব্দেই বোসে থাকবো। কিন্তু সেকি সত্যি ভাল হবে রেবেকা ?"

ঈশ্বরের হাত। তবে মামা এর একটী কেস্ অপারেশন ক'রে সারিয়েছেন জানি—অবিকল এই রকমের কেস্।"

"ব্যাণ্ডেজ খোলা হবে কখন ?"

মণিবন্ধ সংলগ্ন ক্ষুদ্র ঘড়িটার দিকে চাহিয়া রেবেকা উত্তর দিল, "সময় প্রায় হোয়ে এলো বন্ধু!—আজ ঠিক চোদ্দ দিন পরে।"

"আর কতদূর ? পথ যে আর ফুরোয় না!"

রেবেকা বহিরের দিকে চাহিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, "অধীর হোয়োনা বন্ধু—এসে পড়েছি।"

সুবৃহৎ সুন্দর বাড়ীখানি আইভি লতায় ঘেরা। দুই পার্শ্বে ফুলের বাগানে ইন্দ্রধনুর রঙ্ ফুটিয়া রহিয়াছে। মোটর খানা ধীরে ধীরে ফটক অতিক্রম করিল।—

ডাক্তার হজ্ রহিম বাবুর সহিত লাইব্রেরিতে বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। উভয়কে দেখিয়া উঠিয়া দাড়াইয়া

বলিলেন, "এইযে ডাক্তার চৌধুরী—গুড্ আফ্‌টার্ নুন্। সময় হোয়ে গেছে। আপনাদের অপেক্ষায়ই বোসে আছি আমরা। আর দেরি নয় চলুন।"

সকলে নিঃশব্দে দ্বিতলের সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

হঠাৎ থামিয়া মুখ ফিরাইয়া ডাক্তার হোল্‌ম্ হজ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রেবেকা, ডাক্তার চৌধুরীকে বোলেছো ?"

রেবেকা উত্তর দিল, "বোলেছি মামা।"

অমিয়র দিকে চাহিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আপনিও ডাক্তার,—সাবধান কর্‌বার বিশেষ প্রয়োজন নেই, তবু আমার কর্ত্তব্য হিসেবেই বলি। মনে রাখ্‌বেন আপনার স্ত্রীর ভালোর জন্যই এই মুহূর্ত্ত থেকে আপনাকে বোবা হোতে হবে।"

তারপর মহিম বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর আপনাকেও।"

উভয়ে মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলে ডাক্তার হজ্ অগ্রসর হইলেন।—

জানালার মোটা কাল পরদাগুলি কক্ষটীকে প্রায় অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছিল। এক পার্শ্বে ছোট্ট টিপয়ের উপর ঘোর সবুজ চিমনির আড়ালে মোমবাতিটা মিটি মিটি জ্বলিয়া যেটুকু আলোক বিকীরণ করিতেছিল তাহাতে কোন রকমে দেখা যায় মাত্র। সকলে দরজার পরদা সরাইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

যুথিকা ইজি চেয়ারে শুইয়া পার্শ্বোপবিষ্ট নার্সের সহিত গল্প করিতেছিল। পদশব্দে উঠিয়া সহাস্যে বলিল, "আসুন ডাক্তার হজ! আপনার আসবার অপেক্ষায় আমি অস্থির হোয়ে উঠেছি। রেবেকা কই ?"

রেবেকা সাড়া দিল, "এই যে যুঁই।"

ডাক্তার হজ অমিয় এবং মহিম বাবুকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দুইখানা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া গম্ভীর মুখে রেবেকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সলিউসন টা ?

রেবেকা নিঃশব্দে নীল তরল পদার্থে পূর্ণ একটী কাঁচের পাত্র আনিয়া যুথিকার পার্শ্বে টেবিলের উপর রাখিল। ডাক্তার তরল পদার্থ টা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তার পর যুথিকার পশ্চাতে গিয়া ধীরে ধীরে ব্যাণ্ডেজ খুলিতে লাগিলেন। খোলা হইলে রেবেকা নীল জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া ধীরে ধীরে লঘু হস্তে যুথিকার চোখ দুটী ধোয়াইয়া দিল।

অমিয় নীরবে দুরু দুরু বক্ষে বসিয়াছিল। রেবেকা ইসারায় জানাইল, কথা কহিও না। ... ...

যুথিকা অর্থহীন দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে এক বার অমিয়র দিকে চাহিল, এক বার পিতার পানে চাহিল, তার পর রেবেকার পানে চাহিল। তার পর হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি দেখতে পাচ্ছি—দেখতে পাচ্ছি!"

অমিয় চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। রেবেকা বিদ্যুৎ বেগে যুথিকার হর্ষবিস্ময়দীপ্ত মুখখানা বুকে চাপিয়া ধরিয়া অমিয়র পানে ভ্রূকুঞ্চিত নয়নে চাহিয়া অধর যুগলে তর্জ্জনী স্পর্শে জানাইল—"চুপ! খবর্দ্দার!" অমিয় পুনরায় চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

যুথিকা রেবেকার মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিই রেবেকা ?"

রেবেকা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমার কি মনে হয়, আমি কে ?"

যুথিকা হাসিল, বলিল, "আমি ভাবতুম তুমি বুঝি বুড়ো। কিন্তু তাতো নয়! তুমি ভারী সুন্দরীতো!"

রেবেকা প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া উঠিল।

যুঁই মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কই ?"

"কে ? মিষ্টার চৌধুরী ? তিনি এসে পৌঁছোন নি যুঁই, তোমার বাবা আন্‌তে গেছেন তাকে।"

অমিয় পুনরায় চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল। রেবেকা তাহার পানে ভ্রূকুটি-কুটিল নয়নে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, 'ডাক্তার মিটার! আপনি ডাক্তার ডাট্‌কে নিয়ে লাইব্রেরী ঘরে বসুনগে যান্। মামা একটু পরে যাবে'নখন।"

অমিয় ও মহিম বাবু এক বার রেবেকার দিকে ও এক বার যুথিকার দিকে চাহিয়া দেখিয়া নীরবে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

যুথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "মামা কোথায় রেবেকা ?"

প্রৌঢ় ডাক্তার হোল্‌মহজ তখনো পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রোগিনীকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "এই যে মা, দেখতে পাচ্ছো আমায়?"

যুথিকা মাথা নড়িয়া জানাইল, দেখিতেছে।

ডাক্তার হজ তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "চিয়ারো চাইল্ড!" তারপর রেবেকার পানে চাহিয়া বলিলেন,"আমি লাইব্রেরীতে যাচ্ছি মা, সলিউসনটা ঘণ্টায় একবার—ঘুমিয়ে না পড়া অবধি।"

আট

বার্লিনের জনসমাকীর্ণ ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া ট্রেণখানা সশব্দে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।...

প্ল্যাটফর্ম্মে একটী সৌম্যমূর্ত্তি প্রৌঢ়ের স্কন্ধে ভর দিয়া কোন সুন্দরী যুবতী থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কাহারও উদ্দেশ্যে প্রাণপণে রুমাল নাড়িয়া বলিতেছিল, "বিদায় বন্ধু বিদায়!" চোখে তাহার সর্ব্বহারা উন্মাদের দৃষ্টি, মুখে হাসির আবরণে অন্তরের দাবদাহ লুকাইবার অক্লান্ত চেষ্টা।—

ধুরে ট্রেণের কামরা হইতে মুখ বাড়াইয়া দুইটী তরুণ তরুণী পাশাপাশি হাসিমুখে রুমাল নাড়িয়া প্রত্যুত্তর দিতেছিল।...

দৃষ্টি ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিল। ট্রেণ সবেগে দূর হইতে আরও দূরে ছুটিয়া চলিয়াছে। যুবতী এক মুহূর্ত্ত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া প্রৌঢ়ের গায়ে ঢলিয়া পড়িল।

তরুণ তরুণী থমকিয়া পরস্পরের পানে ফিরিয়া চাহিল। কেহ কোন কথা কহিল না। উভয়েই দেখিল উভয়ের চক্ষে অশ্রুবিন্দু টলমল করিতেছে।

গৃহলক্ষ্মী

কণাদেবী

বঙ্গনারী পতিব্রতা
হে কল্যাণময়ী,
তব পুণ্য চিত্র আঁকি
সাধ ছিল মনে
সীতা সাবিত্রীর যুগে
সেই তপোবনে
যুগ যুগান্তের তুমি
হে মহিমময়ী।

বিলাস বাসনা স্রোতে
পুরুষ যেথায়
উদ্দাম চপল তৃণ
ভাসিয়া বেড়ায়
থাক সতি পতি পাশে
বিপদে সম্পদে,
ভারত রমণী চির আদর্শ জগতে,
ধ্রুব জ্যোতিঃ আঁধারেতে আলোকের রেখা
নিত্য নব কল্যাণের আলো দীপ শিখা॥

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীঅমলা দেবী

১৮

লতিকা তখনও নরেশের শুভ্র পা দু'খানির মধ্যে মুখ গুঁজে চোখের জলে শুধু একটি কথাই বার বার বলছিল—"তুমি যেও না, আমি তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না, শুধু তুমি বল তুমি যাবে না।"

বিব্রত নরেশ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আস্তে আস্তে ওকে মাটির থেকে টেনে তুলে—"আঃ—লতু তুমি এরকম ছেলেমানুষী করছ কেন! রাতারাতিই ত আর আমি পালাচ্ছিনে, চল শোবে চল"।

লতিকার হাতখানা ধরে নরেশ শয্যার ওপর বসল, লতিকাকে নিজের পাশে এনে বল্লে—"চুপ করে লক্ষীমেয়ের মত এবার ঘুমিয়ে পড়"।

লতিকার কান্না এতক্ষণে থেমে গিইছিল, এবার চোখটা ভাল করে আঁচলে মুছে নিয়ে, নিজের দুর্ব্বলতাটাকে প্রকাশ করে ফেলার বিরক্তি ও অপ্রতিভতাটাকে গোপন করবার জন্যে চুপ করে মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল।

নরেশ আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বল্লে—"এক দুই তিন, শিগগির শুয়ে পড়—আমি এবার আলো নিভিয়ে শোব"।

লতিকা আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল, নরেশ সুইচটা টিপে আলো নিভিয়ে লতিকার পাশেই শুয়ে পড়ল।

রাত্রি গভীর হয়ে আসে, সন্ধ্যা থেকেই মেঘ করে- [illegible] এখন ঝড় ওঠে উদ্দাম—চঞ্চল বেগে। বৃষ্টি নামে [illegible]। ঘুম উভয়েরই আসে না। ওরা দুজনেই [illegible] রয়েছে।

বিবাহের পর নরেশের আচরণে লতিকার অবমানিত নারীত্ব ঘৃণায় বিমুখ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার পর—তার পর ও নিজের বিমুখ অন্তরকে আবার শান্ত করল—ও যে স্বামী, ও যে দেবতা।

সে দেবতা অব্যয় অব্যক্ত চিন্ময় ঈশ্বর নয়, সে স্রষ্টা শিল্পীর হাতে গড়া পাষাণ দেবতা।

ওকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করতে হয় নইলে অমঙ্গল হবে। কিন্তু তোমার দুঃখে যদি পাষাণ না টলে তা হ'লেও অনুযোগ করতে নেই, দেবতাকে অপরাধী বল্লেও অপরাধ হয়।

লতিকার জাগ্রত চোখে স্বপ্ন নামে।

স্বামী যদি ওকে অন্তরের দিক থেকে বঞ্চিত করে ত' করুক। ও সুদূর অনাগত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখে, সেখানে ওর কোন অভাব অভিযোগ অপূর্ণতা নেই, পুত্র কন্যা বধূ জামাতা, এমন কি তাদের কোলেও শিশু মুখ, কল্পনার পথ দিয়ে ভেসে আসে, সেখানে ও তৃষিতা প্রিয়া নয়, সেখানে, ও মহারাজ্ঞী—রাজরাজেশ্বরী মহিমময়ী জগদ্ধাত্রী রূপা।

হায়রে বাঙ্গালীর মেয়ে!

বাইরে কড় কড় করে মেঘ ডাকে, দূরে হয়ত বাজ পড়ে, লতিকার স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে পড়ে।

আবার কাটে অনেক্ষণ।

লতিকা এবার আস্তে আস্তে সরে এল নরেশের দিকে, নরেশও পাশ ফিরে শুয়েছিল, লতিকা নিজের [illegible] হাতখানা উঁচু করে তার ওপর নিজের মাথা [illegible] হাত দিয়ে নরেশের মাথাটা সযত্নে টেনে এনে, [illegible] বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে [illegible]

লতু মনে করেছিল নরেশ ঘুমিয়ে, কিন্তু ও জেগেই ছিল, নরেশ লতিকার দিকে পাশ ফিরল, ওর বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে লতিকাকে আরো কাছে টেনে এনে দুইহাতে মুখখানা চেপে ধরল, মুখখানা ওর নত হয়ে এল লতিকার মুখের ওপর—সেই এক মুহূর্ত্তে লতিকার মনে হল ও হিন্দুর মেয়ে, সাবিত্রী যমের হাত থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিলেন ও তেমনি করেই বিনীতার হাত থেকে ওর স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

ত্রেতাযুগে রাবণের রাণী ছিল মন্দোদরী। বালীর তারা, রামের সীতা, কিন্তু কলিযুগের সাম্য তন্ত্রে ওরা সবাই এক। রাবণের রাণী মন্দোদরী নয়, এ যুগে রাবণের জন্য ও সীতারি সৃষ্টি হয়।

নরেশ কিন্তু পরক্ষণেই পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল, বিরক্ত স্বরে বল্লে—"এখনো ঘুমোওনি? আঃ—সমস্ত রাত জেগে রয়েছ কেন, অসুখ করবে যে!"

মেঘ ও রৌদ্র, প্রথম ব্যাপারের সঙ্গে শেষ কথাগুলির কোন সামঞ্জস্য নেই।

লতিকা একটু চুপ করে থেকে পরে বল্লে—"অসুখটা আমারি একচেটে নাকি? তুমি কেন জেগে আছ?"

"আমি জেগে আছি বলে তুমিও জেগে থাকবে এমনত কোন কথা নেই।"

লতিকাও হাসলে, বল্লে—"কেন নেই? নিশ্চয় আছে।"

—"নিশ্চয় আছে মানে, আমি সে অধিকার কি কখন তোমাকে দিইছি?"

—"না হিন্দুর মেয়েকে ও অধিকার দিতে হয় না। তার স্বাভাবিক স্বধর্ম্মে সে আপনি নেয়।"

একটু দুঃখিত স্বরে নরেশ বল্লে—"হিন্দুত্বের কথা ত' নয় লতু।"

—"কেন নয়? আমাদের বিয়েটাত আর কোরাণ সরিফ দিয়ে হয়নি। সে আমাদের দাড়ি গোঁফ কামান, নেড়া মাথায় দেড় হাত টিকি কেনো ভটচায ভুল উচ্চারণে হিন্দুর দেবভাষা উচ্চারিত করে দিয়েছিল।

আর হিন্দু বিয়ের মন্ত্রের ভয়েই ত তুমি দেশত্যাগী হচ্ছ, বিলিতি বিয়ে হ'লে কি আর দেশ ছাড়তে, ঘরে বসেই বিবাহ-বিচ্ছেদ করাতে পারতে"।

নরেশ ক্ষীণ হাসি হাসলে—"না লতু আজ আর নিজেকে মিথ্যার আবরণে চাপা দেব না, তুমি ভুল করছ, আমি তোমার ভয়ে দিল্লী যাচ্ছিনে।"

এবার লতিকা চুপ করে গিইছিল, হঠাৎ নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রশ্ন করে ফেল্লে—"তবে?"

লতিকার আজ দুঃখের সঙ্গেও অন্তরে গর্ব্ব জেগেছিল স্বামীকে ও দুর্ব্বল করতে পেরেছে, তাই আজ নরেশ ওরই সঙ্গ-ভয়ে দেশ ছাড়ছে। কিন্তু যখন নরেশের মুখেই শুনল যে তার জন্যে ও যাচ্ছে না, তখন লজ্জায় দুঃখে ক্ষোভে অপমানে, ওর সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে উঠল, ও ভুলে গেল মন্ত্রশক্তি অসীম ক্ষমতার কথা!

নরেশ বলতে লাগল—"আমি এতদিন আশায় ছিলুম, বিনীতার কর্ম্ম-জীবনে যেদিন ক্লান্তি আসবে, সেদিন ও আমারি কাছে এসে দাঁড়াবে, সেইদিনটির আশায় আমি একটি একটি করে দিন কাটাচ্ছিলাম। কিন্তু আজ সে পরিষ্কার না বলে দিয়েছে। আজ ঘরের কোণে চুপ করে এলোমেলো ভেবে কোন লাভ নেই, তাকে আমার ভুলতে হবে।"

লতিকা কোন সাড়া দিলে না, অনেকক্ষণ পর্যান্ত ওর সাড়া না পেয়ে নরেশ প্রশ্ন করল—"কি ভাবছ লতু?"

লতু শুষ্ককণ্ঠে হেসে উঠল—"ভাবছি কি জান, দেশ-মায়ের আবরণে বিনীতাকে চাপা দিয়ে আমাকে এমন অদ্ভুত করবার তোমার কি প্রয়োজন ছিল।

মা বৌ চেয়েছিলেন, বিনীতাকে এনে দিলেই পারতে, তুমি সুখী হতে। তোমার স্ত্রীকে মা বাবা ফেলে দিতে পারতেন না। আর যদিই দিতেন, তুমি ত অক্ষম ছিলে না।"

—"কিন্তু সে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছিল লতু!"

লতিকা বিস্মিত আঁখি তুলে নরেশের দিকে চাইল।

একি ওর বিশ্বাস না শুধু আবৃত্তি!

একটু থেমে লতিকা বল্লে—"একি তোমাদের school girl sentiment নয়? এতখানি যখন এগিয়েছিলে তখন এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, একান্ত মনে অন্তরে যাকে চাও বাইরে তাকে শুধু দুটো আদর্শের স্তোক দিয়ে ভুলে থাকবে, প্রেমের পথ কি এতই সোজা। তোমরা দূরে যাওনি; শুধু

মাঝখানে আমার আড়াল তুলে একটা অদ্ভুত অবস্থা ঘটিয়ে তুলেছ। যে দুঃখকে হাসিমুখে সহ্য না করা যায়, যে বেদনা গৌরব দেয় না, সে শুধু বোঝা। অন্তরকে জীর্ণ করে; বাহিরকে রুক্ষ করে। দূরে যাওয়ার দুঃখকে তোমরা সহজ করে নিতে পারনি; কোন দিন না। ধ্যান করে কাটাতে পারে তারা যারা পরম ভাবে পেয়েছে, কিম্বা একেবারে পায়নি। তোমাদের মধ্যে যা ছিল সে কি ধ্যান? সেত অনুষ্ঠান; আমাকে তোমাদের সেই অনুষ্ঠানের ত্রুটি-হীন সাক্ষী করে রেখেছ! কিন্তু না থাক।"—বলে লতিকা মুহূর্ত্ত চুপ করে বল্লে—"বিনীতাকে তুমি বিয়ে কর আমি দুঃখ পাব না।"

"বিনীতা বলেছে তোমাকে সুখী করতে, তোমাকে দুঃখ দিয়ে সে বিয়ে করবে না।"

নরেশর কথায় এত দুঃখেও লতিকার হাসি এল, প্রেম ও ভিক্ষা করে নেবে বিনীতার কাছ থেকে! মুখে বল্লে—"বিনীতা এ ধরণের কথা বলবে সে আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু আমার জন্যে যদি বিনীতা বিয়ে না করে, তা'হ'লে আমাদের তিনজনের মধ্যে কেউ কি সুখী হ'বে?"

ঢং ঢং করে বড় ঘড়িটায় তিনটে বাজল, নরেশ বল্লে—"এবার ঘুমিয়ে পড়।"

ও পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

লতিকা অন্ধকারে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল, নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে, ও আকুল হয়ে যুক্ত করে ভিক্ষা চায়,—"এবার আমায় মুক্তি দাও ঠাকুর, সহজ হ'তে দাও।"

... ...

স্নান সেরে সত্যবালা ছেলেদের খাবার গুছিয়ে রাখছিলেন, লতিকা পাশে এসে বসল—"মা।"

সত্যবালা মুখ তুলে বধূর দিকে চাইলেন—"কি মা, কিছু বলবে?"

একটু চুপ করে থেকে লতিকা বল্লে—"উনি আবার দিল্লী যাবেন শুনলাম।"

"কে বল্লে নরেশ? তা তুমি শুনে কিছু বল্লে না?"

—"আমি আর কি বোলবো মা!"

বধূর মুখে এমন হতাশার সুর বেজে উঠল, যে সুর উনি আর কখন শোনেন নি।

উনি লতিকার দিকে চেয়ে রইলেন, আজ ওর মুখের দিকে চেয়ে ওঁর মাতৃহৃদয় দুঃখে বেদনায় হাহাকার করে উঠল।

আজ বধূর স্বামী-প্রেম লাভের অক্ষমতার কথা মনেও পড়ল না, আজ অন্তরের জননী গর্জ্জে উঠল সন্তানকে দুঃখের আবর্ত্ত থেকে রক্ষা করতে না পারার বেদনায়। চোখের কোণে জল হয়ত উচ্ছল হয়ে উঠেছিল, উনি কাজ ফেলে দিয়ে উঠে পড়লেন।

লতিকার চিবুক স্পর্শ করে হাতখানা ঠোঁটে ঠেকিয়ে তার পর মাথায় হাত রেখে বল্লেন—"আশীর্ব্বাদ করি মা নরেশ যেন তোমায় চিনতে পারে।"

উনি আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

—১৯—

নরেশ কে আটকান গেল না। মায়ের চোখের জল, পিতার নিষেধ সমস্ত ব্যর্থ করে সে চলে গেল দিল্লী।

যাবার সময় সত্যবালা নরেশের হাত ধরে মিনতি করে বলেছিলেন—"দেরী করিস নে—বাবা যত শিগগির পারিস ফিরতে চেষ্টা করিস।"

নরেশ কোন কথা বলেনি, শুধু ঘাড় নেড়ে জানিয়ে ছিল যে সে দেরী করবে না।

নরেশ গিয়ে মোটরে উঠল, লতিকা সত্যবালার পাশ থেকে আস্তে আস্তে ফিরে গেল নিজের ঘরে।

এতক্ষণের সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ল, লতিকা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে আকুল হয়ে কেঁদে উঠল। অশ্রু ওর বিরহের নয়, ওর পরাজয়ের।

অনেকক্ষণ কেটে গিইছিল, কতক্ষণ তা কে জানে, মাথার ওপর হাতের স্পর্শ পেয়ে লতিকা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে মুখখানা মুছে ফেলে চেয়ে দেখল চেয়ারের পাশে সত্যবালা দাঁড়িয়ে, লতিকা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াইতেই সত্যবালা ওকে দুইহাতে জড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন, আবার অনেকক্ষণ কেটে গেল,

এতক্ষণ পরে সত্যবালা বল্লেন—"এখুনি রমলা এসে পড়বে, চল খপ করে চুলটা বেঁধে দিই।"

—"থাকগে মা, আজ রমলাদিকে বারণ করে পাঠাই, বলে দি যে আজ আমার অন্য কাজ আছে।"

"না মা, রমলা এলে তবু পড়া শুনা এদিক ওদিকে মনটা ভাল থাকবে!"

এবার লতিকা আর কোন কথা না বলে সত্যবালার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

খানকতক বই হাতে করে রমলা এল। লতিকা রমলাকে নিয়ে নিজের ঘরে এসে বসল। একটুখানি নতুন রকম সেলাই দেখিয়ে দিয়ে, রমলা লতিকাকে পড়াতে বসলে। পড়াতে পড়াতে রমলা লতিকার দিকে চাইল—"আজ আর তোমার পড়ায় বোধহয় মন লাগছেনা, না লতু?" বলে একটু অর্থ পূর্ণ হাসি হেসে উঠল।

লতিকার ঠোঁটের কোণে একটু ক্ষীণ হাসি ফুঠে উঠেই মিলিয়ে গেল, অতখানি সৌভাগ্য থাকলে ত ও বেঁচে যেত, বিরহের বেদনা বহন করা সে ও ত মানুষের সৌভাগ্য।

লতিকাকে যে মালা-বদলের মালার রজ্জুতে কণ্ঠ বেঁধে, শালগ্রামের পাষাণ ভার বুকে চাপিয়ে, ধর্ম্মের মহাসাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রমলা আজ পাড়ার বই খানা বন্ধ করে রাখল—"আজ পড়া থাক, আর হ্যাঁ দেখ এই বইখানা তোমার জন্যে নিয়ে এলাম, তুমি সময় মত পড়ে দেখ, তোমার ভাল লাগবে বোধহয়। বেশ বই আজকের দিনে প্রত্যেক নারীর ভাববার বিষয়।"

লতিকা বই খানা হাতে নিয়ে খান কতক পাতা উল্টে দেখল তার পর টেবিলের ওপর বই খানা রেখে একটু হেসে বল্লে—"আপনাকে একটা কথা বলব, আশা করি কিছু মনে করবেন না, আপনার হাতে কিন্তু এ বই মানাচ্ছেনা, স্ত্রী-স্বাধীনতার বক্তৃতা দেওয়া, স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয় লেখা, কিম্বা খুব ভাল বলে পড়ে হাততালি তারাই দেবে, যারা ন্যায্য বলে ঘরের পুরুষদের অত্যাচার নির্ব্বিকার চিত্তে হজম করে, তারাই বাইরের লোকদের চমকে দেবার কিম্বা ভয় দেখাবার জন্যে স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা বলে। আপনার মনে এ ধরণের প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়, কারণ ওর মীমাংসা আপনার ত হয়ে গেছে।"

—"লতু এ কথাগুলো ঠিক ছাত্রীর মত নয়!" বলে রমলা হেসে আবার বললে—"ওকথা বলা তোমার অন্যায়, আমি সুখে আছি বলেই চোখ বন্ধ করে বসে থাকব চারিপাশে চেয়ে দেখবো না?"

—"আমি ঠিক ওধরণের কথা বলিনি, চেয়ে দেখবো চোখ দিয়ে, অনুভব করব অন্তর দিয়ে, কাগজে কিম্বা মুখে তুবড়ী ছোটান নয়, প্রত্যেকের স্বাধীনতার কথা ভাবতে হ'বে, স্ত্রী বলে নয় পুরুষ বলেও নয়—মানুষ বলে।"

বলে লতিকা একটু হেসে এস্রাজটা টেনে নিয়ে বল্লে—"যাক গে ওসব কথা, একটু বাজনা বাজান যাক, তর্ক করতে গেলে প্রত্যেক কথার সঙ্গে এমন যুক্তি দেওয়া উচিত যে অপর পক্ষ অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে উত্তর ভাবে, তা না হ'লে তর্ক মানে শুধু হট্টগোল, অত যুক্তি আমার মধ্যে নেই। অতএব তর্ক না করাই ভাল। তর্ক ঠিক মদের মত, ওষুধের সঙ্গে অল্প হয়ত উপকার দেয়, কিন্তু বে-হিসিবী—অকারণে খেলে পুলিশের ঝোলায় চড়বার সম্ভাবনা আছে।"

লতিকা এবার চুপ করে বাজনাটা বাজাতে লগল।

ঝি ডাকল—"গো ঠাকরুণ, মা ডাকছেন।"

লতিকা সত্যবালার উদ্দেশ্যে চলে গেল। খানিক পরে ফিরে আসতে আসতে শুনতে পেল, রমলা তার সুন্দর মিষ্ট গলার সুর এস্রাজের সঙ্গে মিলিয়ে গাইছে।

—'শুধু এই টুকু মোর রইল অভিমান
ভুলতে কি গো পার ভুলিয়ে মোর প্রাণ।"

লতিকা এসে রমলার পাশে বসে পড়ল। গান শেষে খানিকটা গল্প করে রমলা উঠে পড়ল—"লতু অমি কাল আবার আসব'খন, আজ ত তোমার মন লাগছে না।"

লতিকা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

এখন অনেকখানি অবসর, হাতে কোন কাজ নেই লতিকা রমলার গাওয়া গানটী বাজনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইতে লাগল।

... ...

শৈলেশ্বর বাবু এতক্ষণ নিজের ঘরে চেয়ারে আড় হয়ে শুয়েছিলেন, চিন্তার পর চিন্তার স্রোতে ওঁর মন আকুল হয়ে উঠছিল, নরেশ ওঁকে দিনের পর দিন চিন্তার অকুল পাথারে ডুবিয়ে দিচ্ছে, অন্য সকল সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে যে বেদনা আকুল হয়ে ছুটে আসে, তার কুল আছে, কিন্তু সন্তানের মধ্যে দিয়ে যে দুঃখ আসে সে বুঝি অকুল পাথার! ভাবতে ভাবতে শৈলেশ্বর বাবুর নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে, রূপে গুণে এমন কি বিদ্যার ত্রুটী ও লতিকার নেই, নরেশ কি চেয়েছিল তাও ত একবার পিতার কাছে বলেনি।

শৈলেশ্বর বাবু অস্থির ভাবে উঠে পড়ে অন্দরের দিকে আসেন।

সত্যবালা নিজের ঘরে শুয়েছিলেন শৈলেশ্বর বাবু এসে দাঁড়ালেন, স্ত্রীর কপালে হাত রেখে বল্লেন—"শুয়ে রয়েছ যে? ভাবনার কি আছে? দেশ দেখতে গেছে, দিন কতক বাদে আবার ফিরে আসবে, নরেশ ত আর সেই ছোট্ট নরেশ নেই যে ঘুরে ফিরে তোমার কোলে এসে লুকুবে। আচ্ছা পাগল তুমি।"—আরো ঐ ধরণের এলোমেলো কথা বকে যেতে লাগলেন, সত্যবালাকে সান্ত্বনা দিলেন কি নিজেকে প্রবোধ দিলেন তা কে জানে!

এতক্ষণকার রুদ্ধ অশ্রু স্বামীর স্নেহ স্পর্শে উছলে উঠল, উনি স্ত্রীর মাথার পাশে বসে নিঃশব্দে সত্যবালার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। সন্ধ্যা নেমে আসে—ধরণীর শ্রান্ত দেহে আকাশের স্নেহস্পর্শ নিয়ে।

দিকে দিকে শঙ্খ ধ্বনিতে সন্ধ্যার বরণ করে। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর শৈলেশ্বরবাবু জিজ্ঞেস করলেন—"বৌমা কোথায়?"

—"বোধহয় নিজের ঘরে।"

আবার নিস্তব্ধতা!

কোন সান্ত্বনার কথাই আজ মনে আসেনা, যা বলে উনি স্ত্রীকে শান্ত করবেন।

একটা কাঁটা উভয়ের বুকের মধ্যে কেবলি খচ খচ করছে, কিন্তু কোথায় যে ফুটেছে তার স্থান নির্দ্দেশ কিছুতেই হ'চ্ছে না।

অনেকক্ষণ পরে শৈলেশ্বরবাবু সত্যবালার পিঠে হাত রেখে বল্লেন—"চল বৌমার কাছে যাই।"

শৈলেশ্বরবাবু সত্যবালা দু'জনেই উঠে লতিকার ঘরে গেলেন।

লতিকা চুপ করে অন্ধকার ঘরে জানলার সামনে চেয়ারটা নিয়ে বসেছিল।

ওর কল্প-লোকের সুন্দর, যার প্রতিচ্ছবি ও দেখতে চেয়েছিল, নরেশের মধ্যে—সেকি এই!

অন্তর ওর হাহাকার করে কেঁদে ওঠে।

লতিকা আস্তে আস্তে উঠে সুইচটা টিপে গীতা খানা হাতে নিয়ে বসে পড়ল, কর্ম্মেই অধিকার কর্ম্মফলে নয়, গীতার আদেশ, লতিকার হাসি পেল, ওত কর্ম্ম কিছুই করে নি, কিন্তু কর্ম্মফলের বোঝা ওরই ঘাড়ে পড়ল!

এ বোঝা কি ও জীবনে কখন নামাতে পারবে! 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়' ওর চোখে জল এল, ওত স্বধর্ম্মকেই প্রাণ পণে জড়িয়ে ধরেছিল, ওকেত জোর করে ধর্ম্মচ্যুত করিয়েছে, ও যে সহজ বন্ধনের সুরে সুরে মুক্তির অসীম অনন্ত পথে চলে চেতে চেয়েছিল, সেই ছিল ওর স্বধর্ম্ম।

উদাসিনী সন্ন্যাসিনী হয়ে কর্ম্ম হীন ভাবে সর্ব্বদা গীতা হাতে করে বসে থাকা ওর ধর্ম্ম নয়।

লতিকা আস্তে আস্তে গীতা খানা রেখে দিয়ে আলোটা নিভিয়ে আবার জানলার সামনে বসে পড়ল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শৈলেশ্বর বাবু ডাকলেন।

—"মা।"

লতিকা মনে মনে লজ্জিত হয়ে উঠল, এতক্ষণ ও এমন অন্যমনস্ক হয়ে ছিল যে ওঁর পদ শব্দ পর্য্যন্ত ওর কানে যায় নি।

তাড়াতাড়ি আলো জেলে এগিয়ে এল।

—"আসুন বাবা।"

ওঁরা উভয়ে ঘরে ঢুকলেন।

শৈলেশ্বর বাবু একটা চেয়ারে বসে পড়ে বল্লেন

—"মা ত আর আজকাল ছেলে বলে মনে করেন না, মা আমার সৎমা কিনা। কাজেই ছেলেকেই মনে করতে হয়।"
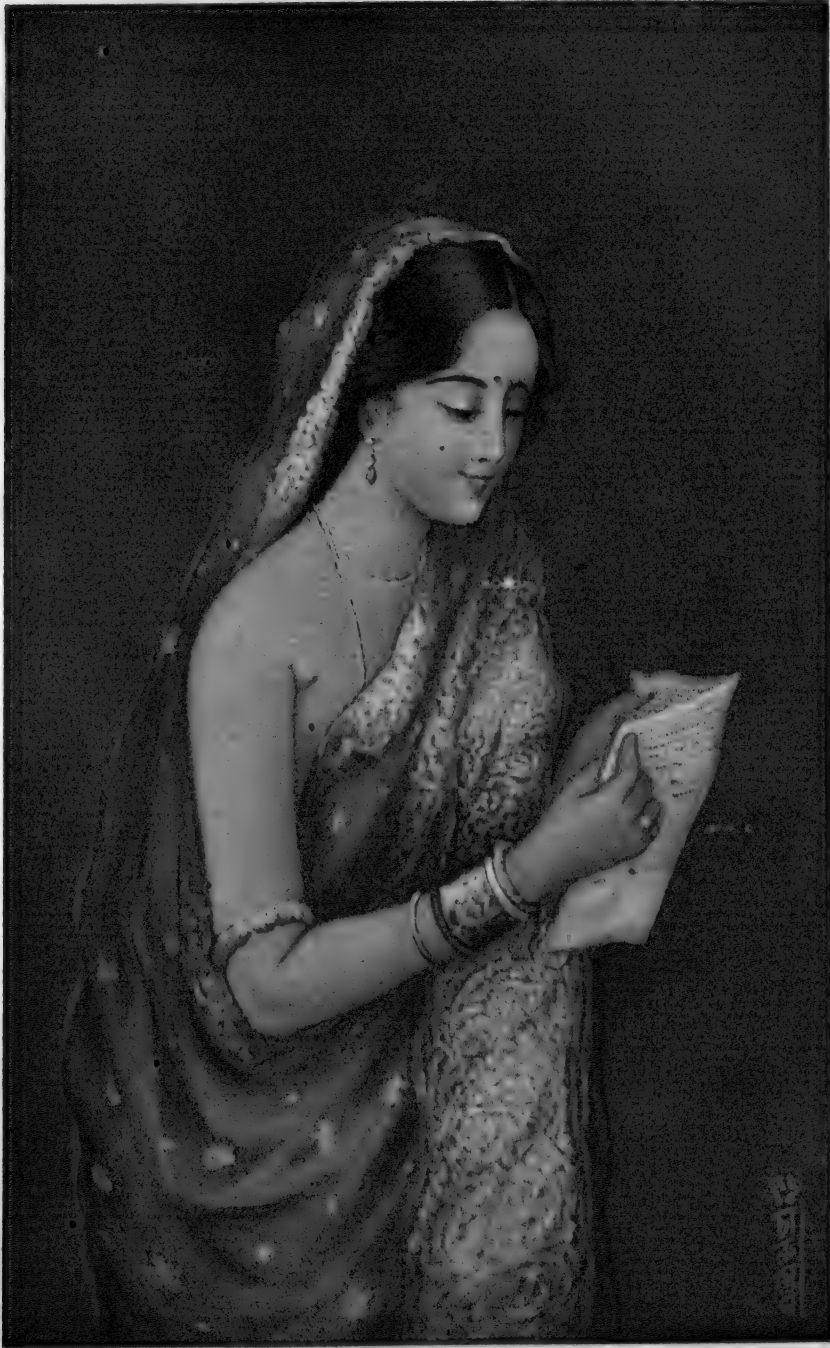
লিপি

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ, কলিকাতা।

লতিকা এসে শ্বশুরের পায়ের কাছে চেয়ারের নীচে বসে পড়ল, উনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "মাটীতে কেন মা, ঐ চেয়ার খানাতে বোস।"

—"আপনি ব্যস্ত হবেন না বাবা, আমি বেশ বসেছি।"

বলে লতিকা ওঁর পায়ের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

শৈলেশ্বর বাবু ওর মাথাটা কোলের ওপর টেনে নিয়ে, হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ছোট ছেলের মত এলো মেলো বকতে লাগলেন।

ওঁর সব চেয়ে বড় ক্ষোভ আজ লতিকাকে নিয়ে, ওকে উনি মস্ত বড় আশা দিয়ে এনে বিশাল নৈরাশ্য পাথারে ডুবিয়ে দিয়েছেন।

অনেক দুঃখ শৈশবের অনেক বঞ্চিত হওয়ার ব্যাথা সন্তান কাল ক্রমে ভুলে যায়, কিন্তু যাঁরা বঞ্চিত করেন পিতা মাতার অন্তরে সেগুলি চিরদিনের মত কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকে।

... ...

আবার দিনের পর দিন আসে যায়।

নরেশের চিঠি আসে, পড়া শেষে শৈলেশ্বর বাবু চিঠি খানা সত্যবালার হাতে দিলেন।

—"নরেশের চিঠি, তোমাকে ও লিখেছে।"

সত্যবালা স্বামীর হাত থেকে চিঠি খানা নিলেন।

পিতার চিঠির সঙ্গে ছোট্ট একটু খানি ওঁকে ও লিখেছে, 'তুমি আমার জন্য কিছু ভেবনা, আমার কোন অসুবিধা নেই।' সত্যবালার চোখে জল উজ্জল হয়ে উঠল। নরেশের জন্য ভাববার ওঁর দরকার নেই সেইটেই ও দু'তিন বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছে, নরেশের দুঃখের সান্ত্বনা আজ আর মায়ের কাছে নেই তাই ও মায়ের কোল ছেড়ে চলে গেল দূরে—বহুদূরে—শান্তির আশায়।

আজ উনি মস্ত বড় দুঃখের মধ্যে দিয়ে প্রথম বুঝতে পারলেন, ওঁর ক্রোড়ের নরেশ ওঁর সমস্ত ক্রোড় ছাপিয়ে উঠে গেছে!

নরেশ আজ মাকে মুক্তি দিয়েছে! অকৃতজ্ঞ সন্তান!

সত্যবালার চোখের জলে এই ধরণের কথাই মনের অঙিনায় উঁকি দিতে লাগল।

মুক্তিত সন্তানের দেবার কথা নয়, সেত মা আপনিই চেয়ে নেন।

স্ত্রী যেমন সন্তানকে নিয়ে পত্নীত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে যায়, মা তেমনি সন্তানকে নিয়ে মাতৃত্বের সীমা উল্লঙ্ঘন করে যাবে, এইত পথ। কিন্তু এযে পথ ছাড়িয়ে যাবার আগে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া!

অনেকক্ষণ পরে চোখটা আঁচলে মুছে ফেলে সত্যবালা স্বামীর দিকে চাইলেন—"আর কোন চিঠি নেই"?

উনি একখানা লতিকার চিঠিরও আশা করছিলেন।—শৈলেশ্বরবাবুরও কথাটা মনে হয়েছিল, উনি আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে ভাঁড়ার ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন—"কিছু খাবার আছে?"

লতিকা ভাঁড়ার ঘর থেকে জিনিষ বার করছিল, ফিরে দাঁড়াল—"আছে বাবা, আপনাকে দেব?"

"দাও, কিন্তু তোমার তৈরী দিও।"

লতিকা অপ্রস্তুত হয়ে গেল—"আমিত আজ করিনি বাবা, আপনিত রোজ খান না তাই করিনি। অন্য খাবার দেব?"

—"ঠাকুরের করা মুখে তোলা যায় না। আর বাজারের খাবার সেত রোগের ডিপো। তুমি কালকে যা তৈরী করেছিলে সে নেই?"

—"আছে বাবা দেব? কিন্তু বাসি।"

—"তা' হোক, তাই দাও। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে না ভাই।"

শৈলেশ্বর বাবু হাসতে লাগলেন।

লতিকাও একটু হেসে বারাণ্ডায় আসন পেতে শ্বশুরের জন্য খাবার নিয়ে এল।

সত্যবালা এসে এক পাশে বসলেন।

লতিকা আবার ফিরে যাচ্ছিল, শৈলেশ্বরবাবু ডাকলেন "—মা।"

লতিকা ফিরে দাঁড়াল—"কি বাবা?"

শৈলেশ্বরবাবু হেসে উঠলেন—"কি মা! সব কথাই ছেলেকে শিখিয়ে দিতে হবে! খেতে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ!"

লতিকা হাসিমুখে বললে—"না বাবা পালাচ্ছি নে, এক গ্লাস জল নিয়ে আসি।"

লতিকা জলের গ্লাসটা শ্বশুরের পাশে রেখে সত্যবালার পাশে বসে পড়ে, সত্যবালার মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললে —"বাবা এমন সুন্দর ডাকেন।—"

কথাটা শেষ হতে না দিয়েই সত্যবালা হেসে বললেন —"মার আমার অমন সুন্দর প্রতিমার মত চোখ থাকলে কি হয়! তুমি বড় এক চোখ! যাও, আমি আর মা বলে ডাকবো না—সৎ মা বলে ডাকব।"

লতিকা হাসল।

শৈলেশ্বরবাবু নানা রকম গল্প আরম্ভ করলেন, কোন রকমে উনি চান ওর অবস্থাটাকে ভুলিয়ে রাখতে। হায়রে স্নেহ কাতর মন!

যে নির্ঝরিণী পর্ব্বতের ক্রোড় ছাপিয়ে বেরিয়ে গেছে, তার গতি পথে যদি মরুভূমি পড়ে সে মরুভূমির বুকে শুষ্ক হয়ে যায়, কিন্তু পর্ব্বতের কোলে সে ত ফিরে যেতে পারে না!

... ...

দুপুর বেলায় লতিকা সত্যবালার পাশে শুয়ে এলো মেলো ভাবে চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাচ্ছিল। সত্যবালা অনেকক্ষণ বধূর মুখের দিকে চুপ করে চেয়ে থেকে পরে বল্লেন—"নরেশর চিঠিখানা ঐ দেরাজের ওপর আছে পড়ে দেখ।"

আবার একটু ইতঃস্তত করে বল্লেন—"আর হ্যাঁ ভাল কথা তুমি একখানা চিঠি দিও।"

লতিকা চুপ করে রইল।

সত্যবালা লতিকাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন—"লক্ষ্মী মা আমার, দিও একখানা চিঠি।" চোখের কোণে জল উছলে এল, উনি আস্তে আস্তে বধূকে নিবিড় ভাবে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বল্লেন—"তোমার মূল্য নরেশ বুঝল না একি আমার কম দুঃখ, কিন্তু কি করবে বল অভিমান করে ত কিছু লাভ নেই!"

বধূ আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে অস্ফুট ভাবে বল্লে —"লিখবো মা।"

... ...

দিনের পর দিন যায় মাস যায় ক্রমে বৎসর ঘুরে আসে। নরেশের কিন্তু ফিরে আসবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

নরেশের চিঠি ও ক্রমে সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে। সত্য বালা এবার শয্যা নিলেন, ওঁর বহু কালের হার্টে অসুখ এবার প্রবল হয়ে উঠে ওঁকে শয্যা-শায়ী কর দেয়।

নরেশকে সকলেই ফিরে আসবার জন্যে লেখে কিন্তু নরেশ ফিরে আসে না।

—২০—

নরেশকে চিঠির উত্তর দেবার পর হ'তেই বিনীত যেন শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল।

ও এমনি করেই দেশের কাজ নিয়ে সচ্ছন্দে দি কাটাতে পারত, যদি লতিকা ওদের মাঝে অত্যু হিমালয় রূপে এসে না দাঁড়াত। সেদিন ও জানত নরেশে ও গৃহের গৃহিণী না হ'লে ও, অন্তরের ও কল্যাণী।

সে খানে কারু অধিকার নেই।

কিন্তু আজ প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হয় নরেশকে মনে রাখাও অন্যায়।

লতিকার মুখ মনে হ'লে ও সত্যি ব্যথা অনুভ করে। আহা বেচারী! রূপ বুদ্ধি বিদ্যা সবই আছে ফাঁক ত কোথাও নেই, তবে ওর ভাগ্যে এত ব ফাঁকি বিধাতা কেন সৃজন করলেন! বিনীতা মনে কোন ঈর্ষা জাগে না, ও নরেশকে যেটুকু পেয়েছে তাতে কোন ফাঁকি নেই। সম্পূর্ণ করেই পেয়েছিল তাই আজ আর ওর ঈর্ষা জাগে না, জাগে আন্তরিক সহানুভূতি।

আবার নরেশের চিঠি এল, এবার নরেশ লিখেছে— সে একটি বার বিনীতার সঙ্গে দেখা করতে চায়, শু একটি বার দেখা করবে, তারপর সব ছেড়ে চলে যাবে দূরে—বহু দূরে।

এবার ও ফিরবে সেই দিন যে দিন ও বিনীতাকে যথার্থ—ভুলতে পারবে।

লতিকার কথায় লিখেছে—'আমি কোন বিষয় লতুকে অযোগ্য মনে করিনে, কিন্তু অন্তর শুধু যোগ্য অযোগ্য দেখেনা।'

আমি অনেক বার শুধু সহজ জীবনের আশায় ও

সঙ্গে অভিনয় করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তুমি কল্পনায়ও ভাবতে পার না, সে কি অসহ্য যন্ত্রণা।'

বিনীতা চিঠি খানাকে উল্টে পাল্টে ভাল করে পড়ল, দুই চোখে জল ছাপিয়ে উঠল, ও চিঠি খানা নিজের জামার ভেতর গুঁজে রেখে শুয়ে পড়ল।

উঃ ভগবান! আর যে সহ্য হয় না ও ত মানুষ! অনেকক্ষণ চোখের জল ফেলার পর মনটা একটু শান্ত হয়ে এল, সে আস্তে আস্তে মুখটা ধুয়ে মাথার চুলটা ঠিক করে বেরিয়ে গেল। ও আর ভাবতে পারে না, তবু ভাবনাকে ছাড়িয়ে যাবার উপায় নেই, তাই ও এড়িয়ে যেতে চায়। রেখার ঘরে ঢুকল, সেখানে রেখা শুক্লা দীপ্তি অম্বা কৃষ্ণা সবাই গল্প করছিল, বিনীতাও ওদের মধ্যে এসে বসে পড়ল।

অম্বা দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে বললে—"এই যে, আসুন, আসুন।"

বিনীতা শুষ্ক হাসি হেসে বল্লে—"অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ!"

ও আর কোন ভাবনা ভাবতে চায় না, এবার ও চিন্তা হীন, আনন্দের গান গেয়ে দিন কাটিয়ে দিতে চায়, চিন্তা কি তবু যায়, ওদের এলোমেলো গল্পের মধ্যেও তার স্রোত চলে।

বিনীতা আবার উঠে পড়ল, নিজের ঘরে গিয়ে নরেশের চিঠির উত্তর লিখতে বসল, নরেশকে বিশেষ করে জানাল যে সে দেখা করতে চায় না, ও এবার মুক্তি চায় জীবনের অনাবশ্যক ভুল থেকে। চিঠি খানা লেখা শেষে ভাঁজ করে খামের মধ্যে পুরে, রুমাল খানার মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে, রেখার ঘরে এল—"চলনা একটু বেড়িয়ে আসি।"

ওরা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ল, ডাক বাক্সের কাছে আসতেই বিনীতা চট করে চিঠি খানা বার করে ফেলে দিলে, সবাই একটু এগিয়ে ছিল, শুধু রেখা ওর পাশা পাশি ছিল, রেখা ওর মুখের দিকে চেয়ে একটু টিপে হাসল, নিম্ন সুরে প্রশ্ন করল—"কার?"

বিনীতা প্রথম একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সেটা সামলে নিয়ে বল্লে—"কি, কার?"

—"ঐ চিঠি খানা?"

—"আমার হাত থেকে ডাক বাক্সে পড়ল তখন আমারি এটা তোমার বোঝা উচিত।"

—"আহা তোমার তাত জানি, ওটা দান করলে কাকে!"

—"কোন একটি মানুষ কে।"

—"মানুষ-টি কে?"

—"সে যেই হোক, চিঠি লিখলেই প্রেমপত্র লিখতে হ'বে তার কোন মানে নেই। চিঠির মধ্যে রোমান্স খুঁজে বেড়ান বাঙ্গালী জীবনের একটা বিশেষত্ব, ওটা শিক্ষিত অশিক্ষিত নেই ভদ্র অভদ্র নেই, চুপি চুপি চিঠি পড়া—। আমি বুঝতে পারিনে ওর মধ্যে কি মাধুর্য্য আছে।"—

—"এক মুখ দাড়ি নিয়ে নীতি জ্ঞান সম্বন্ধে ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে লেকচার দিবিত চল, খুব হাত তালি পাবি।"

—"নানা ভাই আমি তোমায় বিদ্রূপ করিনি, সত্যি আমি অনেক ভদ্র শিক্ষিতদের মধ্যেও ও জিনিষটার প্রাবল্য দেখেছি। আমার বড্ড রাগ হয় ওরকম দেখলে, তুমি যেন নিজে গায়ে পেতে নিও না। ওঃ ওরা অনেকদূর এগিয়ে গেছে, চল একটু তাড়াতাড়ি।"

আরো খানিকটা দূর এগিয়ে যেতেই সুরেশের সঙ্গে দেখা—"এই যে বিনীতা দি কোন দিকে?"

বিনীতা একটু হেসে বল্লে—"আপাততঃ তোমার দিকে, অপরন্তু ভবিষ্যতি। তার পর বাড়ীর খবর কি?"

—"বাড়ীর খবর ভালই। দাদা বুধবারে দিল্লী যাবেন।"

বিনীতা একটু চুপ করে থেকে পরে বল্লে—"ওঃ তাই নাকি? বুধবারে কোন সময়, যে সময় আমি গিইছিলাম সেই সময়?"

সুরেশ মাথা নেড়ে বল্লে—"হ্যাঁ।"

—"চল সুরেশ আমার ওখানে, এখন তোমার কিছু কাজ আছে—?"

—"নাঃ কাজ বিশেষ কিছু নেই একবার লাইব্রেরীটা ঘুরে যাব, খন কতক বই নিয়ে। চলুন আপনার সঙ্গেই যাই।"

ওরা আবার ফিরল, বাড়ী ফিরে বিনীতা সুরেশ কে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল, রেখারা ফিরে যাচ্ছিল, বিনীতা ওদের ডাকল—"এই ঘরেই বোসনা, চলে যাচ্ছ কেন।" ওরা সবাই এসে বসল।

মানুষের সঙ্গ যে মানুষের আমরণকাল কত প্রয়োজনীয় সেটা আজ বিনীতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছিল। তাই আজ ও যাকে সামনে পাচ্ছিল তাকেই কাছে ডাকছিল।

এতদিন অন্তর ছিল পূর্ণ, তাই সঙ্গ ওর প্রয়োজন ছিলনা, আজ শূন্যতায় ও হাঁপিয়ে উঠেছে তাই আজ ওর সঙ্গ চাই।

কিছুক্ষণ পরে সুরেশ উঠে গেল।

রাত্রির আহার সেরে অম্বা নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল, বিনীতা অন্ধকার ঘরে চুপ করে বসেছিল, অম্বাকে দেখে ডাকল—"অম্বা।"

—"কি ভাই ?"

প্রশ্ন করে অম্বা ওর ঘরে এসে ঢুকল, বিনীতার কপালে হাত রেখে বল্লে—"কি হয়েছে খেলেনা যে ?"

বিনীতা ওর হাতখানা নিজের কপালে চেপে ধরে বল্লে —"কিছুই হয়নি, আজ খেতে ইচ্ছে করছেনা, আজ সকালে যে লঙ্কা খাইয়েছ সেটাকে হজম করছি। সে যাহোক তোমার বালিশটা নিয়ে এসো—আজ তোমার আমার ফুল শয্যা—থুড়ি শূন্য শয্যা, কি বল !"

অম্বা হেসে বল্লে—"যো হুকুম।"

অম্বা চলে গেল।

বালিশটা ধপাস করে বিনীতার শয্যার একপাশে ফেলে অম্বা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

—"নাঃ, এ রকম করে আর চলছে না, এ যেন সেই 'ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে' হয়েছে।"

বিনীতা হাসল—"তাহ'লে কি করা উচিত ?"

অম্বাও হেসে উঠল—"কি করা উচিত সে আবার বলে দিতে হ'বে নাকি ? বিয়ে করা উচিত।"

—"করবে নাকি শিগগির ?

—"কোরবো বইকি।"

—"তার পর দেশের কাজ ?"

—"দেশের কাজও কোরবো।"

"ছেলের কান্না থামিয়ে, সংসারের কাজ করে সময় থাকবে ?"

"কেন থাকবে না, ইচ্ছে থাকা চাই। দেশের কাজ করতে হ'লে অবিবাহিত কেন থাকতে হবে আমি বুঝতে পারিনে, স্ত্রীর জন্য মাকে, কিম্বা মায়ের জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করা যেমন অন্যায় অশোভন এবং আশ্চর্য্যকর, এও কি ঠিক তাই নয় ? দু' জনকে নিয়ে চলতে গেলে হয়ত অনেক বাধা বিপত্তি আসবে, কিন্তু অমন কাপুরুষ হ'লে চলবেনা সে বাধা লঙ্ঘন করতে হ'বে। গ্যারি-বলডির জীবনী খানা বাংলা দেশের প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষকে আমি পড়তে বলি, প্রাণ ভয়ে যখন পালিয়ে যাচ্ছেন নদী সাঁতরে, তখন ও গলায় তাঁর পুত্র বাঁধা। আমার এত সুন্দর লাগে, সে শুধু দেশ মায়ের বীর সন্তান নয়, সে মায়ের ছেলে, স্ত্রীর স্বামী, পুত্রের পিতা।"

বিনীতা ক্লান্ত স্বরে হেসে বল্লে—"আগাগোড়া তারা যদি বা পড়িত,

গ্যারি বলডীর জীবন চরিত,

তাহ'লে তাহারা কি যেন করিত কেদারা হেলান দিয়ে।" ঠিক তাই নয় কি ভাই ?"

—"তোমায় গুলি করা উচিত, এমন অপ্রস্তুত করে দাও।"

বলে অম্বা হেসে উঠল।

বিনীতাও হাসল, বল্লে—'না ভাই তোর মত অমি অস্বীকার করি নে, কিন্তু সকলের আদর্শ এক নয়।',

—"তোমার ঘুম আসছে নাকি বিনীতা অমন জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছ যে ?

—"না ঘুম আসছেনা ত, তোমার লেকচার শুনছি তন্ময় হয়ে।"

অম্বা বিনীতার হাতে ঈষৎ ঠেলা দিয়ে বল্লে

—"অত তন্ময়তা ভাল নয়, একটু সামলে।"

আবার কিছু ক্ষণ চুপ করে থেকে অম্বা বল্লে

—"সবারি আদর্শ যে এক নয় বল্লে, কিন্তু এ বিষয়ে ওটা তোমার বলা ভুল। আদর্শ এ বিষয়ে সবারি এক তবে অবস্থা এক নয়। যথার্থ অবিবাহিত তারাই থাকতে পারে যারা পাগল কিম্বা মহাপুরুষ।

তুমি শুধুই স্বপ্নবিলাসী তাই আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছ না কিম্বা চাইছ না। অবশ্য স্বপ্নটার ও প্রয়োজন আছে, নইলে সংসার একটা স্থূল বাস্তবতার কদর্য্যরূপ নিয়ে নিশ্বাস আটকে দেয়, কিন্তু স্বপ্ন কতটুকু ভাল থাকে? যেমন আমাদের কল্পনার যে প্রিয় আছে তাকে নিয়ে সংসার করা চলে না, তাই বাস্তব প্রিয়েরও প্রয়োজন হয়, কিন্তু কল্পনার প্রিয়কে ত্যাগ করিনে, বাস্তবের প্রিয়কে কল্পনার প্রিয়ের মধ্যে মিশিয়ে সুন্দর করি।"

—"আজ কি সমস্ত রাত বক্তৃতা দেবে? বিয়েটাত আপাততঃ এখুনি পালিয়ে যাচ্ছে না। আজ বক্তৃতা রেখে শুয়ে পড়; আর যদি থামতে না ইচ্ছে হয়, তবে চল টাউনহলে যাই, এমন কথাগুলো ঘরের কোণে বলার চাইতে টাউন হলে দাঁড়িয়ে বল্লে তবু দেশের দশের উপকার হবে।"

বলে বিনীতা একটু হাসলে।

অম্বা ও হেসে উঠল—"পোড়ারমুখী।"

—"দেখ ভাই অম্বা তোমার ঐ ঠানদিদির মত গাল দিয়ে আদর ভদ্র সমাজে অচল।"

—"না ভাই তোম'দের ওসব নব্য ভব্য আড়ষ্ট ভাবে এটিকেট্ রক্ষা করা আমার পোষায় না, আমি এই রকম করেই কথা কইব, তোমার যদি কানে বাজে ত তুমি ভবিষ্যতে আমার সামনে যখন আসবে কাণে তুলো গুঁজে এসো।"

২০

হাওড়া ষ্টেশনে নরেশ দাঁড়িয়েছিল, পাশে সুরেশ এবং শৈলেশ্বর বাবু দাঁড়িয়ে, ট্রেন ছাড়তে একটু দেরী আছে, হঠাৎ পেছন থেকে কে ডাকল—"নরেশ।"

নরেশ ফিরে চাইল—"কে বিনীতা এসো।"

শৈলেশ্বর বাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—

—"তোমার বিনীতার সঙ্গে দেখা করে আসা উচিত ছিল নরেশ, দেখ দিখি এখানে ও দেখা করতে এল। এখন ও ট্রেন ছাড়বার দেরী আছে চল আমরা ঐখানে গিয়ে বসি গে।"

ওঁরা তারজনে একখানা বেঞ্চি দখল করে বসে পড়লেন।

সুরেশ শৈলেশ্বর বাবু মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলছিলেন, নরেশ বিনীতা দু'একটা 'হুঁ, হাঁ' ছাড়া বিশেষ কিছু কথা কইছিল না।

ওরা উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখতে লাগল, যেমন করে শ্যামা ধরিত্রীর সঙ্গে অস্তরবির দৃষ্টি বিনিময় হয়।

ট্রেনের সময় হয়ে এল, বিনীতা নরেশের পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ছুঁইয়ে প্রণাম করল, নিঃশব্দে নরেশ শুধু নিজের হাতখানা ওর মাথায় রাখল।

নরেশ পিতাকে প্রণাম করল।

ওরা তিনজনে চুপ করে প্লাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে রইল, ট্রেনখানা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। বিনীতা শৈলেশ্বর বাবুকে একটা প্রণাম করে বেরিয়ে গেল।

... ...

এবার বিনীতা সমস্ত দিন কাজ নিয়ে ঘুরতে লাগল, ওর মনে মনে আশা ছিল ও কাজের মধ্যে নিজেকে ভুলতে পারবে, কিন্তু এতবড় ক্ষতটাকে ভুলে থাকা সেকি সোজা কথা! দিন কতকের মধ্যে ওর দেহমন ক্লান্তিতে ভরে এল। ও আর পারে না এমন দুঃসহ জীবন বয়ে বেড়াতে, এই কি ও চেয়েছিল? এই কি ওর এতদিনের সাধনার পুরস্কার দিল ভগবান।

রেখা বলে—"তোমার আজ কাল কি হয়েছে ভাই?"

—"কই কি হয়েছে?"

বিনীতা ঘুরে আবার প্রশ্ন করে।

—"কি হয়েছে তা তুমি নিজে বুঝতে পার না?

—"কই নাত।"

—"ও অবস্থা এতদূর খারাপ! তাহলে বিয়ে করে ফেল—সব সেরে যাবে।"

বিনীতা হেসে বল্লে—"নিজের করতে ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি।"

রেখা হাত দু'খানা জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বল্লে—

—"রক্ষে কর ভাই।"

... ...

বিনীতার দাদা শচীপতি অনেক দিন থেকেই ওকে নিজের কাছে ডাকছিলেন চিঠিতে, এবার ছোট ভাই

রতিপতিকে পাঠিয়ে দিলেন বিনীতাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে। এমন করে আর চলছিল না, বিনীতাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, ও নিজের কাজ রেখাকে বুঝিয়ে রতিপতিকে নিয়ে দাদার কাছে চলল।

দাদার আনন্দের সংসারে হয়ত ওর জীবনের একটা শান্তির অধ্যায় আরম্ভ হ'তে পারে সেই আশায়।

অনেকদিন পরে বিনীতা দাদার কাছে এসে দাঁড়াল, নত হয়ে প্রণাম করতেই শচীপতি তাড়াতাড়ি ওকে দুই হাতে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন।

মাথার ওপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লেন—"কি চেহারাই হয়ে গেছেরে তোর!"

বিনীতা একটু হাসলে।

আবার কিছুকাল চুপ করে থেকে শচীপতি বল্লেন—"বিনু আর এমন করে ঘুরিস নে ভাই; তোর অমতে আমি কোন বিষয়ে জেদ কোরবো না, তুই আমার কাছে থাক। এতদিন ধরে আমার কিরকম মনের অবস্থা গেছে সে শুধু ভগবানই জানেন।"

বলে উনি নিবিড় ভাবে বিনীতাকে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন।

—"না দাদা এবার তোমার কাছেই থাকবো।"

শচীপতি লোকটি মন্দ নন, কিন্তু বিনিতার সঙ্গে যে মতান্তরের সৃষ্টি হয়েছিল, তা স্নেহ দয়া মায়া হীন নির্ম্মমতার জন্যে নয়, সে শুধু যুগ যুগান্তর ধরে যারা প্রভূত পরিমাণে প্রভুত্ব করে এসেছে, তারা একদিনে প্রভুত্ব ছেড়ে বন্ধুত্ব গ্রহণ করতে পারে না, সেই অন্তরের পুরুষ প্রভুর প্রভুত্বের অবমাননায় ওদের মতান্তরের সৃষ্টি হয়েছিল।

শচীপতির স্ত্রী যোগমায়া পল্লীগ্রামের মেয়ে, এখন কিন্তু দেখলে বোঝা যায় না, গ্রামের সহজ সারল্য ওঁর মধ্যে নেই, শুধু আধুনিক কথাবার্ত্তা চাল চলনের মধ্যে থেকে গদার মা মাঝে মাঝে আবির্ভূতা হন, সেটা বোঝা যায় ওঁর অকারণ কলহ-প্রিয়তার থেকে। ওঁর বাঁকা সিঁথি ওঁর কাঁধের সেফটিপিন ভুলেও কখন স্থানভ্রষ্ট হয় না।

ওঁর শিক্ষার মাপকাঠি সাজসজ্জা।

'মাগো, ও নাকি আবার শিক্ষিতা, কি সাজ করেছিল!'

এ কথা ওঁর মুখে অনেক সময় শোনা যেত।

ওঁর বিবাহিত জীবনের প্রথম অধ্যায় থেকেই বিনীতার ওপর প্রবল বিতৃষ্ণা ঘটেছিল, তার কারণ হচ্ছে এই, বাড়ী শুদ্ধ সকলেই, শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী যে যখন যে-কাজ করতেন তাতেই বিনীতার ডাক পড়ত। 'বলতো বিনীতা এটা কি রকম করা যায়!' 'বিনীতার বেশ পছন্দ আছে।'

ইত্যাদি কথা শুনে শুনে এবং সেই সঙ্গে যখন যোগমায়ার সাজ শয্যা থেকে লেখা-পড়া পর্য্যন্ত বিনীতার ওপর ভার পড়ল তখন বধূ যোগমায়ার মনে হতে লাগল স্বামী এবং অন্যান্য সকলে বুঝি ওর পৈত্রিক গ্রাম্যতা এবং ওর বিদ্যার অভাব জেনেই এ ব্যবস্থা কচ্ছেন—তারই এটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ!

এবার বিনীতার আসার পর প্রথমটা সে চুপ করেই ছিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন জানতে পারল বিনীতা দিন কতকের জন্য আসেনি, থাকবে বলে এসেছে, তখন ওর বহু কালের রুদ্ধ আক্রোশ ক্রমাগত বেরিয়ে পড়তে লাগল শ্লেষ রূপে।

শচী পতি আহারে বসেছেন সামনে বসে বিনীতা পাখাখানা নাড়ছিল, যোগমায়া কি একটা কাজে ঘরে এসে ঢুকল, শচীপতি মুখ তুলে যোগমায়ার দিকে চেয়ে বল্লেন—"সেবা যত্নে আজকাল বিনীতা ঠিক আমাদের মায়ের ধারা পেয়েছে; ওকে দেখলেই আমার মায়ের কথা মনে পড়ে।"

শচীপতি মুখ নীচু করে আহারে মন দিলেন। যোগমায়ার মুখ ক্রমশঃ গম্ভীর হয়ে উঠছিল, শচীপতি তা লক্ষ্য না করলেও, বিনীতার দৃষ্টি এড়াল না, সে অপ্রস্তুত মুখে কথাটা ঘুরিয়ে নেবার জন্যে বল্লে—"ওটা আর একটু এনে দেব দাদা!"

—"দে।"

বলে শচীপতি একটু হেসে বল্লেন—"তুই এসে পর্য্যন্ত আমার খাওয়া আজ কাল ছোট খাট ভীমের আহার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার খাওয়া দেখে আমিই অবাক হয়ে যাই।"

যোগমায়া এতক্ষণ চুপ করে স্বামীর কথা শুনছিল, এবার ও অধৈর্য্য হয়ে পড়ল, স-বিদ্রূপে হেসে বল্লে—

—"তবু ভাল, যাক তুমিও তাহলে প্রশংসা করতে জান।" যোগমায়া ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

শচী পতি গম্ভীর হয়ে মুখ নীচু করে আহারে মন দিলেন, অপ্রস্তুত বিনীতা হতাশ হয়ে ভাবে শান্তি কি ঈশ্বর ওর চারি পাশে কোথাও রাখবেন না; ও নিজের অশান্তির বেড়াজাল ছিঁড়ে ছুটে এসেছিল শান্তির আশায়, আর এখানেও ওকেই কেন্দ্র করে ওদের দাম্পত্য-জীবনের ত্রুটীটা এমনি ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

রতুর ঘরে বসে বিনীতা শচী পতির মেয়ে সীতার ফ্রকে ফুল তুলছিল, রতু বিছনার ওপর শুয়ে কি একখানা বই পড়ছিল, পাশের ঘরে যোগমায়া উকিল মণীন্দ্র বাবুর স্ত্রী আশালতার সঙ্গে গল্প করছিল, সীতা পাশের বাড়ীর ডাক্তার বাবুর ছেলে আশীষের সঙ্গে বাগানে ছুটা-ছুটি করছিল।

ডাক্তার বাবুর চাকর এসে অশীষকে ডাকল—"চল মা ডাকছেন।"

আশীষ চলে গেল।

সীতা কিছুক্ষণ বাগানের মধ্যে একলা খেলা করে বেড়াতে লাগল, তার পর হঠাট ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল।

—"মা আমার ক্ষিদে পেয়েছে।"

যোগমায়া আশালতার সঙ্গে গল্প করছিল কথা থামিয়ে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ ওর পিঠে সজোরে একটা চড় বসিয়ে দিলে—"বুড়ো মেয়ে দিন দিন ধিঙ্গি হচ্ছেন, মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব। আমি সকলকার মত অত আদিখ্যেতার ধার ধারিনে।"

আশালতা সীতাকে কোলের কাছে টেনে নিলেন

—"আহা ছেলে মানুষ! এইত দুষ্টুমী করবার সময়।"

—"এখন থেকে শাসন না করলে দেখছ ত ভাই। সব বিষয়ে ছেলে বেলা থেকে আস্কারা দিয়ে দিয়ে এখন যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছেন। জেল খেটে হৈ হৈ করে বংশের মুখ পুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

ওঁর মত ভাই বলে তাই আজো এত কাণ্ড করছেন ঐ বোনের জন্যে। আমার বাপের বাড়ী হ'লে ও-রকম মেয়েকে ধরে আস্ত পুঁতে ফেলত।"

কথাগুলো ওদের দুই ভাই-বোনের কানে যাচ্ছিল। রতু বিনীতার মুখের দিকে নিরুপায় ভাবে চাইতে চাইতে বেরিয়ে গেল।

যে গ্লানির প্রতিকারের উপায় নেই, তার জন্যে মুখের সান্ত্বনা দিতে যাওয়াও ধৃষ্টতা!

আজ চোখের জলে বিনীতার মনে হ'ল ঈশ্বর ওকে কেন বধির করলেন না!

এমনি করেই বৎসর শেষ হয়ে গেল, ও আর যেন থাকতে পারছিল না, ও বুঝতে পারছিল সংসারের সুখের আশ্রয় ওর জন্য নেই, আবার পূর্ব্ব জীবনে ফিরতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

সেদিন ও শচীপতির শাসন কাটিয়ে সচ্ছন্দে সহজে চলে যেতে পেরেছিল, কিন্তু আজ শচীপতির সস্নেহ বন্ধন কাটিয়ে চলে যেতে পারে এত বড় হৃদয়হীন ও নয়। এমনি করেই দোটানার মধ্যে দিনের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল, হয়ত আরো কাটত।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিনীতা চুল আঁচড়াচ্ছিল, শচীপতি এসে ঘরে ঢুকলেন—"বিনীতা তোর নামে একখানা টেলিগ্রাম আছে।"

বিনীতা চিরুণীখানা রেখে হাতটা মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করল—"কার?"

—"কি জানি ভাই, আমি খুলিনি, এই নে দেখ।" শচীপতি খামখানা বিনীতার হাতে দিলেন। টেলিগ্রাম খানা খুলে বিনীতা পড়ে শচীপতির হাতে দিল, শচীপতি জিজ্ঞাসা করলেন—"লতিকা কে ভাই?"

—লতিকা শৈলেশ্বর বাবুর বড় ছেলে নরেশের স্ত্রী।"

—"মাসীমার বুঝি খুব অসুখ তাই তোকে যেতে লিখেছে, তা কি করবি?"

বিনীতা চুলটা জড়াতে জড়াতে বল্লে—"আমি যাব দাদা আজকের ট্রেনেই।"

শচীপতি বোনের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

২১

দিন দিন সত্যবালার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠছিল। নরেশকে জানান হয়েছিল, নরেশ কিন্তু অন্যরকম ভাবছিল, ও ভাবছিল, ওকে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই বুঝি মার অসুখের অজুহাত দেওয়া হ'চ্ছে।

ছুটো তিনটে বালিশ পর পর উঁচু করে রেখে তারই ওপর ভর দিয়ে বসে সত্যবালা হাঁপাচ্ছিলেন। পাশে বসে সত্যদাসী ওঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

সুরেশ মায়ের পায়ের কাছে চুপ করে বসেছিল। শৈলেশ্বর বাবু চেয়ারটাকে খাটের কাছে টেনে এনে বসলেন।

—"ওঃ ভগবান আর পারি নে!" বলে সত্যবালা আবার হাঁপাতে লাগলেন।

—"বড্ড কষ্ট হচ্ছে? সুরেশ ডাক্তার রায়কে আর একবার ফোন করে দাও।"

সত্যবালা একবার স্বামীর দিকে চাইলেন।

লতিকা আহারে বসেছিল, সুরেশ এসে দাঁড়াল —"বৌ দি।"

—"কি ভাই। মার কাছে কে আছে?" লতিকা মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করল।

—"মার কাছে বাবা আছেন। সত্যদাসী আছে, আমি সেই জন্যই একবার উঠে এলাম।"

—"এসো।"

বলে লতিকা একখানা আসন বাঁহাতে দেবরের দিকে ছুঁড়ে দিল—"পেতে বোস ভাই।"

সুরেশ সেখানাকে পেতে বসে বল্লে—"দাদার বন্ধু প্রশান্ত বাবুকে চেন।"

—"হ্যাঁ। চিনি, তা কি হয়েছে?"

—"তিনি দিল্লী গিইছিলেন, দিন কতক হ'ল ফিরেছেন, আজ ওঁার সঙ্গে দেখা হ'ল বল্লেন দাদার চেহারা বিশ্রি হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে জর হ'চ্ছে।"

"ফেরবার কথা কিছু বলেছেন?"

—"আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা বল্লেন এখন কিছুদিন ওখানেই থাকবেন বলেছেন।"

—"এরকম করে আর কদিন চলবে ভাই, মার যে অবস্থা তাতে প্রত্যেক মুহূর্ত কাটছে তবে মনে হ'চ্ছে যে এ-মুহূর্তটা কাটল। একটা অকারণ খেয়ালের জন্যে একটা প্রাণ যাবে ভাই!"

লতিকার চোখে জল ভরে এল।

অনেকক্ষণ পরে লতিকা মুখ তুল্ল—"ঠাকুর পো তুমি একবার রেখার কাছ থেকে বিনীতার ঠিকানাটা নিয়ে এসো, বিনীতাকে আমার নামে একটা টেলিগ্রাম করে দাও ভাই।"

—"তা দিচ্ছি বৌদি, কিন্তু শুধু বিনীতাদিকে এনে কি লাভ?"

—"তুমি দাও, লাভ আছে বইকি, আমি ত আর পাগল নই যে শুধু শুধু বিনীতাকে ডাকব।"

... ...

লতিকা নীচে নামছিল সিঁড়ির নীচে বিনীতা এসে দাঁড়াল। লতিকা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি কটা নেমে নীচে এল।

—"ব্যাপার কি ভাই, মাসিমা কেমন আছেন?"

"মা আজ অন্যদিনের চেয়ে ভাল আছেন, দেখবে চল।"

লতিকা আবার ফিরে ওকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

—"আমাকে টেলিগ্রাম করলে যে?"

আশ্চর্য্য সুরে বিনীতা প্রশ্ন করলে।

—"সে হবে খন পরে—তুমি এখন একটু জিরোও।"

বলে লতিকা বিনীতার হাতখানা চেপে ধরল।

সত্যবালা চোখ বন্ধ করে ক্লান্ত ভাবে চুপ করেছিলেন, ওদের পদশব্দে চোখ চাইলেন, বিনীতা ওঁর পাশে বসে পড়ে ওঁর হাতখানা ধরে, হাতের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লে—"একি হয়ে গেছেন মাসিমা।"

সত্যবালার চোখে ক্ষীণ ক্লান্ত হাসি ফুটে উঠল—"আর যাবার সময় হয়ে এল যে মা।"

লতিকা ওঁর পায়ের কাছে বসে পায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লে—"কি যে বল মা!"

কমলার মা মেঝেয় বসেছিল, বল্লে—"যা বলেছ বৌ ঠাকরুণ, ছাগা মা তোমার কি এখন যাবার সময়, [illegible] হয়েছে সেহের বাছে, তাঁহকে আমনি অনুমতি [illegible]

কেন? এখন ছোট দাদাবাবুর বৌ আসুক নাতি নাত্নী নিয়ে ঘর সংসার কর।"

... ...

রাত্রে আহারাদির পর শৈলেশ্বর বাবু এবং সুরেশ সত্যবালার ঘরে এলেন, সত্যবালা ঘুমচ্ছিলেন, ওপাশের কৌচখানাতে শৈলেশ্বরবাবু শুয়ে পড়লেন, সুরেশ লতিকাকে আস্তে আস্তে বল্লে—"বৌদি তোমরা যাও।"

প্রথম রাত্রে সুরেশ মায়ের কাছে থাকে, শেষরাত্রে লতিকা থাকে।

লতিকা বিনীতাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। গভীর অন্ধকার রাত্রি আকাশের গায়ে গায়ে তারার আলোক চিহ্ন ও যেন কত যুগ যুগান্তের পায়ের চিহ্ন।

আজও থেমে যাবে না, ওযে পান্থ ওকে চলতে হ'বে, সর্ব্ব বাধা উল্লঙ্ঘন করে।

ওকে চলতে হ'বে আগুনের মধ্যে দিয়ে, পর্ব্বত লঙ্ঘন করে, সমুদ্র পার হয়ে, ও কবেকার কোন প্রথম প্রভাতে বেরিয়েছিল অরূপের সন্ধানে, ওকে চলতে হ'বে, এখনও যে ও তার সন্ধান পায়নি; শুধু নরেশের জন্যে ও থামতে পারে না।

ওরা দুজনে ছাতে উঠে চুপ করে বসে ছিল, অনেকক্ষণ পরে লতিকা বিনীতার হাতখানা চেপে ধরে বললে—"দেখছত ভাই মায়ের অবস্থা—এরকম ভাবে বেশী দিন রাখা যাবে না। শুধু ছেলে খেলার জন্যে একটা প্রাণ যাবে। তুমি একখানা চিঠি লিখে দাও, এখানকার সব অবস্থা জানিয়ে ফিরে আসতে। দেবে ভাই?"

—"আমি!"

বিনীতা বিহ্বল ভাবে বলে চুপ করে রইল। আবার কিছুক্ষণ লতিকা বিনীতার দিকে চেয়ে রইল। ঝোঁকের মাথায় কথাটা হঠাৎ বলে ফেলে লতিকা নিজেও অপ্রতিভ হয়ে পড়ল, ও বুঝতে পারল কথাটা যে ভাবে বলা উচিত ছিল সে ভাবে ও বলেনি। একটু খানি থেমে বিনীতার বিহ্বল বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে লতিকা আবার বল্লে—"দেবে বল?"

—"কি বলছ লতিকা!"

বিনীতা ব্যাকুল ভাবে বলে উঠল।

এতক্ষণ পরে লতিকা পূর্ণ দৃষ্টিতে বিনীতার মুখের দিকে চাইল, বল্লে—"না ভাই আমি পাগল নই, কি বলছি সেকি তুমি বুঝতে পারছনা। আমার কথা ভুলে যাও—শুধু মনে কর মায়ের কথা—আর!—

একটু থেমে নিজের কণ্ঠকে সংযত দৃঢ় করে নিয়ে লতিকা বল্লে—"আর তাঁর কথা যিনি নিজেকে ভোলাবার মিথ্যা মোহে সংসারে নিজেকে এত বড় অপরাধী করে তুলবার উপক্রম করেছেন।"

—"কিন্তু কেন এ ভুল তোমার! আমি তাঁর কে?"

—"তুমি তাঁর কে?"

লতিকা মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে পরে বল্লে—"সে কি তুমি জান না। মন্ত্রের দাবীর চেয়ে প্রাণের দাবী চের বড় সে আমি প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিক্ষণে অনুভব করেছি! আমি ক্লান্ত হয়েছি, যথার্থ ক্লান্ত হয়েছি, তুমি আমাকে মুক্তি দাও ভাই।"

গভীর উত্তেজনায় লতিকার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। বিনীতা দুইহাতে মুখ ঢাকা দিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

অনেকক্ষণ দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, কতক্ষণ পরে লতিকা বিনীতার অঙ্গ স্পর্শ করে শান্ত কণ্ঠে বল্লে—"বল?"

—"কি বলবো?"

অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে বিনীতা বল্লে।

—"তোমার স্থান তুমি ফিরিয়ে নাও, আমাকে ছুটী দাও। আমি দুঃখ পাব! হয়ত পাব—কিন্তু মস্ত বড় গ্লানির হাত থেকে মুক্তি পাব বিনীতা! অন্তরের রাজ্যে কি জোর চলে ভাই! না ভিক্ষা চলে! না পাওয়ার দুঃখ সে ত সম্পদ, কিন্তু জোর করে যে পাওয়া তার গ্লানির কি শেষ আছে! ভিক্ষা যে দেয় সেও ছোট হয় যে নেয় সেও ছোট হয়! বল তুমি আমাকে গ্লানির থেকে মুক্তি দেবে না ভাই?"

লতিকা আস্তে আস্তে বিনীতাকে কাছে আকর্ষণ করে নিল।

বিনীতা একটা কথাও বল্লে না শুধু তার অবাধ্য চোখের জল নিঃশব্দে ঝরে পড়ল লতিকার কোলের ওপর।

... ...

সবাইকে অবাক করে লতিকাই প্রধান উদ্যোগী হয়ে বিনীতার সঙ্গে নরেশের বিয়ে দিয়ে দিল।

তারপর আবার দিন কাটে। শীতের রৌদ্রোজ্জ্বল অপরূপ মধ্যাহ্নে হাতে পাতা খোলা গীতা খানা নিয়ে নিজের ঘরে খোলা জানালার ওপর বসে লতু দূরের দিকে চেয়ে থাকে।

রৌদ্র স্নাত সতেজ শ্যামল গাছগুলি অপূর্ব্ব আনন্দে মর্ম্মর রব তোলে।

ও পাশের ঘর থেকে বিনীতার সকৌতুক কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—"আঃ, কি হ'চ্ছে! গেল আমার চুল গুলো সব, ছাড়।"

লতিকা চকিত হয়ে ব্যাকুল মনোযোগে খোলা পাতার দিকে চেয়ে আবৃত্তি করলে—

—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

একবার দু'বার তিনবার কণ্ঠ আবৃত্তি করে চলে, আনমনা আঁখি কখন খোলা পাতা ছেড়ে চলে যায় দূরে—বহু দূরে যেখানে ধরিত্রীর প্রেমে আকাশ নত হয়ে এসেছে!

কণ্ঠস্বর শিথিল হয়ে আসে, এক বিন্দু জল চোখের কোণে অস্পষ্ট আভাসে ফুটে ওঠে।

খোলা গীতা কোলের ওপর পড়ে থাকে নীরব অহ্বানে

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং
নমস্কুরু।
মামে বৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং
শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

গান

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

ইমণ কল্যাণ—তেতালা

তোমারি পদছায়া রাখ হরি।
তুমিত ভুলিয়া রহগো কোথায়,
তবুনা ছাড়ি তোমারী পদতরী—বাঁচি বা মরি।
চঞ্চলা চপলা শোভিছে নভপট,
দুলিছে মেদুর আঁধারি ঘন ঘট;
তবু রহি নীতি, নিতি যমুনাতট,
সুন্দর ছবিখানি মরম আঁখি ভরি।

গান

কুমারী যূথিকা মুখোপাধ্যায়

কি বলে ডাক্‌বো তোমায়
ভাবি তাই মনে মনে;
কেমন করে খুঁজি তোমায়
লুকিয়ে আছ কোন গোপনে!
বৃথাই তোমায় খুঁজে খুঁজে
পাগল পারা মন যে ছোটে;
তোমায় পাব বলে হরি
ঘুরে মরি বিজন গোঠে।
খুঁজে যে পাইনা তোমায়,
বাজাও বাঁশী কোন সে বনে।

দিশেহারা

—উপন্যাস—

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

এক

—সরিৎ এ চিঠি দেখেছে?

—দেখেছে বই কি?—ওর সাম্‌নেইতো খুল্‌লুম—

—কি বল্‌লে?

—কিছু না, চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। একটা কথাও না বলে।

বল্‌বে আর কি? বেচারি! ওর মনে দুঃখ হয়েছে খুব—না?

—ও মা! তা আর হবে না? বাবা, বলো কি? মেয়েমানুষের এর বাড়া দুঃখ আর কি আছে? আহা! নরেন যদি সত্যি সত্যি আবার বিয়ে করে বসে, তাহলে ও মেয়েটার যে……

—পাগল হয়েছ মা?

সুকুমার হাতের বইখানা রেখে দিয়ে মায়ের মুখপানে তাকিয়ে সহাস্যে বল্‌লে—

—ও শুধু সরিৎকে নিয়ে যাবার ফন্দী, অত বড় পাষণ্ডকে আবার মেয়ে দেবে কে শুনি? জলজ্যান্ত একটা সতীন থাকতে……

শিবানী বিমর্ষ মুখে দুঃখের হাসি হেসে বললেন —তা হলেও…বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ের কি অভাব আছে বাবা? ছেলে দেখতে শুনতে তো মন্দ নয়, যা হোক্ দু পয়সা রোজগারও করে,—ওকে কত লোক যেচে মেয়ে দেবে দেখো। সতীনের জন্যে বাঙ্গালীর ঘরে বিয়ে আটকে থাকে কি?

—বেশ তো করুক্ না বিয়ে! আমিও মজাটা দেখিয়ে দেব বাছাধনকে! আমার বোন্‌টার সর্ব্বনাশ করে আবার —ইঃ! করে দেখুক না একবার, তক্ষুনি গিয়ে দক্ষ যজ্ঞ করে দেব একেবারে—তাতে খুনোখুনি হয় সেও স্বীকার!

সুকুমার উত্তেজনায় মুখ লাল করে আস্তিন গুটোতে লাগল যেন একটি দক্ষ যজ্ঞ করতে যাচ্ছে! মা হেসে ফেল্‌লেন—এই এক পাগল! আরে, এত দূর থেকে খবর পেলে তবে না? সে কি তোমাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাবে বিয়েতে?

—তাহলেও আমি কি অমনি ছাড়ব না কি? আর কিছু নাহয় তো সরিতের খোর-পোষ তার ঘাড়ে ধরে আদায় করে নেব,—হুঁ, হুঁ, সে ভেবেছে কি? বিয়ে করা পরিবার—ঠাট্টা তো না?

শিবানী গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে ব্যথিত স্বরে বল্‌লেন—সে যেন হল, কিন্তু……তাতেই কি সরিৎ সুখী হবে মনে করো? ওর এইত বয়স, সারা জীবনটাই পরে রয়েছে এখনো, মেয়ে মানুষের জীবন এ ভাবে কাটিয়ে দেওয়া বড় শক্ত কথা, বাবা!…

সেই জন্যই না মনু বলেছেন স্ত্রীলোক বাল্যে পিতার অধীন—যৌবনে পতির ……

—আরে, রেখে দাও তোমার মনু! এ সব শাস্ত্র মনু গাঁজায় দম্ লাগিয়ে লিখেছিলেন বোধহয়? নারীত্বের এতবড় অপমান—

তা কেন? যে সংসারে নারীর অপমান করা হয় সেখানে লক্ষ্মীর কৃপা থাকে না, এওতো উনিই লিখেছেন!

—কিন্তু তোমার জামাইটিত সে বান্দা নয় মা! কাকা এ রত্নটি যে কোত্থেকে আবিষ্কার করলেন, তুমিও রাজী হয়ে গেলে এক কথায়।

মা ক্ষুব্ধ হয়ে বল্লেন

—রাজী না হয়ে কি করি বলো? উনি যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে কি আর......পয়সার জোর নেই, মেয়েও তেমন 'আহামরি' না, কাজেই—

—তবুও, তাড়াতাড়ি কি ছিল? এখন তো আর তোমাদের সেকালের গৌরীদানের বিধি নেই। ওর প্রথম স্ত্রী অমন ভাবে মরেছে জেনেও তোমরা কসাইটাকে মেয়ে দিতে গেলে কোন বুদ্ধিতে......আশ্চর্য্য! তার চেয়ে সরিৎকে হাত পা বেঁধে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেই তো আপদ চুকে যেত!

শিবানী একমুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থেকে, আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলে অনুতপ্ত কণ্ঠে বল্লেন

—যাক্, যা হয়ে গেছে, সে ত আর ফেরাবার নয়, এখন কি করলে ভাল হয় বল্তো, আমি যে কিছুই ঠিক করতে পারছি না, চিঠিখানা পেয়ে পর্য্যন্তই ভাবছি—

—সরিতের কি ইচ্ছে, সেটা জেনে নাও তার পর... সে গেল কোথায়?

—ওই যে ও ধারে বসে কি সেলাই করছে, ডাকব?

শিবানী দোরগোড়ায় গিয়ে ডাক্লেন—

—সরি! ও সরি!

উত্তর এলো—কি মা?

—একবার, এখানে আয় তো,—তোর দাদা ডাকছে।

একটু পরেই সরিতের গান শোনা গেল

"একা মোর গানের তরী ভাসিয়ে দিলাম নয়ন জলে"

—এই যে আসছে,—হতভাগা মেয়ে এখনও গান গায় যে কোন সুখে—

মা'র কথায় সুকুমার একটু হেসে বল্লে—

—এটা তোমার ভুল মা, লোকে গান শুধু সুখেই গায় না, দুঃখেও গায়। আর সরিৎ তো গান না গেয়ে থাকতেই পারে না, ওটা ওর মুদ্রাদোষ!

সরিৎ ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে—

—আমায় ডাকছ দাদা?

—হ্যাঁ, বোস্, কি করছিলি?

—এই তোমার রুমাল ক'খানা—এবার একেবারে ডজন খানেক করে দিলুম, দেখি তুমি কত হারাতে পারো!—

সরিৎ তার স্বাভাবিক মধুর হাসিতে অধর রঞ্জিত করে সুকুমারের পায়ের কাছে ধপ্ করে বসে সেলাই করতে লাগলো।

তার সন্ধ্যাতারার মত কমনীয় স্নিগ্ধ মুখখানিতে বালিকার সরলতা, শিশুর নিশ্চিন্ততা যেন মাখানো, উদ্বেগ কি বেদনার এতটুকু আভাস নেই তাতে—আশ্চর্য্য!

এতবড় একটা দুঃসংবাদ ওর মনে কোনো রেখাপাত করে নি কি?

সুকুমার খানিক নীরবে চেয়ে থেকে ডাক্লে—সরিৎ!

সরিৎ সেলাই থেকে মুখ তুলে বল্লে—

—কি দাদা!

—বলছিলুম তোর ডাক এসেছে যে! নরেনের চিঠি পড়লি তো?

সরিৎ ঘাড় নেড়ে ছুঁচে সুতো পরাতে লাগল। যেন কিছুই হয়নি এমন বেপরওয়া ভাবে।

তার মুখের পানে দৃষ্টি রেখে সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে —তোর কি ইচ্ছে? —যাবি?—

—কোথায়?

—রাণীগঞ্জে।

—কেন বলো দেখি? নতুন বৌয়ের জন্য চাকরাণীর দরকার—তাই?—না বাপু, ও সব কাজে আমি মোটেই অভ্যস্ত নাই।

সরিৎ হাসিমুখে বল্লে ও কথাটা তার সহোদর ও জননীর মনে এমন আঘাত করল যে তাঁদের মুখে সহসা বাক্য নিঃসরণ হল না।

শিবানী অচিরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—বালাই! তা কেন? তুই সেখানে ফিরে গেলে কি আর বিয়ে করতে তার সাহস হবে? না এতদূর হবে? মানুষ তো!

-সেইখানেই তো সন্দেহ!

সুকুমার ম্লানমুখে বোধ করে একটু হেসে বললে—

বিয়েটা বন্ধ করতেই তোর যাওয়া।—বুঝেছিস বোকা মেয়ে?—

কিন্তু আমার কিসের গরজ শুনি?—সে একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে করুক না, আমার তা'তে কি?—

মা মেয়ের মুখপানে তাকিয়ে গালে হাত দিয়ে বলে উঠলেন--শোনো মেয়ের কথা! হ্যাঁরে সরি! এই কি তোর ছেলেমানুষি করার সময়?—তোর সারাজীবনটাই যে নিষ্ফল—

—হোক্ নিষ্ফল!

সরিতের আঙ্গুলে ছুঁচ ফুটে রক্ত বেরিয়ে এল, অন্যহাতে আঙ্গুলটা চেপে ধরে উত্তেজিত স্বরে সে বলে উঠল—

—তাই বলে অমন ধারা ঝাঁটা লাথি খেয়ে জীবন সফল করতে আমি চাই না, যার নাম শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে......

—আহা মানুষ কি আর বদ্‌লায় না? সে তো দুবছরের কথা, এখন ভাল করে বুঝে দেখ মা,--বোঝবার বয়স তো তোমার হয়েছে।

—বুঝেছি মা! খুব বুঝেছি। এর বেশী বুঝতে হলে আমার প্রাণটাই বেরিয়ে যাবে! তোমাদের ইচ্ছে হয় দুবেলা দুটো খেতে দিও, না পারো—পথে পথে ভিক্ষে করে ...তাই বলে সে যমপুরীতে গিয়ে থাক্‌তে আমি পারব না!

আরক্তমুখে কঠিন স্বরে কথাটা বল্‌তে বল্‌তে সরিৎ সেখানে থেকে উঠে গেল।

মা হতাশ হয়ে বললেন—

এই দেখ, যা ভেবেছি তাই,—ও মেয়ে কি সহজে রাজি হবে?

সুকুমার সবেগে বলে উঠল—

—এ যে অন্যায় কথা মা!--ও রাজি হয় কেমন করে? মেয়ে জন্ম হ'লে ও ওর ভেতরে একটা মানুষের প্রাণ আছে সেটা স্বীকার করতো?--এতটুকু বয়সে যে অমানুষিক অত্যাচার সরিৎ সহ্য করেছে--এই দু-বছরে তা'কি ভুলতে পেরেছে, মনে কর?

শিবানীর মুখে চোখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল, ক্ষণ-কাল বিমূঢ়ভাবে চিন্তা করে তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বললেন--তাহলে উপায়? ও মেয়েটার এখন কি দশা হবে সুকু!—

কেন! ওতো জলে পড়ে নেই! বেশ, লেখা-পড়া শিখিয়ে...সরিৎকে তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও মা, আমি ওকে এমন ভাবে গড়ে তুল্‌ব যে নিজের জীবনটাকে ও নিজেই চালিয়ে নিতে পারবে স্বচ্ছন্দে,—

কিন্তু...

—আবার কিন্তু কি! সরিতের যে বিয়ে হয়েছে, একথা তুমি ভুলেই যাওনা মা! দেখছ তো আজকাল আমাদের বাংলা দেশেও কত মেয়েরা চিরকুমারী থেকে কেমন স্বচ্ছন্দে, স্বাধীন ভাবে—

—তাদের কথা আলাদা বাবা, তারা ঠিক আমাদের সমাজে চলে না তো?

—আহা!—না-ই বা চলুন! তাই বলে ওটাকে ধরে বেঁধে জবাই করতে হবে নাকি?—আমি কিন্তু পারব না নিয়ে যেতে,—আগে থাক্‌তেই বলে রাখলুম।—

সুকুমার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে বইখানা আবার তুলে নিলে।

মা চুপ করে বসে ভাবতে লাগলেন,—আকাশ পাতাল!—

দুই

রাত তখন কত কি জানি—

কিসের একটু শব্দে সরিতের ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোখ মেলে চাইতেই সে দেখতে পেলে মা কখন বিছানায় উঠে বসেছেন। সামনে খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে গালে হাত দিয়ে স্তব্ধ ভাবে বিরাগী শ্রান্ত ক্ষুব্ধ অন্তরের নিগূঢ় বেদনারাশি নিভৃত নিশীথের মৌন নীরবতার মধ্যে তা'র অন্তর্যামীর চরণে নিবেদন করছিলেন বুঝি।

কৃষ্ণপক্ষের শুভ্র পাণ্ডুর জ্যোৎস্না তাঁর ব্যথাতুর মুখে-চোখে, সাদা ধবধবে থান কাপড়ে পড়ে, বিধবার উদাসীন মূর্ত্তিখানি যেন আরো করুণতর করে তুলেছে।

সরিৎ ধীরে ডাক্‌লে

—মা!

মা চমকিত হয়ে বললেন

—কি মা?

ক'ট বাজল ?

এই দুটো বাজে আর কি।

ইস! তুমি এখনো ঘুমোও নি ?

না মা, পোড়া ঘুম কিছুতেই আসে না যে!

তা বলে সারারাত বসে থেকে—শুয়ে পড়ো মা, এবার বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, ঘুম এসে যাবে।

শিবানী একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়লেন, অন্তরের দাহ কি বাইরের ঠাণ্ডায় শীতল করা যায় ?

পাশাপাশি দুখানা খাট গায়ে গায়ে লাগাও, ঘরের বাতি নিভানো, চাঁদের আলোও সরে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

শিবানী চুপ করে শুয়েছিলেন তবু সরিৎ জানতে পারলে মা ঘুমোন নি জেগেই রয়েছেন, এও বুঝলে মা'র অনিদ্রার হেতু সে-ই।

সরিৎ কাছে সরে গিয়ে মা'র বুকের ওপর একখানা হাত রেখে গাঢ় স্বরে আস্তে আস্তে ডাকলে—

মা!

কিরে সরিৎ ? ঘুম আছসে না বুঝি ?

তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ মা ? সত্যি করে বলো।

শিবানী মেয়ের দিকে পাশ ফিরে স্বল্পালোকে যতদুর সম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখপানে চেয়ে বললেন।

কেন রে। রাগ করব কেন ?

এই আমি যে রাণীগঞ্জে যেতে চাইছি না তাই।

রাগ না সরিৎ, ভাবনা, এ ভাবনার কূল কিনারা কিছু পাচ্ছি না আমি। তুই মাথাটা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখ দেখি মা! তোর এ সময় কর্ত্তব্য কি ? সমস্ত বয়সটাই এখনো পড়ে রয়েছে। চিরটা জীবন এমনি ভাবে নিজের সুনাম সম্মান বজায় রেখে চলতে পারবি কি ? বড় কঠিন মা বড় কঠিন।

তুই ছেলে মানুষ বুঝতে পারবি না, এমন করে স্বামী থাকতেও স্বামী-হারা হয়ে জীবন কাটানো যে কত……

স্বামী! এত দুঃখেও সরিতের হাসি এলো।

স্বামী মেয়েদের পরম প্রিয় সে তা শুনেছে, বইতেও পড়েছে কিন্তু স্বামীর কথা স্মরণে অন্তর তার মধুর পুলক-রসে আপ্লুত হয়ে তো ওঠেই না, বরং হৃৎকম্প হয় যেন, মনে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করে। সেই স্বামী সঙ্গ না পেলে তার জীবনটাই দুর্ব্বহ হয়ে উঠবে, এর চেয়ে আশ্চর্য্য কথা আর কি আছে।

সরিতের নীরবতায় অসহিষ্ণু হয়ে মা আবার ব-লেন—নিজের মনে বেশ করে বুঝে দেখ মা! এখন সকল দিক ভেবে কাজ করতে হবে তো ? যে তোকে এত আদরে এত যত্নে মানুষ করছিল সে তো ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, আবার কোন দিন আমারও ডাক পড়বে, তখন—

সুকু তোমাকে অযত্ন করবে না জানি, কিন্তু—এর পরে পরের মেয়ে এসে যদি বিভ্রাট বাধায় সেটা অসম্ভব নয় সরি!

—তাহলেই বা ভয় কি মা ? ভগবান আমায় হাত পা দিয়েছেন বুদ্ধিও দিয়েছেন কিছু, তাই খাটিয়ে একটা মানুষের জীবন সুখে না হোক স্বস্তিতে কাটতে পারে নাকি ?

পাগলী!

সরিতের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শিবানী সস্নেহে বললেন—

পারে হয়তো কিন্তু মেয়েমানুষের এভাবে একলা পথ চলা যে কত কঠিন তা তোমার এখন ধারণাতেই আসবে না সরিৎ! একটু পা পিছলেছে কি আর রক্ষা নেই! আমাদের সমাজ পুরুষের শত অপরাধ ক্ষমা করে দেবে অনায়াসে—কিন্তু মেয়েদের এতটুকু ত্রুটী বিচ্যুতি তারা সইতে পারে না, এমন পোড়া বিধান।

সরিৎ আর কিছু না বলে চুপটী করে হয়তো মায়ের আদরটুকু উপভোগ করতে লাগল।

তার সাড়া না পেয়ে মা ডাকলেন—

সরি, ঘুমুলি ?

হ্যাঁ মা, আমার এবার ঘুম পাচ্ছে, তুমিও ঘুমিয়ে পড়ো নইলে মাথা ধরে কষ্ট পাবে।" এ সব বিধান টিধান ভেবে কাল যা হয় স্থির করা যাবে।

শিবানী হাতখানা সরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে শুলেন।

সরিৎ ঘুমুলো না, চুপ করে ভাবতে লাগল। ওঃ! এত ভাবনা সে জীবনে কোনদিন ভাবেনি বোধ হয়।

এতদিন মায়ের আদরে, দাদার স্নেহে তার দিনগুলো বেশ এক রকম কেটে যাচ্ছিল হেসে খেলে, এবার ভগবান একি সমস্যায় ফেললেন তা'কে ?

কতক্ষণ বাদে, একটা গভীর উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে চমক ভাঙ্গা হয়ে সরিৎ দেখলে মা আঁচলে চোখ মুছছেন।

সরিতের কোমল চিত্ত আহত, ব্যথিত হয়ে উঠল, আহা! মা তার জন্যে কি যন্ত্রণাই ভোগ করছেন!

তাঁর দিকে খানিক নিষ্পলকে চেয়ে চেয়ে সে হঠাৎ উঠে মায়ের বুকের 'পরে মুখ রেখে আর্দ্র কণ্ঠে বলে উঠল—

মা! তুমি অমন করে আর কেঁদো না মা, আমি রাণীগঞ্জে যাব, কিন্তু যদি সেখানে টিঁকতে না পারি, যদি নিতান্তই অসহ্য হয়ে পড়ে......

তা'হলে আমার কোলে ফিরে আসবি মা, আমি তো এখনো মরি নি!

সরিতের চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল ঝরে পড়ল।

তাকে বুকে জড়িয়ে মা গভীর মমতায়, বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বললেন—

ভয় কি সরিৎ! আমি আশীর্ব্বাদ করছি, এবার স্বামীর ঘরে তুই নিজের স্থান করে নিতে পারবি।

—তিন—

সকালবেলা সরিৎ বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে পূর্ব্ব দিগন্তের যেখানটাতে কোমল গোলাপী আভার ওপর ধীরে ধীরে জাফরাণী রং ফুটে উঠ্‌ছে, সেই দিকে উদাস দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, গুণ্ গুণ্ করে আপন মনে গান করছিল—

—"যা হারিয়ে যায় তা আগ্‌লে বসে রইব কত আর আর পারি নাথ! জাগ্‌তে রাত, ভাব্‌তে অনিবার!"—

সুকুমার হঠাৎ পিছন থেকে বলে উঠ্‌ল—

ইস্! ভারি ফূর্ত্তি হয়েছে না? মেয়েমানুষের জাতটাই এমনি বেইমান্! তাদের যতই খাওয়াও দাওয়াও যত্ন করো, পোষ মানে না, শশুর বাড়ীর নামটী শুনেছেন কি ব্যস্।

সরিৎ দাদার দিকে ফিরে মুখ টিপে হেসে বল্‌লে—আহা গো! তাই তো। ওঁরা এমনি ইমান্‌দার জাত যে একটা বোন্ দিনরাত খোসামোদ করে মরে, তাকে তাড়াবার জন্যে হাত ধুয়ে লেগেছেন,—লজ্জা করে না বল্‌তে?

—আমি তোকে তাড়াচ্ছি বাঁদরী? অ্যাঁ? আচ্ছা, এই সকালবেলা সূর্য্য নারায়ণকে সামনে রেখে সত্যি করে বল্ দেখি, আমি তোকে তাড়াচ্ছি?—

সরিৎ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌ল—

—বারে! আমি কি মিথ্যে বলেছি,—তাড়াতে হবে তো তোমাকেই—নইলে আমার গতি মুক্তি করবে কে?

ওহো! তাই বুঝি ভেবেছিস, আমি তোকে নিয়ে যাব, রাম বলো! শর্ম্মাকে মেরে ফেললেও পাদ মেক নঃ গচ্ছামি।

সরিৎ হেসে রেলিংয়ের ওপর গড়িয়ে পড়ল, হাসির কথা ছিল না—তবু। মেয়েটা যেন হাসির উৎস, গানের ঝরণা।

সরিৎকে ধাতস্থ দেখে সুকুমার তার পানে প্রীতি-পূর্ণ সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সকৌতুকে বললে—

—"আরে গেল যা, হেসেই মলো, হাসির কথা কি বলেছি রে? ঠাট্টা নয়, সত্যি বল্‌ছি তোকে আমি বরং গলা টিপে ত্রিবেণীতে ভাসিয়ে দিয়ে আস্‌ব, তবু সে জঘন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারব না।

সরিৎ হাসি থামিয়ে, হাসির বেগে এসে পড়া চোখের জল মুছতে মুছতে বললে—

—তাহলে কি হবে, আমি কার সঙ্গে যাই, ওই দুঃখী রাম বুড়ো কে বলব নাকি জিনিষ পত্র বেঁধে তয়েরী হতে, এই বেলা গিয়ে না পড়লে শেষে আবার সতীন বরণ করতে হয় যদি, আমি যে আবার বরণ ট্রণ ও কিছু জানি না ছাই!

—বেশ তো, তাই যা কিন্তু যাবার আগে রামকে বলিস্ পিঠে বেশ করে গরম তেল ডলে দিতে, গুণনিধির সেদিকেও ঘাট নেই তো, একেবারে চতুরঙ্গ স্বয়ার!

—হাসছ তুমি, আচ্ছা, হেসে নাও খুব। কিন্তু মনে রেখো, যত হাসি তত কান্না।

—আ গেল পোড়ার মুখী নিজেই হাস্‌বে আবার...

—নিজেকেও বলছি, এতদিন হাসির পালা চলছিল, এবার কান্নার পালা আরম্ভ—

সুকুমারের হাসি মুখ ম্লান হয়ে গেল, সে ত্রস্তে জিজ্ঞাসা করলে—

তুই সত্যি সত্যি যাবি নাকি? হ্যাঁরে?

সরিৎ মুখ নীচু করে ধরা গলায় বললে—

—না তো কি? তুমি কি ভেবেছ তামাসা?

—কিন্তু এ দুর্মতি তোর কেন হল শুনি?

—দুর্মতি নয় দাদা, সুমতি বলো! এ সুমতি মনে আনতে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে, তুমি আর ভাংচি দিও না।

—বুঝেছি, এ সুমতি তোকে দিলে কে—মা'র তো ঐ দশা, এখন ভোজং ভাজং দিয়ে পঠিয়ে দেবেন, আর কেঁদে মরবেন আরকি সরি সরি করে! কি দরকার ছিল—

সুকুমার ফর্‌ফরিয়ে চলে গেল।

সরিৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার গাইতে চেষ্টা করলে, কিন্তু তার গলায় আর গানের সুর ফুটল না।

আজ কিসের একটা অদম্য উচ্ছ্বাস সরিতের বুকের ভেতর উঠছে যেন, কেবলি মনে হচ্ছে মায়ের কল্যাণময় আশীষ বাণী তার অদৃষ্টে যদি—যদিই ফলে যায়!

স্বামীর সাথে ঘর করেছে সে ক'দিনই বা! ছ'মাসও হবে না। তারই মধ্যে স্বামীর অসাধারণ প্রকৃতির যতদূর পরিচয় সে পেয়েছে তাতে স্বামীদেবতার প্রতি ভক্তি ভালবাসা তো দূরের কথা, এতটুকু প্রীতির ভাবও বুঝি মনে কখনও আসে না!

সরিতের নিজের দোষও ছিল হয়ত—স্বামীর ধাত বুঝে ইচ্ছা বুঝে চল্‌তে সে ঠিক মত পারেনি, কিন্তু তাই বলে কি অমনি করেই শাস্তি দিতে হয় নির্দ্দয়ের মত!

কত আশার জল্পনা, সুখের কল্পনা প্রাণে নিয়েই সরিৎ স্বামীর ঘর করতে গিয়েছিল। দোজবরে হলেও নরেনের বয়স বেশী নয়, তার সুশ্রী চেহারা, সরস বচন, সরিতের তরুণ চিত্তকে আকৃষ্ট করেনি—এমন নয়,—কিন্তু সে দুটি দিন মাত্র।

তৃতীয় দিন রাত্রেই সরিৎ বুঝতে পারলে—যে বিধাতা সুন্দর ফুলের বুকে কীটের সৃষ্টি করেছেন এ জীবও তাঁরি সৃষ্ট!

সেদিন নরেন একটু বেশী রাত করে ঘরে ফিরল, তখন তার অবস্থা ঠিক্ স্বাভাবিক নয়।

সরিৎ মা'কে চিঠি লেখা শেষ করে শুধু জেগে থাকবার জন্যে আলোর কাছে বসে একখানা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল—বইখানা ওমর খৈয়াম তার বিবাহের উপহারে প্রাপ্ত।

সারাদিনের ক্লান্তিতে তার চোখ জড়িয়ে আসছে, তবু শুতে পারে না—পাছে স্বামী কিছু মনে করেন।

এক সময় ভেজানো কপাট খোলায় দড়াদ্দম্ শব্দে সচকিত হয়ে সে দেখলে নরেন ঘরের মধ্যে—

তার, আরক্ত ঢুলু ঢুলু চক্ষু, স্ফীত অধর, টলটলায়মান গতি সরিৎকে এতই বিস্মিত ত্রস্ত করে তুললে যে মাথায় কাপড় দিতে সে ভুলে গেল।

নরেনও একটু থমকে গেল সেই বিস্ময় চকিতা তরুণীর পানে চেয়ে।

সরিৎকে আজ বাস্তবিক সুন্দরী দেখাচ্ছিল।

ফাল্‌সাই রংয়ের কালোপেড়ে সাড়ীখানা, শ্যামোজ্জল কান্তিকে সুগৌর করে তুলেছে।

ঢেউ খেলানো কালো চুলগুলি তার সিঁদুর রাঙা সরু সিঁথিটীর দুপাশ থেকে, কাণদুটী প্রায় ঢেকে দিয়ে, স্তরে স্তরে নেমে গিয়েছে। অনাবৃত ঘাড়ের দিকে হেলাবিছে হার ছড়া যেখানে চিক্ চিক্ করছে সেইখানটীতে, চোখে মুখে মধুর অলস ভাব।

সরিৎকে এত সুন্দর নরেন কখনো দেখেনি বুঝি? মনে হচ্ছিল সে যেন কোন কল্পলোকের রাণী! আর লোহার চেয়ারখানা তার যেন স্বর্ণ সিংহাসন!

কিগো রাণী আমার! এখনো জেগে আছ? বাঃ! আমি বলি অর্দ্ধেক রাত্রির!

নরেন এগিয়ে আস্‌তেই সরিতের নাকে লাগ্‌লো একটা অসহ্য উৎকট গন্ধ, যার তীব্রতায় গলার যুঁইফুলের মালার সুমিষ্ট মৃদু সৌরভ চাপা পড়ে গিয়েছে।

—বই পড়া হচ্ছে! কি বই ওখানা—ওমর খৈয়াম!

আরে বাহবা! তাহলে যা ভেবেছিলুম তা নয় দেখছি—তুমি নেহাত বেরসিক নও—

যার ওপর আলো ও বইখানা রাখা ছিল, সেই পুরানো বনাত-ওঠা রং-চটা রাইটিং টেবিলটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, নরেন বইখানার ছবি দেখতে দেখতে হেসে বল্‌লে—

—বাঃ বেশ তো! এই ওমর খৈয়াম বুড়ো—বেড়ে মজায় ছিল কিন্তু!—কেবল সরাব্‌ আর সাকী নিয়ে অমন করে থাক্‌তে পেলে—

কথার সঙ্গে সঙ্গে ভক্‌ ভক্‌ করে দুর্গন্ধ—উঃ!

সরিতের যেন বমি উঠে আসে। মুখখানা যথা-সম্ভব নীচু করে সে বললে

—ওতো আর সত্যি সত্যি মদ খেত না?

—নাঃ! মিথ্যে মিথ্যে মদ শুঁকত! ব্যাটা পয়লা নম্বরের মাতাল যাকে বলে পাঁড়! আবার এদিকে—দাড়ীতো শনের নুড়ী তবু ছুঁড়ী নিয়ে কি রঙ্গ দেখ না! তোমাকেও আজ সাকীর মতন দেখাচ্ছে—বাঃ!

নিজের গলার মালা ছড়াটা সরিতের গলায় দিয়ে তার কাঁধের ওপর নরেন আহ্লাদে ডগমগ হয়ে বললে—

আমি যেন ওমার খৈয়াম আর তুমি যেন আমার সাকী।

উহুঁ হল না তো আমি বসব আর তুমি আমার সামনে এসে—

কাছেই খাটের ওপর বিছানা পাতা, সেই বিছানায় ধপ করে বসে পড়ে নরেন গানের সুরে বলে উঠল—দেও সাকী দেও ভর পিয়ালা—কই গো সাকী! এস না, অমন করে দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সরিৎ তখন হাসবে কি কাঁদবে তা ভেবে পায় না। তার ইচ্ছে করছিল তখুনি ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কিন্তু...

সে যন্ত্রচালিতের মত স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

তার স্তব্ধ বিবর্ণ মুখের পানে তাকিয়ে সুরামত্ত নরেন—

আজ এমন মুসড়ে আছ কেন বলতো? মন কেমন করছে? কার জন্যে গো? কোনো লভার টভার আছে নাকি?

বলতে বলতে নরেন হো হো করে হেসে উঠল, ভারি যেন একটা রসিকতা করেছে।

এবার সরিতের চোখে জল এসে পড়ল। হায়! এই ব্যক্তিই তার স্বামী! তার ইহ পরকালের সর্বস্ব—জীবন-মরণের দেবতা!

ওকি রাগ হয়ে গেল? মাইরী!

সরিতের হাত দুখানা ধরে কোলের দিকে টানতে টানতে নরেন বল্লে—

রাগ করোনা প্রিয়ে! আজকালকার নাটক নভেল পড়া, থিয়েটার সিনেমা দেখা মেয়ে ওরকম ঘটা আশ্চর্য্য কি? তাই বলছিলুম যদি কেউ থাকে টাকে তাহলে—ওকি মুখ ফেরাচ্ছ যে? পায়ে ধরে মান ভঞ্জন করতে হবে নাকি?

সরিতের যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল, সে স্বামীর আলিঙ্গনে ধরা না দিয়ে ত্রস্তে বললে—

আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।

এরি মধ্যে ঘুম কিরে? কচি খুকীটী নাকি? সন্ধ্যে না হতেই......

সন্ধ্যে? কত রাত্তির হয়েছে হুঁস নেই বুঝি?

—নরেনের দিকে ফিরে সরিৎ দৃপ্ত ভঙ্গীতে বললে—

—একবার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ তো?

নরেন ঘড়ির দিকে না চেয়ে সরিতের মুখের দিকে বিহ্বল নয়নে চেয়ে বললে—

মাইরী আজ তোমাকে কি সুন্দরী যে দেখাচ্ছে, কি বলব আর! এজিনিষটার গুণই যে এমনি, তুমি তো তুমি, ওই কালপেঁচী কুলী মাগীরা, ওদেরকেও যেন অপ্সরা মনে হয়। আঃ! আবার মুখ ফেরায়! কেন রে? আমি কি তোর ভাশুর?

নরেন অধীর ভাবে সরিতের গলা জড়িয়ে তার মুখখানা মুখের কাছে আনতেই সরিৎ যেন জ্ঞানহারা হয়ে—

মা গো কি বিশ্রী গন্ধ ঘেন্না করে—

বলে হঠাৎ নরেনের মুখখানা সরিয়ে দেবার জন্যে একটুখানি ঠেলে দিতেই অসতর্ক নরেন খাটের ওপর দড়াম করে পড়ে গেল। মাথাটা খাটের রেলিংএ ঠুকে আঘাতও একটু লাগল বুঝি!

আর কোথায় যাবে?

—তবে যে, হারামজাদী, ঘেন্না করে? ইস্! তোর বাবার কত বড় ভাগ্যি যে আমি তোকে...

বল্‌তে বল্‌তে ক্রুদ্ধ নরেন হতবুদ্ধি সরিৎকে ধাঁ করে দিলে এক লাথি—

সানের মেঝেয় হঠাৎ পড়ে গিয়ে সরিতের আঘাত লেগেছিল সর্ব্ব শরীরে, তার মধ্যে টেবিলের পায়া লেগে রগের কাছে যে জায়গাটা কেটে গিয়েছিল তার দাগ আজও স্থায়ী হয়ে আছে স্বামীর অনপনেয় আদরের চিহ্ন হয়ে।

চার

পুরুষ চরিত্রে যে সব দোষ থাকা সম্ভব নরেনের তাতো ছিলই উপরন্তু একটা বিষম দুর্ব্বলতা, তার মনটা বড় সন্দেহ প্রবণ।—

নরেনের ধারণা স্ত্রীলোককে কদাচ বিশ্বাস করতে নেই। সরিৎ যেন দ্বিতীয় পক্ষ, কিন্তু তার প্রথমা স্ত্রীকেও স্বামীর সন্দিগ্ধ প্রকৃতির জন্য যে কত নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল, বাড়ীর পুরানো ঝিয়ের মুখে তার কিছু কিছু আভাস পেয়ে সরিতের বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে যেত।

তবু বাড়ীতে পুরুষের সংস্রব মাত্র ছিল না।

আবার সরিতের এক মাস্‌শাশুড়ী—সংসারে তার ভয়ানক আধিপত্য, শুধু বাড়ীর কর্ত্রী বলেই নয় ইনি নিঃসন্তান বিধবা, অথচ নিঃস্ব নয়, কাজেই নরেন এই মাসীটাকে একটু অতিরিক্ত সমীহ করে চলে।—

তিনিও সরিতের ধিঙ্গীপনায় উত্যক্ত হয়ে যখন তখন শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন—

—মাগো মা! খুঁজে খুঁজে নরু আমার কোত্থেকে কি বউ-ই যে নিয়ে এল!—সে বউ এমন বেহায়াপনা করলে রক্ষে ছিল কি?—বাপ্‌রে! কেটে দুখান্ করে ফেল্‌ত! ভাগ্যে দোজবরের বউ হয়ে এসেছিলে বাছা,—নইলে:..

এই মাসীটা সরিৎকে প্রথম থেকেই সুদৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি, কারণ সরিতের দোষ একটা নয়—অনেক।

পশ্চিমে মেয়ে সে হিন্দু ঘরের আচার কিছু জানে না, মুড়ী ভিজ্‌লে সকড়ী হয় এ তথ্য সে অনবগত।

গৃহস্থালীর কাজে নেহাৎ অপটু না হলেও বজ্জাতি ক'রে করে না,—অর্থাৎ কুটনো কুটতে আঙুল কেটে ফেলে, রাঁধতে দিলেই হাত পুড়িয়ে বসে, ভাঁড়ার বার করতে হলে তো কথাই নেই! পারে খালি ঘর গোছাতে, টেবিল চেয়ার সাজাতে আর গণেশ ঠাকুরের মত চার হাত বার করে লম্বা লম্বা চিঠি লিখতে—ব্যস্।

মা মাগী আদুরে মেয়েটাকে কি কিছুই শেখায় নি গা?—

ছেলে মানুষ! আরে রামঃ!—পনেরো বছর বললেই হল। বয়স ওর আঠারো উনিশের নীচে যদি হয় তো…

তারপর বউয়ের চাল চলন গেরস্থ ঘরের বউয়ের মত মোটেই নয়। ওর চুল বাঁধা, কাপড় পরা, ওঠা বসা, কথাবার্ত্তা বলা সমস্তই যেন খিরিষ্টানী ঢংয়ের, ঘোমটা দিতে তো জানেই না!

মাথা খুলে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, দরজার ফাঁকে উঁকি ঝুঁকি মারা, আবার যখন তখন গুণ্ গুণ্ করে গান গাওয়া—ওমা!—ওকিরে বাপু!

কেন? সে বউও তো ছিল, সতী-লক্ষ্মী স্বর্গে গেছে, তার মুখের কথাই কেউ শুন্‌তে পেত না। আর এ হয়েছে তেমনি বেহায়ার একশেষ, বোয়ের এসব বিস্তে নরু এখনো টের পায় নি তাই, টের পেলে একেবারে অনর্থ করে দেবে।

অথচ এসব কথা নেপথ্য থেকে এমন ভাবে বল হ'ত, যাতে কাণ পাৎলা নরেনের কাণে ঠিক্ যায়।

ফলে সরিৎকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হত কম নয়। সময় সময় প্রহার পর্য্যন্ত! মা বলে দিয়েছিলেন মেয়ে মানুষকে পৃথিবীর মত ধৈর্য্য রাখতে হয়, তাই সরিৎ নিতান্ত অসহ্য হলেও এ সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করছিল, কোনো অনুযোগ অভিযোগ না করে। মাকে যে চিঠি দিত, তাতেও কোনোদিন উল্লেখ মাত্র করেনি, কিন্তু শেষ কালে এমন এক কাণ্ড হয়ে পড়ল, যাতে সরিতের কপালে স্বামীর ঘর করা আর ঘটে উঠল না।

আশ্বিন মাসে, পুজোর কাছা কাছি মাসীমার একটী ভাগুর পো রাণী গঞ্জে বেড়াতে এলো, তার নাম শৈলেশ।

ছেলেটী দেখতে শুনতে বেশ, নারীর মত কোমল প্রকৃতি,—বয়সে সরিতের চেয়ে বছর দু'বছরের বড়ই হবে।

সরিৎ এই অপরিচিত ছেলেটীর সঙ্গে প্রথমটা কথা বলতেই ভরসা পায়নি কিন্তু শৈলেশ কি ছাড়ে! সে—

—ওকি বৌদি! আপনার বাড়ীতে আমি এলুম, আর আপনি আমার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলবেন না, তাহলে আমার এখানে থাকা চলবে না তো,—

বার, বার, বলায় সরিৎকে কথা বলতেই হল। অবশ্য মাসীমার অনুমতি নিয়ে।

নরু দাদার নব বধূ সরিতের অসাধারণ সরলতা, স্নেহ-প্রবণ মধুর প্রকৃতি শৈলেশ কে শুধু বিস্মিত ও প্রীত না একান্ত বাধ্য করে তুলে দিন কয়েকের মধ্যেই।

নিরপরাধিনী সরিতের নিগ্রহ দেখে তার কোমল চিত্ত দরদে ভরে ওঠে, সময় সময় অসহ্য হয়ে বলে ফেলে—

—আহা কাকিমা! বউ দিকে তোমরা অমন করো কেন, পরের মেয়ে বলে কি এতটুকু মায়া রাখতে নেই, বেচারী নেহাৎ ভাল মানুষ অত শত জানে না, তাই, হত যদি কলকেতার মেয়ে তাহলে দেখতে!—

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ত। নির্ব্বাক্ বধূর সঙ্কোচনত মুখের পানে সকোপ দৃষ্টি হেনে মাসীমা মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠতেন—

—হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ!-বড্ড ভাল মানুষ!-বেচারীর পেটে পেটে যে কত গুণ তাতো জানো না! দেখতেই ভিজে বেড়ালটী।

শৈলেশ আশ্চর্য্য হয়ে সরিৎ কে বলে—

—উঃ! বউদি, এ সব তুমি, কেমন করেই সহ্য করো?

সরিৎ ম্লান হেসে শুধু বলে—

মেয়ে মানুষকে যে সহ্য করতেই হয় ভাই।

সঙ্গে সঙ্গে দুফোঁটা চোখের জল চোখ ছাপিয়ে ঝরে পড়ে টপ টপ্ করে।

যেখানে তার শত দুঃখেও আহা বল্‌তে কেউ ছিল না, সেখানে এমন একটী ব্যথার ব্যথী, প্রায় সমবয়সী দেবরকে পেয়ে সরিৎ যেন 'বর্ত্তে' গিয়েছিল।

শৈলেশ তার বউদিকে খুসী করবার জন্যে কোত্থেকে সব ভাল ভাল বই, কাগজ সংগ্রহ করে আনে, তার চিঠি পত্র সময় মত ডাকে দিয়ে আসে, তাছাড়া আরো খুটি নাটি ফাই ফরমাইস খাটে, আবার আবদার ও করে ভাইটীর মত।

মাসীমা মনে মনে ব্যাজার হলেও মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে পারেন না, শৈলেশ যে তার ভাশুর পো—তাছাড়া থাকতে তো সে আসেনি—এসেছে দুদিনের জন্য বেড়াতে।

কিন্তু একদিনের ঘটনায় তার ধৈর্য্য রাখা কঠিন হয়ে পড়ল।

সেদিন একাদশী, বধূর ওপর রান্নার ভার দিয়ে মাসীমা কোথায় বেড়াতে গিয়েছেন। নরেন বেরিয়েছে কাজে, শৈল ও অনুপস্থিত।

সরিৎ রান্না ঘরে দাল তরকারী সব রেঁধে, উনানে ভাতের জল চাপিয়ে চাল ধুতে ধুতে অন্য মনে গান কর-ছিল—

"জিস্‌না জী চাহে সতালে
ও সীতম্ ইজাদ্ মুঝে
মিস্‌লে তস্‌বীর হুঁ আতি নাহি
ফরিয়াদ্ মুঝে।" *

হঠাৎ কিসের খুট্ করে একটা শব্দে চমকে সরিৎ গান বন্ধ করে দরজার দিকে তাকালো।

শৈলেশ হুর মুর করে ঘরে ঢুকে হাত তালি দিয়ে বলে উঠল—

—এনকোর-প্লীজ! থেমো না বউদি, সত্যি তুমি যে এমন সুন্দর গাইতে পারো—

সরিতের গানে কোনো দিন লজ্জা ছিল না, কিন্তু আজ তার বুকটা যেন দুর দুর করতে লাগল লজ্জায় যত না হোক—ভয়ে, যদি কথাটা ওঁদের মাসী বোন্‌পোর কাণে ওঠে—

তার এ ভয় কে সঙ্কোচ মনে করে শৈলেশ চৌকাঠের ওপর জাঁকিয়ে বসল—

—বলো না বউদি, লক্ষ্মীটী! আমার সামনে আবার লজ্জা কি, হিন্দী গান শুনতে আমার বেশ লাগে।

সরিৎ মুখ না তুলেই বললে—

—এটা তো হিন্দী নয় উর্দ্দু—

---

* দিয়েছ চাও যত ব্যথা তুমি, দাও ওগো নিঠুর, আমায় মৌন আমি ছবিটীর মত—অভিযোগ করিব কি হায়।

ও বাবা! তুমি আবার উর্দ্দু ও জানো বুঝি?

সরিৎ লজ্জিত হয়ে বল্‌লে—

—গানটা দাদা গাইতেন তাই আজ মনে পড়ে গেল।

—বেশ তো, তাহলে আরো একটু মনে পড়ুক না! সত্যি, ভারি মিষ্টি লাগছিল শুন্‌তে, যদি ও মানে টানে বুঝি না, কচু!

হ্যাঁ গানটা কি বউদি?—চিত্‌ না চাহে সতালে-- তারপর?

শৈলর উচ্চারণের বিকৃত ভঙ্গিতে সরিৎ হেসে ফেলে বললে—তারপর জানি না!

—বল্‌বে না?—আচ্ছা!—

শৈলেশ রাগের ভান করে উঠে গেল।

খানিক বাদে ভাতের হাঁড়ী নামিয়ে, সরিৎ শৈলেশকে স্নান করতে বল্‌বে বলে এদিক ও'দিক খোঁজ করেও তাকে দেখতে পেলে না, তখন কি আর করে, আস্তে আস্তে নিজের ঘরে এসে দেখে না, শৈলেশ চুপি চুপি কখন্ হাত বাক্সটী খুলে সরিতের গানের খাতা খানা নিয়ে পড়ছে।

সরিৎ চাবি আঁচলে রাখতে পারে না, টেবিলের ড্রয়ারে তার চাবি থাকে, কেমন করে সন্ধান পেয়েছে কি জানি। সে—

ওকি হচ্ছে ঠাকুর পো?—দিনে দুপুরে চুরী?

বল্‌তেই শৈলেশ সকৌতুকে হো-হো করে হেসে উঠল। বল্‌লে—

কেমন জব্দ! দু'লাইন গান শোনাতে বলেছিলুম তা হ'ল না, এখন একেবারে সবসুদ্ধ···কিন্তু এত গানও তুমি জানো বউদি! বাপ্‌রে বাপ্ সমস্ত গান গুলো না পড়ে এ খাতা দিচ্ছি না।

—না ভাই, রেখে দাও, লক্ষ্মীটী!

—উহুঁ! তা হবে না!—

শৈলেশ হাস্‌তে হাস্‌তে খাতাখানা বুকের সঙ্গে চেপে উঠে দাঁড়াল। সরিৎ অতিমাত্র ব্যগ্র হয়ে—

—না, ঠাকুর পো, আমার খাতা দাও—বলে খাতাটা কেড়ে নিতে তাড়াতাড়ি শৈলের হাত ধরেছে, ঠিক সেই সময় মাসিমা কোথা হতে হন্ত দন্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠলেন—

—ও মা, মা মা! কি ঘেন্না! কি ঘেন্না! বলি হ্যাঁ বউ!—লজ্জা সরমের মাথা কি একেবারেই খেয়েছ? ব্যাটা ছেলের ঘাড়ের ওপর অমন হুমড়ী খেয়ে পড়ে ···ছি, ছি, ছি!

সরিতের আগুন তাতে রাঙা মুখখানা আরো লাল হয়ে গেল।

শৈলেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বিরক্তির সহিত বললে —আঃ! কি বক্‌ছ কাকিমা? বউদি শুধু আমার কাছ থেকে খাতা খানা নিতে...

হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ!—সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে! তুমি কি বুঝবে! ও যে কি ভয়ানক মেয়ে! বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই তাই রক্ষে—

সরিৎ আর চুপ করে থাক্‌তে না পেরে আহত স্বরে বলে উঠল—আমি কি করেছি মাসীমা? যার জন্যে আমাকে এমন করে অপমান...

—ওরে বাপরে!—ওর আবার অপমান! মিটু মিটে 'ডান' ছেলে খাবার রাক্কস—ছেলেটাকে ভাল মানুষ পেয়ে ঘাড়ে চেপে...

—উঃ! আর বলবেন না, বলবেন না! চুপ করুন— আপনাদের মন যে এত জঘন্য, এত নীচ, তাতো জানতুম না!

—কী? যত বড় মুখ না, তত বড় কথা! আমরা নীচ, আমরা ছোট লোক? হারামজাদী! রোস না, আসুক নরু, এখনি ঝ্যাটা মেরে, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বিদেয় করে যদি না দেই তবে যা বল্লি সব মিথ্যে।

তারপর খণ্ড প্রলয় ব্যাপার আর কি?

পাঁচ

ঠিক মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে না দিলেও সরিৎকে যে ভাবে বিদায় করা হয়েছিল তা যেমন করুণ তেমনি বীভৎস।

সে এক বিভীষিকাময়ী রাত্রি, যেমন বৃষ্টি, তেমনি ঝড়। অন্ধকার এত, যে কোলের মানুষ দেখা যায় না। পথের কুকুর পর্য্যন্ত গৃহস্থ বাড়ীর দালানে কোণ খুঁজে নিয়েছে এমনি দুর্য্যোগের রাতে—

শিবানী সকাল সকাল রান্না খাওয়া সেরে, দোর-দারা সব বন্ধ করে বসে, ছেলের সঙ্গে গল্প করছিলেন; এই পূজার ছুটীতে সরিৎকে আনুতে সুবিধা হবে কিনা, সেই কথাই হচ্ছিল—

এমন সময়, বাইরে ঝড় বৃষ্টির সোঁসোঁ ঝম্ ঝম্ শব্দের মধ্যে গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। শিবানী উৎকর্ণ হয়ে বল্লেন।

গাড়ী খানা থাম্‌ল না? কে এলো এ দুর্য্যোগে? বলতে বল্‌তে দরজাটা নড়ে উঠল---শিবানী বল্লেন—

—দেখতো সুকু, কে এলো বুঝি,

সুকুমার ত্বরিতে দরজা খুলেই চম্‌কে উঠল্—

—একি সরিৎ!

সরিৎ তীরের মত ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল, তার কেশ বেশ প্রায় আর্দ্র বিশৃঙ্খল, চোখ মুখ মৃতের মত [illegible] পাংশু, এ আবার কি মূর্ত্তি!—

[illegible] বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইলেন। চোখের তাঁর পলক নেই, মুখে বাক্যও নেই।

সুকুমার সবিস্ময়ে বলে উঠল—

—একি সরিৎ! হঠাৎ এমন করে, এই দুর্য্যোগের মধ্যে তুই···

গাড়োয়ান হাঁক্ দিলে—

আস্‌বাব উতার লিজিয়ে বাবুজী!—

সুকুমার আলো নিয়ে বাইরে গেল। শিবানী ত্রস্তে জিজ্ঞাসা করলেন—

জামাই আসেন নি?—

সরিতের রুদ্ধপ্রায় কম্পিতকণ্ঠে কষ্টে উচ্চারিত হল--

—এসেছিলেন---ষ্টেশন থেকে আমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে চলে গেলেন—

—চলে গেলেন? সে কিরে?—কেন?—

সরিৎ এবার মা'র পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কান্না-ভাঙ্গা আর্ত্ত কণ্ঠে বলে উঠল—

—মা গো!--আমার কোনো দোষ নেই মা!—বলছি—

মেয়েকে কাপড় ছাড়াতে গিয়ে শিবানী শিউরে উঠলেন। তার পিঠময় লম্বা লম্বা কালসিটের দাগ, দু'এক জায়গায় কেটে গিয়ে রক্তপাতও হয়েছে।

—উঃ! মাগো। একি কাণ্ড! দেহখানা একেবারে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে,—পাষণ্ডর প্রাণে কি এতটুকু দয়া মায়া নেই রে?—

মা কেঁদে উঠতেই সুকুমার ছুটে এলো—

—কই দেখি?

সরিৎ তখন দুহাতে মুখ চেপে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিল, তারদিকে সকরুণ সজল দৃষ্টিতে চেয়ে সুকুমার দাঁতে ঠোট কামড়ে সরোষে বলে উঠল—

—কাঁদিস নি সরি! এর শোধ আমি তুল্‌ব, সে রাস্কেলটাকে জেলে না পাঠিয়ে আমি ছাড়ছি না,--মা যাই বলুন।

কিন্তু ভদ্র ঘরে থানা পুলিশ কি করা যায়? কিছুই হল না।

দিন কয়েক পরে নরেনের এক চিঠি এলো, শিবানীর নামে, সে রাগ করে লিখেছে—সরিৎ কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ পলাতক হয়েছে, আপনার কন্যাকে আপনিই রাখুন, কারণ সে মেয়ে গৃহস্থ ঘরের উপযুক্ত নয়।

সরিতের স্বামী-গৃহবাসের ইতিহাসে এইখানেই সমাপ্তির রেখা পড়ে গিয়েছে।

এ দু'ছরের কথা, এর মধ্যে নরেন আর নিয়ে যাবার উল্লেখ করে নি, মা'ও পাঠান নি।

তাই দীর্ঘকাল পরে স্বামীর এ আহ্বান সরিতের তরুণ চিত্তকে ঝটিকা বিধ্বস্ত তটিনীর মত আলোড়িত ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

আশা থেকে নিরাশাই বেশী,—স্বামীর হৃদয়হীন আচরণ সে যে এখনো ভুলতে পারেনি!

তবে মা যে বললেন সময়ে মানুষ বদলে যায়--সেটাও অসম্ভব নয় তো! এতদিনে যদিই তার পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে, এই ক্ষীণ আশা,—দুর্য্যোগ রাতের পথিকের চোখে দুর-দৃষ্ট আলোটুকুর মত সরিৎকে আবার স্বামী-গৃহে টেনে নিয়ে গেল।

কিন্তু সে আশা তার নিভে গেল নিঃশেষে, সে ভুল তার ভেঙ্গে গেল বড় শীঘ্র, অতর্কিতে।

একমাসও পূর্ণ হয়নি, আবার শরতের এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল অপরাহ্নে, চোখের জল মাত্র সম্বল নিয়ে সরিৎ মায়ের দুয়ারে এসে দাঁড়াল, কাঙালিনী বেশে, সঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র পর্য্যন্ত নেই, গায়ের গহনা ক'খানিও অদৃশ্য!

সেই অগ্রহায়ণেই নরেনের পুনর্বিবাহের সংবাদ পাওয়া গেল।

ছয়

দেড় বছর পরের কথা।

শিবানী এখন পরলোকে। তার পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করেছে এখন সুকুমারের তরুণী বধূ প্রতিমা। যাকে নরেনের মাসীমার একটী ক্ষুদ্র শোভন সংস্করণ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এই প্রতিমা সরিতের প্রায় সমবয়স্ক হলেও গৃহিণী পদ লাভের গৌরবে নিজেকে অনেক উঁচু অনেক বড় মনে করে সরিতের উপর কর্ত্রীত্ব করতে কিছু মাত্র দ্বিধা নেই তার।

কিন্তু সরিৎ এই ক্ষুদ্র গৃহিণীটীর শাসন নিয়ম মেনে চল্‌তে একেবারেই অনিচ্ছুক।

প্রতিমা যখন মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর করে, ভারিক্কি চালে—

—ঠাকুর ঝি, তোমার বুদ্ধি বড় কম, সত্যি বলছি। সংসারের ভাল মন্দ কিছু বোঝো না, খালি পড়া মুখস্থ, আর গান গাওয়া এই জানো শুধু—

বলে অযাচিতে উপদেশ দিতে আসে, তখন সরিতের হাসি পায়। দুঃখ ও হয়, সময় সময় রাগও হয়ে পড়ে। তবে রাগটা থাক্‌তে পায় না বেশী ক্ষণ, দাদার জন্য।

—হ্যাঁরে সরিৎ! এটা বুঝিস্ না; ওতো হল পরের মেয়ে, ওর কথায় তুই যদি রাগ করিস্ তাহলে আমাকে যে লোটা কম্বল নিতে হয় ভাই!

বলে সুকুমার একবারটী মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেই সরিতের রাগ অভিমান সব জল হয়ে যায়।

ওদিকে প্রতিমার মুখখানা ভার হয়ে ওঠে।

স্বামীর এ পক্ষপাতিতায় তার পরমস্নেহের পাত্রী এই স্বামী-পরিত্যক্তা অভাগিনীর প্রতি প্রতিমার মন আরো বিরূপ হয়ে ওঠে যেন।

দু'দিক্‌কার তাল সামলাতে গলদ ঘর্ম্ম হতে হয় সুকুমার কে, সুতরাং এক এক সময় শান্তি রক্ষা তার কঠিন হয়ে পড়ে।

সংসার তেমন সচ্ছল নয়, পিতার মৃত্যুর পর তার সঞ্চিত সামান্য যা কিছু ছিল, সমস্তই লেগে গিয়েছিল সরিৎকে পাত্রস্থা করতে।

কাজেই, থার্ড ইয়ারেই কলেজ ছেড়ে সুকুমারকে ঢুক্‌তে হল একটা বে-সরকারী অফিসে।

এখন সে মাহিনা যা পায় তাতে তিনটী প্রাণীর আহারাচ্ছাদনের ব্যয় অক্লেশে নির্ব্বাহ হলেও উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না। এ অবস্থায় ভগ্নীর শিক্ষার জন্য সে আর বেশী কি করতে পারে?

সরিৎ জগত্তারিণী গার্লস স্কুলে পড়ছে, ম্যাট্রিক দেবে এবার—তার পর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

সেদিন রাত্রে, ঘরের মেঝেয় পাতা সতরঞ্চি খানা আড় হয়ে পড়ে, সরিৎ হেরিকেনটী বাক্সের ওপর রেখে হিষ্ট্রি মুখস্থ করছিল, দিনে ঘরের কাজে সময় পায় না বড়।

—কিরে সরিৎ! ঘুমুলি নাকি!

বলে সুকুমার ঘরে ঢুক্‌ল।

—না দাদা, এরি মধ্যে ঘুম কি—

সরিৎ বই থেকে চোখ তুলতেই দেখে সুকুমার একা নয়, তার সাথে আর একটী যুবক, বেশ মানান্ সই পুরুষোচিত চেহারা তার, রং গৌর না হলে ও ফরসা বলা যায়।

চোখের কোল একটু বসা, কিন্তু চোখদু'টীর ভাব মধুর। সামনে লম্বা চুল বাব্‌রী কাটা ধরণের।

একজন অপরিচিত ব্যক্তির সহসা আগমনে সরিৎ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে বস্‌ল।

সুকুমার যুবকটীর হাত ধরে এগিয়ে এসে হাসি মুখে বললে—

—এ কে বল্‌তো!

সরিৎ তার মুখ পানে চকিতে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে, সে মুখ যেন চেনা চেনা—কিন্তু—

—ওকি রে, চিন্‌তেই পারলি না? বারে! এ মধ্যে—

—নেহাৎ এরি মধ্যে নয়, প্রায় পাঁচ বছর হতে য সরিতের তখন বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে সবে—

—ও! আপনি মোহিত দা—না?

মোহিত হেসে বল্‌লে—

আজ্ঞে হঁ্যা! এতক্ষণে চিন্‌তে পারলেন; তবু ভাল!

সরিৎ হাস্‌তে হাসতে বল্‌লে—

—আচ্ছা, কি করে চিন্‌ব বলো; যা ভোল বদ্‌লেছ! মাথায় লম্বা লম্বা চুলের ঘটা, তখন গোঁফ ও ছিল—

—এখন তা অন্তর্দ্ধান!

বসো হে মোহিত! সরিতের ঘরে চেয়ারের পাট তো নেই, এই খাটের ওপর বসো, খানিকটা গল্প করা যাক্, মা গিয়ে পর্য্যন্ত গল্প আর জমে না, তবু সরিৎটা আছে, তাই—

আসন গ্রহণ করে সুকুমার বল্‌লে—

তোর হাতে ওটা কি, হিষ্ট্রী, আঃ ফ্যাল্ ফ্যাল্! সারাদিন বিশ্রাম নেই আবার রাত্তিরে ও—

সরিৎ সহাস্যে বললে

—বারে! মুখস্থ করতে হবে না; কাল যে হিষ্ট্রীর একজামিন!

মোহিত জিজ্ঞাসা করলে—

—কোন্ ক্লাসের একজামিন দিচ্ছ?

—ম্যাট্রিক, তারি জন্যে রাত জেগে মরছে একেবারে। ফার্ষ্ট না হয়ে ও ছাড়বে না দেখি, যে রকম উঠে পড়ে লেগেছে। এ বড় আশ্চর্য্য, ছেলেদের বকে পড়ানো যায় না, আর মেয়েদের বকে ছাড়াতে হয়! বাস্তবিক সুকুদা! মেয়েদের মধ্যে এই রকম একটা গোঁ আছে বলেই তারা পুরুষের চেয়ে স্বাভাবিক দুর্ব্বল হয়েও যেদিকে যায় সেই দিকেই উন্নতি করতে পারে। তুমি যে তামাসা করে বল সরিৎ ফার্ষ্ট হবে, সেটা কিন্তু অসম্ভব মনে করোনা।

—এই দেখ! তুমিও লাগলে মোহিতদা? আচ্ছা, এই নাও, বাপু, হিষ্ট্রী রেখে দিলুম, এখন কি করতে হবে বলো?

—আপাততঃ গল্প, তার পর—জানিস সরিৎ? তোর মোহিত দা এখন যে সে লোক নয়, একজন উঁচুদরের এ্যাক্টর। ফিলিমে নেমেই এ যেরকম নাম করেছে, তাতে ভবিষ্যতে—

—একটা কেষ্ট বিষ্ণু হয়ে দাঁড়াবে! অত আশা করি না দাদা, তবে ঘাড় গুঁজে কলম পেষা থেকে অব্যাহতি পেয়েছি, হাত তুলে দু' পয়সা খরচ করতেও পারছি এই যথেষ্ট মনে করি।

নাম করাতো মুস্কিল নয়, একটু চেষ্টা করলেই—এই তো সেদিন আমাদের কোম্পানীতে একটা মেয়ে এলো, গরীবের মেয়ে, বছর তের চোদ্দ বয়স, দেখতেও তেমন সুশ্রী না, কিন্তু গলাটা ভারি মিষ্টি, তাতেই ম্যানেজার তাকে রেখে নিলেন পঁচিশ টাকা মাসোহরা দিয়ে, এর পরে আরো...

সরিৎ চক্ষু বিস্ফারিত করে বলে উঠল—

—সত্যি?

সত্যি না তো কি মিথ্যে! নাচ, গান, বাজনা যে কত বড় 'আর্ট' তা এখন আমাদের দেশের লোকও বুঝেছে, তাই...

তুমি ও তো বেশ গাইতে পারতে সরিৎ, এখনো গাও? না ভুলে গেছ? তোমার ওপর যা চাপ...

ভগ্নীর দুর্ভাগ্যের ইতিহাস সুকুমার মোহিতকে প্রথম সাক্ষাতেই জানিয়েছিল, তবু পাছে সে প্রসঙ্গ এখানে এসে পড়ে বলে সুকুমার তাড়াতাড়ি বলে উঠল—

নাঃ, ভুলবে কেন? সরিৎ এখন আগেকার চেয়ে ও ভাল গায়, ওদের স্কুলে এবার গানের জন্য ফার্ষ্ট প্রাইজ ওই তো নিলে। আবার আমার কাছ থেকে প্রাইজ আদায় করেছে একখানা রবিবাবুর গানের বই আর এস্রাজ। আন্ তো সরিৎ, তোর এস্রাজটা—

সরিৎ লজ্জিতভাবে বল্‌লে—

আজ থাক্‌না দাদা, এত রাত্তিরে—

রাত্তির কোথায় রে? এখনো দশটাও বাজেনি, আমাদের খাওয়া সকাল করে হয়ে যায় বলেই। ওঠ ভাই, লক্ষ্মীটা! হিষ্ট্রী আমি ভোর বেলাই মুখস্থ করিয়ে দেব'খন।—

দাদার অনুরোধ সরিৎ এড়াতে পারলে না। এস্রাজ নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—

কি গাইব বলো?—

যে গানটা গাইতে তোর ভাল লাগে—।

সরিৎ নীরবে খানিক এস্রাজ বাজিয়ে গান ধরলে—

"আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে—দিবস গেলে

করব নিবেদন

আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন!

প্রথমে ভ্রমর গুঞ্জনের মত মৃদু মৃদু, তারপর নির্ঝরের

স্বতঃ উচ্ছ্বসিত কলতানের মত মধুর করুণ সুরে সরিৎ গাইতে লাগল—

যখন বেলা শেষের ছায়ায় পাখীরা যায়
আপন কুলায় মাঝে,
সন্ধ্যা পূজার ঘণ্টা—যখন বাজে,
তখন আপন শেষ শিখাটী জ্বালবে এ জীবন,
আমার ব্যথায় পূজা হয়নি সমাপন!

মোহিত তন্ময় হয়ে শুনছিল। কলিকাতায় ব্যবসা-সূত্রে সে অনেক বিখ্যাত গায়ক, প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী-দের গান শুনেছে, তার তুলনায় এ কিছুই নয়, তবু ভারি মিষ্টি লাগছিল! সরিতের কণ্ঠস্বর শুধু মধুর নয়, কেমন যেন মোহময়, আবেশময়, স্বপ্নে-শোনা বাঁশীর মত সুর তার—শ্রোতার প্রাণকে মাতিয়ে তোলে—।

তায় আবার বিশ্ব কবির বিশ্ব বিশ্রুত গান!

গান থামতেই মোহিত মুগ্ধ কণ্ঠে পুলকিত স্বরে বলে উঠল—

বাঃ বাঃ! কি বলি সরিৎ! তোমার মতন গলাটী পেলে আমি একেবারে মাত্ করে দিতুম আর কি!-- সত্যি সুকুদা, সরিৎকে গানের দিকেই ভাল করে ট্রেনিং দিলে—

ট্রেনিং আর কে দেবে ভাই? ওই স্কুলে যা অল্প স্বল্প...তাছাড়া আপনা আপনিই শিখেছে সব।

আহা!--একেই বলে ঈশ্বরদত্ত শক্তি। এ শক্তির অপচয় যাতে না হয়...না, সরিৎ! একজামিনে কম নম্বর নিলেও ক্ষতি নেই, মোদ্দা এই ঐশ্বরিক শক্তিটী নষ্ট করো না যেন, দোহাই তোমার! এরই বলে তুমি একদিন জগতে 'ফেমস্' হতে পারো, এই কথাটী মনে রেখো।

কথাগুলি সরিতের মর্ম্ম স্পর্শ করেছিল। তাই তার মনের মধ্যে পাক্ খেতে লাগল কেবলি, ওরা দুজনে চলে গেল—তখনো।

সরিতের গানের সুখ্যাতি করে সকলেই, কিন্তু এমন করে তার সার্থকতার আশা কেউ দেয় নি,--এত উৎসাহ ও সে পায় নি আর কারো কাছে।

সত্যি সত্যি, গান এমন জিনিষ যে সেই কোথাকার কে এক গরীবের মেয়ে, যার দু'বেলা দু'মুটো ভাতও কপালে জুটত না হয় তো—তার কিনা মাসে পঁচিশ টাকা ...

কিন্তু সেকি ভদ্রঘরের মেয়ে?

কি জানি মোহিতদাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

সাত

আজ বুঝি একজামিন হয়ে গেল সরিৎ? যাক্ বাঁচা গেল। এবার মাথায় সর্ষে দিয়ে গঙ্গাস্নান করে এসো গে!

মোহিতের কথায় সরিৎ হেসে বললে—

এখনি? আগে রেজল্ট তো বেরোক, রেজেল্ট যদ্দিন না বেরোয়, ততদিন ছট্ ফট্ করতে হবে।

কেন? পেপার ভাল করেছ তখন ভয় কি?--আচ্ছা এবার তুমি কি করবে সরিৎ? কলেজে পড়ে...

রসো, আগে পাশ তো হই।

আহা! আমি বলছি পাশ হবে—কিন্তু তারপরে? কলেজে ঢুকবে তো?

সরিৎ একটা ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ফেলে উদাস ভাবে বললে তাকি আর আমার কপালে হবে মোহিতদা? দাদা বেচারার ওই তো মাইনে, তাতে কলেজে পড়ে বি এ এম্ এ হবার আশা আমার করাই অন্যায়। তাই মনে করছি ট্রেনিং পাশ করে, একটা মাষ্টারি—

—ও!—মিস্ট্রেস হবে সরিৎ! কিন্তু তাতেই কি তোমার জীবনটা সার্থক হবে মনে করো?

—সার্থক না হোক্—নির্ব্বাহ তো হবে? নইলে এমন করে, চিরদিন দাদার গলগ্রহ হয়ে......

একটা গাঢ় তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে সরিতের বুকখানা কেঁপে উঠল। মোহিতও নিঃশ্বাস ফেলে বললে—

—তুমি মনে করলে জীবনে অসম্ভব উন্নতি করতে পারো সরিৎ! ভগবান্ তোমাকে যে শক্তি দিয়েছেন—

—ওঃ! গানের কথা তুমি বলছ, কিন্তু গান গেয়ে তো পেট ভরবে না? আমাদের স্কুলে গান শেখাবার জন্যে যে মিস্ট্রেস—

—আবার সেই মিস্ট্রেস্! ওরকম মিস্ট্রেস্ তো

হাজার হাজার রয়েছে, আমি সেকথা তো বলছি না,—এই যে 'গ্রেটা গার্বো' নামটা তুমি শুনেছ বোধহয়?—স্কুলের বই ছাড়া আর কিছু পড়ো না বুঝি?—কাগজ টাগজ—

—হ্যাঁ পড়ি বই কি? দাদা লাইব্রেরী থেকে মাসিক পত্র মধ্যে মধ্যে এনে দেন। যার নাম করলে কি গ্রেটা গার্বো তিনি কে?—

—তোমারই মত একটি মেয়ে। এর উপার্জ্জন কত জানো? মাসিক দেড়লক্ষ টাকা!

সরিৎ সবিস্ময়ে বলে উঠল—

উঃ! এত! ইনি গায়িকা বুঝি?

—শুধু গায়িকা নয়, ফিল্ম্ একট্রেস্, ছায়াজগতে এঁর নাম এত বেশী যে—

—একট্রেস্!

সরিতের মুখের ভাব নিমেষে বদ্‌লে গেল। সে ভ্রূকুঞ্চিত করে বল্‌লে—এটা তোমার ভুল মোহিতদা, সে মেয়েটী যত রোজগার করুক আর যতই নাম করুক্—লোকে তাকে একট্রেস্ বলে ঘৃণার চক্ষেই দেখ্‌বে।

—ঘৃণার চক্ষে! আঃ—হা! বলো কি সরিৎ? যে মেয়ের গান শোনা তো দূরের কথা, মুখের একটুকু হাসি দেখতে পেলে বড় বড় লোক নিজেকে ধন্য মনে করে, যার ছবি, যার কীর্ত্তি, দেশে দেশে কাগজে কাগজে বেরিয়ে শিক্ষিত সমাজের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাকে করবে লোকে ঘৃণা? তুমি যে হাসালে সরিৎ!—এই নারী জাগরণের যুগে, একজন শিক্ষিতা মেয়ে হয়ে সেকেলে বুড়ো ঠান্‌দির মত কথা—ছিঃ! শুন্‌লে লোকে বলবে কি?

উত্তেজিত মোহিতের কথা বল্‌বার ভঙ্গীমা দেখে সরিৎ হেসে উঠ্‌ল, বল্‌লে—

লোকে কি বলবে—তাতো জানি না মোহিতদা, তবে আমার মনে যা……হতে পারে এ আমার ভ্রান্ত ধারণা—সিনেমা থিয়েটার দেখ্‌তে বেশ লাগে কিন্তু ওতে যোগ দেবার কথা মনে হলেই গাটা শিউরে ওঠে যেন।

—ওরকম হয় না, যদি তোমরা মনে করো থিয়েটার সিনেমা শুধু রঙ্গালয় নয় টেম্পল অব আর্ট আর এ্যাক্টর এ্যাক্টেস্ ওরা হল তার পূজারী।

বেশ, মেনে নিলুম যেন তাই, কিন্তু আমাদের মত মেয়ের পক্ষে মিস গার্বো হওয়ার আশা দুরাশা নয় কি?

—কক্ষনো না! এ মেয়েটীর মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই ছিল না সরিৎ, সাধারণ এক ভিলেজ গার্ল, দেখতেও 'আহামরি' নয়। তোমাকে ওর ছবি দেখাবখন। আর একটী মেয়ে ইসোডরা ডঙ্কন এর মস্তবড় বই আছে। পড়তে চাও তা হলে এনে দিতে পারি। এও এক গরীব গৃহস্থ কন্যা, আমেরিকান গার্ল, এর অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে খেতে পায় না।

সেই মেয়ে নৃত্যকলা আর অভিনয় দেখিয়ে নিজের অবস্থা কি থেকে কি রকম উন্নত করেছিল আশ্চর্য্য! ধন, মান, যশ, খ্যাতি।

সরিতের মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, নীরবে খানিক চিন্তা করে সে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—

কিন্তু ওরা যে পাশ্চাত্য সমাজের মোহিতদা! আমাদের দেশের ভদ্র মহিলারা যদি অমন করে—

বারে! তাতে কি হয়েছে? এখন সে সনাতন যুগ আর নেই সরিৎ, আজকাল আমাদের দেশ আর্টের কদর করতে শিখেছে, তাই কত ভারতীয় মহিলা—ওই যে মিসেস মেনকার নাম শোনো নি বোধ হয়? ইনি কেবল নাচ দেখিয়ে মাত্ করে দিয়েছেন সমস্ত ইংলণ্ড জার্ম্মাণী—একেবারে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে এঁকে নিয়ে, অথচ ইনি তো পাশ্চাত্য সমাজের মেয়ে নয়! শুধু হাঁড়ী কুঁড়ি আর ছেলেপিলে নিয়ে ঘরের কোণে থাকলে কি এমন ভাবে…

মোহিতের মুখের কথা লুফে নিয়ে সরিৎ বলে উঠল—রামঃ! সেকি আবার একটা জীবন? আচ্ছা, মোহিত দা!

কি?

তুমি এখন কিছুদিন আছ তো এখানে?

হাঁ্যা, কাকিমা কি সহজে ছাড়বেন? তবে বেশীদিন থাকা ঘটে উঠবে না। বাবা মারা গিয়ে পর্য্যন্ত এদেশে আর আসি নি, একবার দেখতে ইচ্ছে হল তাই…

কলকাতায় তুমি একলা থাকো; না?

তা বই কি? দোক্‌লা আর আছেই বা কে?

সরিৎ একটু হেসে বললে—

—কি করে থাকবে বলো? বিয়ে থাওয়া তো করলে না!

না ভাই, বিয়ে টিয়ে এ পর্য্যন্ত করিনি, করতেও ইচ্ছে নেই আর। দরকার কি ওসব হাঙ্গামায়? এ বেশ আছি শুধু নিজেকে নিয়ে।

ভালই করেছ। বিয়ে করা যে কত বড় ভুল—

সরিতের ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেল নিঃশেষে। মুখ চোখের উজ্জ্বলতা মলিন করে দিয়ে চকিতে ঘনিয়ে এলো তার বিবাহিত জীবন-স্মৃতির বেদনাময় ছায়া, তাতে না আছে এতটুকু আনন্দ,না আছে বৈচিত্র্য—শুধুই বেদনা!

তাহলে আমি এখন যাই সরিৎ, বেলা গেল।

কাল সকালের দিকে এসো, রবিবার, দাদাও থাকবেন।

তথাস্তু! সকাল বিকাল যখন বল, আমার এখানে কাজটাই বা কি?

সরিতের পানে সহাস্য স্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মোহিত ঘর থেকে যাবে, সেই সময় জানালার কাছ থেকে কে যেন সরে গেল ত্বরিতে, ছায়ার মত।

সরিৎ তখন নিজের ভাবে মগ্ন।

আট

ওগো শুনছ! কাগজ থেকে মুখখানা তোলোই না একবার!

আহা! কি বলছ—বলো না? শুনব তো কাণ দিয়ে...

থাক দরকার নেই শুনে!

কী মুস্কিল! আচ্ছা এই নাও বাপু!

প্রতিমা রাগ করে চলে যায় দেখে সুকুমার কাগজখানা রেখে দিয়ে বললে—

হ্যাঁ, কি বলছিলে বলো এখন।

প্রতিমা স্বামীর পাশে বসে গম্ভীর মুখে বললে—

বলছিলুম, ওই যে ছেলেটা মোহিত, ওর সঙ্গে তোমাদের সত্যিকার কোনো সম্পর্ক আছে নাকি?

না, তা নেই, তবে তার চেয়েও বেশী। মোহিতের বাবা আমার বাবার পরম বন্ধু ছিলেন, আমরা তাঁকে জ্যেঠামশাই বলতুম, তিনিও আমাদের এত বেশী স্নেহ করতেন। মোহিতকে আমরা ছোট বেলা থেকেই ঠিক আপন ভায়ের মত...

তা হলেও ওর সঙ্গে অতটা ঘনিষ্ঠতা আমার ভাল লাগে না, সত্যি করেই বলি বাপু, যখন না তখন ছুট করে চলে আসে...

কোথায়? তোমার ঘরে? ও বুঝেছি—

প্রতিমার মুখপানে চেয়ে চোখের একটা ইসারা করে সুকুমার সহাস্যে বললে—

তার জন্যে রাগ করো কেন প্রতিমা? জিনিষটা ভাল দেখে একটু আধটু লোভ যদি হয়েই থাকে ওর তা বলে— আচ্ছা মোহিত তোমাকে কি বলেছে, কি করেছে শুনি?

আমাকে! ইস! এত বড় বুকের পাটা ওর হবে নাকি? হুঁ, হুঁ। সে মেয়ে আমাকে পাওনি, আমি বলছিলুম তোমার বোনটীর জন্যে, একজন অপর পুরুষের সঙ্গে ওর এতটা মাখামাখি ভাব—বুড়ো, হাবড়া তো নয়, সোমত্ত বয়স, তারপর বিয়ে থাওয়া করে নি—থিয়েটার করে—

তাতে কি হয়েছে?

সুকুমার এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে গম্ভীর ভাবে বললে—

আমিতো এটা দোষের মনে করি না প্রতিমা, মেয়ে-পুরুষে মেলামেশা তো ভালই, ওতে মনের উন্নতি হয়, চিত্তের সঙ্কীর্ণতা থাকে না, তাছাড়া সরিৎ তেমন মেয়ে নয়, বয়স হলে কি হয়? ওর মনটা এখনো শিশুর মত সরল।

হুঁ!

কি? অমন ভীষণ ভাবে হুঁ করলে যে? কি হয়েছে সেটা স্পষ্ট করেই বলো না ছাই! আমাকে না জানালে আমি কি করে—

জানাব আবার কি? দু'দুটো চোখ থাকতেও যদি দেখতে না পাও, তা হলে...

কি জ্বালা! আমাকে কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে যদি বাড়ীর চৌকিদারী করতে হয় তবেই তো গেছি! সত্যি তেমন সন্দেহজনক যদি কিছু ঘটে থাকে তা হলে বলো, না বললে প্রতিকার করা তো যায় না।

এবার প্রতিমা স্বামীর কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করে যা বললে তা অন্যের অশ্রাব্য।

সুকুমারের মুখখানা শ্রাবণাকাশের মত মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। কতক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হল না তার।

প্রতিমা প্রবীণা গৃহিণীর মত মুরুব্বিআনা চালে বল্‌লে—

—আমি তো এ সব কথা তোমার কাণে তুলতুম না, কিন্তু শেষকালে তুমি আমারি তো দোষ দেবে? তুমি কেন সকলেই,—বাড়ীতে আর গিন্নি বান্নি কেউ নেই যখন—

সুকুমার প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্‌লে—

—যাক্ মোহিত তো শীগগির চলে যাবে শুনছি,—গেলেই ভাল, এর মধ্যে সরিৎকে তুমি একটু সাবধান করে দিও, বুঝ্‌লে? কিন্তু বেশ ভাল করে মিষ্টি কথায়, ও যাতে মনে এতটুকু আঘাত পায়—এমন কাজ আমি করতে পারব না প্রতিমা, তুমি জানো না, তুমি ধারণাই করতে পারো না, বোন্‌টী আমার কত—কত অভাগিনী! আজ সব থাকতেও সর্ব্বহারা। বাবা সরিৎকে যে আদরে মানুষ করেছিলেন যদি দেখ্‌তে—মা মরণ কালেও শান্তি পান নি, ওর জন্যে—

প্রতিমা সহানুভূতির স্বরে বললে—তাইতো, বড় আদরের বড় খোয়ার কিনা? যাক্, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি ঠাকুরঝিকে এমন করে বল্‌ব—যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে।

নয়

বৈকালের দিকে—

আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন। দিগ্‌দিগন্ত প্রসারী জলদের ঘন স্নিগ্ধ-ছায়ায় চৈত্রের দীপ্ত অপরাহ্ন সন্ধ্যার মত ধূসর ম্লান হয়ে পড়েছে—

সরিৎ তার নির্জ্জন ঘরে, জানালায় বসে একখানা টেবিলক্লথে কাপড়ের পাড় থেকে সরানো রঙীন্ সুতায় ফুল তুলছিল। কিন্তু কাজে তার মন ছিল না।

অবাধ্য চক্ষের মুগ্ধ দৃষ্টি তার বার বার উধাও হয়ে যায় সেইখানে যেখানে আকাশের নিকষ কালো বুকখানা চিরে দিয়ে উজ্জ্বল তড়িৎলতা প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মত লক্ লক্ করে জলে উঠছে থেকে থেকে।

ওদিকে আবার শুভ্র বলাকার সারি—নীল সায়রে ভাসিয়ে দেওয়া শ্বেতপদ্মের মালার মত কোথায় ভেসে চলেছে—কে জানে!

বাদ্‌লার দিনে মানুষের মন স্বভাবতঃই কেমন হয়ে যায়। বুকের মধ্যে জেগে ওঠে—এক বিচিত্র অনুভূতি, সেটা কিসের পুলকের না ব্যথার তা ঠিক্ বোঝা যায় না। সেই রকম একটা কি যেন কি ভাবের উচ্ছ্বাস—সরিতের শান্ত সংযত চিত্তকে আজ বিচলিত ভারাতুর করে তুলেছে। আকাশ ছাওয়া মেঘের পানে চেয়ে চেয়ে সে যেন আপন হারা হয়ে গান করছিল—

হায়! অব্‌রে বাহার আজ ঘটা
ঝুম্‌কে আয়ি।
কহি ও মেরে পেয়ারে সে মুঝে
দিজো দেখায়ি।

—ও! আজ যে 'পেয়ারে' মনে পড়েছে—তবু ভাল!

সরিৎ গান থামিয়ে প্রতিমার দিকে ফিরে বল্‌লে—

—বসো বউদি, দাদা এখনও আসেন নি।

এরি মধ্যে? চারটে বাজেনি এখনো, মেঘলা বলে বেলা টের পাওয়া যাচ্ছে না।

জানালার কাছে রাখা ট্রাঙ্কটার ওপর বসে প্রতিমা সরিতের মুখপানে খানিক চেয়ে থেকে মৃদু হেসে বল্‌লে—

আজ ঠাকুরঝির মন কেমন করছে, না?

সরিৎ যেন বিস্ময়ের সহিত বলে উঠ্‌ল—

কার জন্যে গো? আমার আবার মন কেমন করবে কার জন্যে?—

আহা! নেকী আর কি! কেন তোমার 'পেয়ারের' জন্যে।

এখনি যে বলছিলে—

কি জ্বালা! ও তো গান বউদি! সত্যিকারের 'পেয়ারে' আমার কেউ নেই তা মন কেমন করবে কি?

না ভাই, ঠাট্টা নয় সত্যি, ঠাকুর জামাইয়ের জন্যে তোমার মন কেমন কখনো করে নাকি? বুকে হাত দিয়ে বলতো?

সরিৎ মাথা নেড়ে সবেগে বলে উঠল—

উঁহু! আমার মন অমন দুর্ব্বল নয় বউদি!

প্রতিমা গালে হাত দিয়ে সবিস্ময়ে বল্‌লে—

আশ্চর্য্য! কি অদ্ভুত মেয়ে তুমি ঠাকুরঝি! তোমার মন বুঝি পাথরে গড়া? যার প্রাণে স্বামীর জন্যে এতটুকু ব্যাকুলতা আসে না—

সে মেয়ে পাষাণী! তুমি সম্পর্কে মান্যে আমার চেয়ে বড়। আমাকে আশীর্ব্বাদ করো বউদি, এ পাষাণ যেন কোনোদিন বিচলিত না হয়।

অবাক্ করলে ভাই! তোমার জায়গায় আমি হলে কি যে করতুম তাই ভাবি। স্বামী ছাড়া মেয়ে মানুষের জীবনে আর কি আছে?

সরিৎ শ্লেষের হাসি হেসে বল্‌লে—

কিচ্ছু না! বিশেষ স্বামী মহাশয় যদি তেমন··· কি আর বলি! আমার ভোলানাথ দাদাকে তুমি পেয়েছিলে বউদি, তাই—নইলে আমার অবস্থায় পড়লে দেখতুম তোমার পতি-ভক্তি, স্বামী-প্রীতির দৌড় কত!

তা হলেও একেবারে ছেঁটে ফেলাও যায় না তো? দেখ না, সেকালের মেয়েরা স্বামীর জন্যে কত কষ্ট স্বীকার করেছে, এই সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী--এরা...

ঠিক্ কিন্তু ওঁদের স্বামী রাম, সত্যবান, নল এঁরাও মাতাল হয়ে স্ত্রীকে বেদম্ প্রহার দিতেন না---এবং তাকে বিনা অপরাধে একবস্ত্রে গলাধাক্কানি ও দেননি নিশ্চয়।

সরিৎ হাস্‌তে লাগল, বড় বেশী দুঃখ পেলেও মানুষের হাসি আসে।

প্রতিমা একটা নিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—

যাক্ গে, এ তুমি বেশ আছ একরকম, তবে ভাই তোমাকে খুব সাবধান হয়ে চল্‌তে হবে চিরদিন।

তা জানি, এমন একচোখো সমাজে জন্মেছি যখন।

তাই বল্‌ছি ভাই, কিছু মনে করো না, তোমায় এখন সকল দিক্ সাম্‌লে চলা দরকার। তা না হলে... ওই যে মোহিত ঠাকুরপো আসেন, ওঁকে আমার তেমন ভাল মনে হয় না—

সরিৎ চমকিত হয়ে বলে উঠ্‌ল—

কেন বলো দেখি? মোহিতদার অপরাধ?

তা আমি বল্‌তে পারি না,—মানুষটার রকম সকম দেখে সন্দেহ হয় তাই বললুম, অন্যায় হয়ে থাকে যদি মাপ করো আমাকে।

সে দিন সন্ধ্যায় সরিৎ রান্না ঘরের কাজে অহেতুক এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে মোহিতকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হল।

রাত্রে একটু গল্পগাছা করবার জন্যে সুকুমার সরিৎকে ডাকতে এসে দেখে সে আজ অসময়ে শুয়ে পড়েছে। তবু একবার ডাকলে—

সরিৎ! ঘুমোলি নাকি রে?

সরিৎ সাড়া দিলে না, কিন্তু সুকুমার ফিরে গেলে সরিতের হঠাৎ মনে হ'ল দাদা যদি কোনো দরকারী কথাই বলতে এসে থাকেন তা'হলে।

খানিক এপাশ ওপাশ করে সে উঠে পড়ল। দাদার ঘরে ঢুকতে যাবে এমন সময় শুনতে পেলে প্রতিমা বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই বলছে—

তোমরা যে একটা দিকই দেখেছ বিনা? অমন নইলে কি লোকে স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেয় শুধু শুধু—কাণা খোঁড়া নয়—কুৎসিৎও নয়—

সরিতের কাণের মধ্যে কে যেন গলানো সীসে ঢেলে দিলে—ত্বরিতে ফিরে এসে সে বিছানায় মুখ গুঁজড়ে শুয়ে পড়ল—ফেটে পড়া বুকখানা দু হাতে চেপে।

দশ

কি হচ্ছে সরিৎ? তোমার যে আজকাল কাজই ফুরোয় না! কাল ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে এলুম···

সরিৎ সেল্‌ফ উজাড় করে ইংরাজী বাংলা, নূতন পুরাতন সব বইগুলো ঠিকমত গুছিয়ে রাখছিল।

বাড়ীতে সাড়াশব্দ ছিল না। সুকুমার অফিসে, প্রতিমা দোরে খিল দিয়ে ঘুমুচ্ছে নিত্যকার অভ্যাস মত।

সরিৎ আজ মোহিতকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করতে পারলে না, বরং একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল তার অসাময়িক আগমনে।

একখানা ছেঁড়া বইয়ের আল্‌গা হয়ে পড়া পাতাগুলো সংখ্যা মিলিয়ে রাখতে রাখতে সে মাথা নীচু করেই উত্তর দিলে—

কি করি মোহিত দা, বউদির শরীর তেমন ভাল থাকে না কাজেই—আমি না করলে আর কে করবে বলো?

তাতো বটেই—কিন্তু···

সরিৎ মেঝের ওপর ঢেলে ফেলা পুস্তক স্তূপের সামনে

হাঁটুগেড়ে বসেছিল অতি শোভন ভঙ্গীতে, এলো চুলের রাশি তার পিঠ ছাপিয়ে ভূমিস্পর্শ করতে উদ্যত।

সেদিকে খানিক অপলকে তাকিয়ে থেকে মোহিত বললে—

রোজ তো আর জ্বালাতন করতে আসব না, আর দুটো দিন মাত্র।

সরিৎ চকিত হয়ে মুখ তুলে বললে—

সেকি? তুমি যাচ্ছ নাকি? কবে?

একখানা পুরানো কাগজ পেতে মোহিত তার কাছে বসে বললে—কালই যেতুম, কিন্তু কাকিমা বারণ করছেন সামবার দিকশূল নাকি। তাই মনে করছি পরশু রাত বারোটায় যে এক্সপ্রেস যায় তাতেই রওয়ানা হ'ব।

দু'চার দিন আরো থেকে গেলেই তো ভাল হত—এত তাড়া কিসের?

তাড়া আছে বলেই তো যাচ্ছি। এবার 'শেষ রাত্রি' বলে যে নতুন বই আমাদের কোম্পানী কিনেছে তার একটা প্রধান পার্ট আমাকে নিতে হবে, না গেলে লোকসান তো আমারি।

সরিৎ চুপ করে রইল। তার শুষ্ক মুখে বিষাদের গাঢ় ছায়া।

মোহিতের সঙ্গ তার শূন্য জীবনে যেন বৈচিত্র্য এনেছিল। সরিতের ঘা-খাওয়া অবসন্ন মনে সে একটু নয় অনেক খানিই শক্তি দিয়েছিল। তাই মোহিতের চলে যাওয়ার কথা তাকে নিরতিশয় ক্ষুব্ধ করে তুললে।

সরিতের মৌন ম্লান মুখের পানে চেয়ে জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে মোহিত বললে—

—তোমার পাশের খবরটা, আমি পাই যেন। তোমাদের তো চিঠি পত্র লেখা অভ্যাস নেই জানি, তবু বলে যাব। আর তোমার কাছে আমার একটা মিনতি আছে সরিৎ, এতদিন ধরে যা বোঝালুম ত মনে রেখো, তোমার মত বড় একটা প্রতিভা যাতে নষ্ট না হয়, যাতে তার উৎকর্ষ হয় সেদিকে......

—তুমি তো বলে খালাস মোহিতদা, কিন্তু আমি যে কি করে করি—তা ভেবেই পাই না, সত্যি, এমন সঙ্কটে পড়েছি...

সরিতের কণ্ঠস্বর সজল আর্ত্ত। মোহিত ব্যথিত ভাবে বললে—

—তোমার সঙ্কট কি তাতো জানি না, তবে আমার দ্বারায় যদি তোমার এতটুকু উপকার হতে পারে, তা আমি প্রাণ দিয়ে করব জেনো,—এটা শুধু মুখের কথা নয় সরিৎ!

বাস্তবিক, কথাগুলিতে আন্তরিকতা ছিল। সরিৎ তার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—

—সে আমি জানি মোহিত দা, তাই তো তোমাকে এত—আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি সত্যি করে বলো, আমি যদি সিনেমায় যাই তাহলে···

মোহিত একটু চম্‌কে গিয়ে বলে উঠল—

—তুমি?—একি ঠাট্টা করছ সরিৎ—

সরিতের মনের অবস্থা শোচনীয়—কাল থেকেই। আহত বিপর্য্যস্ত চিত্তে তার একটা বিদ্রোহী ভাব ধীরে ধীরে মাথা তুলে উঠছিল—আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কার ঠেলে দিয়ে।

মোহিতের, প্রশ্নে সে ধরা গলায় বললে—

—ঠাট্টা নয় মোহিতদা, বাস্তবিক, আমি গেলে ওরা নেয় না কি?

ইস্, নেবে না আবার, লুফে নেবে! তোমার এমন মিষ্টি গলা ষ্টেজ বিউটী যাকে বলে তাও যথেষ্ট রয়েছে, তার ওপর শুধু বাংলাই নয়, ইংরিজী, উর্দ্দু, হিন্দী, এত গুলো ভাষা জানো, তোমাকে পেলে তো এক্ষুনি—বেশী বলতে সাহস হয় না সরিৎ, কিন্তু তুমি যদি বাস্তবিকই ইচ্ছে করো, আমার ঠিকানা দিয়ে যাব, আমাকে একবার জানালেই ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তবে আগে বেশ করে ভেবে নাও।

—ঢের তো ভাবলুম—তবু···এক পা এগোচ্ছি তো দু'পা পেছিয়ে পড়ি। আর যাই হোক্ ওই যে মেয়ে পুরুষের মাখামাখি ভাব বেহায়াপনা, সিনেমায় দেখেছি তো, ওই খান্ টাতেই বাধে বড়। আমি গেলে আমাকেও তো অম্‌নি করে...মাগো! সেযে ভারি লজ্জার কথা মোহিতদা!

—ওটা তোমার ভুল সরিৎ, সুসভ্য সমাজে মেয়ে

পুরুষে মাথামাথি দূষণীয় মনে করেনা বলেই না ওরা উন্নতি করতে পারছে। কেন? তাতে হয়েছে কি বলো?

'আপন মন চঙ্গা তো কঠৌওতি মে গঙ্গা' এ কথা তুমি বিশ্বাস করো না? আর—পুরুষের সংস্পর্শে যে ধর্ম্ম আল্‌গা হয়ে যায় সেই ধর্ম্ম রক্ষা করতে মেয়েদের কোণ ঠাসা হয়ে পতি দেবতার লাথি ঝ্যাঁটা সব নিঃশব্দে নির্ব্বিকার চিত্তে পরিপাক করতে হবে, এ বিধান যে শাস্ত্রে আছে, সে শাস্ত্র তো পুরুষের লেখা। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যেই যে তারা এ সব যুক্তি দেখায় নি তার প্রমাণ কি!

যাতে মেয়েদের জন্যে এতটুকু দরদ দেখানো হয় নি সেই নিষ্ঠুর বিধান তোমরা মাথা পেতে নেবে নির্বিচারে নিজেদের বুকের রক্ত জল করে—কেন?

—আস্তে বলো মোহিতদা!

মোহিত গলার স্বর নামিয়ে বল্‌লে—

—তোমাকে দেখে ভারি দুঃখ হয় সরিৎ, তাই এত গুলো কথা বললুম, কিছু মনে করোনা। আমি তোমার কথা যখন ভাবি, বাস্তবিক, ইচ্ছে করলে তুমি কি না করতে পারো? যশ, প্রতিষ্ঠা ঐশ্বর্য্য সমস্তই তো তোমার হাতের মুঠোয়,—বেশ করে ভেবে দেখো।

মোহিত চলে যাবার পরও সরিৎ কাজে মন দিতে পারলে না কতক্ষণ! মোহিতের সহৃদয়তা পূর্ণ উপদেশ বাণীর প্রত্যেক শব্দ সেই বঞ্চিতা ভাগ্যহতার আঁধার গহনতলে যেন ভোরের শুকতারার মত জ্বল জ্বল করছিল। যশ গৌরবে সমুজ্জ্বল সেকি সুন্দর স্বাধীন জীবন! তার কাছে সরিতের এই লাঞ্ছিত, জগতের উপেক্ষিত অসহায় জীবন কত তুচ্ছ, কত হীন! একদিকে আলো অন্যদিকে আঁধার। দুইয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

শুধু জন্মগত একটা ভ্রান্ত সংস্কার বশে, লোক লজ্জার ভয়ে, অযাচিতে পাওয়া উন্নতির এত বড়'চান্স' সে হাতছাড়া করবে কেন? কোন সুখের আশায়?

এগারো

হাওড়া গার্ড এক্সপ্রেস খানা প্ল্যাটফরমে এসে গিয়েছে, যাত্রীর দল শশব্যস্ত।

মোহিত একটা ইণ্টার ক্লাসের কামরায় জিনিষপত্র তুলে দিয়ে, গাড়ীর হাতল ধরে সিগারেট খেতে খেতে ষ্টেশনের বিচিত্র জনসমারোহ দেখছিল, এমন সময়—

এই যে মোহিত দা! আমি মনে করেছিলুম—

একি সরিৎ! তুমি?

হ্যাঁ, আমিও তোমার সঙ্গে যাব মোহিত দা, এই কুলি! ইধার আও, ইস কামরামে আসবাব রাখখো—

বলে সরিৎ বিস্মিত মোহিতকে একটা কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে টপ করে গাড়ীতে উঠে পড়ল।

গাড়ীতে ভিড় ছিল না, যে কয়জন যাত্রী সকলেই হিন্দুস্থানী। সরিতের লগেজগুলো গুছিয়ে রেখে মজুরী নিয়ে কুলি নেমে গেল। তখন হতবুদ্ধি মোহিত তার কাছে গিয়ে বললে—

একি কাণ্ড সরিৎ? তোমার দাদাকে না জানিয়ে এমন করে—

সরিৎ বেঞ্চের একধারে বসে পড়ে মুখের কাছে জোরে পাখা নাড়তে নাড়তে বললে—

দাদাকে জানালে আসতে দিতেন নাকি? সত্যি এযে কি কষ্টে এসেছি! বাড়ী আর স্কুল এ ছাড়া আর কোথাও যাইনি তো? তাতে আবার লুকিয়ে একলাটী—

সরিতের দুঃসাহসিকতায় মোহিত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। বাস্তবিক সে এতটা আশা করে নি, সরিৎ যে না বলে কয়ে হঠাৎ এমন করে চলে আসবে তার সুদূর যাত্রার সাথী হয়ে—এর কল্পনা মোহিতের মনকে নাচিয়ে তুলত হয় তো কিন্তু বাস্তব...বাস্তব জিনিষটা বড় কঠিন যে!

সরিতের আকস্মিক গৃহত্যাগ তাই মোহিতকে পুলকিত না করে শঙ্কিত করে তুললে। গোলাপের শোভা সুবাস পরম উপভোগ্য কিন্তু ফুলটী তুলতে গেলেই কাঁটা লাগার ভয়।

সরিৎ যে আপন ইচ্ছায় চলে এসেছে, মোহিত তাকে জোর করে কিম্বা ফুসলে আনেনি একথা দুনিয়ার বিশ্বাস করবে কি? না কখনো না! এখন সমস্ত দোষই মোহিতের ঘাড়ে—

মোহিত এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থেকে বললে—

এরকম লুকিয়ে আসাটা তোমার অন্যায় হয়েছে সরিৎ, সুকুমার আমার ওপর চটে মটে হয় তো কি একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধিয়ে বস্‌বে—

—কেন? তোমার কি দোষ? আমি তো নিজের ইচ্ছেয় চলে এসেছি। উনিশ বছরের মেয়ের নিজের একটা স্বাধীন মতামত নেই কি?

—তা হলেও, তোমার একটুখানি বোঝা উচিত ছিল। যাক্, এখনো সময় আছে, চলো, তোমাকে চুপি চুপি রেখে আসি, বাড়ীতে বলে দেব ট্রেন মিস্ করেছি...

...ভয় পেয়ে গেলে মোহিতদা! হা হা হা!

সরিৎ হেসে উঠল, পাগলের মত সে হাসি।

—তোমার যে শুধু মুখখানিই সার তাতো জানতুম না! নেমে যেতে হয় তুমি যাও, আমি নাম্‌ব না, জোর জবরদস্তি করলে রেলের লাইনে পড়ে প্রাণ দেব তবু বাড়ীতে ফিরতে আমি আর পারব না!

সরিৎ বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল, ক্ষোভে অভিমানে, উত্তেজনায় তার সর্ব্ব শরীর কাঁপছিল, দৃষ্টিতে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে!

মোহিত তার হাত ধরে মিনতি কোমল স্বরে বললে—

—থাক্ নেমে আর কাজ নেই তুমি চলো সরিৎ! আমি ভয় পাইনি তবে একটু ভাবনা, সে তো হবেই। তোমাকে নিয়ে গিয়ে প্রথমটা কোথায় যে রাখব! আমার যদি স্বতন্ত্র একটা বাড়ী থাকত...

সরিৎ বসে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললে—

তুমি মেসে থাকো বুঝি?

না, মেস ঠিক নয় একখানা দোতলা বাড়ীর একটা পোর্সনে, একলাটী থাকা—

তাহলে সেই বাড়ীই আর এক পোর্সনে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিও, নগদ টাকা আমার হাতে নেই বটে, কিন্তু এগুলো তো রয়েছে।

সরিৎ তার হাতের সোনার চুড়ী ক'গাছি দেখালে, এ তার মায়ের শেষ দান, আগেকার একটা নাকছাবিও ছিলনা তো।

তুমি ভয় পেওনা মোহিত দা, আমি শুধু প্রথমটা তোমার একটু সাহায্য চাই তারপর নিজের—

এঞ্জিনের হুইসেলের তীব্র ধ্বনিতে সরিতের শেষ কথাটা ডুবে গেল। ট্রেন চলে পড়ল হুস হুস করে।

সরিৎ জানালায় মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল, গাড়ী প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়িয়ে গেল, তখন ও। মোহিত ডাকলে—

সরিৎ! এই বেলা বিছানা করে দিই, শুয়ে পড়ো, এর পরে ভিড় হলে—

সরিৎ একটা মর্ম্মমথিত করা গভীর নিশ্বাস ফেলে মুখ ফেরালে—তার ছল ছল চোখদুটীতে নিবিড় বেদনা—

মোহিতের দরদী চিত্ত সমবেদনায় ভরে উঠল। ট্রেণ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের দ্বিধা উদ্বেগ অনেকটা কেটে গিয়েছিল। এখন বরং একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিল সেই সরলা প্রিয়ভাষিনী, প্রিয় দর্শনা তরুণীটীকে নিজস্ব ভাবে কাছে পেয়ে—যাকে সে হয়তো সত্যিই ভাল বেসেছিল।

সরিতের পিঠের ওপর হাত রেখে সে আশ্বাস ভরা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে—

কিছু ভয় নেই সরিৎ! আমি সব ঠিক করে দেব। তোমার যাতে এতটুকু কষ্ট না হয় সেই রকম ব্যবস্থা—বলেছি তো তোমাকে সুখী করবার জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

সরিতের বুক থেকে যেন পাথর নেমে গেল। সে চোখদুটো তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে গাঢ় স্বরে বললে—

সে আমি জানি মোহিত দা! নইলে এ দুরাশায় ঝাঁপ দিতে কি সাহস পেতুম।

পথে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি, যাতে অসুবিধায় পড়তে হয়।

কেবল মোগলসরাই থেকে যে একটী প্রবীণা ভদ্র-মহিলা উঠেছিলেন ছেলের সঙ্গে—তিনি গয়ায় নামবেন। সরিতের সাথে দু'একটি কথা বলার পরই মহিলাটী মোহিতকে তন্দ্রাতুর দেখে যখন সহানুভূতির সহিত বললেন

আহা! তোমার স্বামীকে একটু শুয়ে পড়তে বলো না মা! তখন থেকে বসে বসে ঢুলছেন—

তখন সরিৎ যেন মরমে মরে গেল।

উনি আমার ভাই—বলে সে মুখ গুঁজড়ে সেই যে

শুয়ে পড়া যতক্ষণ মহিলাটী ছিলেন—আর মুখ তুলতে পারে নি।

বারো

কলিকাতায় মোহিত যে বাসায় থাকে তার অধিকাংশই মোহিতের সম ব্যবসায়ীদের দ্বারায় অধিকৃত, তাদের মধ্যে দু'চার জন স্ত্রীলোকও ছিলেন, সেজন্য সরিৎকে নিয়ে তেমন বিব্রত হতে হল না।

ম্যানেজার সরিৎকে পছন্দ করলেন। তিনি দেখলেন সরিতের মধুর কণ্ঠ, কমনীয় কান্তি, তাছাড়া চোখে মুখে এমন একটা আর্টিষ্টিক ভাব দেখা যায় যা তাঁদের ব্যবসার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। মেয়েটি বেশ 'স্মার্ট' আছে, ট্রেণিং দিতে বেগ পেতে হবে না, কিন্তু—

সরিতের আপাদ মস্তক আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে ম্যানেজার মহাশয় বললেন—

ইনি তো বিবাহিতা দেখছি, এঁর স্বামী যদি শেষে হাঙ্গামা করেন—তার জন্যে…

মোহিত কিছু বলবার আগেই সরিৎ মাথা নেড়ে এসে বলে উঠল—

না, সে সব হবে না—মনে করুন আমার কেউ নেই!

মোহিত হতবাক হয়ে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

ম্যানেজার একটুখানি ভেবে বললেন—

বেশ তাহলে কাল থেকেই ট্রেণিং আরম্ভ করা হোক্। 'শেষ রাত্রি'র মঞ্জুলার ভূমিকায় আমি এ মেয়েটীকে নামাতে চাই।

পারিশ্রমিক আপাততঃ পঁয়ত্রিশ টাকা মাসোহারা হিসাবে তারপর—

সরিতের থাকবার ব্যবস্থাও তাঁরাই করে দেবেন।

এযে আশাতীত!

সরিতের মন উল্লাসে নেচে উঠল। পঁয়ত্রিশ টাকা নয় পঁয়ত্রিশ মোহর! এযে সরিতের স্বোপার্জ্জিত ধন! মোহিত মিথ্যা বলেনি তো! দ্রুত উন্নতির এমন সহজ রাস্তা আর কোথায়?

সরিৎ তার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে একখানা গদী আঁটা সোফায় আধ-শোওয়া ভাবে বসে কি ভাবছি[ল] যেন।

কাল 'শেষ রাত্রি'র ফুল রিহার্সেল হয়ে গেছে তাতে মঞ্জুলার ভূমিকায় সরিতের অভিনয় এমন নিখুঁত [ও] মনোরম হয়েছিল যে ম্যানেজার খুসী হয়ে তার বরা[দ্দ] আরো পাঁচ টাকা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

নবাগতা সরিতের প্রথম উদ্যমের এই আশাতী[ত] সাফল্যে দলের সকলেই সানন্দে অভিনন্দিত করেছে[ন] তাকে, মোহিতের তো কথাই নাই, কিন্তু সরিতের মনে যথার্থ সুখ ছিলনা।

মোহিতের মুখে শুনে শুনে সে এতদিন নিজের মনে ভবিষ্যতের যে উজ্জ্বল ছবি এঁকেছিল, তার আশু সম্ভাবনা সরিৎকে ঠিক পুলকিত করে নি, বিভ্রান্ত করে তুলেছে।

প্রথমতঃ এখানকার নর-নারীর অসংযত উচ্ছৃঙ্খল জীব[ন] সরিতের চোখে শুধু আশ্চর্য্য নয় বিসদৃশ ঠেকছিল তাদের হাব-ভাব, আচার ব্যবহার, হাস্য পরিহাস সমস্তই যেন কেমন কেমন! এ যে সরিতের কল্পনার অতীত ধারণার বিরুদ্ধ।

তার পর কাল মঞ্জুলার পার্ট অভিনয় করতে সে কি বিভ্রাটেই পড়েছিল!

মঞ্জুলার প্রণয়ী রণজিত বেশী মোহিত বিদায় প্রার্থী হয়ে যখন ব্যাকুলা বিবশা মঞ্জুলার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে—

আমি আসব মঞ্জুল! আবার আস্‌ব—না এসে থাক্‌তে পর্‌ব না যে!

বলে বিরহ ক্লিষ্ট দীর্ঘ যাত্রাপথের পাথেয় নিতে মঞ্জুলার বেপথু অধরে তার আবেগ তপ্ত অধর রেখে—

সে পলকের জন্য শুধু—কিন্তু ক্ষণিকের স্পর্শে তার কি ছিল! জ্বালা?—না কি?—যা এখন পর্য্যন্ত সরিৎকে আবিষ্ট, আচ্ছন্ন করে রেখেছে!

উঃ!—এখনো—এখনো শরীরের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী তার বার বার শিউরে উঠছে সে কথা মনে করে।

বার বার মুছেও মনে হচ্ছে সে স্পর্শ তার ঠোঁটে এখনো লেগে রয়েছে যেন!

বিশ্রাম

ছি ছি! এ তার উন্নতি না অবনতি।

একজন পর পুরুষ, যাকে সে দাদা বলে—দাদার মতই মনে করে, তাকে সে কি বলে অমন ভাবে···ওঃ!

ভাবতে ভাবতে সরিতের বিপর্য্যস্ত চিত্ত থেকে থেকে জ্বলে উঠ্‌ছিল।

সে বুঝতে পারছিল না, এর পরিণাম শেষে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে!

—কি হচ্ছে সরিৎ!

দরজার পর্দ্দা সরিয়ে আনন্দোজ্জ্বল হাসিভরা মুখ নিয়ে ঘরে ঢুকেই মোহিত থমকে দাঁড়াল—সরিতের পানে তাকিয়ে।

তার মুখে চোখে শুধু উত্তেজনাই নয়, কেমন একটা উদাস উদ্‌ভ্রান্ত ভাব।

অবশ তনুলতা তার—যেন আতপতপ্ত কচি কিশলয়ের মত এলিয়ে পড়েছে—

কি হল তার? মোহিত যা আশা করে এসেছিল এযে তার বিপরীত!

—ব্যাপার কি সরিৎ? আমি যে আনন্দ রাখবার ঠাঁই পাচ্ছিনা, আর তুমি কিনা এমন মনমরা ভাবে ···কেন বলো দেখি? শরীরটা তোমার...

সরিতের অনাবৃত ঘাড়ের ওপর হাত রেখে, দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করে মোহিত—

—নাঃ, শরীর তো তোমার ভালই আছে তবে···

বলে—সরিতের পাশেই বসে পড়ল।

তার পর সরিতের মুখপানে চেয়ে হাসতে হাসতে উচ্ছ্বসিত পুলকে বলতে লাগ্‌ল—

কেমন? আমি মিথ্যে বলেছিলুম নাকি?

আমাদের ম্যানেজার তো একেবারে জল! জানো সরিৎ!—

তোমার দৌলতে আমারও প্রতিপত্তি বেড়ে গেল। আমি বল্‌ছি এক দিন দেশ দেশান্তরে তোমার নাম—

—মোহিত দা!

মোহিতের আনন্দোচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে সরিৎ উদাস ক্লান্তস্বরে বল্‌লে—

আমার নাম করে আর কাজ নেই মোহিত দা! যে কাজে মানুষ নিজের ক্যারেক্টার রাখতে পারে না—

মোহিত চম্‌কে উঠে বল্লে—

সে আবার কি? ক্যারেক্টারের সঙ্গে আমাদের কাজের কি সম্পর্ক সরিৎ?—অভিনয়—অভিনয়! আর মানুষের দেহ আর আত্মা তো এক জিনিষ নয়?

এ যুক্তি সরিতের মনে যে আসেনি এমন নয়—কিন্তু মন যে তার মানতে চায় না!

সে সোজা হয়ে বসে একটা ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ফেলে বললে—তাহলেও,—দেহের অপবিত্রতা যে আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না এমন তো কোনো—

মোহিত হা হা করে হেসে উঠ্‌ল—

এ তোমার আজন্মের মজ্জাগত সংস্কার ধীরে ধীরে আপনিই চলে যাবে. তার জন্যে তুমি ঘাব্‌ড়িও না সরিৎ! তবে তোমাকে মোটা মুটি একটা কথা বলি—একটু খানি হাত ধরলে কি একটা 'কিস্' করলেই যার দেহ অশুচি হয়ে যায়, আত্মায় পাপ স্পর্শ করে—সে তো দুর্ব্বল—তার চরিত্র বল নেই বলেই···আগুন নিয়ে খেল্‌বে অথচ হাত পুড়বে না সেই তো হল বাহাদুরী!

কিন্তু···তাই কি সম্ভব? রক্ত মাংসের দেহ নিয়ে সরিতের অতৃপ্ত নারীত্ব, উনিশ বছরের ক্ষুব্ধ যৌবন—যে বুকের তলে অসহায় বেদনায় গুম্‌রে মরছে, সে তো এখনো মরেনি!

এই সুযোগের কোন্ এক ফাঁকে আকণ্ঠ তৃষা নিয়ে সে যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে—তখন—বালিকার চরিত্র বল তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে কি?

—আবার ভাবে—আঃ! এমন পাগল তো দেখিনি!

সরিতের একখানি হাত হাতের মধ্যে নিয়ে চুড়ি ক'গাছি নাড়তে নাড়তে মোহিত বললে—

—এদ্দিন পরে কাল তোমার দাদার একখানা চিঠি এসে উপস্থিত—

সরিৎ সুপ্তোত্থিতের মত বলে উঠল—

কই? কোথায়?

—কি কোথায়? চিঠি? থাক্ সে চিঠি তোমার দেখে কাজ নেই সরিৎ, তারা ভাল আছেন এইটুকু জেনে

হাঁ। শুধু তুমি মনে ব্যথা পাবে বলেই আমি চিঠি খানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি—

—তবু আমাকে একবারে না দেখিয়ে—

কি হত দেখে, দাদা তোমাকে ঘরে ঠাঁই দিতে না চাইলে তোমার তো বয়েই গেল! তুমি নিজেই কত লোককে প্রতিপালন করতে পারবে। কত রকম ভাল কাজ…হুঁ, টাকায় কি না হয়?

মর্ম্মাহত সরিৎ এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। তার পর উদ্গত নিবিড় দীর্ঘ শ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে বললে—

—এতো ধরা কথা, এর জন্যে রাগ অভিমান করবার তো কিছু নেই। দাদা কি—মা থাকলেও হয় তো এই রকম করে—

—যাক্ গে, তুমি ওসব ভেবে মন খারাপ করোনা সরিৎ, যা করতে এসেছে তাই করে যাও তোমার জীবনটা যাতে পরিপূর্ণ সার্থক হয়ে উঠবে। বৃথা নিজেকে দুঃখ দিয়ে লাভ কি সরিৎ? আত্ম পীড়নে বাস্তবিক পুণ্য নেই তো বরং পাপ—'

মোহিতের কথা গুলি আন্তরিক দরদ মাখা, চোখে তার কেমন আবেশময় দৃষ্টি, সেই দৃষ্টি সরিতের মুখের 'পরে রেখে তার স্বেদাক্ত কোমল হাত খানি মুঠোর মধ্যে চেপে মোহিত গাঢ়স্বরে বললে—

আমি এতটা আশা করিনি সরিৎ! সত্যি কাল তোমার অভিনয় এমন সজীব আর স্বাভাবিক হয়েছিল কি বলব? মনে হচ্ছিল যেন তুমি সত্যই মঞ্জুলা আর আমি রণজিৎ! ঠিক যেমনটী হওয়া চাই—সকলেই বলছে—

সরিতের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল। শিরায় শিরায় যেন তড়িৎ শিহরণ খেলে গেল। সে চেষ্টা করেও হাতখানা টেনে নিতে পারলে না, একটুখানি যে তফাৎ হয়ে বসবে সে শক্তিও যেন ছিল না তার! একি মোহ!

বুঝলে সরিৎ? একটুখানি প্রাণের পরশ না থাকলে শুধু কপট অভিনয় এমন নিখুঁত হয়ে ফোটে না একথা ঠিক। এই তোমার জায়গায় অন্য মেয়ে হলে আমি কি এমনি ভাবে করতে পারতুম? উহুঁ, কক্ষনো না! তোমাকে কি শুভক্ষণেই পেয়েছিলুম! তুমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা—

কথাগুলো এত শ্রুতি মধুর, এমন প্রাণ গলানো তার সুর—

মোহাবিষ্টা সরিতের সকল চিন্তা সব অনুভূতি যেন মুছে গেল পলকের জন্য।

মুহূর্ত্তে সচেতন হয়ে সে দেখলে মোহিতের হাতখানা কখন তার গলায় এসে পড়েছে, মোহিতের মুখ তার মুখের অতি কাছে—

হাত খানা ত্রস্ত সরিয়ে দিয়ে সরিৎ সবেগে উঠে দাঁড়াল।

মোহিতের বিহ্বল মুখের পানে দৃপ্ত কটাক্ষ হেনে সে শুষ্ক কণ্ঠে ভর্ৎসনার স্বরে বলে উঠল—

আচ্ছা, এও কি অভিনয় মোহিত দা!

হলই বা? ওতে দোষটা কি সরিৎ? তোমাদের সতীত্ব কি এতই ঠুনকো জিনিষ?

মোহিত নির্লজ্জের মত হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল—

তাহলে তুমি এখন আরাম করো—আমি আসি, গুডবাই।

দরজা পর্য্যন্ত গিয়েই সে আবার ফিরে বললে—

হ্যাঁ, ভাল কথা ম্যানেজার বলে দিলেন কোন রকম কষ্ট কি অসুবিধা বোধ করলে তখুনি জানাতে। তোমার ওপর তিনি ভেরি ভেরি কাইণ্ড। বুঝলে কিনা?

মোহিত চলে যেতেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সরিৎ সোফায় নয় মেঝেতেই লুটিয়ে পড়ল বাণবিদ্ধ হরিণীর মত।

নিজের যে চিত্তবলের 'পরে অখণ্ড বিশ্বাস রেখে সরিৎ নিভৃত গৃহকোণ ছেড়ে বাহিরে অপরিচিত অজানাদের মাঝে চলে এসেছিল নির্ভীক অন্তরে সে চিত্তবল তার কোথায়?

সে দুর্ব্বল, অতি দুর্ব্বল!

নইলে এ বাঁধনহারা জীবন-পথে প্রথম পদার্পণেই এমন করে হোঁচট্ খায়?

আর মোহিত,—প্রতিমা কিন্তু ধরেছিল ঠিক, শিক্ষিত না হলেও সাংসারিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা তার সরিতের চেয়ে ঢের বেশী—তখন সরিৎ রাগ করেছিল বৌদির কথায় কিন্তু এখন—

হায়! তার মন যে এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করবে, দর্পহারী ভগবান যে এমন করে তার সকল আশা সকল গর্ব্ব ধুলিসাৎ করবেন তাকি সে জানত ছাই!

না, এ হবে না,—সরিৎ ভুল করেছে, বিষম ভুল! এ প্রলোভনময় পিচ্ছিল পথ তার মত দুর্ব্বলের উপযোগী নয়—সে আর অগ্রসর হবে না—ফিরে যাবে—

কিন্তু কোথায়?

তেরো

—আমি কোথায়? এটা তো ষ্টেসান নয়?

—না, এটা হস্পিট্যাল

—হস্পিট্যাল? সেকি?

সরিৎ যুগপৎ বিস্মিত উত্তেজিত হয়ে ওঠবার চেষ্টা করতেই শুশ্রূষাকারিণী শশব্যস্তে বরফের ব্যাগটা তার মাথায় চেপে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন—

—অস্থির হয়ো না, উত্তেজনা তোমার পক্ষে নিষিদ্ধ।

সরিৎ তাঁর মুখপানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে অসহায় ভাবে বললে—

আমি হস্পিট্যালে কেন? আমার কি হয়েছে?

—অসুখ, এখন তো ভাল আছ প্রভুর দয়ায়।

—এ কোন জায়গা? কলকেতা কি?

—না, পাটনা। তুমি আর কথা বলো না, বিশ্রাম করো।

—পাটনা? এখানে অমি কি করে এলুম?

—তা ঠিক বলতে পারিনা। ষ্টেশনের পথে তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখে—থাক্, সে কথা পরে শুনো সুস্থ হলে।

সরিৎ নিশ্বাস ফেলে চোখ বুজিয়ে নিলে।

খানিক চেষ্টা করবার পর সরিতের বিলুপ্ত প্রায় স্মৃতি-শক্তি আবার জেগে উঠ্‌ল ধীরে ধীরে, তার মনে পড়ে গেল কলিকাতার দুর্জ্জয় প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা করতে সে কেমন করে পালিয়ে এলো, কেমন করে গিয়ে ট্রেণে উঠল—

তখন পর্য্যন্ত এলাহাবাদে যাওয়াই তার উদ্দেশ্য ছিল। প্রলোভন জয়ের বিপুল আনন্দে সে তখন ভুলেই গিয়েছিল নিজের সঙ্গীন অবস্থার কথা।

তার পরে ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পেরিয়ে গাড়ী যখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে তখন এক সময় চকিতে মনে পড়ল সে এমন করে কলঙ্কের দুরপনেয় ছাপ গায়ে মেখে এলাহাবাদে কোথায় যাবে? কার কাছে?

দাদা—তার স্নেহময় দাদা, তাঁর কোলে কি অভাগিনী সরিৎ আবার স্থান পাবে? না, অসম্ভব, শুধু অসম্ভব নয় সম্ভবাতীত। ক্ষমা?

হায়! ক্ষমা চাইবার, ক্ষমা পাবার মত অপরাধ সে তো করেনি!

তবু দাদা যদি দুঃখিনী বোন্‌টির দুর্দ্দশায়—স্নেহ না হোক্ করুণা পরবশ হয়ে ক্ষমা করতে পারেন সমাজের, ভ্রূকুটী উপেক্ষা করে—কিন্তু বউদি?—আঃ!

—ওই জন্যেই তো স্বামী ওর তাড়িয়ে দিয়েছে—

কথাটা যে এখনো তার প্রাণে বিঁধে আছে তীক্ষ্ণ কাঁটার মত।

স্বামীর দেওয়া অপরাধের সত্যতা প্রমাণ করে সে আজ কোন্ মুখ নিয়ে সেই বউদির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে?

না,না, কেবল দাদা বউদি কেন—কোনো পরিচিত লোককেই সরিৎ আর মুখ দেখাতে পারবেনা।

এলাহাবাদে সে সে আর ফিরবেনা।

—কেন? এতবড় পৃথিবীর কোনো খানে তার এত-টুকু স্থান হবে না কি?

উদ্বেগ কাতর বিপর্য্যস্ত চিত্তে, উষ্ণ মস্তিষ্কে এই রকম চিন্তা ও কল্পনা জল্পনা করতে করতে সরিৎ হঠাৎ পাটনা ষ্টেশনে নেমে পড়ল, তার পর একখানা ঠিকা গাড়ীতে উঠেছিল কোনো একটা যাত্রী-নিবাসে যাবার ইচ্ছায়—তার পর কি যে হল হল, এখানে সে কি করে এলো—কিছুই জানেনা।

সরিৎ খানিক বাদে আবার চোখ মেলে দেখলে যে নারী তার শুশ্রূষা করছিলেন তাঁর পরিচ্ছদ ক্যাথলিক্ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের 'ন্যান্' এর মত। শান্ত সৌম্য মূর্ত্তিতে তাঁর মাতৃত্বের ভাব পরিস্ফুট। চোখে মুখে করুণা মমতা ঝরে পড়ছে যেন।

সে ধীরে ধীরে আবার জিজ্ঞাসা করলে—

—আমাকে এখানে কে আন্‌লে? এটা কি মিশান—

সরিতের গালের ওপর এসে পড়া চূর্ণ কগাছি সযত্নে সরিয়ে দিয়ে তিনি উত্তর দিলেন—

হ্যাঁ, আমাদেরই লোকে তোমাকে এনেছে সুশ্রূষার জন্যে—

আপনি—আপনাকে আমি কি বলে—

সরিতের পায়ের দিকে যে একটি অল্পবয়সী মেয়ে দাঁড়িয়েছিল—সে বল্‌লে—

ইনি আমাদের মাদার, এঁর সেবা যত্নেই তোমার জীবনরক্ষা হয়েছে।

একটা উদ্বেলিত দীর্ঘশ্বাস সরিতের বুক কাঁপিয়ে ঝরে পড়ল।

কি দরকার ছিল এ জীবন রক্ষা করবার? কৃতজ্ঞতা পূর্ণ করুণ নয়নে মাদারের মুখ পানে খানিক তাকিয়ে থেকে সরিৎ বল্‌লে—

—আমার কি অসুখ করেছিল—জ্বর?—

—হ্যাঁ, ব্রেণ ফিভার। ডাক্তার বলছিলেন—

মাদারের ইঙ্গিতে বিরত হয়ে সে মেয়েটী সরিতের সামনে থেকে সরে গেল।

তিনি সরিতের মুখে বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে সস্নেহ বচনে বললেন—

—তোমার কোনো ভয় নেই বালিকা! তোমার জীবন এখন নিরাপদ।

সে কথায়, স্পর্শে একটা আন্তরিকতা ছিল। সরিৎ আশ্বস্ত হয়ে সেই সেবা নিরত কোমল হাত খানি কপালের ওপর চেপে বিগলিত করুণ কণ্ঠে বল্‌লে—

—আমার মত দুর্ভাগিনীকে যত্ন করবার লোক জগতে আছে তাহলে?

সরিতের চোখদুটিতে অশ্রুর আভাস জেগে উঠল। মাদার তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে সাদরে বল্‌লেন।

—স্থির হও বালিকা! প্রভু তোমাকে শান্তি দেবেন বলেই এখানে এনেছেন।

সরিৎ আবার একটা আর্ত্ত নিশ্বাস ফেললে—

শান্তি! হায়! শান্তি সে এ-জীবনে আর কখনো পাবে কি? ঘৃণিত অভিশপ্ত জীবন তার—

চৌদ্দ—

দিন দশ পরের কথা।

সরিৎ সবল না হলেও সুস্থ হয়েছে এখন। মাদার তাকে মায়ের মত যত্ন করেন, পাদরী সাহেব ও স্নেহের চক্ষে দেখেন কাজেই এখানে কেনো কষ্টই ছিল না তার। শুধু সেই নয়, তার চেয়েও অসহায়, তার চেয়েও হীন কত লোক, কত অক্ষম, আতুর, অন্ধ, খঞ্জ, বিপন্ন আর্ত্ত, যার কোনোখানে ঠাঁই নেই তারাও এখানে আশ্রয় পেয়েছে, শুধু আশ্রয় পাওয়াই নয় তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য কি সুন্দর ব্যবস্থা!

ব্যবস্থাকারীরাও কি নিরলস নিরহঙ্কার প্রকৃতির লোক, এতটুকু দ্বিধা কি বিরক্তি নেই, এতটুকু ক্লান্তিবোধ নেই—এরা যেন পরার্থেই জীবন উৎসর্গ করেছেন।

যে ধর্ম্ম মানুষকে এমন উন্নত উদার করে তোলে সেই খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি হিন্দুর মেয়ে হলেও সরিতের ভাবপ্রবণ চিত্তে স্বতঃই একটা শ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে।

পাদরী যখন বাইবেল পড়েন তখন সে শুধু কানে শোনাই নয়, অন্তর দিয়ে তার মর্ম্ম গ্রহণ করতে চেষ্টা পায়। যেখানটায় বুঝতে না পারে মাদারকে জিজ্ঞাসা করে। সরিতের আগ্রহ দেখে সাহেব নিজেই যত্ন করে মহাত্মা যীশুর পবিত্র জীবন কাহিনী শোনাতেন।

অসাধারণ মহত্বে দয়ায়, ক্ষমায় ত্যাগে; মহিমান্বিত কি মধুর করুণ সে জীবন কথা!

পাপী তাপী, অধম আতুর তারাই হল তার সমধিক প্রিয়। যাকে দেখলে লোকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়—সেই গলিত কুষ্ঠ রোগীকে তিনি আলিঙ্গন দিয়েছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে।

সে সব কথা শুনে সরিতের মন সেই মহাপুরুষের চরণে ভক্তিতে অবনত হয়ে পড়ে।

সেদিন মাদার শোনাচ্ছিলেন সেই খানটায়—সে একটী তন্বী তরুণী, যৌবনের উদ্দাম প্রবৃত্তি তাকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছিল।

তার অবৈধ, অসংযত আচরণে উত্যক্ত ক্রুদ্ধ হয়ে লোকেরা তাকে শাস্তি দিতে বদ্ধ পরিকর হয়ে তাকে নিয়ে এলো—অমন পাপীষ্ঠার জন্য যে শাস্তি তারই [illegible]

সেই শাস্তি অর্থাৎ সকলে মিলে পাথর ছুঁড়ে তাকে মারবে যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে বিরত হবে না।

তারা যীশুর কাছে অভিযোগ জানিয়ে শাস্তি দেবার অনুমতি চাইতে যীশু নিষেধ করলেন না, শুধু লিখে দিলেন এই কথাটী—

—যারা পাথর, ছুঁড়বে তারা যেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়।

প্রাণ ভয়ে ভীতা কম্পমানা নারী কারো সাড়া শব্দ না পেয়ে মুহূর্ত্ত পরে যখন মাথা তুলে দেখলে তখন তার সাম্‌নে শুধু যীশু, অভিযোগকারীরা কখন্ চলে গেছে।

অভাগিনী চোখের জলে ভেসে মহাত্মার পায়ে লুটিয়ে পড়ল—তিনি অভয় দিয়ে ক্ষমা করে তাকে বললেন—

ভবিষ্যতে এমন কুকাজ যেন সে আর কখনো না করে।

শুন্‌তে শুন্‌তে সরিতের চোখ দুটী ঝাপসা হয়ে গেল, তাহলে সে ও তো ক্ষমা পেতে পারে—মুক্তি পেতে পারে, ঐ ক্ষমাময় দয়াময় মহাপুরুষের শরণ নিয়ে।

তাই ভাল।

অপরাধিনী সরিৎকে তার আত্মীয় বান্ধব সমাজ কেউ তা ক্ষমা করবে না।

পাষাণের ঠাকুর এতটুকু দয়া করবেন না, তার পায়ে মাথা কুটে মরে গেলে ও—তবে আর কেন?

যাক্—জাহান্নমে যাক্ সব।

সরিৎ সেই দিনই পাদরীকে জানালে সে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হতে চায় স্বেচ্ছায় সানন্দে।

কিন্তু উত্তেজনাটা মন্দীভূত হতেই আবার দুর্ব্বলতা এসে পড়ে—মনের মধ্যে দ্বিধা সংশয়ের দ্বন্দ বেধে যায়—এ যে ভারি জ্বালা।

এই মন নিয়ে সে কি করে কি করবে—

বাগানের একটা নির্জ্জন জায়গায় গাছতলায় বসে সরিৎ তার জট-পাকানো জীবন সমস্যার কথাই ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে অন্য মনে গান করছিল মৃদু মৃদু।

"আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ গর্ব্ব করেছ চুর"

—বাঃ। ভাই সরিৎ। তুমি তো ভারি চমৎকার গাইতে পারো?

বলে একটী মেয়ে তার কাছে এসে বস্‌ল। সে বাঙ্গালীর মেয়ে—সরিতের চেয়ে দু চার বছরের বড়ই হবে। নাম তার নেলী বা নলিনী। এখানকার মেয়েদের মধ্যে এই মেয়েটীর সঙ্গে সরিতের বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে ক'দিনের আলাপে।

সরিতের গান শুনে তার উদাস মুখের পানে তাকিয়ে নেলী সমবেদনা ভরে বল্লে—

—এ গান এমন করে যে গাইতে পারে সে অল্প দুঃখে গায়না ভাই, মনে হয় তুমিও আমার মতই সবহারার ব্যথা নিয়ে এখানে এসেছ, কিন্তু—

সরিতের সিঁথীর প্রায় উঠে যাওয়া সিন্দুর চিহ্নের দিকে দৃষ্টিপাত করে নেলী বল্লে—

তুমি তো সধবা দেখছি—তোমার তো এমন হওয়া উচিত নয়!

সরিৎ বিমর্ষ মুখে ম্লান হেসে বল্লে—

—সধবার বুঝি দুঃখের কারণ কিছু থাকতে নেই?

—কি জানি, সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণাই নেই ভাই! তবে এই যে স্বামী স্ত্রীর সামান্য মতের গরমিলে, কথায় কথায় ডাইভোর্স করে দেওয়া এটা কি তুমি ভাল মনে করো?

কথাটা যে সরিৎ কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে—তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

সরিৎ একটু লজ্জিত হয়ে বললে—

—না ভাই ও সব আমার ভাল লাগে না, ও রকম কোনো উদ্দেশ্য মনে নিয়ে আসিও নি আমি, এসেছি জীবনের অভিশাপ মোচন করতে, অশান্ত প্রাণে এতটুকু শান্তি পেতে, কিন্তু তা'কি পাব বাস্তবিক?

সরিতের সে ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে নেলী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে—

সে কি আর বলা যায় ভাই? আপনাপন ভাগ্য। স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মীয়দের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে আমি যখন আসি, তখন এমনি একটা আশা নিয়েই এসেছিলাম কিন্তু এখন মনে হয়, হয় তো ভুল করেছি। এ যেন গরম কড়া থেকে আগুনে এসে পড়া!

সরিৎ নেলীর মুখপানে তাকিয়ে চকিতে বলে উঠল—

—কেন বলো দেখি; আমার তো বেশ ভালই মনে হচ্ছে—

ও প্রথম প্রথম, তারপর দিন কতক থাকলে বুঝতে পারবে, তুমি যা ভেবেছ আসলে তা নয়। যাক্ বেশী কিছু বল্‌তে আমি চাই না ভাই, তবে এইটুকু তোমায় বলি—যা করবে মাথা ঠাণ্ডা করে বেশ বুঝে সুঝে করো, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কেনো কাজ—

—তুমি যে আমায় ভাবিয়ে তুললে নেলী! আমি যে সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না, যাদের ধর্ম্ম এমন মহৎ—এমন উদার—

—আরে ভাই, ধর্ম্ম তো খুবই ভালো, কিন্তু মানে কে? এদের যে বেশীর ভাগই ভণ্ডামী, ধর্ম্মের নামে এরা সব—ওই যে আমাদের আহ্লাদী আসছেন!

সে একটী ফিরিঙ্গী মেয়ে তার নাম লুসি, কিন্তু মেয়েটী হেসে হেসে, ভুরু দুটী নাচিয়ে নাচিয়ে নাকে মুখে কথা কয় অনর্গল. হাত নেড়ে, গা দুলিয়ে যেন নেচে নেচে চলে, তাই নেলী তার নাম দিয়েছিল আহ্লাদী।

আহ্লাদী নাচতে নাচতে এসে বল্‌লে—

—নির্জ্জনে বসে তোমাদের দুটীতে কি হচ্ছে ভাই? প্রেমালাপ?

নেলী হেসে বললে—

—মর্! এ ছুঁড়ী প্রেম প্রেম করেই গেল। এসেছেন তো মিশনে কাজ করতে—

তাতে কি হয়েছে; সবাই কি তোমার মত কাঠখোট্টা হতে পারে? সত্যি, কি শুক্‌নো ঝুনো প্রাণ রে বাবা! নিংড়ে ফেল্‌লেও এক ফোঁটা রস বেরোবে না!

লুসি হাস্‌তে হাস্‌তে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে সরিতের গলা ধরে বল্‌লে—

—তুমি বলো না ভাই! এতক্ষণ তোমরা দুজনে কি বলাবলি করছিলে!

নেলী চোখ্ টিপ্‌লে। সরিত তার অর্থ বুঝে বল্‌লে—

—বলবার আর কি আছে ভাই! এই একটু ধর্ম্ম তত্ত্ব—

আরে বাপরে! ক্ষমা করো ভাই, ও সব ভণ্ডামী আমার ধাতে সহ্য হয় না।

—ভণ্ডামী!

—আরে তা নাতো কি?

লুসি এদিক ওদিক তাকিয়ে গলার স্বর খাটো করে বললে—

—আমি ভাই, সত্যি কথাই বলি, ওসবে আমার বিশ্বাস বা ভক্তি কিছু নেই বুঝলে; উপাসনার সময়টা কোনো মতে চোখ কাণ বুঝিয়ে থাকি মাত্র। পাদ্রী সাহেব যখন দাড়ী নেড়ে সরমন্ ঝাড়তে লাগেন তখন আমার এত হাসি পায় কি বলি!

লুসি হেসে গড়িয়ে পড়ল।

নেলী তার গা টিপে দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বললে—

চুপ কর পোড়ার মুখী!

—কেন চুপ করব; কিসের ভয়? তোমরা নতুন এসেছ—কিন্তু আমার কাছে তো এদের লুকোনো কিছু নেই! এখনকার সকলেরি নাড়ী নক্ষত্র আমার জানা, শুনবে তাহলে?

সরিৎ বল্‌লে থাক—

—থাক্‌বে কেন; কিছু কিছু শুনে রাখা ভাল, তুমি তো আমাদের দলেই আসছ এখন; এখানে যা সব কীর্ত্তি-

নেলী বললে—

—ও তোমার মনের দোষ লুসি! লাল চশ্‌মা চোখে দিলে সমস্ত লালই দেখা যায়।

আহা গো! তাই তো! আমারি মনের দোষ তো? আচ্ছা তোমাদের যদি দেখিয়ে দিতে পারি এখানকার বড় বড় সব ধর্ম্মাত্মাদের—দলের পাণ্ডা যারা—

আঃ! থামোনা লুসি! ভণ্ডামো সকল ধর্ম্মেই আছে আমাদের মোহন্ত, গোঁসাই তাঁরাই বা কি না করছেন; তুমি অমন করে খামখা সরিৎকে ভরকে দিচ্ছ কেন; দেখা দেখি বেচারীর মুখ শুকিয়ে চুপ হয়ে গেছে—

—সত্যি নাকি;

ত্রস্তা সরিতের চিবুক ধরে লুসি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—

—না, ভাই, তোমার ভাবনা কি; যার এমন 'লাভলি' চেহারা শিক্ষিতাও বটে,—জন্ বলছিল—

—কে?

—জন্, ওই যে সুন্দর হেন ছোক্‌রাটী গো! দেখনি?

—হবে, কি বলছিল সে?

থাক্‌গে, পরে বল্‌বখন, তোমার কিছু ভয় নেই ভাই জান্‌লে; বেশ মজা করে থাকো, জীবনটা'কে উপভোগ করে নাও, যেমন ভাবেই হোক্—আমি তো এই সার বুঝেছি। তুমি ব্যাপ্‌টাইস হচ্ছ এই শুন্‌ডেতে না?

পনেরো

স্রোতহীন অচঞ্চল জলে খুব ভারি একটা পাথর ছুঁড়ে ফেল্‌লে যেমন সমস্ত জল পলকে তোলপাড় হয়ে ওঠে সরিতের বহুকষ্টে স্থির করে আনা সংযত চিত্তও তেমনি আলোড়িত হয়ে উঠ্‌ল নেলী আর লুসীর কথায়।

এখানেও ভণ্ডামী! এখানেও প্রতারণা? যে জন্যে সরিৎ কলিকাতার অত বড় প্রলোভন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে, বিচিত্র সুখের জীবনের মাধুর্য্য আনন্দ উপভোগ করবার শত আয়োজন অবহেলে ফেলে চলে এলো—এখানেও তাই?

সেখানে আর্টের দোহাই দিয়ে, এখানে ধর্ম্মকে আড়াল করে—

হায়! তবে সে কেন মিছে এমন করে মরীচিকার পিছনে ছুটোছুটী করে মরছে—কি অনিশ্চিতের আশায় লুব্ধ হয়ে?

অন্তরের স্বাভাবিক কোমল বৃত্তিগুলিকে বিবেকের নির্ম্মম আঘাতে অসাড় করে দিয়ে, সুকুমার তরুণ যৌবনকে এভাবে বুকের তলে শুকিয়ে মেরে কি পরমার্থ লাভ হবে তার?

কিছু না—সব ভ্রান্তি—সব ভুল!

সংসারে ধর্ম্মা-ধর্ম্ম বলে, পাপ পুণ্য বলে কিছু নেই।

ভগবান—

কি জানি তিনিও আছেন কিনা!

থাকেন যদি—ন্যায় বিচার নেই তাঁর। নইলে সরিৎ এতই কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ করেছিল যার জন্যে তাকে এমন নির্ম্মম ভাবে—শুধু বঞ্চিতই নয়—লাঞ্ছিত হতে হল।

এখনো কি জানি আরো কত লাঞ্ছনা—

অভাগিনী সরিতের চিত্ত সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত অবসন্ন, অন্তর এবার রীতিমত বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ল।

বৈশাখের রুদ্র মধ্যাহ্ন। রোদ যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে—নিদাঘের উত্তপ্ত বায়ু পথের তপ্ত ধুলি কণা উড়িয়ে দিয়ে আগুনের হল্‌কার মত হু-হু করে বয়ে চলেছে।

তারি মধ্যে রৌদ্র-দগ্ধ জন-হীন পথে আজ সরিৎ একা!

এখন সে কোথায় যাবে?—

আবার সেই প্রশ্ন—সেই সমস্যা!

সে ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর দেবার—সে সমাধানহীন বিষম সমস্যার মীমাংসা করতে কেউতো নেই তার!

স্বামী তাকে চায়না, আত্মীয় স্বজন না, সমাজ চায় না, তবে সেই বা কেন কারো মুখ চাইবে? তার প্রতি এ অন্যায় অবিচার, অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলবে না সে কেন?

তার কি এতটুকু শক্তি নেই? সেকি এতই দুর্ব্বল না, সে এবার সব দুর্ব্বলতা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াবে জোর করে সবার বিরুদ্ধে।—

—দয়া মায়া শান্তি, ভ্রান্তি—যাক্ সব মুছে যাক নিঃশেষে! সরিৎ আর কিছু চায় না কারো কাছে।

বুকের ভেতর অগ্ন্যুৎপাতের তীব্র দাহ নিয়ে সরিৎ একবার উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে উর্দ্ধে আকাশ পানে চাইলে—নির্ম্মেঘ নীল আকাশ একান্ত নিষ্করুণ, এতটুকু স্নিগ্ধতার লেশ ও নেই সেখানে। আশে পাশে বিরাট শূন্যতা খাঁ খাঁ করছে। পৃথিবী সহনাতীত জ্বালায় ব্যাকুল হয়ে যেন হাহাকার করছে উত্তপ্ত সীমাহারা সাহারার মত—সেই বারিহীন ছায়াহীন ধূ ধূ মরুতে—

সরিৎ একা, দিশেহারা!

শেষ

রুবি

রাণী সুরুচিবালা চৌধুরাণী

১৯৩৩ সাল। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি দিল্লীতে কনকনে শীত। ২০নং উইণ্ডসর প্লেসের সিটিংরুমে কয়েকজন বসে আছি—আমাদের রসিক প্রবর দাদার (শ্রীযুক্ত তরুণ রাম ফুকন) অপেক্ষা করে! সেদিন কোথাও কোন এনগেজমেণ্ট ছিল না। কোন বিশেষ প্রগ্রামও ছিলনা তাই। দাদা কাছেই ওয়েষ্টার্ণ হোষ্টেলে থাকে, আমাদের বাড়ী সারাদিন রাত ১টা পর্য্যন্ত তাকে Duty দিতে হয়! দাদাকে শুধু খাবার সময় ছুটী দেওয়া হয়—তাছাড়া আর সব সময়ে তাকে হাজির থাকতেই হ'ত, তা নাহলে দাদা বিনে আমাদের সব অন্ধকার! ডিনারের পরে নিত্যকার মত দাদা ১০টার সময় হাজির হ'তেই আমরা নড়ে চড়ে বসলুম। আর রাতে কি করা যায়—১টা ২টার আগে তো চোখে ঘুমই আসে না!

কেউ বললো ব্রীজ খেলি। একজন বললো—

"একটা drive নিলে মন্দ হ'ত না—"

কেউ আপত্তি করে বললো "এই শীতে?"

দাদা বললো "শীতে? তাতে হয়েছে কি? অল্পবয়স তোমাদের শীত গ্রীষ্ম তোমাদের কাছে হার মেনে যাবে, মন্দ কি, চলনা যাবে?"

কে একজন বললো "সিনেমায় এখুনি গেলে ঠিক সময় যাওয়া যায়—"

কেউ বললো—"না হে কালকে বরং শীতকে কাবু করে একটা কিছু হৈ চৈ করা যাবে, আজ অন্ততঃ একটা দিনের জন্য মাথা ঠাণ্ডা ক'রে বসাই যাক না, দাদা গল্প বলুক—"

আর একজন সায় দিয়ে বললো—"আরে সত্যি কথাই বলেছ, দাদার ভাণ্ডারে নিশ্চয় অসংখ্য গল্প বস্তাবন্দী হ'য়ে আছে।"

দাদা হেসে বললো "আমি আর গল্প কি বলবো তোমাদেরই গল্প বরং আমাকে শোনাও, তোমাদের নতুন জীবনে কত নতুন আনন্দ।"

আমি বললুম "না, দাদা আমাদের গল্পের চেয়ে তোমার গল্পই বেশী সুন্দর হবে, একেবারে নিজের জীবনের একটা রোমাঞ্চকর কিছু বল, তোমার এখনকার নূতনত্বের নমুনাই যা পাচ্ছি, তাতে মনে হয় সেকালে না জানি তোমার সেই নূতনত্ব কি রকম অভিনব ছিল! তাছাড়া আমাদের কাল তো তুমি দেখছোই, তোমার সেকালের কথা কিছু বল—"

দাদা হেসে বললো "হ্যাঁ এই তো তোমাদের ব্যবহার যখন দাদার চেয়ে মনোহর আর কিছু তোমাদের আকর্ষণ করবে না তখনি আসবে বুড়ো দাদার কাছে গল্প শুনতে—"

"না দাদা, শত মনোহর কিছু থাকলেও তোমাকে কখনো তুচ্ছ করেছি? তুমি হলে আমাদের সব মনোহারিত্বের উৎস, তুমি না হলে কোন আমোদই জমেনা—বল।"

"না—নেহাৎ আজ আমাকে দিয়ে গল্প না বলিয়ে তোমরা ছাড়বে না দেখছি!" বলে দাদা বড় একটা কৌচের এক পাশে বসে পড়লো!

"কিন্তু এই চমৎকার শীতের রাতটা কি চুপ করে ব'সে গল্প বলবার—আজ—"

এইবার সকলে মিলে চীৎকার ক'রে দাদার সব আপত্তি থামিয়ে দিলুম। দাদা বললো—

"আচ্ছা সত্যি ক'রে তোমাদের সুন্দর একটা গল্প বলবো—খুব সুন্দর তাতে আর সন্দেহ নেই বসে সকলে—

সুন্দর ক'রে গুছিয়ে সেই রকম আবেষ্টনী সৃষ্টি ক'রে দাদার গল্প বলবার একটা চমৎকার ক্ষমতা আছে। সব বাতিগুলো নিবিয়ে দিয়ে এককোণে একটা টেবল ল্যাম্প জ্বেলে আরাম করে আমরা দাদার কাছে ঘেসে ব'সে পড়লুম!

দাদা একটু চুপ ক'রে থেকে বলতে লাগলো।

১৯০৩ সাল। তখন তোমাদের কারো জন্ম হয়েছে বা হয়নি আমি তখন বিলেতে ব্যারিষ্টারী পড়ছি।

বার্লিংটন ষ্ট্রীটে থাকি, তার খানিক দূরেই সেফার্ডস্ বুসএ রিচার্ডসন পরিবার বাস করতো। তাদের একটী মেয়ের নাম রুবি রিচার্ডসন তার সঙ্গে আমার কিছুদিনের ভিতরেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল!

খুব বন্ধুত্ব! সুন্দর মেয়েটি তখন সবে' ২০ কি ২১ বছর বয়েস, নীল উজ্জ্বল চোখদুটী যৌবনের আশা-আনন্দে উচ্ছল। সর্ব্বাঙ্গে প্রাণের স্পন্দন দ্রুত ছুটে চলেছে অবারিত গতিতে। নাচে, গানে, কথায় কথোপকথনে, সঙ্গিনীরূপে সে ছিল অপরূপ। রোজ তার সঙ্গে দেখা হয় তাকে নিয়ে বেড়াই। কত শত তার কল্পনা সে আমাকে শোনাতো, তার ভবিষ্যৎ জীবনের কত রঙীন ছবি সে আমার সামনে এঁকে দিত। তাকে দেখলে মনে হত জীবন একটা অফুরন্ত আনন্দ, দুঃখ শোকই বুঝি মানুষের কল্পনা বাস্তবে তাদের কোন স্থান নেই।

কিছুদিন পরে আমার শরীরটা একটু খারাপ হতে Changeএর আবশ্যক হ'ল তাই একদিন বিদায় নিয়ে—চ'লে গেলুম!

লণ্ডন থেকে মাত্র ৩।৪ ঘণ্টার পথ যাবো, এমন দূরও কিছু নয়, ইচ্ছা করলে সেও যেতে পারে, আমিও আসতে পারি। সামান্য কথা এমন বেশী কিছুই নয়, কোন একটা বড় অভিযানে যাওয়া নয় যুদ্ধে যাওয়া নয়, কিন্তু আমার এ ছোটখাট যাওয়ার ব্যাপারে বিদায়ের পালাটা অস্বাভাবিক রকম গুরুতর বলেই মনে হ'ল। মনে মনে একটু হেসে একটু বিরক্ত হয়ে কেমন একটা অসোয়াস্তি ভাব নিয়েই চ'লে গেলুম। পথটুকু রুবির কথা খুব মনে পড়তে লাগলো। মনে হ'ল যখন ট্রেন ষ্টেশন ছেড়ে এলো তখন রুমালে সে যেন কয়েকবার চোখ মুছেছিল। কি আশ্চর্য্য মেয়েরা অদ্ভুত জীব! এত সহজে একেবারে এলিয়ে পড়ে, এত অল্পে গলে যায়! এতে কাঁদবার কি আছে? তবুও, বেচারা অন্য সব বন্ধুকে অবজ্ঞা করে সে এতদিন আমার সঙ্গই বেছে নিয়েছিল। কোন কোন দিন বরং আমি তাকে এড়িয়ে চলতে চেয়েছি কিন্তু সে সব সময়ই আমাকে ছাড়া আর কাউকে চায়নি।

যাক সেখানে পৌঁছে এক হোটেলে বাসা নিলুম। জায়গাটী চমৎকার! প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। মানে এক কথায় যত কবির বর্ণনাগুলো একসঙ্গে একবার ভেবে নিলে যা হয় সব সেখানে একসঙ্গে মিলে গেল। হোটেলে কয়েকজন বন্ধু বান্ধব পেয়ে গেলুম, তাদের সঙ্গে মিশে রুবির সঙ্গ-স্মৃতি-ভরা লণ্ডনের একঘেয়ে জীবনটা বদলে নেওয়া গেছে ভেবে একটু খুসীই হলুম।

রুবি রোজ চিঠি লেখে, প্রথম প্রথম উত্তর দিতুম, তারপরে আর লিখবারও ধৈর্য্য থাকে না, আজ কাল ক'রে চিঠির উত্তর দিতে আর একখানা এসে পড়ে, তারপরে ৪ খানা চিঠির জবাব একখানাতে যেতে লাগলো, ক্রমে তাও ক'মে এলো।

আমি বেশ ফুর্ত্তিতে কাটাচ্ছিলুম। নিত্য বেড়ানো, খাওয়া দাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া, বান্ধবীও কয়েকটী জুটে গেল, আর কি কারো কথা ভাববার বা কিছু করবার অবসর থাকে?

একমাসেরও বুঝি উপর হয়ে গেল!

উদ্দাম আনন্দের ভিতরও মাঝে মাঝে সকলের এক একটা সময় আসে যখন অন্তরের গভীর দৈন্য ভাব প্রাণের সমস্ত উন্মাদনাকে এসে চেপে ধরে। আমাকেও সেদিন সেই ভাব এসে চেপে ধরেছিল বুঝি। ঠিক সকাল বেলা, একটু দেরী ক'রেও উঠেছি। ব্রেকফাষ্টের পরে ব'সে আছি—হঠাৎ রুবির কথা মনে হ'ল। তাইতো বেচারা অনেক দিন চিঠি-পত্র লেখেনি তো! রাগ করলো নাকি! আমার ব্যবহারটাও বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে। দিন পনেরোরও উপর হবে, আমি লিখিনি, আর সেওতো লেখেনি। তার প্রাণের কোমল তন্ত্রীতে নির্ম্মম ভাবে আঘাত ক'রে, তাকে সত্যি ক'রে অনেকখানি ব্যথিত ক'রে তুলেছি তো! এখনি একটা চিঠি দি! না:—হঠাৎ মনে হ'ল চ'লেই যাই! বেচারা রুবি! মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে উঠলো—আর এখানে থেকেই কি করবো! তখনি হোটেলের বিল ইত্যাদি চুকিয়ে দিয়ে যাবার জন্য সমস্ত গুছিয়ে ফেললুম।

কাজ কর্ম্ম সেরে লাঞ্চের একটু আগে ঘরে কি একটা করছি, এমন সময়—দরজায় নক্ ক'রে হঠাৎ দরজা ঠেলে —আরে!!! ঠিক যেমন রেখে এসেছি তেমনি আনন্দে

অপরূপ, আমার সমস্ত ঘরময় ঝলমলে আলোর রাশি ছড়িয়ে দাঁড়ালো। আমি প্রথমটা একটু অবাক্ হ'লেও আনন্দে লাফিয়ে উঠে তাকে কাছে টেনে নিলুম। বললুম--"একি রুবি! এতদিনে মনে পড়লো বুঝি? বেশ! কেমন আছ?"

রুবি বললো—"আমারি মনে পড়ার জন্য সব কিছুই আটকে ছিল নয়? তুমিই বা কোন্ আমাকে মনে করেছ? এসেই তো ভুলে গেলে! তোমরা এমনই! যাও, যাও, তোমার সব বোঝা গেছে একখানা চিঠি দিয়েও তো ইদানীং একটা খবর নাওনি! কি আর করি, থাকতে না পেরে ছুটে এসেছি—" আমি বললুম—"খুব ভাল করেছ রুবি! আমি এখানে এসে খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলুম—সত্যি বলছি সেই জন্যই—। তা এলে তো ক'দিন আগে এলেই তো ভাল হ'ত, আমি যে আজকেই লণ্ডন ফিরবো ব'লে ঠিক করেছি—তোমার কথা খুব বেশী মনে হল কিনা তাই—" রুবি বাধা দিয়ে বললো—"থাক্ আর বেশী কিছু বলতে হবে না। তা তুমি ফিরছো, বেশতো আমিও একদিনের বেশী থাকতে পারছি না—আমিও তো ফিরবো একসঙ্গেই ফেরা যাবে আর কি—"

আমি খুসী হ'য়ে বললুম—"তা'হলে আজ এই সময়ের ভিতর চল একটু ফুর্ত্তি ক'রে নেওয়া যাক্! বাইরে 'লাঞ্চ' ক'রে রওনা হওয়া যাবে। কি বল? তুমি আসাতে সত্যি ভারি খুসী হয়েছি।"

রুবি আনন্দিত হ'য়ে বললো—"নিশ্চয়। ফুর্ত্তি করতেই তো আসা, কিন্তু তোমার নূতন সঙ্গিনীরা যে ভয়ানক হতাশ হ'য়ে পড়বে –" আমি অনুযোগ ক'রে বললুম—"এই বুঝি আমার বিষয় তোমার ধারণা! চুলোয় যাক্ নূতন সঙ্গিনী—রুবি! তুমি এসেছ সত্যি আমার এতো আনন্দ হচ্ছে। চলো 'লাঞ্চের' সময় হলো বলে। বেরিয়ে পড়া যাক্! জায়গাটী চমৎকার, এই সময়ের ভিতর সব দেখেও নিতে পারবে—"

দু'জনে বেরিয়ে পড়লুম! একটা হোটেলে গিয়ে 'লাঞ্চ' করলুম। দু'জনে কত গল্প, কত হাসি, কত আলোচনা, ঠিক আগের দিনের মত, কি তার চেয়েও বেশী, অত সব বলতে গেলে রাত কাবার হ'য়ে যাবে। কিন্তু মনে হচ্ছিল আমাদের যেন দুজনের বয়স অনেকখানি ক'মে গেছে। বিকেলবেলা 'পার্কে' দোড়াদৌড়ি পর্য্যন্ত করেছি, রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কতবার জোরে হেসে কতজনকে চ'মকে দিয়েছি, কত পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, তার বা আমার কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপই ছিল না!

খুব আনন্দে সারাদিন কাটিয়ে একখানে চা খেয়ে ষ্টেশনে গিয়ে এক কামরায় উঠে বসলুম—সেখানেও কত গল্প, কত হাসি তার সীমা নেই। কয়েক ঘণ্টা কয়েক মিনিটের মত উড়ে চ'লে গেল। আমার মনের অবসন্ন ভাবটা কোথায় এক ফুঁয়ে উধাও হ'য়ে চ'লে গেল, মনটা বেশ হাল্কা হ'য়ে প্রফুল্ল হ'য়ে উঠলো! লণ্ডন পাবার আগে আমি বললুম—

"দেখো রুবি—আমাকে ফেলে পালিও না কিন্তু। এতদূর যখন একসঙ্গে এলুম তখন তোমাকে একেবারে বাড়ী পৌছে দিয়েই আমি বাড়ী যাবো—বুঝলে?

মাথা নেড়ে সে বললো—"আচ্ছা—"

ষ্টেশনে পৌঁছে নেমে হঠাৎ দেখি পাশে রুবি নেই! আরে! ভিড়ের ভিতর কোথাও হারিয়ে গেল নাকি? না, তামাসা করে কোথাও চ'লে গেল! ষ্টেসনে খানিক খুঁজে তাকে পেলুম না, ভাবলুম যাক্ কি মনে করে হয়তো বাড়ী চ'লে গেছে নইলে যাবে কোথায়। তবে যাবার পথেই ওর বাড়ীতে পৌছেছে কিনা একটু খোঁজ নিয়ে গেলেই হবে আর সঙ্গে সঙ্গে আমার এ হয়রানি টুকুর জন্যও একটু ব'কে দিতেও হবে।

রুবির বাড়ীর সামনে গিয়েই চমকে দেখি সমস্ত জানালা গুলো টেনে দেওয়া! বাড়ীটী গম্ভীর নিস্তব্ধতায় থম্‌থমে হ'য়ে রয়েছে, সেখানকার বাতাস পর্য্যন্ত যেন থম্‌কে থেমে নিথর হ'য়ে গেছে! এ আবার কি ব্যাপার! বাড়ীতে কোন দুর্ঘটনা হ'ল নাকি? মনটা হঠাৎ ভয়ানক বিচলিত হ'য়ে উঠলো। খোঁজ তো নিতেই হয়—আর সেও তো কোন কিছুই বললো না—কি মেয়ে!

বড়ীতে ঢুকে পড়লুম। মিসেস্ রিচার্ডসনকে প্রথমেই দেখলুম—আমাকে দেখেই সে কেঁদে উঠলো—বললো "রুবি মারা গেছে।"

আমার তখন অবস্থা বুঝতে পারছ। রুবি মারা গেছে! বলে কি? এরা কি সব পাগল হয়েছে? না আমি পাগল হয়েছি? কি আশ্চর্য্য! কি অসম্ভব কথা! মারা গেছে রুবি! যাকে এই মাত্র—! তবে ষ্টেশন থেকে বাড়ী ফিরবার পথেই কোন দুর্ঘটনা হ'ল কি? কি বলে এরা? না আমি স্বপ্ন দেখছি!

আমি কথা বলতে পারলুম না, শোক বিহ্বলা মাকে কি বলে সান্ত্বনা দেবো—তারও ভাষা খুঁজে পেলুম না—, শুধু যন্ত্রচালিতের মত মিসেস রিচার্ডসন নির্দ্দিষ্ট একটী চেয়ারে বসে জড়িত স্বরে জিজ্ঞেস করলুম "কবে?" কাঁদতে কাঁদতে মিসেস্ রিচার্ডসন বললো "কাল"। বিস্ময়ের উপর আরো বিস্ময় আমি অবাক হ'য়ে শুধু ভাবহীন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম!

মিসেস্ রিচার্ডসন অনেক কিছু ব'লে গেল। সে নাকি ব্যারামে ভুগছিল দিন পনেরো ধ'রে—তার পরে কাল সব শেষ হ'ল। কোন কথাই আমি বলতে পারলুমনা। তার পরে ধীরে ধীরে তার সঙ্গে আমি রুবিকে দেখতে গেলুম তার শেষ বিশ্রাম বাসরে। হ্যাঁ, ঠিক তো সেই! সেই চুল গুলি, সেই হাসিটী, সেই মুখখানি—এই মাত্র দেখা—এই মাত্র শোনা,—একি প্রহেলিকা! এ কি রহস্য! সব স্থির সব প্রাণহীন! কিন্তু একটু আগেই—কি আশ্চর্য্য!

যাবার সময় শুধু জিজ্ঞেস করলুম "কাল কটায়?"

রুবির মা উত্তর দিল "কাল বেলা ১১টায়"—ঠিক আমাকে দেখা দেবার ৫ মিনিট আগে!

পৃথিবীতে অলৌকিক কত কিছু ঘটে যায়—আমরা তা জানতে পারি না। অনেক এমন গল্প শোনা যায়, কিন্তু এ ব্যাপার? অন্যে বললে বিশ্বাস করতুম কিনা কে জানে কিন্তু দিনের উজ্জ্বল আলোয় দেখা—তোমার আমার মত রক্ত মাংসের শরীর তার আমি ছুঁয়েছি অনুভব করেছি, তবু কোন সন্দেহ আমার মনে মুহূর্ত্তের জন্য স্থান পায় নি। তার কথায় বা ব্যবহারে এতটুকুও অস্বাভাবিকত্ব ছিল না, এতটুকু কোন কিছুর অভাব ছিলনা—কিছুনা—তবু এ কি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা!

অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে বলেছি। কেউ বিশ্বাস করেছে কেউ করেনি, তোমরাও করবে কিনা জানি না—কিন্তু সেই হোটেলে সেই কাফেতে গিয়ে আমি তখনো সাক্ষী প্রমাণ দিয়ে তাদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছি এবং আজো পারি, যদি সেই দিনের কেউ আমাদের মনে করে রাখে তবে আমার কথা সত্যি বলেই প্রমাণিত হবে!

দাদার গল্প শুনে আমরা সকলে চুপ করে রইলুম। আমাদেরও এর উপর বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপার দাদার মনে যেমন, আমাদেরও মনে একটা জটিল রহস্যের মত চিরদিনের জন্য গাঁথা হয়ে রইল।

নিবেদন

শ্রীনীরবালা মিত্র

আর কতদিন মোরে রাখিবে মা এ সংসারে অশান্তির অনলে ফেলিয়া;
বল আর কতদিন রব মা দুঃখে মলিন, রব গো মা তোমারে ভুলিয়া।
সংসারের দুঃখ, জ্বালা, শোক, তাপ, আদি ভারে শান্তিহারা জীবন আমার,
হে চির আনন্দময়ি দাও মোরে পদাশ্রয় ঘুচাইয়া মোহ অন্ধকার।
কাটাইয়া মায়া-ফাঁস জ্ঞান-চক্ষু পরকাশ খুলে দাও তৃতীয় নয়ন,
দুর্ব্বহ জীবন ভার বহিতে পারিনা আর দাও মাগো ও রাঙা চরণ॥

নানাকথা

মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি-ই-জে বার্জ্জ গত ২রা সেপ্টেম্বর তথাকার পুলিশ গ্রাউণ্ডে খেলিতে নামিবার সময় আততায়ীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। এই মেদিনীপুরেই ১৯৩১ সালের ৮ই এপ্রিল মিঃ পেডী ও ১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল মিঃ ডগলাস আততায়ীর গুলিতে নিহত হইয়াছিলেন। মিঃ বার্জ্জ অতি জনপ্রিয় ও স্পোর্টসম্যান প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার এইরূপ নির্ম্মম হত্যায় আমরা আন্তরিক দুঃখিত। তাঁহার পত্নীকে এই শোকে সহানুভূতি জানাইতেছি। এই ধরণের হত্যাকে রাজনীতিক হত্যাকাণ্ড বলা হয়—এবং যত সামান্য সংখ্যক লোকই এই কার্য্যে লিপ্ত থাকুক না কেন ইহাতে সমগ্র হিন্দুর পরম ক্ষতি হইতেছে—স্থানীয় জনসাধারণের অস্বস্তি ও দুর্গতির সীমা থাকিতেছে না।

এই ধরণের হত্যার পর খানাতল্লাসী প্রভৃতিতে যাহাতে জনসাধারণের দুর্ভোগ না হয় সে দিকে সরকার পক্ষের যথাসম্ভব দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয় কারণ হত্যাকারীরা সাধারণ লোক নহে, আর সাধারণ মাত্রেই বিপ্লবী নহে। তাহাদের মধ্যে আতঙ্কের সঙ্গে আরও ভীষণ ত্রাস ও দুর্ভোগ না আনাই ভাল মনে হয়।

মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সম্প্রতিকার আলোচনা হইতে বোঝা যায় উভয়েই পূর্ণ মাত্রায় শান্তিকামী। পণ্ডিত জওহরলালের অর্থনীতিক মন্তব্য রাজা প্রজা উভয়েরই প্রণিধান যোগ্য। মহাত্মার শান্তির প্রয়াসও বিশেষ ভাবে উভয় পক্ষেরই প্রণিধান যোগ্য। আশা করি এইবার সরকার ও দেশবাসীর সহাযোগে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে এবং যাহা সত্যই দেশের পক্ষে অমঙ্গলকর তাহার উচ্ছেদের চেষ্টা হইবে।

নারী হরণ পাপ দেশে ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে। এদিকে দেশবাসী সর্ব্বসম্প্রদায়ের ও শাসক সম্প্রদায়ের বিশেষ দৃষ্টি পড়া কর্ত্তব্য এ পাপ যত শীঘ্র বন্ধ করা যায় তাহাই মঙ্গল।

ছাত্রীর কৃতিত্ব—কলিকাতা কলেজের শ্রীমতী চামেলী দত্ত ফিজিক্সে এম, এস, সি পরীক্ষায় ও মিঃ এস, এম বসু বার-এট-ল'এর কন্যা শ্রীমতী রমা বসু দর্শন শাস্ত্রে এম, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কুমারী রমা এত বেশী নম্বর পাইয়াছেন যে আর কেহ কখনও তত নম্বর পান নাই।

এবার ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষায় কুমারী করুণাকণা দত্ত ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী অশোকা সেন এম, এ সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কুমারী করুণাকণা দত্ত শতকরা ৭০ নম্বর পাইয়াছেন।

সহশিক্ষা।—রাজসাহী কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ইতিপূর্ব্বে উক্ত কলেজে ছাত্রী ভর্ত্তি করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি রাজসাহী এসোসিয়েশনের প্রচেষ্টায় কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রীদিগকে কলেজে পড়িবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। ছাত্রীদিগের জন্য আলাদা বসিবার ঘরের বন্দোবস্ত করা হইবে।

কলিকাতায় ছাত্রীনিবাস সমস্যা।—কলিকাতার কলেজসমূহের ছাত্রীদিগের বাসস্থানের সুবিধা করিবার জন্য শ্রীমতী সরলা রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বিষয়টী বিবেচনার জন্য মিসেস সরলা রায়, মিসেস আর্কহার্ট, মিসেস তটিনী দাস এবং মিসেস জে, এন রায়কে লইয়া এক সাব কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন।

কলিকাতার কলেজে ছাত্রী সংখ্যা।—কলিকাতার কলেজের ছাত্রীসংখ্যা ৮০৩।

ডাওসেসান কলেজে	১০৬
লরেটো হাউসে	৮১
বেথুন কলেজে	১৪৬
ভিক্টোরিয়া ইউষ্টিটিউসনে	২২
স্কটিশচার্চ্চ কলেজে	৬৭
আশুতোষ "	১১৮
বিদ্যাসাগর "	১৭৫
সিটি "	৩১
মেডিকেল "	২০
পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্টে	৩৭

এই ৮০৩ ছাত্রীর মধ্যে ৫৫৫ জন অভিভাবকের সঙ্গে থাকেন। ১৭৪ জন কলেজসমূহের হোষ্টেলে এবং অবশিষ্ট ছাত্রীরা ইয়ং উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েসন, গোখেলে মেমোরিয়াল স্কুল, সেণ্ট টমাস স্কুল অথবা প্রাইভেট কমিটী কর্ত্তৃক পরিচালিত বোর্ডিংএ বাস করেন।
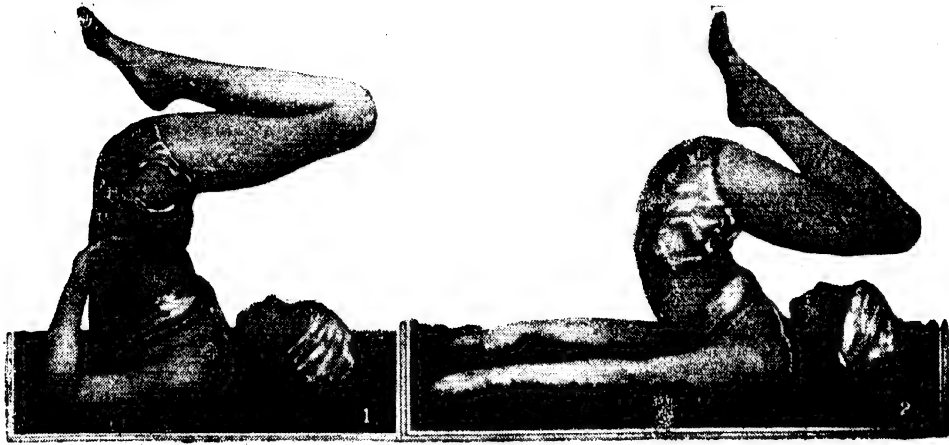
ব্যায়ামে নারী-শ্রী

শ্রীভারত কুমারী বসু

যৌবন-সৌন্দর্য্য

'নারীর যৌবন-সৌন্দর্য্য'—এ কথাটার অর্থ কি?—এর অর্থ, 'নারীর দেহে তরুণী-সুলভ' মুগ্ধকর লাবণ্য' ছাড়া আর কিছুই নয়।...

যৌবনেই নারীর সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং সে সৌন্দর্য্যের মধ্যেই মুগ্ধতা থাকে প্রচুর! এই জন্যই প্রত্যেক নারী-ই যৌবন-সৌন্দর্য্যকে নিজের দেহে চিরকাল বন্দী ক'রে রাখবার জন্য লোভনীয় একটী ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন।...তার সার্থকতা সম্বন্ধে জানবার ব্যাপারটাই হচ্ছে আমাদের উপস্থিত আলোচ্য বিষয়।...

আমাদের দেশে একটা চল্‌তি কথা আছে যে এখানকার মেয়েরা নাকি কুড়িতেই বুড়ী হ'য়ে যান। কথাটা শুধু আমরা কেন, একটু কাণ্ডজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিই বোধ হয় সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার ক'রতে প্রস্তুত নন। নারীর যৌবন বিধাতার দেওয়া একটী অমর আশীর্ব্বাদ। পার্থিব কোনো কিছুর দ্বারাই তা ক্ষুন্ন হ'তে পারে না। যদি হয়, তাহ'লে বুঝতে হবে যে, অবহেলা এবং অযত্নই হচ্ছে তার মূল কারণ!...ঈশ্বরের দান গ্রহণ করবার অধিকার মানুষের আছে। কিন্তু সে দানের অপমান করবার অধিকার মানুষের নেই কখনো।...

যৌবন-শ্রী নারীর অন্যতম গর্ব্ব ও গৌরবের বস্তু। এই শ্রী বজায় রাখতে হ'লে নারীর প্রধান লক্ষ্য ও যত্ন থাকা উচিত, যাতে তাঁর অবয়ব ঠিক সেই অনুযায়ীই গঠিত হয়। যৌবনের লালিত্য সার্থকতায় ফুটে ওঠে না, তা একেবারে নিঃসন্দেহ!

সাধারণতঃ মেয়েদের দেহের স্থূলত্ব দূর ক'রতে হ'লে

নারীর অবয়বই হচ্ছে নারীর সৌন্দর্য্যের আধার। এই অবয়বের অতি পুষ্টি হওয়াই মন্দ। অতি-পুষ্ট দেহে যে তাঁদের দেহের রক্ত আগে পরীক্ষা করা উচিৎ, কারণ, কারুর রক্তে হয় ত চিনি ও নুনের পরিমাণ খুব বেশী

থাকতে পারে। কিন্তু 'স্যালাইভা'র পরিমাণ থাকতে পারে, উপযুক্তভাবে। আবার, কারুর রক্তে হয় ত চিনি ও নুনের পরিমাণ থাকতে পারে উপযুক্তভাবে; কিন্তু 'স্যালাইভা'র অভাব থাকতে পারে অত্যন্ত।...সুতরাং এক দুই ব্যাপারে এক-ই আহার্য্য কখনো গ্রহীতব্য নয়।

প্রথম কারণের জন্য আহার্য্য হ'তে পারে:—টাট্‌কা ফল, শাক-শব্জী, ইত্যাদি, এবং মিষ্টি খাবার একেবারেই না খাওয়া ভাল।

দ্বিতীয় কারণের জন্য আহার্য্য হ'তে পারে:—ডিম, কলা, মাখন, দুধ এবং তৈলযুক্ত জিনিষ।

একটা কথা কিন্তু মনে রাখা অবশ্যই দরকার যে, ব্যায়াম উপকারক হলেও, রুগ্ন স্বাস্থ্যে অথবা অতি দুর্ব্বল স্বাস্থ্যে তা অভ্যাস করা একেবারেই উচিৎ নয়। কারণ, তার ফল হয় অত্যন্ত শোচনীয়। শরীরে যতটা সহ্য হয়, সেই পরিমাণ ব্যায়াম করা উচিৎ। তাতে স্বাস্থ্য ত সবল হবেই, উপরন্তু নারীর দেহে নারীর চির-ঈপ্সিত যৌবনের লাবণ্যও ফুটে উঠবে। এই লাবণ্যই পুরুষের অন্তরকে আকর্ষণ করে।
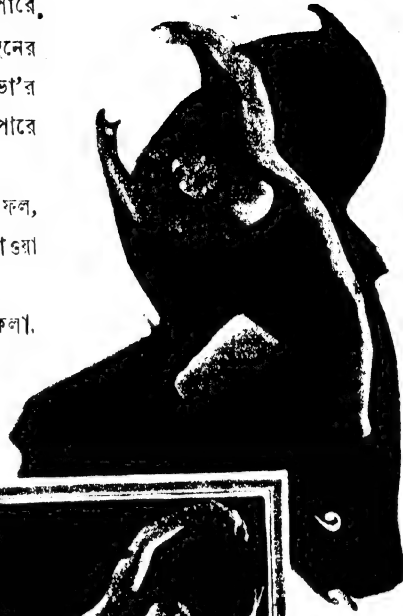
৩

২

১

আকর্ষণকর সৌন্দর্য্য

নারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে-সৌন্দর্য্য। কিন্তু সৌন্দর্য্য মাত্রেই যে আকর্ষণ করিবে, এমন কোন মানে নেই। 'আকর্ষণকরে সৌন্দর্য্য' তাকেই বলে, যার মধ্যে মুগ্ধতা আছে প্রচুর। এই জন্যই বোধ হয়, রূপ-জগতের

ইতিহাসে 'যৌবন' কথাটীর সম্মান অত বেশী ' বাস্তবিকই ঠিক তাই। সৌন্দর্য্যবতী নারী মাত্রেই যদি মুগ্ধকরী হ'তেন. তা হ'লে পৃথিবীর মানুষ, স্বাভাবিক আকর্ষণের দিক দিয়ে, রূপবতী-বর্ষীয়সী এবং রূপবতী-তরুণীর মধ্যে অত খানি ব্যবধানের রেখা চিরকাল টেনে রাখতেন না। সুতরাং তরুণী-সুলভ সৌন্দর্যের সঙ্গেই আকৃষ্ট হওয়ায় সম্বন্ধ র'য়েছে পরিপূর্ণ ভাবে। তারুণ্যেই নারীর তনুলতায় যৌবনের বসন্ত-মঞ্জরী ফোটে! রূপ-দেবতার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় তার অন্তরের সমস্ত চেতনা, সমস্ত প্রকৃতি তখন যেন বিকচ ফুলের অনিন্দ্য শ্রীর মতো লাবণ্যের পাপ্‌ড়ীগুলি মেলে ধরে। ধরণীর বুকে এই লাবণ্যই শ্রেষ্ঠ আদর পায় এবং তা পায়, কারণ, যুগে যুগে বিমুগ্ধ পুরুষ তার আকর্ষণকে সশ্রদ্ধায় এবং সর্ব্বান্তঃকরণে বরণ ক'রতে বাধ্য হয় ব'লে!

যৌবন-সৌন্দর্য্যবতী নারীর প্রতিটী বিশেষতই হচ্ছে আকর্ষণকর এবং নারীর রূপের সার্থকতা হচ্ছে—পুরুষকে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট করা। এক কথায়, নারীর সৌন্দর্য্যে হচ্ছে নারীর অনেক কিছু জিনিষ। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার সুখ-শান্তি-প্রীতি-আশা-ভালবাসা ইত্যাদি সব। যে নারী তাঁর স্বামীকে আকৃষ্ট এবং মুগ্ধ ক'রতে পারেন না, (এ বিষয়ে সাধারণতঃ যৌবন-সুলভ সৌন্দর্য্যই প্রধান কাজ করে) তাঁর দাম্পত্য-জীবনের প্রথম অবস্থা খুব সুখপূর্ণ হ'য়ে ওঠে না। অথচ, পুরুষ ভালবাসে নারীর রূপ, নারীর যৌবন-শ্রী। কর্ম্মের অবসর-মুহূর্ত্তে সে চায় ওই টুকুতে মুগ্ধ হ'তে.—ওইটুকুর আকর্ষণে সানন্দে নিজেকে ধরা দিতে সুতরাং নারীর পক্ষে আকর্ষণকর সৌন্দর্য্য অর্জ্জন করা—শুধু বাঞ্ছনীয় নয়,—একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু! এবং বিনা মূল্যে এই মূল্যবান বস্তুটীকে হস্তগত ক'রতে হ'লে, তার একমাত্র উপায় হচ্ছে.—সহজ-সাধ্য ব্যায়াম দ্বারা দেহ-চর্চ্চা করা। আমরা নীচে তার সুন্দর পদ্ধতিগুলি লিপিবদ্ধ করলুম :—

১। পায়ের পেশীর সবলতার জন্য :—

ঘরের মধ্যে বড় বড় পা ফেলে চলুন। কিন্তু দৃষ্টি রাখুন, যেন চলা অভ্যাস করা হয়—ঠিক সরল একটী রেখার উপর দিয়ে। (১নং ছবি দেখুন)

২। মেরুদণ্ডের শক্তির জন্য :—

(ক) সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে, দু হাতের করতল দিয়ে মাথার পিছন দিকটা ধরুণ। তার পর কনুই দুটা যথা-সম্ভব উঁচু ক'রে তুলুন। (২নং ছবি)

(খ) দু হাত দিয়ে মাথার পিছন দিকটা ধ'রে একটু নুয়ে পড়ুন। কিন্তু লক্ষ্য রাখুন, যেন মাথাটা ঠিক সোজা থাকে। এর পর সাধারণ ভাবে আগেকার মতোই আবার দাঁড়ান। অন্ততঃ ৪.৫ বার এই ব্যায়াম ক'রতে হবে।

(গ) দু হাত দিয়ে মাথার পিছন দিকটা ধ'রে দেহের দু ধারে এক একবার ক'রে হেলে পড়ুন। (৩নং)

(ঘ) দু হাত দিয়ে মাথার পিছ দিকটা ধ'রে দেহটাকে এক দিক থেকে আর এক দিকে ঘোরান। (৪নং)

(ঙ) দুই পা পৃথক ক'রে দাঁড়ান। হাত দুটাও উপর দিকে তুলুন। তার পর দেহটাকে এক দিক থেকে আর এক দিকে ঘোরান কিন্তু দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন প্রতিবার দেহটা ঘোরাবার সময় হাত দুটাও সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধ-বৃত্তের মতো নীচের দিক দিয়ে ঘুরে আবার আগেকার মতোই উপর দিকে উঠে যায়। (৫নং)

(চ) দু হাত উপর দিকে তুলে দাঁড়ান। তার পর দেহটাকে এক দিক থেকে আর এক দিকে ঘোরান। এই সময় দৃষ্টি রাখুন, যেন দেহটা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঘোরাবার সময় মাত্র বাঁ হাতটা সঙ্গে সঙ্গে নামানো হয় এবং বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘোরাবার সময় তুলে-থাকা ডান হাতটা সঙ্গে সঙ্গে নামানো হয় ও বাঁ হাতটা তোলা হয়। (৬নং)

৩। দেহের কার্য্যকর কল-কব্জা ও নিম্নোদরের শক্তির জন্য :—

(ক) পা দুটাকে দুমড়ে সোজা হ'য়ে শুয়ে পড়ুন। তার পর খুব ধীরে টানা নিশ্বাস নিন, যেন বুকের ছাতি ফুলে ওঠে। নিঃশ্বাসটী ফেলতে হবে ঠিক এক রকম ধীর ভাবে।

(খ) পূর্ব্বোক্ত ভাবে শুয়ে, হাতের সাহায্য না নিয়ে ঘন ঘন নিম্নোদর আন্দোলন করুণ। তাতে, উদর মধ্যস্থ 'গ্যাস্' দূর হ'য়ে যাবে।

(গ) একটা চেয়ার উল্টে ফেলুন এবং তার পিঠ রাখবার জায়গার উপর একটা বালিশ রাখুন। এইবার উক্ত বালিশের উপর দেহটাকে রেখে শুয়ে পড়ুন। প্রথমে পাঁচ মিনিট এই ভাবে থাকতে হবে। ক্রমশঃ সময় বাড়ালেই চ'লবে। এতে শরীরের ভিতরকার কল-কব্জার স্থানচ্যুতির ব্যাপারে অনেক সাহায্য হয়। অনেক ডাক্তার হয়ত এই ব্যায়ামটীকে সমর্থন ক'রবেন না। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ ব্যায়ামে উপকার ছাড়া ক্ষতি কিছুই নেই।

৪। সমস্ত দেহের শক্তির জন্য :—

(ক) দুই হাত দিয়ে মাথার পিছন দিকটা ধ'রে দাঁড়ান। তার পর একটা জানু আস্তে আস্তে যতটা সম্ভব উঁচু ক'রে তুলুন। লক্ষ্য রাখুন, যেন জানুটী ক্রমশঃ এসে বুক স্পর্শ করে। প্রথমে এটীর অভ্যাস কষ্টকর ব'লে মনে

ব্যায়ামে স্বয়ং-ত্রী

হ'তে পারে। কিন্তু কিছু দিন চেষ্টা ক'রলেই কাজ হবে। অপর জানু দিয়েও ঠিক ওই ভাবে ব্যায়াম ক'রতে হবে।

(খ) দুই পা একত্র ক'রে দাঁড়ান। তারপর আস্তে আস্তে গোড়ালীর উপর দেহটাকে নামিয়ে আনুন। আবার আগেকরে মতোই দাঁড়ান। এই ব্যায়াম কিছুক্ষণ ধ'রে ক'রলেই কাজ হবে। প্রথমে দেহটাকে গোড়ালীর উপর নামাবার গতি খুব ধীর হলেও ক্রমশঃ দ্রুত ক'রতে হবে।

(গ) একটা জায়গার উপর শুয়ে পড়ুন। তারপর দুই পা উপর দিকে তুলে দিয়ে, পরস্পর এক একটি পা একবার নামান, একবার উঠান। পরে, দুই-পা-ই এক সঙ্গে তুলতে হবে।

(ঘ) দুহাতে করতল দিয়ে মাথার পিছন দিকটা ধ'রে সোজা হ'য়ে শুয়ে পড়ুন। তারপর দেহের উপর-অর্দ্ধাংশ তুলে বসুন। আবার শুয়ে পড়ুন, আবার বসুন। এই ভাবে ব্যায়াম করবার সময় প্রথমে এটিকে কষ্ট-সাধ্য ব'লে বোধ হ'তে পারে। কিন্তু অভ্যাস ক'রলে অল্প দিনের মধ্যেই তা সরল হ'য়ে যাবে।

৫। শিরা, উপশিরা ও দেহের শক্তির জন্য :—

(ক) উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। তার পর দু হাতের উপর ভর দিয়ে মাথাটা যথাসম্ভব উঁচু ক'রে তুলুন এবং দুই পা পিঠের দিকে দুমড়ে মাথাটা ছোঁবার চেষ্টা করুন।

(খ) উপুড় হয়ে শুয়ে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথাটা সোজা ক'রে তুলুন এবং একটা পা পিঠের দিকে দুমড়ে মাথাটা ছোঁবার চেষ্টা করুন। অপর পায়ের পাতা কিন্তু যেন এই সময় আগেকার পায়ের জানুর উপর এনে রাখা হয়।......দুই পা দিয়েই এই রকম ব্যায়াম ক'রতে হবে।

(গ) দুই পা দু ধারে দাঁড়ান। তার পর দুই হাতে বুকের উপর রেখে, পিছন দিকে যতদূর পারেন, দেহটাকে হেলিয়ে দিন। তার পর আগেকার মতোই আবার দাঁড়ান।

(ঘ) সামনের দিকে দু হাত ছড়িয়ে দিয়ে সোজা হ'য়ে শুয়ে পড়ুন। তার পর শক্তির দ্বারা (সামান্য শক্তিতেই হবে) সমস্ত দেহটা মাথার উপর দিয়ে উল্টো দিকে নিয়ে আসুন। তার পর হাত ও মাথার সাহায্যে স্বাভাবিক ভাবে উঠে বসুন। কয়েকবার এই ব্যায়াম ক'রলেই কাজ হবে।

৬। সবল স্বাস্থ্যের জন্য :—

(ক) দেওয়ালের ঠিক পাশে দেওয়ালের দিকে পিঠ ক'রে দুই পা দুধারে রেখে দাঁড়ান। তার পর দুই হাত দেয়ালের উপর রেখে, দেহটাকে যতটা সম্ভব পিছন দিকে নত করুন। এই ভাবে থেকে' হাতের সাহচর্য্যে দেওয়ালের পাশ দিয়ে চ'লতে আরম্ভ করুন।

(খ উপুড় হ'য়ে শুয়ে দুই পা পিছন দিকে দুমড়ে দিন। তারপর মেঝে থেকে বুক ও মাথা যথাসম্ভব উঁচু ক'রে দু হাত দিয়ে পা দুটাকে ধরুন। তার পর পা দুটা এনে মাথায় ছোঁয়াবার চেষ্টা করুন।

(গ) উপুড় হ'য়ে হয়ে পড়ুন। তার পর দুই পা, মুখ ও বুক মেঝে থেকে উঁচু ক'রে কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকবার চেষ্টা করুন।

(ঘ) নতজানু হ'য়ে বসুন। তার পর দেহটাকে পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে মাথাটা মেঝে স্পর্শ করান এবং দুই হাত সোজা ক'রে মেঝের উপর রাখুন। এর পর মাথাটা সরিয়ে এনে পায়ের পাতার উপর রাখবার চেষ্টা করুন।

(ঙ) দুই পা দু দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বসুন। তার পর ডান হাতটা ডান কোমরের উপর রেখে এবং বাঁ হাতটা উপর দিকে তুলে, দেহটাকে যতদূর সম্ভব পিছন দিকে হেলান। তার পর আগেকার মতোই আবার বসুন।

(চ) বাঁ পা-টা দুমড়ে এবং ডান পা-টা সোজা ক'রে রেখে বসুন। তার পর ডান পাটা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে দোমড়ান এবং বাঁ পা-টা সাজা করুন। এই ভাবে ব'সে ব'সে চলা অভ্যাস করুন। তাতে পায়ের সৌন্দর্য্য বাড়বে, আর, কোমরের শক্তি বৃদ্ধি হবে।

এই ব্যায়ামগুলি অভ্যাস ক'রলেই নারীর দেহ সুন্দর স্বাস্থ্যযুক্ত হ'য়ে আকর্ষণকর সৌন্দর্য্যের দ্বারা নারীকে মুগ্ধকরী ক'রে তুলবে। এই মুগ্ধকর সৌন্দর্য্যই মানুষের অন্যতম কাম্য বস্তু। কি পুরুষ, কি নারি,—উভয়েই এই সৌন্দর্যের অভিলাষী।

ব্যায়ামে নারী-শ্রী

—নারীর মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য—

নারীর মুগ্ধকর সৌন্দর্য্যই নারীকে পুরুষের কাছে প্রিয় ক'রে তোলে। এইজন্যই মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য হচ্ছে নারীর অন্যতম একটী শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে নারী আপন সৌন্দর্য্যের মুগ্ধতায় তাঁর স্বামীর চিত্তকে জয় ক'রতে পারে না, তার জীবন বিশেষ সুখপূর্ণ হয় না। নারীর প্রতিটী কথা, ভঙ্গিমা, লাস্য, হাস্য ইত্যাদির মধ্যে থাকা চাই মুগ্ধতার বিশেষত্ব। তবেই তাঁর নারী-সুলভ প্রকৃতির সার্থকতা। নারীর কমনীয় স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিধাতার এমন একটী অমর আশীর্ব্বাদ আছে, যাকে চিরদিন অন্তরের সঙ্গে সম্মান ক'রতে পুরুষ বাধ্য। এই জন্যই এই সৌন্দর্য্য রক্ষার বিষয়ে দৃষ্টি রাখা নারীর পক্ষে বিশেষ কর্ত্তব্য।

'ভগ্ন-স্বাস্থ্য'—কথাটি নারীর কাছে করুণ অভিশাপের মতো। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অনেক সময়েই দেখা যায়, অনেক নারীই এই অভিশাপটীকে বরণ ক'রে, অর্থাৎ শোচনীয় স্বাস্থ্য নিয়ে, দেহ ও মনের স্বাচ্ছন্দের জন্য অনবরত চিকিৎসকের সাহায্য নিচ্ছেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন যে, এত করা সত্বেও তাঁদের উক্ত প্রচেষ্টা হ'য়ে যাচ্ছে একেবারে ব্যর্থ! বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, মানুষের দেহ মনের স্বাচ্ছন্দ অথবা অস্বাচ্ছন্দ হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রকৃতিগত ব্যাপার সুতরাং প্রকৃতির ভিতর দিয়েই তাকে শান্তি, ও শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে। এবং যদি কিছু উপকার হয়ত, তাহ'লে হবে এইতেই!

কিন্তু এই কাজে একটু গোলযোগ আছে। এবং এই গোলযোগটি হচ্ছে সম্পূর্ণ সংস্কার-গত। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, নারীর মনের সঙ্গে তাঁর দেহের সম্বন্ধ ঠিক বন্ধুর মতো। মনকে স্ফুর্ত্তিযুক্ত ক'রতে হলেই, দৈহিক স্বাস্থ্যের দিকে মন দিতে হবে এবং অতি সহজে নারীর এই স্বাস্থ্যের উন্নতির সম্ভবপর হবে একমাত্র নারীর উপযোগী ব্যায়ামের দ্বারা! আমাদের দেশের মেয়েদের কাছে এই 'ব্যায়াম' কথাটাই হচ্ছে একটী বিশেষ 'গোলযোগের' মতো কারণ, তাদের মন্তব্য অর্থাৎ সংস্কার হচ্ছে এই যে, ব্যায়াম আবার কি অদ্ভুত কথা! আমরা বাড়ীতে যে-সব গৃহস্থালী কাজ করি, অর্থাৎ কল্ থেকে জলের ঘড়া তুলি, বাট্না বাটি, খাদ্য পরিবেষণ করি ইত্যাদি,—সেইগুলোতেই আমাদের যথেষ্ট শক্তি-চর্চ্চা হয়! সুতরাং নতুন আর কোনো ব্যায়ামই আমাদের দরকার নেই।'

এদের ধারণা সম্বন্ধে বক্তব্য হচ্ছে এই যে, নারীর শক্তি চর্চ্চা অর্থাৎ স্বাস্থ্য-চর্চ্চা, উক্ত কাজগুলির দ্বারা সম্পন্ন হ'তে পারে না। নারীর স্বাস্থ্য-গঠন-প্রণালী পুরুষের স্বাস্থ্য-গঠন-প্রণালী থেকে একেবারে ভিন্ন। নারীর স্বাস্থ্য-গঠনের মধ্যে তাঁর দেহ-অন্তস্থ কলকব্জার প্রকৃতিগত অনেক জটিলতার কথা আগে এসে পড়ে। এদিক দিয়ে একটু ভাবলেই বেশই বোঝা যাবে যে, উপরোক্ত গৃহস্থালী কার্য্যগুলির দ্বারা নারীর স্বাস্থ্য কখনো উন্নত হ'তে পারেনা। তার প্রথম কারণ:— উক্ত কাজগুলি স্বাস্থ্যোন্নতির একেবারেই উপায় নয়। দ্বিতীয় কারণ:—উক্ত কাজে খাটুনী হয় উপযুক্ত সময়ের বেশীক্ষণ পর্য্যন্ত! এবং এই অতিশ্রমই দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। আর, তৃতীয় কারণ:—উক্ত কাজে উদর-অন্তস্থ কল-কব্জার কিছুমাত্র উপকার হয় না। অথচ, বিশেষ ক'রে এই কল-কব্জার উপকার সাধনই নারীর একটী প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য!

নারীর ব্যায়াম হচ্ছে সম্পূর্ণ নিয়মানুগত কখনো তা স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে উঠতে পারে না। হ'লেই সমূহ ক্ষতি। এইজন্যই, বিশ্বস্ত মনে আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যায়াম অভ্যাস করা উচিত। এবং সে সময়ে মনে রাখা উচিত যে, এই ব্যায়াম করা হচ্ছে—স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে কেবল নিজের সুখের জন্য নয়,—স্বামী এবং ভবিষ্যৎ সন্তানদের আনন্দ এবং শান্তির জন্যও! এই ব্যায়ামের একটী বিশেষ উপকারিতা হচ্ছে এই যে, তা সদা-বিষণ্ণ অন্তরে উৎফুল্লতার উচ্ছলতা আনে, ছোটো-খাটো স্নায়ু পীড়ার (মাথাধরা ইত্যাদির) ইতি করে, এবং মানসিক ও দৈহিক দুর্ব্বলতা দূর ক'রে, হৃদয়ে এক অভিনব উৎসাহ এনে দেয়। এই উৎসাহই স্বামী-পুত্র পরিজনের কল্যাণকর কার্যে উৎসর্গিত হ'য়ে সংসারের মধ্যে এক আনন্দ-শ্রী ফুটিয়ে তোলে। জীবনের নিত্য-চাওয়া এই আনন্দের সন্ধান, স্বাস্থ্য-চর্চ্চার যে অমূল্য প্রণালী গুলির মধ্যে পাওয়া যায়, তার কয়েকটী আমরা পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করেছি:—

সেই সকল ব্যায়ামগুলি অভ্যাস ক'রলেই নারীর দেহ সুন্দর স্বাস্থ্যযুক্ত হ'য়ে নারীকে মুগ্ধকর ক'রে তুলবে। সঙ্গে সঙ্গে তা তাঁর মধ্যে এমন একটী লাবণ্য এনে দেবে, যা অনিন্দ কমনীয়তায় ভরা! এই কমনীয় সৌন্দর্য্যই যুগেযুগে পুরুষের অন্তরকে আকৃষ্ট করে। এইজন্যই এই সৌন্দর্য্যের কাছে পুরুষ স্বেচ্ছায় আত্মদান ক'রে সৌভাগ্য-বান হ'তে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। সে জানে যে, নারীর এই সৌন্দর্য্য হচ্ছে মর্ত্তের মাঝে স্বর্গের অমর আশীর্ব্বাদ স্বরূপ! তা কেবল চোখের সামনে রেখে দেখতেহয়, আর, দেখে, মুগ্ধ' হতে হয়।—

—পুরুষের মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য—

পুরুষ যেমন নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্য ভালবাসে, নারীও ঠিক তেমনি পুরুষের দৈহিক সৌন্দর্য্যকে ভালবাসে। এবং এই ভালবাসার অধিকার বোধ করি একমাত্র পুরুষেরই একচেটে নয়। কারণ, তা কখনো হ'তে পারে না। বিধাতা,—নারী ও পুরুষ—উভয়েরই মধ্যে সমান ভাবে রুচির বিশেষত্ব দিয়েছেন সুতরাং উভয়েই উভয়ের সৌন্দর্য্যের প্রত্যাশী হ'তে পারে, এবিষয়ে কিছু ভুল নেই। প্রায়ই দেখা যায়, অনেক পুরুষ চান স্বাস্থ্যবতী অর্থাৎ সৌন্দর্য্যবতী স্ত্রী। কিন্তু তাঁরা নিজেরা হচ্ছেন যার পর নাই ক্ষীণস্বাস্থ্য এবং এইজন্য কুৎ... সৌন্দর্য্যবান। এস্থলে সৌন্দর্য্যবতী স্ত্রী চাওয়া তাদের পক্ষে কি গুরুতর অপরাধ নয়? এ সম্বন্ধে বেশী কিছু আলোচনা না ক'রে আমরা শুধু এইটুকুও ব'লতে চাই যে উক্ত স্বার্থপরতা পরিত্যাগ ক'রে প্রত্যেক পুরুষেরই উচিত, প্রকৃতিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা; অর্থাৎ সুন্দর স্বাস্থ্যযুক্ত হ'য়ে স্ত্রী ও ভবিষ্যৎ সন্তানদের সুখী করা এই স্বাস্থ্য অর্জ্জনের একমাত্র সুলভ উপায় হচ্ছে আন্তরিকতার সঙ্গে দেহ চর্চ্চা করা। আমরা নীচে আরও কয়েকটী নূতন পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করলুম :—

১। মেঝের উপর পিঠ রেখে সোজা হ'য়ে শুয়ে পড়ুন। দুহাত মাথার দিকে ছড়িয়ে দিন। তারপর হঠাৎ উঠে ব'সে দুহাত দিয়ে পায়ের পাতা ধরুন।

২। একটী চৌকীর উপর শুয়ে দু হাত দিয়ে মাথাটা ধরুন। তারপর কোনো শক্ত এবং ভারী জিনিষের নীচে (ধরুণ, ভারী একটা পাথরের টেবিলের পায়ার নিচে) পা দুটাকে এমন ভাবে আঁকড়ে রাখুন, যেন তা কথনো দুই পায়া থেকে আল্‌গা হয়ে না আসে। এই রকম অবস্থায় হঠাৎ এক ঝাকুনিতে উক্ত চৌকির উপর উঠে বসুন। এইতেই অনেক কাজ হবে।

এই ব্যায়ামগুলি পুরুষের কাছে শুধু প্রয়োজনীয় নয়—একান্ত উপকারক। এতে পুরুষের স্বাস্থ্যের সমস্ত ক্ষুণ্ণতা দূর হ'য়ে যায়, হৃদয়ে এক নূতন আনন্দ আনবে এবং দেহে এক যৌবন সুলভ লাবণ্য ফুটে উঠবে। বিবাহিত জীবনের পক্ষে প্রকৃতির এগুলি সুখের আশীর্ব্বাদ নয় কি?

আবাহন

কুমারী লতিকা মিত্র

এস গো ঈশানী		মহেশ ঘরণী
দুর্গে দুর্গতি হরা
এস মা শুভদে		সুখদে শারদে;
উজলি ইঁসুক ধরা।
শিবে শবারূঢ়া		চণ্ডি চণ্ড চুড়া
ঘোর রূপা এলোকেশী,
(এস) ভৈরবী মাতঙ্গি		ভুবন ঈশ্বরী
উজলিয়া দশদিশী।
ধুমাবতীরূপে		এস গো জননী
ওমা হর মনোরমা,
বগলা, কমলা,		ছিন্নমস্তারূপে
এস গো জননী উমা।
তারা বাবাম্বরা		এস দুঃখ হরা
ডাকিছে ত্রিলোক বাসি
দনুজ দলনী		এস মা শিবানী
চিত্তে কলুষ নাশি।
স্নেহময় পিতা		গিয়াছেন চলে,
স্মরনীয় দিন করি,
যত মুছি জল		নয়ন সজল
ও রাঙা চরণ হেরি॥

নৃত্য

রাণী সুরুচিবালা চৌধুরাণী

তাল লয় বাদ্যাদিসহ হস্তপদ সঞ্চালন এবং ইঙ্গিত দ্বারা নীরবে ভাব বিকাশ করাই নৃত্য। নৃত্য রচনা করিয়া তুলে কবিতা, প্রতি অঙ্গের রেখাপাতে মূর্ত্ত করিয়া তুলে অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্যের কারুকার্য্য, ছন্দে ছন্দে গাহিয়া উঠে নীরবে অপরূপ গানের মূর্চ্ছনা। অন্তরের সুক্ষ্ম অনুভূতিকে রূপদান করিয়া তাহা সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলিতে পারে এক মাত্র নৃত্য। আর্টের রত্ন-ভাণ্ডারে ইহা একটী অন্যতম প্রধান সম্পদ!

কবিতা, চিত্র্য স্থাপত্য চিরস্থায়ী, অমর, অজর। তাহারা স্থির গাম্ভীর্য্যে, পুস্তকের পাতায়, রঙের বর্ণে, পাথরের কঠিনতায় সমাহিত হইয়া জগতকে আপন সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করিয়া বাঁচিয়া থাকে একই ভাবে; কিন্তু নৃত্যকে ধরিয়া রাখা যায় না, তাহা বন্ধনহীন সীমাহারা চঞ্চলতায় আপনাকে লক্ষ ভাবে বিকাশ করিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলে কোন রূপ-সৌন্দর্য্যের অসীমতায়। নিত্য নূতন ভঙ্গী, নূতন ভাব লইয়া নৃত্য দিন দিন নবজীবনে পুনঃ সঞ্জীবিত হইয়া নানা ভাবে জগতকে মুগ্ধ করে।

আদিম মানুষ যখন ভাষা দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিতে জানে নাই, তখনি তাহারা জানিয়াছিল তাহা নৃত্যে প্রকাশ করিতে তাই—সৃষ্টির আদিকাল হইতে নৃত্য আমাদের পরিচিত। শোক, দুঃখ, আনন্দ, উল্লাস সবই তাহারা ব্যক্ত করিত নৃত্যের ভিতর দিয়া, এমন কি পশু পাখীও নাচিয়া নাচিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে ভালবাসে। পৃথিবীতে সভ্য অথবা অসভ্য জগতে এমন মানুষ নাই যাহারা নাচে না। তাহাদের সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করিতে গেলে বড় বড় অনেক খাতা ভরিয়া উঠিবে।

তাল মান রসাশ্রয় বিলাসাঙ্গ বিক্ষেপে নৃত্যের সৃষ্টি হয়—তাই নৃত্যস্রষ্টা এবং নর্ত্তকের এই কয়টি বিদ্যাই আয়ত্ত থাকা চাই। ইহার একটীর হানি অথবা অভাব হইলে নৃত্য হয় না, নৃত্যকে আয়ত্ত করিতে হইলে প্রকৃত ভাবে তাহার সাধনা করিতে হয়। অন্যান্য কলার মত নৃত্য-সাধনায় নিজেকে একেবারে উৎসর্গ করিয়া না দিলে প্রকৃত নর্ত্তক অথবা নর্ত্তকী হওয়া যায় না। আপনহারা হইয়া নৃত্যের তরঙ্গময়ী লীলারসে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ছাড়িয়া না দিলে নৃত্য-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করা যায়না, নিজে তাহার সঙ্গে না মাতিয়া উঠিল জগতকে মাতানো যায় না।

হিন্দু শাস্ত্রে মহাদেব প্রথম নৃত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাই তিনি নটরাজ, এবং প্রত্যেক হিন্দু গল্প উপাখ্যানে সঙ্গীত আর্থাৎ গীত বাদ্য-নৃত্য, সমাদরে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহাদেব নৃত্যের ভিতর দিয়া সৃষ্টি সংহার করেন, মহামায়া নৃত্যের ভিতর দিয়া দানব-দলনী রূপে রণমদে মত্ত হইয়াছিলেন, কালীর শুম্ভ-নিশুম্ভ বধে নৃত্য-লীলা মূর্ত্তি আজো ঘরে ঘরে পুজিতা। কৃষ্ণ রাসনৃত্যে প্রেমিক সাজিয়াছেন। বেহুলা নৃত্য করিয়া মৃত পতিকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন। শুধু গল্প বলিয়া ইহা উপেক্ষা করিলেও, যাহারা যে সময়ে ইহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাদের এবং সেই যুগের নৃত্য সম্বন্ধে জ্ঞান এবং উচ্চ ধারণাকে কোন রকমে উপেক্ষা করিতে অথবা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না।

ভারতীয় নৃত্যের একটা নিজের বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতীয় হিন্দু নৃত্য ধর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রাণ পাইয়াছে, রূপলাভ করিয়াছে আজিও গ্রামের প্রতি ঘরে ব্রত নাচ, বিবাহাদি মাঙ্গলিক উৎসবে নাচ, এমন কি নিত্য পুজার আরতি নাচ প্রচলিত। পুজায় প্রয়োজনীয় মুদ্রাদি প্রদর্শনও নৃত্যের অপভ্রংশ ব্যতীত আর কিছু নহে। ভারতের গ্রামে গ্রামান্তরে সবখানে নৃত্য সুপ্রচলিত। এককালে শ্রীহট্টে বালিকারা নাচিতে না জানিলে বিবাহ হইত না। বিবাহের দিনে "কন্যা নাচ" নাচিয়া বর পক্ষকে

সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদিগকে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিতে হইত। ইহা বেহুলার উপাখ্যানের আদর্শে অনুষ্ঠিত!

তারপরে মুসলমান যুগে ভিন্ন আর এক প্রকারের নাচ রূপলাভ করিল, কিন্তু তাহাও ভারতীয় বৈশিষ্টে গঠিত, এবং ক্রমে কৃষ্ণের হোলি উৎসব বসন্ত উৎসব ইত্যাদি যুক্ত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান আর্টের সংমিশ্রণে সুন্দর হইয়া উঠিল। কিন্তু আজকাল সেই পুরাকালের ভারতীয় হিন্দু নাচ ও পরবর্ত্তী কালের মুসলমান নাচ সবই লোপ পাইয়া যাইতেছে, তাহার পরিবর্ত্তে একপ্রকার নাচের হাস্যকর ব্যঙ্গরূপ নাচ বলিয়া প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল ভদ্র সমাজের নাচ উহাই। উহা পাশ্চাত্য নাচের অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অবশ্য কোন নাচই হেয় নহে, পাশ্চাত্য নাচেও আর্ট আছে, সৌন্দর্য্য-রস আছে কিন্তু অনুকরণ করিয়া Indian বলিয়া চালাইলে আমরা লজ্জিত হই। জগৎ ভাবে আমরা বুঝি সর্ব্বস্ব-হারা রিক্ত হইয়া আজ আমাদের সব বৈশিষ্ট্য হারাইয়া অন্যের দুয়ারে আমাদের কলাসৌন্দর্য্যকে পর্য্যন্ত পুষ্ট করিতে হাত পাতিয়াছি।

পৃথিবীর সভ্য অসভ্য সকল দেশীয় নাচে একটা তালের প্রভাব দেখা যায়। বেতালা অথবা তাল ছাড়া নাচ ক্বচিৎ, কোনখানেও, কোনযুগে দৃষ্ট অথবা শ্রুত হয় না। আমাদের শাস্ত্রে আছে ইন্দ্রের সভায় সামান্য একটু তাল ভঙ্গ করায় উর্ব্বশীকে অভিশপ্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্ম নিতে হইয়াছিল। নারদ যখন কত হাজার বৎসর সঙ্গীত অভ্যাস করিয়া তম্বুরু ঋষির আশ্রমে যাইতেছিলেন—গুরু দক্ষিণা দিবার জন্য—তখন পথে কতগুলি বিকলাঙ্গ নর-নারীকে দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তাহাদের এ অবস্থা কেন, তাহারা তখন সকাতরে উত্তর দিয়াছিল যে তাহারা রাগ-রাগিণী, নারদ নামে কে এক জন বেতালা গাহিয়া তাহাদের এ অবস্থা করিয়াছে। তখনি তিনি লজ্জিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া পর পর এক একটী রাগিণী বহু আয়াসে সাধনা করিয়া তাহাদের অঙ্গ পূর্ণ করেন। যে দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত সেখানে আজ ঘরে ঘরে তালহীন বেতালা নাচ সমাদরে শিক্ষণীয় হইতেছে। ইহা অতি আপশোষের বিষয় সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানে ভারতীয় নাচ বলিতে যাহা—তাহা পেশাদারী নর্ত্তকী মহলেও ক্বচিৎ দেখা যায়। দুঃখের বিষয় রুচি ও মতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও ক্রমে কে কতদূর বেতালা নাচে সিদ্ধ হইয়াছে তাহাই দেখাইতে উৎসুক। খাঁটী ভারতীয় নাচ গ্রামে অশিক্ষিত সমাজে এখনো আছে, এবং নাচ সম্বন্ধে তাহারা আর যেন শিক্ষালাভ না করে ইহাই আমাদের কাম্য!

বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ নর্ত্তক উদয় শঙ্কর। তাঁহার নাচ সুন্দর। শরীরটীও তিনি ভারতীয় এলোরা অজন্তার গুহা খোদিত এবং চিত্রিত মূর্ত্তির মত গড়িয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাচেও পাশ্চাত্য নাচের গন্ধ পাওয়া যায়, এবং তিনিও কোন একটা বিশেষ তাল ধরিয়া নাচেন না। মহাদেব দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন—তাঁহার নাচ নাচিলে তাহার সঙ্গে ভারতীয় ধ্রুপদ তাল সংযোজনা না করিলে "শিব তাণ্ডব" নামানুকরণ না করিলেই ভাল হয়। যদি তিনি তাঁহার নাচে পাশ্চাত্য ভাবটুকু বর্জ্জন করিয়া তাহা তাল লয়সংযুক্ত করিয়া অভ্যাস করেন তাহা হইলে হয়তো মর্ত্ত্যের নটরাজ বলিয়া আমরা তাহাকে অভিষিক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইব না। তিনি পাখোয়াজ সাহায্যে ভাল বাদকের সঙ্গে তালগুলি কিছুদিন অভ্যাস করুন, এবং তাল-নৃত্য সম্বন্ধে কাহারো কাছে আরো কিছু শিক্ষা, উপদেশ লউন এবং নৃত্য সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন পুস্তকগুলি পড়িয়া আরো ভালো করিয়া নৃত্য-বিদ্যা সাধনা করিলে সত্যই সঙ্গীত-অনুরাগী, সঙ্গীতজ্ঞ ভারত তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিবে।

নৃত্য ইত্যাদি অতি বিস্তৃত শাস্ত্র। ইহা ভাল করিয়া আলোচনা করিতে গেলে অনেক কিছু বলিতে হয় কিন্তু সময় ও স্থানাভাব বশতঃ আপাততঃ এই খানেই ইতি করিলাম।
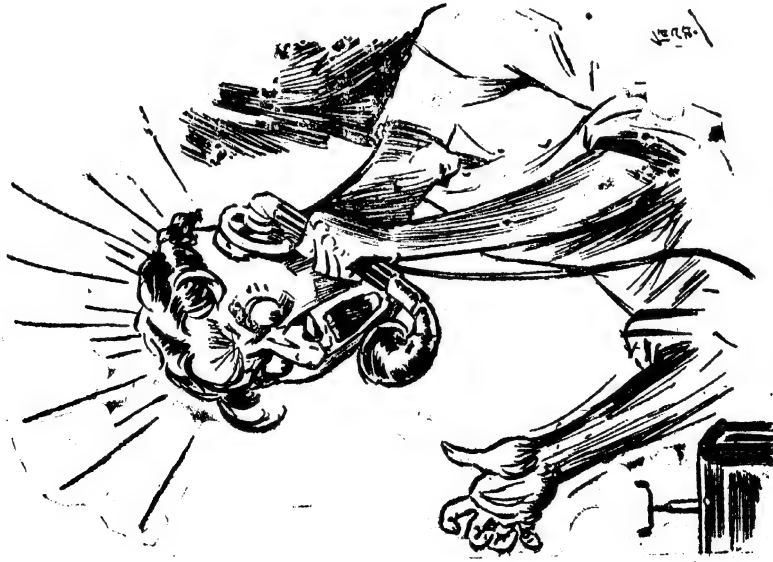
পুলিসের Head office-এ Telephone

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুদক্ষ গোয়েন্দার তলব !

ভীষণ হত্যাকাণ্ড—লক্ষপতি খুন।

সূত্র আবিষ্কার…

অদ্ভুতকর্ম্মা গোয়েন্দা সম্রাট রাঘবেন্দ্রের আগমন…
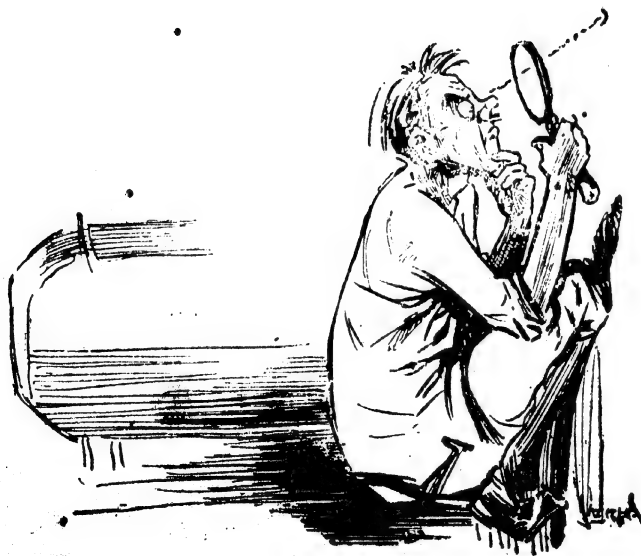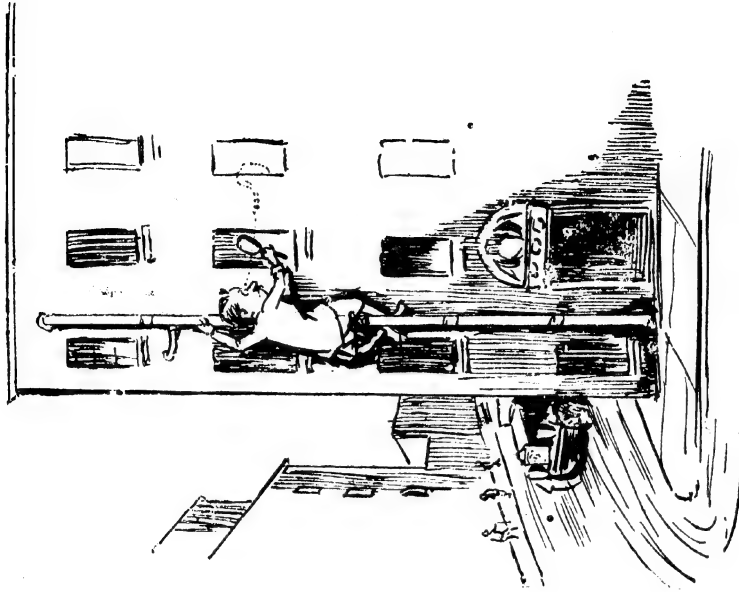
দেয়ালের গায়ে নল বহিয়া উঠিতে উঠিতে সূত্রানুসন্ধান...
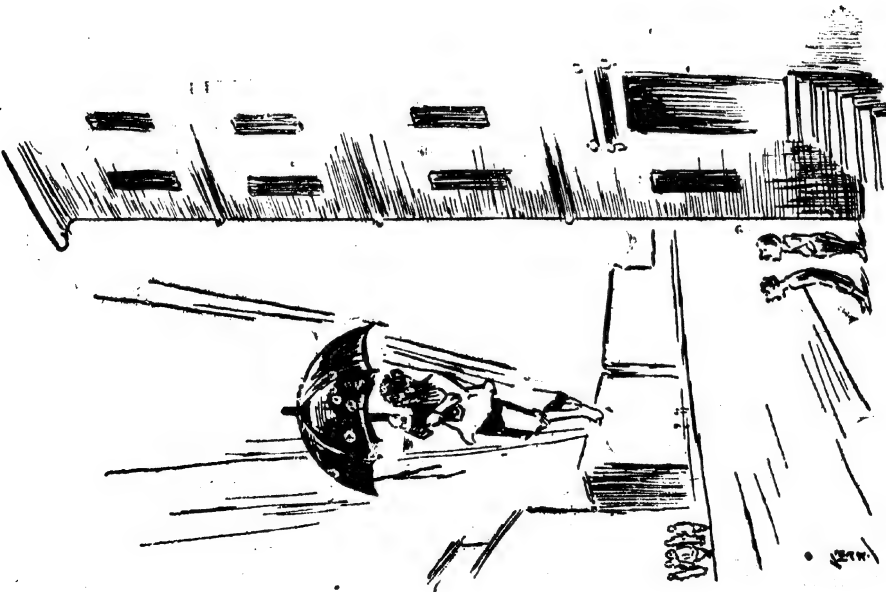
সু-উচ্চ সৌধচূড়া হইতে ছাতার সাহায্যে গোয়েন্দাপ্রবরের নিম্নে অবতরণ...

চিঠি

[গল্প]

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

'খুকু দিদিমণি চিঠি আছে',—দন্তহীন মুখে একমুখ হেসে গ্রামের বৃদ্ধ পিয়ন নবীসেথ দরজার দিকে এগিয়ে এলো।

গ্রাম্য পথের একপাশে ইঁট বের করা পুরানো ধরণের তৈরী তার চেয়ে পুরানো বাড়ী খানি। সুমুখের জমীতে বা পথের একটু নেবে দরজার সমুখের যায়গাতে একটী বছর পাঁচেকের ছোট মেয়ে আর দুটী তিনটী ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলা করছিল। তার পেছনে র'কে বসে তার ঠাকুর্দা একখানা দৈনিক কাগজ আর তামাক সেবন করছিলেন। দাদা বল্লেন 'দাহ্ দেখি কার চিঠি'? তারপর বল্লেন ভেতরে দিয়ে এস—

গাছ পোঁতা, বাগানকরা ফেলে মাটীমাখা হাতে খুকু চিঠি নিলে। সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাশের আড়াল দিয়ে একটী কমবয়সী মেয়ের মুখ দেখা দিল। খুকু পিছন ফিরে মাকে দেখেই অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে চিঠিখানা মাকে দিয়ে বল্লে—'বাবার চিঠি।'

মা অপ্রস্তুত ও আনন্দিত হয়ে সেখান থেকে চলে যায়।

বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী আর খুকু এবং স্বামী নিয়ে তার সংসার। শাশুড়ীর অন্য ছেলে নেই, মেয়ে শ্বশুর বাড়ী। স্বামী কলকাতার ক্যাম্বেলে পড়ে এইবার হলেই হয়। পরীক্ষা চল্‌ছে। তারপর আর দূরে থাকতে হবে না।

চিঠিতে রয়েছে সামনে ইদের ছুটী তার সঙ্গে আর একটা কি পরব আছে, আর রবিবার তাতে দিনসাতেক পাওয়া যাবে। সেটা কলকাতায় অপব্যয় করতে সুবোধের ইচ্ছা নেই। অতএব করবেও না—কিন্তু হঠাৎ যাবে শীগ্‌গীরই। আর এও সে জানে, লজ্জার মাথা খেয়ে ইদ্ কবে সেকথা বধূ শ্বশুর, শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করবেও না। অতএব কেমন মজা—ও গুছিয়ে এবং সেজে থাকতে পারবেনা।

মুসলমানী পর্ব্ব পাঁজিতে অবশ্য আছে—কিন্তু পাঁজির কথা—সেওতো শ্বশুরের ঘরে। পাড়াগাঁয়ে সবই যে বাইরে থাকে।

যাহোক ইদের কথা ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যাবেলাই সদর দরজায় যে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল সে সুবোধের। এবং হেরিকেনে সন্ধ্যা জালতে জালতে জননী বল্লেন—ওমা তুই—খবর দিসনি যে? ভাঁড়ারের প্রদীপ হাতে শাশুড়ীর পেছনে বধূর ঘোমটার ভেতর থেকে একটু খানি চোখ দেখা গেল।

যোগাড় কিছু বিশেষ না থাকলেও ছেলে এবং বাড়ীর লোকের জন্য লোকে ভাবেনা।—আর পল্লীগ্রামের রাত্রি কিছু বড়, কেননা রাত্রে লোকে বড় কাজ করতে ভালবাসেনা। আলোর অসুবিধা, লোকের অসুবিধা, সাপের ভয়—ইত্যাদি—সন্ধ্যার পরে সহরে যেমন রাত্রি অনেকক্ষণ অবধি বিস্তৃত—পাড়াগাঁয়ে সন্ধ্যার পরেই প্রায় গ্রামদেবতা বা গৃহদেবতার আরতি শীতলের পরই মানুষের নিশ্চিন্ত শয্যাগ্রহণ।

বধূ চিঠিখানি রাত্রে পড়বে বলে বালিসের তলায় রেখেছিল। ও চিঠির রস গ্রহণ তো তখনি সত্যিকারের যখন ও নিশ্চিন্ত হয়ে পড়বে আর ভাববে তার লেখকের কথা।

কিন্তু রান্নাঘরের কাজের ব্যস্ততায় সে শয্যা আবার পাতবার অবসর আর তার হয় নি। এবং সুবোধ এসে ওর বিছানাতেই শুয়ে ছিল, আর চিঠিও পেয়েছিল।

রাত্রি হ'ল। তারপর আর কি, বধূর লাগছিল ভালো তাই মুখ অত উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, আর সুবোধের ভাল লাগছিল তাকে দেখতে।

বধূ বল্লে—'জানো খুকুটা কি দুষ্টু হয়েছে? ও তোমার চিঠি হাতে নিয়েই বুঝতে পারে কেমন করে—তোমার চিঠি, অথচ জানো ও কিছু অক্ষর চেনে না।

সুবোধ বল্লে 'হুঁ।'

'আজকে বাবার সামনে মেয়ে এসে বল্লেন "তোমার চিঠি" লজ্জায় মরে যাই! আবার এমন পাজি। এমন বুদ্ধি যে আমার চিঠি আমাকে ছাড়া আর কারুকে দেবেনা :—সেদিন দত্তদের বৌ এসে বসেছিল, সেইযে সেবারে চিঠিতে তুমি গরমের পর গিয়ে যে মস্ত করে লিখলে তা তাকে কিছুতে দিলেনা।—আবার সে চায় বলে আপনি পিছনদিকে হাত নিয়ে লুকোয়!'

খুকির মা অনর্গল বকে যায়।

অসহিষ্ণু স্বামী খুকুর লীলা-ব্যাখ্যার রস ভঙ্গ করে—জিজ্ঞাস করে, সে কই? এখানে দেখছিনা।

মা বলে সে মায়ের কাছে—'ও-ঘরে মা বল্লেন দিতে।'

এবারে বাপ হাসে, বলে, 'ও আমি বলি তুমি দিয়ে এসেছ মা বলেন নি!'

'অপ্রস্তুত হয়ে ও বলে, 'যাও।'

আবার বলে—যেতে কি চায়—তোমার কাছে শোবে বলছিল। কিন্তু এমন বুদ্ধি যে, ঠাকুমা যেমন বল্লেন তোমার নাম করে তার ঘুম হবেনা, তুমি ভোরে বাইরে আসতে চাইবে, অমনি চুপ করল—

'তা' বুদ্ধি আছে দেখছি! জজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ হবে বোধ হচ্ছে!"

অন্ধকারে স্বামীর মুখ হাসিতে ভরে যায়;—বধূ দেখতে পায় না। গলার স্বরে সন্দেহ হয়—উঠে উঁচু হয়ে স্বামীর মুখ দেখে, তারপর অপ্রস্তুত হয়ে হাসে, বলে, 'ঠাট্টা করছ।'

এতক্ষণে তার খোকাবাবুর গল্প মনে পড়ল।

'না, ঠাট্টা কেন সত্যি! ভাবছি ওর মার বুদ্ধি তাহলে কেন এত কম! ওর বুদ্ধির পরিচয় তো মা রোজই পায়!' এবার দুজনেই হাসে। একজন অপ্রস্তুত হয়, অন্যজন আমোদ করে।

এবারে অন্য কথা। আবার জলপনা চলে কতরাত্রি ধরে। তারারা আস্তে আস্তে আকাশ পরিক্রম করে যায়। অন্ধকার ঘন হয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মারে। চাঁদ অস্ত গেছে।

ওরা গল্প করে, ভবিষ্য জীবন, উপার্জ্জন আর ব্যয়, মা, বাপ, বিরহ সান্নিধ্য এবং আরও কত কি। আর কথার দৌড় বেশী নেই ও ঘুরে ফিরে ঘরকন্না খুকু শাশুড়ী শ্বশুর এই আনে। ৪।৫ দিনের মাত্র ছুটি শেষ হতে দেরী হয়না। সুবোধ পাশ হয় চাকরী পায় কোন একটা আধাপাড়াগাঁ ও আধা সহরের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ছোট হাসপাতালে। যা মাইনে পায় পাঠায় তার কিছু। কায়ক্লেশে থাকে। স্বপ্ন দেখে ওরা আসবে। স্বপ্ন বাড়ে। কিন্তু মা বাপের দেশভিটে ছেড়ে আসার মত হয়না, আর সেইজন্যে নিরু আর খুকুও সেখানেই থাকে, কি করে আসবে! আগের ধ্যান করা ভবিষ্যৎ—নিঃসঞ্চয় অল্প আয়ে, বিরহে, তার মেসের মত জীবনে কাটে।

শুধু চিঠিগুলি সঞ্চয়ের খাতে সঞ্চিত হয়।—

অসময়ে হলদে চিঠি এলো। খুকু খেলা করছিল—ঠাকুদ্দা ঘুমুচ্ছিলেন। পিয়নদাদা এসে চিঠি দিয়ে জাগায়ে বলে, 'বাবু, সই করে দিন।' সে তেমন হাসেনা, একটু ভয়ে ভয়ে উৎসুক ভাবে দাঁড়ায়। খবর তো ভালোও থাকে।

দাদা সই করেন। চঞ্চল হাতে খোলেন। হলদে খামখানার ভেতরে গোলাপী কাগজ খুকু হাসি মুখে দেখে। দাদার পড়া হলে হয়, নিয়ে যাবে ছুটে মার কাছে দেখাতে।

ভয়ে ভয়ে পিয়ন জিজ্ঞাসা করে কি খবর বাবু মাইনে বেড়েছে খোকাবাবুর? কর্ত্তার বিবর্ণ মুখে শুকনো ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে, বলেন 'না, ওর অসুখ করেছে—যেতে লিখছে।'

কত বছর তার পর গেছে—বেশ করে নববধূর মত আঙিনায় ঘরে সব মাটী মাড়িয়ে পা ফেলে। যেন পা চলে না। আর চিঠিও আসে। শুধু নবীসেখ হাসিমুখে খুকু দিদি বলে আর ডাকেনা চুপচাপ চিঠি দিয়ে যায়—খুকু অবশ্য হাসিমুখে ডাকত 'ও পিয়ন দাদা আমাদের চিঠি, মার চিঠি? আর বাবার চিঠিও বলত, কি ভেবে এখন আর বলেনা।

আর চিঠি থাকলে আনন্দিত ভাবে নিয়ে যায়—মাকে আনন্দ দেবে ভাবে। কিন্তু মা আর হাসিমুখে নেয় না, বা তখুনি খুলে পড়েনা, কিম্বা ঘরে নিয়ে যায় না।

আরও বছর কতক গেল। খুকুর নাম হয়েছে সবিতা বয়স ১৫ হলো। বিয়ে হয়ে গেছে খুকুর এই ফাল্গুনে।

বৈশাখের দুপুর বেলা। ঠাকুমা ঘরে, শুয়ে থাকেন, খুব বুড়ো হয়েছেন। দাদাও বসে বসে কাগজ পড়েন কখনো বা ঘুমান।

বধূ বসে তেঁতুল কোটে। তার ঘুম আসেনা।

জানলার সামনের পথে চাষী কৃষাণদের বোয়েরা ভাত নিয়ে যায় কেউ কেউ। সরু পথের ওপারে বাঁশ ঝাড়ে সুপুরী তাল নারিকেল গাছের ঘেরা ওদেরই পুকুর। এধারে ওধারে চাঁপা করবী শিউলী ওগুলো সুবোধের পোঁতা। বড় চাঁপা ফুটেছে, গোটাকতক উঁচুতে মগডালে। এখনো মহাদেবের মাথায় দেবার মত নিচে ফোটেনি। কিন্তু ঐ কটীরই গন্ধে পুকুর পাড়ের রোদ্দুর আর দুপুর যেন অলস মাতাল করে তুলেছে। ওধারে প্রকাণ্ড কাঁঠাল গাছে ঘুঘু আর ডাক পাখীর ডাক তার সঙ্গে মিলে আরও যেন কি একটা অবসাদ ছড়িয়ে দিয়েছে।

পুকুরের ওপারে আম-গাছ তলায় গোটা কতক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আম পাড়ছে। বধূ তেঁতুল কোটে ওদের দেখতে পায় ওদের যেতে বলতে ইচ্ছে হয় না। কত আর নষ্ট করবে—করলেই বা কি! কে বা খাচ্ছে? খুকুকে তো ওরা নিয়েই যাবে ওমাসে। আর—আর ওর চোখ উদাস হয়ে যায়। সুবোধের পোঁতা গাছের ফুলের গন্ধ ওকে আজ অনেক দিনের পর—হয়ত প্রতি বছরই করে—ওর মনে হচ্ছে এবারই যেন অভিভূত করে তুলেছে। আপনিই অভ্যাসমতই যেন চোখ ভরে আসে।

হঠাৎ চোখ পড়ল দরজার বাইরের দিকে লাল সাড়ী পরা কে। ও চেয়ে থাকে। একটু পরে দেখলে বাগানের পথেই নবীসেখ আসে হাসিমুখে।

শোনা যায় 'খুকু দিদিমণির চিঠি চাই?'

সবিতা লাল হয়ে উঠে চিঠি নেয়। লালসাড়ী পরা সবিতা লজ্জা আর রৌদ্রে রাঙামুখে ভেতরে ঢোকে।

মার মুখেও হাসি খেলে যায়। জামাইয়ের চিঠি। ছেলেটী যেন, বড় ভালো খুব ছেলে মানুষ। বেশ মিষ্টি কথা, সবিতার যেন ওকে খুব ভাল লেগেছে। আর তার? মনে হয় যেন ভালোই।

মা এবারে তেঁতুল কোটা তুলবেন ভাবেন, অনেক রয়েছে। হবে'খন আর একদিন। কিন্তু কি করবেন?

অদেখা চাঁপার গন্ধ তেমনি আসে, গাছের আড়ালে লুকোনো ঘুঘুর ডাকও কানে আসে, মা অন্য মনে চেয়ে থাকেন। পৃথিবী যেন নির্ম্মম রৌদ্রে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

মেয়ে রাঙামুখে হাসি ফুটিয়ে আসে ঘরে, অপ্রস্তুত ভাবে এদিক ওদিক ঘোরে। মাকে বলে, 'শোওনি মা?'

মা বলেন, 'না, তেঁতুল কুটছিলাম'। মেয়ে কাঁইবিচি নিয়ে খেলা করে। মা ওর সহাস স্বচ্ছ অথচ লজ্জিত মুখের দিকে চান জিজ্ঞাসু ভাবে।

এবার সে বলে 'মা তোমার কাছে খাম আছে?'

মা হাসেন না—কিন্তু ওর মনে হয় হাসছেন, বলেন 'ওই কাঠের বাক্সে আছে নিগে'—

আর দাঁড়ায় না মেয়ে।

মৃদুহাস্যে মা ওর চলে যাওয়ার দিক দেখেন যেন গতিতে আনন্দ উচ্ছল। শাশুড়ী উঠে আসেন, 'বৌমা কি করছ গা?'

তেঁতুল কাটছি মা—'বৌ উত্তর দেন।

'এই গরম বাছা, শুলে না একটু? খুকি কোথা?'

মা বলেন, 'কি জানি চিঠিপত্র কি এলো বুঝি'

বৃদ্ধার কুঞ্চিত মুখে প্রসন্নতা ভরে ওঠে।

বধূর মুখে চান, তাঁর মনে হয় যেন, তার মুখেও বিমর্ষতার মেঘ পাতলা হয়ে গেছে। বৃদ্ধা গল্প করতে বসেন। দুজনের মনের খোঁচার বেদনার জায়গা বাদ দিয়ে আর সব কথাই হয়।

•

মেয়ে শ্বশুর বাড়ী গেছে।

মার তেঁতুল ফুরোয় নি। আরো কাটছেন। আবার মাঝে ঘর বসতের অন্য কাজ পড়েছিল।

অনেকদিনের পর এবারে মা দাঁড়ান দরজার কাছে। বৃদ্ধ নবী সেখ চিঠি নিয়ে আসে—তেমনি আছে ঠিক, আর তাকে উনি লজ্জা করেন না। সেও আর তাঁকে সঙ্কোচ করে না। অনেক কাল পর সুখের ইতিহাসও সে বয়ে এনেছিল, আবার চরম বেদনার দুঃখেরও বার্ত্তাবহ সেই। এতদিনে তার সঙ্কোচ কেটেছে খুকুর চিঠি নিয়ে সে এলো। সেই তরুণী বধূর মুখের বিলুপ্ত হাসি পরিণত বয়স্কা জননীর মুখে পরিমিত ভাবে ফুটে ওঠে।

তারপর মা রোজই দাঁড়ান। মনে হয় চিঠি আসবে। রোজই মনে হয়—আস্তে আস্তে পক্ষান্ত হয়ে যায়।

সেই কবে একখানি চিঠি দিয়েছে খুকু! মার মন দুর্ভাবনায় ভরে ওঠে। দুঃখ হয়, অভিমান হয়।

খুকুর চিঠি আসে, ছোট্ট সংক্ষিপ্ত, বড় ব্যস্ত যেন। চণ্ডীর পুঁথির মত তাকে সযত্নে রাখেন, কিন্তু পড়তে গেলে মনে হয়, খুকু যেন ভুলে গেছে।

কেবলি মনে হয় একটি কথা কি করে ভুলে গেল?

—চিঠিখানির জবাব দিতে নিয়ে বসেন রোজই, কেবল মনে দুঃখ হয়, জবাব লেখা আর হয় না। পাশে দোয়াত কলম কাগজ পড়ে থাকে মা ঘুমিয়ে পড়েন অবসাদে শ্রান্ত হয়ে।

স্বপন দেখেন, তার স্বামী এসেছেন ফিরে। উনি আনন্দিত হয়ে গেছেন ঘরে। সেখানে দেখেন একটী তরুণী মেয়ে আর ছোট ছোট কটী ছেলেমেয়ে রয়েছে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন। পরিচয় পেয়ে স্বামীর মুখের দিকে চান। তিনি অপ্রস্তত হয়ে কি বলেন, ও আর দাঁড়ায় না।

তার ঘুম ভেঙে যায়।

—হাসিও পায় না, দুঃখও হয় না। কি রকম একটা অবসাদ মনকে ঘিরে থাকে। সবাই ভোলে? স্বপন মনে হয় না তাঁর। মনে হয় ওটা ইঙ্গিত, সত্য, সত্যের দিকে দেখানো সঙ্কেত। অন্য মনে ভাবেন।

কিন্তু চিঠির জবাব আজ দিতে হবে। ক'দিন হ'ল এসেছে।

মনে ভরে ওঠে হাজার কথা, অনেক নাম, অনেক আদর।

লিখতে বসেন। কি লিখবেন, 'প্রাণাধিকাষু' না 'সাবিত্রী সমতুল্যেষু? কি ভাবেন, লেখেন, সাবিত্রী সমতুল্যেষু—খুকু মা'—

কি লিখবেন 'খুকু'? না ওর নাম? কিন্তু ওর নাম কি একটী?

তা হলে ওই, 'সাবিত্রী সমতুল্যেষু মা খুকু—তোমার চিঠি পেলাম।

তারপর? আর কি লিখবেন? তাঁর মন কেমন করে—সে কথা লিখবেন?

না,—লিখবেন না। ওরতো মন কেমন করে না!

লিখবেন না, লিখবেন না তাই। তবে কি লিখবেন? তাইতো, তবে কি?

চিঠি লেখা শেষ হয় না। মার চোখ জলে ভরে যায়।

কাগজের পাতায় টপ টপ করে দু'ফোঁটা জল পড়ে। মনে হয় ষাট, ষাট। আহা ওরা ভাল থাক্। অন্য কাগজ নিয়ে আবার আরম্ভ করেন, 'সাবিত্রী সমতুল্যেষু খুকু মা'—

তারপর কি?' চিঠি লেখা শেষ হয় না। তার চেয়ে তেঁতুল কোটা শেষ হোক।
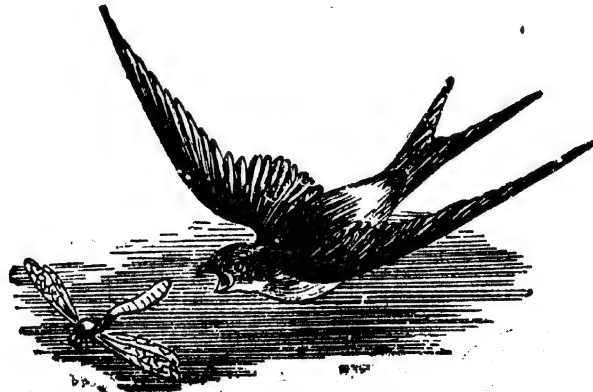
শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি কথা

শ্রীশামসুন নাহার মাহমুদা

আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কিরূপ ভয়াবহ, তা আর কাউকে নূতন করে বলে দিতে হবেনা। যে শিশু এই দুঃখজরা পূর্ণ পৃথিবীতে বহন করে আনে নতুন আশার বাণী—যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পিতামাতার লক্ষ সুখস্বপ্ন, দুদিন পরেই সে দুনিয়ার দেনা পওনা মিটিয়ে চলে যায়, রেখে যায় শুধু নিরশা আর হতাশ্বাস্। ভারতের ঘরে ঘরে নিত্যই এমন হচ্ছে। এমনিকরে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হচ্ছে দিনে দিনে তিল তিল করে আমাদের দেশের আশা জাতির ভবিষ্যত। শুধু এদেশে কেন, এমন এক সময় ছিল যখন সুসভ্য ইউরোপের ও শিশু মৃত্যুর সংখ্যা দেখলে স্তম্ভিত হতে হতো। এদেশের মতো ইউরোপেও অসংখ্য শিশু এক বৎসর পূর্ণ হবার আগেই মৃত্যুর দ্বারে এসে পৌছাতো। কিন্তু ইউরোপের সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। জাতির বংশের গতিরোধ করবার জন্য ইউরোপের শ্রেষ্ট মনীষীরা দিনের পর দিন চিন্তা করেছেন। ফলে প্রতি বৎসর শত শত শিশু মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পাচ্ছে। আমাদের ও এখন সময় এসেছে চিন্তা করবার—যাতে করে আমাদের ফুলের কলির মত শিশুরা ফুটবার আগেই ঝরে না পড়ে তার উপায় নির্দ্ধারণ করতে হবে। শুধু অকাল মৃত্যুর হাত থেকেই রক্ষা করলে চলবেনা। তারা যেন দেহে মনে সুস্থ, সবল ও বলিষ্ট হয়ে ওঠে সহস্র ঘাত প্রতি ঘাতের সঙ্গে লড়াই করে জীবনে যুদ্ধে জয়ী হতে পারে, নিজের দেশকে সুন্দর ও জাতিকে বড় করে তুলতে পারে এমনি ভাবে তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে। ইউরোপীয় মনীষীরা এবিষয় কি ভাবে চিন্তা করেছেন ও কি অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা আমাদের বিশেষ প্রণিধান যোগ্য, অবশ্য তাঁদের সকলেই যে একভাবে চিন্তা করেছেন তা নয়। নানাজন প্রশ্নের নানাদিক থেকে আলোচনা করেছেন এবং সমাধানের চেষ্টা ও করেছেন বিভিন্ন ভাবে। অমরা তার মধ্যে শুধু কয়েকটী কথাই এই প্রবন্ধে বলতে চেষ্টা করব।

শিশু পালন সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই সকলের আগে দুটো বিষয় আলোচনা করতে হয়,—শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা আর চরিত্র গঠন। স্বাস্থ্য এবং চরিত্র দুটোই মানুষের জীবনে খুব দরকারী জিনিষ, আবার দুটোই এমন ওতপ্রোত ভাবে সম্পর্কিত যে দুটোকে মোটেই আলাদা করে দেখা যায় না। একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, শিশুর আহার। সকল শিক্ষিতা জননীই আজকাল জানেন যে শিশুকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত ভাবে খেতে দিতে হবে। নিরূপিত সময়ের বাইরে শিশু কাঁদলে ও তার আহারের জন্য মাতা ব্যস্ত হবেন না। কারণ তাতে তার পরিপাকের বিষম অসুবিধা হবার আশঙ্কা। এইত গেল শারীরিক ক্ষতির কথা, তারপরে আরও একটা কথা আছে, যেটা স্বাস্থ্যের চেয়ে কিছু কম দরকারী নয়। সেটা হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা (Moral education) শিশু কাঁদলেই যদি খাবার পায় তাহলে কালে সে স্বার্থ সিদ্ধির একটা অব্যর্থ অস্ত্র বলে জেনে নেবে। শুধু শৈশব জীবন বলে নয়, পরবর্ত্তী কালেও যখন তখন অন্যায় আব্দার করে অভিযোগ করে কাজ আদায়ের চেষ্টা করবে। কাজেই শুধু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নয়—অকারণ অতৃপ্তিও অসন্তোষ যেন শিশুর মজ্জাগত না হয়ে যায় এই জন্যও শিশুকে কান্নার সঙ্গে সঙ্গেই খেতে দিতে নেই—আধুনিক বিজ্ঞান এই বলছে। কাজেই দেখতে পাচ্ছি আমাদের শিশুশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া চাই স্বাস্থ্য এবং চরিত্র দুটোই। শিশুর দেহ সবল, স্বাস্থ্যবান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রও দৃঢ়, বলিষ্ঠহোক—এই আমাদের সাধনা হওয়া উচিত। এই প্রবন্ধেও আমরা এই দুই বিষয়েই আলোচনা করব।

ঠিক জন্মের মুহূর্ত্ত থেকেই শিশুর প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ

হওয়া উচিত, একথা আগে মানুষের ধারণাতেই আসত না। যুগে যুগে সকল পিতা মাতাই নবজাত শিশুকে শুধু রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং ভাল বেসেই তৃপ্তি পেয়েছেন। অন্ততঃ কথা বলতে শিখবার আগে যে শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত হওয়া দরকার, একথা কেউ ভাবেননি। এখনো পর্য্যন্ত অনেকে ভাবতে পারেন না, ঠিক জন্মের সময় থেকে আরম্ভ করে এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং পিতা মাতার হাবভাব আচার ব্যবহার থেকে শিশু সকলের অজ্ঞাতে তিলে তিলে যে শিক্ষা আহরণ করে, ভবিষ্যত জীবনে তার মূল্য কত বেশী। কিন্তু বিজ্ঞানের চোখে এই সূক্ষ্ম সত্য ধরা পড়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে,—শুধু জন্মের পর থেকেই নয়, মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেও সন্তানের দেহ মনের সুস্থতা এবং চরিত্র গঠনের জন্যে জননীকে অনেকখানি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মায়ের এই সময়কার প্রত্যেকটী কাজ ও প্রত্যেকটী চিন্তার প্রভাব সন্তানের উপর তিলে তিলে সঞ্চারিত হয়

শিশু যখন প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তার অভ্যাস (Habit) বলে একটা জিনিষ মোটেই থাকে না। যা থাকে সেটুকু তার স্বভাব-জাত বুদ্ধি—ইরাজীতে যাকে বলে Instinct মাতৃগর্ভে আট দশমাস থেকে যেসব অভ্যাস তার তৈরী হয়েছিল, বাইরের জগতে সেসব একেবারেই অচল। কাজেই এই রূপ-রস-গন্ধ-ভরা পৃথিবীর আলো-বাতাসের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হবার পর প্রত্যেকটী ব্যাপার তার কাছে একেবারে অদ্ভুত, বিসদৃশ ঠেকে। নতুন জীবনে, নতুন আবহাওয়ায় প্রত্যেকটী জিনিষ তাকে নতুন করে শিখতে হয়। এমন কি অনেক সময় দেখা গেছে শিশু শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের প্রণালীও অনেক কষ্টে শেখে। এক মাত্র মাতৃ দুগ্ধ পান ছাড়া জাগ্রত অবস্থায় শিশু আর কিছুতেই আরাম পায় না এই বিশ্রী অসোয়াস্তির ভাব থেকে বাঁচবার জন্যেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বেশীর ভাগ সময় সে ঘুমিয়ে কাটায়, ক্রমে সপ্তা দুয়েকের মধ্যে এই অস্বস্তির ভাবটা কেটে আসে; এই নতুন জীবন-যাত্রার সঙ্গে সে পরিচিত হয়ে ওঠে। চৌদ্দ পনর দিনের অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ অভ্যাসে পরিণত হতে থাকে। এই সময় থেকে আরম্ভ করে এক বছর পর্য্যন্ত শিশু কোন কিছুতেই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হয়ে যায়। শুধু যে দ্রুত অভ্যস্তই হয় তা নয়; প্রথম বৎসরের অভ্যাস ও শিক্ষা শিশুর মনে একেবারে শিকড় গেড়ে বসে যায়, শিশু যে স্বভাব-জাত বুদ্ধি বা Instinct নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে, ঠিক তারই মত এই সময়কার অভ্যাস গুলো একেবারে রক্তমাংসে মিশ্রিত হয়ে যায়। মানুষ চিরদিনই অভ্যাসের দাস। কিন্তু অতি শৈশবের অভ্যাসের মত পরবর্ত্তী জীবনের অভ্যাসের মূল কখনো এত দৃঢ় হয় না। এই সময়ে যেসব অভ্যাস হয়, এর পরে তা বদলানো অনেক সময় অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়, কাজেই এই সময়কার শিক্ষা যেন সুশিক্ষা হয় এবং এমন ভাবে যেন শিশু না গড়ে ওঠে যার জন্যে ভবিষ্যত জীবনে অসুবিধা ভোগ করতে হবে, এ বিষয়ে পিতামাতা বিশেষ সতর্ক হবেন। বাস্তবিকই ঠিক জন্মের মুহূর্ত্ত থেকেই শিশুর নৈতিক শিক্ষা আরম্ভ হওয়া খুবই দরকর, যে কাজ বড়োরা করলে একান্ত অশোভন ও আপত্তি জনক ঠেকে, শিশুরা যদি তা করে পিতামাতার স্নেহের চোখে তার দোষ নিশ্চয়ই ততটা ধরা পড়ে না, কিন্তু এটা মস্ত বড় ভুল। সন্তান শিশু হলেও সে একেবারে নির্ব্বোধ নয়। তার বুদ্ধি সীমাবদ্ধ। কিন্তু যেটুকুই সে বোঝে তার মধ্যে আর কোন ফাঁকি থাকে না, মোটের ওপর তার বুদ্ধির সীমা যতদূর চলে, তার ভেতরে সে বুড়োদের চেয়ে কোন অংশে কম চালাক নয়—তার সঙ্গে ব্যবহারে একথা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে। অবশ্য বুড়োদের সঙ্গে এক বৎসরের শিশুর কার্য্যকলাপের তুলনা করাই অন্যায়। কিন্তু তবুও বড় হলে সন্তানের পক্ষে যে কাজ আপত্তিজনক হবে, সেকাজে একান্ত শৈশবেও তাকে যতদূর সম্ভব প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো।

সাধারণতঃ শিশু যখন ছোট থাকে তখন তার নৈতিক শিক্ষার কথা আমরা একেবারেই ভুলে থাকি; শুধু আদর সোহাগ আর স্নেহ-মমতায় তা'কে আচ্ছন্ন করে রাখবার চেষ্টা করি। তার পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ এক দিন আমরা এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠি এবং তার সঙ্গে আমাদের আচার ব্যবহারে সেদিন থেকে পুরোপুরি কঠোর হয়ে উঠতে চেষ্টা করি। শিশুর জীবনে কিন্তু এটা একটা

বড় দারুণ হতাশার মুহূর্ত্ত। জন্মের পর থেকে যে শিশু কোন কাজেই বাধা পায়নি, সে একেবারে হঠাৎ বাধা নিষেধের কড়াকাড়ির মধ্যে পড়ে বিষম হাঁপিয়ে ওঠে। যে দুনিয়া এত দিন ছিল মাধুর্য্যে মধুর করুণায় মেদুর হঠাৎ তা হয়ে ওঠে একেবারে কঠোর, কর্কশ। এই নিদারুণ হতাশ থেকে শিশুকে বাঁচাতে হলে তার সঙ্গে আমাদের ব্যবহারে জন্মের মুহূর্ত্ত থেকে আরম্ভ করে আগাগোড়াই মিল রেখে চলতে হবে। বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশের আগেও তার নৈতিক শিক্ষার দিকটাকে অবহেলা করলে কোন মতেই চলবে না।

সময়ানুবর্ত্তিতা শিশুর জীবনে খুবই দরকার। আহার, নিদ্রা, স্নান, বাহ্য প্রত্যেকটী ব্যাপারে তাকে প্রথম থেকেই নিয়মানুবর্ত্তী করে তোলা চাই, প্রতিদিন একই সময়ে শিশু যেন একই জিনিষ প্রত্যাশা করতে শেখে। স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা মঙ্গলজনক আবার নৈতিক শিক্ষার দিক দিয়েও এতে অনেক লাভ হয়।

জন্মের পরে কিছুদিন শিশুকে স্থানান্তরিত না করাই ভালো। একই আবহাওয়া, একই পারিপার্শিকতার মধ্যে সে যেন অন্ততঃ প্রথম বৎসরটা কাটাতে পায়। মর্ত্ত্যের মাটিতে নূতন জীবন যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হতে তার কিছু সময় লাগে, একথা বলেছি। এই সময়ে এক জায়গায় থাকতে পেলে এই পরিচয়টা স্বাভাবিক গতিতে ক্রমে নিবিড় হয়ে উঠবার সুযোগ পায়। কিন্তু স্থান হতে স্থানান্তরে যদি তাকে নিয়ে যাওয়া হয়—তাহলে অত পরিবর্ত্তনের তাল সমলানো তার পক্ষে সহজ হয়না, অত নতুন জিনিষের সঙ্গে পরিচয় করতে গিয়ে তার কোমল মস্তিষ্ক সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই বয়সে নূতনত্বের প্রতি শিশুর শুধুই যে বিতৃষ্ণা থাকে তা নয়; প্রত্যেকটী নতুন জিনিষকে সে ভয় মিশ্রিত সন্দেহের চোখে দেখে। অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত মানুষের মধ্যে সে কিছুতেই নিজকে নিরাপদ মনে ভাবতে পারেনা। একটা আশঙ্কার ভাব তার লেগেই থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই বুদ্ধির বিকাশ হয় ও পৃথিবীটাকে জানবার বুঝবার আগ্রহ বাড়তে থাকে, ততই তার এই স্বাভাবিক ভীরুতা কমে আসে। ক্রমেই সে পারিপার্শিক জগতের প্রত্যেকটী জিনিষের সঙ্গে শীগগীর পরিচয় করে নিতে ব্যাকুল হয়—আর তাই করতে গিয়ে অনেক সময় দুঃসাহসিকতারও পরিচয় দেয়। কিন্তু স্বভাবতঃ দুর্ব্বল বলে জন্মের অব্যবহিত পরে অন্ততঃ একবৎসর কাল দিন দিন জীবনে কোন পরিবর্ত্তন না হলেই সে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। এতে তার মনের স্বাভাবিক শান্তি, আনন্দ আর সন্তোষ অক্ষুন্ন থাকবার সুযোগ পায়।

শিশুকে প্রথম থেকেই আত্মনির্ভরশীল করে তোলবার চেষ্টা করা উচিত। সে যেন তার নিজের ইচ্ছামত মনের আনন্দে খেলা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে—এই-জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ সময় ও স্বাধীনতা দিতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় পরিজনবর্গের আদর সোহাগে শিশু এত বেশী ব্যতিব্যস্ত থাকে যে তার নিজের কিছু করবার আছে একথা অনুভব করবারই অবসর পায়না, বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে কেউ না কেউ অনবরত শিশুকে কোলে নেওয়া, ঘুম পাড়ানো, গান শোনানো বা দোলা দেওয়া মোটেই ভাল নয়। শুধু যে এতে তার দেহের অবাধ রক্ত সঞ্চালনেরই প্রতিবন্ধকতা হয় তা নয়—সে একেবারে অসহায়, নির্জীব, পরমুখাপেক্ষী হয়ে ওঠে। সন্তান গঠনের সময় প্রত্যেকটী ব্যাপারে শিক্ষাদাতার দৃষ্টিকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত রাখতে হবে। এখানেও তিনি ভুলবেন না যে শৈশবের শিক্ষা শুধু শৈশবেই সীমাবদ্ধ থাকবেনা। শৈশবের অভ্যাস ভবিষ্যত জীবনেও সন্তানকে পর নির্ভরশীলই করে রাখবে।

শিশুর সুখ শান্তিবিধানের জন্য পিতামাতা কখনো উদাসীন হবেননা বরং তার সকল অসুবিধা দূর করে কেমন করে তাকে আরাম দেওয়া যায় এই চিন্তায় রাত্রের সুপ্তি ও দিনের বিরামকে নির্ব্বাসিত করবেন, এ অতি স্বাভাবিক। কিন্তু এইখানে বলে রাখা ভালো যে সন্তানের আরামের জন্য তাঁদের ব্যগ্রতা যেন কোনমতেই সীমা ছাড়িয়ে না যায়—অন্ততঃ শিশু যেন তা ঘুণাক্ষরে ও টের পেতে না পাবে। শিশুর প্রতি ঔদাসীন্য ও অতি মনোযোগ এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন হচ্ছে শিশু শিক্ষার ব্যাপারে একটা খুব বড় জিনিষ। শিশুর মঙ্গলের জন্য, শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যতখানি দরকার পিতা মাতা

সবই করবেন ; তবে সেই সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আদর বা সহানুভূতির ভাব কখনো প্রকাশ করবেন না। নবাগত ক্ষুদ্র শিশু অল্পদিনেই তাঁদের হৃদয়ের কতখানি অধিকার করেছে—তাঁদের স্নেহের চোখে তার স্থান কত উচ্চে, একথা যেন সে কখনো অনুভব করতে না পারে। কারণ তাতে সে নিজেকে খুব বড় মনে করবার সুযোগ পায়। এই Self importance এর ভাবটা শিশুদের পক্ষে খুবই খারাপ।

দু তিন মাসের সময় শিশু হাসতে শেখে ; সেই সঙ্গে বস্তু এবং ব্যক্তির পার্থক্য ও বুঝতে আরম্ভ করে। এর আগে দুধের বোতলের (Feeding bottle) জন্যে যতটা মমত্ব বোধ ও আকর্ষণ থাকে মায়ের জন্যে তার চেয়ে বেশী থাকেনা। এই বয়সে মায়ের সঙ্গে তার নিজের সম্পর্ক সে প্রথম নিবিড় ভাবে অনুভব করে। মাতাকে দেখে অস্ফুট স্বরে আনন্দ প্রকাশ ও এই সময় থেকেই সুরু হয়। এর পরেই প্রশংসা আর তিরস্কার বুঝবার শক্তি হয়—সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসা পাবার জন্যে একটা আগ্রহ ও জন্মায়। দেখা গেছে পাঁচ মাসের শিশু টেবিলের উপর থেকে একটা ভারী জিনিষ তুলতে পেরে বিজয় গর্ব্বে চারদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে :—যেন তার এই সাফল্যটাকে অন্যরা কি ভাবে গ্রহণ করল তা বুঝবার জন্যে তার বড় আগ্রহ। যে মুহূর্ত্তে শিশুর এই বোধশক্তি জন্মায়, সেই মুহূর্ত্ত থেকে শিক্ষাদাতার হাতে আর একটা নতুন অস্ত্র এল শিশুমনের ওপর যার ক্ষমতা অতি অসাধারণ। কিন্তু এর প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁকে খুব সাবধান হতে হবে—যেন কোনো ক্রমেই অপব্যবহার না হয়। প্রথম বৎসরে শিশু তিরস্কারের তিক্ত আস্বাদ যেন মোটেই না পায়। তার পরেও যত কম তিরস্কার করে পারা যায় ততই ভালো। তিরস্কারের মত প্রশংসা অতটা ক্ষতিকর নয়। শিশু এক একটী নতুন কথা উচ্চারণ করতে শিখলে বা চলি চলি পা-পা, করে হাঁটতে আরম্ভ করলে কোন পিতা মাতাই প্রশংসা না করে পারেন না, বাধা বিঘ্ন জয় করে শিশু কোন কিছু একটা করতে পারলে তার প্রাপ্য প্রশংসা থেকে তাকে বঞ্চিত করা উচিত ও নয়। শিশুকে বুঝতে দেওয়া চাই যে তার শিখবার আগ্রহ ও চেষ্টার সঙ্গে পিতামাতার সহানুভূতি আছে। তবে প্রশংসা জিনিষটাও বেশী সস্তা হলে শেষটায় শিশুর কাছে তার কোন মূল্যই থাকেনা একথাও মনে রাখতে হবে।

প্রথম বৎসরে শিশুর বুঝবার শেখবার ইচ্ছা আর আগ্রহ বড়দের চেয়ে অনেক বেশী থাকে, পিতামাতা যদি সুযোগ সৃষ্টি করে দেন সে নিজের চেষ্টাতেই শিখে নেবে। তাকে হামাগুরি দিতে হাঁটতে বা কথা বলতে শেখাবার দরকার হয়না। অনেকে চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি বুলি শেখাতে চান ; কিন্তু এ ভুল। আমাদের নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে সে এসব নিত্যই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। বাকীটুকু স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তার নিজের চেষ্টাতেই হবে। কিছু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে যদি সে কোনো কিছু একটা শিখ্‌তে পায়—তবে সেই সাফল্য তাকে আরো শিখবার আগ্রহ আর উৎসাহ এনে দেয় ; আর সেই প্রেরণার জোরে সে সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়ে চলে। শুধু শিশু জীবনে কেন, বড়দের সম্পর্কেও একথা খুবই খাটে। জন্ম থেকে মৃত্যুপর্যন্ত সকল মানুষের জীবনেই এটা একটা অতি বড় সত্যি কথা। কাজেই নিজের চেষ্টাতে সাফল্য লাভ করবার আনন্দ থেকে যেন শিশু বঞ্চিত না হয়। তবে এমন কোন কঠিন কাজেও তাকে প্রবৃত্ত করা উচিত নয়—যা তার ক্ষুদ্রশক্তিতে একেবারেই অসম্ভব। কারণ সেক্ষেত্রে অক্ষমতার গ্লানি তার সমস্ত উৎসাহকে ম্লান করে দেবে। এখানে একথাও মনে রাখতে হবে যে একেবারে অতি সামান্য চেষ্টায় যদি কিছু করা যায় তবে সাফল্যের যে আনন্দ ও গৌরব তার আস্বাদ শিশু পাবে না। তার শক্তির পরিমাণ কিছুটা চেষ্টা করলেই যে কাজ করা যাবে তাতেই তাকে উৎসাহিত করা উচিত। ধরুন একটা ঝুমঝুমি বাজানো বয়োজ্যেষ্ঠ যদি একবার দেখিয়ে দিয়ে তার শিখবার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলেন, শিশু নিজের চোখেতেই তা শিখে নিয়ে একটা তৃপ্তি অনুভব করতে পারে।

আহার, নিদ্রা প্রভৃতি কাজ যেন শিশু নিজের প্রয়োজন বোধে করতে শেখে, তার চেষ্টা করা উচিত। তাকে কোন কাজে জোর করে বাধ্য না করে শুধু

এমন সুযোগ ও অবস্থা তৈরী করে দেওয়া চাই যাতে সে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়েই তা করতে পারে external Discipline জিনিষটা মোটেই ভাল নয়। Internal self disciplineই হচ্ছে আধুনিক শিশু শিক্ষার গোড়ার কথা। এই জিনিষটা শিশুকে প্রথম বৎসরেই যতটা সম্ভব শেখানো দরকার। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। অনেক মাতা শিশুকে দোল দিয়ে, গান গেয়ে অনেক আয়োজন করে ঘুম পাড়াবার বন্দোবস্ত করেন। এ অভ্যাস ভাল নয়। ঠিক সময়ে স্নানাহার শেষ করিয়ে নিরিবিলি শিশুকে বিশ্রাম করবার সুযোগ দিলে তার আপনিই ঘুমিয়ে পড়া উচিত। এভাবে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঘুমাবার অভ্যাস হলে শিশু পরিপূর্ণ শান্তিতে অনেক বেশী ঘুমাবে। আহার নিদ্রা ইত্যাদি ব্যাপারে বেশী তোষামদের ভাব দেখালে শিশু ক্রমেই আরোবেশী খোসামোদ দাবী করতে শেখে। ঠিক সময়ে ঘুমিয়ে সে মাতাকে নেহাৎ অনুগ্রহ করল' অথবা তাঁকে স্রেফ সন্তুষ্ট করবার জন্যই দুধ খেল এমন ভাব জন্মাতে না দেওয়াই ভালো। প্রথম বৎসরে শিশুর এই বোধশক্তি থাকেনা একথা মনেকরা বিষম ভুল। আর জ্ঞানবুদ্ধি অস্ফুট, শক্তি কম। তা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে বুড়োদের চেয়ে সে কোন অংশে কম চালাক নয়, একথা আর একবার বলেছি। প্রথম বৎসরে তার শিক্ষা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলে। এত অল্প কালের মধ্যে এত বেশী শিক্ষা জীবনের আর কোন সময়ই হয়না। নবজাত শিশুর বুদ্ধি অতি প্রখর। না হলে এটা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতনা।

মোটের ওপর ক্ষুদ্রতম শিশুর সঙ্গে ও আচার ব্যবহারে অত্যন্ত সাবধান হতে হবে, সন্তান গঠনের ব্যাপারে এটা হচ্ছে একটা নিগূঢ়তম সত্য। বিশেষ করে শিশুর জীবনের প্রথম বৎসর সম্পর্কেই আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করলাম। এই সময়ের শিক্ষায় যেমন অত্যন্ত বেশী সতর্কতা দরকার এইদিকটায় ঠিক তেমনি আমাদের উদাসীনতাও সবচেয়ে বেশী একথা আগেই বলেছি। আমাদের এই ভুলধারণা ভাঙতে হবে। আমাদের প্রত্যেকটী সন্তান যেন দীর্ঘজীবি হয়ে দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে—একেবারে গোড়াথেকেই প্রতি ঘরে ঘরে জননীদের এই-ই যেন সাধনা হয়।

মা—আঃ মর মুখপোঁড়া। বিড়ালটার লেজে দড়ি বেঁধেছিস কেন? ছেলে—ও বিড়াল ত আমাদের নয়।
মা—বিড়ালটাত আমাদের নয় কিন্ত ঘটিটাতো আমাদের হতচ্ছাড়া।

অন্ধকারের অন্তরালে

[গল্প]

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

গাঁয়ের নাম চন্দনপুর—

অনেক লোকের বাস এখানে আছে, বেশীর ভাগ লোকই কৃষিজীবী, কেউ কেউ মাছও ধরে, দূর বাজারে বিক্রিও করে।

ভদ্র লোকও আছে, তাদের মধ্যে কয়জন কলকাতায় কাজ করে, ছুটি মিললে গ্রামে আসে। আর যারা থাকে তারা জমিজমা দেখা শোনা করে, গান বাজনা করে, তাস পিটে দিন কাটায়।

লেখাপড়ার চর্চ্চা বড় একটা এদের মধ্যে নেই, কোথায় কি হচ্ছে সে সব খবরের ধার এরা বড় একটা কেউ ধারে না। কলকাতা হতে অজিত, মহিম, সুকুমার প্রভৃতি যখন বাড়ী আসে তখন অনেক নতুন খবরই তারা নিয়ে আসে, সেই সব কথা এরা পরম বিস্ময়ে শোনে, আর সেই সব কথা নিয়েই কিছুদিন এদের মধ্যে আলোচনা চলে। তারপর,—আবার সব চুপচাপ হয়ে যায়, আবার ঘরকন্না গৃহস্থালি নিয়ে দিন কাটে, কোনদেশে কি হল কে তার খবর রাখে?

কেউ আলোচনা করে কোন জমিতে কি রকম সার দিতে হবে, কেউ বা ভাবে কোথায় গিয়ে মাছ ধরতে হবে; বাবুরা ভাবেন—কি করলে কারও জমিটা দখল করা যাবে—এমনই ভাবে দিন কাটে।

রতন জেলে এখানে নতুনই এসেছে বলতে হবে। যদিও তিন বছর হয়ে গেছে তবু সে আজও এদের সঙ্গে ঠিক মিলতে পারে নি।

নিজের কাজ সে করে যায়, কারও কাছে কোনদিন যায় নি। নদীর ধারে তার কুঁড়ে ঘর খানা; কাল-বৈশাখীর ঝড়ে কেঁপে ওঠে, মনে হয় চালা বুঝি উড়ে যাবে। বর্ষার নদী ফুলে ওঠে, একটা নদী দশটা হয়, তার স্রোতগুলো আছড়ে পড়ে কুঁড়ে ঘরের পাশে, ঘর তার বেগে কেঁপে ওঠে।

তবু তো সেটা এই তিন বছর টিঁকে রয়েচে। গত বছর চালে গুঁজি দেওয়া হয়েছে, বর্ষার জল পড়েছিল ঘরের মধ্যে, একদিনেকার সন্ধ্যায় প্রবল ঝড়ে তার মট-কাটাও উড়ে গিয়েছিল।

রতন জাল নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যায়, কঙ্কণা ঘরে বসে ভাত রাঁধে, কখন মাছ আসবে তারই আশায় পথ পানে চেয়ে থাকে। রতন মাছ ধরে ঘরে আগে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়, তারপর বাজারে চলে যায়।

এমনি করেই দিন যায়।

কঙ্কণার দিন কাটছিল না। কেবল সংসারের কাজ, রান্না বা, সারাদিনটা সে কাটায় কি করে? ছোট্ট বারাণ্ডায় বসে চেয়ে থাকে নদীর পানে।

যখন ঝড় ওঠে, নদীর বুকে ছোট বড় ঢেউ ছোটে, তার প্রাণ তখন ভয়ে শুকিয়ে যায়। এই স্রোতের মুখে ছোট্ট নৌকখানা যদি সামলানো না যায়, যদি উল্টে পড়ে—

তখনি সে শিউরে ওঠে,—না, তাই কি হয়? ঝড় চির-দিনই এমনি করে আসে, আকাশের বুকে জমাট মেঘ গুলোকে ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়। রতনও চিরদিন ঝড়ের মুখে তার ছোট্ট নৌকা ভাসিয়ে চলে, কখনও তো বিপদ ঘটে নি।

তবু কঙ্কণা দেবতার কাছে মানত করে ওকে ফিরিয়ে আনো ঠাকুর, সোয়া পাঁচপয়সার "হরিলুট" দেব।

হয় তো সোয়া পাঁচ পয়সার বাতাসার লোভেই দেবতা ওকে ফিরিয়ে আনে।

নদীর খানিকটা ইজারা করে নেওয়া হয়েছে।

ঠিক সেই খানেই একদিন পুলিশ সাহেবের নৌকা এসে নোঙর করলে।

জেলেরা মহা আপত্তি তুললে—তাদের মাছ ধরতে হবে, সাহেব আর খানিকটা এগিয়ে গেলেই ভালো হয়।

তারা নিজেরা কেউ এগিয়ে গেল না, এগিয়ে দিলে রতনকে, তার উপস্থিত সাহস খুব বেশী, নৈহাটীতে থাকতে সে অনেক দেখেছে কত কথাও বলেছে।

সাহেব তখন শিকারের আনন্দে মসগুল, বন্দুকটা বাগিয়ে দূরের পানে লক্ষ্য করছিলো, দূরে একটা বক বসে ছিল।

রতনের সাড়া পেয়েই বকটা উড়ে গেলে, সাহেবের লক্ষ্যভেদ আর হল না, তিনি ভীষণ চটে উঠলেন। রতন তাঁর লাল মুখ দেখেও সাহস করে কথাটা বলতে গেল—

"কেঁও বজ্জাত—"

বলেই সাহেব তার গালে ঠাস করে একচড় বসিয়ে দিলেন, বক তাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিফল।

মার খেয়ে রতনের মেজাজও ঠিক ছিল না, বিনাপরাধে এ রকম ব্যাপারে তার রক্তও গরম হয়ে উঠেছিল, সেও তাই সাহেবকে বেশ দুই একটা ঝাঁকানি দিয়ে এত শিগগির সরে পড়ল যে সাহেব বন্দুকটা তুলে নিতেও সময় পেলেন না।

এই অপরাধ একজনই করেছিল, সাহেবের রাগ পড়ল সমস্ত জেলেদের পরে।

সেই মুহূর্ত্তে সাহেবের নৌকা ছেড়ে দিলে নির্ব্বোধ জেলেরা ব্যাপার কিছুই বুঝল না, তারা ভাবলে রতনের ঝাঁকানি খেয়ে সাহেবের চৈতন্য ফিরে গেছে। তারা মহানন্দে রতনকে অভ্যর্থনা করলে।

কঙ্কণা ভয়ে শিউরে উঠে বিবর্ণ মুখে বললে, "মাগো মা, তুমি সাহেবকে মেরে এসেছো—কিছু হবে না এতে ?"

রতন বুক ফুলিয়ে বললে,"কি আবার হবে ? সাহেবের খুব আক্কেল হয়েছে, জ্ঞান ফিরেছে,—ছোটলোক বলে আর কাউকে তাচ্ছিল্য করতে পারবে না।"

বুদ্ধিমতী কঙ্কণা মাথা নেড়ে বললে, "না গো, তুমি বুঝতে পারো নি, সাহেব এ ব্যাপারটা অমনিই ছেড়ে দেবে না,—এই নিয়ে একটা তুমুল কাণ্ড বাধাবে তুমি দেখে নিয়ো। তখন দেখো—যারা তোমায় এগিয়ে দিয়েছিল, যারা আজ তোমার খুব খাতির করছে তারা সবাই পেছনে পালাবে, কেউ তোমার বন্ধু হয়ে থাকবে না।"

অবিশ্বাসের হাসি হেসে রতন বললে "দূর, তাই কখনও হতে পারে। প্রথম কথা সাহেব কোনও গোল করবে না ; তারপরে যদিও করে—এরা আমায় কখনও ফেলে পালাতে পারবে না, তুমি দেখে নিও কঙ্কনা।"

একটু হাসবার চেষ্টায় মুখখানা বিকৃত করে কঙ্কণা বললে, "না পালালেই ভালো।"

কঙ্কনার কথাই ফললো।

একদিন হঠাৎ পুলিশ এসে হাজির হল আর জেলেপাড়ার সবাইকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললে।

সবাই একবাক্যে রতনকে অভিশাপ দিলে,—বললে "রতনের জন্যেই আজ তারা সাহেবের বিষনজরে পড়ল, না হলে তাদের কিছুই হতো না।"

সত্যই এখানকার এই সব অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকেরা খুব কমই সাহেবের সংস্রবে এসেছে। কদাচিত এরা সাহেব দেখলে অনেক দূরে পেছনে সরে যায়।

রতন ছিল নৈহাটীতে,—তার সঙ্গে এদের কথা আলাদা।

পাড়ার ছেলে বুড়ো সবাইকে পুলিশ সদরে চালান দিলে।

পাড়ার মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে গেল, সবাই রতনকে দোষ দিতে লাগল,—তার জন্যেই তো এই কাণ্ডটা ঘটল, নচেৎ কিছুই হতো না।

কোর্টে প্রধান আসামী রতন, কারণ সেই সাহেবকে মেরেছিল।

রতনের পক্ষে কেউ নেই, সকলেই আজ তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। যারা সেদিন তাকে এগিয়ে দিয়েছিল, যারা তার পরে তাকে উৎসাহিত করেছিল, আজ তারা সবাই সাক্ষী দিলে—রতন জেলে মাছধরা ব্যবসা নিয়েছে বটে কিন্তু ও একজন ডাকাত, ওর দলে নাকি অনেক লোকই আছে। অনেকদিন তারা রতনকে জানে, কিন্তু এতকাল ভয়ে পুলিশকে কোন কথা জানাতে সাহস করে নি, আজ পুলিশের অভয় পেয়ে তারা জানাচ্ছে। সেদিনে হুজুর যখন শিকার করবেন বলে নৌকা বেঁধেছিলেন, তারা তখন জাল গুটীয়ে চলে যাচ্ছিল, কেবল রতন তাদের সাহস দিয়ে এক লাফে হুজুরের নৌকায় উঠেছিল।

রতনের চোখ দুটো তখন জলছিল।

ছি ছি, এই সব লোক, এদেরই জন্যে সে অনেক কিছুই করেছে। ওই যে মাধব অনায়াসে কোর্টে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা গুলো বলে গেল ওরই ঘরখানাকে সে সেদিন আগুন হতে রক্ষা করেছে। কেউ সে আগুনে যেতে সাহস করে নি, কঙ্কনার কাতর কথা অগ্রাহ্য করেও সে সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আজও সেই আগুনে পোড়ার চিহ্ন তার সারা গায়ে রয়েছে।

ওই নবীন, ওর ছেলেকে সে সেদিন জল হতে রক্ষা করেছিল। তখন সে ডিঙ্গি উল্টে জলে পড়ে অজ্ঞান অবস্থায় ভাসতে ভাসতে চলেছিল—

আর ওই যে সব লোকগুলো মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে গেল, ওরা— ?

থাক, রতন সেসব কথা ভুলেই যাক, মনে যেন না করে, যে এদেরই কারও এতটুকু উপকার করেছে।

বিচারে রতনের দোষই সপ্রমাণ হল।

অনেকগুলি অজানিত জানিত অপরাধে জড়িয়ে তার শাস্তি হল পাঁচ বছরের জন্যে সশ্রম কারাবাস।

রতনের বলিষ্ঠ দেহখানা একবার কেঁপে উঠল, তার চোখ দুটীর সামনে সব যেন ঝাপসা হয়ে গেল, মনে মনে আর্ত্তভাবেই সে ডাকলে—"কঙ্কনা ! কঙ্কণা !"

চোখের জলে ভেসে কঙ্কনা জিজ্ঞাসা করলে, "আমি এখন কি করব ?"

বৃদ্ধ মাধব দাস তার শ্বেতশুভ্র দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলাল, "কি আর করবে বাছা, এমদাদের সঙ্গে ওর ঘরেই যাও। জাত জন্ম সবই যখন গেছে দাঁড়াবে কোথায় ?"

এমদাদের ঘরে,—এই কঙ্কনার অদৃষ্ট লিপি ?

কিন্তু দোষ কার—তার না দেশের লোকের ?

স্বামীর পাঁচ বছরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ সে শুনেছিল, তাও সে সহ্য করেছিল, ভেবেছিল পাঁচটা বছর বই তো নয়, বছর কয়টা দেখতে দেখতে কেটে যাবে তারপর আবার তার স্বামীকে সে পাবে।

কিন্তু সকল আশাই তার ব্যর্থ হয়ে গেল একদিন রাত্রে।

ঘুম ভেঙ্গে সে ঘরের মধ্যে সে রাত্রে যাদের দেখতে পেলে তাদের কয়জনই তার পরিচিত।

তারপর—

তারপরকার কথা বলবার নয় বাংলাদেশে এমন ধর্ষিতা নারীর কাহিনী অনেকেই শোনা যায়।

দুদিন পরে সে গ্রামে ফিরল কিন্তু আশ্রয় তার কই ? তার সমাজ তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলে এমদাদের ঘরে।

কঙ্কনা চোখের জল মুছে একবার চারিদিক চাইলে তার বুকের মধ্যে অনেক কথাই জমে উঠেছিল একটী কথা সে বলতে পারলে না, বলবার দরকারও ছিলনা।

সে একাতো নয় এই জেলাতেই গ্রামে গ্রামে নিত্য এই রকম ব্যাপার ঘটছে। পুরুষদের রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই, তারা এমনই ভাবে বিচার করে যায়, সমাজকে সকল রকম নেংরামীর ছোঁয়াচ হতে বাঁচায়।

এ সব মেয়েরা যায় কোথায় ?

আজ দেখতে পাওয়া যাবে—সমাজ ত্যক্তা সকল মেয়েই মরতে সাহস পায় না, দুই একজন সাহস করে আত্মহত্যা করে মাত্র; বাকি মেয়েরা কেউবা বাধ্য হয়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করছে, কেউ বা বাজারে গিয়ে দেহের ব্যবসা করতে বাধ্য হয়েছে।

হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম কানুন যে বড় বেশী তাই এর চারিদিকে বেড়া দেওয়া। সনাতনধর্ম্মীরা সন্তর্পণে সমাজ ধর্ম্ম রক্ষা করে চলছেন, যেন এতটুকু পাপের ছোঁয়াচ না লাগে।

কঙ্কনা আশ্রয় পেলে কোথায় ?

এমদাদের ঘরে।

দীর্ঘ পাঁচটা বছর—

এ যেন আর কাটতে চায় না।

রতন জেলে আছে, নিয়মিত কাজ করে, সমস্ত দিন পরে রাত্রে তার বিছানায় ক্লান্ত দেহখানা মেলিয়ে দিয়ে সে ভাবে তার গ্রামের কথা।

পাঁচ বছরে নিশ্চয়ই এমন কিছু বদল হবেনা যা দেখে চেনা যাবেনা। সবইতো তেমনই আছে, সেই মাঠ সেই ঘাট, সেই নদী, সব সমান আছে।

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ, কলিকাতা।

আজ ও বৈশাখের শান্ত সুনীল আকাশে হঠাৎ কালো মেঘ বিরাটকায় দৈত্যের মত দাঁড়ায়, তেমনি করে এলোমেলো ঝড় বয়, নদীর বুকে তুফানের ঢেউ উঠে। বর্ষায় মরা নদী কূলে কূলে ভরে ওঠে, তার জল তার ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের নিচে এসে লাগে।

আচ্ছা; ঘরের পাশে সেই শিউলি গাছটাতে আজও শিউলি ফোটে এবং তেমনি ও গন্ধ ছড়ায়? কঙ্কনা আর বোধহয় ফুল কুড়ায় না, আর সেই হলদে ফুল গুলো কুলো ডালায় করে শুকায় না; নিশ্চয়ই সে গুলো দিয়ে সে আর কাপড় ছুপায় না।

ঘরের পেছনটা নিশ্চয়ই আগাছায় ভরে গেছে, কে-ই বা পরিষ্কার করবে?

আচ্ছা কঙ্কনা কি করে দিন কাটায়,—সে কি রাঁধে, কি খায়? আর বোধ হয় সে আলতা পরে তার পা দুখানিকে লোভনীয় করে তোলে না।

সে নিশ্চয়ই দিনরাত রতনের কথাই ভাবে।

মনে করতেও বুকটায় পুলকের শিহরণ জাগে, সে ভাবে সে নিশ্চয়ই চোখের জল ফেলে। ফিরে পেলে সে নিশ্চয়ই বলবে কি রকম ভাবে সে দিন রাত গুলো কাটিয়েছে।

জেলখানার নিত্যকার কাজ করতে করতে হঠাৎ সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, প্রহরীর হাতের চোট খেয়ে তখনি মনে পড়ে সে জেলে রয়েছে, এখনও রাতদিন তাকে থাকতে হচ্ছে।

সে প্রত্যহ হিসাব করে কতদিন গেল, কতদিন আর বাকি রইল।

অন্তঃস্ত দিনগুলোকে যদি দুহাত দিয়ে ঠেলে দেওয়া যেত দীর্ঘ পাঁচটা বছরকে যদি একটা দিনেই পর্য্যবেশিত করা যেত—তাতে যদি তার জীবনের আধখানা যেত তাতে ও রাজি হতো।

বছর ফুরাল—

মুক্তির দিন সে পথ চলতে কুড়িয়ে পেলে। কয়েদীর পোষাক ত্যাগ করে নিজেরই আগেকার পোষাক পরে সে বাইরে খোলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলে।

কি আনন্দ—কি আনন্দ! এটা কি মাস—বুঝি আশ্বিন মাস, তাই আকাশ আজ নীল, মাঝে মাঝে সাদা রঙের মত এক আধখানা মেঘ ভাসতে ভাসতে এসে চলে যাচ্ছে। জেলের পাঁচিলের ধারে একটা স্থলপদ্ম ফুলের গাছ আগাগোড়া ফুলে ভরে উঠেছে।

পূজা কি চলে গেছে—না আসছে?

রতন পথে চলতে লাগলো।

মনতো তেমনই নবীন কাঁচা রয়েছে, দেহ এমন হল কেন? হাঁটতে পা কেন ভেঙ্গে পড়ছে। পাঁচ বছরের কষ্ট তাকে জীর্ণ শীর্ণ করে ফেলেছে,—তার সঙ্গে মনও কেন যেন ঝিমিয়ে পড়ছে।

কত দীর্ঘ পথ ক্রোশের পর ক্রোশ, এ যেন আর ফুরোয় না। আগে এই পথেইত সে চলেছে, লোকে যা একদিনে শেষ করতে পারত না, সে তা এক বেলায় করত।

রতন গাঁয়ের পথে চলল।

দূরে ওই না সেই উঁচু নারিকেল গাছটা দেখা যায়? কতদূর হতে কতদিন ঐ গাছটার পানে চোখ পড়ে গেছে, মন আনন্দে নেচে ওঠে—ওই তার গাঁ। ওখানে তার কঙ্কনা রয়েছে।

সে হয়তো হিসাব ও করেনি আজ তার স্বামী ফিরবে এই সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, সে এতক্ষণ খাওয়া দাওয়া সেরে নিশ্চয়ই বিছনায় শুয়ে পড়ে রয়েছে "কোথায় গো কবে বছর ফুরাবে, কবে মেয়াদের শেষ হবে—তুমি একটীবার এসোগো।"

আচমকা রতনকে দেখেই তার মুখখানা কি রকম হয়ে যাবে সেইটাই কল্পনা করে রতন বড় শিগগীর চলতে সুরু করলে।

তার পা দুখানা তখন ভেঙ্গে পড়ছে, সমস্ত গা দিয়ে ঘাম ঝরছে।

দূরে ঘরের চাল দেখা যায়—

রতন তখন অবসন্ন হয়ে মাটিতে বসে পড়েছে আর একটী পা চলবার ক্ষমতা তার ছিল না।

কঙ্কনা আজ রতনের স্ত্রী নয়, এমদানের গৃহিণী, তার সন্তানের জননী—

রতন কথাটা শুনে গেল ;—সে চীৎকার করে উঠল না, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল না, কেবল ফেল ফেল করে চেয়েই রইল।

যারা করুণাপরতন্ত্র হল কথাটা দিল শুনিয়ে তারা এ কথাও বললে—ওতে ঘাবড়ে যেওনা রতন' পুরুষ বাচ্ছা তুমি, ভাবনা কিসের ? তুমি একটা কেন দশটা বিয়ে এখনি করতে পারো। এই আমাদের মাধবের নাতনিটি বেশ বয়স্থা হয়ে উঠেছে অনায়াসে একটী সংসার চালাতে পারে ওকেই বিয়ে করে ফেল। রতন, তবু কথা বলেনা।

এমদাদের বাড়ী—

বারান্দার একপাশে উনাশনে তরকারি চাপিয়ে কঙ্কনা বা মতিবিবি কোলের ছেলেটিকে দুধ খাওয়াচ্ছে। কাছে বসে এমদাদ হাসতে হাসতে কি গল্প কচ্ছে।

"কঙ্কনা"—

কি আর্ত্ত চীৎকার—

কঙ্কনা একেবারে বিরস হয়ে গেল।

দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল রতন, এক পলকের দৃষ্টি পাতেই সে তার স্ত্রীকে চিনে ফেলেছিল।

অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে, আজ কেবল কঙ্কনার চোখ দুটি ছাড়া আর কিছুই দেখে যেন চেনা যায় না। তার গায়ের উজ্জল রং কালো হয়ে গেছে,—কণ্ঠার হাড় অনেকখানিই উঁচু হয়ে গেছে। মুখ দেখে মনে হয় সে বড় বেশী রকমই ভাবে, হাসতে সে যেন ভুলে গেছে।

বিনা দোষে বিচারকের বিচারে পাঁচ বছর রতন জেল খেটেছে, তার স্বাস্থ্য গেছে,

এমদাদ নিয়েছে স্ত্রী—তার মনের শান্তি।

এরই কল্পনায় রতন জেলে কাজ করতে করতে বিভোর হয়ে যেত, রাত্রে শুয়ে কত কি ভাবত।

হাতে তার ছিল একটা লাঠি—

জ্ঞান হারা রতন সেইটাই বারাণ্ডা লক্ষ্য করে ছুড়ল—পরমুহূর্ত্তে একটা আর্ত্ত চীৎকার কানে এল, সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হতে লোকজন এসে বাঘের মতই রতনের পরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"হা ভগবান—"

রতন মূর্চ্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

যখন জ্ঞান হল তখন সে শুনতে পেলে—এমদাদ কাকে লক্ষ্য করে বলছে—"হুজুর আমার কবিলাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন এই হিন্দু লোকটা ভারি পাজি, যখন তখন আমার কবিলারে ঠাট্টা করে। আজ হঠাৎ এসে আমায় লাঠি ছোড়ে, সেই লাঠি আমার বাচ্ছার মাথায় লেগে সে ধড়ফড়করে মারা গেল হুজুর।"

উঠানের মাঝখানে দেড় বছরের মরা মেয়ের সামনে বসে কঙ্কনা—

একটী ফোঁটা জলও তার চোখে ছিল না একেবারেও সে মরা মেয়েটার মুখের পানে চায় নি।

সন্তান কার, তার না এমদাদের ?

আজ যেন সে মুক্তিলাভ করেছে—মহামুক্ত, তার সকল বাঁধন আজ কেটে গেছে।

একটিবার সে রতনের পানে চাইলে আর একবার আকাশের পানে চাইলে।

পুলিশ হিড়্ হিড়্ করে দুর্ব্বল রতনকে টেনে নিয়ে চলল। যেথান হতে—

কালই সে মুক্তিলাভ করেছিল, আজ আবার ইচ্ছা করেই সে চললো সেথানে। বাইরের আলো বাতাস সে সহ্য করতে পারছিল না, তার অন্ধকার কারাগারই ভালো।

মুক্তি সে চায় না, বন্ধনের মধ্যেই সে তার জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটিয়ে দিতে চায়।

প্রসাধন শিল্প ও সৌন্দর্য্য চর্চ্চা

শ্রীআশালতা মিত্র

বাঁচ্‌তে গেলেই কি করে বাঁচ্‌তে হয় সেটা জানার দরকার। আমাদের শাস্ত্রকারগণ সে কথা জান্‌তেন বলেই তাঁর এক দিকে যেমন উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম্মমূলক তত্ত্বগুলি লিখে গেছেন, আবার সেইরূপ কামসূত্র রচনা করে গেছেন। তাঁরা ঠিকই বলেছেন ধর্ম্মার্থ কামেভ্যো নমঃ, কেননা যাঁহারা প্রকৃত গৃহস্থ তাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম, ত্রিবর্গেরই প্রয়োজন। আর্য্য ঋষিগণ প্রসাধন শিল্পকে চৌষট্টি শিল্পের অন্তর্গত কতকগুলি শাখা হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। শয়ন রচনা অর্থাৎ কাল রুচি এবং ঋতু ভেদে শয্যা প্রস্তুত প্রণালী, গন্ধযুক্ত বা গন্ধদ্রব্য প্রণালী শিক্ষা, ভূষণ যোজনা বা অলঙ্কার যোগ পুষ্পাস্তরণ বা ফুলশয্যা, ফুলের মশারী প্রভৃতি প্রস্তুত শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলি তখনকার কালের ভদ্র মহিলাদের অধীত বিষয় ছিল। শাস্ত্রকার আবার বল্‌চেন,—

নরঃ কলাসু কুশলো বাচালশ্চাটুকারকাঃ।
অসংস্তুতো সি নারীনাং চিত্তমাশ্বের বিন্দতি॥

কলা বিদ্যা শিক্ষা করলে পুরুষ বহুভাষী, প্রিয়কারী এবং রমণী মনোমোহন হয়। প্রকৃত কলাবিদ্যা শিক্ষায় সৌভাগ্যের উদয় হয়।

প্রাচীন আর্য্যগণ বেশভূষার উপর যত্নশীল ছিলেন। দিবাভাগের কোন সময় কিরূপ অঙ্গরাগ করতে হ'বে তার বিধানও শাস্ত্রে আছে। সকাল বেলা শয্যা থেকে উঠেই মল মূত্র ত্যাগ করা উচিত। তারপর আর্য্য ঋষি বল্‌চেন মালা ও ধূপ গ্রহণ কর্ব্বে। ওষ্ঠ অলক্তক রাগে রঞ্জিত কর্‌বে। তাহার পর তাম্বুল ভক্ষণ ও দর্পণে মুখ দর্শন কর্‌বে। সপ্তাহের কোন দিন কিরূপ অঙ্গ-বিহার উচিত, তারও বিধি শাস্ত্রকার দিতে বিস্মৃত হন নি। তাঁরা বলেন নিত্য স্নান করবে দ্বিতীয় দিনে চন্দন ও গন্ধ তৈল দিয়ে শরীর পরিষ্কার করবে। তৃতীয় দিনে ফেনক পদার্থ অর্থাৎ সাবান মাখ্‌বে। চতুর্থ দিনে ক্ষৌরকর্ম্ম কর্‌বে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে প্রত্যায়ুষা কর্ম্ম কর্‌বে। ঘাম যাতে না হয় সেই জন্য সংবৃত গৃহে বাস করবে। পূর্ব্বাহ্নে ও সায়াহ্নে ভোজন করবে। কিন্তু এ সকলের উপর তাঁরা নিম্নের যে উপদেশটী দিয়েছেন, সেটী খুবই প্রণিধান যোগ্য।

অজীর্ণে ভোজনং যচ্চ যচ্চ জীর্ণে ভুজ্যতে।
রাত্রৌ ন ভুজ্যতে যচ্চ তেন জীর্য্যন্তি মানবাঃ॥

অজীর্ণ অবস্থায় ভোজন করলে, অজীর্ণ অবস্থায় ভোজন না করলে এবং রাত্রে ভোজন না করলে মানুষ জীর্ণ হ'য়ে যায়। অর্থাৎ সৌন্দর্য্য চর্চ্চা করতে গেলে আমাদের মনে রাখ্‌তে হ'বে সৌন্দর্য্য ভেতরের জিনিষ, কেবল মাত্র বাইরের নয়। কতকটা রং গালে মাখ্‌লে, বা গোঁফে কাস্‌মিটিক দিলেই দেখতে ভাল দেখায় না। ইংরাজীতে ঠিকই বলা হয় Beauty culture এবং Health culture একই জিনিষ। স্বাস্থ্য ভগ্ন হ'লে, কতকগুলো পাউডার এসেন্স মানুষকে সংই সাজায়, তাকে দেবতা গড়্‌তে পারে না। আবার স্বাস্থ্য অটুট থাক্‌লে, কোন রকম দ্রব্যের সাহায্য না নিয়েও শুধু একখানা কাপড় বা চাদরের সহায়তায়ই হৃদয়াকর্ষক মনোরম মূর্ত্তির রচনা করতে পারা যায়। আমাদের শাস্ত্রকারগণ তত্ত্বটা এতই সুন্দর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, তাঁরা মাত্র ঐ কয়েকটী কথায় সমস্ত সত্যটা উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ করে গেছেন।

সৌন্দর্য্য চর্চ্চা কর্ত্তে গেলেই প্রথম প্রয়োজন হয় সুগঠিত শরীর। অবশ্যই স্বীকার্য্য যে ইহা ভগবানের দান। কেহই চান না তিনি কম সুন্দর হ'য়ে জন্মান, কিন্তু ইহা ভবিতব্যের গবেষণার বিষয়। নিজেকে সুন্দর করে তোলবার হাত যে মানুষের একেবারেই নেই একথা আমি মোটেই স্বীকার করি না। বিজ্ঞান-সম্মত প্রথানুযায়ী ব্যায়াম কর্ত্তে পার্ল্লে অনেক সময়েই মনোমত না হ'ক, স্বাভাবিক শরীর অপেক্ষা অনেকাংশে অধিকতর সুন্দর শরীর লাভ হয়। শুনা যায় নাকি বিখ্যাত মল্লবীর স্যাণ্ডো আগে দেখিতে কুৎসিৎ না হলেও, বড় ভাল ছিলেন না। ব্যায়ামের

শরণ নিয়ে তিনি তাঁর শরীরকে পৃথিবীর নিকট আশ্চর্য্য পদার্থে পরিণত করেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখ্তে পাওয়া যায় নিয়মিত ব্যায়ামে শরীরের দুর্ব্বল অংশকে সবল করে। অর্থাৎ পঙ্গু ব্যক্তিও ব্যায়ামের সাহায্য নেয়, তবে তার পঙ্গুতার মধ্যেই একটা মাধুরী ফুটে উঠ্তে পারে। আবার যার শরীরের রং ফর্সা কিন্তু একটু স্থূল বেশী, ব্যায়ামে তার মেধ কমিয়ে তাকে প্রিয়দর্শন করে তোলা যেতে পারে। ব্যায়াম সকলেরই নিত্য প্রয়োজন। নারীগণের ব্যায়াম শিক্ষা করা আমার মনে হয় পুরুষগণ অপেক্ষাও বেশী দরকার, কেননা সংসারে তাকে গৃহস্থালী দেখার সহিত, স্বামী, পুত্র ও আত্মীয় স্বজনের নিকট সর্ব্বদাই বরদাত্রী রূপে আবির্ভূত হ'তে হয়। অবস্থা বিশেষে ব্যায়ামের প্রকৃতি ভিন্নরূপ হওয়া উচিত। যে সমস্ত মেয়ে ডিসপেপ্সিয়ায় ভোগে শরীর যাদের সর্ব্বদাই মলিন, তাদের এমন ব্যায়াম করা উচিত যাতে ক্ষিদে হয়, এবং ঐ মলিনতা যাতে ঘুচে যায়। যে মেয়ে সর্ব্বদাই ঘুমন্ত ভাবে থাকে, যার মুখে হাসি প্রায়ই দেখা যায় না, তাকে এমন ভাবে ব্যায়াম করতে হ'বে যাতে সে সর্ব্বদাই জাগরূক থাকতে পারে। এই রকম ব্যায়ামে অভ্যস্ত হ'লে, তার মুখের বিষণ্ণতা আপনা হ'তেই চলে যাবে। যে মেয়ে সর্ব্বদাই চঞ্চল, ঠিক স্থির হ'য়ে বস্তে পারে না তাদের ক্রিকেট এবং টেনিস খেলা শিক্ষা দেওয়া উচিত। কেননা এই খেলা তাহাদের স্বভাবের অনুকূল। কিন্তু ওরই মধ্যে মনের ও স্থিরতা আসে। যারা স্থূল ও স্ফীত-বক্ষা, তাদের বেড়ানই যথার্থ ব্যায়াম।

এই সমস্ত ব্যায়াম ছাড়া খুব গভীর ভাবে 'শ্বাস' নেওয়া অভ্যাস করা সকল মেয়েরই উচিত। সকালবেলা বিছানা থেকে উঠে মুখ হাত ধুয়েই, হয় ঘরের মধ্যে না হয় বাইরে বাগানে ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে 'শ্বাস' নেওয়া অভ্যাস করতে হয়। 'শ্বাস' গ্রহণ কর্বার সময় দেহের সমস্ত যন্ত্রই বেশ শিথিল করে দিতে হয়। তারপর কোমরে হাত দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে খুব জোরে বাহির হ'তে হাওয়া টেনে নিয়ে দু তিন সেকেণ্ড ধরে রেখে ছেড়ে দিতে হয়। এই রকম বার কুড়ি প্রত্যেক দিন করতে পারলেই শরীরে বেশ কমনীয়তা ফুটে উঠে। স্নান করা ও সৌন্দর্য্য-চর্চ্চারই মধ্যে। আমরা যে রকম সচারাচর স্নান করি তাতে সৌন্দর্য্যের হানি হয়। মনে রাখা উচিত সৌন্দর্য্যটা স্বাভাবিক, কাজেই স্বভাবকে ফোটাতে হ'লে তাকে সাহায্য করতে হ'বে। স্নান কর্ব্বার সময় আমরা যদি ভাবি শুধু শরীরের গরমটা কমিয়ে দিচ্ছি, তবে স্নানটা তাই হয়। কিন্তু স্নানের উদ্দেশ্য ও ছাড়াও আর একটী হওয়া উচিত অর্থাৎ স্নানের মধ্য দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তোলা। সত্ত স্নাতার ছবি বাংলায় অনেক হ'য়েছে, কিন্তু মনে হয়, সবগুলিই একই জিনিষের রকম ফের অর্থাৎ হীন অনুকরণ, কোনটাতেই মৌলিকতা নেই। তার কারণ আমরা স্নানটাকে একটা বিলাস বলে ধর্তে ভুলে গিয়েছি। পাশ্চাত্যের বাথ একটী বিশাল কলা-ক্ষেত্র। আমাদের দেশেও স্নানাগার বা হামাম ছিল। কিন্তু জাতি গরীব হ'য়ে যাওয়ার এই শিল্পের পঙ্গুতা ঘটেছে।

একটি সাধারণ ইংরেজী 'বাথে' আমরা এই কয়'টী জিনিষ পেয়ে থাকি। পরিষ্কার ঠাণ্ডা বা গরম জল, ভাল সাবান, একখানি ভাল তোয়ালে, ও একটী ড্রেসিং টেবিল। স্নানাগারে যাতে যথেষ্ট পরিমাণে হাওয়া আস্তে পারে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। উহা বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। অবগাহন করে স্নান করাই উচিত। স্নান কর্ব্বার পরেই নরম তোয়ালে দিয়ে গা মুছে ফেলে পরিধান বস্ত্র পরা উচিত। কেশগুলিতে কোনরূপ সুগন্ধ দ্রব্য দিয়ে আপনার রুচি অনুযায়ী আঁচড়িয়ে নেওয়া দরকার। পুরুষরা শিঙ্গের চিরুণী ব্যবহার কত্তে পারেন। কেননা উহা মাথার উপর দিয়ে চালনা কর্ল্লে চুলের গোড়া শক্ত হয়। কিন্তু মেয়েদের বুরুষ দিয়ে মাথা পরিষ্কার করাই ভাল, তাতে অনর্থক কতকগুলো চুল উঠে যায় না।

ইংরেজীতে Beauty Bath বলে এক রকম স্নানের ব্যবস্থা আছে। যে সমস্ত মেয়েরা স্বভাবতঃ ময়লা তারা মাঝে মাঝে এই স্নানের সাহায্য গ্রহণ কর্ত্তে পারে। বৃষ্টির জল হ'লেই ভাল হয়, যদি না পাওয়া যায় ত স্নান কর্বার একটী বাল্তিতে সামান্য গরম জল ভরে তার সঙ্গে চার আউন্স গোলাপ জল, এক আউন্স গ্লিসিরিন্, এক চামচে গুঁড়া বোরাক্স, এক আউন্স এলকোহল, এক আউন্স

টিন্‌চার বা বেলজিন, মেশাতে হয়। একটু বেশী গন্ধ কর্ব্বার দরকার হলে আরও দু আউন্স গোলাপ জলও দিতে পারা যায়। আস্তে আস্তে অবগাহন করে এই মিশ্রিত জলে স্নান করার নামই Beauty Bath সমুদ্রে স্নান আমাদের অনেক সময় প্রয়োজন হয়। পয়সার অভাবে কিম্বা অন্য কোন কারণে যদি তা সম্ভবপর না হয় তাহ'লে ঔষধের দোকান হতে সমুদ্রের লবণ কিনে এনে স্নানের জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্নান করলে, সমুদ্রের স্নানের মত না হ'ক, তেমনি খানিকটা উপকার পাওয়া যায়। এই স্নানেরই জর্ম্মাণ দেশে একটু রকম ফের আছে সেখানে এ'কে স্পা মেথড (Spa method) বলে। তারা স্নানের বাল্‌তিতে জল দেবার আগে, এক পাঁ'ট ভাল টেবিল সলট ঢেলে দেয় এবং তারপর ওর সঙ্গে খানিকটা গুঁড়ো বোরাক্স মিশিয়ে দিয়ে, গরম জল দিয়ে ভর্ত্তি করে। ঐ জল যখন কুসুম কুসুম গরম থাকে, তখন তাতে অবগাহন করে উঠেই, ভাল সাবান মেখে পরিষ্কার গরম জলে গা ধুয়ে ফেলে। সমুদ্রে স্নান করলে স্বাস্থ্য ভাল হয়, সুতরাং এরূপ স্নানে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। কিন্তু সমুদ্রে স্নান কর্ল্লে রং খারাপ হয় এও ঠিক। এই জন্যই Spa method এ দুবার স্নান কর্ব্বার বিধান।

প্রসাধনের অঙ্গ স্বরূপ স্নান যেমন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক, ভোজ্য বস্তুগুলিও তেমনি সৌন্দর্য্য সৃষ্টির বিশেষ অবলম্বন। পাঁজিতে যে তিথি বিশেষে আমরা ভোজ্যের ব্যবস্থা দেখিতে পাই তার কারণ-ই এই। যে সমস্ত মেয়েরা তাদের রং ফর্সা করতে চায়, তাদের উচিত নয় যে সর্ব্বদাই মুখ নাড়া। খাবার সময়েই খাওয়া উচিত। তৈলাক্ত জিনিষ, মিষ্টি জিনিষ তাদের প্রধান ভোজ্য হওয়া উচিত। ফল, মাখন দুধ ও প্রচুর পরিমাণে খাওয়া দরকার। চা, কফি কিম্বা যে সমস্ত জিনিষ খেলে পাকস্থলী হজম কর্ত্তে পারে না, তাদের সে সমস্ত জিনিষ খাওয়াই উচিত নয়।

সকলেই জানেন যে হলিউডে একদল উর্ব্বশী বাস করেন। অর্থাৎ সেখানকার সৌন্দর্য্যের যে পরিমাপক আছে তার নিখুঁৎ বিচারে, সেই সমস্ত মেয়েরা একেবারে নির্দ্দোষ। আমরা সুন্দর বলতে সাধারণতঃ গায়ের রং ফরসা এবং মুখের হাব-ভাব ভাল বলে বুঝে থাকি। কিন্তু সেখাকার নিখুঁৎ সৌন্দর্য্য সব দিক দেখে হ'য়ে থাকে। অঙ্গের মাপ, বেড়, খাড়াই, হাত-পায়ের 'প্রোপরসন্' ইত্যাদির সহিত গায়ের রং, মুখের হাব ভাব, চোখের জ্যোতি, গ্রীবার ভঙ্গি মেলাতে হয়। গ্রেটা গার্ব্বো, মার্লেনী ডেয়েট্রীক্ কিম্বা জোয়ান ক্রফোর্ড সেখানকার সেরা সুন্দরী। তাঁদের খাদ্য দ্রব্যের লিষ্টি আছে, তাঁরা যা-তা খান না। গায়ের চামড়াকে ভেলভেটের মতন নরম, এবং সাদা রং কে উজ্জ্বল এবং চক্ষুকে প্রাণময় করতে গেলে মাংস খাওয়াই উচিত নয়। মাছ খাওয়াও ভাল নয়। তাঁর মোটামুটী যা সাধারণতঃ খেয়ে নিজেদের অসাধারণ সুন্দরী করে তুলেছেন, তারই একটা তালিকা দিচ্ছি। তাঁরা কখনও চা পান করেন না। সকাল বেলা বিছানা থেকে উঠে তাঁরা চা বা কতকগুলো বিস্কুট খান না। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এবং একটা কমলা লেবু বা আপেল মাত্র খান। দ্বিপ্রহরের আগেই অর্থাৎ ১০ ৩০ হ'তে ১১টার মধ্যে, লঞ্চ ব্রেকফাষ্ট মিলিয়ে একটা খানা খান। এই খানায় থাকে খানিকটা নিরামিষ ঝোল, গোটা কতক সিদ্ধ করা চেষ্টনাট, কিছু চিজ্ বা পনীর, একটু ব্রাউন ব্রেড, একটু মাখন, গোটা কতক চকোলেট্। পানীয়ের মধ্যে হয় গরম দুধ, আর না হয় জল। বিকালে তাঁরা কোন রকম খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করেন না। রাত্রে ৭টার সময় তাঁরা ডিনার খান। ডিনারের ভোজ্য বস্তু ও ঐ সকাল বেলারই মতন, মাত্রায় একটু বেশী হ'তে পারে। তাঁরা যে সমস্ত খানা খান, তা ষ্টীমে সিদ্ধ করা হয়। ঠাণ্ডা জল তাঁরা তেষ্টা পেলেই খান। আমাদের দেশে যাঁরা ভাবেন কতকগুলো মাংস, কেক, বিস্কুট না খেলে শরীর থাক্‌বে না বা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হ'বে না, তাঁরা এ বিষয়ে একটু ভেবে দেখ্‌তে পারেন। তা ছাড়া এই বিধি আমাদের শাস্ত্র-সম্মত। গোড়াতেই দেখেছি যে শাস্ত্রকার বলচেন উপবাস করা উচিত নয়, এবং অনবরত খাওয়াও উচিত নয়।

এতক্ষণ যা বল্লাম তা মোটামুটী সমস্ত শরীর সম্বন্ধেই বলেছি। এইবার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে কিছু বলছি। প্রথমেই মুখের কথা মনে হচ্ছে। মুখকে আমরা

হৃদয়ের দর্পণ বলে থাকি। কাজেই আপনাকে প্রকাশ করতে গেলেই মুখখানা যাতে ভাল হয়, অগ্রেই তার ব্যবস্থা করা খুবই দরকার। মুখে কতকগুলো ব্রণ হওয়া বা মেছেতা পড়ে থাকা—সৌন্দর্য্য হানিকর। আমাদের দেশে যে সব মেয়েরা খালি লেখা-পড়ার চর্চ্চা করে, তাঁরা ভাবে লেখাপড়া করে গেলেই হ'ল, সাজ সজ্জার দরকার নেই। কিন্তু তাদের জানা উচিত সাজ সজ্জাই আধুনিক জগতের অন্যতম অস্ত্র। 'ইণ্টারভিউর' ব্রহ্মাস্ত্রই হচ্ছে কমনীয় দেহ।

পাত্রস্থ হ'বার জন্য মেয়েদের প্রায়ই Interview দিতে হয় সুতরাং সাজ সজ্জার দরকার নেই কেমন করে হতে পারে। প্রথম সাক্ষাতই যদি মনের মধ্যে একটা সহানুভূতি জাগিয়ে দিতে পারা যায় তা হলে একটু শিক্ষা তার পেছনে থাক্‌লেই চালিয়ে নিতে পারা যায়। মুখের বেশ পরিষ্কার ভাব রাখতে রোজই একবার ষ্টীমের ভাপ নিতে হয়। এতে খরচ কিছুই নেই। একটা হাণ্ড বেসিনে ফুটন্ত গরম জল ঢেলে দিয়ে, চুলগুলোকে পিন দিয়ে বেঁধে পিঠের ওপর সরিয়ে দিয়ে মুঠটা তার ওপর রেখে ভাপ নিতে হয়। এই সময় ভাপটা যাতে সম্পূর্ণ রূপে পাওয়া যায় তার জন্য মাথার ওপর দিয়ে একটা টার্কিস তোয়ালে ঝুলিয়ে দিয়ে কানের পাশ দিয়ে টেনে এনে বেসিনের ধার দিয়ে দিতে হয়, তাহালে সব ভাপটা ঠিক মুখেই যেতে পারে। এই রকম পাঁচ মিনিট ভাপ নেবার পর তুলোর প্যাড্‌ বা লিনেন দিয়ে মুখ খানাকে বেশ জোরে মুছে ফেল্‌বে। জোরে মুছলে অনেকটা মাসাজের কাজ হবে। খানিকটা দুধের সর শীতকালে মুখে মাখলে ত্বকের মসৃণতা রক্ষিত হয়। প্রত্যহই ভাল সাবান ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তেল ব্যবহার না কর্‌লেই ভাল হয়, কেননা তেলের সমতা রক্ষা কর্ত্তে না পার্‌লে একরকম মলিনতা এনে দেয়।

মুখ দেখে লোকে বয়স নির্ণয় করে। এই জন্য মুখ যাতে বুড়োটে না হয় তা করা সর্ব্বাগ্রে দরকার। পাশ্চাত্য দেশে একরকম ইন্‌জেকসন উঠেছে তার সাহায্যে নাকি অনেক প্রৌঢ়াকেও যুবতীর ন্যায় দেখায়। আমাদের মনে হয় মনকে সর্ব্বদাই লঘু রাখ্‌বার চেষ্টা করা উচিত। সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্মই ক্রীড়াচ্ছলে ক'রে যাওয়া দরকার। অত্যধিক রাত্রি জাগরণ বা আহার কখনই করা উচিত নয়। সদা প্রফুল্ল থাক্‌বার চেষ্টা করা উচিত। তাহলে মুখের মাংস পেশীগুলি সঙ্কুচিত হতে পারেনা। সকলের চেয়ে বড় কাজ, যা মেয়েদের পরম ধর্ম্ম—তা সকলকে প্রসন্ন করা। যে মেয়ে সকলকে প্রসন্ন করতে পারে, সে মেয়ে কখনই বুড়ী হয়না, তাকে সর্ব্বদাই যুবতীর ন্যায় জ্ঞান হয়। মুখে ব্রণ হলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত বা ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করা উচিত। ব্রণ নারীজাতির ভীষণ শত্রু মেছেতা যাহাতে না বাড়ে তার দিকে দৃষ্টি রাখা সর্ব্বদাই দরকার। মুখে কখনই ক্ষার দিবেনা। কোন শক্ত জিনিষ দিয়ে উচিত নয়। তাতে মুখমণ্ডল কর্কশ হয়ে ওঠে। মুখ সর্ব্বদাই নরম রবারের বা তুলোর প্যাড্‌ দিয়ে ঘসা উচিত।

রং অনেকেই ব্যবহার করে থাকেন, কিন্তু ওর সাইকোলজী খুবই কঠিন তা আমাদের মেয়েদের জানা নেই, এইজন্যই প্রায়ই দেখা যায় যাতা বিলাতী কতকগুলো রং মেখে তারা সং সেজেছে মাত্র। রং নির্ব্বাচনে চিত্রকরের যেমন বাহাদুরী ধরা পড়ে, কোন মেয়ে সাজ সজ্জায় দক্ষ কিনা তাও এই রং ব্যবহারে বুঝ্‌তে পারা যায়। রং এর একটা লম্বা গতি আছে। উজ্জল, লাল, দূরে ফেকাসে লাল হয়, ক্রমশঃ তা নীলে গিয়ে দাঁড়ায়। কালোর উপর রং ধরাণ শক্ত। সাদার পার্শ্বে আবার যা তা রং দিলে চলে না। কালো মেয়েদের নীল রং এ কালই করে, কেননা নীল দূরের রং এবং কালো একেবারেই অজ্ঞাত। অজ্ঞাতকে জ্ঞাত এর রাজ্যে আনতে গেলে শাদা বা শাদায় রাঙায় মিশানো রঙই ভাল। কেননা এরা নিকটত্ব বুঝায়। যে সমস্ত মেয়ের রং ফেকাশে শাদা তাদের হাল্কা গ্রীণ রংই ভাল। সাদার ওপর লাল বেশ শোভা পায়।

পোষাক পরিচ্ছদ অবশ্যই দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী হওয়ার দরকার। কিন্তু কতকগুলো গয়না এবং ভাল ভাল জামা কাপড় গায়ে জড়ালেই সুন্দর দেখায় না। হলিউডের খ্যাত নামা সুন্দরীগণ বেশভূষা সম্বন্ধে নিখুঁত হবার চেষ্টা করেন সত্য কিন্তু কখনই তারা বাড়াবাড়ি

করেন না। আমাদের মেয়েদের কতক গুলো গয়না পরবার প্রথা আছে, তাতে অনেক সময়েই দেখা যায় তাদের সৌন্দর্য্য নষ্ট কচ্ছে। যাতে শরীরের ক্লেশ না হয়, অর্থাৎ খুব ঢিলে বা খুব টাইট বডি ব্লাউজ ব্যবহার করা উচিত নয়। শরীরের যে অংশ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে সমস্ত ভাগ গুলো কখনও খুলে রাখা উচিত নয়। তা অনেকটা লুকিয়ে রাখা দরকার। বুক খোলা বডি এই জন্যই ভাল নয়। লিনেন এবং তুলার কাপড় ব্যবহার করা উচিত। শীতকালেও কতকগুলো শীত বস্ত্র ব্যবহারে মেয়েদের শুধু খারাপ দেখায় না তাতে তাদের শরীরেও ক্ষতি হয়।

নখ ও চুলের উপর নজর রাখাও বিশেষ দরকার। বড় বড় নখ হলে ওর মধ্যে ময়লা ঢুকে ঐ ময়লা খাবার সময় পেটে যেতে পারে। কিন্তু তা না করে আমাদের শাস্ত্রের প্রথানুযায়ী হপ্তায় দু-বার নখ কাটা দরকার। কেশ নারী জাতির পরম আদরের। এই কেশ রক্ষা করার চেষ্টা করা সকল মেয়েরই উচিত। নখের মত চুলেরও প্রাণ আছে। চুল অনেকটা ফুলের মত জল ও হাওয়ায় বৃদ্ধি পায়। স্নান করেই চুল জড়িয়ে রাখার প্রথা শুধুই শরীরের হানি করে তা নয়, ওতে চুলেরও ক্ষতি হয়। আমাদের দেশে যে সব মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়ে তারা স্নান করার পরই, চুলটাকে কোন রকমে ঘাড়ের উপর তুলে দিয়ে ভাত খেয়ে বের হয়ে পড়ে, এই জন্যই এইসব মেয়েদের চুল প্রাণ হীন হয়ে পড়েছে। স্নানের পর রোদে বসে চুল শুকানোর যে ব্যবস্থা ছিল, তাই আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। ইউরোপ-আমেরিকার সুন্দরীরা এইরকম প্রায়ই করে থাকে। চুলে সোডা দেওয়া কর্ত্তব্য নয় ওতে অসময়ে চুল উঠে যেতে পারে। চুলের গোড়া যাতে বেশ স্বাস্থ্যবান থাকে—তা করাই দরকার। চুলের গোড়া খারাপ হ'য়ে গেলে, বাইরে নানা তেল ব্যবহার করলেও কোন উপকার হয় না। প্রত্যহ রাত্রে শয়ন করবার সময় বালিশের ওপর দিয়ে চুল গুলো ছড়িয়ে দিয়ে কাকেও বুরুষ দিয়ে আস্তে আস্তে ঝাড়তে বলবে, চিরুণী ব্যবহার আদৌ কর্ব্বেনা। তারপর একখানি সিল্কের রুমাল দিয়ে ধীরে ধীরে চুলগুলিকে মুছবে এতে চুলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। চুলের গোড়া নষ্ট হচ্ছে কিনা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা দরকার। এইরূপ হচ্ছে সন্দেহ মাত্র হলেই ডাক্তারের মত নিয়ে ভাল হেয়ার লোসন ব্যবহার করবে। বাজারে যে সমস্ত প্রচলিত তেল আছে, তাদের মধ্যে যে তেলগুলি বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত বলে চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত সেই গুলি ব্যবহার করা দরকার

চুলের পরই চোখের কথা মনে হচ্ছে। এ বিষয়ে আমাদের মেয়েদের যে বেশ দৃষ্টি আছে তা মনে হয় না। পড়া শুনা করা আজকাল দরকার কিন্তু তা বলে চোখের অপমৃত্যু ঘটান উচিত নয়। আমাদের মেয়েদের সব সময়ই মনে রাখা উচিত গোধূলিতে বা ইংরাজীতে যাকে Twilight বলে সে সময় পড়া উচিত নয়। আবার জোর ইলেকট্রিক আলোও চোখের জ্যোতি হরণ করে। পড়বার সময় আলো পিছন দিকে রেখে পড়া উচিত। প্রত্যহ সকাল, বিকাল দুই বার ঠাণ্ডা জলে বেশ করে চোখ ধুয়ে ফেলা ভাল। রোদে রোদে ছেলেদের মতন বেড়াতে গেলে চোখ খারাপ হবেই। সেইরূপ বেশী ছুঁচের কাজ করলেও চোখ খারাপ হয়। বৎসরে মধ্যে একবার বা দু বার সহরের বাইরে যেয়ে শ্যামবর্ণ ক্ষেত্রসমূহ দর্শন করতে পারলে চোখের জ্যোতি বাড়ে। জোড়া ভ্রূ ইচ্ছা কল্লেই কর্ত্তে পারা যায়। যাদের নেই তারা সামান্য দু-চার গাছা চুল যা আছে কাঁচি দিয়ে কেটে হাতে খানিকটা গোলাপের তেল লাগিয়ে সে জায়গা দিয়ে বার কতক ঘস্‌লেই চুল গজাবে। যাদের গোঁফের মতন জোড়া ভুরু, তাদের মাঝে মাঝে ক্লিপ দিয়ে কাটা দরকার। চোখের প্রধান খাদ্য ভাল দৃশ্য এবং মনের আনন্দ। ভাল চোখে কর্ত্তে গেলে স্বাভাবিক দৃশ্যে ভ্রমণ করতেই হবে তাতে মনেরও সুস্থতা আসবে।

অঙ্গরাগের নানাবিধ দেশী বিলাতি উপাদান আছে। তাদের তালিকা দিয়ে প্রবন্ধ বৃদ্ধি কর্ব্বার কোন দরকার দেখছি না, যে সমস্ত এসেন্স, পমেটম, রং আপনার পছন্দ এবং চিকিৎসকগণের মতে বিশুদ্ধ উপাদানে গঠিত সেইগুলি ব্যবহার কর্ত্তে পারলেই ভাল হয়। আল্‌তা ব্যবহার আমাদের দেশ থেকে উঠে গিয়ে, সেখানে চলছে তরল আল্‌তা। আমার মনে হয় যে উহা ক্ষতিকর। কস্‌-

মেটিক ব্যবহার না কর্ত্তে পারলেই ভাল। রং মাখার কথা আগেই বলেছি বিবেচনা করে ব্যবহার করা উচিত। এসেন্স ব্যবহার কর্ব্বার সময় মনে রাখা উচিত উগ্র গন্ধ কেহ পছন্দ করে না। যে সমস্ত এসেন্সের গন্ধ বেশ মিষ্ট তাই ব্যবহার করা ভাল। গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে চন্দন-লেপ এবং চন্দনের গুড়ায় উপকার হয়, ও'তে ঘামাচি মরে। রক্তচন্দন ব্যবহার করা উচিত নয়। সন্ধ্যার সময় ধূপ ধূনা ব্যবহার করা মন্দ নয়, ওতে মনের পবিত্রতা রক্ষা করে।

ফুল যদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তবে এসেন্স ব্যবহার নাও কর্ত্তে পারা যায়! শোবার ঘরে ফুলের তোড়া রাখা যেতে পারে, কিন্তু তা যেন শয়ন কর্ব্বার খাটের নিকট না থাকে। ফুলের গয়না এবং ফুলের বিছানার প্রথা সেকেলে প্রচলন ছিল। তত প্রচুর পরিমাণে ফুল এখন আর পাওয়া না। সুতরাং ওকথা উঠ্‌তেই পারে না। যদি পাওয়া যায়, তা হলে ও কতকগুলো ফুল ব্যবহার করাও আবার ঠিক নয়। ফুলের বিছানায় শয়ন করা উচিত নয়। উহা শরীরের অনিষ্ট কর। ফুলের গহনা প্রত্যহ ব্যবহার করা ও স্বাস্থ্যের হানিকর। এই জন্যই বলছিলাম গন্ধ হিসাবে ফুল ব্যবহার করা যেতে পারে, উহার পর্য্যাপ্ত ব্যবহারে ক্ষতি হতে পারে। দুধের সঙ্গে 'ভাল গোলাপ ফুলের পাতা সিদ্ধ করে, ছোট মেয়েদের খাওয়ানো ভাল। এ'তে রং অনেকটা গোলাপী আভা হয়। ফুলের নির্য্যাস নিয়ে গায়ে মাখতে পারলে গায়ের মসৃণতা বৃদ্ধি হয়। কস্তরীর গন্ধ তেজস্কর। বেশী ব্যবহার করা ভাল নয়। দোক্তা পান একেবারে ব্যবহার করা উচিত নয়। যে সমস্ত মেয়েদের আকাঙ্ক্ষা আছে যে তারা এক কালে সুন্দরী বলে অভিষিক্ত হ'বে, তাদের দোক্তা পান ব্যবহার না করাই ভাল।

সর্ব্বদাই শরীরের ন্যায় হাত ও দাঁত পরিষ্কার রাখা দরকার। যে রকম কঠিন কার্য্য করলে হাতে ফোস্কা পরতে পারে তা করা উচিত নয়। ঐরূপ কঠিন কাজ কর্ব্বার সময়, বা ঘর বা বিছানা ঝাঁট দিবার সময় হাতে দস্তানা ব্যবহার করা ভাল। রান্নাঘরে হাত ধোবার জন্য আইডিন বা বেনজিন মেশানো জল রাখা দরকার। রাত্রে হাতে একটু অলিভ অয়েল মাখালে হয়। কিন্তু এ কথাও মনে রাখা উচিত অলিভ অয়েলে ত্বকের মলিনতা আনে সুতরাং বেশী খানিকটা অলিভ অয়েল মাখা কোনমতেই উচিত নয়। সকাল বেলা বিছানা থেকে উঠে হাত বেশ করে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেলা উচিত। বাটনা বেটে হাতে রঙ্‌ ধরতে দেওয়া উচিত নয়। রান্নার সময় হাতে একটা আবরণ রাখ্‌তে পারলেই ভাল হয়।

মোটের ওপর যা যা বল্লাম, সে ভাবে চলতে পারলে মেয়েদের সৌন্দর্য্য রক্ষা এবং বৃদ্ধি করতে পারা যায়।

লঘুক্রিয়া

[গল্প]

শ্রীপ্রমীলা রায় চৌধুরী

এক

পূজার ছুটি আসন্ন···ষ্টেশনে, দোকানে, পথে ঘাটে ভিড়ের আর শেষ নাই...কনসেশনের সুবিধায় তিরিশ টাকার কেরাণীও পথে বেড়িয়ে পড়েছে ..আশা হোটেলে খেয়ে আর দুচার জনে মিলে একটা ঘর ভাড়া করে একটু এ দেশ-ও দেশ ঘুরে চোখের ও মনের তৃপ্তি সাধন করবে তারপর সম্বৎসরের মত দশটা, চারটের অফিস তো আছেই...।...

চতুর্থী কি এমনি কোন্ একটা তিথি হবে...সুকুমার বাবু তাঁর বিপুল পরিবারবর্গ নিয়ে দেশে চলেছিলেন...দেশ তাঁর বর্দ্ধমানের কাছেই...সঙ্গে ছিল ছয়টী ভাই ; তাদের বৌএরা, ছেলেপুলে, নাতি, নাত্‌নি এবং ঝি চাকরে মিলেও প্রায় একশ না হোক...কাছাকাছি বটে ! তবু তো সব কটা জামাই এসে জুট্‌তে পারেনি। কারো বা চাকরীর দোহাই...কারো বা মা-বাপের বালাই থাকায় তাদের বৌ কটি বাপের বাড়ী হলেও একটু ম্রিয়মাণা হয়েই ছিল। তবে ক্ষীণ আশা তাদের ছিল যে ষষ্ঠি থেকে অষ্টমী কি নবমী পর্য্যন্ত অ-নাথা হয়ে কাট্‌লেও ৺ বিজয়ার দিন স-নাথা তারা হতেও পারে।

দুখানা মেয়ে কামরা জিনিষ পত্র ও মেয়ে মানুষেই ভরে গেল দেখে, সুকুমার বাবু, পুরুষ ক'জন কে নিয়ে তাড়াতাড়ি আর একটা কামরায় উঠে পরলেন। ভাই ক'জন কেউই নাবালক নয় তবুও তাদের সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ঠ সাবধনতা...তাদের গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে বার বার করে তাদের নামতে বারণ করে, নিজের জায়গাটুকু বেদখল না হয়ে যায়...সে দিকে নজর রাখতে বলে... একবার মেয়ে কামরা দুটী দেখতে এলেন সব ঠিক মত হয়েছে কিনা ?

সুকুমার বাবুকে উঠ্‌তে দেখে তাঁর ভাদ্রবৌএরা সব ঘোম্‌টা দিয়ে দিয়ে জড়সড় হয়ে বসল...তাদের এই কষ্টকর অবস্থা দেখে বাক্সের সংখ্যা গুণে হাতের শ্লিপলেখার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে নিতে নিতে বল্লেন "লজ্জা করোনা মা, তোমরা...পথে ঘাটে অত লজ্জা করতে হয়না।'

ব্যস্ত ভাবে তিনি গাড়ী দুখানার প্রত্যেকটী জিনিষ তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলেন—হটাৎ বল্‌লেন "কই মা মলিনা ! তোমার ছাই রংয়ের সুটকেশটী দেখছি নাযে ! মলিনা তাঁর বড়ছেলের বউ...শ্বশুরের কথায় উঠে এসে চারিদিক চেয়ে দেখে বল্‌লে "না—বাবা দেখছিনে তো··· তাতে খোকার ফুড্‌, ষ্টোভ্‌, স্পিরিট সব গুছিয়ে নিয়ে ছিলাম ..কোথায় আবার পড়ে থাকলো সেটা ?"—হাতের শ্লিপটা পকেটে ফেলে পত্নী হেমনলিনীর কোল থেকে পৌত্র সুশান্তকে নিয়ে বললেন "তার জন্যে তুমি আর ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা ? শালা সারা রাস্তায় না হয় উপোষ করেই যাবে। কেমন রে ?"

এমন সময়ে সুবোধ তাঁর মেজ ছেলে হারানো সুট-কেশটা হাতে করে খুব হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বল্‌লে "এটা ও গাড়ীতে উঠেছিল দাদা বললে এখানে দিতে।—"

পৌত্রকে আদর করতে করতে সুকুমার বাবু বললেন "তোর বাপের এবার কর্ত্তব্য জ্ঞান হয়েছে, দেখছিস্‌ ? এক সঙ্গেই তোরও খাবার জুট্‌ল...আমারও পরিশ্রম বাঁচলো।"

সুবোধ ও মলিনা দুজনেই মাথা নীচু করে হেসে যে যার জায়গায় ফিরে গেল। নাতিকে তার ঠাকুমার কোলে ফিরিয়ে দিয়ে সুকুমার বাবুও নেমে গেলেন।

এই দলে একটী নতুন বৌও ছিল...মাসকয়েক মাত্র তার বিয়ে হয়েছে...এই দ্বিতীয় বার সে শ্বশুর বাড়ী এসেছে...শ্বশুর বাড়ী বা সেখানের কোন লোক সম্বন্ধে তার বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা...সে সুকুমারের সব চেয়ে ছোট ভাই সুপ্রকাশের বউ।

সুকুমার বাবু তাঁর পিতার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তান হওয়াতে

তাঁর শেষের দিকের ভাইবোন দুএকটী তাঁর নিজের ছেলে মেয়ের বয়সী হয়ে গিয়েছিল...সেই ভাইএর বৌএরা, বোনেরা নিজের ছেলের বৌ, প্রভৃতি মিলে একটা দল করে রেখেছিল···তার ভেতরে তারা নিজেরা ছাড়া আর কারো প্রবেশ নিষেধ ছিল। সুপ্রকাশের নতুন বৌ সতী-রাণীকে তারা নিজেদের দলে ভর্ত্তি করে নিয়েছিল।

সুপ্রকাশ এই দলে ছিলনা...তার কল্‌কাতার কাজ শেষ না হওয়ায় বাধ্য হয়ে আরো দুএকদিন থাক্‌তে হল। সে কিন্তু ষ্টেশনে সকলকে তুলে দিতে এসেছিল..গাড়ী ছাড়বার বাঁশী বাজতেই সে সতীদের কামরাটার সামনে দিয়ে বারদুয়েক ঘুরে গেল···সুন্দরী বউএর মুখ খানাযদি একবার বিদায় ক্ষণে দেখ্‌তে পায়! কিন্তু ননদের হাতের একটা টিপনি খেয়ে মুখ তুলে একবার সুপ্রকাশকে কামরার সামনে বেড়াতে দেখে সেই যে ঘোম্‌টা টেনে সে ফিরে বস্‌ল আর ঘুরে বস্‌লোনা। বৃথাই সুপ্রকাশ ঘুরে বেড়িয়ে গেল...।

হেম-নলিনী জানালার কাছের বেঞ্চিটাতে বসেছিলেন শুকনো মুখে সুপ্রকাশকে পায়চারী করতে দেখে...ব্যাপার বুঝ্‌তে পেরে..কৌতুকের লোভ আর সামলাতে পারলেন না। ইসারা করে তাকে ডেকে তিনি বললেন "আমসির মত মুখ শুকিয়ে বেড়াচ্ছ কেন প্রকাশ? আমাদের সঙ্গে গেলেইত পারতে!" দেওর হলেও তিনি তাদের জন্মাতে দেখেছেন বলে শেষের সব ক'জনকেই নাম ধরেই ডাকতেন।

হাতের কব্জিতে একটা চিম্‌টী দিয়ে সুপ্রকাশ মৃদু তর্জ্জনে বললে "আবার তোমার আরম্ভ হল? এক গাড়ী লোকের সমনে? দেখো অমন করলে আমি পুজোতেও যাবনা।" "ঈস্‌-স" বলে হেমনলিনী হেসে মুখ ফেরালেন, গাড়ী চলতে আরম্ভ হল।

ওদিকে সতীরাণীকে নিয়ে তার জা-কটী তখন খুব ক্ষেপিয়ে তুলছিল...। সুপ্রকাশের ঠিক ওপরের ভাই সুকোমলের বউ বধুমালতী বলছিল "একবার ফিরে বসলে তোর কি ক্ষতি হত সতী? ঠাকুরপো কত খুসী হত বল্‌ দিকি?

খুড়শাশুড়ীর কথায়-সায় দিয়ে মলিনা "হ্যাঁ—বাপু... আমার কিন্তু তোমার ওপর বড্‌ডো রাগ হচ্ছিল রাঙা খুড়ী! রাঙ্গাকাকা বলে এই দুপুর রোদে এল যে জন্যে! যেমন দেখা দিলেনা...নিজে ও দেখ্‌লেনা তেমনি যে কদিন রাঙা কাকা না যাচ্ছে, বিষমুখ করে থেকো—?" বলা বাহুল্য সুপ্রকাশ মলিনার স্বামী সুনীলের চেয়ে ছোট

এবার সতী কথা বললে—"কেন বিষমুখ করব কেন? পুজোর সময় খুব খুসী মনে থাকতে হয়...দেখো আমি... তোমাদের সকলের চেয়েই খুসী হয়ে থাক্‌ব···।

তার মুখখানা ধরে নেড়ে দিয়ে মধুমালতী আর ননদ বীণা একসঙ্গে বলে উঠলো "ইস্‌ তা আর নয়।

গাড়ীর একটানা চলার সুরে তাদের গল্পও একটানা চলতে লাগলো...।

ওধারে হেমনলিনী তাঁর আর তিনটী জাকে নিয়ে খাটী সাংসারিক গল্প আরম্ভ করে দিয়েছেন—এরা সবাই বারমাসই বিদেশে স্বামীদের কর্ম্মস্থলে থাকেন বৎসরান্তে এই একটী মাসের মেলামেশার জন্যে সবাই দিনগুণে কাটান—চিঠি পত্রে তো আর সব খুলে জানান যায় না—তাই জমানো সব কথাগুলি শাশুড়িকে না জানালে শান্তি নেই। বিদেশে—আপন আপন ঘরে সবাই কর্ত্রী হলেও দেশে সে কর্ত্তৃত্ব সকলে হেমনলিনীকেই ছেড়ে দেন—তাঁর কথায় তাঁদের সকলের চলাফেরা—। এই একটী মাস সকলেরই যেন স্বপ্নের মত কেটে যায়—ছুটী ফুরোলে যে যার কর্ম্মস্থলে চলে যায়—সজলচোখে, বাড়ীটায় এক বছরের মত তালা দিয়ে সকলের শেষে হেমনলিনী নিজের দলটি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় ফেরেন—এইই সুকুমার বাবুর চিরদিনের নিয়ম।

দুই

বর্দ্ধমান ষ্টেশনে ট্রেন ছেড়েদিয়ে ক্রোশ চারেক মেঠো রাস্তা পার হয়ে এই বিপুল বাহিনী যখন তাদের দেশের বাড়ীতে এসে পৌছাল তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে—পুরুষদের হাতে যে কটী টর্চ্চ ছিল তাই আলো ফেলে ফেলে কোনরকমে চাকরদের সাহায্যে 'ডিট্‌জের' হারিকেন আর ছোট ছোট টেবিল ল্যাম্প কটী জ্বালিয়ে তারা হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন। এর পরে...

কিছু করণীয়—তার চার্জ্জে স্বয়ং হেমনলিনী—সুতরাং সেদিকে যাবার একেবারেই দরকার নেই তাঁদের—।

হেমনলিনীও এদিকে নিশ্চিন্ত ছিলেন না—প্রকাণ্ড দুটী বেতের টিফিন বাস্কেট খুলে তিনি সবচেয়ে আগে ষ্টোভটী জেলে এ্যালুমিনিয়মের খুব বড় একটী সসপ্যান বের করে সঙ্গের জলের সোরা থেকে জল নিয়ে ষ্টোভের ওপর বসিয়ে দিলেন—। তারপরে সেই বাস্কেট দুটী থেকে লুচি, ভাজা, সন্দেশ, বের করে কলকাতা থেকে আনা ধোওয়া কলাপাতার টুকরাগুলিতে সাজাতে বসলেন। মলিনাকে তিনি তার সাহায্যের জন্যে ডেকে নিলেন—কারণ সে সকলেরই কন্যাস্থানীয়া—তার তো কোথাও বাধা নেই—দুজনে মিলে খাবার সাজিয়ে, সে গুলি মলিনা একে একে সকলকে পৌঁছে দিতে লাগলো। এদিকে প্যানের জল ফুটে উঠছিল। বাস্কেট থেকে চায়ের একটা বাণ্ডিল বের করে তাতে ফেলে দিয়ে তিনি দুচার ট কাপ যা সঙ্গে এনেছিলেন তাই মলিনাকে গুছিয়ে দিতে বললেন—ওদিকে ষ্টোভের ওপর আর একটা প্যানে জল চড়লো—। এই জল দিয়ে কচি কাচা ছেলেপুলের ফুড্ তৈরী হবে—না হলে সদ্য সদ্য দুধের ব্যবস্থা কি করে হয়!

পুরুষদের জলখাবার ও চা খাওয়া হয়ে গেলে—হেমনলিনী সঙ্গে সঙ্গেই বৌঝি দেরও ডাকতে পাঠালেন। তাদের খাওয়া ব্যাপারটাও চুকে গেল—বাকী রইল শুধু হেমনলিনী নিজে আর তার পর পরই তিনটী 'জা'। দুটী রাঁধুনে বামুন আর ঝি চাকরদের গুণে গুণে খাবারের পয়সা দিয়ে—একটা হ্যারিকেন হাতে নিয়ে জায়েদের সঙ্গে গল্প করতে করতে তিনি পুকুর ঘাটে গেলেন - গা, হাত মুখ ধুয়ে ঘাটেই সন্ধ্যাহ্নিক করে ফিরবেন—।

রাত প্রায় এক প্রহর হলে ঘুমন্ত আধঘুমন্ত বৌঝি ছেলেমেয়ে সব ডাকাডাকি করে, দুটো ঘরে পুরুষদের ও মেয়েদের একসঙ্গে মুগের ডালের খিচুড়ী, হাঁসের ডিমের মামলেট ও মোরব্বা আচার, প্রভৃতি দিয়ে খাইয়ে দিলেন—প্রথম দিন—কাজেই ব্যবস্থা হতে একটু দেরীই হল—।

সকলের খাওয়া হয়ে গেল নিজেদের খাওয়ার পালা চুকিয়ে—শুতে যাওয়ার আগে তিনি তাঁর মেয়ের মত নতুন 'জা' টী কোথায় শুয়েছে—দেখতে গেলেন। সুপ্রকাশ বারবার করে তাঁকে বলে দিয়েছিল যে সতীর ঘুম ভাল নয়—বড় গাঢ় ঘুম যেখানে সেখানে যেন শুয়ে ঘুমিয়ে না পড়ে সে—এটা যেন লক্ষ্য করা হয়—।

বীণা, টুনু দুই ননদ ও সতী এক ঘরে শুয়ে গল্প করছিল—একজন ঝিএর ও সে ঘরে শোওয়ার কথা—হেমনলিনী সতীকে দেখ্‌তে পেয়েও তার সঙ্গে আলাপ জমাইবার ইচ্ছায় বলিলেন, "সতী কই রে?"

শাশুড়ীর মত 'বড়জা' কে আসতে দেখেই সতী জড় সড় হয়ে উঠে বসেছিল—এখন তাঁর কথায় বিছানা থেকে নেমে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একটু হেসে হেমনলিনী বললেন "না ডাকিনি তোকে শুধু দেখতে এলাম কোথায় শুয়েছিস? গচ্ছিত জিনিষ মানে মানে ফিরিয়ে দিতে পারলে বাঁচি।"

সতী মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলে...। "মন কেমন কচ্ছে নাকি মা'র জন্যে?"

সতী বললে "না...আপনি আর মন কেমন করতে দিলেন কই?" হেসে হেমনলিনী বললেন "নে—শো... এখন...রাত হয়েছে...আমি যাই সুশান্তকে দুধ খাওয়াতে তুলি গে...মলিনার যা ঘুম! তিনি পিছন না ফির্‌তেই বীণা বললে "শোনো বড় বৌদি...আমার একটি ঘর চাই...।"

"তা আজই তুই ঘর নিয়ে করবি কি চারু আসুক?" বলা বহুল্য চারু বীণার স্বামী.. কোন্ একটা কোলিয়ারীর ম্যানেজার! বিরক্তির সঙ্গে বীণা বললে "আ মরণ আর কি! চুলোয় যাও তুমি! আমরা থিয়েটার করব তার পাট মুখস্থ করার জন্যে ঘর চাই...বুঝলে? এ হট্ট গোলে তো হবেনা।" "তা করিস্! কাল দিনের বেলা দেখে ঠিক করে নিস্! কে—কে করবি?"—

"এই আমাদেরই দলের সব ক'জন।—আর তোমরা দেখবে পুরুষেরা বাদ···।—রাঙা বউদি বেশ সুন্দর বলতে পারে...এতক্ষণ তো তাই শুনছিলাম...ওকে দিয়েও সেদিন করাব।" "তা পালাটা কিসের হবে?—রাবণনা মহীরাবণ বধ?"—

গম্ভীরভাবে বীণা বললে "দুটোর একটাও নয়..ও

দুটো হচ্ছে যাত্রা। তা ছাড়া রাবণ, মহীরাবণ পুরুষ... আমরা দর্শক ও অভিনেতা দুটোই বাদ দিয়ে খাঁটী মেয়েদের অভিনয় করব রবি বাবুর লক্ষ্মীর পরীক্ষা।'

তিন

নবমীর দিন সন্ধ্যা বেলা বীণা ও টুনুর বর এলো... কিন্তু সুপ্রকাশের তখনো দেখা নেই।...সকলে সতীকে ঠাট্টা করতে লাগলো যে সকলের বরই এলো ..শুধু তার বরেরই বা দেখা নেই কেন? সে এমন বেরসিক কেন?...

সতী এত সব অনুযোগের উত্তরে কিছুই বলে না... শুধু হাসে। তখন হাসলেও...একটু আড়ালে সরে গেলেই...তার মনে হ'ত সত্যিই তো ..সপ্তমী গেল, অষ্টমী গেল...নবমীর রাতও এসে গেল ..শুধু সে-ই বা আসেনা কেন? না আস্‌বে যদি তবে এখানে আমাকে আসতেই বা বল্‌লে কেন? কলকাতায় থাকলে নিশ্চয় দেখা হ'ত!...

হেমনলিনী নন্দাইদের খাওয়া দাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত থাক্‌লেও মনে তাঁর তখন সুপ্রকাশের কথাই জাগ্‌ছিল···কেমন ছেলে? আস্‌ব বলে আসেনা!

রাত্রের খাওয়ার হাঙ্গামা শেষ হয়ে গেলে...হেমনলিনী ভাঁড়ারে তালা চাবী লাগিয়ে ওপরে উঠছিলেন।... উঠোনে কার ছায়ামূর্ত্তি দেখে...একটু যেন ভয় হল। দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "কে?"—

একটা সাইকেল ঠেস দিয়ে রাখার মৃদু শব্দ হল। সিঁড়ির মধ্যেকার ম্লান আলোর ছায়ামূর্ত্তির মূর্ত্তি স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌তেই হেমনলিনী হেসে আবার নীচে নাম্‌লেন...।

"কি করে এলে? এখন আর ট্রেণ আছে নাকি?" যে এসেছিল সে সুপ্রকাশ...।—মৃদুস্বরে বল্লে "ট্রেণ না থাক্...সাইকেল আছে তো?"—বলে সে একটু হাস্‌ল...।

সবিস্ময়ে হেমনলিনী বললেন "ওমা সেকি! এই এত পথ তুমি সাইকেলে করে এলে নাকি?"

সুপ্রকাশ মাথা নেড়ে জানালে সেই রকমই একটা কিছু সে করেছে...'—

"তারপর তোমাদের খাওয়া দাওয়া সব শেষ তো?"

"হ্যাঁ—তা হলেই বা···তোমাকে খাবার দিচ্ছি।"

"ও ব্যাপার আমি পথেই চুকিয়ে এসেছি···বর্দ্ধমানে সুতরাং ব্যস্ত তোমার হতে হবেনা···বুঝলে?"

"হ্যাঁ...বুঝেছি।...এখন শুধু শোওয়ায় ভাবনা। আর সেইটাই তোমার মাথায় ঘুরছে।"

খুব জোরে হেমললিনীর হাতে একটা চিম্‌টি কেটে সুপ্রকাশ বল্‌লে "ঠাট্টা করার অভ্যেস তোমার গেলনা দেখ্‌ছি...সময় ও সুবিধা পেলেই তার সদ্ব্যবহার করেই থাক···না? কোথায় কৃতজ্ঞ হবে যে এই রাত্‌ দুপুরে তোমাকে খাটালাম না—না আমাকেই জ্বালাতে সুরু করেছ..."

"আহা।...আমার খাটনীর ভয়েই তো তুমি সারা! পাছে তোমার খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি বাজে কাজে সময় নষ্ট হয়...তাইনা তুমি ও পাট সেরে এসেছ!—"

"খাওয়াটা বুঝি কাজ হল?"—"নয় তো কি?— এখন তো বটেই!" সুপ্রকাশ কথাটা চাপা দিয়ে বল্‌লে শোবার জায়গা দেখাবে না ঝগড়া করবে সারারাত! এতটা পথ সাইকেলে এসে গা, হাত, পা সব এত ব্যথা হয়েছে যে আর দেরী হলে এইখানেই শুয়ে পড়্‌ব! তখন আর তুল্‌তে পারবেনা।..."

"না—উঠলে; আমার বড্‌ডো ক্ষতি।...নেও...চল... ঘরে গিয়ে এখন কড়িকাঠ গোণ গি'য়ে।...তাদের এখন থিয়েটার হচ্ছে!" "সে কি? কিসের থিয়েটার?"

"তোমার বোনদের সখ হয়েছে সবাই মিলে ৺বিজয়ার রাত্রে একটা ছোট 'প্লে' করবে...তারই 'রিহার্সাল, চল্‌ছে ..দিনে রাত চোখে ঘুম নেই সব...আপন মনে আওড়াচ্ছেই!...

হেসে সুপ্রকাশ বল্লে "রক্ষে কর! তোমার বলার বহরে আমার তো ভয়ই হয়ে গিছল! আমরা দেখতে পাব তো?"

"উহুঁ...পুরুষ বর্জ্জিত থিয়েটার বলে···দর্শকদলের মধ্যেও তোমাদের স্থান নেই। তবে যদি মেয়ে সেজে দেখ্‌তে চাও তো দেখাতে পারি।...

"না...তাতে আমার রুচি নেই।"···বলে সুপ্রকাশ শুতে চলে গেল। হেমললিনীও মনে মনে হাস্‌তে হাস্‌তে বীণাদের থিয়েটারের রিহার্সাল দেখতে গেলেন...।

থিয়েটার তখন পুরো দমে চল্‌ছে…লক্ষ্মী ক্ষীরিঝিকে জগী দিয়ে পরীক্ষা করছে তার মনের প্রসার কতদূর!

হেমনলিনী এসে বস্‌লেন…সুপ্রকাশ যে এসেছে তা তিনি কাউকে বল্‌লেন না।…ভাবলেন। আধঘণ্টাই না হয় চলবে।

তারপরে ঘরে শুতে গেলেই তো সতী সুপ্রকাশের আসা জান্‌তে পারবে।…নিবিষ্ট মনে তিনি দেখে যেতে লাগলেন।…

মিনিট দশেক হয়েছে…কিনা…বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে হেমনলিনী উঠে খুলে দিয়ে দেখলেন সুপ্রকাশ দাঁড়িয়ে…ইসারায় চুপ করতে বলে সুপ্রকাশ তাঁকে বাইরে নিয়ে এল…।

সুপ্রকাশ দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁর হাত চেপে ধরে যে ঘরে শুয়ে ছিল সেই ঘরে নিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

তার ব্যবহারে হেমনলিনী একেবারে স্তম্ভিত… নির্ব্বাক! একটু পরে বললেন "তোমার হল কি?

বুঝতে পারছিনে যে বোঝাচ্ছি—কিন্তু তার আগে—তুমি আমাকে বোঝাও তো—এগুলো কি? বলে একখানা চিঠি—পোষ্টাফিসের ছাপমারা খাম—একখানা আধলেখা চিঠি-শুদ্ধ 'রাইটিংপ্যাড' একটা তাঁর হাতে তুলে দিলে—।

হেমনলিনী লেখা চিঠি খানার ওপর আর নীচটা পড়ে চমকে উঠলেন—পরে না লেখা চিঠিখানার লেখাটার দিকে সাহস করে না চেয়ে ক্ষীণ স্বরে বললেন "এটা তো বোধ হয় সতীর লেখা—।"

সুপ্রকাশের মুখ চোখ হিংসায় কালো হয়ে উঠেছিল—বল্লে "বোধহয় নয়—সত্যিই—কিন্তু ও নাম বলে—নামের আর অপমান করা কেন নামের আগে একটা 'অ' বসিয়ে নিলেই চলবে এখন থেকে—।

বাধা দিয়ে হেমনলিনী বললেন "আঃ! কি যে বলো সুপ্রকাশ! না—না—অত সুন্দর চেহারা যার,—তার মনের ভিতরে কখনও অসুন্দরের ঠাঁই হয় না।

"ঠিক উল্টোই হয় বৌদি! সুন্দরের ভেতরই অসুন্দর থাকে—না হলে চাঁদে কলঙ্ক কেন? কাল ভোরেই আমি ফিরে যাচ্ছি—এই রাত টুকু আর তুমি গোলযোগ করোনা আমার আসার খবর তো কেউ জানেনা—মোটেই আসিনি তাই ভাল—উঃ! কাউকেই বোঝা যায়না।

হেমনলিনী বললেন আমাকে একবার জিজ্ঞেস করে আসতে দেও—তারপরে সত্যই যদি অনাচার ঘটে থাকে—তবে তোমার যা ইচ্ছে তাই করো—আমি কিছুই বাধা দেবনা—। বলে সেই চিঠি দুখানি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন—। মৃদুস্বরে সুপ্রকাশ বল্‌লে "যাবে—যাও কিন্তু ফল কিছুই হবেনা—আমি একেবারে সন্ন্যাসী হয়ে যাব"। চিঠির মধ্যেকার দুটো কথা সুপ্রকাশের মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল—। লেখা চিঠিটার সম্বোধন ছিল "আমার প্রিয়তমা" নাম সই ছিল তোমার প্রিয়—। আর সতীর চিঠিটার আরম্ভে ছিল আমার প্রিয়—নাম সই কি হত তা জানা গেল না চিঠিটা শেষ হয় নি বলে—। শুয়ে শুয়ে সুপ্রকাশ তার তপস্যার জন্য মনে মনে জায়গা বাছছিল—।

রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে—ভাবতে ভাবতে সুপ্রকাশ ঘুমিয়ে পড়েছিল—হটাৎ ঘুম ভেঙে শুনলে হেমনলিনী বলছেন "ওঠো ওঠো—'সন্ন্যাসী' মানুষের এত ঘুম কিসের? নেও গেরুয়া চিমটে—কমণ্ডলু আর কি কি লাগবে বল—সতী সব গুছিয়ে গুছিয়ে এনে দিক্—। বাবাঃ। এত যা' তা ভাবতেও পারো! তোমার রাগ বা হিংসার মূলে সত্যিকারের কোন কারণই নেই—যা দেখে ক্ষেপে উঠেছ—সেটা ওরই এক বন্ধুর লেখা চিঠি ও তারই উত্তর দিচ্ছিল—।

বোকার মত সুপ্রকাশ বল্‌লে "তাই বলে এমন সম্বোধন? রাগ যে আপনিই আসে!

"কেন হয়না? তোমার যা খুসি তাই করতে পার—আর আমরা সামান্য সরল ঠাট্টা তামাসা করলেই তার বিচার তোমরা এমনি করেই কর না! তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে কারণ ছিল—রোমিও জুলিয়েটার গোটা কতক 'সিন' প্লে করার ফলেই ওদের এই সম্বন্ধের উৎপত্তি—আর তাই চিঠিতেও চলছে—। তোমার ইচ্ছা হয়—তুমি আবার শোন ওর কাছে—আমি ঘুমুতে গেলাম—।" দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে হেমনলিনী বেরিয়ে গেলেন।

অপরাধীর মত মাথা নীচু করে সুপ্রকাশ যেখানে

সতী দাঁড়িয়ে কাঁপছিল—সেখানে আগিয়ে এল। বলবার মত কথা কিছুই খুঁজে না পেয়ে নিতান্ত বেহায়ার মত বললে "আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে কি সতী?"

সতী কিছুই বললে না—তার সমস্ত শরীরটা শুধু থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল—। সুপ্রকাশের মনস্তাপের শেষ ছিল না—। কি করেই যে সে এই অবিচারিতা পত্নীকে সান্ত্বনা দেয় বুঝে পাচ্ছিলনা—। তার হাত দুটো ধরে বললে "আর তোমাকে কোনদিন ভুল বুঝবনা সতী—এবারের মত আমাকে ক্ষমা কর—।" বাইরে কে যেন শাঁখ বাজিয়ে ছুটে পালালো।

"স্বাধীনতা ও সম্মান"

[গল্প]

শ্রীমতী আশলতা দেবী

চিত্রায় সেদিন উডম্যান অফ্ এ্যাফেয়ার বায়স্কোপ হচ্ছে। প্রধান ভূমিকায় গ্রেটা গার্ব্বো। গ্রেটা গার্ব্বো তখন চলতি ফ্যাশান। স্কুলকলেজের মেয়েরা তার নামে পাগল। সমস্ত হলটা ভর্ত্তি। গ্রেটা গার্ব্বোর অভিনয় দেখতে কলেজের ছেলেরা এবং মেয়েরা ভীড় করে এসেছে।

আরম্ভ হবার ঠিক মিনিট পাঁচেক আগে গেটের কাছে একটি সুদৃশ্য মোটর এসে দাঁড়াল। দেখলেই বোঝা যায় প্রাইভেট্ মোটর, ট্যাক্সি নয়। ড্রাইভার নেমে দরজা খুলে দিলে। একটী সুন্দরী বাইশ তেইশ বছরের তরুণী টক্ করে নেমে পড়ল। তার পরণে ভায়োলেট্রঙের সিল্কের শাড়ি। মাথার দু পাশে, কাঁধে, বুকে, খোঁপার পিছনে, এমনি নানাস্থানে চুনি-মুক্তা খচিত গোটা দশেক ব্রোচের বন্ধনে শাড়িখানি অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে গায়ে জড়ান। পায়ে হিল-উঁচু জুতা, হাতে রিষ্ট ওয়াচ। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে উদ্বিগ্ন এবং ব্যস্ত হয়ে বললে, "নেমে পড় চারু। আর সময় নেই, মিনিট পাঁচেক মধ্যেই সুরু হবে।"

টিকিট ঘরের সামনে তখনও অবিশ্রান্ত জনপ্রবাহ। চারুশীলা অবগুণ্ঠনের মাত্রা আর একটু বাড়িয়ে একটি কাশির সিল্কের চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে আস্তে আস্তে নামল। ঘোমটার থেকে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে, "উঃ লোকের কী ভিড়! দিদি, সেই কালেই বলেছিলুম ভাসুর ঠাকুরকে সঙ্গে নাও! নিলেনা, এখন কি হবে।

"কিছুই হবে না"—চপলা হেসে ফেললে, "কিন্তু তুমি দয়া করে মাথার কাপড়টা একটু নামাও দেখি! হোঁচট খেয়ে এখনই পড়ে যাবে।"

চপলা আর চারুশীলা দুই জা। কিন্তু দু'জনের অবস্থা, পারিপার্শ্বিক এবং স্বভাব ও শিক্ষাদীক্ষা একেবারে আলাদা। ভবানীপুরের একটি ছোট দোতালা বাড়ীতে চারুশশী তার স্বামীর সঙ্গে থাকে। স্বামী শ দুই টাকার মতন কি একটা চাকরী করেন কোন মার্চ্চেন্ট অফিসে। বড় যা চপলা থাকে মুক্তারাম'রো ষ্ট্রীটে। তার স্বামীর তরুণকালে উচ্চাশা ছিল অগাধ। নিজের চেষ্টায় চাকরি করতে করতে ল' পাশ করেন, এবং ওকালতীতে কিছু টাকা জমিয়ে ব্যারিষ্টরী পাশ করে এসেচেন বিলেত থেকে।

কালক্রমে এখন হাইকোর্টে তাঁর বিশেষ পশার। নিজে যথেষ্ট উপার্জ্জনক্ষম হয়ে কিছু বেশি বয়সে নব্যশিক্ষিতা সুন্দরী চপলা বসুকে বিয়ে করেচেন। কিন্তু এ-গেল পূর্ব্ব ইতিহাস। এখন কন্সার্টের বাজনা, উজ্জ্বল আলো এবং অগণ্য লোক প্রবাহের সামনে চারুশশী স্তম্ভিত, মুহ্যমানের মত দাঁড়িয়ে আছে। মিনিট দুয়েকের মধ্যে দু'খানা ফাষ্ট-ক্লাসের টিকিট করে নিয়ে এসে তার গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে চপলা বললে, "চল।"

"আরম্ভ হয়ে গেছে বুঝি দিদি?" সাগ্রহে চারু প্রশ্ন করলে। "আরম্ভ হলেও প্রথমে কমিকটা হবে। কিন্তু তুমিইত দেরী করলে চারু। আমি প্রায় আধঘন্টা মোটর নিয়ে তোমার বাড়ী দাঁড়িয়েছিলুম।"

"কী করা যায় ভাই, খুকীকে দুধ খাইয়ে ঘুম প্যাড়িয়ে ঝিয়ের জিম্মা করে দিয়ে তবেইত আমি ছুটি পাব।"

এক ঘণ্টা পরে :—

গ্রেটা গার্বোর অভিনয়-মাধুর্য্য তখন চরম স্থানে পৌছেচে। ছবির পর্দ্দাতে. নার্সিং হোমের কোন ঘরে গ্রেটা গার্বো উত্তেজনাবশে রোগশয্যা থেকে উঠে এসে তখন একটি ফুলের তোড়া টেবিল থেকে তুলে নিয়ে আবেগ পূর্ণ ভাবে কখন আপন বাহুতে কখন অধরে স্পর্শ করছেন। তাঁর ভাব উচ্চকিত, চোখের দৃষ্টি উৎসুক। তাঁর মনে হচ্চে যেন কোন পরিচিত প্রিয় কণ্ঠের স্বর শুনতে পাচ্ছেন। সে স্বর কতদিন শোনেন নি। তা কি সত্য—তা কি বিকার গ্রস্ত, রোগক্লান্ত মনের উত্তেজিত কল্পনা? —সত্য এবং কল্পনার সীমারেখা ক্রমশঃ মিলিয়ে আসচে। বাইরের করিডোরে তাঁর পূর্ব্বপ্রণয়ী বসে আছেন। এই অনির্ব্বচনীয় দৃশ্যে গ্রিটাগার্বো তাঁর সমস্ত অভিনয় নৈপুণ্য প্রয়োগ করেচেন। প্রশান্ত করুনতায় স্মৃতিভারা-ক্লান্ত বিষাদে, তাঁর প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গী অপূর্ব্ব হয়ে উঠেচে। চপলা আবিষ্ট হয়ে মৃদুস্বরে বললে, "মিঃ বসু দেখচেন? বুঝতে পারচেন, এই হোল সৌন্দর্য্যের চরম অভিব্যক্তি। একেই বলে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য, আর্ট ফর আর্টস সেক। যেখানে আর সব রকম উদ্দেশ্য; নীতি, ন্যায় অন্যায় সমস্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। হয়ে গেছে নিষ্প্রভ।

মিঃ বসু। বটেই ত। আমরাও তাই মনে করি। কিন্তু হয়ত আপনার মত সুললিত, সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পারিনে। চারুশশী পাশের চেয়ারে বসে ঘামছিল। বায়োস্কোপের ছবির বদলে তার চোখের সুমুখে ভেসে উঠছিল, খুকী হয়ত এতক্ষণ ঘুম থেকে উঠেচে, ঝি তার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে গেছে—খুকীর ওঠা সে কি লক্ষ্য করেছে? কিন্তু না সে ভয় নেই। খুকীর খাট থেকে পড়ে যাবার ভয় নেই। আগের থেকে এই ভয় কল্পনা করেই চারু খাটের চারিদিকে বেষ্টন লাগিয়েছে। চপলা তখন মুগ্ধ অপলক নেত্রে গ্রিটা গার্বের দিকে চেয়ে আছে, চারু তার কাপড়ের আঁচলে টান দিয়ে বললে, "দিদি, ও দিদি আমাকে একটু বুঝিয়ে দাওনা কী হচ্ছে। ওই মেয়েটি হঠাৎ এক গোছা ফুলের উপর মুখ রেখে কাঁদছে কেন? যাই বল মেম হলেও মেয়েটীর মুখশ্রী ভালো—না মেয়েটিকে দেখতে সত্যিই ভালো।"

চপলা বললে, "চারু, চুপ কর। যা বোঝাবার পরে বুঝিয়ে দেব। এখন কথা বললে দেখা হবে না। যারা দেখচে তাদের ব্যাঘাত করা হবে।"

মিঃ বসু চপলার পাশে বসেছিলেন এবং তাঁর পাশেই বসেছিল সোমেন মুখার্জ্জি। সোমেন মুখ টিপে হেসে বললে, "মিসেস মিত্র আপনার সাথীটি কে? যদি অপরাধ মার্জ্জনা করেন তাহলে বলব উনি কি আপনার সঙ্গিনী হবার উপযুক্ত?"

চপলা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "যোগ্যের সঙ্গে সুযোগ্যকে সাথী হতে এ সংসারে আপনি ক'টা দেখেচেন সোমেন বাবু?" কথাটার উত্তর ঘুরিয়ে বলা। এবং তার উপর কথার সঙ্গে যে উদ্গত নিঃশ্বাসটুকু মিশ্রিত হয়েচ তার যে কী অর্থ না হতে পারে, সোমেন তা ভেবে পেলেনা। না না, তার ভাববার সাহস হোলনা। সভয়ে নিজের মনকে ঘুরিয়ে নিয়ে সে ছবির দিকে মনোযোগ দিলে।

বায়োস্কোপ ভাঙ্গল। একটি সুমধুর বিষাদময় সৌন্দর্য্যে চপলার মন পরিপূর্ণ। কিন্তু চারুশশী মোটরে চড়তে চড়তে বিরক্ত হয়ে বললে, "কতদিন ধরে ওঁকে বলে রেখে-ছিলুম যে দিদির সঙ্গে একটি বার বায়োস্কোপে যাব। তার পরে আজকে ত এক রকম না বলেই এলুম দিদি। তুমি ওঁর ফেরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলেনা পাছে দেরী হয়ে হয়ে যায়। কিন্তু এত উদয্যুগ এত তাড়াতাড়ি করে আসার ফল এই! কী দেখতে তোমরা রোজ আস দিদি? এর কোনখানটা তোমাদের ভালো লাগে? না আছে দুটো ঠাকুর দেবতার কথা, না আছে দেখবার মত কিছু।"

চপলা মুখটিপে হেসে বললে,—"গল্পটা কিছু বুঝতে পারলে চারু?"

"কী যে বলো! বুঝব কী করে?—আমি কি তোমাদের মত ইংরেজী জানি।"

"তাই, ভাগ্য বোঝনি চারু! বুঝতে পারলে হয়ত

আমার মুখ দেখতেনা। তোমাকে এইসব দেখাতে নিয়ে এসেচি বলে।"

"কেন দিদি? খুব বুঝি চোর ডাকাত খুনেদের কথা?"

"কী ছেলেমানুষ তুমি চারু? গল্পটা না বুঝতে পার, পাত্র পাত্রীর চেহারাত ছবিতে দেখলে। তাদের মুখের চেহারা কি চোর ডাকাতদের মত দেখতে লাগে? তেমন মুখ সত্যিকার জীবনে ক'টা দেখতে পাও? দেখতে পেলে কি খুসী হওনা? চপলা মোটরের দরজার হাতলে হাত রেখে এতক্ষণ গল্প করছিল, এখন উত্তেজনার বশে জোরে হাতল ঘুরিয়ে একেবারে গদীতে ঠেশান দিয়ে বসল"। মিঃ বসু কাছাকাছি ঘুরছিলেন কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখনই বাড়ী ফিরবেন?"

সোমেন বললে, "এখন কটাই বা বাজলো?"

"না, এখনই ঠিক অবশ্য বাড়ী ফিরতে ইচ্ছা করচেনা" চপলা বললে। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললে, "চারু তোমার হয়ত রাত হয়ে যাবে, খুকী কাঁদবে। ড্রাইভারকে বলব তোমাকে পৌছে দিয়ে আসবে? সঙ্গে রামকিষণ আছে, পুরোনো ড্রাইভার। আশা করি তোমার আপত্তির কোন কারণ নেই?

চারু ভীতভাবে উত্তর দিলে, "নানা তা কেমন করে হবে? সে আমি কিছুতেই পারবনা তুমি যেখানেই যাও আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলা খুকী কাঁদবেনা তাকে ঝিয়ের জিম্মায় রেখে এসেচি।"

চপলা বিরক্তিতে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, "আচ্ছা তাহলে চল।" সোমেন আর মিঃবসু সামনের দিকের আসনে বসলেন।

নিউমার্কেটের সামনে মোটরটা দাড়াল। ওঁরা তিনজনে নেমে পড়ে গল্প করতে করতে হাসতে হাসতে চললেন। চারুশশী সঙ্কুচিত ভাবে পিছনে পিছনে নিঃশব্দে তাঁদের অনুসরণ করে চলল।

নিউমার্কেটের ভিতর এত আলো জ্বলছে, স্থানটা দিবালোকের মত উজ্জ্বল। সেই প্রখর আলোয় চপলার ফর্সা রঙ এবং অনুপম বেশভূষা সত্যই বিদ্যুতের মত দেখাচ্ছে।

কাশির সিল্কের চাদরের অবগুণ্ঠন ঈষৎ ফাক করে সেই দিকে চেয়ে চারু মনে মনে বললে, "দিদি যে সুন্দরী একথাটা অস্বীকার করবার যো নেই।"

সোমেন একটা কলেজের নাম করে বললে, জানেন, অমুক কলেজের দুটি ছেলে একই দিনে আত্মহত্যা করেছে। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের এবং আনন্দের কথা হচ্ছে তাদের দুজনেরই ঘরে পাওয়া গেছে গ্রিটাগার্ব্বোর ছবি। ফুলের ভারে আচ্ছন্ন।"

চপলা মৃদুস্বরে বললে, "সৌন্দর্য্যের পায়ে আত্ম নিবেদন। বুঝতে পেরেছেন ত? সৌন্দর্য্যের কাছে যে দেশ, কাল, পাত্র নেই। এবং সম্ভব ও অসম্ভবের সীমা গেছে মুছে।"

বসু ওপাশ থেকে প্রতিবাদ করে বললেন "কিন্তু তাহলেও আত্মহত্যার কি দরকার ছিল?"

"আত্মহত্যার কি আবশ্যক ছিল"—চপলা বলতে লাগল "তা অবশ্য আমি জানিনে। আমি শুধু এইটুকু জানি মৃত্যু মুহূর্ত্তেও তারা অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ীকে স্মরণ করে মৃত্যুকেও মর্য্যাদা দিয়ে গেছেন!"

বসু আবার প্রতিবাদ করে বললেন, "অপরাধ নেবেন না, কিন্তু আমি এখনও সংশয় না করে থাকতে পারচিনে যে এর মধ্যে সৌন্দর্য্য কোথায়? বাঙ্গালীর ছেলেদের এই হয়েছে মুস্কিল। অনবরত য়ুরোপীয় সাহিত্য এবং সিনেমার সংস্পর্শে এসে তাদের কল্পনাবৃত্তি হয়ে উঠেচে অস্বাভাবিক রূপে উত্তেজিত; অথচ সে রকম সামাজিক জীবনের বিস্তার তাদের নেই। তারই ফল এই ধরণের সব কাণ্ড। আমি আবার আপনাকে প্রশ্ন করব :—বলুন এর কী প্রয়োজন ছিল? হয়ত পাশের বাড়ীর ছাদের তরুণীর সঙ্গে প্রেম এবং প্রেমপত্র নিয়ে কথঞ্চিত বাড়াবাড়ি হবার পরে সেই ছাদের প্রেয়সীর বিয়ের শানাই যখন শোনা গেল সেদিন কোন মেসের তরুণ করলে আত্মহত্যা। কিন্তু এর মধ্যে গ্রেটা গার্ব্বোকে আনবার কী দরকার ছিল?"

"বলবেন না ওকথা, অন্ততঃ আজকের দিনে নয়।—" চপলা তীক্ষ্ণ করুণ কণ্ঠে বলে উঠল। তারপরে একটু থেমে আবার বললে, কিন্তু আর না থাকুক ওসব আলোচনা, আজকের সন্ধ্যেটা এমনিতেই যথেষ্ট মুমূর্ষ, ক্লান্ত লাগছে। একটা করুণ দৃশ্য দেখবার অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া। কাজেই থাক্। এখন ও নিয়ে আর কোন কথা।"

ক্রীড়া

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ, কলিকাতা।

চলতে চলতে একটা ফুলের দোকানের সম্মুখে এসে পড়েচে তারা। অজস্র রঙের ফুল। শীতঋতুর আরও কত রকমের বিলেতী সিজ্‌ন ফ্লাওয়ার। আর সেই অসংখ্য বর্ণের ফুল সমাবেশের উপর নানারঙের বিদ্যুতাধার থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে পড়ুচে।

সোমেন একটা তোড়ার দাম করছে।

চারু মুগ্ধ নেত্রে দেখছে। তাকিয়ে দেখলে, এর একটাতেও বোধহয় শিবপূজা হয়না। না হোক, তবু কী সুন্দর রূপ!

সোমনের ফুল কেনা শেষ হোল। এইদিকে ফিরে তাকিয়ে চপলাকে উদ্দেশ্য করে বিনীত কণ্ঠে বলিলে:

"দয়া করে এটা গ্রহণ করুণ। আপনার জন্যেই এতক্ষণ ধরে ফুল নির্ব্বাচন করছিলুম। চেয়ে দেখুন গ্রেটা গার্ব্বোর হাতে যে তোড়াটা দেখেছিলেন এটা সাধ্যমত তার অনুরূপ করবার চেষ্টা পেয়েছি।"

চপলা স্মিত হাস্যে ফুলের তোড়াটি সোমেনের হাত থেকে নিলে এবং মৃদু মৃদু আঘ্রাণ করতে করতে বললে।

"কিন্তু এবারে ফেরা যাক। চারুর হয়ত কষ্ট হচ্ছে।" না না চারুর কষ্ট হয়নি। চারু বিস্ময়ে আলোকপ্রবাহে উজ্জ্বল এই অপরিচিত জীবনের দিকে চেয়েছিল। কী আকর্ষণ, কী স্বাধীনতা কিন্তু মুখ ফুটে সেকথাও বলতে পারলনা।

সবাই মোটরে উঠে এসে বসলেন! চারুকে ভাবানী-পুরে নামিয়ে দিয়ে মোটর চলে গেল।

চারু শশী মোটর থেকে নেমে এসে বারন্দায় উঠে কড়া নেড়ে ডাকলে, "ঝি, ও ঝি দোর খুলে দাও"

ঝি তাড়াতাড়ি উঠে এসে হ্যারিকেন আলোটি উস্কিয়ে দিয়ে সিঁড়িতে আলো ধরলে। সিঁড়িতে বিজলী বাতির বন্দোবস্ত নেই!

দোতালায় নিজের ঘরে এসে গায়ের চাদর খুলে দিয়ে চারু ভালো করে হাত পা ছড়িয়ে বসে ঝিকে বললে, আমার পানের বাটাটা এইদিকে এনে দাওত হারুর মা। বাজারের পান খেয়ে কি সুখহয়! খুকী আমি যাবার পরে আর ওঠে নিত?" পানের সাজ সরঞ্জাম আগিয়ে দিয়ে ঝি সেখানে চেপে বসল। 'না বৌদি খুকী ওঠেনি। কিন্তু দাদাবাবু যে এত রাত্তির অবধি বাড়ী ফিরলেন না, রোজ সন্ধ্যা লাগতে লাগতে বড়বৌদির বাড়ীতে যেয়ে আড্ডা দেওয়া চাই আর বাড়ী ফিরতে যাকে বলে গিয়ে সেই মাঝরাত। না না, এসব ভালো কথা নয়। তুমি বারণ কোর ছোট বৌদি"

এইমাত্র যে জীবনের একটুখানি ঘোমটা খসিয়ে চারু দেখে এসেচে তার মোহ এখন লেগে রয়েছে তার চোখে সে বললে, "তাতে কী হয়েছে হারুর মা দিদিদের ওখানে কত লেখা পড়া জানা লোক যায়, কতরকমের কথাবার্ত্তা হয় সেখানে যাওয়া ত ভালো"

হারুর মা একবার অনুকম্পাভরে এই নিরীহ ভালো মানুষ অত্যন্ত নির্ব্বোধ চারুর পানে চেয়ে সেইখানেই আঁচলপেতে শুয়ে বললে, "দাদাবাবু যতক্ষণ না আসে এখানেই থাকি। তোমার যে আবার একা থাকতে ভয়!"

মুক্তারাম রো ষ্ট্রীটে চপলাদের বাড়ীর গেটের কাছে মোটরটা যখন দাঁড়াল তখনও বাইরের হল ঘরে আলো জ্বলছে। জটলা চলছে।

"এইযে এসেছেন এতক্ষণ সবই ফাঁক ফাঁক ঠেকছিল।" চপলের মেজঠাকুরপো হরিশ বলে উঠল।

"কী করচেন অপনারা?" চপলা ফুলের তোড়াটি টেবিলের উপর রেখে বসল।

"কী আর করব, আপনি ছিলেননা আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলুম। ইতিমধ্যে কিছু কিছু তর্ক বিতর্ক হচ্ছিল। আমি হিতেশবাবুকে বলছিলুম আপনি বর্ণার্ড শয়ের ক্যানডিডা সবচেয়ে ভালো বাসেন। বলুন ঠিক ধরেচি কিনা!"

"হয়ত বাসি—"চপলা বললে, "কারণ প্রেমের একটা নূতন দিক কি সাহিত্য, কি অভিনয়ে যেখানেই প্রকাশ হতে দেখি তা আমাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে। যেমন এইমাত্র গ্রেটাগার্ব্বোর অভিনয় আমাকে মন্ত্রমুগ্ধের মত আকৃষ্ট করল।"

"আপনি গ্রিটাগার্ব্বোর সিনেমা দেখতে গেছলেন?" হরিশ রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল, "আহা আমি যদি

জানতুম। আপনার সঙ্গে যেতুম। যদি প্রশ্ন করেন; কেন এমনিও ত যেতে পারো। আমি তার উত্তরে বলব; তা পারি বটে। কিন্তু আপনার মত যথার্থ আর্টিস্টের ভঙ্গী দিয়ে সৌন্দর্য্য উপভোগ করা সেইটি ত আর পারিনে। আপনার সঙ্গে গেলে সেইদিক থেকে কিছু সহায়তা পেতুম।

চপলা একটু হেসে বললে, "তুমি নাইবা গেলে ঠাকুরপো, আজ চারু আমার সঙ্গে গেছিল।"

"চারু!" হরিশের মুখ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল।

"কী ঠাকুরপো, হঠাৎ অমন মুখ শুকিয়ে গেল কেন? ভয় নেই তোমার চারুকে নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে দিয়েচি।"

"কী যে বলেন, আপনার সঙ্গে যাবে তাতে আর ভয় ভাবনা কোন খানটায়!" হরিশ হাসবার চেষ্টা করলে। কিন্তু ঠিক হাসি হোলনা, বরঞ্চ তাকে একটা মুখ বিকৃতি বলা যেতে পারে! এর পরে হরিশ শান্ত ভাবে বসবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু ভিতরের উত্তেজনায় ক্রমাগত তাকে অশান্ত চঞ্চল করে তুলছে। মনের মধ্যে একটা কথা অবিশ্রান্ত ঘুরছে, চারু, চারু এঁর সঙ্গে গেল কেন? এই ধরণের মেয়েদের সঙ্গে চারুকে অবাধে মেলামেশা করবার অধিকার কে দিয়েছে?

প্রেমের স্বরূপ নিয়ে তখন বসুর সঙ্গে হিতেশের রীতিমত তর্ক হচ্ছে।

হিতেশ বলছে, "একনিষ্ঠতাই যে প্রেম, প্রেমের এমন অদ্ভুত সংজ্ঞা বিংশ শতাব্দীতে অচল।"

বসু বললেন, "তবুও প্রেমের কাছে একটা স্থায়িত্ব একটু স্নিগ্ধতা আমরা চাই। হয়ত নাও পেতে পারি, কিন্তু পেলে যে খুশী হই এমন কথাটা অস্বীকার করি কী করে?"

"রেখে দিন আপনার চাওয়া না চাওয়ার কথা! আপনার খুসী, অখুসীতে কী এসে যায়! সতিই ত মেয়েদের ব্যাপারে আমরা বিধান দেবার কে?"—হিতেশ বলে চলল, "একটু ভেবে দেখুন দেখি একি আমাদের স্পর্দ্ধা নয়? আর এটা মেয়েরাও এবারে বুঝতে আরম্ভ করেচে তাদের বিষয়ে কোন গোঁড়ামি আর তারা সহ্য করতে রাজী নয়। কাকে তারা দেহ দেবে, কাকেইবা দেবে মন এ তারা একবার নয় দুবার নয় একশোবার নিজেরাই ঠিক করবে।"

হিতেশের কথার তোড়ে বসু চুপ করে গেলেন কিন্তু উঠতে পারলেন না। তিনি মিত্র সাহেবের জুনিয়ার। তিনি ক্লাব থেকে ফিরলে তাঁকে একবার দর্শন করে দুটো কথা বলে তবে বিদায় নেবেন।

চপলা হিতেশের দিকে চেয়ে সায় দিয়ে বললে, "ঠিক বলেচেন। বড় চমৎকার প্রকাশ করেচেন। ঠিক, বিংশ শতাব্দীর মেয়েরা এই দাবী সকলের চেয়ে আগে করে।"

"বৌদি এবারে উঠি।" হরিশ চেয়ার থেকে উঠে দোরের দিকে আগিয়ে গেল।

চপলা তখন তর্কে ব্যস্ত। অন্যমনস্কের মত একবার চেয়ে বললে, "আচ্ছা। আবার এসো।"

হরিশ রাস্তায় যেয়ে পড়ল। অন্যদিনের মত মনের প্রফুল্লতা নেই। একটা অকারণ উত্তেজনায়, অবরুদ্ধ ক্রোধে তার সমস্ত মন ভরে উঠেচে। যেতে যেতে দু'টো সিগ্‌রেট ধরালে দু'টোই মনের ভুলে দু একবার মাত্র টান দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলে। হাতটা এত কাঁপচে যে তৃতীয় সিগ্‌রেট ধরাতে যেয়ে দশটা দেশলায়ের কাঠি খরচ করলে।

হেমন্ত কালের স্বচ্ছ আকাশ তখন তারায় ভরে গেছে। নীচে মহানগরীর কোলাহল এবং উপরের আকাশে ওই অগণ্য প্রশান্ত নক্ষত্রলোক। একটা দোতালা বাসে উঠে সেইদিকে চেয়ে হরিশ নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করলে।

কালীঘাটের ট্রাম ডিপোর কাছে বাস থেকে নেমে আরও মিনিট ছয়ের রাস্তা হেঁটে তবে তার বাসার দরজার কাছে হরিশ পৌঁছল। ঝিকে ডাকাডাকি করতে লণ্ঠন হাতে চারুই এসে দরজা খুলে দিলে। হরিশ ভেবেছিল নিজেকে সংবরণ করে রাখবে পরে এক সময় চারুকে সাবধান করে দেবে যে, বৌদির মত হাইক্লাশের মানুষদের সঙ্গে বুঝে সুঝে মিশো। বেশি ঘনিষ্ঠতা কোরনা। এমন করে বলবে

যাতে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় অথচ চারুও কিছু বুঝতে না পারে। কিন্তু চারুকে মুখোমুখি দেখে সে কিছুতেই সামলাতে পারলেনা, ফেটে পড়ল, "তুমি বড়বৌদির সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখতে গেছিলে ?"

চারুশশী ভয় পেয়েছে দস্তুর মত। তবু সাহস সঞ্চয় করে বললে, "কেন তাতে এমন কী হয়েচে ?"

"কী হয়েচে ! সে কথা তোমাকে বোঝাবার প্রবৃত্তি আমার নেই। কিন্তু কেন গেলে ? কিসের জন্য গেলে ? কে তোমায় যেতে বলেছিল ?...তুমি নিশ্চয় জানতে তোমার ওঁর সঙ্গে মেলামেশা আমি পছন্দ করিনে।"

স্বামী হঠাৎ রেগে গেলেন কেন, চারু তা বুঝতে পারলেনা। জবাব হয়ে চেয়ে রইল। অবশেষে আস্তে আস্তে বললে, "আমি তা জানতুম না। বরঞ্চ আমার এর উল্টো ধারণা ছিল। আমিত দেখতুম তুমি বারংবার খোঁটা দিয়ে বলতে, তুমি বৌদির মত হতে পার না, তোমার কোনও যোগ্যতা নেই ! না পারো ইংরেজী বলতে, না জান গান। বাইরে বেরুলেই যেন শশব্যস্ত। ওঁর মত সহজ সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়াতে পারোনা। তোমার সঙ্গে কোথাও যেয়ে সুখ নেই, তোমার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ নেই।...আমিত ভেবেছিলুম..."

"আচ্ছা থাক থাক।" হরিশ হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলে।

"কথা থামাও। আমাকে খেতে টেতে দাও দেখি। রাত কত হয়েছে !"

চারুশশী তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হয়ে তাড়াতাড়ি জায়গা করে স্বামীর জন্যে ভাত বেড়ে আনলে। দু'জনার মধ্যে আর কোন কথা হোল না। চারুশশী আদর্শ স্ত্রী। যত অন্যায় ভাবেই বকুনি খাক স্বামীকে কখন প্রশ্ন করতে পারবেনা বা কড়া কথা বলতে পারবেনা। সে সমস্তই ভুলে গেলে। আজকের সন্ধ্যের সমস্ত কথা, চপলার আলোকস্রোতের মত উজ্জ্বল প্রবহমান জীবন যাপন তার মনে যেমন করে ঘোর লাগিয়েছিল, নিউমার্কেটের অপর্য্যাপ্ত বিদ্যুতালোকে অজস্র ফুলের সামনে দাঁড়িয়ে তার চোখ দুটি ক্ষণকালের জন্য যেমন ভাবে জলে উঠেছিল সে সমস্তই সে ভুলে গেল ? ভুলে যেয়ে তখনই আপনার চিরাভ্যস্ত ঘরকন্নার কাজে তন্ময় হয়ে গেল।

বিছানায় শুয়ে হরিশ ভাবছিল, "সত্যি চারুর কোন দোষ নেই। চারুর কাছে সে বরাবর বৌদির প্রশংসা করে এসেচে। এমন কথা কোনদিন বলেনি যাতে তাঁর সঙ্গে কোথাও যাবেনা এমন ভাব প্রকাশ পায়। হরিশ শান্ত স্বভাবের লোক। বকাবকি বা উত্তেজনা সে একেবারে ভালোবাসেনা। তাই চারুকে আর সে কিছু বলতে পারলনা। নিজের মনে এই অহেতুক ভাব-পরিবর্ত্তনের কারণ খুঁজতে লাগল। চিন্তার ধারাটা তার এখন অন্যদিক বেয়ে চলল। মনে হতে লাগল, বৌদি যদি চারুকে বায়োস্কোপে আনবার কথাটা না বলতেন তাহলে হয়ত হঠাৎ সে অমন করে চলে আসত না। কেনই বা সে আসতে গেল। সে আসবার পরেও ওখানে কত কথা হয়েছে কত তর্ক চলেছে তার এক বর্ণও সে জানে না।

সেই হিতেশ হয়ত বারংবার অনুরোধ করে তাঁকে বাজনায় নিয়ে যেয়ে বসাল। একটা গান করলেন তিনি। কিন্তু কারা শুনলো ?...গানের ওরা বোঝে কি ?...চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। টুকিটাকি গৃহকাজ সেরে রেখে চারু এখন সিঁড়ির দোরে তালা দিয়ে একগ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকল—সুরু হোল সাংসারিক কথাবার্ত্তা, "আলুর দরটা বর্ষার পরেও এবার চড়াই রইল। হ্যাঁ, ছাখো ভালো কথা মনে পড়ল কাল অফিস থেকে ফেরবার সময় অমনি গজ দুই ক্রেপের কাপড় কিনে এন। আমি পাশের বাড়ীর উমাতারার কাছে সেলাই শিখচি। বেশ মেয়েটি উমা ও শ্বশুর বাড়ী আসবার পর থেকে আমার বেশ একটি সঙ্গী হয়েছে।"

হরিশের অন্যমনস্ক কাণে এসব তুচ্ছ কথাবার্ত্তা ঢুকেছিল না। তার নিজের কল্পনা আপন মনে জাল বুনে চলেছিল ! এক রবিবারের কথা মনে পড়ে। সেদিন বাড়ীর মোটরের কি একটা কলকব্জা বিগড়ে যাওয়ায় কারখানায় ছিল সেটা। বৌদি সখ করে আর সবারি সঙ্গে বাসে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। সেদিন তাতেই কী সুন্দর লাগছিল তাকে। একটুখানি চলন্ত বাস থেকেই কেমন লাফ দিয়ে নামলেন। ভালো করে দাঁড়াবার অপেক্ষা অবধি রাখলেন না। তাঁর সব কাজই আনন্দচঞ্চল। হরিশ অবিবেচক নয়।

সে আরও ভাবলে, এ সবই যে সত্যি। তাঁর সঙ্গে সন্ধ্যা কাটান আনন্দ। এ আনন্দের মোহ একটা দিনের জন্যও সে কাটিয়ে উঠতে পারেনা। কিন্তু তবুও চারুকে এক সন্ধ্যা ওঁর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে এ ভাবনাও তার অসহ্য।

এমনই বা কেন হয়? চারু ভালো লেখাপড়া জানেনা। না জানে নির্ভুল ইংরাজীতে অনর্গল কথা বলে যেতে, না পারে অস্কার ওয়াইল্ডের আর্ট ফর আর্টস নীতি নিয়ে কিছুকাল তর্ক করতে। তার জীবনের প্রধান এবং প্রথম ঔৎসুক্যের বিষয় হচ্ছে রান্নাঘর। তবুও হরিশ ভেবে দেখলে, এই রান্নাঘরের যুগের যে মেয়ে চারু তাকেই সে নিশ্চিন্ত নিরাপদে বিশ্বাস করতে পারে, তারই উপর করতে পারে নির্ভর তাকেই দিতে পারে সম্মান। তাকে নিয়ে জীবনে আনন্দ নেই কিন্তু আনন্দহীন সম্মান তার প্রাপ্য। রান্না-ঘরের যুগ থেকে সে ঈষন্মাত্র নব পর্য্যায়ে উঠতে গেলেই হরিশের মনে তুমুল বিপর্য্যয়ে উপস্থিত হবে। যার প্রমাণ এইমাত্র সে হাতে হাতে পেলে। নানা তাই ভালো। চারুর জীবনে স্বাধীনতা না থাকে সেত সম্মান পেয়েছে। সতীলক্ষ্মী মার আসন এবং গৃহিণীর পদ তার। পাশে ঘুমন্ত মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে হরিশ মনে মনে কামনা করলে, বড় হয়ে ও যেন মায়ের মতনই হয়। সংসারে একটি ধ্রুব আদর্শ আশ্রয় করে শান্ত স্নিগ্ধ নিস্তরঙ্গতায় নিজের জীবন কাটিয়ে দেয়। তার সংস্পর্শে তার স্বামী আনন্দ যদিবা না পায় ক্ষতি নেই কিন্তু সারা-জীবন অটুট সম্মানের অধিকারিণী যেন সে হতে পারে। কিন্তু এরই মধ্যে তার সকল চিন্তাকে অতিক্রম করে তার অশান্ত কল্পনা আবার নিজের খুশীমত জালবুনে চলেছে।

পরেরদিন সন্ধ্যার দৃশ্য :—সে সন্ধ্যায় মুক্তারাম রো ষ্ট্রীটের সেই সুসজ্জিত ড্রইং রুমে কেমন করে কথার উত্তর প্রত্যুত্তরে ফুলঝুরি ছুটছে, হাসির শব্দ ঝর্ণাধারার মত উৎসারিত হয়ে উঠচে। গানের সুরে সমস্ত বাড়ী প্লাবিত হয়ে উঠচে। একটুখানি তন্দ্রার ঘোরে হরিশের মনে হোল চপলার তরল সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সে যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে, "ঠিক বলচেন হিতেশ বাবু। ভারি সত্য কথা। কাকে তারা দেহ দেবে কাকে দেবে মন, কত দর্শন স্পর্শন, এবং মননের রসে তারা নিজদেরকে সিক্ত করে না হয়ত স্নিগ্ধ করে নেবে এ মেয়েরা নিজেরাই ঠিক করবে।"

খুকীর কান্নায় তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল,। হরিশ চোখ মেলে দেখলে মশারির ভিতর পাশে বসে চারু অনর্গল বকে যাচ্ছে—।

"—যাই বলো উমা মেয়েটি বড় ঠাণ্ডা। সংসারে ত অসুখ অশান্তি লেগেই রয়েছে। স্বামীর ওই ব্যবহার, শাশুড়ির শুচিবাই। তবুও মুখে হাসির কামাই নেই।"—

খুকীর কান্না থামে না। অগত্যা চারুকে গল্প থামিয়ে খুকীর প্রতি মনোযোগ দিতে হোল। হরিশের হল্কা তন্দ্রা গভীর ঘুমে যেয়ে উত্তীর্ণ হোল। স্বপ্নে দেখলে :—

বৃহস্পতিবার। এই দিনটায় চারু প্রত্যেক সপ্তাহে বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা করে। শুদ্ধ আটহাতি কেটের কাপড় পরে চারু ব্যস্তভাবে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখনই পুরোহিত এসে পড়বেন তাব অনেক কাজ বাকী। নৈবেদ্য সাজান, আল্পনা দেওয়া রাজ্যের কাজ। হরিশ বেরিয়ে যাবে তাই তাড়াতাড়ি চায়ের তাগাদা দিচ্ছে। চারু রাগ করে বললে, "কাপড় ছেড়ে পুজোর গোছগাছ করচি এখন আমি আবার ওই অশুদ্ধ চায়ের বাসনগুলো ছোঁব কী করে? দু'মিনিট সবুর করতে পারনা?" মানে দু'ঘণ্টা আর হরিশ তা জানে। তাই তর্কাতর্কি না করে বিরস মুখে বেরিয়ে গেল। মনে ছিল রাস্তায় যেতে যেতে কোন রেস্তোরাঁয় নেমে চা খেয়ে নেবে।

বাসে উঠতেই কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে দেখা। অবনীশ, জিতেন হরিশ মনে মনে খুব খুসী হয়ে উঠল। আড্ডা চলল। হরিশ দুঃখ করে বললে, "এমন আধুনিক যুগেও আমার স্ত্রীর ভাই যা শুচিবাই। পুজোর কাজ করচেন বলে সেই কাপড়ে চায়ের বাসন ছোঁবেন না। চলেছি তাই কোন একটা চায়ের দোকানে চা খেয়ে নিতে।"

জিতেন শীষ দিয়ে বলে উঠল, "সত্যি কথা, এমনই কুসংস্কারচ্ছন্ন মেয়েদের নিয়ে জীবনে আনন্দ নেই।"

দু'টি মেয়ে টক টক করে বাসে উঠল। একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের চুল বব্‌ করে ছাঁটা অন্যটি অপেক্ষাকৃত সুশ্রী। বাসে জায়গা নেই। দোতলার সমস্ত সীট্‌গুলো ভর্তি।

একজন বন্ধু উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা করে দিতে চাইলে। কিন্তু সুশ্রী মেয়েটি চটপট ইংরেজীতে বলে উঠল, "দুঃখিত। মেয়ে বলেই যে অন্যকে উঠিয়ে সম্মানের দাবী করে জায়গা নেব আমরা তার পক্ষপাতী নাই। আমরা শিভ্যল্‌রি চাইনে, কারণ আমরা তা মানিনা। শিভ্যল্‌রি আউট অফ্‌ডেট্‌। আমরা মেয়ে পুরুষের সমান অধিকার এবং সমান দাবীর অনুমোদন করি।"

বন্ধুদের মধ্যে উঠল একটা হাসির গর্‌রা। "যাই বল আজকালকার ছুঁড়িগুলো কথা বলতে জানে বটে।" একজন খুব নিম্নস্বরে বললে।

"যে মেয়েটা ফরফর করে ইংরেজী বলে গেল, তার চেহারাটা কিন্তু মন্দ নয়।" আর একজন সমালোচনা করে বললে। অবনীশ ভুল শুধরে দিল, "কী আর এমন ভালো, শুক্‌নো।" সেই মেয়ে দুটি নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে পা ঈষৎ ফাঁককরে সিগ্‌রেট ধরিয়ে টানছে। নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। মধ্যে মধ্যে জোরে হেসে উঠচে। হঠাৎ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটি তার বৌদি চপলায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। হরিশ বিমর্ষ হয়ে ভাবলে, বৌদি অমন সুন্দর চুলগুলো তার খামাখা ববড্‌ করতে গেলেন কেন!

সহর ব্যাপী হরতাল। সহরময় কালো কালো পতাকা উড়চে। দোকান পশারা বেমালুম সব বন্ধ। চায়ের দোকান একটাও খোলা নেই। হরিশ তার বন্ধুদের অগত্যা বললে, "কী আর করা যাবে, চল আমার বাড়ী। এতক্ষণ নিশ্চয় তাঁর পূজো সারা হয়েছে। চা করে দেবে না" বন্ধুরা আবার সিগ্‌রেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বাসে এসে উঠল।

হরিশের নিজের বাড়ী:—

লক্ষ্মীপূজা শেষ হয়ে গেছে, পুরোহিত বিদায় নিয়েছেন। ঘরে কেউ নেই। কেবল শুভ্র আল্‌পনার উপর বিজলী বাতির আলো পড়েচে।

প্রদীপ জ্বলচে, ধূপদানি থেকে ধূপ উত্থিত হচ্ছে। সামনের বারান্দায় একটা সতরঞ্চ পাতা।

হরিশ বন্ধুদের ডাকলে, "আয়, বোস।"

"দাঁড়া জুতো না খুলে আসব কী করে?" জুতো খুলে, হাতের সিগারেটগুলো ফেলে দিয়ে তারা শান্ত স্তব্ধ হয়ে এসে বসল। পর্দার আড়ালে গৃহকার্য্যরত কোন কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর হাতের কাঁকণের সঙ্গে চায়ের বাসনের ঠুং ঠুং শব্দ কাণে আসতে লাগল। ঘুম ভেঙ্গে গেল। হরিশ ভেবে পেলেনা এসব অদ্ভুত স্বপ্ন আজ সে কেনইবা দেখচে? এসব স্বপ্নের অর্থ কী!

আশালতা দেবী

নারী নির্য্যাতন
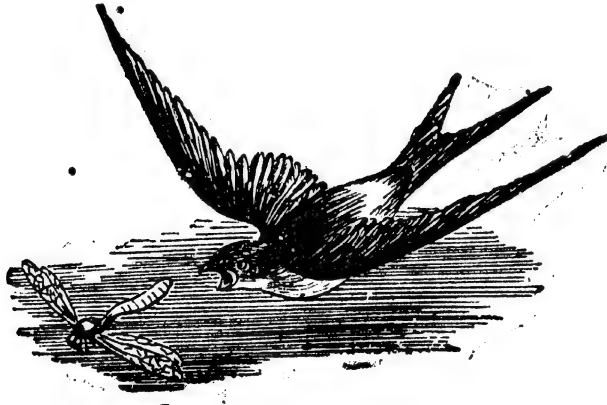
শ্রীঅনিলা দেবী

দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলাদেশে নারীদের জোর করিয়া হরণ করা বৃটিশ রাজত্বে একটি সাধারণ ব্যাপার হইয়াছে। বিশেষতঃ বাংলার পূর্ব্বাঞ্চলে যেখানে মুসলমান সংখ্যাধিক্য সেখানে এই অপরাধের প্রাবল্য দেখা যায়।

গত ছয় বৎসরে যে সব নারীহরণের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় প্রতি বৎসরে ৮৩০ হইতে ১০৫৭টি পর্য্যন্ত নারী হরণ হইয়াছে।

বাংলা গবর্ণমেণ্টের বিবরণীতে প্রকাশ যে এই প্রদেশে ১৯২৬ সালে ৮৩০ টি নারী হরণ ব্যাপার হয় ক্রমশঃ তাহা বাড়িয়া ১৯২৭ সালে ৮৯৮টি, ২৮ সালে ৯৭৬টি, ২৯ সালে ১০৫৭টি, ৩০ সালে ৯৯১টি, ৩১ শালে ৯৯৩টি হইয়াছে।

দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সব যৌন-অপরাধ সুশিক্ষার অভাব বশতঃ মুসলমানদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়।

মুসলমান দুর্ব্বৃত্তদ্বারা মুসলমান বালিকা হরণ এবং তাহার উপর বলাৎকারের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে সব হিন্দুরা দূরবর্ত্তীগ্রামে মুসলমান প্রতিবেশীদের মধ্যে বাস করে তাহাদের মেয়েরাও এই সব দুর্ব্বৃত্তদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করে।

১৯২৬ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত এই কয়বৎসরের নারীহরণের যে বিবরণী বাংলা সরকার প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে নির্য্যাতীতা হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক নির্য্যাতনকারী প্রায় সবক্ষেত্রেই মুসলমান। ইহাতে আরও দেখা যায় যে এক বৎসরে মাত্র ৯টি হিন্দু মুসলমান মেয়ের উপর অপরাধে অভিযুক্ত হয় আর সেই ক্ষেত্রে এক বৎসরে মুসলমানেরা ১৫০টি হিন্দুমেয়ের অপহরণের জন্য দায়ী। এই বিবরণীতে সুস্পষ্টরূপে আরও জানা যায় যে মুসলমাম মেয়েদের নির্য্যাতনকারী প্রায় সব ক্ষেত্রেই মুসলমান।

নারীর উপর অত্যাচার সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া মুসলমান কাগজের মুসলমান সম্পাদক লিখিতেছেন—'ইহা অবশ্যই সত্য যে বাংলায় এই শ্রেণীর অপরাধকারী মুসলমান দুর্ব্বৃত্তের সংখ্যা এই শ্রেণীর হিন্দু অপরাধকারীর চেয়ে বেশী...মুসলমান নামে ফৌজদারী আদালতে নারী-হরণ বলাৎকার এবং ঐ শ্রেণীর অপরাধে অভিযুক্তদের যখন আমরা দেখি তখন মুসলমান ভাবে লজ্জায় আমাদের মাথা নত হইয়া যায়।"

ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মুসলমান কিন্তু নির্দ্দোষ বালিকা হরণ বা তাহাদের উপর বলাৎকার করিতে বিন্দুমাত্রও লজ্জা বোধ করে না—বিশেষতঃ সেই নির্য্যাতীতা হতভাগিনী যদি অ-মুসলমান হয়। এমনও জানা যায় যে দুর্ব্বৃত্তের আত্মীয় স্বজনেরা পর্য্যন্ত তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য নির্য্যাতীতা মেয়েটিকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে লুকাইয়া রাখে। যদিও মুসলমান বদমাসদের দ্বারা মেয়েদের উপর এমনি অত্যাচার দিনের দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং তাহাতে মুসলমানদের সমাজও হিন্দুদের মতই ভুগিতেছে তবু সমাজের নেতাদের দ্বারা এই পাপ উচ্ছেদের বিশেষ কোন চেষ্টা হইতেছে না বা সমাজের যুবকদেরও নৈতিক উন্নতি সাধনের কোন প্রয়াস দেখা যাইতেছে না।

নারী-হরণের এইরূপ অনেক ব্যাপারে মুসলমান পুলিশ কর্ম্মচারী এমনকি বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের ব্যাবহারে পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায় নাই যে ইঁহারা সাম্প্রদায়িকতার মোহের বাহিরে আছেন। যশোহর নারীহরণ ব্যাপারে অভিযুক্ত মুসলমান দায়রা সোপর্দ্দ হইবার পর পাবলিক প্রসিকিউটর তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইতে নারাজ হন। এবং গোয়ালনন্দ নারীহরণ ব্যাপারে বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অভিযুক্ত মুক্ত হইলে জজ যখন পুনর্ব্বিচারের আদেশ দেন এই সব ব্যাপার হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত মেলে।

এই সব নারী নির্য্যাতন ব্যাপারে মুসলমান মেয়েরাই

সবচেয়ে বেশী ভুগিয়াছে। গত ছয় বৎসরে হিন্দুমেয়ে নির্য্যাতীতা হইয়াছে, ৪০০ হইতে ৫৫০ জন, আর ঐ সময়ে মুসলমান মেয়ে অপহৃতা ও নির্য্যাতীতা হইয়াছে ৪৮০ হইতে ৬৫৩ জন।

নারীনির্য্যাতন ব্যাপারে ১৯৩১ সালে ২০৪টি 'কেস' লইয়া মইমনসিং জেলা সবচেয়ে উপরের স্থান অধিকার করিয়াছে। তারপরই বরিশাল। নারী-হরণ ও নির্য্যাতন সেই সব জেলায়ই বেশী যেখানে মুসলমানের সংখ্যা বেশী।

বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে এ সব ব্যাপার খুবই বিরল।

দলবদ্ধ সতীত্বহরণকারী গৃহ হইতে নারীহরণ

দলবদ্ধ লোক অধিকাংশই মুসলমান, নির্দ্দোষ গৃহস্থের ঘর দোর ভাঙ্গিয়া তাহাদের বিবাহিতা বা অবিবাহিতা মেয়েদের লইয়া যায় ও তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়া পরে হতভাগিনীদের অর্দ্ধমৃত অবস্থায় নিজের গৃহের কাছেই কোথাও ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়।

সময় সময় মেয়েটিকে স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া আটকাইয়া রাখা হয়—যতদিন না সাধারণে বা পুলিশ তাহাকে উদ্ধার করে ততদিন এই ব্যাপারই চলে।

অত্যাচারী ও অত্যাচারিতা দুই-ই মুসলমান এমনি ঘটনা উদ্ধৃত করিতেছি:—

(১)

চুরুজান বিবি ওরফে আমিনা খাতুন ফরিদপুর জিলার বালিয়াকান্দি থানার ডোমান গ্রামের তফাজুদ্দি সেক নামক এক কনেষ্টবলের স্ত্রী। ঘটনার রাত্রে সে নিজ ঘরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছিল। তিনজন লোক দোর ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিলে আমিনা চীৎকার করিয়া উঠে। পাঁচুমোল্লা একখানা গামছা দিয়া তার মুখ বাঁধিয়া তাকে উঠাইয়া লইয়া যায়।

আমিনা তাদের সকলকেই চিনিতে পারিয়াছিল কারণ তারা তার প্রতিবেশীই ছিল। প্রথমে তারা তাকে যশোহর জিলার নাকাল গ্রামে লইয়া গিয়া একজন মুসলমানের বাড়ীতে রাখে। এখানে কমিরুদ্দি ও ইব্রাতুল্লা জোর করিয়া তার উপর বলাৎকারের চেষ্টা করে।

তারপর তারা তাকে কাগুরার (যশোর) কিরণ নামে এক বেশ্যার বাড়ী লইয়া এবং সেখানে তাকে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকায় বিক্রীর চেষ্টা করে।

বিহারী বাগ্দী নামে একজন দফাদার কোন রকমে ঘটনার সন্ধান পাইয়া থানায় জানায়ও আমিনার স্বামীকেও জানায়।

কমিরুদ্দি, ইব্রাতুল্লা ও পাঁচু মোল্লা ধৃত হয় এবং ফরিদপুরের এ্যাডিসনাল সেসন জজ মিঃ এস-এন রায়ের বিচারে প্রথম দু'জনের পাঁচ বৎসর এবং তৃতীয় জনের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

(২)

সরাইলের (ত্রিপুরা) সেখ আহর স্ত্রীকে তার ঘর থেকে চারজন মুসলমান বলপূর্ব্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়। ছয় মাস পর্য্যন্ত তারা তাকে নিয়ে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে ঘোরে এবং জোর করিয়া তার উপর অত্যাচার করে। একদিন তার স্বামী বাড়ী থেকে ৩ মাইল দূরে তাকে দেখিতে পায়—এই সূত্রে সোমার বাপ, কাদির, মণ্টু ও শোভান ধৃত হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্ রহমানের কাছে এদের বিচার হয় এবং সোমার বাপ মুক্তি পায়, মণ্টুর ১০০৲ টাকা মাত্র জরিমানা হয়। কাদিরের ৪ মাস ও শোভানের এক বৎসরের জেল হয়। তারা কুমিল্লার জজের কাছে আপীল করিলে কাদির ও মণ্টু ও খালাস পায়—শুধু শোভানের দণ্ড বহাল থাকে। কোন বিবাহিতা নারীকে জোর করিয়া হরণ করা ও সতীত্বনাশ করার দণ্ড মাত্র এক বৎসর!

(৩)

থানা মাগুরা, আক্ছা গ্রামের ১২।১৩ বৎসর বয়স্কা স্বরূপজান বিবির স্বামী ভিন্ গ্রামে গিয়াছিল, ঘটনার রাত্রে সে তার বিধবা মায়ের সঙ্গে ঘুমাইতেছিল রাত্রে কায়েমদ্দি, বাহের ফকির, আবদুল, ভাঙ্গুর, দলিলদ্দিন ও তোরাব এই ছয়জন মুসলমান ঘরে ঢুকে মেয়েটিকে নিয়ে টানাটানি সুরু করে, তার মা মেয়ের সাহায্যের জন্য আসিলে তাকে দা' দিয়া কোপ মারা হয়। দুর্বৃত্তেরা তারপর মেয়েটিকে টানিয়া একটা খালি বাগানে নিয়ে যায় এবং একের পর

আর একজন জোর করিয়া তার উপর অত্যাচার করে। তারপর মেয়েটি অজ্ঞান হইয়া পড়িলে তাকে কায়েমদ্দির বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। দু'দিন পর্য্যন্ত তারা বালিকাটিকে নিয়ে নানা স্থানে ঘোরে ও তার উপর অত্যাচার করে। তার পর তাকে ছেড়ে দেয়।

অপরাধী ক'জনাই ধৃত হয় এবং যশোহরের এ্যাডিসনাল সেসন জজ মিঃ এইচ মুখার্জ্জির বিচারে কায়েমদ্দির ১০ বৎসর, বাহার ফকিরের ৯ বৎসর। আবদুল ও ভাঙ্গুরের ৭ বৎসর দক্ষিনদ্দিনের ৩ বৎসর এবং তোরাবের ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

এইবার মুসলমান কর্ত্তৃক কয়েকটি হিন্দু বালিকা হরণের পরিচয় দিব।

(১ কাজিপারার (জলপাইগুড়ি) চারুবালা দাসী ঘরে ঘুমাইতেছিল এমন সময় ১৬ জন মুসলমান জোর করিয়া দোর ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিয়া তাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহারা তাহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করাইবার চেষ্টা করে—এই সময়ে কোন উকিল তাহাকে উদ্ধার করেন। তিন জন মুসলমান ধৃত হয় এবং বিচারে তাহাদের ৪ হইতে ৬ বৎসরের কারাদণ্ড হয়।

বিশেষ দুঃখের বিষয় পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থলে এইরূপ ঘটনায় যে সব দুর্বৃত্ত নারী হরণ ও নারীর উপর অত্যাচার করে তাহাও প্রতিপত্তিশালী মুসলমানদের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়—এবং তাহাদের বীরের মত সম্মান দেওয়া হয়। মানব সমাজের স্বার্থরক্ষার জন্যই এইরূপ নারীর উপর অত্যাচারী ও নারীহরণকারীদের সমাজচ্যুত করা উচিত। বদমাইসেরা পশুর মত—তারা নিজ সমাজের উপরও যে সু-ব্যবহার করে না তাহা গবর্ণমেণ্টের বিবরণীতেই সুপ্রকাশ। কারণ এই সব বদমাইসদের হাতে মুসলমান রমণীরাই নির্য্যাতীতা হয় বেশী। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান নেতাদের উচিত যে তাঁরা নিজ সমাজের কতকগুলি অপকৃষ্ট লোকের দুষ্প্রবৃত্তি অঙ্কুরেই বিনাশ করিয়া এই ভয়াবহ পাপ উচ্ছেদ করিবেন।

(২) থানা মণিরামপুর হেলাঞ্চি গ্রামের দরিদ্র বিধবা কুসুমকুমারী দাসী তাহার ১৩ বৎসর বয়স্কা কন্যাসহ কুটীরে ঘুমাইতেছিল।

আছান গাজী নামে সাগরা গ্রামের এক দুর্বৃত্ত বদমাস বেড়া কাটিয়া ঐ ঘরে ঢুকিয়া বালিকার উপর বলাৎকারের চেষ্টা করে, বালিকা জাগিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। মা-ও জাগিয়া দুর্বৃত্তকে তাড়াইবার অন্য উপায় না দেখিয়া একখানি দা দিয়া তাহাকে কোপ দেয়। ঐ সাহসী নারী তারপর বদমাসকে বাঁধিবার চেষ্টা করে কিন্তু বদমাস তার খানিকটা কাপড় ছাড়িয়া কোনরূপে পলাইয়া যায়। তার চীৎকারে তার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র আর একজন লোকের সঙ্গে আসে ও আছানের পিছনে দৌড়াইয়া যায় কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারে না।

মনিরামপুর থানার হিন্দু সহকারী দারোগা রক্তাক্ত দা এবং আছানের পরিত্যক্ত কাপড় জিম্বা রাখেন। বাকী কাপড়টুকু আছানের গৃহে পাওয়া যায় ও তাহাকে চালান দেওয়া হয়। সে সময়েও সে সজ্ঞানে ছিল কিন্তু কোন এজাহার দেয় নাই। তারপরে সে যশোহর হাসপাতালে মারা যায় এবং মৃত্যুকালিন জবানবন্দীতে কুসুমকুমারী, তাহার নাবালক পুত্র ও অপর একটি লোককে জড়ায়।

যশোহরের মুসলমান ডেপুটি পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট দুর্বৃত্ত হত্যাকারী সেই সাহসিনী মহিলাকে চালান দেন।

মাজিয়ালি গ্রামের বিজয়গোপাল চন্দ্র ঐ দরিদ্রা রমণীকে মামলায় সাহায্য করেন। এইজন্য গ্রামের মুসলমানেরা তার গৃহে আগুন দেয়। কুসুমকুমারীর ছেলেকে আশ্রয় দিবার জন্য ললিতমোহন দাসের খড়ের গাদায় ও আগুন দেওয়া হয়।

অত্যাচারে হতভাগিনী নারীকে গ্রাম ছাড়িতে হয়।

আছান গাজী চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া জীবন হারাইলে একদল মুসলমান জোর করিয়া সারাজিনীকে হরণ করে এবং পশুর মত তার উপর অত্যাচার করে। যশোহর কপোতাক্ষ নদীর উপর এক নৌকা হইতে পুলিশ তাহাকে উদ্ধার করে। দশজন মুসলমান ধৃত হয় ও সেসন কোর্টে বিচার হয়।

১৯৩২ সালের ২রা জুলাই অপরাধী মুসলমানদের মধ্যে ওসিমদ্দি দফাদারের ১৭ বৎসর, আব্দুল হামিদ সরদার ও তালেব দফাদারের ১৪ বৎসর এবং ওসমান

দুষ্টু খোকা

গাজীর ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। অপর পাঁচজনের ২ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হয়

(৩) মাছনা গ্রামে ১৪ বৎসর বয়স্কা হিন্দু বালিকা হেমন্ত কুমারীকে স্থানীয় মসজেদের মুনসী আহেদালি গাজীর নেতৃত্বে ৪ জন মুসলমান অপহরণ করে। বালিকার উপর অত্যাচার করা হয়।

এই বীভৎস ঘটনার পার পার্শ্ববর্ত্তী দশ গ্রামের মুসলমানেরা সভা করিয়া একত্রিত হইয়া এই নারীর উপর অত্যাচারীদের জন্য চাঁদা তুলে। শুধুমাত্র দু'জন মুসলমান এমন বদমাসদের সাহায্য করিবেন না বলিয়া চলিয়া যান। দুর্ব্বৃত্তদের আত্মীয় স্বজনেরা পর্য্যন্ত এই জঘন্য কার্য্যে তাহাদের সাহায্য করে। (সঞ্জীবনী ১৫-৯-৩৩)

আরও একটি বীভৎস ঘটনার নমুনা দিতেছি :—

(৪) ফরিদপুরে দায়রা জজ জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া সুশীলবালা অপহরণ মামলার প্রধান আসামী ইসারৎ ও লালুকে ৭বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

সুশীলবালা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী প্রদানকালে বলে যে, সে ফরিদপুর জিলার নগরকান্দি থানার অন্তর্গত বালিয়া গ্রামের সতীশচন্দ্র শীলের বিবাহিতা স্ত্রী। রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পর সে যখন বাসন মাজিতেছিল, তখন ইসারৎ ও অপর আরও কয়েকজন মুসলমান হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করে এবং তাহার মুখ বন্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক শোভান নামক জনৈক মুসলমানের বাড়ীতে লইয়া যায়। সেই বাড়ীতে একটি ঘরে তাহাকে জোর করিয়া লইয়া গিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। তৎপর লালু নামক অপর এক ব্যক্তির নিকট তাহাকে রাখিয়া ইসারৎ চলিয়া যায়। লালু পুনরায় তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। সেদিন রাত্রিতে তাহাকে সেই ঘরে আবদ্ধ রাখে এবং ইসারৎ বারান্দায় ঘুমায়। পরদিন ভোরে ঐ বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ আসিয়া তাহাকে বলে যে, তাহার যখন জাত ও সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে তখন আর গোলমাল সৃষ্টি না করিয়া মুসলমানদিগের সহিতই তাহার বাস করা উচিত। পরদিন রাত্রিতে তাহাকে ভজনকান্ত গ্রামের জনৈক মুসলমানের বাড়ী লইয়া গিয়া একটি মুসলমান রমণী ও তাহার কন্যার হেপাজতে তাহাকে রাখা হয়। সেখান হইতে পরদিন রাত্রিতে তাহাকে কাইখালী এবং তথা হইতে বাস্তপাতি গ্রামে লইয়া যাওয়া হয়। বাস্তপাতি পৌছিলে রাত্রি ভোর হইয়া যায়। এমন সময় কুটীশ্বর মণ্ডল নামক এক ব্যক্তির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। কুটীশ্বর তাহাদিগকে বাধা দিলে ইসারৎ ও আনোয়ারুদ্দিন পলাইয়া যায়। কুটীশ্বর মণ্ডল ও তাহার ভাই মঙ্গল মণ্ডল তাহাকে উদ্ধার করিয়া তাহার স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়ের নিকট পৌছাইয়া দেয়।

এইরূপ প্রকাশ যে, নগরকান্দি থানায় অভিযোগ জানাইলে থানার দারোগা মৌলবী আব্বাস আলি অভিযোগ গ্রহণ করেন না। তাহারা তখন ফরিদপুর সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ দায়ের করে।

[আনন্দবাজার ১৫ ই ভাদ্র, ১৩৪০।]

এমনি অসংখ্য কেস রিপোর্ট উদ্ধৃত করা যায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলার সুযোগ্য গবর্ণর সার জন এণ্ডারসন জানাইয়াছেন এই ঘটনার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে—তাহাতে এ বিষয়ে পুলিসকে তিনি সম্যক অবহিত হইতে বলিবেন এমন আশা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় ঘটনার গুরুত্ব যেরূপ অধিক তিনি ততটা গুরুত্ব দেন নাই। তাঁহার মত বিচক্ষণ লোক বাংলা সরকারের নিজস্ব রিপোর্ট এবং আদালতের বিচারে যে সব 'কেস' দণ্ড পাইয়াছে সেইগুলি দেখিলেই ইহার গুরুত্ব ও সর্ব্ব রহস্য সম্যক অবগত হইতে পারিবেন আশা করি।

বাহিরের যত প্রচেষ্টাই হউক না কেন দেশের শাসন নীতি যতক্ষণ না ইহার বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করিতেছে ততক্ষণ ইহার যথাযথ প্রতিকার সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বাংলার নারীর সম্মান রক্ষা করিতে গবর্ণর মহোদয়ের মেয়ের সমান মহিলারা তাঁহার কাছে করজোড়ে আবেদন জানাইতেছে—আশাকরি এদিকে তিনি দৃষ্টি দিবেন।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হিন্দু সভার উদ্যোগে বাংলায় নারী-রক্ষা সপ্তাহ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। জনমত জাগরণ এবং এ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্যই এই আন্দোলন। বহু সুভ্রান্ত মহিলাও ইহাতে যোগ দিয়াছেন—

ইহা সুখের বিষয়। প্রথম দিনে আলবার্ট হলে ময়ুরভঞ্জের মহারাণী শ্রীযুক্তা সুরুচি দেবীর সভানেতৃত্বে যে সভা হয় তাহাতে শ্রীযুক্তা মৃণালিনী সেনের প্রস্তাবে এই ব্যবস্থা গুলি সমর্থিত হয়।

"হিন্দু জনসাধারণের এই সভা বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া নারী-নিগ্রহ ব্যাপারের প্রতিকারকল্পে এই দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছে সে সর্ব্ববিধ সঙ্গত উপায়ে এই লজ্জা এবং দুর্নীতি ও জাতীয় অমর্য্যাদার গ্লানি অগৌণে দূর করিতে এবং এতদুপলক্ষে :—

(ক) বাঙ্গলার বিপন্ন অঞ্চলের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া নারীরক্ষী দল গঠন করিতে হইবে।

(খ) বিপন্ন নারীগণকে উদ্ধার ও সমাজে পুনঃগ্রহণ এবং দুর্ব্বৃত্তগণকে শাস্তি প্রদানের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এতদুপলক্ষে বর্ত্তমান আইনের সংশোধন করিয়া কঠোরতর আইন প্রয়োগের জন্য আন্দোলন করিতে হইবে

(গ) যাহাতে পুলিশ বা রাজকর্ম্মচারীগণ শৈথিল্য বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন না করে তজ্জন্য আন্দোলন করিতে হইবে।

(থ) দুর্ব্বৃত্তগণের আশ্রয়প্রদানকারীগণের শাস্তি প্রদান ও প্রশ্রয় প্রদানকারীগণকে লোক সমাজে হেয় ধিক্কৃত করিয়া তুলিবার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঘ) সকল হিন্দুকেই আর্থিক ও প্রয়োজনীয়ভাবে এই মহতী কর্য্যে সহায়তা করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ঙ। নারীগণ মধ্যে সাহস ও আত্মনির্ভরতার ভাব জাগ্রত করিয়া তাহাদের আত্মরক্ষার্থ বিধান দান করিতে হইবে।

মাতৃজাতির সম্মান হরণকারীর জন্য পরলোকগত বিখ্যাত জজ আমীর আলি মহোদয় প্রাণ দণ্ড ও বেত্র দণ্ড সমর্থন করিয়াছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এজন্য সম্প্রতি নারী হরণ কারীর প্রাণ দণ্ড হইয়াছে। সরকারী উকিল প্রাণদণ্ড সমর্থনে জুরীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন— 'আপনারা যদি এই আসামীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন, তবে এই পাপ দমনের বিশেষ সাহায্য হইবে।'

অষ্ট্রেলিয়া, কেনিয়াতে এজন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আছে।

হিন্দু সমাজের নারীকে হরণ করা তাহার পক্ষে প্রাণদণ্ডের চেয়েও গুরুতর শাস্তি। এরূপ অবস্থায় অপরাধীর যে কোন দণ্ড প্রচুর নহে। কিন্তু দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা দেশের শাসন নীতি—সুতরাং সেই শাসন নীতিই যাহাতে নারী-মর্য্যাদা রক্ষায় এই মুহূর্ত্তেই অব্যবহিত হয় ইহাই আমরা চাই। আর চাই এই বীভৎস মহাপাপ দমনের জন্য দেশে মানুষ নামে যাহারা পরিচিত হইতে চাহেন তাহাদের সকলেরই অকুণ্ঠিত চিত্তে অগ্রসর হওয়া। *

* এই প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহে অনেক স্থলে সাময়িক পত্র বিশেষ করিয়া ডাঃ সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত যন্ত্রস্থ গ্রন্থ "Prostitution in India" হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

পত্র-বিভ্রাট

[গল্প]

শ্রীরেণুকা সিংহ

(১)

সন্ধ্যে তখন ৬টা পিওন এসে দরজায় কড়া নাড়্তে নাড়্তে ডাকাডাকি সুরু করলে "বাবু, চিঠ্‌ঠি হ্যায়।" ১৪।১৫ বছরের একটি কিশোরী ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে দড়াম্ করে দরজাটা খুলে তার হাত থেকে চিঠিটা নিয়েই যেমন ছুটে নেমেছিল আবার তেমনি ভাবেই এক ছুটে চিঠি নিয়ে উপরে উঠে গেল।

কিশোরীটির নাম অমিতা-সবাই তাকে "মিতা" বলেই ডাকে। তার কয়েকমাস হোল নতুন বিয়ে হয়েছে। তার স্বামী বিদেশে চাকুরী করেন। চিঠিটা তারই স্বামীর। দু'দিন অন্তর তার স্বামীর পত্র আসে; সেদিনও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। অমিতা চিঠিটা নিয়ে জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়ে অতি আনন্দিত মনে খামটা আস্তে আস্তে ছিঁড়ে ফেল্‌লে; তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ল একটি গোলাপি রংয়ের সুগন্ধযুক্ত কাগজ। সে তাড়াতাড়ি উৎসুক চিত্তে চিঠিটা খুলে পড়্তে আরম্ভ করলে

"প্রিয় প্রাণের বীণা—

অনেকদিন তোমার কোন চিঠি কিম্বা সংবাদ না পেয়ে যার পরনাই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত আছি। তোমার খবর কী? অবশ্য তুমিও বলতে পারো যে, আমিই বা কেন এতদিন তোমার খোঁজ নিইনি। সে কথা সত্যি বটে! কি জান ভাই নানান্ কাজের ঝঞ্ঝাটে সব সময় সুবিধা হ'য়ে উঠেনা। অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি; একটু কাজ কম্‌লেই শীঘ্র একদিন তোমার কাছে যা'বার খুব চেষ্টা কোরবো। আশা করি তুমি ভাল আছো। আমার অসীম আন্তরিক ভালবাসা তুমি নিও আজ তাহলে আসি। বিদায়। উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম;

ইতি তোমারই "নরেন।"

অমিতা কোন রকমে চিঠিটা পড়া শেষ করে সেই খানেই মেঝেতে বসে পড়ল। তার কিশোরী-সুলভ-চপল বুদ্ধিতে সে কিছুতেই ভেবে পেলেনা যে, তার স্বামী "বীণা" নাম্নী কা'কে আবার এরকম প্রীতিপূর্ণ পত্র লিখেছেন! অনেক ভেবে সে পরিশেষে স্থির করলে যে, বীণা নিশ্চয়ই তার স্বামীর একজন প্রেমিকা এবং তাকে পত্র লিখে তিনি ভুলে অমিতার খামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে আর বেশীক্ষণ ভাবতে পারলেনা; তার মাথার ভেতর যেন ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল……

খানিকক্ষণ পরে অমিতা যখন নিজেকে কিঞ্চিৎ সংযত ক'রে উঠে বস্‌ল, তখন অভিমানে তার মনটা ভারী হয়ে উঠেছে। সে আবার ভাবতে লাগল যে, তবে কি তার স্বামীর এই ভালবাসা শুধুই ছলনা? তিনি যে এই কয়মাস ধরে তাকে নিয়মিত পত্র দিয়ে আস্‌ছেন, সে সবই কি শুধু মৌখিক ভালবাসা—না, না তা হয়না!!

কিন্তু তবে এ পত্র কার?——নানা চিন্তায় অমিতার মাথার ভেতরটা যেন কেমন করতে লাগল। জানলার ধারে যে খাটখানা পাতা ছিল, সে তার ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ল। এই সব ভাবতে ভাবতে মিতা কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা' সে নিজেই টের পায়নি; অনেক রাত্রে তার মা করুণাদেবী এসে যখন খা'বার জন্য ডাকাডাকি করতে লাগলেন "মিতা, ও মিতা! ওঠ? খাবিনা? ওমা, আমি জানি তুই ওপরে এসে রেডিও শুন্‌ছিস, তা নয়, সন্ধ্যে রাত্তিরেই তুই যে ঘুমুতে আস্‌বি তা' কে জানে? তখন মিতার ঘুম ভাঙ্গল—সে বল্লে, "মা, আজ আর আমি কিছু খাবোনা, বড্ড মাথা ধরেছে তুমি ওঘরে শুতে যা'বার সময় আমাকে ডেকে নিয়ে যেও মা।" স্নেহময়ী মাতা কন্যার গুপ্ত মনোভাব কিছুই বুঝতে পারলেন না, তিনি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

(২)

শরৎকালের প্রভাত; সূর্য্যদেবের রক্তিম ছটায় স্নিগ্ধ শারদাকাশে নানান্ রং-বেরংয়ের খেলা চলেছে; ক্রমে তিনি

বেলা দ্বিপ্রহরে এত প্রখর হ'তে প্রখরতর হয়ে উঠলেন যে, তাঁর দিকে আর তাকান চলেনা।

এ হেন একটি দ্বিপ্রহরে অমিতা তাদের দোতলার একটি ঘরে কাগজের প্যাড্, দোয়াত ও কলম নিয়ে বসেছিল—তার স্বামীকে পত্র লেখবার জন্য; কিন্তু তার মনে আগেকার মত সে স্ফূর্তি বা উৎসাহ কিছুই ছিলনা; সে জোর করে যেন তার ভাঙা, বিক্ষিপ্ত মনটাকে টেনে এনে সেই জায়গায় বসাতে চায়। অমিতা লিখল:—

শ্রীচরণেষু,

তোমার পত্র পেয়েছি; আশাকরি তুমি শারীরিক ও মানসিক বেশ ভাল আছো। তোমার ৺পূজার ছুটী কবে হবে? আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম তুমি নিও। এখানকার এক প্রকার কুশল। তোমার সময় ও সুবিধা-মত পত্রের উত্তর দিও। আর অধিক কি লিখব? ইতি

প্রণতা

"মিতা"

(৩)

নরেন অফিস থেকে ফিরে কোটপ্যাণ্ট খুলছিল, এমন সময় চাকর ভজুয়া এসে দু'খানি চিঠি দিয়ে গেল; কয়েক দিন পরে সে খামের উপর অমিতার হস্তাক্ষর দেখে তাড়াতাড়ি চিঠি পড়তে বস্‌ল। কিন্তু তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ল একটি ছোট্ট কাগজে কয়েকছত্র লেখা। নরেন অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল; অমিতার পত্রের এত বিলম্ব ও সংক্ষিপ্ত হ'বার কারণ কি? কই, কোনবার তো এমন হয় না। অন্যমনস্ক ভাবে সে অপর খামখানিও ছিঁড়ে ফেল্ল তাইতে এইরূপ লেখা ছিল,—

প্রিয় নরেন ভাই।

অনেকদিন পরে তোমার গোলাপী সুগন্ধি পত্রখানা পেয়ে কতদূর যে খুসী হয়েছি, তা ভাষায় জানাতে আমি অক্ষম। তুমি যে নতুন বিয়ে কোরেছ এবং বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছো তা' তোমার পত্রেই জানলাম। যাক্, ভাই, মাঝে মাঝে তোমাদের প্রেমের স্বপ্নজাল বোনা পত্রের সঙ্গে "অদল বদল" করে' এই অবিবাহিত অভাগা বন্ধুটীর প্রাণে কিঞ্চিৎ শান্তিদান কোরো। তোমরা উভয়ে কেমন আছ? আমার আন্তরিক ভালবাসা নিও। আচ্ছা চল্লাম। ইতি

তোমার বীণা

নরেন চিঠি পড়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল; তার মাথার ভেতর যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল। বার দু'এক পত্রখানি পড়ে সে বুঝল যে, বীণার এবং অমিতার পত্রের সঙ্গে গোলমাল হয়ে গিয়েই এই বিভ্রাট্। এইবার নরেন বুঝতে পারল অমিতার পত্র অত সংক্ষিপ্ত হ'বার কারণ কি? সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় একটা মৎলব এল—মিতার সঙ্গে এই নিয়ে বেশ একটু পরিহাস কর্‌বার জন্য।

সে কালবিলম্ব না করে অফিসের পোষাক বদ্‌লিয়ে এবং কিঞ্চিৎ জলযোগ করেই টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে চিঠি লিখতে বসে গেল:—

প্রিয় বীণা—,

তোমার পত্র পেলাম। আহা বেচারী তুমি—তোমার জন্য সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে ভাই। তা' তুমি কেন শুধু আমাদের স্বপ্নজাল বোনা দেখেই নিবৃত্ত হচ্ছ, নিজেও তুমি কেন একজন সঙ্গিনী জুটিয়ে নিয়ে জাল বুনতে সুরু কর না?—আমরাও তা দেখে তৃপ্তি পাই!! যাই হোক্, সে সুখবরটী দিতে ভুলোনা যেন। আমার ভালবাসা নিও। শীঘ্রই তোমার কাছে যাবো। কেমন আছ? ইতি

তোমার নরেন।

তারপর নরেন অমিতাকে লিখল—

স্নেহের "মিতা"

অনেকদিন পরে তোমার একখানি পত্র পেলাম। হাঁা, তোমাকে এতদিন বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমার শ্রীবীণা বোসের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব আছে; সে আমাকে খুব ভালবাসে এবং বলা-বাহুল্য যে,—আমিও তাকে খুব ভালবাসি। আমি তার কাছে ৺পূজার সময় যাবো মনে করছি এবং বিজয়ার দিন একেবারে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে তোমাদের কাছে যাবো।

সে খুব ভাল এবং মিশুক—তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো। তুমি কেমন আছো? আমি ভালই আছি। বাটীর সকলে কেমন আছেন ও আছে? যথাস্থানে

আমার প্রণাম ও স্নেহ দিও। আমার আন্তরিক ভালবাসা তুমি নিও। আজ আসি। ইতি

তোমার

নরেন।

এই পত্রখানা যখন অমিতার হাতে গিয়ে পৌছল তখন সে খানিকক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে রইল। তার অন্তর কেঁদে উঠে বলতে লাগল "হে ঠাকুর, আর কেন? স্বামী-প্রেমবঞ্চিতা এ অভাগিনীর মরণ দাও।" কিন্তু মৃত্যু তো কারুর হাতধরা নয় যে তাকে চাইলেই পাবে— কাজে কাজেই অমিতারও আর মরণ হোল না।

(৪)

ক্রমে ৺পূজার দিন নিকটবর্ত্তী হ'তে লাগল। মায়ের আগমনী গানে সারানগর মুখরিত হ'য়ে উঠল; সমস্ত নগরবাসীর মুখে, চোখে আনন্দের দীপ্তি খেলে বেড়াতে লাগল। কিন্তু অমিতার মনে মোটেই শান্তি ছিল না। জগন্মাতার ৺পূজার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হ'তে লাগল ততই সে যেন বিমর্ষ হয়ে যাচ্ছিল। ক্রমে শারদ্ সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী কেটে গিয়ে বিজয়াদশমীর প্রভাত উপস্থিত হোল; আজ অমিতার স্বামী নরেনের আসবার দিন। সকাল থেকেই অমিতার বুক দুরুদুরু করছিল, আজ তার ভাগ্যে কী আছে, তা' একমাত্র ভগবানই জানেন।

সন্ধ্যেবেলায় যখন সারানগর মায়ের বিসর্জ্জনের বাজনায় মুখরিত হ'য়ে উঠেছে, সেই সময় নরেন ও তার বন্ধু শ্রীবীণা বোস্ অমিতাদের বাড়ীতে এসে প্রবেশ করলেন অমিতা তেতালার ছাদ থেকে দেখল তার স্বামী ও অপর একজন পুরুষ মানুষ তা'দের বাড়ীতে প্রবেশ কর্‌লেন। তাহলে বীণা বোস্ আসেনি—যাক্ বাঁচা গেল অমিতার বুকের ভারী পাথরের চাপটা যেন অল্প হাল্কা হ'য়ে গেল।

অমিতা দেখ্‌লে যে, তার স্বামী ও সে বন্ধুবর তার পিতামাতার কাছে প্রণামাদি কার্য্য সম্পন্ন করে' একটি ঘরে বিশ্রাম কর্‌ছেন। মাতা করুণাদেবীর আদেশে সে সেই ঘরে প্রবেশ করতে গেল, কিন্তু স্বামীর বন্ধুটীকে দেখে লজ্জায় কিছুতেই ঘরের ভেতর অগ্রসর হ'তে পার্‌ছিল না; দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। নরেন তাকে দেখ্‌তে পেয়ে উঠে গিয়ে ডাক্‌ল, ভেতরে এস; আমার এই বন্ধুটীর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই, নরেনের বন্ধু বীণাও তার সঙ্গে উঠে এসেছিল, সে বল্লে, "হ্যাঁ বৌদি ভেতরে আসুন আমি এতখানি পথ এসে আলাপ না করে শুধুশুধুই ফিরে যাবো নাকি?" অমিতা লজ্জায় জড়সড় হ'য়ে ঘরের ভেতর প্রবেশ কর্‌ল। নরেন বল্লে, "অমিতা, এই আমাদের বীণা বোস্—আমার পরম বন্ধু;—এর কথাই তোমাকে চিঠিতে লিখেছিলাম। এরি সঙ্গে তোমার চিঠির "বদল" হয়ে গিয়ে এই 'পত্র-বিভ্রাট' কাণ্ড উপস্থিত হয়েছে।" আর বীণা, তুমি বুঝতেই পারছ ভাই যে, ইনি আমার সহধর্ম্মিণী স্ত্রী। যাই হোক এইবার তোমার নামটা বদলে ফেলে একটা নতুন নামকরণ কর হে।"—বলে সে তার স্ত্রীর দিকে সহাস্য নয়নে তাকিয়ে দেখলে যে সে বেচারী লজ্জায় একেবারে লাল হ'য়ে উঠেছে। বীণা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে "বৌদিই না হয় সে ভারটা গ্রহণ করুন।" তার পর তোমরা একটু নিভৃতে বিজয়ার আলাপ সম্ভাষণটা সাঙ্গ ক'রে নাও" বলে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নরেন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে অমিতার খুব কাছে বসে পড়ে বললে—কি মিতা তোমার বীণা—সতীনকে একেবারে সাম্‌নে এনে দিলাম, তার সঙ্গে ঝগড়া করা দূরে থাক্, একটা কথা পর্য্যন্তও কইতে পার্‌লেনা?"

অমিতা বেচারী অপ্রস্তুত হয়ে নরেনের হাতটায় মৃদু আঘাত দিয়ে বল্লে যাঃ—ও. আমায় আগে একথা বলনি কেন? তুমি ভা-রী দুষ্টু!!!

———

হলিউডের প্রণয়-কাহিনী

শ্রীলীলাবতী সিংহ

লা-এঞ্জেলো বৰ্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি বিভাগের ন্যায় আমেরিকার যুক্তরাজ্য সমূহের একটী বিভাগ। এই বিভাগটী পশ্চিম দিকে, অর্থাৎ আমাদের এশিয়ার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। লা-এঞ্জেলোরই একটী সহরের নাম হলিউড। হলিউডকে ইউরোপের জনসাধারণ ফলিউড আখ্যা প্রদান করিয়া ঠাট্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই ফলিউডই আজ

রোমান নোভারো

সমস্ত জগতের বিস্ময় ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তথায় যে সমস্ত নট-নটী বাস করে তাহারাই জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বা অভিনেত্রী। তাহাদের রূপ, যৌবন, অর্থ, সুখ্যাতি কোন কিছুরই অভাব নাই। বর্ত্তমান জগতে তাহারা যেরূপ সম্মান, সম্ভ্রমে এবং জাঁকজমকের সহিত বাস করিয়া থাকে সেইরূপ ভাবে জীবন যাপন করা রাজ্যাধিকারীগণের পক্ষেও অনেক সময় সম্ভব হয় না।

অনেকের ধারণা আছে এই সমস্ত নট-নটী অভিনয়ের নায়ক-নয়িকা সাজিয়া সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিলেও তাহাদের হৃদয় নাই, প্রকৃত ভালবাসা কি তাহারা জানে না। ক্ষণিক উত্তেজনার বশে দুই এক সময়ে কেহ কেহ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেও ঐ বিবাহ-বন্ধন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। একথা খুবই সত্য যে নট-নটীর জীবন সাধারণ গৃহস্থের জীবন নহে। প্রত্যেকেই চাহেন তাঁহাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক কাজেই গার্হস্থ্য জীবন অপেক্ষা তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্ম জীবনকেই বড় করিয়া দেখেন, সেইজন্য বিবাহ-ভঙ্গ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। তবে একথা সত্য নহে যে তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেন এবং তাহাদের নৈতিক সমাজ নাই। মোটামুটী আমাদের ধারণা সত্য হইলেও হলিউডের নট-নটিদের সকল বিবাহই যে স্থায়ী হয় না, উহাদের মধ্যে প্রকৃত ভালবাসার স্থান নাই একথা ও সত্য নহে।

ছোট ডগলাস সুন্দরী শ্রেষ্ঠা জোয়ান ক্রফোর্ডকে বিবাহ করিয়াছেন। তাহাদের কয়েক বৎসর বিবাহিত-জীবনের মধ্যে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই যে, কি জোয়ান কিম্বা ডগলাস মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিতে পারিয়াছেন যে তাঁহাদের বিবাহ বন্ধন সুখের হয় নাই। তাঁহারা যেরূপ সুখের সহিত আদর্শ বিবাহিত জীবন যাপন করিতেছেন, তাহা যে কোন গৃহস্থের পক্ষেও শ্লাঘাজনক। কোন সাংবাদিক একবার ডগলাসকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন কি ভাবে তাঁহাদের বিবাহিত জীবন এত সুখের হইয়াছে? উত্তরে ডগলাস সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

তিনি বলেন—বিবাহের পূর্ব্বে আমরা যখন কোর্টশিপ

১। হাস্য। ২। চিন্তা। ৩। ব্যঙ্গ। ৪। সন্দেহ। ৫। প্রেম-মুগ্ধ। কৌতূহল।
৭। অভিমান। ৮। এ্যাডল্‌ফি মেঞ্জু।

করি তখন আমাদের অভিপ্সিতা নারীর নিকট আমরা সম্পূর্ণ রূপে আত্মদান করি। তাহার সকল প্রকার দোষ উপেক্ষা করিয়া তাবৎ আদর আবদারই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকি। বিবাহের পর দয়িত আমার অধিকার ভুক্ত এইরূপ জ্ঞান আসায় তাহার কোনরূপ আবদার সহিতে আর ইচ্ছা হয় না, তাহার দোষ গুণেরও বিচার করিতে আরম্ভ করি, এবং এই জন্যই বিবাদের সূত্রপাত হইয়া বিষাগ্নি ধুমায়মান হইতে থাকে, যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ঐ বিবাহ-বন্ধন ভস্মীভূত করিয়া দেয়। বিবাহিত জীবনেও মনে রাখিতে হয় কোন প্রেমিকার সহিত আপনি গুপ্ত প্রণয় করিতেছেন এবং আপনার স্ত্রী আপনার আয়ত্তাধীন নয়। তাহা হইলেই উভয়ের মধ্যে বিবাদ ঘটিবার আশঙ্কা কমিয়া যায়।

চিত্র জগতের বিখ্যাত অভিনেত্রী নান্‌সী ক্যারোল (Nancey Carrol) এর নাম সকলেই শুনিয়াছেন। নান্‌সীর বয়স যখন মাত্র ষোল এবং নান্‌সী উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতেছে তখন সে জ্যাক কার্কলাণ্ড (Jack Air kland) নামক এক যুবকের প্রণয়ে পতিত হয়। যুবকের অবস্থা তখন খুবই খারাপ, সে কোন সংবাদপত্র অফিসে সামান্য চাকুরী করে মাত্র। এই প্রণয়-কাহিনীর বার্ত্তা নান্‌সীর পিতামাতার কর্ণে প্রবেশ করিলে উভয়ে বিশেষ চিন্তা যুক্ত হইয়া পড়েন। এদিকে নান্‌সীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আমেরিকার বহু কোটী পতি তাহাদের তাবৎ ঐশ্বর্য্য তাহার চরণ-তলে উপঢৌকন দিতে প্রস্তুত ছিল। নান্‌সী কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া দরিদ্র যুবকের গলায় স্বচ্ছ-প্রণোদিত হইয়া মালা অর্পণ করে। তাহাদের বিবাহিত-জীবনের কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, উভয়ে এখনও পরস্পর পরস্পরকে পূর্ব্ববৎই ভালবাসিয়া থাকেন।

(Janet Gaynar) জেনেট গেনর একজন বিশ্ব-বিখ্যাত নটী। লেডল্ ক্লার্ক (Lydell clark) নানক একজন এটর্নি যুবক এই তরুণীর রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নিকট বিবাহ প্রস্তাব করে। জেনেট ও এই সুন্দর যুবককে তাহার স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই। উভয়ের মধ্যে বিবাহ হইয়া গেলে লেডল দেখিতে পায় যে তাহার বর্ত্তমান পেশা চালাইতে গেলে যথেষ্ট ভাবে অর্থাগম হইতে পারে সত্য কিন্তু তাহার স্ত্রী জীবনে যে উচ্চাশা ঘোষণ করিতেছে

বাষ্টার কীটন

তাহা পূরণ করা হইবে না। এইজন্য লেডল লাভজনক এটর্নি ব্যবসা ত্যাগ করিয়া জেনেট গেনরের এর ষ্টুডিওতে একটী কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্ত্রীকে তাহার কার্য্যে সহায়তা করিতে থাকেন। শীঘ্রই লেডলের সহিত ষ্টুডিও কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হওয়া লেডল কর্ম্মত্যাগ করিলেই জেনেটও কর্ম্মত্যাগ করে। জেনেট অনেক দিন পর্য্যন্ত কোন ষ্টুডিওতে কার্য্য করে নাই। তারপর তাহার স্বামীকে সম্মানজনক কার্য্য প্রদান করা হইবে এই সর্ত্তে জেনেট বর্ত্তমানে Paramount কার্য্য করিতেছে।

Lilyan Tashman (লিলায়ান টাস্‌মান) এক

লন চানির অভিব্যক্তি

১। ভিক্টর্ ভার্কনি ও তাঁর স্ত্রী লুসি

২। "The Volga Boatman" নাটকে রাজকুমারী ও তার প্রেমিকের ভূমিকায় শ্রীমতী এলিনর ফেয়ার ও ভিক্টর্ ভার্সন

৩। The King of Kings নাট্যকের একটা দৃশ্য। এর মধ্যে ভার্কনি, পন্টিয়াস পাইলেটের ভূমিকায় অভিনয় ক'রছেন।

৪। The Last Days of Pompeii" নাটকে গ্লসাস্ ও নিডিয়ার ভূমিকায় ভিক্টর্ ভার্কনি ও শ্রীমতী মেরিয়া কর্ডা।

বিলি ডাভের অভিব্যক্তি

অন্যতম সুন্দরী অভিনেত্রী। সমস্ত হলিউডে নটীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া থাকেন। লিলিয়ান এডমণ্ড লোকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবাহিত জীবন ও বেশ সুখেরই হইয়াছে। লিলিয়ান বলিয়া থাকেন যে পুরুষগণ সাধারণতঃ একটু আত্ম-প্রশংসা শুনিতে ভালবাসিয়া থাকে। এই জন্য স্বামীর নিন্দা করা কোন স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে। তাহার পর প্রত্যেক পুরুষই ভাবিয়া থাকে যে সে একজন হীরো (Hero) তাহার সহিত জগতের অপরাপর পুরুষগণের তুলনায় একটু পার্থক্য আছেই। এই ধারণা সে প্রায়ই খুবই গোপনে তাহার স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিয়া থাকে। স্ত্রী যদি তাহার এই ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা না করে তাহা হইলেই উভয়ের মনোমালিন্য হইবার খুব একটা বড় আশঙ্কা কমিয়া যায়। স্বামী বশ করিবার শ্রেষ্ঠ যাদুমন্ত্র হইতেছে স্বামীর কাছে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ধরা না দেওয়ার। হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটন করিতে হইবে বলিয়া আপনার তাবৎ তত্ত্ব অকপট হৃদয়ে বলিয়া যাওয়া উচিত নয়। সব সময়েই আপনাকে স্বপ্নময়ী ও প্রহেলিকায় আচ্ছাদিত রাখিতে পারিলেই স্বামীর সোহাগ হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা খুবই কমিয়া যায়।

বিখ্যাত হাস্য-রসিক লায়ড হারলডেরও সহধর্ম্মিণী আছে। তাঁহাদের বিবাহিত জীবন খুবই সুখের। সম্প্রতি তাঁহাদের একটী শিশু সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কনষ্টানস বেনেট ও জোয়েল মাক্‌ক্রীনের বিবাহিত-জীবন বেশ সুখের হইয়াছে। তাহারাও স্বামী-স্ত্রী ভাবে সুখে ঘরকন্না করিতেছে। বেবী ডানিয়েল ও তাহার স্বামীকে খুব অন্তরের সহিত ভালবাসিয়া থাকে স্বামী এবং তাহার শিশুগণ অনেক সময়েই তাহার কর্ম্ম-জীবনের অন্তরায় হইলেও সে আপনার নটী-জীবন অপেক্ষা, তাহার গার্হস্থ্য জীবনকেই অধিক প্রীতির চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে।

মোট কথা নারীর হৃদয়ে প্রেম স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আসিয়াছে। সে সৃষ্টির রূদয়িত্রী কাছেই সৃষ্টি রচনায় কখনই অমনোযোগী হইতে পারে না। যেখানে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় সেখানে বুঝিতেই হইবে একটা কিছু অস্বাভাবিক ঘটিয়াছে। এই অস্বাভাবিকতাই এই ব্যতিক্রমের অন্যতম কারণ।

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়।
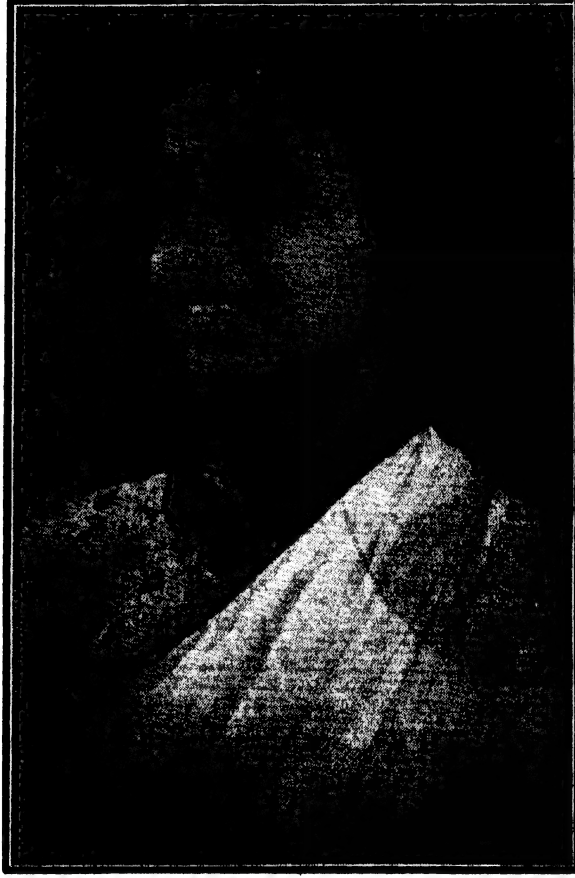
কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়ের লেখার সহিত পুষ্প-পাত্রের পাঠকগন পরিচিত। ইহার রচিত গান গুলি সম্প্রতি নূপুর নামে পুস্তকাগারে বাহির হইয়াছে। কুমারী লতিকার সঙ্গীত শাস্ত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে এবং তাহার মধুর সঙ্গীত অনেকেই রেডিওতে শুনিয়াছেন ও গ্রামোফোন্ রেকর্ডেও তিনি গান দিয়াছেন। এরূপ সুরশিল্পীর রচিত গানগুলি যে সুন্দর হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

ইহার রচিত কাশী একখানি সুন্দর ভ্রমন কাহিনী।

কুমারী লতিকা ডাক্তার শ্রীসন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়ের কন্যা এবং ইহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। এইরূপ অল্প বয়সে ইহার রচনার ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়।

জীবনবীমা প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত এস, সি, সেনের শুভেচ্ছা

আজ এই জাতির জাগরণে জীবনবীমার নাম বাঙ্গালা দেশে চির জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। স্বদেশী বীমা কোম্পানী-গুলির উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া এই অভূতপূর্ব্ব অর্থ সমস্যার দিনেও মনে হয় বাঙ্গালী জাতি আর পড়িয়া থাকিবে না, আবার সুদূর অতীতের ন্যায় বাণিজ্য সমৃদ্ধি বিস্তার করিয়া অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবে। ২৫

মিঃ এস, সি সেন।

বৎসর পূর্ব্বে দুই একটি ভারতীয় কোম্পানীর প্রয়াস ব্যতীত সমস্ত বীমা ব্যবসাই বিদেশী কোম্পানীর হস্তে নিহিত ছিল; সাধারণের নিকট বীমার নাম প্রায় লুপ্ত ছিল। কয়েকটী দেশীয় জীবনবীমা কোম্পানীর বিগত এক চতুর্থাংশ শতাব্দীর প্রচেষ্টার সাফল্য দেখিলে স্বতঃই আশা হয় যে বাঙ্গলার জীবনবীমা ব্যবসায় বাঙ্গালী অচিরেই একচ্ছত্র অধিকারী হইবে।

প্রাচীন ভারতে, এমন কি ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বেও যৌথ পরিবার প্রথার প্রচলন ছিল বলিয়া পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় জীবনবীমার অভাব এদেশে তেমন অনুভূত হইত না। কিন্তু পাশ্চত্য সভ্যতার প্রতিঘাতে সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বীমার ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়াছে; শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রই বীমার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। জনসাধারনও ক্রমে জীবন-বীমার বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিতেছে। আজ কয় বৎসর যাবৎ বীমা কোম্পানীর প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের আলোচনা প্রচারের ফলে সকল শ্রেণীর মধ্যেই বীমা প্রচলিত হইতেছে। "পুষ্পপাত্র" ও এই উচ্চ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বীমা প্রচলনে সর্ব্বদাই বিশেষ সাহায্য করিয়া আসিতেছে। আমি এই পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শ্রীযুক্ত এস সি, রায়ের শুভেচ্ছা

আজ জাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী কোম্পানী ভারতবর্ষের চারিদিক প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। পঞ্চবিংশতি বৎসরের পূর্ব্ব ইতিবৃত্তে দেখা যায় এই দেশে বীমার নাম প্রায় সুপ্ত ছিল যাহাও বা ছিল তাহা, বিদেশী। স্বদেশী যুগে দেশী বীমা কোম্পানীর প্রথম জয়যাত্রা আরম্ভ হয়। তারপর ধীরে ধীরে বৎসরের পর বৎসর উল্টাইলে দেখা যায় তার বিজয়-বিবরণী। আজ ১৯৩৩ সালে, এই বিশ্বময় অর্থ সঙ্কটের দিনেও মনে হয় এ জাতির ভাগ্যচক্র একদিন ঘুরিবেই ঘুরিবে। কঠোর সত্যের পথ অবলম্বন করিয়া স্বদেশী বীমা কোম্পানী বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া দাঁড়াইয়া ভারতের শস্যশ্যামল বুকের উপর দাঁড়াইয়া আছে।

বীমা কোম্পানীর আবির্ভাবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বীমার প্রয়োজন। বীমা কি ইহার দ্বারা দেশের কি উপকার সাধন হয়, এই সকল সম্পূর্ণভাবে জানিবার জন্য বীমা পত্রিকার উৎপত্তি। এখন অনেক বীমা পত্রিকা বাহির হইয়া এই সকল প্রচার করিতেছে। এ ছাড়া বাংলা সাহিত্যের কতকগুলি মাসিক পত্রিকা বীমা বিভাগ খুলিয়া-ছেন—এই প্রচেষ্টা যেন তাঁহাদের জয়যুক্ত হয়। 'পুষ্পপাত্র' ঐ জাতীয় পত্রিকার মধ্যে অন্যতম। এই পত্রিকার বীমা বিভাগ যেন চিরজীবি হইয়া হইয়া থাকে। আমি এই পত্রিকার কল্যাণ কামনা করি।

বীমা ব্যবসায় প্রতিযোগিতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক নূতন বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহাদের ভিতর ভিতর একটী প্রতিযোগিতার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। প্রতিযোগিতা ব্যবসার দিক দিয়া শুভ যদি উহা ন্যায় ও সঙ্গত ভাবে পরিচালিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায়ই উহা ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করে ও ব্যবসার ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কারণ প্রত্যেক স্ব স্ব কৃতকার্য্যতায় ও প্রতিষ্ঠায় একে অন্যের চেয়ে বড় দেখাইতে চেষ্টা করে এবং ইহা দেখাইতে যাওয়াই ভবিষ্যতে ক্ষতির মূল কারণ। বীমা ব্যবসার উন্নতি জন সাধারনের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে কিন্তু একদিনে লাভ করা যায় না—উহা সময় সাপেক্ষ। খুব ধীরে ধীরে সততা ও অধ্যবসায়ের দ্বারাই ইহার উন্নতি।

বীমা ব্যবসায়ীগণের প্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বীমাকারীদের প্রতি। তাঁহাদের সদাসর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে তাঁহারা বীমাকারীদের প্রতিনিধি হইয়াই ব্যবসা পরিচালিত করিতেছেন। উভয়ের স্বার্থই সমভাবে জড়িত—একের ক্ষতিতে—অন্যের ধ্বংস। নূতন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যাহা নিজস্ব এবং আর্থিক ব্যাপার যাহা ব্যবসার পক্ষে আবশ্যক—তাহাই শুধু বাহিরে প্রচার করা প্রয়োজন। তদাতিরিক্ত নয়।

যদি অন্য এক প্রতিষ্ঠান যাহা পুরাতন ও সুদৃঢ় ভাবে স্থাপিত এবং যাহার আর্থিক অবস্থা বাহিরের নাম ও মর্য্যদা যথেষ্ট—তাহার সহিত তুলনা করিয়া নূতনের পক্ষে নিজেকেও সেই ভাবে বাহিরে প্রচার করার অর্থই নিজেকে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করা মাত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে বড় বড় বীমা ব্যবসায়ীরা অংশীদারদিগকে যে পরিমাণ লভ্যাংশ দিতে সক্ষম তাহা নুতন কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই আর্থিক দুর্দ্দিনে সম্ভব নাও হইতেও পারে। বড়র সহিত নিজকে তুলনা করিতে যাইয়া এবং প্রতিযোগিতায় নিজকে পরিস্ফুট করিতে ইহাদিগকে বড়র সমান তালে চলিতে হয়। ফলে নব প্রতিষ্ঠিত বীমা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে।

লভ্যাংশের ব্যাপারটা একটি বড় রকম ব্যাধির ন্যায় ব্যবসা জগতে বিস্তার লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। আমাদের ধারণা, যে কোম্পানী লভ্যাংশ যত বেশী দিতে পারিবে—তাহারই আর্থিক অবস্থা তত সুদৃঢ়। কোম্পানীর আর্থিক ব্যাপারে এই ধারণা ভাল কি মন্দ, এ শুধুই তাঁহারাই বলিতে পারেন। যে কোন কোম্পানীর পূর্ব্ব বৎসরের আয় ব্যয় চালাই চলতি বৎসরের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় সব ক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ আশার উপর নির্ভর করিয়া আয়ের ঘর ঠিক করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখা দরকার যেন বর্ত্তমানে সামান্য লাভের আশায় ভবিষ্যতে না বিপদগ্রস্থ হইতে হয়। ব্যবসায়ের মূলে কোন প্রকার কোম্পানীর স্থান নাই—উহা শুধু ভবিষ্যতের পথই বিঘ্নশঙ্কুল করে।

সর্ব্বব্যবসাই শ্রমজনিত সাফল্য দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করে সুতরাং সাময়িক আগত লাভের উপর লক্ষ্য না করিয়া ব্যবসায়ের মুখ্য উন্নতির নিমিত্ত শততা, এবং উদার ভবিষ্যদৃষ্টির সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াই সমীচিন বলিয়া মনে করি। ইহাতে সাফল্য দ্রুত নাও হইতে পারে কিন্তু যতটুকু সাফল্যই অর্জ্জিত হউক না কেন—উহার স্থিতি আছে এবং ব্যবসায়েও তাহার উৎকর্ষ অনুভূত হইবে।

বীমা প্রসঙ্গ

শ্রীঅরুণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বীমা ও ছায়াচিত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রী

বীমা বিদেশে বহুদিন হইল আদৃত হইয়া আসিতেছে। আমেরিকার ছায়াচিত্র ও অভিনেত্রীদের মধ্যে ইহা কিরূপ

লেখক।

যে বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহা কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম...

'পেগ্যোনের' সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা গায়ক 'র‍্যামন নোভারো' ৮,২৫০,০০০৲ টাকার জীবন বীমা করিয়াছেন।

জন ব্যারিমুর—রাজপুটানা এণ্ডদি এক্সপ্রেস"ও অন্যান্য সবাকচিত্রের খ্যাত অভিনেতা জীবন বীমা করিয়াছেন ৫,৫০০,০০০৲ টাকার।

চিত্রামোদিদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ তারকা অভিনেত্রী ,গ্লোরিয়া সোয়ান'সন বিশেষ পরিচিত। তিনি জীবন বীমা করিয়াছেন ৫,৫০০,০০০৲ টাকার। হলিউডের খেয়ালী বীমার কথা সকলের নিকটই পরিচিত—ইনি তাঁর অতিথির পোষাক পরিচ্ছদ নষ্ট বা হারাইবার বিরুদ্ধে প্রায় ২৭২২২২৲ টাকার বীমা করিয়াছেন।

'দি প্যাশান অফ্ ওম্যান'এর সুন্দরী অভিনেত্রী 'নরমাটোলমেজ' ৩,৪৩৭৫০০৲ টাকার জীবন বীমা করিয়াছেন।

হাস্য রসিক 'চ্যারলি চ্যাপলিন'কে সকলেই চেনেন, ইনি জীবন বীমার উপকারীতা হাসিয়া উড়াইয়া দেন নাই —পরিবারের মঙ্গলের জন্য ইনি ২,৭৫০,০০০৲ টাকার জীবন বীমা করিয়াছেন। ইনি তাঁর এক জোড়া টাউজার হ্যাট ও একটী বেতের লাঠি—হারাইবার ও পুড়িয়া যাইবার বিরুদ্ধে ১৫০,০০০ টাকার বীমা করিয়াছেন।

সর্ব্বজনবিদিত ডগলাস ২,৭৫০,০০০ টাকার জীবন বীমা করিয়াছেন।

কন্সট্যান্ট টেল মেজ।

নির্ব্বাকযুগের সাম্রাজ্ঞী ও সুন্দরী শ্রেষ্ঠ 'মেরী পিকফোর্ড' এবং সবাক 'কিকি'র অভিনেত্রী—আপনার সন্তান সন্ততির মঙ্গলের জন্য ২,৭৫০,০০০ টাকার জীবন বীমা করিয়াছেন। ইনি 'ডগলাসে'র পত্নি ছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রতি ইঁহারা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন।

তারকা অভিনেত্রী 'কন্সট্যান্ট টেল মেজ' ২৭৫৬,০০০৲ টাকার জীবন বীমা করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া উইল রোগেস, জন্ ম্যাক্রোমাক্ প্রভৃতি ২৭৫০,০০০৲ টাকার জীবন বীমা করিয়াছেন।

লুপে ভেলিজ।

জগতের শ্রেষ্ঠতমা, রহস্যময়ী ছায়াচিত্র তারকা 'গ্রেটা গার্কো' এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী যেমন—নরমাসিয়ারার, লুপে ভেলিজ ও বেব্ ডেনিয়াল প্রভৃতি বীমা জগতে বিশেষ পরিচিত।

হলিউডের অনেকে সময় সময় খেয়ালী বীমা করেন, তাহার দুই একটী উদাহরণ নিম্নে দিলাম—

'এডমন লো'—আপনার মুখমণ্ডল নষ্ট হইবার বিরুদ্ধে অনেক টাকার বীমা করিয়াছেন।

'লেসিয়াকে জডিড্'—তাঁহার রেশমের মত সুন্দর কোঁকরান অলক গুচ্ছ নষ্ট বা বিকৃত হইবার বিরুদ্ধে বীমা পত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

'বেনটার প্যাইন' একজন ট্যারা অভিনেতা—তাঁর চক্ষু স্বাভাবিক হইবার বিরুদ্ধে ৩,০০,০০০৲ টাকার বীমা পত্র ক্রয় করিয়াছেন

'বাষ্টার কেটনের' সঙ্গে একটী 'ব্রাউন আইজ' নামক গরু নামিয়াছিল। নামাইবার পূর্ব্বে তাহার জীবন বীমা করান হয় ৩,০০,০০০৲ টাকার।

—নূতন বীমা—

কতগুলি ছায়াচিত্র অভিনেত্রী বলপূর্ব্বক অপহৃত হইবার বিরুদ্ধে (against kidnapPing) বীমা করিতে

বেব ডেনিয়াল।

আরম্ভ করিয়াছেন। বীমা পত্রের একটী সর্ত্ত আছে যে বীমাকারী বা বীমাকারিণী যদি উক্ত বীমার কথা অপরের নিকট উল্লেখ করেন তবে তাঁহার বীমা পত্র বাতিল হইবে। আবেদনকারী বা আবেদনকারিণীকে উক্ত বীমা পত্রে (Kidnapping policy) এইরূপ সহি করিতে হয় যে—তাহাদের অপহৃত হইবার কোনো কারণ বা সম্ভাবনা নাই। এই জাতীয় বীমায় ১০,০০০ পাউণ্ড পাওয়া যাইবে—কিন্তু এক সঙ্গে নয়। প্রতি বৎসর ১০০ পাউণ্ড করিয়া।

ইহার পর শুনিতে না হয় ঐ সকল অভিনেত্রী হারাইবার বিরুদ্ধে বীমা করিতে সুরু করিয়াছেন—বিচিত্র কি!

আমাদের দেশের ছায়াচিত্রাভিনেতা বা অভিনেত্রী খুবই কম। যাঁহারা আছেন তাহাদের জীবন যেন তমসাচ্ছন্ন। তাঁহাদের চরিত্রের কালিমা—ভাল মন্দের বিচার শক্তি সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া দিয়াছে। আমাদের এই বাঙ্‌লার শুধু দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়, মায়া দেবী এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা শ্রীমতী সবিতা দেবী—জীবন

বীমার সহিত পরিচিত। অন্যান্য ছায়াচিত্র অভিনেতা বা অভিনেত্রী ভাব রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন।

বীমা শিক্ষার ব্যবস্থা

বীমা জটিল বিজ্ঞান, ইহা সহজ লব্ধ নয়। আয়ত্ব করিতে হইলে পড়াশুনা দরকার। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ

মায়াদেবী।

ব্যক্তিদের সম্মিলনে এইরূপ দুটী কলেজের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। একটীর নাম ইন্‌সিওরেন্স কলেজ ও আর একটী কমার্শ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আমরা দিন দিন ইহার কল্যান কামনা করি। আজ জাতির জাগরণে—এই দুইটি নব প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় জয়যুক্ত হউক।

বীমা কোম্পানীর এজেণ্ট

আমাদের দেশের বীমা কোম্পানীর এজেণ্ট গণের বীমা সম্বন্ধে জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহারা স্ব স্ব কোম্পানীর দোষ গুণ বিচারে সমর্থ নয়। তাহারা শুধু আপন আপন কোম্পানীর বৈজয়ন্তী উড়াইয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া, সত্যকে মিথ্যা বলিয়া কমিশনের লোভে বীমা পত্র বিক্রয় করিতে চেষ্টা করে। এমন কি আপন কোম্পানীর জন্য—অন্যান্য কোম্পানীর বুকে কলঙ্কের ছাপ মারিতে কোনরূপ দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করে না। প্রায়ই ফল খারাপ হইয়া দাঁড়ায়। নানারূপ বাকবিতণ্ডা শুনিয়া সময় সময় বীমাকারী অবাক হইয়া যায়। কোন কোম্পানীকে বড় কোন কোম্পানীকে ছোট উহা নির্দ্ধারণ করা তাহাদের পক্ষে কষ্ট সাধ্য হইয়া পড়ে।

বীমা সহজ বিজ্ঞান নয়, উহা আয়ত্ব করিতে কিছু মাল-মসল্লার প্রয়োজন। সাধারণ জীবনে উহার দরকার নাও হইতে পারে—কোন কোম্পানী বড় বা ছোট তাহা জানিতে হইলে বিশদ জ্ঞানের প্রয়োজন। মূর্খের কথা নাই বা বলিলাম—অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ও এবিষয়ে অজ্ঞ।

কোম্পানী নির্ব্বাচন

বীমা কোম্পানী নির্ব্বাচন করিতে হইলে—কোম্পানী সম্বন্ধে সঠিক জানিয়া তবে বীমা করা উচিত—কি কি বিষয় প্রধানতঃ জানা উচিত তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল—

১। কোম্পানী নিরাপদ কিনা।

২। কোম্পানীর বীমা তহবীল আছে কিনা।

৩। রিজার্ভ ফাণ্ড আছে কিনা?

৪। কোম্পানীর দাদনী তহবিল নিরাপদে আছে কিনা?

৫। দাবীর টাকা তৎপরতার সঙ্গে পূরণ করা হয় কিনা?

৬। বার্ষিক নূতন কাজে কিরূপ, প্রিমিয়ামের আয় অনুপাতে ব্যয় সঙ্গত ও স্বাভাবিক কিনা?

৭। সংগৃহীত বীমার অনুপাতে বাতিলের হার নিম্নে কিনা।

এই সকল জানিবার একমাত্র উপায়, কোম্পানীর পরীক্ষিত বার্ষিক হিসাব নিকাশ ও উদ্বৃর্ত্ত-পত্র দেখা। ইহাতে কোম্পানীর কার্য্য বিবরণ বিশদ ভাবে দেওয়া থাকে, কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থা ইহা হইতে পরিষ্কার বোঝা যায়। অনেক কোম্পানী কিন্তু কায়দা করিয়া

...ধিক বিবরনী ছোট করেন, তাই বলিয়া আইনের গণ্ডী ...ঘন করেন না অর্থাৎ—আপন আপন খোলসের অন্তরালস্থিত নগ্ন মূর্ত্তি প্রকাশ করেন না—বাহাদুরী দেওয়া উচিত সেই সকল কোম্পানীকে। উক্ত রিপোর্ট পড়িয়া যে ধারণা হয়—কোম্পানীর সত্য রিপোর্ট হয়তো অন্যরূপ ধারনা আনিতে পারে। তাই বলিয়া বলিতেছিনা যে তাহাদের সকল খুঁটিনাটি প্রকাশ করিতে হইবে। বীমা কারীর স্বার্থের দিক দিয়া যাহা যাহা প্রকাশ করা দরকার তাহাই প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

দেশী কোম্পানী—দেশী কোম্পানী—দেশ বাসীর সহানুভূতি চায়—তাহারা চায়না যে দেশের অর্থে বিদেশী বড় হউক—আর দেশী কোম্পানী উঠিয়া যাক্। তাহারা চায়—দেশী কোম্পানীতে সকলে বীমা করুক তাহা হইলে সেই অর্থে আপনার দেশে থাকিব, দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিবে। একদিন পাঞ্জাব কেশরী লালারাজপাত রায় আপনার দেশবাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

It is an undoubted fact that the amonnt of money taken away by foreign Insurance Companies constitutes a large annual drain on tbe resourcre of India and it is the duty of Indian to check this drain and capture the Insurance Business as for as practicable.

হয়তো তার এই মহান্ বানী আজ সত্য হইতে চলিয়াছে। আজ তাই—ওরিয়েন্টাল, হিন্দুস্থান, ন্যাশনাল, এম্পায়ার, নিউ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি এতবড়। আজ ভারত জননী তাঁহাদের গরিমায়—গরিমাময়ী

মিষ্টার এস, সি, রায় এম্, এ বি-এল,
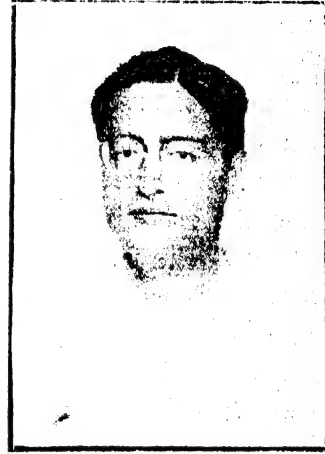
মিঃ এস, সি, রায়

ইনসিওরেন্স ওয়াল্ডের সম্পাদক এবং হিন্দুস্থানের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মিষ্টার এস, সি, রায়, বেঙ্গল ন্যাশেনাল চেম্বার অফ্ কমার্শ কতৃক ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের এড্ভাই-সারি কমিটীর মেম্বার নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা দিন দিন এর মঙ্গল ও উন্নতি কামনা করি।

কোন্ পথে

শ্রীপ্রভাকর মিত্র বি, এ, (কলি) বি, কম্ (বোম্বে)

এর কোথায় শেষ মানুষ তা জানে না—যতদিন যাচ্ছে শ্রমিকের এক একখানা করে বুকের পাঁজর দিয়া দিচ্ছে, আর ধনী অন্তরে শিউরে শিউরে উঠেছে তার কঙ্কাল রূপ দেখে। শ্রমিকের যে বলিষ্ঠ বপু এতদিন ধনীর দুয়ারে কেনা হয়েছিল, যাকে ধনী হেলাভরে বিদ্রূপ করে এসেছে তারই কঙ্কাল আজ ধনীর চোখে বিভীষিকা হয়ে উঠেছে। এরূপ দুর্ব্বিসহ জীবন আর কতদিন চলবে?

দুনিয়া একবার মিলনের মধ্যে বাঁচবার চেষ্টা করে দেখলে বিশ্বের আর্থিক বৈঠকে। কিন্তু মিলনের বদ্ধ নিশ্বাসে বাতাস গরম হয়ে উঠল; ফলে কিছুই হ'ল না। দুচার বার হাত পা নেড়েই সব নীরব হ'ল। বিভিন্ন জাতির মানসিক গঠনে এখনও বিশেষ পরিবর্ত্তন আসে নি—মহামানবতার স্পন্দন এখনও তাদের প্রাণ স্পর্শ করেনি—তাই অমিলনের পরিচয়ই পরিস্ফুট হয়ে উঠল আন্তর্জ্জাতিক ঐ মিলনে! যে মনোবৃত্তি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতি "নিরস্ত্রীকরণে" যোগদান করেছিল তাতে বৈঠকের ফলাফল যে কি দাঁড়াবে তা অগ্রেই বুঝা গেছে। যে যার আপন তূণে অস্ত্রগোপন রেখে অপরকে নিরস্ত্রীকরণে

উৎসাহ দিয়েছিল—তাতে হ'ল "শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি"।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, আরো কতদিন? তার খবর ত কেউ রাখে না। "সন্ধি"র বিশ্বাস মানুষ হারিয়েছে—"সন্ধি" করে যে মানব দুঃখ দূর হবে তার আশা সুদূর পরাহত।

কিন্তু তা বলে ত দুনিয়াকে নিজের বশে চলতে দেওয়া আর চলে না—মানুষের সামাজিক গঠনের ভিত্তিই ধ্বংসের মুখে, রক্ষা যে তাকে করতেই হবে।

তাই বিভিন্ন জাতি এখন আপন আপন ঘর সমলাতে ব্যস্ত। তারা বিশ্বাস করেছে নিজে বাঁচলে তবে বাপের নাম। পন্থা বিভিন্ন তবে লক্ষ্য এক—মানুষের ক্রয়শক্তি বাড়াতেই হবে। তা না হলে ধনী মারাযাবে—আর তার পতনে চুরমার হয়ে, যাবে ধনবানের অট্টালিকা। আমেরিকায় রুস্‌ভেল্ট সমগ্র জাতীয়শক্তি একত্র করে পূনর্জ্জীবনের আশায় প্রচণ্ড প্রয়াস করছেন। সেই প্রয়াসই বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পাচ্ছে বিভিন্ন দেশে। ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদ মজ্জাগত। তাই ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যাপারে ইংরাজ এক নীতিই প্রচলন করিতে চায়—বিলাত এখন 'ষ্টার্লিং সঙ্ঘের' মধ্য দিয়ে জীবনী শক্তি সংগ্রহে ব্যস্ত।

আন্তর্জ্জাতিক সম্মিলনে বিশ্বাস হারিয়ে মানুষকে এখন জাতিয়তা পেয়ে বসেছে।

* * * * *

ধনতন্ত্রীদের মধ্যেও ভাবের মহা পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে। সার হেন্‌রী ফোর্ড এক "নূতন ভাবধারা' আবিষ্কার করেছেন। তার মতে ধরিত্রীর ধারণাশক্তি অফুরন্ত। মাটীর যে স্নেহ মানুষ এতদিন ভুলেছিল, তারই উৎস সন্ধানে তাকে আবার বেরোতে হবে যদি তাকে বাঁচতে হয়। এ যেন আমাদের দেশের Back to village ফিরে চলার প্রতিধ্বনি!

শ্রমিক এসব দেখে আর ভাবে তাকে বাদদিয়ে এখনও জগত চলবার আশা রাখে। এই মহা সমস্যার সমাধানে ধনী যা করবে তাই তাকে যেন মেনে নিতে হবে। নিজের কিছু বলবার বা করবার যেন কোন অধিকার তার নাই। সে ত দীনতা আর সহ্য করতে পারে না জাতীয় ধন দৌলত যে তার সমধিক অধিকার। তাই সময়ে সময়ে অদম্য নিরাশায় সে বলে ওঠে এ অবিচারপূর্ণ দুনিয়া চুলোয় যাক।

রাজপ্রসাদ ভেদ করে শ্রমিকের সেই তীব্র আর্ত্তনাদ রাজসরকারের কানে গিয়ে পৌছায়—সরকার চমকিয়া উঠিল। অর্থবিশারদ মন্ত্রীকে ডেকে বলেন—এর উপায় কি? মন্ত্রী তার দপ্তর নেড়ে চেড়ে বলেন—দুনিয়া অলাভে বিকিয়া যাচ্ছে। লাভের ব্যবস্থা করেদিন সব চুকে যাবে!

তাই পুনরায় লাভের ব্যবস্থাই হচ্ছে—মানুষ এখনও মায়া মরিচিকায় অন্ধ এর স্বর্ণক্ষুধা এখনও মিটে নি?—তাই বর্ত্তমান বিধানমতেই তাকে চলতে হবে—কিন্তু এ চলায় ত আর গতি নেই—মোড় ফেরবার সময় এসেছে কিন্তু সেও কোন্ পথে—সেই হয়েছে তাই প্রশ্ন।

বারান্তরে হিন্দুস্থান, ন্যাশনাল, এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়া, নিউ ইণ্ডিয়া, বোম্বে লইয়া, ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট প্রভৃতি বীমা কোম্পানীর উদ্ধৃত্ত পত্রআলোচনা প্রকাশিত হইবে!

বালিকার কৃতিত্ব

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—পূজার ছুটীর উপলক্ষে পুষ্প-পাত্র আফিস ৮ই আশ্বিন হইতে ২০শে আশ্বিন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিকে। কার্ত্তিকের পুষ্প-পাত্র ১৫ই কার্ত্তিক প্রকাশিত হইবে।

উন্মেষ

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ, কলিকাতা

সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত

৭ম বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ | ৮ম সংখ্যা

বিপন্ন বাঙালী

শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী

বর্ত্তমানে জগতের সর্ব্বত্র যে দারুণ অর্থ সঙ্কট আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে তাহার ফলে, বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপন্ন হইয়াছে বাংলা দেশ। বিদেশী বণিকের ত কথাই নাই, বহু দিন হইতে এই বাংলারই বুকে বসিয়া অ-বাঙালী ব্যবসায়ীগণ বাংলার অর্থ সম্পদ শোষণ করিতেছে; বিলাসপ্রিয় নিশ্চেষ্ট বাঙালী সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেছে না, বা তাহার প্রতিরোধেরও কোন চেষ্টা করিতেছে না। এ-বিষয়ে বাংলার গৌরব আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র প্রমুখ মনীষিগণ কত বক্তৃতা দিতেছেন, কত প্রবন্ধ লিখিতেছেন, কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন ত বিশেষ কিছু লক্ষ্য করা যাইতেছে না। বাংলার ক্রম-বর্দ্ধমান দারিদ্র্য দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

জীবন-যাত্রার প্রণালী অনুযায়ী বাংলার সমাজ বহু দিন হইতে তিনটী স্তরে বিভক্ত ছিল—ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র। যাঁহাদের বড় বড় জমিদারী বা তালুকদারী ছিল, যাঁহাদের দেউড়িতে সর্ব্বদা লোক-লস্করের ভিড় লাগিয়া থাকিত, যান-বাহন ছাড়া যাঁহারা এক পাও চলিতেন না—বাঙালীর সমাজে তাঁহারাই ছিলেন "ধনী" নামে পরিচিত। নিজেদের তত্ত্বাবধানে যাঁহারা জমি-জমার চাষ করাইতেন, যাঁহাদের আঙিনার প্রান্তে দুই চারিটা ধানের গোলা ছিল, যাঁহাদের পুকুর ভরা ছিল মাছ, গোয়াল ভরা ছিল গরু বাড়ীতে দেব-বিগ্রহের ছিল নিত্য সেবা আর বার মাসের তের পার্ব্বণে যাঁহাদের গৃহ উৎসব মুখর হইয়া উঠিত—প্রথমে নবাব সরকার ও পরে ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরী করিয়া বা ছোট-খাট ব্যবসা করিয়া যাঁহারা দু'পয়সা নগদ উপার্জ্জনও করিতেন, তাঁহারা নিজদিগকে "মধ্যবিত্ত" বলিয়া পরিচয় দিতেন। আর যাঁহারা পরের জমি চাষ করিয়া বা নিজের ক্ষেতের ফসল বিক্রয় করিয়া দিন গুজরাণ করিত, সেই কৃষক সম্প্রদায় ধনী ও মধ্যবিত্তের সহিত তুলনায় আপনাদিগকে "গরীব" বলিয়া জানিত। কিন্তু গরীব

হইলেও মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব তাহাদের কোন দিনই ছিল না। বিগত মহাযুদ্ধের সময় দ্রব্য মূল্যাদি অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাওয়ায়, এই কৃষক সম্প্রদায় ও মহাজনগণের মধ্যে অনেকেরই হঠাৎ অবস্থা ফিরিয়া যায়। কিন্তু সময়ের আবর্ত্তনে আজ আবার ব্যবসার বাজার নিতান্ত মন্দা হইয়া পড়ায় ইহাদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা একেবারে চরমে আসিয়া পৌছিয়াছে। বাংলার প্রধান পণ্য পাট ও ধানের দাম একেবারে নামিয়া যাওয়ায় কৃষকের ঘরে আজ একটীও পয়সা নাই। ফলে জমিদারের খাজনা আদায় হইতেছে না, মহাজনের ক্যাস-বাক্সে একটীও সুদের পয়সা উঠিতেছে না। সর্ব্বত্র অসন্তোষ ও অভাব অভিযোগ নগ্নমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে।

বাংলার জমিদার সম্প্রদায় চিরদিনই বিলাস ব্যসনে আসক্ত। তবে পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে পৈতৃক ভবনে বসিয়া যে অর্থের অপরিমিত ব্যয় তাঁহারা করিতেন, তাহার ফলে পল্লীবাসী অনেকে কিছু কিছু লাভবান্ হইত, পল্লীরও যথেষ্ট উপকার সাধন করা হইত, আর যাহাই হউক, বাংলার অর্থ প্রায়শঃ বাংলায়ই থাকিয়া যাইত। কিন্তু যেদিন হইতে সহরের নূতন নূতন রসের সন্ধান তাঁহারা পাইলেন, পল্লী-ভবন ত্যাগ করিয়া যেদিন হইতে তাঁহারা নাগরিকত্ব লাভ করিলেন সেই দিন হইতে তাঁহাদের ব্যয়ভার অসম্ভব রকমে বাড়িয়া গেল—বাংলার অর্থ বাংলার সীমানাত দূরের কথা ভারত ছাড়িয়া দূরে সাগর-পারের দেশে ছুটিয়া চলিল; অনটনের দায়ে জমিদার-গণের মধ্যে অনেকেই বিপুল ঋণ-গ্রস্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন; বড় বড় জমিদারী মহাজনগণের নিকট বন্ধক পড়িল। কেহ কেহ বা সরকারের হস্তে পৈতৃক-সম্পত্তি তুলিয়া দিয়া নাবালকের ন্যায় মাসোহারা ভোগ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে বাংলার বহু পুরাতন বনিয়াদি ঘর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখনও দিন দিন যেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে, তাহাতে বাংলায় জমিদার-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব যে কতদিন বজায় থাকিবে তাহা চিন্তা করিবার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। উচ্চ জাতি নামে পরিচিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহারা পূর্ব্বাপরই বিদ্যাশিক্ষার অনুশীলন করিয়া আসিয়াছেন এবং বিদ্যা ও বুদ্ধির বলে রাজ-সরকারে বড় বড় পদ লাভও করিয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন কালে ইহারাই প্রথম "শিক্ষিত" হইতে আরম্ভ করেন এবং পূর্ব্বে নবাব সরকারের আমলের ন্যায় কোম্পানীর অধীনে ও সরকারী দপ্তরের বড় বড় চাকুরীগুলি করায়ত্ত করেন। রাজ সরকারে ইঁহাদের প্রতিপত্তির জন্য সাধারণলোকে ইহাদিগকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিত এবং ইহারা ও নিজদিগের পদ-মর্য্যদা সম্বন্ধে সর্ব্বদাই বিশেষ সজাগ ছিলেন। ভ্রান্ত আত্ম সম্মান বোধের ফলে ইহারা ক্রমে ক্রমে কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান ও পল্লীজীবনকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে সুরু করেন এবং নাগরিক সভ্যতা প্রধান পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হইয়া নাগরিক জীবন-যাপনেই অভ্যস্ত হইয়া উঠেন। ইহার ফলে পৈতৃক আমলের জমিজমার উপর হইতে ইহাদের দৃষ্টি একেবারে অপসারিত হইয়া যায়; কেহ কেহ বা জমিজমা বিক্রয় করিয়া ফেলেন, অনেকে ভাগ-বিলির ব্যবস্থা করিয়া দেন; তত্ত্বাবধানের অভাবে কাহারও কাহারও পৈতৃক সম্পত্তি বা চির দিনের জন্যই হস্তচ্যুত হইয়া যায়। পরীক্ষা পাশ ও উচ্চ চাকুরী লাভ, এই দুইটীই হইয়া উঠে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালীর চরম লক্ষ্য। ক্রমে ক্রমে ইহাদের অনুকরণে "শিক্ষিত" ও "সভ্য" হইবার জন্য বাংলার অন্যান্য সামাজিকগণের মধ্যেও সাড়া পড়িয়া যায়। কৃষিজীবী, মহাজন ও অন্যান্য বৃত্তিভোগী জাতি সবারই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে লেখা-পড়া শিখিয়া "ভদ্রলোক" হওয়া ও বড় বড় চাকুরী লাভ করা। এতদিন সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে যাঁহারা একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই মধ্যবিত্ত ভদ্র শ্রেণীর আসন টলিল। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার বোধ জাগ্রত হইয়া উঠিল। সুতরাং সরকারী ও আধা-সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে চুল-চেরা ভাগ সুরু হইল। মুসলমান বলিলেন, লোক সংখ্যার অনুপাতে চাকুরীর ভাগ হইবে, বাংলা দেশে আমরাই দলে ভারী, আমাদের

জন্যে চাই শতকরা অন্ততঃ পঞ্চাশটী পদ। তথাকথিত অবনত শ্রেণীর হিন্দু গর্জ্জিয়া উঠিলেন, বড় জাতের লোকেরা চিরদিনই আমাদের ঠকাইয়া আসিয়াছে, আজ তাহার প্রতীকার চাই, সরকারী দপ্তরে আমাদের জন্যও কতকগুলি আসন চিহ্নিত করিয়া রাখা হউক। ন্যায়বান সরকার বলিলেন, তথাস্তু। বড় জাতের লোকেরা এইবার চোখে সরষে ফুল দেখিতে আরম্ভ করিলেন। ছেলে, ভাইপো, ভাগ্নে জামাতা, বি,এ, এম, এ, পাশ করিয়া তিন বৎসর চারি বৎসর ধরিয়া বেকার বসিয়া আছে, চাকুরীতে ঢুকাইবার আর সুবিধা নাই। ও-দিকে বিশ্ব-বিদ্যালয়েরও গ্রাজুয়েট প্রসবের আর বিরাম নাই। বৎসরের পর বৎসর হাজার হাজার বি, এ, এম, এ, গোল দীঘির পাড়ে জড়ো হইতেছে, সকলেরই দৃষ্টি ড্যালহৌসিস্কোয়ারের দিকে, কোথায় চাকুরী! কোথায় চাকুরী!

দুঃখের শেষ শুধু এখানেই নয়। অন্যান্য প্রদেশে Domicile question আছে। বিহারে বাঙালীর প্রবেশ নিষেধ, পাঞ্জাবের চাকুরী শুধু পাঞ্জাবীদের জন্য, আসাম অসমীয়াদের—মাদ্রাজে মাদ্রাজী ছাড়া আর কেউ সরকারী চাকুরী পায় না, এমন কি দেশীয় রাজ্য গুলিতে পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা কিন্তু বাংলার দ্বার সকলের নিকটই অবারিত। এখানে কাহারও আসিবার বাধা নাই,—বাংলার ধন সম্পদ যেন অভিভাবকহীনা না-বালিকার সম্পত্তি,—যাহার খুসী সে লুটিয়া খাউক, বাধা দিবার, রক্ষণাবেক্ষণ করিবার কেহ নাই। তাহার উপর আবার আছে "গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং" Retrenchment বা ছাঁটাই। এই ছাঁটাই কলে পড়িয়া কত গৃহস্থের হাঁড়ী যে শিকায় উঠিয়াছে কে তাহার হিসাব রাখে। বাংলার রাজপথে কর্ম্মপ্রার্থী ও কর্ম্মচ্যুত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সরকারের তহবিলে অর্থাভাব, দেশের লোকও উপায়হীন, কতকটা উদাসীনও বটে। কে এই বেকার সমস্যার সমাধান করে?

কেহ বলিতেছেন, Back to villages—পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাও; কেহ বলিতেছেন, ডিগ্রীর মোহ কাটাও উচ্চ শিক্ষার অভিমান ত্যাগ কর, ব্যবসা বাণিজ্যে মন দাও, দোকান দারি কর।

কিন্তু ফিরিয়া যাইবে কোথায়? পল্লীগ্রাম আজ ম্যালেরিয়ায় অস্থিচর্ম্ম সার। নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী পল্লীতে যাইয়া আর কয় দিন বাঁচিবে? দিনে দিনে সাম্প্রদায়িকতার তীব্র বিষ যে-ভাবে বাংলার পল্লীঅঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাতে কয় দিন সেখানে সে স্ত্রী-পুত্র পরিবার লইয়া নিরাপদে বাস করিতে পারিবে? চুরি, ডাকাতি, নারীহরণ প্রভৃতি ঘটনা আজ পল্লী জীবনের নিত্য সহচর। নাগরিক সভ্যতার প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পরাস্ত বাঙালী আজ পল্লীর গৃহ-কোণে গিয়া যে মাথা গুঁজিবে সে উপায়ও তার নাই। পল্লী-সংস্কারের ধুয়া চারি দিকেই শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এপর্য্যন্ত বাংলা দেশের কয়টা পল্লীর আশানুরূপ সংস্কার সাধিত হইয়াছে? পল্লী-সংস্কার মানে,—পল্লীকে ছোট-খাট সহরে পরিণত করা; সেখানে চাই ভাল রাস্তাঘাট সুপেয় জল, হাট, বাজার, পোষ্টাফিস্, স্কুল, সাধারণ পাঠাগার, ডাক্তারখানা, রেল বা ষ্টীমার ষ্টেশন, ধন প্রাণ রক্ষার সুব্যবস্থা ইত্যাদি। এ গুলি যে পল্লীতে নাই, সেখানে "ভদ্রলোক" বলিয়া অভিমান যাঁহারা রাখেন, সেরূপ বাঙালী কিছুতেই বাস করিতে পারিবেন না। দিন দিন লোকের অর্থকৃচ্ছ্রতা যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে পল্লীসংস্কারের অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়ভারই বা বহন করিতে পারে কয় জন! শুধু স্বেচ্ছাসেবকের দ্বারা এ সকল কার্য্য হইয়া উঠেনা। বিশেষতঃ শ্রম-সাধ্য কার্য্য করিবার মত শক্তি ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত ভদ্র-সন্তানের মধ্যে কয়জনেরই বা আছে?

একদিকে ম্যালেরিয়া আর একদিকে অর্থাভাব এই দুইয়ে মিলিয়া বাঙালী জাতির অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিতেছে। যে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা এক সময়ে বাংলা দেশকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসিগণের নিকট গৌরবের আসন প্রাদান করিয়াছিল, আজ আর তাহার বিকাশ কোথায়? বাংলার গৌরবের যে কয়জন মনীষী এখনও বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদের তিরোধানের পর প্রতিভার ক্ষেত্রে বাংলার স্থান যে কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহা ভাবিতেও যেন শঙ্কা বোধ হয়।

সর্ব্বদা অন্ন চিন্তার জন্য ব্যতিব্যস্ত বাঙালী প্রতিভা

স্ফুরণের অবকাশই বা পায় কোথায়? 'গুণরাশি নাশী' দারিদ্র্য দোষ বংলার মধ্যবিত্ত সমাজে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। গোয়াল ভরা গরু, গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ—এ সব আজ আজ শুধু কল্প-লোক-চারী কবির কল্পনায়ই স্থান পাইতেছে—বাস্তব জীবনে উহাদের দেখা মিলিতেছে অতি অল্পই। মধ্যবিত্ত নামে আত্ম-পরিচয় প্রদানকারী বাঙালী আজ দারিদ্র্যের কশাঘাতে ক্ষত বিক্ষত। তাঁহার সঙ্কীর্ণ উপার্জ্জনের ক্ষেত্র আজ প্রতিযোগিগণের দ্বারা অধিকৃত। নূতন উপার্জ্জনের পথও তাঁহার পক্ষে সহজ নহে। চোখের উপর দেখিতেছি বহু শিক্ষিত ভদ্র সন্তান সাইনবোর্ড ঝুলাইয়া কেহ মুদির দোকান, কেহ মনোহারী দোকান, কেহ বা খাবারের দোকান খুলিয়া নিজেদের হাতেই দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে-ছেন। জিনিষ যে তাঁহারা বাজারের চেয়ে খারাপ দিতে-ছেন বা অধিক দাম নিতেছেন তাহাও বলিতে পারিনা; তবু কিছুদিন বাদে দেখিতে পাওয়া যায় প্রায় লোকেই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিয়াছেন। কতকগুলি পয়সা ঘর হইতে লোকসান দিয়া দিয়া ভদ্রলোক হয়ত চাকুরীর খোঁজেই অফিসের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিতেছেন। ইহাদের দোকান দারিতে লাভ না হওয়ার কারণ কি? অনভিজ্ঞতা নয়কি? কিন্তু বাঙালীকে ব্যবসাদারী শিখায় কে? দেশ-নেতারা এ সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা করিতে পরিয়াছেন বলিয়া ত মনে হয় না।

কেবল মাত্র দোকানদারি বলিয়া নহে, ব্যাপকভাবে বাঙালীর অধিকাংশ ব্যবসাই বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছে না। পশু পালন (poultry) গো-শালা (Dairy) মৎস্যের চাষ (Fishery) প্রভৃতি ব্যবসায় বাঙালীর একরূপ নাই বলিলেই চলে। বাজার দেখিয়া বুঝিতেছি, যে গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা (Perfumery) ছায়াচিত্র প্রদর্শনী, (Cinema House) ও আধুনিক প্রথায় হোটেল পরিচালনের ব্যাপারে বাঙালী যেন কতকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বীমা কোম্পানী গঠনেরও অবশ্য খুবই হিড়িক্ লাগিয়াছে, সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে বেশীর ভাগ বিজ্ঞাপনই বীমা কোম্পানীর। অনেকটা আশার সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ কোম্পানীরই ভিতরের ব্যাপার একটু বিশেষভাবে সন্ধান করিলে জানা যায় যে, বাহিরের ঐ চটকদার বিজ্ঞাপন মাত্রই সম্বল!—আসলের দিকে বড় টানাটানি। দেশের আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য বীমা-কোম্পানীর প্রয়ো-জনীয়তা যে খুবই বেশী ইহা আমরা মোটেই অস্বীকার করি না; কিন্তু কতকগুলি ভুঁই ফোঁড় কোম্পানীর নাম দিয়া এই দরিদ্র দেশের দুঃখীর সম্বল যাহারা শোষণ করিয়াছে, তাহাদের যে কঠোর শাস্তি হওয়া আবশ্যক তাহা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপন্ন হইয়াছেন মধ্যবিত্ত আখ্যাধারী "ভদ্রলোক" গণ, বর্ত্তমান জগতের শ্রমিক আন্দোলনের ফলে জমিদার বা মহাজনের যতটা ক্ষতি না হউক, মধ্যবিত্তগণের ক্ষতি হইয়াছে অত্যন্ত বেশী। যে-কৃষক জমির অর্দ্ধেক ফসলের বিনিময়ে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ক্ষেতের চাষ আবাদ করিত, সে এখন অধিকাংশ স্থানেই দুয়ের তিন অংশ দাবী করি-তেছে। উপায়হীন ভদ্রলোকগণ অনেক ক্ষেত্রেই তাহা-দের এই অন্যায় দাবী মিটাইতে বাধ্য হইয়া আরও অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন। কোথাও কোথাও বা সমর্থ মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ চোখ কাণ বুজিয়া সামাজিক গঞ্জনা সহ্য করিয়া স্বহস্তে ক্ষেত্র-কর্ষণাদি ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কার্য্যে যাঁহারা উৎরাইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে মন্দের ভাল এই হইয়াছে যে অর্দ্ধেক ফসলের স্থলে সম্পূর্ণ ফসল তাঁহাদের গৃহে আসায় অভাব কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী কোন কালেই ক্ষেতের কার্য্যে অভ্যস্ত নহেন; আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ আবাদের প্রচলনও নাই। সুতরাং রৌদ্রবৃষ্টি সহ্য করিয়া কঠোর শ্রম করিতে অনে-কেই অসমর্থ হইয়া পড়েন। কৃষকেরাও জিদ্ বশতঃ তাঁহা-দের ক্ষেত্র-কর্ষণ আর সহজে করিতে চাহে না, এবং যদি ও করে, পূর্ব্বাপেক্ষা দাবীর মাত্রা আরও চড়াইয়া দ্যায়। কৃষকদের নিকট হইতে জমি ছাড়াইয়া নেওয়ার ফলে স্থানে স্থানে যে মহা অনর্থের ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। তাই বলিতেছিলাম,

মধ্যবিত্তের অবস্থাই আজ সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়।—কোন দিকেই তাহার অগ্রসর হইবার উপায় নাই।—যে বিদ্যা হেতু প্রাণপণ করিয়া তাহার অর্দ্ধেক আয়ুঃক্ষয় হইয়াছে—সেই বিদ্যায় তাহার পেটের ভাত আর জুটে না। বিদ্যার বেদীমূলে সে তাহার স্বাস্থ্যকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া আসিয়াছে—শ্রমসাধ্য কার্য্য করা তাহার শক্তির অতীত। মুটেগিরি করিয়া অন্ন-সংস্থানের শক্তিও তাহার মধ্যে নাই। বাল্য হইতে যে শিক্ষার আবহাওয়ার মধ্যে সে মানুষ হইয়াছে, উহা তাহাকে নাগরিক জীবনের অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে—পল্লীর সহিত তাহার প্রাণের যোগসূত্রকে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

আমাদের মনে হয়, যতদিন বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত Back to village কথাটী কিছুতেই সফল হইয়া উঠিতে পারিবে না। এই শিক্ষা পদ্ধতির মজ্জায় মজ্জায় নগরের-মোহ মিশানো আছে—শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে এ মোহের প্রভাব অতিক্রম করা একরূপ অসাধ্য বলিলেই হয়। দুঃখের বিষয় এই, যে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অসারত্ব বিশেষতঃ জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রের অধিকাংশ স্থলে ইহার বিফলতা বহুদিন হইতেই আমাদের দেশের হিতৈষী ব্যক্তিগণের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত এমন কোন শক্তিমান্ মনীষীর আবির্ভাব হইল না, যিনি ইহার প্রয়োজনানুরূপ সংস্কার সাধন করিতে পারিলেন! গোড়ায় এই বিষম গলদ থাকিতে বাঙালী জাতির উন্নতির আশা সুদূর পরাহত।

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে একটী সংবাদ বাহির হইয়াছিল, যে কয়েকজন বেকার গ্রাজুয়েট কলিকাতার রাস্তায় রিকশা চালকের কার্য্য করিতেছেন। কোনো কোনো সংবাদ পত্র ইহাকে শ্রমের নবতম মর্য্যাদা আখ্যা দিয়া বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যে ইহাতে উল্লসিত হইয়া উঠিবার কোনই কারণ নাই। যে রিকশা টানিবে, তাহার পক্ষে গ্রাজুয়েট হইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না, উপযুক্ত শ্রমের অভাবে গ্রাজুয়েটের রিকশা চালকের বৃত্তি অবলম্বন করা বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষার শোচনীয় পরিণাম ও অসারতা ঘোষণা করিতেছে। ইহাতে শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই দুঃখ ও লজ্জা হইবারই কথা।

যে দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া মধ্যবিত্ত বাঙালীর বর্ত্তমান জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে, তাহাতে তাহার পক্ষে নিছক্ বিলাসিতার বস্তু আর কিছুই থাকা উচিত নহে। উচ্চ-শিক্ষা আজ তাহার পক্ষে যথার্থই বিলাসের সামগ্রীতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। স্কুল কলেজের বেতন ক্রমাগতঃই বাড়িয়া চলিয়াছে—প্রতিবৎসরের নূতন নূতন পাঠ্য পুস্তক কিনিবার সময় দুর্ভাবনায় অভিভাবকগণের মাথা ঘুরিয়া যাইতেছে। ইহার উপর সামাজিক কু-প্রথা গুলি পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে—তত্ত্ব, যৌতুক, পাল-পার্ব্বণ লোক-লৌকিকতা না করিয়া উপায় নাই। বাঙালীর জীবনের সঙ্গে এ গুলি ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। বেতনের ছাঁটাই হইয়াছে বটে. কিন্তু খরচের "জায়" অক্ষত শরীরে বর্ত্তমান আছে। বাঙালীর আয় বাড়ুক আর নাই বাড়ুক, ব্যয়ের মাত্রা নিত্যই বাড়িয়া চলিয়াছে।

বাঙলার সম্পদ, বাংলার অর্থ যদি বাঙালীর হস্তে থাকিত, তবে হয়ত আজ এ মুস্কিলের আশান্ করা তাহার পক্ষে শক্ত হইত না। কিন্তু বাংলার মাটী হইতে বাঙালীর বস-বাস না উঠিলেও, বাংলার সম্পদে বাঙালীর ষোল-আনা অধিকার বহুদিন হইতে লোপ পাইতে চলিয়াছে। শুধু রাজধানী বলিয়া নহে, বাংলার সুদূর প্রান্তের পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত অর্থগৃধ্নু অ-বাঙালী ব্যবসায়ীর খরদৃষ্টি গিয়া পড়িয়াছে। বাঙালীর প্রতি বাঙালীর সহানুভূতি নাই বলিয়াই এই সকল বিদেশীর পশার দিনে পর দিন জাঁকিয়া উঠিতেছে। আজ সমগ্র বাংলার এমন একটী বন্দর বা গঞ্জ নাই যেখানে অ-বাঙালী ব্যবসায়ীর গতায়াত না আছে। আত্ম-বুদ্ধিহীন বাঙালী অ-বাঙালীর মুখাপেক্ষী হইয়া আজ প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই পরিচালিত হইতেছে—তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে।

কাঙালী

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বসু বার-এ্যাট্-ল

—আসুন, একটু প্রেমের কথা কওয়া যাক।

একথা বল্লেন একটি রুশ রাজকুমারী, নাম প্রিন্সেস্ কর্ণিলফ্। ইনি পরলোকগত রুশিয়ার 'জার' তৃতীয় নিকলাসের একজন খুব নিকট আত্মীয়া। এঁর স্বামী কাউণ্ট কর্ণিলফ ছিলেন, সম্রাটের পুলিস বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত; গত মহাযুদ্ধে তিনি মারা যান। পরে যখন রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় সম্রাট সপরিবারে বিদ্রোহী হস্তে নিহত হন তখন রাজকুমারী কর্ণিলফ্ প্রচুর অর্থ ও বহুমূল্য রত্ন অলঙ্কারাদি সঙ্গে নিয়ে প্যারিসে পলায়ন করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল অল্প, প্রায় ২৫ বৎসর হবে। এখন তিনি প্রৌঢ়া, বয়স প্রায় ৪০ বৎসর; কিন্তু তাহলেও বয়সের সঙ্গে তাঁর অঙ্গ সৌষ্ঠবের কিছু মাত্র হ্রাস হয়নি। তবে পরিবর্ত্তন হয়েছিল তাঁর ব্যবহারে। এখন তাঁর আর অল্পবয়স্কা রমণী-সুলভ অপরিচিত পুরুষের সঙ্গ আলাপনে কোনও জড়তা বা আড়ষ্টতা ছিল না। এখন কথাবার্ত্তা তাঁর বেশ সহজ, সরল; শীলতা বা শ্লীলতার সীমা অতিক্রম না করেও তিনি সকল পুরুষের সঙ্গে সকল বিষয়ই বেশ স্বাধীনভাবে আলোচনা করতে পারতেন।

এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, এই অপরূপ রূপ লাবণ্যশালিনী রাজবংশীয়া বিদেশিনী অল্প দিনের মধ্যেই প্যারিসের সম্ভ্রান্ত সমাজে খুব এক উচ্চস্থান অধিকার করে বসলেন। খুব বড় বড় লোক তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য লালায়িত হতেন, একবার তাঁর সঙ্গে কথা কইবার অবসর পেলে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। অর্থে ও আভিজাত্যে যে সব পুরুষ প্যারিস সমাজের শীর্ষে তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই রাজকুমারীর পাণিগ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কেহই সফল মনোরথ হতে সমর্থ হন্‌নি।

এহেন মহিয়সী রূপসীর সঙ্গে, আমি বাঙালী কাঙালী

চরণ আমার এত ঘনিষ্ঠতা কিসে হলো সে কথার ইতিহাস একটু অন্ধকারে লুপ্ত। কিন্তু এটা ঠিক যে আমি পড়ি দর্শন শাস্ত্র, থাকি লণ্ডনে র‍্যাসেল স্কোয়ারের একটি বাসায়, মাঝে মাঝে প্যারিসে যাই বেড়াতে। লণ্ডনে আমি মিঃ কে সি, মিটার, প্যারিসে আমার নাম মঁসিয় মিত্রা। এটাও ঠিক অমি সে রাত্রে প্যারিসে, 'গ্রাঁ বুলভার' এর ধারে একটি প্রসিদ্ধ রেস্তোরাঁয় বসে ঐ রাজকুমারীর সঙ্গে ভদকা পান করছিলাম। আমারা বসেছিলাম একটা জানলার কাছে ও দেখছিলাম সেই 'বুলভার' এর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। রাস্তার ধারে উজ্জ্বল আলোকে দীপ্ত, নানা বিচিত্র পণ্যদ্রব্যে সুসজ্জিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পণ্যবীথিকা। চৌড়া ফুটপাথে কতশত পণ্যাঙ্গনা, নানা প্রসাধনে তাদের মানুষের মুখ পুঁতুলের মুখে পরিণত করে, হেলে চলে তাদের নায়কের অন্বেষণে ফিরচে! রাস্তার দু'ধারে মানুষ ও মোটরের দুই বিরাট ও বিরুদ্ধ স্রোত বইচে, অসংখ্য নরনারী অলস ভাবে ধীরপদে বেড়িয়ে বেড়াচ্চে,—রাত্রি সমাগমে যেন সকলেই আনন্দের আবেশে বিভোর। রেস্তোঁরার ভিতরে কত শত সাহেব মেম আস্‌চে যাচ্চে, বস্‌চে, হাস্‌চে, মহিলাদের রূপের ছটায়, পরিচ্ছদ ও প্রসাধনের ঘটায় চোখ যেন ঝল্‌সে যায়। 'গারস' (বয়) গুলি অনিন্দ্য সান্ধ্য পরিচ্ছদ (Evening dress) পরে, তুষার-শুভ্র তোয়ালে বগলে করে মহাব্যস্তে অভ্যাগতদের পানীয় পরিবেশন করচে। হল্‌টি নানা শিল্পে সুসজ্জিত, বিচিত্র বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত। 'অরকেষ্ট্রা' থেকে সুমধুর সুরলহরী বইচে, চারিধারে উল্লাসের উৎসব ছুটচে, বাস্তবিক যেন এই আনন্দ ভবন এক পার্থিব ইন্দ্রভুবনে পরিণত হয়েচে।

রাত তখন প্রায় ১টা। প্যারিস রেস্তোরাঁগুলি প্রায় এই সময়েই বেশ জমে ওঠে। আমরা, অর্থাৎ আমি ও রাজকুমারী যদিও হলের এক নিভৃত কোণে বসেছিলাম আমাদেরও দুজনের কথা বার্ত্তা, গল্প গুজব তখন বেশ জমে এসেছিল। উভয়েরই প্রচুর 'ভদ্‌কা' পান করা হয়েছে সিগারেট উভয়েরই চল্‌চে, মুহুর্মুহুঃ স্বভাবতঃ রাজকুমারী পান করেন স্যাম্পেন কিন্তু ঐ রাত্রে আমাকে তাঁর জাতীয় পানীয় আস্বাদন করবার জন্যে দিয়েছিল 'ভদকা।' আমাদের মধ্যে কথা চলছিল নানা ধরণের, তার একটার সঙ্গে আর একটার যোগ নাই। ক্রমে ভদকা যখন আমাদের মস্তিষ্কে বেশ আধিপত্য স্থাপন করে বস্‌ল, যখন উভয়েরই মন বেশ আবারিত হয়ে এসেচে তখন রাজকুমারী আমার দিকে একটু দুষ্ট হাসি হেসে বললেন—

—আসুন একটু প্রেমের কথা কওয়া যাক। সাম্য সৃষ্টি করতে পানের তুল্য আর দ্বিতীয় উপকরণ সংসারে নাই। অবস্থা হিসাবে আমাদের দুজনের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ 'ভদকার' আনুকূল্যে সে ব্যবধান তখন প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেচে; আমারা তখন যেন সম অবস্থাপন্ন দুই বন্ধু। রাজকুমারীর প্রস্তাবটি তখন বেশ স্বাভাবিক ভাবেই এসেছিল ও আমিও খুব স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর করলাম—

—আসুন, আমি প্রস্তুত। তবে প্রেম একটি বড় জটিল আলোচ্য বস্তু; এর বিস্তার অনন্ত ও বিশ্বব্যাপী। আপনি এর কোন দিক্‌টা, কোন্ রূপটা আলোচনা করতে চান বলুন।

—প্রেমের তত্ত্বকথা আমাদের এখন আলোচনা করা সমিচীন হবেনা,ওর হাল্কা দিকটা নেওয়া যাক্। প্রেমের ইতিহাস সকলের জীবনেই দুই একটা আছে; আমার ত আছে, আপনার জীবনেও যে নেই এ কথা আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারেন না। তারই মধ্যে আপনি আপনার একটা বলুন, অমিও আমার একটা বল্‌চি। কিন্তু গল্পটি প্রথমতঃ সত্য হওয়া চাই, দ্বিতীয়তঃ তাতে একটু মজা থাকা চাই, তৃতীয়তঃ সেটি একটু অ-সাধারণ হওয়া চাই। এই তিনটি কথা স্মরণ রেখে আপনি আরম্ভ করুন।

—আপনিই প্রথমে...

—না, আপনি সুরু করুন, আপনি পুরুষ। মনে রাখ্‌বেন 'আদম' আগে, 'ঈভা,' পরে।

মুখে ত বললাম 'আচ্ছা' কিন্তু মনে মনে বড়ই বিপন্ন হলাম। এ যে এক বিষম পরীক্ষা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এত পরীক্ষা পাশ করে এসেছি কিন্তু এমন পরীক্ষায় ত কখনও পড়িনি। ঘন ঘন সিগারেট টানতে লাগলাম ও তার কুণ্ডলাকৃতি নীলধূমের ভিতর চাইতে চাইতে,

বিস্মৃতির ধূমে আবৃত অতীতের কথা স্মরণ করতে করতে হটাৎ একটা ঘটনা মনে পড়লো, আমি বলে উঠ্‌লাম—

—হয়েচে, শুনুন। দু'বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনে একদিন সন্ধ্যার পর আহার শেষ করে, বাসার সুমুখে একটু বেড়াচ্ছি এমন সময় একটি মহিলার সঙ্গে আলাপ হ'ল। এতক্ষণে বোধহয় বুঝতে পেরেচেন যে আমি একটু বাতিক-বুদ্ধির লোক, খুব বকতে পারি। বুঝলাম যে মহিলাটিও সেই জাতীয়। আলাপ হবার পর থেকেই আমাদের সেই যে গল্প সুরু হলো তা আর ফুরোয় না। শেলী, বাইরণ, শ, গলস্‌ওয়ার্দি, অ্যাস্‌কুইথ, লয়েড জর্জ্জ, ট্রী, অস্কার অ্যাশ সকলেরই শ্রাদ্ধ হতে লাগলো। বেড়াতে বেড়াতে পা ব্যথা হয়ে গেল, বাসার সামনে এসে বললাম —'রাত হয়েচে, এইবার বাসায় ওঠা যাক,' ও ভদ্রতার খাতিরে বললাম 'আপনিও একটু আসুন না; তবে আমার একটি মাত্র ঘর তাইতেই বসি, তাইতেই শুই।' তাতে তিনি কিছুমাত্র আপত্তি না করে অম্লান বদনে আমার সঙ্গে সুড় সুড় করে তেতলায় আমার ঘরে উঠে এলেন। আগুনের কাছে দুজনে বসলাম,-- আবার গল্প, সে গল্পের কি বিরাম নেই! রাত হয়ে গেল প্রায় ১টা, মহিলার বাড়ি ফেরবার নামটি নেই, ভাবলাম স্ত্রীলোকটির মাথায় কিছু গোলমাল আছে না কি?

কিন্তু কথা বার্ত্তায় ত তার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। আমার হাই উঠ্‌তে লাগলো, বললাম 'এইবার শোবার সময় হয়েচে।' স্ত্রীলোকটিও বললে—'আমিও প্রায় এই সময়েই শুই'। আমি পোষাক পরিবর্ত্তন করবার জন্য ইতস্ততঃ করচি, দেখি তিনিও পোষাক পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত, যেন এ-ই তাঁর প্রতিদিনের শোবার ঘর। তিনি পণের প্রত্যাশায় এসেচেন কিনা তখন পর্য্যন্ত তার ত কোনও আভাস পাইনি, পণের কোন প্রস্তাবই হয়নি, এমনকি এতক্ষণ বকা গেছে কিন্তু কোনও প্রেমের কথা পর্য্যন্ত হয়নি। শোবার আগে তিনি মাত্র এই কথাটা বললেন যে প্রত্যুষের পূর্ব্বেই তিনি বাড়ী ফিরবেন যেহেতু তাঁর বাড়ীর কেউ ওঠবার আগেই তিনি জানলা গলে বাড়ী ঢুকে নিজের ঘরে শুয়ে থাকবেন। লণ্ডনে অভিসারিকাদের মধ্যে অনেকেই এ কার্য্য করে থাকেন। প্রত্যুষে ৫টা হয়নি, একটু বেলা হয়ে গিয়েছিল। সেদিন সকালে খুব 'ফগ' রাত্রের মতই অন্ধকার রাস্তায় আলো জ্বলচে, ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়চে। খানিকটা এগিয়ে দিবার জন্য আমিও মহিলার সঙ্গে বেরুলাম ও তাঁকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে তাঁর স্বাস্থ্য পান করবার জন্য একটা 'সেলুন বার' Saloon bar এ ঢুকলাম। বলা বাহুল্য যে তখন বুঝতে পেরেচি যে তিনি পণ্যস্ত্রী নন্। 'বার' এ ঢুকে আবার গল্প, বিয়ারের মুখে গল্প খুব জমে উঠলো, বিদায় নেওয়া ভুলে যাওয়া গেলো, চমক ভাঙ্গলো —যখন বেলা ১টা! আর নয় দুজনেই তখন তাড়াতাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত। ছাড়াছাড়ি হবার আগে আমার নাম ও ঠিকানা এক টুকরা কাগজে টুকে নিলেন আমিও তাঁর নাম ধাম জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন তাঁর নাম মিস্ কার্লসন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঠিকানাটাও দিলেন। আমি যখন লিখে নিচ্ছি তিনি বললেন যে লেখবার কিছু দরকার নেই যেহেতু তিনিই আগে লিখবেন; এই বলে তিনি বিদায় নিয়ে চট্ করে চলে গেলেন। আমি যেন একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

সেইদিন বৈকালে আমার বাসায় এলো জিতেন চাটুয্যে। এ ছোকরা আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো কিন্তু খুব বুদ্ধিমান্ ও তার চেয়েও বেশী চরিত্রবান। অনেক দিন বিলাতে আছে কিন্তু চরিত্রটাকে রেখেচে ঠিক; পান করেনা, এমন কি সিগারেট পর্য্যন্ত খায় না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে সকল আনন্দেই সে যোগ দিতো নিজেকে পূর্ণ মাত্রায় নির্লিপ্ত রেখে। তবে তার শরীরেও আমারই মত বায়ুর প্রকোপ একটু বেশী, সেও খুব বকতে পারতো। বয়সে কম হলেও সে আমাকে খুব ভালবাসতো, অবসর পেলেই আমার কাছে ছুটে আসতো। ব্যাপারটা তাকে বললাম; সে গল্পটা খুব উপভোগ করলে। বৈকালে চা খাওয়ার পর মনটা যেন আবার কেমন কেমন করতে সুরু হলো, মহিলাটির সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করতে লাগলো। ভাবলাম তাঁর সেই অযাচিত আত্মদানের জন্য উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা দেখানো হয়নি। এ কথাও মনে এলো যে তিনি আমি ও চাটুয্যে এই তিনটি বায়ু একত্রিত হলে আমার

এক প্রলয় বায়ু বইতে থাকবে, গল্প খুব জমবে। কর্ম্মক্লিষ্ট অর্থান্বেষী ইংরাজ আড্ডা দেওয়া রূপ বাঙ্গালীর নিজস্ব এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটীর কিছুমাত্র মর্ম্ম বোঝে না। অবশ্য তাদেরও ক্লাব আছে; কিন্তু সেখানে ত কেবল বিলিয়ার্ড এর বল ঠোকাঠুকি, অথবা বিপন্নমুখে দাবার চাল' চিন্তা, বড় জোর ব্রীজ, বেশীর ভাগই মদ্যপান ও মাসের শেষে লম্বা বিল।' বাঙ্গালীর প্রতি বৈঠকখানায় প্রতি অফিস আদালতে, মেসের বাসায়, রাস্তায় ঘাটে সর্ব্বত্রই আড্ডা, বৈঠকের সময় নির্দ্দিষ্ট নেই,মাসের শেষে বিল আসে না ও আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপ্তি বিপুল,—বেদান্ত থেকে ফুটবল ফাইন্যাল অবধি, কিছু বাদ নেই।

চা খাবার পর চাটুয্যেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মহিলার বাড়ী খুঁজতে। সে পাড়ার পুলিশম্যান, পোষ্টম্যান ডাকঘর, দোকানদার কেউই তাঁর বাড়ীর রাস্তার খবর দিতে পারলে না। ডিরেক্টারিতে সে রাস্তার নামই পাওয়া গেল না। সুতরাং ক্লান্ত ও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বাসায় ফিরলাম, বুঝলাম স্ত্রীলোকটা ধাপ্পা দিয়ে গেছে, ঠিকানাটা মিথ্যা।

তার পরদিন বেলা দশটার সময় ডাকে একখানা চিঠি এলো। চিঠির খাম ও কাগজখানা খুব উঁচুদরের। কিন্তু আমি যে ঠিকানা টুকে নিয়েছিলাম চিঠির উপরে সে ঠিকানা নেই, অন্য এক অজানা ঠিকানা। তলায় মিস কার্লসন নেই—মাত্র এ্যালিস। চিঠির মর্ম্মে কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় যে সেই মহিলাই লিখেচেন কারণ পত্রে আমাদের সেই রাত্রের সাক্ষাৎ উল্লেখ করে আমাকে অনেক প্রেম ও প্রীতি জ্ঞাপন করা রয়েচে। নাম যদিও এ্যালিস, সে মহিলার অ্যালিস হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয় কারণ তাঁর প্রথম নামটিত তিনি আমাকে দেননি। গোল বাধলো কেবল ঠিকানায়। কিন্তু তার উত্তরে ভাবলাম প্রথমে আমাকে হয়ত ইচ্ছা করেই ভুল ঠিকানা দিয়েছিলেন, আর সেইজন্যই হয়ত পূর্ব্বদিনে তাঁর বাসা খুঁজে পাওয়া যায়নি, এখন চিঠিতে সত্য ঠিকানা প্রকাশ করেচেন। যাই হোক চিঠি খানা পড়ে মনে একটু খট্‌কা রয়েই গেলো। খানিক পরে চাটুয্যে এসে উপস্থিত, তাকে চিঠিখানা দিয়ে বললাম—এ এক মহা রহস্যে পড়া গেছে। তার সঙ্গে খানিক্ষণ তর্ক যুক্তির পর চাটুয্যে বললে যে সে তখনই চিঠির ঠিকানায় গিয়ে এই রহস্যের মীমাংসা করে আসবে। তার যে কথা সেই কাজ, তৎক্ষণাৎ সে সেই চিঠিখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। ফিরে এসে সে বললে যে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেচে। সে বললে যে সে সেই ঠিকানায় গেলে একজন অল্পবয়স্কা ঝি দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে কা'কে খুঁজচে। চাটুয্যে উত্তর করলে যে সে মিস অ্যালিস্ কার্লসনের সঙ্গে দেখা করতে চায়। ঝি উত্তর করলে যে সে বাড়ীতে ও নামের কেউ থাকে না। চাটুয্যে বললে নিশ্চয়ই থাকে যেহেতু সেই ঠিকানা থেকে তিনি মিঃ কে, সি, মিটারকে পত্র লিখেচেন। চাটুয্যেকে দরজায় দাঁড় করিয়ে ঝি ছুটে ভিতর থেকে একটী সুন্দরী যুবতীকে ডেকে নিয়ে এলো। যুবতী এসে বললে যে মিস্ কার্লসন্ সে বাড়ীতে থাকেন না। চাটুয্যে তাঁকে চিঠিখানা দেখবামাত্র তিনি অত্যন্ত ভীতা ও উত্তেজিতা হয়ে চিঠিখানা ফেরত চাইলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন 'মিঃ মিটার এখন কোথায়?' চাটুয্যে বললে যে চিঠি ফেরৎ দেবার তার অধিকার নেই; মিঃ মিটার বাসায় আছেন, যদি দেখা করতে চান তিনি আসবেন ও আবশ্যক হলে তিনিই চিঠি ফেরৎ দেবেন। সুন্দরী আমাকে রাত আটটায় যেতে বলে শীঘ্র দরজা বন্ধ করে চলে গেল। চাটুয্যের ইতিহাস শুনেও এটা সাব্যস্ত হলো না পত্র-লেখিকা সে রাত্রের সেই মহিলা। তবে এটা নিশ্চিত যে সে রাত্রি সম্বন্ধে আমাকে ওরূপ পত্র লেখবার আর কেউ ছিল না সুতরাং লেখিকা সেই মহিলা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

সন্ধ্যার পর দুজনে তাড়াতাড়ি আহার শেষ করে বেরিয়ে পড়লাম। গন্তব্য স্থানে পৌছে চাটুয্যে গেল সেই বাড়ীতে আমি নিকটের একটা রেস্তোরাঁয় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আটটা বাজলে দ্বারে একটি সুন্দরী যুবতী প্রবেশ করলো, পেছনে চাটুয্যে। সুন্দরী হলের চারিদিকে চেয়ে চাটুয্যের দিকে ফিরে, যেন জিজ্ঞাসা করলেন—'কই আপনার মিঃ মিটার?' চাটুয্যে তাঁকে আমার দিকে নিয়ে এলো, আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম,

দুজনে সামনা-সামনি হলাম, কি বিপদ! তিনিও আমার পরিচিত নন, আমিও তাঁর পরিচিত নই। আমি একটু অবাক হয়ে তাঁকে আস্তে আস্তে বললাম—'মাপ করবেন কিন্তু আপনি ত মিস কার্লসন নন্। 'তিনি উত্তর করলেন '—না, আপনিওত মিঃ মিটার নন।' আমি বলে উঠ্‌লাম —'বাঃ, আমি মিঃ মিটার নই! আমিই ত মিঃ কে, সি, মিটার। আমাকেই ত আপনি চিঠি লিখেছেন।' যুবতী বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে বললেন—'কেন মিথ্যা প্রবঞ্চনা করচেন, আপনিত মিঃ মিটার নন্।' আমিত বড় বিপদে পড়লাম, আমি আমি নই! কে এ সুন্দরী, কোন যাদুকরী আমার আমিত্ব পর্য্যন্ত উড়িয়ে দিতে চায়? চাটুয্যেকে বললাম—'ও চাটুয্যে, কাণ্ডখানা কি? স্ত্রী-লোকটা বলে কি না আমি—আমি নই! সুরা ত আমার মাথায় ওঠেনি, ভুল করচি না ত, আমিত ঠিক আমিই বটে?' চাটুয্যে আমাকে আশ্বাস দিয়া বললে—'আপনি নিশ্চয়ই আপনি! ওঁরই চিঠিখানা দেখিয়ে আপনার আপনিত্বটা প্রমাণ করে দিন না'। আমিও এই কথায় আশ্বস্ত হয়ে খুব জোর করে বল্‌লাম—'আমি যে আমি তার প্রমাণ আপনারই চিঠি। এই দেখুন আপনার চিঠি, খামে নামও আমার, ঠিকনাও আমার; আমি যদি আমি না হবো ত আমার নামের চিঠি আমার কাছে আস্‌বে কেন?' মহিলা আবার হো হো করে হেসে, সে হাসিতে বিদ্রূপের তীব্রতর বাণ সংযোজন করে বললেন—'কেন আমাকে মিছে-মিছে প্রতারণা করবার চেষ্টা করচেন; আমার চিঠিখানা কোন প্রকারে হয়ত আপনার হাতে পড়েছিল তাই আপনি আমার নাম ঠিকানা পেয়েচেন আর আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেচেন। আমিও আপনার সঙ্গে আলাপ করতে প্রস্তুত, মিঃ মিটারের নাম ধাম না নিলেও প্রস্তুত, তবে কেন এই বৃথা প্রবঞ্চনার চেষ্টা। এইটে সোজা বুঝুন না যে আমি মিঃ মিটারকে না চিনে ত চিটি লিখিনি। আপনি তাঁর নাম ও ধাম নিতে পারেন, এবং আমার চিটি খানাও কোন গতিকে পেয়ে থাকৃতে পারেন, কিন্তু তাঁর চেহারাটা, তাঁর আকৃতিটা পাবেন কোথা!' আমি ত বিপন্ন হয়ে আবার চাটুর্য্যের শরণাগত হলাম; দুঃখের বিষয় চাটুর্য্যে ব্যারিষ্টারী পড়ছিল না, নইলে দুই জেরায় বেটিকে জব্দ করে দিত। তবে ভরসা এই যে চাটুর্য্যের পেটে সুধু জিঞ্জারেড, মাথা তার ঠিক আছে। সে আমাকে খুব ভরসা দিয়ে বললে—'আপনার আপনিত্ব ওড়ায় কে। আপনি নিজে সাক্ষী, তার পর আমি একজন নিঃস্বার্থ ব্যক্তি সেটা সমর্থন করচি, তার উপর আপনার ভিজিটিং কার্ড, (Visiting card) আপনার কার্ড কাছে আছে ত?' আমিত লাফিয়ে উঠলাম--'আছে বৈ কি!' মহিলাকে বুক ফুলিয়ে বল্লাম—আমার মামলা জিত! আমি বল্‌চি আমি—আমি। এই বন্ধু আমাকে সনাক্ত করচেন, তার উপর আপনারই চিঠি। তাছাড়া এই সব অকাট্য প্রমাণ দেখুন,—এই দেখুন আমার নামের কার্ড, এই দেখুন আমার পকেটে এক রাশি পুরোনো চিটি সব আমারই নাম ঠিকানায়, এই দেখুন একখানা টেলি-গ্রাম আমার নামে, এই দেখুন আমার নামে একখানা চেক—এখনও ভাঙ্গাইনি, আর ওড়াতে পারবেন কি! বলেন ত চেকখানা সই করে দিচ্চি, কালই টাকা পেয়ে যাবেন। তারপর সুন্দরী, ব্যাপারটা একবার আমার দিক দিয়েও ভেবে দেখুন। আমি এসেছি এখানে আমার এক প্রিয়বন্ধু মিস্ কার্লসনের প্রত্যাশায়, কাল থেকে তাকে খুঁজচি, কিন্তু বড় আশায় এখানে এসেও তাঁকে পেলুম না, তাঁকে হারিয়েচি;--তার উপরে আপনি চান আমি নিজেকেও হারিয়ে, বাড়ী ফিরবো? আমার পৈতৃক নামটা পর্য্যন্ত যাবে? 'মহিলা আমার কথা শুনে একটু একটু হাস্‌ছিলেন বটে কিন্তু একটু একটু ভাবছিলেনও বটে। আমি আবার বললাম—অনেক সময়ে নিজেকে হারাতে ইচ্ছা করে বটে, তবে এমন বেঘোরে নয়, যদি কুড়িয়ে নেবার কেউ তেমন মানুষ থাকে তবে। মহিলা তখন গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমার ঠিক-নায় আমার নামে আর কেউ আছে কিনা। আমি তৎক্ষণাৎ জোর করে বললাম,

—কেউ নাই; সন্দেহ থাকে ত চলুন আমি বাসায় একতলা, দুতলা, তিন তলা সব দেখিয়ে দিচ্চি।

—তাহলে আপনারই কোন বন্ধু আপনার নাম ঠিকানা দিয়ে আমার কাছে সে দিন পরিচিত হয়েচেন, এর আর কোন সন্দেহ নেই।

—খুব সম্ভব। তাহ'লে দাঁড়াচ্চে এই যে আমি যে মিস্ কালসনের প্রত্যাশায় এসেচি আপনি আমার সে বন্ধু নন্।

—না।

—আপনি যে মিঃ মিটারের প্রত্যাশায় এসেছেন আমি আপনার সে বন্ধু নই।

—না।

—ব্যাকরণ শাস্ত্র মতে দুটি 'না' মিলে একটি 'হাঁ' হয়। সুতরাং আমরা পরস্পরের বন্ধু ; ন্যায় শাস্ত্রের দিকে বেশী দৃষ্টি না করে আপনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে, এ বন্ধুত্ব স্থাপন করতে প্রস্তুত ?

মহিলা হাস্তে হাস্তে বললেন—

—খুব প্রস্তুত। এখন যদি আপনার সেই বন্ধু, সেই জাল মিঃ মিটার এখানে এসে উপস্থিত হ'ন তা হলেও আপনারই বন্ধুত্ব বাহাল থাক্‌বে, তিনি হবেন নাকোচ; আমি তাঁর উপর...

কথাটা না শেষ করেই মেম সাহেব হঠাৎ দূরের একটি টেবিলের কাছে ছুটে গেল। সেখানে দেখি বসে আছে মিঃ রায়, আমার আর একটি বন্ধু ; সে কখন এসেচে লক্ষ্য করিনি। এ ছোকরা দারুণ চালাক, যেমন নির্ভীক তেমনই নির্লজ্জ, এবং সর্ব্বদাই ও সব অবস্থাতেই সপ্রতিভ। মেম সাহেব ত তাকে এক রকম হিঁচ্‌ড়ে আমার কাছে টেনে নিয়ে এলো। রায় কিছুমাত্র অপ্রতিভ বা অপ্রস্তুত না হয়ে খুব হাস্‌তে লাগলো ও হাসতে হাসতে বিয়ার আনবার হুকুম দিল। মেমসাহেব রাগে অভিমানে মুখ ভার করে রায়কে বল্লেন—

—জাল মিঃ মিটার, আপনার সঙ্গে এই শেষ। আপনার এরূপ ব্যবহার অত্যন্ত অন্যায়।

—বন্ধু অ্যালিস্, যদি অন্যায় করে থাকি রাগ কোরো না, ক্ষমা করো। প্রেমক্ষেত্রে বা রণক্ষেত্রে যা হয় তার কিছুই অন্যায় নয়। এস, আমরা এই বন্ধু চতুষ্টয় পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করে এই ভ্রম সংশোধনের পালা উদ্‌যাপন করি।

রাজকুমারীকে বল্লাম—এই শেষ, আশা করি গল্পটি আপনার তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েচে।

—মানের সহিত (With honours) আখ্যানটি খুব উপভোগ করলাম। আপনার গল্পটি ভ্রান্তি মূলক ; আমি যেটি বল্‌ব তার মূলে ভীতি। শুনুন—

আমার ইতিহাস আপনার কতকটা জানা আছে ; আমরা থাকতাম "মস্কো" সহরে, একটি রাজপ্রাসাদে। জেনেরাল "রজিন্‌স্কি'র নাম অবশ্যই আপনার শোনা আছে। একদিন তাঁর এক পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের ও অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিমন্ত্রণ হয়। রাত্রে প্রচুর পান ও আহারের পর নৃত্য হচ্ছিল ; আমাদের দেশের বাদ্য ও নৃত্য সম্বন্ধে সুখ্যাতির কথা নিশ্চয়ই জানেন। উন্মত্তকারী বাদ্য চলছিল ও তার সঙ্গে তদোপযুক্ত নৃত্য। নৃত্যবাদ্যে, আমোদ আহ্লাদে মজলিস খুব জমজমাট হয়ে উঠেচে, আমি ও আমার স্বামী উভয়েই তখন নাচ্‌চি এমন সময় একজন গুপ্তচর এসে আমার স্বামীকে আসর থেকে ডেকে নিয়ে গেল একটা পাশের ঘরে। তখন কারণ কিছু বুঝতে পারলাম না। একটু পরে আমার ও ডাক পড়লো। ব্যাপারটা এই,—কিছু-দিন পূর্ব্বে 'মস্কো' এর নিকটে একটা ভয়ানক রাষ্ট্র-বিপ্লবের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে। ষড়যন্ত্রকারীরা সব ধরা পড়ে গেল ও তাদের অশেষ শাস্তি হলো। কতক-গুলো বিপ্লবীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে সাইবেরিয়ার পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সে হতভাগ্যদের মধ্যে অনেকেই পথেই প্রাণ হারালো, যারা তাদের গন্তব্য সেই ভীষণ প্রবাসে পৌছুল, সেখানকার কষ্টের তুলনায় তাদের পথে মরাই শ্রেয় ছিল। যাদের পাঠানো হয়নি তাদের মধ্যে অনে-কের ফাঁসী হলো, কতককে জলে ডুবিয়ে মারা হলো, একজনকে জলন্ত আগুনে ফেলে পোড়ানো হলো, এক জনের মাথা থেকে পা অবধি গায়ের চামড়া ছিঁড়ে নেওয়া হলো, নির্য্যাতনের শেষ রইল না। যে লোকটা এই বিপ্লবের মাথা, অথবা মূলে সে কিন্তু ধরা পড়েনি। সে লোকটার অনেক ইতিহাস, সে একটা সুদূর পল্লি-গ্রামের একজন কৃষকের ছেলে, নাম চার্ম্মুলীন। সে পূর্ব্বে একবার এই রকমই একটা গোলমালে ধরা পড়ে-ছিল ও তার শাস্তি হয়েছিল সাইবেরিয়া প্রবাস। কিন্তু অর্দ্ধেক পথে থেকেই সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থাতেই সে

পলায়ন করে। তার পরে তার কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি। এই ষড়যন্ত্র ব্যাপার ধরা পড়বার পর পুলিস সাব্যস্ত করলে যে এর মূলে সেই চার্ম্মূলীন। তার গ্রেপ্তারের জন্য দশ হাজার রুবল্ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও সে তখন ধরা পড়েনি। পুলিশ তার তল্লাস করতে কিছুমাত্র বাকি রাখেনি; সব সহর, সব পল্লী, যেখানে যেখানে পুলিশের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল, সব জায়গা তোলপাড় করা হলো কিন্তু চার্ম্মূলীন ধরা পড়লো না। অবশেষে গির্জ্জায় গির্জ্জায় আদেশ হয়ে গেল এই পলাতক আসামীর গ্রেপ্তারের জন্ম সর্ব্বত্র প্রার্থনা করা হোক।

উৎসব রাত্রে সেই গুপ্তচর এসে সংবাদ দিল যে সেইমাত্র চার্ম্মূলীনের সংবাদ পাওয়া গিয়েচে, সে প্রায় ৫০ মাইল দূরে একটা ক্ষুদ্র গ্রামের ভিতর একজন চাষার বাড়ীতে লুকিয়ে আছে। আমার স্বামী আমাকে বল্লেন যে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁকে রওনা হতে হবে চার্ম্মূলীনকে গ্রেপ্তার করতে। তিনি নিশ্চিত হয়ে বললেন যে পরদিন নিশ্চয়ই সে ধরা পড়বে ও সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই তার প্রাণান্ত হবে। সুতরাং সে রাত্রে তিনি সহরে থাকবেন না, আমাকে উৎসবান্তে একলাই প্রাসাদে ফিরতে বল্লেন।

ব্যক্তিগতভাবে এই চার্ম্মূলীন সম্বন্ধে কথায়, তার নানা কাহিনী শুনে তার উপর আমার একটা শ্রদ্ধা জন্মেছিল; গুপ্তচরের এই সংবাদ শুনে আমার মনে যেন একটা অন্তর্নিহিত ইচ্ছা জেগে উঠলো যেন সে ধরা না পড়ে। জানতাম তার উদ্দেশ্যে, তার কার্য্য পদ্ধতি সবই আমাদের স্বার্থের বিপক্ষে, আমাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্ম; তবু তার বীরত্ব, তার কষ্ট সহিষ্ণুতা, তার বুদ্ধির প্রাখর্য্য, তার নির্য্যাতন আমার মনে তার উপর একটা গভীর সহানুভূতির সৃষ্টি করেছিল।

কাউন্টের সঙ্গে যখন পাশের ঘরে কথা কইছিলাম তখন দেখলাম তাঁর সামনে টেবিলের উপর একখানা ফটোগ্রাফ পড়ে। ফটোখানা আমি হাতে তুলে নিলে কাউন্ট বললেন সেখানা চার্ম্মূলীনের ছবি। মনে মনে এই লোকটার উপর একটু শ্রদ্ধা রয়েচে বলে ছবিটা দেখবার আগ্রহ হলো। আমার ধারণা ছিল লোকটার একটা ভীষণাকৃতি ভূষমণের মত চেহারা হবে, কিন্তু ফটো দেখে বুঝলাম সেটা ভ্রম। ছবি দেখে মানুষটার প্রতি আমি যেন একটু আকৃষ্টা হলাম। ছবিতে মানুষটার গোঁফ, দাড়ি, মাথা সব কামানো, পরণে সাইবেরিয়া-প্রবাসীর সেই ভীষণ পোষাক, হাতে শৃঙ্খল। ছবিতে তাকে এ অবস্থাতেও আমার চোখে দেখালো সুন্দর, খুবই সুন্দর। অমন করে চোখ বড় বড় করে চম্‌কে উঠবেন না, মঁসীয় কাঙালী চরণ মিত্র, এতে চম্‌কাবার কিছু নেই। আপনি হয়ত তাকে বাস্তবিকই খুব বদ চেহারা দেখতেন; কিন্তু পুরুষ সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আপনারা পুরুষ, আপনারা কি বোঝেন! সে ভারটা স্ত্রীলোকদের উপরে ছেড়ে দিন। অবশ্য এটাও স্বীকার করি যে নারী-সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমরাও অন্ধ তার সমজদার আপনারা।

ফটো দেখে এই বুঝলাম যে মানুষটা বয়সে যুবা, দীর্ঘকায়, দেহ বেশী স্থূল নয় তবে বেশ পুরুষোচিত ও বলিষ্ঠ, মুখে এক প্রবল পাশবিক শক্তির অভিব্যক্তি; অধরে ঈষৎ হাসি, সে হাসিতে সামনের দু-চারটি দাঁত দেখা যাচ্চে, মনে হ'লো সে দাঁতে যদি কাকেও কামড়ে দেয় ত বোধ হয় খুব লাগে।

ফটোটা একটু আগ্রহের সঙ্গে দেখছিলাম বলে আমার স্বামী একটু বিদ্রূপ করে বললেন, প্রথম দর্শনেই প্রেমের উদ্ভাবন নাকি? আমি ছবিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লাম—জানত প্রেম অন্ধ; এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে নাচতে চলে গেলাম। নাচবো বলে গেলাম বটে কিন্তু আসরে গিয়ে নাচতে ভাল লাগলো না, একটু পরে প্রাসাদে ফিরে গেলাম। আমাদের গাড়ী কাউন্ট নিয়ে যাননি, আমারই জন্ম অপেক্ষা করছিল। এই বিদ্রোহের পর থেকে প্রাসাদে পাহারার খুব ধুম; ফটক থেকে আমার শোবার ঘর অবধি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে প্রহরীদের অতিক্রম করে শয়ন কক্ষে পৌছলাম। পাশেই আমার এক সহচরীর শোবার ঘর; সেই আমার পরিচারিকার কাজ করে। তখন ফেব্রুয়ারী মাস, দারুণ শীত, রাতও অনেক হয়েছে, সে

তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সুতরাং তাকে না তুলেই আমি একাই শয্যাকক্ষে প্রবেশ করলাম ও একখানা খুব বড় আয়নার সামনে একটা টেবিলের উপর আমার অলঙ্কার বস্ত্রাদি উন্মোচন করে রাখলাম, গায়ে রইল কেবল হাতকাটা বুককাটা, হাঁটু অবধি ঝুল, ছোট একটি রেসমি সেমিজ। আয়নার ভিতর আমার সেই নগ্ন ছবি দেখতে দেখতে চার্ম্‌লীনের ছবির কথা মনে এলো; বাড়ী আসবার সময় গাড়ীতে তার কথাই ভেবেচি। এখন কোথা সে? কোন গ্রামে, কোন্ জীর্ণ পর্ণ কুটীরে এই নিশীথে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে? সে কি জানচে যে কাল এক মহা-অভিযান তার দিকে প্রতিমুহূর্ত্তে অগ্রসর হচ্ছে, আর তার নিস্তার নেই।

পাশেই একটা আলমারিতে আমার রাত্রের পরিচ্ছদ থাকতো। সেটা বার করবার জন্য আলমারি খুললাম, উজ্জ্বল আলোকে ভিতরটা দীপ্ত হলো; একি ভিতরে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে দেখেই চিনলাম—এ যে সেই!

মনে করবেন, মঁসিয় মিত্রা, আমি ভয়ে মূর্চ্ছা গেলাম। কিছুমাত্র নয়। তবে এটাও ঠিক যে তাকে দেখবামাত্র তার এক চাহনীতে ভয়ে চীৎকার করবার বা পালিয়ে যাবার ক্ষমতা আমা হতে তিরোহিত হলো, আমার নিজের ইচ্ছা শক্তি কিছুমাত্র আর রইল না। আমাদেরই একজন প্রহরীর মত তার বেশ; তাকে দৃষ্টিমাত্র শুধু এইটুকু লক্ষ্য করলাম যে বাস্তব মানুষটা ছবির চেয়ে ঢের সুন্দর।

সে নিঃশব্দে আলমারির ভিতর থেকে বেরুল ও ধীর পদে আমার দিকে আসতে আসতে বললে—আমি কে জানো?

—আমি খুব ভরসা করে, বুক ফুলিয়ে রুদ্ধকণ্ঠ একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বল্‌লাম—

—জানি তুমি চার্ম্‌লীন।

—আমি এই নিশীথে, রাজকুমারী কর্ণিলকের এই নিভৃত শয্যাকক্ষে কি করছিলাম জান?

—লুকিয়ে রয়েছিলে।

—কেন? কি উদ্দেশ্যে?

—সে কথা তুমিই জানো।

—রাজকুমারী, তোমার স্বামীকে হত্যা করবার জন্য।

—হত্যা!

—হ্যাঁ, হত্যা। কিন্তু আজ রাত্রে আমার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েচে, আমারই একটু ভুলের জন্য। এই রকম সামান্য ভ্রমেই অনেক সময় বিদ্রোহীদের সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ হয়। আজ আমারও উদ্দেশ্য পণ্ড হলো, আর অদৃষ্টক্রমে তোমার স্বামীর জীবন আজও রইল। কিন্তু আমার নিজের জীবন এখন সঙ্কট যেহেতু তুমি চীৎকার করলে প্রহরীরা এখনই ছুটে আসবে—আমি ধরা পড়বো।

এই বলতেই যেন তার চোখে একটা অমানুষিক দীপ্তি এলো। সে তার দু'হাত আমার দিকে প্রসারিত করে, ভীষণ গর্জ্জন করে বললে—

—কিন্তু রাজকুমারি, সাবধান, তোমার মুখ থেকে একটি কথা নির্গত হলে এখনি শ্বাসরুদ্ধ করে তোমাকে মেরে ফেলবো।

সে মূর্ত্তি কি ভীষণ, কি ভয়ঙ্কর...কিন্তু তবুও কি সুন্দর! এ কথার মানে বুঝতে পারচেন কি, এ ভাবের একটুও অনুভূতি করতে পারচেন কি, মঁসিয় মিত্রা, কাঙালি চরণ?

তখন সে বাস্তবিকই এক প্রচণ্ড পশু, ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন কারী এক পশুরাজ, এক বলীয়ান, মহীয়ান সিংহ! আমি ভয় পেলাম না, আমার অন্তর যে তার প্রতি কোমল, আমার সে অনিষ্ট করবে কেন? অন্তরে অন্তরে বললাম —'হে রক্ত-পিপাসু পুরুষ-সিংহ। আমি তোমার বধ্য, তোমার ঐ প্রসারিত বাহু যুগল দ্বারা আমার এই উন্মুক্ত বক্ষ বিদীর্ণ করো, আমার বক্ষ রক্ত পান করে তোমার রক্ত পিপাসা তৃপ্ত করো।' মুখে বল্‌লাম—'মেরে ফেলতে চাও মারো। কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমার পেছনে ঐ আলমারিতে আমার শয্যার বসন ঝুলচে, আমাকে দাও, পুরুষ হয়ে আমাকে এ অবস্থায় রেখো না।'

আমার কথা শুনে তার মূর্ত্তিতে একটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন ঘটলো। তার দৃষ্টি শান্ত হলো, তার প্রসারিত হাত দুটি আপনিই নেমে গেল, সে আলমারি থেকে আমার নৈশ পরিচ্ছদটি নিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলে। আমি যখন পরচি, আমাকে সাহায্য করবার জন্যই হোক বা কি কারণে জানিনা, আমার পৃষ্ঠে তার স্পর্শ অনুভব করলাম—

উঃ! সে স্পর্শ কি অনুপম, স্পর্শে আমার সমস্ত শরীরে যেন হঠাৎ একটা বিজলী খেলে গেল। সে গম্ভীর স্বরে, সে-স্বরে তা'র সাধ্যমত কোমলতা মিশিয়ে আমাকে বল্লে—

—দেখচি আমাকে এখানে এই অবস্থায় দেখে তুমিও কিছুমাত্র ভীতা নও। তবে কি কোন ছলে আমাকে ধরিয়ে দেবার তোমার অভিপ্রায় আছে?

আমি তখন তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লাম—আমি আমার স্বামীর স্ত্রী হতে পারি; কিন্তু তুমি কি বল্তে চাও আমিও পুলিশ?

এই কথা বল্তে মনে আমার একটু বল সঞ্চয় হলো, আবার বললাম—

তোমার জীবনের, তোমার মস্তকের মূল্য কি? তোমাকে ধরিয়ে দেবার পুরস্কার কত? দশ হাজার রুবল মাত্র। ঐ আয়নার সামনে টেবিলের উপর আমার যে মুক্তার হার ছড়াটা দেখচ সুধু ঐটার দাম ১ লক্ষ রুবল,—তোমার মাথার দশগুণ বেশি, তোমাকে ধরিয়ে দিয়ে আমার কি লাভ, কি স্বার্থ।

এই সব কথা বলতে বলতে পেছন হাঁট্তে হাঁটতে আমি আমার খাটের কাছে এলাম। সে হঠাৎ এক লম্ফে আমার কাছে এসে আমার হাতের কবজি চেপে ধরে বলে উঠলো—

—ঐ কল্‌টা টিপতে যাচ্ছ যাতে বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠবে—আর প্রহরীরা ছুটে আস্‌বে—আমাকে ধরবে!

—ওঃ, তুমি এই ভয় পেয়েছ! তোমার সে সন্দেহ থাকে ত তারটা কেটে দাও, আমার কোনও আপত্তি নেই।

এই বলে বুক ফুলিয়ে, পা ঝুলিয়ে খাটের উপর বসলাম। আমার মুখে তার 'ভয়' এর কথা শুনে মানুষটা একটু লজ্জিত হলো, আহত কুকুরের মত ধীরে ধীরে পেছিয়ে গেল; তার বাস্তবিকই একটু ভয় হয়েছিল যে হয়ত সে আমার ফাঁদে পড়েচে, আমি হয়ত তাকে ফাঁসিয়ে দেবো। অথচ তার বোঝা উচিৎ ছিল যে তার এরূপ ভয় করবার কোনও কারণ নেই। হা ভগবান। পুরুষগুলো কি বোকা ওরা নিজেদের যতই বুদ্ধিমান মনে করুক, মাপ করবেন ম'সিয় মিত্রা কাওালি, আপনারা যতই দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন, মনো-বিজ্ঞান-বিশারদ হোন, আপনারা নারী মনঃ-তত্ত্ব কিছুই বোঝেন না। আমি তাকে বললাম—ঐখানে বসো, আর ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে আজ রাত্রে তুমি আমার হাতে পড়েচ। তুমি বিপ্লবী, ধরা পড়লে তোমার ভবিষ্যৎ অতি ভীষণ; কিন্তু যে কারণেই হোক্ আমার সঙ্কল্প যে আজ আমি তোমাকে রক্ষা করবো। কারণ জিজ্ঞাসা করো না, মনে করো এটা আমার একটা খেয়াল। আমাকে হত্যা করে যদি সুখী হও ত এই আমি বসে আছি মারো; একজন অসহায়া স্ত্রীলোক্কে হত্যা করা তোমার পক্ষে খুবই সহজ। কিন্তু মনে রেখো আমিও তোমাকে এখনি খুব বিপন্ন করতে পারি। তুমি হয়ত আমাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেল্‌বে কিন্তু তা করেও তুমি নিজে নিস্তার পাবে না; তুমি ধরা পড়বেই ও নানা নির্য্যাতনে তোমার প্রাণ যাবে। জীবন নিয়ে এ খেলা যদি খেলতে চাও ত এসো, আমি প্রস্তুত। কিন্তু আবার বলচি—আমি তোমাকে বাঁচাবো; খেয়াল—খেয়াল—এই মনে কোরে রেখো যে রাজকুমারী কর্নিলক স্যাম্পেনের খেয়াল বশে তার স্বামীর হত্যাকারীকে আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছিল—আর কোনও তার কারণ ছিল না। যে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যের কাল প্রাতে উদয় হবে যার রক্ত রশ্মি ঐ দেখ একটু উঁকি মারুচে—তার অস্ত যদি দেখতে চাওত প্রতিজ্ঞা করো, আমার কাছে প্রতিশ্রুত হও যে প্রত্যূষে—এখনি প্রাসাদ পরিত্যাগ করবে ও সোজা এই রুশ সাম্রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে অন্য রাজ্যে চলে যাবে; তোমাকে নিরাপদে সীমায় পৌছে দেবার ভার আমার। হাসচো, ভাবচো আমার ইচ্ছা থাকলেও, আমি চেষ্টা করলেও, তোমার পলায়ন অসম্ভব? ঐ হার ছড়াটি ত দেখেচ? দশটা মাথার দাম দিলে একটা মাথা কেনা যায়, হোক্‌না সে মাথা একজন বিপ্লবীর, ভেবোনা, সে দায়িত্ব আমার।

মানুষটা সন্দিগ্ধ-নয়নে একবার ঘরের চারিধার চেয়ে দেখলে, এখনও তার মনে যেন একটু সন্দেহ জাগচে, অবিশ্বাসের এখনও একটু রেশ রয়েচে। সে জিজ্ঞাসা করলে—

—তুমি এ কথা শপথ করে বলতে পারো?

—পারি।

—তোমার রক্ত সাক্ষ্য করে?

—আমার রক্ত সাক্ষ্য করে!

এই কথা শুনেই যেন লোকটাতে হঠাৎ একটা পরিবর্ত্তন এলো। বলেচি, ইতিপূর্ব্বে অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্য ও তার মুখে একটু ভয়, একটু লজ্জার ছায়া দেখা দিয়েছিল। আমার কথা শুনে চোখে তার ফিরে এলো এক নূতন দীপ্তি, তার স্বাভবিক, তার পাশবিক তেজ, এক সম্মোহিনী সৌন্দর্য্য। বল্‌লে

—ভাল, তোমার হাত দাও...

আমি কারণ বুঝতে পারলাম না কিন্তু বিমোহিতা হয়ে আমার বাম হস্ত তাকে এগিয়ে দিলাম। সে তার হাঁটু অবধি উঁচু প্রকাণ্ড 'বুট'এর ভিতর থেকে এক ঝলমলে ছোরা বার করলে, ছোরার ফলাটা খুব চৌড়া কিন্তু মুখটা এত সরু যে ছুঁচের চেয়েও সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ। সে এক হাতে আমার হাত তুলে ধরলে...ওঃ! আবার সেই স্পর্শ, সেই তড়িত প্রবাহ! এ যে চার্ম্মলীনের স্পর্শ সে স্পর্শে কত নর-নারীর অশ্রুজল, কত কথা, কত ব্যথা, কত যন্ত্রণা, কত মৃত্যুবেদনা পুঞ্জিভূত হয়ে রয়েচে যার সমষ্টি যার রূপ এই রক্ত,—যে রক্তের শপথ সে চায় আমার প্রতিজ্ঞার। হাঁসপাতালে যেমন একজন কোমল-হৃদয় সেবিকা (Nurse) একটি শিশুর আহত হাতখানি অতি ধীরে, অতি যত্নে তোলে তেমনি কোমল ভাবে সে তার বাম হস্তে আমার হাতটি ধরে ডান হাতে তার সেই তীক্ষ্ণ-শীর্ষ ছুরিকা দিয়ে আমার হাতে ছোট ছোট, দুটি লাইন টান্‌লে, সে দুটি রেখায় হলো একটি 'ক্রস্', রেখায় ঈষৎ রক্ত দেখা দিল,—

—বলো, 'আমার এই রক্ত সাক্ষ্য করে শপথ করচি'!

—আমার এই রক্ত সাক্ষ্য করে শপথ করচি!

সে ধীরে ধীরে আমার হাতটি তার মুখে তুললে, যখন নামিয়ে দিলে তখন আর রেখায় রক্ত নেই। সেই মুহূর্ত্ত থেকে আমি যেন, শরীরে ও মনে, তার সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে গেলাম, ভাবে আমার বুক ভরে উঠলো, চোখ বুজে গেল। একটু সামলে বললাম—

—এখন এই ঘরেই একটু লুকিয়ে থাকো, আমি সব বন্দোবস্ত করচি...

—তুমি আমাকে রক্ষা করতে চাও, আমি যাবো। কিন্তু একটি কথা শোনো, —আমি চোর, আমি ডাকাত আমি লোকের গৃহে আগুন দিয়েচি, অনেক বালিকাকে নষ্ট করেচি, শত নারীর সতীত্ব হরণ করেচি, অসংখ্য মানুষ হত্যা করেচি, যে নারী আমাকে চেয়েচে তাদের পদাঘাতে প্রত্যাখান করেচি, যারা আমাকে প্রত্যাখান করতে চেয়েচে তাদের শ্বাস রুদ্ধ করে হত্যা করেচি,—আমার সম্মুখে, আমার ইচ্ছার সম্মুখে সকলকে অবনত করেচি, জগতের কোনও শক্তি আমাকে আজ অবধি অবনত করতে পারেনি। কিন্তু আজ রাত্রে আমি তোমার কাছে অবনত, কৃতজ্ঞতার ভারে ভগ্ন, তুমি আমাকে বলো তোমার কি আদেশ।

এমন সময় দরজায় হলো ধাক্কার আওয়াজ। আমরা চমকে উঠলাম। আবার আওয়াজ, কি সর্ব্বনাশ! কাউন্ট কি তাহ'লে জান্‌নি নাকি, লোকজন পাঠিয়ে দিয়ে নিজে এসেচেন শুতে!

অথবা পুলিশ সন্ধান পেয়ে লোকজন নিয়ে এসেচে বিদ্রোহীকে ধরতে! কি করি, কি উত্তর দেবো, কি করে চার্ম্মলীনের প্রাণ বাঁচাবো, আমার প্রাণ আমার অপমান চুলোয় যাক। আওয়াজ ঘন ঘন ও ক্রমশঃ বেশি জোরে জোরে হতে লাগলো...আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া হয়ে চার্ম্মলীনের শরণাগত হলাম--তাকে জড়িয়ে ধরলাম। সে সিংহ বিক্রমে 'বুট' থেকে তার সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা নিষ্কোষিত করে চিৎকার করে উঠলো—কে!

আমি রাজকুমারীর এই গল্প শুনতে শুনতে এত তন্ময় হয়ে গেছি, সহানুভূতি আমাকে এতদূর আক্রমণ করেচে অথবা 'ভদকা' মস্তিষ্ককে এতদূর উত্তপ্ত করেচে যে হঠাৎ আমার আত্মবিস্মৃতি হলো, মনে হলো আমি আর শ্রোতা নই, যেন মস্কো শহরের সেই রাজপ্রাসাদে, রাজকুমারী কর্ণিলফের শয্যাকক্ষে, সেই গভীর নিশির নিস্তব্ধতায় যে ভীষণ নাটকের অভিনয় হচ্ছিল আমি নিজেই তার একজন অভিনেতা আমিই তার নায়ক, আমিই চার্ম্মলীন সেই! বিপন্ন রাজকুমারীকে বক্ষে ধারণ করে, নিষ্কোষিত

ছুরিকা আস্ফালন করতে করতে, কণ্ঠের সকল অবরোধ অতিক্রম করে, খুব জোরে চীৎকার করে উঠলাম—'কে' —আমি, মিঃ মিটার। চা একবার ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, আবার গরম চা এনেচি, ভিতরে নিয়ে নিন্, নইলে আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, অনেক বেলা হয়ে গেছে।

কি সর্ব্বনাশ! এ যে বাসার ঝীয়ের গলা। ধীরে ধীরে ঘুম ভেঙ্গে এলো; কোথায় মিলিয়ে গেল প্যারিসের রেঁস্তোরা—আর রাজপ্রাসাদের সেই নৈশ অভিনয়। আরে ছি ছি ছি, এটা তাহলে সর্ব্বৈব স্বপ্ন! যাক্ প্যারিস্ যাক্ রাজপ্রসাদ, কিন্তু তুমি কোথা গেলে রাজকুমারী এসেছিলে, একরাত্রের জন্য, নিয়ে তোমার সেই অলিন্দ্য রূপের ডালি, আর করে গেলে এই অভাগাকে তোমার চিরদিনের—কাঙালী!

কেন বাধা দাও

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

বারে বারে ওগো সখি
কেন তুমি বাধা দাও,
মন যার বাঁধা আছে
তারে কি করিতে চাও!

কেন হাতে ধর সখি
আঁখি কেন ছল ছল,
নিমেষের বিরহ কি
সহিবারো নহি বল!

কথার বাঁধন সখি
কভু যে গো বড় নয়,
বাহুর বাঁধন সে'ত
ক্ষণপরে পায় লয়।

রূপের বাঁধন টুটে
আঁখি যদি ফিরে চায়,
মনের বাঁধনে ব'ল
কে কখন ছাড়া পায়!

যেথা যাই যেথা থাকি
ব্যবধান কোথা আর,
মন যে গো বাঁধা আছে
তব কাছে অনিবার।

১

ঠাট্টা

শ্রীবিমলা দেবী ও অমলা দেবী লিখিত মিলিত উপন্যাস। প্রথমাংশের লেখিকা শ্রীবিমলা দেবী।

—"উমা, অ উমা।" দিদি ডাক দিলেন।

উমা তখন ঘরের কোণে বসে গোপনে একখানা [illegible]াসিকের পাতা ওল্টাচ্ছিল, দিদির কণ্ঠ-স্বরে চকিত হয়ে [illegible]্যস্ত ভাবে বইখানা স্তূপীকৃত বিছানার মধ্যে গুঁজে [illegible]েরিয়ে এল।

জ্যেঠাইমা রান্নাঘরের রোয়াকে বসে ঝোলের আলু [illegible]টছিলেন, দিদি সুষমা কোলের খোকার কান্নায় বিব্রত [illegible]াবে তাকে কোলে নিয়ে চুপ করাবার ব্যর্থ চেষ্টায় [illegible]র করে ছড়া কাটছিলেন।

উমা এসে দাঁড়াতেই সুষমার পুঞ্জীভূত উষ্মা সশব্দে [illegible]কাশ হয়ে পড়ল।

—"কি হ'চ্ছিল ও ঘরে বসে। ছোট্ট ছোট্ট মেয়ে-[illegible]র দিন রাত্তির নভেল মুখে করে বসে থাকা; দেখলে [illegible]ড় জ্বলে যায়।"

উমা উত্তর দিল না; হেঁট হয়ে সুষমার কোল থেকে [illegible]াকাকে তুলে নিল।

জ্যেঠাইমা উমার দিকে চোখ তুলে একবার চাইলেন, [illegible]র সুষমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বল্লেন,—[illegible]দেখত, উমার কাছে গিয়েই খোকা কত শান্ত হয়ে [illegible]ল; তোর যদি কোন ক্ষ্যামতা আছে!"

—"ও যে জন্মে অবধি ওরই কাছে রয়েছে মা! [illegible]ামি যে পারি না!"

আব্দারের সুরে সুষমা বল্লে। মা হাসলেন কথা [illegible]ইলেন না।

সুষমার চার বছরের বড় মেয়ে নন্দরাণী লাফাতে [illegible]ফাতে এসে ভেতরে ঢুকল—"দিদিমা দাদু বল্লেন [illegible]ল বাবা আসবেন।"

—"কে আসবে?"

জগদ্ধাত্রী প্রশ্ন করলেন। সুষমা রান্না ঘরের দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, মুখ ফিরিয়ে মার দিকে চেয়ে বল্লে—

—"কি মা?"

—"কি জানি বাবু!"

জগদ্ধাত্রীর মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

সুষমা ফিরে এসে আবার মায়ের কাছে বসল; একটু ইতস্ততঃ করে বাঁ হাতে খোপার উঁচু হয়ে ওঠা কাঁটা গুলো গুঁজে দিতে দিতে বল্লে—"কাল বাবা তাই বুঝি বলছিলেন তোমাকে? বলনিত কি!"

—"কি আর বলব! তোর শাশুড়ী ত বারে বারেই লিখছেন, এখন সাত তাড়াতাড়ি আবার ছেলেকে পাঠাচ্ছেন, সেখানে গেলে তুই কি আর বাঁচবি! মাগী লোক ত ভাল, কিন্তু যে পোড়া দেশ!"

সুষমা কথা কইল না, জগদ্ধাত্রী একটু চুপ করে থেকে নীচু সুরে স্বগত ভাবে বল্লেন—"দেখি ওঁকে একবার বলব যদি এখানে কোন কাজ কর্ম্ম করে দেন। তোকে পাঠিয়ে দিয়ে কি নিয়েই বা থাকব, ছেলেটাত একদণ্ড বাড়ী থাকে না। আর উমাই কি থাকতে পারবে? এই সবে মা বাপ দুজনের এতবড় শোকটা পেয়ে এসেছে, ছেলেমেয়ে গুলোকে নিয়ে তবু ওর সময়টা ত কাটে।"

বঁটিটা কাৎ করে রেখে কুটনোর থালা তুলে নিয়ে জগদ্ধাত্রী চলে গেলেন।

বেণীমাধবরা দুই ভাই, জ্যেষ্ঠ বেণীমাধবের দুই সন্তান। জ্যেষ্ঠা কন্যা সুষমা, কনিষ্ঠ পুত্র সন্তোষ। ছোট ভাই রাধামাধবের একটি মাত্র কন্যা উমা। এক বৎসরের আড়াআড়িতে মাস ছয়েক পূর্ব্বে দশ বৎসরের অনূঢ়া কন্যা উমাকে একান্ত অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে স্বামী-স্ত্রী অত্যন্ত অতর্কিত ভাবেই পরলোক যাত্রা

করেন। বেণীমাধব ভাইর নিতান্ত দুঃসময়ে স্বেচ্ছায় অগ্রণী হয়ে গিয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রী উমাকে ও সেই সঙ্গে হাজার দশেক গচ্ছিত অর্থের বিষম ভার নিয়ে ফিরে আসেন।

জগদ্ধাত্রী লোক ভালই, মাতৃ-পিতৃহীন দেবর কন্যাকে তিনি প্রসন্ন চিত্তেই গ্রহণ করেছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে সুষমার বিবাহ হয়ে গিয়েছিল, শ্বশুরঘর তাকে করতে হয়নি, তবু মাঝে-মিশেলে পনের কুড়ি দিনের জন্য যেতে হয়েছে, জামাই মিহির মোহন এম-এ, বি-এল পাশ করে ওকালতির পসার জমাবার চেষ্টায় আছে।

সুষমার শ্বশুরালয়ের খ্যাতি সম্বন্ধে জগদ্ধাত্রীর মত-দ্বৈধ ছিল না, শুধু গ্রাম্য জীবনের স্বাস্থ্যের সুস্থতা সম্বন্ধে তার ঘোরতর সংশয় ছিল।

সেই জন্য তিনি কন্যাকে পাঠাতে প্রতিবারেই আপত্তি তুলতেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত পাঠিয়ে দিলেও; শ্বশ্রূর সতর্ক দৃষ্টি ও যথেষ্ট সস্নেহ যত্নকে পরাস্ত করে সুষমা প্রায় প্রতিবারেই রকমারি রোগের তালিকা নিজ দেহে বহন করে ফিরে আসত!

সন্তোষ আই, এ পড়ে, নিয়মিত কলেজ যায়, ফিরে এসে একটু জিরিয়েই বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে বেরোয়, গোল দীঘির ধারে, সিনেমা, ফুটবল ম্যাচ!

বেনীমাধব ডাক্তারী করেন, ভিজিটের টাকা নিয়ে ব্যাঙ্কে জমা করেন, আর অবসর সময় বসে বসে মুখে মুখে সঞ্চিত অর্থের হিসাব করেন। জগদ্ধাত্রী সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখেন, মাঝে মাঝে স্বামীকে তাড়া দেন—"হ্যাঁ গা উমার জন্যে পাত্তর টাত্তর খোঁজ করবে না।"

বেনী মাধব চোখ বিস্ফারিত করে বিস্ময়ের সুরে বলেন—"আরে এখুনি কি! এখন ত বাচ্ছা। হ'বেখন!" উমা সমস্ত ক্ষণ সুষমার খোকা খুকুকে নিয়ে থাকে, অবসর মত জগদ্ধাত্রীর কাছে এসে দাঁড়ায়, মিনতির সুরে বলে—"জেঠিমা দাদাকে বলুন না আমার পড়ার বইখানার একটু মানে বলে দিতে। জ্যাঠামশায়ও বল্লেন সময় নেই।"

—"বলিস নি বাছা সবাই মিলে আমার হাড় ভাজা ভাজা করলে! মেয়েটা মানে মানে করে বেড়াচ্ছে কারুর যেন এক দণ্ড অবসর নেই! কথা কি কেউ কানে নেয়!"

সুষমা বিরহাতিশয্যে স্বামীকে একদিন অন্তর ছ' পাতা করে চিঠি লেখে, সকাল বিকেলে নানা রকম চেহারার শিশি কৌটা নিয়ে বসে সযত্নে প্রসাধন সমাপ্ত করে। অন্য সময় মার কাছে বসে বসে গল্প করতে করতে গলার লম্বা চেন হারটা বাঁহাতে ক্রমাগত গেরো পাড়তে থাকে।

উমার কথায় হাসে—"আর মানের জন্যে অত কষ্ট করতে হ'বে না, মানের মাষ্টার এনে দেওয়া হ'বে শিগগিরই, সমস্ত দিনই কান ধরে মানে জিজ্ঞেস করিস! হ্যাঁ মা তা সে আহিরীটোলার ওরা কি বল্লে!"

—"বল্লে আমার মাথা আর মুণ্ডু! মেয়েটার যে কি করে বিয়ে দেব তা জানিনে! সে সময় ঠাকুর পো ছিলেন, তাই না তোর বিয়ে দিতে পেরেছিলাম, নইলে বাড়ীতে ত কে কার কথায় কান দেয়। বল্লাম না হয়, যে ক'দিন বিয়ে না হয় একটা মাষ্টারণী-ফাষ্টারণী রেখে দাও একটু পড়া শোনাই করুক, আজ কালকার ছেলেরা আবার লেখা পড়া জানা মেয়ে না হলে পছন্দই করে না, তা কে কার কথা শোনে!"

চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সুষমার বিদ্যাভ্যাস দ্বিতীয় ভাগের অথৈ সমুদ্রে হাবু ডুবু খেয়ে শেষে মিহির মোহনের তট ভূমিতে আশ্রয় নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

জগদ্ধাত্রীর কথায় মনের মধ্যে একটু খানি ঈর্ষা মিশ্রিত বিরক্তি ফুটে উঠল—"হ্যাঁ যত সব কথা! মেয়েত আর চাকরী করতে যাবেন না! তার চেয়ে বরং ঘরের কাজকর্ম্মে মন্ দিক যা' কাজে লাগবে।"

—"কেন কোরবোনা? চাকরী করতে বুঝি দোষ আছে।" উমা হাসি মুখে এসে দাঁড়ায়।

অকরাণেই সুষমার সর্ব্বশরীর জ্বালা করে ওঠে, রাগ করে বলে—"হ্যাঁ পড়া ওমনি মুখের কথা কিনা, তাই পড়লেই হ'ল। আমরাই বড় পারলাম তা উনি পারবেন!"

জগদ্ধাত্রী মেয়ের দিকে বিস্মিত নেত্রে চান, শেষে হেসে বলেন—"বড্ড কি সব অনাছিষ্টি! নে-সব দিকি

তোয়া, কাজ গুলো সেরে নি চট করে।',

সুষমা রাগ করেই উঠে যায়।

২

—"হ্যাঁ গা, তোমার ইচ্ছেটা কি বলত? মেয়েটার বিয়ে থা দেবেনা? বার পেরিয়ে তেরয় পড়ল, এখনও সময় হ'ল না?"

ছুটির দিন দুপুর বেলায় তিন জনেই খেতে বসেছিলেন এক সঙ্গে।

বেনী মাধব, মিহিরমোহন, সন্তোষ, সমুখে বসে জগদ্ধাত্রী পাখার বাতাস করতে করতে খাওয়ার তদারক করছিলেন।

উমা পরিবেশন করছিল; পাশের ঘরে সুষমা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি একখানা বই পড়ছিল। গৃহিণীর প্রশ্নে বেনীমাধব একবার মুখ তুলে চাইলেন পরে সন্তোষের দিকে চেয়ে বল্লেন—"আমার ত মনে হয় চাকরীর চেয়ে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা কারায় লাভ আছে ঢের।"

সন্তোষের উত্তর দেবার পূর্ব্বেই জগদ্ধাত্রী কথা কইলেন—"শুনতে পাচ্ছ? ব্যবসা আর চাকরীর ভাবনা ছেড়ে কাজের কাজ কর দিকি।"

—"কি?"

বিরক্ত ভাবে বেনীমাধব প্রশ্ন করলেন।

—"কি আবার? বাগবাজার থেকে ওরা যে দেখতে আসবে, তা তুমি না বল্লে আসবে কি করে।"

—"হেঁটে কি গাড়ী চেপে! আমি ত বলে দিইছি এককথা; একশ বার বকাও কেন? ও সমস্ত ঘটক ঘটকীর দ্বারা আমি বিয়ে দেবনা!"

মিহির মোহন মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে মুখ তুলে শ্বশুর দিকে চেয়ে বল্লে—"সেটা ঠিক, ওরা দুদিকে দুরকম কথা কয়ে এমনি গোলযোগ করে তোলে—"

—"তা তোমরাই বা কোন খোঁজ করছ বাবা, ঘটক ঘটকি কি সাধে আনতে হয়। আজ কোর্ট বন্ধ যাওনা একবার, যাবে?"

—"আজ? আজত সময় হবে না—বাইরে একটু কাজ আছে কিনা—।"

আমতা আমতা করে মিহিরমোহন চুপ করল। সন্তোষ মায়ের আক্রমণের পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি ভোজন অসম্পূর্ণ রেখে আসনের উপর উঠে দাঁড়াল।

জগদ্ধাত্রী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।—

—"ওকি রে! দৈ নিবি নে এরই মধ্যে উঠলি যে!"

—"না মা, খেতে ইচ্ছে করছেনা।"

সন্তোষ বেরিয়ে গেল।

মিহিরমোহন অসহায় ভাবে একবার শ্যালকের দিকে চেয়ে দৈর প্রতীক্ষায় বসে রইল।

জগদ্ধাত্রী এবার মিহিরমোহনকেই ধরে বসলেন।

—"তা হ্যাঁ বাবা তুমিই একবার লেখনা তোমার মাকে, তিনিত কটা সম্বন্ধ দিয়েছিলেন সেবার। লিখবে?"

—"কাকে? মাকে? মা কি আর আমাদের উপযুক্ত ঘর দেখতে পারবেন! সেই সেকেলে ধরণ কিনা!"

জগদ্ধাত্রী মনে মনে চটে উঠলেন।

সাধ করে কি শাস্তোরে ঘরজামাই রাখতে নিষেধ করে। দেখ দিখিন একবার কথা!

নন্দরাণী এসে সংবাদ দিল—"দিদিমা, মা তোমায় ডাকছে।"

—"যাচ্ছি।"

জগদ্ধাত্রী অপ্রসন্ন মুখে উঠে গেলেন।

সুষমা মাকে দেখে বই খানা পাশে উল্টে রেখে উঠে বসল।

ঝনাৎ করে চাবিটা পিঠের ওপর ফেলে দিয়ে, চটকরে চুল গুলোর উপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বল্লে

—"তুমি বুঝি উমার বিয়ের জন্যে ওকে বলছিলে?"

—"হ্যাঁ কেন? কি হয়েছে?"

—"হ'বে আবার কি? আমার শাশুড়ী নাকি আমাদের উপযুক্ত ঘর দেখতে পারবেন! একটা সেকেলে গেঁয়ো ধরে আনবেন অখন।"

—"নে রাখ বাছা তোদের বক্তিমে, ভারি সব মেম্ সাহেব কিনা! বাঙালীর ঘরের মেয়ে, বিয়ে করতে বর আসবে বিলেত থেকে!"

"বিলেত—থেকে মা আসুক; কলকাতায় কি অভাব ঘটেছে নাকি ছেলের। পাড়া গাঁয়ে মেয়ে দিয়ে সাত জন্ম পুকুর আর ডোবা! ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বর! আমি ও ত ছিলাম।"

কন্যা জামাতার উপর জগদ্ধাত্রী মর্ম্মান্তিক চটে উঠলেন। মনে মনে ভাবলেন।—এমনতর সব সাহেব হয়ে উঠবে জানলে কেই বা জামাইকে এনে ঘরে পুষত! পরের ছেলে পরের ছেলের ছেলের মতই ভাল, একেবারে ঘরের ছেলে হওয়ায় অরুচি!'

মুখে বল্লেন—"তা কর না তোরা, আমি কি বারণ করেছি।"

—"আমি আবার কি করব, তোমরাই কর।"

সুষমা বইখানা তুলে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

—"তবে আর কথা কোস কেন বাবু, আমার ওসব চুনো-গলির সাহেবীআনা ভাল লাগেনা। ভদ্দর লোকের ছেলে দেখে বিয়ে দেব, তার একাল আর সেকাল! নে, ওঠ, গুলি যে আবার খেতে আয়।"—

উমার কণ্ঠস্বর ভেসে এল—

—"জ্যেঠিমা।"

জগদ্ধাত্রী বেরিয়ে গেলেন।

(৩)

—"জ্যেঠিমা।"

—"কি মা?"

—"আমার বড্ড ভয় করছে।"

রোগ শয্যায় শায়িতা জগদ্ধাত্রীর মুখ বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

আর কি সেরে উঠবেন! কে জানে! ভেবেছিলেন মেয়েটাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত মনে সংসারের বাঁধন কাটিয়ে যেতে পারবেন; কই আর হ'ল!

এর পর উমাকে কেই বা দেখবে!

উমা যে বড্ড অভিমানী!

কি যে হ'বে! ভাবতে যেন ভরসা হয় না!

উমার শঙ্কিত, ম্লান মুখের দিকে চেয়ে জগদ্ধাত্রীর চোখে জল ভরে এল।

একেই বলে গেরো!

দেখ দিখি একবার!

নিজের ছেলে মেয়ে গুলো বড় হ'ল, বিয়ে থা ঘর সংসার পাতিয়ে দিলেন; তবু কি মুক্তি আছে! কোথা থেকে এ মেয়েটাকে নিয়ে মরণেও দুঃশ্চিন্তা!

ঠাকুর পোর কি এই যাবার সময়!

ছোট বৌ ও যদি থাকত!

কত জন্মের পাপের ফল আর কি!

আঃ ভগবান!

ছোট বৌর ওপর রাগ হয়, এমনি করে শত্রুতা করে গেলি! মুখে তবু হাসি ফুটিয়ে তুলে উমার দিকে চান—"ভয় কিরে পাগলী! জ্যেঠিমা কি সাত কালই বাঁচবে! এর পর তোর দিদির কাছে থাকবি। বিয়েটা যদি দিয়ে যেতে পারতুম!"

উমার চোখে দিয়ে টপ টপ করে জল ঝরে পড়ে; জগদ্ধাত্রীর বুকের কাছে মুখ গুঁজে অশ্রু ভার কণ্ঠে বলে—"তুমি ওমনি করে বোল না জেঠিমা, আমার যে কেউ নেই।"

—"বালাই ষাট! ওরে বুড়ি জ্যেঠি কি সবারি থাকে, পাগল! ছোট বৌ গেল আমার যে কবে যাবার কথা! আমার ভাবনাই যে তার ভাববার কথা, তার ভাবনা কি আমাকে এমনি করে দিয়ে যেতে হয়!"

জগদ্ধাত্রীর ও চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সুষমা দুধের বাটি হতে নিয়ে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল—

—"মা।"

জগদ্ধাত্রী মুখ ফিরিয়ে চাইলেন।

—"এখন থাক ও সব, ইচ্ছে করছে না। তুই এই-খেনে বোস।"

সুষমা পাশে এসে বসল, তারও চোখ্ সজল হয়ে এসেছিল।

—"তোমার যা চেহারা হয়েছে মা!"

চোখের জল সামলে নেবার জন্যে সুষমা মুখ ফিরিয়ে নিল।

জগদ্ধাত্রী চুপ করে চেয়ে রইলেন।

অসহায় উমার একান্ত নির্ভরতা, ছেলে মেয়েদের ব্যাকুল বন্ধন, ডাক্তার কবিরাজদের প্রাণান্ত পরিশ্রম, কোন মতেই জগদ্ধাত্রীকে রাখা গেল না! আশ্রয়চ্যুতা উমা নূতন করে নিরাশ্রয় হয়ে সংসারের কঠিন ধূলায় এসে দাঁড়াল।

যুগ যুগান্তের আপন নিয়মে মহাকালের দিন রাত্রি বর্ষ মাস আসে যায়।

দিনে দিনে সংসারে সকলের মনে জগদ্ধাত্রীর অভাব ও ক্রমে মিলিয়ে আসে; একা উমারই শুধু সেটা সহনীয় হয়ে আসে, মিলিয়ে যায় না।

সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে এ ঘর থেকে ও ঘর যাবার সময়, কতদিন সে আপনার অজ্ঞাতেই চোখ বুঁজে কোণের নির্জ্জনতম অন্ধকারের দিকে হাত বাড়িয়ে অগ্রসর হয়ে যায়; কঠিন দেয়ালের গায়ে হাত ঠেকাতেই তাড়াতাড়ি চোখ মেলে অপ্রস্তুত মুখে চারদিকে চেয়ে কাজে চলে যায়।

অগ্রহায়ণমাসের মাঝামাঝি সুষমার কোলে আর একটি খোকার আবির্ভাব হ'ল, উমার কাজও সেই সঙ্গে বেড়ে গেল।

সন্তানের ছোট বড় সকল কর্ম্মের দায়িত্ব কোনদিনই সুষমাকে বহন করতে হয়নি সে পারেও না ও সব। উমা সকল কাজই করে, সেই সঙ্গে রাগারাগিও করে বিস্তর; আশ্রিতা হয়েও আশ্রিতার ব্যবহার সে কোন দিনই শিখল না! অনিচ্ছা সত্বেও সুষমা তাকে মনে মনে সমীহ করে কাজেই সম্মুখে বিশেষ কিছু বলে না।

জগদ্ধাত্রীর অতর্কিত মৃত্যু একদিকে যেমন উমাকে নিতান্ত অসহায় করে তুলেছিল, অন্য দিকে আত্মরক্ষায় ও যথেষ্ট সমর্থ করে তুলেছিল।

জগদ্ধাত্রী ছাড়া এ বাড়ীতে উমার আবির্ভাব কারুরই মনঃপুত হয়নি; কাজেই তাঁর মৃত্যু উমাকে যথার্থই নিরাশ্রয় করে গিয়েছিল।

সুষমারও অবসর নেই, কর্ত্তৃত্বের দায়িত্বও কম নয়! প্রতিবেশিনীদের কাছে চোখের জল ফেলে সুষমা বলে—"আর ভাই; এমনি করে মা আমার ঘাড়ে এমন কাজের ভার দিয়ে চলে গেলেন! এই কি আর তাঁর যাবার সময়। ছেলে বউ নিয়ে দু'দিন ঘর করলেন না! মেয়েটাকে না আনলেই হ'ত, কি জানি কেমন অপয়া, আসতে না আসতে মাকে শেষ করলে!"

প্রতিবেশিনী যোগমায়া সহানুভূতি সূচক কণ্ঠে বলে—"আহা সত্যি ভাই; কি যে হয়ে গেল! ভাগ্যিস তুই রইছিস, নইলে কি যে হত!"

"সে আর বলতে! শাশুড়ী লিখেছেন ছেলেকে দেখা করতে যেতে, তা উনি খুব রাগ করে লিখে দিলেন, যে এখন কি আর তাঁর যাবার যো আছে! শাশুড়ী আমার যেন কেমনতর, যদি কিছু বোঝেন; এতবড় সংসার এসব দেখা শোনা করে কে যেন বল দেখি; বাবা ত বুড়ো মানুষ তায় এত বড় শোকটা পেয়ে যেন কী হয়ে গেছেন, ভাই নেহাৎ ছেলে মানুষ, এখন কি আর ওর কোথাও নড়বার সময় আছে।"

—"তাত সত্যি জামাই নয়ত যেন ঘরের ছেলে! তা উমার বিয়ের কি হ'ল? কত বয়স হ'ল ওর? সতের! তা আর ত না বিয়ে দিলেই নয়।" কি জানি ভাই, ওসব জানি না, সে বাবাই করবেন এখন।

এই দুর্ঘটনার মাঝ খানে বিয়ে পৈতের কথা কি আর কারুর মনে হ'চ্ছে।" বলতে বলতে সুষমা জননীকে স্মরণ করে আবার চোখের জল মুছল।

যোগমায়া একটু যেন বিস্মিত ভাবেই সুষমার দিকে চাইল। সিনেমা, থিয়েটার, দোল দুর্গোৎসব সবই মনে হয়, কেবল বিয়ের কথায় শোক আর যায় না—কি জানি হ'বে ও বা!

বড় লোক দের তাই বুঝি হয়!

মুখে বলে—"তা ত সত্যি। আজ উঠি কাজ আছে। ভাই।" যোগমায়া চলে গেল।

(৪)

"তবু মনে রেখ, যদি দূরে যাই চলে।"

গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে উমার বন্ধু সুরমা ঘরে এসে ঢুকল।

উমা চা করতে করতে মুখ তুলে চাইল, হেসে বল্লে—"আদেশ?"

"না! অনুরোধ!"

সুরমা পাশের বাড়ীতে থাকে, দু'বাড়ীর ছাত দিয়ে আসা যাওয়া চলে, উমারই সম বয়সী।

বছর খানিক হ'ল বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে এসেছে। উমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ।

উমা আবার হাসলে, বল্লে—"কাকে, পলাতককে না বন্দীকে?"

বলে নিজের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে দেখিয়ে দিল।

সুষমা হাসি মুখে পাশে এসে বসল, উমার হাতের কাজ গুলো কেড়ে নিয়ে তাকে একটু ঠেলে দিয়ে বল্লে—"না পলাতককে ছুটি দেওয়াই কর্ত্তব্য বন্দীকেই বলছি।"

"যদি পড়িয়া মনে
ছল ছল জল দেখা নাহি দেয় নয়ন কোণে
তবু মনে রেখ।—

উমা হেসে উঠল—বাসরে! কি বিপদ, কোথাও কিছু নেই, এত অনুরোধ, অভিমান, সব জুড়ে দিলি কেন বলত? নতুন আমদানী বুঝি!"

—"নিশ্চয় নতুন সন্দেহ আছে! বিয়ে করছ চুপি চুপি খবরটাও দিতে পার নি, কেড়ে নিতাম না গো।"

"—যদি নিতিস। কিন্তু মস্তিষ্কের কিছু গোলমাল হয়নি ত?"

"কিছু না! খবর পাই!"

—"কিসের খবর?"

"—আহা জানেন না যেন! সুষমাদির দেওর গো। রমেশবাবু; যিনি নিত্য এবাড়ীতে আসা যাওয়া করছেন। উমার মুখখানা পলকের জন্যে রাঙা হয়ে পর মুহূর্ত্তে কঠিন হয়ে উঠল, গম্ভীর সুরে বল্লে—

"—এমন মুখরোচক সংবাদ সংগ্রহ করলে কোথা থেকে?—দিদি?"

"—হ্যাঁ সুষমাদিইত বল্লেন সেদিন বৌদির কাছে, মিহিরবাবুও বলছিলেন, তোদের নাকি খুব ইচ্ছে আছে।"

—"হুঁ"

বলে উমা অকস্মাৎ একটি চায়ের বাটি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

পাশের ঘরে মাঝখানের শ্বেতপাথরের ছোট গোল টেবিলের দু'দিকে বসে সুষমা ও রমেশ গল্প করছিল। রমেশ সুষমার গ্রাম সম্পর্কে দেবর।

ছাত্রাবাসে থেকে মেডিক্যাল কলেজ পড়ে। অনেক দিন থেকেই এ বাড়ীতে যাওয়া আসা করে। গ্রামে তার বড় এক ভাই, ভ্রাতৃজায়া, বৃদ্ধা জননী, ও একটি বিধবা বোন আছে।

আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল নয়।

ছেলেটি ভাল, জগদ্ধাত্রীর মনে মনে ইচ্ছা ছিল রমেশ ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে, উমার সঙ্গে একবার বিয়ের চেষ্টা করবেন।

সুষমা মায়ের গোপন ইচ্ছা জানত, কিন্তু সে প্রথম থেকেই আপত্তি তুলেছিল—

—"না না কি যে বল, ওই গেঁয়ো বাড়ীতে নাকি উমা টিকতে পারবে! আমার শ্বশুর বাড়ীর দেশেরই ত সব আমি ব জানি।"

মিহির মোহন ও আপত্তি তুলেছিল—"ওরকম অবস্থায় আমাদের বাড়ীর মেয়েরা সইতে পারবে না।"

উমা ঘরে ঢুকে চায়ের বাটিটা সশব্দে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখতেই রমেশ মুখ তুলে চাইল।

উমা সুষমার দিকে পাশ করে রমেশের সম্মুখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ এক দৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে খুব সহজ সুরে বল্লে—"একটা অদ্ভুত ধরণের কথা আমার সম্বন্ধে কে রচনা করেছে বলতে পারেন?"

উমার কথার সুরে সুষমা বিচলিত হয়ে উঠল, একটু উসখুস করে হঠাৎ সে খোকার জাগরণের কাল্পনিক কৈফিয়ৎ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

রমেশ সবিস্ময়ে চাইল, সুষমার অকস্মাৎ কৈফিয়ৎ এবং উমার অতর্কিত প্রশ্নের সে কোন কারণ অনুমান করতে না পেরে বল্লে—"আমায় বলছ।"

—"হুঁ।"

—"কি!"

—"ঐ ত বল্লাম। আমি শুধু জানতে চাই এত উর্ব্বর মস্তিষ্কটি কার? তিনি যিনিই হোন, তাঁর কল্পনা শক্তি যথেষ্ট আছে বোঝা যাচ্ছে, তবে সেটা এ ভাবে ভাতের হাঁড়ীতে ক্ষয় না করলেই ত ভাল হয়।"

শেষের দিকে উমার কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ এবং বিরক্তি দুইই তীক্ষ্ণ ভাবে বেজে উঠল।

রমেশ মনে মনে উত্তরোত্তর বিস্ময় অনুভব করলেও মুখে একটু হেসে বললে—"কিন্তু কথাটা কি ধরণের সেটা না বুঝলে উত্তর দেওয়া সহজ নয় নিশ্চয়। বিশেষ আমার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ বুঝলাম না ত।"

উমা এইবার একটু খানি নিজেকে বিপন্ন ও বিব্রত বোধ করে চুপ করে রইল।

প্রচণ্ড রাগ নিয়েই সে কথটা আরম্ভ করেছিল, কিন্তু সুষমার প্রস্থানের পর মনের পুঞ্জীভূত ক্রোধটা প্রশমিত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা এসে কণ্ঠরোধ করে ধরল।

উমাকে চুপ করে থাকতে দেখে রমেশ স্বভাব সিদ্ধ বিদ্রূপের সুরে বললে—"কি ব্যাপার? আমার সঙ্গে কি তার কোন সম্বন্ধ আছে মনে হয়? না ওটা তোমার প্রশ্নের নূতন রকম ধারা।"

উমার নির্ব্বাপিত প্রায় ক্রোধ আবার জ্বলে উঠল—"না, মনে হয়, বোধ হয় নয়, সেজন্য আপনিই দায়ী—।"

—"আমি দায়ী! অর্থাৎ?"

—"অর্থাৎ খুবই পরিষ্কার! আপনি কি মনে করেন যে আপনি আমার খুব যোগ্য!"

রমেশের এতক্ষণের কৌতুকোজ্জ্বল মুখে কে যেন অকস্মাৎ একটা কণ্টক বহুল চাবুকের তীক্ষ্ণ আঘাত সজোরে ছুঁড়ে মারল, আহত মুখে সে বললে—

—"না সেত আমি কোন দিন বলি নি।"

উমা ঘোরতর অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তবু মরিয়া হয়েই বললে—"কিন্তু তাই রটেছে। যাঁরা রটনা করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে আমি কিছুই বলব না, শুধু আমি জানতে চাই আপনি এই ধরণের কোন কথা কাউকে বলেছিলেন কিনা?"

রমেশ উঠে পড়ছিল, বেরিয়ে যেতে যেতে শান্তস্বরে বললে—"কে বলেছে আমি জানি না, কিন্তু যেই বলুক আমি তার কল্পনাকে কোন দিন সাহায্য করিনি—সেটা বিশ্বাস তুমি করতে পার।"

৫

সেদিন থেকে রমেশ আর উমাদের বাড়ী আসে না, উমা সেটা পরদিন থেকেই লক্ষ্য করেছিল, মনে মনে একটু খানি লজ্জা মিশ্রিত বেদনা ও বোধ হল, সেই সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতেই রমেশ সম্বন্ধে তার মনের গোপন কোণে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভাব ও জেগে উঠল। যত দিন গত হ'তে লাগল উমার মন অল্পে অল্পে চঞ্চল উন্মনা হয়ে উঠছিল।

মনে মনে ভাবে ও কথা গুলো না বললেই হত। কিন্তু কেমন মানুষ! সেত রাগ করেই বলেছিল সেটুকু আর বুঝলেন না।

না যদি বোঝেন নাই বুঝলেন সেজন্য তারই বা কেন এত শিরঃপীড়া।

নিজের উপরে উমার রাগও হয়; কিন্তু কেমন করে যে সেই রাগটা সকলের উপর অল্পে অল্পে ছড়িয়ে পড়তে লাগল উমা নিজেই তা জানতে পারলে না। সুষমা একদিন রাগ করে বললে—

—"কি হয়েছে তোর? সমস্তক্ষণ মেয়ে যেন সপ্তমের সুর বেঁধেই আছেন! হাঁড়ী পানা মুখ!"

"কোন কাজ আছে?"

উমার শান্ত প্রশ্নে সুষমা মনে মনে জ্বলে উঠল, মুখে আর কিছুই বললে না।

রমেশের আকস্মিক অন্তর্ধান সুষমার ও দৃষ্টি এড়ায়নি। সেদিন দুপুরে উমা একখানা বই নিয়ে চুপ করে শুয়েছিল, সুষমা এসে কাছে বসল, একথা সে কথার পর হঠাৎ বললে—"আচ্ছা রমেশ ঠাকুর পো আজকাল আর আসেন না কেন জানিস?"

—"না আমাকে ত বলে যান নি।"

উমার কথার সুরই অমনি ধারা! রাগ হয়, তবু সেটা চাপা দিয়ে সুষমা বললে—"না তাই জিজ্ঞেস করছি, রাগ করেন নি ত? তুই কিছু বলেছিস!"

—"বলবার জন্যে অনেক মুখ আছে, আমার বলবার দরকার নেই।"

উমা খুব গম্ভীর ভাবে উঠে চলে গেল।

সুষমার রাগ জ্বলে উঠল।

—"আছেই ত! কি বলেছি কি শুনি?"

উমার সাড়া পাওয়া গেল না, এক তরফা যুদ্ধ চলে না কাজেই সুষমাকে চুপ করতে হ'ল। বিকেলে কাপড় কেচে রান্না ঘরে ঢুকে উমা দেখল সুষমার আদেশ অনুযায়ী ঠাকুর রন্ধনের বিরাট আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

গ্রীষ্মকাল, রন্ধন গৃহ যেন আগুন হয়ে রয়েছে।

উমা বেরিয়ে এসে ডাকল—"দিদি।" সুষমা নন্দ-রাণীকে নূতন সাহেব বাড়ীর কেনা একটি ফ্রক পরিয়ে কেমন মানিয়েছে তারই পরখ করছিল; উমার ডাকে সাড়া দিল—"এদিকে আয়ত একবার।"

উমা এসে ঘরে ঢুকল।

—"কেমন হয়েছে রে? সুন্দর দেখাচ্ছে নয়?"

উমার একবার নন্দর হাঁটুর উপরি ভাগ পর্য্যন্ত অনাবৃত পোষাকটির দিকে চাইল, ম্যালেরিয়া ক্লিষ্ট জীর্ণ পা দুটী যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে! নিজেকে আবৃত করবার ব্যাকুল চেষ্টায় সে যেন কেবলি উপর দিকে চাইছে।

উমার ঠোঁটের কোণে অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটে উঠল,—"বেশ হয়েছে। অত রান্নার কি হবে?"

"—ওঃ, হ্যাঁ, তোকে বলতেই ভুলে গেছি আজ যে রমেশকে নেমন্তন্ন করেছি।"

"ওঃ!"

বলে উমা বেরিয়ে গেল। সন্ধের পর মিহির রমেশকে নিয়ে এল।

সুষমা অভ্যর্থনা করে বললে—"দেরী দেখে আমারত ভয় হয়েছিল, আসেব না বুঝি। এতদিন আসনি কেন?"

—"রোজই কি আর আসা যায়?"

রমেশ সুষমাকেই প্রশ্ন করে বসল, ঠিক কোন উত্তরটা দিলে ভাল হল বুঝতে না পেরে সুষমা একটু হেসে —"দেখি রান্নাঘরটা ঘুরে আসি, তুমি বোস।" বলে বেরিয়ে গেল। উমা প্রতিদিন মনে মনে রমেশের আগমন প্রতীক্ষা করেছে, কিন্তু আজ যখন রমেশ এসে উপস্থিত হ'ল, তখন হঠাৎ তার সমস্ত মনটা অস্বস্তি আর লজ্জায় যেন পূর্ণ হয়ে উঠল।

একবার ভাবলে সম্মুখে বেরুব না, কিন্তু সেটা ঠিক ভদ্রতা সঙ্গত হ'বে না, শুধু কি তাই, সেদিনের ঘটনাকে যেন নতুন করে স্মরণ করিয়ে তার সুযোগ দেওয়া হ'বে।

বেরুবে কি বেরুবে না কোনটাই স্থির করতে না পেরে হঠাৎ এক সময় উমা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল, হেসে বললে—"খুব ভাল ছাত্র হবার চেষ্টায় আছেন বুঝি?"

—"সে আর এমন কি অদ্ভুত?"

—"অদ্ভুত নয়, নতুন ত বটে?"

—"নিশ্চয়, যোগ্য, অযোগ্য, ভাল, মন্দ, সবই নতুন থেকে পুরান হয়, এমন কি বিধাতার বিশ্বটাও!"

উমা উত্তর দিল না, জানালার কাছে সরে গিয়ে ভাল করে সেটাকে খুলে দিতে দিতে বল্লে—"উঃ কি রকম গরম পড়েছে!"

"—তরকারীতে নুন জল দিয়ে এলে বুঝি!"

উমার সহিষ্ণুতা এত বেশী নয়, এবার সে রাগ করেই উত্তর দিল—"হ্যাঁ এসেছিই ত।"

"—রাগের কথাত বলিনি মেয়েদের রান্নাঘরটায় ঢুকলেই কেমন মাথা ধরে সেটা খুব স্বাভাবিক কিনা।"

রমেশ একটুখানি হাসলে।

"—আমাদের দেশে বলে মধু সংক্রান্তির ব্রত করলে কথা খুব মিষ্টি হয়, করেছিলেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, তুমি আমি দুজনেই করেছিলাম হয়ত তাই দেখছ না উভয়ের কথাই মিষ্টি!"

"—কিন্তু আপনার ব্রতর ফলটা আমার উপর বর্ষিত হবার কোন সঙ্গতি মানে নাই।"

"—সবটাই কি আর সঙ্গত হয়? ওটা অসঙ্গত, আমি ব্রতের পুণ্য তোমায় দান করেছিলাম।"

"—আমার কিন্তু গ্রহণে আপত্তি আছে।"

"—তা থাক। তারপর আরো কিছু নতুন সংবাদ সংগ্রহ করলে?"

"—আমার ত সংগ্রাহকের কাজ নয়।"

"—ওঃ তা বটে! রিপোর্টার নেই?"

"—আছেই ত।"

উমা রাগ করে বেরিয়ে চলে গেল।

রমেশ সেইদিকে চেয়ে একটুখানি হাসল।

উমার আকর্ষণ ও যেমন প্রবল বিকর্ষণও তেমনি প্রবল।

ওকে যেন চেনা যায়, বোঝা যায় না।

জগদ্ধাত্রীর মনের ইচ্ছাটা সবাই জানত—উমাও, রমেশও। রমেশের সে কথাটা মাঝে মাঝে মনে জাগে কিন্তু তখনি সে, সে ভাবনা মুন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে।

জগদ্ধাত্রী থাকলে সেটা খুবই সহজ ছিল, এখন সেটা শুধু কঠিন নয় অসম্ভব ও।

উমার মনের ভাব সে জানে না, বুঝতেও পারে না; বাড়ীর অন্যান্য সকলের ভাব স্পষ্ট, হয়ত উমারও সেই ভাব!

তাই জানবারও চেষ্টা করে না।

আহারাদির পর সবাই ঘরে এসে জড়ো হলেন। উমা পাখাটা খুলে দিয়ে সুষমার পাশে এসে বসল।

সুষমা রমেশের সঙ্গে গল্প করছিল, মিহির চুপ চাপ শুনে যাচ্ছিল।

সুষমা বল্লে—"অমৃত ছেলেটি খুবই ভাল, ব্যারিষ্টার হয়ে সবে বিলাত থেকে এসেছে, বাবা যদি চেষ্টা করেন ওখানে উমার বিয়ে হ'লে সব দিক থেকেই ভাল হ'বে।"

উমা হাসলে—"বিলেতটা ঘুরে আসার পর ঠিক ধাতস্থ হ'তে কত কাল সময় লাগে?"

সুষমার ভাল লাগল না; আজকালকার মেয়ে বিনা—বিয়ের কথায় মেয়েদের ছুটে পালানুই স্বাভাবিক!

এ মেয়ের সবই কেমন ধারা!

মিহির বল্লে—"ধাতস্থ, অর্থাৎ?"

—"অর্থাৎ যে স্বাভাবিক বাঙালীত্বটা যে ক'বছরে ঘুচিয়ে আসে, সেটাকে ফিরে পেতে আর কি!"

—"তোর কথা শুনলে গা জ্বলে যায়! মার গুণ গুলো ত শিখতে পারলি না!"

সুষমা বল্লে।

রমেশ হাসলে—"ওটা রাগ নয়, 'আঙুর কলটক', আপনারা চেষ্টা করুন না।"

সুষমা বল্লে—"আমরা আর কি চেষ্টা কোরব, বাবা যদি করেন—।"

বাধা দিল উমা—"না, রাগ নয় অনুরাগ। তাইত হওয়া স্বাভাবিক, বিশেষ যখন বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টার অন্ন না জোটে নাম আছে; দেশের উকিল ডাক্তার অন্ন ও নেই নাম ও নেই।"

উমার বিদ্রূপের অর্থ রমেশ বুঝলে, এবং এ স্থলে উমা যে তাকেই লক্ষ্য করে কথাগুলো বলেছে সেটা ও বুঝতে বিলম্ব হ'ল না।

সে একটু হেসে চুপ করে রইল।

সুষমা ও মিহির দু'জনেই উমার কথাটা লক্ষ্য করেছিল, মনে হ'ল মিহির যেন একটু খুশী হয়ে উঠল!

সুষমার বিরক্তি বোধ হ'ল, রমেশ সম্বন্ধে সুষমার মনে কোথায় যেন একটু দুর্বলতা ছিল।

উমার সঙ্গে বিবাহে আপত্তি তুলে ও ওকে আঘাত দিতে ইচ্ছা ক'রত না!

উমাকে ওর ভাল লাগেনা; রমেশকে ওর ভাল লাগে! তাই জগদ্ধাত্রী যখন উমার সম্বন্ধে কথাটা তুলেছিলেন, ওর পছন্দ হয়নি; যোগ্য অযোগ্যতার সমস্যা ওর কোন দিনই জাগেনি, সেটা মিহিরই তুলেছিল, ওটা ও মাঝে মাঝে জগদ্ধাত্রীর সম্মুখে বলেছে শুধু নিজের অনিচ্ছাটাকে সমর্থন করতে।

সুষমার কেমন মনে হয় রমেশ তারই "ঠাকুরপো" শুধু! উমার কথায় সুষমা রাগ করে উত্তর দিল—"দেশের উকিল, ডাক্তারদের ত তোর বিয়ে করবার দরকার নেই।"

—"না অন্ততঃ ইচ্ছা নেই।"—

রমেশ মাথা নীচু করে বাঁ হাতের তর্জনীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সাহায্যে কোলের উপর ঝরে পড়া চুরুটের ছাইগুলো ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে আবার একটু হাসল। উমা অকস্মাৎ উঠে বেরিয়ে গেল।

৬

কেমন করে কি হয়ে গেল!

রমেশ এসে বল্লে উমাকে সে চায়।

সুষমা কোন দিন এমন অসম্ভব ঘটনার আশা করেনি!

বল্লে—"সেত আমি জানি না, বাবাই জানেন।"

"—কিন্তু আপনার বাবাকে ত আপনি বলতে পারবেন।"

"—কি জানি ভাই ওসব আমার সাহস হয় না।"

উমাকে রাগ করে গিয়ে সুষমা জানালে—"কখন বাপের জন্মে জানি না!"

"—জান কি? নিঃশব্দে যত সব মুখোরোচক কাহিনী রচনা করে উপভোগ করতে!"

"—কি বলেছি কি শুনি! তখনি জানতাম।"

সুষমা রাগ করে চেঁচিয়ে উঠল।

"—তখন কিন্তু আমি জানতাম না; এখন জানি।"

অসহ্য! সুষমার রাগ চাপা রইল না—

"করনা কেন বয়ে গেছে।"

"—বয়ে যাবার কথা ত নয়।"

উমা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপভরে বল্লে—"ব্যস্ত হচ্ছ কেন সময় ত শেষ হয়ে যায়নি।"

সুষমা ও মিহিরের চেষ্টায় কথাটা রটতে বিলম্ব হ'ল না। দিকে দিকে লোকে বিস্ময়াতিশয্যে গালে হাত দিয়ে বল্লেন—"ওমা কি হবে!"

বেণীমাধব শুনলেন সবই; "সুষমা বল্লে—ও কিছুতেই হবে না বাবা, ও ছেলে এমন কি ভাল।"

বেণীমাধব বল্লেন—"সেত ঠিক কিন্তু—।"

"কিন্তু টিন্তু কিছু নেই।"

সুষমা রমেশকে জানালে—

"—না ভাই বাবার মত নেই।"

রমেশ চুপ করে রইল, অপমানের আঘাতটা সামলে নেবার জন্যে; শেষে উঠে পড়ে বল্লে—"কাজ আছে।"

"—আবার এস, আসবে ত? নইলে খুব রাগ করবো। উমার চেয়ে ঢের ভাল মেয়ে তুমি পাবে। কেন তুমি অন্যায় সইবে। মাথার দিব্যি রইল এস।"

রমেশ উত্তর দিল না; বেরিয়ে গেল।

উমার চেয়ে ভাল মেয়ে আছে হয়ত কিন্তু ভাল বলেত সে চায়নি!

দিন রাত্রি আবার আসে যায়!

সুষমার দিন কাটে না, রমেশকে সে আবার ডেকে পাঠায়।

বিকেল বেলায় ছাতে সভা বসেছিল, সন্ধ্যা বেলায় ভাঙবার মুখে উমা দাঁড়াল, রমেশ উঠছিল; উমা বল্লে—"দাঁড়ান আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

"—কাকে বলছ, আমাকে?"

রমেশ ফিরে দাঁড়াল—"কি?"

—"পরে বলব"।

সুষমা দাঁড়িয়েছিল, উমার নির্লজ্জতার স্পর্দ্ধা দেখে অবাক! কথাটা শুনবার কৌতূহল কম ছিল না, কিন্তু এর পর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

রাগ করে দুমদাম শব্দে নেমে গেল।

রমেশের কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, বল্লে—

"কোন কাজের কথা?"

"—আপনার পক্ষে না হতে পারে আমার পক্ষে তাই বটে!"

রমেশ একবার পূর্ণদৃষ্টিতে উমার দিকে চাইল; তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মৃদু আত্মগত ভাবে বল্লে—"আমার একটা কথা তুমি বিশ্বাস কর নিশ্চয়?"

—"বলুন।"

"—আমি তোমায় ভালবাসি; বিশ্বাস কর?"

—"না।"

"না!"

"—আশ্চর্য্য হবার কথা ত বলিনি! সবাইকার বিশ্বাস এক নয়।"

এবার রমেশ আবার ফিরে চাইল—"তোমার কথার মধ্যে আর কিছু না থাক জ্বালা আছে।"

"—তা থাকতে পরে, কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছিলাম এ বাড়ী আসা আপনি কবে বন্ধ করবেন?"

অপ্রত্যাশিত আঘাত!

রমেশ এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে—"আমি বুঝতে পারিনি।"

—এবার পেরেছেন অবশ্য।

উমা একটু সরে দাঁড়িয়ে রমেশকে যাবার জন্যে যেন পথ করে দিল।

রমেশ কিন্তু গেল না, চুপ করে কি ভাবতে লাগল।

হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে রমেশ বল্লে—"কিন্তু যদি কোন-দিন অধিকার নিয়ে ফিরে আসতে পারি!"

"—সে হয় না।"

"—কেন হয় না উমা? তুমি কি আজো আমাকে পরীক্ষা করছ?"

উমা মুখ ফিরিয়েছিল, মুখের ভাব তার বোঝা গেল না; অনেকক্ষণ প'রে সে কথা কইল—"ভিক্ষুকের জন্ম প্রেমের সৃষ্টি হয়নি; অন্ততঃ আমি সে ধরণের পুরুষকে স্বামীর যোগ্য মনে করি না!"

সুতীক্ষ্ণ আঘাতে রমেশের সমস্ত মুখখানা বিবর্ণ পাণ্ডাস হয়ে উঠল!

কতক্ষণ পরে আত্মস্থ হয়ে ঠোঁটের উপর একটুখানি হাসি টেনে বল্লে—"ভুলটা অনেক দিন পরে ভেঙেছে। ভাঙল যে এই যথেষ্ট! কেন না নিজেকে তুমি যতটা যোগ্য ভাব আমি হয়ত না,ও ভাবতে প'রি। ঝোঁকের মাথায় কোন কাজ না করাই উচিত।"

রমেশ দ্রুত পদে নেমে গেল।

(৭)

রমেশ আর আসে না।

বারকতক সুষমা ওকে ডেকে পাঠিয়ে ও কোন ফল পায়নি।

দিন কাটে না যেন ওদের!

ছুটি নারী উতলা হয়ে ওর পথপানে চেয়ে থাকে!

যে প্রিয়জনকে অপমানিত করিয়েও নিজস্ব করে রাখতে চায় সুষমার সেই প্রেমের অভিনব রূপ দেখে প্রচণ্ড ক্রোধেই উমা সেদিন রমেশকে ওরকম ভাবে বলেছিল, অসম্মানিত কথা! প্রেমকে ও ওর নিজ তেজে শুষ্ক শীর্ণ করে দিতে পারে তবুও সইতে পারে না লোকে তারই দিক হ'তে সুযোগ নিয়ে তাকে দলিত করে যাবে!

ওর অন্তরের নারী সেত শুধু রমেশকে ভালই বাসে না; সেযে শ্রদ্ধা ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে ওর অন্তর-দেবতার দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে!

সুষমা ভাবে যদি উমা না থাকত তা'হলে রমেশ-ঠাকুরপো শুধু তারই ঠাকুরপো হ'য়ে থাকত, ওরই জন্ম আজ ও রমেশকে হারাল।

আর উমা সেও ভাবে সুষমা যদি ওর জীবন-পথে না থাকত তাহ'লে বিধাতার কোন ক্ষতি হ'ত!

উভয়েই ওরা আপন দুর্ব্বল স্থানকে অবৃত করে শুধু কঠোর দৃষ্টিতে উভয়ের দিকে জলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ঝাঁঝটা মাঝে মাঝে প্রকাশ হয় সাংসারিক তুচ্ছ খুটি-নাটি ঝুড়ি চুপড়ী দিয়ে।

কুটনো কুট্‌তে কুট্‌তে সুষমা বলে—"দেখবো কোন সাহেবের বাড়ীতে বিয়ে হয়! সমস্ত দিন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বই পড়ে আর ইয়ার্কি দিয়ে দিন কাটবে!"

সাহেব সম্বন্ধে ওর ধারণা তারা উদয় থেকে অস্ত পর্য্যন্ত কেবল চেয়ারে হেলান দিয়ে বই পড়ে কিম্বা রসিকতা, গল্প গুজব করে দিন কাটিয়ে দেয়! তারা পিতার কন্যা নয়, স্বামীর স্ত্রী নয়, সন্তানের জননীও নয়। তারা যে মেম! কি জানি হবেও বা সাদা চামড়ার নীচে যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তার রং হয়ত সবুজ! ওরা যে মেম ওদের সবই ভিন্ন!

উমা চুপ করে বসেছিল জানলার উপর। কথাটা ওর কানে যায় ও সুধু একবার দালানের দিকে চেয়ে আত্মগত ভাবে বলে—

"না যদি কাটে তা হ'লে ত কথাই নেই; কিন্তু যদি বই পড়ে আর গায়ে হাওয়া লাগিয়ে দিন কাটানর মত ঘর আমার ভাগ্যে জোটে তা হ'লে সেদিন দিকে দিকে আত্মহত্যার ধুম পড়ে যাবে।"

—"আমি তোকে হিংসে করি; তোর ভাল দেখলে আমি আত্মহত্যা করবো—পোড়া কপাল আর কি! নিজের মেয়ের মত করে মানুষ করলাম আর তুই আজ কিনা এমন কথা বল্লি।"

মানুষ করাই বটে! মানুষের বাচ্ছাকে বাঁদর বাচ্ছায় পর্য্যবসিত করার কোন পথই নেই, নইলে আজকে সুষমা তার চেষ্টা করত হয়ত! উমা আস্তে আস্তে উঠে সে-খান থেকে চলে যেতে যেতে বলে—"হুঁ, তাত বটেই; মেয়ের মত করে মানুষ করেছ! মা যেটুকু কেলে

আমায় গিয়েছিলেন তাতে গলা শুকিয়েই মরে যাওয়ার কথা; ভাগ্যিস তোমার মত দিদি ছিল তাই রক্ষে।"

এমনি করেই ওদের জীবন প্রবাহ বয়ে চলে। দুপুর বেলায় সুরমা এসে উমাকে আবিষ্কার করল ছাতের ওপর, রোদে একখানা তোষক শুকচ্ছিল তারই আড়ালে সতরঞ্চি পেতে উমা চুপ করে শুয়ে ছিল। সুরমা পাশে বসে পড়ল—"আজ কাল তোর কি হয়েছে রে? কাল এসে খুঁজে পেলাম না। আজ কত কষ্টে খুঁজে বার করলাম, আর ওবাড়ীতে ও যাসনে! আজ বৌদি বলে দিলেন, তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে, সেই সেলাইটা দেখিয়ে দিবি বলেছিলি, চল দেখিয়ে দিতে।"

উমা সুরমার সঙ্গে ওদের বাড়ী গেল।

সুরমার বৌদিকে সেলাই দেখিয়ে দিয়ে, কিছুক্ষণ বসে গল্প করে, পরে সুরমা বললে—"চল পান কটা সেজে রেখে আসি।"

দু'জনে উঠে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ ওপাশের ঘর থেকে কে গলা কাঁপিয়ে "মানস সুন্দরী'র আবৃত্তি আরম্ভ করে দিল। উমার হাসি আসছিল, তবু যথা সম্ভব গাম্ভীর্য্য রেখে সে শুধু সুরমার দিকে চেয়ে বললে—"কে ভাই?"

সুরমা হেসে উঠল, পরে চাপা কণ্ঠে বললে—"জানিস নে? আর জানবি ই বা কি করে আজকাল ত আর আসিস নে। উনি বৌদির জ্যাঠতুত ভাই, ক'দিন হ'ল এসেছেন নামটি কি জানিস? মলয়।"

এবার উমা হেসে উঠল—"বাঃ বেশ নামটি ত।"

—"আলাপ করবি; চল আলাপ করিয়ে দিই। তা আলাপ খুব করতে পারেন, শুধু মেয়েদের সঙ্গে কথা কইতে গেলেই ওর মুখ খানা একটু বিশেষ রকম নারী নারী, হয়ে ওঠে।"

উমা বললে—"না ভাই কাজ নেই আলাপ করে, আলাপ করতে গিয়ে শেষে ওর নারী নারী মুখ দেখে যদি আমার আমার মুখ খানা পুরুষ পুরুষ হয়ে ওঠে, তা হ'লেই ত মহা বিভ্রাট।"

দু'জনেই হেসে উঠল।

আলাপ করতে হ'লনা, ওদের হাসির শব্দ শুনে মলয় বেরিয়ে এল।

উমা ভাল করে ওর আপাদ মস্তক দেখে পরে মুখ নীচু করে গম্ভীর ভাবে পান সাজতে লাগল। মলয় অপরিচিতা উমাকে দেখে, সেই খানেই থমকে দাঁড়াল পরে সুরমার দিকে অকারণ করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে, আবার ঘরে ঢুকে পড়ল। এবং কিছুক্ষণ পুনরায় নিস্তব্ধতার পরই ঘোরতর রবে 'চিত্রাঙ্গদা'র—আমি সেই মনসিজে—র সশব্দ ঘোষণা প্রায় পাঠ শোনা গেল।

এবার উমা একটু হাসলে

—"কবি বুঝি?"

সুরমা ও হাসলে, বললে—

—"বিষম।"

বৌদি এসে দাঁড়ালেন—

—"কি গো কিসের এত গল্প হ'চ্ছে? আমাকেও ভাগ দেবে নাকি?"

উমা হাসি মুখে বললে—"সচ্ছন্দে।"

বৌদি বসে পড়লেন।

একথা সেকথা নানা রকম গল্প চলে। উমা উঠে পড়ল—"এবার যাওয়া যাক্। কি বলিস?"

—"কাল আবার আসিস্। তোর ত আজ কাল টিকির সন্ধান পাওয়া যায় না।"

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, হাতে কোন কাজ নেই, মনটাও কিরকম অকারণেই উদাস হয়ে উঠছিল; সুরমা এসে ঘরে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়াল। রাস্তা দিয়ে জনস্রোত বয়ে চলেছে, উদাস অন্তর শুধু স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে।

গভীর ক্লান্তিতে মন ছেয়ে আসে।

মনের মাঝে গত জীবনের স্মৃতিগুলি ছায়াচিত্রের মত ভেসে ভেসে ওঠে।

আনন্দের মূর্ত্তরূপে ছোট্ট একখানি গৃহ যেন স্বপ্নের মত মনে হয়!

সুরমা চুপ করে চেয়ে থাকে দূরে—দূরে—! গোপন অন্তরের মন্দিরে একদিন যে কল্যাণী বধূ সলজ্জ সালক্তক চরণে নুপূরের গুঞ্জন তুলেছিল মনে হয় তার চির বিসর্জ্জনের দিনে কোন ভুলে সে তার চরণের রাঙা আলপনা ওর মর্ম্ম আঙিনায় এঁকে রেখে গেল।

মন কেবলি ফিরে ফিরে সেই দিকেই চায়! চোখে জল আসে না!

শুধু স্তব্ধ ভাবে বিস্মিত অন্তর প্রশ্ন করে সেকি আমি?

হঠাৎ কার পদশব্দে সুরমা ফিরে চায়। মলয় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললে—"আমি একখানা বই নেব, মৃণাল বললে এই ঘরেই আছে।"

মৃণাল সুরমার বৌদি।

—"কি বই?"

প্রশ্ন করে সুরমা বইয়ের আলমারিটা খুলে দিল। মলয় এগিয়ে এসে খোলা আলমারির সম্মুখে দাঁড়িয়ে সুসজ্জিত শ্রেণী বদ্ধ বই গুলি একে একে দেখে দেখে রাখতে রাখতে বললে—"আপনি বুঝি খুব পড়েন?"

সুরমা অল্প হাসলে, বললে—

—"খুব! তাত জানি না।"

—"জানেন না মানে?"

মলয় বই দেখা স্থগিত রেখে ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

সুরমা মলয়ের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে বললে—

—"আপনি কি বই খুঁজছেন?

—"বিশেষ করে ত খুঁজছিনা, এমনি দেখছি যদি কিছু পড়ার মত পাই।"

কিন্তু খুঁজে পেতে ওর এত দেরী হতে লাগল যে সুরমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েই শেষে হতাশ হয়ে বললে—আপনি তবে খুঁজে দেখুন, আমি যাই ছেলেদের খাওয়ার সময় হয়ে এল। ওরা এখনি হৈ হৈ বাধিয়ে দেবে—।"

সুরমা চলে গেল, এবং এর পর মলয়ের ও বই খোঁজার উৎসাহ বিশেষ প্রকাশ পেল না। এটা ওটা নেড়ে ও শুধু হাতেই ফিরে গিয়ে সুর করে "মেঘনাদ বধকাব্য" পড়তে আরম্ভ করে দিলে।

ক্রমশঃ

শেষ প্রশ্ন

শ্রীবিমল মিত্র

চারি ধারে হায় রাত্রি ঘণায় ঝঞ্ঝা দুর্নিবার
পথিক শুধায় আর কতদূর, কতদূর ওগো আর?
চোখে আলো তা'র নাহি যে
পথ তবু একা বাহিছে,
পথ জনহীন সঙ্গীবিহীন সাথে নাই কেহ তা'র।
একেলা পথিক হারায়েছে দিক, বহেনাক' দেহভার

ওগো ও পথিক যা' বলেছ ঠিক, 'কতদূর কতদূর?
তোমারি মতন কতশত জন শুধায় বেদনাতুর।
যুগ-যুগান্ত বহুদিন
কেটেছে তো কত সীমাহীন—
আজো তবু তা'র করিতে কিনার পারে নাই কোন জনা,
নর-মানুষের শেষ প্রশ্নের উত্তর মিলিল না।

উত্তর নাই তবু তাহা চাই, তা'র কি বিরাম আছে!
বাধাহীন স্রোতে বনে পর্ব্বতে ছুটিছে তাহারি পাছে!
সম্মুখে যদিবা চলে কেউ,
আসে বিফলতা ভরা ঢেউ!

আলোর আলেয়া তা'র পিছে ধাওয়া—এমনি সে নিশিদিন
ধর-পিপাসার নাহিক নিবার—ভগবান উদাসীন।
ওগো ও পথিক এই হোল ঠিক-এমনি করেই চলো
গানে দিয়া সুর—"কোথা কতদূর" বার বার এই বলো!

পথের দু'পাশে যাহা পাও
লোভীর মতন লুটি নাও—
সঞ্চয় যার আছে ভারে-ভার সেই তো বাঁচিবে ভবে।
নর-মানুষের শেষ হবে ঢের—প্রশ্ন একই রবে।

ভারতবর্ষের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত মৃণাল দেবীর "কতদূর" কবিতা পাঠ করিয়া লিখিত।

নারী সম্বন্ধে

শ্রীবিমলা দেবী

কার্ত্তিকের পুষ্পপাত্রে এযুগের ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা মহিলা, দেশ এবং বিদেশ পরিচিতা শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর "নারী জীবনের আদর্শ" ও সেই সঙ্গে সম্পদকীয় মন্তব্যে আধুনিক নারীদের ঐ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ পড়লুম।

মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের দেশে—বাংলা ভাষায়—সপক্ষে ও বিপক্ষে এপর্য্যন্ত এত—চিন্তা নয়—গালাগালির সৃষ্টি হয়েছে যা একত্রিত করলে একটি ছোট খাট কিন্তু অভিনব লাইব্রেরীর সৃষ্টি হ'তে পারে!

মেয়েদের শিক্ষা, কর্ত্তব্য, উপযুক্ততা—অনুপযুক্ততা, অধিকার, অনধিকার, রাশি রাশি কথার সমষ্টি আকাশ ছাপিয়ে উঠেছে—এবং সপক্ষ বিপক্ষ দুই দলে বেশ একটী কলহের আভাসও ফুটে উঠেছে—তাতে আর কোন লাভ না হোক খানিক সময় কাটে। বেশ উত্তেজিত অবস্থায়!

কিন্তু এ সম্বন্ধে ধীর ভাবে ভাবেন ক'জন? পুরুষ এবং নারী, একটী সম্পূর্ণ জীবন। পূর্ণরূপ। দুটি পরস্পর বিরোধী যুদ্ধার্থী সৈনিকের সম্বন্ধ নয় এবং প্রভু-ভৃত্যের ও নয় তাই সংসারে সমাজে নারীর সৈনিক মূর্ত্তি ও যেমন ব্যর্থ,দাসী মূর্ত্তি ও তেমনি কুৎসিৎ—ওদুটোই ব্যাধি, সহজ স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।

ইতিপূর্ব্বে—বেশ অনেক দিন পূর্ব্বে—সাপ্তাহিক দুন্দুভির লেখিকা শ্রীযুক্তা বনফুলের নারী সম্বন্ধে লেখা পড়ে যে কথা মনে হয়েছিল, আজকাল দিনের পর দিন দৈনিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত বলাই দেবশর্ম্মার আধুনিক নারী মন্তব্য পড়ে ও ঠিক সেই কথাই মনে হয়।

ব্যক্তিগত আলোচনা সমষ্টি গত ভাবে করতে নেই। করলে তাতে চিন্তা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না—তা ছাড়া সমষ্টিতে তার মূল্যই নেই। শ্রীযুক্তা বনফুল, তাঁর বাস-সঙ্গী যে যুবকের নিষ্পলক চাউনি নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন এবং সেই সূত্রে সমস্ত যুবকদের চরিত্র সম্বন্ধে যে তীব্র তিক্ত কটাক্ষ করেছিলেন—সেটা একেবারে মূল্য হীন, কারণ কোন যুবক হয়ত আধুনিক কোন তরুণীর মধ্যে, লেখক শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর লিখিত তর্পণা অপর্ণাদের আবিষ্কার করে পুলকিত হ'তে পারেন, এবং সেইটাই আধুনিক নারীরূপ বলে প্রচার করে কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের মত আনন্দ লাভ করতে পারেন! কিন্তু তাতে জাগতিক লাভ নেই। আনন্দ! সেও নিতান্তই ব্যক্তিগত!

তেমনি যদি সহ্য করতে পারেন—সত্যকে—রুদ্র সত্যকে—তবে শ্রীযুক্ত বলাইদেব শর্ম্মা সেই নির্ম্মল, শান্ত, পবিত্র পল্লীগ্রামে অপ্রগতি প্রাপ্তা স্বামী পুত্রের, পিতা ভ্রাতার নিত্য মঙ্গলময়ী গোময় ঘটি সমার্জ্জনী ধৃতা কল্যাণী আদর্শ ভ্রাতৃযায়ার অঞ্চল বন্ধনে দু একটী আধুনিক লেখক নয়—তরুণ সাহিত্যিকও নয়—অনেক অতরুণ, অসাহিত্যিক এবং অপ্রগতি দেবরের আবিষ্কার করতে পারবেন!

চরিত্রকে চরিত্রের জন্য, কল্যাণকে কল্যাণের জন্য, আনন্দ পবিত্র সত্য সবই যদি লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করে দিনগত পাপক্ষয় করার জন্য না হ'য়ে জীবনের উচ্চতার বিকাশের জন্য হয় তবে রঙ্গমঞ্চে নৃত্যাকুলা তরুণীই হোন কি পুকুর পাড়ের পোড়া কড়ার ঔজ্জ্বল্য সাধনরতা অবগুণ্ঠিতা কুল বধূই হোন দুইই সমান ওতে কিছু যায় আসে না। আসল কথা হ'চ্ছে একদিক থেকে যারা ভাবেন, এবং বলেন তাঁদের বলার কোন মূল্য নেই। হরিজন আন্দোলন, হুমায়ুন কবির ও শান্তি দাসের বিবাহ, দেবীদাস লক্ষ্মীবাঈয়ের বিবাহ, কোন তরুণীর রঙ্গমঞ্চে নৃত্য নিয়ে শ্রীযুক্ত দেবশর্ম্মাকে তরবারী হস্তে অনেকবার দেখা গেছে, কিন্তু সম্ভবতঃ বড় বড় হেডিং শোভিত সাবিত্রী রাণীর মামলা বিবরণী তাঁর চোখে পড়ে না। মামলাটি বিচারাধীন সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা চলে না—

আমরা শুধু মামলাটির দিকে শ্রীযুক্ত দেবশর্ম্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, মামলার যবনিকাপাতের পর যেন তাঁকে দেখা যায়। কারণ যে পক্ষই দোষী হ'ক, কোন পক্ষই প্রগতি প্রাপ্ত ন'ন—এবং ব্যাপারটি যেদিক থেকেই বিচার করা যাক, যেই দোষী হ'ক যাকেই দোষী বলে ধরে বিচার করা হোক মামলাটির বীভৎসতার তা'তে বিন্দুমাত্র কম হ'বে না!

একদিক থেকে ভাবলে বিচার চলেনা—কলহ চলে।

স্বাধীনতা—শুধু কি স্ত্রীর! স্ত্রী—পুরুষ, জাতি, ধর্ম্ম, দেশ নির্ব্বিশেষে ও হ'চ্ছে জন্মগত অধিকার। শ্রীযুক্ত দেবশর্ম্মা এবং তাঁর ভাবের ভাবুকরা সম্ভবতঃ শিক্ষিতা এবং আধুনিক নারী সম্বন্ধে কাগজে কলমেই যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন, বোধ হয় তাঁরা কোন সুশিক্ষিতা নারীকে নাগরা শোভিত চরণে পথের উপর দূর থেকে দেখেছেন, এবং সম্ভবতঃ তাঁরা তাঁদের অন্দরের গৃহের জীবন যাত্রা দেখেননি শোনেন ও নি। এবং যদি ও সেই জন্যই শিক্ষিতা মহিলার—নিতান্তই স্বামী পুত্রেরই জন্য যেমন পল্লীবধূরা আদর্শ ভারতনারীরা স্বহস্তে রন্ধন করেন—তেমনি এই অনাদর্শ আত্মঘাতিনী নারীরাও রন্ধন করে থাকেন। এই অবিশ্বাস্য খবর শুনলে তাঁরা বিস্মিত হ'তে পারেন! কিন্তু চেষ্টা করলে তাঁরা এ সত্যের দেখা পাবেন। কিন্তু আমরা বলেছি, স্বাধীনতা হচ্ছে স্ত্রী পুরুষ জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে জন্মগত অধিকার। সে স্বাধীনতা টি কি? সন্দেশ নয়ই, কাজেই বাজারেপাওয়া যায় না! স্বাধীনতা—অন্তরের এবং বাহিরের ও সহজাত এবং স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, বিকাশ। যাঁরা বলেন স্বাধীনতা শব্দ সাংসারিক শান্তির পরিপন্থি তাঁরা স্বাধীনতার অর্থ করেন স্বেচ্ছা চারিতা এবং স্বেচ্ছা চারিতা আধুনিকই হোক কি প্রাগৈতিহাসিক যুগেরই হোক স্ত্রী-ই হোক কি পুরুষই হোক এবং ঘরে বাইরে যেখানেই দেখা দিক অশান্তি, কোলাহল, আন্দোলন, আনবেই সন্দেহ নেই। কারণ যে কোন অসংযমের স্বেচ্ছাচারের মূল্য দিতেই হয় তা সামাজিকই হোক কি প্রাকৃতিকই হোক। কিন্তু টেনেবুনে অর্থ যাই করা হোক স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছা চারিতা এক নয়। স্বাধীন দেশ মানে, অরাজক দেশ নয়। তেমনি স্বাধীন নারী মানে বুট বনেট শোভিতা পথে ঘাটে বক্তৃতা পরায়ণা, হোটেলে, হষ্টেলে, যেখানে যখন ইচ্ছা ঘোড়দৌড় করা নয়! এবং স্বাধীন এবং শিক্ষিতা নারীরা স্বামীর পাতে আহারের সময় ব্যঞ্জনের পরিবর্ত্তে টলষ্টয়ের এনাকারনিনা কি হ্যাভ্‌লক এলিসের সেক্স্ সাইকলজি পরিবেশন করবেন এমন আশঙ্কা না করলেও চলবে!

টেবিল, চেয়ার, ফুলদানী সাজান নিয়ে যে গৃহে অশান্তি হয় সেটা স্বাধীনতার দোষ নয়, সে হচ্ছে জীবের কলহ পরায়ণতার প্রবৃত্তি, সে বিশুদ্ধ ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, এবং সরল বাংলা গ্রাম্য ভাষাতেও চলে।

স্বাধীনতার যিনি অর্থাগম করতে পারবেন, তিনি নিজের স্বাধীন মতকে যতখানি ভাল বাসবেন অপরের স্বাধীন মতকে ঠিক সেই পরিমাণেই শ্রদ্ধা ও করবেন সুতরাং এক্ষেত্রে সহজ শ্রদ্ধাশীল সামঞ্জস্য থাকবেই, কিন্তু সে যাঁর বুদ্ধির অতীত হ'বে, তিনি স্বাধীনতার আদ্য অক্ষর না জানলে ও বেশ সুচারুরূপে অশান্তির সৃষ্টি করতে পারবেন তা বিশুদ্ধ ইংরাজীতেই হোক কি বিশুদ্ধ গ্রাম্য সরল বাংলাতেই হোক!

কিন্তু আমরা বলছিলুম পুষ্পপাত্রের শ্রীযুক্তা নাইডুর বক্তৃতাংশের ও সম্পাদকীয় মন্তব্যের কথা। শ্রীযুক্তা নাইডু নারী সম্বন্ধে বলেছেন নারীর সবচেয়ে বড় আদর্শ হ'ল জননী এবং জায়া। এবং সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্তা-নাইডুর এই কথাগুলির দিকে আধুনিক মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, শ্রীযুক্তা নাইডুর এই কথাগুলি সর্ব্বক্ষণ মনে রাখলে সংসার সুখের হ'বে। সুখের হ'বে সন্দেহ নেই; কিন্তু কথা হচ্ছে, এই আদর্শের কথা নারী ভুলেছে কিনা। আমরা বলব ভোলেনি, দু-একজন যদি ভুলেই থাকেন সে নিতান্তই ব্যক্তিগত। এবং যাঁরা খবর রাখেন তাঁরা জানেন, পৃথিবীতে পুরুষ ভাবাপন্ন নারী—এবং নারী ভাবাপন্ন পুরুষ—স্বাধীনতা শব্দের প্রাচুর্য্যে নয়—স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বিকৃতিতে যুগে যুগে দৃষ্টি গোচর হয়েছে। সুতরাং ঐ ধরণের নারী: ইংরাজীই বলুন কি ল্যাটীন, বাংলা, সংস্কৃত যাই বলুন সমষ্টির আলোচনায় তাঁদের ধরা চলে না—তাঁরা ত প্রকৃতির বিকৃত পরিত্যক্ত সন্তান।

কিন্তু বাকী দেশ ভরে যাঁরা রইলেন তাঁরা? তাঁরা নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন। প্রগতি প্রাপ্তাদের কথা ছেড়েই দিই—অপ্রগতি-প্রাপ্তা যাঁরা তাঁরা ত নারীর জায়া জননীর আদর্শ মনেই রাখেন। কিন্তু তবু সেই সমস্ত একান্ত অখ্যাত প্রগতিহীন সংসারে দুঃখের অভাব হয় না, অভাব নেই!—কল্পিত দুঃখ নয় শ্রীযুক্ত দেবশর্ম্মা ও সেই ভাবের ভাবুকদের—সিনেমায় কল্পিত দেখতে না পাওয়ার মর্ম্মাঘাতি দুঃখ নয়, সমস্ত জীবন ব্যাপি মুষ্টি—অন্নের সঙ্গে প্রচুর লাঞ্ছনার পীড়নের মূক ইতিহাস। তাঁরা আজীবন জায়ার আদর্শ জপ করেন কিন্তু স্বামীকে পান সংসারের ভাত কাপড়ের কর্ণধার রূপে—সঙ্গীরূপে—সহকর্ম্মী, সহধর্ম্মী রূপে নয়। এবং পুত্র ততদিনই তাঁদের কোলে থাকে যতদিন সে হাঁটতে না শেখে! কারণ শ্রীযুক্ত দেবশর্ম্মার বর্ণিত শেতলষষ্ঠিতে পুত্র মায়ের অন্তরের স্নেহের যতই নিদর্শন থাকে, জীবন যাত্রার পথে—পৃথিবীর বিস্তৃত পথে সে নিদর্শন কাজে লাগে না। শ্রীযুক্ত দেবশর্ম্মাও বাংলার মেয়েদের জগদ্ধাত্রী মায়ের রূপে বর্ণনা, কল্পনা, প্রার্থনা করে সম্মানিত করেছেন, কিন্তু প্রশ্ন জাগে দেহ ধারিণী জগদ্ধাত্রী মা আছেন কোথায়? পল্লীগ্রামে! ঘরে ঘরে! আমরা ত দেখি চারিদিকে শাশুড়ীর নিত্য পীড়ন লাঞ্ছনার মাঝখানে দীর্ঘ অবগুণ্ঠন ভূষিতা সজল আঁখি, অদৃষ্ট ধিক্কার কারিণী মায়ের দল—পুত্রের—সন্তানের কল্যাণে শেতল ষষ্ঠি ও হরির লুঠ করা ছাড়া তাঁদের আর কোন ক্ষমতাই চোখে পড়ে না! জগদ্ধাত্রী মা আবির্ভূতা হ'বেন! কোথা থেকে? শ্বশ্রূগৃহে বাপ পিতামহের ডোমত্ব প্রাপ্তির ইতিহাস শুনতে শুনতে, ছাই মাখা হাতের উল্টো পিঠে সতর্ক দু'ফোঁটা চোখের জল মুছে যাঁরা পুত্রের কাঁথা সেলাই করে এবং ভবিষ্যতে শ্বশ্রূপদ প্রাপ্তির পরম গৌরবময় সম্ভাবনার আশায় দিন গুণছেন তাদের মধ্যে থেকে। আসল কথা হ'চ্ছে, প্রগতিশীলদের সতর্ক করার চেয়ে, অপ্রগতিদের সংস্কার করা প্রয়োজন, কারণ জীবনে সর্ব্বপ্রথম স্বাধীনতার আস্বাদে যদি কেউ বিভ্রান্ত হ'ন কালে তাঁরা সামলে যাবেনই। শোনা যায় কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে সর্ব্বপ্রথম যখন বাঙালী ছাত্র পোষ্টমর্টম করেন তখন তোপ পড়েছিল। আজ সেই কলিকাতাতেই ছেলের পর ছেলে সসম্মানে ডাক্তারী পাশ করে কড়িকাঠ গোণেন—কেই বা তাঁদের খোঁজ রাখে। সুতরাং কোন এম-এ পাশ নারী যদি আজ অতিরিক্ত ইংরাজী বলেন তাতে চটবার ত কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। মেয়েদের শিক্ষা, স্বাধীনতা সহজ হ'লেই তাঁদের ব্যবহার আচার আপনি সহজ স্বাভাবিক হ'য়ে আসবে।

আজ যদিই দু'একজন জায়া জননীর আদর্শ ভুলে থাকেন—চিরদিন ভুলে থাকবেন না, অনেকক্ষণ বদ্ধ গৃহে বসে থাকলে বাইরের উজ্জ্বল আলোক কিছুক্ষণের জন্যে চোখে ধাঁধাঁ সৃষ্টি করেই কিন্তু সেটা চিরন্তন দৃষ্টিহীনতা নয়—চশমার দরকার হয় না, আপনিই সেরে যায়।

জীবনে সুস্থ, সহজ, স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকতে হ'লে আলো বাতাসে দাঁড়াতেই হ'বে।

আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য পল্লীর গোময় লিপ্ত অঙ্গণ আঁকড়ে থাকা—তিব্বতীয় লামাদের ভগবান প্রাপ্তির জন্য অন্ধকার ফুটোহীন মৃত্তিকা সমাধির সাধনার কথা স্মরণ করায়! তাঁরা বর্ষের পর বর্ষ সেই সমাধির তলে জীর্ণ-বস্ত্রে শীর্ণ-দেহে, একটা অস্বাভাবিক আবেষ্টনে অথচ আশ্চর্য্য মানসিক শক্তিতে, বিভীষিকাময়ী শূন্য অন্ধকারে যে দেবতাকে পান, সহস্র সহস্র যাত্রী, পান্থ শিষ্য সমাকুল উন্মুক্ত কালিকা মন্দিরের একনিষ্ঠ সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংস কি তাঁকেই পান নি?

সুতরাং ভারতের আদর্শকে, সত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে পল্লীর গোময় লিপ্ত অঙ্গনে, এবং সম্মার্জ্জনী ও গোময় জল ভাণ্ড ধৃতা পল্লীনারীকেই প্রয়োজন একথার মূল্য কতটুকু!

আজকের, ভারতের বিখ্যাতা আদর্শ মহিলা শ্রীযুক্তা নাইডু গোময় জল ভাণ্ড, হস্তে প্রভাতে সম্মার্জ্জনীর সাহায্যে গৃহকে পবিত্র করেন না, বরং তাঁর সাংসারিক আবেষ্টন পল্লী গ্রামের প্রতিকূলই বলা চলে, কিন্তু জননী ও জায়ার আদর্শে, তিনি সাহিত্য, রাজনীতি ছাড়িয়েও কোন অংশে সেই সম্মার্জ্জনী ধৃতাদের চেয়ে নিকৃষ্ট নন, উৎকৃষ্টই।

মেয়েদের সম্বন্ধে বলবার, আলোচনা করবার সময় এসেছে—কিন্তু যুদ্ধার্থী সৈনিকের মত নয়—দেউলে প্রত্যুষ মত ও নয়। স্বাভাবিক সহজ সত্যের মধ্যে তাঁরা দাঁড়ান সেইটাই প্রয়োজন।

মেয়েদের সম্বন্ধে সহজ স্বাভাবিক আলোচনার ইচ্ছা রইল—যদি ঘটে ওঠে।

উমা

শ্রীকনকলতা ঘোষ

পেন্সন প্রাপ্ত সদরআলা হরিশবাবু সপরিবারে পুরীধামে বেড়াইতে আসিয়াছেন; সমুদ্র কূলে একখানি সুবৃহৎ বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন ছয়মাসের জন্য।

বাড়ীতে লোকজন অনেক, কর্ত্তা গৃহিণী দুইছেলে দুই বউ দুটি মেয়ে একটী বিধবা কন্যা ও ছোট ছোট নাতি নাত্নি কয়েকটী আর দাসী চাকর। ছেলেদের ছুটি দুই মাসের বেশী নাই তাহারা ছুটি ফুরাইলে কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাইবে। কর্ত্তা সপরিবারে এখানে ছয় মাস থাকিতে মনস্থ করিয়া আসিয়াছেন। তাহার কারণও আছে।

স্বচ্ছল সংসার লোকজন অর্থ কিছুর অভাব নাই দেখিলে বেশ সুখী পরিবার বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কাহারও মনে সুখ নাই সকলেই যেন বিমর্ষ ম্রিয়মাণ,তাহার কারণ জানিতে অবশ্য বিলম্ব হয় না। হরিশ বাবুর দ্বাবিংশ বর্ষীয়া আদরের কন্যা উমা প্রায় ছয় সাত মাস পূর্ব্বে বিধবা হইয়াছে। যথেষ্ট ব্যয় করিয়া উপযুক্ত পাত্রের হাতেই পিতা সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যাকে, বৎসর পূর্ব্বে দান করিয়াছিলেন। বেশ শান্তিতেই তাঁহাদের সংসার চলিতেছিল কিন্তু মানুষের ভাগ্য---বিধাতার তাঁহা সহ্য হইল না। বিবাহের পর সাত বৎসর পূর্ণ না হইতেই নিষ্ঠুর কাল সহসা মাত্র পনের ষোল দিনের অসুখে শয্যাশায়ী করিয়া জামাতা বিশ্বনাথকে হরণ করিয়া লইয়া হরিশ বাবুর সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দিল।

বৃদ্ধ বয়সে এই নিদারুণ আঘাত পাইয়া কর্ত্তা গৃহিণী শোকে মূহ্যমান হইয়া পড়িলেন, উমা গভীর ব্যথায় বাণাহতা হরিণীর ন্যায় একেবারে লুটাইয়া পড়িল।

কিছু দিন অতিবাহিত হইলে হরিশ বাবু ও তাঁহার পত্নী কন্যার মুখ চাহিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। উমার ভ্রাতারা তাহাকে শ্বশুরবাটি হইতে লইয়া আসিল তাহাকে দেখিয়া সকলে অত্যন্ত দুঃখে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন। এই কি তাঁহাদের সেই আদরের উমা মাত্র তিন চার মাস পূর্ব্বে যে ছিল হাস্য মুখরা চঞ্চল, সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া যার সৌন্দর্য্য ও আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যাইত, সেই উমাকে আজ আর দেখিয়া চিনিবার উপায় নাই! শীর্ণ দেহ গম্ভীর স্তব্ধ প্রকৃতি, পাঁচটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে একটা উত্তর দিয়া সরিতে পারিলে বাঁচে। দেহের সেই পূর্ব্ব লাবণ্যের চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট আছে, স্বভাবের সে কৌতুকপ্রিয়তা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এই অল্প বয়সে কোন পাপে কাহার অভিশাপে তাহার এই পরিবর্ত্তন হইল ইহাই ভাবিয়া কর্ত্তা গৃহিণী উচ্ছ্বাসিত অশ্রু গোপন করিয়া কন্যাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন, ভ্রাতারা চোখ মুছিলেন ভ্রাতৃজায়ারা কাঁদিয়া আকুল হইল। উমা যে তাঁহাদের সকলের বড় আদরের, তাহার মত শান্ত লক্ষ্মীমেয়ের কপালে একি দুর্ভোগ বিধাতা লিখিয়াছিলেন? উমার চোখের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল কিন্তু তাহার কণ্ঠ হইতে একটুও স্বর বাহির হইলনা।

২

উমার পিত্রালয়ে আসিবার পর প্রায় তিনমাস গত হইয়া গেল তথাপি তাহার শরীর বা মনের কোনো উন্নতি দেখা গেলনা। দিন দিন সে যেন আরো কৃশ ও নির্ব্বাক হইয়া যাইতেছে। বিশেষ আবশ্যক না হইলে সে কোন কথাই বলে না চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকে যাহা কাজ পায় নীরবে সম্পন্ন করে। পিতামাতা তাহার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। যদি স্থান পরিবর্ত্তনে ও ঠাকুর দেবতা এবং সমুদ্র দেখিয়া উমার মনের একটু স্ফূর্ত্তি ও স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়, এই ভাবিয়া তাঁহারা পুরী ভ্রমণে বহির্গত হওয়ার সিদ্ধান্ত করিলেন। হরিশ বাবুর অর্থবল আছে লোকজনের ও অভাব নেই, সুতরাং চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল না।

যথাসময়ে পুরানো বিশ্বাসী সরকারের উপর কলি-

কাতার বাড়ী ঘর ইত্যাদি দেখা শুনার ভার দিয়া তিনি সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া সপরিবার পুরীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কয়েকদিন অতিবাহিত হইল, নূতন জায়গায় আসিয়া কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় ও বেড়াইতে যাওয়া ঠাকুর দেখিতে আরতি দেখিতে মন্দিরে যাওয়া সমুদ্রে স্নান ইত্যাদি নানাপ্রকার আনন্দ উৎসবের মধ্যে আসিয়া সত্যই উমার একটু স্ফূর্ত্তির ভাব দেখা গেল, প্রথম প্রথম সে বড় বাহির হইতে চাহিত না কিন্তু সকলের অনুরোধে পড়িয়া ও পিতামাতার আগ্রহ দেখিয়া প্রত্যহই তাহাকে বেড়াইতে বা ঠাকুর দেখিতে ও সমুদ্র স্নান করিতে বাহির হইতে হইত। মাসখানেক থাকিবার পর তাহার স্বাস্থ্যের ও একটু উন্নতি দেখা গেল, পিতামাতার প্রাণে একটু সান্ত্বনা আসিল। কিন্তু আরও কিছুদিন গত হইলে পর আবার উমার সেই বিষণ্ন অবসাদ-গ্রস্তভাব ফিরিয়া আসিল। এখন সে তাড়াতাড়ি কাজ-সারিয়া প্রত্যহ বিকাল হইতে একলা যাইয়া চুপ করিয়া সমুদ্রের ধারে বসিয়া থাকে কেহ ডাকিলে উঠিতে চাহে না, বলে তোমরা বেড়াওনা আমি একটু এইখানে বসি।

সমুদ্রের অশান্ত ভাবতরঙ্গের সহিত বুঝি তাহার অন্তরের বর্ত্তমান অবস্থার গভীর সাদৃশ্য আছে, তাই সমুদ্রকে তাহার এত ভাল লাগে? ইহাই ভবিয়া আর কেহ বেশী কিছু বলিতে পারেন না।

ক্রমে রাত্রি বাড়িয়া যায়, কোনো দিন পিতা আসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া বলেন, উমা বাড়ী চল, রাত হয়ে গেল যে মা। উমা সদ্য নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চকিত হইয়া—এই যে যাই বাবা বলিয়া ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়ায়।

কোনদিন ভ্রাতারা কেহ আসিয়া সস্নেহ কণ্ঠে ডাকেন উমা রাত অনেক হয়েছে বোন বাড়ী আয় মা ভাবছেন। উমা লজ্জিত হইয়া বলে—হ্যাঁ দাদা যাই।

৩

এমনি করিয়া আরো কিছুদিন গেল। উমার দাদা-দের ছুটী ফুরাইয়া আসিল, তাঁহারা ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গৃহিণী কন্যার উদাসীনভাব লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তাকে বলিলেন, চলনা আমরা সকলেই যাই যার জন্যে আসা তারতো কোনো পরিবর্ত্তন দেখতে পাচ্ছিনা বরং দিন দিন সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থেকে থেকে যেন আরও গম্ভীর উদাসমনা হয়ে যাচ্ছে, সন্ধ্যে থেকে বসে বসে কেবল ভাবে বেড়ায় না গল্প করেনা এতে আর কি শরীর সারবে না মন ভাল হবে। চল বাড়ী চলে যাই যা বরাতে আছে তাই হবে। কর্ত্তা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন তবে তাই চলো। আচ্ছা আমার কাছে একবার উমাকে ডেকে দাও তার কি ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করে যা হয় করব।

গৃহিণী উঠিয়া গিয়া উমাকে ডাকিয়া দিলেন। উমা আসিয়া বলিল, আমাকে ডেকেছ বাবা?

পিতা আরাম কেদারায় শুইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বোধহয় কন্যার অদৃষ্টের কথাই ভাবিতেছিলেন, কন্যার আহ্বানে চোখ মেলিয়া চাহিলেন—হ্যাঁ মা এইখানে এই চেয়ারটায় বোস, কন্যা বসিলে বলিলেন—বলছি কি তোর দাদারা আর হপ্তাখানেকের মধ্যে বাড়ী যাবে তাদের ছুটি ত ফুরোল, আমরাও কি এই সঙ্গেই ফিরে যাব না আর কিছুদিন থাকব—তুই কি বলিস এখানে কি ভাল লাগছে?

উমা চুপ করিয়া রহিল তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

পিতা স্নেহস্বরে কহিলেন, বল মা তোর জন্যেই এসেছিলুম আরও কিছুদিন থাকবও ঠিক করেছিলুম কিন্তু তোর মা বলে আর থেকেই বা কি হবে যার জন্যে আসা তার ত কোনো পরিবর্ত্তন দেখতে পাচ্ছিনা এইসব বলছিল। তাই বলছি তুই যা বলবি উমা আমি করব। কি তোর ইচ্ছা বল উমা?

উমা ধীরে ধীরে কহিল, আমার ত কিছু আর ভালো লাগছে না বাবা তবে মন্দির আর সমুদ্র দেখে প্রথম বেশ ভালো লেগেছিল তা মন্দিরে অত ভীড়ে বেশী যেতে পারি না আর কতদিন ত থাকা হল চল না বাবা এবার ফিরেই যাই। মা বলে রোজ কেন বেড়াই না, সমুদ্রের ধারে গেলে চুপ করে কেন বসে থাকি? কিন্তু বাবা

আমার যেন সন্ধ্যা বেলা এইখানে বসে নির্জ্জনে সমুদ্র দেখতেই ইচ্ছে হয় বেড়াতে যেতে ইচ্ছা হয় না। আমি যে কিরকম হয়ে গেছি বাবা আমি নিজেই তা বুঝতে পারি না।

কন্যার কথা শুনিয়া পিতার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া বসিয়া কন্যাকে কাছে ডাকিলেন। উমা নামিয়া আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিলে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, লক্ষ্মী মা আমার আমাদের দিকে চেয়ে তুই মন শান্ত কর। দেখছিস্‌ত তোর এ বুড়ো ছেলে মেয়ে দুটো কবে আছে কবে নেই এদের একটু দেখা শোনা কর মা। উমা এবার পিতার কোলে মাথা গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। হরিশবাবু তাহার ক্রন্দনে বাধা দিলেন না। খুব খানিকটা কাঁদিয়া অভাগী মনের ভার একটু হাল্কা করিয়া লউক ইহাই ভাবিয়া তিনি নীরবে বসিয়া সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আপনিই শান্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া উমা চোখ মুছিয়া বলিল, আমি তোমাদের বড় দুঃখী মেয়ে বাবা তোমাদের সুখী করতে পারলুম না কেবল দুঃখই দিলুম। আজ থেকে মনে প্রাণে তোমাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলুম বাবা যদি তোমাকে আর মাকে সেবা যত্ন করে একটুও তৃপ্তি দিতে পারি তাহলে আমার এ ব্যর্থ জীবন সার্থক হবে।

হরিশবাবু কন্যার বেদনাভরা কথাগুলি শুনিয়া আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বহুক্ষণ নীরব গৃহে বসিয়া পিতা ও কন্যা এই দুঃসহ মর্ম্মবেদনায় বাক্যদ্বারা কেহ কাহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন না। উভয়ের উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারার মধ্যে দিয়া যে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পাইল তাহাতে ক্ষণ কালের জন্য একটা পরম সান্ত্বনায় দুজনের মন ভরিয়া গেল।

হরিশ বাবুদের আর ছয়মাস পুরী বাস করা হইল না। শান্তিত বনে নয় শান্তি মনে, যাহার মনে শান্তি নাই তাহার জগতের কোথাও শান্তি মেলে না এই প্রাচীন সত্যকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করিয়া লইয়া কর্ত্তা ও গৃহিণী দুঃখিনী কন্যা উমাকে লইয়া পুত্রদের ছুটী ফুরাইয়া যাইবার পূর্ব্বদিন সকলে এক সঙ্গেই পুরীধাম হইতে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

গত দুইমাসে ভগ্ন স্বাস্থ্য ও মনের যতটুকু উন্নতি হইয়াছে তাহাই তাঁহাদের পক্ষে পরম লাভ বলিয়া মনে হইল।

আধুনিক সাহিত্য

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র এম-এ

Gentlemen Prefer Blondes
But they marry Brunettes } By Anita Loose.

এই বই দুইখানি হোলিউডের বিখ্যাত নটী আনিতা লুজ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ। প্রথম পুস্তকখানিতে লেখিকা দেখাইয়াছেন যে সুন্দরীর মোহ কেমন করিয়া প্রত্যেক মানবকে মুগ্ধ করে। মানব সুন্দরের উপাসক। শিশু সুন্দর ফুল দেখিলে গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করে, বালক সুন্দর খেলানার মোহ পরিত্যাগ করিতে পারে না। যৌবনের বিকাশের সহিত মানব হৃদয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সুন্দরী রমণীর দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। সুন্দর কথাটী কিন্তু চিরকালই তুলনা-মূলক, আদর্শ জগতে উহার বাস। আজ যাহা সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হয়, কাল তাহা সুন্দর থাকিলেও উহার আদর্শ বদলাইয়া যাইতে পারে। সুন্দর ভাব ও আবার ক্ষণস্থায়ী। ফুলের মাধুর্য্য ঘণ্টা কয়েক স্থায়ী হয়। এসেন্সের গন্ধও তদ্রূপ। রমণীর রূপ ও যৌবন বৎসর কয়েকের জন্যই মোহ আনয়ন করে। কিন্তু আদর্শ চিরকালই উন্নত থাকে—কাল তাহাকে নত করিতে পারে না। তাহার গায়ে কোনরূপ কলঙ্ক লেপন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

কবির প্রেম এই জন্য বিশ্বাসঘাতী হইয়া থাকে। আর্টিষ্টদের কল্পনা অনুযায়ী ভালবাসা পাওয়া দুর্লভ বলিয়া তাহারা লম্পট হইয়া যায়। সুন্দরের উপাসকগণ এই জন্য একটু স্বেচ্ছাচার প্রিয় হন বা স্বেচ্ছাচার তাঁহাদের অস্থি মজ্জাগত হইয়া থাকে। মুক্তি কোথায়? যাহার চরণে মানবের মাথা লুটাইয়া পড়ে মুক্তি সেখানে। যেখানে ভক্তির যোগ আছে সেখানে ভোগ নাই। প্রেমিক সুন্দরকে উপাসনা করে কেননা সে সুন্দরের উপাসক। সে সুন্দরের নিকট কোন কিছুরই প্রার্থী নহে। সেখানে সে মোহ মুগ্ধ, যতক্ষণ মোহ কার্য্যকরী থাকে। কবি ততক্ষণ তাহাতে তন্ময় থাকে। মোহের অবসান ঘটিলেই আদর্শের আবরণ উঠিয়া যায়, কবি মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে, তখন ভোগ স্পৃহা তাহার হৃদয় মধ্যে স্বভাবতঃই জাগরিত হয়, ফলে—সুন্দরীর নিকট তাহা সে পায় না, কেননা সুন্দরী তাহার নিকট পূজাই পাইয়াছে। তাহাকে যে আবার প্রিয়ের উপাসনা করিতে হইবে সে ধারণা নাই; লোকের নিকট হইতে সে সম্মান ও মর্য্যাদাই পাইয়াছে। গ্রহণে যে প্রতিদান প্রয়োজন সে শিক্ষা করিবার অবসর ঘটে নাই। এই জন্যই সুন্দরীর সহিত কবির বিচ্ছেদ ঘটিতে বিলম্ব হয় না।

কৃষ্ণাঙ্গী সুন্দরী জানে, তাহার দৈহিক সৌন্দর্য্য নাই, সে সেই জন্য বাস্তব রাজ্যে বাস করে। সে তাহার কান্তকে পাইতে চাহে সেবা এবং সাধনার মধ্য দিয়া। ভক্ত যেমন ভগবানের একটা কল্পিত রূপ দিয়া তাহাকে উপাসনা করে কৃষ্ণাঙ্গীও সেইরূপ পতিকে দেখিতে যাহাই হউক না কেন, তাহার গুণ থাকুক আর নাই থাকুক তাহাকে পাইতেই হইবে এই ধারণা হৃদয় মধ্যে দৃঢ় করিয়া লইয়া তাহার উপাসনা করিতে থাকে। কবি বা প্রেমিক চিরকালই সংসার কার্য্যে অনভিজ্ঞ। তাঁহারা চিরকালই কল্পনা লইয়া থাকেন বলিয়া বাস্তব জগতে পদে পদে জীবন-ধারণের জন্য জীবন সঙ্গিনীর প্রয়োজন হয়। কৃষ্ণাঙ্গী সুন্দরীই তাঁহার সেই চির সাহায্যকারিণী জীবন সঙ্গিনী। উদাসীর ন্যায় ভ্রমণ করিয়া গৃহে আসিলেই তাঁহার হস্তের নিকট তাবৎ প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রাপ্ত হ'য়েন। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে গেলে যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন তাহার কোনটির অভাব ঘটে না, সবগুলিই তাঁহার প্রিয় হস্তের নিকট আগাইয়া দিয়া থাকেন। স্বপ্নলোক

পরিত্যাগ করিয়া কবি মর্ত্ত্যালোকে আগমন করিলেই, তাঁহার হৃদয় এই সুন্দরীর দিকে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ধাবিত হয়।

সুন্দরী কে না চাহে। কিন্তু সুন্দরী চাহে উপাসনা, চিরকালের জন্য উন্নত সিংহাসন এবং সেবা। মানব-হৃদয় তাহা প্রদান করিতে পারে না, এই জন্য সুন্দরী স্ত্রী ভবিষ্যতে দুঃখের আকর হইয়া উঠে। কৃষ্ণাঙ্গী কেহই চাহেন না, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গী স্বামীকে জীবন পণ করিয়া ধরিয়া থাকে। ভোজনে সে শ্রেষ্ঠ পাচক, শয়নে সে প্রগলভা ও লজ্জাহীনা, সুখে এবং দুঃখে তীক্ষ্ণ মেধাবী সহচর, গৃহকার্য্যে সুনিপুণা সেবিকা, হৃদয় কতক্ষণ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, কাজেই মানব হৃদয় সুন্দরী চাহিলেও কৃষ্ণাঙ্গীর প্রেমেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

বিষয়টী বিশেষ গবেষণার বস্তু। আমাদের লেখকগণ যাঁহারা সুন্দরী স্ত্রীর পরিকল্পনা করিয়া পাঠকগণের হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে চাহেন, তাঁহাদের জানা উচিত সুন্দরী স্ত্রী গল্পের নায়িকা হইলেও বাস্তব জগতে যদি তাহার বিশেষ গুণাবলী না থাকে তাহা হইলে অনেক সময়েই সে বিশেষ কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। সুন্দরী স্ত্রী স্বভাবতঃই কার্য্য পরায়ণা হয় না তাহার কারণ গ্রন্থকর্ত্রী যথার্থই বলিয়াছেন যে, সে চিরকালই উপাসনা পাইয়াছে—উপাসনা করিতে শিক্ষা করে নাই। কথাটা খুব সত্য। যে সমস্ত পিতা মাতার সুন্দরী কন্যা আছে তাঁহারা একটু অবহিত হউন।

ব্যবধান

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস

তুমি-আমি! কে বলিবে নাহি ব্যবধান?
তুমি নারী, আমি নর, দু'টি ভিন্ন প্রাণ।
তুমি পুণ্য দিবালোক, আমি অন্ধকার,
দোঁহাকার মধ্যখানে বিশাল প্রাকার।
তুমি বন-বিহঙ্গের প্রথম সঙ্গীত,
আমি তারি ক্ষীণতম সুরের ইঙ্গিত।
তুমি ধান্যমঞ্জরীর লাজকুণ্ঠ হাস,
তোমারে দোলাই আমি দুরন্ত বাতাস।

আঁকা বাঁকা ছায়াঢাকা তুমি গিরি নদী,
নাচিয়া ভাঙিয়া যাও বহি' নিরবধি,
আমি তব মর্ম্মদেশে ছোট বালুচর,
তব প্রেমকল্লোল প্রলাপ মুখর।
তুমি নভ-নীহারিকা কৃষ্ণা রজনীর,
আমি তব দৃষ্টিমুগ্ধ কবি অবনীর।

রিক্তের বেদন

শ্রীনিধিরাজ হালদার

সুনীত কলিকাতায় ফিরিয়া প্রভাতের মুখে শুনিল যে সবিতার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহার মনটা যেন কেমন একটু দমিয়া গেল। প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করিল "পাত্র কি করে প্রভাত ?"

প্রভাত—"শুনেছি, পাত্র জমিদার ; তবে লেখাপড়া তেমন কিছু জানেনা বলেই মনে হয়।"

সুনীত—"যাক তবু ভাল যে সবিতার স্বামী জমিদার, ধনী, দরিদ্র নয়। দরিদ্রের বাসনার মূল্য কতটুকু প্রভাত ?" সমস্ত শুনিবার পর প্রভাত বলিল, "বড় আশ্চর্য্য—ভাই সুনীত—কারণ, আমরা আগাগোড়া জানতুম যে সবিতা তোকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারেনা। কিন্তু হঠাৎ এমনটা যে হবে তা ধারণাতেও যে আসেনা ভাই।"

সুনীত—"সে যদি অপরকে বিয়ে করে সুখী হয়ে থাকে, করলেই বা ? আমি তার সুখের পথে কণ্টক হতে চাই না। প্রকৃত ভালবাসাকে সে যদি উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় ঐশ্বর্য্যকে বড় বলে বরণ করে নিয়ে থাকে—তাতে ক্ষতি কি ? তবে যেমন করেই হোক তার সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।"—

প্রভাত—"সে কি সুনীত, সে এখন পরের বউ—তার সঙ্গে--দেখা করা চুলোয় যাক তার কথা ভাবাটাই পাপ।—"

সুনীত—"শুধু তার সঙ্গে একবার দেখা করে জানতে চাই—সে কোন্ অপরাধে আমায় এমনি করে ছেঁটে ফেলে দিলে ? জানিনা হয়তো অপরাধ করে থাকবো—সুতরাং ক্ষমা চেয়ে ফিরে আসবো।"

প্রভাত—"যদি তোমায় সে ক্ষমা না করে ?"

"ক্ষমা চাওয়াটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট প্রভাত,—ক্ষমা করুক আর নাই করুক।"

রাত তখন আটটা হইবে। সুনীত বাস হইতে নামিয়া বাড়ী খুঁজিতে লাগিল। একটি বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতেই নেপালী দরওয়ান বলিল, "বাবু বাড়ী নেই হ্যায়।"

সুনীত বলিল, "তোমরা মাইজী কো খবর দেও।"

সুনীতকে নেপালী কোন দিন দেখে নাই সুতরাং বাহিরের ঘরে তাহাকে বসিতে দিয়া ভিতরে তাহার মাইজীকে খবর দিতে গেল।

সবিতা উপর হইতেই সুনীতকে আসিতে দেখিয়াছিল। তখন তাহার স্বামী বাড়ী না থাকায় সুনীতকে উপরে ডাকিয়া আনিবার তাহার সাহস হইল না—সুতরাং নেপালী কিছু বলিবার আগেই, সবিতা বলিল, "ভগবত বাবুকো বোল দেও দোসরা বকৎ আনেকো—আবি বাবু নেই হ্যায়।"

ভগবৎ আসিয়া সুনীতকে সবিতার কথা বলিল।—

বাহিরের পথে পা দিতেই, সবিতার স্বামী পরিমল ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, দুইজনেই সামনা সামনি হইল কেহ কাহাকেও চেনেনা—তবু পরিমল জিজ্ঞাসা করিল "কাকে চান আপনি"।" "যার কাছে এসেছিলুম, তিনি ঘৃণা ভরে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন, আর আমি কাউকে চাই না," বলিয়া সুনীত বাহির হইয়া গেল।

পরিমল ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিল না, উপর দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখিতে পাইল, বারাণ্ডার ভিতর দিকে সবিতা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আর কি না বলিয়া উপরে আসিয়া সবিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি সবিতা ? ভদ্রলোকটীর কোনও কথাই বুঝতে পারলুম না, মনে হল যেন বিশেষ অপমানিত হয়ে ফিরে গেলেন।

"সত্যি উনি আমাদেরই একজন প্রতিবেশী, ছোট বেলা থেকেই ওঁকে দাদা বলে ডাকতুম, মার ইচ্ছে ছিল ওর সঙ্গে আমার বিবাহ দেবেন কিন্তু বহুদিন উনি এখানে ছিলেন না। আজ হঠাৎ উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমার দেখা করতে

প্রবৃত্তি হলনা—তাই হয়ত—অপমানিত হয়ে ফিরে গেলেন।"

"কিন্তু ওঁকে আমি দেখেছি বলে মনে হয়"।—

"তার আর আশ্চর্য্য কি, একজন মস্ত নামজাদা প্লেয়ার, নাম সুনীতবাবু।" "তুমি তাকে স্বচ্ছন্দে ঘৃণাভরে তাড়িয়ে দিলে সবিতা! ভদ্রলোক হয়ত সকলের কাছে বলে বেড়াবে বড়লোকের বাড়ী কেমন করে অপমানিত হয়ে ফিরেছেন। তুমি ভাল কাজ করনি সবিতা—তাকে বসতে বললেই পারতে!" সবিতা কহিল, "এখনত আমি সেই আগেকার মত ছোট্ট খুকিটী নই। ভদ্রলোকের জানা উচিত ছিল আমি পরস্ত্রী। কোন্ সাহসে তিনি আমার সঙ্গে এখানে দেখা করতে আসেন?"

"কিন্তু তাই বলে তুমি তাঁকে অপমান করে তাড়াতে পারনা সবিতা।— খুবই অন্যায় করেছ সবিতা অতবড় একজন নামজাদা প্লেয়ার আমার বাড়ীতে এল আর স্বচ্ছন্দে তুমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার সুবিধাটুকু নষ্ট করে দিলে। যাক, একদিন তাঁকে নিমন্ত্রণ করে পাঠাই তাঁর কাছে মাপ চাও।—সেত তোমার অপরিচিত নয় তোমারই প্রতিবেশী—এবং ছোট বেলা থেকেই তাকে যখন দাদা বলে সম্বোধন করে থাক"।

সবিতা বলিল,—নিমন্ত্রণের যদি প্রয়োজন হয়—তবে আমি না থাকলেই করো। যার সঙ্গে আমার বিবাহের একরকম ঠিক ছিল তার সঙ্গে আবার ভাব করবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

পরিমল একটু হাসিয়া বলিল,—না হয় তাকে একটু ভালই বাসলে, তাহলে ত তোমার সঙ্গে আবার তার বে হয়ে যাবে না"।—

সবিতা বেশ একটু রাগত হইয়া বলিল, তোমার কি অন্য কথা নেই!

"সবিতা তুমি জান না—পবিত্র ভালবাসা কত নির্ম্মল। তা যদি জানতে তবে তুমি এমনি করে আমার উপর রাগ করতে না"।

সবিতা আরও রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "নিজের স্ত্রীকে ঐ কথা গুলো বলতে তোমার একটু লজ্জা হচ্ছে না? বেশ, আমায় যখন তোমার অত সন্দেহ তখন আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

"সবিতা তুমি সামান্য সত্য কথাটা শুনে ক্ষেপে উঠলে?"

"না অমন সত্য কথা আমায় তুমি শুনিও না।"

পরিমল সবিতার একটি হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া লইল এবং তাহার পিঠে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিল, "লক্ষ্মিটী সবিতা, তুমি আমার উপর অভিমান করলে তাকে ভাল না বাসতে পার আমাকেত পারবে সবিতা?"

পরিমল আর কিছু না বলিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

বাড়ী ফিরিয়া সুনীত সবিতাকে একখানি পত্র লিখিল,

স্নেহের সবিতা,

বড়লোকের স্ত্রী তুমি, তোমাকে এখন রাণী বলেই সম্বোধন করব। কারণ ঐ নামটাই আমার ভাল লাগছে। আমাকে দেখে হয়ত তুমি অবাক হয়েছিলে কারণ এত দূর সাহস আমার হতে পারে যে তোমার সঙ্গে আমি দেখা করতে গেছি! আমি কোন দিনই তোমার সুখের পথে কণ্টক হতে চাই না। তোমাকে আদর করে সবি বলে ডাকতুম, তখন সে ডাকের একটা মাধুর্য্য ছিল কারণ ডাক শুনলেই হেসে আমার কাছে ছুটে আসতে। ওসব কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে এখন আর আলোচনা করতে চাই না। তোমার কাছে গিয়েছিলুম শুধু একটী কথা বলবার জন্যে। ভালবাসতে নয় ভালবাসা দিতেও নয়। তাতে ভয় পাবার কিছুই ছিল না। এ জীবনে হয়ত আমার সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু একটা স্মৃতি, সেটা ভুলতে হয়ত এ জীবনে পারব না।

যাক অনেক কথাই লিখে ফেললুম। হয়ত তোমার মনে আছে একদিন আমারই একখানা ছবি তোমায় দিয়েছিলুম রাণী, আজ সে ছবিখানি আমি ফিরিয়ে চাইছি। কেন যে ফিরিয়ে চাইছি তা তোমার জেনে লাভ নেই। আশাকরি ফিরিয়ে দেবে। ইতি—

সুনীত।

প্রাতঃকালে পরিমল যখন চাপান করিতেছিল, এমনি সময় পিয়ন আসিয়া সবিতার পত্রখানি দিয়া গেল। পরিমল চিঠিখানি ভগবতকে উপরে দিতে বলিল।

সবিতা চিঠিখানি পাইয়া পড়িল, তাহার পর টুকরা টুকরা করিয়া ছিড়িয়া জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া একটি সোফায় আসিয়া বসিয়া পড়িল। সবিতা ভাবিতে লাগিল কোথা হইতে আবার সুনীত আসিয়া জুটিল। তাহার বিবাহের জন্য সে ত নিজে দায়ী হইতে পারে না তবে সুনীতকে কথা দিয়া অন্যকে বিবাহ করা তাহার খুবই অন্যায় হইয়াছে এরূপ নানা প্রশ্নই সবিতার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিল সে নিজে একদিন সুনীতের কাছে যাইয়া ক্ষমা চাহিয়া আসিবে। ঠিক এমনি সময় পরিমল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—সবিতা তুমি চুপটি করে এখনও এখানে বসে রয়েছ?

সবিতা বলিল, "শরীরটা ভাল নয়।"

পরিমল তাড়াতাড়ি সবিতার কপালে হাত দিয়া বলিল, "তোমার গা ত দেখছি বরফের মত ঠাণ্ডা।"

এ কথা সে কথা বলিতে বলিতে পরিমল জিজ্ঞাসা করিল, একটু আগে যে একখানা চিঠি এল সেখানা পড়ে বুঝি মন খারাপ হয়ে গেছে। কে লিখেছেন মা বুঝি?

সবিতা পরিমলের কোন কথারই জবাব দিল না চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।—

পরিমল জিজ্ঞাসা করিল, "কি, চুপ করে বসে রইলে যে ব্যাপার কি?"

সবিতা বলিল, "সে চিঠি পড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।"

পরিমল জিজ্ঞাসা করিল; চিঠির অপরাধ?

সবিতা বলিল, "সে দিন সুনীতদার সঙ্গে দেখা করিনি বলে আমাকে বেশ দুকথা শুনিয়ে চিঠি লিখেছে আর কি? তার স্পর্দ্ধাও কম নয়!"

পরিমল বলিল, এ ত সুনীত বাবুর উদারতা। এত অপমান সহ্য করবার পরও তিনি তোমায় চিঠি লিখেছেন। আর তুমি তার দোষ দিচ্ছ সবিতা?"

সবিতা বেশ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমার যদি অন্য কাজ—থাকে যেতে পার—চিঠির দোষ গুণ বিচার করতে ত আমি তোমায় ডাকিনি।—" পরিমল বলিল, "সবিতা ভুলে যেওনা স্ত্রীর অন্যায় বিচার করবার অধিকার স্বামীর আছে। তুমিই আমায় বলেছিলে, আগে ওর সঙ্গে তোমার বে হবার কথা হয়েছিল—এবং তোমাদেরই তিনি প্রতিবেশী আবার তুমি তাকে সুনীত দা বলে ডাক সুতরাং তোমাকে সুনীতবাবুর ভালবাসাটা কিছু অন্যায় নয় সবিতা।"

সবিতা বলিল; ও, তুমি তাহলে আমায় সন্দেহ করছ!"

"সন্দেহ নয়—সবিতা—আমি যদি জনতুম তাহলে হয়ত তোমাকে আমি বে-ই করতুম না।"

সবিতা এতবড় কথা তাহার স্বামীর নিকট শুনিবে তাহা কোন দিনও আশা করে নাই। সুতরাং সবিতা বলিল, বেশ তাহলে আমায় বাপের বাড়ীই পাঠিয়ে দাও। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে এমনই বুঝে থাকে তাহলে সে দুঃখ আমার অন্তরেই থাক মুখ ফুটে তা প্রকাশ করবার দরকার হবেনা। বলিয়া, সবিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই পরিমল খপ করিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া বলিল, ছিঃ! সবিতা, তুমি না বুঝেই অতবড় একটা অভিযোগ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে। তাহলে তোমার কাছে আমার ভালবাসার কোনও মূল্য নেই বল?

সবিতা বলিল, না কারুরই উপর আমার রাগও নেই অভিমানও নেই।" কাউকেই কোন দিন দোষী করতে চাইনা তবে। আমার মনটাকে দিন কতকের জন্য বদলে আসতে দাও।

পরিমল বলিল, সবিতা—ভালবাসা হচ্ছে—ভগবানের প্রেরণা এবং ভালবাসার রূপও হচ্ছে অনেক গুলো। যে যেভাবে দেখে সে সেই ভাবে পায়। এটা হচ্ছে—আর্শীতে মুখ দেখার মত, যেমন দেখাবে তেমনি দেখবে বুঝেচ! তাহলে সুনীত বাবুকেই বা কি করে দোষী করবো সবিতা?

সবিতা বলিল, থাক ওনাম আর আমার শুনিওনা,—আমি দিনকতক মার কাছে গিয়েই থাকি।"

পরিমল বলিল, বেশত—আজই তোমার মন বদলাবার দরকার হয়—চল আমরা না হয় দুজনে মাসের জন্যে বাহিরে থেকে ঘুরে আসি।"

সবিতা কিছুতেই রাজী হইল না। সুতরাং পরিমল সবিতাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

এই সব ব্যাপারে—পরিমলের মনটাও খারাপ হইয়া গেল সে ঠিক করিল,দিন কতক বাহিরে কাটাইয়া আসিবে এবং যাইবার পূর্ব্বে একবার সুনীতের সহিত দেখা করিবে। এই স্থির করিয়া পরদিন প্রাতঃ কালে সবিতার ঠিকানামত সুনীতের খোঁজে পরিমল বাহির হইয়া পড়িল। পরিমলকে সুনীতের বাড়ী খুঁজিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না।

সুনীত পরিমলকে দেখিয়াই বলিল, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি। পরিমল পরিচয় দিতে সুনীত জানিতে পারিল এই সবিতার স্বামী—। মর্ম্মাহত হইয়া সে ভাবিল সবিতাই হয়ত পরিমলকে এখানে পাঠিয়েছে—সুতরাং সবিতার প্রতি তাহার ভারী রাগ হইল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোনও কথাই পরিমলকে বলিল না, যৎদূর ভদ্রতা করিতে হয় করিল। পরিমল সুনীতকে বলিল, দেখুন আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমার আজ ভারী আনন্দ হ'ল। তা যাই হোক আপনাকে আমার অনেক গুলি কথা বলবার আছে এবং আপনার কাছে জানবারও আছে। অমি খুব সম্ভব কাল দার্জ্জিলিং যাব ঠিক করেছি তা আপনাকে যদি সঙ্গী পাই তা হলে ভালই হয়।

কিন্তু সুনীত অনেক অজুহাত দেখাইয়া পরিমলকে বিদায় করিয়া দিল। পরিমল পরদিন দার্জ্জিলিং রওনা হইয়া গেল।

সবিতার ছোট ভাই নীহার আসিয়া সুনীতের হাতে একটা কাগজের প্যাকেট দিয়া বলিল, "সুনীতদা, দিদি আপনাকে এটা দিলে।"

সুনীত তাহা খুলিয়া দেখিল, তাহারই ছবি ও সঙ্গে একটি সবিতার লেখা চিঠি। সবিতা লিখিয়া, ছিল—

পূজনীয় সুনীত দা,—

এত কাল বাদে তোমার দেওয়া রাণী নামটা যে আমার মোটেই আনন্দ দেয়নি তানয়,তোমার ছবি ফিরিয়ে চেয়েছ ফেরত দিলুম।

বিবাহে আমার কোনও হাত ছিলনা, এটা ভুলে গেলে চলবে না। সুতরাং এখন থেকে আমায় ভুলে যাবার চেষ্টা কর কারণ এমনি করে চিঠি লিখে আমাকে আমার স্বামীর সন্দেহের পাত্রী করে—তুলোনা। অধিক আর কি লিখব। ভগবানের কাজে প্রার্থনা করি, তুমি আমারই মত সুখী হও। ইতি সবিতা।

সুনীত চিঠি খানি পড়িয়া রাখিয়া দিল।

কোনরূপে সবিতার দুপুর কাটিল। সবিতা পরিমলের আশায় পথপানে চাহিয়া নানা কথাই ভাবিতেছিল। এমন সময় সুনীত আসিয়া সবিতাকে ডাকিল। সবিতা ভগবতকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে সে এখন দেখা করিতে পারিবে না।

কিন্তু ভগবত আসিয়া তাহা সুনীতকে বলিবার পূর্ব্বেই সুনীত উপরে উঠিয়া আসিয়া সবিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সবিতা বলিল, সুনীতদা, আমার স্বামী এখানে নেই, এই সুযোগ নিয়ে তুমি আমার কাছে এসেছ। সুনীত বলিল, "সবিতা আমায় ভুল বুঝো না। তোমার স্বামী থাকলেও আজ এমনি করেই আসতুম। মেরে তাড়িয়ে দিতে, মার খেতুম, পুলিশে দিতে, জেল খাটতুম, এখনও দিতে পার। তুমি আমাকে নির্লজ্জ অসভ্য ভেবনা। আমি তোমার কাছে ভালবাসা ভিক্ষে করতে আসিনি। আমি জানি তুমি পরস্ত্রী সবিতা, সে জ্ঞান আমার আছে।"

সবিতা পিছন ফিরিয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সুনীতের একটী কথারও জবাব দিল না।

সুনীত বলিল, সবিতা তোমার আদেশ না পাওয়ার আগেই আমি তোমার গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে যে অপরাধ করেছি তার জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। জানি তুমি ক্ষমা করবে না, কিন্তু আমিত অপরাধী, আমায় ক্ষমা চাইতেই হবে। চল্লুম সবিতা। হ্যাঁ যাবার আগে একটা কথা বলে যাই—মনে রেখ, আমি প্রতারক নই। আমার ভালবাসা তোমায় জয় করতে পারেনি ; হয়ত ভাল বাসার মত করে তোমায় ভালবাসতে পারি নি, তবু কিন্তু আমি প্রতারক নই। আমাকে আর দেখতে পাবে না। সবিতা। চল্লুম। সুনীত আর দাঁড়াইলনা চলিয়া গেল।

সবিতা কি জানি কি ভাবিয়া বলিল, তাইত সুনীতদাকে বসতে বল্লুম না একটু জল খেতে দিলুম না, ভগবতকে বলিল, ভগবত—যা ত বাবুকে তাড়াতাড়ি ডেকে আন।

ভগবত ছুটিয়া সুনীতকে ডাকিতে গেল কিন্তু সুনীত আসিল না। সবিতা ভাবিল যাক ভালই হইল।

× × × ×

দার্জ্জিলিংয়ে সুনীতের বন্ধু প্রভাতের সঙ্গে পরিমলের দেখা হইল—তাহারা এক হোটেলেই উঠিয়াছিল। কথায় কথায় পরিমল সুনীতের সব কথাই জানিয়া বলিল—"আমার মনে হয় সুনীত বাবু ও সবিতা যদি বন্ধু ভাবে মেলা মেশা করতে পারে তবে দু'জনার পক্ষেই ভাল হয়—তা না হলে দু'জনার পক্ষেই খারাপ।"

প্রভাত বলিল—"হবে কি না জানি না—তবে আমার মনে হয় আপনার ছোট বোনটির হাতে যদি সুনীতকে কোন রকমে সমর্পণ করতে পারেন তবেই সব দিক রক্ষা হয়! কিন্তু সুনীত কি রাজী হবে!"

কলিকাতা পৌছিয়া দু'জনেই এবিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে স্থির হইল—কিন্তু কলিকাতায় পৌছিয়া তাহারা আর সুনীতকে দেখিতে পাইল না—শুনিল সুনীত একখানি চিঠি লিখিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়াছে—কবে ফিরিবে কিম্বা আর ফিরিবে কি না তাহা কেহই বলিতে পারিল না।

লীলাময়ী

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

শেফালীদের বাড়ী আজও সে বেড়াইতে যায়। লীলা তার ছেলেবেলার প্রিয় সাথীটিকে আজও ভুলিতে পারে না। আপন বিসদৃশ জীবনের একটানা ক্লান্তির অবসরে লীলা সঙ্গিনীর বিবাহিত জীবনের কথা চিন্তা করিতেই—অনন্য নির্ভর এক যুবকের প্রশান্ত হাসির লহর যেন তার মনের কোণে হারাণো আনন্দের দিনগুলির ছবি আঁকিয়া যায়। তার বর্ত্তমানের গভীর নিরাশার অন্ধকারে যেন সে অতীত দিনের স্মৃতির চিন্তায় আনন্দ-চঞ্চল হইয়া ওঠে।

সে ত আজ বেশী দিনের কথা নয়। সবে দুই বছর অতীতের কোলে বিলীন হইয়া গেছে। তার পূর্ব্বে লীলার জীবন নিজের কাছে এরূপ দুর্ব্বহ হইয়া ওঠে নাই। প্রতি দিনের যাত্রাপথ বরং দুটি হৃদয়ের আনন্দের পরিপূর্ণতায় বিকাশের দল মেলিয়া সুষমা বিলাইয়া চলিত। পাড়ার অনেকের চোখে হয়তো তাহাদের দাম্পত্য জীবনের সহজ ছবি সুন্দর হইয়া ফুটিয়াছে। অতীতের হারাণো দিনের স্মৃতির কথা মনে হইলেই লীলার ক্ষুদ্র বুকখানি বেদনায় টন্ টন্ করিয়া ওঠে। উন্মত্ত একখণ্ড ঝড়ো হাওয়ায় যেদিন তাহার জীবনের সমস্ত প্রেমের সঞ্চয় একেবারে অকস্মাৎ উড়িয়া গেল—বিস্মৃতির পথে লীলা সেদিনের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির কথা কোন রূপে ভুলিতে পারে না।

সর্ব্বহারা সে।

জীবনের রিক্ততার তীরে বসিয়া যাওয়া-দিনের পানে কাঙ্গালের মতই উন্মুখ হইয়া চাহিয়া থাকে।

* * *

বান্ধবী শেফালীর মন সখীর দুঃখে সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া ওঠে। সে প্রচণ্ডভাবে তাহাকে ঝাঁকানি দিয়া বলে :—

"কি অত ভাবিস্ ভাই? যে তোর তরুণী-জীবনখানা মানুষের কাছে ভাবনার কারণ করে দিয়ে গেল—তার জন্যে?"

লীলা নীরবে চোখের জলে তার উপাধান আভসিক্ত করিয়া চলে। শেফালির ছেলে অমল কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিয়া ওঠে :—

"মাছি মা! তুমি ত থোতো থেলে; কাঁদতো দে!"

খোকার স্নেহার্দ্র আধ আধ ভাষায় দুজনেই প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া লয়। লীলা—তাহার সমস্ত দুঃখ, হাসির

ধারায় ধুইয়া দেয়। দু হাতে সে খোকার ক্ষুদ্র দেহ-লতাটিকে সস্নেহে জড়াইয়া চুমায় চুমায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া ফেলে। খোকা আবাক হইয়া মাসিমার কোলে সুবোধের মত চুপ হইয়া পড়ে। অশান্ত খোকার অতি শান্ত অবস্থার ফাকে মা তাহাকে জোরে দোলা দিয়া বলে :—

"দুষ্টু! এই দুষ্টু ছেলে—"

মা'র অন্যায়োক্তির ভীষণ প্রতিবাদ করিয়া ছোট্ট অমল বাবু রাগিয়া সজোরে বলিয়া ওঠে :—

"তু—তু—তুমি দুত্যু—।"

মা পোয়ের স্নেহের অভিনয়ের অপূর্ব্ব লীলার মহিমায় লীলা একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়।

রণক্লান্ত খোকার ঘুমে এলাইয়া-পড়া দেহখানি লীলা তখন বুকে জড়াইয়া ধরে। শান্তির স্নেহরসে যেন তাহার জীবনের সমস্ত মলিনতার বেদনা শুভ্র সুন্দর হইয়া ওঠে। সখির কোলে অমলকে শোয়াইবার জন্য তুলিয়া দিয়া লীলা আবার চুপ করিয়া বসে।

তাহার ভাবনার অন্তহীন পারাবারে খোকার মুখের পাশে অবিকল একটি শুভ্র শিশুর হাসি উঁকি দিয়া যেন আবার কোথায় মিলাইয়া যায়।

নারী সে। তাহার বুকে মাতৃত্বের অব্যক্ত বেদনা আজ কি জানি কেন হাহাকার করিয়া ওঠে। "আসি ভাই এখন" বলিয়া লীলা মন্থর গতিতে বাড়ীর দিকে চলিয়া যায়।

*   *   *

স্বামী সুশান্তের নিকট শেফালি তাহার প্রিয় সখির দুর্ভাগ্যের ইতিকথা মনের দুঃখে বলিয়া যায়।

সম্ভ্রান্ত সুশান্ত বাবুর শিক্ষিত মানুষ মন বাংলাদেশের অসহায়া নারীর দুর্ভাগ্যে হাহাকার করিয়া ওঠে। মনে মনে সে বিদ্রোহী হইয়া ফুলিয়া ওঠে।

সে ভাবে :—

যে স্বামী সাধ্বী স্ত্রীর দেহ অন্তর মনের সাগ্রহ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া নারীর চমক দেওয়া বাইরের রূপে সব খোয়াইয়া আলেয়ার পেছনে ছুটিয়া চলে—তাহার সত্যকার শাসনের জন্য বর্ত্তমান যুবক-বাংলার বিদ্রোহের প্রয়োজন আছে।

×   ×   ×

লীলার পাশের সুশান্তের মনের চোখে একে একে ভাসিয়া ওঠে—অবহেলিত এ দেশের অগণিত অভাগী "স্নেহলতা" "মালতী" "মানসী"র মুখের অবিকল বেদনার প্রতিচ্ছবি। মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সে বলিয়া যায় :—

"আচ্ছা শেফা! লীলাদি কেন একটা দুর্ভাগ্যের স্মৃতিকেই আঁকড়ে রইবেন বলো ত চিরকাল? বিয়ের মন্ত্রপড়া স্বামী যিনি কেবল মদের সঙ্গে মেয়ে মানুষের দেহকেই বড় বলে মেনে নিয়ে স্ত্রীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মনে করার অবকাশ পেলেন না—তাঁকেই কি তুমি পতি দেবতার পূজো দিতে বলো?"

স্বামীর সহানুভূতিতে শেফালির মন আনন্দে গলিয়া যায়। সমাজ জীবনের সম্ভাবনার দিক হইতে সে হতাশ হইয়া বলিয়া ওঠে :—

"তা ছাড়া আর মেয়ে মানুষের উপায় কি বলো ত? স্বেচ্ছাচারী পুরুষ তার স্বামীত্বের দাবী নিয়ে অনন্য নির্ভরশীলা স্ত্রীর জীবন দলিত মথিত করে দিতে পারবেন, বিচিত্র এ দেশের সামাজিক আইন এতে বাধা দেবেন না। সমাজ জীবনের এই শ্রেণীর ঔদাসীন্য পুরুষের স্বেচ্ছাচারের মাত্রা যেন উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দিয়ে চলেচে।"

স্বামী উত্তেজিত হইয়া বলে :—"তাই-ই-তো।"

শেফালি বলিয়া যায় :—

"আর উপেক্ষিতা নারী যদি দেহের ক্ষুধার প্রয়োজনের ডাকে কোনো দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সাড়া দিয়ে ফেলে—তা হলেই সব ধর্ম্ম, সমাজের সমস্ত পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। এ কেমন তরো এক তরফা বিচার বলো ত?"

তাহাদের ক্ষিপ্র আলোচনার অবসরে ম্রিয়মাণা লীলা ছোট ভাই অনিলের হাত ধরিয়া ঘরের মেঝেয় হতাশ হইয়া বসিয়া পড়ে—। তাহার না জানি কোথায় যেন আজ সর্ব্বনাশের সূচনা হইয়া গেছে। স্বামীর অসুস্থতার কথা বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য শশাঙ্ক মুঙ্গের হইতে 'তার' করিয়া জানাইয়াছে।

তেজস্বী সুশান্ত বাবু লম্পট স্বামীর জন্য নারীর এই

অসহায়া মনের ক্রন্দনে অন্তরে বাহিরে বিরক্ত হইয়া উঠিলেও বাহিরে তাহার কোনরূপ প্রকাশ পাইতে দিল না। বরং শান্তভাবে প্রশ্ন করিল :—

"তা'হলে কি ভেবে ঠিক করলেন লীলা-দি ?"

জিজ্ঞাসু স্বামীর মুখের উপর ক্ষিপ্র জবাব দিয়া শেফালি বলিয়া ওঠে :—"ঠিক আর ও কি কোরবে! আর ঠিক করার মেয়ে মানুষের কি আছে শুনি? স্বামীর অসুখ যখন বাড়াবাড়ি—তখন ওকে যেতেই হবে।"

শেফালির জবাবে লীলা যেন আশ্বস্ত হইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

× × ×

লীলার সন্ধ্যার গাড়ীতে মুঙ্গের যাওয়ার ঠিক হইয়া গেছে। তাহার ছোট ভাই সুনীলকে লইয়া সুশান্ত বাবু পথের সাথী হইবেন—শেফালিই ইহার বন্দোবস্ত করিয়াছে। যথাসময়ে গাড়ী লইয়া সুশান্ত লীলাদের বাড়ীর দরজার হর্ণ দিল। শেফালি অমলকে কোলে লইয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

দরকারী জিনিষ-পত্র খাবার প্রভৃতি চাকরের মাথায় তুলিয়া দিয়া লীলা ছোট ভাই সুনীল ও সখির হাত ধরিয়া মোটরে আসিয়া বসিল! অল্প সময়েই তাহারা ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ওধারে তিনখানা মধ্যম শ্রেণীর টিকিট লইয়া সুশান্ত বাবু আসিয়া বলিলেন :—

"গাড়ী দেখা দিয়েচে। এবার তৈরী হোয়ে নিন লীলা-দি।"

বর্দ্ধমান ষ্টেশন ট্রেণ ছাড়ার পূর্ব্বে লীলা প্রিয়া সখি শেফালিকে আবেগে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নীরবে অমলের গালে চুম্বন দিতেই সে সজাগ হইয়া বলিয়া উঠিল :—

"মাছি মা। বাবা দাবো।"

পর মুহূর্ত্তেই ট্রেণের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। ষ্টেশন ছাড়াইয়া মাঠের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সুদূর বিস্তৃত রেলপথের উপর দিয়া ট্রেণখানি দ্রুত গতিতে বহিয়া চলিল। ক্রমেই শেফালি-অমলের ক্ষুদ্র মুখ মিলাইয়া যাইতে লাগিল। যতদূর চোখের সীমানার দৃষ্টি চলিল—লীলা উন্মুখ হইয়া স্নেহময়ী সখি শেফালির দিকে চাহিয়া রহিল।

* *

পাকুড় ছাড়াইয়া যখন ট্রেণখানি আঁকা বাঁকা সবুজ পাহাড়ের কোল ঘেঁসিয়া চলার সুরু করিয়াছে—লীলার হৃদয় মন তখন প্রকৃতির শ্যাম শোভার অনির্ব্বচনীয়ত্বে পূর্ণ হইয়া গেছে। নিজের মনের গভীর প্রশান্তিতে সে এমনিই আচ্ছন্ন হইয়া আছে যে তাহার সাথী দুইটীর অস্তিত্ব মনে করার প্রয়োজনের সুযোগ পায় নাই। হঠাৎ সে সুশান্তের ক্ষুধার ইঙ্গিতে অপ্রত্যাশিত ভাবে লজ্জিত হইয়া বলিয়া উঠিল —

"অপরাধ নেবেন না ভাই সুশান্ত বাবু! মনটা সত্যিই এত বিশ্রি যে আপনাদের খাবারের কথা একেবারে ভুলেই গেছি।"

টিফিন্ ক্যারিয়ার হইতে খাবার, দুই বাটীতে ভরিয়া, লীলা সুশান্ত বাবু ও সুনীলের সুমুখে নীচের সরাই হইতে দুইটি গ্লাসে জল ভরিয়া সে তাহাদের খাইতে দিল!

"আপনি কিছু রাখলেন না যে লীলাদি?" বলিয়া সৌৎসুক নেত্রে সুশান্ত বাবু লীলার মুখের উপর চাহিয়া রহিল।

লীলা সহাস্যে বলিয়া উঠিল :—

"সত্যিই ভাই,। আমি খাবার এমন কিছু এখন দরাকর বুঝ্ছিনে।" সুশান্ত মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলিল :—

"সেকি! আপনার মনের বর্ত্তমান অবস্থায় ওটা সত্যি হলেও দেহের প্রয়োজনের দিকে খাওয়াটা যে মোটেই অস্বীকার করার জিনিষ নয়—একথা বোধ করি আপনিও মেনে নেবেন।"

লীলা হাসিয়া বলিল :—

"থাক্—সমস্ত ভাল করে আপনি এখন খেয়ে নিনতো?" শরীর খারাপ হলে হয়তো আমায় শেফালির অনুযোগ শুনতে হবে। আপনার লীলা দি'র তরফ থেকে অন্ততঃ শ্রীমতীর এ প্রশ্ন উঠতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া ঠিক নয়।" সুশান্ত তাহার প্রাণ খোলা অট্টহাস্যে গাড়ীখানি ভরাইয়া দিয়া বলে :—

"ওরে বাপ! অতি বড় শত্রুও আপনার অন্তরের সহিত

মমত্ব বোধকে শ্রদ্ধা না কোরেই পারেনা। তা ছাড়া শেফার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত রইতে পারেন—।”

লীলা এই তার্কিক প্রাণখোলা লোকটির সহিত তর্কে আঁটিয়া উঠা ভার বুঝিয়া চুপ করিয়া রহে। ইতিমধ্যে তাহাদের আলোচনার প্রচুর অবসরের ফাঁকে সুনীল নিশ্চন্তে দিদির কোলে মাথা রাখিয়া কখন ঘুমাইয়া গেছে।

তন্দ্রাচ্ছন্ন লীলার মন রাত্রির ট্রেণের ক্লান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। তখন ঝিরঝিরিয়া পাহাড়ের মধ্য দিয়া রেল গাড়ি ধীর মন্থর গতিতে চলার সুরু করিয়াছে। পাহাড়ের অপূর্ব্ব শোভায় তাহার মন যেন আনন্দের পুলক শিহরণে নাচিয়া উঠিতে চাহিতেছে। উদার নীলাকাশের তলে গিরি-শ্রেণীর শ্যামলিমায় লীলা স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া যেন ধেনুচরা শ্যামল মাঠের মায়া রচনা করিয়া চলিয়াছে।

তন্দ্রালু মনের এরূপ অবস্থায় হিন্দুস্থানী কুলিদের তীক্ষ্ণ ডাক তাহার কানে আসিয়া বিঁধিল ঃ—

“মুঙ্গর—মুঙ্গর টিশন্”

সুশান্ত বাবু তাহাদের সমস্ত জিনিষ পত্র কুলির মাথায় তুলিয়া দিয়া লীলা দি ও সুনীল কে লইয়া ষ্টেশনের বাহিরে গাড়ীর আড্ডায় আসিয়া পৌছিল। গাড়ীতে চড়িয়া লীলা ড্রাইভারকে “শান্তি কুঞ্জের” নির্দ্দেশ দিয়া দিল।

সহরের লোক-কোলাহলের বাহিরের বাঙালী রাজা বাবুর উদ্যান বাটিকা গাড়ীর ড্রাইভার-মহলের বিশেষ পরিচিত।

দ্রুত গতিতে গাড়ী শান্তিকুঞ্জের দরজায় হর্ণ দিতেই বিশ্বস্ত ভৃত্য শশাঙ্ক বাহির হইয়া আসিয়া তাহার মাস্-জীর পায়ে অসহায় শিশুর মত লুটাইয়া পড়িয়া সর্ব্বনাশের আভাষ দিল—“সব ফুরিয়েছে”।

লীলা পাথরের মত শক্ত স্থির হইয়া গেছে।

সুশান্তবাবু নির্ব্বাক হইয়া নতমুখে দণ্ডায়মান। সুনীল তাহার দিদির গললগ্ন হইয়া ফুঁপিয়া উঠিতেছে। হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনায় সমস্ত আবেগ নীরবে চাপিয়া লীলা বলিয়া উঠিল :—

“ভাই, সুশান্তবাবু ভেতরে চলুন। যা হবার শেষ হয়েছে।” ঘরে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই শশাঙ্ক পা ধোবার জল গামছা রাখিয়া জলখাবার লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। শশাঙ্কর পিছনে লীলা বাহির হইয়া যাইতেই মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে তাহার নারী হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা অশ্রু ধারায় গলিয়া পড়িতে লাগিল।

ভৃত্য বহুযত্নে রক্ষিত তাহার প্রভুর দেওয়া কাগজ দুইখানি প্রভুপত্নীর পদপ্রান্তে রাখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। উইলখানা ফেলিয়া দিয়া প্রিয়তমের শেষ চিঠিখানি লীলা বুকের ওপর সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বারম্বার পড়িতে লাগিল।—

“প্রিয়তমা—

লীলা !

জীবনের নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ ক’ফোঁটা তেল জ্বেলে যে কয়েকটা কথা আজ তোমার জন্যে লিখে গেলাম—হয়তো বিদায়ের দিন আরো না-বলা অনেক কিছু যা আমার শেষের বেলা তোমায় বলার ছিল বলতে পারতাম। মহাকালের তাগিদ্ এত জরুরি যে তারও আর সময় দিল না।

মদিরার প্রিয়স্পর্শে মৃত্যু-মাতাল আমি—হয়তো আমার কথা আজ বিশ্বাস না কত্তেও পারো কিন্তু আমার প্রিয়াকে পেয়ে স্বেচ্ছায় হারাণোর যে ব্যথা আমি বুকের মাঝে নিয়ে গেলাম তার ওপর যেন শ্রদ্ধা হারিয়ো না।

একদিন তোমার প্রেমের যে মহিমাস্পর্শে ধন্য হয়েছিলাম--বিশ্বাস কর লীলা ! জীবন ভরা এই দেহ মনের অত্যাচার অতিক্রম করে সেই প্রেম মৃত্যুপথ-যাত্রীকে মহিমান্বিত করেছে। মৃত্যু আমার অবহেলিতা চির প্রিয়তমা লীলাকে যাবার বেলা চিনিয়ে দিয়েছে। ওপারের পথিক, জীবনের এই পরম গৌরবের চরম সান্ত্বনা নিয়ে ধরার কোল হতে বিদায় নিল। একে অবিশ্বাস ক’রোনা রাণী।

পারবে কি ?—তবু যদি পারো মাতাল তোমার চির-অপরাধী স্বামীকে ক্ষমা করবার চেষ্টা কোরে একবার দেখো। অক্ষম স্বামীর শেষ দান তুমি কি অবহেলা করবে, লীলা ? প্রিয়তমা আমার ! বিদায় !

মৃত্যু পথের যাত্রী

স্বামী রমেন।”

মৃত্যু পথিকের বুকের রক্তে কয়েকটা লাইন্ বিদ্রোহিনী লীলা শেষের দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। মুঙ্গেরেই সে জীবনের বাকী কয়েকটা দিন কাটাইয়া দিবে ঠিক করিয়াছে। সুশান্ত বাবুর হৃদয়ের অনুরোধও তাই লীলাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। দেশের জমিদারী, বাড়ী ঘর সুনীল ও অমলকে সমান ভাগে দান করিয়া দিয়াছে। ও সুশান্ত বাবুকে ট্রাষ্টি করিয়া দিয়াছে। শশাঙ্ক তাহার মাইজীর অনুরোধ না শুনিয়া মুঙ্গেরে রহিয়া গেছে।

মৃত স্বামীর স্বেচ্ছাচারের "শান্তিকুঞ্জে" গঙ্গার কূলে কূলে প্রেমের মহিমার সন্ধানে আজ ভিখারিনী লীলা আজ নিজেকে ক্ষয়ের যজ্ঞে আহুতি দিয়া দিন দিন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া চলে।

লীলাময়ী হইলেও লীলা যে নারী!

গ্রন্থ পরিচয়

বস্তির গল্প। সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক খাদি প্রতিষ্ঠান মূল্য এক টাকা। খাদি প্রতিষ্ঠানের সতীশবাবুর কর্ম্ম খ্যাতি দেশবিদিত। সম্প্রতি হরিজন সেবা-কার্য্যে আত্ম-নিবেদন করিয়া ইনি আরো শ্রদ্ধেয় হইয়াছেন। এই পুস্তকের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু বলিয়াছেন —'আমাদের সমাজের নিম্নতম স্তরে এক শ্রেণী জীব আছে। তারা ভিক্ষুক নয়, গলগ্রহ নয়, দুরাত্মা নয়, তবু তারা অবজ্ঞাত অস্পৃশ্য ঘৃণ্য। আমরা চক্ষু বুজে তাদের সেবা নি, সেই সেবা একদিন না পেলে ব্যাকুল হই, অথচ আমরা তাদের অস্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই জানি না। লেখক গল্পচ্ছলে সমাজের সেই অধঃস্তরের বিবরণ দিয়াছেন। এতে কল্পনা নেই, ভাবের বিলাস নেই। গল্পের যারা পাত্র, পাত্রী, তাদের সঙ্গে লেখক পরম আত্মীয়ের ন্যায় বাস করেন। তাদের কাজ নিজের হাতে করেন। তাদের সুখ-দুঃখ, পুণ্য-পাপ স্বয়ং উপলব্ধি করেন। এই একান্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে একান্ত করুণা জড়িত হ'য়ে লেখককে 'বাস্তব গল্প' রচনায় প্রবৃত্ত করেছে। গল্পপ্রিয় বাঙ্গালী পাঠকের যে সনাতন রসবোধ আছে, লেখক তাকে প্রচণ্ড আঘাতে অভিভূত ক'রে এক বিচিত্র ভয়ঙ্কর বীভৎস নিরতিশয় করুণ রসের অবতারণা করেচেন। এই অত্যন্ত বাস্তব কাহিনী প'ড়ে সুখভুগ ভদ্রসমাজের যদি কিঞ্চিৎ চেতনা লাভ হয় তবে লেখকের শ্রম সার্থক হবে।' বইখানির সত্য পরিচয় ইহাই। সতীশবাবু প্রচারক লোক—প্রচারকের মতই হিন্দুসমাজের পতিত অবজ্ঞাত অথচ অতি আবশ্যকীয় মেথর ধাঙড়দের জীবন যাত্রার বাস্তব চিত্র আঁকিয়াছেন —এ চিত্র এ দেশের কল্পিত শ্রমিক বা অপর কোন সমস্যার সাহিত্য নহে—ইহা হরিজন সমস্যারই সত্য বাস্তব চিত্র—বস্তির গল্পে তাহাই রূপ পাইয়াছে। আমরা বস্তির গল্প পড়িয়া সমাজের অবজ্ঞাত একটা শ্রেণীর সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিয়াছি—এবং সমাজ হইতেই ইহার সংস্কারের কত প্রয়োজন তাহাও বিশেষ রূপেই বুঝিয়াছি। গল্প হিসাবেও বস্তির গল্পকে উচ্চস্থান দেওয়া যাইতে পারে। বাংলার গল্প, সাহিত্যের দিক দিয়াও সতীশবাবু একটা অভিনব জিনিষ দিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তির গল্পের বহুল প্রচার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। অনিলা দেবী

ছয়াসীতা। শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রণীত বরেন্দ্র লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—।৷৹ মুখপত্রে গ্রন্থকার ভাবার কিরূপ আকৃতি হওয়া উচিত তাহার একটী বিবৃতি দিয়াছেন। পুস্তকখানি রূপক ছলে উপন্যাস, কাজেই প্রারম্ভেই যদি ভাবাতত্ব পড়িতে হয় তাহাতে পাঠক-গণকে একটু বিব্রত হইতে হয়। এরূপ বিবৃতির কারণ তিনি গ্রন্থখানিতে অনেকরূপ বানান Phonetic

প্রথায় চালাইয়াছেন। যেমন—একটার স্থলে লিখিয়াছেন এ্যাকটা,, খেলার স্থলে খ্যালা, এতদিনের বদলে এ্যাতো-দিন এবং একেবারের বদলে এ্যাকেবারে ইত্যাদি। বাংলার ব্যাকরণ আছে, উহা প্রায় সমস্ত লেখককেই মানিয়া চলিতে হয়, সুতরাং যাহা সকলে মানিয়া চলেন তাহা না মানাই Genius নহে, গ্রন্থকারের মনে রাখা কর্ত্তব্য ছিল। Phonetic শব্দ লইয়া পাশ্চাত্য দেশে এখনও গবেষণা চলিতেছে। নিমোনিয়া লিখিতে এখনও গোড়ায় একটা অনর্থক P লিখিতে হয়। সেইরূপ থাইসিসের T এখনও খসিয়া পড়ে নাই। এইরূপ করিবার কারণ এই যে ভাষারও ইতিহাস আছে। কোন শব্দ কোথা হইতে আসিল তাহার ইঙ্গিত থাকে শব্দের বানানের মধ্যে, ইহা ছাড়া প্রত্যেক শব্দের যেমন স্বকীয় উচ্চারণ আছে, সেইরূপ উহার নিজস্ব মূর্ত্তিও আছে। কালী কাল হইবে 'বলিয়া সব কালই কালী নহে।

গল্পের বিবরণ পরকীয়া প্রেম। নূতন কিছুই নহে। মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ না হইলেই যে বিবাহ হয় না, ইহা লইয়া অচিন্ত্যবাবু বিবাহের চেয়ে বড় লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগের অনেকেই উহার গবেষণায় ব্যস্ত। সুতরাং নীতি বা আর্টের দিক দিয়া উহার বিচার না করিয়া লেখকের লিপি কুশলতার সম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করিব। লেখক সনাতনীকে বিদ্রূপ করিয়াছেন, সনাতনীকে বিদ্রূপ সকলেই করে সুতরাং তাহাতে আমাদের আপত্তি কি থাকিতে পারে। বিদ্রূপ করিলেই যশস্বী লেখক হওয়া যায় না, কল্পনাকে রূপ দিতে হয় তাহাকে প্রাণ দিয়া প্রাণবন্ত করিতে হয়। লেখক তাহা পারিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। —যতীন্দ্রনাথ মিত্র

শিরণী বা দরজীর শাস্তর—মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন সংগৃহীত। মুহম্মদ মনসুর উদ্দিনের নাম সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। হারামণি নামক পল্লী সাহিত্য সংগ্রহের অপূর্ব্ব পুস্তকখানি ইঁহারই সঙ্কলিত। শিরণী একটি উপকথা। পাবনা জেলার মুসলমান সমাজে এই উপকথাটি প্রচলিত আছে। লেখক ঐ উপ-কথাটিকে নিজের ভাষায় রূপান্তরিত না করিয়া পাবনা জেলার অকৃত্রিম গ্রাম্য ভাষাতেই রচনা করিয়া-ছেন। তাহাতে দুই কাজ হইয়াছে—প্রথমতঃ গল্পটি তাঁহার গ্রাম্য আবেষ্টণী লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে ইহা একটি মূল্যমর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। গল্পটি বড়ই চিত্তাকর্ষক।

—কালিদাস রায়

দেশ—সাপ্তাহিক পত্র, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটিড্ পরিচালিত নূতন সাপ্তাহিক। ৮ই অগ্রহায়ণ প্রথম বাহির হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার। বার্ষিক মূল্য ৫৲ প্রতি সংখ্যা ৴১০, এই সাপ্তাহিক খানিতে ৮০ পৃষ্ঠা কাগজ এবং অনেক ভাল ভাল লেখা আছে। কাগজ এবং ছাপা আর একটু ভাল হইলে এবং বিষয় গুলি আর একটু ভাল সাজানো হইলে আরো সুন্দর ও জনপ্রিয় হইবে। আনন্দবাজার হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আমরা বিরাট কিছু একটাই আশা করিয়াছিলাম। আশা করি দেশ ক্রমশঃ সর্ব্ব-জনপ্রিয় হইতে পারিবে। —অনিলা দেবী

নানা কথা

জগত্তারিণী স্বর্ণপদক :—এবার শ্রীযুক্তকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাইয়াছেন। ১৯২১ সালে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তিন হাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট পেপার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেনা—তাহার সুদ হইতে ২ বৎসর অন্তর ২০০৲ মূল্যের একটি স্বর্ণপদক বাংলার কৃতী লেখককে দেওয়া হয়। ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ শরৎ চন্দ্র। অমৃতলাল, স্বর্ণকুমারী, কামিনী রায়, দীনেশচন্দ্র এই স্বর্ণপদকের অধিকারী হইয়াছেন।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন :—একাদশ অধিবেশন ২৭।২৮।২৯ শে ডিসেম্বর গোরক্ষপুরে হইবে। এই অধি-বেশনে পাঠের প্রবন্ধ ইত্যাদী পৌষের পূর্ব্বে অধ্যাপক শ্রীযুতললিত মোহন কর, গোরক্ষপুর পাঠাইতে হইবে।

হুগলী জেলা সাহিত্য সম্মেলন :—আগামী ১৭ই ডিসেম্বর বেলা দেড় ঘটিকার সময় কোন্নগর ইংরাজী বিদ্যালয় ভবনে "হুগলী জেলা সাহিত্য সম্মেলন" অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অধিবেশনে পাঠের জন্য বর্ত্তমান সাহিত্যের মূল্যবিচার সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন দিয়াছেন।

শ্রীকানন বিহারী মুখোপাধ্যায় সম্পাদক সম্মিলন সমিতি,
শ্রীনাথ নিবাস, কোন্নগর।

কলিকাতায় যক্ষ্মা :—১৯৩১-৩২ সালে কলিকাতায় ২৯৩১ জন যক্ষ্মারোগে মারা গিয়াছে। মোট যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত মৃত হাজার ২'৫ জন উহার মধ্যে হাজার করা মুসলমান ২'৯ জন এবং হিন্দু ২'৩ জন ভারতীয় খৃষ্টানই বেশী মারা গিয়াছে উহা হাজার করা ৩'৩ জন। ১৫—২০ বৎসরের যুবকই এই রোগে বেশী আক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছে। এই সংখ্যা বড়ই আতঙ্কজনক, শিশু বিবাহই যুবতীদের এই রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর কারণ হইয়াছে কারণ এই শিশু বিবাহের দ্বারা বালিকাদিগকে অপ্রাপ্ত বয়সে বারবার গর্ভবতী হইতে হয় উহাই যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রধান কারণ।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার :—রুষ কবি ও ঔপন্যাসিক মিঃ আইভান আলোক্সভিচ বুনিনকে যখন বলা হয় যে সাহিত্যের জন্য তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে তখন তিনি বলেন ষ্টকহল্মে যাইয়া রাজা গুষ্টভের হাত হইতে পুরস্কার গ্রহণ করিবার সম্ভাবনায় আমি উল্লসিত হইয়াছি, টাকাটা নিশ্চয়ই আমার খুব কাজে লাগিবে। মিঃ বুনীন বলেন যে জর্জ্জ মেরেডিথ ও জন গলসওয়ার্দ্দীর পুস্তক তাঁহার খুব প্রিয়, গ্রাস নামক স্থানে তিনি খুব গরীবানা ভাবে বাস করিতেছেন। ১৯২০ সালে তাঁহার বিশ বৎসরের মেয়েকে লইয়া তিনি তথায় বাস করিতে আসেন মিঃ বুনীন দীর্ঘ দেহ এবং দাড়ি গোঁফ রাখেন। পশ্চিম রুষিয়ার ভরোনেশ নামক স্থানে তিনি জন্মলাভ করেন, তিনি কখনও স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করেন নাই সম্প্রতি তাঁহার পুস্তক "দি ওয়েল অব ডেজ" এর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাও উপন্যাস লেখা ছাড়া মঃ বুনীন বহু অনুবাদ করিয়াছেন এবং কয়েককটি ছোট গল্পও লিখিয়াছেন।

সহাধ্যয়নের সার্থকতা :—স্কটীশচার্চ্চ কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসে ডাঃ আকুহার্ট ছাত্রীদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে "কুমারী সুজাতা রায় বি এ পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া হকিন্স মেডেল পাইয়াছেন এবং বর্ত্তমান বৎসরের যে সব ছাত্রী আমাদের কলেজ হইতে পোষ্ট গ্রাজুয়েট শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের গর্ব্ব অনুভব করিবার বিশেষ কারণ রহিয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমাদের কলেজের কুমারী রমা বসু দর্শন শাস্ত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া হকিন্স মেডেল পাইয়াছিলেন ইনি বর্ত্তমানে দর্শ-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আমাদের এই কলেজের আরো দুই জন ছাত্রী দর্শন শাস্ত্রে ও ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণী পাইয়াছেন কুমারী চামেলী দত্ত পদার্থ বিদ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এম এস্ সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন ইনি দুই বৎসর পূর্ব্বে আমাদের কলেজের ছাত্রী ছিলেন। ছাত্রীদের কৃতকার্য্যতার বিষয় বলিতে গিয়া আমি ইহাও বলিতে পারি যে গত বৎসরের অভিজ্ঞতা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা সহাধ্যয়নের সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদিগকে অধিকতর নিঃসন্দিগ্ধ চিত্ত করিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের জন্য কার্য্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের দ্বার রুদ্ধ না করা পর্য্যন্ত উহাই বাংলার শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের একমাত্র সম্ভবপর পন্থা। শুদ্ধ মাত্র মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহের যতই সার্থকতা থাকুক না কেন বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কটের সময় তাহা আত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং ছেলেদের কলেজে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন সময়ে ক্লাস করার কোন মূল্য আছে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয় এতদ্বারা প্রকৃত পক্ষে ছাত্র-জীবনের কোন সার্থকতা সম্পাদন হয় না। এতদ্বারা দিবসের অস্বাভাবিক সময় পর্য্যন্ত লেকচারেরা ভিড় জমিয়া যায় এবং অবশিষ্ট সময় ছাত্র-ছাত্রীর নিয়মিত পাঠচর্চ্চা হইতে বিরত থাকে এবং বিশেষভাবে যাহারা হোষ্টেলে থাকে ও বাড়ীতে থাকে না তাহারা নিজেদের উন্নতিকর জন্য কোন কাজও করে না।"

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন দেবতা'—

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আপাত দৃষ্টিতে আমরা বিশ্বের যে দিকটি দেখি সেটি তাহার বাহিরের দিক। এই দিকে বৈষম্যের অন্ত নাই—যেখানে ফুল সেখানেই কণ্টক, যেখানে সুখ সেখানেই দুঃখ, যেখানে হাসি সেখানেই অশ্রু, বাহিরের জগৎকে একই কালে বেদনায় ম্রিয়মান ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত করিয়া রাখিয়াছে।

ইহা ছাড়া বিশ্বের আর একটি দিক আছে, সেটি অন্তরের দিক। এ দিকটি প্রত্যক্ষগোচর নয়—অনুভূতি সাপেক্ষ। এখানে দ্বন্দ্ব নাই, বৈষম্য নাই, মহান এবং শাশ্বত ঐক্যে এখানে এপার-ওপার এক হইয়া রহিয়াছে। ফুল এবং কণ্টক, হাসি এবং অশ্রু যাবতীয় বৈপরীত্যের মূলীভূত কারণ স্বরূপ যে চিন্ময় এক তিনিই স্থূলরূপে এই ব্যবহারিক জগৎ, সূক্ষ্মরূপে আমাদের অন্তরের দেবতা। কিন্তু এই চরাচর নিখিল জগতের অন্তর্লীন নিগূঢ় যে সত্তা তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারেন কবি ও ব্রহ্ম বেত্তা। তাই প্রাচীনেরা কাব্য-রস ও ব্রহ্ম-রসকে একই পর্য্যায়ের অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু কবিতা রচনা করিলেই কবি হয় না, সত্যকার কবিই সত্যকার কবিতা রচনা করেন। কাজেই আত্মিক জগতের এই সূক্ষ্মতম স্তরের আভাস অধিকাংশ কবির কবিতাতেই আমরা পাই না। স্থূলের সুখ-দুঃখ, লাভ ক্ষতির বস্তুগত হিসাব নিকাশেই পৃথিবীর সাহিত্য ভরপুর! যে রাজ্য সুখ-দুঃখ, লাভালাভের অতীত, শ্রেষ্ঠ কবিতা আমাদিগকে সেই আনন্দ-লোকের সন্ধান দেয়। স্থূল, চিরদিনই স্থূল তাহা ক্ষণিকের, তাহার যে আনন্দ তাহাও ক্ষণিকের—কিন্তু অতীন্দ্রীয় কল্পলোকের অনুভূতি হইতে যে আনন্দের উৎপত্তি তাহা স্থূলকে সূক্ষ্মের সহিত যুক্ত করিয়া রসে রূপান্তরিত হয়। তখন ভেদ-বুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া যায়—চর্ম্ম-চক্ষে যাহা বহু-রূপে প্রতিভাত হয়, মর্ম্ম-চক্ষে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের যোগটুকু আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। যাবতীয় অনৈক্যের মিলনের মোহানায় গিয়া আমরা দেখি যে সেই একই রস-বস্তু, যাঁহার লীলা-বৈচিত্র্যে এই বৃক্ষ-লতা, নদী-পর্ব্বত-মরুভূমি সমাকীর্ণ বহির্জগৎ ও সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভক্তি সমন্বিত অন্তর্জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে।

এই লীলার স্বরূপ এবং এই লীলাধারের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধটি বুজিতে পারাই হইতেছে চিন্তা মার্গের প্রথম এবং শেষ কথা। যে কয়জন ভাগ্যবান এই দুর্লভ সত্য-দৃষ্টির অধিকারী হইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার সমগ্র কবি-জীবনে তিনি এই লীলা ও লীলার মূলাধার সচ্চিদানন্দকে নানাদিক দিয়া উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন। বাহিরের বৈষম্যকে তিনি মায়া মাত্র মনে করিয়া উপেক্ষা করেন নাই, তিনি বলিয়াছেন অন্তরের রস-লোকে যে চিরানন্দ চির রাত্রি-দিন জাগ্রত রহিয়া বাহির হইতে আমাদিগকে প্রতিনিয়ত ভিতরের দিকে টানিতেছেন, এ তাঁহারই লীলা, আমরা সেই লীলার ক্রীড়নক, তিনি যন্ত্রী আমরা যন্ত্র—এই সত্য উপলব্ধিই তাঁহার জীবন-দেবতাবাদের গোড়ার কথা।

এখানে সহজেই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতাবাদ কি তাহা হইলে দর্শনানুমোদিত অদ্বৈত বাদের অনুরূপ? অনেকে দুইটিকে এক বলিয়াছেন—কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য টুকুই আগে বলি।

অদ্বৈতবাদ বিশ্ব ও বিশ্বের হেতুভূত সত্বাকে অভিন্ন বলেন, তাহাতে বহিঃপ্রকৃতির অস্তিত্বই অবলুপ্ত হইয়া যায়, অথচ স্থূলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই সঙ্কটের মীমাংসা হয় স্থূলকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলে। রবীন্দ্রনাথও বস্তু ও সত্বাকে অভিন্ন বলিয়াছেন, কিন্তু স্থূলকে তিনি সূক্ষ্ম আত্মিক সত্বার লীলারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সত্বা আমাদের অন্তরের অধিষ্ঠাতা, আমাদের জীবন-

দেবতা—শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-বসন্তের বিচিত্র অবর্ত্তনে, সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের অগণ্য বিপর্য্যয়ে আমাদের জীবনে অহরহ যে আনন্দ-বেদনার ঘাত প্রতিঘাত জন্মে এ সেই লীলা, জীবন দেবতা এই লীলার নায়ক :—

"কে গো অন্তরতর সে,
আমার চেতনা, আমার বেদনা তারই সুগভীর পরশে"।

যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হইতে তিনি এই 'সুগভীর পরশের' আভাস পাইয়াছেন তাহা সাধনমার্গের কৃচ্ছ্র, কঠোরতা সমুদ্ভূত নয়—সহজ আনন্দে পুষ্প যেমন আপনার দলগুলিকে বিকশিত করিয়া তুলে, তাঁহার অন্তর এই অন্তরতর সত্তাকে তেমনি সহজে উপলব্ধি করিয়াছে। কিন্তু সঙ্কট হইতেছে উপলব্ধ সত্তার স্বরূপ লইয়া।

রবীন্দ্রনাথকে অনেকেই বৈষ্ণব কবিদের অন্তর্গত করিয়া দেখেন। কিন্তু বৈষ্ণব-কাব্য ও রবীন্দ্র কাব্যের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও, অনেক বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও আছে। প্রথমেই বলা আবশ্যক যে রবীন্দ্র-কাব্য জ্ঞানমার্গের জিনিস, আর বৈষ্ণবের আত্ম-নিবেদন অহেতুক ও অকুণ্ঠিত—সহস্র অত্যাচারের গুরু মহাশয় যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী অসঙ্কোচে তাঁহাকে বলিতে পারেন—

"বঁধু কি আর বলিব আমি!
জনমে-জনমে, জীবনে-মরণে, প্রাণ নাথ হয়ো তুমি।"

কিন্তু রবীন্দ্র নাথের আত্ম-নিবেদনের মধ্যে বোঝা-পড়ার ভাব আছে, এই বোঝাপড়ার মূলে হইতেছে জ্ঞান—

"পাখীরে দিয়েছ গান,
গাহে সেই গান—
তার বেশী করেনা সে দান।
আমারে দিয়েছ' স্বর'
আমি তার বেশী করি দান।
আমি গাহি গান"

এইখানেই বৈষ্ণব কাব্য ও রবীন্দ্র কাব্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য! এবার সাদৃশ্যের দিকটি বলি—

বৈষ্ণবেরা বলিয়াছেন প্রেমের দ্বারাই জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত অবিচ্ছিন্ন রূপে মিলিত হইতে পারে। এই মিলনের নিমিত্ত জীবাত্মা নায়িকা-ভাব লইয়া নায়ক ভাবাপন্ন পরমাত্মার উপাসনা করিবেন। শ্রীমতী এই নায়িকা ভাবের মূর্ত্তিমতী প্রতীক এবং সত্য, শিব, সুন্দর রূপে যে অখণ্ড সত্তা তাহাই শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই সংক্ষেপে বৈষ্ণবীয় মধুর ভাবের সার কথা। রবীন্দ্রনাথও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন, তিনিও প্রেমকেই চরম বলিয়া স্বীকার করেন—

"আমার মিলন লাগি তুমি আস্‌ছ কবে থেকে
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায় রাখবে কোথা ঢেকে?"

এই প্রেমের বিভিন্ন অবস্থান্তর ও নায়ক-নায়িকার সাত্ত্বিক ভাবতাত্ত্বিকতা তাঁহার কাব্যে অপরূপ রস মাধুর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সাত্ত্বিক ভাবের মূলে আছে তাঁহার জীবন-দেবতাবাদ। এই জীবন দেবতাকেই তিনি কখনো নায়ক কখনো নায়িকা রূপে দেখিয়াছেন, আবার নায়ক নায়িকার অতীত অপরূপ রূপেও দেখিয়াছেন।

যখন কবি নিদ্রাঘোরে তাঁহার জীবন দেবতার ক্ষণিকের স্পর্শটুকু পাইয়া জাগিয়া বসেন এবং নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া বলেন—

"কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী" তখন তিনি নায়িকা ভাবের সাধক, আবার যখন এই জীবন দেবতা দোলমঞ্চে কবির সহিত মিলনের দোল খেলেন—

দে দোল্, দে দোল্—

বধূরে আমার কুড়ায়ে পেয়েছি, ভ'রেছে কোল", তখন কবি নায়ক' ভাবের সাধক। এই দুইটি দিকই বৈষ্ণবীয় রস-দৃষ্টির অনুকূল। কিন্তু তৃতীয় অর্থাৎ নায়ক নায়িকার অতীত অপরূপ দৃষ্টি কবি পাইয়াছেন উপনিষদ হইতে, এই উপনিষদের প্রভাবই তাঁহার জীবন দেবতা-বাদকে উজ্জীবিত করিয়াছে এবং রবীন্দ্র কাব্যের intellectual element যাহা তাহারও মূল হইতেছে উপনিষদ।

কিন্তু উপনিষদ হইতেও কবি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখিয়াছেন। তিনি তাহার অন্তর দেবতাকে অবাঙমনোগোচর রূপে দেখেন নাই—তিনি অরূপ, অসীম, অনন্ত তাহা কবি জানেন, কিন্তু তাঁহাকে নিজ জীবনের মধ্যে স্বরূপ এবং সসীম রূপে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন-

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার বিকাশ এই এত মধুর।

তোমায় আমায় মিলন হ'লে সকলই যাই ভুলে,
বিশ্ব-সাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।"

এই যে এককে বহুর মধ্যে বহু এবং বিচিত্র রূপে উপলব্ধি করা ইহা পৃথিবীর সাহিত্যে অদ্বিতীয় কিনা বলিতে পারিনা, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে যে বটে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কবিরই একটা নির্দ্দিষ্ট Philosphy বা জীবন-বেদ যাকে আমার মনে হয় রবীন্দ্র কাব্যের Philosophy হইতেছে এই জীবনদেবতা বাদ।

কবির সমগ্রজীবনের অবদান লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তিনি বরাবরই আত্মার অনধিগম্য এই সনাতন সত্বার সন্ধান করিয়া যাইতেছেন---নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গে' তাঁহার কবি প্রাণে যে বেগের সঞ্চার হয় তাহাতেই তিনি এই সৌন্দর্য্য লোকের দ্বার দেশে আসিয়া পৌছান। কিন্তু সে দ্বার মাত্র, কাজেই বাহির তাহাকে আকৃষ্ট করিতে ছাড়ে নাই। তারপর অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে যখন এই দ্বার মুক্ত হইয়া গেল, কবি অন্তর্লোকের অন্তর্দেশে প্রবিষ্ট হইয়া ইহার শোভা ও সৌরভে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তখনই তিনি অনুভব করিলেন—

"তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি,
তোমার পাইনে কূল!"

এই অনুভূতি যত উচ্চে আরোহণ করিয়াছে ততই তাঁহার চিন্তা সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে সূক্ষ্মতম স্তরে গিয়া, অবশেষে এমন এক রাজ্যে পৌছিয়াছে যেখানে সমাপ্তি নাই পরিণতি নাই, শুধু 'পথ চলারই আনন্দ'—

"শুধু ধাও, শুধু ধাও···"এই নিরুদ্দেশ যাত্রাও কবির প্রথম জীবন হইতেই তাঁহার কাব্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতা বিরহের গান—না-পাওয়া অথবা পাইয়া হারাণর ব্যাথাতেই বৈষ্ণব কবিতার জন্ম, রবীন্দ্র কবিতা পাওয়ার আনন্দেও উচ্ছ্বসিত নয়। আবার না পাওয়ার বেদনায় বিকল ও নয়—ধরি ধরি অথচ ধরিতে পারিনা, পাই পাই অথচ পাইনা—তবু সে আছে, তাহাকে চাই—সে ভিন্ন আমার দিন বৃথা, রাত্রি বৃথা, সে আমায় ডাকে, কোথায় কত দূরে তাহা জানিনা জানিতেও চাইনা—শুধু চলি...ইহাই রবীন্দ্র কবিতা। জীবনের এই বিচিত্র লীলার গানই রবীন্দ্রনাথের গান। এই গানের আড়ালে যে প্রাণের দেবতা চির জাগ্রত তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া তাই কবি গাহিয়াছেন—

"প্রতিদিন আমি হে জীবন-স্বামী
দাঁড়াব তোমার সম্মুখে।"

রাঙাশাড়ী

শ্রীমনীন্দ্ররঞ্জন মজুমদার এম, এ,

এক

গ্রামের ভিতর দিয়া একটী সরু পথ ফেরিঘাটের পাশে কাশবনের মাঝখানে গিয়া মিলাইয়া গিয়াছে। ইট শুরকির বাঁধানো রাস্তা নয়, স্থায়ী প্রশস্ত কাঁচা রাস্তাও নয়। শীতের প্রারম্ভ হইতে বর্ষার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য এই পথ পথিকের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া ক্ষীণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, আবার বর্ষার জলে কর্দ্দমাক্ত হইয়া ছয়মাসের জন্য এমনিভাবে মিলাইয়া যায়, যে ইহার ক্ষীণ চিহ্নটুকুও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বর্ষার নরম ভিজা মাটী অগ্রহায়ণের প্রথমভাগে যখন শক্ত হইয়া উঠে, তখন প্রতিবৎসর গ্রামান্তরের প্রৌঢ় রাইচরণ তাহার শাদা-কাপড়ে মোড়া ছাতাটা মাথায় দিয়া, গায়ে সেই পুরানো খাঁকি কোট চাপাইয়া এবং হাতে তালতলার চটি জোড়া লইয়া হঠাৎ একদিন দ্বিপ্রহরে সেই গ্রামের মাঝখানে দেখা দেয়। সেই হইতেই তাহার পদক্ষেপে পথ নির্ম্মাণের কাজ সুরু হয়। রাইচরণ নদীর ওপারে মাইলখানেক দূরে একটা সাহেব কোম্পানীর পাটের গুদামে সামান্য কাজ করে। ওপারে যাইবার ইহাই তাহার সহজ পথ। জ্যৈষ্ঠের প্রারম্ভে পথ যখন একেবারে অগম্য হইয়া পড়ে তখন সে নদীর ধার দিয়া অনেকটা ঘুরিয়া কর্ম্মস্থলে যায়।

রাইচরণ এই পথের বর্ষার্দ্ধের নিয়মিত পথিক। গ্রামে প্রবেশ করিয়া খানিকদূর অগ্রসর হইতেই এঁদোপুকুরের ধারে বেতসবনের অন্তরাল হইতে গদাধর পরমাণিকের মাতার কাংস্যকণ্ঠ তাহার কাণে আসিয়া পৌঁছে,—'হ্যালা, বউ, বেলা দুপুর হয়, এখনও তোর বাসন মাজাই হোলনা; বলি কখনই বা রাঁধবি ভাত? আর কখনই বা এই দুধের ছেলেকে খাওয়াবি? পুকুরের ধারে বাসনের ঝন্ ঝন্ শব্দ হয়। বোধ করি যে কয়খানা বাসন মাজা হইয়াছে, তাহাই লইয়া বধূ ত্রস্ত পাদ বিক্ষেপে চলিয়া যায়।

রাইচরণ অগ্রসর হয়;—লাউ কুমড়োর মাচার পাশে গোশালা; তাহারই সংলগ্ন ছোট ঘরখানার গা ঘেসিয়া যাইবার সময় নবদম্পতির মৃদুকলগুঞ্জন কানে আসিয়া পৌঁছে আর সঙ্গে সঙ্গে আসে বর্ষীয়সী বিধবা মাসীর তীব্র নিনাদ, তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখনও রসের কথাই ফুরোল না। বুড়ো বয়সের নতুন বউ,—এমনি ভাবেই মারতে হয়রে লক্ষীছাড়া! আমি যে খেটে খেটে সারা হলুম। কেনারাম সশব্দে ঘরের বাহির হইয়া আসে,—'দেখ মাসী, এমনি ভাবে চেঁচাবে তো আমার বাড়ীতে তোমার জায়গা হ'বেনা।

তারপরেই বাঁধে কুরুক্ষেত্র; কেহ কম নয়!

কেনারামের বাড়ী ছাড়াইতেই ছোট্ট পুকুর। পাড়ে সারি সারি আমগাছ। আমগাছের ওদিকে রুদ্ধ গৃহ হইতে হারাণ মণ্ডলের খক্ খক্ কাসির শব্দ শোনা যায়; হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলে, ওরে হারামজাদী হতচ্ছাড়ী আমার পথ্য দিবিনে? বুড়ো বাপ মরে একবার দেখেও দেখিস নে? কাহার উদ্দেশে এই সব মধুর বাক্য প্রয়োগ করা হয়, জানা যায় না।

পথের ওধারে বাঁশঝাড়ের অন্তরাল হইতে ঢেঁকির পাড়ের শব্দ দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতার বুকে প্রচণ্ড আঘাতের মতো কানে আসিয়া পৌঁছে।

রাইচরণ পথ চলে। পশ্চাতে গ্রামান্তরে তাহার ক্ষুদ্র গৃহ, সম্মুখে নদীর অপর তীরে তাহার গন্তব্য স্থল; মাঝখানে গ্রামের সঙ্কীর্ণ ও আবিলতাময় জীবন প্রবাহের অদ্ভুত ও বিচিত্র সুর নেপথ্য হইতে তাহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছে, কিন্তু অন্তরে এতটুকু কৌতুহল সৃষ্টি করে না। অতীত জীবন হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে যেন

উল্কার মত ঠিকরাইয়া আসিয়া আজ এমনই এক পথ ধরিয়া চলিয়াছে, যে চলার মধ্যে না আছে ছন্দ ও বৈচিত্র্য এবং না আছে আনন্দ।

নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে বৈশাখের তপ্ত রৌদ্র নিস্তব্ধ ধরিত্রীর বুকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। গদাধরের বাড়ীর ভিতর চিরদিনকার সেই চীৎকার! শাশুড়ীর কথা শুনিয়া বধূর মেজাজ আজ চড়িয়া উঠিল; বধূ কি একটা জবাব দিতেই বেতসবনের অন্তরালে একটা খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল। কেনারামের মাসীর কণ্ঠস্বর আজ শুনা যায়না। তাই বোধ করি বৈশাখের উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরেও তাহাদের প্রেমালাপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

শরীরটা তেমন সুস্থ বোধ না করায় রাইচরণ আজ অতি সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়িল; ধীরে ধীরে পরাণ মণ্ডলের বাড়ীর পুকুরের ধারের আমগাছগুলির নিম্নে আসিয়া বসিল। জামার হাতায় কপালের ঘর্ম্মবিন্দু মুছিয়া ফেলিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

'কি চাও এখানে? তোমার নাম কি?' বলিতে বলিতে একটি ৮.১০ বছরের মেয়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বস্ত্রাঞ্চল কাঁচা আমে পরিপূর্ণ; হস্তে তাহার একটা সুদীর্ঘ বাঁশের কঞ্চি। বুঝা গেল সে বৃক্ষ হইতে আম্র সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিল। রাইচরণ যেমন ছিল তেমনই বসিয়া রহিল, কোনও উত্তর দিল না। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে বাক্যব্যয় করা তাহার অভ্যাস নয়।

বালিকা উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই আবার বলিল, "এদিকে একবার এসে দেখনা কত বড় দুটা আম ঐ উঁচু ডালটাতে ঝুলছে! কিছুতেই নাগাল পেলাম না। পেড়ে দাওনা আম দুটো!"

রাইচরণ এইবার তাহার মুখের দিকে তাকাইল। অন্যদিকে সহসা দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। চঞ্চলতাময় নিবিড় কালো চোখ দুটী আর এক জোড়া কালো চোখের কথা তাহার স্মরণপথে জাগাইয়া তুলিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি নাম তোমার?"

"মিণ্টু"

রাইচরণ আবার কি চিন্তা করিতে লাগিল।

বালিকা বলিল, 'চলনা, আর দেরী কোরো না। বাবা আবার এক্ষুনি ডাকবেন!"—বলিয়াই তাহার হাত ধরিয়া টানা টানি আরম্ভ করিল।

"এই যাচ্ছি" বলিয়া রাইচরণ উঠিয়া দাঁড়াইল। পাশের ঘর হইতে পরাণ মণ্ডলের কাসির আওয়াজ শুনা গেল; পরক্ষণেই ভাঙাগলার শব্দ আসিল,—"না; আর পারিনে। এক মুহূর্ত্ত স্থির নেই। ওরে হারামজাদী হতচ্ছাড়ী—"

"বাবা ডাক্‌ছেন" বলিয়াই মিণ্টু আর কালবিলম্ব না করিয়া ছুটিয়া গেল।

দুই।

দিন পাঁচেক পরের কথা। মধ্যাহ্নের এলোমেলো বাতাস নারিকেল ও শুপারি গাছের পত্রবহুল অগ্রভাগকে ধারণ করিয়া সজোরে দোলা দিতেছিল; পরাণ মণ্ডলের বাটীর সম্মুখস্থ আমগাছের তলদেশে বসিয়া প্রৌঢ় রাইচরণ ও বালিকা মিণ্টু নিভৃত আলাপনে নিযুক্ত ছিল। আম পাড়িবার সূত্র ধরিয়া একয়দিন মধ্যাহ্নে কিংবা অপরাহ্নে তাহাদের ভিতর যে আলাপ আলোচনা চলিত তাহাই আজ নিবিড়তর হইয়া উঠিয়াছে। রাইচরণ বলিতেছিল, "আমায় দাদা" বলে ডাক্‌তে হয়।"

বালিকা মুখ ফুলাইয়া বলিল, "ভারিতো দাদা, একবার নিয়ে গেলে না ওপারে তোমাদের আফিস দেখাতে! যাও আমি তোমায় দাদা বল্‌ব না। "

টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া কয়েকটা আম প্রবল বাতাসে বৃক্ষচ্যুত হইয়া অদূরে গড়াইয়া পড়িল। বালিকা উহা কুড়াইয়া আনিয়া বলিল, "তোমাদের আফিস খুব সুন্দর, না?"

কথাটা সমর্থন করিবার জন্য রাইচরণ সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"হুঁ"।

দুই হাঁটুর উপর ভর দিয়া তাহার মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বালিকা বলিল "একদিন নিয়ে চলনা দাদা সেখানে!'

"সে যে অনেক দূর!"

"ইস্ ভারি দূর! আমি বুঝি আর সেখানে হেঁটে যেতে পরি না?"

"আচ্ছা নিয়ে যাব আর একদিন।"

বালিকার চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ওপারে

তাহার আফিসের বর্ণনা আজ তিনদিন ধরিয়া শুনিয়া আসিয়াছে। তাহাই কল্পনার বিচিত্র রঙ্‌য়ে উজ্জ্বলতর হইয়া তাহার চোখের সমুখে ভাসিয়া উঠিল।—দূরে আকাশ ও পৃথিবীর মিলনক্ষেত্র, ঘন গগনস্পর্শী সন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী। সম্মুখে প্রকাণ্ড গুদাম মজুরদলের সারাদিনব্যাপী কোলাহলে মুখরিত; বৃহৎ সুরম্য অট্টালিকায় সাহেবের আফিস; আর উহারই সম্মুখস্থ প্রস্ফুটিত উদ্যানের ভিতর দিয়া পাকা লাল রাস্তা অদূরে রেলপথ পর্য্যন্ত প্রসারিত; রেলগাড়ী যাত্রিদল লইয়া কোন্ এক রহস্যময় রাজ্য হইতে উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া আসিতেছে।

আর রাইচরণের দৃষ্টি পশ্চাতে—বহু পশ্চাতে পদ্মার এক নির্জ্জন তীরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। সুখশান্তিময় গৃহের ছবিখানা মানসপটে ভাসিয়া ওঠে। পল্লীর ভালবাসা কন্যার আব্দার ও অভিমান জড়িত অজস্র মধুর স্মৃতি সমস্ত চিত্ত অভিভূত করিয়া ফেলে। মিণ্টুর দিকে তাকাইয়া থাকে; ভাবে,—এরই মতো তাহার কন্যাটীর ও চিরচঞ্চল স্বভাব এবং আব্দার ও অভিমান; এরই মতো তাহারও নিবিড় কালো চোখের অপরূপ শ্রী; এরই মতো—

বালিকা দেখে, রেলগাড়ী ছুটিয়া আসিয়া গুদামের পাশের ষ্টেশনটায় থামিল যাত্রিদল ওঠে নামে, কুলি চিৎকার করে। গাড়ীর বাঁশী বাজিয়া ওঠে।—বাঁশীর শব্দ যেন তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সচকিত ভাবে রাইচরণের মুখের দিকে ফিরিয়া তাকায়, বলে, "কালই নিয়ে যাবে কিন্তু।"—

রাইচরণ ও সচকিত হইয়া বলে, "কাল নয়; এই তিন চার দিন পর মস্তবড় মেলা হ'বে সেখানে বারুণির সময়, তখন নিয়ে যাব।" - বলিয়াই আর বিলম্ব না করিয়া আপনার পথ চলিতে আরম্ভ করে; ভাবে,—এ'রই মতো সেও একদিন গ্রামান্তরে মেলা দেখিতে চাহিয়াছিল; আশ্চর্য্য! সে'ও বারুণিরই মেলা। নদীপথে দু'ক্রোশ দূরে সেই গ্রাম। সেই গ্রামেই তাহার শ্বশুরালয়; স্ত্রীও চলিল সঙ্গে। ফিরিবার পথে কালবৈশাখীর উন্মাদ নর্ত্তনে তাহার সাধের সংসার একমুহূর্ত্তে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া নিঃশেষে উড়িয়া গেল। সেই শুধু ভাগ্যবিড়ম্বিত হইয়া বাঁচিয়া রহিল। তারপর নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়া সংসার-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আজ কোথায় সে আসিয়া পড়িয়াছে!

দূর হইতে ফেরিঘাটে নৌকা অপেক্ষা করিতেছে দেখা গেল। দ্রুতপদে নিকটে আসিতেই মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। আবার আধঘণ্টার পালা, রাইচরণ একটা গাছের ছায়ায় উপবেশন করিয়া সমুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। পাশাপাশি দুইটী বালিকা, উভয়ের ভিতর কি অদ্ভুত সামঞ্জস্য!

তিন

মিণ্টু অস্থির চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে ছিল; দূরে বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে রাইচরণের শাদা ছাতা দেখা যাইতেই ছুটিয়া আসিল, নিকটে আসিতেই বলিল "আজ বারুণি।"

রাইচরণ আজ তিনদিন অফিসে যাইবার কিংবা সেখান হইতে ফিরিবার সময় এখানে অপেক্ষা না করিয়াই সোজা চলিয়া গিয়াছে। আজও তাহার সে ইচ্ছাই ছিল। সংসারের সকল বন্ধন যাহার ছিন্ন হইয়াছে, নূতন বন্ধনে আবার আপনাকে ধরা দেওয়া তাহার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বালিকার কথা শুনিয়াই সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

বৃক্ষোপরি হইতে পাখীর বিচিত্র কলরব এই শান্ত দ্বিপ্রহরে রাইচরণের কাণে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। দূরে একটা কোকিল সমস্ত শব্দকে ছাপাইয়া ডাকিয়া উঠিল। বাতাসের মৃদু শিহরণে গাছের পাতা কাঁপিয়া উঠিল।

বালিকা আবার কহিল. "আজ নিয়ে যেতেই হবে আজ যে বারুণি!"

রাইচরণ কহিল, "আজ থাক্।"

সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বালিকা কহিল, "কিছুতেই না। আজ নিয়ে যেতেই হবে।"

"তোমার বাবার কাছে তাহ'লে বলে এস।"

"তার কাছে আগেই বলেছি। বল এক্ষুনি। আর দেরী কোরো না।"

রাইচরণ তাহাকে সঙ্গে নিয়া চলিল।

রেললাইনের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের নিম্নে খোলা জায়গায় মেলা বসিয়াছে। সারি সারি ছোট ছোট চালা

তৈরী হইয়াছে; তাহারই মাঝে দোকানী দ্রব্যসম্ভার সাজাইয়া বসিয়াছে। লোকজনের সমাগমে এবং তাহাদের কোলাহলে প্রত্যেকটী সুসজ্জিত দোকানই আজ মুখরিত হইয়া যেন এক মায়াপুরী রচনা করিয়াছে। নিস্তব্ধ নিরানন্দ পল্লীর বাহিরে যে এমনই এক বৃহত্তর জগৎ অপরূপ সুষমামণ্ডিত হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে,—তাহা আজই এই প্রথম বালিকা মিণ্টু স্বচক্ষে দেখিল।

দিবসের শেষ আলোরেখা মিলাইয়া গেল। রাইচরণ মিণ্টুর হাত ধরিয়া একটী দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল বালিকার বাঁ হাতে একটী কলের রেলগাড়ী, অঞ্চলে কতকগুলি চিনামাটির পুতুল এবং বিবিধ খেলার সামগ্রী। রাইচরণ কহিল, "আর কিছু চাই? এখন বাড়ী যাই চল। সন্ধ্যা হয়ে এল।"

দোকানে রঙ্‌বেরঙ্‌য়ের শাড়ী সাজানো রহিয়াছে। উহারই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বালিকা বলিল, "রাঙ্গাশাড়ী কিনে দাও একখানা।"

রাইচরণের সঙ্গে যে সামান্য অর্থ ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়াছে, রাঙাশাড়ী কিনিয়া দিবার মত অর্থ আর তাহার সঙ্গে ছিল না। বলিল, "আর একদিন কিনে দেব খন আজ বাড়ী চল।"

মিণ্টু সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না আজই কিনে দিতে হবে, ঐ দেখ কেমন সুন্দর শাড়ী। কিনে দাওনা একখানা।"

রাইচরণ বলিল "আজ থাক্; আর একদিন কিনে দেব। এর চাইতে ভাল শাড়ী কিনে দেব। নিশ্চয়ই দেব। আজ বাড়ী চল।"

ঘণ্টাখানেক রাত হইয়াছে। মিণ্টুকে লইয়া তাহাদের বাড়ীর সমুখে আসিতেই সে ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। বাড়ীর ভিতর হইতে পরাণ মণ্ডলের ভাঙাগলা শুনা গেল, "হারামজাদী হতচ্ছাড়ী, ধিঙ্গি মেয়ে; কোথায় গেছ্‌লি? আঃ মর্! হাতে ওসব কি?—পরক্ষণেই অবিশ্রান্ত চপেটাঘাত ও অস্ফুট কান্নার শব্দে আর কিছুই শুনা গেলনা।

রাইচরণ ক্ষণেক দাঁড়াইল। তারপর আবার আপনার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

চার

পরদিন আফিসে যাইবার সময় রাইচরণ দেখিল পরাণ মণ্ডল ঘর ছাড়িয়া পথের ধারে লাঠি ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাইচরণকে দেখিতেই সে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ আরম্ভ করিল। উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই, অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে রাইচরণ বয়স্থা মেয়েকে, মেলা দেখাইতে নিয়া ভয়ানক অন্যায় করিয়াছে, এবং সেজন্য তাহাকে আর কোনোদিন এই বেসরকারী পথ দিয়া অগ্রসর হইতে দেওয়া হইবে না। ইহার ব্যতিক্রম হইলে তাহাকে এমন কঠোর সাজা দেওয়া হইবে, যাহার ফলে তাহার জীবনসংশয়ও হইয়া উঠিতে পারে। এই বিরোধে জন্যই হোক্, কিংবা নূতন বর্ষায় এই পথ এরই মধ্যে অগম্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই হোক্,—রাইচরণ পরদিন হইতে এই পথ দিয়া যাতায়াত পরিত্যাগ করিল।

ছয়মাস পর একদিন শরৎ কালের দ্বিপ্রহরে রাইচরণ আবার সেই পথে পা বাড়াইল। গ্রামের প্রান্তে ন্যাড়া গাছটা তেমনিভাবে দাঁড়াইয়া আছে; শস্যসবুজ প্রান্তরের পার্শে আপনার নীরস শুষ্ক চেহারা নিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া ভগবানের দরবারে কি নালিশ করিতেছে। কত দিন রাইচরণ ইহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। ঝাঁ ঝাঁ রোদের মাঝে এই পত্রবিহীন উন্নত শীর্ষ বিদ্রোহী বৃক্ষটি কতদিন তাহার অন্তরের ভিতর কোথায় সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতে চহিয়াছে। এই সৃষ্টিছাড়া গাছটা আজও তাহাকে নীরব অভিনন্দন জানাইল।

রাইচরণ অগ্রসর হইল। সেই এঁদো পুকুর বেতস বন অন্তরালে বধূর উদ্দেশে শ্বাশুড়ীর চীৎকার। বৈচিত্র্য এতটুকু নাই। হ্যাঁ আছে, বৈকি! শ্বাশুড়ী বধূর ঝগড়া আর একতরফা হয় না; বধূর কণ্ঠস্বর ও আজ বাড়িয়া উঠিয়াছে। পুকুর ধারের মেটে ঘরখানা গত বর্ষায় একেবারে ধ্বসিয়া গিয়াছে; বাড়ীর আব্রু সরিয়া যাওয়ায় অন্দর আজ সদরে আসিয়া মিশিয়াছে; এবং বধূও এই অল্পকালেই আব্রুবিহীন জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বৈচিত্র্য আছে বৈকি! কেনারামের মাসী গৃহকোণে পড়িয়া থাকিয়া জ্বরে গোঙায়; আর চীৎকার

করিয়া কাঁদে,—'কেনা আমার কোথায় রে ? . ঘরের গা ঘেসিয়া যাইবার সময় জানলাটার ভিতর দিয়া রাইচরণের দৃষ্টি হঠাৎ ঘরের ভিতর গিয়া পৌঁছিল,—দেখে রুগ্না মাসীর পাশে বসিয়া শাদা থানপরা কেনারামের বধূ ছোট্ট দুখানি খালি হাতে চোখের জল মুছে।

পরাণ মণ্ডলের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া রাইচরণ দাঁড়াইল। অবিচ্ছিন্ন খক্ খক্ কাসির শব্দ আর শুনা যায়না উৎসুক দৃষ্টি চারিদিকে কাহাকে খুঁজিয়া ফিরিয়া আসিল। পরাণ মণ্ডলের প্রতিবেশী ও জ্ঞাতি নিধু মণ্ডলকে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়াই রাইচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "পরাণের খবর কিহে মণ্ডলের পো ?"

নিধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'পরাণ ? তার যে আজ তিনমাস হয় কাল হয়েছে।

রাইচরণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিধু বলিল— সংসারে ঐতো একটা মাহারা মেয়ে, বাপকে হারিয়ে আজ আমারই ঘাড়ে এসে পড়ল। মেয়েটাও জ্বরে ভুগছে আজ দুমাস ধরে, ভগবানের কি ইচ্ছা জানিনে। রাইচরণ সমস্ত কথাই নীরবে শুনিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ বলিল "মেয়েটাকে অনেক দিন দেখিনা, চল একবার দেখে আসা যাক্"।

জানালাহীন সংকীর্ণ গৃহ। একপ্রান্তে জীর্ণ তক্তোপোষ তাহারই উপরে ততোধিক জীর্ণ একখানা মাদুরের উপর শতচ্ছিন্ন কাঁথা বিছানো। আবরণহীন তেলসিটে একটা বালিসের উপর মাথা রাখিয়া আপনার রোগশীর্ণ দেহটাকে এলাইয়া দিয়া বালিকা সেই বিছানাতে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া আছে। শিয়রের ধারে একটা ভাঙা কাঠের বাক্সের উপর অর্দ্ধভুক্ত বার্লির বাটি এবং গোটা দুই ঔষধের শিশি। ঘরের একপাশে প্রতিদিনের আবর্জ্জনা জমিয়া স্তুপাকার হইয়া রহিয়াছে। রাইচরণের পাদশব্দে বালিকা চোখ মেলিয়া চাহিল, অর্থহীন দৃষ্টি নিয়া রাইচরণের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল,তারপর হঠাৎ একটু উত্তেজিত স্বরেই বলিয়া উঠিল, "মেলা ভেঙেছে ? উঃ! কত লোক ! কত লোক, এসেছে মেলায়। ওটা বুঝি কলের পুতুল ? বাঃ, কি সুন্দর মাথা নাড়ছে ! কত দাম ? পাঁচ টাকা ? ইস্,—ভারী তো জিনিস !—"

রাইচরণ ডাক দিল,—"মিণ্টু, দিদি !" ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার মুখের উপর গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বালিকা বলিল, 'ওঃ তুমি ? তুমি এসেচ ? রাঙাশাড়ী নিয়ে এসেচ ?. আনোনি ? আমায় মেলায় নিয়ে যেতে এসেচ ? রাঙাশাড়ী কিনে দেবে ? চল, এই আমি যাচ্ছি,—বলিয়াই বালিকা তৎক্ষণাৎ বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং বিছানার উপর এলাইয়া পড়িল।

নিধু বলিল, "এমনি ভুলতো রোজই বক্‌ছে ; কিছুতেই উপশম হচ্ছে না।"

রাইচরণ এ কথার কোনও উত্তর দিল না। শুধু আর একবার কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল; "মিণ্টু,—দিদি !

মিণ্টু কোনও সাড়া দিল না, শুধু তাহার ঠোঁট দুইখানি একবার নড়িয়া উঠিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে রাইচরণ নিধুর সঙ্গে দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছে মিণ্টু ?"

নিধু উত্তর করিল, 'একটু ভাল বলেই মনে হয়,

রাইচরণ বলিল, 'ভাল করে ওর চিকিৎসা করাও, আর এই নাও দশটা টাকা এই জন্যে। আর এই শাড়ীখান্,—হ্যাঁ একদিন চেয়েছিল বটে এক খানা শাড়ী ; এটা ওকে দিও',—বলিতে বলিতে সে একখানা শাড়ী ও দশটি টাকা বাহির করিয়া নিধুর সম্মুখে ধরিল।

নিধু এই অযাচিত করুণার কারণ বুঝিতে পারিল না। টাকা কয়টা গ্রহণ করিয়া ট্যাকে গুজিতে গুজিতে বলিল "টাকা আম নিলুম বটে ! কিন্তু শাড়ীখানা তো নিতে পারিনা।'

"কেন ?"

'রাঙাশাড়ী যে ওর পরতে নেই ?"

কথাটার অর্থ বুঝিবার জন্য রাইচরণ নিধুর মুখের দি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। নিধু আবার ব "ওযে বিধবা !"

রাইচরণের নিকট নিধুর কথা আরও হেঁয়ালি [illegible] বোধ হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কার কথা বলছ তুমি ?"

নিধু বলিল, "মিণ্টুর কথা,—পরাণের মেয়ে।—"

রাইচরণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুখে তাহার

একটী শব্দ ও উচ্চারিত হইল না। কথাগুলির অর্থ যেন সে এখনও স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিল না।

নিধু বলিতে লাগিল, "ওযে বিধবা এ কথা ও জানত না, অনেকেই জানত না। চার বছর বয়সে বিয়ে হয়, বছর না যেতেই বিধবা হয়; কেমন করে জানবে বল? বাপ মা এতদিন একথা চেপেই রেখেছিল; কিন্তু পাড়ার পাঁচজনে এই নিয়ে কানাঘুষো করেছে। আমরা আর সে কথা কেন চেপে রাখতে যাই বল। মেয়েরও তো বয়েস হ'চ্ছে; সত্যি কথা জানাই ভাল। বাপ মার যাওয়ার পরই একথা তাকে জানিয়েছি, বুঝিয়েছি; কিন্তু এখনও ও তেমনি হেসে খেলেই বেড়ায়; কিছুই বোঝে না।"

দশটী টাকা অপ্রত্যাশিতভাবে হাতে আসিয়া পড়িয়াছে, আনন্দের আবেগে সে অনেক কথাই বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু রাইচরণ তখনও নীরব রহিয়াছে দেখিয়া সে তাহার মুখের দিকে তাকাইল; তারপর বলিল, "চল একবার বাড়ীর ভেতর; ওকে দেখ্‌বে।"

নিধুর সঙ্গে রাইচরণ নিঃশব্দ পাদ বিক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করিল; দেখিল, মিণ্টু সেই বিছানাতেই তেমনি ভাবে পড়িয়া আছে। তাহার নিরাভরণ দেহ কল্য কেমন করিয়া যেন তাহার চক্ষু এড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহাই আজ দিবালোকের মত স্বচ্ছ হইয়া তাহার চক্ষের সমুখে প্রতিভাত হইয়া নিধুর কথার সত্যতা প্রমাণ করিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া শাদা ধব্‌ধবে থানখানা যেন অগ্নি-শিখার মতই লক্‌লক্‌ করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া তাহার বোধ হইল। রাইচরণ কয়েক মুহূর্ত্ত সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল; 'মিণ্টু' কিংবা 'দিদি' বলিয়া ডাকিবার শক্তিও তাহার ছিল না, নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার পথে চলিতে লাগিল।—

পাঁচ

মিণ্টু সুস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাকে আর বাড়ীর বাহিরে দেখা যায় না। রাইচরণ প্রত্যহ একবার এই বাড়ীর সমুখে আসিয়া দাঁড়ায়, কি শুনে এবং পরক্ষণেই ধীর পদ বিক্ষেপে চলিয়া যায়। অন্দর হইতে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর তাহার কাণে আসিয়া পৌঁছে,—"মর্‌ হারামজাদী, এত লোকে মরে, তুই মারিস্‌ নে কেন? বাপ মা স্বামী সব খুইয়েছে; যমের বাড়ীর পথটা কি শুধু তুমিই দেখ্‌তে পেলে না?"—অন্দরের রহস্য পরিষ্কার হইয়া যায়। নিরাশায়ে সারাটা বুক ভরিয়া ওঠে। দিন এমনিভাবে কাটে।

ভিতর হইতে নিধুর স্ত্রীর চীৎকার শুনা যাইতেছিল,—"মেয়ের হুঁস হবে কবে? আজ যে একাদশী! শেষকালে জাতধর্ম্ম সব খোয়াবি? এই রাখচি তোকে ঘরে বন্ধ করে; দেখি কে তোকে খেতে দেয় আজ?"—ঘরের পাশে রাইচরণ নীরবে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল; পশ্চাৎ হইতে নিধুর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "বলি রাইচরণ, তা'হলে কথাটা ঠিক?"

রাইচরণ চমকিয়া উঠিল; পরে কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "কি?"

নিধু কহিল, "পরাণ বেঁচে থাকতে সে যে তোমায় একদিন শাসিয়ে দিয়েছিল,—শুনেছি। মেয়েকে ভুলিয়ে মেলায় নিয়ে যাওয়াই বা কেন আর রাঙাশাড়ী কিনে দেওয়াই বা কেন? আর তাই তো ভাবি, সাহায্যের নাম করেই বা সেদিন এই টাকাটা দেওয়া কেন? পাড়ায় যে টী টী পড়ে গেছে, শোনোনি কিছু? নির্লজ্জ কোথাকার! —আজ আবার এখানে ওৎ পেতে বসে আছ?—"

ঘৃণা লজ্জা কিংবা ক্রোধ,—রাইচরণের অন্তরে কোন ভাবেরই উদয় হইল না; উদয় হইল শুধু বেদনার একটা সুতীব্র হাহাকার, আর মনে হইল, এ' এক স্বপ্নাতীত ব্যাপার! তর্ক করিয়া আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের ক্ষমতা তাহার ছিল না, প্রবৃত্তি ও ছিল না। অস্ফুটভাবে সে কি বলিল, বুঝা গেল না, তারপরেই নিধুর পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল।

গভীর নিশীথে রাইচরণ হঠাৎ ঘুম হইতে উঠিল, প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরের মাঝে বিচরণ করিতে লাগিল। মিণ্টুর সেই রোগ ক্লিষ্ট চেহারাখানা চোখের সমুখে ভাসিয়া উঠিল, ঘরে জিনিষপত্র সামান্যই ছিল। সমস্ত বাঁধিয়া ফেলিয়া সে একটা পাটরি তৈরী করিল। তারপর উহা কাঁধে ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও প্রহরখানেক রাত আছে। নিশীথিনীর বিরাট কালো মূর্ত্তি সমগ্র বিশ্বকে

আচ্ছন্ন করিয়া আছে; আকাশে অগনিত নক্ষত্র। রাইচরণের মনে হইল;—দিবসের আলোকে আবার পৃথিবীর কুৎসিত নগ্ন মূর্ত্তি প্রকাশিত হইবে; শ্যামলা ধরণীর অন্তরের করুণ নিঃশ্বাসটী শুনা যাইবে;—এই বিরাট অন্ধকারই পৃথিবীর খাঁটী রূপ; কত অশ্রুজল, দীর্ঘশ্বাস এবং হাহাকার কে ঢাকিয়া রাখিয়াছে আঁধারের এই কল্যাণময়ী মূর্ত্তি!

রাইচরণ একবার পশ্চাতের দিকে তাকাইল; তারপর সেই নিবিড় আঁধারের মাঝে গ্রামের পথে নামিয়া চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পদ্ম

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভরাদীঘির কালো—ঘন গভীর জলে
এই দিনের শেষে,
ওগো বসিয়া র'লে—ওই তিমির তলে
অতি মলিন বেশে।
ওই ক্লান্ত বায়ে কাঁপে সন্ধ্যা বধূ,
রাঙা হিয়ার পরে নাহি জিয়ানো মধু,
ওই—আকাশ দিয়ে বুঝি বাউল বঁধূ
হারানো দেশে
গেছে পাল্‌টী তুলে—গেছে পান্‌সি বেয়ে
স্বপনে ভেসে।
তার উজল রঙে জ্বালা হাসির বাতি
নাই জীবন পুরে,
এই নীরবথনে—কোথা মিলন ভাতি
কোথা মিলায় দূরে!
ওই—গাছের ফাঁকে নামে ধূসর ছায়া,
ওই—ঘুমের ঘোরে ঢুলে ভূধর কায়া,
অয়ি পীতমহারা! ওগো অরুণ জায়া
মোহন সুরে—
বাজে করুণ গীতি—বাজে ও দুটী কাণে
পূরবী ঝুরে।

কেন আঁখির জলে তুমি ভিজাও মালা
"আঁকো বিষাদ ছবি
কাল্‌প্রভাতী বেলা পুনঃ করিয়া আলা
চুমু মাখাবে রবি।
প্রিয়—পূবেরি কোণে ধীরে উদিয়া কবে,
তনু—শিহরি সুখে সই পুলকি রবে,
এই—নিশীথ শেষে ওলো খুসীযে হবে
মাধুরী লভি
তুমি খুলিও পাতা—কল হংস দলে
পড়িবে সবি।
সই! বিরহ বিনে—ভালোবাসা যে মিছে
তুমি তাহা কি জানো?
কেন বিবশ হ'য়ে—ওই সিঁথীর নীচে
বৃথা আঁচল টানো!
আর—মুদোনা পাতা চাও আমার পানে,
গাঁথ—বিরলে কথা লও রাতির গানে
ভোলো—যাতনা যত মোর কোমল তানে
হৃদয়ে আলো—
আশা-অরুণ-আলো—যাবে আঁধার যাবে
জাগিবে প্রাণও।

আর্টে বিপত্তি

শ্রীদেবীদাস চট্টোপাধ্যায়

পরেশ গাঙ্গুলীর চেহারাটী অতি সুন্দর। গোঁফ-দাড়ি কামান ঢল ঢল মুখখানি। ফুট ফুটে রং ইহার সহিত বয়সের তারুণ্য। বাড়ীতে অধিকাংশ সময়েই সে গরদের পাঞ্জাবী ও মিহি ধুতি পরিয়া থাকে। কিন্তু বাহিরে যাইবার সময় পরে গরদের কাঁপড়। মুখে সর্ব্বদা সিগার এবং হাতে যষ্ঠী তাহার চেহারাকে বেশ একটু অকাল গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত করে।

পরেশের যখন বিবাহ হয় তখন তাহার বয়স মাত্র ১৮ বৎসর, আই, এ, পাস করিয়া বি, এ, পড়িতেছে এবং তখনও তাহার পিতা জীবিত ছিলেন। কিন্তু তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। তখন তার স্ত্রীর ব্রীড়াবনত ভাবটি লাগত বেশ,...কিন্তু এখন আর তাহা ভাল লাগে না। ইহার জন্য সে স্ত্রীর কাছে মাঝে মাঝে অনুযোগ করে। ফলে উভয়ের মধ্যে ধীরে একটা দুর্লজ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। পরেশ বলে—"দেখ তোমার ও জড়ো সড়ো পুঁটুলি বাঁধা স্বভাবটা ছাড়ো ওটা আমার মোটেই ভাল লাগেনা।"

বেচারী মনোরমা ইহাতে আরও জড়ো-সড়ো হইয়া পড়ে। বলে "আমি কি করলে তোমার ভাল লাগে বলে দাও আমি যথা সাধ্য তাই কর্ব্ব।"

পরেশ শ্লেষের হাসি হাসিয়া ডেস্ক হইতে খান কয়েক নোট বাহির করিয়া পকেটে পুরিতে পুরিতে উত্তর করে "তা হ'লে সে বিদ্যে শেখাতে একটা মাষ্টারের দরকার আচ্ছা দেখে আসি কোথায় পাওয়া যায়।" বলিয়াই বাহির হইয়া পড়ে।

এই পরিবর্ত্তনের টানে সে হইয়া উঠিল মদ্যপ ও দুশ্চরিত্র। পূর্ব্বের বন্ধুগুলির স্থলে দেখা দিল নূতন বন্ধু। তাহাদের সৎপরামর্শে ও সাহচর্য্যে সে ক্রমে একটা সর্ব্বস্বান্ত নেশাখোর হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু টাকা তাহার চাই-ই। তাই কিছুদিন পূর্ব্বে তাহারা কয়জন মিলিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল একজন "ক্যাসিয়ার আবশ্যক ৫০০্ জমা দিলে ১০০্ মাহিনা।" ইহার জন্য আবেদনকারীরও অভাব হইল না। মনোনীত লোকটি প্রার্থীত ৫০০্ জমা দিল এবং নিযুক্তি পত্রও পাইল কিন্তু যথাসময়ে কর্ম্ম করিতে গিয়া আফিসের কোনও সন্ধান পাইল না। বাড়ীওয়ালা তাহাকে বেয়াকুব বলিয়া তাড়াইয়া দিল। এদিকে পরেশ তখন সহচরবর্গ লইয়া মহ স্ফূর্ত্তিতে মশগুল।

২

বৈশাখের দ্বিপ্রহর বেলা কলিকাতায় রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের একটী বাড়ীর দ্বিতলস্থ একটী কক্ষে ইলেকট্রিক পাখা চলিতেছে। তাহার জানালাগুলি সব বন্ধ। গৃহস্বামী নিবারণ বাবু আরাম-কেদারায় বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি জমীদার লোক কলিকাতায় ৪৫ খানি বাড়ী আছে। সংসারে পুত্র সতীশ, কন্যা সরলা ও স্ত্রী হেমাঙ্গিনী। সতীশ গত বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া ফেল হইয়া ছিল। তখন পিতা বলিয়াছিলেন, "তাতে আর হয়েছে কি? আর একটু ভাল করে তৈয়ারী ক'রে আবার এক্জামিন দে, না হয় ইংরাজী ও অঙ্কের জন্য দুজন মাষ্টার ঠিক করে দি।"

কিন্তু সতীশের মনের ভাব অন্যরূপ। তাহার ইচ্ছা সে বায়স্কোপে অভিনয় করে এবং ইদানিং তাহার চেষ্টাও করিতেছে। সে মনে করে সে একজন "আর্টিষ্ট" তাহার সমকক্ষ কেহ নাই। আর্টিষ্টের একান্ত অভাবই দেশী ফিলমগুলির দৈন্যের কারণ। এজন্য গোপনে ও প্রকাশ্যে নানাভাবে আর্টের চর্চ্চা করে। সে জুলপী বড় করিয়াছে। মাথার লম্বা চুল। স্নানের পরে চুলের প্রসাধনে তাঁহার রোজ প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। নানা রকমের সুগন্ধি তৈল, হেয়ার লোসন যথারীতি লাগাইয়া চিরুনী ও ব্রাস দিয়া অনেকক্ষণ ঘষিয়া ইস্ত্রি করিতে হয়।

তারপর আয়নাখানির সামনে দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া পার্শ্বদৃশ্য Profile ও সম্মুখ দৃশ্য Front view ইত্যাদি অনেকক্ষণ ধরিয়া অনুধাবন করে। তারপর আহার ও স্কুলে গমন। কাজেই স্কুলে পৌঁছিতে অনেক দেরী হইয়া যায়। রাস্তায় বাহির হইয়াও মাথা সোজা রাখিয়া, এদিক-ওদিক না ফিরিয়া ধীরে ধীরে পথ চলে। হিন্দুস্থানী মেয়েরা যেরূপ মাথায় ঘটির উপর ঘটি দিয়া "পানিয়া-ভরণে" যায় অনেকটা সেই রূপ। যাহাহউক, সতীশ অনিচ্ছাসত্বেও পুনরায় পড়ায় মন দিল।

কয়েকদিন হইল "পরী" সিনেমাতে একটা বাংলা ফিলম্ চলিতেছে। প্রত্যহই খুব ভীড় হয়। এই ফিল্মে জনৈক নব্য অভিনেতা নূতন ধরণের অভিনয় কলার অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখাইতেছেন। সরলা দাদার নিকট এই সংবাদ পাইয়া ও খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া পিতাকে সকল বলিল সে দেখিতে যাইবে। নিবারণ বাবু বলিলেন "বেশত, সতীশকে বল তোমাকে দেখিয়ে আনবে। গাড়ীত' বসেই আছে।" সতীশ ও সরলা মহা আনন্দে কাপড় বদলাইয়া মোটরে করিয়া যথাসময়ে রওনা হইল। বায়স্কোপে পৌঁছিয়া সতীশ টিকিট কিনিতে যাইবে এমন সময়ে হঠাৎ একটী লোকের দিকে তাকাইয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল যে আদর্শকে কল্পনা করিয়া নিজের চেহারাটী গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা সে এতদিন করিয়া আসিতেছে লোকটা যেন সেই। তাহার প্রবল ইচ্ছা হইল লোকটির সহিত আলাপ করে কিন্তু সরলা সঙ্গে থাকায় সম্ভব হইল না, টিকিট কিনিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। বলা বাহুল্য লোকটি আমাদেরই পরেশ গাঙ্গুলী। সেও সতীশের হাব-ভাব, আকৃতি ও সঙ্গে সরলাকে দেখিয়া তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং সতীশকে একটাকার টিকিট কিনিতে দেখিয়া সেও এক-খানি একটাকার টিকিট কিনিয়া তাহাদেরই পিছনে পিছনে ভিতরে প্রবেশ করিল। পাশা পাশি তিন খানি চেয়ার তখনও খালি পড়িয়া ছিল। সতীশ সরলাকে লইয়া তাহার দুইখান দখল করিয়া বসিতে না বসিতে পরেশও বাকী খানি দখল করিয়া বসিল।

প্লে আরম্ভ হইতে তখনও কিছু দেরী। পরেশকে পাশাপাশি দেখিয়া সতীশের মনে পুলক সঞ্চার হইল। কিন্তু প্রবল ইচ্ছাসত্বেও তাহার সহিত আলাপ করিবার কোন সূত্র সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিল সতীশ নিজে। রত্ন চিনিতে তাহার দেরী হইল না। সে পকেট হইতে সিগারেটকেস্ বাহির করিয়া সতীশের সম্মুখে ধরিল। সতীশ হাত জোড় করিয়া বলিল— "আপনাকে ধন্যবাদ, আমি খাই না।"

'ওঃ' বলিয়া পরেশ নিজে একটী সিগার ধরাইয়া টানিতে লাগিল।

ইহার বেশী তখন আলাপের সুযোগ হইল না, প্লে সুরু হইয়া গেল।

অন্ধকার ঘর; কিন্তু দৃশ্যপট হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া যে ম্লান আলোটুকু নিস্তব্ধ জনতার উপর বর্ষিত হইতেছিল সতীশ তাহারই সাহায্যে পরেশের বেশ-ভূষার দিকে মাঝে মাঝে তাকাইয়া দেখিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল সে সবের তুলনায় তাহার নিজের বেশভূষা কত শ্রীহীন। চুলগুলি ঐ রূপ দীর্ঘ ও ঢেউ খেলানো এবং জুলপিযুগল উহারই মত নিম্নমুখ ও মনোহর হওয়া উচিত। নতুবা— সহসা ইন্টারভেল হইল। আলো জ্বলিল। অমনি পরেশ বলিয়া উঠিল "আরে ছ্যা, একেবারে মাসাকার, করলে।" সতীশ বলিল "কিসের?

পরেশ বলিল "আর্টের"।

সতাশ বলিল 'কি রকম'?

পরেশ বলিল 'এই কি আর্ট!" তারপর গলার স্বর অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিয়া, যাহাতে নিকটস্থ ৪।৫ জন লোকেও শুনিতে পায় বলিল "আরে মশায় নায়কের পার্ট যে নিয়েছে এই ধীরাজ দত্ত প্লে করার আগে প্রায় একমাস আমার কাছে আনাগোনা করেছিল। ছোকরাকে কত যে তালিম দিয়েছি! কিন্তু চাঁদ! আর্ট কি সোজা না পয়সা দিলেই বাজারে কিনতে পাওয়া যায়? ও হল স্বাভাবিক গুণ। কি শেখালুম আর কি করলে। ছ্যাঃ ছ্যাঃ! ওরে যাত্রার দলে গেলিনি কেনরে বাবা! ভাগ্যে আমার নাম করতে বারণ করেছিলুম না হলে আমার নাম ডুবতো।" সতীশ তাহার এই বক্তৃতায় অভিভূত হইয়া পড়িল। পরেশ আরও যে বলিল, ঐ ধীরাজ দত্ত তাহার

নিকট মোশোন শিখিবার জন্য বহু অর্থ খরচ করিয়াছে। কিন্তু সে শিক্ষা একেবারে অপাত্রে পড়িয়াছে।

ক্রমে বায়স্কোপের বাকী অভিনয়টুকু শেষ হইল। সতীশ ও সরলা জনস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া ক্রমে তাহাদের মোটরের নিকট উপস্থিত হইল। পরেশকে কিন্তু সতীশ আর দেখিতে পাইল না। মনে ভাবিয়াছিল বায়স্কোপ ভাঙ্গিলে তাহাকে আরও দুচার কথা জিজ্ঞাসা করিবে, আলাপ বেশ জমাইয়া লইবে, কিন্তু সরলা সঙ্গে থাকাতে ভীড়ের মধ্যে তাহাকে খোঁজ করিবার কোনও উপায় রহিল না। সে বড়ই মনঃক্ষুন্ন হইল। কিন্তু তাহারা মোটরে উঠিতে যাইবে এমন সময় দেখিল অদূরে দাঁড়াইয়া পরেশ—মুখে বর্ম্মা চুরুট, হাতে যষ্ঠি। সতীশ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিয়া উঠিল 'এই যে আপনি। কোন দিকে যাবেন—"

পরেশ দক্ষিণ দিক দেখাইয়া বলিল—"এই দিকে।" সতীশ বলিল, "অনুগ্রহ করে আমাদের গাড়ীতেই চলুন না—আমরাওত ঐ দিকে যাব।" পরেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া টপ্ করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। একপার্শ্বে সরলা অপর পার্শ্বে পরেশ ও মধ্যে সতীশ। গাড়ীতে উভয়ের নানারূপ আলাপ হইতে লাগিল। সতীশ সরলার সহিত পরেশের পরিচয় করিয়া দিল। বলিল "ইনি একজন মস্ত আর্টিষ্ট" তারপর কথা বার্ত্তায় গাড়ী চোরবাগানের নিকট পৌছিলে পরেশ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল এবং সেখান হইতে নিজের বাড়ী দেখাইয়া দিল ও পরদিন সতীশ ও সরলাকে বৈকালিক চা পানের নিমন্ত্রণ করিল। সতীশ বলিল "আমি নিশ্চয় আসব।" কিন্তু ওর হয়ত আসা হবেনা।"

৪

পরদিন সতীশ যথাসময়ে চুল ফিরাইয়া পরিষ্কার জামা কাপড় পরিয়া পরেশের বাড়ী চলিল। পথে যাইতে যাইতে নিজের ভবিষ্যৎ কল্পনায় তাহার মন পরিপুর্ণ হইয়া উঠিল। পরেশের বাড়ীর নিকট পৌছিয়া তাহার মন এতই উত্তেজিত হইল যে সে হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিল। পরেশ বাড়ীতেই ছিল, তাহার সহিত দেখা হইবামাত্র সতীশ অবনত হইয়া তাহার পদধুলিগ্রহণ করিল। পরেশও সস্নেহে তাহার স্কন্ধে হস্ত দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল। তারপর বৈঠক খানায় বসিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সতীশ ক্রমশঃ নিজের মনের গোপন আকাঙ্ক্ষাটি পরেশের নিকট প্রকাশ করিল। চতুর পরেশ বুঝিল সতীশের আন্তরিক ইচ্ছা সে একজন ফিলম একটর হইবে। পরেশ তৎক্ষণাৎ তাহার চুলের তারিফ করিল, মুখখানির সহিত গ্রীসিয়ান আর্টের তুলনা দিল, আর দেহ খানি বলিল রোমান। এমনকি তাহার হাতের আঙ্গুল ও পায়ের নখগুলি পর্য্যন্ত সে অতি আর্টিষ্টিক তাহাও জানাইয়া দিল। উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে পড়িলে সতীশ একজন অদ্বিতীয় আর্টিষ্ট হইয়া উঠিবে।

সেদিন উভয়ের আলাপ এই পর্য্যন্ত হইলেও সতীশের মনের অবস্থা এমন হইল যে পড়াশুনায় যেটুকু মনোযোগ ছিল, তাহাও আর রহিল না। চা পানান্তে সতীশ পরেশের বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই পথ চলিতে চলিতে না না কল্পনায় এত মসগুল হইয়া গেল যে গাড়ী চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল।

সতীশ সেইদিন হইতে পরেশের বাড়ী যায় আসে। পরেশ তাহাকে একটু আধটু তালিম দেয়। অবশেষে সে তাহার স্ত্রী মনোরমার সহিত সতীশের আলাপ করাইয়া দিল। পরপুরুষের সহিত আলাপে মনোরমার আপত্তি থাকিলেও স্বামীকে সুখী করিতে সে সতীশের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিল এবং সতীশের জন্য তাহার মনে একটু স্নেহের সঞ্চার হইল। তাহার পর সতীশ যখনই পরেশের বাড়ী আসে একবার মনোরমার সহিত দেখা না করিয়া যায় না। মনোরমা তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিল। মনোরমার স্নেহের দাবী ক্রমশঃ এরূপ বাড়িয়া গেল যে সতীশ আসিলে তাহাকে কিছু না কিছু জলযোগ না করিয়া ফিরিবার উপায় ছিল না। স্বামীপ্রেম বঞ্চিত মনোরমা পুত্রবৎ সতীশকে পাইয়া মনের কষ্ট কিঞ্চিৎ লাঘব করিল।

এদিকে নিবারণ বাবু হঠাৎ একদিন মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইয়া গেলেন। ডাক্তার আসিল, পরীক্ষা করিল; বলিল পক্ষাঘাত হইয়াছে। নানারূপ চিকিৎসা হইল, ক্রমে নিবারণ বাবুর জ্ঞান হইল বটে কিন্তু

দক্ষিণ অঙ্গটি পড়িয়া গেল। তিনি আর নীচে নামেন না, তাঁহার বৈঠকখানা সর্ব্বদাই খালি পড়িয়া থাকে।

আজকাল পরেশ মধ্যে মধ্যে সতীশের বাড়ী আসা যাওয়া আরম্ভ করিয়াছে। উভয়ে বৈঠকখানায় বসিয়া নানারূপ কথা বার্ত্তা হয়। সতীশ পরেশকে গুরুতুল্য আদর আপ্যায়িত করে। মধ্যে মধ্যে পরেশের সহিত সরলারও দেখা হয়। পরেশ উহাদের নিকট যতদূর সম্ভব নিজের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া চলে।

পরেশ তাহার আড্ডায় একদিন জাহির করিল "একটা বড় মাছ চারে আসিয়াছে। শীঘ্রই বোধহয় টোপ গিলিবে।" আড্ডার সকলে কথাটাকে তেমন আমল দিলনা; কেননা এমন মাছ ইহার পূর্ব্বেও চার খাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে মাত্র, টোপ গিলে নাই।

একদিন সতীশ বৈঠকখানায় বড় আয়নাখানির সামনে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছে ও ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজের চেহারা দেখিতেছে। এমন সময় পরেশ আসিয়া উপস্থিত। সে ঘরে ঢুকিয়াই বলিল "দেখ সতীশ তোমার যে আর্ট অনেকটা আয়ত্ত হয়েছে সে বিষয় কোনও সন্দেহ নাই।' সতীশ চমকাইয়া ফিরিয়া দেখে পরেশ ঘরে ঢুকিতেছে। সে দৌড়াইয়া গিয়া পদধুলি গ্রহণ করিল। ফরাসে বসিতে বসিতে পরেশ বলিল ''আর সব চেয়ে সুখের বিষয় কি জান সতীশ? তোমার এই আর্ট কাল্‌চারের দুর্দ্দমনীয় চেষ্টা। এর জোরেই তুমি shine করবে। তোমার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। তখন আমার কথা মনে থাকবেত?" "কি বলেন পরেশ দা আপনার কথা মনে থাকবে না? আপনি আমার গুরু অপনাকে না পেলে কি আমার এমন উন্নতি হ'তে পারত? আপনার এ উপকার, এ স্নেহ আমি জীবনে ভুলব না; চিরকালই আপনাকে গুরু বলে পুজো করব।" পরেশ হাত দেখাইয়া বলিল "এই হাতের গুণ বুঝলেহে? এই তোমার মত শিষ্য তৈয়ারী করা বড় চারটিখানি কথা নয়। তা যাই হোক 'আঁধারে আলো' বলে একটা ফিলম্ উঠছে। আমাকে করেছে তার আর্ট ডাইরেকক্টর। তোমাকেও একটা পার্ট দেব ঠিক করেছি। পার্টটা যদিও ছোট কিন্তু বেশ সুন্দর।" কথাটা শুনিয়া সতীশ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া পরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল পরে ধীরে ধীরে মাথা নত করিয়া পরেশের পদধুলি গ্রহণ করিল। পরেশ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আলিঙ্গন করিল। সতীশ আনন্দে ও উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "তা হ'লে পার্টটা আমায় দিন কতক আগেই লিখে দেবেন আমি যতদূর পারি নিজেই ঠিক্ করব। তারপর আপনি দেখিয়ে দেবেন।" পরেশ তাহার কথায় সম্মত হইয়া আরও দুই চারটি উপদেশ দানের পর সে দিনকার মত বিদায় লইল।

৪

সরলার বিবাহের কথা বার্ত্তা হইতেছিল এক ছোকরা উকিলের সহিত। পাত্রটি ছোকরা হইলেও তাহার কেশ বেশ অত্যন্ত সাদাসিধে। ছোকরাটি আবার মুগুর ভাঁজে হাত পায়ের পেশী যেমন পরিপুষ্ট তেমনই সবল। বুকখানি রীতিমত চওড়া। তাহার চাল চলনে পুরুষোচিত সৌন্দর্য্যই প্রকাশিত হয়। তাহার সহিত সরলার বিবাহ এতদিনে হইয়া যাইত। কিন্তু সহসা এক অন্তরায় দেখা দিল। নিবারণ বাবুর ব্যাধি। আর, এই কারণেই নিবারণ বাবু কন্যার বিবাহ চুকাইয়া ফেলিতে ইদানীং তৎপর হইয়া উঠিলেন। কেননা জীবন কখন আছে, কখন নাই, সময় থাকিতে শুভকার্য্য শেষ করাই ভাল। তাই সেদিন সতীশকে পাত্রটির পিতার নিকট পাঠাইলনে।

তাঁহারা সতীশের আদর আপ্যায়ন করিলেন, সরলাকে বধূরূপে ঘরে আনিতে সম্মত একথাও জানাইলেন এবং নিবারণ বাবুর সহিত শীঘ্রই দেখা করিবেন এ কথাও বলিয়া দিলেন; কিন্তু সতীশের পাত্র পছন্দ হইল না। তাহার প্রথম কারণ চারু সতীশকে কোথায় পড়ে জিজ্ঞাসা করায় সতিশ বলিয়াছিল "আর্ট স্কুলে"। তাহাতে চারু পুনরায় জিজ্ঞাসা করে "গভর্ণমেন্টের আর্ট স্কুলে?" ইহাতে সতীশ ভাবিয়াছিল "ছোকরাটা অতি অভদ্র, আর্টের কিছু মর্ম্ম বোঝে না।" দ্বিতীয়ত সুন্দরী ভগ্নীর এই বর? একটা হিন্দুস্থানী পালোয়ানের মত চেহারার ছোকরা; মাথার চুল গুলি এমন করিয়া ছাঁটা যে দুর হইতে মনে হয় যেন ঝুনা নারিকেল। তবে হাঁ, ছোকরার গায়ে জোর আছে বটে। এগুলি দরোয়ানির জন্য আবশ্যক হইলেও ভগ্নীপতির চরিত্রে নিতান্ত বেমানান্।

সে বাড়ী আসিয়াই মাকে বলিল "না! ও ছেলের সঙ্গে সরলার বিয়ে কোন মতেই হতে পারে না। কাটখোট্টা কদাকার চেহারা আর ভদ্রতা মোটেই জানে না।" তুমি বাবাকে বলে এ বিয়ে বন্ধ কর। মাতা বলিলেন—"তা বাছা তোর যখন এতই অপছন্দ তখন আমি কর্ত্তাকে বলে সরলার জন্য অন্য সম্বন্ধ ঠিক করব।" 'কিন্তু নিবারণ বাবু স্ত্রীকে জানাইলেন "সরলার যদি অদৃষ্ট ভাল হয় তবেই তাহার ভাগ্যে এরূপ বিদ্বান বুদ্ধিমান স্বামী লাভ হইবে।"

এই কথা শুনিয়া হেমাঙ্গিনী আর সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। স্বামীর মতেই মত দিলেন, ইহাই তাঁহার স্বভাব।

(৫)

ইহার অনতিকাল পরেই একদিন পরেশ আসিয়া সতীশের সহিত দেখা করিল। বলিল 'দেখ সতীশ তুমি জান বোধ হয় যে আমার এই ফিল্‌ম কোম্পানীতে মাসে ১০০০৲টাকার ওপর খরচ। এই ফিলম্‌টা Ready হলে আমাদের সমস্ত খরচ উঠে যাবে। এখন থেকে অনেকে এই ফিল্‌ম্‌টা নেবার জন্য ঝুঁকেছে। একলক্ষ টাকা আমাদের ব্যাঙ্কে ফিক্‌সড্ ডিপজিট আছে। কিন্তু উপস্থিত আমাদের খরচের টাকার কিছু টানা টানি পড়েছে। কালই কতকগুলা payment করতে হবে। তুমি যদি এ সময় কিছু সাহায্য কর তা হ'লে বড়ই ভাল হয়। আর কিছু-দিনের মধ্যেই ত' তোমাকে আমাদের একজন first-grade আর্টিষ্টের মাহিনা দিতেই হবে। কি বল?' সতীশ শেষোক্ত কথাটা শুনিয়া আত্মহারা হইয়া ভাবিতে লাগিল যে সে এতদিন যাহা স্বপ্নবৎ চিন্তাই করিয়া আসিতেছে তাহা এখন ক্রমশঃ সত্যের আকার ধারণ করিতেছে। সে ভাবিল 'Frist grade আর্টিষ্ট! শুনেছি তাদের মাইনে অনেক! কত? রামন নোভারো যদি মাসিক ৬০০০৲ টাকা পায় তবে আমি বোধ হয় অন্ততঃ ১০০০৲ কি ২০০০৲ এমনি একটা কিছু পাব।" পরেশ তাহার চিন্তার স্রোতে বাধা দিয়া বলিল "তা হলে কি ঠিক্ করলে? টাকাটা দেবে?" সতীশের চমক ভাঙ্গিল। ভাবিল "টাকা! টাকা কোথায় পাই? কিন্তু না দিলেই ত' নয়। যিনি আমার গুরু, আমার উন্নতির মূল তাঁহাকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করিতেই হইবে। বাবাকে বলিব? আচ্ছা আমার বাক্সেত ১০০৲টাকা আছে তাহাতে যদি হয় তবে আর কাহাকেও বলিতে হয় না। তা ১০০৲ টাকায় কি হইবে? এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিল' "আপনার কত টাকা দরকার? আমার নিজের কাছে ১০০৲ টাকা আছে তাতে যদি হয় তবে আমি এখনি দিতে পারি।' পরেশ হতাশ ব্যঞ্জক শব্দ করিয়া বলিল, মোট, ১০০৲ টাকা। তাতে কি হবে? আমার উপস্থিত ১০০০৲ টাকার দরকার। যা হোক এখন ১০০৲ টাকাই দাও তার পর যা হোক করা যাবে। আর দেখ তুমিও চেষ্টা দেখ যদি যোগাড় করতে পারো।' সতীশ 'আচ্ছা' বলিয়া বাটীর ভিতর গিয়া ১০০৲ টাকা আনিয়া পরেশের হাতে দিল। পরেশ তাহা পকেটে করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

পরেশ আড্ডায় আসিয়া পকেট হইতে নোটগুলি বাহির করিয়া সকলের নাকের সামনে একবার ঘুরাইয়া লইল। সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল 'কোথেকে? হোম মেড নাকি?"

"ধোৎ! আর যাই হই, জালিয়াৎ নই। আমার চেলার কাছ থেকে।"

"গুরু দক্ষিণা নাকি?"

"আর্টের পুজোর বাবদ?"

সকলে হাত তালি দিয়া বলিয়া উঠিল "সাবাস! "সাবাস!" তারপর মদ্য মাংস আনিতে লোক ছুটিল। পরামর্শ চলিল। পিতাকে ফাঁসান যায় তাহারই একটা উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। অনেকে অনেক মৎলব দিল। শেষে একটা মৎলব ঠিক হইল। একটা পরিত্যক্ত বাগান বাড়ী ও খান কতক থিয়াটারের সিন্ যোগাড় করতে হইবে। থিয়াটারের কতকগুলি সাজ পোষাক, গোফ, দাড়ি ও তাহার সহিত একজন পেণ্টারও জুটাইতে হইবে। সকলেই এক এক রকম পোষাক পরিয়া, মুখে রং মাখিয়া এদিক ওদিক ছুটা ছুট করিবে। দু এক জন স্ত্রীলোকে চাই তা খুব সহজেই জুটিবে। সকলেই যেন কত ব্যস্ত। একটা বায়স্কোপ তুলিবার ক্যামেরা চাই। তাহার খোল ও গায়ে একটা ঘুরাইবার হাতল চাই। চোরা বাজারে খুঁজিলে এরূপ পাওয়া যাইতেও

পারে! পরেশ হইবে ডাইরেক্টর কেননা তাহারই বাহাদুরী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেদিনকার আনন্দের স্রোত ঠেলিয়া ফন্দীটা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। এই খানেই চাপা পড়িয়া রহিল। একে একে সকলের চোখ খুলিল তখন পরদিন বেলা দশটা। আবার স্ফূর্ত্তি চলিল।

৬

পরেশের উপদেশে সতীশ সরলাকে বুঝাইয়াছে যে আজকাল ভদ্রলোকের মেয়েরাও অনেকে বায়স্কোপে ছবি তুলিতেছে। উহাতে কোনও দোষ নাই। প্রথমে সরলা কথাটা উড়াইয়া দিয়াছিল কিন্তু সতীশের বক্তৃতায় অভিনয় কলার একটী চিত্তাকর্ষক দৃশ্য তাহার মনের মধ্যে ফুটিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সরলা অভিভূত হইতে লাগিল।

সে ভাবিল এত ভারি মজা। সে কতকটা সম্মতি দিল, কিন্তু ইহাতে তাহার প্রধান অন্তরায় পিতা মাতা। সতীশ অভয় দিয়া বলিল "তোর কোনও ভাবনা নাই, বাবা মা কিছুই জানিতে পারিবেন না।"

৭

নারিকেল ডাঙ্গা রেল লাইনের ধারে একটী বহু পুরাতন পরিত্যক্ত বাগান বাড়ী—তাহারই ফটকের সম্মুখে একখান ট্যাক্সি আসিয়া থামিল। গাড়ীতে বসিয়া সতীশ ও সরলা। ফটকে একজন দ্বারবান ছিল। সে দৌড়াইয়া গিয়া তাহাদের সেলাম করিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। সতীশ ও সরলা গাড়ী হইতে নামিলে সতীশ জিজ্ঞাসা করিল "পরেশ বাবু কোথায়?" দ্বারবান বলিল "হুজুর উপরমে খাস কামরামে হ্যায়, আপ মেম সাহেবকো লেকে উপর চলা যাইয়ে।" বলিয়া দ্বারবানই পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া ট্যাক্সিকে বিদায় করিল। সরলা এইরূপ অভ্যর্থনায় একটু সঙ্কুচিত হইয়া সতীশকে বলিল "দাদা, দ্বারোয়ানটা আমাকে মেমসাহেব বলিল যে আমি কি মেম সাহেব?"

সতীশ বলিল "ওরা ওরকম বলে।" সতীশ ফটক পার হইয়া সম্মুখস্থ দ্বিতল বাটির দালানে উঠিয়াও কোনও লোক জন দেখিতে পাইল না। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিল সম্মুখে একটী ঘর, উহার দরজায় পার্শ্বে লেখা আছে Mr. Ganguli Director দরজাটি খোলা তাহার উপর একখানি রঙ্গিন পরদা ফেলা রহিয়াছে। পরদা সরাইয়া উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিল। দেখিল কক্ষটি সুসজ্জিত চতুর্দ্দিকে বড় বড় আয়না, গোটা কতক গদি আঁটা চেয়ার, সোফা ও মধ্যস্থলে একটি টেবিল। টেবিলের নিকট একখানি চেয়ারে বসিয়া পরেশ, টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাগজ পত্র দেখিতেছে। হঠাৎ মুখ তুলিয়া তাহাদের দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দের সুরে বলিল "এইযে সতীশ তুমি এসেছ সরলাকেও এনেছ। বেশ বেশ এইখানে বস।" বলিয়া একখানি সোফা দেখাইয়া দিল। উভয় বসিলে দু একটা কথার পর পরেশ বলিল "আর অনর্থক দেরী করে কাজ নেই, তুমি ও পাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাও। দেখবে নীচের একটা ঘরে আর্টিষ্টরা সব পেন্ট হচ্ছে। আমার সমস্ত বলা আছে, তুমি গেলেই তোমাকেও পেন্ট করে ড্রেস পরিয়ে দেবে আর দেখ পেন্ট ড্রেস হয়ে গেলে তুমি আমার কাছে আবার আসবে। আমি নিজে একটু Finishing Touch দেব। দেখবে তুমি যে ভাবটা ফুটিয়ে তোলবার ভাবটা চেষ্টা করেও পারবেনা আমার এক তুলির Touch এতে অত সহজেই ফুটে উটবে। এ আমাকে অনেক Study করে শিখতে হয়েছে! চট করে যাও রোদটা চলে গেলে আর shooting হবেনা। আমি ততক্ষণ সরলাকে playর বিষয়টা একটু বুঝিয়ে দেই। তা না হলে ও ভাবটা ঠিক আনতে পারবেনা।"

সরলা দেখিল সতীশ তাহাকে একলা ফেলিয়াই নীচে চলিয়া গেল। সে পরেশকে অনেক দিন ধরিয়াই দেখিতেছে তাই তেমন সঙ্কোচ ও ভয় হইল না। একটু সাহসে ভর করিয়া বসিয়া রহিল। তখন পরেশ তাহাকে "আঁধারে আলোর" ঘটনাটা কি তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতে লাগিল। স্থানে স্থানে এমন সকল বর্ণনা দিল যাহা শুনিয়া সরলা একটু লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইল। পরেশ বলিল "আচ্ছা সরলা তুমি এখন একবার এই ভাবটা আনবার চেষ্টা কর দেখি, মনে কর—"

সরলার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, সে তাড়াতাড়ি বলিল "দেখুন আজ আমার শরীরটা ভাল বোধ হচ্ছে না আমি কাল—"পরেশ বলিল" "ওঃ তুমি একটু নার্ভাস হয়ে গেছ। আচ্ছা চল

তোমাকে দেখিয়ে আনি কি করে বায়স্কোপ তোলা হচ্ছে, তাহা হলে বুঝবে এটাতে ভয় করবার কিছুই নেই।" এই বলিয়া তাহাকে দ্বিতলের অপর পার্শ্বের একটা বারান্দায় লইয়া গেল। সেখান হইতে সরলা দেখিল নীচে বাগানের একস্থানে একটা কক্ষের সিন খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। ৪।৫ জন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক মুখে রং মাখিয়া ও নানারূপ পোষাক পরিয়া ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। কিছু দূরে একটা ক্যামেরার হাতল ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া একজন তাহাদের ফটো তুলিতেছে। আর একজন হাতে একটা খাতা লইয়া দূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের ডিরেকসন দিতেছে। সরলা ব্যাপারটা অনেকটা বুঝিল। লক্ষ করিল যে অ্যাক্টর ও অ্যাক্‌ট্রেসরা ডিরেকসন অনুযায়ী অভিনয় করিতে পারিতেছে না। সে পরেশকে বলিল—

"পরেশবাবু, ওরা যেমন বলছে ঠিক্ তেমন করতে পারছে না কেন?"

পরেশ বুঝিল সরলার ভয় অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। সে বলিল "আরে রামঃ পাগল হয়েছ? তা ছাড়া এই প্লে হবার আগে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের কত শিখিয়েছি। তবুও ওদের মাথায় ঢোকে না। যা হোক এখন ব্যাপারটাত বুঝলে, এস তোমাকে কিছু দেখিয়ে শুনিয়ে দিই। তোমার ওপর আমাদের ফিল্মের success নির্ভর করছে।" সরলা উৎসাহিত হইয়া তাহার সহিত চলিল। পরেশ সরলাকে তাহার অফিস কক্ষের পার্শ্বের অপর একটী সজ্জিত কক্ষে লইয়া গেল কক্ষটি ঠিক বড় রাস্তার উপরেই—বড় বড় দুইটী জানালাও সে দিকে আছে। সেজন্য ঘরখানি বেশ আলোকিত। একটি বড় আরসির সামনে একটী গদি আটা টুল রাখিয়া পরেশ সরলাকে তাহার উপর বসিতে বলিল। সরলা বসিলে পরেশ বলিল—"এমনি ভাবে ঘাড় হেঁট করে বস যেন তোমার মনে হয় যে তুমি যাকে ভালবাস সে যেন অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা করে নি।"

সরলার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। তথাপি সে যতদূর পারিল সংযত হইয়া তাহার কথামত কার্য্য করিতে লাগিল। পরেশ তখন দুই তিন পা পিছাইয়া গিয়া সরলার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিল। এই সরলা যৌবনোন্মুখী কিশোরী কি সুন্দরী! পরেশ বলিল "হ্যাঁ হয়েছে, আচ্ছা দাঁড়াও" বলিয়া তাহার চিবুকে হাত দিয়া একটু সরাইয়া দিয়া বলিল "এইবার ঠিক্ হয়েছে। আচ্ছা এইবার আমি পাশ থেকে তোমার সামনে আসি আর তুমি মনে করবে যেন তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী যার চিন্তায় তোমার মন বিহ্বল হয়ে রয়েছে সে অকস্মাৎ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হল। তখন তোমার মনে যে ভাবের উদয় হওয়া উচিত সে ভাব মুখে ফুটিয়ে তুলতে হবে। পাটটা খুবই শক্ত কিন্তু অতি সুন্দর। এই ভাবটির অভিব্যক্তির ওপর সমস্ত নির্ভর করছে। নিজের মনের মধ্যে কথাটা অনুভব না করলে ঐ ভাবের অভিব্যক্তি হয় না। তাই বলছি অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও তোমার মনে করা দরকার যে তুমি আমায় ভালবাস ও আমিও তোমায় ভালবাসি।"

এমন কঠিন কথাটি অতি সহজ ভাবে বলিয়াই আর্ট ডিরেক্টর পরেশ গাঙ্গুলী কিছু দূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার চোখ মুখের চেহারা তখন স্বাভাবিক নয়। সরলা পূর্ব্বের মতই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পরেশ ভাবিল সে নিশ্চয়ই তাহার কথিত ভাবটি মনে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার সারা মুখে চোখে একটা প্রগাঢ় কমনীয়তা ও কারুণ্য ফুটিয়া উঠিয়া পরেশকে মুগ্ধ ও লালসামত্ত করিয়া ফেলিল। সে আর ভদ্রতার মুখোসটি রাখিতে পারিল না। ছুটিয়া গিয়া সরলাকে দুই হাতে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল। আক্রমণটা যেমন অতর্কিত, আর্টিষ্ট পরেশের আচরণটাও তেমনি পাশবিক। সরলা তাই প্রথমটা ক্ষণিকের জন্য সম্বিত হারাইয়া ফেলিল। কিন্তু নিমেষে সে ভাব কাটিয়া গিয়া আত্মরক্ষার প্রবল চেষ্টা তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সে জালে বদ্ধ ক্ষুদ্র সিংহীর মত শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়া নিজেকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাঁচাও—বাঁচাও—"

সতীশ তখন নীচে একটী কক্ষে বন্দী। অভিনেতাগণ তাহাকে দিয়া একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। সরলার কাতর কণ্ঠ তাহার কাণে পৌঁছিলেও তাহাকে বাঁচাইবার কোন উপায় করিতে পারিল না। সেও সকলের নিকট মুক্তি ভিক্ষা করিতে লাগিল।

ঐ বাগানখানির পাশেই আর একখানি বাগান। কিন্তু সেখানে কোন অভিনেতা বা ফিল্ম কোম্পানীর উৎপাত নাই। জন কয়েক যুবক ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে। সরলার আর্ত্তস্বর তাহাদের কাণে যাইতেই প্রথমে মনে করিল অভিনয়। একজনের ইচ্ছা হইল অভিনয়টা চাক্ষুষ দেখে, সে ছিপ ফেলিয়া দ্রুতপদে দোতলায় উঠিয়া গিয়া পাশের বাগানের দিকের ঘরের জানালাটি খুলিয়া দিল। চোখে পড়িল এক কিশোরী প্রাণপণে একটা পুরুষের কবল হইতে আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইতেছে ও তখনও চীৎকার করিতেছে। তাহার কেশ বাস বিপর্য্যস্ত। সে কক্ষে আর কেহ নাই। নিমেষে তাহার ধারণা হইল, ইহা অভিনয় নয়। বাগানটা আর্টিষ্টদের আড্ডা হইলেও মেয়েটিকে মনে হইতেছে যেন ভদ্রঘরের এবং সে উৎপীড়িতা।

সে আর কালবিলম্ব না করিয়া নীচে নামিয়া বন্ধুদের লইয়া প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাগানে প্রবেশ করিল। তারপর সেখানে হইতে দ্রুত সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া সিনেমা ডিরেক্টর বিখ্যাত আর্টিষ্ট পরেশ গাঙ্গুলির কক্ষে প্রবেশ করিল। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় নীচের একটা বন্ধ ঘরে একটা অস্ফুট চীৎকার ও ক্রন্দনধ্বনি শুনিল। বুঝিল এ সমস্ত বাড়ীটায় একটা ভয়ানক ব্যাপার চলিতেছে। যাহা হউক তাহারা কালক্ষেপ না করিয়া একেবারে সোজা উপরে যে ঘরে সেই দৃশ্য দেখিয়াছে তাহারই উদ্দেশ্যে চলিল উপরে উঠিয়া নারী কণ্ঠের আর্ত্তনাদ আরও স্পষ্ট শুনিতে পাইল; এবং যে গৃহের ভিতর হইতে শব্দ আসিতেছে তাহার পার্শ্বের গৃহের পর্দ্দা ঠেলিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াই চিনিতে পারিল বিখ্যাত সিনেমা ডিরেক্টর ও আর্টিষ্ট পরেশ। পরেশ তখনও তাহাদের দেখিতে পায় নাই। যুবকদের একজন পিছন হইতে বজ্রমুষ্টিতে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া একটা ধাক্কা দিতেই সে পড়িয়া গেল। তবুও তাহার নিস্তার নাই। যুবকটি তাহার দুটি কাণ ধরিয়া বলিল—"দাঁড়াও—"

মেয়েটি তখন মুর্চ্ছিতার মত অদূরে ঘরের মেঝের উপর বসিয়া আছে।

ইতিমধ্যে সতীশও এক হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া ও তাহার নিকট যে নগদ কুড়ি টাকা ছিল, তাহাও দিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়া ছুটিতে ছুটিতে উপরে আসিতেছে। আসিয়াই দেখে তাহার আর্টগুরু পরেশের দুটি কাণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে চারু। অদূরে ভূমিতে মূর্চ্ছিতা প্রায় সরলা ও ঘরে জন কয়েক অচেনা যুবক। ব্যাপারটা সে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না।

চারুও দেখিল তাহার ভাবী শ্যালক সতীশ—মুখে রং, চোখে সুর্ম্মা, পরিধানে বিচিত্র পোষাক। সে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হে সতীশ এই তোমার আর্ট স্কুল আর পরেশচন্দ্র বুঝি তোমার মাষ্টার?"

সতীশ নতমুখে সরলার পাশে গিয়া দাঁড়াইল চারু জিজ্ঞাসা করিল—"ইনি কে?"

"আমার বোন।"

"তোমার বোন!" চারু সরলার প্রতি একবার অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিল। তারপর বলিল—"এবার বাড়ী চল আর কখনও এদিক মাড়িও না।"

সতীশ হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে সরলাকে তুলিতেই অপমানে, লজ্জায়, বেদনায় এবার তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

পরেশ তখনও অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া। চারু বলিল —"অভিনয়টা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। পরেশ, হাত জোড় করে মহিলাটির কাছে ক্ষমা চাও—বল "এ কুকুরকে ক্ষমা করুণ—" দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও—"

সিনেমা ডিরেক্টর বিখ্যাত আর্টিষ্ট পরেশ গাঙ্গুলী কুস্তীগীর চারুর ডিরেক্সনে তাহাই করিতে বাধ্য হইল।

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই চারু ও সরলার বিবাহ হইয়া গেল। একদিন চারু সরলাকে বলিল "আচ্ছা পরেশের পাল্লায় পড়ে বায়স্কোপ তোলাতে যাওয়াটা তোমার ভারি ভুল হয়েছিল, নয়?" সরলা বলিল "কিছুই ভুল হয়নি।" চারু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন?" সরলা বলিল "নৈলে তোমায় পেতুম কি করে? দাদা যে বিয়ে ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করছিল" "ওঃ" বলিয়া হাসিয়া চারু সরলাকে বক্ষে টানিয়া লইল।

ইহার পর বহুদিন কাটিয়াছে। সিনেমা ডিরেক্টর বিখ্যাত আর্টিষ্ট আর কোন ভদ্রমহিলাকে যে অভিনয়ে আর্ট শিক্ষা দিয়াছে একথা আমরা শুনি নাই।

"জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তা"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভাদুড়ী।

(১)

এদেশের জনসাধারণ জীবন বীমার আবশ্যকতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কতকটা নিজেদের অজ্ঞতার দরুণ, কতকটা জীবন বীমার প্রচার কার্য্যের অভাবে। অবশ্য আজকাল কাগজে কলমে সে অভাবটা অনেক পরিমানে দূর হইয়াছে; বীমা বিষয়ক বহু তত্বপূর্ণ ইংরাজী বাংলা প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার প্রচলনে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পত্রিকাগুলি তথা কথিত শিক্ষিতদের দৃষ্টি আশানুরূপ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই। কারণ ইহা নীরস, শুষ্ক বিষয়ে পরিপূর্ণ। মন মাতান গল্প নাই, ভাষার চাকচিক্য নাই, কাব্যরস বীররস প্রভৃতি কোন রসই নাই। অবশ্য সকলেই যে এই ভাবের ভাবুক তাহা নয় পরন্তু এই শিক্ষিতেরাই অনেক সময় অপর দশজনের দৃষ্টি এই দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এটা আশা করা যায় না যে সকলেই পত্রিকা মারফৎ জীবন বীমার উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ বিষয় সজাগ হইয়া জীবন বীমা করিবেন। এই দায়িত্ব তাঁহাদের উপরেই অনেক পরিমাণে নির্ভর করে যাঁহারা বীমা পত্র বিক্রয়ের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে যান। এই নিমিত্তই এজেন্ট মহাশয়দের কয়েকটী কথা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদের উদ্দেশ্য যাহাতে লোকে এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে উদাসীন না থাকেন এবং প্রত্যেকেই সাধ্য অনুসারে যাহাতে ভবিষ্যতের দুর্দ্দিনের জন্য জীবনবীমা করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবিষয় যখন জনসাধারণ তত মনযোগী নয় এবং কোন কোম্পানী ভাল এবং কোনটাই বা ভাল নয় বিচার করিয়া দেখিবার সময় বা সম্যক জ্ঞানের অভাব তখন এজেন্ট মহাশয়দের সততা এবং যুক্তিপূর্ণ ভাল মন্দ বক্তৃতার উপরেই অনেক ক্ষেত্রে বীমাকারী নির্ভর করে। কিন্তু এক তরফা জয় গানে অনেক সময় তাহাদিগকে ধাঁধায় পড়িতে হয়। যাহারা বীমা পত্র সংগ্রহ করিতে যান তাহারা শুধু নিজেদের কোম্পানীকেই বড় করিয়া দেখাইতে চান এবং অন্য দশটি কোম্পানী যাহার বিষয় হয়ত নিজেই ভালরূপ জানেন না, উল্লেখ করিয়া তুলনা করিয়া নিজেরটাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হন। এমন কি তাহাদের এই অপচেষ্টায় কৃতকার্য্যতার জন্য অন্য কোম্পানীর সত্য মিথ্যা অপবাদ দিতেও ইতস্ততঃ করেন না। ফলে এই দাঁড়ায় বীমাকারী বিভিন্ন এজেন্টের মুখে বিভিন্ন কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে পৃথক পৃথক মন্তব্য শুনিয়া কোন্‌টা ভাল এবং কোনটা মন্দ নির্ণয় করিয়া জীবনবীমা করা বড়ই কষ্ট সাধ্য বলিয়া এবং জুয়াচ্চোরের পাল্লায় পড়িবার আশঙ্কায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া বীমা করার দিকে তত মাথা ঘামাইতে স্বীকৃত হয় না। এবিষয় এজেন্টরা যদি একটু সতর্ক হন এবং জয় গান একটু কম করিয়া ন্যায়ের পথে চলেন তাহা হইলে দুই দিকেই মঙ্গল।

এদিককার কথা ছাড়িয়া দিলেও আরো অন্য বহু অজ্ঞতা প্রসূত কারণে বীমার উপকারিতায় উদাসীন। বীমা করিতে কেহ অনুরুদ্ধ হইলে অনেকে বলিয়া থাকেন জীবন বীমা করিয়া মৃত্যু হইলে লাভ নচেৎ কোন প্রকার লাভ নাই বরং ক্ষতিজনক। অনেকের এরূপ অসংস্কৃত ধারণা আছে যে জীবন বীমা করিলে নাকি মৃত্যু শীঘ্র শীঘ্র আসিয়া পড়ে। আরো অনিচ্ছা এই কারণে যে বীমাকারীর মৃত্যুর পর তাহার ন্যায়ত উত্তরাধিকারীর পক্ষে বিশেষ অসহায় অশিক্ষিতা গ্রাম্য বিধবার পক্ষে কোম্পানীর নিকট হইতে পলিসি অনুসারে সম্পূর্ণ দাবীর টাকা আদায় করা কষ্টকর এবং তদারকের অভাব প্রকৃত বীমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে বহু বিলম্ব হয়। অবশ্য এটা স্বীকার্য্য ঐপ্রকার অবস্থায় দাবীর টাকা পাওয়া কিছু কষ্টসাধ্য। কিন্তু

পলিসি "এসাইন" করা থাকিলে কোন প্রকার গোলমালের আশঙ্কা থাকে না। বীমাকারীর মৃত্যু সংবাদ কোম্পানীকে সময় মত দিলেই তাহারা কয়েকখানা ফর্ম্ম পাঠান, উহা নিয়মিত পূরণ করিয়া দিলেই দাবীর টাকা পাইতে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় না।

আমরা অদৃষ্টবাদী। অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবেই অন্যথা হইবে না। ভাগ্যে দুঃখ থাকিলে ভোগ করিতেই হইবে উহা কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। ভগবানের এইরূপই নাকি বিধান। এই প্রকার কুসংস্কারগত উক্তি আরও শুনিতে পাওয়া যায় যে ভগবান মুখ যখন দিয়াছেন আহারো জোটাইবেন তিনি। যেন এ চিন্তা ও দায়িত্বটা তাঁহারই। সময় মত ও সুযোগমত হয়ত এটা ভুলিয়া যাই যে ভগবান হাত পা দিয়াছেন কার্য্যের জন্য, উহা দ্বারা উপার্জ্জন করিতে সঞ্চয় করিতে এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে। শক্তি সামর্থ্য থাকিতে আমরা যদি ভবিষ্যৎ ভগবানের উপর ছাড়িয়া দিই এবং বর্ত্তমানকে প্রাচুর্য্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিতে চেষ্টা করি তাহাতে ভগবানের উপর নির্ভরতা প্রকাশ পায় না বরং তাঁহার আদেশ পালনে আমাদের শৈথিল্যই প্রকাশ পায়।

এরূপ ধারণা যে ভুল তাহা আমাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারি। তখন ব্যয় আয়ের অনুপাতে বাড়িতে থাকে এবং দায়িত্বও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তখনি আমরা পরিবারবর্গের ভবিষ্যতে ভরণ পোষণের দিকে দৃষ্টি দিয়া থাকি।

স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকিতে এবং আয় করার শক্তি বজায় থাকিতে এসব বিষয় চিন্তা করিলে হয়ত এতটা ও চিন্তাগ্রস্ত হইয়া ৬০।৭০ বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু থাকিতে ও ৪০।৫০ এর কোঠাতেই চিন্তার তীব্রতায় জীর্ণ শীর্ণ হইয়া ইহলোক হইতে হয়ত বিদায়ের পর্ব্বটার প্রয়োজন না হইলেও হইতে পারিত।

মানুষ মরণশীল। মৃত্যু যখন তাহার অকম্পিত গতিতে আসিবেই—উহাতে কেহ বাধাদিতে পারে না। এবং আসার সময় ও যখন অনিশ্চিত বিশেষ এই ম্যালেরিয়া কালাজ্বর, কলেরা ও বসন্তের লীলানিকেতনের দেশ যেখানে জীবনের স্থায়িত্ব পদ্ম পত্র স্থিত জলের ন্যায়ই স্থায়ি। এক ম্যালেরিয়াতেই বাংলাদেশ হইতেই লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিবৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ইহার উপর কলেরা ও বসন্তের ন্যায় সংক্রামক মারাত্মক ব্যাধিতে কতজনের যে জীবন অকালেই ইহলোক হইতে বিদায় লইতেছে তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

পীড়া ছাড়াও আধুনিক বিজ্ঞান কম পরিমাণে এদিকে সাহায্য করিতেছে না। সহরে যাহারা বাস করেন বিশেষ এই কলিকাতার মত সহরে তাহারা বেশ ভাল করিয়াই জানেন যে রাস্তায় বাহির হইলে. আধুনিক যুগের সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ যন্ত্র চালিত যান বাহনের দ্রুততার প্রতিযোগিতায় নিরাপদে পৈতৃক প্রাণ লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসাও সন্দেহস্থল। রেলগাড়ী, বাষ্পিয় যান ও আকাশ যান প্রভৃতি বিংশশতাব্দির সভ্যতার ও বৈজ্ঞানিক ধুরন্ধরদের বহু পরিশ্রমের ও গবেষণার শ্রেষ্ঠ দান হইলেও ধ্বংসের অংশে কম সাহায্য করিতেছেন না।

জীবনের স্থায়িত্ব এইরূপ অনিশ্চিত এবং তাহার একমুহূর্ত্তও বিশ্বাস নাই জানিয়াও যদি শরীর সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম থাকিতে স্ত্রীপুত্রাদির ভবিষ্যতের জন্য আংশিক পরিমাণে আর্থিক সংস্থানের কিছু না করিয়া যাই তবে সেটা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমার অভাবে স্ত্রীপুত্রাদির কি হইবে এই ভাবনাতেই মানুষ আকুল হয়। এই চিন্তাই জীবন বীমার মূল সুত্র। আমরা বর্ত্তমান থাকিতে এবং আয় স্বচ্ছল থাকিতে পুত্র কন্যাদির যে ভাবে প্রতিপালিত করি। এবং যে ভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দিক্ষায় দীক্ষিত করি—আমাদের অবর্ত্তমানে আয়ের পথ রুদ্ধ হইলে তাহাদিগকে স্বচ্ছল অবস্থা হইতে দারিদ্র্যের চরমে উঠিয়া রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়। এই প্রকার কঠোর জীবন যুদ্ধে আশৈশব সুখে লালিত পালিত জীবন প্রদীপ হয়ত অকালেই নির্ব্বাপিত হয়। জীবন বীমা শুধু টাকা পয়সার দিক দিয়া নয় স্ত্রীপুত্রদের দেহ ও ভালবাসার দিক দিয়াও দেখিবার আছে। যাহারা একদিন প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিল, যাহাদের একটু সুখ ও স্বাচ্ছন্দ

দিতে পারিলে প্রাণে কতই না আনন্দ অনুভব করিতাম কি সে তারা সুখে থাকে এই চিন্তাই তখন প্রবল ছিল মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস্ নিজের শরীরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সমানে শারীরিক মানসিক সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতাম তাহাদের মঙ্গলের জন্য, সুখের জন্য শান্তির জন্য। কিন্তু হায়! মৃত্যুই কি আমাদের সমস্ত দায়িত্বের হাত হইতে মুক্তি দিবে? জীবিত থাকাকালিন যে কর্ত্তব্য ছিল তাহা কি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইবে? পরলোকে ও কি আমাদের আত্মা ইহ জীবনের সুখ দুঃখের ভাগীকে অনাহারে, অর্দ্ধাহারে তিলে তিলে মরিতে দেখিলে শান্তি পাইবে?

ব্যক্তিগত জীবনে বীমার প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও দেশের শিল্প বাণিজ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি উন্নতি বিধানে বহুল পরিমাণে সাহায্য করে। কোম্পানী প্রতি বৎসর যে টাকা পলিসির প্রিমিয়াম দরুণ পান তাহার কতক অংশ দেশের আর্থিক উন্নতিতে ব্যয়িত হয়। আর্থিক বলে শক্তিশালী বড় বড় বীমা কোম্পানীগুলি দেশের জাতীয় সম্পদ স্বরূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও এ দেশ হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ৪ কোটী টাকা প্রিমিয়াম, বাবদ বিদেশীয় বীমা কোম্পানীর হাতে যায়। বলা বাহুল্য উক্ত টাকার কোন অংশই এদেশের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হয় না সেই জন্য প্রত্যেক দেশহিতৈষীর কর্ত্তব্য দেশীয় বীমা কোম্পানিতে বীমা করা যাহাতে উক্ত কোটী কোটী টাকা বিদেশীয়দের হাতে না গিয়া আপনার দেশকে উন্নত করে।

উন্মেষ

শ্রীশচীন্দ্র লাল রায় এম্ এ

—১—

বড়রাস্তার উপর বাড়ী সম্মুখে কাষ্ঠ ফলকে লেখা—শ্রীমতী সরযূ বালা চ্যাটার্জ্জী, লেডি ডাক্তার, গোল্ড মেডেলিষ্ট। পাশ দিয়েই একটি অপ্রশস্ত গলি চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীটির দুইটি অংশ—অপরটির সদর দরজা গলির উপর। দরজায় পিতলের ফলকে লেখা শ্রী আশুতোষ বানার্জ্জী এম, বি (হোমিও)

লেডী ডাক্তারের বাড়ীতে থাকিত--তাহার বালিকা কন্যা ও একটি উড়িয়া চাকর। আর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের বাড়ীতে ছিল—তাহার একমাত্র কিশোর পুত্র আর একজন ঠিকা ঝি।

এই দুইটি ক্ষুদ্র পরিবারের আভ্যন্তরিন সম্পর্ক কল্পনা করিয়া লইতে পাড়ার লোক বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছে তাহা জানা যায় না। কারণ লেডি ডাক্তারের মুখের তোড় ও হোমিওপ্যাথের অমিশুক স্বভাবের জন্য পাড়ার লোকের সহিত তাহাদের তেমন বনিবনাও হইতে পারে নাই।

বাড়ীর দুইটি অংশের মধ্যে গতি বিধি করিবার জন্য যে দরজা ছিল—তাহা কোনও সময়ে বন্ধ থাকিত—কোনও সময়ে বা মুক্ত থাকিত। কেন এইরূপ হইত তাহা ঠিক বলা যায়না। তবে প্রথম যে ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া এই বন্ধ মুক্তির প্রহসন চলিয়াছিল তাহা এই।

লেডি ডাক্তারটি বাড়ীটির প্রথম অংশ ভাড়া লইবার পর হোমিওপ্যাথটির অপর অংশে আবির্ভাব হয়। সরযূ বালা শূন্য অংশটিতে ভাড়া আসিতে দেখিল। আরও

লক্ষ্য করিয়া দেখিল—একটি শিশুপুত্র ভিন্ন আগন্তুকের আর অন্য অবলম্বন নাই। দিন দুই তিন পরে সরযূবালা বোধ করি কোনও 'কলে' যাইবার জন্য সাজ পোষাক ঠিক করিয়া লইতেছিল—এমন সময়ে ও বাড়ীর ভাড়াটিয়া আশুবাবু সেইকক্ষে উপস্থিত হইয়া মৃদুহাস্যে কহিলেন "নমস্কার।"

সরযূবালা মাথার উপর আঁচলটি একটু টানিয়া দিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল—কি চান?

আশুবাবু বলিলেন "আমি আপনারই বাসার পেছন দিকটার ভাড়াটে। আজ তিন দিন হল এসেছি। একটু সুস্থির হয়ে বসেই আপনার সাথে পরিচয় করে নেবার জন্য এলুম"। এই বলিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

সরযূবালা অপ্রসন্ন মুখে চাপা গলায় কহিল "ইডিয়ট!"

আশুবাবুর মুখের হাসির হ্রাস হইল না, বলিলেন "আজ্ঞে হ্যাঁ ইডিয়টই বটে। পাড়া গাঁয়ে বাস ছিল, উঠে এলাম কলকাতায় প্রাক্‌টিস্ করতে। সাহায্য করবার কেউ নাই তাই বোকা বনে গেছি। আপনি তো ব্যবসা করছেন অনেকদিন-তাই ভাবলাম আপনার সাথে পরিচয় করে নিলে—"

সরযূবালা বিরক্তির সুরে কহিল—"ও তাহলে আপনার হয়ে বাড়ী বাড়ী সুপারিশ করে বেড়াতে হবে বুঝি? আচ্ছা আচ্ছা বেহায়া লোক তো আপনি দেখতে পাই। এখন আসুন আপনি। গল্প করবার মত ফুরসুৎ আমার বড় কম। যদি কখনও বাড়ীর কাহারও অসুখ বিসুখে আমার সাহায্য প্রয়োজন হয় তখন 'কল' দেবেন, কাজের ফুরসুতে আলাপ করে আসব, এখন নয়।

এ অপমানেও আশুবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল না, তিনি ম্লান হাসিয়া কহিলেন—"আপনার ও ভাবে সাহায্য নেবার যে আমার কোনকালে প্রয়োজন হবে সে তা মনে হয় না। স্ত্রীলোক আত্মীয় বলতে আমার কেউ নেই। এক স্ত্রী ছিল তাকেও হারিয়েছি। দেখতে পাচ্ছি আমার উপরে আপনি যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। আচ্ছা, এখন আসি—নমস্কার"। এই বলিয়া আশুবাবু সরিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুই বাড়ীর মধ্যের দরজাটি বন্ধ হইয়া গেল।

এই তো গেল ইহাদের প্রথম পরিচয়ের কথা এই দুইটি পরিবারের শিশু দুইটির কি ভাবে আলাপ হইল দেখা যাক্।

দোতালার ছাদে লেডি ডাক্তারের ছয় বছরের কন্যা চিত্রা লজঞ্চুষ চুশিতেছিল এমন সময় আশুবাবুর দশম বর্ষীয় পুত্র সুনীল উপস্থিত হইল। সে কিছুক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট বালিকার দিকে চাহিয়া রহিল তাহার হয়ত মনে হইল এখানকার সঙ্গী হীন জীবনে ইহাকে সঙ্গী পাইলে মন্দ হয় না। সে অগ্রসর হইয়া কহিল কি করছো খুকি?

হাতের গুটি পাঁচ ছয় লজঞ্চুসের মধ্যে একটি মুখে পুরিয়া বালিকা কহিল ও মস্ত বড় লোক তুমি—তাই খুকি বলে ডাকা হচ্ছে!"

বালক তাহার নিকটে বসিয়া কহিল আমিতো তোমার নাম জানিনে ভাই।

—আমার নাম চিত্রা।

—তুমি কি খাচ্ছ ভাই চিত্রা?

বালিকা তাহার ক্ষুদ্র করতল প্রসারিত করিয়া রং বেরংএর খাদ্য দ্রব্যগুলি দেখাইল। বালক লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর কহিল—তুমি আমার সাথে খেলবে তো ভাই চিত্রা?

বালিকা গম্ভীর ভাবে কহিল "হুঁ।"

সুনীল উৎসাহিত হইয়া কহিল "বেশ হবে তাহলে খুব ভাল হবে। আর আমি যখন যে জিনিষ খেতে পাবো তোমাকে তার ভাগ দেব"।

চিত্রা বোধহয় ভাবিয়া দেখিল উদারতা প্রকাশ করিবার সময় তাহারই আগে আসিয়াছে। সে কহিল "একটা লজঞ্চুস্ খাবে তুমি?

বালক ঘাড় দোলাইয়া সম্মত জানাইল। বালিকা অনেক বাছিয়া একটি সুনীলের হাতে অর্পণ করিল।

সুনীল সেইটি মুখে পুরিয়া কহিল—বেশ হল ভাই তোমার সাথে আলাপ হয়ে। রোজ রোজ আমরা একখানে খেলবো কিন্তু।

এই প্রস্তাবে বালিকাও ক্রমশঃ উল্লসিত হইয়া উঠিল। এইভাবে দুটি বালক বালিকার পরিচয় ঘনীভূত হইয়া পরস্পরের মধ্যে পরম বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়া গেল।

মাস দুই তিন পর সরযূবালা শুনিতে পাইল পাশের

অংশটি হইতে অস্ফুট যন্ত্রণাধ্বনি আসিতেছে। সে কিছুক্ষণ কানপাতিয়া শুনিল তারপর ধীরে ধীরে বদ্ধ দরজার শৃঙ্খল উন্মুক্ত করিয়া অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইল।

আশুবাবু জ্বরের ঘোরে ছটফট করিতেছিলেন সরযূ তাঁহার শিয়রে উপবেশন করিয়া স্নিগ্ধ শীতল করতল তাহার উষ্ণ ললাটে স্থাপন করিতেই আশুবাবু বলিলেন—কে ?

"আমি, লেডি ডাক্তার।"

যন্ত্রণার মধ্যেও ম্লান হাসিয়া আশুবাবু কহিলেন—"আপনি আপনি কেন এলেন ?"

লেডি ডাক্তার কহিল 'আপনি চুপ করুন দেখি' আমি তো প্রথম দিনই বলেছিলুম প্রয়োজন হলেই ডেকে পাঠালে আমি আসবো। সুনীলকে পাঠিয়ে দেওয়া আপনার উচিত ছিল। পুরুষ জাতটাই এম্‌নি বোকা। আমরা শুধু স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করিনে প্রয়োজন হলে পুরুষদের সেবা শুশ্রূষা করাও আমাদের অভ্যেস আছে। আপনাকে কষ্ট করে আর কিছু বলতে হবে না—অনেক আঃ উঃ করেছেন—এইবার ঘুমোবার চেষ্টা করুন।...

এই বলিয়া সরযূবালা তাহার ক্রোড়ের উপর আশুবাবুর উষ্ণ মস্তক স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে কোমল অঙ্গুলিগুলি তাঁহার চুলের মধ্যে চালনা করিতে লাগিল।

ইহার পর কিছুদিন আর মধ্যবর্ত্তী দ্বার রুদ্ধ হয় নাই।

—২—

বছর সাত আট পর। সুনীলের বয়স সতরো আঠারো আর চিত্রার তের চোদ্দ। তাহাদের প্রথম পরিচয়ের বন্ধুত্ব এখনও অক্ষুণ্ণ আছে—এখনও তারা এক সঙ্গে খেলা-ধূলা, গল্প সল্প, ঝগড়া বিবাদ করিয়া থাকে—শুধু হাতা-হাতিটা আর করে না।—

সেদিন সন্ধ্যার পর ছাদে বসিয়া দুইজন গল্প করিতেছিল—ফুটবল ম্যাচের গল্প। সেই দিন বৈকালে ইণ্ডিয়ানদের সহিত ইউরোপীয়ানদের ম্যাচ ছিল ইণ্ডিয়ানরা জিতিয়াছে। সুনীল খেলা দেখিতে গিয়াছিল। সে সোৎসাহে বাঙালীদের কৃতিত্বের গল্প করিতেছিল—আর চিত্রা তন্ময় হইয়া শুনিয়া যাইতেছিল।

চিত্রা কহিল—আমি তোমাকে বল্লুম আমাকে নিয়ে চল—তুমি তো নিয়ে গেলে না, নিজে দেখে এসেই সন্তুষ্ট।

সুনীল হাসিতে হাসিতে কহিল—সেখানি কি যেতে পারতিস্ তুই—যা ভিড়। ভিড়ের চাপে আমারই গলদঘর্ম্ম অবস্থা তুই হলে তো মূর্চ্ছা যেতিস্।

চিত্রা ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল—ও মস্ত বড় বীর তুমি। ঐ তো নিক্‌নিকে চেহারা। তুমি ভিড় সহ্য করতে পারলে আর আমি পারতুম না ?

সুনীল কহিল—তবু ব্যাটা ছেলে আমি।

—ব্যাটা ছেলে হয়েছ বলে মাথা কিনে নিয়েছ। ভারী বড়াই তোমার—আচ্ছা, পাঞ্জা কসতো আমার সাথে—দেখি কেমন জোর। এই বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া দিল।

সুনীল তাহার সরু সরু পাঁচটি আঙুল প্রসারিত করিয়া কহিল—বেস, কিন্তু হাত মচ্‌কে গেলে কাঁদতে পারবি নে তা বলে দিচ্চি।

চিত্রা তাহার নরম সুপুষ্ট অঙ্গুলিগুলির মধ্যে সুনীলের অঙ্গুলিগুলি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া কহিল—আচ্ছা, দেখা যাক্।

সুনীল হাসিতে হাসিতে কহিল—এখনও তোর নরম তুলতুলে হাত সরিয়ে নে চিত্রা—নইলে ব্যথা লাগ্‌বে।

চিত্রা কহিল—আচ্ছা, দেখি না তোমার কত জোর। এই বলিয়া তাহার হাত আরও জোরে চাপিয়া ধরিল।

প্রথমে সুনীল বিশেষ জোর দিল না—তারপর একটু চাপিয়া ধরিতেই—চিত্রা 'উহু, কি লোহার মত শক্ত হাত বাবা—এই বলিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখ ছলছল করিতেছিল, সে অভিমান স্ফুরিত অধরে কহিল—আমার হাত ভেঙ্গে দিয়েছে—আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি।

সে দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। সুনীল ব্যগ্র হইয়া ডাকিল—শুনে যা চিত্রা। কিন্তু চিত্রা কোনও উত্তর দিল না।

সুনীল নিজের মনেই হাসিতে লাগিল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে—চাঁদের কিরণে সমস্ত ছাদ প্লাবিত। গোটা

কতক টবের গাছে ফুল ফুটিয়াছে—এই গুলি সুনীল ও চিত্রা নিজের হাতে বপন করিয়াছিল। ফুলের গন্ধে সুনীলের মন আরও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার হৃদয় যেন উল্লাসে নাচিতেছে। আজিকার মত এমন অভূতপূর্ব্ব উল্লাস সে যেন আর কোনও দিন উপলব্ধি করে নাই। সে একবার নিজের হাতের দিকে চাহিল। মনে করিল—এই কঠিন অঙ্গুলির পেষণে চিত্রার মত কোমল হাতে ব্যথা দেওয়া উচিত হয় নাই। কিন্তু তাহার মনে বিশেষ দুঃখের ভাব উদিত হইল না—চিত্রার কোমল অঙ্গুলির স্পর্শের মাধুর্য্যটুকু যেন তাহার অন্তরকে অনবরত দোলা দিতে লাগিল।

সরযূবালা ও আশুবাবু দুইজনে গল্প করিতেছিলেন —বোধ করি তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তারী শাস্ত্রেরই আলোচনা হইতেছিল—এমন সময় চিত্রা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাঁদো কাঁদো সুরে কহিল—দেখেছ মা সুনীল দা আমার আঙুলগুলো একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে।

সরযূ কহিল—কেন রে?

চিত্রা সজল নেত্রে কহিল—শুধু শুধু। আমি তাকে ম্যাচ দেখ্‌তে নিয়ে যেতে বলেছিলুম কিনা। নিয়ে তো গেলই না, তার উপর—।

আশুবাবু বলিলেন—দেখি তো মা। চিত্রার কোমল হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল— আহা, একেবারে লাল হয়ে উঠেছে দেখছি যে! আচ্ছা আমি সুনীলকে বকে দেব।

চিত্রা শান্ত হইয়া কহিল—ব্যাটা ছেলের জোর তো বেশীই থাক্‌বে—সে আর বেশী কথা কি! কিন্তু সুনীল দার ভারী অহঙ্কার।

সরযূ ও আশুবাবু হাসিতে লাগিলেন। চিত্রা বাহির হইয়া গেলে সরযূ সহাস্যে কহিল তোমারই ছেলে তো, দুষ্টুমি বুদ্ধিতে বড় কম নয়।

আশুবাবু সহাস্যে জবাব দিলেন—তোমার মেয়েটিও বড় কম যায় না।

চিত্রা ছাদে ফিরিয়া সুনীলের দিকে একটি বক্র কটাক্ষ করিয়া আলিসার ধারে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। সুনীল চিত্রার অভিমান দেখিয়া মনে মনে হাসিল। সে নিঃশব্দে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া সহসা তাহার মুখ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার অধর চুম্বন করিল। হতবুদ্ধি চিত্রা ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিল -তারপর সজোরে সুনীলকে ধাক্কা দিয়া দৃপ্ত ভাবে কহিল—ও, এমন হয়েছ তুমি!

সে এই কথা বলিয়াই দৃঢ় পদক্ষেপে নীচে নামিয়া গেল।

সুনীলের মনে এইবার আশঙ্কার উদয় হইল—কেন সে যে আত্মহারা হইয়া এমন কাজ করিয়া বসিল—সে নিজেই জানিত না। যেন কোনও অলক্ষ্য শক্তি আজ তাহার মনকে আন্দোলিত করিয়াছে তাই আকাশের চাঁদ মলয় হাওয়া, পুষ্পের সুবাস তাহাকে জীবনে এই প্রথম এমনি কারয়া মাতাইল। তাহার মনে হইল এই যে ক্ষুদ্র ঘটনাটি ঘটিয়া গেল ইহাতে তাহার কোনও হাত ছিল না। এক অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় এই যৌবনোন্মুখী বালিকার দিকে তাহার মন ধাইয়াছে, যন্ত্র চালিতের মত সে এই বালিকার দেহ স্পর্শ করিয়াছে—তাহাকে চুম্বন করিয়াছে।

চিত্রার আচরণে তাহার আশঙ্কা হইল বটে কিন্তু তাহার মনের লঘুভাব ঘুচিলনা। সে চাঁদের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া ভ্রূকুটি করিল. টবের গাছের ফুল তুলিয়া ঘ্রাণ লইল এবং লঘু পদক্ষেপে ছাদের উপর বারংবার পদচারণা করিয়া ফিরিতে লাগিল।

এদিকে চিত্রা নীচে আসিয়া সমস্ত কথাই তাহার মাকে বলিয়া দিল। সরযূ বালা সমস্ত শুনিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি!... সে দ্রুতপদে আশুবাবুর বাড়ীর দিকে ধাইয়া গেল।

আশু বাবু হোমিওপ্যাথিক বই লইয়া সবেমাত্র বসিবার উদ্যোগে করিতেছিলেন-এমন সময় সরযূ ঝড়ের মত সেইখানে কহিল—তোমাদের সাথে আর কোনও সম্পর্ক রাখা চল্বেনা আমাদের। ঐ টুকু ছেলে-তার পেটে পেটে এত বজ্জাতি!

আশুবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—কি হলো সরযূ?

সরযূ ক্রুদ্ধস্বরে কহিল—সরযূ! নামধরে ডাক্‌তে লজ্জা করে না? এমন বেয়াদপ ধেঁ—তার ছেলে আর কত ভাল হবে। কিন্তু এই বয়সে ছিঃ ছিঃ!

'অধিকতর বিস্মিত হইয়া আশুবাবু কহিলেন—কিছুই তো বুঝতে পারছি নে আমি।'

তীব্র সুরে সরযূ বলিল—ন্যাকা কিনা, জানেন না কিছুই! চিত্রাকে আজ জোর করে চুমু খেয়েছে তোমার ছেলে। এর পরে আর কোনও সম্বন্ধ রাখা চলেনা—এই কথাই বল্‌তে এসেছিলুম। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

আশুবাবু শুনিতে পাইলেন—সশব্দে দুই বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী দরজাটি বন্ধ হইয়া গেল।

৩

সুনীল দেখিল—তাহার পিতা কিছুই বলিলেন না। সে খায় দায়, যথাসময়ে কলেজে যায়, বাড়ী ফিরিয়া ছাদের উপর ঘোরা ফেরা করে—কিন্তু চিত্রার আর দেখা মেলেনা। চিত্রাকে দেখিবার জন্য তাহার মনটা উস্‌খুস্ করে, তাহার নিকট ক্ষমা চাহিবার জন্য সে ব্যাকুল হয়—কিন্তু উপায় নাই!

এমনি ভাবে কাটিবার পর তাহার মন পুনরায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। যে উন্মাদনা তাহাকে একদিন অভিভূত করিয়া যৌবনের উন্মেষ সূচনা করিয়াছিল—পুনরায় উহা যেন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। তাহার রুদ্ধ ইচ্ছা এমনি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিল যে তাহাকে দমন করা যেন শক্তির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। চিত্রাকে দেখিতে পাইলে, তাহার সহিত কথা বলিবার সুযোগ দেখিতে হইলে হয়তো তাহার যৌবন-কামনা এত সহজেই তাহাকে এরূপ ভাবে আচ্ছন্ন করিত না। তাহার ক্ষণিক উত্তেজনা অল্পেই শান্ত হইত। কিন্তু এখন তাহার তরুণ মন বাঁধনহারা হইয়া চারি পাশে কি যেন খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

বাড়ীতে সে যতক্ষণ থাকে তাহার ছাদেই কাটিয়া যায়। এই সময়ে সে নিশ্চেষ্ট থাকেনা—তাহার চোখ চঞ্চলভাবে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিছুদিন পর সুনিল লক্ষ্য করিল—বড় রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি বাড়ীর ছাদের উপর একটি রমণী আসিয়া দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ সে যেন তাহারই দিকে চাহিয়া থাকে। সুনীলের চক্ষু যেন এতদিন পর একটি স্থির আশ্রয় খুঁজিয়া পাইল।

একদিন সুনীলের মনে হইল-সেই তরুণী যেন তাহার দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল। আর একদিন তাহার যেন মনে হইল ঐ রমণী অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহার দিকে চাহিয়া ইসারা করিল। সেদিন সে বিনাকারণে সেই বাড়ীটির পাশদিয়া বারবার ঘুরিয়া আসিল—কিন্তু তাহাতে কোনও লাভ হইল না।

সন্ধ্যার পর আশুবাবু অনেকদিন পর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—লেখাপড়া কেমন হচ্ছে আজকাল?

পুত্র মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল—মন্দ হচ্ছে না তো বাবা!

পিতা আর কিছু কহিলেন না পুত্র অগত্যা বই খুলিয়া বসিল। কিন্তু পাঠ্য বস্তুতে তাহার মন গেল না, নারীর গোপন মাধুর্য্য কোথায় তাহারই তত্ত্বান্বেষণে তাহার মন নিযুক্ত হইল। চিন্তা করিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে চিত্রার মুখ। এত নিকটে থাকিয়াও সে কি এত দূরে চলিয়া গেল! কি দোষ সে করিয়াছিল যে চিত্রা এমন নিষ্ঠুর হইল তাহার উপর?

কিন্তু নারীর নিষ্ঠুরতার জবাব দিবার বয়স তাহার হইয়াছে। তাহার মনে পড়িল সম্মুখের বাড়ীর তরুণী নারীর দৃষ্টি, হাসি ও অঙ্গ সঞ্চালন। তাহার যৌবনানুভূতি সমস্ত শিরায় শিরায় সঞ্চালিত হইয়া তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল। এই নারীর সহিত পরিচয় স্থাপনের অদম্য ইচ্ছা কি করিয়া পূরণ হইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কি একটা কথা মনে করিতেই সে একটু মুচকি হাসিয়া পুস্তক বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

পরদিন দেখা গেল সুনীলের ঘুড়ি উড়াইবার অদম্য ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে। সমস্ত সাজ সরঞ্জাম ক্রয় করিয়া সকালে বৈকালে তাহার ঘুড়ি উড়াইবার ধুম পড়িয়া গেল। সে হস্তকৌশলে ঘুড়িটি সম্মুখের বাড়ীর ছাদে ফেলিয়া দিত, কিছুক্ষণ পর সেই ঘুড়িটি আপনি শূন্যে উঠিয়া সুনীলের আকর্ষণে অবিলম্বে নীচে নামিয়া আসিত। সুনীলের এই অভিনব দূতটি অভিনব উপায়ে এই দুই

তরুণ তরুণীর অভিনব প্রেমাভিনয়ের সাহায্য করিতে লাগিল।

দুই তিন মাস এমনি ভাবে কাটিল। কলিকাতা সহরে ঘুড়ি উড়াইবার ইচ্ছা সকলেরই ক্রমশঃ লোপ পাইল কিন্তু সুনীলের সেদিকে খেয়াল ছিল না। কিন্তু ভগবান বাদ সাধিলেন অনুকুল বাতাস আর সচরাচর মেলে না। তবু একদিন প্রিয়তমার একখানি ক্ষুদ্র লিপি অতিকষ্টে তাহার হাতে আসিল এবং তাহা পাঠ করিয়া তাহার মন আনন্দে ও আশঙ্কায় দুলিতে লাগিল। রাত্রি বারটায় সম্মুখের বাড়ীর দুয়ার মুক্ত থাকিবে নায়িকা তাহাকে আহ্বান করিয়াছে। নারীর আহ্বান—তাহার নিকট নূতন বস্তু। কল্পনাতে এতদিন তাহার কাটিয়াছে বাস্তবে নামিতে তাহার ভয় করিতে লাগিল।

কিন্তু ভিতরে ছাপাইয়া উঠিল যৌবন কামনা। রাত বারটায় সে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। রাস্তার এপাশে ওপাশে চাহিয়া সে সম্মুখের বাড়ীর দ্বারের সন্নিকট হইল। একবার ইতস্ততঃ করিল পরক্ষণেই দ্বার ঠেলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল। লিপিতে ইঙ্গিত ছিল বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া নীচতলার দ্বিতীয় কক্ষে যাইতে হইবে। সমস্ত বাড়ীটি খা খা করিতেছে জন মানবের সাড়াশব্দ নাই। তাহার বুক ভয়ে দুরু দুরু করিতে লাগিল কিন্তু ফিরিবার তাহার উপায় ছিল না। সে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিল কক্ষটি গাঢ় অন্ধকার। সে ভীতিবিহ্বল নেত্রে অন্ধকারের মধ্যেই চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

সহসা বৈদ্যুতিক আলোতে ঘরটি আলোকিত হইয়া উঠিতেই সুনীলের চোখের সম্মুখে যে দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল তাহাতে সে শিহরিয়া উঠিল। একজোড়া ভাঁটার মত চক্ষু তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে মুখে তাহার কুটিল হাসি। উপরন্তু এ দৃষ্টি নারীর নয়—কঠরোতম পুরুষের।

লোকটী অগ্রসর হইয়া সুনীলের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—কি সোনার চাঁদ ছেলে, প্রেম করতে এসেছ? সঙ্গে সঙ্গে দুই গালে দুই প্রচণ্ড চপেটাঘাত। সুনীল ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল বটে কিন্তু তাহার মাথা বোঁ বোঁ করিতে লাগিল।

লোকটি তাহার কান ধরিয়া ঝাকনি দিতে দিতে কহিল—কিহে ছোক্‌রা, কথা বেরোয় না যে! বলি বয়স কত?

কান্না চাপিতে চাপিতে সুনীল কহিল উনিশ।

বটে বটে! এই বয়সেই পেকেছ তো খুব। কি ভেবেছিলে ছোকরা বল দেখি এই বলিয়া তাহার গালে আর দুই চড় বসাইতেই সুনীল আর সম্বরণ না করিতে পারিয়া ঘুরিয়া পড়িল।

কান ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া লোকটি হাকিল—'ওরে মণি দেখে যা!'

পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি রমণী হাসিমুখে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেই সুনীল একবার চাহিয়াই মুখ নত করিল। পুরুষটি কহিল—জিজ্ঞেস করে দেখ দেখি গোটা পঞ্চাশেক টাকা বেশী দিতে পারবে কিনা। আমি দিই মাসে আড়াইশ—তিনশ করে না দিলে কি আর পোষাবে তোর। কি বলিস্‌রে ছোড়া? সঙ্গে সঙ্গে আর দুই চপেটাঘাত।

সুধা মুখে কাপড় গুজিয়া হাসিতে লাগিল।

পুরুষটি কহিল—ধন্যি ছেলে বাবা। আমরা তো বখেছি সাতাশে আঠাশে এখন বয়স হল পয়ত্রিশ। উনিশেই তোমার এত বিদ্যে! বাপের পয়সা টয়সা আছে কিছু?

সুনীল নির্ব্বাক্—স্ত্রীলোকটী সহাস্যে কহিল—ওকে আর মারধর করে কি হবে ছেড়ে দাও।

হুঁ, ছেড়েত দেবই—কিন্তু শিক্ষা ওর এখনও হয়নি। কি বুদ্ধি বাবা। ইসারায় হলনা তার উপর আবার ঘুড়ি উড়িয়ে চিঠি চালাচালি। বুদ্ধি তো খাসা লেখাপড়া জানলে কাজে লাগত! বলি আর প্রেম করবি না নেশা ছুটেছে—এই বলিয়া সজোরে এক পদাঘাত করিতেই সুনীল হুড়মুড় করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। কিন্তু সে লোকটির দয়া হইলনা সে উপর্য্যুপরি পদাঘাতে তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া অবশেষে তাহাকে দুই হাতের উপর তুলিয়া লইয়া রাস্তায় নিক্ষেপ করিয়া সশব্দে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সুনীলের বোধ করি জ্ঞান ছিলনা। কতক্ষণ সে মুহ্যমানের মত রাস্তার উপর অসিয়াছিল সে জানে না।

কিছুক্ষণ পরে তাহার মনে হইল কে একজন তাহাকে একরূপ বুকে করিয়া কোনও রকমে বড় রাস্তা পার করিয়া লইয়া গেল। সুনীল ভীতি বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল সে চিত্রা।

চিত্রা সুনীলকে লইয়া একেবারে নিজের কক্ষে সযত্নে শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর তাহার চোখ দিয়া অঘোরে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সুনীল চোখ নির্মিলিত করিয়া নিঝুম হইয়া পড়িয়াছিল সহসা চিত্রা তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। ধীরে সুনীল চোখ মেলিল—বিহ্বলভাবে চিত্রার মুখের দিকে চাহিতেই সে বুঝিতে পারিল—তাহার হৃদয়ের সমস্ত লুকোচুরির ব্যাপার তাহার নিকট অবিদিত নাই।

লেডি ডাক্তার কলে গিয়াছিল -ফিরিতে রাত দুইটা হইয়া গেল। কন্যার ঘুম ভাঙ্গিবে মনে করিয়া সে পা টিপিয়া উপরে উঠিতেই চোখে পড়িল—চিত্রার কক্ষে আলো জ্বলিতেছে এবং চিত্রা সুনীলের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

সরযূবালা ক্ষণিক এই দৃশ্য দেখিল তাহার পর অনেক দিন পর পুনরায় দুই বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী দরজা উন্মুক্ত করিয়া আশুবাবুর গৃহে প্রবেশ করিল।

আশুবাবু নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা দিতে ছিলেন সরযূর ডাকে ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিয়া বিস্মিত ভাবে কহিলেন—ব্যাপার কি সরযূ?

সরযূবালা গম্ভীর মুখে কহিল—ব্যাপার গুরুতর। এমন ভাবে থাকা যায় না।

মধ্যরাত্রে এই নারীর আবার কিসের অভিযোগ! আশুবাবু মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

সরযূ কহিল—তোমার মোটা বুদ্ধি নিয়ে কলকাতায় আসাই ভুল হয়েছিল—এই কথাই বলতে এলাম

আশুবাবু কহিলেন—তাইতো!

—তাইতো বল্লেই আর চল্‌ছে না। উপরের দরজা না হয় বন্ধই ছিল—কিন্তু নীচ দিয়েও তো যাওয়া যেত, আমার ওখানে। কোনও দিন সে চেষ্টা তুমি কর নি। না করলে ভাল কথা—কিন্তু বাড়ীতে বসেও ছেলেকে শাসন করা চল্‌তো—তাও তুমি পার নি। এর ফলও ফলেছে।

আশুবাবু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিলেন—কিছুই বুঝতে পারছি নে যে!

সরযূ গম্ভীর ভাবে কহিল—কিছুই বুঝতে পার না, সে আমি জানি—তাই প্রথমে দেখেই তোমাকে বলেছিলুম—ইডিয়ট! কিন্তু এ কথা যাক্—চিত্রা আর সুনীলের ব্যবস্থা একটা শীগ্‌গিরই করতে হয়—ওদের বিয়ে না দিলে আর চলে না।

আশুবাবু খুসী হইয়া কহিলেন—আমি অনেক দিন থেকেই সে কথা এঁচে রেখেছি—বলতে সাহস করিনি। সুনীলের ব্যবহার দিন দিন দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠলেও বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু চিত্রা——।

সরযূ কহিল—আমার মেয়ের মনের খবর বুঝবো আমি। তুমি সম্মত কিনা তাই বল।

আশুবাবু তড়াক করিয়া উঠিয়া সরযূর এক হাত ধরিয়া ঝাঁকাইয়া দিয়া কহিল নিশ্চয়, নিশ্চয়। তাহলে আমাদের সম্বন্ধটা কি রকম দাঁড়োলো?

গ্রীবাভঙ্গী করিয়া মুচকি হাসিয়া সরযূ বালা কহিল, বেহাই বেয়ান কেমন—রাজী ত?

শাসন তান্ত্রিক গবেষণা

বহু গবেষণায় এখনও ঠিক হইতেছেনা ভারতবর্ষকে কিরূপ শাসনতন্ত্র প্রদান করা হইবে। যাঁহারা নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত হইলে সুফল ফলিবে বলিয়া আশা করেন, তাঁহারা নূতন তন্ত্রের জন্য অনেকটা উদগ্রীব হইবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। বাজারে খুবই জোর গুজব সরকার পক্ষ এই নূতন তন্ত্র যত শীঘ্র পারেন প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ১৯৩৩ সাল গত প্রায় কিন্তু সিলেক্ট কমিটির কার্য্য এখনও শেষ হইল না। সুতরাং ১৯৩৪ সালের প্রারম্ভেই যে ইণ্ডিয়া বিল পার্লামেণ্ট মহা-সভায় পেশ হইতে পারিবে এমন মনে হয়না। আগামী সনের মধ্যভাগে উহা পেশ করিয়া খুব দ্রুততার সহিত উহার কাজ চালাইলেও ১৯৩৪ সালের শেষ ভাগের আগে কখনই ইণ্ডিয়া বিল পাশ করাইতে পারা যাইবেনা। কাজেই নূতন তন্ত্রের নির্ব্বাচন ১৯৩৫ সালের প্রারম্ভের পূর্ব্বে হইতে পারেনা। তবে যদি এই আপত্তি উঠে যে তখন ভয়ানক গ্রীষ্ম, দারুণ রৌদ্রের তাপে নির্ব্বাচন কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিবেনা, তাহা হইলে হয়তো বা ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসই নির্ব্বাচন মাস বলিয়া ধার্য্য করা যাইতে পারে। এদিকে দুই একটী প্রদেশের আইন সভা গুলির কার্য্য কাল শেষ হইয়া আসায় উহাদের পরমায়ু বৃদ্ধি করা হইল। বাংলা কাউন্সিলের আয়ু আগামী বৎসরের জুলাই মাসে ফুরাইবে। একবৎসর কাল উহার পরমায়ু ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আরও একবৎসর বৃদ্ধি করিতে হইবে। আবার জোর গুজব যে যদিও প্রাদেশিক আইন সভা গুলির কার্য্য নূতন বিধান মতে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর হইতে আরম্ভ হয় কেন্দ্রীয় সরকারে নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত করিতে আরও দুই চারি বৎসর লাগিবে অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকার গুলির কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিয়া পরীক্ষায় উহা সর্ব্বপ্রকার নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইলেই তবে কেন্দ্রীয় সরকারে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হইবে। এইজন্যই অনুমান হয় আসেম্বলীর নির্ব্বাচন আসন্ন প্রায়, উহার আয়ু আর বৃদ্ধি করা হইবেনা। আমাদের এই ধারণা সবই অনুমান মাত্র। কার্য্য খুব দ্রুতভাবে অগ্রসর হইলে কত শীঘ্র নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত হইতে পারে তাহাই আলোচনা করা গেল কিন্তু সিলেক্ট কমিটীর কার্য্য মন্থর গতিতে চলিতেছে উহার স্থিতিকাল যদি দীর্ঘ হইয়া দাঁড়ায় এবং আগামী বৎসরের মার্চ্চমাসের পূর্ব্বে যদি ইণ্ডিয়া বিল প্রণয়ন না হয়, তাহা হইলে নূতন বিধান ১৯৩৫ সালেও প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে কিনা সন্দেহ তখন মনে হয় ১৯৩৬ সালেই নূতন বিধান দেখা দিবে। সুতরাং আরো বেশ কিছুদিন মন্ত্রীবর্গ ও সদস্যেরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে বর্ত্তমানের পতিত জাতি

এই স্থলে আরও একটী তর্ক উঠিতে পারে, নূতন বিধান কিরূপ হইবে, উহার যেরূপ আকারই হউক না কেন উহা ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে কিনা? বাক্যযুদ্ধের ব্যূহাবলী যাঁহারা ভাল করিয়া দেখিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ ভাবেন যে ভবিষ্যতে হয়ত চার্চ্চহিল সাহেবেরই জয় হইবে। তাহা হইলে আমাদিগকে কিছু কিছু হটিয়া যাইতে হইবে, অর্থাৎ নূতন প্রবর্ত্তিত আইনাবলী ১৯১৯ সালের পূর্ব্বকার অবস্থাই আনয়ন করিবে। হোর সাহেবও খুব জবর লোক। তিনিও হোয়াইট পেপারকে খুব জাপটাইয়া ধরিয়াছেন উহা হইতে তিল মাত্র পদস্খলন তাঁহার ইচ্ছা নহে। বর্ত্তমান পার্লামেণ্ট মহাসভা তাঁহার পৃষ্ঠপোষক। কাজেই আশা করা যায় তিনি যে

চার্চ্চহিল সাহেবের নিকট রণে পরাজয় স্বীকার করিবেন তাহা মনে হয় না। ভারতের নব্য শাসনতন্ত্র যাহাই হউকনা কেন, ইহা খুবই ধ্রুব সত্য যে ভারতের রাজ-নৈতিক জগতে পতিত জাতির আবির্ভাব খুবই স্পষ্টভাবে দেখা যাইবে। পতিতগণকে এতদিন আমরা পতিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, মানুষের সর্ব্বপ্রকার অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছিলাম, সত্যের মর্য্যাদা সর্ব্বদাই ক্ষুণ্ণ করিতাম, ইংরাজ তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের আসনে বসাইবেন, তাহাদের পক্ষ হইতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ দাবী পূর্ণ করিবেনই। ইহা কালধর্ম্ম ইহার বিরুদ্ধে না দাঁড়াইলেই ভাল হয়।

বর্ত্তমান সমস্যায় মহাত্মাজী

এই বিষয় আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই মহাত্মাজী ও হরিজনদের কথা মনে হয়। কবির ভাষায় লিখিতে গেলে বলিতে হয় 'হে মোর দুর্ভাগা স্বদেশ, নিত্য দূরে রাখি যারে করিয়াছ অপমান অশেষ, অপমানে হ'তে হবে তাদের সবার সমান।' আমাদের ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই স্তরে স্তরে নানা বর্ণ ও বিভিন্ন স্বার্থ বিরাজমান। আর্য্য ও অনার্য্য তত্ত্ব বহু প্রাচীন হইলেও প্রকৃত কথা বলিতে কি অনার্য্যগণকে আমরা কখনই আর্য্য জাতির অধিকার প্রদান করি নাই। কত শতাব্দী অতীত হইয়া গেল, মনুর বিধান এখনও চলিতেছে। জাতিগত বর্ণ ভেদের উপর যেInferiority complex তৈয়ারি হইয়াছিল, তাহাই fossiliyed—হইয়া অচল সনাতন শ্রেণী গুলি গঠিত হইয়াছে। পরাধীনতার সহিত স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের পন্থাগুলি আমাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেলেই, উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ তাহাদের আভিজাত্যের ভিত্তি নিম্ন বর্ণ-গণের সনাতন অক্ষমতা ও অজ্ঞতার উপর দৃঢ় করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইংরাজ ভারত বিজয়ের প্রারম্ভেই এই তত্ত্বটী অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মুষ্টিমেয় বর্ণ হিন্দুকে হস্তগত করিয়া অজ্ঞ নিম্নশ্রেণী সমাজগুলির সুবিধার কোন কথায়ই কর্ণপাত করিতেন না। আজ বর্ণ হিন্দুগণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন ইংরাজ নিম্ন শ্রেণী অচল সমাজ গুলিকে সচল করিয়া রাজ্য চালাইবেন ইহাত খুবই স্বাভাবিক।

মহাত্মাজী সেইজন্যই বোধহয় সময় থাকিতেই হরিজন সেবা আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ণ-হিন্দুগণ তাঁহার মর্ম্মকথা বুঝিতে পারিলেও বহুকাল যে সমস্ত সম্পত্তি ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন তাহা ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না এই জন্যই তাঁহার সহিত বর্ণহিন্দুদের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। বর্ণহিন্দুগণ মহাত্মাজীকে সকলপ্রকারে অপ্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং শেষপর্য্যন্ত করিবেও। ইহার ফলে ভারতবর্ষে আর একটা নূতন রাজনৈতিক বিভীষিকার সৃষ্টি হইতেছে। হিন্দু মুসলমান সমস্যাই ভারতের বহু পুরাতন মর্ম্মব্যথা। আর্য্য-সেমিটিক সভ্যতা মূলগত পার্থক্য লইয়া জন্মায়, উহা কখনই মিল খাইতে ছিলনা, তাহার উপর পুরাতন ক্ষত আর্য্য অনার্য্য তত্ত্ব উন্মুক্ত হওয়ায় ভারতের ঐক্য স্থাপন সম্পূর্ণই অসম্ভব হইয়া উঠিল।

ইঙ্গ-মুসলিম ও পতিত হিন্দু

ডাক্তার মুঞ্জে কিম্বা স্যার নৃপেন মধ্যবিত্তশ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে যাহা বলিতেছেন তাহা বর্ণ হিন্দুদের নিশ্চয়ই মুখরোচক। মহাত্মা গান্ধী হরিজনদের হইয়া যাহা বলিতেছেন তাহা চির পদানত দাসজাতি হরিজনদের মর্ম্ম কথা। এই উভয়দলের সংঘর্ষণে বিষই উৎপন্ন হইয়াছে, অমৃতের কোনরূপ দর্শন পাওয়ার আশা দেখা যাইতেছেনা। যাহারা এতদিন হিন্দুদিগকে Anglo Mnamedan Raj এর বিভীষিকা দেখাইয়া মিলন সংঘটন করিতে যাইতেছিলেন, তাঁহারা এই নূতন বিপদকে উৎকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। ইংরাজ স্বভাবতঃই রাজনৈতিক জাতি। তাঁহারা বেশই জানেন যে আভিজাত্য নির্ভর করে রাজ অনুগ্রহের উপর। পৃথিবীর ইতিহাস তাহাদের পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে। সুতরাং পতিত জাতিগুলিকে অভিজাতে পরিণত করিতে রাজার জাতি ইংরাজকে বিশেষ বেগ পা তে হইবেনা। Anglo-Mahameden Raj প্রতিষ্ঠিত হইলে যদিও বা কিছু ভয়ের কারণ ছিল, কেননা ভারতে হিন্দুজাতির সংখ্যাধিক্য আছে। বর্ত্তমান উচ্চশ্রেণী হিন্দুগণকে বাদ দিয়া যদি Anglo-Mahemaden-Depressed-class রাজ প্রবর্ত্তিত করা যায় তবে ভবিষ্যতে কোন ভয়েরই কারণ

থাকিবেনা যেহেতু বর্ণ হিন্দুগণ ভারতে চিরকালই সংখ্যায় অল্প। ইহাই রাজনৈতিক চাল। বর্ণহিন্দুগণ এই তত্বটী কবে হৃদয়ঙ্গম করিবেন ?

বর্ত্তমান সমস্যায় জওহরলাল

প্রকাশ যে পণ্ডিত জওহরলাল এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে যাঁহারা আইন সভাগুলিতে প্রবেশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তাঁহারা অনেকটা দেশের স্বার্থের অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থের দিকেই বিশেষ নজর দিয়াছেন। আইন সভাগুলিতে প্রবেশ করিলে পণ্ডিতজী স্বীকার করেন যে সরকারকে অনেকস্থলেই ব্যতিব্যস্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়া এ অবধি কোন রূপ ফললাভ ঘটে নাই, উহা ব্যতিব্যস্ততাই পরিণত হয়। কথাটী খুবই সত্য—কেননা সরকার পক্ষের হস্তে নানারূপ ক্ষমতা আছে, কোন আইন পাশ করিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইলে, তাঁহারা অতিরিক্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিবেন সুতরাং Obstruction policy অবলম্বন করিয়া বিশেষ লাভ হয় কই ? ১৯২৬ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত তাহা খুবই স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। পণ্ডিতজী অবশ্য একথাও স্বীকার করিয়াছেন যে গঠন মূলক কার্য্য চালানও মুস্কিল। কেননা দেশের আদর্শ নিত্যই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কোন সনাতনী প্রথাকে প্রধান্য প্রদান করিয়া তাহাকে জাপটাইয়া ধরিতে গেলে এই উন্নতিশীল যুগে আমরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিব। একথাও খুবই সত্য। হিন্দু সভা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এবং ইহার সম্বন্ধে পণ্ডিতজীর কঠোর মন্তব্য পড়িয়া আমাদের মনে হইল পণ্ডিতজী বোধহয় দেশের হিন্দুদের অবস্থা এবং হিন্দু সভার কর্ম্মাবলী মোটেই পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া এই একান্ত অসমীচিন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দু সভা আদৌ আক্রমণ মূলক নহে—ইহা হিন্দুকে সুস্থ সবল ভাবে বাঁচিবার এবং নিজেদের মধ্যে একতা অবলম্বন করিবার জন্য বলিতেছে মাত্র। নির্য্যাতীত হিন্দুদের পক্ষ হইয়া তাহাদের সাহার্য্যার্থও কোথাও দাঁড়াইতেছে—এসব কি হিন্দু সভার অপরাধ—আর ইহাই কি সাম্প্রদায়িকতা !

হার হিটলার ও জার্ম্মাণীর রাষ্ট্র বিবর্ত্তন

হার হিট্‌লার দেখিতেছি ক্রমশঃই সিনিয়র মুসিলিনি-কেও অতিক্রম করিয়া চলিলেন। হিটলার মুসলিনী তত্ব আমাদিগকে গত শতাব্দীর কেভুর বিসমার্কের (Cavour Bismark) কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বিশ্ব-বিখ্যাত রাজনৈতিক বিসমার্ক, কেভুরের শিষ্য ছিলেন। বর্ত্তমান যুগের জার্ম্মাণ হিটলার ইটালিয়ান মুসলিনীর চেলা। কেভুর শতধা বিভক্ত ও দুর্ব্বল ইটালীকে, এক অখণ্ড ও পরাক্রমশালী রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। মুসলিনী মহাযুদ্ধের অব্যহিত পরেই দ্বিতীয় শ্রেণী ইটালী রাষ্ট্রকে এখন প্রথম শ্রেণীর একটী অন্যতম রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছেন। এদিকে বিসমার্ক উৎকট Prussianism প্রচার করিয়া এক প্রকাণ্ড জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য গঠন করেন। যাহার বিরাট বাহুবলের নিকট ফ্রান্স নত শির ও নত জানু হইতে বাধ্য হয়। নেপলিয়নের নিকট জর্ম্মাণির পরাজয়ের প্রতিশোধ এইরূপে দেওয়া হয়। হার হিটলারও ঠিক সেই পথ অবলম্বন করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। ফ্রান্সের হস্তে জর্ম্মাণীর পরাজয়জনিত অপমান হার হিটলার প্রতিশোধ দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। বিসমার্কের প্রধান অবলম্বন ছিল—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র মণ্ডলী। হার হিট্‌লারের প্রধান অস্ত্র—তাঁহার নাজী বাহিনী। বিসমার্ক জানিতেন ইহুদিগণ জর্ম্মাণির প্রধান শত্রু। তাহারা ব্যাঙ্কার হিসাবে জার্ম্মাণ জাতির রক্ত শোষণ করে। তাহারা অধিকাংশ স্থলেই ব্যবসা বাণিজ্য করিবার অজুহাতে জার্ম্মাণ কুলিগণকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলে। প্রয়োজন মত সৈন্য সংগ্রহ করিতে গেলে শ্রম জীবিরাই প্রধান অবলম্বন। অথচ এই শ্রমজীবিগণ সকল প্রকার সহায় সম্বল হীন হইয়া পড়ায়, তাহাদের উৎসাহ এবং কার্য্য করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছিল। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, উৎকট সাম্রাজ্যবাদী বিসমার্কই প্রথম ইউরোপে রাষ্ট্রের মধ্যে Socialism প্রবেশ করান। ইহুদিগণ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জর্ম্মাণ মনিবগণের বিরুদ্ধে জর্ম্মাণ-কুলিগণকে সাম্যের নামে উত্তেজিত করিত। বিশ্ব-বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট Karl Marx একদল জার্ম্মাণ ইহুদি।

তাঁহার বিশ্ব-বিখ্যাত গ্রন্থ Capital শ্রমজীবিদের নিকট বাইবেলে পরিণত হয়। এই সম্প্রদায়কে নৈতিক যুদ্ধে পরাস্ত করিবার জন্যই কর্ম্মী বিসমার্ক Co-operative society (যৌথ-ধন-ভাণ্ডার) old age pension বা (বৃদ্ধকালে শ্রমজীবিদের মধ্যে পেনসন বা অবকাশবৃত্তির ব্যবস্থা), Iusurance against accident or disease (দৈব দুর্ঘটনা, রোগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার বীমা), ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গুলি প্রবর্ত্তিত করেন। এই জন্যই মার্কসের বাণী জর্ম্মাণিতে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। হিটলারও বোধ হয় সেই পন্থাই অবলম্বন করিতেছেন। ইহুদিগণকে তিনি নানারূপে নির্য্যাতীত করিতেছেন, দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিতেছেন। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে প্রায় আটশত জর্ম্মাণ ইহুদী বৈজ্ঞানিক বেকার হইয়া ভীষণ অন্ন কষ্টে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা নাকি বিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক স্যর রমনের নিকট কার্য্য প্রার্থনা করিয়াছেন। হিটলার সাহেব এদিকে দেশের মধ্যে একটী মতবাদ প্রচার করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন। নাজীদলের সংবাদ-পত্রগুলি ব্যতীত সকল প্রকার সংবাদ পত্রগুলিরই কণ্ঠ তিনি রোধ করিয়াছেন। অবস্থা খুবই সঙ্কট জনক। হার হিটলার হয়ত আশা করেন তিনিও বিসমার্কের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার মতবাদ পদ-দলিত করিয়া সমস্ত জর্ম্মাণ জাতিকে তাঁদের অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে, তিনিও ফান্সকে এমন ভাবে পরাজয় করিতে পারিবেন, যাহারা বিজয় গৌরব গতযুগের সিজারের ন্যায় ইতিহাসে অমর-অক্ষরে খোদিত থাকিবে।

উপরে আমরা যাহা ব্যাখা করিলাম, বাহির হইতে দেখিতে গেলে তাহাই মনে হয় ইহা ঠিক। কিন্তু উহার মধ্যে আর একটী অন্তঃসলিলা স্রোত আছে—তাহা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নব প্রবর্ত্তিত মনোভাব। ইংরাজ জাতি চিরকালই মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের পার্লামেণ্ট মহাসভায় সাম্য এবং মৈত্রী ঘোষিত হইলেও, একথা খুবই সত্য যে তথায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাদুর্ভাবই খুব বেশী। ইউরোপের রাষ্ট্র গুলি ইংরাজ জাতির অনুকরণে পার্লামেণ্ট গঠন করিতে যাইয়া দেখিল যে তাঁহারা তাঁহাদের শ্রমিকগণকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। আমরা অবশ্য একথা বলিতেছিনা যে ইংরাজ জাতি তাহার শ্রমিকগণকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। বিশ্ব-ব্যাপী সাম্রাজ্য থাকায় ইংরাজ জাতি তাঁহাদের শিল্প-সম্ভার বিস্তার করিবার জন্য ১৯৩০ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশেষ বেগ পান নাই। কাজেই শ্রমিকগণ তাহাদের অবস্থা অনুযায়ী বৃত্তি পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে এবং সামান্য রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। ইউরোপের রাষ্ট্র সমূহ প্রজাসংখ্যায় বৃদ্ধির সহিত খাদ্যের বৃদ্ধি সংঘটিত করিতে না পারায়—ইহুদি তত্ত্বের মূল মন্ত্র কম্যুনিজম মাথা তুলিতে থাকে। কম্যুনিজম ইহুদি তত্ত্বের মূল মন্ত্র বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহুদি জাতি সমস্ত ইউরোপে আমাদের দেশের 'পরীয়া' জাতির ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইত। কাজেই তাহাদের নেতাগণ কাম্যনিজম প্রচার করিয়া রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃজন করিবার অবকাশ খুঁজিয়া বেড়াইতেন। হার হিটলারের মর্ম্ম কথাই তাহাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য রক্ষা করিতে গেলে খুব কঠোর হস্তে ইহুদি দলন প্রয়োজন, কেননা কম্যুনিজম তাহাদের অস্থি মজ্জাগত ধর্ম্ম।

টাকার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি

প্রায় মাস খানেক ধরিয়া বিবিধ সংবাদ পত্রে টাকার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি লইয়া তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। টাকার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি কি, এবং উহা কিরূপেই বা সম্ভবপর করা যাইতে পারে, সাধারণ পাঠকের মধ্যে এই জ্ঞান না থাকাই সম্ভব। এই জন্য সামান্য পরিচয়ের পর প্রকৃত তত্ত্বের আলোচনা করিব।

পাট ও তুলার ন্যায় টাকা যাহা হইতে উৎপন্ন হয় রৌপ্য একটী উৎপন্ন পদার্থ মাত্র। কাজেই পাট ও তুলার ন্যায় রৌপ্যেরও একটী স্বাভাবিক বাজার দর আছে। এই বাজার দর রৌপ্যের চাহিদার উপরই নির্ভর করে। চাহিদা যদি উৎপন্ন রৌপ্য অপেক্ষা অধিক হয়, রৌপ্যের দর বৃদ্ধি পায়, এবং সেইরূপ চাহিদা যদি রৌপ্যের মূল্য অপেক্ষা কম হয় তবে উহার মূল্যের হ্রাস ঘটিয়া থাকে। এই বাজার দর অনুসারে রূপার টাকার দর যদি বাঁধা থাকে, তবে টাকার দরও প্রত্যহ উঠা নামা করিতে

পারে। এইরূপ করিলে সমস্ত কারবারই জুয়া খেলায় পরিণত হয়, কোন কারবারই স্থায়ী ভাবে করিতে পারা যায় না। এইজন্য সরকার হইতে টাকার একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, ইহাকেই সাধারণতঃ ইংরাজীতে Legal tender বলা হয়। বর্ত্তমানে টাকার দর পাউণ্ডের সহিত ১৬ পেন্স হিসাবে বাঁধিয়া দেওয়া আছে বলিয়াই, আমাদের দেশের ব্যবসায়ীগণ জানেন যে কত টাকার মাল বিলাতে রপ্তানী করিলে কত পাউণ্ড পাইবেন। আবার সেইরূপ বিলাতী ব্যবসায়ীগণও জানেন যে কত টাকার মূল্যের দ্রব্য এখানে রপ্তানী করিলে তাঁহারা কত পাউণ্ড পাইবেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে টাকার হার নির্ণয় করিবার জন্য একটী কমিশন বসিয়াছিল। এই কমিশনে বোম্বায়ের কলওয়ালার টাকার হার যাহাতে ১৮ পেন্স হয় তাহার জন্য কমিশন সকাশে দরবার করিয়াছিলেন। বাংলার ব্যবসায়ীগণ টাকার হার ১৬ পেন্সই হওয়া উচিত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন কথা হইতেছে এই যে, বাংলা এবং বোম্বাই দুইটীই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ, তত্রাচ উহাদের অভিমত বিভিন্ন হইল কেন? বোম্বাই প্রদেশ রপ্তানি কার্য্যই বেশী করে, বাংলার আমদানী কার্য্য বেশী। টাকার মূল্য ১৮ পেন্স হইলে, যাহারা রপ্তানী কার্য্য করে তাহারা প্রত্যেক টাকায় ২ পেন্স বেশী পাইতে পারে, এই জন্যই বোম্বায়ের স্বার্থ টাকার হার ১৮ পেন্স হওয়া। বাংলা আমদানী বেশী করিয়া থাকে বলিয়া, টাকার হার ১৮ পেন্স হইলে প্রত্যেক টাকায় তাহাকে দুই পেন্স বেশী দিতে হয়, এইজন্য তাহার স্বার্থ ১৬ পেন্স হওয়া।

বর্ত্তমানে এই ১৮ পেন্স, ১৬ পেন্সের কথা উঠিয়াছে বলিয়াই কাথাটী আমারা একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করিলাম। কমিশন যুগে বোম্বায়ের স্যার পুরুষোত্তম প্রভৃতি ধুরন্দর গণ ১৮ পেন্সের জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন। বাংলার রাজা হৃষিকেশ লাহা, নলিনীরঞ্জন সরকার প্রভৃতি ১৬ পেন্সের জন্য তদ্বির করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রীযুত সরকার সমস্ত ভারতের দেশীয় বণিক সভার সভাপতি। তিনি নাকি এখন বলিতেছেন যে ভারতে মুদ্রার হার ১৮ পেন্স করিয়া দিলে, জিনিষ পত্রের হার বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাতে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হইবে বাংলা আমদানী করিলেও চাউল পাট প্রভৃতি শস্য রপ্তানী করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে চাউল এবং পাটের মূল্য এত কমিয়া গিয়াছে, অনেক সময়েই কৃষকগণ তাহাদের পারিশ্রমিকের মূল্য উহা বেচিয়া পাইতেছেনা। কাজেই এই স্থলে টাকার মূল্যের হ্রাস করিয়া দিলে এই সমস্ত দ্বারা মূল্য বৃদ্ধি পাইবে যে এবং তাহা হইলে কৃষকগণের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত, জমিদারগণের ও মধ্যবিত্তগণেরও আর্থিক স্বচ্ছলতা আসিয়া দেখা দিবে। এই যে কথাটী যাহা শুনা যাইতেছে ইহা একেবারেই নূতন নহে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি মিঃ রুজভেল্ট সেখানকার মুদ্রা ডলারের হার হ্রাস করিয়া কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু ফলে দেখা গেল তাহাতে সুফল ফলিল না। না ফলিবার কারণ আছে। মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়া দিলেই, কৃষি জাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি যেমন ঘটিবে, অন্যান্য আমদানী দ্রব্যেরও মূল বৃদ্ধি সেইরূপ ঘটিবে। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিলে এইরূপ বলা হয়—৪৲ টাকা করিয়া চাউলের মন হইলে গৃহস্থের ৪ মন চাউল খরিদ করিবার জন্য ১৬ টাকার প্রয়োজন হয়। চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া ৮৲ করিয়া দিয়া তাহাকে ৩২৲ টাকা দিলে, তাহার কি কিছু আর্থিক উন্নতি করিয়া দেওয়া হয়। ব্যাপারটা এইরূপই বটে, তবে অত সোজা নহে, কেননা আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতের উপর নির্ভর করে। টাকার মূল্য হ্রাস করিয়া দিলেই কৃষি জাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে একথা খুবই সত্য কিন্তু তাহাতে সাধারণ প্রচার বাস্তবিক আয় বৃদ্ধি হইবে কিনা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। বিষয়টী বাস্তবিক গবেষণার বস্তু। সাময়িক ভাবে গ্রহণ না করিয়া বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গবেষণা করাইলে ভাল হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পুষ্পপাত্র কার্ত্তিক মাস হইতে মাসের শেষভাগে প্রকাশিত হইতেছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরবর্ত্তী সংখ্যার নিয়মাবলী দেখুন। কার্য্যাধ্যক্ষ

পশারি ওয়ালী

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, লিঃ কলিকাতা।

সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত

৭ম বর্ষ | মাঘ, ১৩৪০ | ১০ম সংখ্যা

নারী-শিক্ষা

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

পুনরুত্থান যদি আমাদের জাতীয় কামনা হয় তবে জাতির অর্দ্ধাংশ—নারী সমাজ অজ্ঞ ও নিরক্ষর থাকিতে সেই কামনা কিরূপে পূর্ণ হইতে পারে? জননীরা যদি আত্মনির্ভরশীলা ও নিপুণা না হন তবে সন্তানেরা কিরূপে আত্মনির্ভরশীল ও নিপুণ হইয়া উঠিবে? আমাদের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীনকালে বহু বিদুষী রমণী ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকে মৃত্যুভয়েও ভীত হইতেন না। তাঁহাদের স্মৃতি আমাদের শ্লাঘার বস্তু কিন্তু তথাপি অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও নারীজাতির অবস্থা শোচনীয়। আমাদের সভ্যতা, রীতি নীতি আচার ব্যবহার সমস্তই পুরুষের স্বহস্তরচিত এবং পুরুষ জাতি সযত্নে আপনার জন্য শ্রেষ্ঠ স্থান সংরক্ষিত করিয়া নারীকে তৈজসপত্র এবং ক্রীড়নক স্থানীয় করিয়া রাখিয়াছে। সমাজ ব্যবস্থার দোষে নারী তাহার গুণগ্রাম বিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করে নাই অথচ নারী অনগ্রসর বলিয়া পুরুষ তাহার স্কন্ধেই সমস্ত দোষ আরোপ করিয়াছে।

ক্রমে কোনও কোনও পাশ্চাত্য দেশে নারী কিছু কিছু স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষের নারীর নিকট প্রগতির আহ্বান আসিলেও আজও সে পশ্চাৎপদ। বাহ্য সামাজিক দুর্নীতি দূর করিতে হইলে, উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যে সংস্কারের শৃঙ্খলে জড়িত, তাহা সবলে ভাঙ্গিতে হইবে।

আমাদের প্রত্যেকের সমক্ষেই আজ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা ভারতের জাগরণের গুরুভার অপসারণ। কিন্তু ভারতীয় নারী, সমাজের সম্মুখে আর একটী অতিরিক্ত সমস্যা আছে; তাহা—পুরুষের সৃষ্ট বন্ধন-শৃঙ্খলা মোচন। আত্মপ্রচেষ্টায় তাহাদিগকে দ্বিতীয় সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে কারণ পুরুষ যে তাহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিবে তাহা মনে হয় না।

আজিকার অনুষ্ঠানে যে সকল বালিকা ও তরুণী উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের অনেকেই পাঠ্য সমাপনপূর্ব্বক ডিগ্রী ধারণ করিবেন এবং তৎপর বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন। কোন্ আদর্শের বাণী তাঁহারা শুনিল

কর্ম্মক্ষেত্রে বহন করিয়া লইয়া যাইবেন? কোন অন্তর্নিগূঢ় ইঙ্গিতে তাঁহাদের জীবন ও কর্ম্মশক্তি নিয়ন্ত্রিত হইবে? আমার আশঙ্কা হয়, অনেকেই জীবনের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যে বিব্রত হইয়া পড়িবেন—মহত্তর আদর্শ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইবেন। আবার অনেকে জীবিকার্জ্জন ব্যতীত অন্য কোনও চিন্তা মনে স্থান দিবেন না। কিন্তু মহিলা বিদ্যাপীঠ যদি ছাত্রীদিগকে মাত্র এই শিক্ষাই দেন, তাহা হইলে বিদ্যাপীঠের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। কোনও বিশ্ববিদ্যালয় যদি তাহার অস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণ করিতে চাহে, তবে ছাত্রেরা যাহাতে প্রাচীন কালের নাইটদের ন্যায় সত্য ও মুক্তির জন্য অন্যায় ও পীড়নের বিরুদ্ধে নির্ভীক ভাবে সংগ্রাম করিতে পারে সেইরূপ শিক্ষাই ছাত্রদিগকে দিতে হইবে। আমি আশা করি, আপনাদের মধ্যে এমন অনেক আছেন যাঁহারা কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন অস্বাস্থ্যকর সমতল ভূমিতে অনায়াসসাধ্য জীবন যাপনে প্রলুব্ধ না হইয়া সমস্ত বিপদ আপদ উপেক্ষা করিয়া দুর্গম তুঙ্গ গিরি পথে আরোহণ করিবেন।

দুঃখের বিষয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ ছাত্রদিগকে দুর্গম পার্ব্বত্য পথে আরোহণ করিতে উৎসাহ দেয় না। নির্ব্বিঘ্ন সমতল ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকিতেই প্ররোচনা দেয়, আমাদের শাসক জাতির তরুণদের মত ছাত্রদিগকে নির্ভীক স্বাধীন চিন্তা শিক্ষা দেয় না এবং উপরওয়ালারা শৃঙ্খলা ও শাসন অবনতশিরে মানিয়া লইতে শিক্ষা দেয়। সুতরাং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ যে নৈরাশ্যকর জড় পঙ্গু এবং সংগ্রামশীল জগতের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

"অনেকেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তীব্র সমালোচনা করিতেছেন এবং তাঁহাদের সমালোচনা অযৌক্তিক নহে কিন্তু সমালোচকগণও ধরিয়া লইয়াছেন সমাজের উচ্চ শ্রেণীর যুবকগণের শিক্ষার ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয় নিম্নশ্রেণীর সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও সংশ্রব নাই। যদি জাতীয় শিক্ষা বিস্তার করিতে হয় তবে সমাজের নিম্নতমস্তর পর্য্যন্ত শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। অবশ্যই বর্ত্তমানে তাহা সম্ভব নহে, কিন্তু বিদ্যাপীঠ হইতে বাহির হইয়া আপনাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষাদানকার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাহারা এই কথা স্মরণ রাখিবেন এবং শিক্ষানীতির পরিবর্ত্তন সাধনের প্রয়াস পাইবেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন, পুরুষের শিক্ষা অপেক্ষা নারী শিক্ষার ধারা স্বতন্ত্র হওয়া কর্ত্তব্য—আমার মনে হয়, এই বিদ্যাপিঠের নীতিও তাহাই। সাংসারিক কর্ত্তব্য—এবং বিবাহরূপ বৃত্তির উপযোগী শিক্ষা লাভই নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষাকে এইরূপ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ করিতে আমি অক্ষম। আমার বিশ্বাস নারী যাহাতে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারে, এইরূপ ব্যাপক শিক্ষা পুরুষের ন্যায় তাহার পক্ষেও আবশ্যক। রাজনৈতিক অবস্থা অপেক্ষা অর্থনৈতিক অবস্থার উপরই স্বাধীনতা অধিকতর নির্ভরশীল। নারী যদি আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই স্বামী অথবা অপর কোনও পুরুষ আত্মীয়ের অধীন হইয়া থাকিবে। নর-নারীর সাহচর্য্য সমানাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য—এতদ্ব্যতীত যে সাহচর্য্য তাহা একের উপর অন্যের প্রভুত্ব মাত্র!

বিদ্যাপীঠ হইতে বাহির হইয়া আপনারা কি করিবেন যুগযুগান্তের রীতি-নীতি ও সামাজিক ব্যবস্থা অপকৃষ্ট হইলেও কি আপনারা তাহা মানিয়া লইবেন? আপনারা কি কল্যাণ কামনা করিয়াই আপনাদের কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিবেন? আত্ম-প্রচেষ্টায় কল্যাণ সাধনে অগ্রসর হইবেন না? আপনাদের বন্ধন শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টা করিয়া কি আপনারা আপনাদের শিক্ষার সার্থকতা প্রমাণ করবেন না? বর্ব্বর যুগের স্মৃতি স্বরূপ যে পর্দ্দাপ্রথা আমাদের কোটি কোটি ভগিনীর দেহ মন অন্তঃপুরের কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই পর্দ্দা বিদীর্ণ করিয়া কি আপনারা ধরণীর মুক্ত বক্ষে বাহির হইবেন না? যে অস্পৃশ্যতার সুযোগে সমাজের এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে শোষণ করিতেছে, আপনারা কি সেই গুরুতর বৈষম্যমূলক প্রথা ধ্বংস করিয়া দেশে সাম্য আনয়ন করিবেন না? আমাদের বিবাহ প্রথা—এবং অন্যান্য যে সকল কালজীর্ণ প্রথা

আমাদের প্রগতির পথরোধ করিয়া রহিয়াছে, এবং নারী জাতিকে নিপেষিত করিতেছে, আপনারা কি ঐসকল প্রথা সমূলে নির্ম্মূল করিয়া আধুনিক কালের উপযোগী রীতিনীতি প্রণয়ন করিবেন না?

আমি আপনাদিগকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু গত চারি বৎসর যে সহস্র সহস্র তরুণী ও মহিলা জাতির মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। যে ভারতীয় নারী কদাপি অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহিরে আসেন নাই তাঁহাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে স্বামী ও ভ্রাতার পার্শ্বে দাঁড়াইতে দেখিয়া কাহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে নাই? বহু তথাকথিত পুরুষকেও তাহারা লজ্জা দিয়াছেন এবং জগত সমক্ষে প্রমাণ দিয়াছেন যে, ভারতনারী সহস্র সহস্র বৎসরের মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়াছেন। আর তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত রাখা চলিবে না।

(প্রয়াগ বিদ্যাপীঠে প্রদত্ত অভিভাষণ)

কুবের ও কন্দর্প

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নিউ ইয়র্কের বুড়া আণ্টনী রক্‌ওয়াল্‌ 'ইউরেকা' সাবান তৈয়ার করিয়া ক্রোড়পতি হইয়াছিলেন। উপস্থিত বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ফিফ্‌থ অ্যাভিন্যুয়ে প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেছেন।

তাঁহার দক্ষিণ দিকের প্রতিবেশী, বনেদী বড় মানুষ জি ভ্যান্‌ স্কাইলাইট সাফক্‌-জোন্স,—মোটর হইতে অবতরণ করিয়া 'সাবান সম্রাটের' প্রাচীন ইতালীয় প্রথায় তৈয়ারী জবড়-জং গৃহতোরণের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া নাক সিঁট্‌কাইয়া ঘৃণাভরে নিজের গৃহে প্রবেশ করিল। বুড়া রক্‌ওয়াল্‌ নিজের লাইব্রেরী ঘরের জানালা হইতে তাহা দেখিয়া দাঁত খিঁচাইয়া হাসিলেন।

'অপদার্থ অহঙ্কেরে বুড়ো বেকুফ্‌ কোথাকার! আস্‌ছে বছর আমার বাড়ী আমি লাল-নীল-সবুজ রঙ করাবো, দেখি বুড়ো নচ্ছারের ভোঁতা নাক আরো সিঁকেয় ওঠে কিনা।'

ঘণ্টা বাজাইয়া চাকর ডাকা আণ্টনী রক্‌ওয়াল্‌ পছন্দ করিতেন না। তিনি ষাঁড়ের মত গর্জ্জন করিয়া ডাকিলেন,—'মাইক্‌!'

চাকর আসিলে তাহাকে বলিলেন,—'আমার ছেলেকে বল, বেরুবার আগে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।'

ছেলে আসিলে বৃদ্ধ খবরের কাগজ খানা নামাইয়া রাখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। নিজের মাথার চুলগুলো একহাতে এলোমেলো করিতে করিতে এবং অন্য হাতে পকেটের চাবির গুচ্ছ নাড়িতে নাড়িতে হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন,—'রিচার্ড, কত দাম দিয়ে তুমি তোমার ব্যবহারের সাবান কেনো?'

রিচার্ড মাত্র ছয়মাস কলেজের পড়া শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে সে একটু ঘাবড়াইয়া গেল। ঘোর আকস্মিকতাপূর্ণ বিচিত্র স্বভাব এই বাবাটিকে সে এখনো ভাল করিয়া চিনিয়া লইতে পারে নাই। বলিল;—'ছ' ডলার করে ডজন বোধ হয়।'

'আর তোমার কাপড় চোপড়?'

'আন্দাজ ষাট ডলার।'

অ্যাণ্টনী নিঃসংশয় হইয়া বলিলেন; 'তুমি সত্যিকার ভদ্রলোক হয়েছ। আমি শুনেছি আজকাল ছোকরারা চব্বিশ ডলার করে সাবান কেনে, একটা পোষাকের জন্যে

এক্‌শ' ডলারের ওপর খরচ করে। নবাবী করে ওড়াবার মত পয়সা তাদের চেয়ে তোমার কিছু কম নেই কিন্তু তুমি ভদ্রতা ও মিতাচারের নিয়ম মেনে চলে থাকো—এথেকে বোঝা যাচ্ছে তুমি ভদ্রলোক হয়েছ। আমি অবশ্য 'ইউরেকা' মাখি; নিজের তৈরী বলে নয়—অমন সাবান পৃথিবীতে আর নেই। মোটকথা, দশ সেণ্টের বেশী একখানা সাবানের পিছনে যে খরচ করে সে রঙকরা কাগজের বাক্স আর এসেন্সের দুর্গন্ধ কেনে।—যাক্, তুমি ভদ্রলোক। লোকে বলে তিনপুরুষের কমে ভদ্রলোক হয় না। বিলকুল মিথ্যে কথা, টাকা থাকলে একপুরুষে ভদ্রলোক হওয়া যায়—যথা তুমি। এক এক সময় সন্দেহ হয় আমিও বা ভদ্রলোক হয়ে উঠেছি। কারণ আমার পাশের প্রতিবেশীদের মত—যাঁরা, আমি তাঁদের মাঝখানে বাড়ী কিনেছি বলে, রাত্তিরে ঘুমতে পারেন না—আমারও মাঝে মাঝে বদ্‌মেজাজ দেখিয়ে অভদ্রভাবে মুখ খারাপ করতে ইচ্ছে করে।'

রিচার্ড উদাসভাবে বলিল, 'পৃথিবীতে টাকার অসাধ্য কাজ ও অনেক আছে বাবা।'

বৃদ্ধ রকওয়াল মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন :—'না না ও কথা বলো না। যদি বাজী রাখতে বল, আমি প্রত্যেক-বার টাকার ওপর বাজী রাখতে রাজী আছি। বিশ্ব-কোষের শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত পড়ে দেখেছি, এমন জিনিস একটাও নেই যা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। আসছে হপ্তায় পরিশিষ্টটুকু পড়ে দেখতে হবে তাতে কিছু পাওয়া যায় কিনা।—আসল কথা, টাকার মত নিরেট খাঁটি জিনিস আর কিছু নেই। দেখাও আমাকে এমন একটা কিছু যা টাকায় কেনা যায় না।'

রিচার্ড বলিল; 'এই ধর, টাকার সাহায্যে বিশিষ্ট ভদ্র সমাজে ঢোকা যায় না।

'অর্থমনর্থম' এর পৃষ্ঠপোষক সগর্জ্জনে কহিলেন, 'যায়না? কোথায় থাকতো তোমার বিশিষ্ট ভদ্রসমাজ যদি তাদের প্রথম পূর্ব্ব-পুরুষদের জাহাজে চড়ে আমেরি-কায় আসবার টাকা না থাকতো?'

রিচার্ড নিশ্বাস ফেলিল।

বৃদ্ধ রকওয়াল গলার আওয়াজ কিঞ্চিত প্রশমিত করিয়া কহিলেন;—'এই কথাই আলোচনা করতে চাই, সেই জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি। দু'হপ্তা থেকে লক্ষ্য করছি তোমার মনের মধ্যে কিছু একটা গোলমাল চলছে। ব্যাপারখানা কি খুলে বল। দরকার হলে স্থাবর সম্পত্তি ছাড়া নগদ টাকা যা আমার আছে তা থেকে এক কোটি দশ লক্ষ ডলার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বার করতে পারি। কিম্বা যদি তোমার লিভারের দোষ হয়ে থাকে আমার কূর্ত্তি জাহাজ ঘাটে তৈরী আছে, দু'দিন বাহামার দিকে বেড়িয়ে এসো গে'।

রিচার্ড বলিল, 'লিভার নয় বাবা, তবে কাছাকাছি আন্দাজ করেছ।'

তীক্ষ্ণচক্ষে চাহিয়া অ্যাণ্টনী রকওয়াল বলিলেন, 'হুঁ। নাম কি মেয়েটির?'

রিচার্ড ঘরময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগল। তাহার অপরিমার্জ্জিত বাবাটি আস্তে আস্তে তাহার প্রাণের সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইলেন। শেষে বলিলেন; 'কিন্তু তুমি প্রস্তাব করছ না কেন? তোমাকে বিয়ে করবার নামে যে কোনো মেয়ে লাফিয়ে উঠবে। তোমার টাকা আছে, চেহারা আছে, চরিত্রও ভাল। মেহনত করে তোমার হাতে কড়া পড়েনি, অন্ততঃ 'ইউরেকা' সাবানের দাগ তাতে নেই। দোষের মধ্যে কলেজে পড়েছ—তা সেটা নাহয় সে মাফ্ করে নেবে।'

ছেলে বলিল, 'আমি যে একটাও সুযোগ পেলাম না।'

বাবা বলিলেন, 'সুযোগ তৈরী করে নাও। তাকে নিয়ে পার্কে বেড়িয়ে এসো, নাহয় মোটরে চড়ে ঘুরে এসো। চার্চ্চ থেকে ফেরবার পথে তার সঙ্গ নাও। সুযোগ—হুঃ!'

'সমাজের সব ব্যাপার তুমি জানমা বাবা। তার প্রত্যেক মিনিটের কাজটি আগে থাকতে ঠিক হয়ে আছে। এক চুল নড়চড় হবার যো নেই। তাকে আমার চাইই চাই না পেলে সমস্ত নিউইয়র্ক সহরটা আলকাতরার মত কালো হয়ে যাবে। কিন্ত কিছুতেই নাগাল পাচ্ছি না। কি যে করি। চিঠি লিখে ত আর প্রস্তাব করতে পারিনা সে যে বড় বিশ্রী হবে।'

অ্যাণ্টনী কহিলেন; 'তুমি বলতে চাও এত টাকা

থাকা সত্ত্বেও এই মেয়েটিকে তুমি এক ঘণ্টার জন্য নিরিবিলি পেতে পারনা ?'

'আমি ইতস্তত: করে দেরী করে ফেলেছি। পরশু দুপুরবেলা সে দু'বছরের জন্যে য়ুরোপ বেড়াতে চলে যাবে। কাল সন্ধ্যে বেলা মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য তার সঙ্গে একলা দেখা হবে। সে এখন লার্চ্চমণ্টে তার মাসীর কাছে আছে, সেখানে ত আর যেতে পারিনা। কিন্তু ইষ্টিশানে রাত্রি সাড়ে আটটার সময় গাড়ী নিয়ে থাক্‌বার হুকুম জোগাড় করেছি। ইষ্টিশান থেকে তাকে গাড়ীতে করে ব্রড্‌ওয়েতে 'ওয়ালক' থিয়েটারে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে তার মা এবং আরও অনেকে থাকবেন। মধ্যে এই ছ'সাত মিনিট সময় আমি তাকে গাড়ীর মধ্যে একলা পাব। ঐটুকু সময়ের মধ্যে কি বিয়ের প্রস্তাব করা যায়? তা হয় না। আর পরেই বা কখন সুযোগ পাব? না বাবা, টাকা দিয়ে এ জট ছাড়ানো যাবেনা। নগদ মূল্য দিয়েও একমিনিট সময় কেনা যায়না, তা যদি যেত তাহলে বড় মানুষেরা বেশী দিন বাঁচত। মিস ল্যান্‌ট্রী জাহাজে চড়বার আগে তাঁর সঙ্গে আড়ালে কথা কইবার কোনও আশাই নেই।'

অ্যাণ্টনী কিছু মাত্র দমিলেন না, প্রফুল্লস্বরে কহিলেন; 'আচ্ছা তুমি ভেবোনা ডিক্‌, এখন তোমার ক্লাবে যাও। তোমার যে লিভার খারাপ হয়নি এটা সুসংবাদ। আর দেখ, মাঝে মাঝে 'অর্থ-পীরের' দরগায় একটু অধটু ধূপ ধুনো জালিও। টাকা দিয়ে সময় কেনা যায় না?—হাঁ— মুদির দোকানে কাগজের মোড়কে বাঁধা অনন্ত কাল বিক্রী হয়না বটে। কিন্তু তোমার 'কাল' মহাশয়কে আমি সোনার খনির ভিতর দিয়ে যেতে যেতে অনেক বার ন্যাংচাতে দেখেছি।'

সেই রাত্রে রিচার্ডের পিসি এলেন ভ্রাতার ঘরে প্রবেশ করিলেন। শান্ত শীর্ণ ভাল মানুষ, টাকার ভারে অবনত এলেন্‌ পিসী নব প্রণয়ীদের দুঃখ দুরাশার কাহিনী আরম্ভ করিলেন।

প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া অ্যাণ্টনী বলিলেন,--'ডিক আমাকে বলেছে। আমি [illegible] ব্যাংকে আমার যত টাকা আছে সব দাও। তবে সে টাকার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করলে।

টাকায় কিছু হবেনা,—দশটা কোটিপতির সাধ্য নেই সামাজিক বিধি বাঁধন একচুল নড়ায়।'

পুনরায় নিশ্বাস ফেলিয়া এলেন বলিলেন:—'দোহাই অ্যাণ্টনী তুমি রাতদিন টাকার কথা ভেবোনা। অকপট ভালবাসার কাছে ঐশ্বর্য্য কিছুই নয়। প্রেম সর্ব্বশক্তিমান। —আর দু'দিন আগে যদি ডিক মেয়েটির কাছে প্রস্তাব করত সে কিছুতেই না বল্‌তে পারত না। কিন্তু আর বুঝি সময় নেই। তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমার ছেলেকে সুখী করতে পারবে না।'

পরদিন সন্ধ্যা আটটার সময় এলেন পিসী একটি কীটদষ্ট কৌটা হইতে একটি পুরাণো সেকেলে গড়নের সোনার আংটি বাহির করিয়া রিচার্ডকে দিলেন, 'বাছা' আজ রাত্রে এটি আঙ্গুলে পরো। তোমার মা এটি আমাকে দিয়েছিলেন আর বলে দিয়েছিলেন যখন তুমি কোনও মেয়েকে ভাল বাসবে তখন তোমাকে এটি দিতে। এ আংটি ভালবাসায় সুখ দেয়, সৌভাগ্য আনে।'

রিচার্ড ভক্তিভরে আংটি হাতে লইয়া নিজের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে পরিবার চেষ্টা করিল। আংটি আঙ্গুলের অর্দ্ধেক দূর পর্য্যন্ত গিয়া আর উঠিলনা। সে তখন আংটি খুলিয়া লইয়া সাবধানে নিজের ওয়েষ্ট কোটের পকেটে রাখিয়া দিল। তারপর গাড়ীর জন্য ফোন করিল।

ষ্টেশনে আট্‌টা বত্রিশ মিনিটে সে মিস্‌ ল্যান্‌ট্রীকে ভিড়ের মধ্যে হইতে বাহির করিল।

মিস্‌ ল্যান্‌ট্রী বলিলেন; 'আর দেরী নয়, মা অপেক্ষা করছেন।'

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রিচার্ড নিশ্বাস ফেলিয়া গাড়ীর চালককে বলিল;—'ওয়ালক থিয়েটার যত শীঘ্র যেতে পারো।'

গাড়ী ব্রড্‌ওয়ের দিকে ছুটিয়া চলিল।

চৌত্রিশ রাস্তায় পৌছিয়া রিচার্ড হঠাৎ গলা বাড়াইয়া গাড়ী থামাইতে বলিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া ক্ষমা চাহিয়া রিচার্ড বলিল; 'একটা আংটি পড়ে গেছে। আমার মা'র আংটি, হারিয়ে গেলে বড় অন্যায় হবে। কোথায় পড়েছে আমি দেখেছি। এখনি খুঁজে আনছি এক মিনিটও দেরী হবে না।'

এক মিনিটের মধ্যেই রিচার্ড আংটি খুঁজিয়া লইয়া গাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু এই এক মিনিটের মধ্যে একখানা 'বাস' তাহার গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কোচম্যান বাঁ দিক দিয়া গাড়ী বাহির করিয়া লইতে গেল কিন্তু একটা ভারি মাল-বোঝাই 'ট্রাক্' তাহার পথের মাঝখানে আগড় হইয়া আটকাইয়া রহিল। সে গাড়ীর মুখ ফিরাইয়া ডান দিক দিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল কিন্তু সে দিকে কোথা হইতে একটা আসবাব ভরা প্রকাণ্ড 'লরী' আসিয়া পথরোধ করিয়া দিল। পিছু হটিতে গিয়া কোচম্যান হাতের রাশ ফেলিয়া দিয়া গালাগালি সুরু করিল। চারিদিক হইতে অসংখ্য গাড়িঘোড়া আসিয়া তাহাকে রীতি মত অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

বড় বড় সহরের রাজপথে মাঝে মাঝে গাড়ী-ঘোড়া এই রকম তাল পাকাইয়া গিয়া যান-বাহনের চলাচল একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়।

মিস্ ল্যান্ট্রী অধীর হইয়া বলিলেন;--'গাড়ী চলছে না কেন? দেরী হয়ে যাবে যে।'

গাড়ীর মধ্যে উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া রিচার্ড দেখিল ব্রড্ওয়ে সিক্সথ্ আভিনিউ এবং চৌত্রিশ রাস্তার চৌমাথাটা সংখ্যাতীত গাড়ী 'বাস' লরী ও আরও অন্যান্য নানা প্রকার গাড়ীতে একেবারে ঠাসিয়া গিয়াছে। এবং আরও অগণ্য গাড়ী চারিদিকের রাস্তা গলি প্রভৃতি হইতে জনস্রোতের মত বাহির হইয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িতেছে। গাড়ীর চাকায় চাকায় আটকাইয়া ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ির মধ্যে গাড়োয়ানদের চেঁচামেচি ও গালাগালিতে যেন এক ভীষণ কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। নিউইয়র্কের সমস্ত চক্রযান যেন একযোগে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া সাড়ে বত্রিশ ভাজার মত মিশিয়া গিয়াছে। ফুটপাথে দাঁড়াইয়া হাজার হাজার লোক এই দৃশ্য দেখিতেছে—এত বড় ষ্ট্রীট ব্লকেড্ তাহারা আর কখনো দেখে নাই।

রিচার্ড ফিরিয়া বসিয়া বলিল; 'ভারী অন্যায় হল। ঘণ্টা খানেকের আগে এ জট ছাড়ানো যাবে বলে মনে হয়না। আমারি দোষ আংটিটা যদি পড়ে না যেতো—'

মিস ল্যান্ট্রী বলিলেন;—'দেখি কেমন আংটি। বেরুবার যখন উপায় নেই তখন এই ভাল। আর সত্যি বলতে কি, থিয়েটার দেখাটা নিছক বোকামি।'

সেদিন রাত্রি এগারটার সময় অ্যান্টনী রকওয়াল লাল রঙের ড্রেসিং গাউন পরিয়া এক বোম্বেটে সংক্রান্ত ভীষণ লোমহর্ষণ উপন্যাস পড়িতে ছিলেন, এমন সময় কে তাঁহার দরজায় টোকা মারিল।

'রকওয়াল হুঙ্কার ছাড়িলেন—ভেতরে এস।'

এলেন পিসী ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা প্রাচীনা স্বর্গলোক বাসিনীকে ভুল করিয়া কে পৃথিবীতে ফেলিয়া গিয়াছে।

মৃদুকণ্ঠে এলেন কহিলেন, 'অ্যান্টনী' ওরা বাগদত্ত হয়েছে; মেয়েটি আমাদের রিচার্ডকে বিয়ে করতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। থিয়েটারে যেতে যেতে পথে ষ্ট্রীট ব্লকেড্ হয়েছিল তাই দুঘণ্টার আগে ছাড়া পায়নি।

'অ্যান্টনী ভাই আর কখনো টাকার গর্ব্ব করোনা। অকপট প্রেমের একটি চিহ্ন ওর মা'র দেওয়া একটি আংটির জন্যে আমাদের রিচার্ড আজ ভালবাসায় জয়লাভ করলে। আংটিটি পড়ে গিয়েছিল তাই কুড়িয়ে নেবার জন্যে রিচার্ড গাড়ি থেকে নামে। সে ফিরে আসতে না আসতে পথঘাট সব বন্ধ হয়ে যায়। তখন নিজের ভালবাসার কথা মেয়েটিকে বলে রিচার্ড তাকে লাভ করেছে। অ্যান্টনী দেখছ প্রেমের কাছে ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ হয়ে যায়।'

অ্যান্টনী বলিলেন;—বেশ কথা। ছোঁড়া যা চাইছিল তা যে পেয়েছে এটা খুব সুখের বিষয়। আমি তখনি বলেছিলাম যত টাকা লাগে আমি দেব—'

'কিন্তু অ্যান্টনী ভাই, তোমার টাকা এখানে কি করতে পারত?'

অ্যান্টনী রকওয়াল বলিলেন; 'ভগিনী, আমার বোম্বেটে উপস্থিত বড়ই বিপদে পড়েছে। তার জাহাজ ডুবতে আরম্ভ করেছে কিন্তু সে বড় কড়া পিত্তির বোম্বেটে, সহজে অত টাকার মাল লোকসান হতে দেবেনা। তুমি এবার আমাকে এই পরিচ্ছেদটা শেষ করতে দাও।'

গল্প এইখানেই শেষ হওয়া উচিত। পাঠকের মত আমারও তাহাই ইচ্ছা। কিন্তু সত্যের সন্ধানে কূপের

তলদেশ পর্য্যন্ত আমাদের নামিতেই হইবে—উপায় নাই।

পরদিন কেলী নামক একটি লোক রক্তবর্ণ এক জোড়া হাত এবং নীলবর্ণ কন্ধ কাটা নেকটাইয়ের বাহার দিয়া অ্যাণ্টনী রকওয়ালের বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার লাইব্রেরীতে ডাক পড়িল।

অ্যাণ্টনী হাত বাড়াইয়া চেকবই খানা লইয়া বলিলেন 'বহুত আচ্ছা—খাসা কাজ হয়েছে। তোমাকে কত দিয়েছি—হাঁ—পাঁচহাজার ডলার।'

কেলী বলিল, 'আরও তিনশ ডলার আমি নিজের পকেট থেকে দিয়েছি। খরচা হিসেবের চেয়ে কিছু বেশী পড়ে গেছে। প্রায় সব বগী গাড়ীওয়ালা আর মাল গাড়ী গুলোকে পাঁচ ডলার করে দিতে হল। ট্রাক আর জুড়ী গাড়ীগুলো দশ ডলারের কমে ছাড়লে না। মোটরগুলো দশ ডলার করে নিলে আর মাল বোঝাই জুড়ী ঘোড়ার ট্রাকগুলো কুড়ি ডলার করে আদায় করলে। সব চেয়ে ঘা দিয়েছে পুলিশে, পঞ্চাশ ডলার করে দুজনকে দিতে হল আর দুজনকে পঁচিশ আর কুড়ি। কিন্তু কি চমৎকার হয়েছিল বলুন দেখি। ভাগ্যে উইলিয়াম এ ব্রাডী সেখানে হাজির ছিলনা, নৈলে হিংসেতেই বুক ফেটে বেচারা মারা যেত। তবু একবারও মহলা দেয়া হয়নি। বলব কি, দুঘণ্টার মধ্যে একটা পিঁপড়ে সেখান থেকে বেরুতে পারেনি।'

চেক কাটিয়া আণ্টনী বলিলেন;—'তেরশ'—এই নাও কেলী। তোমার হাজার আর তিনশ যা তুমি খরচ করেছ। কেলী, তুমি টাকাকে ঘেন্না করনা ত?'

কেলী বলিল—'আমি? যে লোক দারিদ্র্যের আবিষ্কার করেছে আমি তাকে জুতো পেটা করতে পারি।'

কেলী দরজা পর্য্যন্ত যাইলে রকওয়াল তাহাকে ডাকিলেন, 'আচ্ছা কেলী সে সময় একটা নাদুসনুদুস গোছের ন্যাংটো ছেলেকে ধনুক নিয়ে তীর ছুঁড়তে দেখেছিলে কি?'

কেলী মাথা চুলকাইয়া বলিল 'কৈ না উহুঁ। ন্যাংটো? তবে বোধহয় আমি পৌঁছবার আগেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছিল।'

হাস্য করিয়া আণ্টনী বলিলেন; 'আমি জানতাম সে ছোঁড়া সে দিকে ঘেঁষবে না। আচ্ছা—গুড্ বাই কেলী' *

'Henry' মার্কিন হইতে।
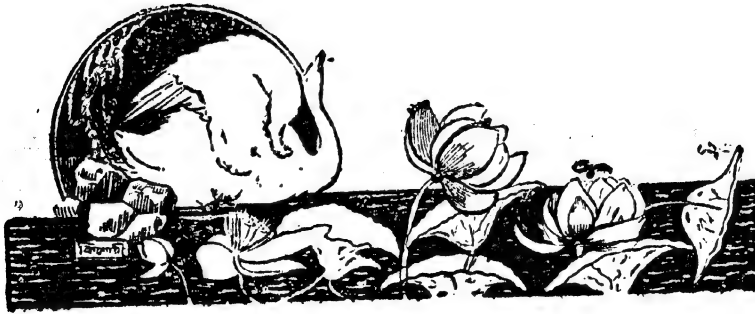
লিমুরিয়া কি প্রাচীন লঙ্কা

শ্রীদেবরাণী ঘোষ

কিছুদিন হইল ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী মহাসাগরের বুক চিরিয়া কয়েকজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এক লুপ্ত মহাদেশের আবিষ্কারে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস মহাসমুদ্রের অতল তলে আজও এক মহাদেশের অস্থি চর্ম্মের শেষ গ্রন্থি লুক্কায়িত আছে, এবং এই ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েকজন ভূতত্ত্ববিদ এবং সমুদ্রতত্ত্ববিদেরা সাগর নিমজ্জিত এই ভূখণ্ডে পরীক্ষা চালাইতেছেন। এই পরীক্ষার ফলে সমুদ্র-তল হইতে প্রস্তর, জলজ বৃক্ষাদি প্রভৃতি এমন অনেককিছু পাইতেছেন যাহার ফলে তাঁহারা নির্ভয়ে বলিতে পারেন যে এতদ্দেশে এককালে এক বিশাল ভূখণ্ড ছিল যাহা কালক্রমে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। এই বিশাল ভূখণ্ডের নাম তাঁহারা দিয়াছেন লিমুরিয়া। এই লিমুরিয়া মহাদেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিন হইল গবেষণা চালাইতেছেন। তাঁহাদের ইহার সম্বন্ধে প্রথম চিন্তা করিবার ইহাই কারণ ছিল যে—আফ্রিকা-মহাদেশ এবং ভারতবর্ষের জীবশ্রেণীর মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য আছে। সকলেই জানেন সিংহ, ব্যাঘ্র, কয়েক জাতীয় বাঁদর, গণ্ডার, হস্তী প্রভৃতি কয়েকটি পশু ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকাতে বর্ত্তমান আছে এবং ইহারা পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানেই নাই। যদিও ভারতবর্ষীয় এবং আফ্রিকার এই শ্রেণীর জীবগুলির আকৃতি এবং প্রকৃতি অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বৈজ্ঞানিকের ধারণা যে ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকার স্থলভূমি এককালে এক ভূখণ্ড দ্বারা যুক্ত ছিল—এবং সেই ভূখণ্ড হইতেছে বর্ত্তমানে সাগর নিমজ্জিত লিমুরিয়া। এই ভূখণ্ডের প্রায় সমস্ত স্থানই সাগর নিমজ্জিত হইয়াছে কেবল হয় নাই তাহার উচ্চ ভূখণ্ড গুলি। এইগুলি বর্ত্তমানে সমুদ্রের বুকে আপনার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া সেই মহা অতীতের সাক্ষ্য দান করিতেছে। এই লিমুরিয়া ভূভাগ সাহায্যে সমপর্য্যায়ভুক্ত জীবগুলি আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষ অবধি সমস্ত স্থানে বিচরণ করিত। সমুদ্র মধ্যস্থিত এই দ্বীপসমূহে লিমুর নামক এক প্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি বাঁদর জাতীয় স্তন্যপায়ী শ্রেণীভুক্ত জীব দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে কীটভুক্ এবং বাঁদর এই দুই শ্রেণী প্রাণীর পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। ইহারা নিশাচর এবং অরণ্যবাসী। ম্যাডাগাস্কার এবং তাহার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী দ্বীপে ইহারা বাস করে। বৈজ্ঞানিকেরা স্তন্যপায়ী মুখ্য (Primates) জীবশ্রেণীর প্রায় অধঃস্তন পর্য্যায়ে ইহাদিগকে স্থান দিয়াছেন। যে কারণেই হউক লিমুরিয়া যখন সমুদ্র নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল তখন এই লিমুর জাতীয় জীব সমূহ উচ্চস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এখন অবধি আপনাদের প্রাচীনত্ব জ্ঞাপন করাইতেছে। এই কারণ লিমুর বেবুন প্রভৃতি বাঁদর পর্য্যায় জীবদেহ ভূগর্ভে শিলাময় (fossil) অবস্থাতে বিশেষ পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে লিমুর এবং তজ্জাতীয় অপরাপর কয়েকটি জীব প্রায় ৪কোটী বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে বাসভূমি স্থাপন করিয়াছিল—যদিও তৎকালীন লিমুরের বুদ্ধি এবং মেধা অতি অল্প ছিল। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন লিমুর প্রাচীন বাসস্থান এই সমুদ্র গর্ভস্থিত ভূখণ্ড ছিল; এবং তজ্জন্যই ইহার নাম তাঁহারা দিয়াছেন লিমুরিয়া। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি লিমুর আমাদের এই অতিবৃদ্ধা বসুন্ধরার এক অতি বৃদ্ধা সন্তান এবং যে এককালে বিশাল মহাদেশের সর্ব্বস্থানে বিচরণ করিত, আজ সে আপনার বিশাল বাসস্থানের পরিবর্ত্তে কয়েকটী ক্ষুদ্র দ্বীপে দিন যাপন করিয়া যাইতেছে।

লিমুরের সাহায্যে লিমুরিয়ার প্রাচীনত্ব বোধগম্য হয় কিন্তু আমরা জানিনা সৃষ্টির কোন অবস্থাতে লিমুরিয়া মহাদেশের উদ্ভব হয়, এবং কবেই বা তাহা পর্ব্বত এবং বৃক্ষাদি মণ্ডিত হইয়া উঠে, আর কবে এবং কিরূপেই বা সেই বিশাল ভূভাগ জল-সমাধি লাভ করিল। লিমুরের জন্ম সময় যদি চারি কোটী বৎসর পূর্ব্বে হয় তবে লিমুরিয়াতে সে কতকাল বাস করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল তাহাও আমাদের জানা নাই।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত রোডেসিয়াতে মানবের পূর্ব্ব পুরুষের যে কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে

তাহাতে বুঝা যায় যে, যে সময়ে উত্তর এবং মধ্য এশিয়া এবং ইউরোপ চির বরফাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং যে সময়ে এই সমুদায় স্থানে মনুষ্যাকৃতি একশ্রেণীর মূক-জীব বাস করিত, সেই সময়ে পৃথিবীর উষ্ণ দক্ষিণ প্রদেশে মনুষ্যের আদিপুরুষ বাস করিত। রোডেসিয়ার কঙ্কাল সমষ্টি দেখিয়া বোধ হয় মনুষ্য জাতির আদি বাসস্থান এই দক্ষিণ এবং মধ্য আফ্রিকা এবং তৎসংলগ্ন সমস্ত ভূভাগ। সুতরাং লিমুরিয়াকেও আমরা মনুষ্যের আদি বাসস্থান গণ্য করিতে পারি। অপর কয়েক জন বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন যে মধ্য এশিয়ার গোবী-মরুভূমি এবং মঙ্গোলিয়াই এককালে মানুষের আদি বাসস্থান ছিল। ইহার বিষয়ে তাঁহারা বহু প্রামাণ্য বস্তু এই সকল স্থান হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে সংগ্রহ করিয়াছেন। যাহা হউক মনুষ্য জাতির আদি বাসস্থান এই উভয় স্থানই হইতে পারে—এবং মানবের প্রথম সভ্যতা এই উভয় স্থানেই স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হইতে পারে।

পঞ্চদশ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বকার এশিয়া এবং ইউরোপের যে চিত্র বৈজ্ঞানিকেরা অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে তৎকালে বর্ত্তমান দাক্ষিণাত্য প্রদেশ সিংহল দ্বীপের সহিত যুক্ত ছিল এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বে জলরাশি বর্ত্তমান ছিল। হিমালয়ের উত্তর ভাগ চিরতুষারময় এবং দক্ষিণ ভাগ বর্ত্তমান আর্য্যাবর্ত্ত-জলাকীর্ণ অবস্থায় ছিল। বর্ত্তমান বিন্ধ্য পর্ব্বতমালা হইতে সুদূর সিংহল অবধি জঙ্গলাকীর্ণ এক বিশাল ভূভাগ ছিল। ইহার প্রমাণও কিছুকাল পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। মধ্য ভারত এবং দক্ষিণ বিহার ও উড়িষ্যায় অবস্থিতি ভূস্তরে প্রোথিত সুদীর্ঘ কয়লার খনি এবং জব্বলপুরের পার্ব্বতীয় ভূভাগে প্রোথিত আদিকালের অতিকায় জীবগুলির যে কঙ্কালরাশি শিলাময় (fossilised) অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে তাহাই এই ভূভাগের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতেছে। মানবের আদি জন্মভূমি যদি দক্ষিণ আফ্রিকা হয় তবে আমাদের দাক্ষিণাত্য প্রদেশও সেই আদি মানবের লীলাভূমি বলা যাইতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের মতে পঞ্চদশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লিমুরিয়ার নাম গন্ধ ছিল না। সুতরাং এই ভূভাগ হয়ত তাহার বহুপূর্ব্বে অবস্থিত ছিল অথবা ইহার বহু পরে ইহা সমুদ্রের তলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া বহুদিন পৃথিবীর বক্ষে দাঁড়াইয়া পরে আবার সমুদ্র মজ্জিত হইয়া গিয়াছে। হয়ত যে কারণে সিংহল ভারত হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে ঠিক সেই কারণেই লিমুরিয়াও সমুদ্রগর্ভে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই মহাপ্রলয় কোন সময়ে ঘটিয়াছে তাহার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

যাহা হউক খৃঃ পূঃ- দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থার সহিত প্রায় এক হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় কালে ভূমধ্য সাগর তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ সমুদ্র ক্ষুদ্রাকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সময়ে এশিয়া এবং ইয়োরোপের উষ্ণ দক্ষিণ ভূভাগে একই জাতি বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া আপন আপন প্রদেশে বাস করিতেছে। এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে কৃষ্ণকায় দ্রাবিড় জাতি এবং পূর্ব্ব ভারতীয় অন্যান্য জাতির উৎপত্তি হইয়া গিয়াছে। দ্রাবিড় সভ্যতা ভারতের কৃষ্টির এক অপূর্ব্ব স্তম্ভ। এই মহাজাতির উদ্ভব ভারতে অথবা অন্য কোন দেশে হইয়াছে তাহার প্রমাণ নাই। ইহার সভ্যতার সহিত আমেরিকার অধুনা লুপ্ত "মায়া" (maya) সভ্যতার কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য আছে। ইহাদের প্রাচীন ধর্ম্মসংস্কারের কিঞ্চিৎ নিদর্শন এশিয়া, ইয়োরোপের দক্ষিণবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগেই পাওয়া গিয়াছে। হারাপ্পা এবং মহেঞ্জদারোর সৃষ্টি বোধ হয় এই মহাজাতিরই বিপুল প্রয়াসের নিদর্শন। কাল ক্রমে ইহাদের শক্তিকে লোপ করিয়া যে গৌরবর্ণ জাতি মধ্য এশিয়া অথবা তদূর্দ্ধ স্থান হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন যাঁহারা বহু দূরবর্ত্তী যুগে "আর্য্য" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন তাঁহারাও দ্রাবিড় সভ্যতার অধিকাংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্রাবিড় সভ্যতার রথচক্র আর্য্য সভ্যতাকে কালক্রমে প্রায় পিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। দ্রবিড়িয় দেবতা মহাকাল এবং মহাকালী আর্য্য দেবতা ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতিকে কালক্রমে এক পার্শ্বে সরাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দ্রাবিড়ী গ্রাম্য নীতিকে, দ্রাবিড়ী রাজনীতিকে আর্য্যেরা কালক্রমে

আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই দ্রাবিড়ীয় এবং আর্য্য সভ্যতার মাঝখানে বহুদিন বিপুল সংগ্রাম চলিয়া আসিয়াছে। কালক্রমে দ্রবিড়েরা আর্য্য সভ্যতার সম্মুখে আপনার মস্তক নত করে নাই, তাহারা যে যে প্রদেশে আর্য্য ক্ষমতা বিস্তার হইতে পারে নাই সেই সমস্ত স্থানে আপনাদের স্বাধীন শক্তি এবং সৃষ্টিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং সুবিধা পাইলেই আর্য্য সভ্যতার পুরোহিত মুনি ঋষি দিগের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। এই আর্য্যেরা খৃষ্টজন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আগমন করেন। বেদের শত পথ ব্রাহ্মণে এক মহপ্রলয়ের বিবরণ পাওয়া যায় এবং তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান মনু এক বিশালাকৃতি মৎস্য দ্বারা এই মহা প্রলয়ের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিয়াছিলেন। এই বিশাল মৎস্য তাঁহার নৌকাকে হিমালয়ের এক স্থানে লইয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। প্রলয়ের পরে ভগবান মনু নিজ তপস্যাদ্বারা এক সুন্দরী নারী সৃষ্টি করিয়া তাহাতে উপগত হন এবং তাহাদের সন্তান মানব নামে বিখ্যাত হয়। এই প্রলয় কবে কোথায় হইয়াছিল, এই মৎস্যই বা কে তাহা শত পথে বর্ণিত নাই।

তাহার পরে মহাভারতে এই একই বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। এই উপাখ্যানে গঙ্গার নাম পাওয়া যায় এবং এই বিশাল মৎস্য আপনাকে স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন। তিনি বৈবস্বত মনুকে পৃথিবীর সমস্ত বীজ এবং সপ্তর্ষিকে আপনার নৌকায় স্থান দান করিতে বলিয়াছিলেন। মৎস্য রূপী ব্রহ্মা বহুবৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মনুর নৌকাকে হিমাবতের শৃঙ্গ সমীপে আনয়ন করেন। প্রলয় শান্ত হইলে মনু তপস্যা আরম্ভ করেন এবং সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

শতপথে বর্ণিত আখ্যান এবং মহাভারতে বর্ণিত আখ্যানে একটু তফাৎ আছে তাহা দেখা যাইতেছে। মহাভারতের বর্ণিত আখ্যানের সহিত অধুনা লুপ্ত চালডিয়ার পুরাতন আখ্যায়িকা এবং বাইবেলে বর্ণিত প্রলয়ের আখ্যায়িকার সহিত সাদৃশ্য আছে। এই মহাপ্রলয়ের ভারতের নায়ক মনু— চলডিয় নায়ক হাসিসত্রা এবং ইহুদীয় নায়ক নোয়া এবং এই মহা সমুদ্রের ভারতীয় কাণ্ডারী মহাভারতে ভগবান ব্রহ্মা, মৎস্য ও ভগবৎ পুরাণে ভগবান বিষ্ণু, চলডিয়াতে ইয়া এবং ইহুদীয় সাহিত্যে ঈশ্বর এবং যে পর্ব্বত শ্রেণীতে নৌকা আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহা ভারতে হিমাবৎ চলডিয়াতে নিজির এবং ইহুদীয় আররৎ পর্ব্বত নামে উক্ত রহিয়াছে। মৎস্য পুরাণে মনুকে মলয়ের (মালাবার) এক শক্তিশালী রাজা নামে উক্ত করা হইয়াছে। ভাগবৎ পুরাণে মনুকে রাজর্ষি সত্যব্রত নাম দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি এক কালে দ্রাবীড় রাজ ছিলেন ইহাও উক্ত হইয়াছে। অগ্নিপুরাণের আখ্যায়িকাও অনুরূপ। এই মহা প্রলয় কবে কোন স্থানে হইয়াছিল? পাশ্চাত্য বহু পণ্ডিত শতপথ ও পুরাণের আখ্যায়িকাকে প্রাচীন সেমিটিক জাতির "চালান দ্রব্য" বলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভারত প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই ভারত বহির্ভূত সর্ব্ব প্রদেশের চালান দ্রব্য লইয়াই আপনার সামগ্রী বাড়াইয়াছে। যাহাহউক কিছুদিন পূর্ব্বে পালেষ্টাইন ও নিকট বর্ত্তী স্থানে খনন কার্য্য করিয়া মহাপ্রলয়ের অনেক চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রলয় কোন স্থান হইতে কোন স্থান অবধি হইয়াছিল কে জানে? কে জানে হয়ত তাহার ধ্বংস লীলায় মেসোপটেমিয়া এবং মালাবার একই সময়ে বিধ্বস্ত হইয়াছিল কি না।

যদি আরব সাগরে কোন স্থানে কোনও যুগে লিমুরির স্থান ছিল তবে এই মহাপ্রলয়ের ধ্বংসলীলায় তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই তা যাহার বিবরণ শত পথে পাওয়া যায় তাহা রাম রাজত্বের কত সহস্র বৎসর পুর্ব্বে ঘটিয়াছিল তাহা অল্পাধিক সকলেই অনুমান করিতে পারি। যদি ভাগবৎ পুরাণ এবং মৎস্য পুরাণ বিশ্বাস করি তবে মালাবারের মনু যিনি এক কালে দ্রবিড় রাজা ছিলেন তাঁহাকে এই দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই মালাবার প্রদেশ যখন প্রলয়ের কবলে ধ্বংস হইয়া যায় তখনই কি লিমুরিয়াও তৎসঙ্গে বিলীন হইয়া গিয়াছে? দেখা যাক বৈজ্ঞানিক মণ্ডলি কি সিদ্ধান্তে আসেন—হয়ত পঞ্চাশ সহস্র বৎসরের পৃথিবীর চিত্র খানি তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া আঁকিতে হইবে।

নিষিদ্ধ ফল

শ্রীমনুজ চন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

অনেক দিনের ইচ্ছেও বটে আর বীনুরও তাগাদার শেষ ছিল না; অগত্যা একরা শারদীয়া কন্‌সেসনে বোম্বাই এসে পড়লাম। ইচ্ছে করেই বীনুকে খবর পাঠাইনি একটু চমকে দেওয়া যাবে বলে। বোরি বন্দর ষ্টেশন থেকে দশ নম্বর হর্ণবি রোড্ খুঁজে নিতে বিশেষ বেগও পেতে হল না! মাঝারি ধরণের বাড়ী সবচেয়ে নজরে পড়ে এখানকার ছাদ, দুদিক ঢালু টালির ছাত বরফের দেশে কাজে লাগতে পারে—নাতি শীতোষ্ণ বোম্বাই সহরে কি দরকার বুঝলাম না। বোধহয় লণ্ডনের অনুকরণ। দশনম্বর বাড়ী দেখেও সন্দেহ মিটল না, সদরের পাশে বিমলের নাম লেখা ট্যাবলেটটা দেখে নিশ্চিন্ত হলাম—এসে পড়েছি। সটান ওপরে উঠে গিয়ে দেখি বারান্দায় বসে বীনু চা ছাঁকছে, বিমল একটা ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল, চেঁচাবার কারণ বোধ হয় বীনুকে শোনানো—ডাকলাম, গৃহস্থের জয় হোক।'

বীনু চমকে মুখ ফেরায়—পরে আমায় চিনতে পেরে সোল্লাসে ছুটে আসে 'ছোটদা! বাড়ী চিনে এলে কি করে—আমায় আগে চিঠি লিখলেই পারতে—'ঢিপ করে এর মধ্যে একটা প্রণাম করতেও সে ভোলে না।

সুটকেসটা নামিয়ে রেখে কাছেই একটা টুলের ওপর বসে পড়ে বললাম, 'বাড়ী চেনাটা ছেলে বেলা থেকে খুব দোরস্ত করা আছে তাত তুই জানিস বীনু—কিন্তু কথা পরে, আগে এক পেয়ালা দে, বলতে গেলে তিন দিন চা খাইনি—ষ্টেসনের চা খেলে মনে হয় যেন কাশার জ্ঞান বাপীর জল খাচ্ছি।'

বীনু তৎক্ষনাৎ চা করতে বসে। বিমল কাগজ ফেলে হেলতে দুলতে উঠে এসে বলে 'কি বড় কুটুম যে একবারে সাড়ে বারশ মাইল পথ ছুটে এসেছ—বাড়ীর খবর কি!'

বীনু চায়ের কাপটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে' 'হ্যাঁ ছোটদা মায়ের অম্বলটা এখন কেমন আছে' আমি চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলি 'সেরেছে একরকম।

বীনু বিমলকে বলে 'আচ্ছা এক কাজ কর—দিকিন এই বেলা ক্রফোর্ড মার্কেট থেকে ঘুরে এস ফোর্ট বাজার যেন যেওনা, কিছু পাওয়া যায় না সেখানে। যাও আর দেরী কোরনাআবার বলবে অফিসের বেলা হয়ে গেল?'

বিমল মুখ খানা লম্বা করে দিয়ে বললে 'হ্যাঁ ক্রফোর্ড মার্কেট? বাবা ট্রামভাড়াই লেগে যাবে দু'অনা!

রাগে চোখ কপালে তুলে বীনু বলে—'কি বললে তোমার বেশী খরচ হয়ে যাবে! বল-- বলে ফেল—'

বিমল চটকরে জোড়হাতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে 'ইস অত রেগোনা গিন্নী—বেজায় ভয় পেয়েছি, নেহাত তোমার ভাই সামনে রয়েছে নইলে পায়ে—মুখ দিয়ে হটাৎ বেরিয়ে গেছে দোহাই' সে নাক কান মলে—

আমার বেশ লাগছিল দাম্পত্য কলহ। সরু লিকলিকে বীনু আজ আঁটসাঁট গড়ন গৃহকর্ত্রী—কে বলবে এ দুবছর আগে কারো সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইত না—অপরিচিত পুরুষ দেখলেই ছুটে পালিয়ে যেত। আমি বারাণ্ডা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পথের লোক চলাচল দেখতে থাকি, কলকাতারই মত অগণ্য মানুষের ভিড়, অধিকাংশই গুজরাটী এবং পার্শী—সবচেয়ে পার্থক্য নজরে পড়ে যে সকলের মাথাতেই একটা না একটা টুপি আছে, এখানে খালি মাথা পথে চলা দস্তর নয়ঃ মুখ ফিরিয়ে বললাম '—চল বিমল বাজারটা আমিও ঘুরে আসি। কি বলিস বীনু!'

বীনু আপত্তি তোলে "এই মাত্র আসছ—এখুনি কোথায় ঘুরতে যাবে—না না ও একলাই যাক।

বিমল চার্লি চ্যাপলিনের মত কাঁধ দুটো কুঁচকে অগ্রসর হতে হতে অস্ফুটস্বরে বলে, "এজ্ঞে—সেই ভাল, না হলে ডবল ট্রাম ভাড়া—থুড়ি—এই এই, বেটা রাম গিদ্ধোড় ঝুরি লে আও জল্‌দি—'

বীনু হাসি গোপন করতে মুখ ফেরায়।

আমি ইজি চেয়ারটার গা এলিয়ে দিয়ে বললাম "হ্যারে বিমল এত 'কিলটেমি শিখলে কোথায়—মাইনে টাইনে কিছু বেড়েছিল না?'

বিনু এক চাঙ্গারি আনজ আর একটা বঁটি টেনে নিয়ে কুটনো কুটতে কুটতে বলে "খেপেছ ছোটদা ও শিখবে পয়সা বাঁচাতে বাজার করে ফিলে এলে দেখোনা আমার মাথা. মুণ্ডু এক ঝাঁকা ছাই পাঁশ কিনে এনেছে—ওই জন্যে ওকে আর বাজার করতে পাঠাইনা আজ তুমি এলে বলেই একটু ভাল মন্দ আনতে পাঠালুম—"

আমি বললাম তাহলে—'বাজার করে কে—'

বীনু একগাল হেসে বলে, 'আমিই করি কি করব বল যে তোমার উড়ুন চণ্ডে বোনাই।'

আমি লাফিয়ে উঠি—'তুই বাজার করিস কিরে এ্যাঁ লোকে শুনলে বলবে কি! চাকরটাকে দিলেইত পারিস।

বীনু নির্ব্বিকার ভাবে বলে—'এখানে কোনো দোষ নেই—এখানে মেয়েরা ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকলে সবাই অবাক হয়ে যায়—অবরোধত নেইই বরং বেশ একটু বিলিতি ব্যাপার। মেয়েরা একলা স্কুল কলেজ যাচ্ছে, বাজার হাট করছে—আফিসে ব্যাঙ্কে সর্ব্বত্র অবাধ গতি। সত্যি ছোটদা এখানে এসে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি, শ্বশুর বাড়ীতে সেই একগলা ঘোমটা দিয়ে বেড়ান যেন অসহ্য হয়ে উঠেছিল।'

সে কথা আমিও অস্বীকার করিনা। বীনুর শ্বশুর রাম গোপাল বাবু পরম গোঁড়া ব্যক্তি- বৌ ঝি রাস্তার ধারের বারাণ্ডায় চিকের আড়াল থেকে মুখ বার করেছে দেখলে তিনি এমনি তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করতেন যে বেচারীরা সপ্তাহ-কাল আর তাঁর কাছে যেতে চাইত না। তিনি বলেন মেয়েদের কড়া শাসনে না রাখলে তারা ক্রমশঃ আহ্লাদী হয়ে পড়ে, তার্কিক হয় অবশেষে আগল খোলা পাগল বাতাস মত্তা, আমাদের সময়ে একখানা পাছাপেড়ে সাড়ীতে দুনিয়ার লজ্জা ঢাকা যেত, আর আজ কালকার ছুঁড়ি গুলো সায়া সেমিজ বডি ব্লাউজ কতকি জড়িয়ে বেড়ায় তবু তাদের দিকে চাওয়া যায় না।'

আমি একদিন ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম'—আজ্ঞে মধ্যযুগে বাংলা দেশের মেয়েদের অবস্থা অতি জঘন্য হয়েছিল তার চেয়ে এ বরং--'

আর বলতে হলনা। বিকট হুঙ্কার করে তিনি আমার বাকশক্তি হরণ করে নিলেন—'হ্যা হ্যা খাম জঘন্য হয়েছিল! কি জান বাপু তুমি? তোমার বুকের বসন হবে আমার উত্তরীয় এইত তোমাদের তার চেয়ে বরং ঝাঁটা মার ঝাঁটা মার, তোমার বোন দেখলুম নল পরিত্যক্তা দময়ন্তীর

মত বিবসনা হয়ে ঘুমুচ্ছে। বলুক দিকি কেউ আমার মেয়েদের ন্যাংটো—করে চ'বুক মারবো না।'

কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল! বীনুকে যে বেশী-দিন শ্বশুরের বাক্য সুধা পান করতে হয়নি এইটেই সান্ত্বনা। বিমল বিয়ের আগে থেকেই বোম্বাইএর গভর্ণমেণ্ট প্লীডার-এবং সৌভাগ্য ক্রমে বাপের মত বাতিক গ্রস্ত নয়। বীনুকে বললাম—'তাই মনের সাধে এখানে উড়ছ! কিন্তু ধর রামগোপালবাবু হয়ত একদিন এখানে এসে উদয় হলেন—তখন।'

বীনুর মুখে চিন্তার ছায়া পড়ে, বলে, 'দেখতেই পাবেন যস্মিন দেশে যদাচার :—এলে ভালই হয় ছোটদা পার্শী মেয়েদের দেখলে ঘেন্না করা দূরে থাক অমলের জন্য বৌ করতে পথ পাবেন না এই আমাদের ওপর তলাতেই মিঃ মেহতা তাঁকে ব্যাপটাইজড করে নেবেন অখন,' অমল হচ্ছে বীনুর ছোট দেওর।

আমি ওপর দিকে চেয়ে বলি, 'ওপরে আবার কারা থাকেরে—একতলায়ত দেখলাম মারাঠীর দল ইঁদুরের মত কিল কিল করছে।'

বীনু মুখটা করুণ করে বলে, "এইতেই একশো টাকা ভাড়া দিতে হয়—ওপরে একঘর পার্শী আছেন আলাপ করিয়ে দেব অখন, এখন স্নান করবেত চল—ওদিকে উনিও এসে হাজির হয়েছেন দেখছি"...

সোরগোল করতে করতে বিমল ওপরে উঠছে শুনতে পেয়ে স্নানাগারে ঢুকে পড়লাম।

× × ×

সহর হিসাবে বোম্বাই কলকাতার চেয়ে কিছু ছোট কিন্তু সৌন্দর্য্যে অনেক বড়! সমুদ্র এখানে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সারা সহরটিকে ঘিরে রেখেছে। হঠাৎ দ্বীপ বলে ভুল হতে পারে! ছোট ছোট ঢেউ পাথর বাঁধান পাড়ের ওপর আছড়ে পড়ছে, মধ্যে মধ্যে জলগর্ভ থেকে লাইট হাউস উঠে তার শোভা আরো বাড়িয়ে তুলেছে—সন্ধ্যার সময় একসঙ্গে সব কটা লাইট হাউস জ্বলে উঠলে এক অপূর্ব্ব দীপালির দৃশ্য দেখা যায়। চৌপাটি সী বীচ ত কলকাতার ইডেন গার্ডেনকে হার মানিয়েছে। রং বেরংয়ের তরুণ তরুণীর মেলায় জায়গাটা বরং বালিগঞ্জ লেকের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এ যাত্রায় বীনু আমার গাইড হয়েছে রোজ বিকেলে দোতলা ট্রামে করে সহরের নানাদ্রষ্টব্য স্থানে সে আমায় নিয়ে ঘুরত—তার সহজ স্বচ্ছন্দ গতি, সকলের সঙ্গে অবাধ কথা বার্ত্তায় আমিও বিস্মিত হয়ে উঠেছিলাম; কোনো দিন ভিক্টোরিয়া জু, প্রিন্স অব ওয়েলস্ মিউজিয়ম, কোনো দিন এ্যাপোলো বন্দর, মম্বাদেবী বেড়াতে বেড়াতে দিন পনেরো কেটে গেল। বীনু মিঃ মেহতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে আমার মস্ত উপকার করেছিল। অবসর পেলেই বৃদ্ধের সঙ্গে গল্প করতে ওপরে উঠে যেতাম! মিঃ মেহতার একটী ছেলে আর মেয়ে নিয়ে সংসার। ছেলেটাকে বড় একটা দেখতে পেতাম না—কোন কাপড়ের মিলে সে চাকরি করে, তবে মেয়ে সুম্মা আমার অভ্যর্থনায় কার্পণ্য দেখাত না! বেশ মেয়ে এই সুম্মা—পার্শীদের ঘরে ও সাধারণ হলেও বাঙ্গালীর মধ্যে সে সুন্দরীর আসন পেতে পারে; অথচ বাঙ্গালীর ঘরের সুন্দরীরা যা করেন এ তা করেনা, মানে কেবল মাত্র রূপচর্চ্চা, বৈকালিক ভ্রমণ, সখের সেলাই এবং গান গেয়েই দিন কাটায় না; যখনই যাই দেখি সে আপন মনে রান্না করছে, বাসন মাজছে, জামা কাটছে কিছু না কিছু করছেই। আমি গিয়ে দাঁড়ালেই সে মিষ্টি করে হেসে বিস্রস্ত কাপড়টা সামলেনিয়ে বলত,—"আসুন আপনার জন্যে বাবা অপেক্ষা করছেন..."

সত্যি কথা বলতে কি তার এই আহ্বানে আমার ভেতরটা পুলকে ভরে যেত—ভারী ভাল লাগত তাকে।

বীনুরত কথাই নেই, সুম্মা তার ছেলের জন্যে কেমন সোয়েটার বুনে দিয়েছে; বিমলকে নানখাটাই খাইয়ে কেমন জব্দ করেছিল এই সব এমন স্নেহের সঙ্গে সে গল্প করে যাতে আমি এক রকম ভুলে গেছলাম যে সে আমাদের কেউ নয়। ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। পার্শী মেয়েদের ধরণ ধারণের সঙ্গে আধুনিক বাঙ্গালী মেয়েদের বিশেষ তফাৎ নেই; এরাও যেমন করে শাড়ী পরে খোঁপা বাঁধে; মোটা হবার ভয়ে দুধ ঘি খেতে চায় না—পথে চলতে চলতে ঘাড় কাত করে দেখে, মোটরে সর্ব্বাঙ্গ শিথিল করে এলানো ভাবে বসে—তারাও ঠিক তাই করে, তফাৎ কেবল ভাষাগত আর কিছুতে নয়।

সেদিন বীণু প্রস্তাব করলে—"সুস্মা আমরা কাল এলিফ্যান্টা কেভ যাব তুমিও চল না…"

সুস্মার বড় বড় চোখ উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, "—কে কে যাবেন—আপনি ও?…"আমায় জিজ্ঞাসা করে।

আমি হাসি মুখে তার পানে চেয়ে বলি, —"হ্যা —চলুন বেশ এক সঙ্গে বেড়ানো যাবে একদিনও ত আপনি গেলেন না কোথাও…"

সুস্মা লজ্জিত ভাবে মুখ নামিয়ে বলে, 'বারে তখন কত অসুবিধে ছিল জানেন না ত—আচ্ছা কাল যাব, আমি খুব সকাল সকাল রান্না বান্না সেরে রাখব…কি কি রাঁধব বলুন ত…?

বীণু আদর করে তার চুলে হাত বুলিয়ে দেয়, —তোমায় কিছু করতে হবে না-আমি ভোর বেলা পুরী আর তরকারি করে টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে রাখব…"

সুস্মা বায়না ধরে, 'না-আমায় কিছু করতে দিতে হবে…বলুন না…কি করব!…'

সমস্যাটা আমিই সমাধান করে দিলাম, "—আচ্ছা আপনি না হয় ফ্লাস্কে করে চা নেবেন আর বেশ ভাল দেখে গোটাকতক নানখাতাই…কেমন?…"

সে তার যুঁথির মত শুভ্র মুখখানি হাসিতে ভরিয়ে তোলে, "—নানখাতাই! আচ্ছা—দেশে গিয়ে গুণ গাইতে হবে কিন্তু…"

কপালগুণে রবিবার থাকায় .বিমলকেও পাকড়াও করা হয়েছিল। বেলা দশটায় ষ্টীমারে করে "এলিফ্যান্টা কেভ" পৌছে গেলাম। বিরাট কাণ্ড! সমুদ্র গর্ভস্থ একটি ছোট পাহড়-তারই ওপরে একটি অপূর্ব্ব গুহা; গুহা না বলে রাজ প্রাসাদ বলা উচিত; তার ভেতরকার পাথরের থাম খোদাই করা মূর্ত্তি, রঙিন ছবি প্রভৃতি অতীত ভারতীয় শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছে। গুহার মুখে দুইটি বৃহদাকারে পাথরের সিংহমূর্ত্তি; বিমল বললেন, ক্যামেরাটা কি বইতেই এনেছ নাকি হে—এই দুটোর একটা ছবি নাওনা, অমি কিন্তু ওর ঘাড়ে চেপে ছবি তুলব "—।

খেয়ালই হয়নি। পকেট থেকে ছোট ক্যামেরা বের করে তাগ করে ধরলাম, ওদের সবাইকে দাঁড়াতে বলতে সুস্মা বললে তুলতে হলে চারজনে তুলব তানা হলে শুধু সিংহের ছবি তোলা হোক। অগত্যা নিকটস্থ মারাঠী ভদ্রলোকের হাতে ক্যামেরার শাটার ধরিয়ে দিয়ে আমি বিমলের দেখা দেখি সিংহটার মাথার ওপর বসলাম—মারাঠি ভদ্রলোককে ইঙ্গিত করতে তিনি টিপে দিলেন। উঠে এসে তাঁকে মামুলি প্রথায় ধন্যবাদ দিতে তিনি আমার হাতে ক্যামেরা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এতে আর ধন্যবাদ দেবার কি আছে। আচ্ছা আমার কৌতূহল ক্ষমা করবেন আপনারা কি বাঙ্গালী?

আমি ফিল্মের নম্বরটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললাম, 'ঠিক বলেছেন—কি করে ধরলেন বলুন দেখি।'

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন,'না এমনি অনুমান করে বলছি আচ্ছা উনিও কি বাঙ্গালী, বলে সুস্মাকে দেখান!

আমি বিস্মিত হয়ে তার মুখ দেখি—একটু বিরক্তও হয়েছিলাম, তবু ধীর ভাবে বললাম,'—না উনি এ দেশীয় —কেন ওকে চেনেন না কি?'

মারাঠী ভদ্রলোক সুস্মার দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইলেন, কেমন উন্মনা ভাবে বললেন—'চিনিনা, এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম। আচ্ছা নমস্কার। আস্তে আস্তে সে একটা বাঁকের আড়ালে চলে গেল।

আমি দলে ফিরে আসতে বীণু বললে '—ওই দুশমন চেহারার, গুজরাটিটা তোমায় কি বলছিল ছোটদা;

অমি বললাম '—না কোথাকার লোক তাই জিজ্ঞেস করছিল। চল্ এইবার সব ঘুরে দেখি।;

অনেকক্ষণ ঘোরা ঘুরি করে আমরা গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে পাহাড়ের শেষ প্রান্তে রেলিং এর ধার ঘেঁসে শতরঞ্জি বিছিয়ে বসলাম। নীচেই সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল। আশ পাশ দিয়ে ছোট বড় ষ্টীমার যাচ্ছে আসছে!

বীণু পা ছড়িয়ে বসে টিফিন ক্যারিয়ার খুলে খাবার সজাতে বসল দেখে সুস্মাও তার ছোট কেসের বাক্স খুললে, তার ভেতর ছোট ছোট চায়ের কাপ ডিস ফ্লাস্ক তোয়ালে—দুনিয়ার বস্তু!

বিমল সর্ব্বাগ্রে খেতে আরম্ভ করে গোগ্রাসে লুচি

খেতে খেতে বললে,—সুষমা—তোমার নান খাতাইটা বের করত—শালা বোম্বাই এসেছে এখানকার ভীম নাগের কেরামতিটা একবার দেখুক ;

সুষমা সহাস্যে প্লেটে করে ডবল নানখাতাই আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। খেতে খেতে বললাম, প্রাইজ দেওয়া চলে—একি সুষমা দেবীরই তৈরী নাকি।

বীণু হেসে গড়িয়ে পড়ল,----'ছোটদা যে খেতে না খেতেই দেবী টেবী বলতে সুরু করলে গো।'

বিমল ভরা গালে উত্তর দেয়, তাবলে আমার কাণ্ডটা—'বলতে বসনা যেন।'

দেখলাম বিমলের ওই কথায় সুষমার মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল ; আমি কৌতুহল ভরে বলি কিরে বীণু ব্যাপারটা কি ?

বীণু মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বলে, একদিন রাত্রে উনি ওর ঘরে কাউকে না বলে ঢুকে ছিলেন ধরা পড়তে স্বীকার করলেন নান খাতাই চুরি করতে গেছলেন। ও্যা কোথায় যাব, বীণু লুটিয়ে লুটিয়ে হাসতে থাকে হাসির চোটে তার ব্লাউজ পট পট করে ওঠে।

আমিও হাসছিলাম কিন্তু বিমল এবং সুষমার মুখভঙ্গী দেখে হাসি মিলিয়ে এল, সুষমার মুখ শুকিয়ে আমসির মত হয়ে গেছে আর বিমল মুখে ক্রমাগত লুচি পুরে পুরে গাল দুটো ফুটবলের আকারে এনে ফেলেছে; কোনো রহস্য আছে নাকি! মারাঠীর ভাবান্তর মনে পড়ল—নাঃ ব্যাপার সুবিধার নয় দেখছি...

আমাদের ভাবান্তর লক্ষ্য করে বীণু স্থির হয়ে উঠে বসে বলে, —"কি গো সব বোবা হয়ে গেলে যে...এই সুষমা তুমি খাচ্ছনা কেন..."

সুষমা নিরুত্তরে খাবারের প্লেটটা টেনে নেয়। আবার আমাদের কথাবার্ত্তা চললো বটে কিন্তু মনের মালিন্য আর দূর হল না; কি যেন একটা লুকোচুরি ভাব সকলকে পীড়া দিতে লাগল; সকলেই সহজ হবার চেষ্টা করলাম অথচ সেই চেষ্টাই এমন উৎকট দেখাতে লাগল যে ঘন্টাখানেক বাদে আমরা হর্ণবি রোডে ফিরে এলাম। অদৃষ্টের আনন্দ কর্পূরের মত উপে গেল কি অধাত্রা!

নানখাতাই চুরি করা আমার কাছে একটা হেঁয়ালি হয়ে রইল; অহরহ সেই চিন্তাটা আমায় ঘিরে থেকে কত কথাই ভাবিয়ে তুলছিল! খাবার খেতে ইচ্ছে করলে দুপুর রাত্রে একজন অনাত্মীয়ার ঘরে চুরি করতে যেতে হয় না—আমোদের ছলেও না! ঘুমন্ত রাজকুমারীর ঘুম ভাঙ্গালে আগে দণ্ড হত না,—এখন হয় একথা একজন শিশুও জানে! বীণু ব্যাপারটাকে সরল ভাবে দেখালেও আমার মন মানতে চাইছিল না; কিন্তু বিমলের সম্বন্ধে অন্য সন্দেহ করতেও লজ্জা হয়—ওই সদানন্দ নির্ম্মল চিত্ত মানুষকে কুকর্ম্মী মনে করা পাপ বই কি। আবার মনে হল রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে কয়টা পুরুষই বা নারীকে জয় করতে পেরেছে? —মনকে সজোরে ভৎর্সনা করলাম, না না ছিঃ এ হতে পারে না। ওই অনিন্দ্য সুন্দরী বালা যার দেহে মনে বাক্যে সর্ব্বত্র সুষমা, সর্ব্বত্র শুচিতা, আমিও যার গুণে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি সেই মাধুর্য্যময়ীকে রূপজীবিনী মনে করা শুধু পাপ নয়—মহা-পাপ; সে পাপের ক্ষমা হয় না তাকে ক্ষমা করা উচিত নয়; ছি ছি এ আমি করেছি কি! মনকে অন্য পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম।

বীণু এসে বললে, '—তোমার হল কি ছোটদা আজকাল দেখি তুমি সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক—এত কি তোমার চিন্তে এসে পড়ল? সাধে কি বাবাকে বলি যে ছোটদার বিয়েটা দিয়ে দিন—উড়ু উড়ু ভাব কমে কিনা দেখি—নাও ওঠো চা খেয়ে একটু বেড়িয়ে এস, একলা ভাল না লাগে সুষমাকে না হয় ডেকে নিয়ে যাও। একলা চুপ করে বসে থাকলে কখনো মন ভাল থাকে? খোকার যে জ্বর হয়ে গেল নইলে আমিই যেতুম—"

উদ্গত নিঃশ্বাসটা চেপে নিলাম। সত্যিই আমি বেড়াতে এসে কোথায় আনন্দ করব না এদের সহজ সংসারের আবহাওয়াও ভারী করে তুলছি; হাসি দেখিয়ে বললাম, '—হ্যাঁরে মুখপুড়ী বিয়ের ভাবনাই কেবল আছে আমার, আর তা থাকলে এত দিন হতে বাকি থাকত না,—ভাবছিলাম বাড়ী ফেরবার কথা অনেক দিনত কাটল এখানে—'

নিমেষে বীণুর মুখ ম্লান হয়ে গেল, 'কেন ছোটদা

এখানে ভাল লাগছে না? আর কিছুদিন থাক না ভাই লক্ষ্মীটি কতদিন পরে দেখা হল বল দিকিন—'

আমি তাকে টেনে এনে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, —'তুই একটি পাগলী--আমার বুঝি কলকাতায় কোনো দরকার থাকতে নেই? আবার আসবরে—'

বীণু সবেগে মাথা নেড়ে বলে, '—না না এখন তোমার যাওয়া হচ্ছে না, আবার যা আসবে তা জানাই আছে—আচ্ছা এস এখন চা জুড়িয়ে এল—ওসব পরের কথা।' সে ঘরের ভেতর চলে যায়।'

আমি চিন্তিত হয়ে উঠলাম। বীনুটা যে রকম এক-গুঁয়ে মহা মুস্কিল বাধাবে দেখছি! চায়ের খালি বাটিটা তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, '—আচ্ছা তুই খোকাকে ঘুম পাড়া আমি একটু বেড়িয়েই আসি—ফিরোজশায়ের হ্যাঙ্গিং গার্ডেনটা দেখা হয় নি এই বেলা সেরে রাখি—'

বীণু আঁচল থেকে একটা টাকা দিয়ে বলে,—

'আসবার সময় ভুলেশ্বর থেকে এক পাউণ্ড গাওয়া ঘি কিনে এনো—তিলের তেল খেতে খেতে তোমার জিভে হাজা পড়ে গেল—'

বোম্বাই সহরে ঘৃতপক্ক খাবার দুষ্প্রাপ্য। তিলের তেলেই ঘিয়ের কাজ-সারা হয়। টাকাটা পকেটে ফেলে বেরিয়ে পড়লাম।

দোতলা ট্রামে উঠে টিকিট করলাম—ওয়ালকেশর জংশন; শুনেছিলাম এইখানে নাকি হাজার হাজার পায়রার সমাবেশ হয়; পার্শী টাওয়ার অব সাইলেনস—অর্থাৎ প্রেতভূমিও ওই পথেই দেখে আসব! পার্শীরা প্রায় হিন্দুর অনুকরণে নিজেদের গড়ে তুলেছে ওদের অগ্নি পূজার পদ্ধতি দেখে আমার সেই ধারণা জন্মেছে। কিছুদূর অগ্রসর হয়েছি হটাৎ পেছনের সীট থেকে কে ডাকলে '—শেটজী—'

মুখ ফিরিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম—সেই এলিফ্যান্টা কেভের মারাঠী! সন্দেহ হল—লোকটা গোয়েন্দা নয়ত, তা আমার পেছনে ঘুরছে কেন? ভুলেও কোনো দিন স্বদেশী লেকচার শুনতে গেছি বলেত মনে পড়েনা হঠাৎ আমার ওপর—শুকনো হাসি হেসে বললাম, '—এই যে এতক্ষণ দেখতে পাইনি, খপর ভালত?—'

লোকটা স্মিত মুখে বলে, "ভাল—কতদূর যাচ্ছেন?" আমি তাচ্ছিল্য ভরে বলি "এই ভুলে-শ্বর বিষ্ণু মন্দির অবধি কিছু ঘি কিনতে হবে—আপনি?—'

ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিলেন, আমার প্রশ্নে সজাগ হয়ে বলেন, —আমি! ওঃ সে অনেক দূর যাব! দেখুন আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকারী কথা ছিল—মানে একটু নির্জ্জনে বলতে চাই··· শুনবেন কি?'

লোকটার মতলব কি! অমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে চাইলাম। লোকের চোখ দেখে তার মনের কথা বুঝতে অমি অভ্যাস করেছিলাম, আশ্চর্য্য লোকটার চোখের ভেতর কেবল ব্যথার তরঙ্গ ফেনিয়ে উঠেছে—হতাশার ক্ষোভ ঠিকরে পড়ছে, কে-এ, কি বলতে চায় আমাকে।

সে আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে হাসে '—অপরি-চিতের আব্দার বলে ভয় পাবেন না, কোনো অসদুদ্দেশ্যে নয়, তর ওপর আপনিত আমার চেয়ে ঢের বেশী বলবান, হাতে যে লাঠি রেখেছেন তার এক ঘায়েইত সাবাড় হয়ে যাব, আমাকে বন্ধুই জানবেন, সে দিন যে আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনাদের সেই সহচরী আমার পরিচিত কি না তারই সম্বন্ধে কিছু তথ্য আপনাকে দিতে চাই—' গলার স্বরটা আরো পাতলা করে এনে সে পরিষ্কার বাংলায় বলে, '—আমি মারাঠী নয়—আমিও বাঙ্গালী···"

আমি আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠি—বাঙ্গালী? ছদ্ম বেশে ঘুরছে—সুস্মার কথা বলতে চায় ব্যাপারটা সব যেন তাল গোল পাকিয়ে গেল! একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বললাম, '—নাঃ—ভয়ের জন্যে নয়—তা আপনি যা বলতে চান তাতে নির্জ্জন স্থানের প্রয়োজন কি? এই খানেইত বলতে পারেন।'

সে মাথা নেড়ে বলে, —'সে অনেক কথা এক জায়গায় স্থির হয়ে না বসলে হবেনা...'

আমি কৌতূহলে অধীর হয়ে উঠেছিলাম; যদিও তা হবার কথা নয়—সুস্মার জন্যে আমার মাথা ব্যথা অশো-ভন তবু কি জানি তার সম্বন্ধে খুটিনাটি খবরে আমার আগ্রহ হত; বললাম, '—বেশ কোথায় বসতে চান বলুন আমি যেতে রাজী আছি...

সে রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে কি ভেবে তারপর আমার দিকে ফিরে বলে, '—স্যাণ্টা ক্রুজে গেছেন কোনো দিন ?...'

সে বললে, '—তাহলে সেই খানেই চলুন—নামুন ট্রাম থেকে কোলাবা ষ্টেশনে যেতে হবে আগে...'

দুজনে কোলাবা রেল ষ্টেশনে পৌছলুম! প্রতি দশ মিনিট অন্তর সেখান থেকে ইলেকটিক ট্রেণ যাচ্ছে আসছে—নিঃশব্দে। সে বি, বি, সি, আই বুকিং আফিসে গিয়ে দুখানা টিকিট কিনে এনে বললে, '—চলুন টেণ ছাড়বে এখুনি।'

ট্রেণ চাপবার একটু পরেই বিচিত্র ফুঁ শব্দ করে টেণ ছেড়ে দিলে। ইঞ্জিনের শব্দ নেই ধোঁয়া নেই,কেবল চাকার খট খট শব্দ, এক একখানা ক্যারেজ জি আই পির ডবল, এক্স্প্যাণ্ডেড মেটালের দরজা, থার্ড ক্লাশে গদি, ফ্যান—গাড়ীর চূড়ান্ত! আমার পর্য্যবেক্ষণের ভঙ্গী দেখে সে বললে, '—এ গাড়ী কখনো চড়েন নি বুঝি—'

আমি প্রফুল্ল কণ্ঠে বললাম, "—না আপনি না নিয়ে এলে চড়াও হতনা বোধ হয়—আচ্ছা লাইনের ধারে ওগুলো কি ?—'হাত বাড়িয়ে দূরে দেখিয়ে দিলাম।

সে টেণের জানলা থেকে মুখ বার করে বললে,—"ওগুলো অটোমেটিক বেল, ট্রেণ আসবার পাঁচ মিনিট আগে পথচারীকে সাবধান করবার জন্যে আপনা আপনি বেজে ওঠে—"

এ ট্রেনের গতি ও আশ্চর্য্য রকমের দ্রুত। কথা কইতে আমরা সাণ্টা ক্রুজ ষ্টেশনে এসে গেলাম! রাস্তার লেভল্ থেকে প্রায় দোতলা উঁচু রিণফোর্সড কনক্রিট সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম সরস্বতী রোড; একটা ট্যাক্সিতে চড়ে আমার সঙ্গী চালককে বললে,—'চল—জুহু রোড।'

এসেত পড়লাম! যত রাজ্যের ভাবনা মাথার মধ্যে ঝিলমিল করে উঠল। কে এই অজ্ঞাত লোক—কি গোপন কথা সে আমায় বলবে—আমার তা শুনে কি লাভ হবে! সামনে চেয়ে দেখলাম অপার আকাশ নীল হয়ে নেমে এসেছে—দুধারে ধূ ধূ করছে মাঠ, তার মাঝখানে নারিকেল গাছের সারির ভেতর দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি; হঠাৎ বিপুল জলকল্লোল শুনতে পেলাম। সমুদ্র গর্জ্জন করছে—এ চলেছি কোথায়! সঙ্গীর মুখের দিকে চাইলাম সে এক দৃষ্টিতে মালাবার পাহাড়ের প্রতি চেয়ে আছে—তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে।

পর্ব্বত সানুদেশে ট্যাক্সি দাঁড়াতে আমার সঙ্গী নেবেই ভাড়া দিচ্ছিল—আমি তার হাতটা চেপে ধরে বললাম, 'আমিই দিচ্ছি—'

সে সচকিত হয়েহাত গুটিয়ে নিয়ে বললে "—ঠিক আবার ফিরতে হবেত এই তুম ঠাহরো, হমলোগ ইসিমেই লৌটেঙ্গে—চলুন ওপরে ওঠ যাক—"

মালাবার পর্ব্বত। চারিদিকে ঘন নারিকেল এবং তাল কুঞ্জ দীর্ঘ বাহু বিস্তার করে সমুদ্রের বন্দনা গাইছে। চন্দনের গাছও বিস্তর—বেশ গন্ধ পাচ্ছিলাম। নানা জাতীয় পাখী কলরব সহকারে উড়তে উড়তে এক রকম শান্ত সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলেছে! পাহাড় পৌছে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে বঙ্গোপসাগর দেখা ঘটেছিল—কিন্তু আরব সাগরের এই প্রলয়ঙ্কর রূপ দেখে আমার বাক্য স্ফূর্ত্তি হলনা। দুশ ফিট নীচে ভীম নাদে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে পাহাড়কে আঘাত করছে—সে বাধা মানেনা—পর্ব্বতের ঔদ্ধত্য সে চূর্ণ করবেই; মাঝে মাঝে এক এক চাপ পাথরও ঝপ করে জলে খসে পড়ছিল জয়ের আনন্দে সেই কাল জল যেন হেসে ওঠে কেমন। দূরে পাহাড়ের কোলে দু' একটা তাল পাতার ঘর থেকে ধোঁয়া উঠছিল—বোধ হয় জেলের কুটীর! আমি উল্লাসে আত্মহারা হয়ে উঠলাম। মনে হল এই যেন আমার প্রকৃত বাসস্থান এত দিন পথ হারিয়ে যত্র তত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি! আমার সঙ্গী একটা পাথরের ওপর বসে বললে, '—বসুন—আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হয় নি।'

আমি ও একটা উঁচু পাথরে বসতে বসতে বললাম '—এইবার আপনার পরিচয়টা বলুনত ?'

সে করুণ গম্ভীর স্বরে বলে,'আমার পরিচয় নেই—শুধু আমার প্রকৃত নামটা আজ আপনাকে বলব। আমার নাম সনত সেন, আমি এক কালে কলকাতার স্কটিশচার্চ্চ কলেজের ছাত্র ছিলাম—ধনে মানে বিদ্যায় আমরা সম্ভ্রান্ত

বংশ বলে পরিচিত, মা বাপ ভাই বোন সবই আমার আছে কিন্তু সব থেকেও কেউ নেই—তাদের কাছে আমি মৃত। বীরেন বাবু সাবধান আপনারও আমার মত অবস্থা ঘনিয়ে আসছে।'

নিস্তব্ধ পর্ব্বতে তার কণ্ঠ স্বর থম থম করতে লাগল।

আমি লাঠিটা চেপে ধরে বললাম, 'আমার কি অবস্থা হত দেখলেন সনত বাবু। ভারী রাগ হচ্ছিল—লোকটা কি তামাসা পেয়েছে নাকি আমায় ভয় দেখাতে চায়!

সনত উত্তেজিত হয়ে বললে '—অন্ধকারে আলেয়ার আলো দেখে ছুটে যাচ্ছেন জানেন না সেখানে কতবড় খাদ—একবার পড়ে গেলে আর উঠতে পারবেন না সেখান থেকে। ওঠা যায় না তোলাও যায় না, আপনার সেই অবস্থা হয়েছে বীরেন বাবু।

আমি বললাম, 'হেঁয়ালি রেখে বলুন।'

সনত হেসে ওঠে। এই প্রথম তাকে হাসতে দেখলাম, সেত হাসি নয় সে চেঁচানো। শীত কালে নাইতে লোকে যেমন গান গায় এও তেমনি হাসি। বললে,—'বুঝবেন বইকি' হা হা হাড়ে হাড়ে বুঝবেন—কিন্তু যদি সত্যি বুঝতে চান যদি বাঁচতে চান তাহলে শুনুন—' সে ফ্যাল ফ্যাল করে একবার চারদিকে কি যেন দেখে তারপরে মুখ নীচু করে বললে—'আচ্ছা আপনি ভূত বিশ্বাস করেন...?'

পাগলের পাল্লায় পড়লাম নাকি! সেই থেকে যে গৌড়চন্দ্রিকা আর শেষ হয় না।

সনত তর্জ্জন করে ওঠে,'--কেন করেন না—না করবার কারণ? সায়েন্স বলেনা! কে বললে বলেনা, জল যদি Transformed হয়ে বাষ্প হতে পারে, বাষ্পের যদি স্বাধীন ইচ্ছে এবং শক্তি থাকতে পারে আর প্রাণের বেলাই হবেনা? জানেন—এই খানেই অশরীরি শ্রোতা বর্ত্তমান রয়েছে—আশ্চর্য্য আপনি টের পাচ্ছেন না?...'

অতিষ্ট হয়ে উঠলাম; বললাম,'-বেশ লোক মশাই আপনি-এই শোনাবার জন্য ভুলেশ্বর থেকে আমায় এই খানে আনলেন নাকি?...'

জলদগম্ভীর স্বরে সনত বলে উঠল 'না না বীরেন বাবু, আপনাকে যা বলতে এনেছি তা বিশ্বের কাউকে বলা হয় নি'। আপনি বাঙ্গালী আমার স্বজাতি তাই আপনাকে বলতে হবে।'

এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে সে তার কাহিনী আরম্ভ করে' ...যে সুষমা মেহতার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে চলেছে—ওর এক বড় বোন ছিল রমা মেহতা। তার দেখবার মত রূপ ছিল—শোনবার মত গলা ছিল,মেয়েদের যা যা থাকলে ভাল হয় সবই তার ছিল। স্কটিশে ও যখন বি এ পড়ত তখন ওর প্রেমে পড়েনি এমন কোনো ছেলে সে কলেজে ছিলনা---বরং অন্যান্য কলেজেও তার প্রেমাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা কম ছিল না।

কলেজের অন্যান্য মেয়েরাও তার আশ্চর্য্য রূপে হিংসা কোরত, বাঙ্গালীর মেয়ে যতই চেষ্টা করুক না কেন পার্শীর সঙ্গে তুলনাই হয় না! সে বিউটি বাথ করুক স্যাম্পুয়িং করুক লিপ ষ্টিক ব্যবহার করতে শিখুক তথাপি সে বাঙ্গালী—তার রূপ খুলবে চওড়া লাল পেড়ে সাড়ী পরে ঠাকুর ঘরে আলপনা দেবার সময়, ভিজে চুলের রাশি নিটোল পিঠের ওপর ছড়িয়ে তুলসি তলায় প্রণাম করবার সময়ে; ইরাণীর সুর্ম্মা আঁকা চোখের কটাক্ষ বাঙ্গালীকে মানায় না--তাই অনুকরণ করলেও কেউ তার সমকক্ষ হবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করত না।

এ হেন রমার সঙ্গে আলাপ করতে আমিও উৎসুক হয়ে উঠলুম, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে অপরিচিত মেয়েদের সঙ্গে কথা কইতে পারতুম না—ভয়ানক লজ্জা করত! অথচ কলেজের মধ্যে অন্যান্য ছেলেদের তুলনায় আমি সকলের চেয়ে ধনীর সন্তান, তারা আসত হেঁটে অথবা বাসে আমি যেতুম মিনার্ভা নয় ডেমলার চড়ে কাজেই মোটরে করে কলেজ যাওয়ার সঙ্গে সুন্দরী মেয়েদের সাথে কথা বলবার অধিকার আমারই সব চেয়ে বেশী! এ কথা সকলে স্বীকার করলেও আমি করতুম না। অথচ ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণীর ছেলে কাশী সকলকে টপকে যে কোনো মেয়ের সঙ্গে এমন জমিয়ে তুলত যা সত্যিই অদ্ভুৎ!

কিন্তু আমি কিছু না করলেও রমার সঙ্গে আমার আলাপ

হোল—অপ্রত্যাশিত ভাবে এবং বেশ গভীর ভাবেই হোল। বর্ষাকাল না হলেও একদিন দুপুর থেকে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হোল; ক্লাশ শেষ হতে কেউ দাঁড়িয়ে কেউ পায়চারী করে কমনরুমে বৃষ্টি ধরার অপেক্ষায় ঘণ্টা দুই কাটিয়ে অবশেষে বিরক্ত হয়ে ভিজতে ভিজতে চলে যায়! কাশী একটা ঠিকে গাড়ী করে একপাল মেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল—রমাকে বলে গেল "Excuse me Miss Mehta I am just coming"রমা বই থেকে মুখ তুলে তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। কেইবা তাকে আসতে বললে এত লোক থাকতে তারই বা পৌঁছে দেবার অধিকার বা আগ্রহ হোল কেন তা সে বুঝতে পারে না।

পরিচিত মোটরের হর্ণ শুনে আমি উঠে দাঁড়ালাম, প্রোফেশর ব্যানার্জ্জি চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন তাঁকে ডেকে বললুম, 'সার আপনি এখন বাড়ী যেতে চান ত আমি পৌছে দিতে পারি—রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে...'

প্রোফেশর ব্যানার্জী উঠে বললেন, 'যাব বইকি বাবা--তোমার গাড়ী এসেছে বুঝি! চল, কি দুর্য্যোগ বল দিকিন...হটাৎ রমার দিকে নজর পড়তে বললেন,'—'Hallo Rama! come along our young prince will be glad enough to help you—won't you Sanat?...'বলে আমার দিকে ফিরলেন...

কোনো রকমে উত্তর দিলুম,'-If she please...'

বেথুন রোয়ে প্রোফেশর বানার্জীকে নামিয়ে দিয়ে চিত্তরঞ্জন এ্যাভুন্যুতে মাধো ভবনে রমাকে পৌছে দিতে যাই। পথে তার সঙ্গে একটিও কথা কইতে পারছিলুম না দেখে সেইই প্রথম কথা কয়। কি কথা সে কয়েছিল তা মনে নেই, তবে এইটুকু মনে আছে সেই অমৃত সিক্ত স্বর শুনতে শুনতে অলক্ষ্যে আমি তার রেশমী সাড়ীর এক প্রান্ত চেপে ধরেছিলুম, মোটরের ঝাঁকানিতে তার গায়ে আমার গা ঠেকে যেতে কেঁপে উঠেছিলুম; এবং সে তার বাড়ীতে নেমে যেতে বুঝতে পেরেছিলুম—আমি রমাকে ভালবেসেছি! এর আগে কাউকে ভালবাসিনি--প্রেমের গল্পই পড়া ছিল--তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না, সেই দিন হল। তীব্র ব্যাকুল অনুভূতি আমার সর্ব্বাঙ্গী শিথিল করে আনে, থেকে থেকে মনের মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জন ওঠে রমা, রমা, রমা; সেই দিনটি আমার স্বর্গ সেইদিন আমার যৌবনকে আমি চিনতে পারলুম...' সনত চুপ করলে।

'তারপর সেইদিন থেকে আমি যেন আর একজন মানুষ হয়ে গেলুম মানে বিদেশিনী জেনেও আমি রমাকে পাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠলুম। নিষিদ্ধ ফলই বেশী মিষ্ট। রমাও একটু একটু করে আমায় ধরা দিচ্ছিল। রূপবান রঞ্জনকে ছেড়ে, শক্তিমান ভবেশকে উপেক্ষা করে, রসিক কাশীকে পাত্তা না দিয়ে রমা আমারই সঙ্গে বেছে নিয়েছিল। আমি কলেজ থেকে ফেরবার পথে কতদিন ওদের বাড়ী চা খেতে যেতুম ওর বুড়ো বাপের সঙ্গে গল্প করতুম ওই সুন্মাকে আদর করতুম—তবু ওকে বেশী কিছু বলতে পারতুম না! বুড় মহতা কথায় কথায় একদিন বলে ছেলেটার কারবারে বড়ই লোকসান যাচ্ছে হাজার দশেক টাকা ধার না করলে বোম্বাইয়ে ওদের ফার্ম উঠে যাবে। আমি উপযাচক হয়ে সেই টাকা বুড়কে বিনা রসিদে ধার দিলুম; রমা শুনে আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার দুই হাত তার নরম হাতে তুলে নিয়ে বলে, 'দুদিনের আলাপে আপনি আমাদের এত বড় উপকার করবেন তা ভাবিনি...'

রমা স্নিগ্ধ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে, আমার হাতের আঙুল গুলো মটকে দিতে দিতে মধুর কণ্ঠে বলে, '—আপনি আমায় খুব ভাল বাসেন না?' ধরা পড়ে আমার কানের ডগা গুলো ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে আমি তার মোমের মত দুই করতলে মুখ লুকুই; এ কথার জবাব কেমন করে দেবো—আমি যে মুখ ফুটে বলতে পারি না। রমা বুঝতে পারে ধীরে ধীরে সে আমায় তার কাছে টেনে নেয়।

—সেই দিনই আমার হীরের আংটি দিয়ে তার সঙ্গে রিং বদল করলুম?...

রমা কোনো আপত্তি না তুলে কেবল বললে,—'তোমার গার্জেন মত দেবেত সনত...'

আমি তার গলা জড়িয়ে ধরে বললুম, 'ইণ্টারকাষ্ট ম্যারেজ' পাপত নয় ডিয়ার আর যদি নাই মত দেয় তাহলেও আমাদের মিলনে বাধা নেই...'

রমা ভয়ে ভয়ে বলে, '—তুমি আত্মীয় স্বজন আমার জন্যে সব ত্যাগ করবে...এত ঐশ্বর্য্য !...'

আমি তাকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বললুম,—'তোমার জন্যে নয়,—আমার জন্যে সবাইকে ত্যাগ করবো, আর ঐশ্বর্য্য সেত আমার বুকেই রয়েছে, এ ঐশ্বর্য্য যার আছে তার কি অন্য ঐশ্বর্য্যের লোভ থাকে রমা ..'

কথাটা চাপা রইল না। বাবা চীৎকার করে বাড়ী মাথায় করে তুললেন, মা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন, দাদারা মুখ গম্ভীর করে সরে গেলেন—বোনেরা বোঝালেন, কিন্তু আমি অবিচলিত রইলুম; মহাত্মা গান্ধীর মতে আন্ত-র্জাতিক বিবাহ বৈধ এবং প্রয়োজন—রমাকে বিয়ে কোরবই ; তাতে বাড়ীতে থাকতে দিক আর নাই দিক। বৌদিরা ঠাট্টা করে বললেন '—ভাব হয়েছে না হয় হয়েছেই তাই বলে বিয়ে কেন। কত লোকেই ত অমন আর্ম্মাণী ইহুদি মেম রেখেছে তারা কি সব বিয়ে করেছে নাকি!' অবশেষে আমাকে বাড়ী ছাড়তে হল, স্থির করলাম বোম্বাই গিয়ে আমাদের বিয়ে হবে।

—আমার নিজের নামে কুড়ি হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা ছিল—সব টাকা বোম্বাইয়ে ট্রান্সফার করতে বলে আমরা সকলে এখানে চলে এলুম; হর্ণবি রোডে যে বাড়ীটাতে আপনারা রয়েছেন ওইটে রমার নামে কিনলুম! গৃহ ত্যাগের বিচ্ছেদ ভোলাতে রমা মাঝে আমার এই সান্টাক্রুজে বেড়াতে আনত। তার আদরে সোহাগে দিন এক রকম কেটে যাচ্ছিল ; অবশেষে একদিন আমাদের সরকারের চিঠি পেলুম—বাবার ইচ্ছানুসারে আমি তাঁর বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়েছি এরপর আমার পুত্রকন্যা যাতে তাঁর নাতি বলে পরিচয় না দেয় এটা তারই অনুষ্ঠান। তাতেও কাতর হলুম না---আমি তখন রমাময়—শয়নে স্বপনে রমা! আঃ বীরেন বাবু নারীর রূপ কি এতই মোহিনী! পুরুষ বিশ্ব জয় করতে পারে—পারেনা কেবল রূপসী রমণীকে ঝেরে ফেলতে।

—তারপর আরো কয়মাস কেটে গেল। আজকাল করতে করতে আমাদের বিয়েটা তখনো ঘটে উঠল না—অথচ আমার যাবতীয় সঙ্গাত তার "ব্রাইডাল ড্রেস" প্রভৃতি কিনতে কিনতে নিঃশেষ হয়ে এল ; একদিন বললুম, আর দেরী করা উচিত নয়—সে হেসে উড়িয়ে দিলে। অবশেষে বৃদ্ধ মেহেতাকে বলতে সে যা উত্তর দিলে তা শুনে আমার মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল; সে বললে—রমার আশা ত্যাগ করতে হবে। বিখ্যাত সওদাগর ফিরোজসা জীমশেদ জী রমার পানি প্রার্থী, আমি বিয়ে করলেও আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।'

পাগলের মত রমার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম এ কথা সত্য কি না? অম্লান বদনে সে স্বীকার করলে!

আমি কেঁদে ফেললুম' '—তোমার জন্যে আমি যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে পথের ভিখিরি হয়েছি রমা—"

রমা বিরক্ত ভাবে বলে, '—সেইজন্যেইত এত গোল-যোগ—তোমার টাকা থাকলে আর আমার অন্য চেষ্টা করতে হোত না—বিশেষতঃ তোমার বাপও তোমায় ত্যাজ্যপুত্র করেছে ভবিষ্যতেও ভরসা নেই…"

আমি রেগে উঠি '—ভালবাসার চেয়ে টাকা বড় হল তোমার কাছে? তুমি আমার টাকা দেখে আমায় ভাল বেসেছিলে রমা? বেশ তোমায় আমি ১৫হাজার টাকা বাড়ী কিনে দিয়েছি—তোমার বাপকে দশ হাজার টাকা দিয়েছি, এ সব এখুনি ফেরত দাও— আমি চলে যাচ্ছি…

'—কি বললে' তীব্রস্বরে সে চেঁচিয়ে ওঠে 'ফিরিয়ে দোব, আমাদের চেননা বটে, আমাকে কি তোমাদের সেই গীতা রয়, আর কল্পনা দত্ত পেলে নাকি যে আজই — বিদেয় হও এখান থেকে—ঢের পীরিত হয়েছে…'

আমি রাগে থর থর করে কাঁপতে থাকি! উঃ বিশ্বাসহন্ত্রী, আমায় পথে বসালে, ঠিক হয়েছে আমার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে, বাপ মায়ের মুখ চাইনি তাই না আজ পথে পথে ঝুম ঝুমি আর সাবান ফিরি করে বেড়াতে হচ্ছে, বুঝেছেন বীরেনবাবু—ঠেলা গাড়ী করে খেলনা ফিরি করে আমি পেট চালাই...যাক, রমার ব্যবহারে মর্ম্মাহত এবং নিরুপায় হয়ে শেষ কালে তার পায়ে ধরে কাঁদলুম, '—আমার ত্যাগ কোরনা রমা—তুমি ছাড়া আমার কে আছে…!…'

রমা স্বচ্ছন্দে পা গুটিয়ে নিয়ে বললে '—সবই আছে...বাপের কাছে ফিরে গেলেই পার, আমিও বাঁচি —তুমিত বাঁচই...আর শোনা, কখনো যার তার সঙ্গে ধাঁ করে প্রেমে পোড়ো না—বুঝলে...'

সে কথার আর জবাব কি দেব। অশ্রু ভরা চোখে অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকি! ও! এমন ভুল কি মানুষে করে! অনেক দিন পরে মায়ের কথা মনে পড়ল বোনের কথা ভায়ের কথা, সকলে যেন সার বেঁধে আমার সামনে আসতে লাগল; আমি যন্ত্রণায় পাগল হয়ে উঠলুম-এখন কি করব আমি? একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে কাতর ভাবে বললুম,'—তাই যাব রমা--কিন্তু তোমার এ রূপ আমি মনে করে নিয়ে যেতে পারব না--আমি যে তোমায় বড় ভালবাসি রমা, আমি তোমার সেই স্যাণ্টা ক্রুজের প্রেমময়ী রূপ মনে রাখতে চাই যবে রমা—জন্মের মত স্যাণ্টা ক্রুজে আমাদের মিলন কুঞ্জে যাবে? সেই খান থেকে আমায় হাসি মুখে বিদায় দেবে আমি হাসির ছবি বুকে এঁকে নিয়ে চলে যাব...'

অনেক বাদানুবাদ করে অবশেষে সে রাজী হল। এমনি এক সন্ধ্যার সময়ে তাকে নিয়ে এইখানে এলুম। আপনি যে পাথরটার ওপর বসে রয়েছেন ওই খানটায় তাকে বসিয়ে বুক ফাটা স্বরে তাকে জিজ্ঞেস করলুম"— 'বল রমা—একদিনের জন্যেও কি আমায় ভাল বাসনি—আমার টাকা শোষণ করতেই এতকাল কি কেবল অভিনয় করে এসেছ! বল রমা বল...'

অল্পে অল্পে রমার মুখের সেই কাল মেঘ খানা সরে গেল--একটু স্মিত মুখে সে বললে,'—না সনত তোমায় যে একেবারে ভাল বাসিনি তা নয়, মেয়ে মানুষ একেবারে ভাল না বেসে শুধু অভিনয় করতে পারেনা-তবে তারা দীর্ঘ কাল ধরে একজনের মধ্যেই ভালবাসাটা শেষ করে ফেলেনা, যেমন তোমরা কর....'

উঃ— মনের ওপর কে যেন চন্দন ছিটিয়ে দিলে। রমা তাহলে ভালবাসে- আমায় কি আনন্দ, উল্লাসে চীৎকার করে উঠলুম '—তাহলে তুমি এখনও আমার সম্পত্তি—তোমায় মারতে পাপ নেই তাহলে...'

রমা সভয়ে বলে উঠে, 'সে কি!'

আমি পাগলের মত বলি 'হ্যাঁ রমা তোমায় ত প্রাণ ধরে অন্যের হাতে দিতে পারব না তোমায় আজ মুক্তি দেব। ওই যে নীচে একটা বড় খাদ রয়েছে, দেখনা রমা ভারী সুন্দর খাদ—ওর মধ্যে তোমায় লুকিয়ে রাখব। কেউ খুঁজে পাবে না তোমায়-কেউ কেড়ে নেবে না আর; রোজ সন্ধ্যে বেলা তোমার সঙ্গে গল্প করতে আসব— কেমন?'

নিদারুণ ভয়ে রমা কেঁদে ওঠে 'আমায় মেরে ফেলবে! সানু এই তোমার ভালবাসা আমায় ভুলিয়ে এনে মেরে ফেলতে চাও, কি হবে! ওরে বাবারে কেন এলুম তোমার সঙ্গে,--সানু আমায় বাঁচাও আমি তোমার সব টাকা ফিরিয়ে দোব। বাঁচাও—আমায় বাঁচাও-'সে আমার পায়ের গোড়ায় লুটিয়ে পড়ল।

কঠিন পাথর থেকে মমতা ভরে আমি তার তুল তুলে দেহটি তুলে ধরে বললুম 'ভয় পেয়েছ রমা?'

সে আমার বুকের ওপর এলিয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'হ্যাঁ আমি অজ্ঞান হয়ে যাব, বাড়ী চল সানু।'

তার সেই কাতর কণ্ঠস্বরে আমার দুই চোখ জলে ভরে এলো; সাদরে তার কম দেহলতা বুকে ধরে বললুম,—'তা যে হয় না রমা, দুবার ভুল করতে ত পারিনা। তোমার জন্যে বাপ মা ত্যাগ করেছি-তবু তোমায় ত্যাগ করিনি। তোমার জন্যে আজ আমায় ত্যাগ কোরব আমার প্রাণ আমার রমাকে মেরে ফেলব'-

আমার দারুণ পেষণে সে যন্ত্রণায় চীৎকার করতে লাগল, '—কে আছ বাঁচাও বাঁচাও' একটু পরেই সে আমার বুকের মধ্যে নেতিয়ে পড়ল? কঠিন আলিঙ্গন শিথিল করে দেখলুম সে অচেতন হয়ে গেছে; চোখের পাতা তখনো কাঁপছে—মেঘের মত চুল এলিয়ে পড়েছে।

গলার সরু চেনটা ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেছে দেখে আবার সেটা পরিয়ে দিলুম, বিস্রস্ত বসন যথাযোগ্য স্থানে ঠিক করে পরিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ তার ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে রইলুম! সুন্দর—অতি সুন্দর—কোথাও কোন পাপের রেখা নেই, সদ্য ফোটা কমলের মত সে মুখ লাবণ্যে চল চল করছে, আমি অতি যত্নে—অতি সাবধানে তার

ঠোঁটের ওপর চুমো খেয়ে কেঁদে উঠলুম, "—কেন এ দুর্মতি তোমার হ'ল রমা? সে কি আমার চেয়ে তোমায় ভালবাসত, সে লোহার ব্যবসাদার সে প্রেমের ব্যবসার কি জানে। ওই অনন্ত সমুদ্রের অতল গর্ভে আমার সাত রাজার ধনকে লুকিয়ে রাখব, আমার রমা আমারই থাকবে—তাকে কিছুতেই দেবনা—দিতে পারবনা; যাও রমা যাও—ওই ঠাণ্ডা খাদের কোলে ঘুমিয়ে থাক, লুকিয়ে থাক—আমি তোমার কাছে লুকিয়ে দেখা করে যাব—রমা—রমা'…নীচের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার সময়ে তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল; উড়ন্ত অপ্সরার মত পড়তে পড়তে সে একবার ডেকে উঠল "সানু"… তারপর অস্ফুট একটা ছপ করে জলে পড়ার শব্দ হল—ব্যস, আর কিছু শুনতে পেলুম না, হেঁট হয়ে দেখলুম—অন্ধকার—গভীর খাদ হাঁ করে রয়েছে, আরো চায় আমাকেও গ্রাস করতে চায়,—লাফিয়ে পড়বার উপক্রম করছি হঠাৎ মনে হল—বহুকাল—বহুকাল-পরে মা যেন পেছন থেকে ডাকলেন "যাসনি সনত পড়ে যাবি," স্পষ্ট শুনেছিলুম—সত্যি বলছি বীরেন বাবু—আশ্চর্য্য ব্যাপার—ফিরে দেখলুম—ওয়্যারলেশের ওই বড় বড় পোষ্ট গুলো বিভীষিকার মত অন্ধকারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে …আর কেউ নেই।'

আমি ঘেমে উঠলাম। নারীহন্তা! তারই সঙ্গে এতক্ষণ সমুদ্রতীরে বসে রয়েছি—আর শুনছি তার হত্যার কাহিনী; আমার চিন্তায় বাধা দিয়ে সনত আবার বলতে লাগল, 'সবই বললুম আপনাকে—হয়ত মনে মনে আমায় ঘৃণা করছেন—পুলিশে ধরিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন, কিন্তু যাই করুন, তার আগে আপনি এই অভিশপ্ত দেশ ছেড়ে চলে যান, রমার বোন সুষমা আপনাকে জালে জড়িয়েছে ওদের বংশের এই রীতি, আমি জানি বীরেন বাবু আপনার মা আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন—ফিরে যান —যত শীঘ্র পারেন সুষমার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করুন; আরো শুনে রাখুন আপনার ভগ্নীপতি বিমল বাবুকে সুষমা মন্ত্রমুগ্ধ করেছে, তার রক্ষা নেই—পারেনত আপনার বোন-কেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন…যান রাত হয়ে গেছে ট্যাক্সি-ওয়ালা ঘন ঘন হর্ণ দিচ্ছে' যান আর দেরী করবেন না।…

আমি যেন বিদ্যুতের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠি—ঠিক! নানখাতাই চুরিটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। ব্যাকুলভাবে বললুম 'আমি কালই কলিকাতা ফিরে যাব—কিন্তু বিমলকে বাঁচাবার কি কোন উপায় নেই'… ?

ক্ষুব্ধ গম্ভীর কণ্ঠে সনত বলে, 'না অক্টোপাসের মত সহস্র বাহুতে সে বিমলকে ঘিরেছে—তাকে টেনে আনবার চেষ্টা করেছিলুম—পারিনি—যান যান—আপনার জন্যে রমা আসতে পারছে না'…

সভয়ে বললুম,—'রমা কোত্থেকে আসবে—এঁ্যা'…

সনত হো হো করে হেসে উঠল,'এই যে বলছিলেন ভুত বিশ্বাস করেন না? রমা এইখানেই আসবে—ওই যে খাদের জলে তরঙ্গ উঠেছে, শুনতে পাচ্ছেন না—বাঁশীর মত সুরে সে ডাকতে ডাকতে আসছে সানু সা-নু…'

জীবন সন্ধ্যায়

শ্রীকণা বোস্

বিদায় বেলায় তোমার কাছে
ক্ষমা আমি আজি চাই।
মোর জীবনের সন্ধ্যা ঘনায়
সময় আজি যে নেই॥
হয়'ত কখনও অজানিত ভাবে
ব্যথা দিয়েছিনু মনে।
নিঝুম সন্ধ্যায় সেই কথা আজি
মনে জাগে ক্ষণে ক্ষণে॥
বন্ধু আমার! প্রিয়ে গো আমার
তোমাকেই ডেকে বলি।
যতটুকু ব্যথা দিছি তব প্রাণে
সেইটুকু যেও ভুলি॥
ক্ষম অপরাধ ত্রুটি বিচ্যুতি,
ভুল, আর পরমাদ।
মনে রেখো শুধু প্রণয় আমার
এইটুকু মোর সাধ।
তোমাকে আমি কি-ই বা দিছি
আমি-ই বা আজ কিবা পেনু।
পেয়েছি আমি, তব প্রেম, ভালবাসা
তোমাকেই শুধু ব্যথা যে দিনু॥

ঠাট্টা

শ্রীঅমলা দেবী ও শ্রীবিমলা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅমলা দেবী

১২

নিস্তার ঝি কাপড় কেচে শুকুতে দিচ্ছিল, সুষমা ঘর থেকে তাড়া দিয়ে উঠল—"আজকাল কি বিচ্ছিরী কাপড় কাচা হয়েছে তোমার, ভাল করে নিগ্‌ড়ে ঝেড়ে শুকুতে দাও।"

বলতে বলতে সুষমা বারাণ্ডায় বেরিয়ে আসতেই দেখল রমেশ এসেছে– "আজ কার মুখ দেখে উঠেছি! কি সৌভাগ্য আমার যে তুমি এলে!"

বলতে বলতে সুষমা রমেশকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। একটা চেয়ারে বসে পড়ে রমেশ বললে—"সেদিন যে আপনি আসতে বললেন, তাই।"—

কথাটা শেষ না করতে দিয়েই সুষমা বললে—"তাই বুঝি এত শিগগির এলে!"

সুষমার ধারণা ছিল রমেশ ওর আপনার, উমা অনর্থক মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু এতদিনে ও বুঝতে পেরেছে, রমেশের বন্ধন রজ্জু ওর হাতে নেই!

ওকে ছেড়ে দিতে ওর অন্তর পরাজয়ের অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে! তাই ও এবার বেঁধে নিতে চায় উমাকে দিয়ে।

ঘরে গিয়ে সুষমা ডাকল—"উমা, অ উমা, রমেশ ঠাকুরপোর জন্যে ছুটে পান সেজে নিয়ে আয় না ভাই।"

উমা এলনা, সুষমার মেয়ে হাতে পান নিয়ে এল।

সুষমা সস্নেহ সুরে বললে—"যা তোর মাসিমাকে পাঠিয়ে দে, বল কাকাবাবু এসেছেন।"

রমেশ বিস্মিত হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল, যার বসে থাকা সুষমার অসহনীয় তাকেই আজ সস্নেহে আহ্বান!

সুষমার মেয়ে ফিরে এসে বললেন—"মাসিমা সুরমা মাসিদের বাড়ী চলে গেল।"

সুষমা ঝেঁকে উঠল—"সব বিচ্ছিরী, একটু ভব্য নয়, ডাকলাম মেয়ে ফর ফরিয়ে চলে গেল।"—

সন্তোষ কোথা থেকে বেড়িয়ে ফিরল—"এই যে রমেশ বাবু ব্যাপার কি? আজ কাল ত আপনার দেখাই পাইনে।"

রমেশ একটু হাসলে—"সময় হয় না, তা ছাড়া তুমিও ত আজ কাল বাড়ীতে থাক না। বোস।

—"না, এখন আর সময় নেই, আমাকে এখুনি আবার বেরুতে হ'বে। মাপ করবেন।"

বলে সন্তোষ আলমারীটা খুলে কি একটা পকেট ফেলে বেরিয়ে গেল।

সন্তোষ বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে রমেশ বললে—"আমার আজ একটু কাজ আছে, এবার চললাম বৌদি।"

সুষমা অভিমানের সুরে বললে—"কাজত লতুর কাছে হাজরী দেওয়া! আমি রোজ মনে করি যে আজ তুমি আসবে, আর তুমি রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে ফিরে যাও; একবার মনে পড়ে না যে বৌদি আছে কি মরেছে!"

রমেশ ও কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুরুটটা ধরিয়ে তাতে একটা টান দিয়ে বললে "তারপর আপনার সেই কি একটা বিশেষ কথা আছে সেটা বলে ফেলুন শুনে যাই।"

—"থাক আর বলতে হ'বে না; আমার কথা শুনবার জন্যে তোমার কোন মাথা ব্যথা নেই সে জানি, কিন্তু কথাটা আমার বিষয় নয় তোমারি।"—

—"আহা রাগ করছেন কেন বৌদি আমি ঠাট্টা করছিলাম। তার পর বলুন।"

সুষমা খানিকটা চুপ করে থেকে পরে বললে—"বাবাকে তোমার কথা বলেছিলাম, প্রথম বারে কিন্তু

কিন্তু ভাব ছিল, কিন্তু এবার আর অমত নেই, আর উমা ওত মস্ত বড় হয়ে গেছে তাই বোধ হয় তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলতে চান। যাই হোক খুড়িমার মতটা নেবার জন্যে আমি একখানা চিঠি লিখে দিই, কি বল?"

সুষমার কথা শুনে রমেশের মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল, ও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে বললে—"আপনি আপনার বাবার মত নেবার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করলে ভাল হ'ত। অতদিনকার পুরোনো কথা নিয়ে হৈ হৈ না করলেই পারতেন। আপাততঃ এখন আমি বিয়ে কোরবো না, ভবিষ্যতে দেখা যাবে। যাই হোক উমার জন্যে আপনারা খুঁজলেই আমার চেয়ে অনেক অংশে যোগ্য পাত্র পাবেন।"

সুষমা রমেশকে সুসংবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করতে চাইছিল; হঠাৎ এ অস্বাভাবিক উত্তরে কি রকম অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

—"তুমিই ত প্রথম বলেছিলে ভাই তাই আমি বাবাকে বললাম।"—

"হঠাৎ না ভেবে ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছিলাম, আমার ত অবস্থা তত ভাল নয়, আমায় মাপ কোর বৌদি।"

বলে রমেশ সুষমাকে আলগোছে একটা প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ল।

দুপুর বেলায় সাজ শেষে সাড়ীর আঁচলটা ঠিক করতে করতে বেরিয়ে এল, পাশের ঘরে উমা বসেছিল দরজার সামনে এসে সুষমা বললে—"আমি একবার মজুমদারদের বাড়ীটা ঘুরে আসছি।" সুষমা চলে গেল।

উমা একখানা মাসিক পত্রিকা নিয়ে পড়তে লাগল। অনেকক্ষণ কেটে গেছে পড়তে পড়তে একটু তন্দ্রা মত এসেছে হঠাৎ সুরমার হাসির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল, চেয়ে দেখল সুরমারা দাঁড়িয়ে, উমা একটু মৃদু হেসে বললে —"কতক্ষণ এসেছিস ভাই?"

—"অনেকক্ষণ, তুই ত খাসা ঘুম দিচ্ছিলি!" ওরা তিন জনেই উমার পাশে বসে পড়ল।

লতু বললে—"তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করলাম ভাই আমরা এসে।"

—"না, না, ব্যাঘাত আর কি!" বলে উমা হাসল।

ওরা গল্প করছিল, এক সময় লতু উঠে খাটের ও-পাশের জানালার ওপর রাখা বই ক'খানা নিয়ে নাড়া-চাড়া করে দেখতে দেখতে হঠাৎ একখানা বই তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে এসে বসে উমাকে জিজ্ঞেস করল— "তোমার বুঝি এই ধরণের গল্প গুলো বড্ড ভাল লাগে?"

—"ভাল লাগে নি পড়ে, তবে ও ধরণের প্রশ্নটা সব মানুষেরই মনে জাগে, তারই ঝোঁকেই কেনা।"

সুরমা বই খানাকে হাতে নিয়ে একবার দেখে আবার রেখে দিল—"কি জানি ভাই ও-ধরণের বই আমি অনেক পড়েছি কিন্তু মীমাংসাত কিছুই হয় না।"

উমা হাসলে—"যা বলেছিস ভাই বইতে দেখি ওদের বিপদ, উইল, দেনা, পাওনা, এমন কি সান্ত্বনা দিতে পর্য্যন্ত পরলোক থেকে সব ছুটে ছুটে আসে কিন্তু আমাদের ও ত অনেক রকমে দিন কাটছে কই একবার কেউ এসে সান্ত্বনা চুলোয় যাক, দাঁত খিঁচিয়ে ও যায় না।"

—"আমাদের গুলো ছাই হবার সময় তাদের আত্মা গুলো ও ছাই হয়ে গেছে। ওদের সব জ্যান্ত আত্মা কি না!"

বলে একটু ম্লান হাসি হেসে সুরমা চুপ করে গেল।

নিতাই মিত্তিরের মা তারা সুন্দরী এসে বসলেন, বয়স প্রায় সত্তর, ওঁদের যুগে ওঁর শিক্ষিতা বলে হয়ত একটু খ্যাতি ছিল, তারপর অনেক বছর কেটে গেছে যুগের ও পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু উনি যে শিক্ষিতা লোকে বলেছিল সে কথা উনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না।

—"সুষমা কই!"

তারাসুন্দরী জিজ্ঞেস করলেন।

"—দিদি মজুমদারদের বাড়ী গেছে ঠাকমা।"

উমা—বল্লে।

তারাসুন্দরী লতুর সঙ্গে গল্প করতে করতে হাত বাড়িয়ে বল্লেন—"হ্যাগা ও কি বই? দেখি।"

লতু ওর হাতে বই খানা দিয়ে বল্লে—"পরলোক সম্বন্ধে লেখা।"

—"পরলোক সম্বন্ধে—!"

বলে তারাসুন্দরী একটু কৃপা মিশ্রিত হাসি হাসলেন।

—"আপনি বিশ্বাস করেন?"

সুরমা জিজ্ঞাসা করল।

—"কি করে বিশ্বাস কোরব বল! এই আমাদের দেখনা কত প্রাণে প্রাণে ভাল বাসা ছিল তার পর এই দশ বছর হয়ে গেছে, কিছুই নেই।"

বলে তারা সুন্দরী বই খানার পাতা উল্টিয়ে বার্দ্ধক্য জানত বক্র ক্ষীণ দৃষ্টিতে পড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন। ওরা পরস্পর পরস্পরের দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। ওরা সবাই মনে মনে স্থির করেছিল কেউ কারুর মুখের দিকে চাইবে না কিন্তু মনের অজ্ঞাতেই অকস্মাৎ লতু উমার দিকে চাইল উমাও অন্যমনেই ওর দিকে চেয়েই হাসিতে ফেটে পড়ল, সুরমাও হেসে উঠল।

তারা সুন্দরী ওদের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—"কি হ'ল গা, অত হাসছ কেন?"

অপ্রস্তুত সুরমা হাসি থামিয়ে বললে—"থাম বাপু, তখন থেকে জ্বালিয়ে মারলি। কিছু নয় ঠাকমা এই আমি উল্টো জামাটা পরে এসেছি বলে তখন থেকে হাসছে।"

তারাসুন্দরী কট মট করে ওদের দিকে চেয়ে রইলেন।

বাইরে সুষমার মেয়ে নন্দরাণী—চৌধুরীদের ভুতির সঙ্গে পুতুল খেলায় ব্যস্ত ছিল, সুষমা বেড়িয়ে ফিরল, নন্দরাণীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে—"নন্দরাণী—খোকাকে একটু নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেনা মা।"

নন্দরাণী সানুনাসিক সুরে বললে—"সারাদিন আমিই নিয়ে থাক্‌ব?—"

সুষমা জ্বলে উঠল—"ভারি বজ্জাত! একটু আমার ছেলেকে দেখতে পারে না. যখুনি নিতে বলব তখুনি ঐ সুর। মেরে হাড় ভেঙে দেব। নে শিগগির।"

নন্দরাণী নাকি সুরে আঁ আঁ করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে খোকাকে কোলে টেনে নিল।

সুষমা নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে একবার উমার ঘরে উঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—"এই যে ঠাকমা কতক্ষণ?"

—"অনেকক্ষণ এসেছি ভাই। বলি আমার সতিন না হ'লে কি আর জমে, তখন থেকে ছটফট করছি।"

—"আসুন ঠাকমা আমার ঘরে।"

সুষমা তারাসুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

পরক্ষণেই ও-ঘর থেকে তারাসুন্দরীর তাঁর পুত্রবধূদের ও সুষমা উমার আদ্যশ্রাদ্ধের আয়োজন শোনা গেল।

ও-ঘর থেকে কথা বেশ শোনা যাচ্ছিল. অসহ্য হয়ে উমা বললে—"চল সুরমা তোদের বাড়ী যাই।"

ওরা ও অস্বস্তিতে ভরে উঠেছিল, সুরমা বললে—"চল।"

ওরা তিনজনে সুরমাদের বাড়ী এল।

মৃণাল রুনুর পাশে শুয়ে শুয়ে মহাভারত পড়ছিল।

ওরা তিনজনে এসে মৃণালের পাশে বসল।—"চেঁচিয়ে পড়না বৌদি, আমরা ও একটু ধর্ম্মকথা শুনে স্বর্গের পথ পরিষ্কার করি।"

উমা বললে

—"অত ধর্ম্মে মন দিতে হবে না।"

বলে মৃণাল মহাভারত খানা লতুর হাতে দিয়ে—"তুই পড় না ভাই, আমি চেঁচিয়ে পড়তে পারি না।"

লতু পড়তে লাগল।

ওদের পড়ার মধ্যে মলয় এসে বলল—"মহাভারত পড়ছ? পড় ওতে অনেক জিনিষ আছে।"

লতু পড়া থামিয়ে বই খানা বন্ধ করে রেখে বললে—"মহাভারত আমাদের সকলেরই আগে পড়া, তবে পড়বার কিছু হাতের কাছে নেই. তাই ব্যাসের শ্রাদ্ধ হচ্ছে!"

পানের সজ্জার পাশে আজ ক'দিন হ'ল সুরমা সুপুরী কুচিয়ে ফেলে রেখেছিল সেটা আর তোলা হয় নি, মলয় সেই দিকে চেয়ে বললে—"সুরমা দ্রৌপদী সত্যভামার সংবাদটা পড়েছ?"

সুরমার হাসি পেল, মুখ তুলে প্রশ্ন করল—"কেন বলুন ত? সমস্ত মহাভারত খানা যদি শেষ করে থাকি তবে ওটাও নিশ্চয় পড়েছি।"

—"দ্রৌপদী সত্যভামার সংবাদ যদি পড়েছ, তবে ওটার মানে কি? আজ পাঁচ দিন ধরে দেখছি থালার সুপুরী থালাতেই পড়ে আছে আর তার ওপর ধুলো পড়ছে।"

বলে মলয় থালার দিকে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করলে। সুরমা চুপ করে গেল, উত্তর দিল না। উত্তর দিল লতু হেসে বললে—"সুরমার কোন বুদ্ধি নেই,শুধু অত বই গিললে কি হ'বে। আমি যেদিন প্রথম অভিজ্ঞান শকুন্তলা পড়ে ছিলাম, সেদিন সমস্ত রাত পদ্মের পাঁপড়ীতে শুয়ে বালিশের গলা জড়িয়ে 'হলা পিও সহি' বলে ডেকে ডেকে সারা হয়েছিলাম।"

মলয় লতুর কথায় মনে মনে চটে উঠলেও; বাইরে সে ভাব প্রকাশ করলে না; মেয়েদের ও আঘাত করতে পারেনা।

১৩

—"সুরমা একখানা বই দিয়ে তার পর তুই কাজ করতে যাস। ভাল লাগছে না।"

বলে লতিকা লম্বা হয়ে খাটের ওপর শুয়ে পড়ল।

সুরমা বই গুলো নাড়াচাড়া করতে করতে একখানা বই টেনে লতিকার হাতে দিল—"দেখ দিখি, এ খানা বোধ হয় পড়া।"

—"এ খানা আগে পড়েছি যদিও, তাহোক দে, আবার পড়া যাক।"

সুরমা লতিকার হাতে বই খানা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ—দরজার চৌকাটের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে বাইরের দিকে ইঙ্গিত করে বললে—"ঐ আসছেন ভাল লাগাবার লোক।"

তাড়াতাড়ি উঠে বসে লতিকা উঁকি মেরে বাইরের দিকে চাইতেই রমেশকে দেখতে পেল। সুরমার দিকে অপ্রস্তুত ভাবে কটমট করে চেয়ে বললে—"পোড়ামুখী।"

সুরমা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

রমেশ ঘরে ঢুকল—"কাকে গাল দেওয়া হচ্ছে?"

—"মা-ভৈঃ আপনাকে যে নয় সে আমি তামা তুলসী হাতে নিয়ে বলতে পারি।"

—"ছোট বেলায় গল্প শুনেছিলাম ঝগড়াটী বামনী ব্রহ্ম দৈত্যকে মারে নি, মেরেছিল বেল গাছকে, কিন্তু সেই বেল গাছের প্রহারেণ দেখে ব্রহ্মদৈত্য দেশত্যাগী, আমারও প্রায় তাই হয়েছে কিনা!"

—"আহা কি কথাই বললেন, আমি বুঝি তেমনি ঝগড়াটী।"

—"ঠিক তেমনি নও কাছাকাছি।"

লতু কৃত্রিম রাগতঃ স্বরে বললে—"বেশ।"

চেয়ারটা টেনে নিয়ে তাতে বসে পড়ে রমেশ খাটের ওপর থেকে বইখানা তুলে নিয়ে তার পাতা উল্টে দেখতে লাগল।

সুরমা ঘুরতে ঘুরতে এসে বসল,

লতু হেসে জিজ্ঞাসা করল—"হল রে তোর কাজ?"

--"না এখনও হয় নি।"

সুরমা বল্লে।

—"সুশান্ত কবে ফিরবে কিছু লিখেছে?"

রমেশ জিজ্ঞেস করল।

"দাদার এখনও ফিরতে বোধহয় দিন কয়েক দেরী হবে।"

"ওঃ।"

বলে রমেশ বাইরের দিকে চাইতেই অযাচিত ভাবে সুরমার আবির্ভাব হল।

সুরমা এসে ঘরে ঢুকল।

রমেশ হেসে বল্লে—"এই যে বৌদি, এস এস।"

"আর এসো এসো বলতে হবেনা তার চেয়ে যাও যাও বল শোনাবে ভাল।"

বলে সুষমা সুরমার পাশের চেয়ারে বসে পড়ে বল্লে—"মাপ কোর ঠাকুরপো। আমি জানতাম না যে তুমি এসেছ, তা যদি জানতাম, তাইলে এমন অসময় এসে কষ্ট দিতাম না, আমি এসেছি সুরমা কি একটা নাকি অপূর্ব্ব সেলাই করছে বিপিন বলছিল তাই দেখতে; দেখি সুরমা বার করত সেটা।"

সুরমা সেটা উঠে গিয়ে ওঘর থেকে নিয়ে এল।

সুষমা হাতে নিয়ে বার কতক নাড়া চাড়া করে টেবিলের ওপর রেখে দিল—"ওঃ এই, এত আমিও করেছি, আমি বলি না জানি কি করেছিস।"

রমেশ হাত বাড়াল—"দেখি আপনাদের কিসের গবেষণা হচ্ছে।"

রমেশ সেখানাকে নিয়ে কোণদুটো ধরে মুখের

সমনে তুলে ধরল—"বাঃ, বৌদি ভয়ে বলবো না নির্ভয়ে? আপনার চাইতে সুরমার টাই ভাল হয়েছে; আপনার আঁকা আর রংয়ের দোষে মাড়োয়ারী মাড়োয়ারী হয়ে গেছে!"

সুষমার মুখ খানা মুহূর্তের জন্যে ম্লান হয়ে গেল, পরক্ষণেই সামলে নিয়ে একটু হাসল।

"তোমাকে কষ্ট দিলাম ঠকুরপো, মাপ কোর, আমি জানতাম না তুমি এসেছ নইলে আসতাম না; এবার চললাম প্রাণ খুলে গল্প কর।"

বলে সুষমা উঠে দাঁড়াল।

সুরমা বললে—"আর একটু বোস না সুষমা দি।"

"না ভাই রমেশ ঠাকুর পো মনে মনে গাল দেবে!"

"হুল না ফুটিয়ে আপনি কথা কইতে পারেন না, না বৌদি?"

বলে রমেশ হাতের বইখানা খুলে দেখতে লাগল।

সুষমার মুখে একটা ক্রুর হাসি ফুটে উঠল; উঠে পড়ে সুরমার পিঠে একটা চড় মেরে বললে—"জানিস-বিপিন, রমেশ ঠাকুরপো সবাই যে তোর কাজের দিকে দিকে প্রশংসা করে সেটা শুধু তোর কাজের নয় তোর বয়স কম কিনা তাই।"

—বলতে বলতে সুষমা বেরিয়ে চলে গেল।

অপমানে রাগে সুরমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে উঠল।

খানিকটা শুব্ধ হয়ে বসে থেকে তার পর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সুরমা চলে যাবার পর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে ছিল, প্রথম কথা কইল লতিকা—আচ্ছা আপনি এখানে আসেন বলে ওর এত গাত্রদাহ হয় কেন?"

"ওটা ওর স্বভাব।"

"স্বভাব! স্বভাব ছাড়া আর কিছু নয়?"

লতু একটু হেসে ওর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল।

রমেশ লতিকার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে তার পর বললে—"মাপ কোর, স্বভাব ছাড়া আর কিছু আছে কিনা সে কথা কখন ভেবে দেখিনি, দেখবো ও না। আমি ওকে নিজের দিদির মত শ্রদ্ধা করে মিশেছিলাম অতএব আশা করি আর কখনও ও ধরণের কথা তুমি আমার বলবে না।"

লতু অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে গেল।

রমেশ আপন মনে বই খানা পড়তে লাগল।

নিস্তব্ধতার মধ্যে বহুক্ষণ কেটে গেল।

প্রথম কথা কইলে লতিকা।

লতিকা রমেশের চেয়ারের পিঠের কাছে উঠে এসে বললে—"বেশ বই খানা নয়? আমি শিগগির বাড়ী ফিরে যাব।"

ও লতুর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হাতের বই খানা দেখিয়ে বললে "বই খানার প্রশংসার সঙ্গে তোমার বাড়ী ফিরবার কথা বলার কি সম্পর্ক—? তুমি কি মনে মনে ঠিক করছ যে তোমার বিচ্ছেদে আমি এই রকম এক খানা 'স্মরণ' লিখে ফেলব।"

"আহা আমি যেন তাই বলছি।"

বলতে বলতে লতিকা সরে যাচ্ছিল, রমেশ চট করে ওর হাত খানা চেপে ধরল—"তাত তুমি বলছ না, কিন্তু কি বলতে চাও সত্যি কথাটা বলে ফেল দেখি।"

—"আঃ কি পাগলামী হ'চ্ছে!"

বলে লতু নিজের হাতখানা রমেশের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার বার কতক ব্যর্থ চেষ্টা করে, চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে বল্লে—"কি বলব?"

—"তোমার মনের সত্যি কথাটি, কি আমি বলছি সেটা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পেরেছ, এত বোকা নও যে বুঝতে পারবে না।"

—"জানি নে।"

—"সত্যি জান না?"

—"নিজের মনকে কি সব সময় ঠিক বোঝা যায়?"

"—না, যায়না, তবু আজকের মন তোমার কি বলছে সেইটে বল।"

বলে রমেশ ওর হাতখানা ছেড়ে দিল।

লতিকা সরে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ চাপা দিল।

"—আমার কথার উত্তর দিলে না লতু?"

রমেশ জিজ্ঞাস করল।

—"সত্য কথা জেনে কি লাভ?"

রমেশ হেসে উঠল—"লোকসান কিছু নেই লতু।"

"—যদি বলি না।"

"—তবে দুঃখে হার্টফেল কোরব না, তবে একটু দুঃখ হবে।"

লতু হেসে বাইরের দিকে চাইল, চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সুরমা এসে ঢুকল।

সুরমার আগমনে ওদের কথার স্রোত বন্ধ হয়ে গেল। ওরা দু'জনেই চুপ করে বসে রইল, লতু আপনমনে টেবিলের ওপর থেকে ছুরীটা তুলে নখ পরিস্কার করতে লাগল আর রমেশ বইখানার পাতা উল্টে যেতে লাগল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সুরমা বিস্মিতভাবে লতুর দিকে চাইল—"আজ ব্যাপার কি লতুদি, তোমরা সবাই মৌনব্রত নিয়েছ নাকি?"

লতু হেসে বললে—"কি কথা বলবো?"

এবার রমেশ হেসে উঠল, বললে—"কি কথা বলবে সেটাও সুরমাকে শিখিয়ে দিতে হবে নাকি?"

লতিকা কৃত্রিম বিরক্ত মুখে বললে—"হ্যাঁ হবে বৈকি? ভাগ্যিস তোমার মুখখানা ছিল নইলে।—"

কথায় বাধা দিয়ে রমেশ বললে—"নইলে এতক্ষণ লতিকা দেবীর পদ্মহস্ত আমার কণ্ঠ চেপে ধরে বাড়ীর বাইরে দিয়ে আসত!"

"—কথা কোয় না।"

"—যো হুকুম।"

বলে রমেশ আপনমনে পা নাচাতে লাগল।

সুরমা হেসে উঠল—"লতুদি অত মাথা ঘামিয়ে ইস্কুল কলেজ ঘুরে এত বছর ধরে, পরীক্ষাগুলো না দিলেই ত' হ'ত, তারচেয়ে ঘরে বসে বসে ঝগড়ার পরীক্ষা দিলেই ত' তুমি খুব বড় একটা ডিগ্রি পেয়ে যেতে!"

লতু হাসি মুখে বললে—"সবাই একদলে, আমিই শুধু একলা! কলিকাল!"

রমেশের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, সুরমা শূন্য কাপটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল, রমেশ সুরমার দিকে চাইলে—"এবার আমিও উঠি।"

"—এখুনি?"

"—আর এখুনি কি অনেকক্ষণ এসেছি।"

রমেশ চলে গেল।

১৪

উমা চা তৈরী করছিল, সুষমাও পাশে বসে মেয়ে নন্দরাণীর চুল বাঁধছিল, সন্তোষ এসে বসল। একথা সে কথার পর সুষমা বললে—"কাল সুরমাদের বাড়ী গেলাম, সেই যে বিপিন বলছিলনা যে সুরমা কি একটা সেলাই করেছে খুব সুন্দর, সেইটে দেখতে, গিয়ে দেখি রমেশ বসে, সুশান্ত নেই কিন্তু রমেশ রোজ ঠিক হাজরী দিচ্ছে। লতুর সঙ্গে আজকাল খুব দহরম মহরম চলছে।" বলে সুষমা একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসল।

সন্তোষ ভ্রূকুঞ্চিত করে ওর কথা শুনছিল, বিপিন এসে ডাকল—"সন্তোষ সন্তোষ" সুষমা ওঘরে বসে বলতে লাগল—'সুরমাটাকে এতকাল ভাল মানুষ বলে মনে করতাম, কিন্তু ও কম মেয়ে নয়। বা বাঃ খাসা ওদের মধ্যে বিন্দে দূতি সেজে বসেছে।'

বলে ওদের দুজনের মুখের দিকে চেয়ে হাসল।

সন্তোষ ভ্রূকুঞ্চিত করে সুষমার দিকে চাইল—'এখন চা হ'ল না? যেমন লতু তেমনি উমা দুটোই মহা স্মার্ট!'

এ ঘরের কথা সমস্তই ওঘরে উমার কানে যাচ্ছিল, রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে, প্রতিদিন শোনা অভ্যাস তবুও।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকার পর মাথাটা একটু স্থির হয়ে এল, উমা আবার চা ছাঁকায় মন দিলে।

সুষমা এসে দাঁড়াল—"চা হল রে?"

উমা কোন উত্তর না দিয়ে দুটো কাপ ওর দিকে এগিয়ে দিলে।

সুষমা চায়ের কাপ দুটো তুলে নিয়ে যেতে যেতে বললে —"আমার চা টা দিয়ে যাস।"

সুষমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল, বিপিন ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল হঠাৎ দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল, উঠানে তুলসীতলায় ফুল বেলপাতার মধ্যে মাটির শিব পড়েছিল, উমার দুর্ভাগ্য আজ সকালে উঠে হঠাৎ কি মনে হ'ল তাই শিব পূজো করে সেটা তুলসী তলায় রেখেছিল।

তুলসীতলার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বিপিন বললে "—আজকাল আপনি বুঝি শিব পূজো করেছেন? যাক এতদিন পরে আপনার ধর্ম্মে কর্ম্মে মন দেখে সুখী হ'লাম!"

সুষমা বিদ্রূপভরে হেসে উঠল—"হ্যাঁ আমি এত কি অধর্ম্ম করেছি যে সকালবেলায় উঠে শিব পূজো কোরব!"

"—তবে উমার বুঝি ধর্ম্মে মতি হয়েছে?"

বিদ্রূপের হাসি হেসে সন্তোষ বললে--"শিবপূজো করছেন? যত সব ন্যাষ্টি ভালগারিটি ওর মধ্যে আছে!"

বিপিন সন্তোষ দু'জনেই বেরিয়ে এল, বিপিন মাটির গড়া শিবটা তুলে এনে চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর রেখে রেকাবখানাতে মাটির শিবটা রেখে নেড়ে চেড়ে দেখে দেখে ইঙ্গিতে নানারকম গবেষণা সুরু করে দিলে।

সে গবেষণা এতই গভীর অর্থপূর্ণ যে মিস মেয়োও হার মানবার উপক্রম!

বিপিন সন্তোষ সুষমার মিলিত হাসির শব্দ ভেসে আসছিল, উমা রাগে অপমানে যেন কি রকম হয়ে গেল, ও চায়ের সমস্ত ফেলে আস্তে আস্তে ছাতে চলে গেল।

ছাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখে জল উপচে আসে, অপার বিস্ময়ে মনে জাগে সুষমাও নারী, ও মা-ও বটে! মলয় আজকাল রোজই সুষমার কাছে আসে, চায়ের আড্ডা ওর এখানেই বসে, সুষমার ভারী ভক্ত! সুষমা বলে—"মলয়ের একটু বুদ্ধি কম, তা হোক ও বেশ ছেলে, রমেশের মত চালিয়াৎ নয়।"

আজো মলয় এসে বসল।

সুষমা ব্যস্ত হয়ে উমাকে ডাকতে লাগল—"উমা, অ উমা আমার আর মলয়ের চা নিয়ে আয়।"

সাড়া পেলনা, শেষে রাগে গর গর করতে করতে উঠে গিয়ে দেখল চায়ের সমস্ত পড়ে রয়েছে উমা নেই। নিরুপায় সুষমা দু'কাপ চা ছেঁকে নিয়ে ফিরে এল, সন্তোষ বিপিনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

মলয় সুষমার সঙ্গে গল্প করে, কবে ওদের মেসের সামনের বাড়ীতে একটি মেয়ে থাকত, সে দেখতে খুব সুন্দর ছিল, খুব ধারাল কাটাল গড়ন মুখ চোখ, তাই তার নাম দিয়েছিল কর করে, যেবার ও পরীক্ষা দেবে সেই বার পরীক্ষায় পড়া ছেড়ে দিন রাত তার বাড়ীর দিকে চেয়ে থাকত, আর কবিতা লিখত। সে সব কবিতার খাতা এনে সুষমাকে পড়িয়ে শোনায়, আরো কত জীবনের কাহিনী, কত চোখের জলের ইতিহাস।

মিহির মোহন এসে ঢুকল, মলয় শশব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—"বসুন।"

মিহির মোহন একটু হেসে বললে—"তুমি বোস, আমি বসছি।" বলে ওপাশের চেয়ার খানাতে বসে পড়ল।

মিহির মোহনের আগমনে মলয়ের গল্প আর জমেনা। একটু উস খুস করে মলয় বললে—"এবার যাই সুষমা দি।"

—"এখুনি?"

সুষমা প্রশ্ন করল।

—"একটু কাজ আছে।"

—"আচ্ছা ঘুরে এস, আজ কিন্তু আমাদের সঙ্গে সিনেমায় যেতে হ'বে, না বললে শুনব না।"

মলয় সুষমার নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে আসার পর উমা ছাত থেকে নেমে এল, রান্নাঘরের সামনে গিয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করল—"ঠাকুর আজ সব কোথায়?"

ঠাকুর বললে—"বায়স্কোপ দেখতে দাদাবাবু জামাই-বাবু মলয়বাবু আর দিদিমণি গেছেন।"

উমার হাসি পেল—তাই সুষমা একবার ছাতে নিঃশব্দে উঁকি দিয়ে দেখে গিইছিল যে উমা বাড়ীতে উপস্থিত আছে কিনা। অনেক রাত্রে সব কোলাহল করে বাড়ী ফিরল।

পরদিন মধ্যাহ্নে মিহির সুশান্ত খেতে বসেছে, সম্মুখে বসে সুষমা পাখা নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছিল আর গল্প কর-ছিল—"কাল ভাগ্যিস মলয় ছিল,নইলে যে ভীড় হয়েছিল! মলয় ছেলেটি বেশ, আমাদের উমার সঙ্গে চেষ্টা করলে হয়।"

উমা ওপাশের জানালার ওপর বসেছিল, বললে—"কেন উমার ত এখন এমন পোড়া কপাল পোড়েনি!"

—"কি কথার ছিরি! কেন মলয় কিসে মন্দ?"

—"অত যদি ভাল লাগেত নিজে জামাই কর না।"

—"হ্যাঁ তোর আর মলয়কে ভাল লাগবে কেন! তুই করবি কোর্টশিপ করে বিয়ে।"

—"কোরবই ত।"

সুষমা এবার চুপ করে গেল।

১৮

লতিকা আনমনে বারাণ্ডায় পায়চারী করছিল, ভাঁড়ারে বসে মৃণাল কুটনো কুটছিল, সুরমা ডাল মশলা ইত্যাদির টিন গুলো ঝেড়ে ঠিক করে গুছিয়ে রাখতে রাখতে হেসে উঠল—"ঐ দেখ বৌদি সাধ করে কি বলি লতুদি একটু সুবিধে পেয়েছে কি বারাণ্ডায় ছুটোছুটি করতে লাগল।'

অপ্রস্তুত লতিকা দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল —"তোমায় গুলি করা উচিত, পোড়ামুখী!'

সুরমা আবার হেসে উঠল—"কেন বললাম বলে? আচ্ছা বেশ আর বলব না কখন, কিন্তু আমার সেমিজ দুটো তুমি সেলাই করে দাও দেখি, আবার এই ক'দিন বাদে চলে যাবে তখন আবার মন কেমন করবে যে সুরমা বলেছিল, ভালর জন্যেই বলছি!'

—"দুর্গা বল, তোমার জন্যে আমার একটুও মন কেমন করবে না; আর আমি সেমিজও সেলাই করতে পারব না!'

বলে লতিকা আস্তে আস্তে ঘরে গিয়ে ঢুকল। আপন-মনেই সেমিজটার ওপর মেসিন চালিয়ে যাচ্ছিল, রমেশ আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এসে লতুর পেছনে দাঁড়াল, লতু হাসি মুখে ফিরে চাইল—"পা টিপে টিপে আসা হ'চ্ছে, অত সহজে ঠকি নে।'

রমেশ পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে হেসে বললে —"না, তুমি ঠক না, ঠকাও সবাইকে, না লতু?'

লতিকা সেলাই বন্ধ করে উঠে এসে রমেশের চেয়ারের পাশে দাঁড়াল—"একজন ভদ্র মহিলাকে ধরে ঠগ জোচ্চোর যা' তা' বলে দিলে তুমি ভারি অভদ্র ত!'

রমেশ ওর হাতখানা চেপে ধরল—"তাই নাকি ভদ্র-মহিলা? মাপ করবেন।'

—"তুমি আরো বেশী অভদ্র দেখছি! বাঙালী হয়ে জাননা স্ত্রীলোকদের কাছে কি করে ক্ষমা চাওয়া উচিত!'

রমেশ হেসে উঠল, বললে—"ক্ষমা আর কিছুদিন বাদে সব অপরাধের চেয়ে নেব'খন!'

—"কিছুদিন বাদে কি করে চাইবে? আমি ত থাকব না!'

—"তুমি থাকবে না সে জানি, কিন্তু ক্ষমাত এখানে চাইব না, সে চাইতে যাব তোমার বাড়ীতে। ক্ষমা চাইবার রকমটা আজো ঠিক জানিনে, কারণ ইতিপূর্ব্বে কোন ভদ্র মহিলার কাছে ক্ষমা চাইনি, তবে বোধহয় পুরুত এসে বৈদিক মন্ত্রের শ্রাদ্ধ করে ক্ষমা চাওয়াবে।"

—"কেবল বাজে বক বক করছ, আমি তোমায় বিয়ে কোরবো না!"

রমেশ হেসে ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললে - 'বোস।'

—"কেন, হুকুম?"

—"হ্যাঁ।"

—"বোসব না।"

বলে লতিকা ওপাশের চেয়ার খানার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। রমেশ লতুর দিকে একবার চেয়ে, সুশান্তর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললে—"সুশান্ত হ'ল তোমার?"

সুশান্ত তোয়ালে খানাতে মুখ ঘষতে ঘষতে এসে লতুর সামনের চেয়ার খানাতে বসে পড়ল—"কি হে অত চেঁচাচ্ছ কেন, ব্যাপার কি?"

রমেশ লতিকার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে —"চেঁচাব না, চেঁচাবার কাণ্ডই যে করে তুলেছ! মশাই বোনের বিয়ের কি হ'চ্ছে? তোমার বোন যে এদিকে স্বয়ম্বরা হ'বে বলে বরণ মালাটা আমার টাক পর্য্যন্ত ঠেকিয়ে আবার ভয়ে ভয়ে সরিয়ে নিয়ে বললে দাদা কান মলে দেবে!"

অপ্রস্তুত সুশান্ত কথাটাকে ঘুরিয়ে ফেলবার জন্যে চেঁচিয়ে বললে—"সুরমা তোদের চা হল রে?

লতিকা এতক্ষণ অপ্রস্তুত মুখে সুশান্তর পেছন দাঁড়িয়ে রমেশের দিকে কট মট করে চেয়ে ছিল, এইবার বললে —'দেখি চা হ'ল কিনা!"

বলে বেরিয়ে গেল।

লতু চলে যাবার পর সুশান্ত একটু হাসলে, বললে— "তুমি ত ভারি অসভ্য!"

রমেশ কৃত্রিম দুঃখিত সুরে বললে—"ভাই বোনে জোট করে অভদ্র অসভ্য চাষা যা' ইচ্ছে তাই বলছ, কেন আমি কি করেছি? বলে নাও ভগবান তোমাদের মুখ দিয়েছেন!"

মৃণাল চা নিয়ে এল, কথার স্রোত এবার অন্য দিকে ফিরে গেল।

সুরমা লতিকা দু'জনে এল, লতিকার কোলে রুণু।
—"রুণু কি বকতেই পারে বৌদি!"

বলে লতিকা রুণুকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বসে পড়ল মৃণালের পাশের চেয়ার খানাতে। রুণু রমেশের আহ্বানে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, রমেশ ওকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্লে—"রুনুবাবু একটু চা খাবে?"

রুনু রমেশের দিকে চেয়ে বল্লে—"আর তুমি?"
—"আমিও খাব।"

রুনু দাঁত বার করে হেসে উঠল—"তুমি আমি দু' জনেই খাব।" একটু খানি চা খেয়ে রুনু আবার খানিকটা ভেবে বল্লে—"আর কালকে কি হইহিল?"

রমেশ হেসে উঠল—"কাল আমি একলা খেয়ে ছিলাম।"

রুণু ঘাড় নেড়ে জিজ্ঞেস করল—"তার পর?"

—"আজ তোমাতে আমাতে দু'জনে খেলাম।"

রুণু—আবার হেসে উঠল।

ঘর শুদ্ধ সবাই হেসে উঠল।

সুরমা বল্লে—"রুণু আমাদের খুব বড় উকিল হ'বে ওর তার পরের জেরা সহজে শেষ হয়না।"

মৃণাল হাসি থামিয়ে রুনুকে তাড়া দিয়ে উঠল—"রুণু যাও বাইরে গিয়ে খেলা করগে।"

রুণু—মায়ের মুখের দিকে একবার চেয়ে পরে রমেশের দিকে চেয়ে বল্লে—"দাঁড়াও চা খেয়ে নিই।"

মৃণাল বকে উঠল—'না চা খেতে হ'বেন', ছেলেমানুষ বেশী চা খায় না, যাও বাইরে।"

রুণু চটে কাঁদ কাঁদ সুরে—"আয়ত বাঘ মাকে হাম করে যা।"

বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

৩৬

এক খানা চিঠি হাতে করে সুষমা ঘরে ঢুকল, ভটচার্য্যি গিন্নি বসে উমার সঙ্গে গল্প করছিলেন সুষমা ওঁর পাশে বসে পড়ল।

সন্তোষ এল, ভটচার্যি গিন্নি হেসে বল্লেন—"এসো ভাই, এসো, আজ কাল ত আর দেখতেই পাই নে।"

সন্তোষ ওর কথার উত্তরে একটু হেসে সুষমাকে বললে—"দিদি বাবা কেন ডাকছিলেন তোমাকে?"

—"বাবা এই চিঠি খানার জন্যে ডাকছিলেন, পড়ে দেখ।"

সুষমা সন্তোষের হাতে চিঠি খানা দিল।

চিঠি পড়া শেষে সন্তোষ হেসে উঠল—"ওদেরও মেয়ে আছে, ওরা পরিবর্ত্ত করতে চায় তা বেশ ত এখন লিখে দাও যে আপনাদের কথা মত আমরা পরিবর্ত্ত করতে রাজী আছি, তবে আগে মেয়ের বিয়েটা হয়ে যাক তার পর ছেলের বিয়ে দেব। তার পর উমার বিয়ে হয়ে গেলে পরে বোল যে ছেলের মত নেই।"

ভটচার্যি গিন্নি এতক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে ওদের মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন, এইবার বল্লেন—"উমার বিয়ের কথা হচ্ছে? তা যে পরামর্শ দিচ্ছ ভাই ওত কোন কাজের কথা নয়, শেষে উমাকে ধরে তারা তিন সন্ধ্যে বাপান্ত করবে যে।"

সন্তোষ হেসে বল্লে—"তা সে উমা বুঝবে আর তারা বুঝবে।"

সুষমা বললে—"বাবাঃ শুধু কি আর উমাই বুঝবে আমার মাস শাশুড়ী এমন লোক নন। তিনি আমাকে শুদ্ধ ধরে বাপান্ত করে দেবেন। আমিত বাবাকে বলে এলাম যে ও পাড়াগেঁয়ে মেয়ে সন্তোষের পছন্দ হ'বেনা আর বাবারও পরিবর্ত্ত করবার বিশেষ ইচ্ছে নেই।"

সন্তোষ ঈষৎ বিরক্ত মুখে বেরিয়ে যেতে যেতে বল্লে—"তাহলে বাবা যা' ভাল বুঝবেন, তাই করবেন। বাবার পাঠা বাবাই যদি ল্যাজের দিকে কাটেন ত আমার কি বয়ে গেল।"

রাত্রে পিতার আহারের সম্মুখে বসে সুষমা বললে—"আমার মাস শাশুড়ী ত পরিবর্ত্ত করতে চান, সেত সুবিধে হ'লনা, আর উমাওত মস্ত বড় হয়ে গেছে---আর রাখা যায় না, তুমি যদি বলত মলয়ের সঙ্গে চেষ্টা করতে পারি। পাশ করা ছেলে, আর অভিভাবক কেউ নেই, দেনা পাওনার খুব সুবিধে হ'বে।"

জ্যাঠা মশায়ের আপত্তির আর কোন কারণই নেই; লোকে বলতে পারবে না অযোগ্যের হাতে দিয়েছে, পাশ করা ছেলে সংসারের অবস্থা ভাল, তার ওপর দেনা পাওনার জুলুম নেই, এমন সুযোগ মুর্খেতে ছাড়ে, কাজেই বেনীমাধব ঘাড় নেড়ে বললেন--"হ্যাঁ, হ্যাঁ চেষ্টা কর, ও ত খাসা হ'বে।

যথা সময়ে সুষমা মলয়ের কাছে কথা উথাপন করলে, মলয়ের কোন আপত্তি নেই, ও সানন্দে সম্মতি দিল।

উমাকে পাওয়া মলয়ের পক্ষে আশ্চর্য্যই শুধু নয় আশাতীত। ওর রাধারাধা ভাব উমার কাছেও কখন প্রকাশ করতে পারে নি, যদিও মনে মনে ইচ্ছা হয়েছে অনেক বার। সুরমার জীবনে পাওয়া অল্প হোক তবু পরিপূর্ণ ভাবে পেয়েছে, তাই ওর রূপে আছে স্নিগ্ধ কোমলতা, যেটার সুযোগ মলয় নিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু উমা যেন তপস্বিনী উমা,তাই এতদিন পরে সুষমার মুখে সুসংবাদ পেয়ে মলয়ের মনে হ'ল এটা বুঝি একটা সহজ পথ উমাকে স্পর্শ করবার! উমার বিয়ের কথা সব ঠিক হয়ে গেল।

উমা সুরমার কাছে গিয়ে বসল, সুরমা মৃণাল ওরা দু'জনে ছাতে বসেছিল, মৃণাল সেলাই করছিল।

সেলাইটা শেষ হতেই ফ্রেমটা খুলতে খুলতে মৃণাল সহাস্যে উমার মুখের দিকে চাইল—আর উমা বলে ডাকা নয়, এবার বৌদি!

উমা মৃণালের মুখের দিকে চায়, সলজ্জ হাসি ওর মুখে ফোটে না, ফোটে বিদ্রূপের।

সুরমা ওর ব্যথা বোঝে, ও অন্য কথা পাড়ে--লতুদি চলে গেল, বাড়ীটা যেন খালি হয়ে গেছে; দু'দিনের জন্যে এসেছিল তবু মন কেমন করছে।

এমনি এলো মেলো আরো কত কি।

অনেকক্ষণ পরে উমা সুরমার দিকে চেয়ে বললে—"লতুদির হাওয়া গায় লেগেছে দেখছি, তখন থেকে বসে বসে বকেই যাচ্ছ, আমার কিন্তু পিঠ টন টন করছে, তুমি ভাল করে বোস দেখি আমি শোব।"

উমা সুরমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল, চোখ বন্ধ করে উমা বললে—"আঃ, এই বার একটা গান আরম্ভ কর না ভাই।"

সুরমা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, ওর চিবুকটা ধরে একটু নাড়া দিয়ে হেসে বললে—"আদুরী!"

সুরমা গান গাইতে লাগল। রুণুকে কোলে নিয়ে রমেশের সঙ্গে সুশান্ত এসে দাঁড়াল।

—"বাঃ, সুরমা থামলে কেন? তোমার ত খাসা গলা, এতদিন খুব ফাঁকি দিয়েছ! আজ তোমার গান শুনবো।"

রমেশ বললে। . .

অপ্রস্তুত মুখে হেসে সুরমা বললে—
"আজ নয়, আপনার বিয়ের দিন গান শোনাব।"

—"সে দিনত শোনাবেই, কিন্তু তার আগে একটা শুনতে চাই।"

সুরমা হেসে চুপ করে গেল। মৃণাল সুশান্তর দিকে চেয়ে বললে—"রুণুকে কোত্থেকে নিলে এলে?"

—"ও বাইরে চাকরটার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল তাই নিয়ে এলাম।"

সুশান্ত রুণুকে সুরমার কোলে দিয়ে নীচে নেমে যেতে যেতে বললে—"আমার বেশী দেরী হ'বেনা রমেশ, এখুনি আসছি; আর সুরমা চট্ করে ততক্ষণ দু'কাপ চা করে দে ত ভাই।"

সুশান্ত নেমে গেল। মৃণাল উঠে পড়ল—"আমিই যাই ঠাকুরঝি চা টা করে নিয়ে আসি।"

মৃণাল নীচে নেমে গেল। সুরমাও উঠে পড়ল—"চল উমা আমরাও নীচে যাই।"

রুণুকে কোলে তুলে সুরমা উঠে পড়ল। ওরা তিন-জন সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। সুরমা প্রথম তারপর উমা একটু দূরে সুরমার পরে আসছিল হঠাৎ রমেশ ওদের দু'জনার মাঝখানের স্থানটিতে এসে দাঁড়াল; ছোট সিঁড়ি পাশা পাশি নামা যায় না কাজেই উমা দাঁড়িয়ে পড়ল, রমেশ একটু খানি দাঁড়িয়ে, সুরমা এগিয়ে যাবার পর উমার দিকে চেয়ে অস্ফুট স্বরে বললে—'আজ তোমার সঙ্গে কথা কইলে, নিশ্চয় যোগ্য অযোগ্যের কথা উঠবে না।

যাই হোক আমি বড় খুসী হ'লাম তোমার বিয়ের খবর শুনে।" বলেই রমেশ তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

স্তব্ধ উমা চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল, অনেকক্ষণ পরে ওর হুঁস হ'ল, ও আস্তে আস্তে নেমে গেল।

বাড়ী ফিরে উমা দেখল সুষমা গল্প করছে ঝিয়ের সঙ্গে, হাতে নীল কাগজে মোড়া কতক গুলো গহণা—"ওরা কিছু চায়নি, কিন্তু তাই বলে উমাকে ত আর নেড়া করে পাঠান যায় না, আর মা বাপ মরা, সেই ছোট বেলা থেকে হাতে করে মানুষ করা, না দিলে মন মানে না।" —ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঝি গহণা গুলো নাড়া চাড়া করে রেখে দিল—"বেশ সুন্দর হয়েছে দিদিমণি।"

উমা বিদ্রুপ ভরে হেসে উঠল—"নাকে নথ, কোমরে বিছে, হাতে মোটা মোটা তাগা বালা দিলেও আমার আপত্তি নেই; কারণ আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার যখন কোন মূল্য নেই তখন শুধু গহণার বেলায় মতামত দিয়ে কোন লাভ নেই। কথায় বলে 'ভারী ত বিয়ে তার দু'পায়ে আল্‌তা।"

উমা ঘরে ঢুকে পড়ল। সুষমা রাগে নেচে উঠল— "তোর আর এ বিয়েতে মন উঠবে কেন? তুই ভেবেছিলি ঢলাঢলি করে, তা'পর বিয়ে করবি। আর করেও ত ছিলি, কিন্তু সে করলে? ঝাঁটার বাড়ী দিয়ে চলে গেল যে!"

—"হ্যাঁ আমার ত ঢলিয়ে বেড়ান অভ্যাস কিন্তু তোমার মত হিংসেয় ফেটে ভাঙিয়ে বেড়াইনে।"

বলে উমা ঘরে ঢুকে পড়ল।

১৭

চিন্তাভরে উমাকে এই কটা দিনের মধ্যে যেন বহু দিনের ক্ষয় রোগগ্রস্তা করে তুলেছিল। ওকে যে দেখছিল সেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল। ওপাড়ার যদু ঘোষালের স্ত্রী, ভটচায্যি গিন্নি বেড়াতে এলেন, ভটচায্যি গিন্নি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—"ওমা! উমা কি রকম হয়ে গেছে, অসুখ করেছে নাকি?"

—"কই! না।"

সুষমা বললে।

—"তবে ও রকম হয়ে গিছিস্ যে? বলি বিয়ের নামেত লোকে ফুর্ত্তিতে মোটা হয়ে ওঠে।"

যদু ঘোষালের স্ত্রী সস্নেহে দৃষ্টিতে উমার দিকে চাইলেন —"আমাদের ছোট বেলায় হয়েছিল, অতশত কি আর বুঝেছিলাম গয়না কাপড় পেয়েই আহ্লাদে আটখানা, ও বড় সড় হয়েছে কত রকম কথা মনে হ'চ্ছে; আহা মন কেমন করবেই ত!"

ওদের সঙ্গ উমার ভাল লগছিল না, ও উঠে পড়ল— "যাই পান নিয়ে আসি।"

অশান্ত মন, এলো-মেলো স্বপ্ন দেখতে-দেখতে ঘুম ভেঙে যায়, আর ঘুম আসেনা, উমা আস্তে আস্তে বেরিয়ে ছাতে গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকার, অন্ধকার দিগ দিগন্ত অন্ধকার ঘিরে ওর জীবনে ঘনিয়ে এসেছে। আলো একটু খানি আলো প্রাণ আকুল হয়ে চায়।

অন্ধকার আকাশে লক্ষ তারার নয়ন মেলে তারই ক্ষীণালোকে ওর চির দিনের সাথী যেন সান্ত্বনা দেয়।

মন আকুল হয়ে ওঠে ও শুধু নিঃশব্দে চেয়ে থাকে।

এই গভীর রাত্রে সবাই ঘুমে অচেতন ওর একবার মনে হয় আস্তে আস্তে নেমে বেরিয়ে যাবার কথা, এত বড় বিপুল বিশ্বে ওর কি কোথাও স্থান হবে না?

আস্তে আস্তে পাচিলের কাছে দাঁড়ায় ঐত পথ এই মুহূর্ত্তে যদি ও নেমে বেরিয়ে পড়ে?

পর মুহূর্ত্তেই মনে হয় এক মলয়ের ভয়ে ও যদি আজ বেরিয়ে পড়ে, ওখানে কত মলয় ওর জন্যে হাত বাড়িয়ে দাঁড়াবে!

ভেবে যেন কূল পায়না, পাগলের মত সমস্ত ছাতটা ঘুরতে থাকে।

অনেকক্ষণ পরে নিজের ঘরে এসে ঢুকল, আলো জ্বেলে দোয়াত কলম নিয়ে বসল, সুষমার মেয়ে নন্দ রাণী উমার কাছে শোয় সে উঠে বলল—"মাসিমা জল খাব।"

ওকে জল খাইয়ে উমা আবার শুয়ে পড়ল, খানিক পরে নন্দ রাণীর ঘুম গাঢ় হয়ে-এলে লিখতে বসল।

লেখা শেষে চিঠি খানাকে খামের মধ্যে পুরে বন্ধ করে নিজের জামার মধ্যে গুজে শুয়ে পড়ল।

জ্যাঠামশায় রুগী দেখতে বেরিয়েছেন, সন্তোষ তাদের আড্ডায় গেছে, মিহির মোহন সুষমা ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘরের দ্বার বন্ধ করে দিবা নিদ্রায় মগ্ন।

উমা এদিক ওদিক চাইতে চাইতে নেমে এল, নীচে বালক ভৃত্য কেষ্ট সুষমার ছেলে মেয়েদের জুতো পরিষ্কার করবে বলে সবে সে সেগুলা নিয়ে বসেছে এমন সময় উমা এসে এক খানা চিঠি ওর হাতে দিয়ে বললে—"যাত কেষ্ট চিঠি খানা চট করে ডাকে দিয়ে আয় বড্ড দরকারী। আমি জুতো পরিষ্কার করে রাখছি।

কেষ্ট চিঠি খানা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

উমা ভিজে কাপড় খানা রোদে মেলে দিচ্ছিল পদশব্দে মুখ তুলে চাইল, রমেশ এসে দাঁড়াল, উমার দিকে জিজ্ঞাসা নেত্রে চাইতেই উমা এগিয়ে এল—"চল ঘরে।"

ওর সঙ্গে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রমেশ জিজ্ঞেস করল —"বৌদি কই?"

উমা ফিরে একবার ওর মুখের দিকে চাইল তারপর বললে—"দিদি উষাদির সঙ্গে দেখা করতে গেছে।"

ঘরে ঢুকে রমেশ একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল উমা স্তব্ধ হয়ে জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রইল, ভাষা আজ ওর হারিয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পরে রমেশ প্রথম বললে—"কাল তোমার চিঠি খানা পেলাম, কিন্তু কাল সুবিধে হয়নি আসবার। তার পর হঠাৎ কি জন্যে চিঠি লিখেছিলে, ব্যাপার কি?"

কথা শেষে রমেশ উমার দিকে চাইল। ওর বিবর্ণ মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে রমেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ওর কাছে দাঁড়াল—"কি হয়েছে উমা?"

উমা রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ আবার চুপ করে রইল, তার পর বললে—"তুমি আমায় নিয়ে চল।"

রমেশ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল —"কোথায়?"

—"তোমার কাছে।"

—"আমার কাছে!"

রমেশ ঐটুকু শুধু উচ্চারণ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

উমা ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে—"তুমি একটি বার এসে জ্যাঠামশায়কে বল, আমি জানি তিনি নিশ্চয় মত দেবেন।"

রমেশ এবার ফিরে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল—"জ্যাঠামশায়ের মত না হয় নিলাম উমা, কিন্তু আমার শুধু ঐ টুকুই ত নয়, আরো অনেক বাধা আছে। তুমি কিছুদিন আগে আমায় বললে না কেন? আজকের দিনটার জন্যে তুমি সেদিন যদি এতটুকু আশা রাখতে দিতে!"

উমা চুপ করে জানালার ওপর বসে পড়ল, অনেকক্ষণ পরে মৃদু স্বরে বললে—"তুমি আমায় মাপ কর।"

রমেশ অধীরভাবে নিজের চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বললে—"ক্ষমার কথা নয় উমা, তুমি এমন জায়গায় দাঁড় করিয়ে আজ আমায় বললে যে, যে দিক দিয়েই হোক একটা অন্যায় আমায় করতেই হ'বে।"

উমা আর কোন কথা বললে না, চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

রমেশ অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে বার কতক ঘুর-পাক খেয়ে এসে আবার চেয়ারে বসে পড়ল।

—"উমা তুমি কি আমার কিম্বা লতুর বিষয় কিছু শোননি?"

—"শুনেছি, দিদির মুখে, কিন্তু সে কথা কি সত্যি?"

রমেশ অন্যমনস্ক ভাবে পকেট থেকে চুরুটের বাক্সট বার করে, তার থেকে একটা চুরুট তুলে নিয়ে, সেটাকে ধরিয়ে, একটা টান দিয়ে হাতটা নামিয়ে বললে—

—"হ্যাঁ সত্যি, তাছাড়া ওর মায়ের মত নিয়ে আমাদের বিয়ের পর্য্যন্ত সব ঠিক; আজ ওকে এতখানি এগিয়ে এনে কি বলে ফিরিয়ে দেব?"

এর উত্তর উমার কাছে নেই। ও শুধু মাথাটা নীচু করে নিলে। অনেকক্ষণ কেটে গেল স্তব্ধ নীরবতায়, রমেশ উঠে এগিয়ে এল উমার দিকে—সস্নেহে উমার চুলের ওপর হাত রেখে বললে—"সে হয় না উমা কিছুতেই, তুমি আমায় ক্ষমা কোর।"

উমা চুপ করে বসে রইল পাষাণ দেবতার মত স্থির হয়ে। রমেশ আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল, যেমন করে মানুষ তার প্রিয়ের বিগতপ্রাণ দেহের কাছ থেকে উঠে যায় তেমনি করে। দূরে বড় রাস্তার ফুটপাতের ওপর দিয়ে কে একজন হিন্দুস্থানী পথিক গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছিল

"মনমোহন সে প্রীত লগাই,

সোচ সমস মন ম্যায় পসতাই"

১৮

বিয়ে উমার হয়ে গেল, মলয়ের সঙ্গেই। সমারোহ ও হ'ল, জ্যাঠা মশায়ের অর্থাভাব নেই, পিতৃমাতৃহীনা ভ্রাতুষ্পুত্রি লোকের মুখটাও ত বন্ধ করতে হ'বে। আচার অনুষ্ঠান কিছুই বাদ পড়ল না! শুভ দৃষ্টি ও হ'ল—দৃষ্টিটা শুভ হ'ল কিনা কে জানে! কিন্তু সবাই স্বীকার করে নিলে শুভ বলেই! আর মালা বদল, তাও হ'ল, হয়ত উমার অন্তর বিমুখ হয়েছিল তবুও তার হাত দু'খানা সকলকার মতই কণ্ঠে মালা দিয়ে বরণ করে নিলে!

দেহটাকে সকলে দেখতে পায়, মনের ও বালাই নেই, তা যদি পেত তা'হ'লে সমস্বরে হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, উৎসবের কল কোলাহল, আলোকান্বিতা বিবাহ রাত্রি সমস্ত থেমে যেত এক নিমেষে।

অন্ধকার গাঢ় অন্ধকার নেমে আসত বিবাহের দীপান্বীকে আবৃত করে।

কুশণ্ডিকা শেষে বিবাহের হোমের চিতায় কুমারী উমার দাহকার্য্য শেষে ও যখন বেরিয়ে এল, তখন অন্তর ওর বিধবা দেহ ওর সধবা।

বর বধূ বিদায়ের সময় সুষমা সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্র অলঙ্কারের প্রদর্শনী খুলে বরণ করতে এল।

বরণ শেষে অশ্রুহীনা উমাকে অবাক করে, সমাগতা মহিলা মণ্ডলীর প্রশংসার মুকুট মাথায় নিয়ে, সুষমা অকস্মাৎ বরণ ডালাখানা মাটিতে ফেলে উমার গলাটা জড়িয়ে ধরে করুণ সুরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

ত্রুটী হীন সকল অনুষ্ঠান পর্ব্ব শেষ করে উমা স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরালয় এল।

এখানেও অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটী নেই, যদিও বাড়ীতে স্ত্রীলোক কেউ ছিলেন না, তবু আত্মীয়া প্রতিবেশিনী ইত্যাদিতে গৃহ পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল।

মলয় বিবাহ ফেরত মৃণালকে নিয়ে এসেছিল। সকল অনুষ্ঠান শেষে মৃনাল উমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল, অন্য সকলে একটু দূরে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প করতে লাগলেন—"দেখতে বেশ চক্ষু দুটী বড় সুন্দর, যেন মান-ভঞ্জনের রাধার মত। তবে বয়সটা একটু বেশী হয়ে গেছে।"

অপর একজন মলয়ের খুড়িমা সম্পর্কিয়া বললেন—"তা' হোক বাড়ীতে কেউ মেয়ে মানুষ নেই, বড়সড়ই ভাল, আর তা' ছাড়া মলয়ের ও বয়স হয়েছে, ও আমার হারাধনের বয়সী, হারাধন তিন ছেলের বাপ; সময়ে বিয়ে হ'লে মলয়ের বৌ ত আজ গিন্নি বান্নি হ'বার কথা।"

হ্যাঁ সেত বটেই, তবে বিয়ের কনে বেশ ছোট খাট হ'লেই মানায়। তা' যা হয়েছে বেশ হয়েছে, সুখে সচ্ছন্দে বেঁচে থাক, হাতে নোয়া সিঁদুর নিয়ে।"

দিন কতক থেকে মৃণাল ফিরে গেল। মিহির মোহন এল ওদের জোড়ে নিয়ে যেতে। মলয় উমাকে নিয়ে এল মিহির মোহনের সঙ্গে। বেনীমাধব বললেন—"উমা এখন কিছুদিন থাক, তারপর এসে নিয়ে যেও।"

মলয় শুনে সুষমার কাছে এসে বললে—উমা না গেলে চলবে না, বাড়ীতে কেউ নেই, আর তা'ছাড়া উমাতো নেহাৎ ছেলে মানুষ নয় যে সারাদিন কেঁদে কেঁদে ঘুরবে!"

লোকের মুখ বন্ধ করবার জন্যই বলা নইলে বেনীমাধবের উমার থাকা কিম্বা যাওয়া কোনটার জন্যেই বিশেষ শিরঃপীড়া নেই।

উমা মলয়ের সঙ্গেই ফিরে গেল। দিন রাত্রি আবার যায় আসে, উমার অন্তরবাসিনী নারী হতাশ হয়ে মৃত্যুর পথ চায়—এ যে ধর্ম্ম বন্ধনের রজ্জু, এত চুক্তি নয়!

বিকাল বেলায় মলয়কে চা জল খাবার দিয়ে, উমা ভাঁড়ার ঘরে বসে বসে কুটনো কুটছিল, মলয় এসে দরজায়

চৌকাঠের সম্মুখে দাঁড়াল—"এখুনি কুটনো নিয়ে বসলে যে ?

—"কি আর করি তাই বসলাম।"

বলে উমা মুখ নীচু করে কুটনো কুটতে লাগল।—"কি আর করি মানে ? চল ঘরে একটু গল্প করি।"

উমা মুখ না তুলে বললে—"এ কাজ গুলোও ত করতে হ'বে, শেষে সন্ধ্যে হয়ে যাবে তাড়াহুড়ো পড়বে।"

—"বল্লাম ত একটা ঠাকুর রাখি, তাত তুমি রাখতে দিলে না।"

এবার উমা একটু হাসল—"আমাকে ও ত অন্নের ঋণ শোধ করতে হবে।"

—"কি যে বল! মেয়েরা বড় নির্ম্মম, কেবল পুরুষদের খেলিয়ে নিয়ে বেড়াতে ভালবাসে।"

বলে মলয় ফিরে গেল।

উমার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল।

মলয় যদি মলয় পবন না হয়ে বজ্র হ'ত তা'হলে হয়ত উমার জীবন তন্ত্রে আবার নূতন সুর বেজে উঠ্‌তে পারত। মলয়ের মলয় বাতাসে ওর দম্ বন্ধ হয়ে আসে! উমার মনে হয় এর চেয়ে দশ বছরে বিয়ে ঢের ভাল, তবু ত তারা অন্ধ সংস্কার নিয়ে আজীবন কাটিয়ে দেয়। খানায় যখন পড়ে হাত পা ভাঙতেই হবে, তখন চোখ না চেয়ে অন্ধ হয়ে পড়াই ভাল।

মলয় ফিরে এসে নিজের ঘরে থমকে দাঁড়াল, উমা ও পাশে বসে ফল ছাড়িয়ে রাখছিল—"ইস্, আজ এত সাজ সজ্জা! ব্যাপার কি ? আমিত একটু সাজ গোজ করতে বলে বলে হয়রাণ, তাই আজ বুঝি দয়া হ'ল।"

মলয় বল্লে।

উমা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল; এত দুঃখের মধ্যেও উমার মনে হ'ল, যে প্রেম বিষয়ে মলয়ের অধ্যবসায় খুব প্রবল আছে!

—"আজ দেবেশ বাবুর স্ত্রী এসে ডেকে নিয়ে গেলেম প্রফুল্ল বাবুর বাড়ী।"

মলয় থমকে দাঁড়াল, এ উত্তর শুনবার জন্যে ও প্রস্তুত ছিল না, মুখ খানাকে অনাবশ্যক করুণ করে ক্ষীণ-স্বরে বললে—"প্রফুল্ল বাবু এখন ছুটিতে বাড়ীতেই আছেন, এ সময় তুমি না গেলেই ভাল হ'ত।"

উমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে উঠল—"প্রফুল্ল বাবুর ছুটিই হোক আর অফিসই হোক, আমিত আর তাঁর কাছে যাইনি; গিইছিলাম তাঁর স্ত্রীর কাছে।"

মলয় উমার রুদ্র রূপ দেখে থতমত খেয়ে আমতা আমতা করে বললে—"আমি কি তাই বলছি, সে কথা নয়, তবে, হুঁ—প্রফুল্ল বাবু কি করছিলেন ?"

—"প্রফুল্ল বাবু কি করছিলেন তা'আমি কি জানি! আমার ও রকম উঁকি মেরে দেখে বেড়ান অভ্যেস নেই; সে দেখবে যারা পরীক্ষার পড়া ফেলে, রাত জেগে পাশের বাড়ীর মেয়েকে দেখবার জন্যে বসে থাকে।"

মলয় নীরবে ওর কথা গুলো সব শুনে, পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে উমা চা নিয়ে মলয়ের কাছে এল, দেখল মলয় ইজি চেয়ারে আড় হয়ে পড়ে চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে শুয়ে আছে।

উমা গিয়ে চায়ের কাপটা পাশের টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে বল্লে—"চা এনেছি।"

মলয় আর কোন কথা না বলে খপ করে উমার হাত খানা ধরে নিজের চোখের ওপর চেপে ধরল—

—"উঃ কি কষ্ট আমায় দিচ্ছ রাণী, আমি যে আর পারি না।"

উমার হাতখানা চোখের ওপর ঘসে, সেই ঘসার জন্যেই হয়ত দু'ফোঁটা চোখের জল চোখ থেকে উমার হাতে লেগে গেল।

বিরক্ত ভাবে উমা হাতখানা টেনে নিয়ে বল্লে—"আঃ, কি করছ! চা খেয়ে নাও, তা হলেই মাথাটা আপনিই ঠাণ্ডা হয়ে আসবে।"

বিদ্রূপের হাসিতে সচকিত করে উমা বেরিয়ে গেল।

৩৬

দিনে পর দিন যায়, মাস যায় বছর ঘুরে যায়।

দিন কেটে চলে আশাহীন, তৃপ্তিহীন, ভবিষ্যত হীন দুঃসহ বর্ত্তমানকে ধরে!

রান্নাঘরে মলয় এল একখানা চিঠি হাতে নিয়ে—"এই নাও তোমার চিঠি।"

উমা উনানের কাছ থেকে উঠে এসে, হাত ধুয়ে আঁচলে হাতটা মুছে ফেলে বললে—"দাও।"

মলয় ওর দিকে চেয়ে বললে—"তুমি ভারী নোংরা ত, কাপড়ে হাত মুছলে কাপড় খানা অপরিষ্কার হ'লে না?"

—"তা'হোক গে, ময়লা কাপড় ত আমাকে কামড়াবে না।"

বলে উমা চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল।

—"না, তোমায় কামড়াবে না, কিন্তু আমার চোখকে খোঁচা দেবে।"

—"তুমি আমার দিকে চেওনা।"

মলয় এবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, উমার চিঠি পড়া শেষে বললে—"কার চিঠি দেখি সুরমার না সুষমাদির?

—"হুঁ"

বলে উমা চিঠি খানাকে নিজের সেমিজের ভেতর গুঁজে উনুন পাড়ে গিয়ে বসল।

—"কই দেখালে না।" বলে মলয় অবাক হয়ে উমার দিকে চাইল।

উমা কড়ায় খুন্তি খানা নাড়তে নাড়তে বললে—"ওখানা আমার চিঠি তোমার নয়।"

—"তা'ত জানি, কিন্তু তুমি কি গো! আনন্দ করে দেখতে চাইলাম দেখালেনা।"

—"আমার চিঠি সকলে দেখে সে আমি পছন্দ করি নে।"

—"সকলকার সঙ্গে আমি সমান?"

উমা আর কোন সাড়া দিলে না।

মলয় আরো একটু দাঁড়িয়ে থেকে বললে—"তুমি এত অপমান কর যা বলবার নয়, আর সেটা স্বীকার কর না—নিজের দন্ত দিয়ে চাপা দিয়ে রেখে দাও! আমি বলে তাই চুপ করে থাকি অন্য কেউ হ'লে।—"

মলয়কে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই উমা হেসে বললে—"ঝাঁটা মেরে বিদায় করে দিত ত, কি বল?"

দোষ মলয়ের নয়, ও গৃহিণী উমাকে চেনে না,—বন্ধু উমাকে জানেনা, ও শুধুই প্রেয়সী উমাকে জানাতে চায়!

উমা বসে বসে সেলাই করছিল; মলয় এসে খাটের ওপর শুয়ে পড়ল, শুয়ে শুয়ে উমার সেলাই দেখতে লাগল—"দেখি রংয়ের চোখ তোমার চেয়ে আমার বেশী আছে।"

মলয় বললে।

উমা সেলাই টাই ওর হাতে দিল, ও নেড়ে চেড়ে সে-খানাকে বিছানার ওপর পেতে দেখতে দেখতে বললে—"একি বিশ্রি রং দিয়েছ! বুদ্ধ করেছ কাল রংয়ের সুতো দিয়ে, বুদ্ধ রাজপুত্র, লোকে কথায় বলে রাজ পুত্রের মত দেখতে, বুদ্ধের গায়ের রং সাদা দাও।"

উমা বিনা বাক্য ব্যয়ে নিজের হাত থেকে এক গাছা চুড়ি খুলে বললে—"দেখি তোমার হাতে হয় কিনা, বেশ মানাবে—সুন্দর। পরবে?"

মলয় ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে—"তুমি প্রত্যেক কথায় এত অপমান কর যা বলবার নয়, আমার বন্ধুরা শুনে অবাক হয়ে যায়।"

—"তোমার বন্ধুদের অবাক হওয়া না হওয়ার জন্যে আমার বিশেষ মাথা ব্যথা নেই। আচ্ছা যাই হোক এবার তোমার কাছ থেকে রং মিলোতে শিখবো'খন! কিন্তু বড় বড় চিত্রকররাও পেন্সিল স্কেচ্ কাল দিয়েই করে, খড়ি দিয়ে গায়ের রং সাদা করে না।"

× × × ×

অনেক দিনের রোগ ভোগ করে মলয় সুস্থ হয়ে উঠেছে।

ও বাড়ীর খুড়ি মা এসে বসলেন মলয়ের কাছে।

মলয় উমার দিকে চাইল, উমা এগিয়ে এল, আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল—"কিছু বলছ?"

—"হাঁ। আমি উঠে বসব।"

উমা হেলান চেয়ার খানা জানালার কাছে পেতে দিয়ে ফিরে এসে মলয়ের হাতখানা ধরে উঠিয়ে দিতে গেল। মলয় বল্লে—"থাক এখন আমি আস্তে আস্তে উঠে যেতে পারব।"

ও ধীরে ধীরে উঠে চেয়ার খানাতে আড় হয়ে শুয়ে পড়ে, খুড়িমার সঙ্গে গল্প করতে লাগল।

উমা খুড়িমাকে বল্লে—"আপনিত রইলেন, আমি

ওদিক কার কাজ কর্ম্মগুলো সেরে আসি, যদি কিছু দরকার হয় ত ডাকবেন।"

উমা চলে গেল।

খুড়িমা একথা সে কথার পর আরম্ভ করলেন—"কি ভীষণ ফাঁড়াই গেল বাবা তোমার, কি করে যে সামলে উঠবে কিছু ভেবে পাইনি। সত্যি বাপু বৌমার সেবার জোরেই তুমি সেরে উঠলে। কি সেবাটাই করেছে!"

সন্ধ্যার পর মলয় নিজের শয্যায় এসে শুয়ে পড়ল। খুড়িমা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ও ঘুমিয়ে পড়ল।

খুড়িমা উঠে গিয়ে উমাকে ডেকে দিয়ে উনি নিজের বাড়ী চলে গেলেন।

অনেক রাত্রে মলয়ের ঘুম ভাঙল, উমা তখন ওর শিয়রে বসে আস্তে আস্তে পাখা নাড়ছে। মলয় চুপ করে ওর দিকে চেয়ে রইল। উমা ধীরে কপালের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল—"ঘুম ভেঙে গেছে, কোন কষ্ট হ'চ্ছে নাকি?"

—"না ভালই আছি।" বলে মলয় আবদারের সুরে বললে—"তুমি ওখান থেকে উঠে এসে এই খানটায় বোস।" নিজের পাশের স্থানটা দেখিয়ে দিল।

উমা ওর পাশে এসে বসে বললে—"এখানে আমি বসছি—তুমি একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর।"

মলয় আর কোন কথা না বলে উমাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নিলে।

অসহ্য অস্বস্তিতে উমার সর্ব্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হয়ে এল, ও চোখ বন্ধ করে আড়ষ্ট ভাবে চুপ করে রইল, হঠাৎ শুনতে পেল মলয় ওর মুখ খানাকে দুই হাতে চেপে ধরে বলছে—উমা, উমা, তুমি আমায় এত ভালবাস, তা, আগে কখন বুঝতে পারিনি, তখন কেবলি মনে হত, জীবনটা বুঝি শুধুই কান্নায় ভরা একটা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি জীবন কত সুখের স্বর্গীয় আনন্দে ভরা।"

উমা আস্তে আস্তে ওর বাহু বন্ধন থেকে আপনাকে মুক্ত করে নিয়ে হেসে বললে—'জীবনটা দুঃখ ও নয়, আনন্দ ও নয়, জীবনটা শুধুই ঠাট্টা!"

—সমাপ্ত—

আজি স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে

বনফুল

জন কোলাহল পূর্ণ এই নগরীর মুখর মত্ততা
আজিকার স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে মরমে জাগায় কত ব্যথা।
নিঃসীম, নীরব নির্জ্জনতা ঘিরেছে আমার
চারি ধার
সময়ের সমুদ্র বেলায় উঠিছে তরঙ্গ অনিবার।
জনতা চ'লেছে ছুটে তার অসমাপ্ত কর্ম্ম সমাপনে
সুগভীর সমাপ্তির রেখা ঘিরিয়াছে আমার জীবনে
নাহিক উদ্দেশ্য কিছু তার,নাহি যে পুলক চঞ্চলতা
সমস্ত জীবন ভরি মোর নামিয়াছে সুপ্তি শীতলতা
ক্লান্তি ঘিরিয়াছে এই দেহ, শ্রান্তি জুড়িয়াছে
মোর মন
একান্ত আগ্রহে তাই আজ করিতেছি মৃত্যু আমন্ত্রণ।

ছন্দ হারা আমার পৃথিবী, গন্ধ হারা জীবন কুসুম
বদ্ধ আত্মা দৈন্য রিক্ততায় নয়নে নামিছে মহা ঘুম।
আমার এ অন্তরের অনবদ্য আনন্দের ধারা
সংসার সাহারা মাঝে তাই বুঝি আজ হ'লো
পথহারা
পঙ্গু প্রেম কেঁদে ফেরে তাই আমার আত্মার
অন্তঃপুরে
মোর ভালবাসা দিয়ে কভু পরিপূর্ণ করিনি কাহারে
বৃথা প্রাণ ধারণের গ্লানি সহি তবে কোন স্বার্থ আশে
কেহ কি আমার লাগি ফেলে অশ্রু শুধু মোরে
ভাল বেসে?

গান্ধীজী

সমাজ, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রে

শ্রীভারতকুমার বসু

তাপসের জীবনকথা ঠিক ধর্ম্ম-গ্রন্থের কথার মতোই পবিত্র। আজ সারা পৃথিবী গান্ধীজীর মধ্যে, সংযম এবং অহিংসার চরম বিকাশ দেখে, বিমুগ্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ জানে, ওই তিনটী গুণ বাল্যকাল থেকেই গান্ধীজীর আদর্শকে গ'ড়ে তুলেছে। বালক-বয়সে তিনি মিথ্যার প্রলোভনে প'ড়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মধ্যে দেবতার যে-স্ফুলিঙ্গ বরাবরই জাগ্রত ছিল, তা সেই মিথ্যাকে মূর্চ্ছিত করে, ভস্ম করে। একবার তিনি এক দুষ্ট বন্ধুর পরামর্শে তাঁর এক ভাইয়ের হাত থেকে সোনার তাগার টুক্‌রা গোপনে কেটে নেন। কিন্তু তার পরই চুরীর পাপের কথা তাঁর স্মরণ হ'লো। ঈশ্বরের কাছে অপরাধী জেনে, বালক-গান্ধী কম্পিত-বুকে গেলেন—পিতার কাছে পাপ স্বীকার ক'রতে। পিতৃদেব ক্রুদ্ধ হ'লেন না, বিরক্ত হ'লেন না, ভর্ৎসনাও ক'রলেন না। কেবল তাঁর চোখ থেকে অশ্রুর মুক্তা-বিন্দু গড়িয়ে প'ড়লো! সেই অশ্রুতেই গান্ধীজী শুদ্ধ হ'লেন।...সে দিনের সেই ঘটনা থেকেই তিনি তাঁর জীবনে প্রথম ক্ষমার আদর্শ লাভ করেন।

সংযম অভ্যাসও তিনি করেন যৌবনেই। ১৯০১সালে এবিষয়ে তিনি জাগ্রত হন। তিনি সেই সময়কার কথা-প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আমার স্ত্রীর সঙ্গে কি-রকম সম্বন্ধ রাখবো? স্ত্রীকে ভোগের বস্তুরূপে ব্যবহার করলে স্ত্রীর প্রতি কি-রকম বিশ্বস্ততা দেখানো হয়? যতদিন আমি ভোগের অধীন থাকবো, ততদিন আমার পত্নীব্রত্যের কোনোই মূল্য নেই। এখানে এ কথা বলা দরকার যে, আমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ থাকা সত্বেও, কোনদিনই স্ত্রীর দিক থেকে আক্রমণ আসেনি। সেই দিক দিয়ে দেখলে, আমি যখনি ইচ্ছা করি না কেন, আমার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা সহজ ছিল।"—("আত্ম-কথা", তৃতীয় ভাগ, সপ্তম পরিচ্ছেদ।)

গান্ধীজী আরও বলেন, "সংযম পালন ক'রতে মুস্কিলের অন্ত ছিল না। পৃথক খাট করলুম। রাত্রে খুব শ্রান্ত হয়ে শুতে চেষ্টা করলুম।... আজ বিগত দিনের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি, ওই সমস্ত চেষ্টাই আমাকে শেষশক্তি দিয়েছিল।"

এই শক্তিতেই গান্ধীজী আজ ভৈরবের অমোঘ প্রতাপে সারা পৃথিবীর অদ্বিতীয় ব্যক্তি। এই শক্তিতেই প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকার রাষ্ট্র-গগন কাঁপিয়ে তুলেছিলেন। ইতিহাস আজও তার সাক্ষ্য দেয়।

১৮৯৩ সালে ব্যারিষ্টার রূপে মহাত্মা গান্ধী একটী 'কেস্' নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। সেখানে তখন কৃষ্ণকায়দের প্রতি ঘৃণা পূরোমাত্রায় জেগেছিল। এমন কি, সেখানকার অধিবাসী প্রত্যেক এশিয়ার লোকই নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ভারতীয়েরা সাধারণ 'ফুটপাথে' ও চলবার অধিকার পেতো না। ট্রান্সভ্যালে প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাবার সময় অনভিজ্ঞতার জন্য গান্ধীজীকেও তাই অপমানিত হ'তে হয়। উক্ত বাড়ীর এক সিপাই কোনো কথা না বলে ছুটে এসেই তাঁকে ধাক্কা দিলে এবং পদাঘাতে রাস্তায় ফেলে দিলে। জাগ্রত নারায়ণকে এইভাবে অপমান করবার সময়ে হতভাগা একটুও দ্বিধা বোধ করলে না। এই উপলক্ষে গান্ধীজী তাঁর বন্ধু মিঃ কোর্টস্‌কে বলেছিলেন, "এতে দুঃখের কারণ নেই। সেপাই বেচারা কি জানে। তার কাছে কালা ত কালাই! সে নিগ্রোদের এই ব্যবহারই দিয়ে থাকে; কাজেই, আমাকেও ধাক্কা মেরেছে। আমি নিয়ম ক'রেছি, ব্যক্তিগত অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আদালতে যাবো না। এইজন্যই আমি মামলা করবো না।"

এই দুর্ভোগ ছাড়াও, ট্রেনে লাঞ্ছনা, হোটেলে অপমান ইত্যাদি ইত্যাদি নানা অত্যাচার মহাত্মাকে অসংখ্য বার সহ্য করতে হয়। শেষে গান্ধীজী স্থির-সঙ্কল্প হয়ে উঠলেন,

দক্ষিণ আফ্রিকান্ গভর্ণমেণ্টের এই রকম দুর্নীতির উচ্ছেদ করতে;—উচ্ছেদ করতে—ভারতীয়দের জন্য, সেখানকার এশিয়ান্‌দের জন্য। ঠিক এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের উপর একটী নির্মম কর বসালেন। প্রত্যেক ১৬ বছরের ছেলে এবং ১৩ বছরের মেয়েকে বাৎসরিক ১২ পাউণ্ড (তখন ১৯০্ টাকা) ঐ কর-স্বরূপ দিতে হবে। গান্ধীজী নেতাল-ইণ্ডিয়ান-কংগ্রেসে বিপুল আন্দোলনের দ্বারা ঐ করের হ্রাস করলেন। ২৫ পাউণ্ড, তিন পাউণ্ডে নেমে এল। কিন্তু এই তিন পাউণ্ড ও গরীবদের উপর বিষম জুলুম! এই করের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ দরকার! একদিকে শ্বেতাঙ্গদের সুবিধার জন্য সেখানকার এশিয়ান্‌দের প্রতি দারুণ দুর্ব্যবহার, আর এক দিকে দেড়লক্ষ ভারতীয়ের প্রতি ওই অন্যায় করের অসহনীয় বোঝা! ঈশ্বরের এক কঠোর অগ্নি পরীক্ষা সামনে নিয়ে, দৃঢ়বক্ষে গান্ধীজী এগিয়ে গেলেন, উৎপীড়িতদের দুঃখ-মোচন ক'রতে; পাপের রাজ্যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করতে।... অন্তরীক্ষে সর্ব্বদ্রষ্টা বুঝি তখন তাঁর পদ্মাসন থেকে আশীর্ব্বাদের জন্য আপন কমল-হাতখানি তুলেছিলেন।

প্রথমেই গান্ধীজী ভারবান্ সহরের বাইরে তাঁর কর্ম্ম কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই খানেই তিনি অধিকার বঞ্চিত, ক্লিষ্ট অভাগাদের ডেকে এনে সকলকে সেই খোলা জায়গায় থাকতে বললেন, এবং তাদের প্রতিশ্রুত করিয়ে নিলেন, তারা যেন অতঃপর সেই সীমানার বাইরে না গিয়ে দারিদ্র্যের দুঃখকে বন্ধুর মতে বরণ করে, এবং সরকারকে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ জানায়। সম্ভবতঃ এইটিই ধর্ম্মঘটেরই নামান্তর। গান্ধীজীর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দলে দলে শ্রমিক-শ্রেণী কর্ম্মস্থল ছেড়ে সহর ও গ্রাম থেকে উক্ত স্থানে বাস করবার জন্যে উপস্থিত হলো। তার ফলে, অবিলম্বেই দেশের সামাজিক ও ব্যবসার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠলো। গান্ধীজীর সেই ধর্ম্মঘটের বাণী যেন প্রাচীন যুগে ফ্যারওর রাজ্য থেকে উন্মুক্ত প্রান্তরে ইস্‌রেলাইট্‌দের নিয়ে-আসা মিশরী মূসার (Moses-এর) বাণীর মতোই উদার, অথচ গম্ভীর! গান্ধীজীর সে-আন্দোলন ছিল ধর্ম্মের আন্দোলন। তাই, ১৮৯৯ সালে যখন বোয়ার যুদ্ধ সুরু হয়, তখন তাঁর ধর্ম্ম যেন সাড়া দিয়ে বললে,—"মহত্তর কর্ত্তব্য সামনে রয়েছে।" গান্ধীজী অবিলম্বে ধর্ম্মঘট থামিয়ে, আহতদের নিয়ে একটি রেড্ ক্রশ্ দল গঠন করলেন। তারপর সরকারের অনুমতি নিয়ে সুমহান্ কর্ত্তব্যের দিকে এগিয়ে গেলেন —কখনো কখনো গোলা বারুদের বিপদ সঙ্কুল সীমানার ভিতরও গিয়ে কাজ করতে তিনি কিছু মাত্র দ্বিধা করেন নি!

বোয়ার যুদ্ধের পর গান্ধীজীর ধর্ম্মঘট-আন্দোলন আগেকার মতোই আবার আরম্ভ হ'লো। কিন্তু ১৯০৪ সালে জোহানেস্‌বার্গে হঠাৎ ভীষণ প্লেগ দেখা দেওয়ায়, আবার তিনি তা বন্ধ রাখলেন। এবার তাঁর কর্ত্তব্য হলো——কর্তৃপক্ষ শুশ্রূষা দেবার আগেই, নিজের তৈরী হাঁসপাতালে রোগীদের সেবা করা। ঠিক এইভাবে ১৯০৬ সালে জুলু-বিদ্রোহ আরম্ভ হতেই, তিনি আবার তাঁর ধর্ম্মঘট-আন্দোলন বন্ধ রেখে আহতদের জন্য ডুলি বাহকের কর্ত্তব্য বেছে নিলেন। এই সাহায্য দেওয়ার জন্য নেতাল গভর্ণমেণ্ট্ প্রকাশ্যতঃই তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরেই তাঁর আবার সেই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের আন্দোলনের জন্য ওই গভর্ণমেণ্টই তাঁকে বারবার গ্রেপ্তার করে কারাবন্দী করতে লাগলেন। কারা-পিঞ্জরে তাঁকে হাত-পা বেঁধে চাবুক মারা হতো, নির্জ্জন-বন্দীত্বের শাস্তি দেওয়া হতো, আরও কতই লাঞ্ছনা করা হ'তো। চরমভাবে উৎপীড়িত পুণ্যাত্মা সেণ্ট্ পল্‌ও কি এত অত্যাচার সহ্য করেছিলেন? একবারত পথের ধারে শ্বেতাঙ্গদের ক্ষিপ্ত জনতার রোষাগ্নিতে প্রহার ও পদাঘাতের দ্বারা গান্ধীজী মূর্চ্ছিত ও মৃতপ্রায় হয়েছিলেন বললেই হয়! উর্দ্ধে অলক্ষ্য বিধাতা কি তখন এর প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করেন নি—করেছিলেন।...

১৯১৩ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যাটী গ্রহণ করেন। রাজকীয় কমিশন-ও নিযুক্ত হয়। তার ফলে, সেখানকার উৎপীড়িতদের জন্য "Relief Act" অর্থাৎ "মুক্তি-আইন" প্রচারিত হ'লো।

গান্ধীজর দক্ষিণ-আফ্রিকার জীবন থেকে দুটি বিশেষ

জিনিষ জানতে পারা যায়,—তাঁর সেবাপরায়ণতা ও সারল্য। তিনি তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন—"একদিন এক আতুর কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত লোক আমাদের বাড়ীতে এল। তাকে খাইয়ে বিদায় ক'রতে মন চাইলে না তাকে একটা ঘরে রাখলুম, তার ঘা সাফ ক'রলুম, ও তার সেবা করলুম ;"—গান্ধীজীর সারল্য-ভরা জীবন-যাত্রার মূলেও ছিল ওই সেবা-ভাব ;—পীড়িতদের সেবা, দুঃখীর সেবা। তাই তিনি অনাড়ম্বর আহারের ব্রত নিলেন, বাড়ীতেই নিজের বসন কাচতে ও ইস্ত্রী করতে লাগলেন এবং নিজেই নিজের চুল-কাটা ও ক্ষৌর-কার্য্য আরম্ভ করলেন। এমন কি, ১৯০১ সালে যখন তিনি কিছুদিনের জন্য একবার ভারতবর্ষে আসেন, সেই সময় নাতালের ভারতীয়েরা যে-সব মূল্যবান ভেট্ দিয়ে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল, সেই সব জিনিষের কোনোটিকেই তিনি তাঁর নিজের অথবা পরিবারবর্গের আদৌ প্রয়োজনীয় বলে বোধ করে'নি। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "সারল্য বেড়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় সোনার ঘড়ি কে ব্যবহার করবে? সোনার চেন, হীরের আংটি কে ব্যবহার করবে? গহনা-পত্রের মোহ আমি অপরকে ছাড়তে বলেছিলুম। আমার এই গহনা-জহরৎ কি দরকারে আসবে? আমার এই সব জিনিষ রাখা হতে পারে না, —এই স্থির করলুম। আমি পার্শী রুস্তমজী ও অন্যান্যকে ট্রাষ্টী ক'রে এই সব গহনা তাঁদের সম্প্রদায়ের স্বার্থে ব্যবহারে করতে দিয়ে এক পত্র লিখলুম।"

১৯১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার কর্ত্তব্য শেষ হয়। ঐ বছরেই গান্ধীজী ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। মহামতি গোখেল ছিলেন তখন ভারতের নেতা। গান্ধীজীকেও নেতার মতো সম্মান দিয়ে অভ্যর্থনা করা হলো। জাতীয় কংগ্রেসের দাবী—স্বায়ত্ত শাসন পেতে সমস্ত ভারতবাসী যেন তখন দ্বিগুণ আশা, দ্বিগুণ শক্তি লাভ করলে।

এর পরের বৎসর ১৯১৪ সালে ইউরোপের মহাসমর সুরু হলো। গান্ধীজী কিন্তু তখন ধর্ম্মতঃ রাজাকে সাহায্য করাই কর্ত্তব্য ব'লে বিবেচনা করলেন। তিনি লণ্ডনে গিয়ে একটা ভারতীয় এ্যাম্বুলেন্স-দল গঠন করলেন। অবিলম্বে ভারত-সচীব মণ্টেগু এবং লিবারায়াল-মন্ত্রী লয়েড্ জর্জ্জ এই রকম একটা প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, বৃটিশকে যদি ভারতবর্ষ, দেশীয় সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে, তা হলে, ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দেওয়া হবে। এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস ক'রে প্রায় দশ লক্ষ ভারতবাসী, সৈনিকের সজ্জা গ্রহণ করলে। কিন্তু ১৯১৮ সালে যুদ্ধ-শান্তির পরই দেখ গেল, বৃটিশের ওই প্রতিশ্রুতি ছায়া-ছবির মতোই অলীক ;—নিছক মূল্যহীন! কৃতজ্ঞতা স্বীকার ত দূরের কথা, ভারত-গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর মুখবন্ধকারী নির্ম্মম "রাওলাট্ বিল্" প্রচার করলেন। পুলিসের জুলুম বাড়লো ; লোক স্তম্ভিত হয়ে গেল!

ইতিমধ্যে গোখেলের মৃত্যু হওয়ায় গান্ধীজীকেই তাঁর স্থানে বরণ করা হয়েছিল। ভারত-নেতা মহামানব গান্ধী বৃটিশের ওই ব্যবহারে যার-পর-নাই বিস্মিত হ'য়ে গেলেন। এইটাই কি ধর্ম্ম? কিন্তু তখনো বাকী ছিল। ১৯১৯ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে জেনারেল্ ডায়ার জালিয়ান্-ওয়ালাবাগে অকল্পিত নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড করলেন। ঋষি-গান্ধীজীর পুণ্যাত্মা আর স্থির থাকতে পারলোনা ;—বিদ্রোহী হলো। ১৯২০ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে তাঁর নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলন ভারতের নর-নারীকে আত্ম-প্রতিষ্ঠার এক নূতন জ্যোতির্ম্ময় পথ দেখিয়ে দিলে। কিন্তু ঋষির দীক্ষার পবিত্র মর্য্যাদা রক্ষিত হলো না। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শয়তানের প্রভাবে চৌরীচৌরার একটা উত্তেজিত জনতা ঈশ্বরের ধর্ম্মকে পদাঘাত ক'রলে। হিংসার আত্মপ্রকাশে গান্ধীজীর পুণ্য আন্দোলন কলুষিত হ'লো। গভীর বেদনায় তিনি আন্দোলন বন্ধ করলেন। কিন্তু আন্দোলনের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'লো ১০ই মার্চ্চ তারিখে। আটদিন পরে রাজদ্বারে বিচারের দ্বারা ছয় বৎসরের জন্য জেলখানার মধ্যে তাঁর স্বরাজ-আশ্রম নির্দ্দিষ্ট হলো।

ভারতের আত্মা কিন্তু গান্ধীজীকে ভুললো না ; তাঁর অহিংস আদর্শে প্রস্তুত হতে লাগলো। এজন্য সময় লাগলো পূর্ণ আট বৎসর। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে সারা ভারত আবার সাড়া দিলে। এ-সাড়ার মহান প্রতাপে মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই সমস্ত পৃথিবির ভিত্তি কেঁপে উঠলো। গান্ধীজী বন্দী হলেন ; মোট ৫৪০৪৯ জন

সত্যাগ্রহী কারা বরণ করলেন। শেষে বড়লাটের ঘোষণা অনুসারে ১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে গান্ধীজী মুক্তি পান। পরে গান্ধী-আরউইন-চুক্তির ফলে সমস্ত সত্যাগ্রাহীদেরও ছেড়ে দেওয়া হয়।

এর পর ভারত-ব্যবস্থার জন্য লণ্ডনের গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে, বিলাত থেকে কংগ্রেসকে নিমন্ত্রণ করা হয়। গান্ধীজীই কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হলেন। কিন্তু দিল্লী-চুক্তি প্রতিপালিত না হওয়ার জন্য বারদোলীর কতকগুলি অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করতে বড়লাট উইলিংডন অসম্মত হওয়ায়, লণ্ডন-বৈঠকে যাবার বিষয়ে গান্ধীজী উদাসীন রইলেন। শেষে বড়লাট ওই তদন্তে সম্মত হলেন। জগতের সমস্ত জাতি প্রত্যক্ষ ক'রলে, সত্যাগ্রহীর সত্য-বল কত অমোঘ, কত মহান, কত উন্নত!

২৯শে আগষ্ট তারিখে "রাজপুতনা" জাহাজে মহাত্মাজী বোম্বাই থেকে লণ্ডন যাত্রা করলেন। "রাজপুতনা" ধন্য হ'লো।

ইংলণ্ডে মাহাত্মা গান্ধী

লণ্ডন।
১২ই সেপ্টেম্বর।
সকাল বেলা।

আকাশ তখন অঝোরধারা ঝরিয়ে দিচ্ছে। সহরবাসী বিব্রত। কিন্তু তবুও সেদিন ভারতাগত এক শীর্ণদেহ রাজনৈতিক সাধুকে দেখবার জন্য লোকের কী সে বিপুল জনতা! পুলিশ বহুকষ্টে তাদের সংযত ক'রে রেখেছিল। ধীর পদক্ষেপে জগতের মহাত্মা ইংল্যাণ্ডের মাটী স্পর্শ ক'রলেন। বিস্মিত জনতা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। ঠিক এই সময়ে অদূরে এক গির্জ্জায় ঢং ঢং ক'রে প্রহর-নির্দ্দেশী ঘণ্টা বেজে উঠলো। অলক্ষ্যে ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুর আত্মা কি এইভাবে মহামানব গান্ধীকে অভ্যর্থনা জানালে? এক মুহূর্ত্ত নীরব, নিস্তব্ধ। ধীরে মহাত্মার দুই চোখ সেই গির্জ্জার দিকে ফিরলো। সঙ্গে সঙ্গে জনতারও। গান্ধীজীর সারা অন্তর যেন অসীম শ্রদ্ধায় অ-শ্রুত ভাষায় তাঁর প্রিয়-প্রার্থনাটী সেই লোকাতীতের উদ্দেশ্যে নিবেদন ক'রলে,—"Lead, kindly light, amid the encircling gloom! Lead thou me on! I am far from home; Lead thou me on!"—"তুমি নিয়ে চল, হে মঙ্গল-শিখা, এই চারিদিকের ঘনায়মান অন্ধকার ভেদ ক'রে! তুমি পথ দেখিয়ে আমাকে নিয়ে চল! ঘর হ'তে আমি আজ বহুদূরে। তুমি নিয়ে চলো আমাকে হে আলো, পান্থ-জনের বন্ধু!"

অভ্যর্থনা-সভার পক্ষ থেকে মিঃ হাউস্‌ম্যান গান্ধীজীর গলায় মাল্যদান ক'রে বললেন, তাঁর (হাউস্‌ম্যানের) জীবনে এর চেয়ে গৌরবজনক ঘটনা আর-কিছু ঘটেনি। সেদিন রাজাধিরাজের মতো গান্ধীজীর প্রতি যে বিরাট সম্মান শ্বেতাঙ্গ-সমাজ দেখিয়েছিল, অন্য কেউ তা পেলে, নিঃসন্দেহভাবে উন্মাদ কিম্বা অতিরিক্ত দাম্ভিক হ'য়ে প'ড়তেনই। কিন্তু জগতের মহাত্মা পর্ব্বতের মতো স্থির, অটল! তিনি বাণী দিলেন,—"ভারত তীব্রতর দুঃখ-যাতনা সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত আছে। ভারতবর্ষকে সেই দুঃখ-যাতনা থেকে রক্ষা করবার জন্য আমি ইংলণ্ডে আসিনি। ইংলণ্ড ভারতবর্ষে নিজের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে নিষ্ঠুর; অসংযত দমন-নীতি চালাবার ফলে আজ পশুত্বের পথে। তাকে সমধিক পশুত্বে অধঃপতন থেকে রক্ষা করবার জন্যই আমি ইংলণ্ডে এসেছি।"

১২ই সেপ্টেম্বর-তারিখে এক অভ্যর্থনা-সভায় গান্ধীজী আরও বলেন, "কংগ্রেসের প্রতিনিধি-হিসাবে আমি আজ এখানে এসেছি, এবং কংগ্রেস্ আজ ভারতের কোটী কোটী মূক ও অর্দ্ধ-অনশনক্লিষ্ট অধিবাসীদের জন্য প্রকৃত স্বাধীনতা দাবী ক'রছে। আমি শান্তিতে বিশ্বাসী। কিন্তু যে-শান্তির জন্য লোককে আত্ম-সম্মান বিসর্জ্জন দিতে হয়, সে-শান্তিকে আমি বিশ্বাস করি না। আত্ম-সম্মান রক্ষিত হয়, সেই শান্তিই আমার কাম্য।"

১৩ই সেপ্টেম্বর-তারিখে কিংস্‌লি-হল্ থেকে মহাত্মাজী ব্রড্‌কাষ্টিং-যোগে আমেরিকার কাছে ওই শান্তির বাণীই প্রেরণ করেন,—"এ-পর্য্যন্ত পৃথিবীর জাতিগুলি বর্ব্বরের মতো হিংস্র যুদ্ধ ক'রেছে। কিন্তু ভারতবাসীরা এই উপ-

লব্ধি করে যে,হিংস্র বর্ব্বরের জন্য যে-নীতি, সে-নীতি মানব-জাতিকে পরিচালনের জন্য নয়। রক্তাক্ত পথে ভারতের স্বাধীনতা লাভ করার চেয়ে, দরকার হ'লে তিনি ব্যক্তি-গতভাবে বরং যুগ-যুগান্ত ধ'রেও অপেক্ষা ক'রতে প্রস্তুত আছেন। আজিকার পৃথিবী রক্ত-ক্ষরণের দ্বারা পীড়িত এবং মুমূর্ষু হ'য়ে প'ড়েছে। তিনি নিজে এই কথা ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব ক'রছেন যে, পৃথিবীকে এই সমস্যা থেকে রক্ষা করবার জন্য ভারতবর্ষ এক মহান্ পন্থা আবিষ্কারের গৌরব লাভ ক'রবে।

গান্ধীজী চান, ইংল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে যেন সমান সম্মান-বোধের অংশীদারীত্ব অর্পিত হয় এবং সে অর্পণ যেন বাধ্যতা-মূলক না হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে গোল-টেবিল বৈঠকে গান্ধীজী বলেন,—"এমন এক সময় ছিল, যখন আমি নিজেকে একজন বৃটিশ-প্রজা ব'লে গৌরব বোধ করতুম। আমি নিজেকে একজন বৃটীশ প্রজা ব'লে পরিচয় দিতে অনেক বৎসর চেষ্টাও ক'রেছি। কিন্তু আমি এখন একজন প্রজা ব'লে অভিহিত না হ'য়ে এক জন বিদ্রোহী ব'লেই অভিহিত হ'তে পারি। তবে আমি এই ইচ্ছা পোষণ ক'রেছি এবং এখনো ক'রছি যে, আমি যেন একজন নাগরিক হ'তে পারি। তবে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের নাগরিক হ'তে চাই না;—কমনওয়েল্‌থের-ই সমান অংশীদার হ'য়ে একজন নাগরিক হ'তে চাই। সম্ভবতঃ এই অংশীদারী বিচ্ছেদ-যোগ্য হবে না। তবে যে-অংশীদারী একজাতি জোর ক'রে অন্য জাতির উপর চাপা'তে চায়, সে-অংশীদারী আমি চাই না।"—("Reuter's Special Service," 15. 9. 31.)

ল্যাঙ্কাশায়ার-ভ্রমনের সময় সেখানকার শ্রমিকদের বিশ্রাম-ভবন "হেস্ ফার্ম্মে" বেকারদের কয়েকটি প্রতিনিধির সামনে মহাত্মাজী বলেন, "আপনাদের মধ্যে ৩০ লক্ষ লোক বেকার। কিন্তু আমাদের প্রায় তিন কোটী লোক ৬ মাসের জন্য বেকার বসে থাকে। আপনারা গড়্‌পড়তা ৭০ শিলিং ক'রে বেকার-বৃত্তি পেয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের মাথা-পিছু গড়পড়তা আয় মাসিক ৭ শিলিং ৬ পেন্সের বেশী নয়। শ্রমিকরা ঠিকই বলেছে যে, এইভাবে ব'সে থাকার জন্য তাদের আত্ম-বিশ্বাস ক'মে যাচ্ছে। আমিও একথা বিশ্বাস করি যে, বেকার ব'সে থাকা এবং পরের সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করা—মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। ধর্ম্মঘট পরিচালনা করবার সময় আমি ধর্ম্মঘটকারীদের একদিনের জন্য ব'সে থাকতে দিইনা। রাস্তার জন্য পাথর ভাঙা কিম্বা বালুকা বহনের কাজে তাদের লাগিয়ে দিই। সেই কাজে আমার সহকর্ম্মীদের সাহায্য করতে বলি। ভেবে দেখুন, যেখানে তিন কোটী লোক বেকার, সেখানকার কী অবস্থা কাজের অভাবে প্রত্যহ কয়েক লক্ষ লোক অধঃপতিত হচ্ছে, আত্ম-সম্মান হারাচ্ছে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হচ্ছে। আমি তাদের কাছে ঈশ্বরের বার্ত্তা বহন ক'রে নিয়ে যেতে সাহস পাই না। ঐ যে কুকুরটী ওখানে ব'সে আছে, ওকে ঈশ্বরের কথা শোনানোও যা—কোটী কোটী বুভুক্ষু লোক, যাদের চোখে জ্যোতি নেই,হৃদয়ে আশা ভরসা নেই,তাদের কাছে ঈশ্বরের কথা বলাও তাই। রুটিই তাদের কাছে ঈশ্বর। কর্ম্মের পবিত্র বার্ত্তা যদি আমি তাদের কাছে নিয়ে যেতে পারি, তা হলেই ঈশ্বরের কথা তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ। সকালে উঠে বেশ একবার খাওয়া দাওয়ার পর এবং আর একবার আহারের চিন্তা মনে নিয়ে আমাদের মতো ঐশ্বরিক চিন্তা করা খুবই সহজ। কিন্তু দুবেলা যাদের দুমুঠো অন্ন জোটে না, তাদের কাছে আমি কি ক'রে ঈশ্বরের কথা বলি? তাদের কাছে ঈশ্বর শুধু রুটি ও মাখন রূপেই দেখা দিতে পারেন। ভারতের কৃষকেরা জমি চাষ ক'রে তাদের রুটির সংস্থান করে। তারা যাতে মাখন সংগ্রহ করতে পারে, সেজন্য আমি তাদের চরকা দিয়েছি। বৃটিশ জন-সাধারণের কাছে আজ যে আমি কৌপীনবাস প'রে উপস্থিত হয়েছি, এর একমাত্র কারণ এই যে, আমি অর্দ্ধাসনগ্রস্ত অর্দ্ধনগ্ন মূক লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর একমাত্র প্রতিনিধিস্বরূপ এসেছি। ঈশ্বরের আলোয় যাতে উদ্দীপ্ত হতে পারি, সেজন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি। ......আপনাদের এই যে দুঃখ-কষ্ট, এর মধ্যে আপনারা অনেকে সুখী আছেন। আপনাদের সুখ দেখে আমি ঈর্ষা করি না। কিন্তু ভারতের লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের সমাধির উপর সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করবার চিন্তা ত্যাগ করুন। ভারতবাসীরা জগতের অন্যান্য অংশ

থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে—এ আমি মোটেই চাই না। আমার কার্য্য এবং পরিধেয়ের জন্য আমি অপর কোনো দেশের ওপর নির্ভর ক'রতে চাই না। বর্ত্তমানের এই সঙ্কট কিসে অতিক্রম করা যায়, সেজন্য আমরা চেষ্টা করতে থাকি। কিন্তু এ-কথা আমি আপনাদের বলবোই যে, ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রাচীন ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের আশা আপনারা রাখবেন না। ওটী সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঐ কাজে সাহায্য করতে ধর্ম্মের দিক থেকে আমার বাধা আছে। মনে করুন, হঠাৎ যদি আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, এবং কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে আমি আবার নিশ্বাস ফেলতে থাকি, তা হলে আমি কি চিরকাল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চালাবার জন্য কৃত্রিম উপায়ের আশ্রয় নেবো এবং নিজের ফুস্‌ফুস্‌ ব্যবহার ক'রতে অস্বীকার করবো? না, এটি আত্মঘাতী পন্থা হবে। নিজের ফুস্‌ফুসের শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যই আমরা চেষ্টা করবো এবং নিজেদের উপর নির্ভর ক'রে আমাদের বাঁচতে হবে। আপনারা ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করুন, ভারত যেন ফুস্‌ফুসের শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। আপনাদের দুঃখ-কষ্টের জন্য ভারতকে দোষী করবেন না। জগতের শক্তিগুলি ভীষণবেগে আপনাদের বিরুদ্ধতা করছে। যুক্তির প্রখর আলোয় বস্তু বিচার করবেন।"

অপর এক জন-সভায় মহাত্মাজী বলেন,—"বৃটিশ-শাসন আমাদের উপকার ক'রেছে, এ-কথার বিচার কে ক'রবে? আমরা, না, আপনারা? বিদের নীচের ব্যাঙই জানে যে, তার কিসে কষ্ট হচ্ছে। স্যার দাদাভাই নৌরজী স্যার ফিরোজ শা মেটা, মিঃ রাণাডে এবং গোখেল আপনাদের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন এবং ইংরাজের সাহচর্য্যে গৌরব বোধ ক'রতেন। তাঁরা সকলেই এক বাক্যে এই মত প্রকাশ ক'রেছেন যে বৃটিশ রাজত্ব ভারতকে আগের চেয়ে অধিকতর দরিদ্র ক'রেছে এবং ভারতবাসীকে বলবীর্য্যহীন ক'রেছে। মোট কথা, আমাদের অনিষ্টই ক'রেছে। আমরা কি দুর্ব্বল জাতি? আমরা প্রশস্তমনা। হায়, দুর্ব্বলা ভারত-ললনা,—অশিক্ষিতা বর্ণজ্ঞানহীনা নারীরাও, যাঁরা সরোজিনী নাইডুর দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের মহিলাও নন, তাঁরাও বুক পেতে লাঠির আঘাত সহ্য ক'রেছেন।......হাজার-হাজার নর-নারীর হৃদয়ে লৌহ-দণ্ড প্রবেশ ক'রেছে। কাজেই, আজ তারা এই বিজাতীয় শাসনে উত্যক্ত হ'য়ে উঠেছে।...কংগ্রেসের আহ্বানে এসে, কংগ্রেসের বাণী মেনে' আজ যে কত নর-নারী বর্ণনাতীত লাঞ্ছনা ভোগ ক'রেছে, তা আপনাদের কাছে আমি বিশদভাবে বর্ণনা ক'রতে পারি। আপনারা মনে করবেন না যে, একটা অসার প্রতিষ্ঠানের জন্য আমরা এই দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'রেছি। অসংখ্য হিন্দু মুসলমান, শিখ পার্শী, খৃষ্টান আজ এই দুঃখ-কষ্ট বরণ ক'রছেন। কংগ্রেস-ই একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। সর্ব্বসাধারণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হ'য়েছে। কিন্তু ভারতকে অনুন্নত শ্রেণী, খৃষ্টান, এংলো-ইণ্ডিয়ান, অথবা অন্য সাম্প্রদায়িক-ভাবে কংগ্রেস বিভক্ত করেনি। ধরুন, আমি ফুলস্ক্যাপ-কাগজ চাইলুম। আপনি কাগজখানি টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে, আমাকে তা দিলেন। এতে কি কাজ চ'লবে? নিশ্চয়ই না। সেই রকম ভারতকে টুকরো-টুকরো ক'রে পরে বলা হচ্ছে যে, এই ত সম্মিলিত ভারত। আমি ভারতকে নানা ভাগে বিভক্ত দেখতে চাই না।"—*(Free Press Special Service, 22. 10. 31.)*

(ক্রমশঃ)

প্রাণের পরশ

(ত্র্যঙ্ক নাটক)

শ্রীকনকলতা ঘোষ

পাত্র-পাত্রীগণ

যূথিকা
চামেলী
মাধবী
} বেথুন কলেজের সহপাঠিনী বন্ধুত্রয়

স্নিগ্ধা—যূথিকার জ্যেষ্ঠা ভগিনী

নার্স পরিচারিকা প্রভৃতি......

মহিমনাথ—চামেলীর পিতা (পদস্থ রাজ কর্ম্মচারী)

প্রশান্তকুমার—স্নিগ্ধার স্বামী (ডাক্তার)

সরোজকুমার—চামেলীর দেবর (চাকুরীয়া)

বিকাশ লোচন—মাধবীর ভ্রাতা (চাকুরীয়া)

ভৃত্য সোফেয়ার প্রভৃতি.........

প্রস্তাবনা-সঙ্গীত

(মিলিত ভাবে)

—০—

আমরা জানাব বিশ্বে নারীর মহিমা গাহিব নারীর জয়
দেবতা-আশীষে নব অভিযান হইবে মহিমাময়।
মোরা বাংলার কুমারী সকলে
করিয়াছি পণ রব দলে দলে—
কুমারীরূপেই, যতদিন নাহি ঘুচে বরপণ-প্রথা
যোগ্যে যোগ্য মিলিবে যেথায় মোরা বধূ হব সেথা।
ছিঃ ছিঃ দেখে শুনে বড় পাই লাজ
সভ্য যুগে এ অসভ্য কাজ
কি করে চালায় ভদ্র সমাজ, শিক্ষিত পিতা মাতা
মেয়ের বিয়েতে পথে বসে বাপ এ বড় ভীষণ কথা।

মেয়েগুলো নাকি বেজায় সস্তা
তার সাথে চাঁদি বস্তা বস্তা
না দিলে বন্ধ বিয়ের রাস্তা, কি দারুণ কথা বাপ
সভ্য ভব্য কেতাদুরস্ত, হাঁকিছে বরের বাপ—
ওই চলে যায় ওজন দরেতে
পাশ করা ছেলে এম-এ,তে বি-এ তে,
কে হাঁকিবে হাঁকো, দেরী হ'য়ে গেলে পড়িবে বিষম ফাঁকী
মোরা শুনে ভাবি সভ্য হওয়ার কি কিছু রয়েছে বাকী।
মেয়ে বলে যদি হই মোরা হীন
অপমান কেন স'বো চিরদিন
আমরা মানুষ আমাদেরো আছে নিজ মর্য্যাদা জ্ঞান
বিয়ে হয় হবে না হয় না হবে—বিকাব না সম্মান।
জ্ঞানে গুণে মোরা হব সুন্দর
স্নেহ প্রীতি ভঁরা রবে অন্তর
আত্ম-পরের সেবায় আমরা বিলাইব আপনারে
দেখাব নারীর ও প্রয়োজন আছে বিশ্বের দরবারে।
দেখাবো বিধির সৃজনের মাঝে
অপরূপ রূপে রমণী বিরাজে
এস এস ভাই বাংলা দেশের সকল কুমারী মেয়ে
কল্যাণ-ব্রতে ব্রতী হইয়াছি তোমাদেরি মুখ চেয়ে।
বিবাহ তো নয় খেয়ালের খেলা
এ যে বিধাতার সৃজনের লীলা
এক সুরে সুর মিলাইয়া সবে বল জয় হবে জয়
কর্ম্মে যেথানে প্রেরণা মহৎ জয় সেথা নিশ্চয়।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—ইডেন-গার্ডেন।

কাল—অপরাহ্ন।

তিন বন্ধু—চামেলী, যূথিকা ও মাধবী একখানি বেঞ্চে বসিয়া গল্প করিতেছে।

মাধবী কহিল—হ্যাঁরে যুই শুনেছিস্ চামেলীর যে বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে আসছে রবিবারে পাকা দেখা হবে।

যুঁই—তাই না কি রে চামেলী? তোকে কে বল্লে রে মাধবী?

মাধবী—কেন সেদিন ওদের বাড়ী গিয়ে নিজের চোখে দেখে এলুম চামেলী সেজে গুজে কনের মত বসে আছে, তারপর শুনেছি তাদের পছন্দ হয়েছে রবিবারে পাকাদেখা হয়ে বিয়ের দিন ঠিক হবে।

যূথিকা—সত্যি বলছিস? তা বেশ তো আমাদের তো মজাই হবে, তা তুই এমন জবর খবরটা আমাদের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলি কেন ভাই চামেলী?

চামেলী—লুকোবো কেন যুঁই, এসব খবর কি আর বন্ধু-মহলে লুকোনো থাকে ভাই, তবে সভার মাঝে নিজে ঢাক পিটোতে লজ্জা করে যে।

যুঁই—ও: তাই বলিস নি বুঝি? তা দেখিস লজ্জায় আমাদের নেমন্তন্নটা যেন বাদ দিস নে। হাত ধুয়ে বসে রইলুম যেমন ডাক পড়বে অমনি ছুটে গিয়ে একপেট চব্য চষ্য খেয়ে বাসর ঘরে গিয়ে বরের সঙ্গে খানিকটা রগড় করে আসা যাবে কি বলিস মাধবী? তোর খবর কি বিয়ের কিছু ঠিক্ ঠাক্ হল না কি রে?

চামেলী—হ্যাঁ রে ওর তো এক জায়গায় কথা বার্ত্তা চল্‌ছে হলেই হয়। এই বার তোর খবর কি যুঁই বল্ ভাই মত বদ্‌লেছিস কি না?

যুই—(তাড়াতাড়ি হাত যোড় করিয়া কহিল) রক্ষে কর ভাই আমাকে আর দলে টান্‌তে হবেনা। আমার সঙ্কল্প তো আর তোদের মত ঠুনকো নয় যে "বিয়ে করব না অন্ততঃ একটা পাশ না করে কিছুতেই না" বলে এক দিন ধরে জোর গলায় মন্তব্য প্রকাশ করে, আর, বিয়েতে পণ নেওয়া বন্ধ করবার জন্যে কুমারী সমিতি গঠন করবার চেষ্টা করতে করতে যেই বাড়ীতে কথা-বার্ত্তা ঠিক করা হবে অমনি বিনা দ্বিধায় সুবোধ বালকের মত—থুড়ি সুবোধ বালিকার মত বিয়ের ফাঁস পরবার জন্যে গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে সাগ্রহে সেই শুভ দিনটীর প্রতীক্ষা করব। যুঁই সে রকম মেয়েই নয়, ভাই আমার সঙ্কল্প স্থির, আগে দুটো পাশ করি তার-পর যদি কেউ সাধ্যি সাধনা করে আমাকে বিয়ে করতে চায় যদি তাকে মনে ধরে, তবেই যুঁইয়ের সিঁথিতে কোন দিন সিঁদুর উঠবে, তা নয় তো এজন্মের মত ও স্বাদে বঞ্চিতই থেকে যেতে হবে। তোরা অবশ্য বিয়ে থা করে সুখী হ প্রার্থনা করি। তবে আর বছর দুই অপেক্ষা করে একটা পাশ করে নিয়ে যদি বউ হয়ে সংসারে প্রবেশ করতিস ভালো হত না কি?

মাধবী—(দুঃখিত স্বরে কহিল) কি করব ভাই বাড়ীতে অনেক করে সেই কথাই বলে ছিলুম, কিন্তু মা কাঁদলেন বল্লেন, "আমরা গেরস্থ মানুষ, তায় আবার খোঁজ করবার লোক নেই, এমন সম্বন্ধ হাতছাড়া হয়ে গেলে মুস্কিল হবে।" মাসীমা'র সইয়ের ছেলে বর কিনা, মাসীমাই সম্বন্ধ ঠিক্ করছেন ওখানে বিয়ে হ'লে তাঁরা খুব দেখা শোনা করবেন। জানো তো ভাই বাবা নেই, দাদা একলা মানুষ সেও বিদেশে চাকরী নিয়ে চলে যাচ্ছে। এখানে যদি মা আর আমি থাকি তা হলে আমাদেরই বা কে দেখবে; আর সেখানে দাদাকেই বা কে দেখা শোনা করবে। তাই মা বল্লেন "বিদেশে যেতে হলেও এখন পড়া ছাড়তে হবে আর বোর্ডিংয়ে রাখা দাদার মত নয়। কাজেই এমন সুযোগ যখন ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন তাকে অবহেলা করা উচিত নয়।" এর পর আর আমি কি বলব ভাই?

চামেলী—আমিও কি আপত্তি করিনি কিন্তু কি করবো ভাই তোর মত স্বাধীনতা তো সকলের থাকেনা। তোর বাবার নিজেরও এখন বিয়ে না দিয়ে পড়াবার ইচ্ছা, আর তার উপর তোর মতেই তাঁর মত কাজেই তুই এমন সুবিধে পেয়েছিস্। আমার

বাবা তো সে রকম লোক ন'ন—এমনিতে অবশ্য খুবই ভালো মানুষ, কিন্তু তাঁর কথার ওপর কথা বললেই সে যেই বলুক না কেন, অমনি ব্যস একেবারে রেগে অস্থির হয়ে উঠবেন, কাজেই আমি আর কি করব বল্?

যুঁই—না না তোদের কারুকে কিছু করতে হবেনা, তোরা দুজনে শান্ত শিষ্ট বউটী হয়ে মনের সুখে ঘর সংসার কর গে যা ভাই। কিন্তু দেখিস্ ভাই বর পেয়ে যেন পুরোনো বন্ধুটীকে ভুলে যাস্‌নে তোরা, তা'হ'লে কিন্তু বড় কষ্ট হবে আমার। হাঁ ভালো কথা, আমাদের কল্পিত "কুমারী সমিতি" কি তা'হ'লে কল্পনাতেই রয়ে গেল? অঙ্কুরিত হবার কোন লক্ষণ তো আর দেখ্‌ছি না, কেবল যা প্রস্তাবটাই উত্থাপিত হয়ে রইল।

(চামেলী ও মাধবী লজ্জায় মাথা নত করিল)। কিছুক্ষণ পরে মাধবী সঙ্কুচিত ভাবে কহিল, আমরা তো সে কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে পারলুম না যুঁই, তুই ভাই আর সব বন্ধুদের মধ্যে, ক্লাশের মেয়েদের মধ্যে না হয় দেখ যদি কুমারী সমিতি গঠনে সাহায্য করবার উপযুক্ত কয়েকজন মেয়েকে দেখতে পাস্, দুচার জন তো এখনো তোর বন্ধুদের মধ্যেই আছে।

যুঁই—নাঃ ভাই সে আর কাজ নেই। বাংলাদেশের কটা মেয়েই বা স্বাধীন মতে চলতে পায় বল? দু পাঁচজন যদিও বা পায় তাদের খুঁজে বের করতে পারলেও হয়তো শেষ অবধি আমার হয়রাণীই সার হবে। এদিকে লেখাপড়ার ক্ষতি হ'লে বাবা রাগ করবেন আমারও মিছামিছি সময় নষ্ট হবে, দরকার নেই আমার অত হাঙ্গামায়। তোরা সঙ্গে থাকলে তবু চেষ্টা করা যেতে পারতো। যাহ'ক কুমারী নাম ঘোচাবার জন্যে তোরা যখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তখন আর সে আলোচনায় কাজ নেই। যাহ'ক মনে করে চিঠি পত্র দিস্ ভাই। আর হাঁ—ভালোকথা বিয়ে হচ্ছে বলে একেবারে সব বিদ্যেই যেন ভাতে পোড়া দিয়ে খাসনে। মাধবী তোর সাহিত্যচর্চ্চা আর চামেলী তোর আর্টের সাধনা এগুলো অন্ততঃ সময় সুবিধে মত একটু আধটু নিয়ে বসিস। পাড়ার কথা আর না তোলাই ভালো কি বলিস? এখন থেকে নতুন পাঠ সুরু হতে চলল। বলিয়া যুথিকা হাসিতে লাগিল।

চামেলী—(হাত যোড় করিয়া অবনত মস্তকে কহিল)—যে আজ্ঞে, আপনার উপদেশ স্মরণ থাকবে বন্ধু। আপনিও এ অধিনীদের পাশের পড়ার চাপে যেন বিস্মৃত হবেন না। আর আপনার সুন্দর হস্তের অভিনব শিল্পকলার উন্নতির নিদর্শন আমরাও যথাসময়ে পাবো তো? (চামেলীর বলিবার ভঙ্গীতে তিনজনেই হাসিয়া উঠিল)।

হাসিতে হাসিতে যুথিকা কহিল—তথাস্তু মহাশয়, সেদিনের বিলম্ব নাই সত্বরই আপনাদের বিবাহবাসরে অযোগ্য হস্তের সুযোগ্য উপহার কিঞ্চিত নিবেদিত হবে।

মাধবী—দেখেছিস্ চামেলী যুঁই এমন বুড়ো গিন্নির মত কথা বলছে আর উপদেশ দিচ্ছে, যেন মনে হচ্ছে—আমাদের বিয়ে বুঝি বা হয়েই গেছে, এইবার শ্বশুরবাড়ী যাবার পালা।

যুথিকা—গম্ভীর হইয়া কহিল—আহা হা, রহু ধৈর্য্যং। ও কথা পাকা-পাকি হওয়াও যা বিয়ে হয়ে যাওয়াও প্রায় তাই। যাহোক বন্ধু মিষ্টান্ন মিতরে জনাঃ মনে রেখো কিন্তু। তাহারা আবার হাসিতে লাগিল।

এই সময় মাধবীর ভ্রাতা বিকাশ অসিয়া কহিল কিরে মাধবী তোরা যে দেখছি বেড়াতে এসে একেবারে গল্পে মসগুল হয়ে গেলি। সন্ধ্যা যে ক্রমে নিশুতি রাত্রে পরিণত হয়ে এল বাড়ী যেতে হবে না?

মাধবী—এই যে দাদা যাচ্ছি চলো। (বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল সঙ্গে সঙ্গে যুথিকা ও চামেলী উঠিয়া পড়িল। ফটকের নিকট চামেলীদের বাড়ীর মোটরকার দাঁড়াইয়া ছিল, এবং অদূরে ঘাসের উপর শুইয়া যুথিকাদের বাড়ীর দাসী দিব্য আরামে নিদ্রা যাইতেছিল, তাহাকে ডকিয়া লইয়া সকলে যাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সোফার হর্ণ বাজাইয়া "কার" ছুটাইয়া দিল।

—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—মাধবীদের গৃহের একটী কক্ষ।

যুথিকা ও মাধবী।

ছয় বৎসর পরের কথা।

মাধবী সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া সম্প্রতি মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিয়াছে। বিকাশ কলিকাতায় বদলী হওয়ায় কয়েক দিন পূর্ব্বে তাহারা সকলে কলিকাতায় আসিয়াছে। যুথিকা ইতিমধ্যে আই, এ, পাশ করিয়াছে, মাধবীদের আগমন সংবাদ পাইয়া সে আজ মাধবীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। প্রথম সাক্ষাতে উভয়ে কেহই কোনো কথা বলিতে পারিল না। মাধবী বাল্যসখীকে দেখিয়া নীরবে নয়ন জলে ভাসিতে লাগিল; যুথিকাও নীরবে তাহার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে পর, যুথিকা শান্ত হইয়া সস্নেহে মাধবীর চোখ মুখ মুছাইয়া দিতে দিতে কহিল, চুপ কর মাধবী আর কেঁদে কি হবে ভাই? কান্নাই যে জীবনের সম্বল হয়ে রইল। ভাগ্যে দুঃখ আছে তাই,—নইলে মাত্র পাঁচ ছয় বছরের জন্য নাই বা তোরা সংসার পাততিস ভাই। খেলা ধূলায় কাজ কর্ম্মে মেতে থাকলে একসঙ্গে আমাদের দিনগুলো বেশ কেটে যেতে পারতো কিন্তু অদৃষ্টের উপর তো হাত নেই। চামেলীর ভাগ্যের কথাও শুনেছিস তো মাধবী? তোর দুঃখ একরকমের তার আবার আর এক রকমের। বিস্মিতা যুথিকার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—না শুনিনি তো, কি হয়েছে তার।

ব্যথিত কণ্ঠে যুথিকা কহিল—সে আজ প্রায় একবছর হবে স্বামী-সঙ্গ ত্যাগ করে শ্বশুরবাড়ীর বাস উঠিয়ে দিয়ে বাপের কাছে চলে এলেছে। চামেলীর বাবা তার নামে একখানা বাড়ী লিখে দিয়েছেন, তার ভাড়া থেকে বেশ মোটা রকম আয় হয়। তাঁর মেয়ে যাতে দুঃখের উপর আবার অর্থের অভাবে কোনোদিন কষ্ট না পায় এই তাঁর ইচ্ছা।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা মাধবী ক্ষণেকের জন্য নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বিস্মৃত হইয়া বন্ধুর দুঃখে অতিমাত্রায় দুঃখিতা হইয়া সহানুভূতির সহিত বলিয়া উঠিল—সে তো খুব ভাল কাজই করেছেন তিনি। কিন্তু চামেলী একেবারে শ্বশুরবাড়ী ত্যাগ করে চলে এল কেন ভাই তারা কি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে না কি যুঁই?

যুঁই—না ঠিক তাড়িয়ে দেয় নি। তবে শুনেছি ওর স্বামীর স্বভাব চরিত্র তেমন ভাল নয়, তার উপর তিনি চামেলীকে দেখতে পারেন না ভয়ানক উপেক্ষা আর তাচ্ছিল্য করেন, তার উপর আবার শাশুড়ী ননদরাও ওকে বড় কষ্ট দ্যায় অনেক অত্যাচার অপমান সহ্য করে ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। একটি দেওর নাকি খুব যত্ন করতো দেখাশোনা করতো, কিন্তু এমন ভাগ্য সেও কিছুদিন আগে রেঙ্গুনে চাকরী নিয়ে চলে গেছে। সে যাবার পর সকলের ব্যবহারই খারাপ হয়ে উঠল, আর সহ্য করতে না পেরে ওর মন ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে গেল তাই বাবাকে চিঠি লিখে নিয়ে গিয়ে চামেলী তার সঙ্গে একেবারে চলে এল। অনেকে অনেক নিন্দে চর্চ্চা করে। আমি, তো বলি নিজের আত্মমর্য্যাদা বজায় রেখে চলে এসে চামেলী খুব ভালো কাজই করেছে। ওর বাবাও সে জন্য এতটুকু বিরক্ত হ'ন নি তিনি বলেন, "শুধু টাকা থাকলেই মানুষ বড় হয় না। মনুষ্যত্বে তারা অত্যন্ত ছোট,—তা নইলে আমার এমন লক্ষ্মী মেয়েকে কষ্ট দিতে পারে?"

সে কথা তাঁর একটুও মিথ্যে নয়। বেচারী চামেলী একেবারে যেন লজ্জায় দুঃখে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। ভারী দুঃখ হয় ভাই তোদের জন্যে যেমন চেহারা হয়েছে ওর তেমনি হয়েছে তোর।

—ক্রমশঃ—

প্রণবচন্দ্র

শ্রীসরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন এক মহা মুস্কিল বেঁধে গেল। ব্যাপারটা যে এমন করে এতদূরে গড়াতে পারে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি নি কেউ।

রোজই যেমন প্রিন্সপালের আইন অমান্য ক'রে লিজার টাইমে কলেজের পূর্বদিকের নির্জ্জন প্রফেসর রুমের ভিতর সদলবলে উপস্থিত হয়ে ফ্যান্, লাইট, ট্যাপ ওয়াটার যা কিছু আছে সব গুলোকেই ব্যতিব্যস্ত করে টেবিল বাজিয়ে গান চল্‌তো সেদিনও ঠিক তেমনিই চলেছিলো। এসব বিষয়ে আমাদের শত্রু হল আদ্যিকালের বুড়ো দারোয়ান 'মোহন'। কলেজের জন্মাবধি সে তার লালন পালন করে বলে তার ক্ষমতা নাকি প্রিন্সিপালেরই সমান। পাকা গোঁফে চাড়া দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই আমরা চেঁচিয়ে উঠতুম 'পুষ্যিপুত্তুর রে।' তার পরই যে যেখানে পারে ভালো ছেলের মত অন্যমনস্কভাবে স'রে পরতুম।

মোহন চন্দ্র প্রায়ই ভয় দেখাতো যে প্রিন্সিপালকে বলে এবার সে একটা কিছু করবেই। কিন্তু সে করা আর তার কোনদিনই হয়ে উঠতো না বলে আমরা এ বিষয়ে এইটুখানি বেপরোয়া ভাবের ছিলুম।

সেদিন বেশ স্বাভাবিক ভাবেই চলছিলো

দু'তিনজনে মহা উল্লাসে এক খেঁকী প্রফেসরের ডেস্কখানা প্রায় ভাঙবার জোগাড় করে রথীনের 'ময়না দিদি লো'—আর হরেনের Pomp Pomp Pomp walking shoe, dancing shoe" গানের সঙ্গে তাল রেখে চলছিলো। মজলিস যখন বেশ জমে উঠেছে তখন প্রণব বড় কোচটার উপর জুতাসমেত দাঁড়িয়ে শিশির বাবুর নাট্য প্রতিভার পরিচয় দিতে হাতলটার উপর সবেমাত্র হুমরি খেয়ে প'ড়ে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে "তুই কি আমার সীতার তনয় ?"...

ঠিক সেই সময়ে দোরের পেতলের হাতলটার একটি বিশেষ আশঙ্কা জনক শব্দ হলো! ক্যা—অ্যা—চ।"

শব্দটির এমন একটা গুণ বা দোষ ছিলো শুনবামাত্র ঘরের সব মানুষগুলি সম্পূর্ণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়্‌তো।

সিগারেটগুলো ঝুপঝাপ করে জুতার তলায় আশ্রয় নিতে না নিতেই দেখা গেলো প্রিন্সিপাল দত্ত সাহেবের ভীষণ চোখ দুটো ঘরের কুণ্ডলিত ধোঁয়ার মধ্যেও আপন দীপ্তি নিয়ে জ্বল্ জ্বল করছে। আড় চোখে চেয়ে নিজেই তো যে যার বুকের মধ্যে অর্দ্ধেক রক্ত শুকিয়ে ফেল্লুম।

প্রথমেই দত্ত সাহেব সামনের দু'জনকে ধরে এক হুমকি দিলেন, What is your roll number ?'

বিজয় বল্লে—ফোর্থ ইয়ার আর্ট্স থার্টিন।

হরেণ বল্লে—সার, সার, উ—উ ইঁ টেন।

দত্ত সাহেবের নোটবুকে লেখা হ'য়ে গেল কট্ কট্ করে।

তারপর সাইকেল ছেড়ে দিয়ে একেবারে কোচের কাছে এসে দাঁত খিঁচিয়ে তিনি হাঁক দিলেন "ইউ গেট আপ"।

প্রণব এতক্ষণ রামের পোজ দিয়ে হাতলটাকে লব কল্পনা করে নিয়ে উপুড় হয়ে দম বন্ধ করে মড়ার মতো প'ড়ে ছিলো প্রিন্সিপালের ডাকে তার চৈতন্য হলো না।

প্রিন্সিপাল সোনালী রঙের পার্কার কলমের পিছন দিয়ে প্রণবের পিঠে একটা খোঁচা দিয়ে ডাকলেন—"ইউ সেভেনটিন।"

প্রণবের এবার আর ভুল করবার জো ছিল না যে দত্ত সাহেব হয়ত অন্য কাউকে ডাকছেন। সে যে দাগী আসামী, আর সেই যে পালের গোদা তা আর দত্ত সাহেবের জানতে বাকী ছিল না।

ডাকের উপর ডাক পড়তে লাগলো।

প্রণব অগত্যা চোখ রগড়াতে রগড়াতে কাঁচা ঘুমটা ভেঙে যাওয়ার আলস্য দেখিয়ে দত্ত সাহেবের মুখের পানে ভালমানুষটির মতো চেয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো।

দাঁড়াবামাত্র সার্টের পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকটা ফট্ করে সবার সামনে মাটিতে প'ড়ে গেল। প্রণব

তাড়াতাড়ি সেটা জুতার তলায় চেপে ফেল্লেও কারুর আর দেখতে বাকী থাকে নি।

প্রিন্সিপাল গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন 'কোচের উপর দাঁড়িয়ে অ্যাক্ট কচ্ছিলে নাকি ?'

প্রণব ভ্যাবাচাকা খেয়ে অ্যা অ্যা অ্যা ক'রে সবেমাত্র বলতে যাবে যে মাথা ধরার জন্য সে নির্জ্জন ঘর দেখে 'অনেকক্ষণ আগে থেকে কোচের উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিলো,—এরা যে কখন এসেছে তা সে মোটেই টের পায় নি ইত্যাদি কিন্তু হঠাৎ তার নজর পড়লো যে দত্ত সাহেব একবার তার জামার দিকে আবার শূন্য কোচটার পানে ফিরে ফিরে কি যেন বিশেষভাবে লক্ষ্য করছেন। এমন ভাবে নিরীক্ষণ করার বস্তুটি যে কি তা আমাদের প্রণব জানে খুব ভালো রকমই। ভাব—বিভোর অবস্থায় দরজার কাছে শব্দহতেই সে স্থবীরত্ব লাভ করেছিলো ; তার পর একটুও নড়বার সময় পায় নি। হাতের সিগারেটটা যে কোচের কোণে তার সার্টের পকেটটিকেও ছাইয়েরআকার দান করেছে তা সে ভালো রকমই জানতে পারছিলো—কিন্তু কি করে ? উপায় কি ? টেনে ফেল্তে গেলেই যে ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। প্রিন্সিপালের ডাকে দাঁড়িয়ে উঠতেও জলন্ত সিগারেটটা যে তার জামার সঙ্গেই উঠে এসেছে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হ'য়ে তা সে মোটেই টের পায় নি। এইবার হঠাৎ ছ্যাকা লাগায় আমাদের বেচারা প্রণবভায়া সেটিকে জামার বৃহৎ পোড়া গর্ত্ত থেকে টেনে মাটিতে ফেল্তে বাধ্য হলো।

তার অবস্থা দেখে মেঘের কোলে বিদ্যুতের মতো দত্ত সাহেবের ঘন কালো গোঁফ জোড়ার নীচে একটুখানি হাসির আলো উঁকি দিয়ে নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেল। তক্ষুনি মুখখানাকে আরো দশ পার্সেন্ট গম্ভীর ক'রে নিয়ে তিনি প্রণবের হাতে এক ঝাঁকানি দিয়ে বল্লেন—

"এসো এধারে।"

প্রণব বলীর পাঠাটির মত দত্তসাহেবের পিছু পিছু চল্লো তাঁর ঘরের দিকে। আমরা সেই ফাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে যে যেদিকে পারা যায় টেনে দিলুম দৌড়। কি জানি শেষে বলা যায় না তো কিছুই—এ স্থলে 'য পলায়তি সঃ জীবতি মন্ত্রই' মেনে চলা হলো বুদ্ধিমানের কাজ।

২

তিন দিন পরে প্রণবকে কলেজ থেকে রাসটিকেট করার খবর পেয়েই আমরা ধর্ম্মঘট করে ছাত্র ও অধ্যাপক দলের মধ্যে একটা সাড়া এনে দিলুম। পিকেটিং যখন দ্বিতীয় দিনও খুবই সাফল্যজনক দেখা গেল তখন বিকেলের দিকে মিঃ দত্ত হঠাৎ এক নোটিস্ জারী করে আরও তিন চারিটি পাণ্ডার কলেজের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিলেন। নোটিসটিতে কাজ হ'লো খুবই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খবর পাওয়া গেল যে গোপনে প্রায় শ খানেক ছেলে প্রিন্সিপালের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি পাঠিয়েছে।

ব্যাপারটায় খুবই দমে গেলুম। প্রণবের জন্য—সত্যই মনটা খারাপ হয়ে গেল। একে তার বাবা নেই তায় কাকা আবার বেজায় মেজাজী লোক। এই সব ব্যাপার শুনে তিনি প্রণবকে স্পষ্টই লিখে পাঠিয়েছেন যে তার কাছ থেকে ভবিষ্যতে আর কোনোরকম সাহায্য সে যেন আশা না করে। অথচ প্রণবের মত ছেলে যদি scope পায় তো সত্যি অনেক কিছুই করতে পারে। আমরা তো জানি তার ভিতরে একটা মহৎ শক্তি আছে। পায়ে ফুটবল পেলে সে যেমন দর্শককে মুগ্ধ করতে পারে, ঠিক তেমনি পারে যদি সে হাতে ধরে একটা তুলি কিম্বা এক টুকরো খড়ি। ছবি আঁকা জিনিষটার সে কালচার করে খুবই। কিন্তু তার আর্ট যে সব সময়ে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ তা নয়। তার আর্টিষ্ট মনটিকে মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত পাগলামির আনন্দ ভূতের মত চেপে বসে। এ পাগলামী কিন্তু তার নিজের ঘরে থাকে না মোটেই ঘরের কাগজ পত্র হাঁটকালে অনেক সময় বেশ সুন্দর সুন্দর গভীর ভাবপূর্ণ দু'দশ খানা ছবি পাওয়া যায়। পত্রিকায় যেগুলো প্রকাশিত হয় সে গুলো হলো এই দলেরই। কিন্তু এই পর্য্যন্ত যে সব ছবি সে বন্ধুদের আড্ডায় নিয়ে গেছে কিম্বা যেগুলি কলেজের বোর্ড ও দেয়ালে রঙিন খড়ি দিয়ে এঁকেছে—তার অধিকাংশই হয় অতীব অশ্লীল আর নয় কারুর বিকট মুখভঙ্গিমাযুক্ত অপূর্ব্ব ব্যঙ্গ চিত্র।

কলেজে যখন এমনি হৈ হৈ চল্‌ছে তখন আমাদের প্রণবভায়া আর এক কাণ্ড বাধিয়ে বসলো।

তারই বা দোষ কি! এ রকম দুষ্টমী তো সে চিরকালই করে, আর বেমালুম গা ঢাকাও দিতে পারে। কিন্তু সেদিন কোথা দিয়ে যে কি হ'য়ে গেল তার কূল কিনারা পাওয়া যায় না।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই:—

কলেজের কম্পাউণ্ডের মধ্যেই প্রিন্সিপালের বাড়ী, মোটর গ্যারেজ, টেনিস লন প্রভৃতি যা কিছু সব।

ধর্ম্মঘটের তৃতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের প্রণবভায়া খানিকটা সাদা তেলের রঙে দত্ত সাহেবের কালো রঙের নতুন Studibaker এর পিছনে, তাড়াতাড়ি কয়েকটা টান দিয়ে খুব মজার একটা ছবি ফুটিয়ে তুলছিলো।

আঁকা শেষ করে তুলিটা তুলে ধরতেই পিছনে কে একজন খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

প্রণব ভূত দেখার মত চম্‌কে উঠে পিছন ফিরতেই দেখে যে বাসন্তী রঙের সাড়ী পরে দাঁড়িয়ে তারই কলা-শিল্পের পানে চেয়ে লীলা নিজের মনেই হেসে খুন।

লীলাকে চেনে সবাই। লীলা হলো দত্ত সাহেবের একমাত্র কন্যা। মেয়ে কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারে আর্টস্ পড়ে। গায়ের রঙ কিছু কালো বটে কিন্তু সারা দেহটি তার একসঙ্গে দেখতে গেলে প্রণবের আর্টিষ্ট চোখে সে সত্যই অপূর্ব্ব সুন্দরী। তার মুখ চোখ এমন কি সারাঅঙ্গের ভিতরে এমন একটা জিনিষ আছে যার মাঝে সহজেই মনটা বাঁধা পড়ে। এই সহজ কমনীয়তার মাঝেও তার একটা সরল তেজোদীপ্ত ভাব সব সময়েই চোখে পড়ে।

প্রণবের অবস্থা দেখে কোনরকমে হাসি চেপে লীলা বলে উঠলো—'বাঃ! চমৎকার '

প্রণবভায়া আর কেনো কথাবার্ত্তা নয়—যেন তেমন কিছুই হয়নি, আর কাউকেই চিন্‌তে পাচ্ছেনা এমনি অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়ে ধীরে ধীরে গেটের দিকে এগিয়ে চল্‌লো।

গেটের কড়া ধরে টান দিয়ে বুঝলো যে এরই মধ্যে কে চাবি লাগিয়ে দিয়েছে।

পিছন ফিরে দেখে যে লীলা তার কাছেই এসে হাজির হয়েছে।

প্রণব বৃহৎ পাঁচিলের পানে একবার তাকিয়ে নিয়েই বিশেষ হতাশ হ'য়ে গেল।

লীলা আঁচলের খুঁটটা পাকাতে পাকাতে ছেলেমানুষী ঢঙ্গে চোখ মুখ ঘুরিয়ে প্রণবকে শুনিয়েই বললে বোধ হয়— "বেশ কেমন মজা হয়েছে। ইস্ যে উঁচু পাঁচিল Oh my God had I been a monkey!"

প্রণবের অবস্থা সত্যই শোচনীয়। পৃথিবীশুদ্ধ লোককে তখন সে গালাগালি দিচ্ছে—মনে মনে।

লীলা একমুখ হাসি নিমেষের মধ্যে গিলে ফেলে চোখে মুখে বেশ একটু হতাশভাব ফুটিয়ে তুলে প্রণবের বাথায় খুবই ব্যথিত হ'লো—"কি করবেন তা হলে? আমি যদি বাবাকে ডেকে দি এবার"?

প্রণব কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দেখে লীলা হন্ হন্ করে সত্য সত্যই চললো দত্ত সাহেবকে ডাক দিতে। তবুও চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল প্রণব পরম নির্ভরশীল হয়ে। হাজার হোক লীলা তো মেয়ে। টিকৃটিকির কাজটা কি আর পারবে সে! কিন্তু লীলা যখন সত্য সত্যই সিঁড়িতে উঠতে আরম্ভ করলো তখন আর তার বুকে এতটুকুও সাহস রইল না। এতক্ষণ ভেবেছিলো লীলা হয়তো অতখানি করতে পারবে না অন্ততঃ চেনা পরিচয়ের খাতিরে সে ভরসা যখন আর রইল না তখন লীলার মতো মেয়ে যে সবই করতে পারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে প্রণব ছুটলো সিঁড়ির দিকে।

প্রণবকে কাছাকাছি এসে পড়তে দেখে যেই লীলা পালাতে যাবে এমন সময় প্রণব খপ করে তার আচলের কোণটা ধরে ফেল্লে।

আঁচলে টান পরবামাত্র লীলা প্রণবের দিকে ফিরে গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো "ছি! এই রকম বুঝি ভদ্রতা শিখেছেন?"

লীলাকে তখন আর চেনবার জো নেই। পাঁচ মিনিট আগের লীলার সঙ্গে এর যেন আর এক রত্তি মিল নেই কোথাও।

প্রণব থতমত খেয়ে গিয়ে সবেমাত্র আঁচলটা ছেড়ে দিয়েছে এমন সময় বৈঠকখানার দরজাটা খুলে গেল। হঠাৎ সিংহের মতো লাফ দিয়ে দত্ত সাহেব ভীষণ চীৎকার

করে ইংরাজীতে কয়েকটা গালাগালি উচ্চারণ করতে করতে প্রণবের একটা হাত ধরে একটান দিয়ে ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন। চাকর দরোয়ানকে উপস্থিত হতে দেখে লীলা কোন কিছু না বলে বিশেষ অপরাধীর মত বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

তার পরদিন শোনা গেল দত্ত সাহেব পুলিসে ডায়রী করেছেন। প্রনব নাকি তাঁর বাড়ী চড়াও করে লীলাকে অপমান করতে গিয়েছিলো। কেবলমাত্র কার্যতৎপরতা আর যথেষ্ট উপস্থিতে বুদ্ধির জোরেই মেয়ে তাঁর রক্ষা পেয়েছে সেদিন। প্রমান ও সাক্ষীর অভাব নেই। দত্ত সাহেব এবং চাকর দারোয়ান প্রভৃতি সকলেরই ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখা।

বাসা থেকে খবর পাওয়া গেল সেইদিনই সকাল বেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তার নামে সমন জারি করেছেন। সন্ধ্যে সাতটা আটটার সময় পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে।

ব্যাপার শুনে মনটা ভারি দমে গেল। বিকেলবেলায় প্রনবের মেসের ঘরখানিতে হাজির হ'য়ে দেখি যে স্নানাহার ত্যাগ ক'রে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে আছে সে, শরীরের বিষয়ে অনেকগুলি মামুলী উপদেশ দিলুম কিন্তু কাজে লাগলো না একটিও। অগত্যা চলে এসে তার জন্যে জামীনের বন্দোবস্ত করতে লাগলুম।

সন্ধ্যা বেলায় ক্লান্ত হয়ে আবার মেসেতেই ফিরে এলুম। জামিনের জন্য কাউকেই ঠিক করা গেল না।

মেসে ঢুকেই দেখি চার পাঁচ জন পুলিস সঙ্গে নিয়ে ইনস্পেক্টর বাবু আর আমাদের দত্ত সাহেব প্রনবের ঘরের দরজায় সজোরে লাথি মারছেন। দরজা ঝন্ ঝন্ করে কেঁপে উঠছে তবুও ভিতরে জনপ্রানীর টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। দত্ত সাহেব ইংরাজীর বাছাই বাছাই গালাগালি খুব ধীর বিক্রমে বলে চলেছেন।

সব জিনিষগুলো এক সঙ্গে ভাবতে গিয়ে বুকটা আমার কেমন যেন ছাঁৎ করে উঠ্লো। প্রনব শেষে আত্মহত্যা করে নিতো! খানিকক্ষনের মধ্যেই কেমন যেন ভয় করতে লাগ্লো, হয়তো সত্যই তাই। বলা যায় না তো কিছুই সে যে রকম ভাবপ্রবন ছেলে!

ভয়টার একটু আঁচ্ দেবার জন্য দত্ত সাহেবের একটু কাছ ঘেঁসে দাঁড়ালুম।

দত্ত সাহেব এপাশ ওপাশ ঘুরে দেয়ালে ইলেক্ট্রীকের তারের গর্ত্ত দিয়ে ঘরের ভিতরের দিকে একবার চেয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে পুলিস ইন্স্পেক্টরের কাছে ছুটে এলেন, পুলিস তখন এদিকে দরজা ভেঙ্গে ফেলবার জোগাড় করছে।

ইন্স্পেক্টরবাবু জিজ্ঞেস করলেন—"তা হ'লে সই দিয়ে বাইরের দিকে জানালায় লোক পাঠাই?"

দত্ত সাহেব মুখখানাকে আর একটু গম্ভীর করে বল্লেন—"না! আর দরকার নেই।"

ইন্স্পেক্টর বাবু অবাক্ হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে দত্ত সাহেব প্রনবের জন্য হঠাৎ খুব করুণা পরবস হয়ে উত্তর দিলেন "আপনারা এখন যেতে পারেন। বেচারী ছেলে মানুষ কি ভয়ই না পেয়েছে। এর পর যা করবার আমিই করবো। আপনারা এখন যেতে পারেন আমি কালই মকর্দ্দামা তুলে নেবো।"

ইন্স্পেক্টর বাবু ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না পেরে দলবল নিয়ে বেতের ছড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

সিঁড়ির উপর পুলিসের জুতার খট্ খট্ আওয়াজ থামবার আগেই প্রণবের দরজায় খিল্ খোলার খুট্ করে শব্দ শোনা গেল।

প্রণব যে পটাসিয়াম্ সাইনাইট খায় নি তার এই সদ্য সদ্য খিল-খোলা-রূপ প্রমাণ থেকে বুঝতে পেরে মনে মনে বেশ একটু আনন্দই হ'লো!

পরম আগ্রহে বল্লুম—"স্যার চলুন।" ইচ্ছেটা ছিলো যে আপোষে মিমাংসাটা এইখানেই হ'য়ে যাক্। কিন্তু তা আর হ'লো কই?

দত্ত সাহেব রুমাল দিয়ে শুধু শুধু বার পাঁচেক মুখটা মুছে নিয়ে উত্তর দিলেন "নাঃ, আমি এখন চল্লুম—আমার একটু কাজ আছে এখন।"

আর এক মুহুর্ত্তও না দাঁড়িয়ে দত্ত সাহেব সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন তর তর করে!

দত্ত সাহেবের সব কিছুই কেমন যেন একটু হেঁয়ালী হেঁয়ালী মনে হ'তে লাগলো।

কৌতুহল আর চেপে রাখতে না পেরে দোরের কড়া ধ'রে টান মেরে হুড় মুড় ক'রে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েই চমকে উঠি! কী আশ্চর্য্য! এ কখনও আবার হ'তে পারে?

কিন্তু সত্য সত্যই হ'য়েছে যখন তখন আর হ'তে পারে কি না ভেবে কোনো লাভ নেই।

যাকে আসন্ন বিপদের মাঝ হেকে উদ্ধারের জন্য এসেছিলুম, ঘরে ঢুকে দেখি সে উদ্ধার অনুদ্ধারের সম্পূর্ণ বাইরে।

ঘর থেকে বেরিয়ে পালাচ্ছি দেখে আমাদের প্রণব ভায়া চাইনিজইন্‌ক্ মাথানো তুলিটা হাতে নিয়ে চেয়ার থেকে এক লাফে আমার জামাটায় টান দিয়ে ঘরের ভিতর চ'লে এলো। সঙ্গে সঙ্গেই আধখানা ছাড়ানো একটা আপেল আর একটা ছোট ছড়ি নিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এক গ্রাস হাসি চেপে লীলা ব'লে উঠলো—"বাঃ পালাচ্ছেন কোথায়! বসুন, আজকে আমাদের বাদলার দিনটা বেশ ভালো রকমই কাট্‌বে।" তাকে একেবারেই ভুল করবার উপায় ছিলো না সে দিন। রক্ত মাংসের দেহ নিয়ে স্বয়ং লীলা—আমাদের প্রিন্সিপালের অপমানিতা কন্যা জল্ জ্যান্তো লীলা। আর যে আমায় টান মেরে ঘরের ভিতর ফিরিয়ে আন্‌লো তাকে তো সকলেই জানে আমাদের দলের প্রণব ভায়া—বাড়ী চড়াও করা ফৌজদারী আসামী প্রণব চন্দ্র।

ব্যাপার দেখে বেশ বুঝলুম যে প্রণবের এবার আর নিস্তার নেই। দত্ত সাহেব শীঘ্রই হয়তো তাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখ্‌বার আয়োজন করবেন। কোথা দিয়ে কেমন ক'রে যে কি হ'য়ে গেলো কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না।

কাব্য ও কবিতা

শ্রীকমল মুখোপাধ্যায়

এই বনে এই বকুলছায়ে
প্রভাতের ওই উদাস বায়ে,
সারা বেলা কাট্‌বে আমার চিত্ত চিন্তাহারা;
তোমার মাঝে থাক্‌ব আমি সদাই আত্মহারা।
বকুল ফুলের সুবাস মেখে
সবুজ প্রাণের অ-বুঝ চোখে
তোমার পানে থাক্‌ব চেয়ে সাধ যে জাগে প্রাণে;
জীবনের এই ছুটির দিনে—পরম সঙ্গোপনে।
তোমার আমার একা একা
কোথাও কাহার নাইক দেখা,
তোমার কোলে মাথাটি রেখে রইবো আমি চেয়ে,
বিশ্বের চলা আমার চোখে আস্‌বে ঝাপসা হ'য়ে।
অলস মোরে ব'লবে লোকে
কেউবা তীব্র বিষের চোখে
হান্‌বে ঘৃণার বান্?—ওগো তাইত আমি চাই,
তোমার বুকে স্থান আছে মোর—পরম শান্তি তাই।

তোমার বাহুর বাঁধন খানি
ভুলিয়ে আমার সকল গ্লানি
কোন্ সে স্বর্গরাজ্যের কথা বলে' দেবে প্রিয়া,
ময়লা মাটী ধুয়ে আমার শুভ্র হবে গো হিয়া।
ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা
তোমার প্রেমে দিশেহারা,—
তোমার আমার মাঝেতে শুধু বকুল ফুলের বাসা।
ফুলের গন্ধে রঙীন্ হ'য়ে উঠছে প্রাণের ভাষা।
কোকিলের ওই কুহুতানে
মলয়ের ওই সমীরণে
বুকের মাঝে উঠবে জ্বলে' তোমার পূজার ধুপ,
ব্যথা-বেদন সজীব হ'য়ে ধরবে কবির রূপ।
অন্তরের আদেশ মানি,
কাব্য আর কবিতা রাণী
আমার প্রাণে থাক্‌বে ফুটে সারা জীবন ভরি'
এই সাধনা আছে আমার জীবন উজল করি'।

অবাক্

শ্রীবিজয় গোপাল বক্সী

১

আমার ভায়রা ভাই মোহিতবাবু থাকতেন মানিকতলায় বাসা ক'রে। রাইটার্স বিল্ডিংসে কাজ ক'রতেন—মাইনে শ দেড়েক টাকাই শুনেছিলুম দু' বছর আগে। আমার শ্বশুরের মেয়ে দু'টী, বড়টীর সাথেই তার বিয়ে হ'য়ে ছিল। ভায়রার বাসা থেকে একবার বেড়িয়ে আসবার জন্য অনেক দিন ধ'রে অনুরোধ পত্র আস্‌ছে। শালী মহাশয়া একজন ছোটখাট সাহিত্যিকা; মাঝে মাঝে এমন এক একখানা মিঠে কড়া ঠাট্টা বিদ্রূপ মেশানো চিঠি লিখতেন—যার জবাব দেবার জন্য আমাকে গভীর রাত পর্য্যন্ত কাগজ কলম নিয়ে ব'সে থাকতে হ'তো। এবার চিঠি পেয়েই সঙ্কল্প ক'রে বসলুম—যে ক'রে হোক কল্‌কাতায় এবার যাবোই। পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ী,—নানা কাজের ঝাঞ্ঝাট—যতদুর সম্ভব মিটিয়ে দুর্গার নাম স্মরণ ক'রে বেরিয়ে পড়লুম। স্কটস্ লেনে আমার এক বন্ধু থাকতো মেসে; তারই ওখানে গিয়ে উঠলুম। সেখান থেকেই খপর পাঠিয়ে পরদিন বিকেল বেলায় ভায়রার বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলুম। বন্ধুকে ব'লে গেলুম,—'এ বেলায় খাবোনা, ভায়রার বাসায় নেমন্তন্ন আছে।'

বাসার বাইরে চৌকাটের ওপর নম্বরটা একবার ভাল ক'রে দেখে নিয়ে কড়া নাড়লুম,—একবার দু'বার তিন বার। ভেতরে কোন সাড়া শব্দ পেলুম না। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দরজাটা আস্তে ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ঢুকে পড়লুম—ভেবেছিলুম, শালী অথবা ভায়রা একজন কেউ এসে এগিয়ে নিয়ে যাবে। চুলোয় যাক্ এগিয়ে নেওয়া, এখন তাদের পাত্তা পেলেই যে বাঁচি! বাসাটা দোতলা, বছর তিনেক আগে একবার এসেছিলুম, নিতান্ত অপরিচিতও নয়। তবুও পাড়াগাঁয়ে থাকি, পদে পদে 'গেঁয়োভুত' প্রমাণ হবার ভয়; কাজেই ভড়কে না গিয়ে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে সিড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে চল্লুম। প্রথমেই যে ঘরখানা, সেই ঘরে একটা তরুণী—দিব্যি ফিট্ ফাট্, বয়স অনুমান বছর চোদ্দ হ'বে—ব'সে ছিল। বেশ হৃষ্টপুষ্ট খুব সুন্দরী না হ'লেও দিব্যি মিষ্টি চেহারা। মেয়েটী আমার দেখেই মুখখানায় একটু মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে ব'ল্লে,—"আসুন ভেতরে—ঐ চেয়ার রয়েছে বসুন।

মেয়েটীকে আগে আমি কখনো দেখি নি। একটু বিস্মিত হ'য়ে গেলুম। ভায়রা শালী কাউকেও দেখছি নে, তবে কি তারা এ বাসা ছেড়ে দিয়েছে! বাসা ভুল করিনি ত! তাই হ'য়েছে; ১৫ নং দেখতে ভুল ক'রে ১৬ নং দেখে তাতেই ঢুকে প'ড়েছি।—

আমাকে চিন্তিত দেখে মেয়েটী একটু হেসে মিষ্টি স্বরে ব'ল্লে,—"ভাবছেন কি? আসুন ভেতরে।"

পুরুষ লোক হ'য়ে একজন বালিকার কাছে অপ্রস্তুত সাজা সঙ্গত মনে হ'লো না। 'দেখাই যাক্ না কি দাঁড়ায়' ভেবে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে চেয়ারখানায় ব'সে পড়লুম জিজ্ঞেস করলুম,—"এটা কি ১৫ নং বাসা নয়?"

"হ্যাঁ—এইটেই ১৫ নং বাসা। সে কথা কেন বল্‌ছেন—বলুন দেখি?"

তবেত বাসাও ভুল করিনি! বল্লুম,—"তাড়াতাড়িতে যদি ভুল হয়ে থাকে!"

"হলোই বা; আপনাদের মত ঢের ঢের লোকের পায়ের ধুলো প'ড়ে থাকে এখানে। আমাদের কারবার সব ভদ্রলোকের সাথেই।"

এ্যাঃ বলে কি! তবে কি এরা তাই; শুনেছি ত কাল্‌কাতায় সহরে পুরুষদের ভুলোবার জন্য গলির ভেতর মেয়েরা ওৎ পেতে থাকে। মনটা কেমন করে উঠ্‌লো।

আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে মেয়েটী বল্লে—"কথা কইছেন না যে! নতুন—জায়গায় এলে প্রথম প্রথম সবারই একটু সঙ্কোচ লাগে, তারপর সব ঠিক হ'য়ে যায়।"

বল্লুম,—"কেমন—যেন ভাল—লাগ্‌ছে না।" মেয়েটী মুখখানা ঈষৎ গম্ভীর ক'রে বল্লে :—'

"ভাল—লাগছে না—তাহ'লে আমাকে নিশ্চয়ই খুব কুশ্রী দেখতে !"

জবাবে বল্লুম,—"আপনাকে ভাল লাগছে না তা'ত বল্‌ছিনে ! আমার মনটাই ভাল নেই।"

মেয়েটী মুখের গম্ভীর্য্য আর একটু বাড়িয়ে ব'ল্লে,—"তা বুঝেছি।"

একটু থেমে আবার ব'ল্লে,—' ভাল কথা, মশাইয়ের, নাম ?"

"অনীল কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—।'

''আপনার মতলবটা কি জিজ্ঞেস করতে বাঁধা নেই ত ?"

"মতলব আবার কি ! মোহিতবাবু আমার ভায়রা কি না তাই এলুম একবার বেড়াতে। রাতটা থেকে—

কথাটা শেষ ক'র্‌বার আগেই মেয়েটী চোখ মুখ ঈষৎ কুঞ্চিৎ ক'রে ব'ল্লে,—"কল্‌কাতার সহরে এত বেড়াবার জায়গা থাকৃতে আপনি এ'লেন কিনা এই বাসার ভেতর বেড়াতে যেখানে পুরুষ মানুষের ছায়াটী পর্য্যন্ত এখন নেই।'

কেমন যেন হ'য়ে গেলুম। একটু ভেবে বল্লুম,—"এটা—কি মোহিত বাবুর বাসা নয় ?"

ঘোর বিস্ময় প্রকাশ ক'রে মেয়েটী ব'ল্লে, "মোহিতবাবু ! ও আপনার ভায়রা বুঝি—একটু আগে বল্লেন ?'

মনটা সংশয়ের দোলায় দুল্‌তে লাগলো। বল্লুম,—"হ্যাঁ—এটা কি তার বাসা নয় ?"

"যদি বলি নয়, তা হ'লে কি ক'র্‌বেন আপনি ?"

"এখ্‌খুনি এখান থেকে চ'লে যাবো।"

"সে কি ! আপনিত রাতটা থাক্‌বেন বলেই এসেছেন ; মনে করুন না, এইটেই তার বাসা ?"

"না—না আমি যাই ; শেষে রাত হ'য়ে গেলে বাসা খুঁজে বের ক'ত্তে কষ্ট হবে।"

"যাই ব'ল্লেই এখান থেকে যাওয়া যায় না।—এই নিধে, হুসিয়ার হ'য়ে থাকিস,—কেউ যেন বিনা হুকুমে বাসার বাহিরে যেতে না পারে।"

তখন আমার মনের অবস্থা যা হ'য়েছিল, তা আর বল্‌বার নয়। এদের উদ্দেশ্য কি তাও জানিনে। একটু ইতস্তত: ক'রে বল্লুম,—"আপনাদের রকম-সকম-ব্যবহারে আমি একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছি,—আমায় যেতে দিন দয়া ক'রে।

"খবদার, নড়বেন না আমি ফিরে আসি।" ব'লে মেয়েটী ঝাঁ ক'রে বেরিয়ে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে এক ডিস খাবার ও এক গ্লাস জল নিয়ে এলো। যে চেয়ারে আমি ব'সে ছিলুম তার সাম্‌নে ছিল একখানা ছোট টেবিল, তার ওপর রেখে দিয়ে একটু হেসে ব'ল্লে,—"দেখুন দেখি, কেমন যত্ন কর্‌ছি।—খেয়ে ফেলুন।"

তার ভাবগতিক রকম-সকম দেখে কেমন যেন হ'য়ে গিয়েছি। বল্লুম,—"আমায় মাপ কর্‌বেন।"

মুখখানায় গাম্ভীর্য্য ছড়িয়ে মেয়েটী ব'ল্লে,—"মাপ করার জিনিষ ত কিছুই দেখ্‌ছিনে এখানে। তা যাহোক্‌, এসব মেয়ে মানুষের কবল থেকে রেহাই পেতে চান যদি এই বেলা ভাল মানুষটীর মত খেয়ে ফেলুন।"

কি আর করি ? অগত্যা খেতে সুরু কর্‌লুম। মেয়েটী এগিয়ে এসে 'এটা ওটা' ক'রে যা কিছু রেকাবীতে ছিল আমায় খাইয়ে তবে ছাড়্‌লে।

হাত মুখ ধুয়ে পান দিতেই মেয়েটী ব'ল্লে—"দেখুন মেয়ে মানুষ আমরা, আপনাদের মত লোকের আদর যত্ন ক'র্‌বার ক্ষমতা কি আছে আমাদের ?" ব'লে মুখ টিপে একটু হাস্‌লে।

আমি সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বল্লুম,—"তা হ'লে এই বারটা আমায় যেতে দিন।"

মেয়েটী বিরক্তি-মাখা গম্ভীর কণ্ঠে ব'ল্লে,—"আপনি কেমন ধারা ভদ্রলোক গা মশাই ?"

আমি কাতর চোখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে মেয়েটীর দিকে তাকালুম।

মেয়েটী ব'ল্লে,—"আপনি ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে কতদূর অভদ্রের কাজ ক'রেছেন, তা কি বুঝতে পারেন নি এখনো ?"

কিছুই বুঝতে পারলুম না। অপরাধীর মত মাথাটা নীচু ক'রে ব'সে রইলুম,—জবাব দিলুম না।—

মেয়েটী ব'ল্লে,—"দরজা খোলা পেয়ে না ব'লে ক'য়ে একজন ভদ্রমহিলার ঘরে ঢোকা উচিত হয়েছে কি আপনার মত লোকের পক্ষে? বোধ হয় বুঝ্তে পেরেছিলেন, বাসায় এখন পুরুষ মানুষ নেই?"

দুঃখের বেদনায় চোখের পাতা দু'টো জলে ভিজে উঠ্লো; ব্যথিত স্বরে বল্লুম,—"মোহিতবাবুর বাসা মনে মনে ক'রেই ঢুকেছিলুম, কিন্তু তারপর অপনিই ত আমায় যত্ন ক'রে বসিয়েছেন!"

মেয়েটী দীপ্ত কণ্ঠে ব'ল্লে,—"ভদ্রলোককে অযত্ন করুতে আমরা শিখিনি অনীল বাবু! আপনাকে ভদ্রলোক জেনেই অভার্থনা ক'রেছি।"

মিনতিপূর্ণ স্বরে বল্লুম,—"দেখুন, বাসা ভুল ক'রে এক কাজ ক'রে ফেলেছি, আমায় ক্ষমা করুন আপনি!— আমি যাই।"

মেয়েটী বেশ গম্ভীর হ'য়ে ব'ল্লে,—"না-না, যেতে এখন পাচ্ছেন না। বাবুরা এসে যা হয় এর বিচার করুন, তারপর অব্যাহতি দেন,তারাই দেবেন।

আপাততঃ আসুন আমার সাথে কর্ত্রী ঠাকরুণের কাছে। দেখি তাঁর কি মত হয়।"

রেহাই যখন পাবোনা, তখন দেখাই যাক্, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

(২)

সন্ধ্যা হয়। মেয়েটী আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আর একটী ঘরে প্রবেশ করলে। ঘরটী দিব্যি সাজানো গোছানো—ফিট্ ফাট। কোথাও অনাবশ্যক একটা জিনিষও চোখে পড়্লো না। বিছানা-পত্র গুলো দুধের মত সাদা; অন্যান্য আসবাব পত্র এমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন--দেখলেই বোধ হয়—সন্ত-কেনা—ঝক্ ঝকে। ঘরে বৈদ্যুতিক আলো জল্‌ছিল। একটী পূর্ণবয়স্কা যুবতী এক খানা সোফায় আধ-শোয়া অবস্থায় বসে কি একখানা বই পড়েছিল। হাত- পা আর মুখখানা বাদে তার সর্ব্বাঙ্গে বহুমূল্য পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে ঢাকা চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা; তাতে তার সত্যকার চেহারাখানা যেন ঢেকে রেখেছে। তবে বোঝা গেল যুবতী বেশ সুন্দরী। দেখে শুনে চোখে যেন তাক লেগে গেল। পদশব্দে যুবতী একটু চম্‌কে উঠে বইখানা উপুড় ক'রে রেখে চশমার ভেতর দিয়ে একবার বেশ ক'রে আমাকে দেখে নিয়ে বল্লে,—আপনি।'

মেয়েটী আমাকে বিছানার এক পাশে বসিয়ে দিয়ে যুবতীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লে—'ইনি এখানে থাক্‌বেন আজ। কিন্তু অপরাধ যা ক'রেছেন, ভদ্রলোকের অযোগ্য তারপর গলা খাটো ক'রে আরো কত কি বলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। আমি বুঝলুম। আমার বিরুদ্ধে যা কিছু অভিযোগ সব যুবতীকে জানিয়ে গেল'।

যুবতী ব'ল্লে,—"আপনি এখানে থাক্‌বেন শুনে খুব খুসী হ'য়েছি। এখানকার বন্দোবস্ত যা সব প্রথম শ্রেণীর তাতেই ফিটা একটু চড়া।"

বল্লুম,—কিন্তু আমিত থাক্‌তে চাচ্ছিনে এখানে।"

যুবতী স্নিগ্ধ কণ্ঠে ব'ল্লে—চট্‌বেন না। 'আপনি ভদ্রলোক। না হয় গোটাদশেক টাকা দিন তাতেই একরকম চালিয়ে নিতে পারবো।'

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে মনিব্যাগটা বের ক'রে যুবতীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লুম,—নিন—এই গোটা পঁচিশেক টাকা আছে এরভেতর, যা খুসী হয় নিয়ে আমায় অব্যাহতি দিন।

যুবতী ব্যাগটী এক পাশে রেখে বল্লে,—"আপনি বোধ হয় এমন জায়গায় আর কখনো আসেননি?"

ছোট্ট ক'রে জবাব দিলুম,—"না"

"তা ভাববেননা একটু পরেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

আমি বরাবরই লক্ষ্য করছিলুম, যুবতীর কণ্ঠস্বরটা কেমন একটু চাপা অথচ মোলায়েম। অনুনয়ের সুরে বল্লুম—'আপনার শরীরে একটু মায়া দয়া আছে ব'লে মনে হ'চ্ছে। ভদ্রলোকের ছেলে তাড়াতাড়িতে একটা ভুল ক'রে ফেলেছি—তার জন্য আক্কেল ও যথেষ্ট হ'য়েছে; এখন দয়া ক'রে আমায় ছেড়ে দিন।"

যুবতী হেসে ফেল্লে; ব'ল্লে—"আমাদের একটা গান শোনান যদি, এক্ষুনি আপনাকে ছেড়ে দেবো।"

এত দুঃখেও আমার হাসি পেল। বল্লুম,—'আমিত আমি আমার চোদ্দ পুরুষের ভিতরেও কেউ জানেনা।"

যুবতী ব'ল্লে—এ-সব ছেলেভুলোনো কথায় আমাদের

কাছে রেহাই পাবেন না। গান করুন। ভাল হোক মন্দ হোক—এখখুনি ছেড়ে দেবো।"

গান করার অভ্যাস ত কোন দিনই নেই। কিন্তু কি করি? এদের কবল থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিলুম। কাজেই না ভেবে চিন্তে যা মনে এলো গাইতে লাগলুম।—

আমায় মুক্তি দাওগো হরি
(আমি) পড়েছি শঙ্কটে আসিয়ে নিকটে
বিপদ হরণ করো বিপদ হারী॥

* * * *

চারিদিক থেকে একটা হাসির রোল উঠলো। মুখখানায় বিষাদের রেখা টেনে যুবতী ব'ল্লে,—"দেখুন ত মশাই, হাতখানায় আমার কি হলো হঠাৎ?"

আমি ব্যস্ত হ'য়ে যুবতীর দিকে এগিয়ে গেলুম। যুবতী ডান হাত বাড়িয়ে তার সুগোল সুন্দর হাতখানা দু'হাতে তুলে নিলুম। কিছুই দেখতে পেলুমনা। বল্লুম,—"কি—

মুখের কথা মুখেই আটকিয়ে গেল। দুম্ দুম্ করে পা ফেলে একটা সাহেব ঘরে ঢুক্‌লে। আমার দিকে একবার কটমটিয়ে চেয়ে তিক্ত কণ্ঠে বল্লে,—"বেয়াদপ, জাস্তা চোরের মত ঘরে ঢুকে ভদ্র মহিলার অসম্মান—পাহারাওয়ালা! পাহারাওয়ালা!!"

আমি তাড়াতাড়ি যুবতীর হাতখানা ছেড়ে দিয়ে শীত-লাগা বুড়ো মানুষের মত ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলুম। এবার যে কপালে কি আছে তা ভগবানই জানেন। মুখ দিয়ে কথা সরলো না।

দুতিন মিনিট যেতে না যেতেই একজন পাহারাওয়ালা এসে ঘরে ঢুক্‌লো। সাহেব চীৎকার ক'রে ব'ল্লে,—"ভদ্রমহিলার অসম্মান ক'রেছ।"

মাথার উপর যে বিপদের কতবড় একখানা কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে এইবার তা ভালকরে বুঝতে পাল্লুম; সাহেবকে কাতর কণ্ঠে বল্লুম,—"দেখুন আমার কোন দোষ নেই।"

কেউ আমার কথা কানে তুল্লে না। পাহারাওয়ালা এসে লম্বা একখানা লাল ন্যাকড়া বের করে আমার হাত দুখানা ক'সে বেঁধে টেনে নিয়ে চল্লো।

* * * *

পাহারাওয়ালার সঙ্গে দোতলা থেকে নাম্‌তে যাবো হঠাৎ দেখতে পেলুম। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে আমার শালী মুখে তার দুষ্ট হাসির রেখা। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বল্লে—"অনিলবাবু যে! একি দশা দেখছি আপনার! পাহারাওয়ালা ছেড়ে দাও ওকে উনি যে আমার বোনাইবাবু।"

পাহারাওয়ালা একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে আমার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে সেখানথেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

খুট ক'রে শব্দ হ'লো পাশের ঘরের দরজা খুলে সেই মেয়েটীর হাত ধ'রে হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন আমার ভায়রা মোহিতবাবু। বল্লেন,—"গোস্তাফি মাফ হয় অনিলবাবু, এটী আমার বোন।"

নিধে চাকরটা পাহারাওয়ালা শালী মহাশয়া চশমাপরা যুবতীর আর মোহিত বাবু সাহেবের পার্ট প্লে ক'রেছেন জেনে সত্যিই আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলুম।

বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি

অধ্যাপক শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে দেশে আজ চিন্তা করবার লোক আছে এবিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ নেই।

বাংলা সম্বন্ধে ঔৎসুক্যও যেমন কিছুকিছু দেখা যাচ্ছে, তেমনি সাধারণের মধ্যে এর প্রতি অবহেলাও নিতান্ত কম নয়। দেশময় আজ যে বাচালতা ও ছলনার অতিশয্য দেখা দিয়েছে, তা জাতীয় উন্নতির পরিপন্থি হ'চ্ছে ব'লেই আমার বিশ্বাস। ভাবের ক্ষেত্রেই হোক আর ধর্ম্মের ক্ষেত্রেই হোক নিষ্ঠা ও সাধনার মূল্য অপরিসীম। অথচ সাধনার অভাব আজ বাঙ্গালী চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

জীবন ও সাহিত্যের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। জীবনসমুদ্রের ডুবুরী যারা, তাঁরাই এর রতন মাণিক্যের খোঁজ রাখেন। কিন্তু নবীন-সাহিত্য-বিলাসী চায় সস্তায় নাম কেনা। জীবনের বিপুল রহস্য তাকে প্রলুব্ধ করেনা। প্রকৃতি ও জীবনের অপরূপ মহিমায় যাঁদের চোখ ভুলেছে, মন ভুলেছে, তাঁরাই সাহিত্যে শাশ্বত সম্পদ দান ক'রে গেছেন। সে মহিমা যা'রা দেখতে পায়নি তারা কোন সাহিত্যের সৃষ্টি করতে পারেননি।

সুনীতির সঙ্গে সাহিত্যের বিরোধ কল্পনা করা আজ ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নীতি মানে যদি বাইরেকার অর্থহীন আচার মাত্র হয়, তবে তার সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ কোন যোগ নেই একথা সত্য। কিন্তু অন্তরাত্মার যে গভীরতর নীতি, উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে যা আমাদের মহাসত্যের অভিমুখে অগ্রসর ক'রে নিয়ে চলেছে,—তার মধ্যে শিল্পের অখণ্ড যোগ র'য়েছে। সাহিত্য জীবনেরই খণ্ড প্রকাশ। জীবন ও সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখার সঙ্গত কারণ কিছু আছে ব'লে মনে হয়না। সাহিত্য সাধনা জীবন সাধনারই অংশমাত্র। জীবনকে যারা বড় করতে চায়নি, বড় সাহিত্য সৃষ্টির যোগ্যতাও তাদের নেই। আন্তরিকতার অভাব কৌশলে পূরণ করা চলেনা, লাবণ্যের অভাব প্রসাধনে ঘোচেনা। রূপহীনার প্রেম নিয়েও মন খুশী হ'তে পারে, কিন্তু প্রেম-হীনার রূপে মন তৃপ্তি মানেনা।

কিন্তু আজ চতুর্দ্দিকে শুধুই ছলনা। বস্তুতন্ত্রের দোহাই দিয়ে অবাস্তব ভাববাষ্প বিকিরণ, গণতন্ত্রের ছলনা ক'রে দারিদ্র্যজীবনের মিথ্যা কুৎসা প্রচার, চায়ের টেবিলে বসে বন্দীজীবনের চিত্র কল্পনা আরামলিপ্সু বাঙ্গালীর এই সহস্র মিথ্যাভাষণ তার নিষ্ঠাহীনতারই পরিচয় দেয়। দারিদ্রের দুঃসহ বেদনার উদ্দেশে পূজারীর বেশে অর্ঘ্য সম্ভার নিয়ে যে বেরিয়ে পড়েনি, কি ক'রে সে দরিদ্র জীবনের মর্ম্মের গান গাইবে তার গ্রন্থে? কুলীর মাথায় মোট চাপিয়ে তার সঙ্গে বাড়ী আসি বলেই তার জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ হয় প্রচুর? বস্তীর আশে পাশে নজর হেনেই কি বস্তীজীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি এবং নিবিড় উপলব্ধি ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য কখনই রচিত হ'তে পারেনা। গোর্কী, হামসুন শুধু প্রতিভাবান্ নন তাঁরা ঐকান্তিক সাধক; দারিদ্রের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সম্বন্ধ তাঁদের দুঃখের গানে প্রাণসঞ্চার করেছে। কর্ম্মজীবনের ক্ষেত্র আমাদের সঙ্কীর্ণ। কল্পনারও তাই প্রসার নেই। হ্যুগো, সেক্সপীয়ার, ইবানেজ—এঁদের রচনায় কল্পনার যে প্রসার, আমাদের সাহিত্যে তার অভাব। বায়রনের লেখার মহিমা বাংলাসাহিত্যে দুর্লভ। সাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, কোথায় পাবো আমরা Toiler of the sea দৈনন্দিন জীবন আমাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আছে, কোথেকে আসবে আমাদের Hamlet বা Macbeth এর কল্পনা? যুদ্ধের খবর শুনি দূর দুরান্তর থেকে কি করে ভাববো আমরা Mare Nostrum কিম্বা Four Horsemen এর প্লট? পশ্চিমের সাহিত্যে তাকিয়ে দেখি, কত অফুরন্ত বৈচিত্র্য, নবনব কল্পনা। কত স্রষ্টা, কত ভোক্তা। আমাদের

সাহিত্যে কেবলি একঘেয়ে ক্ষীণ সুর, বৈচিত্র্য নেই বিশালতা নেই। জীবনকে বড় করতে না পারলে সাহিত্যও বড় হ'য়ে উঠ্‌বে না।

মধু, হেম, নবীনের কাব্য, এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশ-চন্দ্রের জীবনের বিচিত্র সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছে। বিরাটরূপ খুঁজতে গিয়ে তাঁদের উপন্যাসে অনেক সময়ই তাকাতে হ'য়েছে অতীতের পানে। আধুনিক জীবনের সত্যকার রূপ যাঁরা আঁকতে চেয়েছেন, তাঁদেরও আমরা ভুল্‌বনা। রবীন্দ্রনাথ, ও শরৎচন্দ্র, নিরুপমাদেবী ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এঁরা বাংলা দেশেরই সাহিত্যিক, দেশকে এবং জীবনকে এঁরা অন্তর দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন এবং সক্ষমও হয়েছেন। আর ও সাধক কি আমরা পাবোনা? উচ্ছৃঙ্খল ভাব ও ভাষা কি আমাদের নব সাহিত্যকে বিপর্য্যস্ত করে ফেল্‌বে?

এম্‌নি একটা আশঙ্কার কারণ সম্প্রতি সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। ইংরাজী কথায় ভর্ত্তি, ধনুষ্টঙ্কার-গ্রস্ত বিকৃত একশ্রেণীর বাংলা রচনা আজকের সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। এ সব রচনার ভাব ও ভাষা দুই-ই বিশৃঙ্খল। সৌন্দর্য্য এবং সামঞ্জস্য যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ, একথা বোধ হয় তাঁরা অস্বীকার ক'র্‌তে চান। এই ভাষা ও ভাব-বিভ্রাট অপ্রকৃতিবস্থার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাংলার এযুগের সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা অভিযোগ অনেকদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। স্বর্গত চিত্তরঞ্জন দাস একদিন এ অভিযোগ উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর মতামত একটু একপেশে হলেও বোধহয় তাতে সত্যতা ছিল। অভিযোগটি হ'চ্ছে এই যে বাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগ নেই; এযেন কৃত্রিম টবের ফুল। রবীন্দ্রনাথও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছিলেন, "এখানকার অধিকাংশ বাংলা বই প'ড়ে আমার এই মনে হয়, যে আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের সময় বাংলাদেশই ছিল কিনা, ভবিষ্যতে এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। * * * পণ্ডিতেরা বলবেন বঙ্গসাহিত্য একটা কলেজের সাহিত্য, এটা দেশের সাহিত্য নয়। কিন্তু সে কলেজটা ছিল কোথায় এ বিষয়ে কিছুতেই মীমাংসা হ'বেনা।" সুখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের "ছিন্নপত্রে" "গল্পগুচ্ছে" ও নানা কবিতায় শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুরছেলে' 'অরক্ষণীয়া' প্রভৃতি আখ্যানে, দীনেন্দ্ররায়ের 'পল্লীচিত্রে' বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী,' ও 'অপরাজিত'-য় এবং আরও দু এক লেখকের রচনায় খাঁটি বাংলার পরিচয় মেলে। যে আবেষ্টন ও জীবন আমাদের পরিচিত নয় তার কথা আমাদের অন্তরকে নিবিড় ভাবে স্পর্শ করতে পারেনা। সমালোচনার মানদণ্ডে কিসের কত ওজন জানিনা, কিন্তু আমার ত' মনে হয়, স্বাভাবিকতা ও আন্তরিকতা মানুষের মনকে এমন একটী তৃপ্তি এনেদেয় যা কৌশল বা বিশ্লেষনী বুদ্ধির সম্পূর্ণ অনায়ত্ত। শুধু এই কারণেই শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীনের" চেয়ে তাঁর "অরক্ষণীয়া' আমাকে বেশী আনন্দ দান করে। "পথের পাঁচালী" ও এই কারণেই আমার অত্যন্ত প্রিয়। তা'র পল্লীগ্রামের অপূর্ব্ব মায়াপুরী, রামায়ণ মহাভারতের বিচিত্র স্বপ্নচ্ছবি, দেশের যুগ যুগ প্রবাহিত জীবন ধারার সঙ্গে আমার একটি নিবিড় পরিচয় বোধকে জাগ্রত ক'রে তোলে আমার সহস্র স্বপ্ন ও স্মৃতি মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। লেখক ও পাঠকের মধ্যে আর ব্যবধান থাকেনা। তাঁর কথা যেন আমারই মনের কথা বলে মনে হয়। দেশের সঙ্গে এই পরিচয়ের চিহ্ন আজকের অনেক লেখকের লেখায় নেই। তাই, সে-সব লেখায় কারিকুরী যতই থাকুক তা অন্তরকে স্পর্শ করেনা। সাহিত্য শিল্পে আমরা চাই—কৌশল নয়, হৃদয়; কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্ত্তি নয়; ধরণী চাহিছে শুধু হৃদয়, হৃদয়,। অন্যের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারাতেই শিল্পের প্রকৃত সার্থকতা। কৌশলকে যেন আমরা আন্তরিকতার চেয়ে বেশী দাম না দেই, দেহকে যেন প্রাণের চেয়ে বেশী সম্মান না করি। দেশের ও জাতির সত্যকার পরিচয় সাহিত্যে প্রকাশিত হউক, ছলনা ও প্রবঞ্চনা যেন পূজার স্থান গ্রহণ না করে। আমরা যেন ভুলে না যাই, নূতনত্ব দেখানোটাই খুব বড় কথা নয়,—যা চিরন্তন তাকে বুঝতে ও জানতে চেষ্টা না ক'রলে প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি কারও পক্ষে সম্ভব নয়। সাধনার মহান আদর্শ আমাদের আত্ম-বিকাশের পথে দৈনন্দিন অগ্রসর করুক। আমরা যেন বুঝতে পারি সাহিত্যে বিশ্বজনীনতা থাকবে ব'লে তাতে

দেশের পরিচয় থাকবেনা, একথা মনে করা প্রকাণ্ড ভুল। সত্যি ক'রে কোন দেশের না হলে তা বিশ্বজনীনও নয়। একের মধ্যে দিয়ে সমগ্রের মর্ম্মকে স্পর্শ করাই শিল্পীর কাজ। ইন্দ্রকে শরৎবাবু সত্যি করে চেনেন তাই তাঁকে আমাদের চিনিয়ে দিতে পেরেছেন। অভিজ্ঞতার বাইরে থেকে চরিত্রসৃষ্টি ক'রলে তিনি কারও কাছেই তাকে পরিচিত ক'রে তুলতে পারতেন না। কবি তাঁর নিজের প্রীতির মধ্যেই প্রকাশ করেন সমগ্র প্রীতিকে নিজের চিন্তার দ্বারাই সমগ্রের চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করেন। সর্ব্বমানবের অন্তরে যে পরম ঐক্য, নিজের অন্তরে ডুব দিতে না পার্‌লে কেউ তা'র সন্ধান পায় না।

রাণীবোস

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

যা ঘটেছিল তাই যদি ইতিহাস হয় তবে রাণীবোসের জীবনেরও একটা ইতিহাস আছে। রাণীবোসকে আমরা চিনি—বিখ্যাত ব্যারিষ্টার এম, এন্ বোসের পত্নী হিসেবে নয়, সরস্বতী গারল্‌স স্কুলের হেঠমিষ্ট্রেস হিসেবে। এত বড় ব্যারিষ্টারের ঘরণীকে ও কেন যে মাষ্টারণী হতে হয় সেটুকুই ইতিহাস।

রাণী মিত্র যখন আই, এ পড়ে বোস তাকে বিয়ে করে রেখে বিলাত চলে যায় ব্যারিষ্টারী পাশের জন্য। বোস তিন বছর ফিরে আসে, মিসেস বোসও তখন বি, এ পাশ করেছে। দুইটি বছর ভবানীপুরের বাড়ীতে নির্ব্বিবাদে কেটে যাওয়ার পর ঐ অঞ্চলে এই নিয়ে একদিন হৈ চৈ পড়ে যায় যে বিলাত থেকে কোন্ একজন এমিলি টল্‌মেজ তার আড়াই বছরের ছেলের জন্মদাতা বলে মিঃ বোসের নামে নালিশ এনেছে এবং মেম সাহেবও নাকি শীঘ্রই আস্‌ছে একটা বোঝাপড়া করার জন্য।

ঐদিন বোস যখন কোর্ট থেকে ফিরে এল রাণী বেশ শান্ত ও সহজ সুরেই তাকে জিজ্ঞাসা করল—এতদিন যা গোপন রেখেছ আজ যখন তা প্রকাশ হয়ে গেলই তখন তা আমার কাছে খুলে বল্‌তে বোধ হয় আপত্তি থাকতে পারে না—কি বল?

বোস যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল—বলল, কিছু আপত্তি নেই, বল কি জান্‌তে চাও তুমি?

একটু ইতস্ততঃ করে রাণী বল্‌ল—এমিলি কি ভদ্রঘরের মেয়ে? বোস্ রাণীবোসের চোখের দিকে সোজা চেয়ে জবাব দিল—কেবল ভদ্রঘর বল্‌লে কম বলা হয়; এমিলি নিজে যেমন লেখাপড়া জানা মেয়ে, তেমন তার বাপও ক্যাম্ব্রিজের একজন নামজাদা প্রফেসর। আমাকে মিছামিছি জব্দ করার জন্যই যে সে নালিশ আনতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করিনে। হয়ত আমার সঙ্গে দেখা করার তার অন্য কারণ আছে। আমি তোমার কাছে অপরাধী কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইনে' কিন্তু তার কাছে যে সত্যই অপরাধ করেছি এটা অস্বীকার করলে মিথ্যে বলা ছাড়া আর কিছু হয় না। মিসেস্ বোস ভ্রূকুঁচকে বল্‌ল—আমার কাছে তুমি অপরাধী কিনা বিশেষ করে এ প্রশ্নটাই যদি জিজ্ঞাসা করি কি উত্তর আশা করতে পারি আমি? বোস শান্তসুরে বল্‌ল—তোমার কাছে কোন অপরাধইত করিনি আমি। এ পর্য্যন্ত তোমার প্রতি আমার ভালবাসার বা কর্ত্তব্যের কোন ত্রুটি ভুলেও কি তোমার মনে স্থান পেয়েছে? এমিলি যদি না এসে পড়ত কিই বা জানতে তুমি—আমাদের জীবন যাত্রা যে ভাবে চল্‌ছিল ঠিক সে ভাবেই চলত। আজ যদি তুমি মনে কর তোমার প্রতি অবিচার করা হয়েছে তবে সেটাকে তোমার ঈর্ষা না বল্‌লে বল্‌তে হবে উদারতার অভাব।

মিসেস বোস ক্লেশের সুরে বল্‌ল—আমার প্রতি তোমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি আমার চোখে ধরা না পড়লেই যে

সেটা তোমার অকৃত্রিম ভালবাসার প্রমাণ হল' এরূপ অদ্ভুত ধারণার জন্য তোমাকে প্রশংসা করতে পারছিনে। আর একটা কথা, কর্ত্তব্যের ত্রুটি ধরা সহজ হতে পারে কিন্তু ভালবাসার ফাঁকি সহজে ধরা যায় না। যাক সে কথা। ঈর্ষার জন্যই হউক অথবা উদারতার অভাবের জন্যই হউক, আমার আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে বলে যদি আমি মনে করেই থাকি তবে এখন আমার কর্ত্তব্য কি হবে বল্‌তে পার ?

মিঃ বোস—তোমার কর্ত্তব্য তোমারই ভেবে দেখা উচিত কিন্তু যদি আমার কথা শুনতে হয় তবে কিছুদিন শান্তভাবে অপেক্ষা কর। ইউরোপীয় সমাজের দেখাদেখি একটা ফ্যাসান বা হুজুগের ঝোঁকে আত্মসম্মান সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠোনা। একটা কঠিন সত্য কথাই বল্‌তে হচ্ছে—একজনের মনের গোপন রহস্যটুকু আর একজনের কাছে যদি অপ্রকাশ না থাকত তবে স্ত্রী ও স্বামীকে পতিদেবতা বলে পূজা করতনা আর স্বামী ও স্ত্রীকে সাধ্বী বলে শ্রদ্ধা করত না। সৌভাগ্য বশতঃ মনের কথাগুলো যার যত বেশী গোপন থাকে সেই হয়ে উঠে তত বেশী মহৎ। আমার মনের ক্ষণিক দুর্ব্বলতা বা মোহ একটা ঘটনা অবলম্বন করে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার সুবিধা পেয়েছিল বটে কিন্তু তা বলেই যে অন্য কোন পুরুষ বা স্ত্রী যারা অদৃষ্টের জোরে চিরদিনই অন্তরালে রয়ে গেল তারা যে সকলেই এক একটা পরমহংস গোছের লোক এ কথা আমি মানতে রাজী নই। কাজেই আজ আমি এই তথাকথিত ভালমানুষদের চেয়ে নিজেকে কোন প্রকারেই ছোট মনে করতে পারি না। আশাকরি কথাটার কুট অর্থ করে আমাকে ভুল বুঝতে চেষ্টা করবে না।

মিসেস বোস উত্তেজিত হয়ে উঠে বল্‌ল—তুমি কি এ সন্দেহই করছ যে বাইরে প্রকাশ না পেলেও মনের কোনে আমারও এ-সব পাপ জমা হয়ে থাকতে পারে যার জন্য নির্ব্বিচারে সতী আখ্যাটা আমাকে দেওয়া যায় না।

বোস অসহায় ভাবে বল্‌ল—ঐ যা! যা ভয় করেছি তাই! আমি ত বলেইছি কথাটার ভুল অর্থ করোনা। অসচ্চরিত্র বা অসতী কথা দুইটির তোমরা সাধারণতঃ যে অর্থ করে থাক তা আমার কাছে মনঃপুত নয়। কাজেই এত সহজে চট করে কাউকে অসতী বা অসচ্চরিত্র বলতে আমি পারি না। কিন্তু তুমি এখন উত্তেজিত এ সম্বন্ধে পরে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব—দেখবে যত বড় পাষণ্ড আজ আমাকে হঠাৎ মনে করে বসেছ তত বড় পাষণ্ড আমি মোটেই নই। এখন তোমার একটু একলা থাক্‌তে হচ্ছে। লক্ষ্মীটি, যাও কোন কথাই এখন তুমি শান্তভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। এমিলিকে নিয়ে আমাকে কি করতে হবে একটু ভাবতে হচ্ছে। বেচারী সত্যই যদি আমার কাছে এসে উঠে তবেই হবে মুস্কিল।

রাণীবোস উত্তরে এই বলে ঘর হতে বের হয়ে গেল যে এমিলি কলকাতা এলে যাতে এই ভবানীপুরের বাড়ীতেই এসে উঠতে পারে সে ব্যবস্থা সে করে দেবে—এর জন্য বোসের যেন মাথা ব্যথা না হয়।

... ...

দিন দশেক পর মিঃ বোস কোর্ট থেকে ফিরে এসে জান্‌ল রাণী কোথায় চলে গেছে, বিশ্বাসী ভৃত্যের মারফতে এই চিঠিখানা পাওয়া গেল—

আজ যে আমি চলে যাচ্ছি তার কোন কৈফিয়ৎ দেওয়াই আমি দরকার মনে করতাম না তুমি বড় গলায় যুক্তি তর্কের সাহায্যে প্রমাণ করতে চেষ্টা করতে যে এমিলির সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করে তুমি আমার প্রতি কোন অবিচারই করনি। তোমার ও আমার যে বিয়ে তা'ত হিন্দুসমাজের ছেলেমেয়েদের মত শুধু বাপ মায়ের কথাতেই হয়নি। আমি তোমাকে যথার্থই ভালবেসেছিলাম এবং তুমিও যে আমাকে ভালবেসেছ সে বিষয়েও আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল।

কিন্তু বিলাত গিয়ে বছর খানেক যেতে না যেতেই যখন এক বিদেশিনীর প্রেমে পড়ে গেলে তখন এটা আমার পক্ষে মনে করা অস্বাভাবিক নয় যে আমার প্রতি তোমার সে দেখান ভালবাসায় কিছু ফাঁকি ছিল যা হয়ত তুমি নিজেও তখন ধরতে পারনি। তোমার ঐ নতুন প্রেমকে তুমি যে একটা ক্ষণিক মোহ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছ তা যে সত্য নয় তা তোমার তর্ক করার জিদ্ দেখেই বোঝা

যায়। আর একটা কথা। ঐটা যদি তোমার মোহই হয় তা হলে আমাকে যে তুমি ভালবাস বল তাই যে মোহ নয় এই বা কি করে জানব। তোমার মনে একটা যুক্তি উঠ্‌তে পারে যা হয়ত তুমি বলতে সাহস পাচ্ছনা—যে একজন পুরুষের কি দুইটি মেয়েকে ভালবাসা নিতান্তই অসম্ভব? আমি উত্তরে বল্‌ব সমস্যাটা তোমার নিজের একলার দিক দিয়েই সমাধান করলে চল্‌বে না। একজন পুরুষের দুইটি মেয়েকে বা একটি মেয়ের দুইজন পুরুষকে ভালবাসা হয়ত সম্ভব হতে পারে কিন্তু ভালবাসার প্রতিদান দু'জনার কাছ থেকেই সমানভাবে পাওয়া অসম্ভব। কারণ, তুমি যাকে ভালবাসবে সে নিতান্তই তোমাকে আপনার বলে জানবে এবং কি দেহে কি মনে তোমাকে সম্পূর্ণ—ভাবেই পেতে চাইবে—তার ভালবাসার অংশীদার সে সহ্য করতে পারবেনা কিছুতেই। প্রাকাশ্যে দুজনকে একজনার ভালবাসায় বিপদ এইখানে। ঐ যে কথায় বলে দুই নৌকায় পা দেওয়া। দুই নৌকায় পা রাখা যায় বটে কিন্তু নৌকা দুইটিই পায়ের নীচে বেশীক্ষণ থাকে না। তুমি আজ যাকে ইউরোপীয় সমাজের দেখাদেখি একটা ফ্যাসান বা হুজুগ বলে উড়িয়েদিতে চাও দুদিন পরে দেখবে হয়ত সেটা আমাদের দেশেও বেশ চল হয়ে গেছে। পুরুষের ধাপ্পাবাজী আর বেশীদিন টিক্‌ছে না। পারিবারিক শান্তিভঙ্গের দোহাই দিয়ে যদি ইউরোপের দৃষ্টান্ত দেখাতে চাও আর লম্বা লম্বা বক্তৃতা কর, ভুলবনা কারণ এজন্য তোমরা পুরুষজাতি যতটা দায়ী আমরা ততটা নই। কিন্তু যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। এমিলির প্রতি ভালবাসায় তোমার শুধু দৈহিক লোভ ছাড়া সত্যিকার যদি কিছু থাকত তবে তুমি পূর্ব্বেই যে বিবাহিত একথাটা তাকে জানাবার মত সাহস ও তোমার থাক্‌ত আর তা হলে ব্যাপারটা হয়ত এতদূর গড়াত ও না। তোমার কাছে লিখিত তার কয়খানা পত্র পড়ে মনে হয় চরিত্র ও শিক্ষাদীক্ষায় বাস্তবিকই মেয়েটি সাধারণের অনেকখানি উঁচুতে। কাজেই তার মনে যাতে কোন আঘাত না লাগে এজন্যও আমার এ বাড়ী ছেড়ে যাওয়া উচিত। এতদিনে যদি আমাকে চিনে থাক তবে বোধ হয় এটা বুঝ্‌তে পারবে যে এ চিঠি পেয়ে আমাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা বৃথা হবে কাজেই খোঁজ করেও কোন লাভ নেই। দু তিন মাস পরে আমার গর্ভে যে সন্তান হবে তাকে মানুষ করার ভার আমি স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে নিলাম। এজন্য যে এমিলির মত নালিশ আন্‌ব না এটা ঠিক জেনো। বিদায় ইতি রানী-বোস

এর পরেই রাণীবোস সোজা চলে আসে রাজসাহী এবং নেয় এই টিচারী কাজটা একমাত্র যার উপর নির্ভর করে শিক্ষিতা মেয়েরা বড়াই করে—"পুরুষের তোয়াক্কা রাখিনে" বা "পুরুষের তাঁবে থাকবনা।"

ভ্রম সংশোধন

পৌষ সংখ্যার পুষ্পপাত্রে 'অভিসার' গল্পলেখকের নাম ভ্রম বশতঃ মুদ্রিত হয় নাই—লেখকের নাম হইতেছে শ্রীসুধাংশু কুমার গুপ্ত এম, এ।

গর্ব

মহম্মদ এছাহক বি-এ

মানব মাত্রেই অহঙ্কারী। ইহাতে পুরুষ স্ত্রী ভেদ নাই, বরং স্ত্রীলোকের অহঙ্কার পুরুষের অপেক্ষা এক কাঠি বেশী। শিশুর দলই কি নিরহঙ্কার? 'যাদু আমার,' 'সোনা আমার', 'চাঁদ আমার' বলিলে কোন্ শিশু না প্রীত হয়? ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার নেশা শিশুর পিতাদের অপেক্ষা শিশুদের মধ্যে কোন অংশেই কম নয়।

খাঁদা ও গোব্‌রা দুই ভাই খাঁদা যখন হঠকারিতা করিয়া লম্ফে, ঝম্পে ও চীৎকারে বাড়ীখানা তোলপাড় করিয়া তোলে, কিছুতেই তাহাকে নিবৃত্ত করা যায় না, মা তখন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেন।—"আমার খাঁদার মত ছেলেই নাই।" ঐরূপ খাঁদার প্রশংসা ও গোবরার নিন্দা গোবরার মত নচ্ছার নয় ও বাড়ীর ললিতার মত বয়াটে নয়। ব্যস্ অমনি খাঁদা চুপ।

জীব জন্তুর মধ্যেও অহঙ্কার দৃষ্ট হয়। ময়ুর নাকি বড় অহঙ্কারী পাখী। কোন কোন প্রাণী দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া তন্ময় হইয়া যায়। একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করা যাউক। উৎসবের দিনে বিলাতের কোন এক ফার্ম্মে জনৈক ভদ্রলোক একটী গাভীর গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দেন। প্রাণীটী নূতন ফ্রক পরিহিতা শিক্ষার্থি নারীর ন্যায় সমস্ত দিন উল্লাসে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছিল। মালাটী ফিরাইয়া লওয়া হইলে গাভীটী অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়ে, এমন কি সেটী পুনরায় প্রত্যর্পণ করিয়া তবে তাহাকে দোহন করা সম্ভবপর হয়।

অহঙ্কারে বিড়াল প্রায় মানুষেরি সমান। "তোমার ত বড় স্পর্দ্ধা হে"। "দূর হও, আমাকে স্পর্শ করিও না।" এইরূপ ভাব প্রকাশক মুখভঙ্গী প্রায় সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গে লাগিয়াই আছে। এ হেন বিড়ালকেও অনায়াসেই বশে আনা যায়।—জনৈক ইংরাজ কবি তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"যদি তুমি পুষীর গায়ে হাত বুলাও, তাহাকে আরাম দায়ক মৃদু আঘাত কর ও খাইতে দাও, তবে সে তোমাকে ভালবাসিবে।"

এক্ষেত্রে আরও একটী বিষয় লক্ষণীয়—পুষী কি প্রকারে মানুষের ভাল মন্দ বিচার করে শেষের দুই পঙক্তি হইতে আমরা তাহাও বেশ বুঝিতে পারি। যদি তুমি পুষীর তুষ্টি সাধন কর, তবে তুমি ভাল।

পুণ্য সম্বন্ধে পুষীর যে এই সংকীর্ণমনা দৃষ্টি, তাহা শুধু মার্জ্জার জগতেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্যকে বিচার করিতে হইলে আমরাও বিড়ালের পন্থাই অবলম্বন করি। যাহারা আমাদের পছন্দ মত কার্য্য করে কেবল তাহারা ভাল। মূলকথা আমাদের প্রত্যেকেরই একটী জন্মগত সংস্কার আছে যে গোটা দুনিয়া আমাদের অভাব দূরীকরণের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে ও তাহাতেই তাহাদের সার্থকতা।

পোয়সারের মোরগ (Poyser's bantam cock) মনে করিত, প্রাতে কেবল তাহার ডাক শুনিবার জন্যই বুঝি সূর্য্য উদিত হয়। আমরা প্রায় সকলেই ঐ মোরগের মত। গর্ব্বই সংসার চালনা করে। সম্পূর্ণ আত্মাভিমানবর্জ্জিত মানব পৃথিবীতে কখন ছিল বলিয়া মনে হয় না।

গর্ব্বই সেই শক্তি যাহা মানব জাতিকে পরিচালিত করে এবং চাটুকারিতা ইহার দক্ষিণ হস্ত। যদি আপনি জগতের ভালবাসা ও সম্মান লাভ করিতে চান, তাহা হইলে উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রশংসায় লিপ্ত হইবেন—অল্পদিনেই আপনি প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িবেন। যে নিকটে আছে তাহার গুণের প্রশংসা করুন আর যে দূরে আছে তাহার দোষের নিন্দা করুন। প্রত্যেককেই প্রত্যেক গুণের জন্য ধন্যবাদ দিন, বিশেষতঃ যেগুলি তাহার নাই। কুরূপাকে রূপের জন্য নির্ব্বোধকে জ্ঞানের জন্য ও অন্ত্যজকে তাহার বংশমর্য্যাদার জন্য প্রশংসাকরুণ দেখিবেন আপনার বিচার কুশলতা ও জ্ঞানগরিমার প্রশংসাধ্বনিতে গগন প্রকম্পিত হইয়া

উঠিয়াছে। পৃথিবীতে এমন কেহই নাই যে তোষামোদে তুষ্ট না হয়।

তোষামোদ ভালবাসার জীবনী শক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাহারও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে হইলে পূর্ব্বে তাহাকে আত্মপ্রীতিতে ভরপুর করিয়া তোলা উচিৎ, তাহার নিজের মধ্যে যখন আর এই প্রীতির স্থান সঙ্কুলান না হইবে, তখন ইহা আপনাতে গড়াইয়া পড়িবে। কোন একটী বালিকাকে যদি বলা যায় যে সে অপ্সরা অপেক্ষাও অধিক সুন্দরী, দেবী অপেক্ষাও অধিক স্বর্গীয়া, রতিদেবী অপেক্ষাও অধিক মনোরমা—তাহার সহিত তুলনা করিলে ক্লিওপেট্রা প্রভৃতি সুন্দরগীণ নিগ্রো রমণীতে পরিণত হয়—মোটের উপর অতীতে যত স্ত্রীলোক ছিল কিংবা থাকিতে পারিত, এবং বর্ত্তমানে যত স্ত্রীলোক আছে, সে তাহাদের অপেক্ষা অধিক মনোহারিণী ও চমৎকারিণী, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনি তাহার ক্ষুদ্র বিশ্বাস পরায়ণ হৃদয়ের অনুগ্রহ ভাজন হইয়া পড়িবেন। সে আপনার একান্ত অনুগত হইবে।

অবশ্য অনেকেই স্বীকার করেন না যে তাঁহারা তোষামোদে তুষ্ট হন। কিন্তু যখন বলিবেন শুধু তোমার বেলায় এটী তোষামোদ নয়—ইহা সরল সত্য। এ কথার কোনটাই অতি রঞ্জিত নয় যে মানবরূপী যত জীব এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়াছে তাহাদের সকলের মধ্যে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দরী, স্বর্গীয়া ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত তখন সে মধুময় মৃদুহাসি সহকারে গুঞ্জন করিয়া উঠিবে, "সত্যি তুমি বড় ভাল লোক।"

একটুও অতিশয়োক্তি না করিয়া কোনরূপ তোষামোদের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু নিভাজ সত্যের সাহায্যে কখনও প্রেম স্থাপনা সম্ভবপর নয়। মনে করুন কোন সত্যবাদী প্রেমিক, প্রেয়সীর দিকে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল "সাধারণতঃ বালিকারা যেরূপ কুদর্শনা হয়, মোটের উপর তুমি সেরূপ নও, গৌরবর্ণা না হইলেও তোমাকে উজ্জ্বল শ্যামা বলা চলে। আকাশ মুখো উদো নাকের সহিত তুলনা করিলে তোমার নাক সুন্দরই বটে। আমি যতদূর অনুধাবন করিতে পারি, তাহাতে তোমার চোখ দুটী চক্ষুর যেরূপ হওয়া উচিত এবং সাধারণতঃ চক্ষু যেরূপ হইয়া থাকে সেইরূপই।" তাহার ভালবাসার খুব সম্ভবতঃ এই স্থানেই যবনিকা পতন হয় এবং তাহার প্রেয়সী সেই লোকের হাতেই ধরা দেয় যে নির্ব্বিচারে বলিয়া ফেলে, "তোমার মুখমণ্ডল ফুটন্ত গোলাপের মত সুষমাময়, কণ্ঠস্বর মধুমাখা, কেশরাজি ভ্রমরকৃষ্ণ এবং চক্ষু দুটী যেন যুগল সন্ধ্যাতারা।"

তোষামোদেরও শ্রেণীবিভাগ আছে—অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিতে হয়। অধিকাংশ লোকই সোজাসুজি ও সম্মুখের প্রশংসায় তুষ্ট। কেহ কেহ বা ইহা বিদ্রূপের আবরণে পাইতে চায় যেমন, "এই হতভাগ্য নির্ব্বোধটা চিরদিনই আপনি ভোলা—নিজের দিকে লক্ষ্য না করিয়া পরের জন্য সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দেয়।" আবার এক শ্রেণীর লোক কেবলমাত্র তৃতীয় পক্ষের মুখ হইতেই তাহার প্রশংসা শুনিতে চায়, তবে সে সোজাসুজি 'ক'য়ের সম্মুখে এরূপ না করিয়া তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু 'খ'য়ের নিকট প্রশংসা করিবে, এবং 'খ'কে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিবে, সে যেন অন্য কাহাকেও বিশেষতঃ 'ক'য়ের নিকট এই প্রশংসার কথা প্রকাশ না করে। এইরূপে তাহার উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সিদ্ধ হইবে।

অবশ্য এক শ্রেণীর হোমরা চোমরা ওমরাহের দল আছেন, যাঁহারা সগর্ব্বে বলিয়া থাকেন, "মহাশয় আমি তোষামোদ ঘৃণা করি। উহার সাহায্যে কেহই আমার নিকট লাভবান হইতে পারে নাই।" তাহাদের ব্যবস্থা অতি সহজেই করা যাইতে পারে। তাঁহাদের নিরহঙ্কার সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ করিবেন তখন তাঁহাদের নিকট হইতে যে কোন কাজ আদায় করিতে কষ্ট পাইতে হইবে না।

বস্তুতঃ অহঙ্কারকে পাপ পুণ্য দুইই বলা চলে। আদর্শ হস্তলিপিতে লিখিত ইহার বিরুদ্ধ মন্তব্য মূলক বিধি আবৃত্তি করা সহজ হইলেও কাহারও মন হইতে এই সংস্কারের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন এক প্রকার অসম্ভব। তথাপি এই রিপুই আমাদিগকে যেরূপ মন্দের দিকে চালিতে কহে, সেইরূপ ভালর দিকেও চালিত করিতে পারে। উন্নীত গর্ব্বের নামই উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আমরা প্রশংসা সম্মান ও যশ

চাই—কাজেই বড় বড় গ্রন্থ প্রণয়ন করি, মনোহর চিত্র আঁকি ও সুললিত সঙ্গীত গাহিয়া থাকি,—অধ্যয়ন বয়ন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লিপ্ত হই।

শুধু সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্যই ধনী হইতে চাই না। অন্ন বস্ত্রের অভাব মিটাইয়া সুখে জীবন যাপন করিতে হইলে তেমন প্রচুর অর্থের আবশ্যক হয় না। মূলতঃ আমরা চাই, আমাদের বাড়ীখানা প্রতিবাসীদের বাড়ী অপেক্ষা অধিকতর জাঁকাল করিতে, অধিক সংখ্যক দাসদাসী নিযুক্ত করিতে স্ত্রী কন্যার দেহ অপ্রয়োজনীয় অলঙ্কার ভারে আবৃত করিতে এবং নাম জাহিরের জন্য বড় বড় ভোজ দিতে। কাজেই আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া পৃথিবীর উন্নতিতে মনোনিবেশ করি—ইহার সুদূর প্রান্তে বাণিজ্য সম্ভার বহন করি—সভ্যতার ধ্বজা উড়াইয়া দেই।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে। গর্ব্বকে কেহ যেন ঘৃণা না করে, সম্মান গর্ব্বেরই রূপান্তর মাত্র। ঈগল এবং ময়ূরেরও গর্ব্ব আছে। নিতান্ত হীন জীবন গ্রাম্য অধমেরও গর্ব্ব আছে,—প্রকৃত বীরের ত কথাই নাই। মানুষের পক্ষে গর্ব্বহীন হওয়া অসম্ভব।

* Jerome K Jerome অবলম্বনে।

ব্যথা

কাদের নওয়াজ

সৃষ্টির নবপ্রাতে,
হে ব্যথা! তোমায় সাথী করি বিধি পাঠালেন মোর সাথে,
সঞ্জীবনীর ধারা—
পান করি কেহ গাহিলরে গান কেহ বা আত্মহারা,
যবে এল মোর পালা,
দিল কে আমায় ব্যথার গরল দুখের পাত্রে ঢালা,
পান করি হলাহল—
আজীবন আমি কাঁদিতেছি সখা ফেলিতেছি আঁখিজল।
আজি, কত ফুল ফোটে কত পাখী গায়,
চাঁদিনী যামিনী সোহাগ বিলায়,
কুলু কুলু রবে নিঝরিণী ধায়
ঢুলু ঢুলু চোখে কুমুদিনী চায়,
ঝুরু ঝুরু বহে দখিণা ধরায়
চকোরিণী উড়ি মেঘেতে মিলায়
সকলেই সুখে রয়েছে বিভোর,—
দিল্-পেয়ালায় ব্যথা-হলাহল, ল'য়ে শুধু কাঁদে চিত্ত এ মোর
শুন তবে কলপণে!
হ'ক না অসহ জীবন অবহ তবু যে ব্যথার সনে—
আছে মোর প্রীতি মনে মনে টান্ আজিও রয়েছে জানি
যদিও দগ্ধ ব্যথার অনলে উজল হৃদয় খানি,
শুন সখা প্রিয়তম,
তুমিই সোহাগে কাঁটার মাল্য কণ্ঠে দিয়েছ মম,
দুখের মুকুট তাজ—
পরায়েছ তুমি তাই শিরে ধরি সম্রাট আমি আজ।
হ'ক না যাতনা বোধ,
গানে গানে তবু ছেয়ে থেক মোর এই শুধু অনুরোধ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

১৯৩৪ সালের ভূমিকম্প—বিহার প্রলয়

গত ১৫ই জানুয়ারী ভারতের উপর দিয়া যে ভূমিকম্পের স্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে তাহাতে নানা স্থানে অল্লাধিক ক্ষতি করিলেও উত্তর বিহারের উপর দিয়াই ইহার ধ্বংসলীলা খণ্ডপ্রলয় সাধন করিয়াছে। সে দিন অপরাহ্ন ২-৪০ মিনিটের সময় এই ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়া ৩-৪ মিনিটকাল ছিল। কলিকাতা ও বাংলার বহু স্থানে ইহার প্রবল কম্পন অনুভূত হইলেও সে কম্পন তেমন বে-তালা ছিল না তাই এক দার্জ্জিলিংএ সামান্য ক্ষতি করা ছাড়া আর কোথাও অট্টালিকাদি ভূমিসাৎ হয় নাই, জীবন হানিও হয় নাই। কিন্তু বিহারে—মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা, মুজঃফরপুর, মতিহারী, সমস্তিপুর, লাহেরিয়া সরাই প্রভৃতি স্থানে এই কম্পন এত ভীষণ ভাবে হইয়া ছিল যে এই তিন চার মিনিট সময়ের মধ্যে কত রাজপ্রাসাদ, সুরম্য হর্ম্ম্য, কত পর্ণ কুটীর যে পড়িয়া গিয়াছে এবং তাহার চাপে পড়িয়া কত হাজার হাজার মানুষ যে বিনাশ হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। ভূমিকম্পে একদিকে অট্টালিকা, গৃহাদি পড়িতেছে—তাহাতে দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকার—তাহার উপর মাটিতে ফাটল ধরিয়া তাহা হইতে গন্ধকাদি মিশ্রিত জলোচ্ছ্বাস বিশ্বকে প্রলয় পয়োধিজলে গ্রাস করিতে উদ্যত। কোন স্থানে বা আগুন লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া জনপদকে জনপদ গ্রাস করিতেছে। —প্রলয়কালের যে বর্ণনা পাই—যাহাতে বহু বিরাট দেশ, জনপদ জলমগ্ন হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে বিহারের উপর দিয়াও আংশিক ভাবে তেমনি প্রলয় সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে বিহারের কয়েকটি সহরের ও অসংখ্য পল্লীর যে অবস্থার কথা ক্রমশঃ শোনা যাইতেছে তাহাতে দেখা যায় অনেক সহর বা পল্লী শুধু মাত্র ধ্বংস স্তূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। লোকজন যাহারা সেই ধ্বংসস্তূপের মহাশ্মশানে বিরাজ করিতেছে—তাহাদের গৃহ নাই, অর্থ নাই, খাদ্য নাই—এক মুক্ত আকাশ তলে ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সব আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছে।

এমন ভীষণ ভয়াবহ সংহার লীলার পর বহুক্ষণ—এক দিন, দু'দিন কোথাও বা তার চেয়েও বেশী সময় কোন সংবাদের আদান প্রদান সম্ভব হয় নাই, ডাক, তার, রেল প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে সব বন্ধ ছিল। এরোপ্লেনের সাহায্যে এই সব জলমগ্ন বা শুধুমাত্র ধ্বংসস্তূপে পর্য্যবসিত সহরাদির বিবরণ যৎকিঞ্চিৎ প্রথমে পাওয়া যায়। ক্রমে যত দিন যাইতেছে ততই এই ধ্বংস লীলার প্রচণ্ডতা বাহিরের লোকে জানিতে পারিতেছে। এই প্রলয়কাণ্ড জানিবার পরই চারিদিকে দুর্গতদের কি ভাবে সাহায্য করা যায় তাহার সাড়া পড়িয়া যায়। বড়লাট, কলিকাতার মেয়র, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতি অনেকেই সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। বিহার গবর্ণমেন্টও ক্রমশঃ সাহায্যের দিকে বেশী করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। এই চারিদিকের সাহায্য ভাণ্ডারে এ পর্য্যন্ত ২৫।২৬ লাখ টাকা উঠিয়াছে—আরো অনেক উঠিলেও প্রলয়মগ্ন দুর্গতদের দুর্গতি মোচন আংশিকও হইবে না বুঝিয়া এখন ভারতীয় নেতারা আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছেন—মহাত্মা, রবীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতি এ আবেদনে উদ্যোগী হইয়াছেন। বিলাতে লর্ড মেয়র ও হাই কমিশনার এজন্য আবেদন জানাইয়াছেন। তাঁহাদের আবেদনে এপর্য্যন্তও তেমন সাড়া না পাওয়া গেলেও শীঘ্রই পাওয়া যাইবে আশা হইতেছে। আমেরিকা প্রভৃতি স্থান হইতেও ভারতের এই দুর্গতিতে সাড়া পাওয়া যাইবে এমন আশা অনেকেই করিতেছেন। এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল হিমালয় ও নেপালের নিকটস্থ পর্ব্বত ইহাই অনুমিত হইতেছে—এত দিন যে সব ভূমিকম্প ভারতের এ অঞ্চলে হইত তাহার উৎপত্তি স্থল ছিল আসাম। ১৮৯৭ সালে ভারতে যে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে আসাম, মইমনসিং, রংপুর এবং বাংলার আরো বহু জেলার অট্টালিকাদির প্রচুর ক্ষতি হইয়াছিল অনেক লোকজনও মরিয়াছিল। সে সব ক্ষতির চিহ্ন অনেক স্থানে এখনও দেখা যায়—তাহার পূর্ণ সংস্কার আর কোন দিনও হইবে কিনা সে

বিষয়ে সন্দেহ আছে। আসাম, মইমনসিংহ প্রভৃতি স্থানে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে এখনও অনেকে সাহস করে না। আসামে তো টীনের ঘরেরই রেওয়াজ। অট্টালিকা করিলেও এক তলার বেশী কেহ বড় করে না। বিহার অঞ্চলে ভূমিকম্প যে ভীতি দেখাইয়া গেল তাহাতে মনে হয় এখানেও শীঘ্র অট্টালিকা করিতে কেহ বড় সাহস করিবে না। শোনা যায় জাপান ভূমিকম্পে ভুগিয়া ভুগিয়া এখন ভূমিকম্প-সহনশীল এক রকম ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছে। আমাদের উপদ্রুত অঞ্চল সমূহেও তেমন পরীক্ষা সম্ভব হইলে করিতে ক্ষতি নাই।

১৭৭৫ সালের লিসবনের ভূমিকম্প, ১৮৯৭ সালের ভারতের ভূমিকম্প এ সব ভূমিকম্পের ভীষণতাই বর্ত্তমানের বিহার ভূমিকম্প ছাপাইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই ভূমিকম্প বিধ্বস্ত নরনারী যাহারা এখনও বাঁচিয়া আছে তাহাদের উপরে মানুষ মাত্রেরই বিশেষ করিয়া দেশবাসীর ও দেশের গবর্ণমেণ্টের বিরাট কর্ত্তব্য রহিয়াছে। কি করিয়া বিধ্বস্ত অঞ্চল পুনরায় যথাসাধ্য বাসযোগ্য করিতে হইবে—কি করিয়া লোকজনদের অভাবের মুখ হইতে বাঁচাইতে হইবে এ সবের ব্যবস্থা দেখিতে হইবে। এই ভীষণ শীতের মধ্যে গৃহ হারাদের যে কি দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে তাহা কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়? আপাততঃ দেশের বিবিধ প্রতিষ্ঠান হইতে যে সাহায্য পাওয়া যাইতেছে তাহাতে তাহাদের বর্ত্তমানের দুঃখ কষ্টের কিছু লাঘব হইবে কিন্তু এরূপ সাহায্য দীর্ঘকাল বজায় রাখা সম্ভবপর নয়। তখন বিশেষ ভাবে ইহাদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন একমাত্র দেশের গবর্ণমেণ্টই। বিহার গবর্ণমেণ্ট তথা ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে আজ ভীষণ দায়িত্ব উপস্থিত। গৃহহীনদের গৃহের ব্যবস্থা করিবার মত ঋণ দিতে হইবে। কৃষিকার্য্য করিবার মত সম্বল দিতে হইবে, ইহাদের বাঁচাইয়া রাখিবার মত আহার্য্য দিবারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এজন্য যে টাকার দরকার হইবে তাহা কি ভাবে উঠান যাইতে পারে সে সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত দিতেছেন সে বিষয়ে যাহা ভাল তাহা গবর্ণমেণ্টকেই নির্ণয় করিতে হইবে। জনসাধারণের হিতার্থেই যে গবর্ণমেণ্ট, গবর্ণমেণ্ট এক্ষেত্রে তাহার সম্যক পরিচয় দিতে পারিবেন।

এই ভূমিকম্প দিনের বেলায় না হইয়া রাত্রিকালে হইলে আরো অসংখ্য লোক হত আহত হইত। বিংশ-শতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগেও ভূমিকম্পের এই জনপদ বিধ্বংসী লীলাকে বিধাতার বিধান বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে—ইহা নিরোধের উপায় মানুষের নাই—তবে মানুষ এক্ষেত্রে আর্ত্তের যথাসাধ্য সেবা করিয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারে।

ভূমিকম্প ও মহাত্মা

ভূমিকম্প-পীড়িতদের সেবায় অনেক নেতা আত্ম-নিয়োগ করিলেও মহাত্মা গান্ধী কেন ভূমিকম্প প্রপীড়িত অঞ্চলে আসিয়া আর্ত্ত সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেছেন না এ সম্বন্ধে একটা অনুযোগ কোন কোন অঞ্চল হইতে শোনা গিয়াছিল। অনেকে এ অনুযোগও দিতেছিল মহাত্মা হরিজন সেবায় যে অর্থ তুলিয়াছেন তাহা বিহারের দুর্গতদের জন্য ব্যয় করুন না কেন ইত্যাদি। এই সব অনুযোগ যাহারা মহাত্মার প্রতি আরোপ করিয়াছেন তাহারা বিহারের জন্য দরদী না মহাত্মার প্রতি দরদী? বিহারের উপর আকস্মিক ভাবে আজ যে বিপদ আসিয়া পড়িয়াছে তাহার সাহায্যের জন্য চারিদিক হইতে যথাসাধ্য অর্থ আসিতেছে। মহাত্মা আসিলেই যে এর চেয়ে কিছু অঘটন হইত তাহা মনে হয় না। আর হরিজনদের জন্য মহাত্মা যাহা উঠাইয়াছেন তাহাই বা একার্য্যে ব্যয় করিবার কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? সব কাজেই যে মহাত্মার নিজের নামিতে হইবে ইহারই বা কি হেতু থাকিতে পারে? বহু দেশস্থ লোক হইতে আচার্য্য রায় ও রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতিও তো ইহাতে রহিয়াছেন। বিহারের চম্পারণেই মহাত্মার প্রথম কার্য্য খ্যাতি উদ্ভাসিত হইয়াছিল—বিহার মহাত্মার কত প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্র তাহা মহাত্মাই ভাল জানেন। রাজেন্দ্র প্রসাদ তো আছেনই, তা ছাড়া অধুনালুপ্ত সবরমতীর সমস্ত সত্যাগ্রহীদের মহাত্মা বিহারে যাইতে আদেশ দিয়াছেন—প্রয়োজন হইলে নিজেও যাইতে প্রস্তুত জানাইয়াছেন। তবু—এক শ্রেণীর

লোক মহাত্মার মত লোকের নামেও এই শ্রেণীর দরদ দেখাইয়া মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী ইহাই প্রমাণ করিতে চায়!

ভূমিকম্পে নেপাল

ভূমিকম্পে নেপালেরও বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে ও বহু অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে—অনেক ছোটখাট পাহাড় ধ্বসিয়া গিয়াছে। নেপালের দুস্থদের সাহায্যের জন্য ভারতের অনেক প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী আছেন—এ সংবাদ তথাকার মহারাজকে জানানো হইয়াছে—মহারাজও জানাইয়াছেন প্রয়োজন হইলে সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। নেপাল গুর্খাদের বাসস্থান তাই ইংলণ্ডের অনেক সংবাদ-পত্রও নেপালে সাহায্যের প্রেরণা দিতেছেন।

পরলোকে রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার

মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রের খ্যাতনামা সম্পাদক কংগ্রেস নেতা এ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয় ৫৭ বৎসর বয়সে গত ৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১-৪৫ মিনিটের সময় পরলোক গমন করিয়াছেন, ১৯০৬ সালে ইনি 'হিন্দু' পত্রে সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য আরম্ভ করিয়া ১৯১৫ সালে, বিখ্যাত তামিল দৈনিক 'স্বদেশ মিত্রমের' সম্পাদক হন। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ইনি মণ্ট-ফোর্ড কমিটিতে সাক্ষ্য দিতে বিলাতে গিয়াছিলেন। ১৯২৪ হইতে ২৭ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯২৪ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত ও স্বরাজ্যদলের সেক্রেটারী হন। ১৯৩১ ও ৩৩ সালে তিনি রাউণ্ডটেবল্ কনফারেন্স যোগ দিয়াছিলেন। সংবাদপত্র-সেবী হিসাবে ও কংগ্রেসসেবী হিসাবে আয়েঙ্গার মহাশয়ের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। স্বরাজ্যদল গঠনে ও পরিচালনে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। অর্থনৈতিক বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্র বিশেষ সুপরিচালিত সংবাদপত্র, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারের পরিচালন কালে তাহার সে প্রতিষ্ঠার হ্রাস তো হয়ই নাই বরং তাহা উজ্জ্বলই হইয়াছে। আয়েঙ্গার মহাশয় সংবাদপত্রসেবী হইয়াও রাজনীতিক্ষেত্রে যেরূপ সম্মান পাইয়া গিয়াছেন তাহাও সংবাদপত্রসেবীদের আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ভারতীয় সংবাদপত্র জগৎ ও রাজনীতিক্ষেত্র হইতে একজন বিশিষ্টকর্ম্মী আজ মহাকালের আহ্বানে বিদায় হইলেন—আমরা রঙ্গাস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয়ের আত্মীয় স্বজনকে ও হিন্দু পত্রকে এই শোকে সহানুভূতি জানাইতেছি।

পরলোকে মধুসূদন দাস

উৎকলের বরেণ্য নেতা মধুসূদন দাস মহাশয় ৮০ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। উড়িষ্যার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সঙ্গে ইহাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিহার-উড়িষ্যা কাউন্সিলের সদস্য ও মন্ত্রীরূপে তিনি প্রশংসনীয় কার্য্য করেন—ধর্ম্মে খৃষ্টান হইলেও তাঁহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না—উড়িষ্যার উল্লেখযোগ্য লোকের নাম করিতে সর্ব্বাগ্রে দাস মহাশয়ের নামই আসিত। এই দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনগণকে আমরা সহানুভূতি জানাই-তেছি।

ভূমিকম্পের সাহায্যে পক্ষপাত

বিহার ভূমিকম্পের সাহায্যে প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় এবং সাহায্য বিতরণেও কিছু পক্ষপাত কোথাও দেখানো হইয়াছে বলিয়া গুজব উঠিয়াছে। কোন সংবাদপত্রে এমন কথাও দেখিয়াছি যে কোন বাঙ্গালী ফাটলে পড়িয়া মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিলেও কোন অ-বাঙ্গালী তাহাকে উদ্ধার করে নাই। জানি না ইহার কতটা সত্য—শোনা কথা তিল পরিমাণ সত্য থাকিলে তাল পরিমাণ রটিতে বিলম্ব হয় না। সাহায্য দান কার্য্য যেরূপ বিরাট ব্যাপক ভাবে চলিতেছে তাহাতে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নহে। তবে বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় কতকটি লোকের মাঝে মাঝে কার্য্যস্থলে গিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রিপোর্ট প্রচার করা সঙ্গত মনে হয়। এ সব কোথাও এক আধটু ঘটিলেও সংবাদপত্রে ইহাকে বেশী প্রাধান্য দিয়া আত্মকলহ সৃষ্টির প্রয়াসে কোন লাভ নাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাহারা এই ব্যাপারে নিঃস্ব হইয়াছেন তাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন বেশী—অথচ তাহারা বিতরণের ক্ষেত্রে গিয়া সাহায্য লইতে

পারেন না—মজুর শ্রেণী সাহায্যও লইতেছে—মজুর খাটিয়াও বেশ রোজগার করিতেছে। এরূপ অবস্থায় অনেক স্থানেই শুনিতেছি কর্ত্তৃপক্ষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের বিনা সুদে বা স্বল্প সুদে ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, ইহা অতি সঙ্গত কার্য্য। এক্ষেত্রে সাহায্যকারীদের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের অবস্থা বিশেষ ভাবে ভাবিয়া যথাসম্ভব উপায়ে তাহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এখন কোন মহাসমর সম্ভব কি ?

আবার একটি বিরাট যুদ্ধ শীঘ্র বাধিতে পারে কি না ইহা লইয়া মাঝে মাঝেই আলোচনা দেখা যায়। জেনেভার শান্তিতীর্থ বা লীগ অব নেশান, অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ বৈঠক ইত্যাদি শান্তির কোন পুণ্যজল ধরণীবক্ষে ছিটাইতে পারিল কিনা সে বিষয়ে অনেকের চিত্ত সংশয়াচ্ছন্ন। মহাযুদ্ধের পর সন্ধি-মুক্ত জার্ম্মেনী যে-রকম আষ্ঠে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়িয়াছিল—তারপর হিটালারের অভ্যুত্থানে তাহার বন্ধন-মুক্তি প্রয়াস এখনো চলিতেছে—জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া মাঞ্চুকুয়ো সৃষ্টি করিল এ সব ব্যাপারে কোন শক্তিই আনন্দিত না হইলেও গাত্রজ্বালা নিবারণের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিবার সাহস দেখাইতে পারে নাই। মহাযুদ্ধের পর আর্থিক টাল সামলাইতে গিয়াই পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গ এখন ভীষণ বিব্রত—এখন অপর কোন যুদ্ধে গা ঢালিবার মত সাহস বা আর্থিক ক্ষমতা কাহারও বিশেষ নাই। গত মহাযুদ্ধে ব্যবসায় বাণিজ্যে এবং আরো নানা প্রকারে জাপান লাভবান হইয়াছিল আশাতীত, তাই প্রাচ্যের একমাত্র শক্তি জাপান এই সুযোগে নিজের আয়তন যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিয়া যাইতেছে। যুদ্ধের পর রাজ্য বিস্তার ও বাণিজ্য বিস্তারে জাপান যতটা অগ্রসর হইয়াছে অপর কোন জাতি তাহা পারে নাই। এখন শুনিতেছি জাপান প্রতিবেশী চীনের অংশ অধিকার করিয়াও খুসী নহে সে প্রাচ্যে রুষের অধিকারও সংক্ষিপ্ত করিয়া দিতে চাহে। রুষিয়াও রক্ত চক্ষু করিয়া তাহাকে শাসাইতেছে। তবে কি আবার রুষ জাপান যুদ্ধের পুনরভিনয় হইতে পারে? এমনি ভাবে আরো কোথাও কোথাও যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা এক একবার দেখা যায়—যুদ্ধ যে কোন দু'টি রাজ্যে লাগিলে তাহার সহিত বহু রাজ্যের যোগাযোগে আবার বিশ্বব্যাপী মহাসমর বাধাও বিচিত্র নয়—কারণ এখন নানা রাজ্যের সঙ্গে নানা যোগ-সম্পর্ক বিচিত্রভাবে জড়িত। যুদ্ধ বাধে বাধে করিয়াও জগৎব্যাপী আর্থিক ত্রাসের জন্য যেমন বাধা সম্ভব হইতেছে না আবার অন্যদিকে এই যে রাজ্যে রাজ্যে সমরায়োজন চলিয়াছে—এই যে অসংখ্য এরোপ্লেন, সাব্‌মেরিন, যুদ্ধ জাহাজ তৈরী হইতেছে—এই যে অর্দ্ধেক রাজস্ব সমরোৎসবে ব্যয়িত হইতেছে এ ঠাট যুদ্ধ না করিয়া আর কত দিন সমভাবে বৃদ্ধি করিয়া চলা যায়—এই কর্ত্তব্যের দায়ে হয়তো এই আর্থিক দুরবস্থার মধ্যেও যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া যাইতে পারে।

সভ্য মানুষ কোন পথে চলিতেছে ?

বিংশ শতাব্দীর মানুষ জ্ঞানে বিজ্ঞানে এত অগ্রসর হইয়াছে—সাগরে তাহাদের অর্ণবযান চলিয়াছে, আকাশে এরোপ্লেন উড়িতেছে—নানা ব্যাধি আসিতেছে ঔষধ হইতেছে—জন্ম নিরোধ—যৌবন সংরক্ষণ ব্যবস্থা হইতেছে তবু মানুষ জন্মিতেছে ও মরিতেছে। এ-যুগে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে মেলা-মেশা আলোচনা বেশী হইয়াছে—জাগতিক মানুষের মধ্যে একটা ভাবের আদান-প্রদান চলিয়াছে। এ-যুগে মানুষের সুবিধার জন্যই সব করা হইতেছে কিন্তু মানুষের অসুবিধা ও অভাব আর কিছুতেই মিটিতেছে না। ক্রমশই তাহা বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রতি রাজ্যেই অসংখ্য মানব যে ট্যাক্স দিতেছে তাহার বেশীর ভাগই দেশ-রক্ষা ও পররাজ্য আক্রমণের জন্য সৈন্য পোষণে ব্যয়িত হইতেছে। বিজ্ঞানের যত কিছু চরম সৃষ্টি হইতেছে তাহার চরম উদ্দেশ্যই যেন হইতেছে কি ভাবে বেশী লোক হত্যা করা যাইতে পারে। বিজ্ঞানে মানুষ নানা ভাবে উপকৃতও হইতেছে যথেষ্ট কিন্তু তাহার চরম লক্ষ্যের কথা মনে পড়িলে সে উপকার ক্ষুদ্রই বোধ হয়। যে নরহত্যার ফাঁসী, দ্বীপান্তর হইতেছে সেই নরহত্যাই যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে সংঘটিত হইতেছে। ইহা যে শুধু এ কালেরই ধর্ম্ম তাহা নহে, পূর্ব্বতন কালেও এমন কাণ্ড বহুবার ঘটিয়াছে, পুরাণে-ইতিহাসে তাহা

দেখা যায়। সভ্য মানুষের চরম সভ্যতাই কি তবে এই ধ্বংসের মুখে আগাইয়া যাইবার উপায় উদ্ভাবন করায় ও তাহা কার্য্যে পরিণত করায়?

পরলোকে স্যার প্রভাসচন্দ্র

গত ২৬শে মাঘ বেলা ২-২০ মিনিটের সময় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সে দিন সকালেও তিনি বাংলার গবর্ণরের একসিকিউটিভ্ কাউন্সিলের সভায় যোগ দিয়া কার্য্য করিয়া ১টার সময় বাসায় ফিরিয়া স্নান কক্ষে গিয়া স্নান করিবার সময়ই মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্যার প্রভাস স্বানামধন্য স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রে তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৮৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৯৫ সালে এম-এ ও ল' পাশ করিয়া ১৮৯৭ সালে হাইকোর্টে যোগ দেন। এই সময় সামান্য কিছুকাল তিনি কলিকাতার রেজিষ্ট্রারও হইয়াছিলেন। পরে আবার হাইকোর্ট যোগ দেন। ইনি রাওলাট কমিটির সদস্য হইয়া একশ্রেণীর লোকের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। মণ্টাগু শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে ইনি শিক্ষমন্ত্রী হন। পরেও মন্ত্রী হন এবং পরে শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ সালে তাঁহার কার্য্য কাল শেষ হইলে তাহা আরো এক বৎসর বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। ইনি বৃটিস ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের সম্পদক ও সভাপতি ছিলেন! কাউন্সিলের সদস্য—একজিকিউটিভ কাউন্সিলের ভাইসপ্রেসিডেণ্ট ছিলেন। নানা আইনে প্রভাসচন্দ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বাংলার জমিদার সম্প্রদায়ের একটা বড় স্তম্ভ ও সহায় ছিলেন তিনি—প্রভাসচন্দ্র বিশেষ ক্ষমতাশালী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন—আজ তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার বিশেষ ক্ষতি হইল। ইনি সদালাপী ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। গোলটেবল বৈঠকে দুইবার বিলাত গিয়াও ইনি নানা ভাবে ভারতের উপকারের চেষ্টা করিয়াছেন। প্রভাসচন্দ্রের বিয়োগে আমরা আজ মস্ত একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতা হারাইলাম। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুণ। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের সহানুভূতি জানাইতেছি।

বিহার পুনর্গঠনে কত টাকা লাগিতে পারে?

বিহারের ভূমিকম্প বিধ্বস্তদের সেবার পর যথসম্ভব পুনর্গঠনের সমস্যা আসিবে। ১৯২৩ সালে জাপানে ভূমিকম্পের পর তাহার পুনর্গঠনে প্রায় ৮০ কোটী মুদ্রা লাগিয়াছিল। এখনই বিহারের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ সম্ভব না হইলেও যতটা ক্ষতি অনুমিত হইতেছে তাহার কতকটা পুনর্গঠনে ৩০।৪০ কোটি মুদ্রার কম ব্যয় হইবে না মনে হয়। বিহার গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছেন, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ জানাইয়াছেন—ভূমিকম্পে বিহারের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের পরিমাণ ৩০ হাজার বর্গমাইল হইবে। মোট ১২টি সহর বিধ্বস্ত হইয়াছে, ৩ হাজার বর্গ মাইল কৃষিজমি ভূগর্ভ উত্থিত জল ও বালিতে মরুভূমির মত হইয়াছে। সমস্ত কূপ বালি ভর্ত্তি হওয়াতে পানীয় জলের মহা অসুবিধা হইয়াছে। ক্ষেত্রের শস্য যথেষ্ট নষ্ট হইয়াছে। ১৫টি চিনির কলের ১০টী ধ্বংস ও ৫টী কাজের অযোগ্য হইয়াছে। ২০ হাজারের বেশী লোক মারিয়াছে এবং এখনো ধ্বংস স্তূপে বহু মৃতদেহ রহিয়াছে।—পুনর্গঠনের প্রারম্ভে ধ্বংস স্তূপ পরিষ্কার ও প্রোথিত সম্পত্তির উদ্ধার, কূপগুলির পুনরুদ্ধার, কর্ষণের অযোগ্য জমিগুলির উন্নতি, অদূর ভবিষ্যতে যে খাদ্যাভাব ঘটিবে তজ্জন্য এখন হইতেই খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা। যাহাদের শিল্প ব্যবসা নষ্ট হইয়াছে তাহাদের যথাসম্ভব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, জমি একেবারে যেথায় নষ্ট হইয়াছে তথাকার কৃষাণদের সরাইবার ব্যবস্থা, জমির খাজনা, সেস্, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের ব্যবস্থা, চিনির কলগুলিকে কার্য্যক্ষম করার ব্যবস্থা এই সব বহু কার্য্য করিতে হইবে। ইহাতে প্রচুর অর্থ চাই এবং নিস্বার্থ সেবা প্রতিষ্ঠানের বহু উৎসাহী কর্ম্মী চাই। গবর্ণমেণ্টের এবং দেশবাসীর পূর্ণ সহযোগিতা চাই।

গ্রন্থ-পরিচয়

চালিয়াৎ চন্দর— (ছেলেমেয়েদের উপন্যাস) শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক এস-কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১৯৮ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা। মূল্য আট আনা। চালিয়াৎ ছোকরা চন্দরের বহু চালিয়াতির গল্প সৌরীন বাবু বেশ চটকদার ভাষায় বলিয়াছেন, পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। চন্দর চালিয়াৎ ছেলের আদর্শ হইতে পারে কিনা পাঠক-পাঠিকারা সে বিচার করিবেন। প্রচ্ছদ পটের ত্রি-বর্ণ চিত্র ও ভিতরের ছবি গুলি সুন্দর হইয়াছে। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ও মনোজ্ঞ—বহিখানির বহিরাবরণের সঙ্গে গল্পের বৈচিত্র্য ও ছেলে-মেয়েদের চিত্ত আকর্ষণ করিবে।

দিল্লীকা লাড্ডু— শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত— ছেলে-মেয়েদের গল্পের বই। প্রকাশক এস-কে-মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স—১৯৮, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। এই বইখানিতে ১১টি ছোট-বড় গল্প আছে এবং প্রায় সব গুলি গল্পই বলিবার ভাষার চাতুর্য্যে নূতন রকমের মনে হয় ও পড়িয়া আনন্দ পাওয়া যায়। বেশ smart গল্প। ছেলেমেয়েরা পড়িয়া বিশেষ আনন্দ পাইবে সন্দেহ নাই। এ বই খানিরও প্রচ্ছদপটের ত্রি-বর্ণ চিত্র ও ভিতরের ছবিগুলি সুন্দর। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই মনোজ্ঞ শিশু-চিত্ত সহজেই অকৃষ্ট করিতে পারিবে। এত অল্প দামে এমন সুন্দর বই দু'খানি ছেলেমেয়েদের হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য প্রকাশকেরা ধন্যবাদ পাইতে পারেন।

পত্র-লেখা, শ্রীকনকলতা ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক-জ্ঞান পাবলিশিং হাউস, ৪৪ বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা। এই গ্রন্থের কয়েকখানি পত্রে লেখিকা বাংলার বিধবাদের মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। নিবেদনে লেখিকা লিখিয়াছেন —'যদি কয়েকটিও ভাগ্যহতা নারীর চিত্তে ইহা সমব্যথিতার সহানুভূতির স্নিগ্ধ ধারা ঢালিয়া দিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে 'পত্রলেখা' প্রকাশের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সফল হইবে।' সুলেখিকা কনকলতা বিধবা, তাই বিধবার ব্যথা ও অবস্থা তিনি তাঁহার অশ্রুসিক্ত ভাষায় প্রাণস্পর্শী করিয়া ফুটাইতে পরিয়াছেন এবং এ ভীষণ অবস্থায় পড়িলে দুর্ভাগিনী নারী কি ভাবে সহস্র অশান্তির মধ্যেও কিছু শান্তি পাইতে পারেন তাহারা ইঙ্গিত করিয়াছেন। বাংলার নারীদের এবং যাঁহারা বিধবাদের অবস্থা চিন্তা করেন তাঁহাদের 'পত্রলেখা' পড়িতে অনুরোধ করি।

নূতন পথে—শ্রীকনক লতা ঘোষ প্রণীত গল্পের বই। প্রকাশক জ্ঞান পাবলিশি হাউস্, ৪৪, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা, এই গ্রন্থে লেখিকার আটটি বড় গল্প স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থের পরিচয়ে শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় বলিয়াছেন—লেখিকার কল্পনা লীলা-বিলাসিনী নহে, পুণ্য পথচারিণী তপস্বিনী এবং এ কালের আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি সম্পন্না হইলেও সেকালের অনুবর্ত্তিনী ও আদর্শ বাদিনী। তাঁহার রচনার সৌন্দর্য্য, ভাবের গাম্ভীর্য্য এবং স্বভাবের মাধুর্য্য সহজেই চিত্তাকর্ষণ করে। তাঁহর আখ্যান বস্তু আড়ম্বরহীন অথচ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সমস্যা সমাকুল। তাহাতে একালের আর্ট (art) না থাকিলেও সে কালের হার্ট (heart) আছে। বসু মহাশয়ের কথাগুলি এই গ্রন্থের প্রতি গল্পে উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। গল্প গুলি পড়িলে লেখিকার উচ্চ ভাব ধারণা ও মনের পরিচয় পাওয়া যায়। একটা অনাবিল আনন্দ শান্তি

লাভের প্রয়াস এবং সেই সঙ্গে মানসিক হৈর্য্যেরও কিছু শিক্ষা লাভ করা যায়। গ্রন্থের ছাপা কাগজ সুন্দর, প্রচ্ছদপটের, চিত্রটি একটু চিত্তাকর্ষক হইলে ভাল হইত

সাকি ওস্তুরা। কবিতার বই। শ্রীবীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ বিদ্যারত্ন প্রণীত, দাম ছয় আনা। এই গ্রন্থে মোট ১৫টি কবিতা আছে এবং কয়েকটি কবিতা পড়িয়া বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে কবির আরো ভালো কবিতার বই দেখিবার আশা করি।

শান্তি-সোপান বা পান্থ প্রদীপ। হজরত এমাম গাজ্জালী (রাহমাতুল্লাহআলায়াহ) প্রণীত মেনহাজোল আবেদিন ও ছেরাজোছছালেকিন নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক মৌলবী চৌধুরী কাজেমদ্দীন আহম্মদ সিদ্দিকী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান বলিয়াদি, ঢাকা। মূল্য ২।০ স্থলে ১।০। আজকাল মোস্লেম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই আরবী ও পার্শি পড়িতে বা বুঝিতে পারেন না তাই মৌঃ সিদ্দিকী সাহেব আরবী হইতে এই সুবিখ্যাত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন। বলিয়াদির সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী খাঁ বাহাদুর সিদ্দিকী সাহেব নিজে সাহিত্য রসিক ও সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠ পোষকও বটে—আরবি হইতে এই সুবিখ্যাত পুস্তক-খানির অনুবাদে তিনি যথেষ্ঠ শ্রমস্বীকার করিয়াছেন এবং এরূপ জ্ঞানগর্ভ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া তিনি একটি মহৎকার্য্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা শিক্ষিত মুসলমানদের ও মুস্লিম ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে অভিলাষী হিন্দু-দেরও এই পুস্তকখানি আয়াস স্বীকার করিয়া পড়িয়া দেখিতে বলি।

ভ্রম-সংশোধন—"ত্রিবর্ণ চিত্র" পশারি ওয়ালীর স্থলে পশারিণী পড়িতে হইবে

মাতৃমূর্ত্তি

লুনি (Luini)

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ, কলিকাতা।

৺ সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত

৮ম বর্ষ { শ্রাবণ ১৩৪১ { ৪র্থ সংখ্যা

নারী ধর্ম্মঘট

কুমারী ছায়া দেবী

[বিশ্বের অধিকাংশ নারীই এখন আর তাহাদের পূর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্ট নহে—নানা ভাবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া তাহারা ইহার প্রতিকার চাহিতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে—লেখিকা নারীদের এমনি ধর্ম্মঘটের চিত্র দিয়েছেন এবং তাহাতে নারীদের সঙ্গে পুরুষদের ও ঘর সংসারের অবস্থা কেমন হয় তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নারী ধর্ম্মঘট কৌতুহলোদ্দীপক—চিন্তারও খোরাক আছে।]

সে আজ অনেকদিনের কথা। তখন আমার বয়স ছিল অল্প। পল্লীগ্রামে যৎসামান্য বিদ্যা অর্জ্জন করিতেছিলাম, এমন সময় আমার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন। পিতৃদেবের যৎসামান্য আয় ছিল তাহাতেই আমাদের কায়ক্লেশে চলিয়া যাইত। কিন্তু এখন দিন যাওয়া বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিল; জননীর বেদনা ক্লিষ্ট মুখদর্শনে আমার মাথা নত হইয়া পড়িত। মনে মনে একদিন স্থির করিলাম কলিকাতায় গিয়া চাকরির চেষ্টা করিব। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া জননীর অজ্ঞাতসারে কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলাম। পরণে ময়লা কাপড় ও একটি টুইল সার্ট—শুধু পা, সঙ্গে পয়সার লেশমাত্র নাই। যখন ক্ষুধার উদ্রেক হইত গৃহস্থের শরণাপন্ন হইতাম। মুড়ি, নারিকেল নাড়ু, ও দুগ্ধ বাঙলার পল্লীতে তখন অভাব হয় নাই। এমনি করে একদিন সহরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় কলিকাতায় বাস করিতেন। নিরুপায় হইয়া তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা চাহিলাম। প্রথম প্রথম আমাকে লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন কারণ আমি দরিদ্র। পরে আমার কাকুতি মিনতিতে তাঁহার স্নেহের উদ্রেক হয়। কলিকাতায় আমার স্থান হইল। আত্মীয়ের পরামর্শে চাকুরির সন্ধানে প্রভাত হইলে বাহির হইতাম। সমস্ত দিন পদব্রজে নানাস্থান ঘুরিয়া রাত্রে নিরাশ হৃদয়ে ক্লান্তদেহ লইয়া বাড়ী ফিরিতাম। এমনি করিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

প্রখর রৌদ্রে সেদিন সহরের সৌন্দর্য্য স্তিমিত প্রায়। মনে হয় গ্রীষ্মের আতিশয্যে সহর-মনে আফিমের নেশা ধরিয়াছে। যাহার বিশেষ প্রয়োজন সেই কেবল সহর মরুভূমিতে যাতায়াত করিতেছে। দরিদ্রের কথা স্বতন্ত্র।

আমিও সেই প্রখর রৌদ্রে নগ্নপদে চাকরির আবেদন হস্তে লইয়া আফিসে গেলাম। অদৃষ্ট মন্দ, দেখি সেই

অফিসে কিসের জন্য ধর্ম্মঘট হইয়াছে। হতাশ মনে বাড়ীর দিকে ফিরিলাম।

দেহ ক্লান্তিবোধ করিতে লাগিল; তখন সেই লালিত্য বিহীন ক্ষীণ তনু লইয়া ক্ষুধার জ্বালায় নিকটবর্ত্তী উদ্যানে বিশ্রামের তরে উপনীত হইলাম। ভগ্নআশা ও ক্ষুধার সংমিশ্রণে আমার দেহ মনে এক প্রকার অবসাদ আসিল। ঠিক অবসাদ কি তন্দ্রা বুঝিতে পারিতেছিলাম না; স্বপ্নাবস্থা কি জাগ্রতাবস্থা তাও বুঝিবার শক্তি ছিলনা। কি যেন এক রকম হইয়া গিয়াছিলাম।

* * *

* * * *

এইভাবে কতক্ষণ গেল জানিনা। তারপর ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় যে আসিলাম তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতা সহরের পরিচিত রাস্তা বলিয়াত মনে হইতেছে না।

পল্লীগ্রামে বাসকালে জমিদার বাবুদের গৃহাবাস দেখিয়া মনে হইত যদি কখন অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি তাহা হইলে এইরূপ উৎকৃষ্ট একখানি অট্টালিকা তৈয়ারি করিব। কিন্তু যখন কলিকাতা সহরের সৌধাবাস দেখিলাম তখন মনে মনে ভাবিতাম ইহার নিকট জমিদার গৃহ! এক্ষণে এই সমস্ত বাড়ীঘর দুয়ার দেখিয়া কলিকাতা সহরের সুখ সৌন্দর্য্য মানসপট হইতে তিরোহিত হইল। বড় বড় অট্টালিকা; বড় বড় সোজা রাস্তা। রাস্তার দুধারে বড় বড় বৃক্ষ। প্রত্যেক বৃক্ষটি পুষ্পভারে নত মস্তকে দাঁড়ায়ে আছে—যেন নব পথিককে, নব আগন্তুককে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছে। রাশি রাশি কুসুম বৃক্ষতলে সভা করিয়া রাস্তার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় এ বৃক্ষ-সৌন্দর্য্যের শোভা শেষ হয় না। বাড়ীঘর দুয়ার দেখিলে মনে হয় কোন একজন সুনিপুণ শিল্পী তাহার মানসপটের রসবোধ দ্বারা এই সহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রত্যেক বস্তুটি সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক।

নব বস্তু সন্দর্শনে তন্ময় হইয়া নিজ মনে চলিয়াছি। পথেরও শেষ নাই আমার পথ চলারও সীমা নাই। হঠাৎ মনোমধ্যে উদয় হইল তাইতো একজন মানুষকে জিজ্ঞাসা করিলে হয় না এ প্রদেশের নাম কি? ফিরে দেখি জনমানব শূন্য পথ। মনে হইল সত্যিইতো এতদূর পর্য্যন্ত আসিলাম কৈ একজন মানুষও তো দেখিতে পাইলাম না। ভয় হইল; চেয়ে দেখি সহরের দৃশ্য যেন চকিতে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। পরিষ্কার বড় অট্টালিকা কিন্তু তার সাজগোজ যেন সব এলোমেলো। কার অভাবে যেন বাড়ীর লক্ষ্মী শ্রী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমস্ত গৃহগুলির ভিতর যেন একটা অভাববোধ দেখা যাইতেছে।

কোন গৃহের সদর-দরজা বন্ধ; আবার কোন গৃহের অর্দ্ধভেজান; কোন গৃহের তাহাও নাই। ধূলাতে দরজা-গুলির অবস্থা হইয়াছে যেন কতকাল গৃহে লোকজন নাই। পথগুলি এত অপরিষ্কার যেন যুগান্তর পরিষ্কার হয় নাই। উপরকার ঘরের শার্সিগুলির উপর কত ধূলা জমিয়া গিয়াছে। জানালার চিত্রবিচিত্র কাপড়গুলি শত ছিদ্রবিছিদ্র হইয়াছে, বাতাসের তাড়নায় কেহ বা কোণঠেসা হইয়া পড়িয়াছে। যে বাড়ীটির দিকে নিরীক্ষণ করি দেখি সবই বিশৃঙ্খল—যেন কি বস্তুর অভাবে স্বভাবের বিকাশ হইতেছে না। এমন সময় দূরে একজন মানুষ দেখিতে পাইলাম। ভদ্রলোক হন্তদন্ত হইয়া চলিয়াছেন। পরণে অপরিষ্কার ইজের তাও শত-ছিদ্র। মাথার টুপিতে এক মুটা ধূলা জমিয়াছে। কোটের সব বোতামগুলি নাই—যেন সেলাই করিবার অভাবে জামাটির এই বিকৃত অবস্থা। লোকটি কিসের ভাবনায় যেন উন্মনা। দেখিলে মনে হয় যেন সদ্য স্ত্রীবিয়োগ ঘটিয়াছে। আমার গলার স্বর শুনিয়া ভদ্রলোক একটিবার মাত্র চাহিলেন তারপর যথাপূর্ব্বং তথা পরং।

ভদ্রলোকের ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আমি অপরিচিত পথিক কোথায় সৌজন্যের জন্য যথারীতি উত্তর দিবেন তা নয় নিজ মনেই চলিয়া গেলেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি এমন সময় দেখি সুমুখের বাড়ী হইতে একটি হৃষ্টপুষ্ট প্রৌঢ় সটান আমার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি বিদেশী পথিক।

আচ্ছা মশাই, আপনি সত্যি করে বলুন দেখি আমি পাগল কি না? লোকে বলে আমি পাগল। পাগল হ'তে যাব কেন? মানুষ বিষয়ের লোভে মানুষকে পাগল করে দেয়। ভাই ভায়ের বিষয় ভোগ করবার জন্য মায়ের পেটের ভাইকে পাগল করে দেয়। স্ত্রী উপপতির সঙ্গ লাভের আশায় স্বামীকে পাগল করে দেয়। ধনী নিজ সুখের ইচ্ছায় মানুষকে পাগল করে মানুষ হত্যা শেখায়। আমরা বেশ থাকি মশাই, কিন্তু যেই বিবাহ করেছি অমনি পাগল হয়েছি। আপনি স্থির জানবেন কোন বিবাহিত লোকের মাথায় শান্তি নাই সব পাগল। সব পাগল।—এই কথাগুলি শুনাইয়া খুব উচ্চৈস্বরে হাসিতে লাগিল। আর একটা কথা বলি শুনুন। কোন এক দেশের একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত বলেছিলেন, রাজা আর স্ত্রীলোককে কখন বিশ্বাস কর্ত্তে নাই। বিশ্বাস করেছেন কি আপনাকে ডুবিয়েছে। এই দেখুন না মশাই, দুবেলা দুমুঠ রেঁধে খাওয়াচ্ছিল তাও খেয়ালের মাথায় বন্ধ করে দিয়ে স্বাধীন হতে চলে গেল। এখন আমি আহার করি কি? বলি তোরা পরাধীন কোন্‌খানটায় ছিলি যে স্বাধীন হতে আজ ছুটেছিস্? পাগল কি আর গাছে ফলে!—এই কথাগুলি শুনাইয়া পুনরায় দৌড়াইয়া গৃহের ভিতর চলিয়া গেল। ভদ্র লোকের আচার ব্যবহার এবং কথবার্ত্তার ঢং দেখিয়া বুঝিলাম বিকৃত মস্তিষ্কের লোক।

ভদ্রলোকের কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি এমন সময় দেখি সদাহাস্যময় এক যুবক আসিয়া উপস্থিত। যুবকটিকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁ মশাই, বলতে পারেন এ কোন্ দেশ, এখানে পথে লোকজন চলাচল নাই কেন? যা-ও দু'একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল তারাও যেন কি রকম কি রকম! কথার উত্তরই দিল না। আমার কথা শুনিয়া ভদ্রলোক স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, —আপনি কি কিছু জানেন না? এ দেশের মহা বিপদ ঘটেছে। দেখছেন না বাড়ী ঘর দুয়ার সব বিশৃঙ্খল এলোমেলো—যেন ছন্নছাড়া। এ দেশের মেয়েরা সব ধর্ম্ম-ঘট করেছে। রাস্তা ঘাটে, পথে-মাঠে বাড়ী-ঘর-দুয়ারে হোটেলে কোথাও স্ত্রীলোক দেখতে পেয়েছেন? পথে ঘাটে দোকানে বাজারে নারী না দেখতে পেলে বুঝতে হবে আপনি আল্পস পর্ব্বতের উচ্চ-শিখরে বাস কচ্ছেন। আমার তো মনে হয় আপনি অন্ধ নচেৎ এত বড় একটা প্রকাণ্ড ঘটনা যা সৃষ্টির প্রথম থেকে হয় নাই আপনার চখে পড়েনি। নারী জাতির তো এটা কঠিন দুর্ভাগ্য বলতে হবে।—এই বলিয়া ভদ্রলোকে হাসিতে লাগিল। কথাগুলি শুনিয়া আমার চমক্ ভাঙিল, সত্যিই তো এত বড় একটা সত্য আমার চখে পড়েনি! জিজ্ঞাসা করিলাম, একটিও নারী সহরের ভিতরে নাই?

Not a single মশাই not a single! বর্ত্তমানে এর নাম হচ্ছে নারীচ্যুত সহর। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এরাই প্রথম এ বিষয়ে রেখাপাত কল্লে।"

আপনাদের দেশে ব্যাপার তো মন্দ ঘটেনি দেখছি। কিন্তু কথা হচ্ছে এরা এখন বাস কচ্ছে কোথায়?

ভগবানের রাজ্যে কোন জিনিষেরই অভাব ঘটে না মশাই। আমাদের সহরের বাহিরে একটি নরচ্যুত-পর্ব্বত আছে, তারই শিখরদেশে মা লক্ষ্মীরা প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় বিরাজ কচ্ছেন।

তা নয় হল, কিন্তু এরা এ বিদ্যা শিখলে কোথা থেকে কেই বা এদের শেখালে? এ তো ছেলে মানুষি কথা নয়! আমরা দশজনে একটা বিষয়ে তিনদিন এক হয়ে থাকতে পারিনা আর এই সতত কলহশীল সম্প্রদায় একমাস তো দিব্যি নিজের মত নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে! আপনাদের দিকে একবার ফিরেও তাকাচ্ছেনা।

একথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে জানতে চাই মশায়ের খাওয়া দাওয়া হয়েছে কি না। যদি না হয়ে থাকে আমার সঙ্গে বাসায় আসুন যা হোক্ দু'মুঠো আধসেদ্ধ আধপোড়া পেটে পড়বে নচেৎ রাস্তায় অন্ন মিলবে না। এখন যা সুবিবেচনা হয় করুন। ভদ্রলোকের কথা শিরোধার্য্য করিয়া তাহার সাথী হইলাম।

ভদ্রলোকের গৃহে আসিয়া দেখিলাম সবই বিশৃঙ্খল। কোথাও কোন গোছগাছ নাই। ঘরের বিছানা পত্তর সব লণ্ডভণ্ড। পরিধানের পোষাকাদি সব অপরিষ্কার।

দরজা জানালা সময় মত না খোলা হওয়াতে ঘরের ভিতর দুর্গন্ধ বাহির হইয়াছে। দূরে একটা স্টোভে যৎসামান্য আবসেদ্ধ খাবার তৈয়ারি হইয়া রহিয়াছে। পরিষ্কার অভাবে আলোগুলি কালোয় কালো। একই বাসনে বহুবার ভোজন জন্য দুর্গন্ধ ছাড়িয়াছে। সর্ব্বত্রই অপরিচ্ছন্ন।

আহারাদির পর ভদ্রলোক নিজেই কথা উত্থাপন করিলেন, আপনি যে প্রশ্ন করেছিলেন, এরা এ বিদ্যা কোথা থেকে শিখলে তার উত্তর শুনুন। বর্ত্তমান যুগে অবাধ বিদ্যাচর্চ্চার দিনে কোন জিনিষই আর বিচ্ছিন্ন থাকবে না। সংবাদ পত্রের মারফৎ প্রত্যেক শুভ অশুভ ঘটনা জগতের প্রত্যেক স্থানে প্রচারিত হবে। প্রথমে জনৈক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি কতকগুলি ভাব (Idea) স্বয়ং অনুভব করেন। তাঁহার সেই ভাবরাশি কতকগুলি নিজ মনোমত ব্যক্তির মস্তিষ্কে ঢুকাইয়া দেন অর্থাৎ তাহারা সেই চিন্তারাশিকে শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন করেন। এই যুবক সম্প্রদায়ই সেই ভাবরাশিকে নিজ স্বার্থত্যাগ দ্বারা, জনসমাজে প্রচার করেন। আধার অনুযায়ী ভাব গ্রহণ করে। ইংলণ্ডে যখন প্রথম-ধর্ম্মঘট হয় তার খবর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন নারী সমাজ দেখলে বিনাস্বার্থে সঙ্ঘবদ্ধ কেহ হয় না। সঙ্ঘবদ্ধ হতে হলেই কতকগুলি সমস্বার্থের প্রয়োজন হয়। স্বার্থের ভিতর যদি ইতর বিশেষ থাকে তা হলে সে সঙ্ঘের আদর্শ পূরণ হতেও অনেক সময় লাগবে। স্বার্থ যত ঘনিষ্ঠ হবে মানবমনও ততো একতাসূত্রে বদ্ধ হবে। সেইজন্য এদের স্বার্থ একতাসূত্রে বদ্ধ বলিয়া তাদের পীড়ন সহ্য কর্ব্বার শক্তিও অসীম।

আচ্ছা এদের ন্যায্য দাবী কি? এরা কি চায় এবং কি পাচ্ছেনা যার জন্য ধর্ম্মঘট করল?

এরা একটি মাত্র বস্তু চায় সামানাধিকার। বহুকাল ধরে নীরবে সর্ব্ববেদনা সহ্য করে এসে এদের প্রকাশের ভাষা পঙ্গু হয়ে গেছল। নির্জ্জনে নিরবে রোদন করাই ছিল এদের একমাত্র সান্ত্বনা। স্বার্থের শুভ ইচ্ছায় নারীজাতির নারীত্ব বিকাশের সব পথ অন্ধকার করে রেখেছিল। যুগযুগান্তরের পুঞ্জীভূত ব্যথা আজ এদের বাক্ শক্তির স্ফুরণ করেছে। এরা আজ তোক বাক্যের পরিবা চায় না; চায় নারীত্ব বিকাশের সর্ব্বপথ উন্মুক্ত।

এর মীমাংসা কবে হবে?"

সে উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। এ বস্তু এত লঘু নয় যে একদিনে মীমাংসা হয়ে যাবে। যে বস্তুর যত গুরুত্ব তার মীমাংসাও তত সময় সাপেক্ষ। নরনারীর সমানাধিকারের সীমারেখা যে কোথায় তার সঠিক ঠিকানা কেহই জানেনা। নরনারীর মনোজগতের রসবস্তু এত প্রখর এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তার সীমা নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তে যাওয়া পাগলামী ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। স্বার্থ যেখানে বিপুল তথায় একদলকে অন্যের বশ্যতা স্বীকার করতেই হইবে। তারপর জাতির ধ্বংসের দিনে সমানাধিকার বড় প্রশ্ন নয়; বড় প্রশ্ন হচ্ছে কোন উপায়ে জাতীয়জীবন রক্ষা পাবে। বন্ধু, পেট বড় না সমানাধিকার বড়? থাক্ এ বিষয় আজ এই পর্য্যন্ত।

কথাগুলি শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম আচ্ছা মশাই, এদের নিত্য আহারাদি চ'লছে কেমন করে? অর্থতো আপনাদের হাতে।

এর মীমাংসা অতি সহজ। যার বৃদ্ধা মা আছেন সেকি কখন জননীকে না আহার পাঠিয়ে নিজে খেতে পারে? যার শিশু সন্তান আছে সে যদি না আহার প্রেরণ করে তাহলে রাত্রে উন্মাদ হয়ে উঠবে। যার বিধবা ভগ্নী আছেন সে যদি না আহার পাঠায় তাহলে শোকে মুহ্যমান হয়ে উঠবে। এমনি করে সব বাড়ীথেকেই নিত্য আহার সামগ্রী যাচ্ছে। থাক্ বন্ধু, আজকের মত শয়ন করিগে যাই চল।

পরদিন প্রভাতে চা পান করিয়া ভদ্রলোক বাহির হইয়া গেলেন। আমি সেই অবসরে কিছু আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম। ভ্রমণান্তে ভদ্রলোক একটি সংবাদ লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। সংবাদটি বড়ই চমকপ্রদ। রাস্তার গাত্রে বড় বড় হরফে লিখিয়া দিয়া গিয়াছে "অদ্য বিকালে

নারী ধর্ম্মঘটকারিণীদিগের শোভাযাত্রা বাহির হইবে। সময় বেলা ৫টা।"

এ নূতন অভিনব পন্থা। সকলেই উৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া রহিল। বেলা চারিটা না বাজিতে বাজিতে

লোক সমাগম হইল। যে যে রাস্তা তাহারা প্রদক্ষিণ করিবে তাহার প্রত্যেক স্থান পুরুষ দর্শকে পূর্ব্বেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষরা বিষণ্ণ বদনে উপর তলায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। সকলেরই মুখে বিষাদের ছায়া। কারণ প্রত্যেক গৃহই আজ নারী শূন্য।

যথা সময়ে পর্ব্বত শিখর হইতে নারী ধর্ম্মঘটনাকারিণী-দিগের শোভাযাত্রা বাহির হইল। সু-শৃঙ্খলরূপে তাহারা সহরের দিকে আসিতে লাগিল দলে দলে। প্রথম দলে দেখিলাম ছোট ছোট বালিকারা লাল পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া আনন্দ সহকারে চলিয়াছে। প্রত্যেকেই প্রফুল্ল; প্রত্যেকেরই মুখে আর হাসি ধরে না। পতাকার তলে লিখিত আছে, "আমরা কৃপা চাইনা; মানবের জন্মগত অধিকার চাই।" কেন তাহারা আজ পতাকা হস্তে হাসিতে হাসিতে পথ দিয়া চলিয়াছে তা তাহারা জানেনা। তাহাদের ইহা আজ খেলা, আমোদ। এবং মা সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে আছে তাই তাদের দ্বিগুণ উৎসাহ। পিতৃগৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে আনন্দে পিতাকে যখন পতাকা দেখাইতেছিল তখন পিতার আর আনন্দের পরিসীমা ছিল না। মনে হইতেছিল কন্যার সদাহাস্য বদন দেখিয়া পিতা বুঝি এখনি তাহাকে স্নেহভরে বক্ষে তুলে লন। কিন্তু নিরুপায়।

তাহার পর আসিল শিক্ষিতা যুবতীর দল। ইহাদের হস্তে পুস্তক ও চক্ষে চশমা। দেহের ও মনের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া মনে হইল সহসা নারদ ঠাকুরাণীদিগের আবির্ভাব হইয়াছে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, দিক্‌পাত নাই, নারী সরলতা নির্ম্মূল করিয়া পৌরুষকার অবলম্বনে ধরার মাটি ক্ষত বিক্ষত করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ পতাকাতলে লিখিত ছিল, "মানুষ হয়ে মানুষের মত যদি না বাঁচতে পারি তাহলে মৃত্যুই সুখকর।" ইহাদের আচরণ ও পাদচারণ দেখিয়া কেহ ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিল, Right turn please; কেহ বলিয়া উঠিল, Left turn; কেহ বলিল hault; কেহ বা বলিয়া উঠিল, Forward charge please! বৃদ্ধেরা তিতিবিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, Pest of the country, nuisance of the society. They are the root of all these evil propaganda!

তৃতীয় দলে আসিল জননীরা। ক্রোড়ে দুগ্ধপোষ্যা কন্যা। সলজ্জভাব; কাহার মুখে হাসি নাই--মুখমণ্ডল মলিনতায় পরিপূর্ণ। যেন কত অপরাধিণী। ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। কাহার ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার শক্তি নাই—পাছে স্বামী সন্দর্শন হইয়া পড়ে। কেহ কেহ গৃহের নিকটে অলক্ষ্যে চকিতে একবার স্বগৃহের অবস্থা দেখিয়া লইল। কেহ বা অপাঙ্গ দৃষ্টিতে একবার স্বামীর মুখখানি দেখিয়া লইল। কাহার বা স্বামী দর্শনের পর লজ্জায় ও ব্রীড়ায় পদবিক্ষেপে অশান্তি বোধ হইতে লাগিল। কাহার বা পুত্র সন্দর্শনে বক্ষে স্নেহধারা বহিল। করুণার প্রতিমূর্ত্তি শুষ্ক ও নিঃশব্দ চলিয়া যাইতে লাগিল। মুখে ভাষা নাই; চক্ষে দৃষ্টি নাই; বক্ষে স্নেহ নাই; পদক্ষেপে উপেক্ষা নাই। ইহাদের সন্দর্শনে প্রত্যেক গৃহ প্রত্যেক মুখমণ্ডল চিন্তিত ব্যথিত। কাহার মুখে বাণী নাই—। সকলেরই বিষাদ দৃষ্টি। ইহাদের শ্বেত পতাকাতলে লিখিত ছিল, "প্রেম ও সত্যের জয় সুনিশ্চিত।"

এইবার আসিল বৃদ্ধার দল। ইহাদের দেখিলে দুঃখও হয় হাসিও পায়। ইহারা বাল্যের মাতৃ ক্রোড় নহে; যৌবনের বৃন্দাবন নহে; বার্দ্ধক্যের বারাণসীও নহে—ইহারা বৈতরণীর যাত্রী। কেহ চলিতে চলিতে কষ্টে বসিয়া পড়িল; কেহ বার্দ্ধক্যবশতঃ রাস্তায় হোঁচট খাইল; কাহার বা কোমরে ব্যথার জন্য পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। কেহ চক্ষুহীন বলিয়া পরের কাঁধে হস্ত দিয়া চলিল; কাহার বা এক চক্ষু বলিয়া লাঠি সাহায্যে চলিতে হইল। কেহ স্থূল; কেহ বা সূক্ষ্ম। কাহার মাথায় সামান্য শ্বেত কেশ; কাহার বা তাহাও নাই। মোট কথা সকলেই শ্মশানের পথিক! ইহাদের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া কেহ কেহ অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। কেহ বা ঘরে ঢুকিল কাহার বা দরজা বন্ধ হইল। কেহ বা মাতৃ সন্দর্শন আশায় আগুয়ান হইল; কেহ বা দুঃখে পশ্চাৎপদ হইল। বৃদ্ধারা যখন স্বগৃহের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল তখন সন্তানের কল্যাণের জন্য ঊর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক ভগবৎ

সমীপে প্রার্থনা জানাইতেছিল। কেহ বা চশমা কপালে তুলিয়া পুত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ও হস্ত তুলিয়া মঙ্গলার্থে আশীর্ব্বচন আওড়াইতেছিল। কাহার বা একমাত্র পুত্র সন্দর্শনে করুণাশ্রু দরবিগলিত ধারায় চক্ষে বহিতে লাগিল। কেহ বা সন্তান সন্ততিকে দেখিতে না পাইয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। ইহাদের হরিদ্রাবর্ণ পতাকা তলে লিখিত ছিল, "স্বাধীনতাই মানবের জন্মগত অধিকার।"

সে রাত্রে ভদ্রলোক আর বিশেষ কোন কথা তুলিল না। শয়ন কক্ষে চলিয়া গেল। বুঝিলাম এদৃশ্য দর্শনে চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে।

পরদিন প্রভাতকালে যখন চা পান করিয়া আমরা দু'জনায় আরাম কেদারায় শয়ন করিয়া আছি এমন সময় দূরে হরকরা হাঁকিতে ছিল "বাবু নূতন পত্রিকা বাহির হইয়াছে "নারীজাগরণ"—ইহাতে গতকল্যের শোভাযাত্রার বিশদ্ বিবরণ আছে।" শ্রবণমাত্র ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি উঠিয়া এক সংখ্যা খরিদ করিয়া লইয়া আসিল। প্রথমে নিজে মনে মনে পড়িল তারপর সহাস্যবদনে আমায় পড়িতে দিলেন। আমি দেখিলাম নারীজাতির ইহা মুখপত্র। প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। সংবাদের চাইতে ইহার মুখবন্ধ পঠিতব্য। মুখবন্ধের শিরোনামায় লেখা হইয়াছে "খোকা আসিতেছে"। সম্পাদিকা স্বয়ং লেখিকা। ইহা বিশেষ কৌতুকপ্রদ সুচিন্তিত প্রবন্ধ।

খোকা আসিতেছে—

পিতা খোকাকে চাহে না কারণ তাহার অল্প আয়। যে কয়েকটি সন্তান সন্ততি বর্ত্তমান আছে তাহারা অতি কষ্টে দারিদ্র্যের ভিতর দিয়া মানুষ হইতেছে। ইহার উপর খোকা আসিলে তাহার কষ্টের আর পরিসীমা থাকিবে না। অতএব তাহার খোকার প্রয়োজন নাই, তথাপি সে আসিতেছে!

মাতা খোকাকে চাহে না কারণ তাহার যথেষ্ট সন্তান হইয়াছে। সন্তানের স্নেহ ও আকাঙ্ক্ষা তাহার রীতিমত পূরণ হইয়াছে আর সন্তান প্রয়োজন নাই। যে কয়েকটি সন্তান আছে তাহাদের পালন যত্ন ও সেবা করিতে করিতে আজ সে চিররুগ্না। ইহার উপর যদি তিনি পুনরায় আসে তাহা হইলে তার আর বাঁচিবার আশা নাই অতএব তিনিও খোকার আসা পছন্দ করেন না। তবু ছেলে আসিতেছে!

ভাই বোনেরা খোকার আসা পছন্দ করে না কারণ একেই তাহারা ভাল খাইতে ও শুইতে পায়না তাহার পর যদি খোকা আসে তাহলে তাদের খাদ্যে ভাগ পড়িবে অতএব তাহারাও নিজ সুখস্বাচ্ছন্দ্য হেতু খোকাকে একান্ত মনে চাহে না। তথাপি খোকা আসিতেছে!

বাড়ীর কুকুরটি খোকাকে চাহে না কারণ একেই ছেলেদের পাতে কিছু অন্ন পড়িয়া থাকে না তাহার পর খোকা যদি পুনরায় আসে তাহ'লে তাহাকে উপবাসে দিন কাটাইতে হইবে। একেই নিত্য ছেলেদের আঘাতে তাহার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইতেছে তাহার পর খোকা যদি আসে তা'হলে বাড়ীতে তিষ্ঠান দায় হইবে অতএব সেও খোকাকে চাহে না। তথাপি খোকা আসিতেছে! রাষ্ট্র ও সমাজ খোকাকে চাহে না কারণ খোকা আসিলে তাহাদের বাজে খরচ বৃদ্ধি পাইবে। দরিদ্রের সন্তান অর্থাভাবে মূর্খ, অভদ্র ও চোর হইবে তাহাতে সমাজ-শৃঙ্খলা নষ্ট হইবে অতএব তাহারাও খোকাকে চাহে না। কিন্তু তথাপি খোকা আসিতেছে!

এমন সময় হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আমি একাকী সেই জনমানব শূন্য উদ্যানে সুখস্বপ্নে বিভোর ছিলাম।

তিন নারী

গল্প শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

[গল্পের নায়ক তিনটি নারীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন—সেই সূত্রে লেখক তাহাদের আকর্ষণ বিকর্ষণের পরিচয় দিয়াছেন। তিন নারী পুরুষ চরিত্র ও নারী চরিত্রের একটা দিক বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট করিয়াছে। মনোজবাবু জ্যৈষ্ঠের পুষ্পপাত্রে এনডিওরেন্স গল্পে নারী ও পুরুষ চরিত্রের একদিকের পরিচয় দিয়াছিলেন, তিন নারী স্বতন্ত্র ধরণের হইলেও বিশেষ মনোজ্ঞ।]

...হাসি পাচ্ছে। নাঃ তার সঙ্গে বোধ হয় ফেনিয়ে ওঠা কান্নাও পাচ্ছে। লোকে শুনলে বলবে দুর্ব্বল। পুরুষ মানুষের কান্না পাচ্ছে কি? নিরুপায়ের মত কাঁদবে মেয়ে মানুষ। কিন্তু তথাপি আজ আমার হাসির সঙ্গে কান্না পাচ্ছে। আশ্চর্য্য—ছেলেবেলায় সহজে কেঁদেছি বলে মনে পড়ে না। মার খেয়ে কাঁদতুম না, মা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে এলে হাতখানা দুর্জ্জয় ক্রোধে ছুঁড়ে দিয়েছি—বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদি নি। সেই আমারই আজ ইচ্ছে করেছে লুকিয়ে কাঁদতে? তাই হাসছি জোর করে হাসছি; এমন পরিবর্ত্তনও মানুষের হয় তাহলে? ইস্কুলে পড়বার সময় থেকে পৌরাণিক উপকথা, বাংলা গীতা প্রভৃতি গুরুজনের বিনানুমতিতে নাড়া চাড়া করতে করতে কেমন যেন একটা তেজের সঙ্গে স্বপ্ন দেখেছিলুম আমি একটা প্রকাণ্ড হোমরা চোমরা ব্যক্তি; ধারণা জন্মে গেল যে আমার মত ব্রহ্মচারী খুবই কম ছেলের ভেতর দেখা যায়। বোনেদের কাছে বড়াই করতুম—মেয়েদের নিয়ে গালাগাল দিতুম, তারা অবাক হয়ে ছোট ছেলের কথা শুনত—তারপর মুখটিপে হেসে বলত "—তুই তাহলে শঙ্করাচার্য্য হবি বল!..."

প্রৌঢ়ের মত গম্ভীর হয়ে বলতুম "নিশ্চয় হব—"

রূপসী মেয়েগুলোকে কিছুতেই দেখতুম না। তাদের ওপর কেমন জাতক্রোধ হয়ে উঠেছিলুম, ধারণা হয়ে গেছল যে রূপ থাকলেই তারা সেইটে দেখিয়ে বেড়াবার জন্মে পাতলা জামা এবং আদ্দির সায়া সেমিজই ব্যবহার করে। বাড়ীতে বিয়ে থা হলে আত্মীয় কুটুম্বিনীর দল যখন যোড়শীর মেলায় আসর গুলজার করতেন—আমি সন্ন্যাসী জনোচিত উপেক্ষা ভরে সে স্থান ত্যাগ করতুম। দিদিরা মজা দেখতে সেই মেলাতে ডেকে পাঠালে বড়া বড়া কথায় মেয়ে জাতের সমালোচনা করে কারো রাগ, কারো বিস্ময়, কারো বা কৌতুক উদ্রেক করতুম। বন্ধু মহলেও আমায় নিয়ে বাকবিতণ্ডা চলত। কেউ বলত ওটা ভণ্ড, কেউ বা আবার তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হত। আমি কিন্তু একগুঁয়ে ষাঁড়ের মত লঘুগুরু কিছুই মানতুম না। আমার এই স্বভাবের জন্মে আমার জ্ঞাতি মিত্ররা দুচক্ষে আমায় দেখতে পারত না। অথচ মজা দেখতে আমায় ডেকে পাঠাত গল্প কোরত, ফাই ফার-মাসটা খাটিয়ে নিত। তা নিক! কিন্তু কাজ ফুরুলেই তারা যখন আমায় অস্বীকার কোরত সেইটে সহ্য কোরতে পারতুম না। গালাগাল চীৎকারে বাড়ী মাথায় করে সেইযে যাওয়া বন্ধ করতুম দুমাস আর সে মুখো হতুম না। প্রেসিডেন্সী কলেজ যখন ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ছি তখন সমীর আমায় দিয়ে একটা কবিতা লিখিয়ে সেটা কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপিয়ে দিয়েছিল। সমীরের বোন মলয়া সেটা কিছুতেই আমার লেখা বলে স্বীকার না করতে রেগে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম "—তোমার দাদাটা আবার লিখবে কি—ওটাত একটা আস্ত গোভূত! আমার চিবোনো কথা বলে লোকের কাছে তবু দাঁড়াতে পারে দূর দূর—" তাদের বাড়ী সেই থেকে আর যাইনি। এমন কি কলেজে সমীরের সঙ্গে আর কথা কইতুম না, সে দু একবার চেষ্টা করে অবশেষে ব্যথিত ভাবে নিরস্ত হয়। মলয়া এসে একদিন পাকড়াও করলে "—তুমি আর আমাদের ওদিকে যাওনা যে বড় কাবলদা?—" বলে অপরাধিনীর মত এমন এক রকম চাইলে যে আমি একেবারে গলে গেলুম। হ্যাঁ, মলয়াই আমার প্রথম সঙ্গিনী, এত ছেলের সঙ্গে

মিশেছি সবই এক রকম ঠেকত কিন্তু তার কাছে গেলেই আমার যেন কেমন একটা অন্য ধরণের ভাব আসত; সে যে কেমন তা বোঝানো যায় না, কি যে সে করলে আমায়! আমার মুগুর ভাঁজা হাতের মাশল্ গুলো টিপতে টিপতে যে যখন বলত "—মাগো ঠিক যেন একটা গুণ্ডা—" তখন আমার কিশোর মনে যে আনন্দ হত,— সহস্র দর্শকের সামনে লুপিং দি লুপ করবার সময়ে করতালি ধ্বনিতে আমার তা হত না। তখনো কিন্তু আমি কিছুই বুঝতুম না—মলয়ার হাতটায় খুব জোরে চাপ দিয়ে বলতুম "—তোমায় এমনি টিপেই মেরে ফেলতে পারি—"হাতে লাগলেও মলয়া হাসি মুখে সহ্য কোরত। সীলেটের কোন জমিদারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে; এতদিনে বোধ হয় চার পাঁচটা ছেলে পুলে নিয়ে সে সংসারী হয়ে পড়ছে। হাঁ—পাত্রের কথা শুনেই আমি রেগে গেছলুম, একটা মুখ্য জমিদারের দুলাল ছেলে সে করবে মলিকে বিয়ে? মলি কেবল বলে গেল "—তুমি কেবল রাগতেই জানো কমলদা—আর কিছু ব্যবস্থা করতে পারো না--" তখন কথাটার মানে বুঝিনি, আজ বুঝছি। জানোয়ার—সমীরটা জানোয়ার। আমাকে জামাই করতে তার বাবার ইচ্ছা ছিল এ কথাটা হতভাগা আগে বলেনি কেন! বললে কিনা দুবছর পরে। জানি ওটাকে লেখা-পড়া শেখানো মানে ভস্মে ঘি ঢালা। স্কাউণ্ড্রেল!

যাক—মলিত গেল! কিন্তু রেখে গেল এক অদ্ভুত ভাব! আগে কখনো সে ভাব আমার ছিল না, থেকে থেকে তাকে মনে পড়ত—মনে হতে লাগল সব যেন ফাঁকা ফাঁকা; মলিকে চাই, আমার মলিকেই চাই, এর মধ্যে ঘটল এক ঘটনা।

মাসীমা পাটনা থেকে তাঁর দেওর ঝিকে পাঠিয়ে দিলেন, আমাদের বাড়ীতে। বাবাকে চিঠি দিয়েছিলেন যে ওকে কোনো ভাল বোর্ডিংএ ভর্ত্তি করে দিতে। ও এইখান থেকে ইণ্টারমিডিএট পাশ করতে চায়। চৌদ্দস মেয়ে—তুড়িলাফ দিতে দিতে সিঁড়িতে ওঠা নামা করে। দেখতে কিন্তু বেশ! পাতলা দোহারা চেহারা একটা নীল রংএর বুক কাটা ব্লাউজ সে চব্বিশ ঘণ্টাই পরে থাকত; অনাবৃত গলা থেকে ধবধবে বুকের ওপর সরু এক গাছা সোনার চেন এমন ভাবে লতিয়ে থাকত যাতে মনে হোত যেন ঠাণ্ডা পেয়ে একটা চিত্তেল সাপ ঘুমুচ্ছে! সব চেয়ে সুন্দর তার ঠোঁট দুটি—এত পাতলা ঠোঁঠ এর আগে আমি কখনো দেখিনি; ও যখন তার দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণ চেপে ধরত—আমার মনে হত এখুনি ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে। তার নামটাও বেশ নতুন রকম—শিখা! বাবা দেখে শুনে বল্লেন "না না হোষ্টেলে থাকতে হবে না—যত সব বখা মেয়ের ঝাঁকে থেকে কেবল পাকামো শেখা বইত নয়, ও এই খানেই থাক।" মাও আপত্তি করলেন না। কিন্তু ঠাকুমা মুখ ভার করলেন! এক ঘর ছেলেপুলে এ আগুন ঘরে পোরা কেন বাপু? মহিমের (বাবার নাম) জ্ঞান বুদ্ধি কি লোপ পাচ্ছে নাকি। মেজদা ঠাকুমার ওই কথাটা বুঝি শুনতে পেয়েছিল, সেই থেকে শিখার নাম শুনলেই সে বাড়ীর বাইরে পালিয়ে যেত। আমি অত শত জানিনা—আলোচনা বেড়ে চলেছে দেখে একদিন সোজা তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম "—তোমার কোথায় থাকতে ইচ্ছে বল এখানে যদি অসুবিধা হয় আমি বাবাকে বলছি—"

শিখা হাসলে, অসঙ্কোচে আমার দিকে চোখ তুলে বললে "—তুমি নিশ্চয়ই কমলদা—"

ভড়কে গেলুম, ধরেছে ঠিক! বল্লুম "কি করে জানলে অমলদা বা বিমলদা নই?—"

"বড়দা মেজদাকে চিনতে কষ্ট আছে বটে, তবে তোমার কথা আমি শুনেছি—হ্যাঁ আমি এইখানেই থাকব—হোষ্টেলে বড় অসুবিধে হয়--ঘড়ি ধরে নাওয়া খাওয়া—"

আমি খাটের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বল্লুম "—তা থাক কিন্তু গাড়ী থেকে নামবার সময় ও রকম লাফ দিয়ে নেমোনা—ঠাকুমা মেয়েদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা দেখতে পারেন না—"

শিখা মুখ টিপে হাসে, "—বাঃ পরিচয় হতে না হতেই উপদেশ দেওয়া আরম্ভ হয়ে গেল—ঠাকুমা পারেন না না তুমি দেখতে পার না?—"ইতিমধ্যে সে একটা চেয়ারও দখল করে বসেছিল।

আমি গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে বল্লুম "—আমার মানা শুনতে হলে তোমায় অনেক কিছুই করতে হবে—"

"যথা ?"

"তোমার নীল সিল্কের ব্লাউজ ছাড়তে হবে—"

"আর ?—"

"চুলগুলো ও রকম ছড়িয়ে না রেখে পমেড করতে হবে—সাড়ীটা ও রকম ফেরতা না দিয়ে—"

"থাক আর বলতে হবে না—"শিখা হেসে উঠলো —"তুমি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলে কমলদা, তুমি না গীতাভাষ্য পড়—এ সব এত দেখতে শিখলে কোথা ?—"

হঠাৎ চাবুক খেয়ে আমার বাচালতা থেমে পড়ল! মুখ চোখ গরম হয়ে উঠল, বল্লুম "—গীতা ভাষ্যেই আছে এ সব—আচ্ছা তুমি যেতে পার—" আমি এলিসের একটা ভল্যুম টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলুম।

শিখা এগিয়ে এসে বইটার নাম পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে "—তাইত বলি, এত হিটলারীজম্ কোথা থেকে বেরুচ্ছে—ওসব ছেড়ে দাও কমলদা—ও নেহাৎই বই—এলিস পড়ে কি আর জ্ঞান হয়? এলিস হতে হয়—"বলেই বেরিয়ে গেল।

আমি চকিতে সোজা হয়ে উঠে বসলুম। কি দুর্দ্দান্ত মেয়ে এই শিখা—ক্ষণেকের পরিচয়ে যে এত কথা কইতে পারে, ঘনিষ্ঠতা করলে সে তাহলে কি করবে। আমি লুব্ধ হয়ে উঠলুম। আর কিছু নয়—শুধু মেয়ে জাতের দৌড় কত দেখবার জন্যেই। হ্যাঁ মোহ মুদগর আবৃত্তি করতে করতেই আমি শিখার সঙ্গ নিলুম।

মাস খানেকের মধ্যে আমি আশ্চর্য্য রকম বদলে গেলুম মানে শিখা আমায় বদলে দিলে। আগে কোনো মেয়ের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হবার ভয়ে কাছে যেতুম না, অথচ শিখা যখন আমার হাতটা ধরে বলত "দেখি তোমার রিষ্ট ও ভারীত এই টুকু চওড়া মোটে ?"—তখন ওর সমস্ত দেহটা এক হাতে জড়িয়ে ধরে অল্প চাপ দিতুম "—এই রিষ্ট তোমার দেহখানা চুর করে দিতে পারে শিখা—দেব নাকি ?"—আর একটু জোরে চাপ দিতুম।

শিখা মোটেই ব্যস্ত হত না বরঞ্চ আমার বুকের আরো কাছ ঘেঁষে বলত "ছাড়ো কমলদা—পাঁসপিঁস ছাড়ো বলছি—"আমি ভয় পেয়ে হাত সরিয়ে নিতুম, ও খিল খিল করে হেসে আমায় ধাক্কা দিয়ে ছুটে পালাত। মলয়ার হাতখানাই আমার হাতে থাকত শিখা সমস্ত দেহটা ছেড়ে দিতেও কাতর নয়। আমি কি করি, কি কোরব আমি ? এ আমার কি হোল ? ঠাকুমা আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে বল্লেন "—হ্যাঁরে ও ছুঁড়ির সঙ্গে তোর এত কি কথা রে! তুই না খুব নারীদ্বেষী!—" ভয়ে চুপ করে যেতুম। আশ্চর্য্য! অন্য সময় হলে আমি কি করতুম! ঠাকুমাই কি মুখ তুলে ওই সব কথা বলতে সাহস কোরত ? শিখাকেও তিনি ছাড়লেন না। তাঁড়ার ঘরে ও আমার জন্যে পান আনতে যেতে ঠাকুমা হাঁ হাঁ করে এসে পড়লেন "—ছুঁয়োনা বাছা—আমার মালা আছে ওখানে—"

শিখা মুহূর্ত্তকাল অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায় তারপর ফিক করে হেসে বললে "—আচ্ছা ঠাকুমা! ছুঁলে কি ঠাকুর মরে যায় ?—"

ঠাকুমা চোখ পাকিয়ে বললেন —"তা যায় বইকি বাছা—সাতাশটে পুরুষ ছোঁয়া মেয়েদের হাতে ঠাকুর মরে বই কি—সর সর আমি পান দিচ্ছি—"

শিখা কাতর হয় না, তেমনি হাসতে হাসতেই বললে "ঠাকুর্দ্দা দেখছি আপনাকে চুবড়ি চাপা দিয়ে রাখতেন, আচ্ছা আপনি সবশুদ্ধ কটা পুরুষ ছুঁয়েছিলেন ? সাতাশটের অনেক কম বুঝি!—" সে আর পানের জন্য দাঁড়ায় না দ্রুতপদে মার কাছে পালিয়ে যায়। ঠাকুমার আক্রোশ থেকে বাঁচবার আশ্রয় এ বাড়ীতে ওই একটা জায়গায় সকলেই ছুটে যেত। মা আমার পুরুষের মত উদার হৃদয় নিয়ে জন্মেছিলেন। তিনি শিখার বেহায়াপনায় কিছুমাত্র বিরক্ত হতেন না; বলতেন বয়স হলে কেউ আর নিজের ছেলের বয়সটা ভেবে দেখেনা কেন—বুঝি না—মানে বৃদ্ধ যে তরুণদের আচার ব্যবহারের সমালোচনা করবার অধিকার রাখে না এটা আমার মা খুবই মানতেন। বালককে চীৎকার করে হাসতে না দিয়ে প্যাঁচার মত মুখ করে বসিয়ে রেখে শান্ত শিষ্ট করে তোলা, অথর্ব্ব জরাগ্রস্ত ব্যক্তিরই সাজে। বৃদ্ধ সমাজপতিদের যুবক সম্প্রদায়ের যৌবনোচ্ছ্বাসকে দাবিয়ে রাখতে

যাওয়া অজীর্ণ রোগীর অপরকে আহার সম্বন্ধে উপদেশের মতই হাস্যকর। তার অসংযত এবং অপরিমিত ভোজনে বাধা অনেকেই দিতে পারেন বটে। মা শিখার পিঠে হাত রেখে বলতেন "ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এলি যে—"

শিখা মার কোলে শুয়ে পড়ে বলত "—সাতাশটে পুরুষ ছোঁয়া বলে ঠাকুমা আমায় ভাঁড়ারে ঢুকতে মানা করলেন মাসীমা—"

মা গম্ভীর হয়ে গেলেন, কুটুম্বের মেয়ের সঙ্গে একি ব্যবহার? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন "—মার কথা ধরতে নেই শিখি; ওরা সেকেলে প্রথাগুলো খুব বড় করে দেখেন কিনা—কিন্তু এ কথাও মিথ্যে নয় মা, যে মেয়ে একাধিক পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে—তারা ভাল থাকতে পারে না—"

শিখা দীপ্ত ভাবে উঠে বলে "—ভাল থাকাটা কি রকম জিনিস মাসীমা? একটা বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে যারা যথেচ্ছাচার করে—তাদের বেলা কটু মন্তব্য নেই!"

মা হাসেন "দূর পাগলী সবল অবস্থাতেই মেয়েদের সম্বন্ধে এক কথা; স্বামীর সঙ্গেও ইতরোমি অচল—তবে শিক্ষার অভাবে সেইটে মেনে নিতে হচ্ছে উপায় নেই বলে; তাদের সম্বন্ধেও ভাল অভাল আছে। যারা লোভী নয় তাদেরই ভাল বলি—নইলে কার্য্যক্ষেত্রে সকলেই এক; দোযত আমি কাউকে দিইনে মা—"

শিখা মুগ্ধ ভাবে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলে "ঠিক বলেছ মাসীমা! তুমিও মানুষ আমার ঠাকুমাও মানুষ—মেয়ে মানুষ—অথচ দুজনের মধ্যে—"

মা তার মুখ চেপে ধরে তিরস্কার করেন "—গুরু নিন্দা পাপ না মানতে চাস—এটা জানিস যে তাতে নিজের ক্ষতির পরিমাণটা বেড়ে উঠতে থাকে; তাদের সঙ্গে অসহযোগ করলে সংসার সুখের হয় না শিখি। সমাজের এই নিয়ম কানুন কেবল সুখের সংসার করবার জন্যেই—"

শিখা উঠে দাঁড়িয়ে বললে "সংসারের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অর্থে গুরুজন, তাই বলে তাঁরা তাঁদের অধীনস্থ ব্যক্তিদের ওপরে অত্যাচার করলে মুখ বুজে সইতে হবে? তাদের কোনো কথা কইবার অধিকার নেই। তবু যদি না তাঁরা নিজের স্বার্থটি ছাড়া আর কিছু দেখতেন—সংসার সুখের করতে হলে দাস দাসীকেও সমীহ করে চলতে হয় এ কথাটা যারা বোঝেন তাদেরই আমি গুরুজন বলি মাসীমা—" সে আর দাঁড়ায় না তাকে আবার কলেজ যেতে হবে ত?

শিখা আমাদের বাড়ীতে যেন একটা বিদ্রোহ প্রচার করতে আরম্ভ করলে। আমাদের বনিয়াদী চাল চলন ভেঙ্গে চুরে সে যেন একটা নূতন কিছু প্রতিষ্ঠা করতে চায়। দাদারা তার সঙ্গে এই জন্যে বেশী কথাই কন না; বৌদিদিরাও তাই, বলেন "—আমরাত আর কলেজে পড়িনি ভাই—বা বুক কাটা জামা পরতে পাইনি তোমার সব কথা বুঝব কেমন করে?—"

শিখা তৎক্ষণাৎ জবাব দিত "খুবই বোঝ বৌদি ইচ্ছে করে ন্যাকা সাজ বৈত নয়। বিয়ের আগে তুমিই হয়ত পুকুর পাড় থেকে ভিজে কাপড় আরো ভিজিয়ে লজ্জাবতী লতাটির মত পথ হাঁটতে—এখন সেই তুমিই বুক কাটা জামা দেখিয়ে ভেংচি কাটছ—কেমন?—" বৌদিরা রাগে গুম হয়ে যান। সত্যি কথার এমনিই মহিমা।

সে কথা থাকুক কথা হচ্ছে আমার পরিবর্ত্তনের। নারী সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা কোনো দিনই ছিল না—তাই তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতুম। কামিনী শব্দের অভিনব ব্যাখ্যা করে—রমণী নামের মূলোৎপত্তি নির্দ্দেশ করে লোকের কাছে এবং নিজের কাছে প্রচার করেছি ওগুলো আমার মত লোক গ্রাহ্যই করে না। হয়ত করতুম না, না করবার ইচ্ছাটাই ত আমার প্রবল ছিল; কিন্তু শিখা আমার সেই অহঙ্কার পুড়িয়ে ছাই করে দিলে। আজকাল অনেক সময় তার কথা ভাবি। ব্রহ্ম চিন্তা কমে এল—অজ্ঞাতে কমে এল। কখনো কখনো অনুশোচনায় ব্যাকুল হয়ে শঙ্কর ভাষ্য খুলে গভীর মনোযোগ সহকারে পড়তে বসতুম নাঃ আমায় নারীবর্জ্জিত জীবন গঠন করতে হবে এসব কি করছি। আমায় ভাল হতেই হবে—চরিত্র অক্ষুন্ন রাখতে হবে। সবলে পা ঝাড়া দিয়ে মেরু দণ্ড

ঋজু করে বসতুম। আবার আস্তে আস্তে একদিন সব গ্রন্থি শিথিল হয়ে আসত—স্ত্রীলোকের দেহটাই না হয় গ্রহণ করব না, মনটা নিতে আপত্তি কি? অর্থাৎ একজন মেয়েকে প্রাণভরে ভালবাসার ইচ্ছা একটু একটু করে আমার মনের মধ্যে জাগছিল; শত চেষ্টা করে সহস্র চোখ রাঙিয়ে আমি তাকে শাসিত করতে পারছিলুম না। ভোর বেলা পূব আকাশে যেমন লক্ষ লক্ষ আলোক রেখা ধীরে ধীরে অন্ধকারকে ঠেলে উঠতে থাকে, তেমনি করে আমার ভেতর এক অপূর্ব্ব জ্যোতিষ্ক বিরাট আকৃতিতে পাখা মেলে ছড়িয়ে পড়ছিল।

একদিন সন্ধ্যেবেলা শিখার সঙ্গে ছাতে বেড়াতে বেড়াতে গল্প করছিলুম। হ্যাঁ বলতে ভুলে গেছি আমি প্রেমের গুঞ্জন তুলতে একেবারেই অনভ্যস্ত। গল্পটা হচ্ছিল। আমাদের সাঁতারের বাজির কথা। কেমন করে হুগলী ঘাট থেকে আহিরীটোলা অবধি লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকত; আর যুদ্ধ ব্যবসায়ীর মত আমরা সাহঙ্কারে তাদের সামনে দিয়ে সাঁতরে চলতুম এই সব কথাই হচ্ছিল। গল্পের মাঝখানে কথায় কথায় শিখা জিজ্ঞেস করে "কত ওয়েট তুমি লিফট্‌ করেছ কমলদা?" কথাটা সে নিতান্ত সাধারণ ভাবে বলেছিল কিন্তু আমি দুষ্টুমী করে বল্লুম "তোমায় এক হাতে কাঁধে তুলে নিতে পারে সেটুকু জোর আছে শিখি—"

শিখা চিরদিনই সঙ্কোচহীনা—আমার কথায় একটুও লজ্জা না পেয়ে থমকে দাঁড়ায়—"আচ্ছা পরীক্ষা দাও।"

আমি নির্ব্বিচারে ছোট পাখীর মত তার দেহখানা শূন্যে তুলে বলি—"নীচে ফেলে দোব নাকি শিখি?"

শিখা জবাব দিলে না—দুখানা হাতে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে নির্জ্জীবের মত কাঁধে মাথা রাখে। আমার দেহে সহসা বিদ্যুৎ খেলে গেল, তাকে নামিয়ে দিতে গিয়ে আরো জোরে জাপটে ধরলুম।

সহসা ঠাকুমার কণ্ঠস্বরে দুজনে চমকে উঠলুম—"বেহায়া বাইউলীর মেয়ে তুই যে এ রকম ঘটাবি আমি অনেক দিনই জানি, কালামুখী ডাইনীর মত ছেলেটার মাথা খাচ্ছে বলে এক দণ্ড চোখের আড়াল করি না—দূরহ দূরহ পথে গিয়ে কুঁপের দোকান খুলগে যা"—ঠাকুমা হাঁপাতে হাঁপাতে আমার দিকে ফিরে বললেন—"ওরে হতভাগা তোর একি স্বভাব হয়েছে এ্যা সোমত্ত মেয়ে তাকে কিনা তুই"—আর বলতে পাল্লেন না, ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে ছাদের ওপর বসে পড়লেন।

বোঝাতে পারলুম না। আমি মূর্চ্ছিতের মত শুয়ে পড়লুম। উঃ কি নোংরা মন এদের, বুঝবে না কিছুতেই না। কোনো দোষই করলুম না অথচ একি অপরাধের বোঝা ঘাড়ে এসে পড়ল। বাবার সামনে দাঁড়াতে তিনি উন্মাদের মত বলতে লাগলেন "—আমার ছেলে তুই এমন—তোর মৃত্যু হোক—ওরে তোর মৃত্যু হোক—"

সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। তরুণীর প্রতি তরুণের স্বাভাবিক স্নেহ কি এতই দূষণীয়? কোন শাস্ত্রে লিখেছে এমন কথা। কাম ছাড়া অন্য বস্তু নেই নাকি? না এ শুধু অক্ষমের অন্যায় সন্দেহ। এরা জানে বিবাহিতা নারী ছাড়া আর কারো সঙ্গে নির্জ্জনে কথা কইবার অধিকার দিতে নেই দিলেই তারা অপরাধ করে বসবে। না না এ আমি ছাড়তে পারব না শিখার স্পর্শে জেগে উঠেছে আমার নিদ্রিত পৌরুষ—রুদ্র দেবতার ডমরুধ্বনি আমার বুকে, আমায় ডাকছে মনোহর সুরে। একটি পরিপূর্ণ অন্তরের সুগভীর ভালবাসা পেয়ে সেইখানে আমার মৃত্যু হোক। তার আগে নয়, শুষ্ক নীরস পাষাণ ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে মরতে চাই না; বাবার ইচ্ছানুসারে আমি মরব কিন্তু তার আগে আমি পান করব ওই অমৃত—আকণ্ঠ পান করে যখন নেশায় অচেতন হয়ে থাকব সেই অবস্থায় যেন আমার মৃত্যু হয়। আমি চললুম—মৃত্যুর অভিমুখেই চললুম—

শিখাকে আর বাড়ীতে রাখা হল না। আমিই তাকে একটা বোর্ডিংএ ভর্ত্তি করে দিয়ে বললুম "—আমি এখান থেকে আর বাড়ী যাব না একেবারে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছি—"

শিখা এতটুকু ম্লান হল না। ওর চিরকেলে দীপ্ত হাসিতে ভর্ত্তি থেকেই উত্তর দেয় "—ফ্রয়েড পড়া বৃথাই হল তোমার! আর মোহমুদ্গরও যখন কোনো কাজে লাগল না তখন মুখ খানি অমন শুকনো করেই বা যাচ্ছ কেন? লোকের বিশ্বাস তোমার যখন বড় করতে পারলে না অবিশ্বাসেই বা ছোট করবে কি করে? ছিঃ

কমলদা এত দুর্ব্বলতা তোমার সাজে না।" শিখা তার ঠোঁট দুটো আমার অধরে একটু ছুঁইয়ে বোর্ডিংএর ভেতর চলে গেল।

আমার রোমাঞ্চ হল না, অসীম আনন্দে দেহ ভরে উঠল না। কাঠের পুতুলের মত অনেকক্ষণ গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। যখন সেখান থেকে বেরিয়ে পথ চলতে সুরু করলুম তখন আজীবনের দৃঢ় বিশ্বাস আমার পূর্ব্ব সংস্কারের মৃতদেহটা বোর্ডিং হাউসেই ফেলে রেখে এলুম। নারী—শুধু বিষ দেয় না সুধাও দেয়, আনন্দ দেয়, ভরসা দেয়। শিখা শিখা আমার মৃত্যুমুখী প্রাণকে এ কোন পথ দেখিয়ে দিলে। অসহ্য ব্যথার ক্ষতে একি স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দিলে?

\+ × ×

পাঁচ বছর সিঙ্গাপুরে রয়েছি। দু বেলা পেটভরে খেতে পাই না। আমার সেই বিপুল দেহ চুপসে আমসি হয়ে গেছে। আগে বসতুম ছড়িয়ে এখন সমস্ত শরীরের হাড় গুলোকে যতদূর সম্ভব ঠেলে ঠুলে ভেতর দিকে গুটিয়ে নিয়ে বসতে হয়। আগে লোককে চটিয়ে মজা দেখতুম এখন লোকের ক্রোধ শান্তি হলেই তৃপ্তি পাই। পাঁচটা বছর—আমায় কি আশ্চর্য্য বদলে দিয়েছে। মানসিক চিন্তা ধারায় এমন একটা পরিবর্ত্তন এসেছে যা সত্যিই অদ্ভুৎ! আমার রূঢ় চিত্তবৃত্তির ভেতর কেমন অসহায় কোমলতা এসে পেছল। এ যেন রৌদ্র দগ্ধ দ্বিপ্রহরের পাশে গোধূলির আলো। শিখাকেই এর জন্যে দায়ী করতে পারি। আমার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্যে নয় আমার রুচি পরিবর্ত্তনের জন্যে। অন্ন চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে সিঙ্গাপুরের পথে পথে ঘুরছি—সঙ্গে রয়েছে শিখার স্পর্শ, স্বজন বিচ্ছেদের গ্লানিতে সমস্ত অন্তর কেঁপে উঠেছে সঙ্গে রয়েছে মলয়ার হাসি।

রূপার সঙ্গে কেমন করে আলাপ হল সে ইতিহাস বলবার সময় নেই। সঙ্গ পিপাসী হলে মেয়েদের সঙ্গে ভাব হবার ঘটনার অভাব হয় না। বাসে সিনেমাতে এত আকচায় লেগেই আছে নিতান্তই মামুলি হয়ে গেছে আজ-কাল বাজার হাটেও আলাপ করা যায় এটা অন্তত আমি প্রমাণ করেছিলুম। কলকাতার টেরিটিবাজারের মত সিঙ্গাপুরে একস্থানে বিস্তর পাখী বিক্রয় হয়। রূপা গেছল কাকাতুয়া কিনতে। পাখী পোষার ভয়ানক সখ আমি স্বত প্রবৃত্ত হয়ে রূপাকে একটা পাখী বেছে দিয়েছিলুম—বিদেশে বাঙ্গালী পেয়ে ও ত খুসী হলই উপরন্তু আমাকেও খুসী করলে। ওর বাবা এখানে চাকরি করতে এসেছেন সম্প্রতি—ওই তাঁর বড় মেয়ে। বেশ লাগল মেয়েটিকে ভারী ঠাণ্ডা আর অত্যন্ত রুচি ওর মুখাকৃতি। আমি কাকাতুয়াটা ওদের বাড়ী অবধি পৌঁছে দিতে যাই; রূপা সানন্দে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল এমন কি পুরানো দাঁড়ে পরিয়ে কাকাতুয়ার ডানার আঁটা ছাড়িয়ে তবে আমার ছুটি মিলল। ছুটি কিন্তু মেলে নি—বন্ধু বান্ধবহীন বিদেশে রূপাকে পেয়ে পাঁচ বৎসরের উপবাসী মন আমার উল্লসিত হয়ে উঠল। রূপা আমাকে পাখীর পরিচর্য্যা করতে নিযুক্ত করলে বটে কিন্তু আমি পাখী অপেক্ষা তার মালিকের তদ্বিরেই বেশী আগ্রহ প্রমাণ করতুম। আমার নিঃসঙ্গ জীবনের ইতিহাস শুনে সে সমবেদনা প্রকাশ করে-ছিল। খুব সাধারণ ভাবে, অথচ আমি সেটাকে বেশ বড় করে দেখলুম। মুস্কিল হল তার বাবা অরিন্দম বাবুকে নিয়ে। তিনি আমার সমস্ত ইতিহাস শুনে (অবশ্য কিছু কিছু গোপনও করতে হয়েছিল) সেই যে তীক্ষ্ণ চোখ দুটো তীক্ষ্ণতর করে আমার আপাদ মস্তকে বুলিয়ে নিলেন, সে দৃষ্টির পরিবর্ত্তন হল না। যখনই দেখতেন আমি পাখী পড়াচ্ছি তার দাঁড় সাফ করছি, তিনি অমনি ওপর থেকে হাঁক দিতেন "রূপা!"

সে সন্ত্রস্ত ভাবে উঠে দাঁড়াত "তুমি এখন যাও কমলদা আমি বাবার কাছে পড়তে যাই..."

এখানেও সেই রক্ষণশীলতা। অর্থাৎ অবিশ্বাসের পাষাণ প্রাচীর। রূপা আমার অবস্থা বুঝতে পেরে করুণায় আমার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। তবে কি না ও বড় লজ্জাশীলা তাই কিছু বলত না বোধ হয়। একদিন বললে "কমলদা তুমি কলকাতা আর যাবে না তাহলে?"

আমার চোখ জলে উঠল "কলকাতা! এ জন্মে আর নয়।" তারপরই অস্থিরতা প্রকাশ হবার ভয়ে অন্য কথা পাড়লুম "তোমার কাছ ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে

না, আচ্ছা রূপা তোমার বিয়ে কি ওই প্রদোষের সঙ্গেই ঠিক হয়েছে? ওই যে পুলিসের ইন্‌স্‌পেক্‌টর—"

রূপা লজ্জায় চোখ বোজে। সে দৃশ্য আমার চমৎকার লাগলো। কতকাল থেকে এমনি মুখ ভাব দেখবার জন্যে আমার চোখ দুটো যেন তপস্যা করছিল, আমি মুগ্ধ হয়ে বলি "কই বললে না রূপা? এতে লজ্জার কি আছে—"

সে মুখ রাঙ্গা করে উত্তর দিলে "বেশ যাহোক আর বুঝি ভূভারতে কথা খুঁজে পেলে না? ওর সঙ্গে—"

আমি ব্যাকুল হয়ে তার হাতখানা ধরে ফেলে বল্লুম "তবে কার সঙ্গে? বল শীগ্‌গীর বল না রূপা—"

রূপা অপাঙ্গে আমার মুখ ভাব দেখে নিয়ে হঠাৎ ফিক্ করে হেসে ছুটে পালিয়ে গেল। আমি বোধ হয় প্রকৃতিস্থ ছিলুম না তা না হলে কি করে মনে করলুম ওর ওই দৃষ্টিতে প্রেম রয়েছে—আমার প্রতি ভালবাসার লক্ষণ রয়েছে। আমার মৃত প্রেম এইবার সহস্র শিখা বিস্তার করে পুনর্জ্জলিত হল। পেয়েছি—পাঁচ বছর চেষ্টা করে আমার সমস্ত ভালবাসার একটি আধার পেয়েছি আর আমার মরতে ভয় নেই, মরতে আক্ষেপ নেই, আগে নিঃশেষে ওই রূপ পান করব তারপর পিতৃদত্ত এই জীবিত দেহটা মৃতদেহে রূপান্তরিত করে পাঠিয়ে দোব যারা যারা আমার মরণে শান্তি পাবে তাদের কাছে।

উঃ সেকি অসহ্য কামনা। আমি চাই—এইবার ওকে চাই। আমি রূপাকে চাই—ও আমায় ভালবেসেছে; ওর বাপ মা আত্মীয় পরিজন যত বাধাই দিক,—আমি ওকে কেড়ে নোব—! কিন্তু কি আশ্চর্য্য আমার ভাব ভঙ্গী দেখে রূপা হঠাৎ এমন লুকিয়ে পড়ল, যে আমি ফাঁপরে পড়ে গেলুম। একেইত অরিন্দম বাবু দুচোখে আমায় দেখতে পারেন না—একদিন রূপাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি দেখে, বেশ কড়া সুরে বল্লেন "—কি হে কমল, আজকাল চাকরি আর করনা নাকি?"

আমি মনে মনে তার মুণ্ডপাত করতে করতে বলি "—আজ্ঞে হ্যাঁ করি বইকি—এসেছিলুম রূপার পাখীটাকে দান করাতে—তা সেটাকে নিয়ে গেল কোথা?"

তিনি ক্রুর দৃষ্টি হেনে বল্লেন "—আমি সেটা উড়িয়ে দিয়েছি—"

আমার এখানে আসবার উপলক্ষ্যটাই এরা সরিয়ে দিলে? অরিন্দম বাবু বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন। এমন সময়ে রিক্‌স করে রূপা এসে সদরে নামল, রিক্‌সওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে উঠানে ঢুকে আমায় দেখেই কেমন অপ্রতিভ ভাবে বললে "এখানে দাঁড়িয়ে যে?"

আমি বললুম "আমায় এ ভাবে কষ্ট দিয়ে তোমার কি লাভ হচ্ছে রূপা?"

তার মুখ অরুণ বর্ণ হয়ে গেল, চারিদিক চাইতে চাইতে মৃদুকণ্ঠে বল্লে "—বাবা পছন্দ করেন না, এস ওই ঘরটায় সব বলছি—" ও তার পরে পড়বার ঘরে ঢুকে গেল।

আমার মাথায় যেন খুন চেপে গেল—আমি এক লাফে রূপার নিকটস্থ হয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার ভীত পাংশু মুখে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করতে লাগলুম—পাগলের মত—প্রলাপগ্রস্ত রোগীর মত আমার সে চুম্বন বৃষ্টি থামল না! চুম্বনে ছটফট্ করতে করতে রূপা গর্জ্জন করে বলল—"ছেড়ে দাও এখনো ছেড়ে দাও—"

যখন ছেড়ে দিলুম, তখন তার আর দাঁড়াবার অবস্থা ছিল না, টলতে টলতে একটা কুশন চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে "হতভাগা বদ-মায়েস! তুমি এই রকম করলে কি সাহসে? যাও শীগগীর যাও এখান থেকে—"সে চেয়ারের হাতলে মুখ গুঁজড়ে পড়ল।

আমি গভীর পরিতৃপ্তিতে দেখতে থাকি তার চুল এলোমেলো হয়ে গেছে, সমগ্র মুখখানা রাগে লাল হয়ে থম থম করছে, বুকটা থেকে থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ফুলে উঠছে—কচি মেয়ের ফুঁপিয়ে ওঠার মত! হেসে বল্লুম "চমৎকার! কিন্তু গালাগাল দিলে কেন?"

রূপা তেড়ে উঠলো "হাসতে লজ্জা কোরছে না? এখনো দূর হও বলছি পাজী লম্পট—"

আমি ক্রোধ গম্ভীর স্বরে ধমকে উঠি "—এই চুপ।"

রূপা আরো জোরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল "কেন কেন চুপ কোরব। তুমি কে যে আমাদের এই রকম অপমান

করে যাবে। কোন অধিকারে? একটা রাস্তার কুকুরকে নাই দিয়ে মাথায় তোলার এই ফল। চরিত্র হীন পিশাচ।"

আমি তার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিতেই সে তীব্র চীৎকারে বাড়ী মাথায় করে তুলল। চারদিক থেকে সবাই ছুটে এল—আমি গম্ভীর ভাবে তাদের এড়িয়ে পথে বেরিয়ে এলুম। যাক সবই ত দেখলুম। মলয়া দিত আহার, শিখা দিলে অমৃত আর আমার রূপার কাছে পেলুম বিষ। আজ আমার মৃত্যুবাসর। দ্রুতগতিতে মরণ এসে আমার প্রাণকে আকর্ষণ করছে, এইবার কেবল পড়ে থাকবে ভীত আহত অশুচি এই দেহটা, আমার প্রেম আমায় ছেড়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এ অবস্থাতেও আমার হাসি পাচ্ছে এবং তার সঙ্গে একটু কান্নাও পাচ্ছে! ইচ্ছে হচ্ছে শিখা কিম্বা মলয়া অথবা রূপারই কোলে মুখ লুকিয়ে একটু কাঁদি। আমার উদ্ধত অহঙ্কারী আত্মা পরাজয়ের ক্ষোভে আজ আমার কাছ থেকে চির বিদায় নিচ্ছে। থেকে থেকে মনে পড়ছে আমার সেই বিশুদ্ধ পাঠের ভঙ্গী—মোহ মুদ্গরের চরণ তাই হাসিও পাচ্ছে। হায়রে মানুষের মন—অভিমানের ত এই দাম, মেয়ে মানুষের ওপর অভিমান হয়নি এইতেই আমার সৌভাগ্য—কারণ তা হলে বোধ হয় আত্মহত্যার ভীরুতা প্রকাশটাও আমার বাকি থাকত না। এইতেই আমার সান্ত্বনা।

তোমার দান

শ্রীহাসিরাশি দেবী

দুঃখ আমার সিন্দুর শোভা, বন্ধু হে, সে যে তোমারই দান,
অপরাধ মোর কণ্ঠের হার—, লাঞ্ছনা মম বাড়াক মান।
তোমার পরশ হে প্রিয় আমারে—,
এনে দিয়ে যাক্ দুখ বারে বারে
অশ্রুসায়রে অবগাহি আজি মুছিয়া ফেলেছি মানাভিমান;
ব্যথার কিরীট মাথায় পরেছি, হয়েছে আমার নিশাবসান।

গৃহের দুয়ার বন্ধ হউক, বান্ধব! সে যে তোমারই ডাক,
বৈভব যত কুটীরাঙ্গনে চিরতরে আজ পড়িয়া থাক্।
মোর অন্তর নন্দনবনে, তোমারে পেয়েছি চির শুভখনে'
শূন্য মাঝারে পূর্ণ জ্বেলেছে বিষাদ-শান্ত মৌন যাগ—;
মরুর বক্ষে নামিয়াছে মোর মধুবসন্তে নবানুরাগ।

মৃত্যু আমার অমৃত বহি আসিয়াছে দ্বারে পান্থ মম,
ফিরাবনা তারে অবহেলা ভরে, চির বাঞ্ছিত, হে প্রিয়তম।
চিত্ত আজিকে কম্পিত নয়, ভয় হ'লো মোর মূর্ত্ত অভয়,
কলঙ্ক দিকে দিকে ঘোষে জয়, বাঁধন মুক্ত আ'জিকে মম,
তুমি দিলে আজ তোমারই পতাকা, মানস দেবতা!
নমঃ হে নমঃ।

"নিমিত্ত-মাত্রম্"

গল্প

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এমএ

[অর্থ সমস্যা আজ কাল বড়ই প্রবল। কয়েকজন যুবক এই অর্থ সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কিরূপ সাধু (!) উপায় আবিষ্কার করিয়াছিল এবং কি ভাবে মা কালীর অনুগ্রহে তাহা কার্য্যকরী করিয়া তুলিয়াছিল সুলেখক গোপালবাবু 'নিমিত্তমাত্রম্'এ তাহাই ফুটাইয়াছেন।]

এক

চারিটা বাজিতে না বাজিতেই অবিশ্রান্ত ধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়া আসিল তবু বৃষ্টি ছাড়িবার কোনও লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। তাই মেসে উপস্থিত সমস্ত ছেলেরাই যাইয়া সত্যহরির ঘরে জমিয়াছে। সত্যহরি অনেকদিন পূর্ব্বেই লেখাপড়া ছাড়িয়াছে বটে কিন্তু এখনও তাহার পুরাতন মেসের এই ঘরখানি ছাড়ে নাই বর্ত্তমানে ছাড়িবার বিশেষ আগ্রহও নাই। কেন না মেসের ছেলেরা তাহাকে আদৌ ছাড়িতে রাজি নহে—তাহাতে সত্য-হরির নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা থাকুক বা নাই থাকুক। লোকটি মেসের সকলেরই অতিপ্রিয়। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দোহারা চেহারা, মাথায় বাবরি কাটা বড় বড় চুল—সুকণ্ঠ এবং সুন্দর ব্যবহারের জন্য সবলেই তাহাকে ভালবাসে। অপরের জন্য সর্ব্বদাই সে পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত। হাতে অন্য কোনও কাজ না থাকিলেই যত সুন্দর সুন্দর মতলব অনেকের মাথায় ঘা মারিয়া বেড়ায়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সহজে বিনা পরিশ্রমে কেমন করিয়া বহু অর্থ পাওয়া যায় এই সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত সকলে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। তাহাতে যেন জীবন-মরণের পণ! হয় সমস্যার সমাধান—নয় সহাস আননে সর্ব্বক্লেশ নিসূদন মৃত্যুকে বরণ! অনেকেই অনেক মাথা ঘামাইল কিন্তু এমন কোনও একটা "one day preparation seriesএর মতলব বাহির হইল না যাহা সর্ব্বতোভাবে নিরাপদ এবং যাহা বস্তুতঃ অনায়াস সাধ্য।

সত্যহরি এতক্ষণ একটাও কথা বলে নাই। ছোট হুঁকার মাথার জলন্ত কলিকাটা চাপাইয়া সে তামাকের ধোঁয়ায় সমস্ত ঘরটিকে অন্ধকার করিয়া দিয়াছে এবং একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহার সেই হুঁকা কলিকার উপর অনেকেরই সাগ্রহ ক্ষুধিত দৃষ্টি বারংবার আছাড় খাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। অবশেষে ছেলেরা যখন তাহাকে এই সমস্যা সমাধানের জন্য ধরিল তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান আবার ফিরিয়া আসিল। দেওয়ালে টাঙ্গান কালীঠাকুরের ছবিটির দিকে হুকাশুদ্ধ হাতদুটি উঠাইয়া সে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিল এবং স্বগতঃ ভাবে গোটাকত অবোধ্য মন্ত্র উচ্চারণ করিল। তাহার পর তাহার কেওড়া কাঠের টেবিলের পায়ায় হুকাটা রাখিয়া সকলের দিকে একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া লইল এবং এমনই মুখের ভাব দেখাইল যাহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে সত্যহরির নিকট এই সমস্যার সমাধান যেন একটা অতি সামান্য ব্যাপার। কিছুমাত্র ব্যস্ত না হইয়া সে একটা হাই তুলিয়া আবার হাতদুটি মাথায় ঠেকাইল তাহার পর দেওয়ালে ঠেস দিয়া সোজা হইয়া বসিল। ছেলেরা আর ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল "আধছটাক তামাকটা সমস্ত পুড়াইয়াও সত্যদা তুমি একটা মতলব বাহির করিতে পারিলে না?" এবার সত্যহরি নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল "না-হে-না আমার মাথার মধ্যে চুকুড়ি দশটা মতলব ঢুকিয়া বাহির হইবার জন্য এতই ঠেলাঠেলি করিতেছে যে কোনটা প্রথমে বলিব তাই ঠিক করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক —বাছা বাছির কিছু প্রয়োজন নাই। সকলের প্রথমেই যেটায় হাত পড়িতেছে সেইটাকেই বলি।" সকলে শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। সত্যহরি বলিল "আজ সকালে গৌরজীর সেই Old curio houseএর নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম কাল পাথরের ছোট একটি কালীমূর্ত্তি রহিয়াছে। মূর্ত্তিটি ছোট হইলেও অত্যন্ত সুন্দর! দেখিতে দেখিতে মনের মধ্য হইতে মা কালীরই

দয়ায় এক অনুপ্রেরণা পাইলাম। ভিতরে যাইয়া দাম জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম বারটি টাকা পাইলেই দোকানের মালিক তাহা হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত। কাছে অতটাকা ছিল না। মাত্র তিনটি টাকা হাতে ঠেকিল। তাহাই অগ্রিম বায়না স্বরূপ দিয়া বলিলাম আমার বাড়ী মফঃস্বলে এই মূর্ত্তিটির জন্য তিন টাকা বায়না দিলাম। আট দিন পরে বাকী নয়টি টাকা দিয়া ঠাকুরটিকে লইয়া যাইব। এই কথা শুনিয়া দোকানের মালিক একটা "Sold" শ্লিপ মূর্ত্তিটির গলায় ঝুলাইয়া আমায় এই রসিদ দিয়াছে—এই দেখ"—বলিয়া সে একটা তিন টাকা জমা দেওয়ার রসিদ দেখাইল। তাহার পর আবার সুরু করিল, "আমার যাহা আছে তাহার মধ্য হইতে এক টাকা spare করা যায় এখন বাকী আট টাকা হইলেই সকল দিক রক্ষা হয়। এখন এই আট টাকা তোমরা যদি আমায় দাও এবং আরও কয়েকটা বিষয়ে সাহায্য কর তবে এই আট টাকা কিছুদিন পরেই আমি আটশত করিয়া পরিশোধ করিতে পারি।"

আট টাকা কেমন করিয়া আট শত টাকা হইবে ইহা না বুঝিতে পারিলেও—ছেলেরা এটা স্পষ্টই বুঝিল যে মতলবটির "future prospect" খুবই ভাল। আট টাকা দিলেই যখন এতবড় একটা সার্ব্বজনীন সমস্যার সমাধান হয় তবে আর কেন এই অকারণ হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম। জয় মা কালী। তোমারই মা জয়! আমরা তোমায় আবাহনের জন্য এখনই এই আট টাকার পাদ্য অর্ঘ্য দিতেছি তুমিই আমাদের রক্ষা করিও। আইন অর্থ-শাস্ত্র প্রাচীন ইতিহাস পুরাতন ইংরাজি ভাষাতত্ত্বের মোটা মোটা বইগুলার নীরস তথ্যে আর কি আছে সারাদিন রাত হাতড়াইয়া মরিলেও সেখানে একটি পয়সা পাইবারও প্রত্যাশা নাই—আর মা কালী দয়া করিলে সঙ্গে সঙ্গেই আট টাকায়—আট শত টাকা—আট শত টাকায়—না, এই ভাবিয়াই প্রত্যেক যুবকই আপন আপন বাক্স হইতে দুই টাকা হিসাবে আনিয়া নগদ আটটি টাকা সত্যহরির টেবিলে রাখিল। সত্যহরি প্রত্যেক টাকাটি ভাল করিয়া বাজাইল এবং নিজের সুতায় বোনা অর্থাধার হইতে আর একটি টাকা বাহির করিয়া একত্রে রাখিয়া বলিল "দেখ টাকাকড়ির ব্যাপার প্রথম হইতেই খোলাখুলি কথা হওয়া দরকার। এই বার টাকার মধ্যে আমি চারিটি টাকা দিলাম সুতরাং হিসাব মত আমার তিন ভাগের এক ভাগ পাওনা; আর দুই ভাগ তোমাদের চারিজনের কেমন? তোমরা রাজি—? ব্যাপারটা কিছু না বুঝিয়াই ছেলেরা মন্ত্র পড়ার মত বলিয়া গেল হাঁ আমরা রাজি—আপনার one third আর আমাদের চারিজনের two third। তখন সত্যহরি তাহার planটি সকলের সম্মুখে বিশদ ভাবে বুঝাইয়া বলিল। ছেলেরা দেখিল বাস্তবিকই সত্যদার plan বড় জবর plan ইহাতে আট টাকায় আটশত কেন—আট হাজার হইতেও বেশী দেরী লাগিবে না। জয় মা কালী! তুমিই চরণে স্থান দিও মা!

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে দিন সত্যহরির ঘরের বৈঠক চলিল। ছিলিমের পর ছিলিম করিয়া অনেক খানি তামাক সেদিন পুড়িল। রাত্রি প্রায় সাড়ে বারটার পর ছেলেরা আপন আপন সিটে শুইতে গেল এবং বুঝা গেল যে তাহাদের সহজপন্থায় অর্থোর্জ্জনের first step সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে আদৃত এবং গ্রাহ্য হইয়াছে।

"পুরাতন গঙ্গা" নদীর তীরে অবস্থিত বিষ্ণুপুর গ্রামটি অতি প্রাচীন এবং সেখানকার মহাশ্মশান স্বর্গারোহণের একটি বিশ্ববিদিত প্রকৃষ্ট পন্থা। চারিদিকের দশ পনের ক্রোশ দূর হইতে মৃতদেহ আসিয়া লোকে এখানে সৎকার করিয়া থাকে এবং প্রতিদিন গড়ে অন্ততঃ আট দশটি করিয়া মৃতদেহ তথায় দাহ করা হয়। সেজন্য সকল সময়েই লোকের ভিড় এবং প্রত্যহই তথায় প্রায় মেলা বসিয়া থাকে। বহুদূর হইতে মৃতদেহ আনিতে হইলে বহু লোকের আবশ্যক হয় এবং স্থানীয় প্রথানুসারে শবানুগামী প্রত্যেক লোককেই অবস্থানুসারে ভূরি ভোজন করাইতে হয় সুতরাং সেখানকার দোকানদারদের অবস্থা প্রত্যেকেরই বেশ স্বচ্ছল।

আজ কয়দিন হইতে এই শ্মশানে এক সাধুর আবির্ভাব হইয়াছে। যে সমস্ত গুণ থাকিলে সন্ন্যাসীরা লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন এ সমস্ত গুণই তাঁহাতে বর্ত্তমান। সুন্দর সুশ্রী ও সুগঠিত দীর্ঘদেহ সিন্দুর পরিশোভিত দীর্ঘ ললাট এবং চক্ষের প্রশান্ত দৃষ্টিতে এমনই একটা আকর্ষণ মাখান যে তাঁহা দেখিয়া লোকে তাঁহাকে

শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। তাঁহার গম্ভীর অথচ সুকণ্ঠে গীত কালীকীর্ত্তন সত্যই মনের মধ্যে একটা নূতন ঢেউ তুলিয়া দেয়। লোকের উন্নত শির স্বতই তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িতে চায়। সন্ন্যাসী কাহারও সহিত বিশেষ বাক্যালাপ করেন না। অপরাহ্ণে কালীকীর্ত্তনের সময় দু এক জনের সহিত দু একটা কথা কহেন এই মাত্র। বাকী অন্য সময়ে তিনি সর্ব্বদাই "আসনে" উপবিষ্ট থাকেন। দুই একজন গ্রামের প্রাচীন লোক তাঁহার বড়ই অনুরক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সারাজীবনের কাজ সারিয়া খেয়া-ঘাটের তীরে দাঁড়াইয়া খেয়ানায়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন সুতরাং অবসর এবং ধৈর্য্য তাহাদের অসীম। একদিন তাঁহাদেরই মুখে শুনা গেল কি উদ্দেশ্যে সাধু বিষ্ণুপুর শ্মশানে আসিয়া "আসন" পাতিয়াছেন; লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আপনা হইতেই বাড়িয়া গেল।

এই বিষ্ণুপুরের শ্মশান মহামায়া আদ্যাশক্তির একটি প্রিয় স্থান। অমাবস্যার গভীর রজনীতে আজও তাঁহার অনুচরেরা অগণিত নরমুণ্ড প্রক্ষিপ্ত বিরাট এই শ্মশান ভূমিতে গেণ্ডুয়া খেলিয়া থাকে। তাহাদের অট্টহাসিতে দশদিক পূর্ণ হইয়া যায়। এই শব্দে অনেক সময়েই অনেক বিদেশী পথিকের প্রাণনাশের উপক্রম হইয়াছিল। এইরূপ বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান সন্ন্যাসী জগন্মাতা মহামায়ার নিকট প্রত্যাদেশ পাইয়া এখানে আসিয়াছেন। এই মহাশ্মশানের ভূমিতে তিনি পাষাণ মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইবেন এবং এই সন্ন্যাসীই হইবেন তাঁহার প্রতিষ্ঠাকারী। সন্ন্যাসী দিবারাত্রি আসনে ধ্যানস্থ থাকিয়া মহামায়ার আবির্ভাবের দিন গণনা করিতেছেন। কবে তিনি আসিয়া সমস্ত পৃথিবীকে ধন্য করিবেন আকুল উৎকণ্ঠায় প্রত্যেকেই সেই দিনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। নিকটে এবং দূরে বহুস্থানেই এই জনরব ছড়াইয়া পড়িল—দেশ বিদেশ হইতে যাত্রীরা আসিয়া ধর্ণা দিতে আরম্ভ করিল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই একভাবে প্রণোদিত হইয়া জগন্মাতার আহ্বান গীতি গাহিতে লাগিল—সকলের মুখে শুনা গেল "মা আসিতেছেন—ওগো দেশবাসী মা আসিতেছেন।"

একদিন অপরাহ্ণে নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলেও সন্ন্যাসীঠাকুর আসন হইতে উঠিলেন না। কালীকীর্ত্তন শ্রবণমানসে বহুলোক এই সময় এখানে উপস্থিত হন। তাঁহারা সকলে সন্ন্যাসীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন সন্ন্যাসীর তখন বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত—চক্ষু মুদ্রিত—। সহসা সকলে দেখিলেন সন্ন্যাসীর সমস্ত দেহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, উচ্চকণ্ঠে মাতৃনাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি সাষ্টাঙ্গে শ্মশানভূমিতে পতিত হইলেন—বিপুল পুলকে তাঁহার সমস্ত দেহ ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী মাতৃনাম গান করিতে করিতে পুনরায় নীরব হইলেন; তাঁহার দেহ স্থিরভাব ধারণ করিল—সমস্ত জনতা নির্ব্বাক নিষ্পন্দ চিত্তে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল—সহসা সেই নীরবতা ভঙ্গ হইল, সকলে শুনিতে পাইল কে যেন শূন্য হইতে অতি মধুর, অতি ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ভক্তগণ আমি আগামী অমাবস্যার রাত্রিতে পাষাণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিতেছি। আমার মন্দির প্রস্তুতের ও নিত্য সেবার আয়োজন তোমরা সাধ্যমত আহরণ কর। শত শত লোক সেখানে উপস্থিত ছিল প্রত্যেকেই স্বকর্ণে দেবীর এই শ্রীমুখের বাণী শুনিল প্রত্যেকেই শুনিল মা বলিতেছেন তিনি আসিবেন। কে হেন অর্ব্বাচীন আছে যে সে অবিশ্বাস করিবে যে মা আসিবেন না! ক্রমে সন্ন্যাসীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল—সকলের সমক্ষে শিশুর মত কাঁদিতে কাঁদিতে শ্মশানভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "মাগো তুই কোথায় লুকালি?"

দেবীর আদেশ হইয়াছে তাঁর মন্দির নির্ম্মাণের ও নিত্য সেবার আয়োজন করা চাই। অমাবস্যার আর অধিক বিলম্ব নাই। শ্মশানেরই এক প্রান্তে প্রস্তাবিত মন্দির নির্ম্মিত হইবে। দেশে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর অভাব নাই। এমন একটি কার্য্যে অর্থব্যয় করিতে না পাইলে নশ্বর মানব জীবন ধারণের সার্থকতা কি? অযাচিত এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে জলের ন্যায় অর্থ আসিতে লাগিল। একজন পতি পুত্র হীনা ধনবতী মহিলা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দেবীর সেবার জন্য দান করিলেন। এই-রূপে সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইতে লাগিল। শ্মশানভূমির উপর দেবীর মন্দিরের ভিত্তি-

সংস্থাপিত হইল এবং মন্দির নির্ম্মাণের কার্য্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিত্য সেবার জন্যও প্রচুর অর্থ জমিতে লাগিল। এখন মা দয়া করিয়া আসিলেই হয়।

দেখিতে দেখিতে অমাবস্যার দিন আসিয়া পড়িল কত দেশ দেশান্তর হইতে অসংখ্য ধর্ম্মপ্রাণ নর-নারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই আসিয়াছেন মা আসিবেন বলিয়া। সন্ন্যাসীর পদতলে স্বর্ণ রৌপ্যের বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাহার পরিমাণ এত যে তাঁহার তিনজন শিষ্য তাহার সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পরিতেছিলেন না।

সন্ধ্যার সময় দেখা গেল একজন মলিন বস্ত্রধারী লোক "দণ্ডী কাটিতে কাটিতে" শ্মশানভূমির দিকে আসিতেছে তাহার চক্ষে ঝরিতেছে অবিরত অশ্রুধারা আর মুখে উচ্চারিত হইতেছে "মা" "মা" রব। বিপুল জনতা সসম্ভ্রমে সেই জীর্ণ বাসপরিহিত ভিক্ষুককে পথ ছাড়িয়া দিল—সে অগ্রসর হইয়া প্রথমে সন্ন্যাসীর চরণ বন্দনা করিল পরে অর্দ্ধ নির্ম্মিত মন্দিরের পাদদেশ পর্য্যন্ত যাইয়া সাষ্টাঙ্গে লোটাইয়া পড়িল। তাহার সমস্ত শরীর নিশ্চল—জীবিত কি মৃত তাহা প্রথম দৃষ্টিতে বুঝা কঠিন। রাত্রি অধিক হইবার সঙ্গে সঙ্গে জনতা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঢাক ঢোল সানাই প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের শব্দে ও সমবেত জনমণ্ডলীর মাতৃ নামোচ্চারণে দশদিক আলোড়িত হইয়া উঠিল। বহু সহস্র আলোকমালায় ভূষিত হইয়া বিভীষিকাময় শবশিবামুখরিত শ্মশানভূমি আপনার অস্তিত্ব হারাইবার উপক্রম করিল।

"মা মা" চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া সকলই দেখিল সন্ধ্যার সেই নবাগত মলিন বেশধারী ভিখারীর মূর্চ্ছা রোগগ্রস্ত রোগীর মত হস্তপদাদির আক্ষেপ আরম্ভ হইয়াছে তাহার মস্তকটি বিপুলবেগে উভয় পার্শ্বে সঞ্চালিত হইতেছে। ইহা দেখিয়াই সন্ন্যাসীঠাকুর লাফাইয়া উঠিলেন —স্বয়ং যাইয়া সেই ব্যক্তির মস্তক আপন ক্রোড়ে উঠাইয়া তাহার কর্ণে অতি মৃদুকণ্ঠে মধুর মাতৃনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে তাহার আক্ষেপ কমিল—সন্ন্যাসী তাহার মস্তক কোল হইতে মাটিতে রাখিলেন। দেখা গেল লোকটি সংজ্ঞাহীন। সহসা সকলে শুনিল সেই সংজ্ঞাহীন লোকটি পুনরায় মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে বলিতেছে "মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত প্রজ্জলিত ঐ চিতাভূমির নিম্নে আমি আসিয়াছি আমায় উঠাইয়া লও।" সমবেত জনমণ্ডলীর দৃষ্টি সেই দিকে ফিরিল। তখন সন্ন্যাসী সেইদিকে অগ্রসর হইতে না হইতেই উন্মত্ত জনমণ্ডলী সেই প্রজ্জলিত চিতার উপর হইতে অর্দ্ধদগ্ধ বিকৃত শবটিকে দূরে টানিয়া ফেলিল—জলন্ত কাঠগুলি কে কোথায় সরাইয়া ফেলিল কিছুই বুঝা গেল না। কোদাল, শাবল প্রভৃতি খনিত্রের সাহায্যে খনন কার্য্য চলিতে লাগিল। অর্দ্ধঘণ্টা অবিরত খনন করিবার ফলে বৃহৎ একটি গর্ত্ত খোদিত হইল। সহসা "পাইয়াছি পাইয়াছি" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে করিতে সন্ন্যাসী সেই গর্ত্তের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ কিছুই দেখা গেল না —শোনা গেল না। তাহার পর যখন সন্ন্যাসী উঠিলেন তখন সকলেই দেখিলেন তাঁহার ক্রোড়ে এক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটিকে গঙ্গার জলে ধৌত করার পর সকলেই দেখিলেন সেটি সুন্দর কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত এক কালীমূর্ত্তি। সমবেত জনমণ্ডলীর সুউচ্চ জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। যাহারা বহুদূরে ছিল তাহারাও বুঝিতে পারিল যে মা আসিয়াছেন। সারারাত্রি এইরূপ ভাবে কাটিল। রাত্রি প্রভাত হইলে সকলেই মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া আপন আপন ঘরে ফিরিল—কিন্তু জনতা কমিয়াও কমে না—যতই লোক যায় ততই আসিতে থাকে। স্বর্ণ রৌপ্যের বৃষ্টি সমানভাবে চলিতে লাগিল। তাহার যেন শেষ নাই। সকলেই ভাবিল মা আপনার সেবার ভার আপনিই পাঠাইতেছেন।

দেখিতে দেখিতে মন্দির নির্ম্মাণের কার্য্য শেষ হইল। মহাসমারোহে শুভদিনে মাতৃমূর্ত্তি নবনির্ম্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা হইলেন। দূরদেশ হইতে আগত যাত্রীদের জন্য পান্থশালা নির্ম্মিত হইল—বড় বড় দোকান খোলা হইল, নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের সমাবেশে স্থানটি নূতন আকার ধারণ করিল। একদিন শ্মশান বলিয়া লোকে যেথায় অত্যাবশ্যক না হইলে যাইত না এখন সেই স্থান সর্ব্বদাই লোকারণ্য। কত রোগী আসিয়া দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তি পাইয়াছে কত হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছে। এমনই মায়ের

মহিমা। মা আসিয়া সন্তানগণের দুঃখ দৈন্য রোগ শোক ক্রমশই মুছিয়া দিতেছেন। এইরূপ ভাবেই দিন যাইতে লাগিল। মন্দিরের আয় ক্রমশই বাড়িয়া চলিল। সন্ন্যাসী ও তাঁহার চারিজন শিষ্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কাহারও কোনও অভাব অভিযোগ করিবার কারণ রহিল না। মাতৃসেবার পর উদ্বৃত্ত অর্থ লোকহিতার্থে এবং দরিদ্রদের সেবার নিমিত্ত দেশ বিদেশে পাঠান হইতে লাগিল।

তিন

সত্য-হরি ও চারিজন অংশীদার একত্র বসিয়া আহার করিতেছেন। পাঠকঠাকুর চলিয়া গিয়াছে সুতরাং তখন সেখানে বাহিরের লোক কেহ নাই। চারিজনের মধ্যে অমর আসিয়াছিল সকলের শেষে সুতরাং আগেকার সমস্ত ঘটনা সে সব জানিত না। নরেন সবিস্তারে তাহাকে সত্যহরির ventriloquismর কথা বলিতেছিল। "সত্যদা যখন বলিল তোমরা মন্দিরের ও নিত্য সেবার আয়োজন কর তখন আমার এত হাসি পাইয়াছিল যে আমি আর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি নাই। সত্যদা'র মতই মাটিতে মুখ লুকাইয়া হাসিটাকে কান্নায় রূপান্তরিত করিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিলাম।" সত্যহরিও বলিল "ওহে ঐ ভয়েইত আমি মাটিতে মুখ লুকাইয়া ছিলাম। যাক্ এখন তোমাদের আটটাকা ফেরত পাইয়াছ ত?" সকলেই সমস্বরে প্রাপ্তিস্বীকার করিল এবং নরেন সোজাই স্বীকার করিল অপরের মত কাল পর্য্যন্ত সে বারশত টাকা বাটী পাঠাইয়াছে। আহা বাড়ীর লোকেরা আমাদের বড়ই গরীব এই সমস্ত গরীবদের দুঃখ নিবারণ করিবার জন্যই ত মায়ের আগমন!

সত্যহরি বলিল সকলের চেয়ে কঠিন কাজটি হইয়াছিল মাটির মধ্যে মূর্ত্তিটি প্রোথিত করা। গভীর রাত্রিতে টর্চ্চ জালিয়া শাবল দিয়া মাটি খুঁড়িতে যাইয়া তাহাকেও বিশ্বরঞ্জনকে যে কি কষ্ট পাইতে হইয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ পাওয়া যায় না। মাটি যেমন শক্ত তেমনই দুর্গন্ধ! রামলাল বলিল "কিন্তু আমি কেমন পাহারা দিয়াছিলাম বলুত?"

যাহা হউক দেখা যাইতেছে যে সত্যহরির plan বাস্তবিকই বড় জবর। এমন সোজা উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের উপায় থাকিতেও বাঙ্গালার লোক আজ অনাহারে কাটাইতেছে। সত্যহরি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"অদৃষ্ট হে অদৃষ্ট! সকলই সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা।" তখন সকলেই সমস্বরে বলিল সন্ন্যাসীঠাকুর দোহাই আপনারা দুপুর রাত্রিতে এখন আর তত্ত্বকথা কহিবেন না—তাহা হইলে হজমের ব্যাঘাত হইতে পারে!

প্রতিদিন রাত্রে এমনি করিয়াই সন্ন্যাসী ঠাকুর ও তাঁহার শিষ্যগণ একত্রে মিলিত হন এবং অতীত জীবনের আলোচনায় কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। আহা কোথায় সেই মেসের ক্ষুদ্র ঘর আর কোথায় এই উন্মুক্ত প্রান্তরের বিশাল মন্দির। তবে মধ্যে মধ্যে শবদাহের সময় বিশ্রি গন্ধ আসিয়া সকলকে অতিষ্ঠ করে এই যা বিপদ। নচেৎ আর কোনও কষ্ট নাই। এই টুকু সহ্য করিতে না পারিলে চলিবে কেন "দুখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?"

তাহাদের দিনগুলি বেশ কাটিতেছিল। মধ্যে মধ্যে পালাক্রমে তাহাদের মধ্যে একজন করিয়া তীর্থ যাত্রা করিত। দুই মাস তিন মাস করিয়া অনুপস্থিতির পর আবার ফিরিয়া আসিত। লোকে জানিত সন্ন্যাসী ঠাকুরের অন্যান্য মঠের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্তই তিনি বা তাঁহার লোকেরা মাঝে মাঝে স্থানান্তরে গমন করেন।

দেশে রোগ শোক মৃত্যুর সংখ্যা যেন কমিতে লাগিল তৎপরিমাণে বাড়িতে লাগিল লোকের ভক্তি। স্থানীয় সমস্ত লোক বুঝিল তাহাদের আর ভয় নাই--কেননা জগন্মাতা স্বয়ংই যে তাহাদের মধ্যে আসিয়াছেন। বলির রক্তে শ্মশানের কালমাটি লাল হইয়া উঠিল। তদনুপাতে বাড়িতে লাগিল সন্ন্যাসীদের আকার এবং আড়ম্বর। গেরুয়া রঞ্জিত বস্ত্র এবং উত্তরীয়—রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে সিঁদূরের দীর্ঘ ফোঁটা,পায়ে কাষ্ঠ পাদুকার উৎকট শব্দ এই সবগুলি মিলাইয়া প্রত্যেকেই একজন বড়দরের হইয়া উঠিলেন। কে বলিবে যে তাঁহারা আজন্মকাল হইতেই এইরূপ জীবন যাপনে অভ্যস্ত নহেন।

বাঙালীর যৌথকারবারের শেষ পরিণাম যাহা হয় এখানেও তাহা সংঘটিত হইল। হইবে নাই বা কেন? একজন বাঙালী একা পরিশ্রম করিয়া অসাধ্য সাধন

করিতে পারেন, জগতে নাম রাখিয়া যাইবার মত একটা কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন কিন্তু যখনই একাধিক বাঙ্গালী কোন কাজে হস্তক্ষেপ করেন—তখন সে কার্য্যের শেষ পরিণাম—আশুপতন; ইহার কখনও কোন ব্যতিক্রম হয় না চিরকালই ইহা হইয়া আসিয়াছে—এখনও হইতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত হইতেও থাকিবে।

"অর্থমনর্থম" সন্ন্যাসী ঠাকুররা এই কথাটা ভুলিতে পারেন নাই তাই তাঁহাদের সাজান ঘর ছাড়িতে হইল। অংশ লইয়া অংশীদারদের মনে সন্দেহ জাগিতে লাগিল, প্রত্যেকেই মনে করে অপর কয়েকজন মিলিয়া তাহার প্রতি দারুণ অবিচার করিতেছে এবং সমস্ত অর্থ নিজেরা আত্মসাৎ করিতেছে। প্রথমে এই সন্দেহের ভাব মনের মধ্যেই ছিল পরে কিন্তু আর গোপন রাখা সম্ভবপর হইল না। ঈর্ষা-বিদ্বেষ-কুটিলতা-ষড়যন্ত্র প্রভৃতি যতদূর চলিতে পারে চলিল শেষে বাধিল ঘোরতর Civil War। তাহার ফলে মূর্ত্তি প্রাপ্তির সমস্ত কথা সাধারণে প্রকাশ হইয়া পড়িল—এবং "ধনঞ্জয়ের" ভয়ে সাধুবাবারা লোটা কম্বল লইয়া রাতারাতি অন্তর্হিত হইলেন। প্রাণের প্রতি সাধু-সন্ন্যাসী সকলেরই মায়া আছে।

মন্দির এবং মূর্ত্তির আদি বিবরণ শুনিয়া কাহারও ভক্তি বিশেষ কমিল না। বরং সকলেই প্রায় বলিতে লাগিলেন—"বেটীর মাথা বোঝা ভার কখন কাহাকে কি নিমিত্তের ভাগী করেন তাহা বোঝাই দায়। নহিলে এই অর্ব্বাচীন কলেজে পড়া ছেলে গুলোর মাথায় এমন মতিগতি আসে—এ সবই সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা এই ছোঁড়াগুলো নিমিত্ত মাত্র।"

স্থানীয় জমিদার বাবু সেবাইৎ রূপে মন্দিরের ভার গ্রহণ করিলেন। মন্দিরের ব্যবস্থা পূর্ব্বের মতই চলিল। এখনও লোকে মন্দিরে আসে এখনও পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিমার সম্মুখে স্বর্ণ রৌপ্যের বৃষ্টি হয় কিন্তু কোথায় আজ তাহারা যাহারা এই সমস্তের মুখ্য কারণ? কালের স্রোত অবিরাম ভাসিয়া চলিয়াছে বাধা নাই বিরাম নাই কিঞ্চিন্মাত্রও কোথায় শিথিলতা নাই—সেই কালের স্রোতই ভাসাইয়া তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। আজ একজনও জানে না অপরেরা কোথায় আছে! তাহাদের মনে আজও স্বপনের মত ভাসিয়া ওঠে এক অতীত জীবনের সুখময় চিত্র যাহার পিছনে ছিল লক্ষ নরনারীর দ্বিধাহীন শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং যাহার মূল ছিল ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর ভগবানে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমা

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

প্রথমা প্রিয়ার স্পর্শে প্রাণে ওঠে প্রথম হিল্লোল
প্রতি রোম-কূপে আনি' কম্পনের মৃদু মৃদু দোল
আনন্দের তীব্রোচ্ছ্বাসে; মরি মরি অপূর্ব্ব চাহনি
কি সে দেয় নন্দনের অশ্রুত বারতা; রণরণি'
বুকে বাজে কি হর্ষের ঘন ঘন সশব্দ আঘাত,
শাণিত দেহের রূপ, অঙ্গভঙ্গি অলস করাত—
মার্জ্জিত রুচির, হেরি হৃদয়ে জমিয়া উঠে খালি
প্রমত্ত আশার মধু; করেছিনু প্রেমের মিতালী
তার সাথে; আজিকার কুঞ্জবনে আলো আর ছায়া;
গাঢ় হয় উল্লাসের নিষ্প্রতিভ স্নেহ হর্ষ মায়া।
নারীর অস্থি নিয়ে এ-দেহীর স্পর্দ্ধিত গঠন,
সহজ সুন্দর কান্তি; পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘের আসন
সে নারীর অশ্রু দিয়ে, স্বর্গচ্যুত পূত নির্ঝরিণী
ধীরে ধীরে বহি এল; মহীয়সী প্রিয়া-সিমন্তিনী।

সমর্পণ

গল্প

শ্রীপ্রমীলা রায়চৌধুরী

[অণিমা কলেজে পড়ে—সংসারের সহস্র অভাবের মধ্যেও সে নিজ ক্ষমতায় রোজগার করিয়াই সে অভাব মিটাইতে চায়—দেবেশ তাহার পিতৃবন্ধুর পুত্র, সে অণিমাকে ভালবাসে এবং বিবাহ করিতে উৎসুক—কিন্তু অণিমা এ বন্ধনে জড়াইতে চাহে না। পরে কেমন করিয়া কি হইল সুলেখিকা প্রমীলা রায় সমর্পণ গল্পে তাহাই দেখাইয়াছেন]

অণিমা বেথুনে আই, এ ক্লাশের ছাত্রী। গরমের ছুটির পরে কলেজ বোর্ডিং এ ফিরিতেছিল। বাড়ীতে ছুটির কয়টা দিন কাটাইয়া, প্রিয় সঙ্গগুলির মায়া ত্যাগ করিয়া কলেজে যাইতে মনটা তাহার বড়ই পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল।

বাড়ীর অবস্থা বিশেষ ভাল নয়—পিতা সামান্য কেরাণী, ভাই বোনে মিলিয়া তাহারা তিনটী। মেয়ের পড়ার আগ্রহ ও ইচ্ছা দেখিয়া নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তিনি তাহাকে পড়িতে পাঠাইয়াছেন। অণিমা মেয়েটি ভালই—ম্যাট্রিকে পনরটাকা বৃত্তি লইয়া পাস করিয়াছে...আই, এ তেও যাহাতে বৃত্তি পাইয়া পাস করিতে পারে...সেজন্য এখন হইতেই খাটিতেছে। বৃত্তি বন্ধ হইলে তাহার পড়াও বন্ধ হইবে—কারণ পিতার সামর্থ্যে আর তাহাকে পড়ান হইয়া উঠিবেনা।—

মেল ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে—অণিমার চিন্তাও তাহা অপেক্ষা বেগে ছুটিতেছে। ভাইটী বড় হইয়া উঠিতেছে তাহাকে পড়ান দরকার—মায়ের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—তাহার বিশ্রাম চাই। সংসারের খুঁটিনাটি কত কিই যে এবার তাহার চোখে পড়িয়াছে—একা সে সব বিষয়ের সুবিধা করা দুঃসাধ্য! বি, এ,টা পর্য্যন্ত হইয়া গেলে তবে কিছু রোজগারের আশা। না হইলে? নাঃ আশার ক্ষীণ আলোও কোথাও দেখা যায় না।

—সহসা তাহার চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন হইল! এই দুঃসহ দুশ্চিন্তার হাত হইতে এখনই তো মুক্তি পাওয়া যায়! তাহার একটু ইঙ্গিতেই তো সকলের ভাগ্য পরিবর্ত্তন সেই ঘটাইতে পারে। দেবেশর বিশেষ ধনী—তাহার পাণি-প্রার্থী হইয়া তাহার মুখের একটী কথার আশায় তিন বৎসর ধরিয়া অপেক্ষা করিয়াই আছে। পাত্র হিসাবে দেবেশর মন্দ কিছুই নয় লেখা পড়াও যথেষ্ট করিয়াছে। দেবেশকে জামাতারূপে পাইলে অণিমা বাদে সকলেই যে মাত্রার অতিরিক্ত খুসী হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু সে নিজেই যে অসুখী হইবে! —কারণ কিছু সাংঘাতিক নয়—শুধু নিজেকে আবদ্ধ করিবেনা নিজের প্রয়োজন নিজেই সংগ্রহ করিয়া মিটাইবে বলিয়া—না হইলে বিবাহের ইচ্ছা থাকিলে দেবেশকে বাদ দিয়া সে আর কাহাকেও বিবাহ করিতনা। তা সংসারে কি আর মেয়ে নাই? অণিমার অধরে মৃদু হাসি খেলিয়া গেল। কেনই যে দেবেশ তাহার অপেক্ষা করিয়া আছে! তাহার চেয়ে কত কত ভাল মেয়ে দেবেশকে পাইলে জীবন সফল মনে করিবে! বিবাহ সে তো একটা বিলাস! সে বিলাসে ভাসিবার ইচ্ছা তাহার নাই! সে নিজেকে সকল রকম কঠোরতার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবার জন্য প্রস্তুত করিতেছে—ভাইবোনের মধ্যে সে বড়—পিতা মাতার প্রথম সন্তান! পিতাকে অর্থচিন্তা হইতে মুক্তি দিবে—ভাইটীকে মনের মত করিয়া মানুষ হইতে দিবে এই না তাহার মনের সাধনা! কলিকাতায় ফিরিয়া দেবেশকে সে জানাইয়া দিবে যে সে যেন তাহার আশা ছাড়িয়া দিয়া বিবাহ করিয়া সুখী হয়! অণিমা কোন দিন বিবাহ করিবেনা—করিবার অবসর নাই। দেবেশকে বিবাহ করিতে দেখিলে সে সুখী হইবে। ইত্যাদি

—সারা রাত্রি ধরিয়া এই সব চিন্তায় চোখে তাহার ভাল করিয়া ঘুম আসিল না—ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়া কোলাহলে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল—সেদিন

দেবেশ তাহাকে ডাকিয়া তুলিতেছে "অণিমা! অণিমা! ঘুম যে তোমার ভাঙেই না দেখি!"

চমকিয়া চোখ মুছিয়া অণিমা চাহিল। দেখিল সারা-রাত্রি যে চিন্তাকে সে পরিহার করিয়া চলিতে চাহিয়াছিল তাহাই যেন মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্ষুদ্র একটী নিশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল—চশমার কাঁচটা মুছিয়া লইয়া বলিল "আমার জিনিস গুলো দেখে নিই।"

হাসিয়া দেবেশ বলিল "সে আর তোমার অপেক্ষায় পড়ে নেই এতক্ষণ! তুমি এলেই হয়!"

গাড়ী হইতে নামিতে অণিমা বলিল "কিন্তু আপনি জান্‌লেন কি করে যে আজই আস্‌ছি আমি!

"কাল আমি একটা তার পেয়েছি—আর তোমার নির্ব্বিঘ্নে পৌছবার একটা খবর দেবার জন্যে অনুরুদ্ধও হয়েছি।". অণিমা ভাবিতে ভাবিতে চলিল ইহাকে কি করিয়া দূরে রাখা যায়! সমস্যা যে ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিল।

—ষ্টেশনের বাহিরে দেবেশের সিডান বডি কার অপেক্ষা করিতেছিল—অণিমাকে উঠাইয়া ষ্টার্ট দিয়া নিজে উঠিয়া সে বলিল "কোথায়? বোর্ডিংএ যাবে?"

মাথা হেলাইয়া অণিমা জানাইল 'হাঁ।'

২

দেবেশের পিতা ও অণিমার পিতা বাল্যবন্ধু...। বন্ধু সামান্য কেরাণী হইলেও দেবেশের পিতা রমেশ কোন দিনই তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ধনী পিতার একমাত্র সন্তান বলিয়া তাঁহার বিবাহ অল্প বয়সেই হইয়া গিয়াছিল। দেবেশ সেই বিবাহের একমাত্র সন্তান —বন্ধু কমলাকান্ত দারিদ্র্যের তাড়নায় কেরাণীগিরিতে বাহাল হইল—দেখিয়া মনে খুব কষ্ট হইলেও তিনি তাঁহাকে বাধা দিলেননা—। কারণ তিনি জানিতেন যে আত্ম-মর্য্যাদা সম্পন্ন বন্ধু তাঁহার আর্থিক সাহায্য কখন গ্রহণ করিবেন না—বন্ধুর এই আত্মমর্য্যাদা তাঁহাকে তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছিল।—কমলাকান্ত বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়াও একটী অবিচারের কাজ করিয়া ফেলি-লেন—পরে হয়তা তিনি আজীবন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গেলেন। সমব্যথায় ব্যথিত হইয়া তাঁহারই মত এক দরিদ্রের মাতৃহীনা কন্যা ইন্দিরাকে বিবাহ করিয়া শূন্য গৃহে আনিলেন। বিবাহে তাহার লাভ হইল শুধু শ্বশুরের বুক ভরা আশীর্ব্বাদ ও তাঁহার কন্যা ইন্দিরা—বিবাহ সম্বন্ধে তাহার এত লজ্জা আসিয়াছিল যে অমন যে বন্ধু রমেশ তাহাকেও তিনি খবর দেন নাই—। কিন্তু তিনি খবরটা গোপন করিতে চাহিলেও গোপন বেশী দিন রহিল না—।

কিছুদিন কমলাকান্তের দেখা না পাইয়া রমেশ নিজেই মোটর চড়িয়া বন্ধুর সন্ধান লইতে আসিলেন—আসিয়া দেখিলেন; কমলার ভাঙা ঘরে লক্ষ্মীর আসন পাতা হইয়াছে —ইন্দিরা তখন সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালাইয়া তুলসীর মূলে দিয়া বোধ করি নিজের মনের গোপন কামনা জানাইতে ছিল—। প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে অপরিচিত লোক দেখিয়া সভয়ে দুই পা পিছাইয়া আসিল। অপ্র-তিভের একশেষ হইয়া রমেশ বলিলেন "মাপ করবেন—আমি জান্‌তাম না যে এখানে কমলার কেউ আত্মীয় এসেছেন—খবর না দিয়ে অভ্যাসমতই ঢুকে পড়েছি—।"

ইন্দিরার মুখে হাসি খেলিল—মাথার আঁচলটা আরও একটু টানিয়া দিয়া আরক্ত মুখে বলিল "আপনি বসুন —ওর আসতে বেশী দেরী হবে না—।"

রমেশ আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন ইন্দিরার অকুণ্ঠ ব্যবহারে! কে এ মেয়েটী? কমলার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ? মনে মনে তিনি খুবই অস্থির হইয়া উঠিলেন—কেমন করিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়? হঠাৎ বিদ্যুতের মত একটী কথা মনে হইতেই সব জলের মত বোধগম্য হইয়া গেল—ঠিক! ধারণা তাঁহার অভ্রান্ত নিশ্চয় কমলা বিবাহ করিয়াছে—না হইলে স্ত্রীলোক সংস্পর্শশূন্য গৃহে এমন নারী কে আসিবে? ঠিক! ভুল নয়—ভুল হইতে পারে না—। নিজের উপর তাহার খুব রাগ হইতে লাগিল —কেন সে এতক্ষণ বুঝিতে পারে নাই—

তার পরে অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে—বিবাহের খবর তাঁহাকে না দেওয়ার জন্য তাঁহার দুর্জ্জয় অভিমান ভাঙিতে কমলাকান্তকে কত না বেগ পাইতে হইয়াছে তাহার কাহিনী নিষ্প্রয়োজন—কিন্তু ছেলে বেলার সে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিয়া গেল।—

ক্রমে কমলাকান্তের ঘরে তিনটী সন্তানের আবির্ভাব হইল। আয় কিন্তু আর বাড়িল না। ইন্দিরার গুণে কোন রকমে ছেলে মেয়ে বড় হইয়া উঠিল—শিক্ষার প্রয়োজন; কিন্তু সুশিক্ষা তো অর্থ সাপেক্ষ. বড়টী কন্যা মেধা তাহার অদ্ভুত, পিতার নিকটে পড়িয়াই সে প্রাইভেট ম্যাট্রিক দিল। বৃত্তি পাওয়ার আশা ছিল না, পাইয়া পিতাকে জানাইল যে সে আই-এ পড়িবে। কমলাকান্ত বাধা দিলেন না। অণিমা কলিকাতায় পড়িতে চলিয়া গেল।

রমেশের কিন্তু দেবেশ ছাড়া আর দ্বিতীয় সন্তান ছিল না। অণিমা ও দেবেশের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে তাঁহার বরাবরই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু মত ছিল না কমলাকান্তের। তিনি মনে করিলেন বন্ধু এই সুযোগে তাঁহাকে সাহায্য করিতে চাহেন। অনেক দিন ধরিয়া কথাটা নাড়া চাড়া করিয়াও যখন কমলাকান্ত কথাটা বুঝিতে চাহিলেন না তখন তিনি নিরস্ত হইলেন। কিন্তু পুত্র দেবেশ কে বলা রহিল যে অণিমার কাছে জবাব না পাইলে সে যেন অন্য কোথাও বিবাহ না করে! তার পরে সহসা তাঁহার একদিন কাল হইল— পত্নী তো অনেক আগেই মারা গিয়াছিলেন। বন্ধুর শ্রাদ্ধ শান্তি মিটিয়া গেলে কমলাকান্ত নিজেই উপযাচক হইয়া দেবেশকে বলিলেন "ঘরে এখন তোমার থাকা দায় হবে—। বড় হয়েছ, কৃতীও হয়েছ. দেখেশুনে একটা বিয়ে করে ফেল। তোমার বাবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে আমার অণিমাকে পুত্র বধূ করেন, তা তখন হয়ে ওঠেনি। এখন ভাল মেয়ে যদি না পাও তো অণিমা তো রইল। কিন্তু ভাল মেয়ের খোঁজ আগে করা চাই।"

নতমুখে দেবেশ বলিল "বাবা আমাকে আদেশ দিয়ে গেছেন যে অণিমা যদি আমাকে বিশেষ রকম অপছন্দ করেন তবেই তাঁর সম্মতি নিয়ে আমি অন্য মেয়ের খোঁজ করতে পারব। নচেৎ, নয়।"

চিন্তিত মুখে কমলাকান্ত চলিয়া গেলেন।

সেই হইতে নানা প্রকারে দেবেশ জানিতে চাহিয়াছে অণিমা ভবিষ্যতে কি করিবে? কিন্তু সে আবার পিতা কমলাকান্ত অপেক্ষাও আত্মমর্য্যাদাশালিনী। ভদ্র ও সংযত ভাষায় একই উত্তর সে দেবেশকে জানাইয়াছে যে বিবাহে তাহার আদৌ ইচ্ছা নাই। ভ্রাতা ও ভগিনীকে উচ্চশিক্ষা দেওয়াই তাহার জীবনের প্রধান ব্রত। দেখিয়া শুনিয়া দেবেশ থমিয়া রহিয়াছে। কিন্তু আশা ছাড়িতে পারে নাই। কমলাকান্তের ভাব এই যে "পার যদি তো অণিমাকে রাজী করিয়া বিবাহ কর।"

*　　*　　*

বোর্ডিংএর দরজায় অণিমাকে নামাইয়া দিয়া দেবেশ বিদায় হইয়া গেল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টএর ঘরে দেখা করিয়া অণিমা স্নান করিতে চলিয়া গেল। কলেজ খুলিতে তখনও দুই দিন দেরী ছিল; সব মেয়ে আসিয়া জোটে নাই। দুপুরটা কিছু সময় ঘুমাইয়াও বাকী সময় চিঠি লিখিতে কাটিয়া গেল।

বিকালে কাপড় ছাড়ার পরে মাঠে বেড়াইতে নামিল বটে; কিন্তু নিজের দলের কেহই তখনো আসে নাই দেখিয়া বিরক্ত মনে বোর্ডিংএর পিয়ানোটা খুলিয়া বসিল। দুই একটা সোনাটো বাজাইয়া যখন আর ভাল লাগিল না উঠিবে উঠিবে করিতেছে ঠিক সেই সময়ে দারোয়ান তাহাকে "ভিজিটরের" আহ্বান জানাইল। দারোয়ানের হাত হইতে কার্ড লইয়া দেখিল, লেখা আছে "দেবেশ"। যাচ্ছি, চল বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

ঘরে ঢুকিতে দেবেশ তাহাকে বলিল, "ওবেলা তাড়াতাড়িতে কিছু খোঁজ নিয়ে যেতে পারিনি, তুমি ঠিক accomodated হয়েছ তো? বেড়াতে যাবে? গাড়ী আছে আমার সঙ্গে। একলা থাকার চেয়ে একটু চাও ঘুরে আসবে। যাবে?"

"আসি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বলে।" অণিমা বাহির হইয়া গেল; ভাবিতে ভাবিতে গেল আর বোধহয় সে দেবেশকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বলিতে, তিনি হাসিয়া বলিলেন "যেতে পার কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ইজ হি ইওর—" কথাটা শেষ করিতে না দিয়া লজ্জায় লাল হইয়া আরক্ত মুখে অণিমা বলিল "না, না, সে কিছু নয়। চেনা আছে এই পর্য্যন্ত!" বলিয়া সে সবেগে তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কেন? সকলেই এমন ভাবে কেন? পুরুষ মানুষ কি বন্ধু হইতে পারে না? তবে?—

গাড়ীতে গিয়া সে যখন উঠিল, তখনও তাহার মুখের লজ্জারুণ ভাব যায় নাই—দেবেশ একটু চাহিয়া রহিল, এ আলোছায়ার খেলা কিসের? তাহার সান্নিধ্যে! না—অণিমা সে মেয়েই নয়। ষ্টিয়ারিংটা শক্ত করিয়া ধরিয়া দেবেশ বলিল "কোথায় যাবে?" "যেখানে ইচ্ছে চলুন।" বলিয়া অণিমা সামনের সীটেই বসিয়া পড়িল।

রাত্রে তাহাকে নামাইয়া দিতে দিতে দেবেশ বলিল "আজ, তুমি খুব ক্লান্ত হয়েছ; আজই বল্‌ছিনা—কিন্তু আমার সেই কথাটার উত্তর দেওয়ার সময় কি তোমার আজও হয় নি? আমার ঐ কথাটা একটু ভেবে দেখো।"

'কিছু না বলিয়া অণিমা ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দেবেশ গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

(৩)

দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে—অণিমা এখন ফোর্থ ইয়ার আর্টসএর ছাত্রী। সবই সেই পুরাতন রহিয়াছে শুধু কমলাকান্ত রুগ্ন হইয়া শয্যা লইয়াছেন। দিন চলা ভার হইয়াছে—অণিমার পরের বোন্‌টী এবারে ম্যাট্রিক দিবে—ভাই মনোরম পড়া শুনায় ভাল একটু সাহায্য পাইলে ভাল ভাবেই পাস করিয়া যাইবে। কিন্তু সব কিছু ভালর জন্যই তো অর্থের প্রয়োজন! মায়ের লেখা যে চিঠিখানি আসিয়াছিল তাহা সে আবার পড়িতে আরম্ভ করিল:—

"মা অণিমা! তোমার বাবার অসুখের তো কিছু সুরাহা করিতে পারিলাম না; ভিজিট না পাইলে ডাক্তার আর আসিতে চান না—আর শুধু ডাক্তার আসিলেই বা কি হইবে—ঔষধ পথ্যও তো চাই! অণিমার ম্যাট্রিকের ও নোরমের স্কুলের দুমাসের মাহিনা তাও এই সঙ্গে চাই, ডাক্তার বাবু বলেন চেঞ্জের দরকার। ইনি বলেন 'গরীবের আবার চেঞ্জে কি? এই খানেই মরিব।' মা, আমার দুর্ভোগের কথা তুমি অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ। ক্রমাগত রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া অমন যে শান্ত মেজাজ তাহাও খিটখিটে হইয়া গিয়াছে। সংসারে তোমাকে আনিয়া বিশ্রাম তো কোনদিন দিলামনা আজও মা, তুমি আমার মা হইয়া আমাকে এ বিপদে ত্রাণ কর। যে বয়সে শুধু হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবার সময়, সেই বয়সে আমি মা তোমাকে সংসার সমুদ্রে ঠেলিয়া দিয়াছি। তুমি বুদ্ধিমতী যা হয় একটা উপায় স্থির করিও। দেবেশ তোমার কাছে যায় কি? আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ লইও। ইতি তোমার অভাগিনী মা"—

চোখের জলে অণিমার বুক ভাসিয়া গেল। তাহার অমন জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মত মা, অমন সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি! সেই অভাগিনী! না, না, এই দুর্দ্দিন দূর করিবার উপায় চাই। মাকে টাকা সে পাঠাইবেই যেমন করিয়া হোক্—নিজেকেই সে বাঁধা দিবে! নোটবুকের একটা পাতা টানিয়া লইয়া পেন্সিল দিয়া সে লিখিল—"দেব-দা, বিশেষ দরকারে গোটা পঞ্চাশেক টাকার দরকার হয়ে পড়েছে—আপনি অনুগ্রহ করে টাকাটা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন, শোধ দিতে কিছু দেরী হওয়াই সম্ভব; কারণ এর মধ্যে একটা জুটিয়ে নিতে হবে আমায়। পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই আপনার টাকা শোধ দেবার চেষ্টা করব প্রথমে। আশা করি যত দিন দেরী হবে আপনি চুপ করে থাকবেন। একটা হ্যাণ্ডনোটও এই সঙ্গে লিখে পাঠালাম।" ইতি অণিমা।—

চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়া অণিমার অস্বস্তির আর শেষ রহিলনা—চিঠির ভাষা আগাগোড়া মনে করিয়া অশান্তি আসিতে লাগিল। চিঠিতে যেন কিছু অধিকার করিবার ভাষা বুঝাইয়াছে—এ ভাষা কি করিয়া বাহির হইল? যাক্—লেখা যখন হইয়া গিয়াছে তখন আর উপায় কি? সারাদিন ও রাত্রি প্রতীক্ষায় কাটাইয়া সকালের ডাকেও দেবেশের না আসিল পত্র, না কেহ দিয়া গেল টাকা। ধিক্কারে তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিল—ছিঃ! সে কী পাগল হইয়া ছিল। সে তাহার কে? কেন? কেনই যে এই দুর্ম্মতি হইল! মন যখন এইরূপ অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিয়াছে তখন ধীরে ধীরে দেবেশ বোর্ডিং এর ভিজিটার্স রুমে প্রবেশ করেন।

খবর পাইয়া অণিমা দুরু দুরু বক্ষে সেই ঘরে আসিল। না জানি দেবেশ কি বলে! কিন্তু দেবেশ বলিলনা কিছুই শুধু চাহিয়া দেখিল মাত্র। ঘরের অসহ নীরবতা ভাঙিয়া অণিমা বলিল "আমার চিঠি পেয়েছিলেন?"

মাথা হেলাইয়া দেবেশ জানাইল 'হাঁ।'

"যে কথাটা লিখেছিলেম, তার কি করলেন ?"

প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া দেবেশ বলিল "কিন্তু এমনি করে ক'দিন চলবে অণিমা ?"

সচকিতে অণিমা বলিল "কেমন করে ? আমার কিছু টাকার প্রয়োজন হওয়ায় আপনার কাছে ধার চেয়েছি, তার ভেতরে আপনি আমার পারিবারিক ব্যাপার কিছু জানতে চাইবেন না। টাকা আপনি খুসী হলে দিতেও পারেন না ও পারেন। দিলে সেটা আমি ঋণ বলেই গ্রহণ করবো।" তাহার স্বরের উত্তপ্ততায় দেবেশ একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল। বলিল "টাকা তুমি কেন চেয়েছ তা আমি কিছু কিছু আন্দাজেই বুঝেছি সেই জন্যই বলছি যে আমার কথাটা ভেবে দেখবার সময় কি এখনও আসে নি ?"

"একটু খানি দুর্ব্বলতা আমার পেয়ে আপনি আমাকে অপমান করতে সাহস করছেন—আগে বুঝলে আমি কখনো এ ফাঁদে পড়তামনা।"

"অপমান তুমি কোথায় পেলে অণিমা ? তোমার বাবা এবং আমার বাবা মিলে যে কথার সৃষ্টি করেছিলেন, সেটাকে তো আমি অগ্রাহ্য করতে পারিনে! কথার শেষ হবে না, যতদিন না তুমি আমাকে বিদায় দিচ্ছ।"

"শুধু টাকা চাওয়ার সুযোগ পেয়ে আপনি যে এই কথা নিয়ে যাচাই করবেন তা আমি বুঝতে পারিনি। আমার মত কোনদিনই বদল হবেনা জানবেন।"

ধীরে ধীরে দেবেশ বলিল "আমাকে এতটা নীচ মনে করোনা অণিমা ; টাকা আমি কালই পাঠিয়ে দিয়েছি পঞ্চাশ নয় একশো টাকা তোমার মায়ের নামে। আর এই তোমার হ্যাণ্ডনোট নাও। তেজারতী করা আমার ব্যবসা নয়।" বলিয়া পকেট হইতে হ্যাণ্ডনোট খানি বাহির করিয়া তাহারই সামনে ছিঁড়িয়া ফেলিল। অণিমার মাথাটা আপনা হইতেই নীচু হইয়া গেল। দাঁড়াইয়া সে আবার বলিল "তুমি বললে এইমাত্র যে মত তোমার কখন বদল হবেনা ; কিন্তু আমি বলছি মত তোমার বদল হবেই তা এখনই হোক, দু'বছর পরেই হোক্। তখন তুমি আমাকে জানিয়ো—তোমার ঢুকবার জন্যে আমার দরজা চিরদিনই খোলা থাকবে অণিমা! তোমাকে চাওয়ার শেষ আমার এ জীবনে হবেনা সাধনা আমার সফল হবেই।" টলিতে টলিতে সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। অণিমা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগল।

কমলাকান্ত সে যাত্রা টাল সামলাইয়া লইলেন। কিন্তু ভাঙা বুঝি আর জোড়া লাগেনা—মাস দুই ভাল থাকার পরেই আবার তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িল। এই শোওয়াই যে তাঁহার শেষ তাহা তিনি এবং বাটির সকলেই বুঝিতে পারিলেন। অণিমার কাছে আবার চিঠি গেল। এবারের চিঠি পড়িয়া অণিমা নিজের মন স্থির করিয়া লইল—বুঝিল ভগবানের ইচ্ছার কাছে মানুষের ইচ্ছা চিরদিনই নত হইয়া গিয়াছে! সকলের সুখের জন্য অসহ্য অর্থ চিন্তা হইতে মুক্তি লাভের জন্য সে [illegible]র সঙ্কল্প হইতে নিজেকে বিচ্যুত করিল।

চিঠি পাওয়ার পর হইতেই সে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল—সমস্ত দুপুর ধরিয়া ভাবিয়া সে ঠিক করিল যে দেবেশকে নিজমুখেই সম্মতি দিয়া যাইবে। বিদায়! জীবনের লক্ষ্য! বিদায় প্রিয় গ্রন্থগুলি! বিদায় আনন্দময় এই ছাত্রী জীবন। কিছু দিন আগে দেবেশের বলা কথাগুলি মনে হইল—'মত তোমার বদল হবেই—দুদিন পরেই হোক বা দশবছর পরেই হোক—তখন আমাকে জানিয়ো—তোমার জন্যে আমার ঘর চিরকালই খোলা থাকবে।' মনে মনে দেবেশকে উদ্দেশ করিয়া অণিমা বলিল 'মত আমার বদল হ'ত না বাধ্য হয়ে বদল করতে হল। তোমার ঘরেই আমার শেষ আশ্রয়।'

বিকাল বেলা সে সকলকে জানাইয়া দিল যে পিতার সঙ্কটাপন্ন পীড়া, হয়তো তাহার বোর্ডিংবাস জন্মের মতই ফুরাইয়া গেল। আজই রাত্রে সে বাড়ী রওনা হইবে। দেবেশের ঋণের টাকা সে পূর্ব্বেই পরিশোধ করিয়াছিল। ষ্টেশনে যাইবার কিছু আগে সময় আন্দাজ করিয়া লইয়া সে দেবেশের বাড়ীর দিকে গাড়ী ছুটাইল।

দেবেশ তখন নিজের অফিস কামরায় বসিয়া টেবিল ল্যাম্প জ্বালাইয়া বোধকরি মক্কেলের কাজ কর্ম্মই দেখিতেছিল, হটাৎ পর্দ্দা ঠেলিয়া অণিমা ঢুকিয়া পড়িল। বিষম চমকাইয়া দেবেশ চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল মুখে শুধু দুটী কথা বাহির হইল "তুমি ? রাত্রে ?"

একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া অণিমা নিজেই বসিল—বলিল "হাঁ আমিই দেব দা। মা'র চিঠি পেলাম বাবার অসুখ বেড়েছে তাই আজ রাত্রেই আমি বাড়ী যাচ্ছি—। তার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছি যে আপনার কথাতেই সম্মত হচ্ছি ভাববার অবসর আর নেই আমার! বাবা ভাল হোন্ বা না হোন্ আমার কথার নড়চড় হবে না।"

"তুমি তোমার মত সত্যিই বদলালে! অণিমা! কি সুখ, কি শান্তি! আজ যদি বাবা থাকতেন তাঁর যে তোমাকে ঘরে নেওয়ার বড় ইচ্ছাই ছিল। ঠিক করে ভেবে দেখেছ তো? অসুখী হবেনা তো? অণিমা অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিল "আমি একা আর চারি দিকের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে পারছিনে। নাও—আমাকে; আমার ইষ্ট, অনিষ্ট শুভ, অশুভ, ভাল, মন্দ, সব তোমার হাতে তুলে দিলাম—ভাবতে আর পারিনে আমি!"

দেবেশের চক্ষুও শুষ্ক ছিলনা—বলিল "নিলাম! আজ থেকে তোমার ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ সব আমার হয়ে রইল; আমার এই ছন্নছাড়া জীবনটাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম, তুমি একে ফুটিয়ে তুলো।" বলিয়া ড্রয়ার হইতে একখানি খাম বাহির করিয়া অণিমাকে দিয়া বলিল "এই নাও তোমার সেই টাকা আমি রক্ষা কবচের মত যত্নে রেখেছিলাম ঋণ তোমার শোধ হয়েছে" অণিমা আর আপত্তি করিল না।

হঠাৎ উঠিয়া অণিমা বলিল "সময় হয়েছে—যাই।"

মৃদু হাসিয়া দেবেশ বলিল "আর তো তোমাকে একলা যেতে দিতে পারি নে—চল আমিই নিয়ে যাই। আমাকে তোমার হাতটা ধরতে দেবে?"

বিনা বাক্যব্যয়ে অণিমা তাহার ডান হাতখানি অগ্রসর করিয়া দিল। দেবেশ তাহার হাতখানি লইয়া নিজের দুই হাতের মধ্যে লইয়া ছাড়িয়া দিল।

বিমূঢ় অণিমাকে লঘু ও চপল হস্তে ধরিয়া লইয়া সে যখন গাড়ীতে বসাইল তাহার মনে তখন আনন্দের সীমা ছিল না বটে, অণিমা কিন্তু কি ভাবিতেছিল সেই জানে!

আকাঙ্ক্ষা

শ্রীঅর্পিতা দেবী

এসেছে জীবন-সন্ধ্যা আজি,
যৌবনের অভিনয়ে নামে ধীরে যবনিকা
সমাপনী শঙ্খ উঠে বাজি।
আজি শুধু বলো একবার
মোরে বেসেছিলে ভালো বন্ধু হে আমার।
এসেছে মলিন হয়ে প্রভাতের রবি ভাতি,
বন্ধু! এই মহা শুভলগন,
প্রেমের দীপালী জ্বালি জাগো মোর শুকতারা,
উজলিয়া আঁধার গগন।

যৌবনের খর সূর্য্যকরে
যে আলো লুকানো ছিল আজি তা উঠুক ফুটে
সায়াহ্নের শ্যামল অম্বরে।
দিবসের কোলাহলে যে রাগিনী ছিলো মিশে,
এ নীরব নিভৃত সন্ধ্যায়
তোমার বাঁশরি রন্ধ্র পরিপূর্ণ করি আজ
সেই সুর শুনাও আমায়।
বলো, শুধু বলো একবার,—
হাসি, অশ্রু, সুখে, দুখে, মোর তরে ঐ বুকে
ভরা ছিলো প্রণয় তোমার।

বিবাহ কি ব্যর্থ হইয়াছে ?

শ্রীসুজাতা ঘোষ

[আধুনিক নারী প্রগতির আলোচনায় যে সুর সাধারণতঃ চলিয়াছে শ্রীসুজাতা ঘোষের লেখার সুরটি তার চেয়ে অন্য ধরণের। নারী প্রগতির আলোচনায় এ-দিক ও-দিক দু'দিকই ভাবিবার আছে। আশা করি লেখিকারা যিনি যেমন ভাবেন সেই ভাবেই মহিলা-মজলিসের আলোচনা সমৃদ্ধ করিবেন।]

প্রায় পঁচিশ বছর আগে Westminster Review পত্রিকায় শ্রীমতী মোনা বেয়ার্ড, "Is Marriage a Failure" অর্থাৎ "বিবাহ কি অকৃতকার্য্য হইয়াছে" এই বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখেন। তাঁর সেই প্রবন্ধ প্রকাশের পরই "Daily Telegraph" পত্রে এই বিষয় নিয়ে পত্রে বাদানুবাদ চলতে থাকে। সেই সূত্রে যে তর্কের উদ্ভব হয়, তা থেকে বর্ত্তমান য়ুরোপে বিবাহের ভালমন্দ সম্বন্ধে নরনারী নূতন একটা উপায় বার করতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় সমস্ত নরনারী এই সময়ে বিবাহ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে যে কোন একটা নূতন উপায় উদ্ভাবন করতে যত্নবান হন। এবং সকলের চেয়ে মজার কথা এই যে সমস্ত ধর্ম্মযাজক বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তাঁরাই বিবাহ বিচ্ছেদকারী নরনারীর পুনঃ বিবাহে পৌরহিত্য করতে সামান্য মাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নাই।

সেই সময় টলষ্টয় বলেন যে, "পুরাতন যৌন সম্পর্ক ত্যাগ করে নরনারী বিবাহের নূতন রূপ দিতে চেষ্টা করছে।"

ইবসেন (Ibsen) বলেন, "স্বাধীনচিত্ত মানব, কেবল মাত্র কাব্যের মধ্যেই দেখা যায়। বিবাহ সম্পর্কে এ কথা খাটে না। বর্ত্তমান স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক জাতীয় প্রগতির চলিষ্ণুতাকে বন্ধ করে দিচ্ছে।"

প্রসিদ্ধ লেখক জর্জ্জ মারডিথ দ্বিত সকলের উপর টেক্কা দিয়া বলেন, "বিবাহের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্দেশ থাকা উচিৎ। দশ বছরের অধিক স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় থাকা কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নহে।"

মারডিথের এই কথা পাশ্চাত্যে একটা বড় রকমের আন্দোলন সৃষ্টি করে। পরবর্ত্তী কালে গ্রান্ট এলেনের "The Woman Who Did" স্কুলের মেয়েরা পর্যন্ত মেতে উঠলো এই বই নিয়ে। অভিভাবকরা মুস্কিলে পড়লেন। এই আন্দোলনে বৈজ্ঞানিক আসিয়া জুটিলেন তাঁদের মনস্তত্ত্বের দুর্ব্বহ বোঝা নিয়ে। হেভলক এলিস, ফ্রয়েড, হল মেয়েদের স্বামী ত্যাগের প্রধান অস্ত্র। "বিভিন্ন প্রকৃতির স্ত্রীপুরুষের মিলন উৎকৃষ্ট ভবিষ্যত সন্তান জননের পক্ষে অন্তরায়।" যাহা ছিল প্রকৃতির উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা, Race culture বা সৌভ্রাত্য বিস্তার অন্নবুদ্ধি দিক সেই উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়িয়ে। সৌভ্রাত্য বিস্তার যেটুকু উচ্ছৃঙ্খল তার সহায়ক সেইটুকুই গ্রহণ করে নর-নারী "Nature's Club" স্থাপন করলো, সাফ্রেজিষ্ট হয়ে দরজা জানলা ভাঙতে শুরু করে দিল। নর-নারী কেহ কাহারও সান্নিধ্য সহ্য করতে পারছে না। পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করছে। প্রকাশ্যে কাগজে কলমে নারী বিদ্বেষ ও পুরুষ বিদ্বেষ প্রচার হতে থাকে। মেয়েদের সম্বন্ধে তখন এবং এখনও এই কথা বলা হয়ে থাকে—

"Women are preposterously masculine contemptibly feminine, ridiculously intellectual, repulsively athletic, and revoltingly

frivolous. In appearence they are either lank, gaunt, flat-footed lamp posts, or else over dressed, unnaturally shaped, painted dolls," ইত্যাদি।

আমেরিকার বিচারক জর্জ্জ লিণ্ডসে এই নরনারী বিদ্রোহ সম্বন্ধে তাঁর যে অভিজ্ঞতা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন তা পাঠ করলে য়ুরোপ, আমেরিকার যৌন কদর্য্যতা চোখে পড়ে।

কেবল মাত্র পশ্চিমের নরনারীই যে পরস্পরের সম্পর্ক সহ্য করতে পারছে না তাহা নহে, আমাদের দেশেও যৌন সমস্যা সম্বন্ধে ছেলে মেয়েরা বিকৃত ভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছে।

"না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।" সঙ্গীত প্রায় পঁচিশ, ত্রিশ বছর পূর্ব্বে বাংলার নরনারীকে এই বিপ্লবে উৎসাহিত করে। মেয়েদের রাজনৈতিক আন্দোলন পরিণতি লাভ করে বিদ্রোহ ও বিভীষিকায়। ভাবের মোহ মেয়েদের মধ্যে অত্যধিক ভাবে প্রকাশ পায় বলেই মেয়ে পুরুষ ঘর ও বাহির ভাগ করে নিয়েছে। গৃহের মধ্যে নিজেকে ধরা দেয় বলেই নারী হয় গৃহের গৃহিণী। নারীর পরিণতি তার ঘরের মধ্যে। বাহিরের স্থিতিহীন গতি, লাভহীন চেষ্টাই যদি নারীর ভাগ্য হয় তবে এমন ভয়ানক দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে! বাহিরের চঞ্চল গতি প্রবাহের উপর যে নারী প্রতিষ্ঠার ভিত্তিস্থাপন করতে চায় তার যে দশা হয় সে কারো অগোচর নেই। তাকে ডুবতেই হয়। এমন কত জাতি ডুবে গেছে।

অভিসারে

রূপক

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপের কিরণ ছড়িয়ে দিয়ে নীলিমার বুকে এসে দাঁড়াল চন্দ্র। অনন্ত যৌবনরসে উচ্ছ্বসিত হয়ে চলেছে সে তার প্রেমিকের সন্ধানে। ভরাভাদরের ভরা যৌবন ছড়িয়ে দিয়ে আকাশের বুকে ফুটে-ওঠা সখীদের বলে সে,—নয়নের কোণে কেন সখি বারিরাশি এসে জমা হয়েছে! আজ যে আমোদের দিন। বহু আরাধনা করে যে পথের সন্ধান পেয়েছি, আজ আমি সেই পথের পথিক! যাঁর কাছে যাব বলে এতদিনের প্রেম প্রাণের গোপনকক্ষে সঞ্চিত করে রেখে দিয়েছি, আজ সেই প্রেম বিলিয়ে দিতে চলেছি আমার প্রেমিকের কাছে।

জ্যোৎস্নাভরা আননখানি পৃথিবীর দিকে নিক্ষেপ করে সে বলতে থাকে,—চলেছি আজ সকল বন্ধন এড়িয়ে তাঁর কাছে—যাঁর রূপের প্রভায় আমার এই তনুটি বেড়ে উঠেছে।—

এমন সময় ঘোর অমানিশার কালো রেখার ছাপ নিয়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে রাহু।—

রূপের ঢেউ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়ে বলে ওঠে চন্দ্র,—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমার পথ,—

ঘোর নিনাদে বলে ওঠে রাহু,—অয়ি অভিসারিকে! কোথায় চলেছ তোমার বিপুলরূপের ঐশ্বর্য্য নিয়ে, একলাটি, এই পথের পথিক হয়ে—?

চলেছি আমি আমার প্রেমিকের কাছে,—যাঁর স্বচ্ছ প্রেমে আমার প্রাণের নির্জ্জীব আলোটুকু মুখরিত করে তুলেছে!

—না, না, রাণী! আমার প্রাণের সুপ্ত তন্ত্রীতে মৃদু ব্যথার আঘাত করে চলে যেও না—আজ আমি যখন তোমায় পেয়েছি—তুমি নিজে এসে যখন ধরা দিয়েছ তখন তোমায় আমি ছেড়ে দেব না। এস...এস...

চন্দ্র করুণ-সুরে বলে ওঠে,—ওগো না, না,—আমায় এমন করে বাধা দিয়ো না, ছেড়ে দাও, আমার পথ।

রাহু তার উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছুটে চলে চন্দ্রকে আলিঙ্গন করতে। ভয়ে ত্রাসে চন্দ্র শিউরে ওঠে—পালাবার চেষ্টাকরে—। কিন্তু বৃথা! দুর্ভাগিনী পথ খুঁজে পায় না।—তার এতদিনের আশায় ব্যর্থতার রেখা পড়ে যায়!

রাহু চন্দ্রকে আলিঙ্গন করে বলে ওঠে,—এস, আমার হৃদয়ের মাঝে এসে বসো! আজ আমি তোমায় পেয়েছি! আজ আমার কি সুখের দিন।

চন্দ্র শিউরে ওঠে। তার কান্নার সুরের মাঝে ডুবে যায় তারশেষ করুণ মিনতি।

রাহুর কালো অঙ্গের আবেষ্টনের মধ্যে চন্দ্রের কোমল তনুটি মিলিয়ে যায়।—

রাহু গ্রাস করে চন্দ্রকে—

মেয়ে রাজার দেশে

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

[কোন জায়গা দেখিয়া বা না-দেখিয়াই অনেক ভ্রমণ বৃত্তান্ত মাসিকে বাহির হইয়া থাকে। ভাল করিয়া লিখিতে পারিলে যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত কত উপভোগ্য হয় তাহা ব্রহ্ম প্রবাসী সুলেখক মনোরঞ্জন বাবু "মেয়ে রাজার দেশে" দেখাইতেছেন।]

পেগুর কথা বলিবার পূর্ব্বে আমার এই সাড়ে তিন দিন পায়ে হাঁটার এক রাত্রির কথা না বলিলে ভ্রমণ কাহিনীটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। রেঙ্গুন ছাড়িবার দুই দিন পরে এক সন্ধ্যায় আমাদিগকে আশ্রয় নিতে হইল এক বর্ম্মী হেডম্যান বা মোড়লের বাড়ীতে। সদর রাস্তা হইতে পোয়াটাক মাইল দূরে ঘন বনজঙ্গলের মধ্যে এক প্যাগোডা। তাহারই অনতিদূরে এক পাহাড়ী নদীর তীরে এই মোড়লের বাড়ী। বাড়ী বা গ্রাম বলিতে আমরা যাহা বুঝি এ দেশের গ্রাম বাড়ী সে রকম নয়। আমরা যাহার অতিথি হইলাম সে নাকি ছোটখাট একটা জমীদার অথচ বাসোপযোগী তাহার একখানা মাত্র প্রকাণ্ড বাঁশের ঘর। আর একটা ছোট ঘরে গাই বলদ প্রভৃতির সঙ্গে চাকর বাকরদের আড্ডা। এই বাড়ীর দূরে দূরে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে আর পাঁচ সাত খানা ঘর ছাড়া মানুষের কীর্ত্তি বলিয়া আর কিছু নজরে পড়ে না। এখানে না আছে পোষ্টাফিস না আছে হাটবাজার তথাপি বস্তিটার গ্রাম বলিয়া একটা জমকালো নাম আছে। আমরা যখন এই বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম তখন বিকাল সাড়েপাঁচটা। গৃহস্বামী খুব সমাদর করিলেন। অতিথি পরায়ণ বলিয়া বর্ম্মীদের যে সুনাম শুনিয়াছিলাম তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম। মোড়লের নাম উমংজি বা উবোজি নামটা সঠিক মনে নাই। বয়স পঞ্চাশের উপর। ভদ্রলোক দিলদরিয়া গোছের মানুষ—যেমনই সরল তেমনই আলাপী। নিঃসঙ্কোচে তিনি তাহার ঘরের কথা আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন। তাহার দুই ছেলে রেঙ্গুনে থাকিয়া কলেজে পড়ে—ছুটীতেও তাহারা বাড়ীতে আসে না, একটিমাত্র তাহার মেয়ে এবং সেই তাহার প্রথম সন্তান। মেয়েকে তিনি বিবাহ দিয়াছিলেন একটি বড় লোকের ছেলের সঙ্গেই কিন্তু কিছুদিন পরে প্রকাশ হইয়া পড়ে যে ছেলেটির আর একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব আছে। সেই থেকেই মেয়ে স্বামীর ঘর করে না। সে বর্ত্তমানে এই বাড়ীতেই তাহার সঙ্গে আছে।

বৃদ্ধের এই ঘরাণা কথা শুনিবার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না কাজেই এক সময়ে আমি সকলের অলক্ষ্যে ঘর হইতে বাহির হইয়া কাছের নদীর ধারটা বেড়াইয়া আসিলাম। ফিরিয়া দেখি আহার প্রস্তুত -সকলেই আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, শুনা ছিল বর্ম্মীরা যা তা খায় কাজেই এ ভোজন ব্যাপারটা সম্বন্ধে মনে মনে যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। কিন্তু চক্ষুলজ্জার খাতিরে শেষ পর্য্যন্ত না বসিয়া পারা গেলনা। মোড়লের মেয়েই নিজে পরিবেশন করিলেন। আহার সুরু করিয়া দেখা গেল আমার খাদ্য বিভীষিকা নিতান্তই অমূলক। ডাল,ভাত,পাঁপড়ভাজা আর বন্যকুক্কুটের মাংস। এই গুলিতে কাহারও অরুচি জন্মিবার কথা নয়। তবে ইহার সঙ্গে একটা সবুজ রঙের ঝোল্‌ ছিল যার তীব্র গন্ধটা আমার বরদাস্ত হইলনা। আমি কেবল এইটাই পরিত্যাগ করিলাম। খাইতে খাইতে ঘরের সমস্ত আসবাব পত্র নজর দিয়া দেখিতে লাগিলাম। সহর হইতে বহুদূরে এই গ্রাম অথচ সহরের বিলাসিতার নানাপ্রকার উপকরণ এখানেও ঠাঁই পাইয়াছে। ইলেক্‌ট্রিক টর্চ্চ, সাইকেল, গ্রামোফোন বড় আয়না এ্যালুমিনিয়ামের টিফিন কেরিয়ার ফ্লাস্ক ত আছেই এমন কি ঘরের জানালায় জাপানী সিল্কের পর্দা পর্য্যন্ত টাঙান হইয়াছে। আর মোড়লের মেয়ে যিনি আমাদিগকে ভাত দিতে আসিয়াছেন তিনি যে সমস্ত অলঙ্কার ও পোষাক পরিয়া আসিয়াছেন সেইগুলি কমপক্ষে পৃথিবীর পাঁচটি দেশের তৈরী। আমার সম্পাদক ও বন্ধুবর ব্রজ-ভায়া জানেন কাজেই তাহারা খাইতে খাইতে দিব্যি গল্প জুড়িয়া দিলেন—দুই একটি রহস্যের কথাতে

মোড়লের মেয়েকেও যোগ দিতে দেখা গেল,. বর্ম্মী মেয়েদের যে কেবল পর্দ্দা প্রথাই নাই তা নয় ওরা পুরুষের সাথেও খুব সহজ ভাবেই মিশিয়া থাকে। আজ আমরা ইহাদের সম্মানিত অতিথি এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত তথাপি ইহাদের ব্যবহারে কিছুমাত্র আড়ষ্টতা লক্ষিত হইল না। আমার কাছে সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য্য মনে হইল এই কথাটা যে শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হইতে দূরে এই জঙ্গলের মধ্যে থাকিয়া আচার ব্যবহার ও পোষাক পরিচ্ছদে ইহারা এমন মার্জ্জিত রুচি হইল কেমন করিয়া। গল্পে বর্ণিত রাক্ষসপুরীর রাজকন্যার মতই এই মোড়লের মেয়ের রূপ, অটুট এর স্বাস্থ্য এবং আত্মসম্মান সম্বন্ধে অতিমাত্র সচেতন এর নারীত্ববোধ। যেই মাত্র জানিতে পারিয়াছে স্বামীর মনে দুর্ব্বলতা ঢুকিয়াছে অমনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। বাপ বুড়া হইয়াছে—মা নাই এবং ভাইরা সহরে। বিষয় কর্ম্মে সেই এখন পিতার দক্ষিণ হস্ত। খাওয়া দাওয়ার পর শুইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এই মেয়েটির কথাই ভাবিতে লাগিলাম। বন্ধুদের নাক ডাকিতে সুরু করিয়াছে—তাহাদের দিকে চাহিয়া মনে হইল আমরা যেন রূপ কথার তিন রাজপুত্র। অনেক রাজ্য ঘুরিয়া অবশেষে মেঘবরণ চুল ও সোণার বরণ রাজকন্যার সন্ধান পাইয়াছি। একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল—জাগিয়া শুনিলাম বাহিরে ভীষণ গণ্ডগোল। এদিকে ঘরের মধ্যে চেঁচামেচির অন্ত নাই কিন্তু ভাষা দুর্ব্বোধ—কিছুই ঠাহর করিতে পারিলাম না। হঠাৎ বন্ধুবর দিদারুল আলমের আর্ত্তনাদ শুনিলাম-ডাকাত পড়িয়াছে। ভাগ্যে আপদকালে বন্ধুবরের মুখে মাতৃভাষাটা বাহির হইয়াছিল তা না হইলে আমার পলাইতে দেরী হইত। ঘর হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহির হইয়াই কিছু দূরে গিয়া একটা আমগাছে উঠিয়া পড়িলাম এবং ঘন পত্রান্তরালে আত্মগোপন করিলাম। "য পলায়তি স জীবতি।" তিন বন্ধু (Three musketeers) কেহ কাহারও খোঁজ লইল না। ভগবান বিশ্বাস করি না তথাপি দুর্গানাম জপিব কিনা ভাবিতেছিলাম এমন সময়ে ঘর হইতে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া পীলাচমকাইয়া গেল। উপর্য্যুপরি কয়বার বন্দুকের শব্দ হইল তাহা গণিয়া রাখার মত মনের অবস্থা ছিল না। যখন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল তখন কোলাহল থামিয়া গিয়াছে। দিদারুল আলমের গলা শুনিলাম—আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে মোড়লের মেয়ের উচ্চ হাসিও কানে গেল। ব্যাপার কি? আস্তে আস্তে গাছ হইতে নামিয়া ঘরে গিয়া উঠিলাম। দেখিলাম বন্ধুদের কাপড়চোপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে—একজনের কপাল কাটিয়া গিয়াছে আর এক জনের হাঁটুর নীচে খানিকটা মাংস উঠিয়া গিয়া রক্ত ঝড়িতেছে। তাড়াতাড়ি পলাইতে গিয়াই তাহাদের এই দুর্দ্দশা। মাটি হইতে ঘরের মেঝে বেশী উঁচু নয় কিন্তু বাধ্য হইয়া ঐ বরবপু নিয়াও তাহাদিগকে মাচার নীচে ঢুকিতে হইয়াছিল। শুনিলাম ডাকাতদের সংখ্যা মাত্র চার পাঁচজন ছিল—তাহারা যখন দরজা ভাঙিতে উদ্যত তখন মোড়লের মেয়ে বাপের বন্দুক নিয়া কয়েকবার গুলি ছোড়ে! ইহাতেই ভয় পাইয়া ডাকাতেরা পলায়ন করে। আমি হাসিয়া দেখি বন্ধুরা মোড়লের মেয়েকে ঘিরিয়া ঐতিহাসিক বীরত্বর কাহিনী জুড়িয়া দিয়াছে। সম্পাদক বন্ধু কি ভাবে এই ঘটনাটা রেঙ্গুণের সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিবেন তাহার একটা খসরা করিয়া ফেলিলেন মুখে মুখে এবং তাহার রিহাসেল দিলেন। মোড়লের মেয়ের মুখে কেবল হাসি আর হাসি। আমি শুধু সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

পেগুতে আট নয় জন বাঙালী উকীল আছেন। অবস্থা সকলেরই ভাল—প্রত্যেকেরই নিজস্ব বাড়ী আছে। একজনের সম্পত্তি সাত আট লাখ টাকার উপর। মেসে যে কয়জন বাঙালী আছেন তাহারা পোষ্টাফিস পি, ডব্লিউ ডি অফিস ও মিউনিসিপাল অফিসে কাজ করেন। তা ছাড়া দুই একজন ডাক্তার এবং কণ্ট্রাক্টর ও আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মুষ্টিমেয় বাঙালীদের মধ্যে ও এক পক্ষে চাটগার লোক ও অন্যপক্ষে অন্যান্য জেলার লোক এই দুই দলে দলাদলি আছে। রেঙ্গুনেও লক্ষ্য করিয়াছি চাটগা অঞ্চলের লোকদের সকলেই যেন একটু অবজ্ঞার চোখে দেখে, এই বৈষম্যের কারণ কি বুঝিতে পারি নাই। এক শিক্ষিত বর্ম্মী ভদ্রলোক একবার

আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি চিটাগনিয়ান না বাঙালী। সেন্‌সস্‌ রিপোর্টেও দেখিলাম চট্টগ্রাম জিলার লোকদিগকে চিটাগনিয়ান অন্যান্য জিলার লোকদিগকে বাঙালী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। চট্টগ্রামের লোকদের এতে আপত্তি করা উচিত।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মেসের বন্ধুকে নিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। এক সরু গলির মুখে একটা রেস্তোরাঁ গোছের দোকানের সাইন বোর্ডে Bengal Burma Cabin নাম দেখিয়া দাঁড়াইলাম। অবজ্ঞার সুরে বন্ধু বলিলেন আমাদেরই একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ একটি বর্ম্মী ছুক্‌রী নিয়া এই দোকান খুলিয়াছে এখানে শুকরের মাংসও বিক্রয় হয়। কৌতূহল হওয়ায় দোকানের দরজায় উঁকিমারিয়া দেখিলাম কয়েকটা আস্ত ব্যাঙ ভাজা ও গোটা পাঁচেক অর্দ্ধ দগ্ধ হাঁস মুরগী দড়িতে টাঙাইয়া রাখা হইয়াছে—আর তার সম্মুখেই ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছে এক বর্ম্মী তরুণী। দোকানের অপর পার্শ্বে চায়ের ব্যবস্থা—কতকগুলি মাদ্রাজী মুসলমান টেবিলে চা খাইতেছে।

লা গে ছেয়া (আসুন মশায়!) বলিয়া এক মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিল। তাহার পরণে কালো রঙের লুঙ্গি, খোলা গায়ে এই রঙেরই এক গাছা সূতা ঝুলিতেছে, অনুমানে বুঝিলাম ময়লা জমিয়া পৈতে গাছটাই এই অবস্থায় পৌঁছিয়াছে কিন্তু ও হরি! এযে আমাদেরই পঞ্চানন বাঁড়ুয্যে! গ্রামের স্কুলে এক সঙ্গে ম্যাট্রিক ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম। তার পর দশ বছর পর আজ দেখা। পঞ্চাননও আমাকে চিনিতে পারিল। লজ্জার ঘোরটা কাটিয়া গেলে সমাদর করিয়া আমাকে বসাইল। তারপর আলাপের ফাঁকে তার সুখ দুঃখের কাহিনীটাও আমাকে বলিয়া গেল। কুলীন ব্রাহ্মণ—স্কুলে থাকিতেই দুইটি বিয়ে করিয়াছিল কিন্তু স্কুল ছাড়িয়াই মুস্কিলে পড়িল। সংসারের নিত্য অভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৌয়ের মুখ ঝাম্‌টা সহ করিতে না পারিয়া শেষে একদিন রাগ করিয়া বর্ম্মা মুলুকে আসিয়া হাজির হইল। এই দেশের অলিতে গলিতে ঘুরিতে ঘুরিতে বর্ম্মা কথাটাও শিখিয়া ফেলে এবং বরাত গুণে এই দোকানের মালীক বর্ম্মী যুবতীটির অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয়। এখন সে বেশ আছে—খায় দায় ফূর্ত্তি করে, রাত্রিতে বায়স্কোপ দেখে। তবে বছর দুই পূর্ব্বে একটা গুরুতর আঘাত সে পাইয়াছে। দেশের ছোট বৌটি কেমন করিয়া যেন তাহার খোঁজ পায় এবং সোজা এখানে চলিয়া আসে। পঞ্চানন তাহাকে স্থান না দিয়া পারে না। কিন্তু বর্ম্মিণী সহিবে কেন? সে দিন রাত বৌটাকে জ্বালাইতে থাকে। অবশেষে অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া গলায় ফাঁস দিয়া বেচারা আত্ম হত্যা করে। পঞ্চাননের চোখের কোণে অশ্রুকণা চক্‌ চক্‌ করিয়া উঠিতে দেখা যায়।

আর দেশে ফিরিবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় পঞ্চানন একটা ঢোক গিলিয়া বলিল—দেশে ফিরিবার তার ইচ্ছা আছে কিন্তু শুধু হাতে ত যাওয়া যায় না। প্রায় সাত আটশ' টাকা সে বাড়ী যাওয়ার জন্য জমাইয়া ছিল কিন্তু বৌটা গলায় দড়ি দিয়া মরায় স্থানীয় বাঙালীরা তার নামে মোকদ্দমা করে। তাহাদের অভিযোগ সে আর বার্ম্মিনীই নাকি বৌটাকে মারিয়া টাঙাইয়া রাখিয়া ছিল। ঐ মোকদ্দমায় ঐ সাত আশ টাকা সব খরচ হইয়া যায়। এখন টাকা জমাইতে বেগ পাইতে হইবে কারণ বর্ম্মিণীর নজর বড় কড়া। গল্প শেষ হয় আমরা উঠি। চারি পেয়ালা চা'য়ের দাম পঞ্চানন নেয় না। আমাদের সঙ্গে অনেক দূর আসিয়া হঠাৎ সে বলে—ভাই ঘৃণা করোনা, বড় হীন ভাবে আছি। কিন্তু কি করিব একদিন না খাইতে পাইয়া রাস্তায় মরিতে বসিয়াছিলাম কেহ ডাকিয়া এক ফোটা জলও দেয় নাই—এই বর্ম্মিণীর দয়াতেই বাঁচিয়া আছি। পঞ্চানন বিদায় নেয় আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসে।

পেগুর বিখ্যাত শোয়াবুদ্ধ দেখিতে গেলাম, সন্ধ্যা হইতেই মন্দিরের গায়ে হাজার বিজলী বাতি জ্বলিয়া উঠিল। এক বৃদ্ধ ফুঙ্গী ঘণ্টা বাজাইয়া স্তোত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন। বিরাট মূর্ত্তি এই বুদ্ধের, শ্বেত পাথরের এরূপ অতিকায় মূর্ত্তি। আর কোথাও আছে বলিয়া শুনি নাই। এই বুদ্ধদেবের হাতের একটি অঙ্গুলি

মাপিয়া দেখিলাম আমার হাতের পুরা সাড়ে তিন হাত। বর্ম্মার তীর্থস্থান গুলির একটা বিশেষত্ব এই যে এই সব স্থানে আমাদের দেশের মত পাণ্ডার উপদ্রব নাই, মন্দিরের মধ্যে দুই কাতারে কেবল ফুল ওয়ালী বর্ম্মিণীদের দোকানে থাকে, খুসীমত লোকে সেখান হইতে দুই চারিপয়সার ফুল ও মোমবাতি কিনিয়া নিজ হাতেই বুদ্ধদেবের সম্মুখে সাজাইয়া দেয় কোনরকম জবরদস্তি নাই। তবে রেঙ্গুনের অতিপ্রসিদ্ধ শোয়েডেগণ প্যাগোডাতে দেখিয়াছি এই তরুণী পসারিণীর দল বাঙালী যাত্রীদের নিকট বেশ একটু আব্দার করিয়া থাকে। তাহাদের কথার ছটা ও ভ্রূভঙ্গী উপেক্ষা করার মত শক্তি যাত্রীদের থাকেনা কিছু কিনিতেই হয়।

সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিতেই সবলে বলিল চলুন প্রসাদ নিতে। মগেরমুলুকেও বাঙালী বাড়ীতে শনি ঢুকিয়াছে শুনিয়া শঙ্কিত হইলাম কিন্তু যাইতেই হইল। ঘোষাল বাবু পেগুর পোষ্টমাষ্টার, খুব প্রাচীন হইয়াছেন কিন্তু দেহটা এখনও বেশ আছে। খুব লম্বা চওড়া চেহারা মুখখানা সদাহাস্যময়—দিব্যি অমায়িক পুরুষ। প্রতি শনিবারেই তিনি শনিপুজা করেন আর পেগুর সমস্ত বাঙালী প্রসাদ পান। বলাই বাহুল্য এই প্রসাদের পরিমাণ 'কণিকামাত্র' নয়। পোষ্টাফিসের উপরেই ঘোষাল বাবুর কোয়ার্টার প্রকাণ্ড বাংলোর ফ্যাসানে ঘরগুলি কিন্তু থাকেন মাত্র স্বামী স্ত্রী দুইজনে। বিশ বছর বয়সে তিনি বর্ম্মা মুলুকে আসেন এবং বিশ টাকা বেতনে কেরাণী হইয়া পোষ্টাফিসে ঢোকেন বর্ত্তমানে বেতন পান সাড়ে তিন শ। বর্ম্মার অনেক যায়গা তিনি ঘুরিয়াছেন—আগের দিনের বহু অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার কথা তিনি গল্পচ্ছলে আমাকে বলিয়া গেলেন। ঢাকা জেলায় তাহার বাড়ী কিন্তু সারাজীবনে মাত্র একবার দেশে গিয়াছিলেন। আমরা উঠি উঠি করিতেছি এমন সময় খুব জমকালো পোষাকে এক বর্ম্মী ভদ্রলোক কুলির মাথায় একটা প্রকাণ্ড সুটকেস চাপাইয়া সরাসরি উপরে আসিয়া উঠিলেন। ভদ্রলোক ঘোষাল বাবুকে ভুমিষ্ট প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলাম। ঘোষাল বাবু আমাদের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—ইনি প্রোম জেলায় ফার্ষ্ট এ্যাডিশনাল জজ। এর মাকে আমি বিবাহ করি ত্রিশ বছর পূর্ব্বে। দেশের স্ত্রী তখন সঙ্গে ছিল না। এর জন্মের আট বছর পর এর মা মারা যায় এবং একে আমি রেঙ্গুনে রাখিয়া লেখা পড়া শিখাই—এর বাঙ্গালী নাম রাখিয়াছি রাজেন্দ্র। আপনাদের যেমন জানাইলাম দেশের সকলকেও সেইরূপ এই কথাটা বলিয়াছি আর তার ফলেই দেশে যাইয়া সুস্থির থাকিতে পারি না। ঘোষাল বাবু থামিলেন এবং পরে ছেলের দিকে ফিরিয়া ব্রহ্ম ভাষাতে তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। ঘোষাল বাবুর বাম্মণী স্ত্রী ও তাহার ছেলের সম্বন্ধে আরও কিছু শুনিবার কৌতূহল রহিয়া গেল কিন্তু আর অপেক্ষা করা অশোভন মনে করিয়া উঠিতে হইল।

চলবে

শৈবলিনী

শ্রীসুরেশ চন্দ্র সেন, (এডভোকেট, হাইকোর্ট)

[গত মাসে সুরেশ বাবু প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর লিখিয়াছিলেন এবার 'শৈবলিনীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বঙ্কিম সৃষ্টিতে প্রগাঢ় নিষ্ঠা, গভীর সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টি লইয়াই লেখক বঙ্কিমচরিত্রের এই আলোচনা করিতেছেন—পাঠক পাঠিকার বঙ্কিমের অন্যান্য আলোচনার সঙ্গে এই আলোচনার পার্থক্য দেখিতে পাইবেন। ক্রমশঃ পুষ্পপাত্রে এই আলোচনা বাহির হইতে থাকিবে।]

শৈবলিনী দরিদ্রের ঘরে বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান। প্রতিবেশী বালক প্রতাপের সহিত তাহার বড় ভাব ছিল, উভয়ে এক সঙ্গে খেলা করিত, পাপিয়ার সহিত গলা মিলাইয়া শৈবলিনী গান করিত, ফুলের মালা গাঁথিয়া কাহাকে পরাইবে তাহা লইয়া বিবাদ করিত, মধুর শৈশবে শঙ্কাহীন, ভাবনা শূন্য দিনগুলি পরস্পরের সাহচর্য্যে তাহাদের পক্ষে মধুরতর হইয়া উঠিত।

কোমল বয়সেই বালিকার চিত্তে প্রণয়ের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। সংসারানভিজ্ঞা বালিকা মনে করিত প্রতাপের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। যখন জানিল সে বিবাহ হইবার নয়, তখন আর তাহার ফিরিবার উপায় নাই, প্রতাপের বিচ্ছেদে তখন জীবন নিরর্থক, বিড়ম্বনা মাত্র, তাই উভয়ে সিদ্ধান্ত করিল গঙ্গার জলে দুর্ব্বহ ভার বিসর্জ্জন দিবে। কিন্তু কার্য্যকালে শৈবলিনী মরিতে ভয় পাইয়া কূলে ফিরিয়া আসিল। প্রতাপেরও মরা হইল না, চন্দ্রশেখর তাহাকে রক্ষা করিলেন। তারপরে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তাহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। শৈবলিনীর জীবনে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

আট বৎসর চন্দ্রশেখরের ঘর করিয়াও গৃহে শৈবলিনীর মন বসিল না। প্রতাপ তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া ছিল, আট বৎসর পরে সে প্রতাপের সহিত মিলন কামনায় কুলের বাহির হইল। প্রথম যৌবনে একবার গঙ্গায় ডুবিতে গিয়াছিল, ভরা যৌবনে আবার কলঙ্ক ও বিপদ সাগরে ঝাঁপ দিল। কিন্তু এবার আত্মবিসর্জ্জনের জন্য নহে, আত্মপ্রতিষ্ঠাই তাহার দুরূহ পণ।

এই জন্য শৈবলিনী সকলের চক্ষে পাপিষ্ঠা। প্রতাপ ও সুন্দরী তাহাকে সহস্রবার পাপিষ্ঠা বলিয়া গালি দিয়াছেন; রমানন্দ স্বামী পর্য্যন্ত তাহাকে লইয়া বিব্রত "এ পাপিষ্ঠা কাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল?" শৈবলিনী নিজেও চন্দ্রশেখরকে বলিতেছে—"প্রতাপকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম, এজন্য আমি সাধ্বী নই, মহা পাপিষ্ঠা।"

শৈবলিনীর পাপ, সে কুলত্যাগিনী, পরপুরুষে অনুরাগিণী। সেই অনুরাগ বশে প্রণয় পাত্রের সহিত মিলনের জন্য সে অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সমাজ শাসন, ধর্ম্মপত্নীর কর্ত্তব্য, রমণী সুলভ লজ্জা, সমস্তই সে অদম্য ভোগ পিপাসার নিকট বলি দিয়াছিল। এই পাপের মূলে ছিল তাহার অতৃপ্ত সুখ লালসা এবং আত্ম সংযমে অক্ষমতা অথবা অনিচ্ছা।

স্বামীর প্রেমে তাহার অন্তরের ক্ষুধা মেটে নাই অথবা আদৌ সে স্বামীর প্রেম কামনা করে নাই। তাহার অন্তরে প্রতাপ ব্যতীত অন্য কাহারও স্থান ছিল না। অন্ধ প্রবৃত্তির দমন, অথবা উচ্ছৃঙ্খল চিত্তবৃত্তির সংযম করিবার আবশ্যকতা তাহার মনে হয় নাই। আপনার উদ্দাম প্রেমকে সার্থক করিবার আশায় সে সুপথ কুপথ জ্ঞানশূন্যা হইয়াছিল। স্বামীর প্রেমে তাহার আস্থা ছিল না। প্রতাপের প্রতি আকর্ষণ ছিল প্রবল, গঙ্গায় ডুবিয়া মরা সংক্রান্তে প্রতাপের নিকট আপনার পরাজয়ের লজ্জাও ছিল বলবতী, তাহার আবেগ বাধা মানিল না, তাহার উপর প্রতাপ চরিত্রের অন্ততঃ একটা দিক তখন পর্য্যন্ত শৈবলিনীর অজ্ঞাত ছিল। কামনার পরিতৃপ্তি ভিন্ন সংসারে মানুষের অন্য কর্ত্তব্য থাকিতে পারে তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। মোহ চালিত হইয়া শৈবলিনী গৃহত্যাগ করিল, কিন্তু এত করিয়াও তাহার কামনা পূর্ণ হইল না, বড় আক্ষেপেই তাহাকে বলিতে হইয়াছিল "অনর্থক কলঙ্ক কিনিলাম, জাতি হারাইলাম, পরকাল নষ্ট করিলাম।"

প্রতাপের সাক্ষাৎলাভের ভরসায় শৈবলিনী তাহার দুই চোখের বিষ যে ফিরিঙ্গি তাহার কবলে ধরা দিয়াছিল, সাক্ষাৎ তাহার মিলিয়াছিল, প্রতাপই ফিরিঙ্গির হস্ত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিলেন, প্রতাপের গৃহে, শৈবলিনীর চির আকাঙ্ক্ষিত নীড়ে, তাহার আশ্রয় মিলিল, অভীপ্সিত স্থান কাল পাত্র সকলই জুটিয়াছিল, অদৃষ্টের পরিণামে এই সংযোগই হইল শৈবলিনীর সকল আশা মূলোচ্ছেদের নিদান। প্রতাপের মুখে শৈবলিনী শুনিল, সে পাপিষ্ঠা, তাহার মুখ দর্শনেরও অযোগ্য, তাহার মরাই উপযুক্ত কেবল স্ত্রীলোক বলিয়াই প্রতাপ তাহাকে বধ করেন নাই, আরও শুনিল, তাহার বিষের ভয়ে প্রতাপ বেদ গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে। লোকনিন্দা ও গঞ্জনা তুচ্ছ করিয়া, এত বিপদ পার হইয়া আট বৎসর পরে প্রথম সাক্ষাৎ কালে প্রণয়ীর নিকট এই সম্ভাষণ শৈবলিনী লাভ করিল। দীনতার বিনিময়ে উগ্রতা, সজল আঁখির পরিবর্ত্তে রক্ত আঁখি, প্রেম নিবেদনের ফলে তীব্র তিরস্কার ইহাই তাহার অদৃষ্ট লিপি। শৈবলিনী প্রতাপের দান মাথা পাতিয়া লইল, সব সহ্য করিয়া রহিল। কিন্তু যে তাহার সকল দুর্দ্দশায় হেতু, যাহার জন্য সে গৃহধর্ম্মচ্যুত দুঃখিনী, সেই প্রতাপ যখন বড় গলা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল-"আমি তোমার কি করিয়াছি ?" তখন তাহার সহ্য হইল না, শৈবালিনী গর্জ্জিয়া উঠিল। হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত উন্মুক্ত করিয়া দেখাইল, প্রতাপ তাহার কি করিয়াছে। প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে স্থান হইতে তিনি পলায়ন করিলেন। শৈবলিনীর সকল আশা নির্ম্মূল হইল।

শৈবলিনীর রোপিত বিষবৃক্ষে ফল ধরিতেছিল, ইংরাজের হাতে প্রতাপ বন্দী হইলেন।

তখন একাকিনী বসিয়া শৈবলিনী নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিল। প্রতাপ তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, জীবনে এখন তাহার প্রার্থনীয় কিছু নাই, অহরহ মৃত্যু কামনা করিতেছে, তাই তাহার চিত্ত ভয় শূন্য। সে মরিবে, কিন্তু প্রতাপকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার কি হয় তাহা না জানিয়া মরিতে পারিবে না।

পর দিন নবাবের লোক আসিয়া যেমন ভ্রমে শৈবলিনীকে দরবারে লইয়া গেল। বিপদে মুহ্যমান হইবার পাত্রী শৈবলিনী ছিল না। তাহার সাহস, বুদ্ধি, চাতুর্য্য সবই অনন্য স্ত্রী-সুলভ, তাহার রূপ অতুলনীয়, সেই রূপের মূল্যও সে জানিত, সর্ব্বোপরি বলবৎ ছিল তাহার মজ্জাগত একটা বে পরোয়া ভাব। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। বাঙ্গালার নবাবকে রূপের ছটায় ও বাক্য কৌশলে মুগ্ধ করিয়া আপনার সঙ্কল্প সিদ্ধির সহায় করিয়া লইল। তাহার পর যে কৌশলে আমিয়টের নৌকা হইতে প্রতাপের উদ্ধার সাধন করিল তাহা কেবল শৈবলিনীর পক্ষেই সম্ভব।

তাহার পর প্রতাপের সহিত গঙ্গায় সন্তরণ ও শৈবলিনীর শপথ গ্রহণ, কবি কল্পনার অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

শপথ গ্রহণে শৈবলিনীর সমস্ত আশা ভরসার সমাধি হইল, সত্য সত্যই সর্ব্ব কামনা ত্যাগ করিয়া সে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীবের মতই সংসারের নিকট হইতে পলাইয়া গেল। সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া শৈবলিনী মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু তাহার মৃত্যু হইল না কামনা ত্যাগের সহিত কামনা জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। সে প্রায়শ্চিত্ত অতি ভীষণ। কবিবর্ণিত মরণের পরে অনির্দ্দিষ্ট নরক ভোগ নহে, জীবনেই প্রত্যক্ষ নরক ভোগ।' চেতনে অচেতনে কেবল নরক দর্শন করিয়া প্রবল দুঃখের আগুনে খাঁটী সোনা হইয়া শৈবলিনী বাহির হইল, আপনাকে ভুলিয়া সে স্বামীকে চিনিল। কঠোর তপস্যায় শুদ্ধ হইয়া শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের গৃহিণী হইবার যোগ্যতা লাভ করিল।

(২)

শৈবলিনীর জীবন জটীল সমস্যা পূর্ণ, এই সমস্যার সমবায়ে তাহার পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত, তাহার পতন ও উত্থান মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম সমস্তই সংঘটিত হইয়াছে। হোক সে সকলের চক্ষে পাপিষ্ঠা, তথাপি একথা ভুলিলে চলিবে না যে অবস্থা বিপর্য্যয়ে তাহাকে পাপে প্রণোদিত করিয়াছিল। শৈবলিনীর জীবনেতিহাস আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিলে গ্রন্থকারের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি এবং সৃষ্টি কৌশল আমাদিগকে বিস্মিত করে।

সংসার জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বেই শৈবলিনীর মনে প্রতাপের প্রতি আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। খেলার সাথীর জন্য অপাপবিদ্ধ বালিকা-চিত্তের স্বাভাবিক ভালবাসা, কোন বাসনা, কোন কামনার আবিলতা তাহাতে স্পর্শ করে নাই। কালে অঙ্কুর হইতে বৃক্ষের মত বালিকার ভালবাসা যুবতীর প্রণয় রূপে দেখা দিল। কিন্তু প্রণয় পাত্রের সহিত তাহার মিলন হইল না। একের প্রতি আসক্তি অন্তরে পোষণ করিয়াও বাধ্য হইয়াই শৈবলিনী অপরের সহিত পরিণীতা হইল। শৈবলিনীর ন্যায় অসামান্যা রূপবতী বুদ্ধিমতী দৃঢ়চিত্তা নারী, প্রতাপকেও এক দিন স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বাঘের যোগ্যা বাঘিনী—প্রতাপের সহিত বিবাহ সম্ভব হইলে আদর্শ গৃহিণী রূপে তাহাকে আমরা দেখিতে পাইতাম।

বিবাহের পরেও শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিতে পারিল না। স্বামীর সহিত তাহার হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল না, যেদিন গঙ্গাগর্ভে প্রতাপকে মৃত্যুর দ্বারে পরিত্যাগ করিয়া শৈবলিনী ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই দিন হইতে অসীম লজ্জায় সে আর প্রতাপকে মুখ দেখাইতে পারে নাই—কিন্তু বিবাহের পরে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বেই শৈবলিনীর প্রেম ছিল অতি গভীর। তাহার উপর এই একটা অপরাধের কুণ্ঠা তাহার প্রেমকে নিবিড়তর করিয়া তুলিল। প্রতাপের সহিত চির-বিচ্ছেদের বেদনা যখন প্রবল, সেই অবস্থায় উভয়ের সাক্ষাতে শৈবলিনীর হৃদয়ে আগুন জ্বলিল। সে আগুন নির্ব্বাণ করিবার মত সম্বল শৈবলিনীর ছিল না। চন্দ্র-শেখরের নিকট সে তাহা পায় নাই।

স্বামীর গৃহে দীর্ঘ আট বৎসর কাল শৈবলিনী আপনার জীবন সুখের বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। তাহার চিত্ত স্বামীর প্রতি নির্লিপ্ত এবং নিজের প্রতি স্বামীর প্রেমের পরিচয় ও কোন দিন পায় নাই। সুন্দরী তাহাকে গৃহে ফিরাইবার চেষ্টা করিলে সে বলিয়াছিল—"কোন সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়া যাইব—ন পিতা ন মাতা ন বন্ধু।" স্বামীর সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস—"আমি তাঁহার কেহ নহি, পুঁথিই তাঁহার সব। তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না।" নিজের মনের কথা—"তাঁহাকে আমি কখনও ভালবাসি নাই, কখনও ভাল বাসিতে পারিব না।"

কিন্তু শৈবলিনী যাহাই বলুক, চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে তাহার চিত্ত উদাসীন ছিল না। তাঁহাকে ভাল না বাসুক, ভক্তি করিত, পরিত্যাগ করিয়া গেলেও বেদ-গ্রামের গৃহের প্রতি তাহার অকৃত্রিম মমতা ছিল। প্রতাপের নিকট নিষ্ঠুর প্রত্যাখানের আঘাতে আশা-ভঙ্গ হইয়া যখন শৈবলিনী মৃত্যু কামনা করিতেছিল, তখন তাহার মনে পড়িল অন্তিমের আশ্রয়, বেদগ্রামের গৃহ, মরিতে হয় বেদগ্রামে গিয়া মরিব। সেখানে তাহার স্বহস্ত রোপিত পুষ্প বৃক্ষ, তুলসীমঞ্চ,পালিত পক্ষিটি, কতকি মনে পড়িল; সে চন্দ্রশেখরের জন্য পূজার আয়োজন করিয়া রাখিত। ভীমাতটে সুগন্ধি বায়ু সেবন করিত, বাপী তীরে কোকিল ডাকিত।

কুলনারীর পক্ষে স্বামীত্যাগ করিয়া কুলের বাহিরে আসিবার যে অপরাধ তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধেও শৈবলিনীর চিত্ত সচেতন। তাহার মনে হইয়াছে। "যিনি আমার স্বামী তাঁহাকে কি বলিয়া মরিব? "কথা ত মনে করিতে পারি না। মনে করিলে বোধ হয়, আমাকে শত সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করে, শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে।" তাহার মনে "একবার নিতান্ত সাধ হয়। সেই কথাটি কেহ আসিয়া বলে, তিনি কেমন, কি করিতেছেন। তাঁহাকে আমি কখনও ভালবাসি নাই, কখনও ভাল বাসিতে পারিব না। তথাপি তাঁহার মনে যদি কোনও ক্লেশ দিয়া থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হইল।"

বেদগ্রাম ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এত কথা এমন করিয়া চিন্তা করিবার শক্তি শৈবলিনীর ছিল না। কারণ, তখন তাহার সুখের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। প্রবৃত্তি বেগবতী, তাহাতেই তাহাকে গৃহে ছাড়িবার প্রেরণা দিয়েছিল। সুন্দরীর ভাষায়, সে "অন্ধের অধিক অন্ধ।" চন্দ্রশেখরের হৃদয়ে প্রেমের অভাব ছিল না। বিশুদ্ধ, প্রগাঢ় এবং সর্ব্বাবস্থায় হ্রাসহীন যে প্রেম তাহাতে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। শৈবলিনীর সহস্র অপরাধেও তাহা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কিন্তু শৈবলিনী এই সুপ্ত মধুধারার সন্ধান পায় নাই,

সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল তাহার স্বামী হৃদয়হীন পুঁথি সর্ব্বস্ব। সেই জন্যই, যাহার মত স্বামী নারী জন্মে দুর্ল্লভ তাহার পত্নী হইয়াও সে সুখী হইতে পারে নাই, দুর্লভ ভালবাসার অধিকারিণী হইয়াও তাহার হৃদয় বুভুক্ষিত।

হৃদয়ের এই প্রেম বুভুক্ষাকে শৈবলিনী সংযত করিতে পারে নাই, এবং সংযমের অভাবই তাহার নিজের অপরিসীম দুর্গতি। চন্দ্র শেখরের মর্ম্মান্তিক ক্লেশ, প্রতাপের আত্মাহুতি এ সকলের মূল ইহা সত্য। শৈবলিনীর হৃদয় মধ্যে প্রতাপের যেখানে স্থান, প্রতাপের হৃদয় মধ্যে শৈবলিনীর স্থান তদপেক্ষা নিম্নে ছিল না। শৈবলিনী প্রতাপাসক্ত হৃদয় লইয়া চন্দ্রশেখরের পত্নী, প্রতাপও শৈবলিনীময় জীবিত হইয়া রূপসীর স্বামী, অবস্থা উভয়েরই তুল্য। পার্থক্য তাহাদিগের বিভিন্নমুখী চিত্ত বৃত্তিতে। প্রতাপ আত্মজয়ী তিনি কামনা সংযত করিয়াছেন, এবং ইহার জন্য যে প্রচণ্ড বলের প্রয়োজন তাহার অধিকারী বলিয়া মনুষ্য মধ্যে প্রতাপ দেবতা। শৈবলিনী যদি প্রতাপের মত নিজের প্রবল সুখলালসাকে সংযত করিতে পারিত, প্রেমকে ভোগের পথে না লইয়া ত্যাগের পথে চালিত করিত, তাহা হইলে হয় ত তাহাকে দেবী আখ্যা দেওয়া চলিত, কিন্তু তাহা পারে নাই বলিয়াই তাহাকে পিশাচী বলা চলে না। জীবন যুদ্ধে তাহার পরাজয় বিশ্ববিজয়ী অনঙ্গ দেবের নিকট। কুলবধূ হইয়া একজন বিজাতীয় ফিরিঙ্গি যুবককে প্রণয়ের ভাণে মুগ্ধ করিয়া কুলের বাহিরে যে ভাসিয়া যায়, পতিব্রতার গৌরবে সে নারী বঞ্চিত, সন্দেহ নাই, তাহার অবিমৃষ্যকারিতা যতই নিন্দনীয় হো'ক, প্রথম প্রেমের একনিষ্ঠতার জন্য যদি কোন গৌরব থাকে তবে তাহাতে শৈবলিনীর দাবী অকাট্য।

প্রেম মানব হৃদয়ের সনাতন ধর্ম্ম, প্রেমাস্পদের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষা মানবচিত্তের সনাতন বৃত্তি, এবং একনিষ্ঠতায় প্রেমের গৌরব। স্বামীর নিকট অবিশ্বাসিনী হইলেও শৈবলিনীর প্রথম প্রেমের একনিষ্ঠতার হানি হয় নাই। সেই প্রেমই কবচের মত তাহাকে বিপদের হতে রক্ষা করিয়াছে।

শৈবলিনী পাপিষ্ঠা হো'ক, কলঙ্কিণী হোক, তাহার পতনের জন্য দায়িত্ব চন্দ্রশেখরেরও সামান্য ছিল না। শৈবলিনী অন্ধ, কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহার চক্ষু ফুটাইতে চেষ্টা করেন নাই, আংশিকরূপে তিনি নিজেও অন্ধ।

চন্দ্রশেখরের প্রেম যতই গভীর হো'ক অপার্থিব, সুষমা মণ্ডিত হো'ক তাহার অভিব্যক্তি ছিল না। তিনি কোন দিন শৈবলিনীর হৃদয় জয় করিবার চেষ্টা করেন নাই, আপনাকে শৈবলিনীর অযোগ্য স্বামী বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত থাকিতেন। সেই জন্যই শৈবলিনী তাঁহাকে উদাসীন এবং আপনাকে স্বামীপ্রণয় বঞ্চিতা ধারণা করিয়া বসিয়াছিল।

শাস্ত্র-চর্চ্চা নিরত আত্মসমাহিত স্বামীর উচ্ছ্বাসহীন প্রেম শৈবলিনীর হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার অন্যতম কারণ সে পূর্ব্ব হইতেই অন্যাসক্ত। কিন্তু শৈবলিনীর হৃদয় যে উপাদানে গঠিত, তাহাতে যদি চন্দ্রশেখর এই বিশুদ্ধ প্রেমের সম্ভার শৈবলিনীর হৃদয় দ্বারে উন্মুক্ত করিয়া ধরিতেন, তাহা হইলে শৈবলিনী তাহার অপমান করিতে পারিত না। যদি অকৃত্রিম আদরে সোহাগে, মান অভিমানে, প্রণয় কলহে তাহার হৃদয়ের রিক্ততা পূর্ণ করিয়া তুলিতেন, যদি শৈবলিনীকে বুঝিতে দিতেন যে তাহারা পরস্পরের সুখ দুঃখের অংশী, তাহা হইলে সময়ে শৈবলিনী তাহার উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখিত। সকল নারীই আপনাকে স্বামীর প্রীতিদায়িনী জানিয়া গৌরববোধ করে, স্বামীর অনুরাগ ও আদর তাহার কাম্য—না পাইলে তাহার নারীহৃদয়ে আঘাত লাগে, কিন্তু শৈবলিনী আপনাকে স্বামীর উপেক্ষার পাত্রী বলিয়া জানিত। চন্দ্রশেখরের হৃদয় জয় করিবার জন্য ব্যগ্রতা তাহার না থাকুক, কিন্তু স্বামীর উপেক্ষা অথবা ঔদাসীন্য কোন অবস্থাতেই নারীর প্রীতিকর হইতে পারে না। চন্দ্রশেখরকে তাহার বাহ্যিক ব্যবহারে শৈবলিনী সংসার নির্লিপ্ত মহাপুরুষ স্বরূপে দেখিয়াছে; আপনাপেক্ষা উচ্চতর লোকবাসী শ্রেষ্ঠতর জীবকে ভক্তি করা চলে, পূজা করা চলে, কিন্তু তাহাকে লইয়া ঘর করা চলে না। সন্তানহীনা নারীর সংসারে অন্য বন্ধনও ছিল না। তাহার উপর আরও একটি কথা, চন্দ্রশেখরের মাতা পূর্ব্বেই গত হইয়াছিলেন,

তাহার নিজের মাতাও কন্যাকে স্বামী গৃহে পাঠাইয়া অধিক দিন জীবিত ছিলেন এরূপ মনে করিবার হেতু পাই নাই। পিত্রালয়ে মাতার অভাব এবং স্বামীগৃহে শ্বশ্রূর অভাব বধূ জীবনের একটী পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। শৈবলিনীর জীবনের ধারা সুনিয়ন্ত্রিত করিবার কেহই ছিল না।

এই ভক্তিভাজন দেবতার অন্তরে ক্লেশ দিয়া শৈবলিনীর অনুতাপের সীমা ছিল না, আমরা দেখিয়াছি অপরাধের গুরুভারে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর উপেক্ষা প্রকৃতপক্ষে কল্পিত হইলেও তাহার চক্ষে সত্য ভিন্ন অন্যথা ছিল না, তথাপি স্বামীর প্রতি শৈবলিনীর এই ভক্তি বস্তুতই তাহার প্রাণের জিনিস।

চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে উপেক্ষা করা দূরে থাকুক, অতিমাত্রায়ই স্নেহ করিতেন, কিন্তু তাহার বাহ্যিক আচরণের যে দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি তাহা নারী-হৃদয়ের প্রেমকে জানাইবার পক্ষে অনুকূল নহে।

একদিন লরেন্স ফষ্টরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুকুর ঘাট হইতে ঘরে ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, শৈবলিনীর শঙ্কা হইল, না জানি বিলম্ব দেখিয়া স্বামী কত উদ্বিগ্ন হইতেছেন। গৃহে ফিরিয়া সে দেখিল, তিনি শঙ্কর ভাষ্যে নিমগ্ন, অত রাত্রি পর্য্যন্ত স্ত্রীর অনুপস্থিতি লক্ষ্য মাত্র করেন নাই। মনে পাপ ছিল, গায়ে পড়িয়া শৈবলিনী কৈফিয়ত দিতে গেল, কলহাস্যে স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার কথা স্বামীর কর্ণে স্থান পাইল না, অন্যমনস্কভাবে তিনি বলিলেন "আর আসিও না।" আত্মভোলা স্বামীকে ভুলান কষ্টসাধ্য ছিল না, তবুও তাহাকে ভুলাইতে হইবে এই প্রয়োজন বোধটাই শৈবলিনীর অস্বস্তি জনক হইয়াছিল, কিন্তু যখন সে দেখিল এই ছলনার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না, তাহার আচরণের প্রতি মন দিবার অবসর স্বামীর নাই, এতই সে উপেক্ষার পাত্রী, তখন তাহার নারীগর্ব্ব আহত হইবারই কথা।

কেহত তাহাকে বলিয়া দেয় নাই, উপেক্ষা পাত্রী সে সত্যই নহে বরং পরম বিশ্বাসের পাত্রী বলিয়াই স্বামী তাহার সম্বন্ধে বিকার শূন্য। তাহার জীবনের ব্যর্থতায় স্বামীর অন্তর মধ্যে কি গভীর বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে তাহা তিনি নিজেও কোন আভাসে জানিতে দেন নাই। আমরা দেখিয়াছি, সেই দিনই গভীর রাত্রে পুঁথি বাঁধিয়া রাখিয়া চন্দ্রশেখর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বাতায়ন পথে চন্দ্রালোক আসিয়া নিদ্রিতা পত্নীর সুষুপ্তি সুস্থির মুখখানি উদ্ভাসিত করিতেছিল, চন্দ্রশেখর তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার অন্তর অনুশোচনায় ভরিয়া গেল, আপনাকে তিনি ধিক্কার দিলেন—"আমি নিতান্ত আত্মসুখ পরায়ণ × × সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবন তাপে দগ্ধ করিবার জন্য বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম ?" শৈবলিনী জানিল না, কয়েকদণ্ডমাত্র পূর্ব্বে যাহার নির্ম্মম উপেক্ষার কল্পনা বুকে লইয়া সে আপনার ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেছিল, সেই সংযমী পুরুষ তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া, তাহারই দুঃখে অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন!

আমরা আরও দেখিয়াছি, মুরশীদাবাদ হইতে ফিরিবার পথে শৈবলিনীর পীড়ার কল্পনা মাত্র মনে হইতে চন্দ্রশেখর আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছেন, গঙ্গাবক্ষে ফষ্টরের বজরার কক্ষমধ্যে শৈবলিনী স্বপ্নেও তাহা কল্পনা করিতে অক্ষম ছিল।

শৈবলিনী ব্যর্থ প্রণয়ে ভাগ্য বঞ্চিতা, সুখলালসাময়ী যুবতী, চন্দ্রশেখর আত্মসমাহিত তত্ত্ব জিজ্ঞাসু সংযত প্রৌঢ় পুরুষ এক জনের অন্যাসক্ত হৃদয়কে অপরের উচ্ছ্বাস বিহীন প্রণয় স্পর্শ করিতে পারিল না। জ্ঞাতিকন্যা হইয়াও সুন্দরী চন্দ্রশেখরকে চিনিয়াছিল, আট বৎসর একত্র বাসেও শৈবলিনী তাঁহাকে চিনিল না, ইহার অপরাধ একা শৈবলিনীর নহে; সে প্রতাপের প্রণয়ে অন্ধ হইয়াছিল, আবার চন্দ্রশেখরও সযত্নে আপনাকে দূরে রাখিয়াছিলেন তাহার নিকট ধরা দিলেন না কেননা কষ্টসঞ্চিত গ্রন্থরাশি অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়া রমণীমুখপদ্মকে জীবনের সারবস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রণয় আকাঙ্ক্ষা এবং জ্ঞান পিপাসা উভয়ই মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম একের জন্য অপরকে বিসর্জ্জন না দিয়া উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার মত শিক্ষা চন্দ্রশেখরের ছিল না। চন্দ্রশেখর তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন গ্রন্থরাশিকে অগ্নিতে আহুতি দিয়া, শৈবলিনীও দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিয়াছে আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া।"

ভুল দুই জনেই করিয়াছেন, দুইজনকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। এক দিন ক্লেশ সঞ্চিত পুস্তক রাশির পরিবর্ত্তে রমণীমুখপদ্মকে ইহজন্মের সারভূত করিবার চিন্তা মাত্রে চন্দ্রশেখর "ছি-ছি" বলিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার দুই দিন না যাইতে গৃহ প্রাঙ্গণে অগ্নি জ্বলিল, বহুযত্নে রক্ষিত, বহুকাল হইতে অধীত অমূল্য গ্রন্থরাশি তাহাতে ভস্ম হইয়া গেল; কেবল ইহাই চন্দ্রশেখরের পক্ষে গুরুতর শাস্তি, তাহার উপর শৈবলিনীর নরক যন্ত্রণার অংশ হইতেও তিনি মুক্তি পান নাই।

চন্দ্রশেখর গৃহী হইয়াও সংসার বিরাগী ছিলেন ইহাতে সংসারিক কর্ত্তব্যে তাহার ক্রটী না ঘটিয়া পারে না। সংসারে দুঃখ ভোগের মধ্যে ভিন্ন যে শিক্ষালাভ হয় না, আজীবন জ্ঞান চেষ্টার মধ্যে সেই শিক্ষারই ছিল তাহার অভাব, চরম দুঃখের ভিতর দিয়া সেই শিক্ষা তাঁহাকে লাভ করিতে হইয়াছিল। শিক্ষার আবশ্যকতা শৈবলিনীরও ছিল। প্রতাপের নিকট শপথ গ্রহণ করিয়া পলাইয়া আসিবার পর যে শৈবলিনীকে আমরা দেখি, সে আমাদিগের পরিচিতা, মুখরা, বুদ্ধি জ্বালা প্রদীপ্তা শৈবলিনী নহে সে ভাগ্য বিড়ম্বিতা; সর্ব্বস্বরিক্তা কাঙ্গালিনী, তাহার যত্ন আত্মপ্রতিষ্ঠায় নহে, আত্ম গোপনে; কেবল লোক সমাজ হইতে অথবা প্রতাপের নিকট হইতে নয়, আপনার নিকট হইতে আপনাকে সে লুকাইতে চায়। তাহার পর আরম্ভ হইল মনোনরকের ভীষণ অগ্নি দাহ। তাহার পর তাহাকে পাইলাম বহ্নি বিশুদ্ধা, তপঃকৃশা ভক্তিমতী প্রেমময়ী শান্ত রমণী মূর্ত্তি।

৪

প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতি নর নারীর মিলনে, অন্তরে বাহিরে পরস্পরের নিকট আত্ম সমর্পণে। সমাজের চক্ষে ক্ষেত্র বিশেষে এই প্রকার মিলন নানা কারণে অমঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত, সুতরাং নিষিদ্ধ। সমাজের মঙ্গলই এই নিষেধের উদ্দেশ্য। মানবসমষ্টি লইয়া সমাজ, অনেক সময় সমষ্টির হিতের জন্য ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা এবং কার্য্যের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে হয়। হয়ত কাহারও প্রতি ইহাতে পীড়ন ঘটে, তথাপি ইহা অপরিহার্য্য। আবার কালের গতি অনুসারে অনেক সময় সমাজ বিধানেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়—নতুবা তাহা হিতের পরিবর্ত্তে অহিতকর হইয়া উঠে। পরিবর্ত্তন সংস্কারকের কার্য্য।

মানুষে অনেক সময় কোন বিশেষ সামাজিক বিধানের অর্থ না বুঝিয়াও অন্ধ ভাবে তাহার অনুবর্ত্তন করে, ইহার ফলে, অনেক অহিতকর বিধান যাহা লোপ পাওয়া উচিত তাহাও চলিতে থাকে, আবার সংস্কারকও অনেক সময় ভ্রান্ত বুদ্ধি অথবা সংস্কারের মোহবশত সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। কিন্তু যে প্রকারেই হউক লঙ্ঘিত হইলে সমাজ লঙ্ঘনকারীকে ক্ষমা করে না।

হিন্দু সমাজে সগোত্র নরনারীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে জ্ঞাতি কন্যার সহিত যদি কোন পুরুষের প্রণয় জন্মে তবে সমাজ বিধান তাহাদিগের মিলনের পথে অন্তরায় হইবে। অথচ তাহাদিগের মিলন না ঘটিলে হয়তো দুইটী নরনারীর জীবন চির দিনের মত ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে।

প্রতাপ এবং শৈবলিনীকে লইয়া এইরূপ একটি সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু সমাজ সংস্কারক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ধর্ম্মোপদেষ্টা, নীতি শাস্ত্রবিদ দার্শনিক, এবং এই সমস্যার সমাধান তদনুরূপই করিয়াছেন।

প্রতাপ এবং শৈবলিনীর মধ্যে যে প্রেম তাহার পরিণতি, হয় সমাজের নিকট আত্মবলি দানে, না হয়, সমাজ বিধানকে লঙ্ঘনে, তৃতীয় পন্থা ইহাদিগের ছিল না। নিকলুষ হৃদয়ে স্বভাবজাত অঙ্কুরের স্বাভাবিক বিকাশ, ক্ষণিকের মোহ মাত্র নহে। ক্রমে তাহারা উপলব্ধি করিল, মিলন ভিন্ন তাহাদিগের জীবনে সার্থকতা নাই, অথচ সমাজে বাস করিয়া তাহাদিগের মিলনেরও উপায় নাই। বিধাতা যাহাদিগকে মিলাইয়া দিয়াছেন মানুষ তাহাদিগকে পৃথক করিতে চায়, সেই জন্য তাহারা আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিল। কারণ বয়োধর্ম্মে তখন আসঙ্গ লিপ্সা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহারা বন্ধন চায়। জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্মকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই অথচ সমাজের নিষেধ লঙ্ঘন না করিয়া আত্মতৃপ্তির উপায় নাই, তাই ইহলোকে সমাজকে ফাঁকি

দিয়া তাহারা পর লোকের পথে পথিক হইয়াছিল, কিন্তু বিধাতা তাহাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা করিলেন। শেষে সমাজ বিধানেরই জয় হইল অন্যত্র তাহাদিগের বিবাহ হইয়া গেল। তাহাদিগের মিলনের পথে বাধা আরও ঘনীভূত হইল।

এইরূপে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহাদিগের বিভিন্নমুখী চিত্তবৃত্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতাপ এবং শৈবলিনীকে বিভিন্ন স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গেল। প্রতাপ সংযমী এবং সবল হৃদয়, তিনি সমাজ এবং বন্ধু জনের প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া অমানুষিক বেগে হৃদয়াবেগ সংবরণ করিলেন, তাঁহার প্রেমের পূত ধারা অন্তঃসলিলা সরস্বতীর ন্যায় অন্তরের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিল। কিন্তু শৈবলিনী আপনাকে বলি দিয়া সমাজ ও স্বামীর নিকট আপন কর্ত্তব্য নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না। আপনার সহিত যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হইয়া অবশেষে একদিন অকূলে ভাসিল। একের লক্ষ্য হইল সংযমে ও আত্মত্যাগে অপরের লক্ষ্য হইল সম্ভোগে ও আত্ম প্রতিষ্ঠায়।

উভয় আদর্শের মধ্যে প্রথমটির শ্রেষ্ঠতা গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন মানব সমষ্টির হিতের জন্য সমাজের যে বিধি ও নিষেধ, একের তৃপ্তি জন্য তাহা উল্লঙ্ঘন করিলে ফলে মঙ্গল হইতে পারে না, কারণ, ব্যক্তি বিশেষের কৃত কার্য্যের ফল তাহার নিজ জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, তাহা সুদূর প্রসারী। ইহা জানিয়াই তিনি শৈবলিনীর প্রবৃত্তির অগ্নিতে ইন্ধন না যোগাইয়া প্রথমতঃ নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানের আঘাতে তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন এবং পরে কঠোর প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। শৈবলিনী বন্ধন গ্রহণ করিল বটে কিন্তু সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য বোধে অথবা অধর্ম্মভয়ে নয়, প্রতাপের জীবনরক্ষার জন্যই সে বন্ধন স্বীকার করিয়া লইল। তাহার কল্যাণের জন্য প্রতাপকে জীবন বিসর্জ্জনে বদ্ধ সঙ্কল্প দেখিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্যই এই প্রথম সে আপনাকে সংযত করিল, আপনার সুখ, শান্তি, আশা, আকাঙ্ক্ষা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া সেই দিন শৈবলিনী মরিল।

আবার সেই মৃত্যুর মধ্যেই শৈবলিনী নব জন্ম লাভ করিল। কেবল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিই যথেষ্ট নহে, অপরাধিনীকে কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত না করাইলে মঙ্গল বিধান সিদ্ধ হয় না, ক্ষমার মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয়। তাই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইতে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। সেই প্রায়শ্চিত্তের আগুনে তাহার সকল মলিনতা দূর হইল, চন্দ্রশেখরের ক্ষমাময় স্নেহস্পর্শে সে স্নিগ্ধতা লাভ করিল, হিতবুদ্ধি জাগরিত হইলে সে আপনার কর্ত্তব্যের সন্ধান পাইল, প্রতাপকে বলিল পূর্ব্ব কথা সকল স্বামীকে বলিয়া তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইবে।

আপনার ভ্রম উপলব্ধি হইলে শৈবলিনী আরও বুঝিল নারী চিত্ত বড় দুর্ব্বল এবং দুর্ব্বলতাই অমঙ্গলের নিদান বুঝিয়া সে প্রতাপকে অনুরোধ করিল তুমি জীবনে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। পরের মঙ্গল কামনায় প্রতাপ আত্ম বিসর্জ্জন করিলেন। ভোগের সংসারে ত্যাগের মহিমা প্রচারিত হইল।
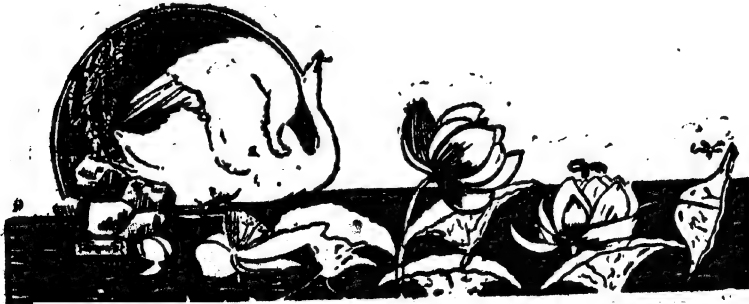
দেশপ্রিয়ের সঙ্গে কয়দিন

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

[দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের স্মৃতিকথা সকলেরই প্রিয়—কারণ তাঁহার স্বভাব সুন্দর ছিল এবং তিনি নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের কাজে লাগিয়াছিলেন না। সুলেখক বসন্ত বাবু জেলে কিছুদিন দেশপ্রিয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারিয়াছিলেন তাই দেশপ্রিয়ের অতি ব্যক্তিগত কথায় এই স্মৃতি সমুজ্জ্বল করিতে পারিয়াছেন।]

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যখন জলপাইগুড়ি হইতে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আসেন তাহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই আমি তথায় বাস করিতেছিলাম। দেশপ্রিয়েরও স্বপক্ষ ও বিপক্ষ দল দুই-ই সেখানে ছিল, অবশ্য দেশপ্রিয়ের সরল সৌজন্য, উদারতা, মহত্ব ও অমায়িকতার জন্য মত ও দল নির্ব্বিশেষে সকলেই যে তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহার আগমনের সংবাদ পাইয়া সকলেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল। কিন্তু দেশপ্রিয় যে ঠিক কোন দিন আসিবেন তাহার কোন স্থিরতা ছিল না। ফলে যেদিন তিনি রুগ্ন অবস্থায় সত্যই আসিয়া পৌঁছিলেন সেদিন অল্পকয়েকজন ভাগ্যবান ব্যতীত অধিকাংশই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ পান নাই। সে দিন সকাল বেলায় প্রাতঃকৃত্য এবং জেলের প্রভাতি কর্ত্তব্যাদি শেষ করিয়া নিজের সেলে বসিয়া কড়িকাঠ গুণিতেছিলাম, 'মতি' মেট ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সংবাদ দিল—বাবু, সাহেব এসেছেন।

যতীন্দ্রমোহন

জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন সাহেব রে?

—সেনগুপ্ত সাহেব, যাঁর আসবার কথা ছিল। তিনি নীচে এসেছেন। তাড়াতাড়ি নীচে গিয়া দেখি সত্যই দেশপ্রিয় আসিয়াছেন। একটী invalid চেয়ারে করিয়া তাঁহাকে আনা হইয়াছে, তখন পর্য্যন্ত সেই চেয়ারটীতেই বসিয়া আছেন। শীর্ণকায়, মলিন বদন দুপায়ে ব্যাণ্ডেজ

বাঁধা। নমস্কার—করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন আছেন? কেমন আছেন তাহা দেখিতেই পাইতেছিলাম জিজ্ঞাসা না করিলেও চলিত, তখন বলিবার মত কোন কথা মনে আসিতেছিল না বলিয়াই বোধকরি এমন অসঙ্গত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিয়াছিলাম। দেশপ্রিয় মৃদুহাস্যে বলিলেন, মোটেই ভাল নাই। শরীর বড় খারাপ! একটু থামিয়া বলিলেন, আর কে কে এখানে আছেন? তাদের একবার ডাকুন না। সংবাদ পাইয়া একে একে উপর হইতে সকলেই নামিয়া আসিলেন অধিকাংশই তাঁহার পরিচিত। একে একে সকলকেই সম্ভাষণ করিলেন, মনে হইল তাঁহার দুর্ব্বলতা, ক্লান্তি রাজবন্দীদের সাক্ষাৎমাত্র সব দূর হইয়া গিয়াছে। সেই সদা হাস্য প্রফুল্ল বদন মণ্ডল, সেই সরল অমায়িক ব্যবহার! সকলের সহিত নিকট আত্মীয়ের মত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র আসিয়া পৌঁছিয়া গেল। দেখিলাম একটী ছোট ড্রেসিং রুমে যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন তাহার সব কিছুই তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে। তাঁহার আগমনে আমাদের যতখানি আনন্দ, মনে হইল জেল কর্ত্তৃপক্ষ যেন ততখানি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। কিছু না বলিলেও বুঝিতে পারিতাম, যেন তাঁহাকে অন্য কোথাও বিদায় করিয়া দিতে পারিলেই এরা বাঁচিয়া যায়, কিন্তু কোন জেলেই তাঁহাকে লইতে রাজী ছিল না। না থাকার একটা

কারণও ছিল। জেলকর্তৃপক্ষের অন্যায় বা ঔদাসিন্যের জন্য প্রয়োজন হইলে তিনি direct Viceroyকে 'তার' করিতে পারিতেন। যদিও তিনি এই ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না, তবুও যেন কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে একটু সমিহ করিয়াই চলিত।

সাধারণতঃ তিনি সামান্যই আহার করিতেন। জেলের সাধারণ ভাবে রান্না কোন জিনিষই তিনি খাইতে পারিতেন না। সাথে নিজের পাচক ছিল, সে পৃথক ভাবে তাঁহার জন্য রান্না করিত। জিনিষ যা যা দরকার খাতায় লিখিয়া দিতেন, জেল কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করিত। দুটি ছোকরা কয়েদী চাকর হিসাবে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার কাছে থাকিত। জেলে আর একটা সুবিধা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল, জেলের নিয়মে প্রত্যেক ওয়ার্ড রাত্রে lock up করিতে হয় কিন্তু তাঁহার ঘর lock up হইত না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা তাঁহার স্বভাব, জেলে আসিয়াও এই অভ্যাস পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সমস্ত ঘর, জিনিষপত্তর সদা-সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিতে পছন্দ করিতেন, কিন্তু তাঁহার কাজকর্ম্ম করিবার জন্য যে সব কয়েদীয়া ছিল—তারা সব পাড়াগাঁয়ের গরীবের ঘরের ছেলে; তিনি যে সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করেন তারা জীবনে সে সব জিনিষ কখন দেখেও নাই—handle করা তো দূরের কথা! তারপর দেশপ্রিয়ের Conception of neat and clean তাদের কল্পনাতীত। সেজন্য তাদের নিয়ে প্রায়ই বিরক্ত হয়ে উঠতেন।

মানুষের ব্যবহারিক জ্ঞান পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে উদ্ভুত হয়। ইহাদের Social heredity অত্যন্ত low, সেজন্য ইহাদের দায়ী করিয়া লাভ নাই। যদিও তিনি কয়েদীদের সময় সময় বকিতেন কিন্তু তাহাদের আহার ও সুখ সুবিধা বিষয়ে তাঁহাকে কখনও উদাসীন থাকিতে দেখি নাই। দিন কয়েক নীচে থাকিবার পর একদিন আমাকে বলিলেন Mr Chatterjee আমাকেও উপরে নিয়ে চলুন। নীচে লাল দেয়াল দেখে দেখে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে কিন্তু উপর থেকে ওরা সব নামবেন তো? বলিলাম আপনার এই অসুস্থ শরীর দেখে নামা তো উচিত। তারপর একদিন invalid চেয়ারে বসাইয়া সকলে মিলিয়া তাঁহাকে উপরকার হল ঘরে লইয়া যাওয়া হইল।—উপরে উঠিয়া তিনি খুব খুসী হইয়া সকলকে ধন্যবাদ দিলেন। Mrs Sengupta রোজই জেলে দেশপ্রিয়কে দেখিতে যাইতেন,—যাইবার অনুমতি ছিল।—তাঁহার পুত্রেরা সপ্তাহে দুইবার মাত্র সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন। উপরে যাইবার পরেই তাঁহার অসুখ বাড়িয়া যায়। সেই সময় রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট আমাদের তরফ হইতে দুই জন করিয়া থাকিবার কথা হয়—তাঁহার সেবার জন্য। সোমড়ার ডাঃ সনৎবাবু ও শিববাবু, দক্ষিণ কলিকাতার চিত্তরঞ্জন, হাওড়ার প্রবোধ বাবু, চট্টগ্রামের দয়ানন্দ চৌধুরী ও জহর বক্সী ইঁহারাই রাত্রিতে তাঁহার সেবা পরিচর্য্যা করিতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে মহাত্মা গোলটেবিলে স্বায়ত্ত শাসন বা অনুরূপ কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার বিশ্বাস লইয়া গিয়াছিলেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, উত্তরে বলিলেন, না, মাহাত্মাজী প্রথমেই আমাকে বলেছিলেন, এখানে কিছু মাত্র ন্যায় বিচার পাবার আশা নাই মিঃ সেনগুপ্ত; তা যদি থাকতো তাহলে আমি অন্যভাবে কথা বলতাম। কিন্তু যখন কোন কিছু পাবারই আশা নাই, তখন জগতের নিকট নিজের দেশকে নীচু করি কেন?

—তাহলে আপনারা লণ্ডন থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশে ফিরলেই ধরা পড়বেন?

—হ্যঁ, অনেকটা তাই বটে।

—আচ্ছা মহাত্মাজী সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের লোকের ধারণা কিরূপ?

—মহাত্মাজী যে বর্ত্তমান জগতে একজন মহৎব্যক্তি সে বিষয়ে সকলের একমত। তবে ওসব দেশের লোক হিংসা নীতি ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না, সে জন্য তারা মহাত্মার অহিংসানীতি সম্বন্ধে বড়ই সন্দিহান। তাদের ধারণা মহাত্মাজীর আন্দোলন একটা experiment মাত্র। যদি তিনি আখেরে জয়ী হন তো খুব ভালই নচেৎ সর্ব্বৈব শক্তি পণ্ড। তবে জগতের লোকের বর্ত্তমান ভারতবর্ষের আন্দোলনের উপর দৃষ্টি আছে।

তাঁহার চলিবার শক্তি ছিল না। সদাসর্ব্বদা বিছানায়

শুয়ে বা বসে থাকতে হ'ত। এক কথায় ব্যাধি তাঁহার যথেষ্ট কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছিল। অথচ নিরুপায়।

কম্রেড হাসেমি সাহেবের মুখে শুনেছিলাম দেশপ্রিয় খুব ভাল ব্রিজ তাস খেলা জানেন। যে দিন এলেন সেদিন থেকেই তিনি ব্রিজ খেলবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন; প্রথমেই নরেন বাবুকে প্রশ্ন করেছিলেন যে এখানে কেহ ভাল ব্রিজ খেলোয়ার আছে কি না? সকলেই আমার নাম করেছিল। দেশপ্রিয় আমাকে দেখেই বলে উঠলেন "You know Mr Chatterjee I am a bridge expert" তদুত্তরে আমি বলেছিলাম, "It might be but I can't accept your opinion until I meet with you."

"All right let us meet to day."

"Thank you."

সত্যই তিনি ব্রিজ খেলা পেলে উন্মত্ত হয়ে উঠেন। এক দিন দুপুর বেলা তাঁহার সাথে ব্রিজ খেলা হয়। আমার ইচ্ছা ছিল কণ্ট্রাক্ট ব্রিজ খেলবার; কিন্তু তিনি এবং আমি ব্যতীত অন্য কেহ সেই নিয়ম না জানায় সাধারণভাবে খেলা হোল। তিনি ক্ষিতীশ বাবুকে স্বদলে পছন্দ করিলেন এবং আমি ও নরেন বাবু বিপক্ষে বসিলাম। সে খেলায় তিনি যথেষ্ট ভাবে পরাজিত হন। তাতে তিনি একটু আমার উপর রাগান্বিত হন। কারণ তাঁর সুনাম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যাই হ'ক, আমরা আর কখন খেলি নাই কারণ তিনি সাধারণ খেলোয়ার ছিলেন; তারপর blood pressure; পরাজিত হলেই চটে যাবেন সে জন্য আমরা কয়জন মিলে আর কখন খেলি নাই। তবে অন্যান্যর সাথে মাঝে মাঝে সাধারণ ভাবে তিনি খেলতেন। তাঁর কাছে অনেক ব্রিজ খেলার বই ছিল, এই খানে তাঁহার একটি মহত্ত্বের কথা প্রকাশ করব। আমাকে পরাজিত করতে পারলেই তিনি সুখী হ'তেন সে জন্য সময় সময় একটু জুয়াচুরি করতেন; ইহার জন্য আমি একদিন একটু কটুভাষায় বলেছিলাম। Mr Sen Gupta mind that you are going beyond your jurisdiction! এই কথার অর্থ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সে জন্য তার পরদিন আমার নিকট ক্ষমা চেয়েছিলেন। মুখে আমাদের যাহাই বলা হউক কিন্তু সবাই প্রফুল্ল থাকতেন। কখন রাগতে দেখি নাই—। সকলেরই সঙ্গে হাসি তামাসা। তাঁর সহিত কথাবার্ত্তা বলে সকলেই সুখী ও আনন্দিত হত। সদা সর্ব্বদাই আলোচনা করতে ভাল বাসতেন। স্পেশাল ওয়ার্ড থেকে ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল, জ্ঞানানন্দ স্বামী ও মৈমনসিংহের ডাঃ বিপিন বিহারী সেন মহাশয় মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতেন এবং তাঁদের সাথে নানা বিষয়ে আলাপ পরিচয় হত। দেশপ্রিয়ের বড় ইচ্ছা ছিল একবার চট্টগ্রামের অম্বিকাবাবুর সহিত দেখা করেন কিন্তু তা হয়ে উঠে নাই। একদিন কথা উঠিল joint electorate নিয়ে। সকলেই নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, আমি চাই কি জানেন? যেমন করে হ'ক joint electorate চাই। আজ না হয় দু'বছর চার বছর দশ বছর হউক ক্ষতি নাই কিন্তু দশ বছর পরেও যেন চিরস্থায়ী joint electorate হয়। joint electorate না দেবার গূঢ় অভিসন্ধি হল দেশের মধ্যে ভেদ নীতি রাখা। আমাদেরও কর্ত্তব্য হচ্ছে সকলের বলা আমরা joint electorate চাই। আমি বললাম যে, দেখুন সমস্বার্থ না হলে united voice হয় না, কিন্তু যারা গেছে তারা তো Indian representatives নয়, তারা হচ্ছে ব্রিটিশ বুর্জ্জোয়া representatives সে জন্য তারা প্রত্যেকেই a form without a voice! হাসতে লাগলেন। এক সম্প্রদায় যুবকের মত ছিল joint electorate এ হিন্দু মুসলমান বিবাদ বৃদ্ধি পাবে কিন্তু seperate electorate এ সে জিনিষটা হবার আশা নাই।

একদিন খবর আসল একটি Div III র ছেলে hunger strike করেছে—সে কিছুতেই আহার করতে চায় না। দেশপ্রিয় বড়ই ভাবনায় পড়লেন। জেলার দেশপ্রিয়কে অনুরোধ করলেন ছেলেটিকে শান্ত করতে। কিন্তু নিজের যাবার ক্ষমতা নাই তাই ক্ষিতীশ বাবু ও নরেন বাবুকে অনুরোধ করলেন, তারা গিয়ে যাতে ছেলেটি Hunger strike ত্যাগ করে তার চেষ্টা করতে। কারণ তখন নরেন বাবু ও ক্ষিতীশ বাবুর অন্য বাড়ীতে

যাবার অনুমতি ছিল। যে ডাক্তার বাবুটি নিত্য দু'বেলা আসতেন তাঁকেও বললেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না! শেষে আমাকে একদিন বললেন, একটা উপায় করুন Mr. Chatterjee? আমি বললাম দেখুন আপনি একখানা পত্র লিখে পাঠিয়ে দিন, দেখুন ছেলেটি কি করে। তারপর দিন সকাল বেলা আমি একটি পত্র লিখে দিলুম এবং তিনি তাইতে সহি করে দিলেন। বোধ হয় শিব বাবু ও নরেন বাবু সে পত্রখানি নিয়ে ছেলেটির কাছে যান ছেলেটি পত্র পাঠ করে দেশপ্রিয়ের সম্মান রেখেছিল অর্থাৎ Hnnger strike ত্যাগ করেছিল। এই খবরে তিনি সুস্থতা লাভ করেন। Hunger strikeএর পক্ষপাতি তিনি কোনদিন ছিলেন না।

কথা প্রসঙ্গে মডারেডদের কথা উঠিল। আমি বললাম দেখুন লোকে বলে সাপ্রু জয়াকর সব মস্ত লোক। হতে পারে তারা ধনী, বড় আইনজ্ঞ কিন্তু ইংরাজের রাজনীতিক চাল যে তারা কিছুই বোঝে না একথা আমি স্পষ্ট বলব। এক সুরেন বাবু ছাড়া এদের কোন political philosophy নাই। দেখুন আমার মনে হয় সুরেন বাবু যে, politicsএর সংজ্ঞা দিয়েছিলেন সেই সংজ্ঞা এখন আমাদের রাজনীতিতে চালান উচিৎ।

একদিন কথা প্রসঙ্গে দেশবন্ধুর কথা উঠিল। বলিলাম,—আপনি তো দেশবন্ধু সম্বন্ধে অনেক ঘটনা জানেন। আপনার উচিৎ কিছু লিখে রেখে যাওয়া। এখন তো বেশ বিশ্রাম পেয়েছেন; এই সময় যদি রোজ একটু একটু লেখেন তাহলে এইটিও লেখা হয়ে যাবে আর আপনার মনও প্রফুল্ল থাকবে। —হ্যাঁ আমার ইচ্ছা আছে একটা ইতিহাস লিখবো কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য পেরে উঠছি না; —তবে এবার থেকে রোজ একটু একটু করে লিখলে মন্দ হয় না। দেশবন্ধু সম্বন্ধে একটা গল্প বলি শুনুন। তখন বাবা বেঁচে মিঃ দাসকে একটা মামলায় চট্টগ্রামে নিয়ে গেছেন। তখন তো আর দেশবন্ধু হন নি, তখন Mr. C. R. Dass আমি তো সেদিন পর্য্যন্ত তাঁকে Mr. C. R, Dass বলেই জানতুম। একদিন বাবা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন caseএর শেষ পর্য্যন্ত তাঁর থাকা বাবা দরকার হবে কি না। C. R. Dass আমাদের বাড়ীতেই থাকেন এবং বাবাকে অত্যন্ত সম্মান করেন। বাবার একান্ত ইচ্ছা যে caseএর শেষ পর্য্যন্ত তিনি থেকে যান। বাবার কথা শুনবামাত্র C, R, Dass বলে উঠলেন,—C. R. Dass যে case take up করে, সে Case শেষ পর্য্যন্ত না দেখে, মাঝখানে ত্যাগ করে না। C, R, Dassএর এই কথাগুলি বলবার ভঙ্গিমা, তার চোখ মুখের সেই দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাব আমার আজও মনে আছে। সেইদিন থেকে আমি প্রথম C, R, Dass মানুষটিকে দেখলুম—কি দৃঢ় বিশ্বাস! কি স্থির প্রতিজ্ঞা! বললাম,—তাঁর জীবনটাই তো তাই। রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন তিনি জানতেন না। কিন্তু দেশের লোকের সাথে লড়াই করেই বোধ করি তিনি মারা গেছেন, আমরাই তাঁর অকাল মৃত্যুর হেতু!

—মজা দেখুন তারপর, case তো শেষ হয়ে গেল, যেদিন তিনি কলিকাতায় ফিরবেন হঠাৎ বাবার নিকট ২০০৲ টাকা ধার চাইলেন। আমরা ভাবলাম বোধ হয় কিছু টাকা কম পড়েছে। বাবা ২০০৲ টাকা তাঁকে দিলেন তিনি সেই ২০০৲ টাকা আমাদের বাড়ীর সমস্ত চাকর বাকরদের বকশিস্ দিয়ে চলে এলেন। আমরা তো তাঁর এ ব্যবহার দেখে অবাক। দেখুন বিপিন বাবু একবার আমায় বলেছিলেন যে চিত্তকে যে যত দোষ যত রকমে পারে দিক্ কিন্তু চিত্ত কৃপণ ছিল, অতিবড় শত্রুতেও এ দোষ দিতে পার্ব্বে না। আমার জীবনে একমাত্র চিত্তকেই আমি দেখছি যে টাকার উপর মমতা কোনদিন রাখেনি—টাকা কোনদিন তাকে মুগ্ধ কর্ত্তে পারে নি। এ জিনিষ আমি আর কারও জীবনে দেখতে পাই নি। আর একটা কথা আজ আমার মনে পড়ে। তখন দেশবন্ধুর নামে কেউ কেউ অর্থের অপবাদ প্রকাশ কচ্ছিল। একদিন কোন একটি সভায় সেই অপবাদের উত্তরে দেশবন্ধু বলেছিলেন, আমায় টাকার লোভ দেখায়! আমি চিত্তরঞ্জন দাশ টাকার মস্তকে পদাঘাত করি। টাকা আমার পশ্চাতে ঘোরে আমি টাকার পশ্চাতে ঘুরি না। এ স্পর্দ্ধার কথা একমাত্র বর্ত্তমান ভারতবর্ষে দেশবন্ধুই বলতে পার্ত্তেন। দেশপ্রিয় বলিলেন, একশোবার, একথা তাঁর মুখেই শোভা পায়।

জেলে আমরা দু'খানি খপরের কাগজ পাইতাম —সপ্তাহিক Statesman এবং সোমবার Englishman যদি কেহ স্বখরচে সঞ্জীবনী পড়িতে চান তো আন্‌তে পারেন। মোট কথা দেশের খপরগুলি মৃত অবস্থায় আমাদের নিকট আসিত দেশ প্রিয় আসতে আমরা নিত্য Statesman পড়িতে পাইতাম কারণ তাঁহাকে নিত্য Statesman দেওয়া হইত।—সেই সময় পুণাচুক্তির বিপক্ষে বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রতিবাদ উঠিতেছিল। পুণাচুক্তিতে যে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ষতি হয়ে গেল সে বিষয়ে বেশীরভাগ ছেলের এক মত ছিল। দেশ প্রিয়ও এ বিষয় আমাদের সঙ্গে অনেকটা একমত ছিলেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, "দেখুন দিকিনি এখন সব প্রতি-বাদ কচ্ছে! যখন এঘটনা হ'ল তখন কোথায় ছিলে তোমরা? কৈ একজন তো যেতে পারনি ঘর ছেড়ে। আজ প্রতিবাদ তুলছো। রবীবাবু গেছলেন তবু বাঙ্গালার মান বাঁচলো। তোমরা সব তখন ঘরে বসে রইলে কেন? কেউ কি তোমাদের যেতে বারণ করেছিল? এখন চীৎকার কল্লে হবে কি? চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।" তদুত্তরে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের পরস্পর দলাদলিতে আমরা সব নষ্ট কর্ত্তে বসেছি। কে যাবে বলুন? যারা যাবার যোগ্য বা যাদের মধ্যে voice আছে তারা সব জেলে। বাহিরে যারা আছে তাদের দেশের মধ্যে hold কোথায় hold বলতে একমাত্র Congressএর আছে—তা সে আজ রুগ্ন। দেশপ্রিয় বললেন—কিন্তু একজনের তো যওয়া উচিত ছিল।—যখন একটা ভারতবর্ষময় চুক্তি হচ্ছে এবং সে চুক্তি হয় তো White Hall accept বর্চ্চে তখন দু'চার জনের বাঙ্গালা থেকে নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত ছিল। অন্ততঃ সেখানে উপস্থিত থেকে দেখা যে কি চুক্তি হয় এবং তাতে বাঙ্গালার কি অবস্থা দাঁড়ায়।

একদিন বিলাতের রক্ষণশীলদের কথা উঠল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা আপনি তো অনেক রক্ষণশীল নেতাদের সাথে ভারতবর্ষের অবস্থা আলোচনা করেছেন তাদের সব মত কি রকম দেখলেন?

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওদের সকলেরই মত এক। যতই মুখে লম্বা চওড়া কথা বলুক এ বিষয়ে সকলেই রক্ষণশীল।

—জনসাধারণের কি মত দেখলেন?

—তাদের আবার মত কি? তাদের যা আমাদের সম্বন্ধে বোঝায় তাই বোঝে।

—মহাত্মাজীকে জনসাধারণ কি ভাবে দেখে?

—একটি curio। আচার ব্যবহার চাল চলন সবই বর্ত্তমান সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা—যেন একটা দেখবার বস্তু; তারপর প্রচারের ফলে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে তাঁর জন্য তাদের কষ্ট হচ্ছে তিনিই তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু।

দিন দিন তিনি রুগ্ন হয়ে উঠছিলেন। আহারাদি ক্রমশঃ সামান্য করে ফেলছিলেন। প্রত্যুষে Bed tea তারপর বেলা ৭টায় কিছু পেস্তা বাদাম কিসমিস ও মোনাক্কা এবং সঙ্গে চা পান করতেন। বেলা ১২ টার সময় যৎসমান্য ভাত, মাছের ঝোল ও দধি দিয়া আহার করিতেন। বিকাল বেলা চা এবং কোন কোন রাত্রে দু'এক খানা টোষ্ট, কোন দিন তাহাও নহে। সকাল বেলা চায়ের সাথে dry fruits দু'এক দিন মাত্র আহার করেছিলেন। নিজে খেতে পারতেন না কিন্তু সকলকে খাওয়াতে তিনি বড় ভাল বাসতেন। তাঁহার ভিতর আর একটি বিশেষত্ব দেখেছি, অহঙ্কার বা দেশ-পূজ্য নেতা বলে কোন মাদকতা তাঁহার ভিতর ছিল না সদাই প্রফুল্ল, মুখে হাসি তামাসা লেগেই আছে, সকলের সাথে সমান ব্যবহার এবং ব্যবহারের ভিতর শিশুর মত সরলতা। যে কেউ তাঁর কাছে গেলেই যত্ন করে বসাতেন এবং আপনজনের মত করে আলাপ পরিচয় করেতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস বিবেকানন্দ স্বামীকে বলেছিলেন, "ওরে অনেক পুণ্য না করলে মানুষ সরল হয় না সরল হব মনে করলেই মানুষ সরল হয় না।" দেশ-প্রিয়র স্বভাব ছিল সরলতাময়।

দেশপ্রিয় এককালে বড় Sportsman ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে কখন কখন Sporting union clubএর হয়ে খেলতেন। টেনিস তো শেষ পর্য্যন্ত খেলেছেন। খেলোয়ার সকলেই হতে পারে কিন্তু Sporting spirit

সকলের থাকে না। দেশপ্রিয়র আমি সেই spirit লক্ষ্য করেছিলাম। একদিন খবরের কাগজে লেখা ছিল যে অষ্ট্রেলিয়ার test মেলায় Pataudi century করেছে। এই খবর না পড়ে দেশপ্রিয়র কি আনন্দ। তাঁর আনন্দ দেখে মনে হল ভারত বুঝি স্বাধীন হয়ে গেছে। দেশপ্রিয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন; "দেখছেন Pataudির কাণ্ডকারখানা! এই অল্পদিনের মধ্যে তিনজন তো International Indian cricketter জন্মাল। বলে কি না আমাদের stamina নেই? এখন তো বুঝতে পারছে stamina আছে কি না। এখন practically England এর ভিতর দু'জন Indianই strong batsmen, এরা যদি Indian team এর সঙ্গে খেলতো তাহলে Indian দের খেলার রূপ বদলে যেত। সে কি আনন্দ। যদি কোন ভারতবাসী বিদেশে সুনাম করেছে কাগজে দেখতেন তাহলে তাঁর বড়ই আনন্দ হত।

Mr. J. C. Gupta কে তিনি বড়ই প্রীতির চক্ষে দেখতেন। একদিন বললেন,—লোকে J. C. কে বলে coward, জেলে যেতে পারে না। জেলে যাওয়াটাই কি সব চেয়ে বড় কাজ? দেখলেন তো সেদিন নরেশবাবুকে বলে দিলুম যে মুক্তির পর, আমার নাম করে যেন সকল পত্রিকায় ছাপিয়ে দেয় শুধু শুধু কাজ না করে কেউ যেন না জেলে আসে। এখন দাঁড়িয়েছে যেন জেলে যাওয়াটাই সব চেয়ে দেশের বড় কাজ। সকলেই যদি জেলে আসবে তাহলে বাইরে কাজ চালাবে কে? কাজের সঙ্গে সম্পর্ক নাই শুধু জেলে। J. C. যে কত ভিতরে ভিতরে কাজ করেছে তার খবর কয়জন রাখে? এই যে বিনা পয়সায় চতুর্দ্দিকে মকদ্দমা করে বেড়াচ্ছে সেটাও কি একটা বড় কাজ নয়? লোকে ভিতরের ব্যাপার কিছু জানবে না শুনবে না যা তা একটা opinion গড়ে বসল। আমার case এর বেলায়ও Mr. Gupta যথেষ্ট খেটেছিলেন; এ বিষয়ে যে যাই বলুক দেশপ্রিয়ের উক্তিগুলিকে সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে লওয়া ব্যতীত আমার পক্ষে প্রতিবাদ করার একটা কথাও ছিল না। বললাম—হ্যাঁ এ বিষয়ে আমি নিজেও Mr. J. C. Guptaর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বললেন,—হ্যাঁ J. C.র heart সত্যিই খুব ভাল।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা দিন দিন All India তে hold হারিয়ে ফেলছি। All India তে আমাদের যেন voiceআর কিছু নাই।

দেশপ্রিয় বললেন,—বাঙলাকে যে All India অগ্রাহের চোখে দেখে সে কথা আমিও বুঝতে পেরেছি। আমি যখন বিলেতে চট্টগ্রামের ঘটনা মহাত্মাজীকে বলি তখন তো তিনি প্রথমে শুনতেই চান নাই। 'আমাদের দলাদলিই আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে। এবার বেরিয়ে প্রথমে সুভাষকে ডেকে সব মিটমাট করাই হবে আমার প্রথম কাজ। তাতে আমাকে যা কিছু ত্যাগ করতে হয় করব। এর বিরুদ্ধে কারো কোন কথাই আমি গ্রাহ্য করব না। বললাম, এতদিনের পুরানো ঝগড়া সহসা মিটবে কি? জেলে এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট ভেবেচি। Mr. Chatterjee আপনি নিশ্চয় জানবেন এবার বাংলার দলাদলি যেমন করে হোক মিটাব।

বলছিলাম; আখেরে কে জয়ী হবে নিশ্চয় করে বলা বড় মুস্কিল। দেশপ্রিয় বললেন;—আমার কিন্তু মনে হয় শেষ পর্য্যন্ত ফ্যাসিষ্ট মতবাদ জয়ী হবে। এমন কি Europe এর অনেক দেশ ফ্যাসিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করবে। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ ফ্যাসিষ্ট মতবাদী হয়ে উঠবে।

—

উৎসবের আলেয়া

উপন্যাস

রাণী সুরুচিবালা চৌধুরাণী

[রাণী সুরুচিবালার লেখার ভঙ্গি একেবারে নূতন ধরণের—'উৎসবের আলেয়া' উপন্যাসখানির চরিত্র বিন্যাসে, কথোপকথনে ইনি এমন একটা নূতন সুর দিয়াছেন যাহা বাংলা উপন্যাসে সম্পূর্ণ অভিনব। এই উপন্যাসে যে সমস্যার অবতারণা তিনি করিয়াছেন তাহা যেমন জটিল ফুটানও তেমনি কঠিন—অথচ নরনারীর এই চিরন্তন সমস্যার একদিক রাণী সুরুচিবালা ফুটাইতেছেন অতি নির্ভীক সরল সহজ ভাবে—অথচ লেখা এত আর্টিষ্টিক যে যিনি পড়িবেন তিনিই মুগ্ধ হইবেন।]

"আমি চিরকাল এমনি তা ঠিক! কিন্তু তুমি বলতে চাও কয়েক বছর আগেও এমনি ভালবাসতে? কখনো না, তা যদি করতে তাহলে—" অরুণা থামিয়া গেল। রঘুবীর কাগজ গুলা সরাইয়া রাখিয়া বলিল "আমি বুঝতে পারি, তুমি কেন ও কথা গুলো বল। কিন্তু ভেবে দেখতো ভাল করে, ভাল করে একবার আমার পক্ষ নিয়ে বিচার করে দেখ, তারপরে অতদিন আগেকার কথা নিয়ে আমাকে আজ অভিযুক্ত কর। একথা সত্য কখনো তোমাকে ব'কেছি, কখনো তোমাকে রূঢ় কথাও বলেছি, কিন্তু কেন বলেছি সে গুলো কোনদিন ভেবে দেখেছ? শুধু নিজের দিকটাই দেখে যাও—আর আমার উপর শত অপরাধের বোঝা চাপাও। শোন, তুমি স্ত্রী আমি স্বামী-তোমাকে আমি তখন ভালবাসতুম আপনার মতন করে তাই যখনি কোন অন্যায় দেখেছি, তখনি আদর ক'রে শাসন করতে গেছি, সেইগুলোকে তুমি অত্যাচার অবিচার মনে করে, কতখানি ব্যথা আমাকে তার প্রতি-দানে দিয়েছ—তা জানো? তাই সেই থেকে এখন আমি তাও ছেড়ে দিয়েছি।"

"আমি কখনো কোন অন্যায় করেছি ব'লে মনে হয় না। সামান্য ভুল ত্রুটিকে অন্যায় দোষ মনে করে তুমিই অতিরিক্ত কঠোরতা নিয়ে শাসন করতে গেছ—আর যদিও বা অন্যায় করে থাকি কিছু তা তোমার শাসনের কঠিন-তায় প'ড়ে—সেটা তোমার দোষ, আমার নয়, আর, আর সবচেয়ে চরম হয়েছিল সে দিন জার্মাণীতে—"

রঘুবীর অরুণার পাশে বসিয়া তাহার হাত দুইটী চাপিয়া ধরিল, বলিল "অরুণা, তার জন্য শতবার ক্ষমা চেয়েছি—তবুও? সেদিন আমি পাগল হয়েছিলুম—কিন্তু রাগ করোনা, ভেবে দেখো, তুমিই আমাকে প্ররোচিত করে তোলনি কি? নয়, তুমি আজ বলছ তোমার ব্যবহার গুলো সামান্য ভুল ত্রুটি, কিন্তু জানোনা আমার অন্তঃপুরের মর্য্যাদার কাছে সেগুলো কত বড়। তবুও তোমাকে ভালবেসেছি ব'লে আমি সামান্য ভাবেই তোমাকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছি মাত্র, তাই তুমি বল অত্যাচার? অবিচার?"

"নিশ্চয়, আমি যা করতে গেছি তাতেই তুমি নির্দ্দয় ভাবে বাধা দিয়েছ। কখনো আমার সামান্য ইচ্ছাটাকে একটু সম্মানের চক্ষে, দয়ার চক্ষে দেখনি, আমাকে কলের পুতুলের মত চালিয়ে এসেছ—"

ব্যথিত স্বরে রঘুবীর বলিল—"অরুণা এতবড় মিথ্যে কথা গুলো আজ উচ্চারণ করতে পারলে? সমস্ত বিলাস-পুর জানে, সমস্ত সভ্য সমাজ জানে—বোধ হয় সমস্ত ইওরোপ জানে তোমার সামান্য ইচ্ছাটুকু আমার কাছে কতখানি—বলতে গেলে অনেক বলা যায়, আর তা তুমি বিশ্বাসও করবে না। কিন্তু বিলাসপুরের রাজার পক্ষে স্ত্রৈণ নাম পাওয়াটা কত বড় ঘৃণা কত বড় লজ্জার কথা তা তোমাকে কি বলে দিতে হবে? তুমি জানো—কিন্তু—সে নামও আমি সানন্দে সসম্মানে মাথায় তুলে নিয়েছি।"

"ধন্যবাদ—! তুমি আমাকে নিয়ে দেশ বিদেশ ঘুরেছ বটে, ঐশ্বর্য্য বিলাসিতা ধনরত্ন স্তূপীকৃত ক'রে আমার উপর ঢেলে দিয়েছ বটে—কিন্তু সবের ভিতর একটা শাসনের কর্ত্তৃত্ব তার আত্মম্ভরিতা তোমার ছিল এবং আছে—। সমস্ত ইউরোপ ঘুরিয়েছ ঠিক—তাতে তোমার অনেক টাকাও গেছে কিন্তু বাইরে তুমি ছিলে একেবারে অনুগত প্রেমিক স্বামী—আর ঘরের ভিতর?

এতো শিগগির ভুলে গেলে? নিজে তুমি বান্ধবী নিয়ে আমোদ করতে আর আমার বেলায় যত বাধা—"

"আমি বান্ধবী নিয়ে কখনো আমোদ করিনি—আর যদি বাধা দিয়ে থাকি তবে তা তোমারি ভালোর জন্য। বাধা দিয়েছি তোমার জন্য ছেলের জন্য, আমার বংশ মর্য্যাদার জন্য—তার উপর ভালবেসেছি তার জন্য—নইলে কি হ'ত আমার, মাও পিড়াপিড়ি করছিলেন, তোমাকে বাধা না দিয়ে, তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আরো তো বিয়েও করতে পারতুম, কিন্তু কেনো করিনি? এ সবের মূলে শুধু ভালবাসা নয় কি?"

"জানি না কিন্তু আর্ম্মেনীর ঘটনাটা—এওকি তোমার ভালবাসার অঙ্গ?"

"আবার সে কথা, তাহ'লে আমাকেও অনেক কথা বলতে হয়, যা আমি বলা কেন—কখনো মনেও আনতে চাই না। সেদিন আমার কি দিন ছিল মনে আছে? আমার জন্মদিন ছিল, সেইদিনে মায়ের কাছ ছাড়া হ'য়ে মনটা এমনিতেই ভাল ছিল না তারপর সন্ধ্যে থেকে তুমি ডান্সে যাবার জন্য জিদ ধরলে, অস্বীকার কর? আমি কি বলেছিলুম 'আজকের দিনটা বাদ দাও অরুণ', আজ একটু পবিত্র ভাবেই ঘরে বসে থাকি, কারণ আজ বাড়ীতে মা এমনি সময় পূজো করছেন আমারি মঙ্গল কামনায়, কিন্তু তুমি রাগ করে আমাকে ফেলে চ'লে গেলে নাচের মজলিসে সেজে গুজে, আচ্ছা গেলে তো ভালই, আমি আমার মনের অভিমান মনে চেপে ঘরেই ছিলুম, তারপর কি রকম অবস্থায় ফিরে এসেছিলে মনে আছে? মাতাল অবস্থায়—নিজে ঝগড়া করে—তার পরে—মনে আছে দেরাজ থেকে পিস্তল বের ক'রে আমার দিকে তুলে ধরেছিলে—সেটাকে ফেলে দেবার জন্যই তো ফুলদানী ছুঁড়ে মেরেছিলুম আমি"—

অরুণা সজোরে বলিয়া উঠিল "কখনো না। হ্যাঁ আমি dance এ যেতে চেয়েছিলুম সত্য কিন্তু তুমি কি সেদিন ঠিক সেই ভাবেই বারণ করেছিলে, তবুও হয়তো না গেলেই ভালো হ'ত কিন্তু জিদের বশে গিয়েও ফিরে এসেছি শিগ্‌গীর, কারণ একটু অনুতাপ হয়েছিল। আজ তুমি বলছ আফিমাতাল ছিলুম, কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি একচুমুক কোন কিছু আমি মুখে দিইনি সেদিন। কিন্তু ফিরে এসে কি দেখেছি? মিস্ এ্যালেনকে নিয়ে বিভোর হয়ে গ্লাসের পর গ্লাস খালি করছিলে তুমি! তারপরে আমি পিস্তল তুলেছি বলছ, এতোটা মিথ্যে কি ক'রে বললে? আমি মিস্ এ্যালেনের কথা বলতে তুমি রাগ ক'রে গালাগাল দিয়ে ফুলদানীটা তুলেছিলে না? আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্য দেরাজ থেকে নয়, পাশের টেবিল থেকে হাতে যা এলো তুলে নিলুম—পরে দেখেছি সেটা একটা পিস্তল—"

"আমি মিস্ এ্যালেনকে নিয়ে ড্রিঙ্ক করছিলুম! যাক্ এ সব কথার মীমাংসা হবে না কোন দিন। চিরকাল তুমি তোমার অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে থাকবে, আর আমিও তাই ক'রে থাকবো, কিন্তু মুখের কথা মনের ভাব গুলোকে ছেড়ে দিয়ে শুধু কার্য্যাকার্য্য বিচার করলে আজ সারা জগত দেখতে পাবে কে সব চেয়ে হতভাগ্য বেশী!! তুমি আমার বংশকে দোষ দিচ্ছিলে একটু আগে, তবুও সেই বংশকে কতদূর অবহেলা অমর্য্যাদা করেছি আমি, তা জানো! পূর্ব্বপুরুষরা এক স্ত্রী নিয়ে সংসার করা কতটা লজ্জার কথা মনে করতেন। এমন কি আমার বাবা পর্য্যন্ত, কিন্তু আমি আজো তোমাকেই জীবনের লক্ষ্যস্থল মনে ক'রে পূজো ক'রে আসছি! তারপরে আমার মা'রা এখনো পর্য্যন্ত অসূর্য্যম্পশ্যা। কিন্তু তোমার সন্তুষ্টির জন্য তোমাকে কিনা করতে দিচ্ছি অরুণা? কিসের জন্য বলতে পারো? আমার লাভ?"

"খুব বলতে পারি! সমাজে নাম কিনবার জন্য—। সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রীর স্বামী ব'লে গর্ব্ব করবার জন্য, বন্ধু মহলে কুপ্রথার প্রবর্ত্তনকারী ব'লে বাহবা পাবার জন্য ও আধুনিক সব বিষয়ে অগ্রগণ্য হবার আনন্দ ও সম্মান পাবার জন্য—"

"তাহলে এর উপর আমার আর কিছু বলবার নেই। তুমি যা খুসী তাই বলতে পারো—আমি সবই মেনে নেবো জেনো—। শত উপেক্ষাতেও আমাকে আমার পথ থেকে টলাতে পারবে না। তুমি যাই হও, তোমাকে সত্যি আমি ভালবাসি—"

অরুণা কোন উত্তর দিল না। সে চুপ করিয়া

খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার এক মুহূর্ত্তে ইচ্ছা হইল এই মূল্যবান বস্ত্র অলঙ্কারগুলি খুলিয়া ধুলার উপর ফেলিয়া দেয়। প্রাণটা কি জানি কি কারণে বেদনায় ভরপুর হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে রাগও হইল। এ রাগ কাহার উপর সে তাহা নিজে বুঝিতে পারিল না। সবার চাইতে রাগ হইল তাহার নিজেরই উপর বেশী। হাতের হীরার ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল "আমি দিদির সঙ্গে লাঞ্চ করতে যাচ্ছি। তুমি কোথায় করবে?"

"যাক্ সৌভাগ্য, তবু আমার খোঁজটাও নিলে"—অসহিষ্ণু ভাবে অরুণা বলিল "আঃ সব সময়ে কি যে এক কথা! নইলে চলনা আমার সঙ্গে—"

"না থাক্ তুমিই যাও"

অরুণা চলিয়া গেল। রঘুবীর আবার কাগজগুলি টানিয়া লইল, কিন্তু মন তাহার কোথায় চলিয়া গিয়াছিল তাহা সে বহু চেষ্টা করিয়াও খুঁজিয়া পাইল না!

সত্যই সে স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসে কিন্তু তাহার এ ভালবাসায় সে তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেনা, সে তাহা জানে। অরুণার সর্ব্ব-গ্রাসী মন, জগতে তাহার সব কিছু পাওয়া চাই এইটুকুই উপলব্ধি করিয়া সে বড় হইয়াছে কিন্তু তাহার এ সর্ব্ব-গ্রাসী ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন করা রাজা রঘুবীরেরও অসাধ্য! সে তাহাকে বহু চেষ্টা করিয়া তাহার স্ত্রীর পদ মর্য্যাদা বুঝাইয়াছে, এবং যথাসম্ভব তাহাকে সংযত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সে গুলাকে অরুণা অত্যাচার বলিয়া ধরিয়া দুঃখিত হইয়াছে। এই দুঃখটুকু দেওয়ার জন্য আজ রঘুবীরের মনটা অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল সত্যই তো, এইটুকু দুঃখ না দিলে কি চলিত না? কি হইত—সামান্য কতগুলি আমোদ আনন্দ হইতে তাহাকে বঞ্চিত না করিলে? তাহা হইলে সে হয়তো নিজকে অনেক সুখী মনে করিত। তাছাড়া মাঝে মাঝে তাহারও দুর্ব্বলতা কখনো কিছুতে ছিল নাকি? প্রথম দিকে, সেই বংশানুবর্ত্তী অভ্যাসগুলি? সেও যে একবারে সাধু ছিল তাহাও তো নহে। অরুণাই কতদিন তাহাকে কত বিষয়ে ধরিয়া ফেলিলেও মুখে কিছু বলে নাই—তাহা উপেক্ষাই করিয়াছিল! অবশেষে একদিন এক দাসীর সঙ্গে!—ছিঃ ছিঃ! তারপরে আরো কিন্তু যাহাই হউক সে তাহাকে তখনো ভালবাসি এখনো ভালবাসে—তবে ও গুলি সামান্য খেলা, স্ফূর্ত্তি অথবা অভ্যাস ব্যতীত আর কিছু নহে অরুণার ইহা বুঝ উচিত। আর এখন তো সে সবই ছাড়িয়া দিয়াছে—এখন তাহার অসন্তুষ্ট হইবার কোন্ যুক্তিযুক্ত কারণ আছে?

কিন্তু অরুণাও কি একেবারে নির্দ্দোষ? তাহার বন্ধুগণের সহিত মেলা মেশা, পান, আহার নাচ—এই সব অরুণা মনে করে আধুনিক নির্দ্দোষ আমোদ—এবং এই সকল নিয়া আলোচনা করাও অসভ্যতা ও বর্ব্বরতা! কিন্তু প্রবীর সিংহের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবটাও কি এরূপ নির্দ্দোষ? সহজ, সরল? বহুবার বহুরকম যুক্তি তর্ক দিয়াও সে তাহার মন হইতে ইহাকে লঘুভাবে সরাইয়া দিতে পারে নাই। অনেক দিন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াও পারে নাই। কাল রাত্রেও সে প্রবীর সিংহকে দেখিয়াছে। সে কি তবে নীচ গুপ্তচরের মত সন্ধান লইয়া কোন গোপন রহস্য সূত্র আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইবে? না, অরুণা যাহাই করুক সে তাহাকে চিরকাল ভালবাসিবে এই দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া উদাসীন থাকিবে?

× × ×

"লাঞ্চের" কিছুক্ষণ পূর্ব্বে রাণী চন্দ্রাবতী কতকগুলি চিঠি পত্র লিখিল তারপরে ফ্রেঞ্চ ইতিহাসের কয়েক পাতা পড়িয়া উঠিতে যশোদা ঘরে প্রবেশ করিল। যশোদা তাহার বহুদিনের পরিচিতা এবং উভয়ের ভিতর যথেষ্ট সৌহার্দ্দ ছিল। খানিকক্ষণ অন্যান্য কথার পর যশোদা বলিল—"সত্যই তা'হলে মিসেস রতন শেষ কালে divorce এর আশ্রয় নিল?"

চন্দ্রাবতী একটী কোমল গদি-সম্পন্ন সোফার উপর হেলান দিয়া বসিয়াছিল। সে বলিল "মন্দ কি? স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কটা সম্পূর্ণ লেন দেনের হওয়া উচিত। কারণ দুই জন একেবারে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক যে একসঙ্গে সুদীর্ঘ দিন যাপন করবে তাদের ভিতর যদি লেনদেনের কারবার না থাকে, তা'হলে হয়ে যায় সব কিছু এক তরফা, কিন্তু ভরণপোষণের জন্য অনেক টাকা দাবী ক'রে ভাল করেনি।"

যশোদা বলিল "সত্যি, কিন্তু এটা আমার মতে ভারি

চিত্রা
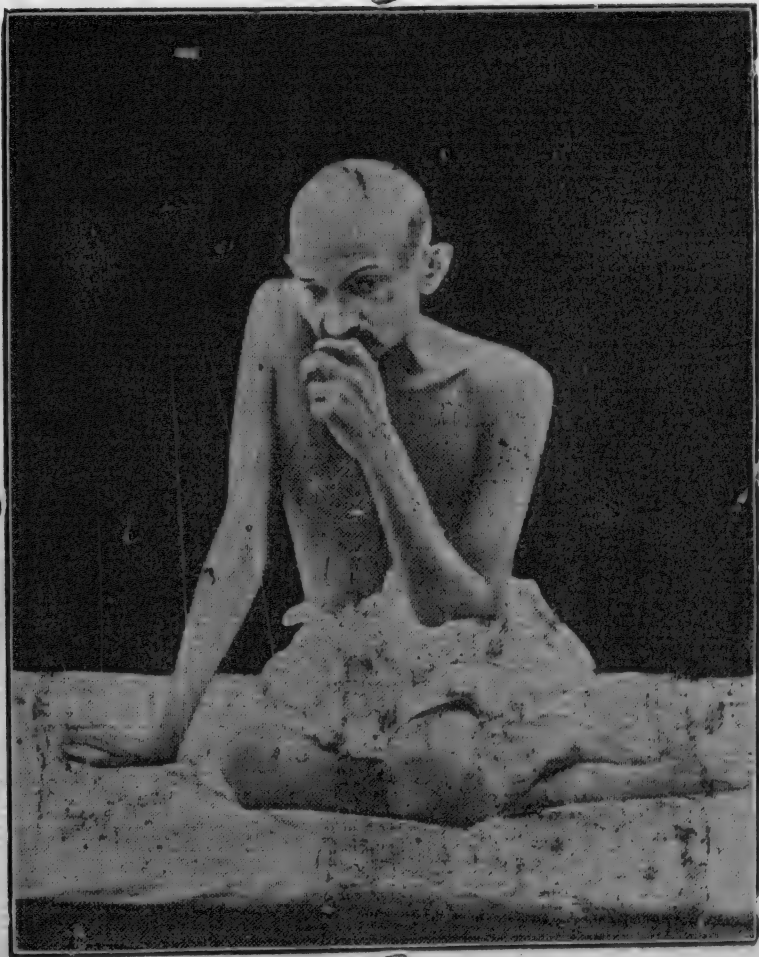
মহাত্মা গান্ধী

জাহাজ হইতে কপিকলে হস্তী উত্তোলন

পুরী--রথযাত্রা

মুর্শিদ কুলি খাঁর কবর—মুর্শিদাবাদ

দার্জ্জিলিং রেলপথ
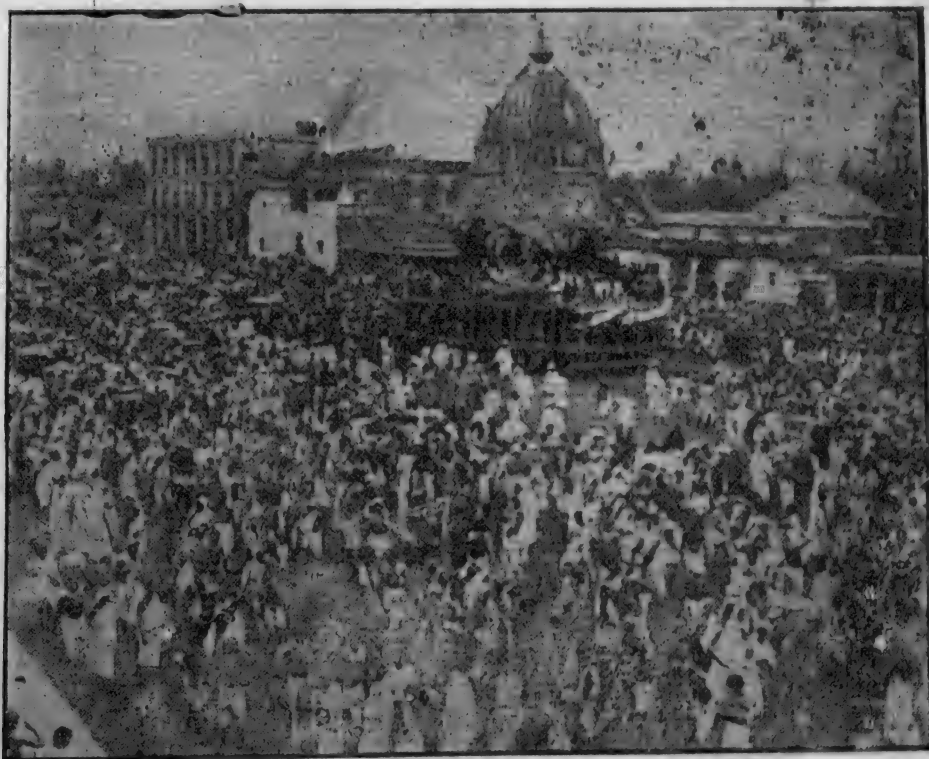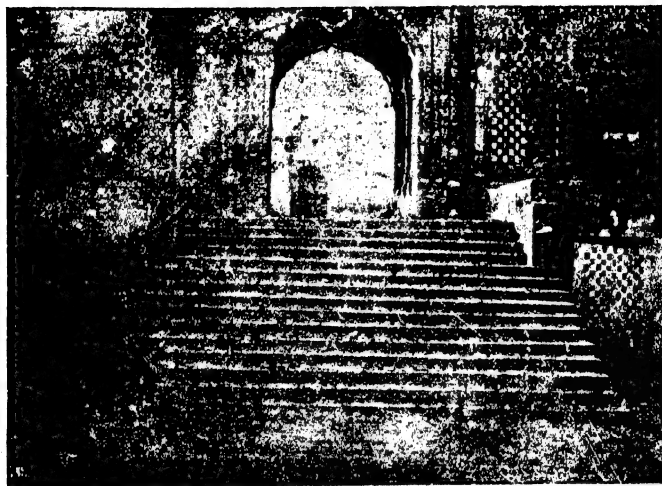
অন্যায় বলে মনে হয়। যে স্বামীকে আমি অযোগ্য বা একসঙ্গে বাসের অনুপযুক্ত ব'লে ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে চাইব, তার এক কপর্দ্দকও আমি গ্রহণ করিবো না, সে ক্ষেত্রে যদি আমার যথাসাধ্য করে দিন কাটাতে হয় তাও ভাল তাও সম্মানকর! কিন্তু আমাকে যদি তারই দেওয়া দয়ার দান মাথায় তুলে নিতেই হয়, তা'হলে তার সঙ্গে এক হ'য়ে শত অত্যাচার সয়েও থাকা উচিৎ।"

চন্দ্রাবতী একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিল "হুঁ, স্বামীর উপর স্ত্রীর অথবা স্ত্রীর উপর স্বামীর কোন দাবী থাকা উচিত নয়, দুজনার সম্পর্ক mutual হওয়া উচিত।"

যশোদা বলিল "নিশ্চয়, কিন্তু অনেক স্ত্রীরা একেবারে চরমে গিয়ে ওঠে, জানো? দাবীর মাত্রাটা মাঝে মাঝে মৃত স্বামীর জামা কাপড় ইত্যাদি নূতন স্বামীর জন্য চাওয়া পর্য্যন্ত।"

চন্দ্রা হাসিয়া একটু ভাবিয়া বলিল "শুনেছি, আমি আরো শুনেছি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বিধবা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে, নূতন স্বামী ও তার ছেলে মেয়েকে নিয়ে সেই মৃত স্বামী র বাড়ীতে গিয়ে আরামে বাস করে।"

যশোদা উত্তেজিত স্বরে বলিল "হ্যাঁ আমি জানি। ছি ছি! এদের নারীত্ব, মনুষ্যত্ব বলে কোন জিনিষ নেই, আর সেই নূতন স্বামীকেও এ রকম পুরু চামড়ায় গা ঢাকার জন্য ধন্যবাদ দি। এরকম লোক ভাগ্যি পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু আমি দেখেছি তাদের সমাজ এদের বাহবা দিয়ে, হাততালি দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে কুণ্ঠিত হয়না।"

"পালানোটা দোষের বলছ, না ঐ ভূতপূর্ব্ব স্বামীর অর্থপুষ্ট নূতন স্বামীর সঙ্গে তারই বাড়ীতে বাসটা?

"সে পালিয়ে নরকে যাক্ সে কথা বলছিনা, কিন্তু আবার সেইখানকার অর্থ নিয়ে নূতন স্বামী পোষণ তারপরে তারই গৃহে বাস। তাদের সমাজের বিবেকে একটু দ্বিধা আসেনা এদেরই নিয়ে গর্ব্ব ক'রতে, আমি তাই ভাবি। একটা অত্যন্ত ঘৃণনীয় নীচতা। সত্যি আমারই যদি কোন দিন এমন মতি হয়, তাহলে আমার স্বামীর বাড়ীর কাছে আমি মৃত হ'য়ে রইব চির-কাল, সেখানকার এককণা বালুও আমার কাছে অস্পৃশ্য তাতে উপবাসে মরতে হয় তাও স্বীকার।"

চন্দ্রা হাত বাড়াইয়া বলিল "একটা সিগারেট দাও please! তোমার ওদিকে ঐ যে" যশোদা একটী সিগারেট দিয়া ধরাইয়া দিল। চন্দ্রা খানিকক্ষণ নীরবে ধূমপান করিয়া বলিল "দেখো, তুমি এটাকে এতো করে নিন্দে করছ, কিন্তু তাদের পক্ষে এটাই নির্ভীকতা, সাহসিকতা। আজকাল practical যুগে লোক practical হ'তে ভালবাসে। কোন রকম Sentimentalityর ধার ধারেনা। তুমি যে রকম নিন্দে করছ, অনেকে হয়তো সে রকম করছে, আবার অনেকে বুদ্ধিমতী বলেও তাদের আদর্শ ideal করে তুলে ধরেছে।"

যশোদা বিরক্তি ভরে বলিল "তা তুলুক, কিন্তু আমার মনে হয় এটা নীচতা।"

"নীচতা তোমার মতে কিন্তু যেখানে বুদ্ধিমত্তার মাপকাঠিতে মানুষকে ওজন করা হয়, সেখানে তারা খুব বড় পদই পাবে।"

"তাহলে উচ্চ নীচ বিচার একটা নেই?"

"ব্যক্তিগত ভাবে আছে, বিশ্বজনীন একটা কিছু নেই।"

যশোদা উত্তেজিত ভাবে একটু নড়িয়া বসিয়া বলিল "কি বলছ চন্দ্রা?"

চন্দ্রা হাসিয়া সিগারেটের শেষ অংশটা ফেলিয়া দিয়া বলিল "making a virtue or vice of necessity; যা দরকারী যা প্রয়োজনীয়, তাকে বিশ্লেষণ করে নানা রকমে ন্যায় বা অন্যায় বলে দাঁড় করানো। কেউ কেউ বলবে তোমরা সেকেলে। তাছাড়া বিবেক সততা আর কিছু নয়, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা মাত্র।"

"দুর্ব্বলতা? তবে এ দুর্ব্বলতা যেন আমার চিরকাল থাকে। সেকেলে বললে বলুক গে। কিন্তু যা অন্যায় নীচ সেগুলো নিন্দে করবো আমি চিরকাল। তোমার বুঝি খুব ভাল লাগে? তুমি তো দিব্যি দেখছি বেশ সায় দিয়ে চলেছ।"

সায় দিচ্ছি না, যাক্ অরুণা এসেছে।"

"সত্যি? আমার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি কেমন আছে?"

"আছে এক রকম—কিন্তু ঐ তো! আমি আর সাধে বলি মেয়েদের পক্ষে ideal খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। কারণ যেহেতু তাদের, তাদের চেয়ে বেশী বয়সের পুরুষদের বিয়ে করতে হয়, সেই জন্য তাদের idealismটা গড়ে উঠবার ঢের আগেই তাদের স্বামী হবার উপযুক্ত পুরুষদের idealism গড়ে ওঠে।"

"তাহলে কি করতে বল ?"

চন্দ্রা হাসিয়া বলিল"Idealistic grown up মেয়েদের বলি তাদের চেয়ে বয়সে ছোট পুরুষদের বিয়ে করতে। এমন কি বছর দশেকের difference এও বড় যায় আসেনা। তাহলে তারপরে সেই কচি স্বামীটাকে নিজের মন মত গড়ে তুলে জীবনটাকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।"

যশোদা উচ্চ হাসিয়া বলিল "বেশ theory বের করেছ। আজকাল পুরুষরা শিক্ষিতা বড় মেয়ে বিয়ে করতে ভয় পায়, তাই অনেকে শিক্ষিতা সমাজে মিলে মিশে শেষে একটী গ্রাম্য মেয়েকে বিয়ে করে শান্তি খুঁজে নেয়।"

চন্দ্রা বলিল "তারাই idealistic পুরুষ। নিজেদের ideal খুঁজে বেড়ায়। তারপরে হতাশ হয়ে গ্রাম্য মেয়ে বিয়ে করে নিজেদের মন মত তাদের গড়তে পারবে বলেই। কারণ কি মেয়ে কি পুরুষের পক্ষে জীবন্ত ideal খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, কারণ লোকে আদর্শ তৈরী করে নিখুঁত করে অথচ নিখুঁত মানুষ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই বলছিলুম মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের পক্ষে নিজেদের ideal তৈরী করে নেওয়ার সুযোগ ও সুবিধা হয় অনেক বেশী, কিন্তু মেয়েরা তা পারে না, সেই জন্য এই নিয়ে যত গণ্ডগোল জীবনে।"

"তা'বলে বয়সে ছোট স্বামী কি বিশ্রী।"

"মন্দই বা কি ? চ'লে গেলে সয়ে যাবে। কচি স্ত্রীদের উপর স্বামীরা যেমন কর্ত্তৃত্ব করে স্ত্রীরাও সে রকম করলই বা—বেশ একটা নূতনত্ব নয়। নূতনত্বই বা বলি কেন—হিন্দুস্থানের অনেকখানে এ প্রথা চলিত আছে। আমি চাই সবখানেই তা হবে—। অথবা আর এক উপায় আছে—Divorce—"

"ছুটোই কি বিশ্রী, ভাবতেও খারাপ লাগে।"

চন্দ্রা ধীরে ধীরে বলিল "তাহলে মেয়েদের শিক্ষিতা করোনা। তাদের চোখ ফুটিয়ে দিওনা, তাদের আমিত্বটাকে জাগিয়ে দিওনা। ছোট বয়সে বিয়ে দিয়ে, তাদের স্বামী যেমনই হোক্ না কেন, আদর্শ দেবতা বলে পূজো ক'রে তৃপ্ত হ'তে শেখাও। তবুও তার মনের ভিতর একটা আকাঙ্ক্ষাকে টিপে মেরে ফেলতে পারবেনা কারণ মানুষ জাতির কি পুরুষ, কি নারীর এই চির অনুসন্ধিৎসু ভাবটা চিরকাল থাকবে ও তাকে খোঁচা দেবে। ওটা তাদের জাতিগত জন্মগত দান। তাই সেকাল থেকে নারী চির নির্য্যাতিতা হয়ে এসেছে শক্তিশালী পুরুষের হাতে। এটা brutality, barbarism,—। এটা কল্পনায় আনা যায়না। তাই মেয়েদের দিতে হয় মনুষ্যত্বের অধিকার, সেই শিক্ষা দীক্ষা, আর তার সঙ্গে মানিয়ে চলবার জন্য সেকেলে সামাজিক এবং আইনের শৃঙ্খল তাদের পা থেকে খুলে ফেলে দিতে হবে। তা না হ'লে মিষ্টি এবং তেতোর ভিতর প্রভেদটা ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েও জোর করে তাকে তেতো খাওয়ানোর মত হ'য়ে পড়ে এ। তার চেয়ে তারই হাতে স্বাধীন বিচার ভার তুলে দেওয়া উচিত।"

যশোদা মৃদু হাসিয়া বলিল "বিদ্রোহী নারীনেতৃ। কোন ব্যক্তিগত কারণ আছে নাকি ?"

চন্দ্রা একটা ছোট হাই চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "না সে রকম ব্যক্তিগত কোন কারণ নেই।"

"রণধীরের সঙ্গে চলছে কি রকম ?"

চন্দ্রা অনাবশ্যক ভাবে টেবিলের উপর কতগুলি জিনিষ নাড়িয়া চাড়িয়া আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া বলিল "অস্বাভাবিক কোন রকম কিছু নয়।"

"তোমার আবার অস্বাভাবিক কথাটার অনেক রকম মানে হয় কিনা, আমি জিজ্ঞেস করছি জগতের মতে অস্বাভাবিক অথবা আমার মতে অস্বাভাবিক ?"—

বাধা দিয়া চন্দ্রা বলিল "জগতের কাছে অস্বাভাবিক কি বলছ ? যা তোমার কাছে অস্বাভাবিক আমার কাছে তা হয় তো স্বাভাবিক। কি করে জগতের মত

লক্ষ লোকের মতামত আমি এক কথায় প্রকাশ করি বল? আর তোমার মতামত?—কে বলতে পারে আজ তুমি যা অস্বাভাবিক বলে মনে করে দূরান্ত পেছিয়ে যাচ্ছ—ঠিক কালই আবার তাই স্বাভাবিক ব'লে মেনে নিতে দশ পা এগিয়ে আসবে—"

যশোদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "তোমার সঙ্গে পারা যাবে না, তর্ক করতে করতে রাত হয়ে যাবে, আমি চললুম।"

চন্দ্রা হাসিয়া বলিল "আর একটু বোসইনা—এই তো লাঞ্চের সময় হ'য়ে এলো সকলেই এসে পড়বে এক্ষুণি।"

"তা'হলে change ক'রে আসি—"

"কি হবে change ক'রে, শুধু হয়তো অরুণা আসবে—"

হাসিয়া যশোদা সোফার উপর বসিয়া পড়িল, বলিল "তোমার মাথা খারাপ, এই বললে সকলে আর এই বলছ শুধু অরুণা—"

চন্দ্রা ঘরের ভিতর পায়চারী করিতে করিতে হাসিয়া বলিল "ঐ, তার মানেই তাই। আচ্ছা সত্যি ক'রে বলতো তুমি তোমার নিজের অবস্থা নিয়ে সুখী আছ? প্রাণ তোমার আর কিছু চায় না?"

যশোদা বলিল "না; আর কিছু চায় না।"

চন্দ্রা থমকিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "সত্যি ক'রে বলতে পার? তোমার নিজের অবস্থা নিয়ে তুমি সুখী আছ? প্রাণ তোমার আর কিছু চায় না?"

যশোদা হাসিয়া সোফার উপর লুটাইয়া পড়িল, বলিল "না—"

"চায়না? তোমার দুর্ভাগ্য! সে একটা সন্ধানের উৎসাহ, খুঁজে পাওয়ার আনন্দ তারপরে জয়ের উল্লাস। একটা রীতিমত প্রবল energy, তা যদি তোমার না থাকে, তবে বুঝলুম তোমার মনে মরচে ধরেছে। প্রাণ বিহীন একটা কলের মানুষ তুমি জগতের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছ—"

"রক্ষে কর, soul mate খুঁজে বেড়ানোটাই জীবনের একটা মস্ত বড় উদ্দেশ্য হ'ল বুঝি?" "soul mate বললুম বুঝি আমি? আগে soulই আছে কিনা তাইতো ঠিক হোক তারপরে তার mate কে খোঁজা যাবে, কিন্তু আমি বলছি বড় একটা কিছু পাবার জন্য চেষ্টা করা, একটা aim একটা ambition তোমার জীবনে কিছু নেই?"

"না ভাই কিছু নেই তুমি আর আমার মাথাটা খারাপ ক'রে দিও না—"

"বুড়ো বয়সে তোমার মাথা খারাপ? আমি করবো?"

"উঃ তুমি যে কোন লোকের মাথাটা এখনো গুলিয়ে দিতে পারো। তোমার এত বড় aimটা কি জিজ্ঞেস করি?"

"আমার aim—? পাগলের পাগলামি! যশোদা; আমি চাই ক্ষমতা, প্রতিপত্তি—আমি চাই একটা জাতির কর্তৃত্ব—একটা মস্ত বড় বাহিনীর নেতৃত্ব—আমি চাই বিরাট একটা ধ্বংস স্তূপের উপর একটা স্বাধীন জাতির প্রতিষ্ঠা করতে—আর একটা French revolution টেনে আনতে আবার ইটালীর মত O bella Liberta গাইতে—"

যশোদা বলিল "ওঃ তাহলে তোমার ভিতরেও আগুন আছে দেখছি—"

"না, আগুন নেই আগুন জলে পুড়ে ছাই ক'রে নিজে নিবে যায়—কিন্তু জগতে হ'তে হয় জলের মত অদম্য, জলের মত বেগবতী—জলের মত ক্রুর! সে শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে ঠিক তার নিজের মত পথটুকু ক'রে নিয়ে চলে যায় দেশ বিদেশ ভাসিয়ে দিয়ে।"

"তোমার এ বড় বড় তত্ত্ব আমি বুঝতে পারি না—পরশু দিন যেতে হবে আমাকে—"

"কেনো?"

"ওদিকে বাড়ী ফেলে এসেছি। বিশেষতঃ ছেলে মেয়েরা—"

"কি জানি আমার কোনদিন এ সখটা হল না। আমার মনে হয় কি রকম disturbing জিনিষ ওরা—"

যশোদা মৃদু হাসিয়া বলিল "তোমার হবে কি ক'রে তুমি যে অন্য জিনিষে তৈরী। কিন্তু আমার মনে হয় ওরাই বুঝি অন্তরের দূরত্বটুকু কাছে টেনে এনে আরো নিবিড় করে বেঁধে দেয়—"

চন্দ্রা হাঁটা থামাইয়া একটী সোফায় বসিয়া শুধু বলিল "শুধু দুটী অন্তরকে কাছে টেনে আনা ছাড়া আরো কিছু বড় উদ্দেশ্য নিয়ে ছেলে মেয়ে জন্ম দিতে হয়। ওদের নিয়ে এলেনা কেন?"

"পড়াশোনার ক্ষতি হবে সেই জন্যই। হাঁ্যা সত্যি! তোমার যখন হবে বুঝবে। বড় উদ্দেশ্য সাধিত হোক না হোক্—কিন্তু সংসারের আনন্দ ওরা, ওদের ভিতর নতুন ক'রে আমি আমার শৈশব কৈশোর দেখতে পাই। তারপরে আমার যৌবনও দেখতে পাবো। তখন আমি বুড়ো হ'য়ে গেলেও আর কোন ক্ষোভ থাকবে না, মরে গেলেও দুঃখ নেই। কারন আমি আবার আমার সন্তান সন্ততির ভিতর দিয়ে বার বার পৃথিবীতে ঘুরে ফিরে শৈশব কৈশোর যৌবন ভোগ ক'রে যাবো—"

চন্দ্রা আর একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল "শুনলেও ভরসা হয়—"

"দেখো আমার ইন্দিরা, সুনীতি বড় হ'লে তাদের যখন সাজাবো আমারি পারিপট্য দিয়ে, তখন আমার আর নিজের সাজবার আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। তাদের ভিতর দিয়ে আমার সব আশা পূর্ণতা লাভ করবে। সত্যি, আমি আমার ছেলে মেয়ে ছাড়া নিজের অস্তিত্বটা কল্পনাই করতে পারি না—"

"মিসেস নারাণ কিন্তু উল্টো বলে—"

"ওটা একটা brute ওর কথা ছেড়ে দাও—"

"ছাড়বোই বা কেনো?"

যশোদা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল "আর দুপুর রোদে তর্ক ক'রে মাথাটা কেনো গরম করাচ্ছ? উঃ ক্ষিদেও পেয়ে গেল। লাঞ্চ ফাঞ্চ খাও তো চল—"

চন্দ্রা হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া পিয়ানোর উপরিস্থিত সুদৃশ্য ঘড়িটীর দিকে চাহিল—বলিল "ও! তাই, আমার ঘড়িটা বন্ধ হ'য়ে গেছে—" তারপরে হাতের ঘড়িটা খুলিতে খুলিতে বলিল "Superstition মানো?"

"আর আমি তোমার কোন কথার জবাব দেবোনা—"

"কিন্তু এখনো lunch এর একটু দেরী আছে—ততটুকু সময় কথা বলতেই হবে।" তারপরে চন্দ্রা অনেক কথাই বলিল। সে বলিল সমগ্র ইওরোপ ভ্রমণ করিয়া তাহার আনন্দ যত না হইয়াছে তত বেশী হইয়াছে ক্ষোভ। প্রত্যেক জাতির ভিতর এখনো এতো অকৃত-কার্য্যতা, এতো পশ্চাদনুবর্ত্তিতা, এখনো এতো ভুল। নারী জাতির উপর জগতের পুরুষদের এতো অবিচার যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, আজ যদি সে স্বাধীন এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত! এবং পর পর সে তাহার স্বপ্নের সঙ্গুপ্ত ছবিগুলি একে একে মেলিয়া ধরিল যশোদার বিস্ময় বিহ্বল চোখের সামনে। আজ পুরুষ নারী শক্তিকে এতোখানি হেয় করিয়া রাখিয়াছে। পুরুষের কর্ত্তৃত্বের অন্তরালে কত প্রকৃতিগত রমণী প্রতিভা নষ্ট হইয়া যাইতেছে ইতিহাসে সেই জন্য বিধবা এবং কুমারী ছাড়া আর কোন রমণী কখনো সুগৃহিণী ভিন্ন বহির্জগতে আর অন্য কোন বিষয়ে খ্যাতিলাভ করিতে পারে নাই।

একটু পরেই কয়েকজন আসিয়া লাঞ্চের জন্য সমবেত হইল। অরুণা খানিক পরে একটু চঞ্চল ভাবে প্রবেশ করিল এবং উৎসুক আগ্রহ ভরা চোখ দুটী দিয়া চারিদিকে দেখিয়া, একটু হতাশ এবং পরক্ষণে একটু আশ্বস্ত ভাবে এক পাশে বসিয়া পড়িল। সকলে নানা রকম আলাপ করিতেছিল। 'বয়'গুলি সুদৃশ্য ট্রের উপর গ্লাস পূর্ণ করিয়া নানারূপ পানীয় পরিবেশন করিতেছিল। অরুণা সাগ্রহে পর পর দুইটী গ্লাস তুলিয়া লইয়া, এক নিশ্বাসে শেষ করিয়া একটী সিগারেট ধরাইল। একটু পরে চন্দ্রাবতী তাহার নিকটে আসিয়া ঝুঁকিয়া নিম্নস্বরে বলিল "প্রবীরের জন্য অপেক্ষা করছি; কিন্তু অরুণা, সকলের সামনে একটু সাবধানে চ'লো, সেই জন্য টেবিলে তার কোন পাশেই তোমার জায়গা দিইনি।"

হঠাৎ অরুণা বিরক্তি ভরে বলিল "তাহলে আমার এখানে এসে লাভ? আমি তবে চললুম।"

চন্দ্রা মৃদু হাসিয়া বলিল "আমি আর যা কিছু হ'তে পারি কিন্তু dirty pimp হ'তে পারি না। তবে এটুকু দুর্ব্বলতায় প্রশ্রয় না দিয়ে থাকতে পারবোনা এও ব'লে দি, তোমাকে বাধা দেবোনা কারণ আমি জানি তুমি একটী নিরেট বোকার মত তাকে ভীষণ ভাবে ভালো-বেসে ফেলেছ।"

একটু পরেই প্রবীর সিংহ প্রবেশ করিল।

সুন্দর সুসজ্জিত "মেহগনি" কাঠের টেবিলের উপর লাঞ্চ পরিবেশন করা হইয়াছিল। অরুণা নিজের স্থান প্রবীরের ঠিক সম্মুখে দেখিয়া আনন্দিত হইল। প্রবীরের একপাশে গৃহকর্ত্রী চন্দ্রাবতী ও একপার্শ্বে সুলতা বসিয়াছিল, অরুণার একপার্শ্বে গৃহকর্তা রণবীর ও অন্য পাশে দিলীপ। দিলীপের পাশে অম্বার স্থান দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু তাহার স্বামী বুড়ী মিসেস নারাণকে সেই আসনে বসাইয়া স্ত্রীটীকে নিজের কাছে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। দিলীপ মনে মনে বুড়ার মুণ্ডপাত করিয়া বলিল "Damn it all! Rascalটার জন্য এই উপাদেয় লাঞ্চটা না খেলে নিজেকেই পস্তাতে হবে—কিন্তু ডানদিকের সঙ্গিনীটি কি চমৎকার উপাদেয়।"

বুড়ী মিসেস নারাণ নিজকে সবার চাইতে সুন্দরী মনে করে এবং এই টুকুতেই তাহার বড় আনন্দ! বয়স তাহার ৪০শের উপর হইলেও সে ব্যবহারে কথায় হাবভাবে ১৬ বছরের যুবতীর মত চলে। দিলীপ আড়চোখে তাহার দিকে কয়েকবার দেখিল—সে তখন গালে এবং ঠোঁটে ভীষণ ভাবে রং লাগাইয়া উজ্জ্বল রংএর একখানি সাড়ী পরিয়া সশব্দে সুপটুকু নিঃশোষিত করিতেছিল। দিলীপ মনে বলিল এখনই সে রাণী চন্দ্রাকে বলিবে ভবিষ্যতে এইরূপ সঙ্গিনী দিলে সে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া যাইবে। পরক্ষণেই সে অরুণার দিকে ফিরিল! অরুণার সঙ্গে দিলীপের অনেক দিনের আলাপ। প্রথম দিকে সে বেশ প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টি দিয়াই ইহার দিকে চাহিয়াছিল অবশেষে অপেক্ষায় অপেক্ষায় এবং অরুণার সরল ব্যবহারে সে প্রেমটুকু চলিয়া গিয়া আছে এখন শুধু শ্রদ্ধা, প্রশংসা ও নিছক বন্ধুত্ব!

অরুণা বুঝিতে পারিতেছিল সম্মুখস্থ চক্ষুদুটি বারবার চারিদিক ঘুরিয়া তাহারই দিকে ফিরিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সে নিজে সাহস করিয়া চাহিয়া দেখিতে পারিতেছিলনা। একি দুর্দমনীয় উন্মত্ততা তাহাকে জ্ঞান শূন্য করিয়া তুলে, এই একটী প্রাণীর সান্নিধ্যে! সে জগত ভুলিয়া যায়, বাহিক যাহা কিছু তাহার সংজ্ঞা হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, থাকে শুধু উজ্জ্বল হইয়া প্রবীর সিংহ আর কেহ নহে, কিছু নহে। তাহার সমস্ত জ্ঞান-বুদ্ধিকে আলোড়িত করিয়া দিয়া, সব কিছু ঘনীভূত অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়া তাহারই মধ্যে হীরক চন্দ্রিমা সম থাকে প্রবীর সিংহ। তাহার বিবেক বুদ্ধি বিবেচনা এমন কি মনুষ্যত্বটুকু পর্য্যন্ত পরাজয় মানিয়া কোন গোপনে আশ্রয় লয়, তখন থাকে শুধু অরুণার দেহ ও মনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত তরঙ্গোচ্ছ্বাস। তবু নিজেকে বাঁধিয়া রাখিতে একি অসহনীয় যন্ত্রণা, দেহের প্রতি শিরা উপশিরার একি করুণ আর্ত্তনাদ। প্রাণের একি নিদারুণ মর্ম্মপীড়া। সে কি করিবে? ইহার চাইতে না আসিলেই ভাল হইত। কিন্তু না আসিয়াও তো পারে না সে!

রঘুবীর মৃদু হাসিয়া বলিল "কি অরুণা, ব্যাপার কি?

লজ্জিত ভাবে অরুণা বলিল "কিছু না"

"কিছুনা? আমার চোখদুটো কাঁচের নয় বুঝলে? তোমার আমার একটা আত্মীয়তা আছে তদুপরি বন্ধুত্ব, তবে যদি কোন সাহায্যের দরকার হয় কোন দিন আমাকে বলো।"

"হঠাৎ সাহায্য দরকার হবে কিসে?"

"কিসে? কারণ—কারণ অনেক! ওরা জগতকে উপেক্ষা করে চলে, ওদের কাছে আবরণ নেই, কো কিছুতে আবদ্ধ নেই—পবিত্রতার মর্য্যাদা বোধ নেই। ওরা সব চায় জোর করে খোলা খুলি ভাবে নিতে, নিজেদে বশে রাখতে জানেনা ওরা, আর রঘুবীরও একজন রাজা কাজেই; আরো একদিকে আছে।"

'কি বলছ যা তা বাজে কথা আরো একটা দি কি?"

"সেটা উল্টোটা—আজ সে তোমাকে কত ভাবে ভা বাসা জানাচ্ছে তোমাকে মাথার মণি ব'লে কতব আদর ক'রে বোঝাতে চাচ্ছে কিন্তু কে বলতে পা পরক্ষণেই সে তোমাকে তার পূজার সিংহাসন থেকে টে ধূলার উপর ফেলে দেবে। কেনো? শুধু দেখবার জ —একটা সখের জন্য তুমি পূজিতা হয়েও লাঞ্ছনাটা ভাবে নাও এইটুকু দেখবার জন্য। যেমন এরা হাত লড়াই দেখে ষাঁড়ের যুদ্ধ দেখে, পালোয়ানের যু

দেখে—ঘোড়দৌড় খেলা করে ঠিক সেই ভাবেই। এরা তোমাদের নিয়ে খেলতে ভাল বাসে—"

"কিন্তু আমি এইটুকু জানি তুমি যতটা বলছ ততটা তারা নয়—তুমিও তো একজন রাজা—আমার স্বামীও একজন আর বাবা ও তো"

"ঐ তো সেই জন্যই বলছি, তবে আমরা রাজা ওরা মহারাজা আমাদের চেয়েও এক কাটি সরেস! নিজেদের তো সাধু বলছিনা—তবে অনেকে সেটা বুঝতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে, অনেকে পারেনা বা পেরেও করেনা! ওদের বিশ্বাস করোনা অরুণা। তুমি চোদ্দবার জন্ম নিয়ে এলেও এদের চিনতে পারবে না। এরা আকাশের মত ফাঁপা মেঘের মত লঘু, পরিবর্ত্তনশীল, চপল, চঞ্চল এরা কখন কোন রঙে রঙিন হ'য়ে ওঠে তা তারা নিজেরাই বুঝতে পারে না। কাজেই সাবধানে চলো।"

কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় অরুণার বুকখানি কাঁপিয়া উঠিল।

লাঞ্চের পর অরুণার ইচ্ছা হইল ঘরে পলাইয়া যায়—কিন্তু পারিলনা। ইতিমধ্যে সকলে তাহার সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিল। আধঘণ্টা পরেই তাহার প্রবল আগ্রহ হইল প্রবীরের সঙ্গে কথা বলে, মনে মনে যে সঙ্কল্প করিয়া সে লাঞ্চে আসিয়াছিল তাহা আর সে ধরিয়া রাখিতে পারিলনা। তাহার যে সর্ব্ব স্বত্ত্বা সর্ব্ব অস্তিত্ব তাহারি পায়ে অসহায় ভাবে লুটাইয়া পড়ে। রণবীরের সমস্ত উপদেশকে ডুবাইয়া দিয়া-অরুণা ভীত ভাবে উপলব্ধি করিল প্রবীর ছাড়া তাহার আর অন্য গতি নাই!

× × ×

শীতের সূর্য্য অস্তগামী হইয়াছে। চারিদিকে ধূসর আবরণে ঢাকিয়া দিয়া কুয়াসা নামিয়াছে। দিনের জলরাশিকে কাঁপাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে হিমশীতল বাতাস বহিয়া প্রকৃতির সারা অঙ্গে শিহরণ তুলিয়াছে। তবু সে দিকে প্রবীর ও অরুণার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। রক্ত গোলাপের ক্ষেতের আড়ালে একটী লোহার বেঞ্চের উপর তাহারা বসিয়াছিল। প্রবীরের হাতের মুঠার ভিতর অরুণার হাত দুইটী অবশ হইয়া গিয়াছে আবেশে। প্রবীর সজোরে হাতদুইটী একটু টিপিয়া দিয়া বলিল—"বুঝেছ অরুণা? আমি আর এ খেলা সহ্য করতে পারছিনা। ধৈর্য্য, অপেক্ষা এসব আমার রক্তে নেই, তবুও অনেকদিন করেছি, কিন্তু এখন আর না! জগতে আগুন লেগে যাক্, পৃথিবী ধ্বংস হোক্, যত প্রাণী জগতের সব বিরাট ভূমিকম্পে মাটীর ভিতর মিশিয়ে যাক্ তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি আর থাকতে পারছিনা। ছলে বলে কৌশলে আমি তোমাকে চাই—বুঝলে? তোমাকে জীবন সঙ্গিনী করতে চাই। কিন্তু কি ক'রে তোমাকে পাবো? টাকা টাকা! অরুণা! তোমার স্বামীকে টাকা, ঐশ্বর্য্য, পদ-মর্য্যাদা কি দিয়ে বশ করতে পারি?"

ধীর স্বরে অরুণা বলিল "দুঃখের বিষয় কোন কিছু দিয়ে নয় প্রবীর—কারণ তার সব কিছু যথেষ্ট আছে—আর আমাকে দিয়ে তোমার যত খানি প্রয়োজন—তারও তার চেয়ে কণামাত্র কম নয়।"

"অসম্ভব, মিথ্যাকথা, হ'তে পারেনা। আমার প্রয়োজন কতখানি তা তুমি কি বুঝবে, সে কি বুঝবে? সে তোমা ছাড়া হ'য়ে কতখানি যন্ত্রণা সহ্য করে? কিন্তু আমি? অরুণা আমাদের শরীরের ভিতর যে স্বাধীনতার মুক্ত বাধাহীন রক্ত স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, তার ফেনিল উচ্ছ্বাস কি দিয়ে রোধ করবো? আমি পারি না।"

উচ্ছ্বসিত স্বরে অরুণা বলিল "আমিও তো পারিনা প্রবীর! আমারও সমস্ত বিচার বুদ্ধি পরাজিত হ'য়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়তে চায়, তোমার কাছে আমি আমার সব শক্তি হারিয়ে ফেলি। সেইজন্য সকালে তোমার কাছ থেকে পালিয়েছিলুম।"

"তবুও তো তোমাকে আমার কাছে আনতে পারছিনা— যার যা খুসী বলুক, যা হয় হোক, চল আমার সঙ্গে।"

"ঐটুকু করতে আরো প্রবল কি যেনো একটা আমাকে বাধা দিতে চায়, প্রবীর, আমার ছেলে আছে।"

প্রবীর হাসিয়া উঠিল, বলিল। "অসার একটা কারণ দেখিয়ে আমাকে ভোলাতে চাও?, তোমার বাধন কি ঐ এক ছেলেতেই শেষ?"

"আমার মাতৃত্ব না হোক্ আমার স্বামীর পিতৃত্ব।"

"তাই বা শেষ কি ক'রে বল? কিন্তু ওসব বড় বড় তথ্যের কথা ভাববার সময় নেই, শক্তিও নেই। অরুণা! কোথা থেকে কি সুন্দর মিষ্টি সুগন্ধ ভেসে আসছে, কি যেনো কিসের সুখ স্মৃতি, কতদিনের কত আবরণের অন্তরাল থেকে আজ ছুটে বেড়িয়ে আসতে চায়। মনে পড়ে তোমার? বলতো?"

অরুণা গভীর ভাবে নিশ্বাস টানিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "মনে পড়ে! ভুলতে চেষ্টা করলেও জীবনে অনেক কিছু ভোলা যায়না। একদিন বার্লিনে তুমি আমি সখ ক'রে সাধারণ একটা হোটেলে ঢুকেছিলুম— সেখানে তখন বড় কেউ ছিল না, কিন্তু সমস্ত ঘরটা ফুলে ভরা ছিল, ঠিক এমনি সুমিষ্ট গন্ধে ঘরের বাতাস ভরপুর হয়েছিল।"

প্রবীর স্বপ্ন বিজড়িত স্বরে বলিল "তারপর?"

"তারপরে?"

বলিয়া অরুণা মৃদু ম্লান হাসি হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

প্রবীর বলিল "সামনে এই বিস্তৃত জলরাশি দেখে কি মনে হয়? মনে হয় ভেনিস? সেই তোমার কি একটু অসুখ হ'ল তারপরে seaside এ যাবে বলে চুরি করে ভেনিসে গেলে, একদিনের জন্য আমিও গেলুম। সেই একটা রাতের একটি দিনের স্মৃতিরাশি প্রাণের প্রতি পরতে গাঁথা হ'য়ে গেছে তোমার মনে আছে?"

"মনে আছে বৈকি প্রবীর! মনে না রেখে পারা যায় না যে। এতটুকু গন্ধ, একটুখানি সুর, এতটুকু কথা এক গুচ্ছ ফুল স্মৃতির বন্ধ দুয়ার খুলে দিয়ে, গোছালো ভাণ্ডার আগোছাল ক'রে দিয়ে যায়, তা কি আমার হয় না?"

"না তোমার হয়না, তোমার প্রাণে দয়া নেই, মায়া নেই নইলে তুমি এখনো আমার কাছ থেকে অত দূরে স'রে আছ?"

"তুমি বার বার কেনো আমাকে এতো ভালো করে জেনেও, অনুযোগ করে অযথা কষ্ট দিচ্ছ?"

"তোমাকে কষ্ট দেবার ইচ্ছে নেই ভালবাসি বলেই বলি। কিন্তু এখানে এসে অবসর অনবসর গুলো এতো ক'রে বেছে বেছে চলতে হয়, কে জানতো? তা হ'লে মিছা-মিছি এখানে আসতুমনা।"

"কিন্তু এসেছ ব'লে আপশোষ করছ কেন? তবুও শুধু দেখার কি সার্থকতা নেই?"

"না, ওসব দেখা শোনার সার্থকতা আমার কাছে কিছু নেই। ও কবিতা, ভনিতা, কতগুলো মুখের কথা, ওসব আমি চাইনা।"

"কিন্তু তুমি না এলে কত যে আপশোষ হ'ত আমার সব আলো নিবে যেতো, আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, না এলেই বোধ হয় ভাল হ'ত?"

"কিন্তু এসেছি যখন তখন হতাশ হ'য়ে ফিরে যাবোনা। জানো? মাত্র একটী দিন বাকি, তার পরে চ'লে যেতে হবে আমাকে!"

"কোথায়?"

"সে অনেক কথা! আমার রাজ্যে ভয়ানক বিদ্রোহ অশান্তি দেখা দিয়েছে। এতোদিনের আমার অনুষ্ঠিত অন্যায়, অবিচারগুলি আজ মূর্ত্তি ধরে দেখা দিয়েছে। গবর্ণমেণ্ট উপদেশ দিয়েছে আমাকে কিছুদিনের জন্য বিদেশে ভ্রমণ করতে। ভালোই হয়েছে—একবার দেশে গিয়ে তারপর সেই সুদূর দেশে আবার চলে যাবো সেখানে আমার সব সুখ, সব স্মৃতি মাখা নন্দন কানন-গুলো আর একবার ভালো ক'রে দেখবো, আর শুধু তোমাকে ভাববো। জানিনা হয়তো বা বড় কোন একটা expedition এও চলে যেতে পারি।"

চলবে

মরুর পথে

—উপন্যাস—

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সর্ব্বজন পরিচিতা লেখিকা। তাহার 'মরুর পথে' উপন্যাসখানি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজেরই নানা সমস্যা লইয়া রচিত। বাংলার হরিজন সমস্যা তেমন প্রবল না হইলেও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা কত প্রবল তাহা শক্তিশালী লেখিকা এই উপন্যাসে অতি সুন্দর ভাবেই লিখিতেছেন। আমরা বাংলার শিক্ষিত নর-নারী মাত্রকেই এই উপন্যাস খানি পড়িবার অনুরোধ করি। লেখিকারও অভিমত যে ইহাই তাঁহার বর্ত্তমানে লেখা উপন্যাস গুলির মধ্যে— সুন্দর]

দীনেশ নিঃশব্দে তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিল। হাত বাড়াইয়া বিছানার একটা কোন তুলিয়া একখানা পত্র বাহির করিয়া আর্দ্রকণ্ঠে উমা বলিলেন, "এতদিন একটা কথাও তো বলিনি দীনেশ, আজ আর না বলে পারলুম না। দেখছি শরীরের অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে পড়ছে, যদি হঠাৎ অমনি ভাবে দমবন্ধ হয়ে মারা যাই, কে গোপাকে দেখবে সেই ভেবেই আমি আকুল হচ্ছি। এই দেখ প্রভাকরের পত্র, মাস খানেক আগে পেয়েছি, এ পত্র পাওয়ার পরে আমি আর তাকে পত্র দেই নি।"

সামান্য দুচার লাইন লেখা, দীনেশ একবার চক্ষু বুলাইয়া লইল মাত্র।

একান্ত অসহায়ের মত উমা বলিলেন, "বল দেখি বাবা, আমি এখন কি উপায় করতে পারি, গোপাকে কি করে তার কাছে পাঠাই?

দীনেশ একটু ভাবিয়া বলিল, "দিদিকে আমি কাল পরশু একদিন পাঠিয়ে দেব, তার সঙ্গে এ সব বিষয়ে পরামর্শ করবেন।"

এই সময়ে গোপা ঘাট হইতে ফিরিল।

উমা বলিলেন, "দেখে নাও বাবা, তোমায় আর দেরী করাব না, ও দিকে আবার ঢের কাজ আছে তোমার।"

চুপি চুপি বলিলেন, "ও সব কথা ওর সামনে তুলো না দীনেশ, আমি ওকে এ সব কথা জানাই নি।"

দীনেশ একবার চোখ তুলিয়া গোপার পানে তাকাইল মাত্র।

৮

সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকার তখন সমস্ত গ্রামখানির বুকে কেবলমাত্র ছড়াইয়া আসিয়াছে; পাখীরা বিদায় গীতি গাহিয়া নীড়ে ফিরিয়া গিয়াছে, পশ্চিমাকাশের লাল আভা তখনও সম্পূর্ণভাবে মিলাইয়া যায় নাই।

সুরমা ঘাট হইতে ফিরিয়া কাপড় ছাড়িয়া আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলেন, দীনেশ বাড়ী নাই—কোথায় গিয়াছে; করুণা গোয়াল ঘরে গরুগুলাকে দেখিতে গিয়াছিল। এই সময় উঠানের বেড়ার ও-পাশ হইতে কে ডাকিল, "দিদিমণি, বাড়ী আছেন কি?"

সুরমার আহ্নিক শেষ হইয়া গিয়াছিল তিনি মাটিতে মাথা পাতিয়া প্রণাম করিতেছিলেন, ডাক শুনিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

করুণা গোয়াল ঘর হইতে উঁকি দিল।

আবার কে ডাকিল, "দিদিমণি,—"

সুরমা মাথা তুলিলেন, "কে রে, শিবানী নাকি?"

মেয়েটী বেড়ার দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সুরমা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন—তখনও বাহিরে অন্ধকার ঘন হয় নাই; সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরে, কোন দরকার আছে নাকি, এই সন্ধ্যেবেলায় ঘর সংসার ফেলে চলে এলি যে?"

"ঘর সংসার—"

মেয়েটীর মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিতে না ফুটিতেই মিলাইয়া গেল—

সে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু কোথায় গেছেন দিদিমণি?"

তাহার কণ্ঠস্বরে ফুটিয়া উঠিল উৎকণ্ঠা।

সুরমা উত্তর দিলেন, "সে যে আজ দিন দশ বারো হতে এখানকার ডাক্তারখানার ভার নিয়েছে, সেখানেই সকালে বিকেলে যায়। আজও বিকেলে সেখানে গেছে, এখনও ফেরে নি।"

মেয়েটী তেমনই ব্যগ্রভাবে বলিল, "তাই তো, তা হলে কি হবে ?"

তাহার কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া সুরমা বলিলেন, "কেন তাকে কি দরকার পড়লো হঠাৎ ? একটা আলো দিয়ে যা করুণা, বড় অন্ধকার হয়ে এসেছে, কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না।"

করুণা একটা ল্যাম্প আনিয়া বারাণ্ডায় দিয়া গেল। তাহারই মৃদু আলোকে সুরমা দেখিলেন শিবানী উঠানের এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সুরমা বলিলেন, "ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন অন্ধকারের মধ্যে ? একে তো বর্ষাকাল, চারদিকে যে রকম আওতা, অন্ধকারে পা বাড়াতেই ভয় হয়। ওর মধ্যে দাঁড়াসনে বাপু, বারাণ্ডায় এসে বস।"

শিবানী একটু হাসিল, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমার কিছু হবে না দিদিমণি। আমাদের মত লোকদের সহজে কিছু হয় না, যমও আমাদের ঘেন্না করে পায়ে ঠেলে যায়। ভয় ভাবনা হয় তাদের যারা গেলে অনেকে অনাথ হয়, সেই জন্মেই তাদের সাবধান হয়ে চলা দরকার। এই যে কত আঁধার রাতে ঘুরে বেড়াই দিদিমণি, কখনও কিছু হয় নি— হবেও না।"

সুরমা বলিলেন, "ও কথা বলিস নে বাপু, লোকে কথাতেই বলে—দিন যায় না ক্ষণ যায়; কার কপালে কখন যে কি ঘটবে তা কি কেউ কিছু বলতে পারে ? কথা আছে সাবধানের মার নেই,—সাবধান হয়ে চললেই হয়, কোন ভয় থাকে না। তুই বাপু বারাণ্ডায় বোস ওধারটায় যা জঙ্গল—আমার তো দিনের বেলাতেই ভয় লাগে।"

বিনা প্রতিবাদে শিবানী বারাণ্ডার ধারে বসিল। ল্যাম্পের আলোতে দেখা গেল তাহার মুখখানা বড় মলিন, চোখের পাতা যেন তখনও চক চক করিতেছে।

ছিন্ন মলিন বসনেও তাহার সৌন্দর্য্য উথলিয়া উঠিতেছিল বেশী রকমই; এলোমেলো রুক্ষ চুলগুলা তাহার মুখচোখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। আয়তির চিহ্ন স্বরূপ তাহার সিঁথায় সিন্দুর উজ্জলভাবে জলিতেছে, দুই হাতে দুগাছি শাঁখা, একগাছি লোহাও আছে।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, মহেশ আবার আজ কি করলে, দীনুকে দরকার কেন ?"

শিবানী মুখ নত করিল, মলিন দীপালোকেও দেখা গেল তাহার চোখের জল হাতের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে।

সুরমা বলিলেন, "কাঁদছিস কেন, কি হয়েছে খুলে না বললে জানতে পারব কি করে ? আজ আবার তোর ওপর অত্যাচার করতে সুরু করেছে বুঝি,—মার ধোর করেছে নাকি ?"

শিবানী রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "সে তো কেবল আজই নয় দিদিমণি, ও সব তো আমার গায়ের ভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এযে করবে তা তো জানিই,—ছোট লোকের সঙ্গে মিশলে মানুষ ছোট লোকই হয়ে থাকে—" বলিতে বলিতে হঠাৎ সে থামিয়া গেল, একটু পরে বলিল, "লোকে বলে ছোটলোক সে ছোটলোকই,—তবু এখানে আসবার আগে কেষ্টনগরে থাকতে একটু ভালো ভাবেই চলতো, এমন করে সাত পুরুষ তুলে গালাগালি দিত না কি ধরে ধরে মারত না। এখানে এসে যত জেলে, হাড়ি, বাগদির সঙ্গে মিশে একেবারে অধঃপাতে গেল দিদিমণি, আজ ওর কিছু করতে বাধে না।"

সুরমা বলিলেন, "কেষ্টনগরে তো বেশ ছিলি, সব রকমেই ভালো, তবে মরতে আবার এখানে এলি কেন ?"

প্রবহমান চোখের জল গোপনে মুছিয়া ফেলিয়া শিবানী বলিল, "আমি কি আসতে চেয়েছিলুম দিদিমণি, কর্ম্মসূত্রই যে আমাদের টেনে নিয়ে এল। ও কিছুতেই আর সেখানে থাকলে না, জোর করে এখানে চলে এলো।"

সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন এলো তাও তুই জানিস নে ?"

এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া শিবানী বলিল, "জানি সবই, একদিন সে সব কথা আর কাউকে না হোক—আপনাকে জানাব দিদিমণি। আজও সে সব কথা জানানোর সময় আসে নি, সেই জন্মেই জানাতে পারব না।"

সুরমা বলিলেন, "বুঝেছি,—থাক, আমি তোর কাছ হতে সে সব কথা এখন জানতেও চাইনে। তবে একটা কথার উত্তর দে,—দীনু বলে খৃষ্টান হওয়ার আগে তোরা নাকি হিন্দু ছিলি—কথাটা সত্যি কি ? সত্যি কথা

বলছি বাপু, তোকে দেখলে কিন্তু ছোট জাতের মেয়ে বলে বোধহয় না।"

শিবানী মলিন হাসিল, বলিল, "না দিদিমণি, ওই যে বললুম ছোটজাত চিরকালই ছোটজাত হয়ে রয়েছে থাকবে ও। জাতে নমঃ শূদ্র,—আপনারা আমাদের ঘৃণা করেন তো বড় কম নয়,—আপনাদের সেই অবহেলাই আমাদের অন্য ধর্ম্ম নেওয়ার প্রবৃত্তি দিয়েছে।"

সুরমা খানিক নিষ্পলকে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তুই বেশ লেখাপড়া জানিস তো?"

শিবানী মাথা নাড়িল, "কিছু না দিদিমণি জেলের বউ লেখাপড়া শিখবে কি করে? ভদ্দর ঘরে জন্মালে তবু শিখতে পারতুম—আশা অনেক থাকলেও কিছুই তো পুরল না দিদিমণি।"

বলিতে বলিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল—"ঘরে যাই, কি হল দেখি গিয়ে। দাদাবাবু তো এলেন না, যদি এর মধ্যে আসেন, একবার পাঠিয়ে দেবেন।"

সুরমা বলিলেন, "কি হয়েছে কথাটা বলে যা, তাকে বলব এখন।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শিবানী বলিল, "যা হয় তাই হয়েছে। আজ হাটবার ছিল, হাটে মাছ নিয়ে গিয়ে মাছ বিক্রির পয়সা দিয়ে খুব তাড়ি খেয়ে বাড়ীতে এসে একাকার কাণ্ড সুরু করে দিয়েছে। একখানা দা নিয়ে আমাকে কাটতে এসেছিল, আমি তাই পালিয়ে এসেছি।"

সুরমা চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "কিন্তু আবার এখন বাড়ীতে গেলেও তো সে কাটতে আসবে।"

শিবানী বলিল, "সত্যি কথা বলব দিদিমণি, ওর রাগ বেশীক্ষণ থাকে না, খানিক বাদেই আপনি পড়ে যায়। কতদিন এ রকম হয়েছে, আবার সে রাগ পড়েও গেছে, আমাকে তার রাগ ভাঙ্গানোর জন্যে কিছুই করতে হয়নি। এতক্ষণ দা ফেলে নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছে কিন্তু পেট তো জ্বলছে। আজ সারা দিনটা কিছু খায় নি, সকালে খাবে বলে তাড়াতাড়ি রাঁধলুম, তার আগেই চলে গেল। সমস্ত দিন সেই ভাত তরকারী আগলে রেখে এই বিকেল বেলা আবার সব গরম করেছি। এতক্ষণ রাগ পড়ে গেছে ডাকলেই উঠে ভাত খাবে।"

সুরমা একটু হাসিলেন,—"মাগো, ওই স্বামীকেই তুই আবার এত ভালবাসিস, যত্ন করিস শিবানী—আমি হলে কখনো করতুম না। নিত্যি যে লোক মারতে আসে—কাটতে চায় তাকেই আবার আদর করে ডেকে খাওয়ায়?"

শান্তকণ্ঠে শিবানী বলিল, "কিন্তু যদি দেখি আমি না খাওয়ালে সে খেতে পায় না, তখন তাকে আদর ক'রে ডেকে যে খাওয়াতেই হবে দিদিমণি, এটা যে আমাদের কর্ত্তব্য কাজ। আমরা ছোটজাত হলেও ছোট বেলা হতে শিক্ষা পেয়েছি স্বামীকে দেবতা মনে করতে হয়। দেবতা যাই করুন না কেন, ভক্তকে তা সইতেই হবে, তা ছাড়া আর উপায় নেই যে।"

সুরমা চমৎকৃতা হইয়া বলিলেন, "এত বড় বড় কথা কোথায় শিখলি শিবানী, তোদের খৃষ্টান শাস্ত্রের মধ্যে এ সব কথাও আছে নাকি?"

শিবানী শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "আছে বই কি দিদিমণি; সতীত্ব, স্বামীভক্তি সকল ধর্ম্মেই আছে, কোন ধর্ম্মই এ সব জিনিস উড়িয়ে দিতে পারে নি।"

সুরমা বলিলেন, "কিন্তু, আজকাল বিলেত জার্ম্মানী, আরও অনেক দেশে শুনেছি এসব নাকি জানে না।"

শিবানী বলিল, "সমুদ্রের এপার ওপার অনেক দূর দিদিমণি, নাগাল বড় সহজে মেলে না। আমরা এখনও ওদের মত শিক্ষা পাই নি, সেই জন্যেই এ দেশের যা নিয়ম তাই মেনে চলি। না, রাত হয়ে উঠল, আমি চললুম দিদিমণি।"

চলিতে চলিতে শিবানী বলিল, "লোকে আপনারই মত বলে—যে স্বামী মারে, খেতে দেয় না, সে স্বামীর সেবাযত্ন কর কেন? কেন যে করি তা আর কে জানবে, কেই বা বুঝবে?"

বাহিরে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় সে মিলাইয়া গেল।

সুরমা তবু সেই দিক পানে তাকাইয়া তাহার কথা ভাবিতে লাগিলেন।

(৬)

দীনেশ ডাক্তারের পশার নষ্ট করিবার জন্য মহিম অনেক চেষ্টা করিতেছিল। সে সকলকে বারণ করিতেছিল কেহ যেন দীনেশকে না ডাকে, কিন্তু কাজের বেলায় সবই মিথ্যা হইয়া যায়, সকলেই দীনেশকে ডাকে।

দীনেশের পসার নষ্ট করিতে না পারিয়া মহিম ভারি বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

ভদ্রলোকেরা তবু এক হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সত্যই দীনেশকে ডাকা বন্ধ করিল, কিন্তু সমাজের এক পাশে যাহারা কোনরকমে টিঁকিয়া রহিয়াছে সেই সব তথাকথিত ছোটলোকেরা কিছুতেই রাজি হইল না, তাহারা স্পষ্টই বলিল, "সেটি হবে না কর্ত্তা, মরি বাঁচি আমরা দীনেশ ডাক্তারকে ছাড়তে পারব না।"

ছোটলোকদের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া ভদ্রলোকদের লইয়াই দল বাঁধিল। সেই জন্যই হরলাল রায়ের শ্রাদ্ধে দীনেশের নিমন্ত্রণ হইল না, রাম মিত্রের কন্যার বিবাহেও তাহাকে বাদ দেওয়া হইল।

সে দিন মহিমকে ডাকাইয়া সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "একঘরে করবার মত এমন কি অপরাধ করেছে দীনু— যে তাকে তোমরা এমন করে একপাশে ঠেলে রাখছ? তারপর ওকেই না হয় একঘরে করলে ঠাকুর পো, আমি কি অপরাধ করেছি বল দেখি? তোমার ঘরে থাকলে নিশ্চয়ই একঘরে হতুম না—"

মহিম মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা হতে না। সত্যি কথা বলতে পারি বউ দি, আজ যদি তুমি ওই মেয়েটাকে বাড়ী হতে বিদায় করে দিতে পার আজই তোমায় সবই সসম্মানে বরণ করে নেবে। তা ছাড়া আরও একটা কাজ করতে হবে বউদি, তোমার ওই ভাইটাকে সামলাতে হবে যেন ও রকম করে ছোটলোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে না বেড়ায়।"

সুরমা একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কি বলে জানো তো ঠাকুর পো? আশ্রিতকে হিন্দু কখনও ত্যাগ করে নি, নিজের ক্ষতি সহ্য করেও তাঁরা আশ্রিতকে রক্ষা করেছে। করুণাকে দুনিয়ার কেউ আশ্রয় দেয় নি, আমি তাকে আশ্রয় দিতে পেরেছি এইটুকুই যে আমার পরম পুণ্য। এরজন্যে যত খানি ক্ষতিই আমার সইতে যদি হয় আমি তা সইব, যত দুঃখই বইতে হোক, আমি তা বইব। তোমাদের চোখ রাঙানো, ভয় দেখানো আমায় আমার কর্ত্তব্য হতে বিচলিত করতে পারবে না ঠাকুর পো।"

মহিম বলিল, "আশ্রিতকে আশ্রয় দেওয়া মহাপুণ্য তা জানি বউ দি, কিন্তু এ রকম লোককে আশ্রয় দেওয়া মানে পাপের প্রশ্রয় দেয়া তা মানবে কি?"

শান্ত হাসি হাসিয়া সুরমা বলিলেন, "দয়া কখনও পাত্রাপাত্র বিচার করেনা ঠাকুর পো, সৎ অসৎ বেছে দান করা চলে না, মন যদি কাঁদে সেইটাই হয় সত্যি। আর করুণার কথা যদি বল—তার পাপ তো আমি এতটুকু দেখতে পাইনে। হিন্দু ঘরের বালিকা বিধবা তাকে যদি ব্রহ্মচর্য্য পালন করাতেই হয়, তেমনই সংসর্গে তাকে রাখা উচিত। কচি মেয়েটাকে সারাদিন উপবাস করিয়ে রেখে তার সামনে কেউ যদি চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় খায়, সেইটাই কি মহাপাপ নয়, সেইটাই কি তাকে প্রলুব্ধ করবে না? তারপরে কেউ যদি সেই কচি মেয়েটাকে অনবরত প্রলোভন দেখায়, সে কতক্ষণ নিজকে সংযত করে থাকতে পারে; এ জন্যে অপরাধী কে—সেই মেয়ে মা যারা তাকে প্রলোভিত করে তারা?"

মহিমের কালো মুখখানা বেগুনি হইয়া উঠিল, সে বলিল, "ও সব কথা তো সমাজ শুনবেনা বউদি, সমাজ দেখবে মেয়েটিরই দোষ, শাস্তি তাই তাকেই বইতে হবে—"

বাধা দিয়া সুরমা বলিলেন, "তা আমি জানি, দোষ যে যাই করুক না কেন, মেয়েটিকেই যে সে ফল বইতে হবে এ জানা কথা। দেশের সমাজ এই রকম একচোখো বিচার করে বলেই না আজ বাংলার মেয়ে এমন নিঃসহায়. সবলের মাঝখানে থেকেও সে জানে তার কেউ নেই। এতটুকুতে যার ধর্ম্ম যায়, একমুহূর্ত্তে যে সংসার সমাজ, স্বামী পুত্র হারায় সে কতটুকু অহঙ্কার করতে পারে বল দেখি? এদেশের মেয়েদের সেই জন্যেই সর্ব্বদা সঙ্কুচিত

ভাবে থাকা উচিত, কেননা যে কোন মুহূর্ত্তে তাদের সবই যেতে পারে। এককথায় এরা যেমন ভাবে সর্ব্বস্ব হারায় এমন ভাবে আর কোন দেশের মেয়ে হারায় না। এমন মোটা পক্ষপাত বিচার আর তো কোন দেশে নেই।"

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, "মজা দেখ,—এই সেই দেশ—যে দেশের মেয়ে রাত্রে শুতে যাওয়ার সময় মনে করে যায় সে শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যবতী; তার স্বামী হয় তো তাকে জীবনাধিক ভালোবাসেন, এক মিনিট চোখের আড়াল করতে পারেন না, সন্তান তার মাকে এক মিনিট ছেড়ে থাকতে পারে না, বাড়ীর সে গৃহিণী,—যে দিক না দেখবে সে দিক একেবারে অচল হয়ে পড়ে; কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ—রাত ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয় তো দেখা যাবে—নিজের সামান্য ভুলে, অথবা পরের অত্যাচারে বা ছলনায় সে সব হারিয়েছে। সেই সংসার তাকে বাদ দিয়েও চলে, সেই স্বামী তাকে হারিয়েও বেঁচে থাকেন, মা-হারা সন্তানই যা কেবল কষ্ট পায়। সাধ্য থাকলে সে সেই মায়ের কাছেই যেতে পারত, তাকে সবাই ধরে রাখে।"

মহিম রূঢ় কণ্ঠে বলিল, "কেবল মেয়েদের দিকটাই দেখছো বউদি, এটা নেহাৎ এক চোখোমি। আজকালকার দিনে সহরে শুনেছি মেয়েরা পুরুষের সমান অধিকার পাওয়ার জন্যে রীতিমত মারামারি পর্য্যন্ত করছে, সেই হাওয়া আমাদের গ্রামগুলোতে পর্য্যন্ত বইতে সুরু করেছে। তা হোক, কিন্তু তাই বলে এমন একচোখোমি ভালো নয় বউদি, মেয়েরা একেবারে অবলা সরলা তো নয়,—সে বেশ জানি। এই তোমার করুণার কথাটাই ভাবো না—"

বাধা দিয়া সুরমা বলিলেন, "ভেবেছি বই কি, কেবল যে ভেবেছি তাও নয়, ওর সঙ্গে মিশে কথা বলে ওর ভেতরের খবরও জেনেছি, সেই জন্যে বলি—ওর কথা ছেড়ে দাও, কথায় কথায় দৃষ্টান্ত দিতে ওই একটা হতভাগীকে টেনো না।"

মহিম রাগে ফুলিতে লাগিল—

সুরমা বলিলেন, "আর ওর কথা যদি ধরলুম তবে সব কথাই বলি ঠাকুরপো, কিছু মনে করো না ভাই। এই যে মেয়ে পুরুষে দোষটা করেছে, শাস্তি করুণা একলাই বা পায় কেন? পুরুষ মাথা উঁচু করে বেড়াচ্ছে, সমাজে তার আসন অনেক উপরেই রয়ে গেল, মেয়েটী কেন পড়ল পাঁকের মধ্যে? ওরও ত আত্মীয় স্বজন আছে, তারা হয়ত গোপনে এই অভাগিনীর জন্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, চোখের জলও মোছে, কিন্তু তবু যে একে নিতে পারে নি—সে কেবল তোমাদের সমাজের ভয়েই নয় কি?"

মহিম প্রথমটায় উত্তর দিলনা, তাহার পর হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুরমা তাহার পানে চাহিলেন—

মহিম হাসিতে হাসিতে বলিল, "আজ মেয়েরা এই সব নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছে, লম্বা লম্বা কথাও বলছে বড় কম নয়, তাই বলে সত্যি সেদিন আসছে না বউদি যে দিন মেয়েরা পুরুষের সমান হতে পারবে? তুমি দেখে নিয়ো—মেয়েদের চিরদিন পাঁকে পড়ে থাকতেই হবে, যেখান হতে যাবে সে জায়গায় আর কোন দিন তারা ফিরতে পারবে না। একি যার তার তৈরী নিয়ম, স্বয়ং মনুর তৈরী শাস্ত্রটাকে কখনও উল্টানো যায়? মেয়েরা যে মা, তারা পুরুষ হবে কি করে? সন্তান হলে বাপ তাকে ফেলে অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারে, কোন মা কোন দিন পালিয়েছে দেখেছ কি? ওই খানেই যে মেয়েদের মস্ত বড়ো হার হয়ে গেল, ওই জন্যেই যে মেয়েদের কোন দোষ ক্ষমা করা চলে না। সন্তানদের যারা গর্ভে ধারণ করবে যারা খাইয়ে পড়িয়ে শিক্ষা দিয়ে মানুষ করবে, তাদের অত হালকা হওয়া চলে না। ভবিষ্যৎ বুঝে পুরুষ কাজ না করলেও পারবে, মেয়েদের ভাবতেই হবে যে।"

সুরমা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, এ কথার উপর বলিবার উপযুক্ত কথা তখনই তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

মহিম বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল—"তা হলে বোঝ বউদি, সেকালের শাস্ত্রকারেরা অনেক ভেবে চিন্তে এই সব আইন তৈরী করে গেছেন, এমনি নয়। মেয়েদের যা কাজ তারা তাই করুক, তারা শক্ত হোক আমরা পুরুষ আমরা হালকা হই—আমরা যা'খুসি তাই করি তোমরা

কেন পথ হারাবে ? আমরা যদি তোমাদের টানতেই যাই, তোমরা কেন আসবে—তোমরা কেন প্রলোভনে ভুলবে ? মেয়েদের এখন হতে এমনি শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলো বউদি, নইলে যাই কিছু করতে যাও—জেনো, সব মিথ্যে হবে।"

সুরমা স্থির কণ্ঠে বলিলেন, "অনেক কথাই বলেছ ঠাকুরপো, উত্তর দেওয়ার মত ক্ষমতা আমারও আছে। প্রথম একটা কথা বলি শোন, একটা দিন ছিল যে দিন পুরুষের আগে ছিল মেয়েদের আসন, সেটা জানো ?

মহিম উত্তর দিল, "অন্ততঃ পক্ষে শুনেছি। আর এ কথাও শুনেছি মেয়েদের অনুপযুক্ততাই তাদের আগে হতে পেছনে এনে ফেলেছে।"

সুরমা একটু হাসিলেন, "তোমার মত লোকেরা এই কথাই বলবে—বলছেও তাই। কিন্তু তোমার সঙ্গে তর্ক করা মিথ্যে ঠাকুরপো, তোমাকে আমি তর্ক করার উপযুক্ত পাত্র বলে মনে করতে পারি নে! তোমার মুখে মেয়েদের অজস্র নিন্দা শুনে তর্কের প্রবৃত্তি মনে জেগেছিল এখন আর নেই।"

বিজয় গর্ব্বে মহিমের মুখখানা উজ্জল হইয়া উঠিল, সে বলিল, "তাই তো বলি বউদি, শাস্ত্রের তুমি জানো কি ? হিন্দু ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম করছো,—হিন্দু ধর্ম্মের তুমি জানো কি ? বোঝ কি ? আমরা পুরুষ, আমরাই কিছু বুঝতে পারলুম না জানতে পারলুম না, আর তোমরা মেয়ে হয়ে এত বড় শাস্ত্রটা একেবারে আগাগোড়া জেনে ফেলবে, এও কখনও সম্ভব হতে পারে ?"

গর্ব্বের হাসি হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

চলবে

অবশেষে

শ্রীগিরিজা কুমার বসু

কবি যার, ছবি আর প্রতিমা গড়ে
তোমাদের বই, ওই যাহারা পড়ে
তাহারা কি তার কথা শুনিবে
দরশন আশে দিন গুণিবে ?

কোন্ গান, মন প্রাণ, জান' কি গাহে
খালি বুক কালি মুখ, কাহারে চাহে ?
সে আমার কি তাহা কে বুঝিবে
তারি তরে, ত্রিলোক কে খুঁজিবে ?

স্মৃতি তা'র, প্রীতি ভার, মরমে আনে
দেখা নাই, একা চাই পথেরি পানে
চাঁদ হাসে গরবেতে গগনে,
সে কোথায়, এই চারু লগনে ?

মধু মোর, বঁধু ওর প্রণয়ে হরি
দূরে দূরে, আজি ঘুরে, কি বলো করি
আপনিই ধরা যদি না দিবে
পায়ে ধরে, হিয়া তারে সাধিবে।

গান

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

মল্লার—তেতালা

গরজিছে মেঘদল
—বরষা আইল ;
ঘুম ভেঙ্গে বিজলী
হাসিয়া চাহিল।
আকুল পবন
জলভরা শ্বাসে,
বিজলী নাচিছে মেঘে
নূপুর পায়ে ;
বাদল আসে
কালো মেঘ নায়ে,
ঝিরিঝিরি মধুক
কি সুর গাহিল।

কুমারী যুথিকা মুখোপাধ্যায়

খোল দ্বার—(ওমা) খোল দ্বার ;
পারি না বহিতে বোঝা যাতনার
—মম করে হাহাকার।
আনিয়াছি খালি যুথিকার মালা,
আর কিছু নাই—ভরিব যে ডালা ;
ছলছল আঁখি চঞ্চল হৃদি
টলমল চারিধার ;
নিভিয়ে যে এল দিবসের আলো,
ঘনাইলো আঁধিয়ার।

স্বরলিপি

[সুকবি শ্রীবিনয়ভূষণ দাশ গুপ্তের রচিত গানগুলি ভাব ও ভাষার মাধুর্য্যে অনুপম। এই গানখানির সুর দিয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ সুরশিল্পী ও গায়ক শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য।]

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত   সুর ও স্বরলিপি—শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য এম্-এ

ইমন কল্যাণ—একতালা

পুণ্য মধুর সন্ধ্যা লগনে
দীপমালা জ্বালো কুটীরে
হৃদয় কুঞ্জে কুসুম-কোরক
গন্ধে উঠিবে ফুটিরে।
ভরে দাও চিত নব-নিবেদনে
সুন্দর তব আসে নিকেতনে
বেদনার বাঁধ ভাঙিয়া জাগাও
ছল ছল আঁখি দু'টীরে।
নব সুষমায় সুনীল আকাশ
গেঁথেছে তারার মালিকা,
আমার দেউলে রয়েছে সাজানো
পূজার পুণ্য থালিকা;
বন্দনা গীতে বীণার তন্ত্র
মধু ঝঙ্কারে তুলেছে মন্ত্র
আমার বাসনা তাঁহার চরণে
পড়িয়াছে আজ লুটিরে।

আস্থায়ী

না -া না | ক্ষা ধা পা | পা ক্ষা পক্ষা | গা মা গা |
পু ০ ণ্য | ম ধু র | স ন্ ধ্যা | ল গ নে |

× পা র্সা না | ধা পক্ষা পা | গা রা সা | -া -া -া |
দী প মা | লা জ্বা লো | কু টী রে | ০ ০ ০ |

ক্ষা ক্ষা ক্ষা | পা পা পা | পক্ষা পা পরা | গা রা সা |
হৃ দ য় | কু ঞ জে | কু সু ম | কো র ক |

র্গা র্গা র্রা | র্সা না ধা | পা ক্ষাপা ধা | -া -া -া |
গ ন্ ধে | উ ঠি বে | ফু টি রে | ০ ০ ০ |

অন্তরা ও আভোগ

পা ধা পা | র্সা র্সা র্সা | না ধা ধর্সা | র্সা র্সনা র্সা |
ভ রে দা | ও চি ত | ন ব নি | বে দ নে |
ব ন্ দ | না গী তে | বী ণা র | ত ন্ ত্র |

পজ্ঞা ধা ধা | না না ধঃ | না ধা না | ধা পজ্ঞা পা |
সু ন্ দ | র ত ব | আ সে নি | কে ত নে |
ম ধু ঝ | ঙ় কা রে | তু লে ছে | ম ন্ ত্র |

র্সা র্সা র্সা | র্গা র্গা -া | র্গা র্জ্ঞা র্গা | না র্রা র্সা |
বে দ না | র্ বাঁ ধ | ভা ঙি য়া | জা গা ও |
আ মা র | বা স না | তাঁ হা র | চ র ণে |

না র্সা না | ধা পা গা | গপা পধা ধা | -া -া -া |
ছ ল ছ | ল আঁ খি | দু টী রে | ০ ০ ০ |
প ড়ি য়া | ছে আ জ | লু টি রে | ০ ০ ০ |

সঞ্চারী

সা সা ধা | সা সরা রগা | গা গা -া | গা গা -া |
ন ব সু | ষ মা য় | সু নী ল | আ কা শ |

জ্ঞরা গা জ্ঞা | জ্ঞা -া পা | জ্ঞা ধা পা | -া -া -া |
গেঁ থে ছে | তা রা র | মা লি কা | ০ ০ ০ |

পা গপা পধা | ধা -া -া | জ্ঞপা জ্ঞপা জ্ঞপা | গা মা গা |
আ মা র | দে উ লে | র য়ে ছে | সা জা ন |

রা গা জ্ঞা | পা ধা গা | না রা সা | -া -া -া |
পূ জা র | পু ০ ষ্প | ধা লি কা | ০ ০ ০ |

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতায় মহাত্মা

গত ১৯শে জুলাই মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি প্রান্তের গাড়ীতে হাওড়া ষ্টেশনে আসিবেন জানিয়া বহু সহস্র নর-নারী তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য গিয়াছিলেন—কিন্তু মহাত্মাকে পূর্ব্বেই বেলুড়ে নামানো হইয়াছিল বলিয়া হাওড়ার দর্শনার্থী জনসঙ্ঘ তাঁহার দর্শন না পাইয়া অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হন। বাংলার কয় জন নেতা এভাবে ভীড় বাঁচাইবার জন্য মহাত্মাজীকে লইয়া চালাকী খেলাতে মহাত্মাও বিস্মিত হইয়াছেন, জনসাধারণও ক্ষুন্ন হইয়াছেন। মহাত্মা ২৪নং রায় ষ্ট্রীটস্থ জীবন চাঁদ মোতী চাঁদের বাড়ীতে ছিলেন। ঐ দিনেই তিনি এলবার্ট হলে মহিলা সভায় যোগ দেন। অপরাহ্নে কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়—সন্ধ্যায় শ্রীমতী অপর্ণাদেবীর কীর্ত্তন শোনেন। শুক্রবার বাংলার কংগ্রেসের গোলযোগ মীমাংসায় অনেক সময় দেন। শনিবার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে বালক বালিকাদের জন্য হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করেন। অপরাহ্নে টাউনহলে কার্পোরেশন মহাত্মাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন, ঐ দিনই ৫৷৷০টায় দেশবন্ধু পার্কে বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দেন। শোনা গেল কলিকাতা হইতে যাইবার সময় মহাত্মা হরিজন ভাণ্ডারের জন্য ৭৫ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছেন। মহাত্মার হরিজন ভাণ্ডারে এত অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাই বোধ হয় সব প্রদেশের চেয়ে বেশী অর্থ দিয়াছে—এখানে শুধু খ'খানেক ভিন্ন প্রদেশের মজুর শ্রেণীর লোকের কৃষ্ণ পতাকা ও 'গান্ধী বাদ নিপাত যাউক' সহ পরিভ্রমণ ছাড়া বিক্ষোভ আর কিছু দেখা যায় নাই। বিস্তৃত দেশবন্ধু পার্কে তিল ধরণের স্থানও ছিল না—অনেকে মনে করেন এখানে লক্ষাধিক লোক হইয়াছিল। যেখানে যেখানে মহাত্মা গিয়াছিলেন সেখানে সর্ব্বদাই বহুজন সমাগম হইয়াছিল।

বাংলার কংগ্রেস ও মহাত্মা

কংগ্রেসের ঘরোয়া বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য মহাত্মা প্রধানতঃ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন—কিন্তু নিষ্পত্তি তেমন কিছু হয় নাই। মহাত্মা বলেন—'যদি কংগ্রেস হইতে দলাদলি দূর করিতে হয়, তবে ভোট সংগ্রহ বিষয়ে যেরূপ অসাধু ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ পয়সা দিয়াও ভোট কেনা হয়—তাহা দূর করিতে হইবে। ...বাংলার ৪০টি নির্ব্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে ২২টি কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা বলিয়াছেন তাহারা নির্ব্বাচন না করিয়া আপোষে সভ্য নিযুক্ত করিবেন। ...বাংলার কংগ্রেস কর্ম্মীদের অধিকাংশ যদি নিখুঁত সততার সঙ্গে কংগ্রেসের কাজ করিতে প্রস্তুত না হন তবে তাঁহারা কংগ্রেসের কাজ পরিচালন করিতে পারিবেন না। —মিঃ আনের কর্ত্তৃত্বাধীনে যে নির্ব্বাচন বোর্ড আছে তাহা জেলা কেন্দ্রের সর্ব্ববাদি সম্মত নামের তালিকা পরীক্ষা করিবেন, ও বোর্ডই তাহাদের ঘোষণা করিবেন। যে সব জেলা কেন্দ্রে সর্ব্ব সম্মতিতে নহে কিন্তু বেশীর ভাগের মতে সভ্য নির্ব্বাচন হইয়াছে বোর্ডই তাহার কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিবেন।—' মহাত্মা আবার বলিয়াছেন 'কংগ্রেসের কার্য্যে সাধুতা ও পবিত্রতা না হইলে বাংলা দেশ যে রোগে ভুগিতেছে তাহা হইতে কখনই মুক্ত হইতে পারিবে না।'

কর্পোরেশনের মানপত্র

কর্পোরেশন উচ্ছ্বাস বহুল, ওজস্বী মানপত্র মহাত্মাকে দিয়াছেন—সুখের বিষয়। কিন্তু দেখা যায় চিরন্তন সত্য শুনিতে ভাল শুনাইলেও তাহা মানে কম লোকেই। —অভিনন্দনে আছে—'আত্মত্যাগই ইষ্ট লাভের একমাত্র উপায়' ইত্যাদি—কর্পোরেশন সভ্যদের দৃষ্টি তাঁহাদের এই সব লেখার দিকে বেশী করিয়া আকৃষ্ট করিতে বলি।

নূতন ভাইস চ্যান্সেলর

স্যার হাসান সুরাবর্দ্দির কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় বাংলা গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, বার-এট-লকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ভাইস চ্যান্সেলর পদে মনোনীত করিয়াছেন। এই মনোনয়নে আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি—কারণ শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বয়স মাত্র ৩৩ বৎসর হইলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত অবস্থা এবং আইন কানুন তাঁহার নখদর্পণে, বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার মত অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ আর কাহাকেও আমাদের জানা নাই—এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রাণস্বরূপ এবং জীবনের সাধনার শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রের স্বরূপ। এ বিষয়ে শ্যামাপ্রসাদ বাবু তাঁহার স্বনামধন্য পিতা বিশ্ববিদ্যালয়গতপ্রাণ স্যার আশুতোষেরই স্বরূপ। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় শিক্ষাও—অল্পদিনের জন্য হইলেও—তিনি পাইয়াছিলেন আশুতোষেরই কাছে। এত অল্প বয়সে আর কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ গৌরবময় আসনে বোধ হয় বসেন নাই। ১৯০১ সালের জুলাই মাসে শ্যামাপ্রসাদের জন্ম হয়। ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিট্যুশন হইতে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সিতে ভর্ত্তি হন। ১৯২৩ সালে

পুষ্পপাত্র—পূজা বার্ষিকী—মহিলা সংখ্যা

আগামী আশ্বিন সংখ্যা পুষ্পপাত্র বরাবরের মত এবারও মহিলা সংখ্যা হইবে। মহিলা লেখিকারা যত শীঘ্র সম্ভব এই সংখ্যার লেখা পাঠাইবেন।

এম-এ পাশ করেন। ১৯২৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলো নির্ব্বাচিত হন। ঐ সনেই পিতার মৃত্যু হইলে সিণ্ডিকেটের সদস্যের যে পদ খালি হয় তাহাতে তিনিই নির্ব্বাচিত হন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়ও তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রেরই সদস্য। উচ্চশিক্ষা বিস্তারে বরাবরই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আশাকরি ভাইস-চ্যান্সেলর রূপে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারিবেন।

কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি

খ্যাতনামা কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় আর ইহলোকে নাই। অতি সামান্য অবস্থা হইতে শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয় ভারতের চিকিৎসকদের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন—বৈদ্যশাস্ত্রপাঠ তাঁহারই কীর্ত্তি। দয়া দাক্ষিণ্যে কবিরাজ মহাশয় ছিলেন হৃদয়বান মহাপুরুষ—আর রোগ নির্ণয়ে ও বিধান দিতে ছিলেন পরম ধীমান বিচক্ষণ-ধন্বন্তরী সদৃশ।

অষ্ট্রীয়ায় বিপ্লব

অষ্ট্রীয়ার ডিকটেটর ডাঃ ডলফ্যাস আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছেন—মুসোলিনি বা হিটলারের মত তত জবরদস্ত ডিকটেটর না হইলেও ডাঃ ডলফাসও তাঁহাদের সমান সমানই চলিতেছিলেন। ডলফসের মৃত্যু অতি আকস্মিক ও বড় করুণ, গুপ্ত আততায়ী বা বিদ্রোহীর হস্তে একটা রাজ্যের সর্ব্বে সর্ব্বার এমন হত্যা বড় নিদারুণ, ডলফাসের মৃত্যুতে ইউরোপে আবার একটা রাষ্ট্র বিপ্লব না বাধে—কারণ অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতার উপর অনেক রাজ্যেরই নিরাপত্তা নির্ভর করে। হিংসাবাদ দ্বারা জাতীয়তা—কঠোর শাসনে জাতীয়তা রাজ্যে রাজ্যে যেরূপ বাড়িতেছে— তাহার ফল স্বরূপই এই সব অনাচারের উদ্ভব হইতেছে কিনা কে বলিবে !

পক্ষাঘাতগ্রস্ত জাতীয়তা

করপোরেশনে মেয়রী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়াছে কিন্তু এখন বিবেচ্য এই দ্বন্দ্বের অবসানে জয়লাভ করিল কে ? একটু ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে কংগ্রেসের যে দুইটী শাখা কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবার জন্য পরস্পর কলহ করিতেছিল তাহাদের কোন দলই জয়লাভ করিতে পারে নাই। প্রকৃত পক্ষে এখন বাংলা সরকার কংগ্রেসের আত্ম-কলহ মিটাইবার জন্য স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের অধীনে করপোরেশনী পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আত্ম-কলহই আমাদের জাতীয় উত্থান চিরকাল পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। এক্ষেত্রেও বাংলার কতকটি কংগ্রেসী কর্পোরেশন সভ্য তাহারই জলন্ত নিদর্শন রাখিলেন।

নূতন মেয়র

আমরা নব-নির্ব্বাচিত মেয়র শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। তিনি একজন কর্ম্মশীল সুকৌশলী ব্যক্তি, তিনি নিজের সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন যে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে গৃহহীন অনাথ কলিকাতায় আসিয়া রাস্তার ফুটপাথে আশ্রয় গ্রহণ

করিয়াছিল, অধ্যবসায় বলে সেই আজ কলিকাতার মতন মহানগরীর কর্পোরেশনের মেয়র। অসূয়া বশতঃই কোন কোন সংবাদপত্র তাঁহার উক্তির অংশ বিকৃত করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিলেও ভাগ্য ও পুরুষকার অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর

শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার

করপোরেশনের মধ্যে আত্ম-কলহ ভীষণ রূপে প্রকটিত হওয়ায় তথায় অনেক জনহিতকর কার্য্য যাহা হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। আত্ম-কলহের মধ্য দিয়াই নলিনী বাবু এই উচ্চপদের অধিকারী হইলেও আমরা তাঁহাকে সম্ভব হইলে তাহা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

ডেপুটী মেয়র

শ্রীযুত বিনয়েন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী একজন উদীয়মান যুবক তাঁহাকেও আমরা আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। তিনি সুশিক্ষিত প্রিয়দর্শন, কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ্য পিতার উপযুক্ত পুত্র হইয়া দেশ ও দশের নানাবিধ মঙ্গলজনক কার্য্য ক্রমশঃ করিতে পারিবেন আশা করি। কেহ কেহ বলিতেছেন যে তিনি নির্ব্বাচিত সদস্য নহেন, তাহাতে এ কথা বলা যায় যে আমাদের দেশে নির্ব্বাচিত সদস্যগণ যেমন এক একটি শ্রেণী কর্ত্তৃক মনোনীত হয় সরকারী সদস্যেরাও সেইরূপ শ্রেণী বিশেষের প্রতিনিধি। ইউরোপীয় রাজ্যসমূহে নির্ব্বাচিত সদস্যগণ শুধু মাত্র সরকারের মুখ-পাত্রই হইয়া থাকেন। কিন্তু এখানে অনেক স্থলেই নির্ব্বাচনে বিশেষ সুবিধা না থাকায় মনোনয়নের মধ্য দিয়া নির্ব্বাচন চালাইতে হয়। বোধহয় সকলেই জানেন যে স্বর্গীয় গোখলে মনোনীত সদস্য হিসাবে ভারত সরকারের আইন সভায় প্রবেশ করিয়া জনসাধারণের হিতকর কার্য্য করিতেন। জেলাবোর্ডের মনোনীত সদস্যগণই অনেক সময় চেয়ারম্যান পদ পান। শ্রীযুত রায় চৌধুরী এই নিয়মানুসারেই ডেপুটী মেয়র হইয়াছেন। করপোরেশনের অলডারম্যানেরা যেমন সাধারণ নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়া না আসিয়া সদস্যগণ কর্ত্তৃক মনোনীত হন; সরকারী সদস্যগণও সেইরূপ কতকটা সাধারণ নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়া না আসিয়া কতকগুলি স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকার কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন।

নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব ও কংগ্রেস

কংগ্রেস আগামী নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবার জন্য বিশেষ তোড়জোর সুরু করিতেছেন। সরকার পক্ষও তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্যই বোধ হয় একের পর একটী করিয়া কংগ্রেস বোর্ডগুলিকে আইনের বেড়া জাল হইতে মুক্তি প্রদান করিতেছেন। সংবাদ খুবই সন্তোষজনক। কিন্তু আমাদের এখানে একটু বক্তব্য আছে। কংগ্রেসের নামে অনেক অনাচার সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। দলাদলি অবশ্য সর্ব্বত্র আছে। দলাদলির মধ্য দিয়া যখন ভীষণ আত্ম-স্বার্থের উৎকট মূর্ত্তি উঁকি মারে তখনই আমাদিগকে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইতে হয়। অতীতের বি পি সি-সির দ্বন্দ্ব ও বর্ত্তমানে করপোরেশনী কলহ আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে কংগ্রেস শুধু কতকগুলি স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি কর্ত্তৃকই পরিচালিত হইতেছে। আপনাদের গুপ্ত অভিপ্রেত গোপন রাখিবার জন্যই এই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকেন। কাজেই নির্ব্বাচনে ভোট দিবার সময় আমরা জনসাধারণকে এই কথা

জানাইতে চাহি যে তাঁহারা পুরাতন পাপীগণকে যেন আর ভোট না দেন। যাহাদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সম্বাদ-পত্রসমূহে বহুবার নানাবিধ ইঙ্গিত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদিগকে অস্পৃশ্যবৎ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ভাল হয়।

বাংলায় হরিজন

হরিজন সমস্যা সম্বন্ধেও দুই-একটা কথা বলিবার আছে। হরিজন সমস্যা বাংলায় খুব প্রবল নহে। বর্ত্তমানে উহার অস্তিত্বও খুবই কম। যে বাংলায় হিন্দু-জনসংখ্যা অপেক্ষা মুসলমান জনসংখ্যাই অধিক তাহাদিগকে স্বভাবতঃই উদার মতাবলম্বী হইতে হয়। অস্পৃশ্য হরিজন বাংলায় এখন নাই বলিলেই চলে, কোথাও থাকিলেও তাহাদের জলাশয়াদি হইতে জলগ্রহণ ইত্যাদিতে কোন নিষেধ নাই। আমাদের অস্পৃশ্যতা অনেকটা আচার ব্যবহারেরই উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। কোন অস্পৃশ্য যুবক শিক্ষিত হইলেই আমরা তাহাদিগের সহিত সমানে মিশিয়া থাকি। সুতরাং হরিজন নাম গ্রহণ করিয়া শতধা বিভক্ত বঙ্গ যাহাতে সহস্রধারে বিভক্ত না হয় সে দিকেই এখন তীব্র দৃষ্টি রাখা দরকার।

হিটলারের কৈফিয়ৎ

অকস্মাৎ জার্ম্মেন রাষ্ট্রনায়ক হার হিটলার তাঁহার সহকর্ম্মী প্রতিষ্ঠাবান বহু নাজীর কঠোরতম দণ্ড বিধান করিয়াছেন। প্রকাশ এইভাবে একটা বিরাট রাষ্ট্র দ্রোহকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা হইয়াছে। হার হিটলার তাঁহার পার্লামেণ্টারি অভিভাষণে আত্ম সমর্থন করিয়াছেন। Norido বংশের কুল প্রদীপ হার হিটলার বিশ্ব মানবতা ইহুদি জাতির চরম ধাপ্পাবাজী বলিতে চাহেন। ইহা যদি সত্যই হয় তবে জার্ম্মানি ইহুদি জাতিরই একজন মহাত্মা যীশু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে কেন এখনও ধারণ করিয়া রহিয়াছে? খৃষ্ট ধর্ম্মের মধ্যেও কি বিশ্ব-মানবতা নাই। ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ আর্য্য কালচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশ্ব মানবতা ও গীতোক্ত ধর্ম্মের আদর্শকে হার হিটলার কি বলিয়া উড়াইয়া দিবেন? মোট কথা হার হিটলার যদি স্বদেশ জাতির যখন সঙ্কট কাল উপস্থিত হয় তখন রোমানগণের আদর্শে ডিক্টেটর পদ প্রবর্ত্তন করা বিশেষ প্রয়োজন—তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যদি কোন দল বিশেষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য বজ্র হস্তে সর্ব্ব প্রকার প্রতিবাদ দমন করা হয়—তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ফল সুবিধা জনক হইবে কি?

আগামী শাসনতন্ত্র

অনেকেই জল্পনা কল্পনা করিয়া থাকেন যে ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে নব নির্ব্বাচন হইবে। এই আশার মূলে যে খানিক সত্য নাই এরূপ মনে হয় না। ইংলণ্ডেও সাধারণ নির্ব্বাচন আগত প্রায়। বর্ত্তমান পার্লামেণ্ট তাহার শাসন কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ভারত সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন মনে হয়। এই ব্যবস্থা কি হইবে এবং যাহা হইবে উহা আমাদের মঙ্গলকর হইবে কিনা তাহা লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা হইতেছে। ব্যবস্থা যাহাই হউক আমাদিগকে কতকটা শাসন কার্য্য ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। উহার মাত্রা কতটা হইবে—তাহা নির্ভর করিতেছে ইংরাজ জাতির স্বার্থের উপর। তাহাদের জাতীয় স্বার্থ যাহাতে অক্ষুন্ন থাকিতে পারে ততটা ব্যবস্থা করিয়া বাকী সমস্ত ক্ষমতাই আমাদের হস্তে ন্যস্ত হইতে পারে।

কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড

কাশীর অধিবেশনে পণ্ডিত মালবীয়, শ্রীযুত আনে পদত্যাগ করিয়াছেন—আরো অনেকে ইহাদের অনুসরণ করিতে পারেন। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে কংগ্রেসের অস্থি সিদ্ধান্তই এই মতান্তরের কারণ। এ সময় ইহা দুঃখে কারণ হইলেও অপরিহার্য্য হইয়াছে—এই ব্যাপারে পণ্ডি মালব্যের নীতি দেশের একটা শক্তিশালী অংশের য সমর্থন পাইবে কংগ্রেস নীতি তত পাইবে না বলিয়া অনুমান হয়।

বিধবা বিবাহ ও সমাজসমস্যা

সহযোগী আনন্দবাজার ৩০শে আষাঢ় বাংলা বিধবা সমস্যা সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে বিশে আলোচনা করিয়াছেন। বিধবা বিবাহ প্রায় শতব পূর্ব্বে আইন সিদ্ধ হইলেও বিধবা বিবাহ আমাদে মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহার কার আমাদের বংশগত সংস্কার। রমণী জাতির সতীত্ব জা বিশেষেরই মধ্যে তুলনা মূলক, শুধু আমাদের বাংলায় উহা জীবন মরণের সম্বন্ধ। দশ বৎসরের কুমারী বিধ হইলেও তাহাকে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হই আবার এদিকে ষাট বৎসরের বৃদ্ধ তরুণী ভার

গ্রহণ করিতেছে। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সহযোগী স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও ইহাই বলিতে হয় যে আমাদের সতীত্বের আদর্শকে কুসংস্কার বলিয়া মত দিতে হয়। দ্বিধা এই খানেই। রমণী পর-পুরুষে আসক্ত হইলে সন্তানের পিতার বিচার যেমন ঠিক থাকেনা —সমাজে ব্যভিচারও তেমনি প্রচলিত হইয়া থাকে। সত্যবটে মুসলমান ও পাশ্চাত্য জাতি 'তালাক' প্রথার সাহায্যে মনান্তর ঘটিলেই নারী বদলাইয়া লন, তাহাতে যাহাদের নারী আছে তাহারাই নারী পাইবে, যাহাদের নারী নাই তাহারা নারী পাইবে কিরূপে? নারীর পত্যন্তর ঘটিলে অবিবাহিতগণ অপেক্ষা বিবাহিত গণেরই পত্নীর অদল বদল ঘটিতে পারে। তাহাতে সমাজিক অশান্তি এবং গৃহস্থের ঘর কন্নার অসুবিধা কত বাড়িয়া যাইবে। অক্ষত যোনি না হইলে কেহ কোন বিধবাকে বিবাহ করিতে রাজী হয়না তাহার প্রধান কারণ এই নহে সে তাহাকে "সতী" হিসাবে জানিতে চাহে। যেখানে কোন রমণী কুড়ি বা ততোধিক বর্ষে উপনীত হইয়াছে, সেইখানেই সে বহু পুত্রের জননী হইয়া পড়ে। এই অর্থ কষ্টের যুগে একটি রমণী লাভের জন্য এতটা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনেকে রাজী হয়না। অর্থ চিন্তাই ইহার অন্ততম প্রধান অন্তরায়। রমণীকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া দিলে সামাজিক শান্তি নাশের সহিত নানাবিধ যৌন ব্যাধিও সমাজের সম্ভ্রান্ত বংশগুলিতে ও প্রবেশ করিবে। লেখক দুঃখ করিয়াছেন যে যৌন ব্যাধি অতি ভীষণ ভাবে আমাদের মধ্যে আত্ম প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু একথা ত সত্য এখনও শতকরা জন কয়েক উহার কবলগ্রস্ত নহে। স্বেচ্ছাচার চালাইলে যৌনব্যাধি শতকরা একশতেই গিয়া দাঁড়াইবে। একথা স্বীকার্য্য জন সংখ্যা বৃদ্ধি জাতির উন্নতির এক প্রধান নিদর্শন। কিন্তু ইহাও ত সত্য যে কতকগুলি অপগণ্ডের জন্ম দেওয়া জাতির বলক্ষয়ের কারণ। জার্ম্মানী ফ্রান্সের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত, কিন্তু ফ্রান্স জার্ম্মানির ন্যায় জন সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে নারাজ কেননা বর্দ্ধিত জন সংখ্যাকে অন্নসংস্থান দ্বারা পালন করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। লেখক যে সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন—তাহা আধুনিক গল্প লেখকগণের অত্যন্ত প্রিয় আখ্যান বস্তু। রোমান্স যাহাই হউক প্রবন্ধ হিসাবে উহার যুক্তিযুক্ততা বিবেচনা করিবার যোগ্য।

রাজবন্দী শ্রীযুত শরৎ বসু

প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুত শরৎ বসু এখন কর্শিয়াংয়ে রাজবন্দী আছেন, তাঁহার ভাতা ১২০০৲ হইতে সম্প্রতি ১৫০০৲ হইয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে শরৎবাবুর সমালোচনা আমরা কোন কোন সময়ে করিয়াছি—কিন্তু তিনি হঠাৎ এ ভাবে রাজবন্দী কি করিয়া হইলেন ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এখন 'খেয়ালী' প্রভৃতি পত্রে দেখিতেছি এ বিষয়ে অনেক গোপন তথ্য বাহির হইতেছে—তাহা সত্য কি মিথ্যা সে সম্বন্ধে তথ্য দিতে পারেন নাকি শরৎ বাবুরই দলভুক্ত শ্রীযুত বিধান রায়, শ্রীযুত নলিনী রঞ্জন সরকার ইত্যাদি। উত্তর দিবার কিছু থাকিলে ডাঃ রায় ও মেয়র সরকারের অবশ্যই তাহা দেওয়া উচিত। শরৎ বাবুর মত প্রতিষ্ঠাবান ব্যরিষ্টারকে খুব ভাল কিছু প্রমাণ না থাকিলে সরকারের আর আটকাইয়া রাখাও ঠিক মনে হয় না।

বাংলায় ও আসামে প্লাবন

আসামের নানা স্থানে ও বাংলার কোন কোন স্থানে প্লাবনে তথাকার অধিবাসীদের ভীষণ কষ্ট হইয়াছে, ফসলাদি একেবারে নষ্ট হইয়া বর্ত্তমানের সঙ্গে তাহাদের ভবিষ্যৎও বিশেষ অন্ধকার দেখিতেছে। আসামের বন্যা পীড়িতদের প্রতি দেশের লোকের তেমন সহানুভূতি-দৃষ্ট না দেখিয়া পাঞ্জাবের মহিলা অমৃত কাউর অনশন অরম্ভ করিয়াছিলেন—পরে নেতৃস্থানীয় কয়জন আসামের অন্নহীন ও বস্ত্রহীনদের জন্য যথা সম্ভব করিবেন আশ্বাস দেওয়াতে ইনি অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন। আসামের বন্যা পীড়িত অঞ্চল হইতে কোন মহিলা আমাদের লিখিয়াছেন 'এদিকের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। উপর্য্যুপরি ৪।৫ বৎসর ধরিয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কোন রকমে এদেশের লোকগুলি বাঁচিয়া আছে—তদুপরি এবার ঝড় ও বন্যা যেন ইহাদের পক্ষে একেবারে মৃত্যুবাণ হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পরে কি হইবে বুঝিতে পারিতেছি না।' —শুধু এ দেশেই নহে বহু দেশেই কিছুদিন হয় প্রাকৃতিক বিপ্লব বড় ঘন ঘন হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশের দীন দরিদ্রের এসব দুর্দ্দৈব সহিয়া টিকিয়া থাকিবার ক্ষমতা যে বড় কম। ভূমিকম্প নিবার্য্য না হইতে পারে কিন্তু এরূপ বন্যার কারণ যে নদী গর্ভ মজিয়া যাওয়া এবং স্থানে অস্থানে দীর্ঘ বাঁধ দিয়া নদীস্রোতকে প্রতিহত করা তাঁহাতে সন্দেহ নাই। যে ভাবে ইহাতে ক্রমাগত দেশের ধন প্রাণ নষ্ট হইতেছে তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের বন্যার কারণ নির্ণয় ও তাহার প্রতিবিধার ব্যবস্থায় অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

সাহিত্য-বৈঠক

সম্প্রতি 'নবারুণ' নামক মাসিক পত্রিকায় এক উদীয়মান তরুণ সাহিত্যিকের কবিতা পড়িবার সুযোগ হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় একটি কবিতাতে কবি লিখিয়াছেন—ছুটে যাই—এবং ছুটিয়া কি করেন তাহাও লিখিয়াছেন—আত্মামন সমাহিত করি নারকীয় পাপকুণ্ড মাঝে—। পাপকুণ্ডে সমাধি হইবার সময় তাহার 'প্রোগ্রাম'ও যে তিনি লিপিবদ্ধ করেন নাই তাহাতেই আমাদের প্রতি প্রচুর কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আষাঢ়ের 'উদয়নে' এক ঠাকুর কবি (রবীন্দ্রনাথ নহেন) 'দেবদাসী' শীর্ষক একখানি কবিতা লিখিয়াছেন। কবিতাটিতে তিনি রাজা সাজিয়া দেবদাসীর প্রেমে পড়িয়াছেন। কবির প্রিয়া বড় সহজ প্রেমাস্পদ নয়,

সে 'নীলাম্বরীতে ঢেকেছে নিচোল
রামধনু আঁকা আঁচল গায়,
নূপুরের ধ্বনি বাজে রিনি ঝিনি
ফুল কলি সম চপল পায়

নিচোল মানে তো আমরা বক্ষ-বাস বলিয়াই জানি, কিন্তু কবি-প্রিয়ার বক্ষ নয় বক্ষ-বাসই নীলাম্বরীতে ঢাকা। এমন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বর্ণনাকে কঠিন কবিত্ব বলিতে হইবে।

তার পর প্রিয়ার পায়ে 'নূপুরের ধ্বনি বাজে', নূপুরই বাজে বলিয়া এত দিন জানিতাম, নূপুরের ধ্বনি নয়, সেও আবার

'ফুলকলি সম চপল পায়'

পা ফুল কলির মত চপল না ফুল কলির মত পা। কবির ইহাই ধারণা কিনা জানি না, যে—

"কাঁটা থাক্‌লেই কাঁটাল আর থাবা থাক্‌লেই বাঘ", 'ঠাকুর' পদবী থাক্‌লেই কবি হওয়া যায় না ইহা তাহার জানা উচিৎ।

'মেয়েলি ছড়া' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কবি রাধেন্দু দত্ত দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন আজকালকার ছেলেমেয়েরা মেয়েলি ছড়া পছন্দ করে না, তাহারা নাকি ইলিয়াড, রবিন হুড এর কথা জানিতেই বেশী ব্যস্ত। যে সব ছড়ার মধ্যে তিনি অমূল্য সম্পদের সন্ধান পাইয়াছেন তাহার নমুনা তিনি দিয়াছেন—

—গাল ফুলো গোবিন্দের মা
চাল্‌তে তলায় যেয়ো না—

কিসে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় আছে কিনা জানি না, উচ্ছ্বাসময় কবিত্বদ্বারা যে সে কাজ হয় না তাহা বুঝিতে পারি। মেয়েলিছড়ায় কবিদের প্রবন্ধ লিখিবার উপাদান থাকিলেও মানুষ হইতে হইলে বালকদের পক্ষে শুধু মাত্র তাহাই পর্য্যাপ্ত কিনা ভাবিয়া দেখা দরকার। কবির বৃথা আড়ম্বর ও উচ্ছ্বাসকে স্বাদেশিকতা ও গুণগ্রাহীতা বলিয়া ভুল করিবার কোন কারণ নাই।

আষাঢ়ের ভারতবর্ষে কবি দিলীপকুমারের একটি কবিতা বাহির হইয়াছে। কবি নাকি কবিতাটি অরবিন্দের চারলাইন ইংরাজী কবিতা হইতে অনুপ্রেরণা পাইয়া লিখিয়াছেন। অরবিন্দের কবিতা চার লাইন নীচে দেওয়া আছে বলিয়া আমরা পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি। ভাব ও ভাষায় তাহা অতি সুন্দর। তাহার মর্ম্মার্থ

—দুই চোখ দিয়া যাহা দেখি, দুই কান দিয়া যাহা শুনি, তাহা সবই এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর ও মোহন মুরতির অংশ মাত্র। বিহঙ্গের মধুর কণ্ঠ অথবা অপূর্ব্ব শোভাময়দৃশ্য আমাদের হৃদয় পুলকিত করে বটে কিন্তু তা'ও সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্তু বর্ত্তমান কবি তার এই অবস্থা করিয়াছেন। তাহার কবিতার প্রথমে আছে—

যত দোল) নন্দিল নয়নে
ঝঙ্কৃল শ্রবণে
শিহরিল অধরে
পরশি'
তার কিছু পরেই
মনলোভা) ফুটন্ত প্রাতে
ঝরন্ত রাতে
যতবাণী) তটিনী কণ্ঠে
বর্হি শিখণ্ডে

কাব্যের নামে কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়া যে কি আত্ম-প্রসাদ লাভ হয় তাহা একমাত্র কবিই বলিতে পারেন।

আর এক কবি (ইনিও ঠাকুর) আষাঢ় মাসের প্রদীপে রিক্‌সাওয়ালা নামে একটি কবিতা লিখিয়াছেন তাহাতে আছে

চলেছি সে দিন রিক্‌সায় চেপে,
নিঝ্‌ঝুম দুপুর
জ্বলেছিল তার পায়ের তলায়
'কনক্রীট'জমা ব্যথা

ব্যথা কনক্রীটে জমা না কবির মাথায় জমা। কবিত্ব না থাকিলে কবিতা লিখিবার অদ্ভুত মাথা ব্যথা!

কোন সম্পাদক নিজেই নিজ পত্রিকায় কবিতায় লিখিতেছেন

তোমার বুকের স্বর্ণে নীল দাগ
নাই বল আমার নখের—
বেশ ভালই।

প্রবাসীতে কোন অধ্যাপকের নির্ব্বাচিত ভাল ১০০ বইর নামের মধ্যে সীতা দেবী ও শান্তাদেবীর ২ খানা বইর নাম যখন বাদ পড়ে নাই তখন বিচিত্রায়ও সেই পথে চলিয়া কোন লেখক যখন ১০০ বইর নাম নির্ব্বাচিত করিয়াছেন তখন তিনিই বা স্বয়ং বিচিত্রার সম্পাদক উপেনবাবুর তিনখানি উপন্যাসের নাম না দিবেন কেন? এই ভাবে সবগুলো কাগজে যথা সম্ভব ঘরোয়া ভাবে একশত উৎকৃষ্ট বইয়ের নাম প্রকাশ হইলে মন্দ হয় না। —কিশোর

'উত্তরা'—আষাঢ় শ্রীরমেশ চন্দ্র দাসের কবিতা। "এ মেয়ে আরো সুন্দর।" আরো অর্থাৎ ঈশ্বরের চেয়ে। এ আর এমন নূতন কথা কি? সাক্ষাৎ দেবতা জননীকে পিয়ারীর দাসী করিতে ত হামেসাই দেখা যায়। তবে কিনা ইনি বলিতেছেন

"হে ঈশ্বর...
তোমারেও ভুলাইল যার রাঙ্গা গাল—"

ভয় কি কবি রাঙ্গা গাল হাড্ডিসার হইলেই আবার মনে পড়িবে। কিন্তু তুমি যে বলিতেছ—

"তোমারে শুনেছি শুধু চোখে দেখি নাই
দেখিনু এ মেয়ে—"

ও ঈশ্বরকে না দেখিয়াই "ভুলাইল।" মেয়েটিকে দেখিয়াই ঈশ্বর বিস্মরণ! কি দেখিলে—না—

"ইহার রঙ্গিন ঠোঁঠ, কৃশ স্তন, খোঁপা আগোছাল" বেশ বেশ! আচ্ছা কি রকম রঙ্গিন—বেলোয়ারী কাঁচের মত? তারপর "কৃশ স্তন।" সে কিরে বাবা থাইসিস্ রুগী নাকি? ওত সহজে কৃশ হয় না; "পীন পয়োধর ভার ভরেন—" শেষকালে দাঁড়াইল কিনা চামড়ার প্যাড। তার তাই দেখিয়া "লাগে ভাল তোমারও চেয়ে" (ছন্দ?) মানে ঈশ্বরের চেয়ে মেয়েটীকে ভাল লাগিল। ঈশ্বরের দুর্ভাগ্য। ভাবিয়াছিলাম এত যখন হরিনাম সাষ্টাঙ্গ প্রণাম একটা হইবেই তা সেটা ভাল রকমই হইয়াছে। "—এ অঙ্গ তরঙ্গে তাই মুখ গুঁজি চক্ষু দুটী মুদি। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগে পড়িয়াছিলাম ব্যাঘ্র শীকারান্তে টাটকা রক্ত পান করিতে মৃগাদির দেহে মুখ গুজিয়া চক্ষু মুদিয়া সুখে রক্ত পান করে। এই ভগবান ভড়কান প্রেমিকের ব্যাপার শুনিয়া মনে হইতেছে ভাগ্যিস ইনি ঈশ্বরকে দেখেন নাই—শুধু শুনিয়াছেন।

কবিচন্দ্র

গ্রন্থ পরিচয়

'চিত্রে বিদ্যাসুন্দর' অমর কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বিদ্যাসুন্দরের সচিত্র রাজ সংস্করণ। প্রকাশক এস-কে-মিত্র ব্রাদাস, ১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। দাম ৩॥০। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের নাম না শুনিয়াছেন বা না পড়িয়াছেন এমন বাঙ্গালী কমই আছেন। বিদ্যাসুন্দরের নানা রকম সংস্করণ আছে কিন্তু তেমন সুন্দর কোন সংস্করণ নাই—এতদিনে এস-কে-মিত্র ব্রাদার্স সেই অভাব পুরণ করিলেন। পাশ্চাত্যে এমন সব 'ক্লাসিক' বইয়ের বহু শোভন সংস্করণ থাকে। চিত্রে বিদ্যাসুন্দরে বহু ত্রিবর্ণ চিত্র আছে। কাগজ ছাপা বাঁধাইও যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহাই করা হইয়াছে বাংলার শোভন সংস্করণের যে কয়খানি বই বাহির হইয়াছে—ইহা তাহার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। আশা করি বইখানি বাংলার প্রত্যেক পাঠাগারে ও সৌখীন নর-নারীদের পাঠকক্ষে বিরাজ করিবে।

'মোটর বিজ্ঞান' শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র গুপ্ত প্রণীত, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩ কলেজষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। দাম আড়াই টাকা। আমাদের দেশে বহু মোটর চলিতেছে এবং ক্রমশঃ সংখ্যা বাড়িবেই কিন্তু যে দেশে এত মোটর চলিতেছে সে দেশে এ পর্য্যন্তও মোটর তৈয়ীর কোন ব্যবস্থা হইল না এমন কি মোটর বিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানা ভাল বই পর্য্যন্ত ছিল না। মোটর যাঁহারা রাখেন এবং ড্রাইভারী ও মেকানিজম্ যাঁহারা শিখিতে চাহেন তাঁহাদের এসব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ একখানি বাংলা বইয়ের যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল সে কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। এত দিনে মোটর বিজ্ঞান সে অভাব পূর্ণ করিতে পারিয়াছে। ইহাতে মোটর চালনা, কল কব্জাদির পরিচয়, দোষ নির্ণয়, মেরামত সবই বিশদভাবে লেখা হইয়াছে। ড্রাইভারী ও মোটরের কাজ যাহারা শিখিতে চাহেন এবং যাহারা এ লাইনে আছেন তাহাদের এ গ্রন্থ খানি অমূল্য সম্পদ স্বরূপ হইবে, মালিকেরাও এ বই খানি রাখিলে কারখানার অনেক খরচ ও হাঙ্গামার হাত হইতে বাঁচিবেন। মোটর বিভাগে এখনো বহু লোকের অন্ন সংস্থান হইতে পারে সুতরাং মোটর বিজ্ঞান পড়া থাকিলে বহু যুবকের অন্ন সংস্থানের পথ সুগম হইবে—দেশের বেকার সমস্যা অনেকটা মিটিবে। বহু চিত্র দ্বারা মোটরের কলকব্জাদির সব ব্যাপার বুঝানো হইয়াছে—আমরা মোটরের মালিকদের ও মোটর সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠার সুদৃশ্য বাঁধাই গ্রন্থ, প্রকাশকেরা বইখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে কোন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

'আকাশ পাতাল—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। প্রকাশক—এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা। ছেলেদের জন্য রচিত গ্রন্থ। প্রয়োজনের এই যুগে

আকাশ ভ্রমণসহজ সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। মাটীর নীচে, সমুদ্রের তলায় অভিযানও এখন আর সকল মানুষের কাছে আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। মানুষ যে কতরকমে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিতেছে, তাহা এই 'আকাশ পাতাল' পুস্তকে গ্রন্থকার বিশেষ সরল ভাষায় ও চিত্তাকর্ষকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখক খগেন্দ্র বাবু পুষ্পপাত্রের পাঠক পাঠিকাগণের নিকট সুপরিচিত। শিশুসাহিত্যেও তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। আকাশ পাতাল পাঠ করিয়া ছেলেমেয়েরা একাধারে নূতন বিষয়ে শিক্ষা ও আনন্দ উভয়ই লাভ করিবে। পুস্তকখানি এণ্টিক কাগজে ছাপা ও বহু চিত্র শোভিত। মলাটের রঙ্গিনচিত্র সুন্দর। মূল্য সুলভই বলিতে হইবে।

'চিনার'—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, এল এল-ডি প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅনন্তকুমার সেন, পাবলিক লাইব্রেরী এলাহাবাদ। প্রাপ্তিস্থান কমলা-বুক ডিপো, কলেজষ্ট্রীট. কলিকাতা। মূল্য আট আনা। পঞ্চাশটী সনেটের সমষ্টি। প্রসাদগুণ সম্পন্ন এই কবিতা গুলি পাঠে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। কবির ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গী বিশেষ প্রশংসনীয়। চিনার বৃক্ষ শোভিত পার্ব্বত্য প্রদেশের শোভায় একান্ত মুগ্ধ কবি-হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাই ভাষায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভক্ত কবি সৃষ্টির প্রশংসা করিতে গিয়া, স্রষ্টার, তাঁর অন্তরের দেবতার, গুণগান করিতে ভুলেন নাই। কাব্য রসিক মাত্রেই সুপণ্ডিত প্রবীণ গ্রন্থকারের রচিত এই পুস্তকখানি পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। পুস্তকখানি এণ্টিক কাগজে সুন্দর ভাবে মুদ্রিত।

'তুমি আর আমি' (অভিনব গাতি-কবিতার বই) শ্রীআশুতোষ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। ডি-এম লাইব্রেরী, কলিকাতা। —দাম ৷৵০। ৮টি ছোট বড় লালসাতুর কবিতা আছে। পরিচয়ে কবি অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—'তরুণ তরুণীর মিলন-রসে কবিতাগুলি আবর্ত্তিত। সে রস যে কামগন্ধ হীন নয় কবি নিজেই তা বলেছেন। এ হিসেবে কবিতাগুলি আধুনিক। বিষয় বস্তু যাই হো'ক এদের রৌপিক সৌন্দর্য্য উপভোগ্য। সাধনের প্রথম যত্ন হ'লেও চমৎকার লাগলো।' তরুণ কবি প্রথম কবিতায় বাদল রাতে প্রিয়ার সঙ্গে যথেচ্ছ সম্ভোগের চিত্র আঁকিয়াছেন —তারপরের আর ৭টি কবিতাতেই কাহাকেও জানালায় দেখিয়া কাহাকেও বাসে দেখিয়া কাম-দগ্ধ হিয়ার বাসনা কবিতায় ছড়াইয়াছেন। অপরিণত মনের এই সব প্রেমোচ্ছ্বাস বন্ধুবান্ধবকে শুনাইয়া তৃপ্ত থাকারই নিয়ম ছিল গোপনে, এখন সেগুলি বহি আকারেও বাহির হইতেছে। লেখক স্মরণ রাখিতে পারেন 'নগ্ন' জিনিষ গোপন থাকাই ভাল প্রকাশের চেয়ে। লেখকের কবিত্ব শক্তি আগামীতে মার্জ্জিত রুচির কোন কিছু কাব্য অভিযানের ভিতর দিয়া প্রকাশ হইতে দেখিলেই সুখী হইব।

'গীতি কুঞ্জ'—শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার প্রণীত। প্রভা নিকেতন, ভুজেশ্বর, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত। মূল্য বার আনা মাত্র। এই বই খানিতে ষোলটি গান এবং তাহার স্বরলিপি আছে। গানগুলি কবিত্বপূর্ণ এবং সুন্দর হইয়াছে। বিভিন্ন শিল্পীগণ সুর সংযোজন করায় গানগুলির আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সঙ্গীত অনুরাগী পাঠক পাঠিকাগণকে এই বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

"অবাঙ্গালীর অভিযোগ"

পুষ্পপাত্র' সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

আপনার মাসিক পত্রিকার গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'প্রলয় নাচন' গানটীকে parody করে কুমারী লতিকা মুখার্জ্জী 'উড়িয়া ঠাকুর' শীর্ষক যে গানখানি লিখেছেন তাহাকেই অবলম্বন করে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সমস্যা নিয়ে যদি দু একটা বলি, আশা করি, আপনার পত্রিকায় তা প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

ঐ গান খানির সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আমার পরিচয়টা আপনাদের জানানো নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ, সমালোচনা করব আমি সেই দিক থেকেই। আমি তাদেরই একজন যাদের আপনারা উড়িয়া' এবং আরো মধুর ভাবে 'উড়ে' বলে প্রিয় সম্বোধন করে থাকেন।

এখন বোধ হয় সহজেই বুঝতে পারবেন আঘাত আমার কোথায়, আর কি নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই। আচ্ছা, বলতে পারেন, অন্য জাতির কিংবা অন্য দেশের লোককে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে তাদের হীন বলে পৃথিবীর কাছে প্রমাণিত করবার অহরহ চেষ্টা করা কি সভ্যতার লক্ষণ যেমন আপনারা করে থাকেন? দু একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় কথাটাকে আপনারা কেহই অস্বীকার করবেন না। 'ওড়িয়াকে' নিজের অজ্ঞতাবশতঃ 'ও' কে 'উ' করে 'উড়ে,' হিন্দুস্থানীকে 'খোট্টা,' মাড়োয়ারীকে 'মেড়ো' এমন কি মাদ্রাজীকে 'বিলাতী উড়ে' বলা এক বাঙ্গালী ছাড়া আর কাকেও বলতে শোনা যায় না।

এটা যদি শুধু অতি সাধারণ বাঙ্গালীর মনোবৃত্তি হোত তবু আমরা একটু সান্ত্বনা পেতাম। কিন্তু আপনাদের সাহিত্যিকরা যাঁদের মন, উদার ধরণীর প্রতি পীড়িত দুস্থ লাঞ্ছিত মানবের বেদনার জন্য সমবেদনায় উন্মুখ হয়ে থাকবে বলে আশা করা যায়, মুখে প্রচার করে থাকেন—তাঁদের মন উদার, বিশ্বপ্রেমিক তাঁরা, কিন্তু কাজে এবং সাহিত্যের মধ্যে তাঁহাদের এই Hypocrisy বহুবার অতর্কিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং আজও করে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে লেখকদের লেখার মধ্যে যেখানেই খানিকটা জাতীয়তার কথা উঠেছে সেই খানেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপে লেখনী হয়ে উঠেছে পঞ্চমুখ, সেই খানেই ধরা পড়েছে কত provincial কত communal আপনারা।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আপনাদের বঙ্কিম সাহিত্যকেই ধরা যাক্, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল ওড়িয়াদের অকারণে নিন্দিত করে বঙ্গ সাহিত্যকে কলঙ্কিত করে নি; ঐতিহাসিক না হয়েও অনধিকার চর্চ্চা করে Hunte

প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের মিথ্যাবাদী বলে গালাগাল দিয়ে ওড়িশার শিল্প সম্পদ আর তার অতীতের বীরত্বের গৌরবে ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে ওড়িশার গজপতি, গঙ্গপতি বংশের স্বাধীন দিগ্‌বিজয়ী রাজাদিগকে বাঙ্গালী বলে প্রচার করে গেছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ একজনের মিথ্যা ভাষনকে আপনাদেরই আর একজন সংশোধিত করেছেন—তিনি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ৺রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়। তাঁর বহু পরিশ্রমে লিখিত 'History of Orissa' যারা পড়েছেন তাঁরাই জেনে থাকবেন বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক তত্ব আবিষ্কারের মুখে সত্য আছে কতটুকু। শুধু এতেই তাঁর স্মৃতি দেশ প্রীতি আর অন্যকে ঘৃণা করা স্বভাব নিরস্ত হয় নাই। 'রাজ সিংহ,' 'কৃষ্ণ কান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ' ইত্যাদি উপন্যাস গুলিতে অকারণে 'ওড়িয়াদের' প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছে।

তার পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা ধরা যাক্। তাঁর বিশ্ব প্রেমিক লেখনীর মুখে "ঝুটি বাঁধা উড়ে, পঞ্চম স্বরে পাড়িতে লাগিল গালি" এমনতর লাইনও সম্ভব হয়। বোধ হয় এক সময় ভারতের সকল জাতিরই ঝুটী ছিল, এখনও অনেকের আছে; কিন্তু তারা সবল, তাই বোধ হয় বিশ্বকবি তাদের কথা বলবার সময় একটু সাবধানেই বলেছেন, 'পঞ্চনদ তীরে বেনী পাকাইয়া শিরে জাগিয়া উঠিল শিখ

যদিও অন্যের তুলনায় শরৎচন্দ্রের লেখনীতে মানুষের দুঃখ দৈন্যের জন্য সমবেদনার ছবি ফুটে উঠেছে খুব মর্ম্মস্পর্শি হয়েই তবুও তাঁর সাহিত্যে অন্য জাতির প্রতি অবহেলা ওতাচ্ছিল্য দেখা যায়। 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের একখানি প্রসিদ্ধ উপন্যাস। তারি মধ্যেই দেখা যায় তিনি হিন্দুস্থানিদিগকে আক্রমণ করেছেন। তাঁর লেখনী স্থানে স্থানে বিনা অপরাধে আমাদের উপরেও খড়্গের মত নির্ম্মম হয়ে উঠেছে। এই তো আপনাদের বিশ্ব বিশ্রুত বড় বড় সাহিত্যিকদের মনোভাব। অন্য লেখকদের দোষ দেখে কেমন করে? আর এই সব খ্যাতনামা লেখকদের লেখা আবার অনুবাদিত হয়েছে ইংরাজী ভাষায় অর্থাৎ পৃথিবীর সকল সভ্য জাতিই জানতে পারবে ভারতবাসীর মনোভাব।

অন্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখা আর ছোট মনে করার মনোবৃত্তি নিয়ে এই বিংশ শতাব্দিতে বিশেষতঃ পরাধীন ভারতবর্ষে, যেখানে সব জাতির মধ্যে প্রীতি একান্ত প্রয়োজন বাঙ্গালী যে জগতের কি মহান আদর্শে সাধনে উদ্যত হয়েছে তা আপনারাই জানেন।

নারী হৃদয় কোমল, সহানুভূতিতে পূর্ণ বলেই প্রবাদ আছে। কিন্তু কুমারী মুখার্জ্জি কি তার বাহির? তিনি যদি Mother Indiaর লেখক Miss Mayo শ্রেণী নারী বলে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকতেন, আজ আমাদের অভিযোগ কিংবা দুঃখ করবার কিছুই থাকত না। কিন্তু তিনি ভদ্র শিক্ষিতা ভারত রমণী, অধিকন্তু আত্মপ্রকাশ করেছেন কবির রূপ নিয়ে। বাঙ্গালী কবির মন কি এমনি দরদী?

বহুবারে বহুপ্রকারে আপনাদের খোটার সঙ্গে খোঁচা খেয়ে খেয়ে আজ কতকগুলি অপ্রিয় সত্য বলতে বাধ্য হয়েছি আশা করি, আমার কোন বাঙ্গালী ভাই বোন একে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলে মনে করবেন না। আমার এই লেখার উদ্দেশ্য আমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা জাগান নয়; আমরা নিজ নিজের দোষগুলিকে আলোচনা করে যাতে পরস্পরকে স্নেহ সৌহার্দ্দ্যে বাঁধতে পারে এই উদ্দেশ্যেই আমি আমার অতি সামান্য লেখা নিয়ে আপনাদের দোরে এসেছি।

বশম্বদ
রমেশচন্দ্র নায়ক
সেক্রেটারী, ওড়িশা ইনষ্টিটিউট

রমেশবাবু, আমার লেখা ব্যঙ্গ রচনাটীকে জাতিগত আক্রমণ ভাবে লইয়াছেন দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। পত্রলেখক একটু ভাল করিয়া পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে ইহাতে ঠাকুর বা রাঁধুনীদের উল্লেখ করিয়া লেখা হইয়াছিল মাত্র; 'ওড়িয়া' জাতি সম্বন্ধে কোথাও কিছু নাই।

ব্যঙ্গ রচনা কখনো serious ভাবে কেহ ধরে না। এইরূপ বাঙ্গালী কেরাণীদের ও বিলাত ফেরত কলিকাতার আধুনিক বাঙ্গালী সমাজকে ব্যঙ্গ করিয়া ৺অমৃতলাল বসু প্রভৃতি অনেকেই অনেক comic নাটক, কবিতা প্রভৃতি লিখিয়াছেন। কিন্তু সে সব রঙ্গ রচনাকে আমরা কখনো serious ভাবে লই নাই।

'উড়িয়া' শব্দে উড়িষ্যার অধিবাসী আমরা বুঝিয়া থাকি। ইংরাজীতে Orissa লেখা হয় বটে কিন্তু বাঙ্গলায় "উড়িষ্যা" শব্দ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

উড়িষ্যার অধিবাসীদের যে 'উড়িয়া' বলা হয় তাহা খারাপ ভাবিয়া কোন বাঙ্গালীই বলে না আমার বিশ্বাস। 'উড়িয়া' শব্দ যদি ভুল হয় এবং 'ওড়িয়া' শব্দ যদি ঠিক হয় তাহা হইলে ভুল দেখাইয়া দিলে 'ওড়িয়া' শব্দ সহজেই চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু লেখকের পূর্ব্বে এ বিষয়ে বোধ হয় আর কেহ আলোচনা করেন নাই। আর এক কথা। ভৌগলিক নামগুলি যেভাবে সে দেশে উচ্চারিত হয় অন্য দেশের লোকেরা ঠিক সেইভাবে উচ্চারণ করে না। আমরা Englishmen দের বলি ইংরাজ, জার্ম্মানীর অধিবাসীরা নিজেদের দেশকে ইংরাজদের দেওয়া নাম "জার্ম্মানী" বলে না।

এক দেশের লোকের পক্ষে অন্য দেশের লোককে উপহাস করা অত্যন্ত অন্যায়। লেখক এ বিষয়ে কেবল বাঙ্গালীদের দোষ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় জানেন না যে ইংরাজদের ব্যঙ্গ করিয়া বলা হয় John Bull. আমেরিকার যুক্তরাজ্যের লোকদের ইংরাজরা বলে ইয়াঙ্কি।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চর্চ্চার মধ্যে যে ভুল আছে তাহা লইয়া লেখক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন; ইহাকেও তিনি বাঙ্গালী সাহিত্যিক-মনোবৃত্তির পরিচয় স্বরূপ লইয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমের ভুল যিনি দেখাইয়া দিয়াছেন সেই রাখালদাস বাবুও যে বাঙ্গালী।

'ওড়িয়া (লেখকের প্রদত্ত নামই আমি লইলাম) সাহিত্যে বাঙ্গালী লেখকের দানও বোধ হয় কম নয়।

বাঙ্গালী ও উড়িষ্যাবাসীদের আকৃতি ও প্রকৃতি, ভাব ও ভাষার মধ্যে যে পরিমাণ মিল আছে, সেরূপ আর ভারতের অন্য কোন প্রদেশের অধিবাসীর সঙ্গে আছে কিনা জানিনা। এই উভয় জাতির মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যের বন্ধন যাহাতে দৃঢ় হয় তাহা প্রত্যেকেরই করা উচিত।

পরিশেষে 'উড়িয়া ঠাকুর' গানটীর জন্য যদি একজনও উড়িষ্যাবাসীর মনে ক্ষোভ হইয়া থাকে সেজন্য আমি দুঃখিত। গানটী শীঘ্রই রেকর্ডে উঠিত; কিন্তু ইহার পর আমি এই গানটীকে আর রেকর্ডে দিতে ইচ্ছা করি না। আশা করি এই অপ্রীতিকর বাদ প্রতিবাদ এই খানেই শেষ হইবে।

কুমারী লতিকা মুখার্জ্জি

মাতৃমূর্ত্তি

বোটেচিলি

সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত

৮ম বর্ষ | আশ্বিন ১৩৪১ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

নিভৃতে

শ্রীপ্রমীলা রায় চৌধুরী

বধূ—"বলি, ঘুমায়েছ নাকি ?
উঁহু ! ঘুম নয় ; আঁখির পাতাটী
কাঁপিতেছে থাকি থাকি।"

বর—"তাই কি কখনো হয় ?
তুমি না আসিলে, ঘুমাইব আমি
এও তো মনেতে লয় ?"

বধূ—"থাক্ থাক্ মহাশয়—
কথার মাধুরী খুব জান তুমি
কথাতেই কর জয়।"

বর—"যা বলিবে মেনে লব—
বুঝেছি, আজিকে কলহ করিতে
বাসনা হয়েছে তব।"

বধূ—"একি কথা বল স্বামি!—
তুমি কি কেবল কলহই দেখ
কথাটী কহিলে আমি!"

বর—"তা কেন দেখিব প্রিয়া!—
তোমার কথায় মধুর আবেশে
নাচিয়া ওঠে এ হিয়া—
ভাল লাগে মোর, দেখিতে তোমার
স্ফুরিত অধর, নয়ন আমার
মৃদু মৃদু হাসি, গদ গদ ভাবে
কত কি বলা—
তাই নিয়ে আমি মাতা মাতা করি
সারাটী বেলা—"

বধূ—"ছল জান তুমি কত!—
মিছামিছি তুমি কাঁদাও আমারে
ব্যথা পাই কত মত!"

বর—ব্যথা পাও কোন্ দুখে ?
তোমার বেদনা দ্বিগুণিত বেগে
ফিরে আসে মোর বুকে—
আমি দেখি শুধু, তুমি মোর প্রাণে
নিত্য নূতন শর-সন্ধানে
জয় করে লও আমার হৃদয়
পুলক ভরে—
যেদিকে চালাও, কথাটি কহিনা
তোমার 'পরে।"

বধূ—"এত সুখ কি গো স'বে ?
নর-মানবেরে এত ভালবাসা
কে কোথা শুনেছে কবে ?
পদে পদে স্মরি আমার দীনতা—
পরাণ আমার বহিছে হীনতা
তুমি ভগবান্, তুমি সে দেবতা
সে কথা মানি।
পলকে আমারে ধূলা হতে নেহ
হৃদয়ে টানি।"

বর—"ওরে আদরিণী মোর—
ভালবাসা মোরে দেবতা করেছে
দিয়াছে প্রণয় তোর।"

—"যৌবন আনন্দ রসে—"

—গল্প—

শ্রীক্ষণপ্রভা রায়

[পুরুষ অনেক সময় মেয়েদের নিয়ে এবং মেয়েরা অনেক সময় পুরুষদের নিয়ে খেলে। এ এক শ্রেণীর পুরুষ ও নারীর স্বভাব। গল্পের নায়ক অরবিন্দ সেই প্রকৃতির পুরুষ। অজিতা, রুবি অনেক মেয়েই আকৃষ্ট হয়ে এর সঙ্গ চায়, আর এ ভাবে—'আমি কি করব—পতঙ্গ যদি আগুনের চার পাশে ঘোরে তার বিপদ না বুঝে তবে আগুনের আর কি দোষ?' এ-অবস্থায় শেষে অনেক নারী কি চায়—অজিতা তার দৃষ্টান্ত, আর অরবিন্দ নিজেই একটি বিশিষ্ট চরিত্র। বর্ত্তমান প্রগতির যুগে নারী-পুরুষের মেলামেশা সহজ করিতে অনেকেই উৎসুক—সুলেখিকা ক্ষণপ্রভা এই ছোট গল্পটিতে নারী ও পুরুষের মেলামেশারই একটা সহজ রূপ ফুটাইয়াছেন।]

অরবিন্দ ও অখিল দুজনে ছেলেবেলার বন্ধু,...। অখিলের অবস্থা 'অন্যভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ...' অরবিন্দের অগাধ পয়সা...।

যৌবনে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে সব রকমের সুবিধে করে দিয়ে অরবিন্দের বাবা মারা গেলেন। সংসারে তারা পিতা পুত্র, দুজনে দুজনের অবলম্বন—কাজেই বাবা মারা যাওয়ায় সে দিন কয়েক খুব অধীর হয়ে পড়ল।

শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে যেতে একে একে বন্ধু জুটে গেল। একে বড় লোক তায় শাঁসালো—কাজেই বন্ধুর অভাব তার হল না। সন্ধ্যার মজলিস্ গানে, গল্পে, আমোদে কাটতে লাগলো। অরবিন্দ এই আনন্দের স্রোতে ভেসে চললো। ক্রমে নিজেদের নিয়ে আমোদে মন আর ভরে উঠতে চাইল না। সে সবের সুবিধেও বন্ধুরা করে দিলে—অরবিন্দ টাকা দিয়েই খালাস—কার কি তার এসব হাঙ্গামা পোহানোয়? কোথায় কোন্ বাইজী ভাল গান করে, কোথায় গার্ডেন পার্টি না হলে লোক সমাজে মুখ দেখানো যাবে না—এসব বন্ধুদের নখদর্পণে।—

এমনি করে পাঁচ বছর খুব জমাট ভাবে মজলিস্ চললো—তার পরে ভাঙন এলো। টাকা ধার করার দরকার হলো—এসব ঝঞ্ঝাট বন্ধুরাই পোহাতো—অরবিন্দ সই করেই ছুটি। সে মানী লোক—কোথায় কার কাছে হাত পাততে যাবে? সর্ব্বনাশ যখন সাড়ে তিন পোয়া এগিয়ে এসেছে—তখন কাণাকাণি হয়ে অখিলের কাছে সে খবরটা পৌছিল।

দূরের গাঁয়ে অখিল মাষ্টারী করছিল—শনিবারে স্কুল করে অরবিন্দের কাছে রাত্রেই এসে পড়ল। সমস্ত দেখে শুনে তার আর কথা সরল না। অরবিন্দের বন্ধুমণ্ডলী

ও তার আচার ব্যবহার লক্ষ্য করে তার মনে খুব আঘাত লাগলো। ভেবেছিল যে সে নিশ্চয় তাকে মানুষের পথে দাঁড় করাবে।

সকালে যখন তার সঙ্গে অরবিন্দের দেখা হলো—অখিল তার মনের অবস্থা আর লুকোতে পারলেনা। বললে—"অরু! ছোট বেলা থেকে তোকে দেখে আসছি—এমনি করেই কি নিজেকে নষ্ট করতে হয়? অত লেখা পড়া শিখে শেষে তুই সাধারণের মতই দিন কাটাতে লাগলি? আর এই সব লোক তোর সঙ্গী? আমি কালই চলে যেতাম—যাই নি শুধু তোকে একবার ফেরাবার চেষ্টা করব বলে! তোর বাবার যে তোর ওপর কত আশা ছিল অরু!"

অরবিন্দ অখিলের কথা ক'টা শুনে লজ্জিত হলো—মনে মনে ভাবলে এমন করে কেউতো আমাকে বলেনি। সকলে আমার টাকাই দেখেছে—টাকাই চেয়েছে। বললে "সত্যিই কি আমার ফেরার পথ কিছু নেই অখিল? ফিরতে আমি চাই।"

এতক্ষণে তার হাত ছুটো নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে গভীর আবেগে অখিল বললে "আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তুমি পথভ্রষ্ট হয়েছ। তাই তুমি আজ এমন! অরু! তোমাকে ফেরাবার জন্য আমি জীবন পণ করতে রাজী আছি। সহজ, সুন্দর, সরল যা কিছু, সবই যে তোর মধ্যে ছিল।"

অরবিন্দ শুধু শুনে গেল। তার পরে অখিলের প্রাণান্ত চেষ্টায় অরবিন্দ তার বর্তমান জীবন থেকে ফিরে গেল; কিন্তু তার জন্যে অখিলের সামান্য মাইনেটুকুও ঘুচে গেল। বাধ্য হয়ে তখন তাকে অরবিন্দের সঙ্গেই থাকতে হল।

\+ \+ \+

আগের ঘটনার পরে প্রায় বছর দশেক হয়ে গেল। দেনার দায়ে বিক্রী হবে যে সম্পত্তিটুকু বেঁচে ছিল তাই দিয়ে অখিল, শেয়ার মার্কেটে কে'না বেচা আরম্ভ করে দিলে। ক্রমে ক্রমে পালিয়ে যাওয়া লক্ষ্মী একটু যেন বাঁধা পড়লেন। অখিল অরবিন্দকে সকল মন্দ অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিল; পারেনি শুধু তরুণীদের সঙ্গে মেলামেশা কমাতে। যেখানেই পার্টি হোক্ বা পিকনিক্ হোক সে ঝড়ের আগে বাতাসের মত সেখানে যেত-ই। আর কি যে মোহ ছিল তার হাব ভাবে কেউ না কেউ তাতে আকৃষ্ট হতই। অখিল জানতে পারলেই এই নিয়ে অনুযোগ করত—কিন্তু সে হেসে বলতো "দেখ, অখিল তোমার কথায় সব ছেড়েছি—আগেকার অরিন রায়—এখনকার অরবিন্দ রায় শেয়ার মার্কেটের দালাল হয়েছি। কিন্তু দোহাই তোমার, আমায় এটুকু ছাড়িও না। তোমার মত শুষ্কং কাষ্ঠং কে হবে? মানুষ হয়ে জন্মেছি—জীবনটাকে ভোগ করবনা? তবে পশু জন্ম নিলেই হত। তুমি তো আর জীবনের এ দিকটা দেখলেনা—শুধু ধর্ম আর নীতি নিয়েই বেঁচে রইলে—।"

এ দিকটায় দুজনের মতের মোটেই মিল না থাকলেও অন্য বিষয়ে তাদের তিলমাত্র অমিল ছিল না। দুজনেই দুজনের সঙ্গকামী ছিল।

সে দিন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরে গরমের ভাবটা কেটে গিয়ে বেশ একটু উপভোগ করার মত ঠাণ্ডা পড়েছে—। হাতে কোন কাজ না থাকায় অরবিন্দ "If winter comes" বইখানা পড়ছিল—পাশে একখানা কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে অখিল কিসের হিসাব ক্রমাগত লিখছিল আর কাটছিল।

ছোট একটা টিপয়ের ওপরে একটা টেলিফোন ছিল—সেটা ঝন্ ঝন্ করে উঠলো—তার 'রিসিভার'টা তুলে নিয়ে অরবিন্দ কাণে দিয়ে কি শুনে যেতে লাগলো—কিন্তু বললে না কিছুই?

অনেক ক্ষণের পর শুধু বললে "এবার হয়েছে—ব্যস্ No more থামতে পার।" বলে রিসিভারটা ষ্ট্যাণ্ডের ওপর রেখে দিলে।

তার কথাক'টা শুনতে পেয়ে পেন্সিলটা নামিয়ে অখিল বললে "কে হে?"

অপ্রসন্ন স্বরে সে বল্লে "কে আবার? অজিতা বোস্।"

"কি বলে? চায় নাকি কিছু?

"বলবে আর কি সেই পচা পুরোনো কথা যেটা আমার মোটেই সয় না! এই এক দোষে আমি ওকে ক্রমশঃ dislike করছি—না হলে আগে-তো ভালই লাগতো।"

অখিল স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললে "তোমার দিক থেকে যাই হোক—On the contrary অজিতার কথাটা মোটেই অসঙ্গত নয়—বরং ভেবে দেখতে গেলে খুবই সঙ্গত ও ন্যায্য। সে বড় ঘরের মেয়ে—Society তে তার মান, মর্য্যাদা, আছে—নাম, যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি সব কিছুই যে তার করতল গত। এ ক্ষেত্রে সে নিজের Position রাখতে যে দাবী তোমার ওপর জানাতে চাচ্ছে—সেটা কিছুই অসঙ্গত নয় অরু! বরং ঢের বেশী সঙ্গত।"

"সবই ত বুঝলাম—কিন্তু দাবীটা যে অসঙ্গত—এ আমি বলবই। কাদায় ঢিল ফেললে—ছিট্‌কে তা গায়ে লাগেই—এতো জানা কথা—তবুও সে কাদায় নেমেছিল কেন? আমি তো সরে এসেছি—কাদা লাগেনি—কিন্তু ওর গায়েই বা লাগলো কেন? না না—বড়ই disgusted হয়ে পড়েছি হে—এ ব্যাপারের যাহোক কিছু নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। আর্থিক ব্যাপার হলে—"

"তা......বিয়ে তো তুমি করবেই... flirt করে আর ক'দিন চলবে...নিজের খেয়ালে খুসীমত উচ্ছৃঙ্খল জীবনে তো এতদিন চললে...সুখ কিছু পেলে কি? আরাম?"

বাধা দিয়ে অরবিন্দ বললে "আঃ! জ্বালালে দেখছি... আমি মরছি নিজে কি করে পিছলে বেরিয়ে আসব তাই ভেবে...আর তুমি এখন Sermonise করতে বসলে... এই খানেই তোমার সঙ্গে আমার মতে মেলেনা অখিল! বিয়েটা যে করতেই হবে...অবশ্য করণীয় ব্যাপার...তা বলে কই আমি তো ভাবিনে, বিয়ের প্রয়োজন আছে বলেও মনে করিনে...আর, সকলে এই কাজটা করে বলে যে আমাকেও কত্তে হবে, তা ও মানিনে।"

জ্বলন্ত চোখে চেয়ে অখিল বল্লে "বিয়েটা প্রয়োজনীয় বলে মনে কর না, কিন্তু বিশ্বস্ত কুমারী-প্রাণ নিয়ে যা করে যাচ্ছ সেটা প্রয়োজনীয়, অবশ্যকরণীয় মনে কর তো? আশ্চর্য্য আমরাই আবার আমাদের শিক্ষার গৌরব করে থাকি? এই কি তার পরিচয়?"

হা হা করে হেসে অরবিন্দ বল্লে "সত্যিই, বিয়ের কিছু প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনে। ভগবানের অসীম দয়ায় পুরুষ মানুষ হয়ে জন্মেছি সে কি বিয়ের বাঁধনে আট্‌কা থাকবার জন্যে—তবে তো মেয়ে হয়েই জন্মাতে পারতাম!"

"সেটা কি তোমার ইচ্ছেয় হতো নাকি? না—না ওসব কাজই করোনা—পয়সা কড়ি আনছ—বিয়ে করবে বৈকি! অনাচারে লক্ষ্মী চঞ্চলা হন—মান তো? flirt নিয়ে তো প্রায় বছর চল্লিশ কাটালে—এইবার বিয়ের জীবনের আনন্দ——"

"আরে, রেখে দেও তোমার কথা! বিবাহিতের আবার জীবন! তার আবার আনন্দ! সেই এক-ঘেয়ে কাপড় দেও, গয়না দেও, না দেও আমার মাথা খাও—ছেলের অসুখ, মেয়ের বিয়ে, ডাক্তার ডাকো, রাত জাগো—রক্ষে কর ভাই—এ সব আমার মোটেই পোষাবেনা—বেশ আছি বাবা—বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়! কিন্তু কেন বলো তো আজ মেয়েদের হয়ে তর্ক করতে তুমি এত উৎসুক হয়েছ? এত সাধু তো তুমি নও! তোমার কি মনে বিয়ের ইচ্ছে জেগেছে? মধুকর বৃত্তি বা এত মন্দ কি? তোমার যুক্তিমত এতে বিয়ের আরাম না থাক আনন্দ আছে—অভিজ্ঞতা আছে প্রচুর।

'কোন কুসুমের বুকের তলায়
না ফুরানো মধু ঘুমায়
আমার মানস-মৌমাছি ধায়
তারি অন্বেষণে।'

বুঝলে বন্ধু—মানুষ হয়ে জন্মিয়েছ—জীবনটা ভোগ করে নেও—তাতে যদি দুঃখ, দুর্দ্দিন আসে তো—আসুক। মনে করতে পারবে—ভোগের আনন্দ জেনেছ।——তা না সব সময়েই—'দুর্ব্বাসা আসে অবহিত হও—ওঠো, জাগো ত্বরা করি।'

"ছিঃ ছিঃ ভদ্রঘরের মেয়েদের সম্বন্ধে এসব কথা ব্যবহার করোনা অরু! ভগবানের দয়াতেই নারী মনোহর চেহারাটা পেয়েছ—যেটা তাদের attract করবার পক্ষে তোমার প্রধান অস্ত্র—এবং তোমার advertisement ও বটে!'

হেসে অরবিন্দ বল্লে "তোমার চেহারাটা যে ঠিক নেই

পরিমাণে উল্টো, আসক্তি না জন্মে বিরক্তি জন্মায়—সেটা মনে করে আজ কি তোমার হিংসে হচ্ছে ভাই ?, সবাই তো আর অরু রায় নয় যে তোমার মুখচন্দ্রমা দেখে খুসী হবে ?"

"নাঃ— হিংসে নয় অরু! দুঃখ। যে জাতের ভেতর মা, বোন, মেয়ে জন্মায়, সেই জাত নিয়ে এতটা স্বেচ্ছাচার আমার যেন বরদাস্ত হয় না। তোমার মত আমি অতটা বেপরোয়া হতে পারিনি—এখনো—ভাই—"

"ভুলে যাচ্ছ অখিল—মায়ের জাতের মধ্যেই আবার স্ত্রীও জন্মায় যাকে তোমাদের কবিতার ভাষায় বলে 'প্রিয়া' 'মানসী'—আরো কি বলে জানিওনা ছাই। জাত এক হতে পারে কিন্তু তার মধ্যেও আবার—division আছে। যাক্ গে—এসব। এখন অজিতার কি করি বলো, আজকে যে যেতে বললে—কি করে এড়াই পরামর্শ দেও একটা কিছু! রেগেই রইলে যে!"

নির্ণিমেষে তার দিকে চেয়ে অখিল বললে"আমার পরামর্শ তুমি তো শুনবেনা—সুতরাং বলে লাভ নেই। তুমি অজিতাকে যেখানে এনে দাঁড় করিয়েছ,—সুনাম রাখতে গেলে ওকে বিয়ে করে সম্মান দেওয়া ছাড়া আর কিছুই সম্ভবপর নয়—তা যদি না করতে পারো তবে Let her die—" অখিলের চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো।

+ + +

লাল সুরকী ঢালা পথের উপর দিয়ে, দুধারে সাজানো পাম গাছের টবের পাশ দিয়ে—সাদা মার্কেলের সিঁড়ি ক'টার পাশে ল্যাণ্ডিং এ এসে অরবিন্দ গাড়ী থামাল। বাড়ীর মালিক স্বনাম খ্যাত ব্যারিষ্টার—এঁর এক মাত্র মেয়ে 'মলি'র জন্মদিনে অরবিন্দের কাছে চিঠি গিয়েছিল—। তেমনি গিয়েছিল মেয়ের বন্ধুদের কাছেও—সেই নিমন্ত্রণের কথা জানা ছিল বলেই অজিতা তাকে এখানে আসতে অনুরোধ করেছিল—ইচ্ছা ছিল বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষাও হবে—আর অরবিন্দের সঙ্গও।

লঘু পায়ে অরবিন্দ কার্পেট পাতা সিঁড়ি ক'টা পার হয়ে গেল—ওপরে উঠতেই একটী ছোট মেয়ে তার 'বটন হোলে' একটী ফুলের গুচ্ছ পরিয়ে দিলে। স্মিত একটু হেসে সে তার গাল দুটি একটু টিপে দিলে। আর একটু আগাতেই জন কয়েক তরুণী তাকে একেবারে ছেঁকে ফেললো।

মুরলা—বেশীর ভাগ সময় বোর্ডিংএই থাকে—অনেক করে ছুটী নিয়ে বন্ধু 'মলি'র জন্ম দিনে এসেছে। বললে "অরুণ বাবু! আপনাকে যে দেখাই যায় না আর! আপনি কি Societyতে মেলা মেশা ছেড়ে দিয়েছেন নাকি? তা ছাড়ুন গে—আমরা তা বলে আপনাকে ছাড়চিনে!"

মেয়েটীকে চিনতে অরবিন্দের একটু সময় লাগলো—কিন্তু সে তার বিন্দুমাত্রও আভাস না দিয়ে বললে "কই! আমি তো সব জায়গায়ই গিয়ে থাকি—কিন্তু আপনাকেও তো দেখিনে! উল্টো চাপ দিচ্ছেন বুঝি?" মিষ্টি সুরে—হেসে উঠলো—।

নন্দা পাশেই ছিল—বললে "অরু বাবুর বুঝি সকলের Company সহ্য হয় না! না হলে সে দিনের Steamer partyতে এলেন না যে!"

তার দিকে ফিরে হাসিমুখে সে বললে "Excuse me for that. সত্যি করে—বিশ্বাস করুন যে সে ত্রুটী আমার অনিচ্ছাকৃত। তার জন্যে কি আমি ক্ষমা চেয়েও—পাব না?"

নন্দা কি হয়তো বলতে যাচ্ছিল—কিন্তু অজিতাকে আসতে দেখে থেমে গেল। অজিতা কাছে এল—রূপ তার সামান্য নয়—সেই রূপকে সে সাজিয়েছে সুন্দর করে—সমস্তটা তার দেহ ঘিরে অপূর্ব্ব শুচিতা—যেন মূর্ত্তিমতী কবিতা—।

অরবিন্দ একবার চেয়ে দেখলে—তার মনে হল যে অজিতা যেন মৌন নিবেদন করছে—

"আপনি কতক্ষণ?" অতি স্নিগ্ধ স্বরে অজিতা জিজ্ঞাসা করলে। "এই তো তারপর আপনি?" বলে অরবিন্দ তার দিকে চাইল।

"আমি কিছুক্ষণ হল এসেছি—আপনি খুব punctual তো! প্রায় eleventh hourএ এসেছেন! 'মলির' জন্যে present কি এনেছেন দেখি?"

"সামান্যই—এ কি আর আপনাদের মনেই ধরবে না

আপনাদের যোগ্য ?" বলে প্যাণ্টের পকেট থেকে ছোট একটা 'কেস' বের করে তার হাতে দিলে।

'কেস'টা খুলতেই Gold stoneএর ছোট ইয়ারিং একজোড়া বিদ্যুতের আলোয় ঝিক্ ঝিক করে উঠলো—।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে অজিতা বললে "এই Present মনে ধরবেনা বলছিলেন ?—কেন ?—excuse me for a minute যার জিনিস তার মুখ থেকেই প্রশংসাটা আপনাকে শুনিয়ে দিচ্ছি!" বলে সে 'মলি'র খোঁজে চলে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই 'মলি' এল—কাণে তার সেই ইয়ারিং দুটা। কপালে হাত দুটী ঠেকিয়ে সে বললে "সত্যি—কি খুসীই যে হয়েছি—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! আপনার choice আছে—এ অস্বীকার করার উপায় নেই—।"

অরবিন্দ শুধু হাসলে।

একটু পরেই খাওয়া আরম্ভ হল—এরপরে অল্প দু'চারটে গান হয়ে সে দিনের মত Party ভঙ্গ। 'মলি' তার বন্ধু বান্ধব নিয়ে টেবিলে খেতে বসল—পুরুষ বন্ধুও জন কয়েক ছিলেন। অরবিন্দ ও এই দলে ছিল। খাওয়ার আয়োজন সমস্ত দেশী হলেও 'পানীয়ের' ব্যবস্থা ছিল।

অনেক চেষ্টা করে অজিতা অরবিন্দের ঠিক সামনের আসন দখল করেছিল। অরবিন্দের পায়ের আঙুল তার পায়ের আঙুলের সঙ্গে কি আলাপ করে গেল—খেতে খেতে সে শুধু একবার মুখ তুলে দেখলে।

ইভিনিং স্যুট পরা হলেও চেয়ারে বসেই অরবিন্দ তার পা দুটো মুক্ত করে নিয়েছিল। গল্প সে সকলের সাথেই করে যাচ্ছিল কিন্তু এই খেলা তার শুধু অজিতার কাছেই সীমাবদ্ধ ছিল।

হঠাৎ সে বললে—"শীগ্‌গীরই আমি একটা Long drivingএ বেরোব—আপনারা কেউ দয়া করে যদি accompany করেন তো drivingটা খুব enjoy করা যাবে—কি বলেন যাবেন কেউ ?"

আইসক্রীম খেতে খেতে অজিতা বললে "আমি রাজী আর কেউ যাবি তোরা ? মলি তুই ?"

হেসে মলি বল্লে "না—একেই তো এই জন্মদিনের হাঙ্গামে দু'দিন পড়া শুনো কামাই গেল—এরপরে আবার Motor tripএর কথা তুলি তো মা আর আমার মুখ দেখবেন!—বুঝলি রে বোকা ? তা ছাড়া অরু বাবু তোকে mean করেই বলেছেন—আমরা উপলক্ষ্য মাত্র।

হাত বাড়িয়ে তার বাহুমূলে একটা চিমটী দিয়ে অজিতা বললে "What a naughty you are! অরুবাবু কখনই তা বলেন নি। বলেছেন আপনি ? বলুন তো ?"

"আমি সকলকেই যাবার জন্যে অনুরোধ করছি—কারো ওপরেই আমার কোন রকমের partiality নেই—যে কেউ গেলেই আমি বিশেষ খুসী হব।"

"Partiality নেই বলছেন—কিন্তু partialityই তো করলেন—অজির কথাটা support করায় তো তাই-ই বোঝাল। আপনি তো বলতে পারতেন যে "হাঁ—আপনাকেই mean করেছি" এ সৎসাহসটুকু বুঝি হল না ?" বলে নন্দা হাসলে।

বিজয়, এদের পুরোনো বন্ধু—কোথাকার ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার—পছন্দটা নন্দাকেই—এটা বোঝা যায়। ঘরে বৌ, ছেলে মেয়ে আছে— তবুও পুরোনো বন্ধুত্বের খাতির ছাড়তে পারেনা—বল্লে "নন্দা দেবি! আপনি তো অনেক দিন আমাদের ওদিকে যান্ নি।"

নন্দা কিন্তু এ লোকটার হাব ভাব মোটেই সহ্য করতে পারে না—তার মনে হয় এর গায়ের রক্ত বিষম ঠাণ্ডা—কোন কিছুতেই এ যেন তেজে জ্বলে উঠতে পারেনা—এর প্রেম নিবেদন শুনে শুনে নন্দা কালা হবার জোগাড় হয়েছে—নন্দা স্বীকার হলেই সে বৌ ছেলে মেয়ে সব কিছু ফেলেই তাকে নিয়ে elope করতে রাজী।

আজও তার মুখে নিজের নামটা শুনে তেমনি শিউরে উঠল—একটা অশুচি কিছু মাড়ালে যেমন সারা দেহ ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে তার মনও তেমনি হল। মনের ভাব মনেই রেখে সে বললে "না—সময় পাইনে মোটেই! আপনার স্ত্রী, ছেলে পিলে ভাল তো ?" যেন নন্দা তাকে জানাতে চায় যে তার পারিবারিক খবর সে রাখে—বাইরে যুবা সাজলেও মনের যৌবন তার অনেক দিন গিয়েছে—

সে সন্তানের পিতা—স্ত্রীর স্বামী—তার কি আর এই বলে—

বিজয় কিন্তু নন্দার এই কথা ক'টাতেই কৃতার্থ হয়ে গেল—বল্লে "সময় নেই তা জানি—কত কাজ আপনার—কিন্তু সময় করে যাবেন একদিন। বলেন তো আমিই নিয়ে যেতে পারি।"

"চেষ্টা দেখব"—বলেই নন্দা অরবিন্দের দিকে ফিরল—অপমানে বিজয়ের মুখটা কালো হয়ে উঠল। চোখের দাহিকা শক্তি থাকলে হয়তো সে তাকে ভস্ম করে ফেলত।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়েই এসেছিল—যা' একটু আধটু বাকী ছিল তা শীগগীরই শেষ হয়ে গেল—হাত ধুয়ে রুমালে মুছতে মুছতে সকলেই উঠে পড়ল। দু'চার জন বাড়ী ফিরবার জন্য তখনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—দু'চার জন তাঁদের মেয়েদের কৃতিত্ব দেখবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলেন—। শীগগীর আর এমন মেলা মেশার সম্ভাবনা নেই সুতরাং এ সুযোগ ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়—যদিই কোন তরুণের—

গানে 'রুবি'র গলা ছিল—কিন্তু অহঙ্কার ছিল তার চেয়েও বেশী। গলা খারাপ হওয়ার ভয়ে সে বেশী কথা বলত না, দই খেত না আর সব সময় কাবাবচিনি তার মুখে থাকতই। সকলে মিলে তাকে গানের জন্যে অনুরোধ করতে মিহি সুরে সে বল্লে "এই পেট ভরে খাওয়ার পর? যা' অবস্থা হয়েছে পেটের!—"

"দেখ রুবি গান তুই ভাল করিস্ তা আমরা সবাই জানি—তাই বলে এত সাধতে হবে নাকি? আমার তো বাপু এত সাধাসাধি নেই—কেউ বললেই গেয়ে দিই তা যেমনই হোক্" বলে নন্দা হাস্‌লে।

"দাও না ভাই নন্দা দি, আমার গলাটা আজ ধরে গেছে নেহাৎ যদি পেড়াপীড়ি কর তো গাইব কিন্তু ভাল লাগবে না তোমাদের কারোরই—" বলে সে চট করে অরবিন্দের দিকে চেয়ে নিয়ে নিজের চেহারাটাও ঘরের দাঁড়া আয়নায় দেখে নিলে।

অরবিন্দ রুবিকে আমল দেয় নি সুতরাং পরিচয় না থাকায় আলাপ [illegible] অসুবিধা হল—[illegible] সে কিছুই বললে না বটে—কিন্তু সেই থেকে অনুক্ষণ তাকে লক্ষ্য করে যেতে লাগল।

সকলের বলা-বলিতে রুবি গান সুরু করলে:—গলা তার সত্যিই সুন্দর তার ওপর সুন্দর করে গান করার দিকে তার নিজের বিশেষ ঝোঁক ছিল কাজেই গানের কথা ও সুর সকলের মনকেই স্পর্শ করলে। রুবি গাইছিল—

"স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে,
যাবার বেলা হোলো:
যাবার আগে সেই কথটী বোলো।
ফিরিয়া চেয়ে এমন কিছু দিয়ে
বেদনা হবে মোর পরম রমণীয়।
আমার মনে রহিবে নিরবধি
বিদায় ক্ষণে, ক্ষণেক তরে যদি
সজল আঁখি তোলো॥"

যে ক'জন তরুণ তরুণী সেখানে ছিল সকলের মনই একটা সজল বিষণ্ণতায় ভরে উঠলো—সকলেরই মনে হল দেওয়ার অনেক ছিল—নেওয়ারও বুঝি ছিল কিছু—কিন্তু সময় পার হয়ে যায়। হল না কিছুই।—

সন্ধ্যা থেকে মেঘ করে ছিল, জ্যোৎস্না দেখা যায় নি। এখন সেই কালো মেঘটা সরে গিয়ে জ্যোৎস্না উঠল। একটু আগেই যেখানটা গানে, গল্পে মুখর হয়েছিল—সেখানে এখন অতল নীরবতা।—

সকলেই কিছু না কিছু ভাবছিল কিন্তু চিন্তাধারা সকলের বোধ হয় এক ছিল না।

হাতের ঘড়ীটার দিকে চেয়ে অরবিন্দ বল্লে "ও: দশটা হয়ে গেছে! I will be going now" সে উঠে দাঁড়াতেই সকলেই যেন ঘুম ভেঙে ওঠার মত উঠে পড়ল—তার পরে কার গাড়ী তখনও এসে পৌঁছয় নি—কে বাড়ী যাওয়ার পথে একটু ঘুরে গেলেই অন্য একজনকে নামিয়ে দিয়ে যেতে পারে এই নিয়ে আলোচনা, অনুরোধ ও ধন্যবাদ চলল।

অরবিন্দ একটু দাঁড়িয়ে দেখলে তার কাছে কোন অনুরোধ এসে পৌঁছয় কিনা—কেউ কিছু বললে না দেখে সে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ মনেই নিজের গাড়ীর দিকে এগিয়ে

গেল। কারো সঙ্গই তখন তার পক্ষে লোভনীয় ছিল না, তরুণীর সঙ্গ তার নেশার মত হলেও অবসাদ আসতেও দেরী হ'ত না, তখন সে নিজেকে নিজের মধ্যে এমন করে লুকিয়ে রাখত যে তার একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অখিলও সেখানে ঢুকতে পেত না।

এখন এই partyর শেষেও তার মনে তেমনি একটা অবসাদ এসেছিল কিন্তু ভাগ্য বিধাতা লিখেছিলেন অন্তরকম। শেষ সিঁড়িতে পা দিতেই হেনার ঝোপের পাশ দিয়ে কার এক খানা মার্ব্বেলের মত সাদা হাত বেরিয়ে এল ও তার কোটে টান পড়ল, ফিরে চেয়ে দেখলে অজিতা দাঁড়িয়ে—মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেও ভদ্রতার খাতিরে দু'পা তাকে এগিয়ে যেতে হ'ল। অজিতা প্রায় কাণে কাণে বলার মত করে বল্লে "তুমি কি এখন সত্যি সত্যি বাড়ী ফিরবে? না অন্য কোথাও?"—

"তা ঠিক নেই, ইচ্ছে হলে হয়তো এখন লেকে গিয়ে বসে থাকব—হয়তো ঠিক এর উল্টো দিক ব্যারাকপুরের পথ ধরব কিছুই ঠিক নেই অজিতা—"

"না, থাকগে, তোমার সঙ্গে আমার গোটা কতক কথা আছে সুতরাং আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।" বলেই তাকে আর দ্বিতীয় কথা বলার অবসর না দিয়ে সে হেনার একটা গুচ্ছ টেনে ছিঁড়ে নিয়ে আলোয় ঝল্ মল্ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

অরবিন্দ কি যেন একটু ভেবে নিলে—পরে আপন মনে বল্লে "আমি কি করব—পতঙ্গ যদি আগুনের চার পাশে ঘোরে তার বিপদ না বুঝে তবে আগুনের আর কি দোষ? তার স্বধর্ম্ম হচ্ছে নিজে জ্বলে অপরকে জ্বালানো।" তার পরে ধীর পায়ে সে নিজের গাড়ীর দিকে গেল।

হেনার গোছা হাতে নিয়ে অজিতা এগিয়ে এল, সকলকে শুনিয়েই সে বেশ চেঁচিয়ে বল্লে "অরু বাবু! আমাকে যদি যাবার পথে একটু নামিয়ে দিয়ে যান তা খুব অসুবিধা হবে কি আপনার?"

কিছু না বলে অরবিন্দ মাথা নাড়লে, গাড়ীটা ষ্টার্ট দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে দরজাটা খুলে ধরতে অজিতা ঢুকে পড়ল। গেট পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গিনীদের ক্ষীণ একটা হাসির রেশ যেন কাণে এসে পৌছল। তার চোখ, কাণ গরম হয়ে উঠলো।

\+ × +

কিছু কথা আছে বলে অজিতা নিজে ইচ্ছে করেই অরবিন্দের সঙ্গে এসেছিল কিন্তু সমস্ত গাড়ীই সে চুপ ক'রে কাটালে, বলার কিছু থাকলে সে বলতে পারতো—অনুকূল ছিল সবই—এমন কি অরবিন্দের মনও কিন্তু বলা হলনা, হেনার মৃদু গন্ধ, গাড়ীর গতিবেগ, অরবিন্দের সঙ্গ-সুখ, চাঁদের পূর্ণ জ্যোতির মধ্যে সে আবিষ্টের মত বসেই রইলো—শরীর তার এত শিথিল হয়েই ছিল যে যখন বাড়ীর কাছে গাড়ী থামিয়ে অরবিন্দ Steering থেকে হাত তুলে তাকে তার দুই সবল বাহুর মাঝে বেঁধে নিয়ে কপালে, চুলে, মর্ম্মর-শুভ্র, শাঁখের মত দাগ ওয়ালা গলায় পর পর চুমো দিয়ে এই পরিপূর্ণতা প্রকাশ করতে চাইল—তখন সামান্য একটা বাধা দিয়ে, সামান্য একটু হাত তুলেও সে আপত্তি জানালে না। অরবিন্দ তাকে ছেড়ে দিয়ে বল্লে "কই বললে না তো কিছুই?"

ধীরে সুস্থে গাড়ী থেকে নামতে নামতে সে বললে "বলার আর দরকার নেই কিছুই।" তারপরে আর কোনো দিকে না চেয়ে সে সোজা বাড়ীতে ঢুকে গেল।—

অরবিন্দ তার চলে যাওয়া পথের দিকে এক সেকেণ্ড চেয়ে দেখলে—পরে ষ্টার্ট দিতে দিতে ভাবলে "স্ত্রীণাম্ চরিত্র—"

\+ × +

ওপরের ঘটনার পর দিন দশেক চলে গিয়েছে—এর মধ্যে অজিতার সঙ্গে অরবিন্দর আর দেখা হয় নি। সেদিন কলেজ থেকে ফেরার পর রুবির একটা নিমন্ত্রণ চিঠি পেয়ে অজিতা একটু ভাবনায় পড়ে গেল—। চিঠিটা সংক্ষিপ্ত খুবই,

অজু, আজ বিকেলে একটু গান বাজনার আয়োজন করেছি—মলি, নন্দা, প্রভৃতি আসবে—তোকেও আসতে হবে। কিসের জন্যে? তার কারণ এখানে এলে বুঝতে পারিব। ইতি—তোর রুবি।

পুনশ্চ:—অরু বাবু কোথায়? তার ঠিকানা তুই নিশ্চয় জানিস—আমাকেও জানাস ভাই—লক্ষ্মী—"

দিন দশেক ধরে অরবিন্দের সঙ্গে তার দেখা শোনা ছিল না সত্যি—কিন্তু সে যে কলকাতায় আছে তা জানা ছিল—এখন রুবির চিঠি পেয়ে সে ভাবলে কোথায় যাওয়া তার সম্ভব! বাড়ীতে তার মা ছাড়া আর কেউ ছিলনা—তিনি আবার অতিমাত্রায় রক্ষণশীলা—মেয়ে যে যখন তখন যার তার সঙ্গে বেড়াতে যায়—রাত করে ফেরে এটা তাঁর মতের সঙ্গে মিলতো না—কিন্তু না মিললেই বা—মেয়ে তো আর বললে শুনছে না—সুতরাং না বলাই ভাল—এই ছিল তাঁর মনের কথা—। অত বড় বাড়ীর খানকয়েক ঘর নিয়ে তিনি তাঁর মনের মত আস্তানা পেতেছিলেন—বাকী সবটাই ছিল অজিতার দখলে।—

একটা স্লিপ লিখে অরবিন্দের বাসায় পাঠাতে গিয়ে কি ভেবে সে সেটা আর পাঠালেনা। —টেলিফোনে সে তাকে ডাকলে—।

"তারপরে, তোমার যে মোটেই খবর নেই কিছু?"

"কি খবর তুমি চাও?"

তার কথার ভঙ্গীতে অজিতা চটে গেল—বল্লে "আমি চাইনে খবর—রুবি তোমার নতুন বন্ধু তোমার ঠিকানাটা চেয়েছিল—তাই—তার চিঠির ভাবে বুঝেছিলাম—তুমি বুঝি কলকাতায় নেই—"

"রুবি ঠিকানা চেয়েছে? কেন? ২। ৩ দিন আগেও তো তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে!"

অজিতা একেবারে স্তম্ভিত! বাক্য হারা! অরবিন্দ এখন রুবির সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত,—তাই তার—অবসর নেই অন্তকিছুর—। আর সে? এমন বোকা—এমন অল্পবুদ্ধি যে, সে দিনের ঘটনাটাকেই মনের মধ্যে—ছিঃ! ছিঃ! অরবিন্দের সেই ব্যবহারটা মনের ভিতরে কত যত্নে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—সাজিয়ে অনুভব করতে চেয়েছে! ছিঃ! তার ভেতরে প্রাণের কি কোন যোগ ছিলনা? অসার? মূল্যহীন? খেয়ালী যুবকের ক্ষণিকের খেলা? তাই যদি হয়? তবে? রাগে, দুঃখে, অপমানে তার চোখ জলে ভরে উঠলো—একটু সামলে নিয়ে বল্লে "তুমি একবার আজ আমার এখানে আসতে পারবে?"

খুব নির্লিপ্ত ভাবে অরবিন্দ বল্লে "বিশেষ কিছু দরকার আছে কি?—যদি—সিনেমায় যাওয়ার ঠিক করে থাকো বা বেড়াবার তবে আগেই বলি যে আমার সময় হয়ে উঠবেনা।—না হলে—।"

এতদূর! অথচ একদিন অজিতার সঙ্গলাভের আশায় অরবিন্দ ধীর ভাবে শুধু অপেক্ষা করেই গিয়েছে—এমন দিনও গিয়েছে। তখন মনে হ'ত তার মত ভদ্র, সুন্দর, সরল, সংযত বুঝি সহজে দেখা যায় না। কি এক অজানা আকর্ষণে ধীরে ধীরে, তিলে তিলে, এগিয়ে সে নিজের জালে নিজেই এমন আটকে পড়েছে যে-সে জটা খুলবার আর উপায় হচ্ছে না—। নিজের ওপর অক্ষম রোষে সে অধীর হয়ে পড়লো—কেন? কেন সে এত অসহায়? কিন্তু আর নয়। খেলাই যদি এ হয় তো এ খেলারও শেষ করতে হবে এইবার। এমনি-তেই তার সুনাম খানিকটা যেন নষ্ট হয়েছে—এর পরে জানাজানি হয়ে গেলে!

ধরা গলায় অজিতা বল্লে "না—সিনেমাতে বা বেড়াবার সখ আমার নেই—তুমি অনুগ্রহ করে সন্ধ্যের পরে যে কোন সময়ে এসো—আমি বাড়ী থাকব।"

"আজ সন্ধ্যায় খুব সম্ভব পেরে উঠবোনা—অফিসের কাজ আছে। তবে—সময় যদি পাই তো যেতে চেষ্টা করবো—না হলে কাল—।"

সন্ধ্যা থেকে অপেক্ষা করে অজিতা যখন অরবিন্দের আসা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছে—তখন সে এলো।

নিজের দেরী হওয়ার কৈফিয়ৎ স্বরূপ সে বললে "অফিসের কাজ সেরে ফিরবার পথে রুবির সাথে পথে দেখা—সে বাড়ী না নিয়ে গিয়ে ছাড়লোনা—তাই একটু দেরী হলো—তা অসময় হয় নি কি বলো?"

রুবি যে ধীরে ধীরে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে...এটা মনে হতেই তার অস্বস্তির শেষ রইলো না। অরবিন্দ আবার বললে "কাল কি একটা party আছে বললে... সন্ধ্যা ছ'টায় সুতরাং কালও হয়তো যেতে হবে।"

অজিতা একবার জলে উঠলো...বললে "আর, হয়তো

যেতে হবে—বল্‌ছ কেন? যাবেই তাই বল—। যাবে নাই বা কেন? তার সঙ্গে নূতন আলাপ—। সে যাক্‌ গে—। তুমি আমার কথার কি উত্তর দিচ্ছ? এ রকম করে যে চলেনা—সেটুকু বুঝবার ক্ষমতা—আশা করি তোমার আছে—"

বিষম চমকিয়ে অরবিন্দ বল্‌লে "কি রকম করে চলেনা—? বন্ধুত্ব করে? কেন? স্ত্রী পুরুষে কি বন্ধুত্ব চলেনা? সব তাতেই মনটা অত সঙ্কুচিত কর কেন?"

"আমার মনের প্রসার বেশী নয়—সেদিনের ঘটনা-টাকেও কি বন্ধুত্বের নিদর্শন বলতে চাও? আমি তা চাইনা—হয় এ খেলার শেষ কর না হয় যা' সহজ, সত্য তার আশ্রয় নেও। এমন সাঙ্ঘাতিক খেলার প্রশ্রয় আমি আর দিতে পারিনে।"

"সহজ, সত্য, কি? তার সরল অর্থ তো বিয়ে করা! আমাকে মাপ করো—ওইটী পারবনা—। আমি চিরদিন মুক্ত বাধা বন্ধহীন—বন্ধন আমার সইবেনা—পুরুষ হয়ে জন্মিয়েছি কি নারীর দাসত্ব করতে না প্রভুত্ব করতে?"

"শেষ পর্য্যন্ত যদি এই ধারণাই তোমার মনে বদ্ধমূল ছিল—তবে? তবে—কেন আমাকে নিয়ে—এ খেলা খেল্‌লে—তুমি যে এত ভয়ানক—তোমার সুন্দর দেহের নীচে যে এমন জঘন্য মন লুকিয়ে আছে তা তো এক-বারও আমার মনে হয় নি—। ছিঃ! ছিঃ! তুমি—"

হা হা করে হেসে অরবিন্দ বল্‌লে "কেন মিছে কাঁদুনী গাইছ? তুমি বেশ জানো—আমার চেয়েও ভাল করে জানো—যে এমন কিছু condition এ তোমাকে এনে ফেলিনি—যার জন্যে তুমি আমাকে এত ধিক্কার দিচ্ছ। আর সে দিনের সেই ঘটনার কথা বলছো—trifle matter ও হয়েই থাকে—তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না—। বা সেই জন্যেই বিয়ের ফাঁসী পরতে হয় না—। এত বোঝ? আর এটা বোঝ না যে Passing state of mind সকলেরই হয়!"

"বিয়ে করে সহজ পথে জীবনটা চালানো কি ফাঁসী পরা হলো?"

"নিশ্চয়—যে বন্ধন চায় না তাকে সেটা জোর করে পরালে সেটা তার পক্ষে উদ্বাহ না হয়ে উদ্বন্ধনে দাঁড়ায় শুধু এই কথাটাই অখিলের সঙ্গে আমার মেলেনা। সে ও এই কথাই বলে—বিয়ে! বিয়ে করব কেন? বিয়ের একটা সম্বন্ধ না হলে তোমার যদি আমার সঙ্গে মিশ-বার পক্ষে কিছু বাধা ঘটে বলে মনে কর তো মিশো না—"

"নিষ্ঠুর! তুমি বেশ জানো যে সেটা আমার পক্ষে শক্ত তাই তুমি বলতে পারছ! কিন্তু একবারও কি তুমি ভেবে দেখো না যে যাদের নিয়ে তুমি তোমার এই খেলা আরম্ভ করেছ—তাদের অবস্থা—তাদের স্থান কি দাঁড়াবে তুমি যখন খেলা ভেঙ্গে সরে দাঁড়াবে?"

"এতক্ষণ তা ও তোমার মাথায় একটু বুদ্ধিও ছিল—কিন্তু এখন দেখছি কিছুই নেই। বাগানে ফুল ফোটে ভাল ফুল হলে তার সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে এসে লোকে তাকে তুলে নেয়, যতদিন ভাল লাগে, ইচ্ছে হয়—ফুলের সুগন্ধ থাকে ততদিন তাকে আদর করে রাখে, পরে ভাল না লাগলে তাকে ফেলে দেয় অন্য ফুল তার বদলে রাখে কিন্তু আগের ফুলের কি অবস্থা হলো তা কি আর সে দেখে? না দেখতে চায়? বলো!"

"সত্যি! সত্যিই তোমার মনের রূপ এই? যারা নিজেদের কিছুমাত্র অস্তিত্ব না রেখে দেহের প্রতিটী রক্ত বিন্দু দিয়ে তোমাদের আনন্দ দিতে চায় আরাম দিতে চায়, তাদের সম্বন্ধে এই মূল্যই কি তুমি দিয়ে থাক? না শুধু আমাকেই বলে যাচ্ছ?"

"না সকলের সম্বন্ধেই আমার এই ধারণা—যতদিন যাকে ভাল লাগবে ততদিন তার সঙ্গে বন্ধুত্ব—তার বেশী কিছু নয়। বন্ধনহীন জীবন বেদুইনের জীবন—Bohemian life কল্পনা করতে পারো? সে জীবনের দায়িত্ব না থাক enjoyment আছে। অস্বীকার করতে পারো! অম্রিতা বলবে আর কি? সে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মায়ের নিষেধ —বন্ধুদের হাসি বিদ্রূপ নিজের বিবেকের সঙ্গে মনের দ্বন্দ্ব সব মনে পড়ে তাকে অধীর করে তুলছিল, সকলের ওপরে অরবিন্দের কথাগুলি তীরের খোঁচার মত তাকে বিঁধছিল।

ঘড়ীতে এক এক করে বারোটা বেজে গেল—দাঁড়িয়ে উঠে অরবিন্দ বললে "রাত হল—এবার তাহলে উঠি আমি। না কি বাড়ী যাওয়ার নিষেধ আছে?"

অজিতার সমস্ত দেহ থর থর করে কাঁপছিল—কৌচের ওপরেই সে মাথাটা হেলিয়ে বসল। নিজের অপমানিত নারীত্ব তার সমস্ত স্নায়ু শিথিল করে দিয়েছিল ক্ষোভে।

আপন মনেই ইংরাজী গানের একটা লাইন গুন্ গুন্ করে গান করতে করতে অরবিন্দ উঠে দাঁড়াল—পরে কি ভেবে একটু দাঁড়িয়ে বললে "Don't be silly যেমন চলছিল তেমনি চলতে দেও—তাতে তোমার ক্ষতিটা কি হচ্ছিল? আর হঠাৎ করে তোমার chastity জেগে থাকে তো আলাদা কথা।"

শ্রান্ত স্বরে অজিতা বললে "একটা কথার ঠিক উত্তর দিও। আমার সঙ্গে তো flirt করেই গেলে—কিন্তু কবি গুপ্তকে নিয়ে এমন চলবে কি? আমার ভুল হয়েছিল তোমার সাথে মেলামেশা করা, তার প্রায়শ্চিত্ত হয়তো জীবনের বাকী দিন ধরেই আমায় করতে হবে—এই কষ্টকর দিনের স্মৃতি বোধহয় কখনো ভুলতে পারব না।"

বাধা দিয়ে অরবিন্দ বললে "—আগেই তো বলেছি ভুলে যাচ্ছ কেন? কোন বন্ধনই আমার ধাতস্থ নয়—তোমাদের পেতে চাই এ কথা অস্বীকার করিনে—কিন্তু তার মূল্য বা মর্য্যাদা কতটুকু তাও তো বলেছি। নারীকে আমি পেতে চাই অবসর-সঙ্গিনী রূপে তাই বলে তার কোন দায়িত্ব আমি নিতে চাইনে। তার চিরদিনের ভরণ পোষণ, তার সুখ, শান্তি, আনন্দ তার সন্তানে পিতৃত্ব এসব সত্যিই আমার পোষাবেনা, pleasure for pleasure এই হল আমার মজ্জাগত এর ভিতরে বন্ধনের স্থান হতে পারে না—তোমার সঙ্গে মেশাটা একটু বেশী মাত্রায় ও বেশী দিন ধরে হয়েছিল তাই দু'চার দিন হয়তো একটু অসুবিধে মনে হবে কিন্তু তার পরে যে কে সেই। কবি গুপ্ত, বা অজিতা বোসের অভাব হবেনা কোনদিন।"

"তোমার কি ধর্ম্ম বলেও কোন জিনিস নেই? যাদের তুমি এমনি করে খেলায় টেনে ছেড়ে দিচ্ছ তাদের অভিশাপ কি তোমার লাগবে না মনে কর? অন্ততঃ আমি তো যতদিন—যতদিন বেঁচে থাকব, আমার জীবনের দুর্গ্রহ বলে তোমাকে অভিশাপ দিয়ে চলবই, এর রোধ হবেনা কোনদিন। তোমার দেওয়া আংটী, ফুলের vase তুমি নিয়ে যাও, তখন নিয়ে ছিলাম ভেবে ছিলাম যে হয়তো এই দেওয়া-নেওয়া কোনদিন সত্যি হয়ে উঠবে। তা হলনা—হবে না কোনদিন তখন মিথ্যে দিয়ে গড়া মিথ্যের ওপরে স্থাপিত present কিছুই রাখব না, দুঃস্বপ্নের মত তোমার কথা আমার মনে জাগবে—যাও তুমি—আর কোনদিন তুমি আমার সামনে এসোনা—যাও।

অরবিন্দ উঠেই ছিল, যেতে যেতে বললে "ভালই হল যে তুমি নিজে থেকে বিদায় নিলে—না হলে আমি সত্যিই disgusted হয়ে উঠছিলাম একই জিনিস বেশী-দিন খাবার ভাল লাগেনা—আচ্ছা wish you a new companion, with all good wish—" বলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে বল্লে "যৌবন আনন্দ রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি—"

\+ × +

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে ঘুমন্ত অখিলকে জাগিয়ে অরবিন্দ বললে "অখিল আজ অজিতার ব্যাপারটা শেষ করে দিয়ে এলাম। আর কোনো দিন সে আমার পথে দাঁড়াবেনা। কই? তুমি কিছু বলছ না যে। খুসী হওনি?"

অখিল বললে "খুসী হয়েছি বলি বা কি করে? দোসরা অজিতা জুটতে—"

বিছানায় ভাল করে শুতে শুতে সে বললে "নিশ্চয় না হলে কি তোমার মত সাধু হতে বল? জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দকে বঞ্চনা করে? সে আমাকে দিয়ে হবে না ভাই। এতে যদি তুমি অসন্তুষ্ট তো আমি নাচার—"যৌবন আনন্দ-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি"—বলে সে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোতে আরম্ভ করলে।

ঘরের ভিতরে যে একটুকরা জ্যোৎস্না এসেছিল তার আলোয় বন্ধুর দেহের পানে চেয়ে অখিল কেবলি তার কথা ভেবে চলল। এই উচ্ছৃঙ্খলতার শেষ কোথায়? কেমন করে? কি ভাবে?

মন্তরিয়া

গল্প

শ্রীপ্রভাবতী গঙ্গোপাধ্যায়

[মন্তরিয়া মেয়েটিকে কিষণ ও সুকুন দু'জনাই সমান ভালবাসে। এই ভালবাসার কাহিনী নিয়েই পশ্চিমে পাহাড়ী দেশের নর-নারীর বিচিত্র জীবন-লীলার মধ্যে এই গল্পটী মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে।—প্রেমের চলতি উপাদানের কোন অভাব না থাকলেও গল্পটির মধ্যে সুলেখিকা প্রভাবতী যে বৈচিত্র্য এনেছেন তা পাঠক-পাঠিকার হৃদয় সহজেই আকর্ষণ করবে।]

গোটাকয়েক ঘুমভাঙ্গা বুনো পাখী সবে বিচিত্র সুরে উষার স্বাগত সম্ভাষণ সুরু করিয়াছে—দেওনারাণ গোহাল হইতে বাহির হইয়া উচ্চৈস্বরে হাঁক দিল, "মন্‌তরিয়া—এ মন্‌তরিয়া।"

মন্‌তরিয়া ঘরের দাবায় শুইয়াছিল। পিতৃব্যের সাদর আহ্বানে চকিতে উঠিয়া বসিয়া নিদ্রা জড়িত রাঙ্গা আঁখি দুটী ডলিতে ডলিতে সাড়া দিল, "যাই।"

দেওনারাণ দাঁত মুখ খিঁচাইয়া গর্জ্জন করিল, "জলদি আয়—নবাবের বেটী!" অতঃপর বিড় বিড় করিয়া আরও কি বলিল, বোঝা গেলনা।

সিঁড়ির নীচে ঘটী ভরা জল ছিল। বালিকা তাড়াতাড়ি চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়া বসনাঞ্চলে মুছিতে মুছিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেওনারাণ হুকুম দিল, "বাবুর কুঠিতে দুধ নিয়ে যা—পুরো সাত সের। আর বলিস্ বিকেলে দাম আনতে যাবো,—বুঝলি?"

মন্‌তরিয়া কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ভরা ছোট মাথাটী কাত করিয়া জানাইল, বুঝিয়াছে। দেওনারাণ তাহার পানে একবার অপাঙ্গে চাহিয়া একটা নিমের ডাল চিবাইতে চিবাইতে ইঁদারার দিকে চলিয়া গেল। যাইবার আগে একবার শাসাইল "দেখিস রাস্তায় ফেলে দিসনে যেন। যদি ফেলিস তা হলে—"দেওনারাণ এমন একটা ভঙ্গি করিল যাহার স্পষ্ট অর্থ, "শির্ তোড় দেঙ্গে।"

মন্‌তরিয়া করুণ নয়নে দুধভরা মেটে কলসীটির পানে চাহিল।

পিতৃমাতৃহারা অনাথা মেয়েটী সবে বারো বৎসরে পড়িয়াছে। সুশ্রী শ্যামল মুখখানি তার ভারী চমৎকার। দুধ সে রোজই 'কুঠি'তে লইয়া যায়। সংসারের ছুটো ছাটা কাজ কর্ম্মও যথা-সাধ্য হাসিমুখেই করে। পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নীর তাড়ন'-গঞ্জনাও তাহার একরূপ গা-সহা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ দুধের পরিমাণ প্রতিদিনের প্রায় দ্বিগুণ। বহিতে পারিবে কি?

দেওনারাণকে ডাকিয়া কোনরূপ সাহায্য চাহিবার মত সাহস তাহার ছিলনা। হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মন-তরিয়া বহু কষ্টে দুধের পশরা মাথায় তুলিয়া লইল।

সরু গ্রাম্য পথ। দু পাশে ভুট্টা ও জনারের ক্ষেতে রঙ ধরিয়াছে,—মাঝে মাঝে দুই চারিটা নিম, মহুয়া ও কেন্‌ড্ ফলের গাছ মৃদু হাওয়ায় নিঃশব্দে কাঁপিতেছে। দূরে চারিদিকের ঢেউ খেলানো ঘনকৃষ্ণ পাহাড়গুলির পাদদেশে ছোট ছোট পল্লীর আবছায়া,—ঝর্ণার মৃদু কল্লোল।

মেয়েটী "নীলাবরণে"র (গ্রামের নাম) বাহিরে আসিয়া পথের উপর চিত্রার্পিতার মত দাঁড়াইল। চারিদিকে একবার উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল,—কাহারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন সবে একটু একটু ফরসা হইতে সুরু করিয়াছে। ভূতের কাল্পনিক ভয় তত ছিল না বটে, কিন্তু কোন গৃহমুখী বন্য জন্তু যদি হঠাৎ কাছে আসিয়া পড়ে? মন্‌তরিয়ার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। এত ভোরে এমন নিঃসঙ্গ সে কোনদিন যায় নাই। দুধের পশরাও একা বহন করে নাই—সঙ্গীরা ভাগাভাগি করিয়া বহিয়াছে। বালিকা হতাশ হৃদয়ে অগ্রসর হইল।

সহসা পিছনে ধপাস করিয়া শব্দ হইল। বালিকা চমকিয়া উঠিল। টাল সাম্‌লাইতে দুধের পশরাসহ পথের উপর পড়িল। কলসী ভাঙিয়া সমস্ত দুধটুকু ভুট্টার ক্ষেতে গড়াইয়া গেল।

মহুয়া গাছ হইতে লাফাইয়া নামিল হর শঙ্করের ছেলে

কিষণ। বলিষ্ঠ বালক মনতরিয়ার প্রতিবেশী—ক্রীড়া-সঙ্গী। কিষণ এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল,—এরূপ হইবে সে আশা করে নাই। তারপর তাড়াতাড়ি বালিকার হাত ধরিয়া তুলিতে গেল। সস্নেহে বলিল, "খুব চোট পেয়েচিস মনতর্?"

মনতরিয়া এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া সক্রোধে সক্রন্দনে বলিল, "ছেড়ে দে।"

কিষণ বলিল, "রাগ করিসনে, ওঠ! আমি ধূলো পুঁছে দোবোখন।"

মনতরিয়া মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "তুই ফেলে দিলি কেন? হতভাগা গুণ্ডা।"

"আমি কি জানি তুই অত ভীতু!"

মনতরিয়া আরোও চটিয়া গেল। ক্রোধে, ক্ষোভে, দুঃখে, বেদনায় সে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। ভাঙা কলসীটার দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সব দুধ পড়ে গেল,—কাকা আজ খুব মারবে।" চোখের সম্মুখে তার ফুটিয়া উঠিল পিতৃব্যের রোষকষায়িত ভীষণ মূর্ত্তি।

কিষণ তাচ্ছিল্যভরে বলিল, "হ্যা মারবে না আরো কিছু। যদি সত্যি মারে তোকে তো আড়াল থেকে এমন পাথর ছুঁড়বো যে—তুই কাঁদিসনি, ওঠ।"

পিতৃব্যের নিকট প্রহার লাভের সম্ভাবনা সত্বেও মনতরিয়া কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তত ছিলনা। সে জানিত দুর্দ্দান্ত কিষণের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। তাই কিষণ যখন পুনরায় তাহাকে ভূমিশয্যা হইতে তুলিতে আসিল তখনও সে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "সরে যা। আমাকে ছুঁলে ভাল হবেনা বোলছি।"

কিষণ চটিয়া বলিল, উঠবিনি?

"না।"

"উঠবিনি।"

"না।"

বাবজিকের জনার ক্ষেত ভাঙিতে ভাঙিতে ছুটিয়া আসিল লছমনের ছেলে সুকুল। কিষণের মত অত বলিষ্ঠ না হইলেও তাহারই সমবয়সী। মনতরিয়ার আর একটী খেলাসাথী।

একবার কিষণের দিকে জিজ্ঞাসু নয়নে চাহিয়া সুকুল বালিকাকে হাত ধরিয়া তুলিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি হোয়েছে রে মনতর?"

মনতরিয়া বলিল, "এই দেখনা, কিষো আমার দুধ ফেলে দিলে—আবার শাসাচ্ছে।"

বালিকার গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে সুকুল কিষণের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "বদমাস্"

কিষণ গর্জ্জিয়া বলিল, "খবর্দার সুকো—মুখ সামালকে!"

প্রত্যুত্তরে সুকুল মুখ ভেংচাইতেই কিষণ তাহার উপর আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া পড়িল।

বালিকা তাহার সঙ্গীদুটীকে বহুবার ভাব করিতে ও কলহ করিতে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন লড়াই করিতে কখনো দেখে নাই। কাজেই দ্বন্দ্ব যুদ্ধটা সে বেশ সানন্দে হাসিমুখেই উপভোগ করিতেছিল। কিন্তু যখন দেখিল এক পক্ষের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, তখন তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। চীৎকার করিয়া বলিল, "এই কিষো, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে।"

কিন্তু কিষণ কর্ণপাত করিলনা। সুকুলকে মাটিতে চিৎ করিয়া তাহার বুকের উপর হাঁটু দিয়া বসিল।

মনতরিয়া হাত ধরিয়া টানাটানি করিল, তবু কিষণ তাহাকে ছাড়িলনা। তখন নিরুপায় বালিকা ভাঙা কলসীটার একখণ্ড কুড়াইয়া লইয়া কিষণের মাথায় সজোরে আঘাত করিল।

কিষণ সুকুলকে ছাড়িয়া দুইহাতে নিজের মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মনতরিয়ার দিকে শুধু একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল,—কিছুই বলিল না।

সুকুল গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "চল মনতরিয়া—ঘরে চল্।"

মনতরিয়া ভাঙা কলসীর পানে চাহিয়া মাথা নাড়িল, "কাকা মারবে; সাঙসের দুধ—"

"আমি দেবোখন, চল্।"

"কোথায় পাবি?"

"গোয়াল থেকে দুইয়ে দেবো।"

"তোর বাপ!"

"বাবার এত ভোরে ঘুম ভাঙ্গেনা—"

"জেগে যখন জিজ্ঞেস করবে ?"

"বোলবো বাছুরে খেয়ে গেছে।"

মন্‌তরিয়ার হাত ধরিয়া সুকুল অগ্রসর হইল।

কিষণ মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া নিঃশব্দে দেখিতেছিল। বলিল, "আমি লছমন কাকাকে বলে দেবো।"

সুকুল মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ভয় দেখাচ্ছিস ? আমিও তাহ'লে পালোয়ান জেঠাকে বোলবো তুই মন্তরকে মেরেছিস।"

কিষণ নিষ্ফল গর্জ্জিতে লাগিল। সে বোধহয় ঐ একটী মানুষকেই শুধু সমীহ করিয়া চলিত। তাহার পিতা হরশঙ্করের পালোয়ান বলিয়া খ্যাতি ছিল।

(দুই)

'নীলাকরণের গা ঘেসিয়া সর্পিল গতিতে তড়িৎবেগে বহমান ছোট সরু পাহাড়ী নদীটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর গুলির প্রতিঘাতে অপূর্ব্ব জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছে। দৃশ্যটী মনোহর। ঝর্ণা নয়—তবু লোকে ঝর্ণাই বলে। আশে পাশের পল্লীবালারা সকাল সন্ধ্যা জল লইয়া যায়,—চমৎকার পাৎলা মিষ্ট জলটী।

মন্তরিয়া গাগরী কাঁখে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। এমন রোজই আসে।...তখনো সন্ধ্যার ধীর অভিসার অনাগত। সূর্য্যদেব সবে রাঙ্গা মুখে পাহাড়ের আড়ালে নামিতে সুরু করিয়াছেন। সারি সারি পাহাড়ী গাছ-গুলির অন্তরালে পথহারা গাভীর ঘণ্টারবের সাথে রাখালের বিচিত্র আহ্বান। সম্মুখে দরিয়ার কোলে ছোট ছোট মৎস্য শাবকের আনন্দ উল্লম্ফন।...মন্তরিয়া গাগরী নামাইয়া রাখিয়া বসিয়া পড়িল—আজ তত তাড়া নাই।

উচ্চৈঃস্বরে একটা বেসুরা হিন্দি গান গাহিতে গাহিতে কোন রাখাল বালক একপাল 'গাই-ভইস' লইয়া সন্নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। মন্তরিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আগ্রহভরে ডাকিল, "এই কিষো—!"

কিষণ মুখ ফিরাইয়া বলিল, "মন্তর !"

মন্তরিয়া ছুটিয়া নিকটে গেল। কিষণের একখানা হাত দুটী নরম হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তুই দুদিন আসিস্‌নি কেনরে ? রাগ কোরেছিস ? আমি তোর জন্যে—" সহসা সে চমকিয়া উঠিল। সভয়ে বলিল, "তোর মাথায় কি হোয়েছে রে ?"

কিষণ হাসিল, "তুই সেদিন মেরেছিলি মন্তরিয়া।"

মাথার কাছে অনেকটা ফুলিয়া উঠিয়াছে।—কপালের পাশে খানিকটা রক্তাভ কাটা দাগ,—তখনও ঘা শুকায় নাই। বালিকার মুখ মলিন হইল। চোখের কোণে দু ফোঁটা অশ্রু টলমল্ করিয়া উঠিল। সুকুলকে রক্ষা করিতে গিয়া সে যে এরূপ মর্ম্মান্তিক আঘাত করিয়া বসিয়াছে, ইহা সে কল্পনাও করে নাই। খানিকক্ষণ স্তব্ধতার পর ছলছল চোখে বলিল, "তোর বড্ড লেগে-ছিলরে কিষো ?"

কিষণ সগর্ব্বে হাসিয়া বলিল, "ধুর্! তোর মারে আমার লাগে নাকি ? আমি 'মরদ' তুই 'জনানা'।"

মন্তরিয়া বলিল, "তা হোক, তুই চল্। 'দরিয়া'র জলে ধুয়ে দি—এখনো 'খুন' লেগে আছে। ঘরে গিয়ে চুণ হলুদ লাগাস্ কিষণ।" বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল।

কিষণ বলিল, "কাঁদছিস কেন হতভাগী ? ও কিছু নয়, আপনি সেরে যাবে। চল্, তোর গাগরিতে 'পানি' ভরে নিবি। আমি ব'য়ে দিয়ে আসবোখন।"

মন্তরিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গাগরীতে জল ভরিতে লাগিল। কিষণ উপরে দাঁড়াইয়া গান ধরিল, "নিমে মন্তরিয়া ভরত গাগরীয়া, দরিয়া মেরে—"

মন্তরিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "এই কিষো থাম্। মার খাবি আবার।" কিষণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।"

অদূরে কার গলার আওয়াজ শোনা গেল, "এই কিষো, তোর গাই ক্ষেত খাচ্ছেরে—হট্ হট্ হট্।

কিষণ দৌড়াইয়া গরু সামলাইতে চলিয়া গেল। কাছে আসিয়া দাঁড়াইল সুকুল। মন্তরিয়ার পানে চাহিয়া বলিল, "তোর কাকী খুঁজছেরে মন্তর। তোদের বাড়ী গিয়েছিলুম। বোল্লে, মন্তরিয়া 'পানি' আনতে গেছে অনেকক্ষণ। বেশী আরগে আসেনা কেন। চল্ ঘরে চল্।"

বালিকা উপরে উঠিয়া আসিল। সুকুল বলিল, "দে—গাগরী দে। আমি নিয়ে যাই। জল্‌দি।"

পিছন হইতে কিষণ বলিল, "এই গাগরী আমি নেবো।"

সুকুল মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কেন ?"

কিষণ হুঙ্কার দিল, "আলবৎ।"

আর একটী গজ কচ্ছপের সমর সম্ভাবনায় মন্তরিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাগ করিয়া বলিল, "তোরা যদি খালি ঝগড়া করিস তো কারো নিতে হবেনা যা। আমি নিজেই নোবো।"

কিষণ নরম হইয়া বলিল, "তবে ও নিতে চায় কেন ? আমার তো তোর সাথে কথা ছিল।"

সুকুল বলিল, "আমাকে তো ওর কাকী পাঠিয়ে দিলে।"

মন্তরিয়া মধ্যস্থতা করিয়া বলিল, "বেশ, এক কাজ কর তাহলে। কিষো, তুই গাগরী আধাপথ নিবি—সুকো তোর 'গাই' নিয়ে যাবে। তারপর সুকো গাগরী নেবে, তুই তোর 'গাই' নিবি। কিন্তু দু'জনে ভাব না হোলে কাউকে নিতে দোবোনা। ঝগড়া ছেড়ে ভাব কর।"

কিষণ ও সুকুল পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। মন্তরিয়া তাড়া দিল, "জলদি নে। দেরী হোলে কাকা বকবে।"

ধীরে ধীরে যন্ত্রচালিতবৎ অগ্রসর হইয়া উভয়ে আলিঙ্গন বদ্ধ হইল। কিষণ ডাকিল, "সুকো"! সুকুল ডাকিল, "কিষো!"

(তিন)

প্রভাতে ঘরের দাবায় বসিয়া মুলা ও 'ঘাটা' (সিদ্ধ জনার) খাইতে খাইতে দেওনারাণ আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিল। তাহার অর্থ এই যে সে দিন হাট-বার কয়েকটী প্রয়োজনীয় সামগ্রী না কিনিলেই নয়। অথচ সে গেলে ক্ষেত খামার 'ভইস' দেখিবে কে ? লেড়কা লেড়কী সব দুধের বাচ্চা। 'ভাগি' একটা 'লেড়কি' রাখিয়া গেল, তা সে তড়িঘড়ি তেমন সেয়ানাই হইতেছে না যে একা হাটে পাঠায়।

হাত মুখ ধুইয়া দেওনারাণ হাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহার 'জরু' আসিয়া বলিল, 'লেড়কার' জন্য কিছু 'মিঠা' আনা চাই—জরুর। শুধু দুধ ও কিছুতেই খাইতে চায়না।

দাবায় দাঁড়াইলে বাহিরের শস্য ভরা মাঠ গুলি হইতে তরঙ্গায়িত পাহাড় অবধি দেখা যায়।

দূরে গায়ে 'কুর্তা' মাথায় পাগড়ী পরিয়া একটী কিশোর হন হন্ করিয়া আসিতেছিল। দেওনারাণ সেইদিকেই এক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, স্ত্রীর ফরমাস শুনিয়া অস্পষ্ট স্বরে শুধু বলিল, "হু।"

মন্তরিয়া তখন বাবুর 'কুঠি'তে দুধ যোগান দিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কাকীর মুখের দিকে সে অর্থসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "কাকী, আমারি—"

কাকীর মনে পড়িয়া গেল। 'আদমী'র দিকে ফিরিয়া বলিল, "আর দেখ মন্তরীর শাড়ী একদম নেই।" দেওনারাণ নিঃশব্দে একটা বিকট মুখভঙ্গি করিল।

কিশোরটী তখন নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। দেও-নারাণ চিনিল। জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় চলেছিস্‌রে সুকুল ?

সুকুল জবাব দিল, "হাটে যাচ্ছি।"

দেওনারাণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। বলিল, "ভালই হোলো তাহ'লে। আমার গোটাকয়েক জিনিষ নিয়ে আস্‌বি। পয়সা নিয়ে যা।"

হাটের নিকটে জমিদার বাবুদের কাছারী বাড়ী "রামলীলা" অভিনয় হইবার কথা ছিল। সুকুল অনেক কষ্টে পিতার অনুমতি সংগ্রহ করিয়াছে, 'রামলীলা' দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহে ফিরিবে। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "আমারও যে অনেক জিনিষ আন্‌তে হবে কাকা,—অতো নিয়ে আসবো কি করে ?"

দেওনারাণ একটু ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাহলে এক কাজ কর। মন্তরীকে সঙ্গে নে,—বয়ে নিয়ে আসবে তুই শুধু কিনে দিস্।—এই মন্তরিয়া—"

হাট বসে সেই 'তেলুয়া'র—নীলাবরণ হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে। শিমুলতলা ষ্টেশন দিয়া ঘুরিয়া

গেলে মাইল দেড়েক বেশী হাঁটিতে হয়।

সুকুল দাবায় আসিয়া দাঁড়াইল। মন্তরীকে সঙ্গিনী পাইবার উল্লাসে তাহার বুকটা যে দুলিয়া উঠে নাই এমন নয়। চাহিয়া দেখিল কিশোরী মন্তরিয়ার মুখখানাও যেন উৎসাহ-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অতখানি পথ। —সুকুল বলিল, "ওকি যেতে পারবে কাকা? এই রদ্দুরে—"

দেওনারাণ বলিল, "খুব পারবে। অতবড় ধাড়ী সেয়ানা মেয়ে পারবেনা কেন?"

দুজনে যখন মাঠে আসিয়া দাঁড়াইল তখন বেশ চন্‌চনে রৌদ্র উঠিয়াছে, পাহাড়ের গায়ে তখনো আলো ছায়ার বিচিত্র সমাবেশ। চাকাই রোডের কাছাকাছি আসিয়া সুকুল বলিল, "চল মন্তরী, ষ্টেশন হোয়ে বাসে চলে যাই,—অল্প হাঁটতে হবে। নৈলে পার্‌বিনে তুই।"

মন্তরিয়া বলিল, "বাসের ভাড়া পাবি কোথা?"

সুকুল বলিল, "মার কাছ থেকে কিছু বেশী চেয়ে নিয়েছি। আর তাছাড়া—সুকুল বুক ফুলাইয়া বলিল,—"আমি কিছু রোজগার করেছি, জানিস? পুরো দু টাকা।"

মন্তরী সবিস্ময়ে বলিল, "কি কোরে রে সুকো?

"বাবুদের মোট বয়ে। আমি আর কিষো রোজ দুপুরে ষ্টেশনে যাই কিনা—বলিস্‌নি যেন কাকেও। কিষোও করেছে।"

মন্তরিয়া মাথা নাড়িয়া জানাইল, বলিবেনা।

চাকাই রোড ধরিয়া উভয়ে বরাবর গল্প করিতে করিতে করিতে অগ্রসর হইল। ষ্টেশনের নিকট আসিয়া সুকুল জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু খেয়ে এসেছিস্ মন্তর?"

মন্তরিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া মাথা নাড়িল।

পাশেই সারি সারি খাবারের দোকান। সুকুল চট্ করিয়া কয় পয়সার কচুরী আর পেঁড়া কিনিয়া ঠোঙাটা তাহার হাতে দিয়া বলিল, "খেয়ে নে—নৈলে 'ভুখ' লাগবে। 'পানি' আন্‌ছি দাঁড়া।"

মন্তরিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "তুই এত খরচ কোচ্ছিস্ যে বড়?"

সুকুল হাসিল, "কোরবোনা তো কি 'ভুখায়' মরবি?"

"তোর 'ভুখ' লাগবে না?"

"না, আমি 'ঘাটা' খেয়েছি রে—সকালে।"

বাসে তেলুয়া পৌছাইতে অধিকক্ষণ লাগিল না। যাহা কিছু কিনিবার ছিল কিনিয়া উভয়ে মহানন্দে হাটের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইল। একটা ছোট কাপড়ের দোকানে খান কয়েক রঙীন শাড়ী দেখা যাইতেছিল। হঠাৎ মন্তরিয়ার পুরাতন ছিন্ন বস্ত্রের দিকে চাহিয়া সুকুল প্রশ্ন করিল, "তোর ভাল শাড়ী নেইরে মন্তরী?"

মন্তরিয়া নিজের অঙ্গে একবার চোখ বুলাইয়া বলিল "না—কাকা দেয় না।"

সুকুল বলিল, "ঐ যে টাঙানো আছে, পছন্দ কর।"

মন্তরিয়া আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিল, "তুই দিবি সুকুল?"

সুকুল বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল। বলিল, "হ্যা রে, তোর জন্যইতো আমি—তুই দেখনা কোন্‌টা নিবি।"

শাড়ী কেনা হইলে উভয়ে পরিশ্রান্ত দেহে হাটের বাহিরে একটা গাছের ছায়ায় নিরিবিলি বসিল। 'রাম-লীলা' আরম্ভ হইবার তখনো বিলম্ব আছে। দুজনে কয়েক পয়সার ছোলাভাজা কিনিয়াছিল, তাহাই চিবাইতে চিবাইতে গল্প করিতে লাগিল।

মন্তরিয়া ইতিমধ্যে নূতন কেনা শাড়ীখানা একটু অন্তরালে গিয়া পরিয়া আসিল। সুকুল আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "তোকে খুব 'খুপসুরৎ' দেখাচ্ছে রে মন্তরী।"

মন্তরী সলজ্জ হাসিভরা মুখে চাহিল,—কিছু বলিল না। অতঃপর দুইজনে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে বসিল। সুকুল বলিল, "রাম লীলা আগাগোড়া দেখা হবেনা রে মন্তর। সন্ধ্যে হবার আগে বাড়ী পৌছতে হবে।"

মন্তরী প্রশ্ন করিল, "বাসেই যাবিতো?"

সুকুল বলিল, "আলবৎ, বাসের ভাড়া দিয়ে যদি কিছু বেশী থাকেতো—" 'কুর্ত্তার' পকেটে হাত দিয়া সুকুলের মুখ শুকাইল। গোটা তিনেক পয়সা আছে মাত্র, বাসের ভাড়াও কুলাইবেনা। খরচ করিবার সময় বাসের কথাটা মনে হয় নাই।

শুনিয়া মন্তরিয়ার ও হাসি নিভিয়া গেল। এখন কি করা যায়? পদব্রজে ফিরিতে হইলে 'রামলীলা'টা মোটেই দেখা হয়না যে! পথশ্রমতো আছেই।

সহসা পিছন হইতে কে ডাকিল, "এই মন্তরী—এই সুকো—"

মন্তরিয়া লাফাইয়া উঠিল, "কিষো, তুই!"

কিষণ বলিল, "শুনলাম তোরা এসেছিস তাই আমিও এলাম। এই নে ধর্ মন্তরী—তোর জন্যে এনেছি।"

চুলের ফিতা, কাঁটা, রঙ্গীন কাঁচের চুড়ী, একশিশি সস্তা গন্ধ তেল। মন্তরিয়া মহানন্দে বলিল, "বা-রে, তুই দিলি কিষো? আর এই দেখ সুকো শাড়ী দিয়েছে—" মন্তরী অঞ্চল প্রান্ত উঁচু করিয়া দেখাইল।

কিষণ গম্ভীর হইয়া বলিল, "হু, চল রামলীলা দেখবি। সুকো ওঠ।"

সুকুল বর্ত্তমান সমস্যাটা বুঝাইয়া বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কাছে বেশী পয়সা আছে তো কিষো?"

কিষণ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না। কিন্তু কুচ্ পরোয়া নেই, গরুর গাড়ীতে যাবো সব। এমন জোরসে হাঁকাবো যে এক ঘণ্টায়—"

মন্তরিয়া প্রশ্ন করিল, "গরুর গাড়ী পাবি কোথায়?"

"'ভগলুয়া' কা গাড়ী। তার 'বোখার' হোয়েছে, আমি সোয়ারী নিয়ে এসেছি। সোয়ারী গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে।"

'রামলীলা' দেখিয়া ফিরিবার পথে সুকুল বলিল, "আমরা একদিন রামলীলা কোর্‌বো রে কিষো, কি বলিস্? আমি রামজি তুই মহাবীরজি আর—"

কিষণ ধমক্ দিয়া বলিল, "চোপ উল্লু। আমি রামজি, তুই মহাবীরজি।"

মন্তরিয়া হাসিয়া বলিল, "ঝগড়া ছেড়ে দে। দুজনেই রাম হোস্ না হয়। কিন্তু সীতাজি পাবি কোথায়?"

কিষণ ও সুকুল সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "তুই সীতাজি।"

মন্তরিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ধ্যেৎ, মার্‌বো এক থাপ্পড়—"

কিষো ও সুকো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

(চার)

অনাদরে অবহেলায় শীর্ণা ছোট পুঁই লতাটী কার অদেখা মোহন স্পর্শে দিনে দিনে বাড়িয়া রসনম্রা শ্যামলী পল্লবিনীরূপে যৌবন নদীর এপারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শৈশবের চাপল্য গতপ্রায়,—মন্তরিয়া এখন ধীরা। চোখে তাহার স্বপ্নের নেশা, আবেশ আনে, হৃদয়-থালায় প্রণয়-পুষ্প পূজার ছল খোঁজে।

দুটী প্রতিদ্বন্দ্বী কিষণ ও সুকুল পূর্ব্বের মতই কলহ ও বন্ধুত্ব লইয়া আছে।

হরশঙ্কর গরুর গাড়ী কিনিয়া দিয়াছে—কিষণ মহানন্দে, গাড়ী হাঁকায়। মাঝে মাঝে বাজি রাখিয়া কুস্তিও লড়ে,—পালোয়ান বলিয়া সে ইতিমধ্যেই নাম কিনিয়া ফেলিয়াছে।

লছমন পরলোকে। তাহার ত্যক্ত গরু মহিষ জমি-জমা ও বাড়ী ঘরের মালিক এখন সুকুল। গরুর দুধ ও জমি জমার উপসত্বে সে বিধবা মাতা ও ছোট ভাই বোন লইয়া স্বচ্ছন্দে সংসার চালায়।

উভয়েই তাহাদের প্রণয়িনীকে লইয়া ভবিষ্যতের সোণালী স্বপ্ন গড়িয়া তোলে। উভয়েই অধীর আগ্রহে সেই দিনটীর প্রতীক্ষা করে যেদিন মন্তরিয়াকে জীবন-সঙ্গিনী-রূপে পাইবে। মন্তরিয়াও নিরাশ করেনা কাহাকেও দুজনের প্রেম নিবেদনেই সে সলজ্জ হাসিমুখে সাড়া দেয়,—কিন্তু স্পষ্ট ধরা ছোঁয়া দেয় না। কাহাকে যে সে অধিক ভালবাসে তাহা বোধহয় নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারেনা।

দুটী পানী-প্রার্থীর ছোটখাট উপহার প্রতিযোগীতায় দেওনারাণের ক্ষুদ্র গৃহ ভরিয়া উঠিয়াছে। মন্তরিয়া আবশ্যকের অতিরিক্ত সব কিছু খুড়তুত ভাইবোনদের বিলাইয়া দেয়। সম্ভবতঃ সেই কারণেই দেওনারাণ তাহার বিবাহ বিষয়ে তেমন মাথা ঘামাইতে চায়না। কিষণ ও সুকুল দুজনকেই তাহার বিবেচনার অপেক্ষায় ভুলাইয়া রাখে।

তবে অযত্ন বর্দ্ধিতা মন্তরিয়ার এখন আদর বাড়িয়াছে। দুধের যোগান আর তাহাকে দিতে হয় না,—সে কাজটা

দেওনারাণ নিজেই সারিয়া লয়। সংসারের কাজকর্ম্মের ভারও দেওনারাণের পত্নী বেশীর ভাগ নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লইয়াছে। মন্তরিয়া নিজের ইচ্ছামত এটা ওটা করে, আর সন্ধ্যার পূর্ব্বে গাগরী ভরিয়া জল আনে। এই কাজটী সে স্বেচ্ছায় কিছুতেই ছাড়িতে চাহেনা। কেন চাহেনা তাহা দেওনারাণ ও তাহার স্ত্রী দুজনেই মনে মনে উপলব্ধি করে বটে, কিন্তু বাধা দিবার প্রয়োজন অনুভব করে না।

কিষণ ও সুকুল একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া ক্রমশঃ অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছে। দুই বন্ধু একদিন পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়া ফেলিল, দেওনারাণের সহিত শেষবার বোঝাপড়া করিবে। কিন্তু সর্ব্বপ্রথম মন্তরিয়ার সুস্পষ্ট মতামত অবগত হওয়া প্রয়োজন—কাহাকে সে অন্তরে অন্তরে কামনা করে কে জানে!

সুকুল বলিল, "দুজনে ঝগড়া করে কি 'ফায়দা' হবেরে কিষণ? তার চেয়ে মন্তর যদি তোকে চায়তো তুই 'সাদি' করিস্, আমি ছেড়ে দোবো। আর যদি আমাকে চায়তো—" সুকুল কিষণের মুখের দিকে চাহিল।

কিষণ বলিল, "তাই ভাল সুকো, যদি তোকে চায়তো আমি ছেড়ে দোবো।"

দুইটী কলহ-পরায়ণ বন্ধু সজল চক্ষে পরস্পরের পানে অনেকক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল।

সেদিন বৈকালে মন্তরিয়া গোহালে গরুগুলিকে আদর করিতেছিল, ছোট বাতায়নটীর ওপাশ হইতে কিষণ মৃদুস্বরে ডাকিল, "মন্তরী"!

মন্তরিয়া চাহিয়া দেখিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। বলিল, "কিরে কিষো? ওদিকে কেন, ভিতরে আয়না। কেউ নেই এখানে।"

কিষণ বলিল, "না, তুই এগিয়ে আয়, শোন্।"

মন্তরিয়া নিকটে গিয়া ঘরের বেড়া ধরিয়া মধুর ভঙ্গিমায় দাঁড়াইল। কিষণ চাহিয়া দেখিল, তাহার মানসী-প্রতিমার নিটোল যৌবনশ্রী—মনোরম—লোভনীয়।"

চোখে চোখে পড়িতে মন্তরিয়া নতমুখে বলিল, "অমন করে তাকাচ্ছিস কেনরে কিষণ, ডাক্‌লি কেন—বল্‌না।"

কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই কিষণ জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কাকে বেশী ভালবাসিস্ বল্, আমাকে না সুকুলকে?"

মন্তরিয়া তৎক্ষণাৎ হাসিয়া উত্তর দিল, "তোকে।"

"সাচ বাত?"

"সাচ।"

"তাহলে আমায় 'সাদি' করবি?"

মন্তরিয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "'সাদি'?—আচ্ছা, দাঁড়া—আসছি।"

কিষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল "না বোলে 'ভাগচিস' যে বড়? এই মন্তর।"

মন্তরিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, "তোকে ভয় করি নাকি যে ভাগবো? এগোনা তুই, আমি গাগরী নিয়ে যাচ্ছি এক্ষুণি।"

গ্রামের বাহিরের পথে ভুট্টা ক্ষেতের পাশে কিষণ দাঁড়াইয়াছিল। কয়েক মিনিট পরে মন্তরিয়া আসিয়া মিলিত হইল। পথ চলিতে চলিতে কিষণ বলিল,"কই জল্‌দী জবাব দে মন্তরী।"

মন্তরিয়া একটু ভাবিয়া বলিল, "যদি বলি সুকোকে 'সাদি' কোরবো' তাহলে তো তুই তাকে খুন কোরে বস্‌বিরে ডাকু?"

কিষণ জানাইল, তাহা করিবেনা, কারণ সুকুলের সহিত এ বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

সমস্ত শুনিয়া মন্তরিয়া বলিল, "তাহলে কি কোরবি তুই?"

অদূরে সমুন্নত গিরিশ্রেণীর গাম্ভীর্য্যময় মূর্ত্তি নীল আকাশের গায় সগর্ব্বে দাঁড়াইয়াছে। সেই দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেতে দেখাইয়া কিষণ বলিল, "ঐ পাহাড়ের মাথায় উঠে নীচে লাফিয়ে পড়বো।"

মন্তরিয়া চমকিত হইয়া কিষণের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "অমন কাজ করিস্‌নি কিষণ।"

দুজনে কথা কহিতে কহিতে ঝর্ণার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের উপর সুকুল

অপেক্ষা করিতেছিল। নামিয়া নিকটে আসিল। বিষণ গম্ভীর মুখে বলিল, "মন্তর সিধা বাত কিছু বলেনারে সুকো।"

সুকুল মন্তরিয়ার মুখের দিকে চাহিল। মন্তরিয়া হাসিয়া বলিল, "তুই কি বর্‌ঝিরে সুকো? লাফাবি নাকি?"

সুকুল কিছু বুঝিতে না পারিয়া শুধু চাহিয়া রহিল।

মন্তরিয়া বুঝাইয়া বলিল, "বোলছি, ধর্‌ তোকে যদি সাদি না করি? তুই পার্ব্বতীয়াকে সাদি কোরবিতো?" পার্ব্বতীয়া পাড়ারই মেয়ে—সুকুলদের পাশের বাড়ী থাকে। লছমন জীবিত থাকিতে পার্ব্বতীয়ার পিতা সুকুলকে 'দামাদ' করিবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু সে স্বীকৃত হয় নাই।

সুকুল বিকৃত মুখে বলিল, "ধেৎ।"

মন্তরিয়া বলিল, "তবে কি কোরবি তুই?"

সুকুল একটু নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমি বাড়ী ঘর ছেড়ে সাধু হ'য়ে চলে যাবো।"

মন্তরিয়া পুনরায় গম্ভীর হইল—কিছু বলিল না।

গাগরীতে 'পানি' ভরিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে দুইবন্ধু সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কাকে সাদি কোরবি বোলে যা মন্তরী? আমরা ঝগরা কোরবোনা—বোলে যা।"

মন্তরিয়া মলিন মুখে উত্তর দিল, "আর দু-চার দিন সবুর কর, ভেবে দেখি। আজ মনটা ভাল নেই তত।"

(পাঁচ)

মন্তরিয়া স্বেচ্ছায় কাহাকে বরমাল্য প্রদান করিত বলা যায়না। সে এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বেই নীলাবরণে একটী ধূমকেতু আবির্ভূত হইয়া সমস্ত ওলট পালট করিয়া দিল।

ধূমকেতুটীর নাম রামযশ। রামযশ কলিকাতায় কোন রাজা উপাধিধারী জমিদার গৃহে দরোয়ানী করে। কচিৎ দেশে আসিয়া দুই এক মাস থাকিয়া যায়। এবার প্রায় দশ বৎসর পরে সে দেশে ফিরিয়াছে। ফিরিবার পূর্ব্বে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে তৎস্থানে বহাল করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। উদ্দেশ্য বাকী জীবনটা দেশের স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর মাঝে নিরিবিলি শান্তিতে কাটাইয়া দিবে, আর কলিকাতায় যাইবে না।

প্রভাতে হাত মুখ ধুইয়া দেওনারাণ বাবুর কুঠিতে দুধ দিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এমন সময় পিতলে বাঁধান তেল চকচকে বাঁশের লাঠিটী হাতে করিয়া রামযশ সোজা তাহার বাড়ীর উঠানে গিয়া উপস্থিত হইল।

গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "এই দেওনারাণ।"

দেওনারাণ মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "গোর লাগি কাকা! কবে এলে? তবিয়ৎ ভাল আছে?"

রামযশ তাহার প্রকাণ্ড গুম্ফ যুগল মর্দ্দন করিতে করিতে জানাইল, কাল রাত্তিরে আসিয়াছে এবং শরীর বেশ ভালই আছে।

দেওনারাণের পিতার বয়সী হইলেও রামযশের স্বাস্থ্য অটুট ছিল। চুলে পাক ধরিলেও তাহার দেহে ও মনে প্রৌঢ়ত্ব শমন জারি করিতে পারে নাই।

দেওনারাণ একটা ছোট চারপায়া বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "বোসো কাকা, ছেলেপুলে কেমন আছে? তারা এসেছে কেউ?"

চারপায়ায় বসিয়া পড়িয়া রামযশ বলিল, "সব ভাল আছে, 'কলকাত্তা' আছে।"

দেওনারাণ পুনরায় প্রশ্ন করিল, "কাকী কই? কাকী আসেনি?"

রামযশ মুখটা বিকৃত করিয়া উত্তর দিল, "রামসুভাগের মা-তো চলে গেছেরে—আজ দু বছর, হোলো।" রামসুভাগ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম।

খানিকক্ষণ উভয়ে নীরব।

একটু মৃদু হাসিয়া রামযশ বলিল, "তোর সাথে একটা কথা আছেরে দেওনারাণ। তোর বাপ যে—"

মন্তরিয়া আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সেই দিকে দৃষ্টি পড়িতেই হঠাৎ থামিয়া রামযশ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "এ কেরে দেওনারাণ? তোর মেয়ে?"

দেওনারাণ উত্তর দিল, "না, দাদার মেয়ে। দাদাতো মারা গেছে কাকা।"

"সাদি দিসি কোথায়?"

"সাদি এখনও হয়নি কাকা। দুটী পাত্র আছে বটে কিন্তু—"

রামযশ মন্তরিয়ার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "হু। কত বয়স হোলো? ষোলো?"

"না পনেরো চল্‌ছে।"

রামযশ গোঁফে চাড়া দিয়া বলিল, "বেশ বেশ। নাম কি খুকী? ভয় কি—এদিকে এসোনা।"

মন্তরিয়া নাম বলিলে রামযশ পুনরায় বলিল, "বেশ বেশ।" তারপর দেওনারাণের দিকে চাহিল, বলিল, "এরে দেওনারাণ, তোর বাপ যে টাকা নিয়েছিল সেটা এখন আমার দরকার, বুঝলি? দু-এক দিনের ভেতর দিতে হবে।"

বছর দশেক পূর্ব্বে দেওনারাণের পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রের চিকিৎসার জন্য সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া দু কুড়ি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। সুদে আসলে তাহা এখন তিন কুড়ি দশে দাঁড়াইয়াছে। দেওনারাণের মুখ মলিন হইল। দুই এক দিনের মধ্যে সে অতগুলি টাকা পাইবে কোথায়?

শুষ্ক মুখে বলিল, "খেতে পাইনে কাকা,—কোন রকমে দুধ বেচে—"

রামযশ সক্রোধে বাধা দিয়া বলিল, "আমায় খাওয়াবে কে? এখন কি নোকরি আছে যে মাসে মাসে মাইনে পাবো? টাকাটা দিতেই হবে। নৈলে নালিশ করে সব বেচে নোবো।"

দেওনারাণ মুখখানা কাঁদ কাঁদ করিয়া বলিল "একদম মরে যাবো কাকা। তুমি তো বড়লোক, কেন গরীবকে—"

মন্তরিয়ার দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া রামযশ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "বড়লোক। আচ্ছা যা, বিকেলে দেখা করিস্ একবার। যা হয় একটা কিছু—বুঝলি?"

দেওনারাণ জানাইল বুঝিয়াছে। রামযশ লাঠি খট্ খট্ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

বৈকালে দেওনারাণ যখন রামযশের সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিয়া গৃহমুখে ফিরিল তখন তাহাকে বিশেষ অসন্তুষ্টতো দেখা গেলইনা, বরং বেশ একটু নিশ্চিন্ত বলিয়াই বোধ হইল। সে বিড় বিড় করিয়া মনে মনে কি বলিতেছিল, সবটুকু বোঝা গেল না। যেটুকু বোঝা গেল তাহার অর্থ এইযে মন্তরিয়ার পিতার চিকিৎসার দেনার জন্য মন্তরিয়াই ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ দায়ী। তাহারই শোধ দেওয়া উচিত। তাছাড়া রামযশ এমন বৃদ্ধই বা কোথায়? টাকাও করিয়াছে বিস্তর।

দেওনারাণ যাইবার খানিকক্ষণ পরেই রামযশ সাজিয়া গুজিয়া হাস্যমুখে গুন্ গুন্ করিতে করিতে পথে বাহির হইল। মাথায় পাগ্‌ড়ী, গায়ে ধুতি পাঞ্জাবী, পায়ে নাগরা, আর হাতে সেই তেল চক্‌চকে লাঠিটী।

ঢাকাই রোডের সন্নিকটে আসিয়া কিষণ ও সুকুলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে গল্প করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছিল। কিষণ বলিল, "আরে দাদু যে! গোড় লাগি দাদুয়া। চলেছো কোথায় এত তাড়াতাড়ি?"

রামযশ থামিয়া গুম্ফ মর্দ্দন করিতে করিতে বলিল, "বাজারে যাবোরে, গোটা কয়েক জিনিষ কিন্‌তে হবে।"

সুকুল হাসিয়া বলিল,"দেখে বোধ হচ্ছে দাদু যেন 'সাদি' কোত্তে চলেছে।"

রামযশ হাসিয়া বলিল, "তামাসা কোচ্ছিস্? কেন আমার কি সাদি কর্‌বার বয়স নেই নাকি মনে কোরেছিস্।"

উভয়ে সমস্বরে বলিল, "নেই কে বলে? নিশ্চয়ই আছে! তুমি নয়াদিদি নিয়ে এসো দাদু।"

রামযশ খানিকক্ষণ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "সত্যি, 'সাদি' কোরছিরে সুকুল, সব ঠিক হোয়ে গেছে। এই আসছে বুধবার—"

কিষণ বলিল, "সত্যি? ক'নেটি কে দাদু?"

রামযশ বলিল, "এই গ্রামেরই মেয়ে—বহুৎ খুপসুরৎ একদম হুরীর মত। আর—"

সুকুল বলিল, "নামটাই বলনা দাদু। পার্ব্বতীয়া? সুন্দরীয়া? মঞ্জরী?"

রামযশ হাসিভরা চোখে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হু—তোদের বলি, আর তোরা ফেড়ে নে আরকি।"

সুকুল হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই দাদু, বল, আমরা নোবো না।"

রামযশ গুম্ফ মর্দ্দন করিতে করিতে মৃদুস্বরে বলিল, "মন্তরিয়া।"

কিষণ রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, "কি?"

রামযশ বলিল, "মন্তরিয়ারে মন্তরিয়া। চিনিস্‌নে? দেওনারাণের ভাই দীপনারাণের মেয়ে। এইতো এক্ষুনি দেওনারাণের সাথে কথা পাকা হোয়ে গেল। সেই জন্যই তো—"

আর অধিক বলিতে হইলনা। কিষণ ক্ষিপ্ত গরিলার মত লাফাইয়া পড়িয়া চক্ষুর নিমেষে রামযশকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। সুকুল তড়িৎ বেগে সবলে তাহাকে জড়াইয়া না ধরিলে বোধ হয় গলা টিপিয়া মারিয়াই ফেলিত।

উভয়ে মাটির উপর জড়াজড়ি করিতে করিতে সুকুল বলিল, "করিস্ কি কিষো। পাগল হোয়ে গেলি নাকি?"

কিষণ বলিল, "ছেড়ে দে সুকো, শালা বুড়োকে মেরেই ফেলবো।"

রামযশ ইতিমধ্যে ধূলা ঝাড়িয়া লাঠি হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিশোধের এমন সুবর্ণ সুযোগ সে ত্যাগ করিল না। "শুয়ার কা বাচ্চা" বলিয়া গর্জ্জিয়া সে সবলে কিষণের মাথা লক্ষ্য করিয়া লাঠি মারিল। আঘাতটা কতক মাটিতে কতক সুকুলের মাথায় কতক কিষণের কাঁধে পড়িল।

সুকুল আঘাত পাইয়া কিষণকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিল রামযশ কিষণকে পুনরায় আঘাত করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সে চকিতে লাফাইয়া উঠিয়া রামযশের উদ্যত হস্ত ধরিয়া না ফেলিলে কিষণ বোধহয় মরিত। লাঠিটা সবলে দূরে নিক্ষেপ করিয়া রক্তমাখা মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া সুকুল কাঁপিতে কাঁপিতে আবার বসিয়া পড়িল।

রামযশ তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছে।

(ছয়)

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সুকুল বিছনায় শুইয়াছিল। সামান্য একটু জ্বর হইয়াছে বটে, তবে আঘাতটা খুব সাংঘাতিক হয় নাই। শিমূলতলা হইতে সরকারী ডাক্তার বাবুকে কিষণ ভিজিট দিয়া নিজের গরুর গাড়ী করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, ভয়ের কোন কারণ নাই, সপ্তাহ দুইয়ের মধ্যে ঘা সম্পূর্ণ শুকাইয়া যাইবে।

কিষণ বিছানার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছিস্‌রে সুকো?"

সুকুল বলিল, "অনেকটা ভাল। ডাক্তার বাবুর ওষুধ গুণো ভালই।"

কিষণ সুকুলের কপালে হাত দিয়া বলিল "দারোগাবাবু এসেছেরে— সব বোলবি তাকে। বুঝলি? শালা বুঢ্‌ঢাকে জেলে দিতেই হবে—"

সুকুল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "দারোগা বাবুকে খবর দিলে কেরে?"

কিষণ বলিল, "আমি দিয়েছি, আর কে দেবে?"

সুকুল বলিল, "কেন?"

বাহির হইতে দারোগাবাবুর গম্ভীর আওয়াজ পাওয়া গেল, "কইরে কিষণ, কোথায় গেলিরে ব্যাটা?"

কিষণ চট্ করিয়া বাহিরে গিয়া দারোগাবাবুকে লইয়া আসিল। দারোগাবাবু সুকুলের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "হু, কি হোয়েছে বল্ দেখি?—একটা বসতে কিছু দেনা বেটা আহাম্মক। এই কিষণ!"

কিষণ একটা বেতের মোড়া আগাইয়া দিল। দারোগাবাবু বসিয়া পুনরায় সুকুলের দিকে প্রশ্ন-সূচক দৃষ্টিতে চাহিলেন।

সুকুল বলিল, "কিছু হয়নিতো হুজুর।"

দারোগাবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "হয়নি! মাথায় লাগলো কি কোরেরে ব্যাটা?"

সুকুল জবাব দিল, "গাছের উপর থেকে পড়ে। ঐ যে বড় গাছ আছে না? ওর উপরে—"

দারোগাবাবু বিরক্তিভরে ডায়েরী পকেটে ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিষণ বলিল, "মিছে কথা হুজুর ঐ শালা বুঢ্‌ঢা রামযশ—"

দারোগাবাবু ধমক দিলেন, "চোপরাও উল্লু।" তার পর খুট খুট করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

সুকুলের এরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারের কোনও কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া কিষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুকুল মৃদুস্বরে ডাকিল, "এই কিষো, শোন্।"

কিষণ সক্রোধে বলিল, "শুন্‌বোনা। তুই "ঝুট বাত" বোল্‌লি কেন?"

সুকুল বলিল, "বোল্‌বোনা? তাহলে যে দারোগা-বাবু তোকে জেলে দিত আগে। জানিস্?"

কিষণ সবিস্ময়ে বলিল, "আমাকে? কেন?"

সুকুল হাসিয়া বলিল, "তুই আগে বুঢ়ঢাকে খুন কোত্তে গেছলি বোলেই তো সে লাঠি চালালো। আমার তো লাগলো হঠাৎ।"

কিষণ খানিকক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে সুকুলের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আপন মনে মৃদুস্বরে বলিল, "লেকিন্ হাম্ নেহি ছোড়েঙ্গে।"

সুকুল বলিল, "কি বোলছিসরে কিষো?"

কিষণ জবাব দিলনা। সুকুলের বিছানার পাশে ধীরে ধীরে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

দরজার নিকট মন্তরিয়ার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "সুকো!"

সুকুল ও কিষণ উভয়ে ফিরিয়া চাহিল। এ কয়-দিনেই মন্তরিয়ার চেহারা শুকাইয়া বিশ্রী হইয়া গিয়াছে।

মন্তরিয়া ছুটিয়া আসিয়া সুকুলের মাথায় হাত দিয়া মলিন মুখে বলিল, "কেমন আছিসরে সুকো? ডাক্তার-বাবু কি বললে? সেরে যাবে তো? অনেক 'খুন' পড়েছে বুঝি?"

সুকুল জানাইল, ভালই আছে। তেমন কিছু হয় নাই।

মন্তরিয়া একবার বাহিরের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আসিয়ে সুকো। তোর কিছু হয়নিতো রে কিষো? আসি ভাই! আমি পালিয়ে এসেছি—কাকা বেরুতে দেয়না মোটে। টের পায়তো বড্ড মারবে। সেই বুঢ়ঢাটাইতো কাকাকে বোলে আমাকে"—মন্তরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কিষণ সস্নেহে বলিল, তুই যারে মন্তর, আমি বুঢ়ঢাকে 'সিধা' কোরে দোবোখন। কোন ভয় নেই।"

মন্তরিয়া যেমন ঝড়ের মত আসিয়াছিল তেমনি ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

কিষণ বলিল, "আমি দেওকাকার সাথে দেখা করে-ছিলাম রে সুকো।"

সুকুল কথা কহিল না।

কিষণ বলিল, কাকা বল্‌লে, আমি 'গরীব আদ্‌মী', টাকা পাবো কোথা? তোরা যদি বুঢ়ঢার টাকা শুধে দিতে পারিস তো মন্তরীকে পাবি।

সুকুল নীরবে ভাবিতে লাগিল।

কিষণ পুনরায় বলিল, "তুইই মন্তরকে সাদি কর সুকো।"

সুকুল বলিল, "কেন, তুই?"

"আমি? নাঃ।"

"কেনরে কিষো?"

"মন্তরিয়া তোকেই বেশী ভালবাসেরে। আমাকে করে ভয়। তাই কিছু বোলতে চায় না,—পাছে তোকে খুন কোরে ফেলি!" কিষণ কাষ্ঠহাসি হাসিল।

সুকুল সাগ্রহে বলিল,"কি কোরে জানলি?"

"আমি জানি।"

"তোকে বোলেছে কিছু?"

কিষণ মৃদুস্বরে জবাব দিল, "হু।"

খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া সুকুল জিজ্ঞাসা করিল, "তুই রাগ কোরবিনে কিষো?"

কিষণ মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি খুসিছে ডাল পুরী খাবো।"

আবার খানিকক্ষণ উভয়ে নীরব। সুকুল মলিন মুখে বলিল, "কিন্তু আমার তো অতো টাকা নেই কিষো! পাবো কোথায়?"

"কত আছে?"

"এক কুড়ি দশ। আর যদি হাটে গোটা কয়েক গরু বেচতে পারি কিষো—"

কিষণ হাসিয়া বলিল, "গরু বেচবি তো খাবি কি? মন্তরিয়াকে কি খাওয়াবি?"

সুকুল হতাশ ভাবে বলিল, "তবে আর হয়না ভাই।"

কিষণ তাহার বিরস মুখখানার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া

কি যেন ভাবিল। তারপর হঠাৎ বলিল, "আচ্ছা যা। বাকী যা লাগে আমি দোবোখন।"

সুকুল সবিস্ময়ে বলিল—"তুই। তুই কোথায় পাবিরে কিষো ?

কিষণ জানাইল, সে গরুর গাড়ী চালাইয়া কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়াছে। বক্রী যাহা কিছু প্রয়োজন, সে যেমন করিয়াই হউক সংগ্রহ করিয়া দিবে।

দুইবন্ধু অনেকক্ষণ নিঃশব্দে পরস্পর অশ্রু বিনিময় করিল।

(সাত)

বিবাহের আনন্দ কোলাহল তখন শান্ত হইয়াছে। বর ক'নে নিভৃত কক্ষে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিল।

সুকুল পরিহাস করিয়া বলিল, 'বুঢঢা'র সাথে তোর 'সাদি' হোলে বেশ হোতোরে মন্তর! উয়া বড় গোঁফ,— এত্তা বড়া টিকি,—ওর—"

মন্তরিয়া সুকুলের মুখে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "মার খাবি সুকো।"

সুকুল হাসিয়া বলিল, "আমিতো বুঢঢার পিয়ারী ছিনিয়ে নিয়েছিরে।"

মন্তরিয়া কৃত্রিম ক্রোধে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আবার!" হরিদ্রা বর্ণের শাড়ী পরা নবোঢ়া নব যৌবনা মন্তরিয়াকে ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল। সুকুল তাহাকে বাহু বেষ্টনে কাছে টানিয়া আনিয়া প্রেমপূর্ণস্বরে ডাকিল মন্তরী।

আনন্দ আবেশে আঁখি দুটী বুজিয়া মন্তরিয়া বলিল, "বল্।"

"সত্যি, কি কোরতিস্ তাহলে ?"

"কি হোলে ?"

"যদি বুঢ্ঢার সাথে সাদি হোতো ?"

কথাটা কল্পনা করিতেও মন্তরিয়া শিহরিয়া উঠিল। বলিল, "তাহলে আফিম খেয়ে 'জান' দিতাম। জরুর!"

খানিকক্ষণ নীরবতায় কাটিয়া গেল। বোধহয় উভয়ে বর্তমানের সুখ-শান্তি-আনন্দের উৎসটাকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতেছিল।

সহসা মন্তরিয়া প্রশ্ন করিল, "রামযশ বুঢ্ঢার টাকা সব দিয়ে দিয়েছিসরে সুকো ?"

সুকুল বলিল, "হ্যাঁ দিয়েছিতো। কেনরে ?"

মন্তরিয়া বলিল, "অত টাকা পেলি কোথায় ? ধার কোরেছিস বুঝি ?"

সুকুল জানাইল, ধার করে নাই। কিছু নিজের ছিল, অবশিষ্ট সমস্ত কিষণ দিয়াছে।

কিষণ যে এই বিবাহ ব্যাপারে কোনরূপ বাধা না জন্মাইয়া সাহায্য করিতে পারে, ইহা মন্তরিয়া কোনদিন স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে সবিস্ময়ে বলিল "কিষো!"

সুকুল বলিল, "হ্যারে। তা নৈলে তো তোকে পেতাম না মন্তর।"

মন্তরিয়া একটু ভাবিয়া বলিল, "কিষো কোথায় টাকা পেলো জানিস্ ?"

সুকুল মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাতো জানিনে।"

মন্তরিয়া পুনরায় অন্যমনস্ক হইল।

সুকুল প্রশ্ন করিল, "তুই কিষোকে বোলেছিলি মন্তর, তার চেয়ে আমাকে বেশী ভালবাসিস্ ?"

মন্তরিয়া বলিল, "ঝুট বাত্।"

"ঝুট! আমায় ভালবাসিস না তাহলে ?"

"বাসি। কিন্তু কিষোকে কিছু বোলিনি তো।"

সুকুল ও মন্তরিয়া পরস্পরের মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিল।

মন্তরিয়া বলিল, "কিষো কোথায় রে ? তাকে তো দেখিনি সারাদিন—'সাদির' সময়ও না।"

সুকুল জবাব দিল, "আমি বিকেলে একবার খোঁজ কোরেছিলাম মন্তরী। পলহোয়ান জেঠা বোল্লে সেই সকালে বেরিয়েছে আর আসেনি।"

"আসেনি!" মন্তরিয়ার নিটোল মুখখানা বিবর্ণ হইল। মনোহর আঁখি যুগল যেন সহসা দৃষ্টিহীন হইয়া উঠিল।

সুকুল তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিল, "মন্তরী! কি হোলো ? অমন কোরছিস কেনরে ?"

মন্তরিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমার মনটা কেমন ভাল লাগছেনা সুকো। চল্, দেখে আসি কিষো এলো কিনা।"

তাহার পাংশু মুখখানার পানে চাহিয়া সুকুল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। বলিল, "চল্ যাই।"

ঝিল্লিমুখর নিঝুম রাত্রি। মাঝে মাঝে দু-একটা গ্রাম্য-কুকুর সম্ভবতঃ কোন বন্য পাখী দেখিয়া চীৎকার করিতেছে। উভয়ে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সুকুল বলিল, "তুই একটু দাঁড়া মন্তর, আমি লাঠিটা নিয়ে আসি।"

সুকুল লাঠি লইয়া আসিলে দুজনে সরু গ্রাম্যপথ বাহিয়া অগ্রসর হইল।

দুপাশে ছোট ছোট জঙ্গল। উভয়ের পদ শব্দে একটা ভীতি বিহ্বল মণ্ডুক পথ ছাড়িয়া লাফাইয়া পড়িল। মন্তরিয়া আগে আগে যাইতেছিল। সুকুল পিছন হইতে তাহার কাঁধে হাত দিয়া বলিল, "আমায় আগে যেতে দে মন্তরী, নয়তো হাত ধ'রে যাই চল।"

দুজনে পাশাপাশি চলিল।

হরশঙ্করের বাড়ীর কাছে আসিয়া মন্তরিয়া ডাকিল, "কিষো!" কেহ সাড়া দিল না।

মন্তরিয়া পুনরায় ডাকিল, "কিষো—এই কিষণ!"

মানুষের সাড়া পাইয়া একটা নিশাচর পেচক বিকট চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল। হরশঙ্কর ভিতর হইতে সাড়া দিল, "কোন্ হ্যায়রে?"

মন্তরিয়া বলিল, "আমি মন্তরিয়া। কিষণ ফিরে এসেছে জেঠা?"

ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতে আসিতে হরশঙ্কর বলিল, "এত রাত্তিরে তুই একা এসেছিস 'মায়ী!' না—ঐ যে, সুকুল নয়?"

মন্তরিয়া বলিল, "কিষণ কই? আসেনি?"

হরশঙ্কর বলিল, "সন্ধ্যে বেলাতো একবার এসেছিল মায়ী। তারপর আবার কোথায় গেছে, এখনো ফিরলো না।"

মন্তরিয়া একবার সুকুলের পানে ফিরিয়া চাহিয়া পাষাণ মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

সুকুল জিজ্ঞাসা করিল, "কিষো কি গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছে জেঠা?"

হরশঙ্কর বলিল, "গরুর গাড়ী? সে তো নেই! ক' দিন্ হোলো বেচে দিয়েছে।"

সুকুল ও মন্তরিয়া পরস্পরের মুখের দিকে নির্ব্বাক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। উভয়েই বুঝিতে পারিল কিষণ কি করিয়া অর্থ-সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল।

হরশঙ্কর আপনমনে সখেদে বলিল, "ছেলেটার কি যেন হোয়েছে। বাড়ীতে থাকেনা, কারো সাথে কথাও কয়না। কেবল কি ভাবে—"

মন্তরিয়া ডাকিল, "সুকো।"

সুকুল বলিল, "কি বোল্ছিস?"

"কিষো পাহাড়ে গেছে—চল্।"

"পাহাড়ে! পাহাড়ে যাবে কেনরে এই রাত্তিরে?"

"হু, নিশ্চয়ই গেছে। আমি কিষোকে চিনি। সে একদিন বোলেছিল যদি তাকে 'সাদি' না করিতো পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে 'জান' দেবে।" মন্তরিয়া অগ্রসর হইল।

দূরে তারকা খচিত আকাশের গায় পাহাড়ের ম্লান সীমা রেখা দেখা যাইতেছিল। সপ্তমীর চাঁদ আলো হইতে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে আরো বেশী। সেই দিকে একবার চকিতে চাহিয়া দেখিয়া সুকুল উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "মন্তরী শোন্—শুনে যা, এই রাত্তিরে—"

মন্তরিয়া উন্মত্তের মত ছুটিতে ছুটিতে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "এখনো হয়তো সে বেঁচে আছে সুকো, এখনো হয়তো—" সুকুল সবেগে তাহার পশ্চাৎধাবন করিয়া বলিল, "দাঁড়ারে মন্তর, একটু দাঁড়া। আমিও যাচ্ছি চল। একা যাস্নি—"

(আট)

পরদিন প্রভাতে গ্রামবাসীরা তিনটী মৃতদেহ আবিষ্কার করিল।...

বৃদ্ধ রামযশ তাহার গৃহের অঙ্গনে উত্তান হইয়া পড়িয়াছিল। নির্ম্মম লাঠির আঘাতে তাহার করোটি ফাটিয়া মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িয়াছে।...

অদূরে গগনচুম্বী তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গটির পার্শ্বে শ্যামল বনশ্রীর অন্তরালে যেখানে পর্ব্বত গাত্র সহসা মসৃণ হইয়া চতুর্দ্দিকে সরল ভাবে অনেক খানি নীচে নামিয়া গিয়াছে, সেই বিরাট গহ্বরের তলদেশে পড়িয়াছিল কিষণ ও মন্তরিয়ার দৃঢ় আলিঙ্গন বদ্ধ চির নিদ্রিত প্রাণহীন দেহ।...

শুধু পাওয়া গেলনা সুকুলকে। সে কোথায় নিশ্চহ্ন হইয়া গিয়াছিল কে জানে!...

তাহার পর বহুবর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে।

নীরব নিশীথে যখন নীলাবরণ বাসীরা সুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়ে, তখন কেহ কেহ নাকি হঠাৎ জাগরিত হইয়া শুনিতে পায় কে যেন পাহাড়ের বনে বনে আকুল ক্রন্দনে ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিতেছে, "মন্তরিয়া—এ মন্তরিয়া! তু কিধার গিয়া হ।" লোকে বলে, "ও সুকো পাগলা।"

গ্রামবাসীরা সেই গিরিশ্রেণীর নাম দিয়াছে "মন্তরিয়া পাহাড়।"

———

পুজার ডালি—

শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্র কুমার সেন

'যা দেবী গৃহমধ্যেষু 'গিন্নি' রূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।'

উদ্যান-দৃশ্য

প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত — শিল্পী—এইচ, জি, নাগরকর

চিত্র শিল্প ও শিল্পী

কুমারী যূথিকা মুখোপাধ্যায়

চিত্র ও ফটোগ্রাফ—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে আলোক-চিত্রকর প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের অবিকল প্রতিলিপি তুলিয়া লয়, চিত্রকর তাহার অন্তরের রূপটি ফুটাইয়া তুলেন। চিত্রকর রূপের স্বপ্ন তুলির আঁকে মূর্ত্ত করেন বলিয়াই চিত্রের স্থান আলোক চিত্রের অনেক উঁচুতে।

একমাত্র কবির সঙ্গে চিত্রকরের তুলনা হতে পারে। তুলির ছন্দে চিত্রকর অরূপকে রূপ দেন জীবনের সাধনা ও সত্যের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করাই তাঁর কাজ। যে ছবির মধ্যে যত বেশী প্রাণ স্পন্দন অনুভব করা যায়, সে ছবির আদর তত বেশী।

মোনালিসা

র‍্যাফেলের আঁকা ম্যাডোনার মুখের মধ্যে বাৎসল্যের যে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার তুলনা নাই। র‍্যাফেল, লিয়োনার্ডো ডা ভিঞ্চি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় শিল্পীদের চিত্রগুলি পুষ্পপাত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

ভারতীয় চিত্র কলার বৈশিষ্ট্য তাহার ভাবে—বাহিরের জগৎকে সে যেন বাদ দিয়া চলিতে চায়।

ভারতীয় চিত্রকলায় নূতন রূপ দিয়াছেন অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর। তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যগণের কাছে ভারতীয় চিত্রকলা অনেক ঋণী।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন দুই সাধক শিল্পী—৺মন্মথ-নাথ চক্রবর্ত্তী (স্বামী-সচ্চিদানন্দ) ও শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী। ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল ইহাদের কীর্ত্তি।

ধানের ক্ষেত—

লিথোগ্রাফ

শিল্পী—ক্যাপ্টেন স্পেন্সার প্রাইস

ধরিত্রী

শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

শিল্পী যোগেশ চন্দ্র রায়ের ছবিগুলি রূপমাধুর্য্য ও অপূর্ব্ব বর্ণ সম্পাতের জন্য এত ভাল লাগে

নতভ্রূ—ছবিখানি যোগেশচন্দ্রের অনুপম সৃষ্টি। জল লইয়া ফিরিবার পথে বাতাসে আঁচল সরিয়া গিয়াছে। বসন ঠিক করিতে গিয়া কলসীর জল পড়িয়া গেল। যুবতী নিজের রূপে নিজেই মোহিত হইয়া গিয়াছে।

পৃথিবী—আর একখানি সুন্দর ছবি। মাতা ধরিত্রীর মুখে দৃঢ়তা ও বাৎসল্যের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পুরুষকার—ছবিখানিতে অদৃষ্টের উপর নির্ভরতা এবং পুরুষকারের চিত্র পাশাপাশি দেখান হইয়াছে। একদিকে একজন মাঝি হাল ছাড়িয়া জোয়ারের আশায় বসিয়া আছে। আর একজন নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া নৌকা স্রোতের বিপক্ষে টানিয়া চলিয়াছে।

পুরুষকার

শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

শিল্পী হেমেন্দ্র নাথ মজুমদারের ছবিগুলি অনুপম।

শ্রীমতি হাসিরাশি দেবীর প্রাচীন পদ্ধতির অনুকরণে অঙ্কিত চিত্রগুলির বিষয় নির্ব্বাচন
ন হইলেও ছবিগুলি কেমন অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিশ্বাসের 'জীবনের শেষে' ও 'বসন্তোৎসব' এ বৎসরের দুইখানি উৎকৃষ্ট
ির মধ্যে অন্যতম।

শ্রীপ্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছবিগুলি সাধকের চক্ষে তুলনাবিহীন।

শ্রীমতি শান্তি ঘোষালের 'তথাগত', ছবিখানিও এবৎসরের একখানি সুন্দর ছবি।

অভিমানিনী

[প্রফেসর গৌরের সৌজন্যে

নতভ্রূ

শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
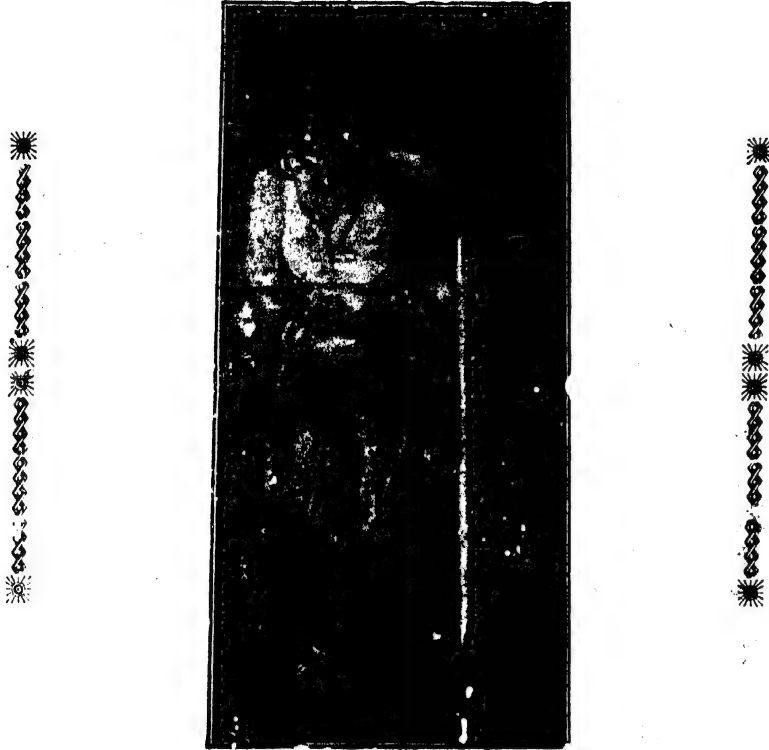
শ্রীনন্দলাল বসুর কতকগুলি ছবিকে যদি ব্যঙ্গচিত্র বলিয়া চালানো যায় তা'হলে বোধ হয় ইহাদের উপর অবিচার করা হয় না।

'রূপশ্রী' নামক কারুশিল্প সম্বন্ধে একখানি নূতন সুন্দর ত্রৈমাসিক পত্র বাহির হইয়াছে। এদেশে সম্বন্ধে ইহাই একমাত্র পত্রিকা।

শ্রীবিনয়কুমার বসু, শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন, শ্রীসুবোধকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীগগনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রগুলি সুন্দর। মহিলাদের মধ্যে শ্রীহাসিরাশি দেবীর ব্যঙ্গচিত্র উপভোগ্য।

উড়ুন চণ্ডী

গল্প

শ্রী গিরিবালা দেবী

[সুলতা ও তামাল লতা দুই বোন—সুলতা হিসেবী, সুন্দরী—কাকেও দয়া বা দান করা তার প্রকৃতির বাহিরে। তমাল লতা আবার এত কোমল ও দয়ালু যে কাহারো অভাব দেখিলে সে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়াও তাহার অভাব মোচন করিতে চাহে। মা সুলতার উপর যত আশা রাখেন তমাল লতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তেমনি আশাহীন। এই অবস্থায় দুই বোনের ভবিষ্যৎ কি ভাবে গড়িয়া উঠিল তাহারই একটা মধুর বাস্তব চিত্র সুলেখিকা গিরিবালা দেবী এই গল্পে ফুটাইয়াছেন।]

মা মহারাগতঃস্বরে ডাকিলেন "ও পোড়ারমুখী, উড়ুনচণ্ডী।"

ভীত ত্রস্ত মেয়েটি দুরু দুরু কম্পিত বক্ষে মায়ের নিকটে আসিল।

মা উড়ুনচণ্ডী পোড়ারমুখী বলিয়া ডাকিলেও মেয়ের নাম কিন্তু তা নয়। নাম তার তমাললতা, সকলে তালি বলিয়া ডাকে।

মা তালির ঝাঁকড়া চুল মুঠায় চাপিয়া হাঁকিলেন "ফের তুই নিজে না খেয়ে আজ আবার ভিকারীকে ভাত দিয়েছিস? কেন দিয়েচিস বলতো?"

তালি নিরুত্তর।

বড়বোন সুলতা বলিল, "তখুনি আমি ওর বজ্জাতি বুঝতে পেরেচি মা, তুমি ভাত খেতে ডাকলে ও বল্লে আমার ক্ষিধে পায়নি ভাত ঢাকা দিয়ে রাখো, পরে খাব। যেদিন ও পরে খাব বলে সেই দিন ওর ভাত খায় অন্যে।"

তালি মৃদু প্রতিবাদ করিল "ক্ষিধে আমার কম ছিল বলেই চাট্টি ভাত বিশুকে দিয়েছি, নিজে না খেয়ে তো দেই নাই।"

"না খেয়ে দেই নাই, অন্যায় করে আবার মুখ নেড়ে কথা বলা হচ্ছে। 'আপনি শুতে পায় না ঠাঁই, শঙ্করায় মাকে মধ্যে শোয়াই!' ভাত জোটে কোথা থেকে খাড়ির তা জ্ঞান নেই। আমার হয়েছে দুর কুভাগীর ব্যাটার নাম সাগর মল্লিক!" বলতে বলতে মা রাগে গর গর করিয়া দিবা নিদ্রার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

সুলতা নিজের সেলাই লইয়া বসিল।

ভাত দিয়ার ব্যাপারটা বেশীদূর গড়াইলনা দেখিয়া তালি একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল। মনে পড়িল মাস্টারের বাকী মাস [illegible] কথা। সংসারের অধিকাংশ কাজ তাকেই করিতে হয়। পিতা শ্যামসুন্দর কৃষাণদের সহিত চাষ আবাদে খাটিয়া কোনরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তালিরা তিনটি ভাই বোন, ভাইটী ইস্কুলে পড়ে। সুলতা বাবা, মার প্রথম সন্তান, যেমন আদুরে তেমনি আবদেরে। তার সুচিকণ দীর্ঘ কেশ, গৌরবর্ণ, মার গৌরবের বস্তু। মেয়ের পর মেয়ে তায় শ্যামবর্ণা বলিয়া তালির প্রতি মা তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। মেয়ে সুলতা কেমন হিঁসাবি, গোছালো, হাতের ফাঁক দিয়া একটা সূচও গলাইতে পারে না। তালি তার সম্পূর্ণ বিপরীত, দাতাকর্ণ হইয়া যেন জন্ম লইয়াছে। সমস্ত দ্রব্য গোপনে বিলাইয়া দিবে, সমনের ভাত অন্যকে খাওয়াইবে। রাজ্যের দুঃখী কাঙ্গালের সহিত বন্ধুত্ব, পশু পক্ষীর প্রতি অহেতুক করুণা। ইহাতে কোন মার মন মেয়ের উপর খুসী থাকিতে পারে?

মেয়ে খুসী অখুসীর ধার ধারেনা, যা করিবার শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিয়াও নির্ব্বিবাদে করিয়া থাকে।

+ : + +

বিশু ভিখারিণী কাঁঠাল তলায় বসিয়া তখনো পাতের ভাত খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছিল। তালি রন্ধন শালা হইতে একবাটী দুধ আনিয়া চুপে চুপে বলিল "বিশু এই দুধটুকু আগে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেল। আজ তোমার পেট ভরলো না। ভালকরে খাওয়াতে পারলাম না, আর একদিন এসে খেয়ো।"

ভিখারিণী অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে কহিল "আমি বেশ খেয়েছি তালিমা, এ গেরামে তোমার মতন এমন করে কেউ খেতে দেয় না। যে দোরে যাই, সেখানেই দূর দূর কেউ ছাই ছাই। তুমিই কেবল অন্ধ আতুরকে ভালবাস, ঠাকুর তোমার ভাল করবে।"

নিজের নিন্দা প্রশংসায় তালির লেশমাত্র আগ্রহ ছিল না। সে দেখিতেছিল বিশুর ছেঁড়া কাপড়। উহাতে যে লজ্জা নিবারণ হইবার উপায় নাই। আহা বিশু বড় দুঃখিনী, কেহ নাই, কেহ ভালবাসেনা। রোগে জীর্ণ অনাহারে শীর্ণ, পরের দ্বারে দ্বারে কাজ করিয়া খাইবার শক্তি নাই, উহাকে না দিলে ও পাইবে কোথায়?

বেড়ার গায়ে তালির একখানি শাড়ী শুখাইতেছিল, তালি সেইটা তুলিয়া বিশুর কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল "বিশু, তুমি এইটে পরো, তোমার কাপড়ে কিছু নেই। আর একটা কথা এ কাপড় পরে কখনো কিন্তু আমাদের বাড়ী এসনা।" ভিখারিণীর চক্ষু অশ্রু সজল হইল, সে কোন কথা বলিতে পারিলনা।

বিশুকে বিদায় দিয়া বাসন মাজিয়া তালি কলসী কাঁখে জল আনিতে চলিল। মা উঠিবার আগেই সে আজ সমস্ত কাজ সারিয়া মাকে সন্তুষ্ট করিতে চাহে। ভাত দিবার অপরাধ, কাপড় দিবার অপরাধ দুইটা পাশাপাশি হইয়া তার মস্তকে খাঁড়ার মত ঝুলিতেছে। কাজের ছুতায় সে পর্ব্বত প্রমাণ অপরাধ যে কোন মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। তালির যে পদে পদে বিপদ, বিড়ম্বনা।

যাহার জীবনই বিড়ম্বিত তাহার সহজে নিস্তার মেলে না। শত বাধা বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়।

তালির গমন পথের পাশে কয়েকটা নেড়ী কুকুর একত্র হইয়া একটি কুকুর ছানাকে সগর্জ্জনে আক্রমণ করিতেছিল, অসহায় কুকুর শিশুর আর্ত্তনাদে তালি স্থির থাকিতে পারিল না।

মুহূর্ত্তে তালি জলের কথা ভুলিয়া গেল, মার রাগের কথা ভুলিয়া গেল। কুকুর তাড়াইয়া তালি ছানাটিকে বুকে তুলিয়া লইল। তার রক্তাক্ত কানের দিকে চাহিয়া তালির চোখ জলে ভরিয়া গেল।

নিদ্রাভঙ্গে মা বাহিরে আসিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তালি কুকুর ছানা কোলে করিয়া তার ক্ষত বিক্ষত কানে চুণ হলুদ লাগাইয়া দিতেছে। বাচ্চাটা আরামে লেজ নাড়িতেছে।

এ হেন অনাসৃষ্টি কাণ্ডে মা চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। উচ্চ চীৎকারে পাড়া মাথায় করিয়া তুলিলেন "হতচ্ছাড়া, উড়ুনচণ্ডী তোর কি ঘেন্না পিত্তি নেই? কোথা থেকে আপদ নিয়ে এলি? যা এক্ষুনি যা রাস্তার কুকুর রাস্তায় ফেলে দিয়ে চান করে আয়।"

মার পশ্চাৎ হইতে সুলতা টিপিয়া টিপিয়া কহিল "দেখেচ মা, কুকুরের রক্তে ওর কাপড়ের ছিরি দেখেচ? গা আমার ঘিন ঘিন করচে, আমি এজন্মেও ওর হাতের জল খাব না, তা কিন্তু বলে দিলাম।"

মা চীৎকার করিতে লাগিলেন "মরণ, তবু বসে রইলো, উড়ুনচণ্ডিপনা করে করে সাহস বেড়ে গেচে, তাই কুকুর নিয়ে এসেচেন। এখনো ভাল মুখে বলচি কুকুর ফেলে দিয়ে চান করে আয়, নইলে তোর রক্ষা নাই।"

তালি মিনতি করিয়া কহিল "আমাদের কুকুর নেই, এটাকে বাড়ীতে রাখ না মা, এ খুব ভাল, কিছু করবে না তোমার ঘরে দোরে যাবে না। রাস্তায় ফেলে দিয়ে এলে শেয়ালে কুকুরে মেরে ফেলবে!"

"ফেলে ফেলবে, তাতে তোর কি উড়ুনচণ্ডি? দয়াবতী, দয়া রাখবার ঠাঁই পান না। আমি রাখবো কুকুর বাড়ীতে? আমায় দিয়ে সে কাজ হবে না, যা ফেলে দিয়ে চান করে আয়।"

তালি আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। কুকুর কোলে করিয়া বাগদী পাড়ার দিকে পা বাড়াইল।

বাগদী বৌ ঘুঁটে দিতেছিল, তালির আবির্ভাবে মুখ তুলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিল। তালি দি, এস, ওমা, ওটা কিগো, কুকুর ছেনা কুথায় পেলে?"

তালি বলিল "নদীর পথে অনেক গুলো কুকুর মিলে একে মেরে ফেলতে নিয়েছিল, দেখনা, কান দিয়ে এখনো রক্ত পড়চে। মা কিছুতেই রাখতে দেবেনা, পথে ফেলে দিলে ওযে মরে যাবে বৌ?"

"মরবে কেনে তালিদি? যেঁনার জীব তেঁনাই দেখবে। মা যা হুকুম দেচে তুমি তাই কর।"

বাগদী বৌয়ের আশ্বাসে তালি আশান্বিত হইতে পারিল না। ক্ষণেক চিন্তার পর করুণ স্বরে কহিল "না বৌ তা হয় না, তুই ওকে রাখ লক্ষ্মী, আমি রোজ তোকে

চাল দিয়ে যাব। তুই কারুকে কিছু বলিসনে, মা, দিদি যেন জানতে না পায়?

বাগদী বৌ সহাস্যে উত্তর করিল "ছেনা রেখে যাও তালিদি, আমি যতন করবো, আমার যা জুটবে খাওয়াবো। চাল দিয়ে তুমি গাল মন্দ শোন নি, তোমার এত দয়া, মা, বুন কিন্তুক তেমত লয়।"

তালি নিশ্চিন্ত হইল, কিন্তু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবার অবকাশ কোথায়? রঙ্গীলা গাইয়ের বাছুরের কথা স্মরণ হওয়ায় সে দেরী করিতে পারিল না। গাভী তাহাদেরই, মাস দুই হইল তার বাছুর হইয়াছে। চাকর হরি দ্বিপ্রহরে ধেনু-বৎস বাঁধিয়া বিশ্রাম করিতে গেলে তালি গোপনে বাছুর খুলিয়া দিয়া দুগ্ধ পান করায়। কেবল নিজেদের বলিয়া নহে, সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে প্রতিবেশীদের গৃহেও উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

বাছুরকে দুধ খাওয়াইয়া ডুমুর গাছের পাতার বাসায় টুনি পাখীর ডিম কয়েকটা দেখিয়া স্নানান্তে তালি যখন বাড়ী ফিরিল তখন বেলা সন্ধ্যার নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছে। মা শুষ্ক কাপড়গুলি কোঁচাইয়া তুলিতে লইয়া তালীর শাড়ীর অনুসন্ধান করিতেছেন।

তালিকে সম্মুখে পাইয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন "বেড়ার গায়ে তখন যে তোর কাপড় শুকুতে দিয়েছিলি, সেটা কোথায় গেল?"

সুলতা বলিল "আমি তো বলচি মা, তা দান হয়ে গেচে, তোমার বিশ্বাস হল না, এখন বার কর কাপড়; দেখি কেমন মুরদ?"

তালি নত নেত্রে ধীরে কহিল "বিশুর কাপড় ছিঁড়ে গেচে তাই"—

মা সরোষে মেয়েকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া তার পৃষ্ঠে কয়েকটা চপেটাঘাত করিলেন।

"যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল" বলিয়া সুলতা খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।—

এ হাসি পর্য্যন্ত বেশীক্ষণ চলিল না। প্রীতি প্রফুল্ল মুখে শ্যামসুন্দর গৃহে প্রবেশ করিয়া পত্নীকে ডাকিলেন "ওগো, শুনেচ, গোকুলপুরের নায়েবের ছেলের সাথেই সুলতার বিয়ে পাকা করে এলাম। আজ ছেলেটির সঙ্গেও দেখা হল, বেশ ছেলে। ম্যাট্রিক পাশ করে জমিদারী সেরেস্তায় বাপের কাছে কাজ কর্ম্ম শিখচে। বাপের পরে ছেলেই নায়েব হবে। জমিদারের বয়েস কম, কত কালের পর এবার দেশে এসেচে। বড় লোকের খেয়াল এর পরে হয় তো বিদেশেই থাকবে। নায়েবই সর্ব্বে সর্ব্বা।"

মার চক্ষু দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি স্বামীর নিকটে সরিয়া গিয়া প্রশ্ন করিলেন "তুমি যা দিতে চাইচ তাতেই ওরা রাজী হলো তো?"

"হ্যাঁ, তাতেই রাজী। বল্লে অনেকেই বেশী টাকা দিতে চাইচে, কিন্তু আপনার মেয়েকেই আমাদের পছন্দ হয়েচে বেশী।"

মা সগর্ব্বে জবাব দিলেন "হবে না, এমন মেয়ে কোথায় পাবে? আমিত তোমায় চিরকালই বলচি সুলতাকে নিয়ে ভাবনা নেই। ভাবনা হচ্ছে উড়ুনচণ্ডীর জন্যে রংয়েরো বাহার নেই, চুলেরো শোভা নেই স্বভাবটাও লক্ষীছাড়া। ওকে বিয়ে দিতে পারবে না। বয়েস হল পনেরো ষোল এখনো বুদ্ধির গোড়ায় জল ঢালতে হয়। মেয়ের ভাবনায় আমি কূল কিনারা পাই না।"

বাপের দুই পাশে দুই মেয়ে আশায় উল্লাসে গৌরবে; সুলতার মুখখানি প্রভাত সূর্য্যের মত দীপ্তিময়। শ্যামল তালির শান্ত নয়ন সুকুমার আনন হইতে পরদুঃখ— কাতরতা করুণা শতধারে যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। কে বলে তমাল লতা দেখিতে ভাল নহে। লতার মত যার দেহলতা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যভরে দুলিতেছে, প্রস্ফুটিত পুষ্পমঞ্জরীর মত যে মুখ কোমল হইতেও কোমলতর কে তাকে অসুন্দর বলিবে? কোন মেয়ে পরের নিমিত্ত এত ব্যথিত, এত ম্রিয়মান? শ্যাম সুন্দর তালির দিক হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না।

\+ \+ \+

সুলতার বিবাহের দিন স্থির হইবার সাথে সাথে বাড়ীতে সাড়া পড়িয়া গেল। সচ্ছল সংসার নহে, মা পাকা গৃহিণী পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত গুছাইয়া রাখিতে চাহেন। পূজার কয়েকটা দিন পরে কার্ত্তিক মাস, তার পর

অগ্রহায়ণের প্রথমে বিবাহ। স্বজন স্নেহে পুলক হিল্লোলে সুলতা আন্দোলিত।

মা নিজের সেকেলে ভারী গহনা ভাঙ্গিয়া সুলতার হাল ফ্যাসানের গহনা গড়াইতে দিলেন। সেই সঙ্গে তালির দুইটি তামা বাঁধানো সোনার চুড়ি হইয়া আসিল। এত বড় মেয়ের গায়ে কোন গহনা নাই, কাঁচের চুরি সার। ইহাতে মার দুঃখ ক্ষোভের সীমা নাই। কিন্তু সাহস করিয়া সাধ্যমত তালিকে কিছু দিতে পারেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে সুলতার পরিত্যক্ত দুল জোড়া পরাইয়া দিয়া তাঁহার শিক্ষা হইয়াছে। রসিক মালির পুত্রের কঠিন রোগে সে দুলের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। ছোট হোক বড় হোক সোনার গহনা, মা তার শোক আজও ভুলিতে পরেন নাই। তদবধি তালি ভূষণ বিহীনা, বসনও না থাকিবার মধ্যে।

\+ + +

ষষ্ঠীর প্রভাতে মা পুত্র, কন্যাকে স্নান করাইয়া আপনার হাতে প্রসাধন করিয়া দিলেন। সুলতার সদ্যধৌত সুমার্জ্জিত দেহ পরিবেষ্টন করিয়া ঝলমল করিতে লাগিল এক দামী শাড়ী। তার রং আষাঢ়ের ঘন নীল মেঘ, পাড় জলন্ত অগ্নিশিখা। পিতার সাধ্যের অতিরিক্ত মূল্য জানিয়াও সুলতা জেদের বশে শাড়ীটি কিনিয়াছিল। তালির পূজার কাপড় রক্তজবা রংয়ের, অল্প দামের সাধারণ শাড়ী, সে পছন্দ করিয়াই লইয়াছে।

নববস্ত্র পরিধানের পরে মা কন্যাদ্বয়ের ললাটে সিন্দুরের টিপ আঁকিয়া দিলেন। পায়ে আলতা। সুলতার শরীরে মা'র অবশিষ্ট গহনা ক'টি ঝিকমিক করিতে লাগিল। তালির নিটোল বাহুমূল শোভিত হইল নূতন চুড়িতে।

ভোর হইতে পাড়ায় পাড়ায় উৎসবের বাঁশী বাজিতেছে। শরতের সোনার রৌদ্র, সজীবতা, পুলকতায় ভুবন ভরিয়া গিয়াছে।

বন্যা পীড়িত অধিবাসীর সাহায্যার্থে একদল উৎসাহী যুবক খোল করতাল সংযোগে গান গাহিয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। ভাদ দুর্দ্দর গৃহে ছিলেন না, দ্বারে সকরুণ সঙ্গীত লহরী ঐতিধ্বনিত হইতে লাগিল—

ভিক্ষা দাও জননী, ভিক্ষা দাও, এসেছি তোমারি দ্বারে,
ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিলে সন্তান, মাকি থাকিতে পারে।

মা রান্নার যোগাড় করিতেছিলেন। বিরক্ত ভাবে বলিলেন "এতকাল শহরের পথে ঘাটেই বাউলের দল গান গেয়ে ভিক্ষে ক'রে বেড়াত। পাড়াগাঁয়ে এ উৎপাত ছিলনা। এখন দেখছি, এখানে এসেও জুটেছেন। উনি বাড়ী নেই, কি ভিক্ষা দেব?"

সুলতা চোখ ঘুরাইয়া মুখ নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, ভিক্ষা না ছাই দেব, কোথায় বন্যা হ'ল, কে মরলো, কার চাল নেই, কাপড় নেই, তাতে আমাদের কিসের দরকার? আমাদের না থাকলে কে দিতে আসে? তুমি তোমার কাজ কর মা, আমি ওদের বিদায় করে দিচ্ছি।"

ভিক্ষার্থীদের বিদায় করিতে সুলতার বেগ পাইতে হইল না। যেখানে আশা নাই, সেখানে বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন বলিয়া যুবকের দল প্রস্থান করিল। কিন্তু যাইবার সময় গৃহহীন, অন্নহীন অসহায় নর-নারীর দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না।

সে মর্ম্মোচ্ছ্বাস সুলতার অন্তঃকরণ স্পর্শ করিল কিনা জানিনা, কিন্তু তালিকে বিচলিত ব্যথিত করিল। যাহাদের বাড়ী নাই, ঘর নাই, লজ্জানিবারণের বস্ত্র নাই, ক্ষুধার অন্ন নাই; তাহারা কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছে? গৃহ তৈজস ভাসিয়া গিয়াছে, পালিত পশুপক্ষী ভাসিয়া গিয়াছে, পুত্র কন্যা ভাসিয়া গিয়াছে, তাহাদের জন্য দিদি কিছুই দিতে পারিল না? ছেঁড়া কাপড়, চাউল তাহা কি দেওয়া চলিত না?

তালির চক্ষুপল্লব বহিয়া অশ্রুজল ঝড়িয়া পাড়িতে লাগিল। নূতন গহনা পরাইয়া মা আজ তাকে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। সুলতা সতর্কতার সহিত পাহারা দিতেছে। দূরের অস্পষ্ট "ভিক্ষা দাও জননী, ভিক্ষা দাও' স্বরের রেশ তখনো থামে নাই, শরতের উতলা অনিলে ভাসিয়া আসিতেছে।

তালি আর পারিলনা, চঞ্চল নয়নে চারিদিকে চাহিয়া বাড়ীর পশ্চাৎভাগে নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিল। লোকাপবাদে তার পা বাড়াইবার উপায় ছিল না, মা দেখিতে পাইবেন। তারা পিছু লইবে।

বনখণ্ড অতিক্রম করিয়া নদীর কূলে আসিয়া তালি স্তব্ধ হইয়া গেল। ঘন পল্লবিত জামগাছের তলায় একটি বুলবুলি পাখী পড়িয়া রহিয়াছে। শাখাজালে আবদ্ধ নিভৃত নীড়ে থাকিয়া অপর বুলবুলিটা ডাকাডাকি করিতেছে। তটিনীর জলে ছায়া ফেলিয়া এক হিংস্র বাজ পক্ষী উড়িয়া বেড়াইতেছে।

তালি সস্নেহে সযত্নে বুলবুলিটাকে বুকে চাপিয়া তার ডানায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অগ্রসর হইল।

নদীর শীতল জলে অঞ্চল ভিজাইয়া তালি পাখীর চঞ্চুপুট দুটি পরিসিক্ত করিয়া মুখ তুলিল। তাহার অনতিদূরে ঘাটে একখানি পাল্কি বাঁধা, পাল্কির সামনে তীর ভূমিতে এক তরুণ বয়স্ক অপরিচিত যুবক দাঁড়াইয়া। সৌম্য সহাস তরুণের বেশভূষা সাধারণ, গৌর দীর্ঘ দেহ, অঙ্গুলিতে একটি বৃহদাকার হীরক অঙ্গুরী রৌদ্র কিরণে জ্বলিতেছে।

ছেলেটিকে দেখিয়া তালি প্রফুল্ল হইল। ইহারাই তো দলবদ্ধ হইয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল। ভিক্ষান্তে নৌকায় ফিরিয়া যাইতেছে।

তালি অপরিচিতের পাশে উপনীত হইয়া হাসিমুখে বলিল "দেখুন, দিদি কিছু দেয়নি বলে আপনারা রাগ করবেন না। ওর ভারি বদ অভ্যাস, কারুকে কিছু দিতে চায় না।"

বিস্মিত তরুণ বিস্ফারিত চক্ষু মেলিয়া তালিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিল "কি বলছ তুমি? ভুল করেছ?"

"না ভুল করবো কেন? আপনি যে বন্যার জন্যে আমাদের বাড়ী ভিক্ষা চাইতে গিয়েছিলেন। দিদি বারণ করে দিলে?"

"দিদি, বারণ—"

"হ্যাঁ, আর একমাস পরে দিদির গোলকপুরের নায়েবের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে কিনা। আমরা গরীব, অনেক খরচ পত্র করতে হ'বে বলেই দিদি কিছু দেয় নাই। তাতে রাগ কিছু ক'রবেন না, এইটে নিন" বলতে বলতে তালি বামহস্তের চুড়িগাছি খুলিয়া অপরিচিতের সামনে ধরিল।

যুবক দুই পা পিছু হটিয়া উত্তর করিল "আমি ভিক্ষা চাইতে, না তুমি ভুল করছ। গোলকপুরের নায়েবের ছেলের সাথে তোমার দিদির বিয়ে, আচ্ছা তোমার বাবার নাম কি?"

"বাবার নাম শ্রীযুক্ত শ্যাম সুন্দর মিত্র। নিন, এ[illegible] রাখুন, আমি দেরী করতে পারবো না, আমার ঢের কা[illegible] আছে। আপনি গাছে চড়তে পারেন তো?" বলিয়া[illegible] তালি তরুণের পাঞ্জাবীর বুক পকেটে চুড়িখানা গুঁজি[illegible] দিল।

তরুণ হতবাক। মেয়েটা পাগল নাকি? না উন্মাদে[illegible] উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বলতা ত ইহার মধ্যে নাই। এ যেন শরতে[illegible] মূর্ত্তিমতী আনন্দ প্রতিমা। ঘন কৃষ্ণ আঁখি তারকায় কারু[illegible] কোমলতা উছলিয়া পড়িতেছে। নির্ম্মল ললাটে ভো[illegible] ভোরের শুকতারার মত একটি সিন্দুর বিন্দু। গুচ্ছ গু[illegible] কুন্তলে বালিকার সুকুমার সুন্দর মুখখানি শৈবালে আব[illegible] প্রস্ফুটিত পদ্মের মত অপরূপ লাবণ্যে বিকশিত। এ যে[illegible] শারদ লক্ষ্মী তাঁর কনক চাঁপা বরণ শরতের হরিৎ ক্ষেতে[illegible] লুকাইয়া রাখিয়া শ্যামল রংয়ের তুলিকা সর্ব্বা[illegible] বুলাইয়া আসিয়াছেন।

মুগ্ধ তরুণ চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমা[illegible] নাম কি?"

তালি একটুখানি সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া কহিল "আমা[illegible] অনেক নাম, মা ডাকেন উড়ুনচণ্ডী, আর সবাই তা[illegible] বলে, নাম আমার তমাল লতা।"

তরুণ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "বাঃ বেশ নাম তে[illegible] তমাল তালি বনরাজী নীলা।"

তালি কবিতায় বাধাও থামিল না। ক্রোড়স্থিত বু[illegible] বুলকে সস্নেহ চুম্বন করিয়া প্রশ্ন করিল "আপনি গা[illegible] চড়তে পারেন ত? চলুন একে বাসায় তুলে দেবে[illegible] নইলে বাজপাখী এক্ষুনি মেরে ফেলবে।"

ছেলেটি দুষ্ট হাসি হাসিয়া কহিল "আমি চড়[illegible] জানিনে, আমার মালারা জানে। তা আমি যদি [illegible] এত কষ্ট করা কেন, গাছতলায় বসিয়ে রাখো[illegible] নিয়ে চলে যাবে। বাজেরো ত খাবার চাই?"

তালির দুইচোখে কলহ ঘনাইয়া আসিল। [illegible] ভ্রূ বাঁকাইয়া তর্জ্জনি তুলিয়া কলকণ্ঠে ঝঙ্কার দিল, "[illegible] আপনারা এমনি. মানুষের জন্য ভিক্ষা করে বেড়া[illegible]

ারেন, আর ছোট্ট এতটুকু পাখীটা'র ওপর মায়া হয় া? ডাকুন আপনার মাল্লাকে একে বাসায় তুলে রাখুক।"

\+ + +

বুলবুলকে নিরাপদ নীড়ে রাখিয়া এতবেলায় বাড়ী ফিরিতেই তালি মায়ের সম্মুখে পড়িয়া গেল। মেয়ের অনুপস্থিতের মধ্যে মা চুড়ির বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছিলেন। তাতে মুখে ধরা পড়িয়া তালি আজ লেশমাত্রও ক্ষুব্ধ হইল না। মার চড় চাপড় ভৎসনা নির্ব্বিচারে সহিয়া গেল। এক ক্ষুদ্র প্রাণীকে রক্ষা করিবার আনন্দে, দুঃস্থ বিপদগ্রস্তদের উদ্দেশে কিঞ্চিৎদান করিবার উল্লাসে তার হৃদয় পরিতৃপ্ত প্রসন্ন।

বিজয়ার অপরাহ্ন স্বজন বান্ধবদের নিমিত্ত মা জলযোগের আয়োজন করিতেছেন। সুসজ্জিতা সুলতা মার কাছে বসিয়া গল্প করিতেছে। তালি পান সাজিতেছে, আজ তার বেশ নাই, ভূষাও নাই। অবেণীবদ্ধ চুল চোখে মুখে লুটাইতেছে। একটি চওড়া লাল পাড় শাড়ী পরিধানে, হাতে পুরাতন কাঁচের চুড়ি। সোণার চুড়িটি খুলিয়া রাখা হইয়াছে, চুড়ির জন্যে মা তালির প্রতি একান্ত বিমুখ।

চতুর্দ্দিক হইতে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতে লাগিল। নবীন বসন পরা বালক বালিকার কলহাস্তে কলরবে পথ ঘাট মুখর হইয়া উঠিল।

এমন সময় ব্যস্তভাবে শ্যামসুন্দর আসিয়া স্ত্রীকে ডাকিলেন "ওগো, শিগগীর এস, আমাদের হব বেয়াইয়ের সঙ্গে গোলকপুরের জমিদারণী এসেচেন। বেয়াই পুরানো বিশ্বাসী লোক ওঁরা বড্ড ভালবাসেন, সেই জন্তেই বোধহয় সুলতাকে দেখে আশীর্ব্বাদ করতে এসেচেন। সুলতার চুল টুল ত বাঁধা হয়েচে? তালি কোথা? দাওয়ায় নতুন পাটীখানা পেতে রাখুক। তুমি চল, জমিদারণীকে পাল্কী থেকে নাবিয়ে আনবে।"

মা সহাস নয়নে সুলতার আপাদ মস্তকে চক্ষু বুলাইয়া স্বামীর অনুসরণ করিলেন।

শুভ্রবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া এক শান্ত বদনা, শান্তনয়না বিধবা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বিধবা পাটীর কোণে উপবেশন করিয়া মাকে জিজ্ঞাসিলেন "আপনার, মেয়ের নাম তমাল লতা, তালি—না?"

মা বলিলেন "ছোট মেয়ের নাম তালি, বড় সুলতাই আপনাদের নায়েব মশায়ের বৌ হতে যাচ্ছে। সুলতা এদিকে আয়, প্রণাম কর।"

সলজ্জ স্মিত হাস্যে সুলতা মায়ের আদেশ পালন করিল।

বিধবা তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদান্তে কহিলেন, "আপনার তালিকে একটু ডাকুন আমি তাকে দেখতেই এসেছি। শুধু দেখা নয়, আপনাদের কাছে আমার একটা প্রার্থনাও আছে। জানেন তো গোলকপুরের ওরা বসু বংশ, আপনাদের স্বঘর। আমার ছেলে প্রবীর গোলকপুরের জমিদার, প্রবীরের লেখাপড়ার জন্তেই এতদিন আমরা বিদেশে ছিলাম, তার পড়াশোনা শেষ হয়ে গেছে, অল্পদিন হল আমরা দেশে এসেছি।"

মা বিধবার বাক্যের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। তাঁর হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি তালিকে ডাকিলেন।

চুণ খয়েরে রঞ্জিত হাত অঞ্চলে মুছিতে মুছিতে তালি আসিয়া নবাগতার সামনে ভূমিষ্ঠ হইতেই তিনি তাকে কোলে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তুমি তালি তমাল লতা? বন্যায় সর্ব্বস্বান্তদের জন্তে এ-চুড়িগাছা প্রবীরকে দিয়েছিলে? যাকে দিয়েছিলে সে তোমার হয়ে সেখানে সাহায্য পাঠিয়েচে। তোমার চুড়ি তুমি নাও মা, প্রবীর আমায় পরদুঃখে কাতর, পরের সেবা করবে বলে বিয়ে করতে চায় নি, তোমাকে দেখে তার মতের পরিবর্ত্তন হয়েচে। আমি তোমাকে প্রবীরের কাছে চিরজীবনের মত নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে এসেচি। গোলকপুরে যেয়ে তোমাকে পরের কাজ নিতে হবে তালি।" বলিয়া বিধবা তালির কম্পিত হস্তে দুইটী হীরার বালা পরাইয়া দিলেন।

মার চক্ষে ধারা ছুটিল, কাহাকে তিনি লক্ষ্মীছাড়া, উড়নচণ্ডী বলিয়া গালি দিয়াছিলেন? যাহাদের নিমিত্ত কুবাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাদেরই সংমিলিত শুভকামনা ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ তাঁহার দুঃখিনী তালিকে আজ সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে তুলিয়া দিতে আসিয়াছে।

পথ প্রান্তে

—গল্প—

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

[ব্রততী শিক্ষিতা মেয়ে—বি-এ পাশ। পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই তাহার বিবাহ স্থির—কিন্তু এমন সময় সে খবর পাইল তাহার মাতা মৃতা নহে জীবিতা এবং পতিতা। এখন সে কি করিবে—এই সমস্যাটা লইয়াই খ্যাতনামা লেখিকা প্রভা সরস্বতী এই 'পথ প্রান্তে' গল্পটি লিখিয়াছেন। আশাকরি পাঠক-পাঠিকারা গল্পটি পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।]

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের মাথার উপরে শুক্লা পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদখানা সরু রেখার মতই ভেসে উঠেছিল। তার কোলের কাছে জেগেছিল একটী তারা, সেটাও ঠিক চাঁদের মতই জল জল করে জলছিল।

তারই ছায়া পড়েছিল সামনের কালো জলে—কেবল চাঁদের নয়, তারার, পাশের ফুলগাছ গুলিরও।

বাগানের মধ্যে আলো জলছে না, একটু আগে ঘণ্টাধ্বনি থেমে গেছে, দলে দলে—যারা বাগানের মধ্যে ছিল তারা বার হয়ে পড়েছে।

ব্রততীও বার হয়ে এলো—

মুখখানা তার তখনও বিবর্ণ হয়ে রয়েছে। দেড়ঘণ্টা সে একটা গাছতলায় বেঞ্চের উপরে একা বসিয়ে কাটিয়েছে, কেবল ভেবেছে এখন সে কি করবে।

জন কোলাহল তার ভালো লাগেনি, বোর্ডিংয়ে কাউকে সে বলেনি কোথায় যাচ্ছে। দুপুরে কথা হয়েছিল নীলাকে সঙ্গে নিয়ে সে ভবানীপুরে যাবে তার কোনও বন্ধুর বাড়ীতে, কিন্তু বিকালের ডাকে একখানা পত্র পেয়ে সে একেবারে মুসড়ে পড়েছে।

সে পত্র এখনও তার ব্লাউসের ফাঁকে রয়েছে, একটু নড়তে চড়তে খড়্ খড় করে উঠে নিজের অস্তিত্ব জানাচ্ছে,—বলছে—"আমি আছি, আমি আছি।"

বোর্ডিংয়ে অত মেয়ের মাঝখানে পত্রখানা ভালো করে পড়াও হয় নি, সেই জন্যই সে পত্র নিয়ে পালিয়ে এসেছে এইখানে। ওই বেঞ্চটায় বসে সে দেড়ঘণ্টা ধরে সেই পত্র দেখেছে। পড়েছে কি? না, কেবল সে চোখ বুলিয়েছে। এক একটা অক্ষরের উপর চোখ রেখে সে আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

—চোখে জলছিল আগুন, জল ঝরলে ভাল হতো, কিন্তু জল আসেনি বুকের আগুনের শিখা এসে পড়েছে তার চোখে। মুখে[র] উপরে ক্লান্তির ভাব ফুটে উঠলেও চোখ দুটি তা[র] অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।—

অথচ পথ সে এখনও পায় নি, আলো সে এখন[ও] দেখে নি, সে যেমন অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে পড়েছি[ল] তেমনই অন্ধকারে ছিল।

কত দিন কত রাত চলে যাবে, সে দীর্ঘকাল এ[ই] অন্ধকারেই পড়ে থাকবে।

প্রাণ তার হাঁপিয়ে উঠছে এই ভীষণ অন্ধকার দেখে তাহার ক্ষীণ দুটি বাহু এ অন্ধকারের জাল ছিঁড়তে পার[বে] কি?

শ্রাবণের পরিষ্কার নীল আকাশের বুকে হু হু করে একখানা কালো মেঘ এসে পড়ে চাঁদের সৌন্দর্য্য একেবারে লোপ করে দিল। সেই আকাশের পানে চেয়ে ব্রততী ভাবছিল তার চিত্তাকাশও ছিল নির্ম্মল নীল, এই পত্রখান[া] কালো মেঘের মতই এসে পড়েছে। আকাশের মেঘ সরে যাবে, আবার চাঁদ সূর্য্য উঠবে, কিন্তু তার অন্তরে আজ যে কালো মেঘের সঞ্চার হল, এ দিন দিন ঘন হতে ঘনত[র] হবে, পাতলা কোনদিন হবে না, মিলিয়েও যাবে না।

মানুষ সব হারিয়ে যেমন করে ফিরে আসে সে ফিরল ঠিক তেমনি ভাবে।—

তার মা—

হ্যাঁ, এই পত্রখানা তার মায়ের অনেক খবর বয়ে এনেছে।

সে জেনেছে—তার মা মরেন নি, তিনি এখন[ও] বেঁচে আছেন, এই কলকাতাতেই তিনি রয়েছেন সে যদি ইচ্ছা করে তার মাকে সে দেখতে পারে।

কি ভয়ানক কথা।

কোন সন্তানের না মায়ের বুকে ছুটে যাওয়ার ইচ্ছা হয়, কোন সন্তান না মাকে ডাকতে চায়? যে মায়ের নাম করতে সন্তানের অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে, ব্রততীর মা— সে আজও আছে, বেঁচে আছে—এখানেই আছে।

কিন্তু মা বলে ডাকতে গিয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে কেন—?

ব্রততীর সেই মা—সে আজ কোথায়? সেখানে যাওয়ার কথা ভাবতে গেলেও ঘৃণায় ব্রততীর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বোর্ডিংয়ে ফিরতেই নীলা এসে চেপে ধরলে—"বেশ আক্কেল ব্রততী, তোর সঙ্গে যাব বলে ঠিক হয়ে রয়েছি, আর তুই কিনা সোজা একা পিঠটান দিলি—?"

তার পরই ব্রততীর মুখের পানে চেয়ে সে বললে, তোর অসুখ হয়েচে নাকি, মুখ চোখ কি রকম দেখাচ্ছে যে।"

জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে ব্রততী বললে, "না, স্পষ্ট অসুখ নয়, তবে শরীরটা একটু খারাপ করছে বটে। ঘণ্টাখানেক চুপ করে শুয়ে থাকলেই এ ভাবটা কেটে যাবে।"

নীলা নিজেই তার বিছানা ঠিক করে দিয়ে বললে "তুই খানিকটা ঘুমো ভাই, আমি বাতাস করি।"

তার হাত হতে পাখাখানা কেড়ে নিয়ে ব্রততী বললে, "তোর নিজের কাজ কর গিয়ে নীলা, আমায় বাতাস করার কোন দরকার নেই, বাতাস না করলেও আমি ঘুমাতে পারব জানিস।"

নীলা রাগ করে চলে গেল,—

একটু পরেই সে আবার ফিরে এল, বললে, "তুই আসবার খানিক আগে জিতেনদা এসেছিলেন—"

অকস্মাৎ যেন ব্রততী চমকে উঠল—

"—মিঃ রায়—তিনি এসেছিলেন?"

নীলা হাসি টিপে বললে, "তোমার জন্যে পাকা আধ-ঘণ্টা অপেক্ষা করে শেষে চলে গেলেন।"

ব্রততী আর একটীও কথা বললেন না, বালিশের মধ্যে মুখখানা গুঁজে পড়ে রইল। অনেকক্ষণ চুপ করে পাশে বসে থেকে নীলা উঠল, সে ভেবেছিল ব্রততী ঘুমিয়ে পড়েছে।

× × ×

মিঃ রায় বা জিতেন রায়ের সঙ্গে ব্রততীর বিয়ের কথা ঠিক হয়ে রয়েছে; বি, এ, একজামিনের খবরটা বার হলেই বিয়ে হবে।

সঙ্গিনীদের আনন্দ বড় কম হয় নি, তারা নিমন্ত্রণ খাবে তাদের বন্ধুর বিয়ের;—তারা তাদের সঙ্গিনীকে সাজিয়ে দেবে, বিয়ের রাত্রে কত আনন্দ করবে।

নীলার জিতেন দা,—তার মাসতুতো ভাই। নীলাই মাঝখান হতে কথাটা তুলেছে, মাসিমা মেসোমশাই:কে রাজি পর্য্যন্ত করিয়েছে।

এখন কেবল বিয়েটা হলেই হয়।—

একজামিন শেষ হয়ে গেছে, খবরও দুই এক-দিনের মধ্যে বার হবে। এই দুই এক দিনটা যদি কোন-রকমে হাত দিয়ে সরিয়ে দেওয়া যেত, নীলা তা দিত।

সেদিন বেড়াতে গিয়ে সে কোথায় কি খবর পেয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বোর্ডিংয়ে ফিরল, আনন্দে মুখখানা তার অতি উজ্জ্বল—।

ছুটে গিয়ে ব্রততীকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরে সে বলে উঠল—"আমায় কি খাওয়াবি বল দেখি, ভয়ঙ্কর একটা সুখবর এনেছি, এটার সঙ্গে সঙ্গে আর একটাও মিলে যাবে।"

"ব্রততী একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল কেন তা নীলা বুঝতে পারলে না।

ব্রততী জিজ্ঞাসা করলে, "কি খবর আগে সেইটাই বল শুনি, আর একটা খবর পরে হবে এখন।"

নীলা হেসে উঠে তার গালে একটা টোকা দিয়ে বললে, "মাইরি, পরের খবরটার জন্যে এদিকে প্রাণ হাঁফাচ্ছে, তবু কি রকম কঠোর ঔদাসীন্য। সত্যি কথা বলি শোন—তুই পাশ হয়েছিস—একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট। জিতেনদাকে খবর দেই বিয়ের যোগাড় করুক, সামনে যে দিন আছে সেই দিনেই বিয়েটা হয়ে যাক।"

ব্রততী চুপ করে রইল, একটু আনন্দের চিহ্নও তার মুখে ফুটল না।

নীলা অবাক হয়ে গেল, বললে,—"কি রকম একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেলি যে—"

ব্রততী জোর করে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বললে, "ভাবছি এবার এম, এ, পড়তে হবে।"

নীলা বললে, "বিয়ের পরে পড়বি তো, এখন আগে সেই কাজটা সারা হয়ে যাক্ তো।"

ব্রততী হেসে উঠল,—"বিয়ে মানে? বিয়ে তো এখন করব না, এরপর ভেবে চিন্তে দেখা যাবে।"

নীলা বললে,—"তার মানে—?"

ব্রততী জোর করে বললে, "সত্যি এখন বিয়ে করব না নীলা। সময় যথেষ্ট পড়ে আছে, আমার কতকগুলো কথাও আছে। সময় আসুক, যিনি আমার সব কথা শুনে আমার বিয়ে করতে রাজি হবেন তাঁকেই বিয়ে করব।"

নীলা হেসে বললে, "রাজকুমারীর আবার কিসের পণ শুনি? সেকালের রাজকুমারীরাই তো এমনি সব পণ করিতেন, এ কালের কুমারীরা যদি এমনি পণ করে বসেন, তা হলেই না মুস্কিল। হয়তো বলে বসবে—সাতসমুদ্দুর তের নদীর ওপারে কোথায় রক্তকমল ফুটে আছে,—আনতে হবে; নয়তো বলবে—দুধসমুদ্রে দুধহাতীর মাথায় গজমতি আছে, সেটা এনে দিতে হবে,—"

বাধা দিয়ে ব্রততী বললে, "অবশ্য সে রকম পণ তারাও ভালো ছিল—পুরুষে বীরত্বের পরিচয় দিয়ে মেয়েদের বিয়ে করতে পারত। কিন্তু রক্ষা কোর, আমার সে বীরত্বের পরিচয়ে লাভ নেই, মনের উদারতার পরিচয়টুকু পেলেই যথেষ্ট মনে করব, চাই ও শুধু তাই। থাক্ সে কথা—যখন সেদিন আসবে তখন সে বিষয় বিবেচনা করব।"

সে হঠাৎ উঠে এমনভাবে ঘর হতে বার হয়ে গেল যাতে নীলা সত্যিই একেবারে অবাক হয়ে গেল—ব্রততীর [illegible]

একজামিনের ফল বার হলে দেখা গেল ব্রততী সত্যই ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছে। ব্রততীর মুখে কেবল মলিন একটু হাসির রেখা ভেসে উঠল।

যে দিন নীলার সঙ্গে তার কথা হয়েছিল সেইদিনই সে রংপুরে বাপের কাছে চলে এসেছে।

বাপ ব্রজমাধব বাবু রংপুর কোর্টের উকিল। একটী মাত্র মেয়ে ছাড়া জগতে তাঁর আর কেহই ছিল না। বাপের স্নেহ মায়ের ভালোবাসা দিয়ে মেয়েটিকে তিনি এত বড় করে তুলেছেন—তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত পাত্রের হাতে সমর্পণ করতে পারলেই তাঁর কর্ত্তব্য শেষ হয়।

ব্রততীর পাসের খবর পেয়ে তিনি খুব বিরাট ভাবেই একটা ভোজের অনুষ্ঠান করতে চাচ্ছিলেন—কিন্তু ব্রততী কঠিন মুখে নিষেধ করলে—

ব্রজমাধব বাবু অসহায়ভাবে মাথা চুলকিয়ে বললেন, "কিন্তু সবাই যে ধরেছে মা—।"

কঠিন মুখেই ব্রততী বললে, "সবাই ধরলেই কি তাই করতে হবে বাবা? আমার মনে হয়,—সবার সামনে অতটা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার চাইতে আমার অতি গোপনে থাকাই ভালো। সেই জন্যেই আমি কারও সামনে প্রকাশ হতে চাইনে বাবা, আমি লুকিয়ে থাকতে চাই।"

বাপের মুখখানা হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল, চাঁফিয়ে উঠে তিনি বললেন, "তুই বলছিস কি ব্রতী—?

ব্রততী পাংশুমুখে বললে, "আমার চেয়ে তুমিই তা সব ভালো জানো বাবা। আমার মত মেয়ে—যার মা—"

ব্রজমাধব বাবু দুইহাতে মুখ ঢাকলেন—"থাম—থাম ব্রতী এ সব কথা তোকে বললে কে—শুনালে কে—? না না, এ সব মিছে কথা—সব মিছে কথা; তোর মা মরে গেছে, সত্যি মরে গেছে।"

ব্রততী হাসলে, বললে, "না বাবা, মরে নি, আজও সে বেঁচে আছে, সে ভবানীপুরে রয়েছে। বিশ্বাস কর, আমি সে বাড়ী দেখেছি, আমি তাকেও দেখেছি।"

ব্রজমাধব বাবু দুইহাতের মধ্যে মুখ ঢেকে রইলেন,—

ব্রততী বাক্স খুলে অনেকদিন আগে পাওয়া পত্রখানা তাঁর সামনে রেখে বললে "পড়ে দেখ বাবা, এই পত্র-

খানাই তার পরিচয় আমায় দিয়েছে, আমার সব ইনি-য়েছে, আমি—”বলতে বলতে হঠাৎ সে স্তব্ধ হয়ে গেল।

মুখ হতে হাত সরিয়ে ব্রজমাধব বাবু তার পানে চাইলেন—“কিন্তু আমি যে তোর বিয়ের সব ঠিক করেছি ব্রতি, জিতেন যে আসছে শিগগিরই।”

ব্রততী শুষ্ককণ্ঠে বললে, “তিনি আসুন, আমি নিজেই তাঁকে সব কথা খুলে বলব।”

একটা নিঃশ্বাস ফেলে ব্রজমাধব বাবু বললেন, “পারবি ব্রতি? নিজের মায়ের কলঙ্কের কথা তাকে নিজের মুখে বলতে পারবি?”

ব্রততী একটু হাসলে—

“পারতেই হবে বাবা, না পারা ছাড়া আর উপায় কই? আমার সর্ব্বস্ব গেছে, তাঁর শান্তি সুখ কেন নষ্ট করব? আমায় বিয়ে করার ফলে তাঁকে অশান্তি সইতে হবে,—কেন? এর প্রতিবিধানের ভার তো আমার হাতেই আছে, আমি তাঁকে রক্ষা করব।”

× × ×

নীলা কেবল একটা নিঃশ্বাস ফেললে ব্রততী বললে, “আমি তোর দাদাকে সব বলেছি নীলা,—আমি জানিয়েছি এ রকম অবস্থায় আমি বিয়ে করব না।”

নীলা একটু হাসবার চেষ্টা করলে।

কলঙ্কিনী মায়ের সন্তান।—

কিন্তু পাঁকে ও তো পদ্ম ফোটে। যে নারীর গর্ভে সে ছিল, সে তো কলঙ্কিনী ছিল না—সে ছিল স্ত্রী, সংসারের সাম্রাজ্ঞী।—

পাঁকের পদ্মে ও তো দেবপূজা চলে—।

জিতেন অসঙ্কোচে ব্রজমাধবের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলে—।

ব্রজমাধব মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, “মত আমি দিতে পারব না জিতেন,—মত দেবে সে, তুমি তার কাছে মত চেয়ে দেখ।”

জিতেন বললে, “তবু আপনি একবার বলুন।”

মলিন হাসি হেসে ব্রজমাধব বাবু বললেন, “আমার মত যদি চাও, আমার মত আছে। ওবে সন্ন্যাসিনীর মত জীবন যাপন করবে তা আমি কোনদিনই চাই নে, কোন বাপেই তা চায় না।”

ব্রততী যেন পাথর হয়ে গেল।

জিতেনের কথার উত্তরে সে গভীর ভাবে কেবল জানায়—এ হতে পারে না। লোকের কাছে এমন ভাবে আমি প্রকাশ হতে পারব না; তোমাকেও সকলের কাছে হেয় করতে পারব না।”

জিতেন বললে, “আমি বলছি ব্রতী, এতে আমার হেয় হতে হবে না। যে ফুল পাঁকে পড়ে আছে, পাঁকে নেমে তাকে তুলে এনে যদি দেবতার পায়ে অর্পণ করতে পারি,—আমার সে গৌরবকে তুমি ক্ষুণ্ণ করো না, আমায় ওইটুকু সার্থকতা লাভ করতে দিয়ো।—”

ব্রততী দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকলে; তার চোখের জল আঙুলের ফাঁক দিয়ে কেবল ঝরে ঝরে পড়তে লাগল।—

× × ×

ভিতর বাড়ী আনন্দে উচ্ছ্বসিত—

সম্প্রদান শেষ করে ব্রজমাধব বাবু বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়ালেন।—

লোকের ভিড়ে, কাজের গোলে তিনি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন, নিজের জ্ঞান তিনি নির্জ্জনে থেকে ফিরিয়ে আনতে চান।—

শান্ত রাত্রি, জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল,—

আকাশ চাঁদের আলোয় ভরে গেছে, পৃথিবী চাঁদের আলোয় শুভ্র হয়ে উঠেছে। কপালের ঘাম মুছে ফেলে ব্রজমাধব বাবু আকাশের পানে চেয়ে রইলেন।

কতক্ষণ পরে চোখ নামাতেই দৃষ্টি পড়ল সামনে, একেবারে পায়ের কাছে। কে একটী মেয়ে তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়েছে।

দু পা পেছিয়ে গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “কে—কে তুমি—?”

মেয়েটী মুখ উঁচু করলে,—“আমি ছায়া।”

“ছায়া—?”

ব্রজমাধব বাবুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল—“তুমি আবার এখানে কি করতে এসেছ? তোমায় মিনতি করছি—

তুমি চলে যাও এখান হতে, কেউ যেন না জানতে পারে তুমি এসেছ।"

মেয়েটী উঠে দাঁড়াল, স্থির কণ্ঠে বললে, "আমি চলেই যাব, কেবল ওদের একবার দেখতে এসেছি, একটু দেখেই চলে যাব।"

ব্রজমাধব বাবু হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন,

"না, যাকে একবছরেরটী ফেলে রেখে চলে গেছ, সে আজও তোমার কেউ নয়—সে একা আমার। তুমি চলে যাও, জেনে যাও—সে তোমায় ঘৃণা করে। তোমার জন্যই সে বিয়ে করছিল না; আজ যদিও তার বিয়ে হয়েছে, তবু তোমার মেয়ে নামে পরিচিত হওয়ার আগে এই মুহূর্ত্তে সে বিষ খাবে।"

মেয়েটী আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আমার যৌতুকও সে নেবে না?"

মলিন হেসে ব্রজমাধব বাবু বললেন, "তুমি তার কাছে পর—মৃত। কোন অধিকারে তাকে যৌতুক দেবে শুনি—?"

"অধিকার—"

মেয়েটী তাঁর পায়ের পরে লুটিয়ে পড়ল, আর্ত্তকণ্ঠে বললে, "অধিকার আমার নেই জানি, তবু তোমায় অনুরোধ করছি। আমি তার কাছে যাব না, তুমি আমার এই যৌতুক তাকে তোমার নাম করেই দিয়ো।"

একখানা কাগজ সে ব্রজমাধব বাবুর পায়ের পরে রাখলে,—

বিস্মিত ব্রজমাধব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি এখানা?"

শান্তকণ্ঠে সে উত্তর দিলে—"আমার দানপত্র। সব কিছু আমার মেয়ে জামাইকে দিয়ে গেলাম। ওরা জানুক—আমি নেই আমি মরে গেছি, আমার যা কিছু তোমার হাত দিয়ে ওরাই পাক।"

ধীরে ধীরে সে চলতে লাগল—

জ্যোৎস্নার আলোর ভিতর দিয়ে চলতে চলতে কোথায় অন্ধকারের মধ্যে সে মিলিয়ে গেল কে জানে।

ব্রজমাধব বাবু নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। জ্যোৎস্নার মায়া বলেই ভুল হতো যদি হাতে তারই দেওয়া দানপত্র না থাকত। কেবল সেই কাগজখানাই প্রমাণ দিচ্ছিল এক জন যে মুহূর্ত্তের জন্যে মুহূর্ত্তের ভুলে অধিকারের দাবি নিয়ে এসেছিল, একদিন সত্যই তার এ দাবি ছিল, আজ সে দাবি সে হারিয়ে ফেলেছে।

"তাজ"

শ্রীকনা দেবী

যমুনার তীরে পাষাণ প্রাসাদে
অপরূপ হেরি ছবি
শ্বেত মর্ম্মরে কনকের রেখা
ধীরে ডুবে যায় রবি।
পাষাণে গঠিতা লাবণ্য লতিকা
প্রেমের সমাধি-তাজ
যুগ যুগান্তের অতুল মহিমা
শত বিরহী-রাজ।
মরণ শাসন বিশ্ব ভুবনে
স্মরণ করেছে সব

মমতাজ তব প্রিয়তম সনে
মিলন নিখিলময়।
স্নিগ্ধ শীতল যমুনা কিনারে
শেষের শয়ন তব,
রূপসী তোমার অনুপম রূপ
রচিল কে অভিনব।
ফুল মালা আর অঞ্জলি ঢালি
প্রেমের তীর্থ তলে,
শিল্প সাধনা সার্থক করি
ভুবন মোহিনী এলে।

আগ্নেয় গিরি

শ্রীবাণী দেবী

[আশার বিবাহের সব স্থির ছিল অসিতের সঙ্গে—কিন্তু শেষকালে অসিত আশার চেয়েও সুন্দরী অন্য মেয়েকে বেশী পণ পাইয়া বিবাহ করিল। আশাকে সহ্য করিতে হইল—কারণ বাংলার মেয়ের এ-প্রত্যাখ্যান সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই। পাঁচ ছ'বছর পরে—আশার সঙ্গে অসিতের আবার দেখা। আশা তখন বিবাহিতা—পরের প্রেয়সী। কিন্তু অসিত তখন যেন আবার তাহাকে চাহে—এই অবস্থায় আশা কি করিল—অসিতেরই বা কি অবস্থা হইল সুলেখিকা বাণী রায়—'আগ্নেয় গিরিতে তাহারই উজ্জ্বল বাস্তব চিত্র দিয়াছেন। আশাকরি পাঠক-পাঠিকারা গল্পটি পড়িয়া খুসী হইবেন।]

প্রেমাস্পদের পরিণয় পত্র হাতে পাইয়া আশা আর্ত্ত চীৎকার করিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল না। কিংবা অতি আধুনিকা মেয়ের মত বামহাতে ললাট চাপিয়া "নিষ্ঠুর!" বলিয়া অর্দ্ধোক্তিও করিল না। তাহার স্বভাবের মেয়ের পক্ষে নীরব ব্যথায় ঘরে দরজা দেওয়া উচিত ছিল, সে তাহাও দিলনা। অধরে ওষ্ঠ চাপিয়া মায়ের পাশ হইতে উঠিয়া জানালার সামনে দাঁড়াইল। সরু রেখার মত রাস্তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইল এই নিমন্ত্রণ পত্রখানা হাতে পাইবার আগেই পৃথিবীর বর্ষাস্নাত রূপটি যেন আরো একটু মনোহর ছিল আর তাহার জীবন যেন আরো একটু পূর্ণ ছিল।

আশার মা চিঠিখানা হাতে চাপিয়া সভয়ে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। বর্ত্তমানের বাজারে অসিতের মত পাত্র হাতছাড়া হইয়া যাওয়া যে কত বড় কথা তাহা অরক্ষণীয়া মেয়ের মা'রাই বোঝেন ভালো। কিন্তু কন্যাদায়ের চিন্তা অপেক্ষা আশার মা'র মনে মেয়ের চিন্তাই বেশী উদিত হইল। আশা যে তাহার তরুণ হৃদয়ের সমস্তখানি এই প্রবঞ্চকের হাতে দিয়া রাখিয়াছিল তাহা কে না জানে।

আশার রূপ ছিলনা সত্য কিন্তু তাহার কি গুণের অভাব ছিল? বসন্তের বরে তাহার তনুবল্লরী নব পুষ্পশোভায় বিকচ হইয়া না উঠিলেও তাহার শরীরকে তনুবল্লরী বলা যাইত। লেখাপড়া। সতের বছর বয়সে যতটা জানা দরকার সে তাহার অনেক বেশী শিখিয়াছিল। সুধী-ব্যক্তিদের সহিত কথাবার্ত্তায় তাহার শাণিত সহজ বুদ্ধি জলিয়া উঠিত। তাহার সুবিন্যস্ত বাক্যাবলী পুরুষের মনে সম্ভ্রমেরই উদ্রেক করিত। গান বাজনা! হ্যাঁ, তাহাও আশা জানিত। মোটামুটী মিষ্টস্বরে নজরুলের কয়েকটি গানও গাহিত বেশ। লোকে একবার শুনিলে আর একবার শুনিতে চাহিত। শিল্পকার্য্যের নিদর্শন স্বরূপ তাহার মায়ের ঘরে একখানি কার্পেটে বোনা রাধাকৃষ্ণের যুগ্মরূপ টাঙানো ছিল, আর নীচে বসিবার ঘরে দেওয়াল আলমারীর পাশে একখানি পেন্সিলে আঁকা ছবি ঝুলিত, নীচে মেয়েলী হাতে লেখা 'নদীতে ঝড়—আশা।'

ইহা ভিন্ন আশার আর একটি অনন্য সাধারণ শক্তি ছিল। কিন্তু তাহার কথা বড় বেশী কেহ জানিত না। কারণ চিত্র বা সূচীশিল্পের মত তাহা দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখা যায়না, গানের মত কণ্ঠে করিয়া বহা যায়না। আশা কাব্যচর্চ্চা করিত। তাহার ড্রয়ারের কোণে একখানা নীল মলাটের খাতা ছিল, তাহাতে তরুণ কবি তাহার অনেক মনোভাবই ধরিয়া রাখিত।

আশার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাহার উপর সহানুভূতির উদ্রেক করিবার জন্য দেওয়া হইল না, দেওয়া হইল অসিতের বুদ্ধিহীনতা প্রমাণ করিবার জন্য। এইতো দুইমাস পূর্ব্বেও আশাকে অসিত কথায় কথায় বলিয়াছিল "সত্যি আশা! এতো মেয়ে দেখলাম, কিন্তু তোমার মত— তোমার মত এত গুণ, এমন সরস মন, বুদ্ধির বিকাশ আর কারো দেখিনি।"

আশার কোমলচিত্তও সেদিন অনেক আশায়ই উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল এবং নিজের বিষয়ে বিশ্বাস হইয়াছিল তবে সে নিতান্ত 'পাঁচী পাঁচী' নহে। তাহার বাস্তবিক কিছুমাত্র বিশিষ্টতা আছে।

প্রেম বলিতে আশা কেবল অসিতকেই বুঝিত। পৃথিবীর সম্রাট আসিলেও তিনি তাহার চক্ষে অসিতের অপেক্ষা হেয় হইতেন সন্দেহ নাই। যেদিন আশা অসিতের পদশব্দ শুনিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল যেন তাহার বক্ষের উত্থান পতন একটু দ্রুতগতি লাভ করিয়াছে সেদিন নিঃসংশয়ে নানা অধীত পুস্তকের সহিত মিলাইয়া সে বুঝিল যে সে ভাল বাসিয়াছে। তাহার পর সুরু হইল তরুণ মনের নীরব পূজা। পূজা বলিলেই বুঝায় যে একটা কিছু ব্যাপার সত্যসত্যই ঘটিয়াছে। মানুষ যেখানে প্রণয়াস্পদের যোগ্যতা বিচার না করিয়া ভালবাসে সেখানে ভালবাসা নদীর স্রোতের মত উত্তাল হইতে পারে কিন্তু তাহা নদীর স্রোতের মতই ক্ষণস্থায়ি। কিন্তু সকল যোগ্যতা বিচার করিয়া শ্রদ্ধার সহিত যে ভালবাসা জন্মগ্রহণ করে তাহা স্বভাবতঃ গভীর, আঘাত ও অদর্শন সহ্য করিয়াও বাঁচিতে পারে। আশার প্রেম এই শ্রেণীর, তাই সে সহজে অসিতকে ভুলিতে পারিল না। তাহাকে ক্ষমা করিয়াও একটা মৃদু আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ করিতে পারিলনা।

দিন চলিয়া যায়। অসিত বিবাহ করিয়াছে। যাহা আশা ও আশার পিতা তাহাকে দিতে পারিতেন না তাহা সে পাইয়াছে। রূপ ও রৌপ্য! কিন্তু আশারও পাত্রের অভাব হইল না। একদিন 'নব-কাঞ্চনে' শ্রীপতির সহিত ভূপেন হালদারের কনিষ্ঠা কন্যা আশাদেবীর শুভ উদ্বাহ ক্রিয়া হইয়া গেল।

এইখানে কল্পনা করা যাক সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতীতের খাতায় নাম লিখাইয়াছে। আশার ও শ্রীপতির দুধ্বাত্রায় নিয়মিত চিত্র অঙ্কন করিয়া রসভঙ্গ করিবার ইচ্ছা নাই। তবে শ্রীপতি অসিতের মত রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ না হইলেও সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয় স্বামী। তাই তাহাকে পাইয়া আশা সুখী হইয়াছিল। হয়তো তাহার কিশোর জীবনে একজনের নিদারুণ অবহেলা যৌবনের প্রারম্ভে আর একজনের স্নেহের প্রলেপে মুছিয়া গিয়াছিল।

ইতিমধ্যে বলা কর্তব্য বঙ্গ সাহিত্যে শ্রীমতী আশাদেবী একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। তার প্রতিটি [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] আশার রচনাবলী বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত হইতেছে।

আশার স্বামী শ্রীপতি দেওঘরে বদলি হইয়াছে তাই এবার সেখানকার সাহিত্য সম্মেলনে আশা সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

সভানেত্রীর অভিভাষণের পর সম্মান হইয়া আশা চাহিয়া দেখিল কোণের একটি আসন হইতে এক রূপবান যুবক তাহার দিকে চাহিয়া আছে। নয়নের নীরব পূজা পাইয়া আশার নূতনত্ব বোধ করিবার কিছুই ছিলনা, আজকাল সে ইহাতে অভ্যস্ত। কিন্তু লোকটির দৃষ্টি ও আকৃতি যেন কাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আশার হৃদয় নিকুঞ্জের প্রথম পুষ্প যেন ইহারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইয়াছিল! সে কতদিন আগে! আশা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিল।

সভা শেষ হইয়া গিয়াছে। আশা ভাবকবৃন্দ পরিবৃত হইয়া শ্রীপতির পশ্চাৎ তাহার গাড়ীতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। তাহার পশ্চাৎ হইতে অসিত ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া ডাকিল "আশা!" আশা মুখ ফিরাইয়া তাহার স্বাভাবিক মধুর হাস্যের সহিত অতি স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, "আপনি? অসিতদা? সত্যি এখানে আপনাকে দেখতে পাবার আশা করিনি। কতদিন পরে!" যেন কখনও আশা অসিতকে ভালবাসে নাই, যেন অসিত তাহাকে অবহেলা করিয়া ত্যাগ করিয়া যায় নাই! যেন আশা তাহার প্রথম জীবনের সে অপমান নিঃশেষে ভুলিয়া গিয়াছে!

নানা কথার পর আশা স্বামীর সহিত অসিতের পরিচয় করিয়া দিয়া তাহাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় হইল।

আশার সুন্দর বাগান দেওয়া সরকারী বাসার হাতার সম্মুখে আসিয়া অসিত মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া রহিল। অতি সুললিত মহিলা কণ্ঠে গীত হইতেছে—

"কেউ ভোলেনা কেউ ভোলে অতীত দিনের স্মৃতি—"

আশার গলা এতো ভাল হইয়াছে! অসিত একটুকরা কাগজে নিজের নাম লিখিয়া চাকরের হাতে দিয়া সুসজ্জিত বসিবার ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

[illegible] আশার শান্ত মূর্ত্তি, [illegible] [illegible] অসিত

দেখিয়াছিল। আজ যখন আশা ঘরে প্রবেশ করিল তখন কিয়ৎক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে অসিত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

আশার পরিধানে নীলাভ সূক্ষ্মবস্ত্র, জড়ীর পাড় বসানো। গায়ে হাতাশূন্য পাতলা কিংখাপের জামা। যে ভীরু বালিকা অসিতের দৃষ্টির সম্মুখে সলাজ নয়ন নত করিয়া থাকিত আজ কোন যাদুমন্ত্রে সে এই লীলাময়ী তরুণীতে রূপান্তরিত হইয়াছে! আশাকে রূপহীনা বলিবার পথ আর কোথায়?

ইতস্তত কথার পর আশা জিজ্ঞাসা করিল "বৌদিকে আনেন নি?"

অসিতের কর্ণপ্রদেশ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। একটু অস্পষ্ট গলায় সে বলিল "তাকে আনা সম্ভব নয়।"

তাহার স্ত্রী! অশিক্ষিতা, যৌবনে স্থবিরা। একদিন যে কিশোরীকে সে প্রত্যাখান করিয়াছিল আজ চিত্ত তাহারই প্রসাদভিখারী হইতে চায়। জ্ঞানে, গৌরবে আজ আশা শীর্ষস্থানীয়া। স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিতে তাহার স্বামীর কি আনন্দ হয়!

সহজভাবে আশা কথা বলিতে লাগিল। নিজের কথা, স্বামীর কথা। বোধহয় কৈশোরে তাহার আকাশে যে বজ্রপাত হইয়াছিল যৌবনে তাহার কোনও মালিন্যের চিহ্ন নাই। সুন্দর, নির্ম্মল গগনে বর্ষণঅন্তে ইন্দ্রধনু উঠিয়াছে।

সে দিন বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে অসিত নিশ্বাস ফেলিল। আশার আতিথ্য অপূর্ব্ব। তাহার স্বহস্ত প্রস্তুত খাদ্যে তাহার রসনার তৃপ্তি হইয়াছে। তাহার সুমধুর সঙ্গীতে তাহার শ্রবণ পরিতৃপ্ত। আর নয়ন তাহার তৃপ্ত হইয়াছে আশার সাবলীল গতিভঙ্গীতে, মধুর মুখের হাসিতে। কিন্তু মনে অতৃপ্তির জ্বালা। আশা কি ভুলিয়াছে? লেখিকার ভাবপ্রবণ চিত্ত এত সহজে পূর্ব্বপ্রেম বিস্মৃত হইল? রমণীর মন এত সহজে তাহার অপরাধ ক্ষমা করিল? আশ্চর্য্য নারী চরিত্র!

× × ×

একমাস পরের ঘটনা। বোধ হয় সে দিন পূর্ণিমা রাত্রি, মাথার উপর বিশাল চন্দ্র ঝক্ ঝক্ করিতেছে। আকাশে শরতের লঘুমেঘখণ্ড তারকায় খচিত। সবুজমাঠের উপর অসিত ও আশা বেড়াইতেছে।

"আপনার আজ হোল কি?" আশা প্রশ্ন করিল।

অসিত নীরবে তাহার চন্দ্রালোকিত মুখের প্রতি চাহিল। সত্যই কি তুমি পাষাণ প্রতিমা! পুরুষের চিত্তের আকুল কামনা কি তোমার চিত্তে ঘাত-প্রতিঘাত তোলে না? নির্ব্বাক বিস্ময়ে কেবল তুমি চাহিয়াই থাকিতে জান? কবেকার অবহেলা, কবেকার প্রেম তোমার মনে রেখাও রাখিতে পারে নাই?

আশা অসিতের সন্নিকটে সরিয়া আসিল। তাহার চুলের সুবাস, গায়ের আতরের গন্ধ স্বপ্নের মত অসিতকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। কোমল কণ্ঠে, প্রায় মিনতির মত করিয়া আশা বলিল "আমার ওপর রাগ করেছেন?"

কিসে কি হইয়া গেল বোঝা গেল না। সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর যেন ছায়া-ছবির মত অসিতের নয়ন সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। মনে পড়িল সেই আশাদের বাড়ীর নির্জ্জন ছাদের কোণে নিরালাতে কিশোরী আশার সহিত তাহার আলাপ। এই লীলামুখরা তরুণী তো সেই আশা, সে তো সেই অসিত!

আশার একখানা হাত ধরিয়া অবরুদ্ধ প্রায় কণ্ঠে অসিত বলিল "তোমার ওপর রাগ কোরব আমি?"

অন্যের বিবাহিতা পত্নীর পক্ষে পরপুরুষের স্পর্শে যাহা করা উচিত আশা তাহা করিল না বরং প্রতীক্ষমানা সূর্য্যমুখীর মত সাগ্রহে মুখ তুলিয়া নিবিড় দৃষ্টিতে অসিতের প্রতি চাহিয়া রহিল।

অসিতের মনে বিদ্যুৎচমকের মত একটা কথা শিহরণ তুলিয়া ফিরিয়া গেল। তবে কি আশা তাহাকে ভালবাসে?

"আশা, তুমি কি কিছুই বোঝনা? কত যে ভালবাসি তোমাকে!"

একমুহূর্ত্তে সমস্ত দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আশা দীপ্ত ভঙ্গিতে সরিয়া দাঁড়াইল। "ঠিক এই কথাই শোনবার আশা করেছিলাম এতোদিন—" আশার কণ্ঠে কঠিন ব্যঙ্গ—"সেইজন্যে আপনার সাথে একা একা বেড়াতে আসতাম। সত্যিকথা, আপনি রাতে আমি

ব্যবহার করেন তারই জন্তে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। পাঁচবছর আগে এ কথা মনে ছিল আপনার?"

অসিতের নির্ব্বাক, শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া আশা পুনরায় বলিতে লাগিল "তখন কেন সকলের মধ্যে আমার মুখ তুলে দাঁড়াবার পথ রাখলেন না? আমার মা বাবাকে, আমাকে যে অপমান করেছেন আপনি, আজ তার শোধ হোল।"

অসিত বিবর্ণমুখে উচ্চারণ করিল "তার জন্যে ক্ষমা কোরো।"

"ক্ষমা করেছি আপনাকে, আজ দুমিনিট আগে থেকে।"

আশা ধীরে ধীরে পথ ধরিল।

"আপনি বাড়ী যান অসিত দা—" আশ্চর্য্য মধুর কণ্ঠে আশা বলিল, তাহার স্বরে রাগ বিদ্বেষ কিছুই নাই, নির্লিপ্ত তাহার স্বর।

"উনি হয়তো আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমি নিজেই বাড়ী যেতে পারব।"

আশা একাই বাড়ী ফিরিয়া গেল।

আমার বাড়ী

শ্রীমতী বাজেগা

আমাদেরি বাড়ীর পাশেই
ফুল বাগানের 'পর
প্রজাপতি ভোমরা ফড়িং,
উড়ছে নিরন্তর,
বুলবুলীরা ফুলের গাছে,
সাঁঝ সকালে বসেই আছে
দিন-দুকুরে হোল্‌দে পাখীর
ডাক শুনিতে পাই
আমার বাড়ী, আমার বাড়ী
বড়ই সুখের ঠাঁই।

(২)

যুঁই রজনী-গন্ধা ফোটে
ঐযে বেড়ার কাছে,
বগড়ু কুকুর আমার হেরি
নিত্য সেথার নাচে
দুষ্টু "মিনু" বিড়ালটী মোর
রয় যেখানে ঘুমেই বিভোর
ঐ খানেতেই আমার বাড়ী
সামনে "কেয়া"র বন
দুষ্টু "মারু" ভাই সেথা মোর
খেলছে অনুক্ষণ।
সুখে দুখে জাগছে হৃদে
সেই যে আমার বাড়ী
ত্যাগ করিতে গেলেই তারে
টাটায় প্রাণের নাড়ী
তোমরা তারে যাই বল বোন্
মোর কাছে যে সেই "তপোবন'
দেখলে পরে জুড়ায় নয়ন
তুলনা তার নাই
আমার বাড়ী আমার বাড়ী
বড়ই সুখের ঠাঁই।

প্রত্যাবর্ত্তন

গল্প

শ্রীঅমলা দেবী

[পৃথা সোমনাথের বাড়ীর ভাড়াটের মেয়ে হলেও সম্পর্ক তাদের অন্তরকম। তারা দু'জনেই জানে তাদের বিয়ে হবে তাই সম্পর্ক তাদের তেমনি মধুরই ছিল। কিন্তু স্ব-ঘর নয় বলে শেষ পর্য্যন্ত তাদের বিয়ে হোল না—পৃথার মৃত্যু হোল। তারপর সোমনাথের আবার বিয়ে হোল—ছেলে পিলেও হলো—তারই এক মেয়ে সুলতা—সে যেন পৃথারই ছবি—এই একটা অতি করুণ মর্মন্তুদ ব্যাপারের উপরেই সুলেখিকা অমলা দেবী এই গল্পটি লিখিয়াছেন।]

চেয়ারের ওপর বসে সামনের টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে সোমনাথ কি লিখছিল, পৃথা ঘরে ঢুকে পানের ডিবেটা টেবিলের উপর রেখে, ঘুরে ওর চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে, চেয়ারের পীঠটার ওপর হাত রেখে বল্লে —"কি লিখছো ?"

সোমনাথ মৃদু হাস্যে পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে বল্লে—"চিঠি।"

"কাকে ?"

—"তোমার সতীনকে।"

পৃথা কৃত্রিম কোপ পূর্ণ মুখে বল্লে—"তুমি আমার সতীনকে চিঠি দেবার কে ?"

—"এখন তোমার সতীনের কেউ নাই না ? আচ্ছা বেশ ভবিষ্য কেউ ত বটে !"

পৃথা হেসে বল্লে—"ভবিষ্যতের জন্যে এখন থেকে মক্স করছ বুঝি ?"

—"সেকি আজ নতুন করছি।"

—"মানে ?"

—"মানে তুমি জান না ? তবে দেখিয়ে দিই।"

হাস্য মুখে সোমনাথ ওর হাত খানা ধরে টেনে নিজের দিকে এনে দুইহাতে ওর মুখ খানাকে চেপে ধরে, মুখটা নত করলে।

—"আঃ কি কর। ছাড়না। ঐ কে আসছেন।"

বলে পৃথা তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সোমনাথ ওর গমন পথের দিকে চুপ করে চেয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরেই নীচে থেকে পৃথার গানের সুর ভেসে এল 'আমি কামনা করিয়া সাগরে মরিব

সাধিব মনের সাধা,

আমি মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন

তোমারে করিব রাধা।'

সোমনাথ কলমটা রেখে চেয়ার ছেড়ে শয্যায় এসে শুয়ে পড়ল।

মনের মধ্যে এলোমেলো চিন্তা রাশি কেবলি জট পাকায়।

প্রথমটা ও অন্ধ ভাবেই পথ চলেছিল, একটা সাময়িক আনন্দের উত্তেজনায়। এ পথের যে কোন গুরুত্ব আছে সে কথাও ভেবে দেখেনি।

কিন্তু আজও প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করছে পৃথা ছাড়া হয়ে জীবনের পথে ও চলতে পারবে না, সে অসম্ভব। কিন্তু কাছে টানা সেত খুব সহজ বলে মনে হয় না। ওরা খুব বড় কুলীন, পৃথারা ভঙ্গ, কাজেই মা মত দেবেন না, জেদ করে ও যদি করে তাতে মায়ের মনে আঘাত দেওয়া হ'বে। এলো মেলো চিন্তার মধ্যেই কখন ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মনে হ'ল এলো চুলের রাশি যেন ওর মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে তারি মৃদু সৌরভ ওর ঘুমের আবরণকে যেন আস্তে আস্তে ঠেলে দিচ্ছে।

চোখ কিন্তু খুলতে পারছিল না।

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে ললাটের ওপর একটা স্পর্শ অনুভব করে, সোমনাথ চোখ খুল্লে।

পৃথা প্রস্তুত হয়েই ছিল হেসে চটকরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। সোমনাথ হাত বাড়িয়ে ওকে অতি কাছে টেনে নিয়ে এল—"ছুঁ! এ রকম করে আর যে পারছিনে। তার চেয়ে তুমি মরে যাও না।"

—"কেন তোমার ভাবনার দড়ী গলায় দিয়ে? দায় পড়েছে আমার। কত জাতে বউ কিনতে পয়সা খরচ হয় তুমি নাহয় ভাবনা দিয়েই কেন।" বলেই একটু

চঞ্চল ভাবে ওর বাহু বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে নিতে বল্লে—"আঃ কি হ'চ্ছে! মা যদি এসে পড়েন?"

সোমনাথ ওকে ছেড়ে দিয়ে শয্যা ছেড়ে বসে বললে—"আমার বেলাই মা ছুটে আসেন, না? আর তুমি যখন ঘুম ভাঙালে তখন মা আসতে পারতেন না?"

—"আচ্ছা বেশ! চল নীচে মা ডাকছেন।" বলে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চেঁচিয়ে বললে—"ওমা, মা তুমি জাগিয়ে যাও। যে ঘুম! চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেছে তবু উঠলেন না!"

বলে নীচে ভাঁড়ার ঘরে যেখানে সোমনাথের মা চারুবালা বসে ছিলেন সেইখানে গিয়ে বসে পড়ে পানের বাক্সটা টেনে নিয়ে পান সাজতে আরম্ভ করল।

চারুবালা উঠে দাঁড়ালেন—"উঠল না বুঝি? যাই। এই এক ফ্যাসানের বাড়ী হয়েছে বাপু, আর কি ওপর নীচে সব সময় করতে পারি।" বকতে বকতে চারুবালা গোটা দু'তিন সিঁড়ি উঠেছিলেন কিন্তু সোমনাথকে আসতে দেখে আবার ফিরে এসে ভাঁড়ার ঘরের ঢুকে পৃথাকে বললেন—"উঠেছে।"

—"উঠেছেন?" প্রশ্ন করে পৃথা চেয়ে দেখল সোমনাথ দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে, ওর মুখের ওপর একটা মৃদু হাসির আভাস খেলে গেল, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পান গুলো মুড়তে মুড়তে বললে—"তবু ভাল আমি ত তাড়া খেয়ে মানে মানে পালিয়ে এলাম।"

সোমনাথের মুখেও হাসি ফুটে উঠল, বললে—"কে তাড়া দিলে, আমি?"

—"তুমি নয়ত কে? মর বললে না।"

আজকাল ওদের ব্যবহারে চারুবালার মনে একটা কিন্তু জাগে, এখন ও কথা গুলো যেন কিরকম বলে মনে হ'চ্ছিল! উনি চটকরে সেটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেললেন, মনেমনে বললেন 'ও আমার ভুল।' মুখে বললেন—"ষাট। মর কি বলতে আছে!" বলে চারুবালা নিজের কাজে মন দিলেন।

সোমনাথ চারুবালাকে জিজ্ঞেস করল—"কি বলছ মা? কেন ডাকছিলে?"

—"ওমা কেন ডাকছি! সরোজিনীকে আজ আনতে যাবি ভুলে গেছিস?"

—"না ভুলিনি। কিন্তু এখুনি যাব? এখন ত মোটে সাড়ে তিনটে।"

—"একটু সকাল সকালই যা না। সন্ধ্যের আগেই নিয়ে আয়, নইলে রাত হয়ে গেলে কচি কাচা নিয়ে কষ্ট হবে। আর হ্যা ভাল কথা কুটুম বাড়ী যাবি, শুধু হাতে যাসনে বাজার থেকে মিষ্টি কিনে নিয়ে যাস।"

—"আচ্ছা নিয়ে যাব। মেয়েরাও শ্বশুর বাড়ী যাবার সময় মিষ্টি নিয়ে যায়?"

মা হেসে বললেন—"নিয়ে যায় ত। হঠাৎ তোর ও কথা মনে হ'ল যে?"

—"তুমি যে ভালমানুষ হয়ত বলতেই পারবে না, তাই জেনে রাখলাম, তোমার বউ যদি ভুলে যায়ত তাকে মনে করিয়ে দিয়ে আদায় করে নেব।" বলে হাসতে হাসতে সোমনাথ ওপরে উঠে গেল।

পৃথা তাড়াতাড়ি পানগুলো গুছিয়ে রেখে উঠে পড়ল—"যাই চা টা করে নিই।" পৃথা খাবার ঘরে ঢুকে ষ্টোভে চায়ের জল বসিয়ে, চায়ের কাপগুলো ঠিক করে গুছিয়ে নিতে লাগল। পৃথার পিতা হরিশ্চন্দ্র সোমনাথদের বাড়ীর একটা অংশের ভাড়াটে। হরিশ্চন্দ্র সোমনাথের পিতা তারানাথের কাছ থেকে বাড়ীর এই অংশটা ভাড়া নিয়ে ভাড়াটে হয়েই বসবাস আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু অকস্মাৎ পৃথার জননীর মৃত্যুর পর চারুবালা এসে পৃথাকে কোলে তুলে নিলেন সেই থেকে ওদের দুই সংসারে একটা আত্মীয়তার বন্ধন এসে পড়ল। তারপর সংসারের নানা আবর্ত্তনে, বিপদে সম্পদে আনন্দে বেদনায় সে বন্ধন দিনে দিনে আরো দৃঢ় হয়ে গিইছিল।

পৃথার চা হয়ে এসেছিল, সোমনাথ এসে ঢুকল—"চা হয়ে গেছে?"

—"হ্যাঁ।"

পৃথা চা ছাঁকতে ছাঁকতে চারুবালার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বল্লে—"মা আমার চা হয়ে গেছে।"

একটু পরেই চারুবালা খাবার হাতে করে ঘরে ঢুকে

সোমনাথের কাছে টুলের উপর রেকাব খানা রাখলেন। ও দিককার সদর দরজায় শেকল নাড়ার শব্দ হ'ল।

পৃথা এককাপ চা সোমনাথকে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে যেতে যেতে বল্লে—"বাবা এসেছেন।"

এ বাড়ী ও বাড়ীর উঠানের মাঝের প্রাচীরের গায়ে একটা দরজা আছে, সেইটে দিয়ে ওদের যাওয়া আসা চলে।

পৃথা উঠানের দরজা দিয়ে এসে সদর দরজার খিলটা খুলে দিল। হরিশচন্দ্র প্রবেশ করতেই ও হাত বাড়িয়ে পিতার হাত থেকে ছাতা কাগজ পত্র সব চেয়ে নিয়ে পিতার সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘরের দিকে চলে গেল।

ঘরে এসে ছাতাটা দেয়াল আনলায় টাঙ্গিয়ে রেখে কাগজগুলো টেবিলের উপর গুছিয়ে রেখে পৃথা পিতার ইজিচেয়ারের পাশে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে পাখাখানা নাড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ ক্লান্ত ভাবে চুপ করে শুয়ে থাকার পর হরিশচন্দ্র উঠে বসে সস্নেহে কন্যাকে কাছে টেনে নিজের মুখের ওপর এসে পড়া চুল গুলোকে সরিয়ে দিতে দিতে বল্লেন—"সত্যি মা, তুই চলে গেলে কি হ'বে?"

পৃথা পিতার কোলে মুখ গুঁজে আবদারের সুরে বল্লে—"তোমাকে ছেড়ে আমি যাবনা বাবা। তুমি ওসব ভাবনা ছেড়ে দাও।"

হরিশচন্দ্র সস্নেহে বল্লেন—"দূর পাগলী। আর যখন আমি মরে যাব তখন?"

—"আমিই অনেক দিন বেঁচে থাকব তার কি কোন মানে আছে?"

—"আমার মা হইছিস্ বলে আমি যে তোর বাবা সে কথাটা বুঝি ভুলেই যাস?"

বলে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"কাপড় ছেড়ে আসি।"

—"চল।"

বলে পৃথা তাড়াতাড়ি উঠে পিতার কাপড় কামিজ তোয়ালে ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো কলতলায় ঠিক করে রেখে এসে পিতার জলখাবার ঠিক করে রেখে ষ্টোভে চায়ের জল বসিয়ে দিল।

চারুবালা এসে পৃথার পাশে বসলেন।

হরিশচন্দ্রের চা জল খাবার খাওয়া হয়ে যাবার পর চারুবালা বল্লেন—"হ্যাঁ ঠাকুরপো, আমি যেখানে বল্লাম সেখানে খোঁজ নিইছিলে?"

"—হ্যাঁ নিইছি কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষে আমার দিতে ইচ্ছে করছে না।"

—"ওমা! দ্বিতীয় পক্ষ? কই তাত গিরিবালা ঠাকুরঝি কিছু বল্লেন না! শুনলাম পাস করা ছেলে, ভাল কাজ করে।"

—"হ্যাঁ ভাল সবই কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষে দিতে ইচ্ছে করছে না।"

—"তবে আর কি হবে!"

বলে হেসে চারুবালা পৃথার পীঠের ওপর হাত রেখে বল্লেন—"তবে থাক তুই আমাদের মা হ'য়ে। তোর আর বিয়েতে কাজ নেই।"

বলে হাসতে হাসতে উঠে চলে গেলেন।

(২)

—'ননদিনী বোল বঁধুরে
ডুবেছে রাই রাজ নন্দিনী
কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে।

গাইতে গাইতে সোমনাথের দিদি সরোজিনী পৃথার রান্নাঘরে এসে ঢুকল।

চারটি পুত্র কন্যার জননী। আনন্দময়ী হাস্যময়ী অদ্ভুত প্রকৃতির।

পৃথা ময়দা মাখতে মাখতে মুখ তুলে চাইল কিন্তু সরোজিনীর গান আর মুখের হাসি দেখে বুঝতে পারল, সলজ্জভাবে মুখটা নীচু করে বল্লে—"বোস দিদি।"

"দূর পোড়ামুখী বসব কি বল?"

এবার পৃথা হেসে উঠল—"তবে কি করবে?"

"নাচব, শুভ সংবাদ পেয়েছি। গান শোনালাম কি পুরস্কার দিবি বল?"

পৃথা কোন উত্তর দিলনা দেখে সরোজিনী "ভারী চালাক মেয়ে। দেবার ভয়ে বোবা সাজে!" বলে হাতটা ধুয়ে উনানের কাছে গিয়ে তরকারীর কড়াইতে খুন্তি

চালাতে চালাতে বল্লে—"বল্লাম ওখানে খাবি তবে এত তরকারী করেছিস, অত ময়দা মেখেছিস কেন?"

"ঠিক আন্দাজ হয়নি দিদি।"

—"তবেই হয়েছে! আমার ভাইটিকে ফেল করবি দেখছি।" পৃথা অপ্রস্তুত মুখে চুপ করে রইল।

সরোজিনী তরকারীর কড়াটা নামাতে নামাতে বল্লে —"দে বেলে আমি সেঁকে দি।"

রন্ধন শেষ করে হরিশ্চন্দ্রকে আহারে বসিয়ে পৃথা বেরিয়ে গেল জল গামছা পান সব ঠিক করে রাখতে।

সরোজিনী হরিশ্চন্দ্রের কাছে পাখা খানা হাতে নিয়ে এসে বসল—"উঃ কী গরমই পড়েছে।"

হরিশ্চন্দ্র সস্নেহে সরোজিনীর দিকে চেয়ে বল্লেন— "মায়েরা ত সব পট করে আপন আপন বাড়ী চলে যাবে, তারপর আমারি মুস্কিল!"

—"সত্যি কাকাবাবু পৃথা চলে গেলে আপনার বড় কষ্ট হ'বে।" বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বল্লে —"আচ্ছা কাকাবাবু আমাদের সোমনাথের সঙ্গে পৃথার বিয়ে দিননা।" সরোজিনীর মুখে এ প্রস্তাব শুনে হঠাৎ যেন ওঁর মনে একটা ছায়া পড়ল।

'কি আশ্চর্য্য! সত্যি?' মন মাথা নাড়ল 'না না এ ওঁর মিথ্যা আশঙ্কা!

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বল্লেন—"সে কি করে হ'বে? তোমরা যে মস্ত কুলীন।"

—"তাতে আর কি হয়েছে? আজকাল কেই বা অত বাছে? এই ত আমার ছোট ননদের বিয়ে হ'ল ভদ্দর ঘরে।"

—"তোমরা দিয়েছ তোমরা মান না তাই। কিন্তু বৌদির সংস্কারে বাধবে।"

এবার সরোজিনী চুপ করে গেল।

হরিশ্চন্দ্র আহার শেষ করে উঠে গেলেন।

সরোজিনী সব জিনিষ গুছিয়ে তুলে রেখে হাত ধুয়ে পৃথাকে বল্লে—"যা রইল কাল হরির মাকে দিয়ে দিস। কাল থেকে আমি এসে কাকাবাবুকে করে খাইয়ে দিয়ে যাব, আজ এই এলাম তাই সময় হ'ল না।"

—"রোজই কষ্ট করে করতে হবে।"

—"হ্যাঁ রোজই। তোর বড় আস্পর্দ্ধা। আমাদের বাড়ী খাবিনেত খাবি কার বাড়ীতে? বাঙ্গালী মেয়েদের বিয়েটা একটা সহজ জীবিকা জানিসনে? আর তাছাড়া—" বলে মৃদু হেসে বল্লে—"সোমনাথ আমার কাছে যায় আর বলে 'দিদি তুমি চল, মাকে বলে মত করাও।' কাজেই ছুটে আসতে হ'ল। বিয়েত তোদের হয়ে গেছে গন্ধর্ব্ব মতে, আমি বৌ ভাতটা করিয়ে দিই। আর মায়ের কাছে ফুলশয্যার মতটা আদায় করে ব্যবস্থা করে যাই।"

বলে হাসতে হাসতে উঠানের দরজা দিয়ে ও বাড়ী চলে গেল। পৃথাও রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ করে সরোজিনীর পশ্চাদানুগমন করলে।

(৩)

ভোর বেলায় প্রতি দিনকার মত আজো পৃথার ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠতে কিন্তু ইচ্ছা করছিল না, মনে হ'ল সর্ব্বাঙ্গে কি রকম যেন যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে, মাথাটাও যেন ভার ভার। তবু উঠতে হ'ল।

পিতা আহারাদি করে আপিস বেড়িয়ে গেলেন। পৃথা অনেকক্ষণ রান্নাঘরের সামনের রোয়াকে চুপ করে বসে রইল।

রোজ সরোজিনী এসে রান্নার সাহায্য করে, হরিশ্চন্দ্র আপিস বেড়িয়ে যাবার পর ওরা দু'জনে ও বাড়ী চলে যায়।

আজ কিন্তু আসেনি। পৃথা একটু বিস্ময় মিশ্রিত আশঙ্কা অনুভব করলে।

তবু প্রতিদিনকার অভ্যাস মত আজও ও বাড়ীতে চল।

ও বাড়ীর উঠানে পা দিয়েই প্রতি দিনকার মত আজো সোমনাথের পড়ার ঘরের দিকে চাইল।

আজো সোমনাথ দাঁড়িয়েছিল কিন্তু প্রতি দিনকার মত হাসি মুখে ওকে অভ্যর্থনা করল না, শুষ্ক বিষন্ন মুখে একবার পৃথার দিকে চেয়েই সরে গেল।

পৃথার ইচ্ছে হচ্ছিল ফিরে যেতে কিন্তু উপায় ছিল না কারণ ঢাকবালা, সরোজিনী আর খোকপিসী তিনজনে

সামনের বারাণ্ডায় বসে গল্প করছিলেন। কাজেই পৃথা এগিয়ে এল।

সরোজিনী শুকনো মুখে ওর দিকে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্লে—"আয়, বোস।"

চারুবালা কিন্তু কোন কথাই বল্লেন না একবার শুধু বিরক্ত মুখে পৃথার দিকে চাইলেন।

ঐ টুকু দৃষ্টিই পৃথার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ঘোষগিন্নি রয়েছেন হঠাৎ উঠে চলে যাওয়া যায় না।

ঘোষগিন্নী পৃথার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—"মুখখানা অত শুকনো দেখাছে কেন মা!"

"শরীরটা ভাল নেই খুড়িমা।"

"কি হয়েছে?"

"হয়নি কিছুই মাথাটা কি রকম তার মনে হচ্ছে।"

"ওঃ।"

বলে ঘোষগিন্নী আবার রায়েদের ছোট বৌর কথা আরম্ভ করলেন।

অন্য দিন চারুবালা এ সব কথায় 'আহা ছেলে মানুষ। বিম্বা কোন বড় কথা হ'লে' কপালের গেরো নইলে এমন দুর্ম্মতি হবে কেন। বলে ছেড়ে দেন।

আজ কিন্তু তিক্তস্বরে বল্লেন—"আজ কালকার মেয়ে গুলোর কি হায়া লজ্জা কিছু আছে! ছিঃ!"

পৃথা এবার বুঝতে পারল, অন্তর জুড়ে অভিমান গর্জ্জে উঠল, হয়ত চোখে জল এসে পড়ত, ও তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

এ বাড়ীতে এসে ঘরে ঢুকে মেঝেয় বসে পড়ল। চোখের জলে বার বার একটি কথাই মনে হ'ল 'মা আমাকে এমন করে অপমান করলেন।'

\+ \+ \+

গত রাত্রে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চারুবালা ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা কাটা কাটি করার পর শেষ কথা সোমনাথ বল্লে "বেশ তা' হ'লে আর কখন আমার বিয়ের নাম কোর না।"

তারপর উনি আর একটি কথাও বলেন নি, ওরাও নয়। কিছুক্ষণ বাদে ওরা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু চারুবালার প্রায় সমস্ত রাত ঘুম হয়নি। ওঁর মত ওরা যে চাইছে তার সঙ্গে যেন কোন যোগাযোগ নেই। ওটা যেন ওঁকে দিতেই হবে।

ওঁর মনে হ'ল ওঁকে আর ওদের প্রয়োজন নেই।

উনি গুমরে কেঁদে উঠলেন মনে হ'ল এতবড় বিশ্বে উনি যেন একা, কেউ নেই কোন সম্বল নেই।

সকালে রাত্রির সমস্ত অভিমান ক্রোধে এসে ঠেকল। রাগ করে মধ্যাহ্নে ঘোষ গিন্নীকে ডেকে নিয়ে এসে কালীঘাট চলে গেলেন।

কালীঘাট ঘুরে ওঁর দূর সম্পর্কীয় এক বোনের বাড়ী হ'য়ে যখন বাড়ী ফিরলেন তখন রাত আটটা।

কড়া নাড়তেই সোমনাথ দরজা খুলে দিলে।

বাড়ীর মধ্যে পা দিয়েই ওর বুকের মধ্যে কি রকম করে উঠলো।

সমস্ত বাড়ী অন্ধকার, উঠানে একরাশ খাবারের ঠোঙ্গা ছড়ান।

মনে হ'ল উঠানের কোণ থেকে কে যেন ও বাড়ীর দ্বারের দিকে এগিয়ে গেল।

উনি চটকরে সামলে নিয়ে বিরক্ত ভাবে বল্লেন—"সন্ধ্যে উতরে গেছে বাড়ীতে একটা আলো জ্বলেনি। এইটুকু বাড়ী ছিলাম না তারি মধ্যে বাড়ীর দশা দেখ!" বলে এগিয়ে যেতে যেতে বল্লেন—"আমাকেত দরকার নেই কিন্তু যোগ্যতাত সব এই!"

সোমনাথ এগিয়ে এসে বল্লে—"পৃথার জ্বর হ'য়েছে, দিদি ওখানেই আছে। তোমার ফিরতে দেরী হ'চ্ছে দেখে ছেলেমেয়েদের আমি বাজারের খাবার এনে খাইয়ে দিইছি।"

চারুবালা কিছু বল্লেন না, নিজের কাজে মন দিলেন।

রাত্রে সংসারের কাজ কর্ম্ম সেরে উনি এসে যখন সরোজিনীর ছেলে মেয়েদের পাশে শুলেন অন্তর তখন অভিমানে আরো পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে।

উনি ক'বার পৃথার ঘরে কাজের ছলে ঘুরে এলেন পৃথা কিন্তু একবার ও ওঁকে ডাকলে না। আগে কিন্তু পৃথার সামান্য একটু মাথা ধরলেও পৃথা ওঁকে ছাড়তে চাইত না। ও পাশের শয্যায় সোমনাথও জেগেই ছিল, কিন্তু আজ ওরা দু'জনেই নীরব। সামান্য একটু জ্বরের

মিস্ কজ্জন

(বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী)

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ, কলিকাতা]

[শ্রীভারত পিক্‌চার কোং'র সৌজন্যে

ঘোর এসেছিল কিন্তু সরোজিনীর ব্যাকুল আহ্বানে তাড়াতাড়ি উঠে বললেন—"কিরে ?"

—"ওমা শীগগির চল পৃথা কি রকম করছে।"

সোমনাথ জেগেই ছিল হয়ত, সরোজিনীর কথা শুনেই ও তাড়াতাড়ি চলে গেল।

চারুবালাও প্রায় ছুটে চলে গেলেন।

সরোজিনী ঝি হরিদাসীকে ডেকে ছেলেমেয়েদের ঘরে শুতে বলে আবার চলে গেল।

পৃথা প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে এলোমেলো বকছিল—'আমি যাব—দাঁড়াও আসছি আসছি।'

চারুবালা কেঁদে উঠলেন "কি হ'বে।"

সোমনাথ মায়ের হাতটা চেপে ধরল—"মা তুমি অমন কোর না, আমি এখুনি ডাক্তার বোসকে নিয়ে আসছি। তুমি চুপ করে থাক ও শুনলে আরো ভয় পেয়ে যাবে।"

চারুবালা চুপ করে গেলেন কিন্তু চোখের জল বাধা মানে না।

সোমনাথ ডাক্তার ডাকতে চলে গেল। ডাক্তারকে সঙ্গে করে সোমনাথ ফিরে এল।

ডাক্তার রুগী দেখে, প্রেসক্রপসন লিখে বরফ মাথায় দাও ইত্যাদি ব্যবস্থা দিয়ে, ফিয়ের টাকাটা পকেটে ফেলে—'জ্বরটা বড্ড বেশী, হু, ভয় নেই হু।' বলে অনাবশুক আপন মনেই গোটাকতক হুঁ হুঁ করে চলে গেলেন।

অন্ধকার বিভীষিকাময়ী রাত্রি যেন দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হয়ে ওঠে, মনে হয় এ রাত্রির বুঝি শেষ নেই!

এমনি করেই সমস্ত রাত কেটে, ভোরের দিকে পৃথার জ্বর কমে এল, পৃথা চারুবালাকে ডেকে বললে—"মা জল।"

চারুবালা পৃথাকে জল খাইয়ে দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিয়ে সস্নেহে ওর কপালের ওপর চুম্বন করে বললেন—"কাল কী রাতই কেটেছে। এখন ভাল হয়ে ওঠ মা শীগগির, তোকে বাড়ী নিয়ে যাই।"

পৃথা ছোট মেয়ের মত চারুবালার গলা জড়িয়ে ধরে ওর বুকের মধ্যে মুখটা লুকিয়ে ফেললে।

পৃথাকে সহজ ভাবে আবার কথা কইতে দেখে সবাই আনন্দিত মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে সংসারের কাজে মন দিল।

পৃথা ঘুমিয়ে পড়েছিল হঠাৎ চমকে জেগে উঠল।

শিয়রের কাছে সোমনাথ বসে বাতাস করছিল, সরোজিনী এ পাশের মেজেয় মাদুর পেতে শুয়েছিল, চারুবালা সংসারের কাজে চলে গেছেন, হরিশ্চন্দ্র ওষুধ আনতে আর ছুটির ব্যবস্থা করতে বেরিয়েছেন। পৃথাকে চমকে উঠতে দেখে সোমনাথ ওর পীঠের ওপর হাতটা রেখে জিজ্ঞেস করল—"কি হয়েছে?"

পৃথা কিন্তু কোন উত্তর না দিয়ে সোমনাথের হাতখানা চেপে ধরে অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল, তারপর বললে—"কি বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম। আচ্ছা আমি সেরে উঠব?"

—"সেরে উঠবে না কেন? স্বপ্ন দেখলে বলে? কী পাগল! দুর্ব্বল শরীরে লোকে অমন দেখে থাকে স্বপ্ন।" বলে সোমনাথ ওর মুখের ওপর এসে পড়া চুলগুলো সরিয়ে দিতে লাগল।

পৃথা কিছুক্ষণ আবার চুপ করে থেকে বললে—"না গো সত্যি আমার কি রকম মনে হ'চ্ছে! আচ্ছা তুমি জন্মান্তর মান?"

—"আর কথা কয়োনা, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই তুমি চুপ করে শুয়ে পড়।"

—"না সত্যি যদি মরে যাই তবে আবার কিন্তু তোমার কাছে ফিরে আসব, যেমন করেই হোক।"

—"কী পাগলামী করছ! অসুখ কি কারুর করে না, না তারা কেউ সেরে ওঠে না?"

সরোজিনী এবার উঠে এল—"ভারী দুষ্ট মেয়ে, কিছুতেই চুপ করবে না। তোর দুধটা নিয়ে আসি, তারপর দেখি তোকে চুপ করাতে পারি কিনা।" বলে হেসে সরোজিনী দুধ আনতে চলে গেল।

কিন্তু ওদের মুখের হাসি কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। পৃথার জ্বর আবার প্রবল ভাবে বেড়ে উঠল। আবার ডাক্তার ওষুধ বরফ ছোটাছুটি করতে করতে সমস্তরাত কেটে গেল, ভোরের কিছু আগে পৃথা ঘুমিয়ে পড়ল চিরদিনের মত।

\+ + ×

হরিশ্চন্দ্র পাগলের মত দিবারাত্রি অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়ান। চারুবালা সরোজিনী আকুলভাবে চোখের জল ফেলেন। শুধু স্তব্ধ শোকে সোমনাথ চুপ করে বসে বসে ভাবে 'না না সে ওকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকতে পারবে না। সেত আসবে বলে গিইছিল সে আসবে, নিশ্চয় আসবে।' কত রাত্রে অন্ধকারে ছায়া দেখে ও এগিয়ে গেছে কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে ব্যাকুল অন্তরে মনে মনে বলেছে 'শুধু তুমি একটিবার জানিয়ে দাও তুমি কোনপথে ফিরবে তা'হ'লে আমি সেই পথ চেয়ে যুগ যুগান্তর জন্ম জন্মান্তর বসে থাকব।'

\+ + +

(৪)

তারপর দীর্ঘ দিন কেটে গেছে, কত বৎসর। সেদিনের যুবক সোমনাথ আজ আর নেই!

আজ আছে প্রবীণ সোমনাথ, মস্তকে বার্দ্ধক্যের শ্বেত উত্তরীয়, ললাটে বলিরেখা, মুখে গাম্ভীর্য্যের অবগুণ্ঠন।

গতদিনে যারা ছিল আজো তারা সবাই আছে।

সোমনাথ পাঁচটি পুত্র ও কন্যার পিতা।

স্ত্রী সন্ধ্যা সহজ সরল ভাল মানুষের মত, দেখতে সাধারণ লোকে যাকে সুন্দর বলে তাই, রং ফরসা, মোটা সোটা, মাঝারী চোখ নাক।

হরিশ্চন্দ্র পৃথা মারা যাবার পর বার কতক কাশীবাস করবার প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু সোমনাথ প্রথমে আপত্তি করে শেষে অভিমান করে ওর সে সঙ্কল্পের শেষ করে দিইছিল।

দেখা শোনা ওরাই করে, বিশেষ করে সোমনাথ। হরিশ্চন্দ্র যেন ওর মাতৃহীন সন্তান, ঠিক সেই রকম ওর মনের ভাব।

সোমনাথের সবচেয়ে ছোট মেয়ের নাম সুলতা, ছোট্ট বছর তিনেকের, অজস্র কথা কয়। ঠাকমা, বাবা, দাদু এই তিনজনকে ঘিরেই ওর যত আবদার যত আনন্দ অভিমান।

অন্য ছেলে মেয়েরা ফরসা, কড়কটা মায়ের ধরণের শান্ত সরল। এক স্নিগ্ধ রং কালো বড়বড় চোখ নাক, রোগা চঞ্চল অভিমানী। সবাই বলে 'ও ঠিক বাপের মত হয়েছে।'

সোমনাথ কিন্তু অবাক হ'য়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, মুখে বলে—"তা হ'বে!"

সেদিন কিসের একটা ছুটি ছিল সোমনাথ খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে হরিশ্চন্দ্রের ঘরে এসে দেখল হরিশ্চন্দ্র পৃথার ট্রাঙ্ক খুলে গহনা কাপড় চারিদিকে ছড়িয়ে তারি মধ্যে বসে ব্যাকুল ভাবে চোখের জল ফেলছেন।

সুলতা দুইহাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলছে— "দাদু কাঁদেনা, চুপ, চুপ।"

সোমনাথ এসে সতরঞ্চির এক পাশে বসল।

কিছুক্ষণ পরে হরিশ্চন্দ্র শান্ত হ'য়ে একটু ইতস্ততঃ করে তারপর সোমনাথকে বল্লেন "এগুলো বৌমাকে আর সরোজিনীর মেয়েদের দিয়ে দেব ভাবছি।"

দাদুকে শান্ত হ'তে দেখে সুলতা এদিকে সরে এসে গহনা গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

গহনাগুলোর মধ্যে ছোট্ট একটি সরু হার তার মাঝখানে।

সোমনাথের ফটোর লকেট, সেইটে সুলতা তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ সেই ফটোর দিকে চেয়ে বল্লে—"দাদু এ কে?" হরিশ্চন্দ্র বল্লে—"ও তোমার বাবা।"

সুলতা পিতার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বল্লে —"বাবা এটা আমি নেব।"

সোমনাথের সমস্ত অন্তর ওর কথাতে চমকে উঠল। ও হার সোমনাথই পৃথাকে দিইছিল, কিন্তু সে কখন সহজ ভাবে ও হার গলায় দিতে পারেনি, তার জামার উল্টো-দিকে সেপ্টপিন দিয়ে সর্ব্বদা আটকে রাখত।

তাই নিয়ে কতদিন সোমনাথ ঠাট্টা করেছে—"গিন্নি বুকে আমার ফটো কারা রাখে জানো?"—

পৃথা তৎক্ষণাৎ হার খুলে ওকে ফেরৎ দিয়েছে—"চাইনে তোমার হার।"

কিন্তু সে কিছুক্ষণ; পরক্ষণেই ফিরে এসে বলত— "দাও শিগগির আমার হার।"

সোমনাথ দুই হাতে কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

হরিশ্চন্দ্র মনে করলেন কন্যাকে অন্যায় [illegible]ার থেকে বিরত করবার জন্য বুঝি সোমনাথ সুলতাকে কোলে টেনে নিল। তাই উনি সে হারছড়াটা সুলতার হাত থেকে নিয়ে ওর গলায় পরিয়ে দিলেন।

সোমনাথ সুলতাকে নিবিড় ভাবে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বল্লে—"এ সব গহনা কাপড় থাক কাকাবাবু ও কারুকে দেবেন না এখন। যদি সুলতা বেঁচে থাকে তবে ওসব সুলতাকেই দেবেন।"

+

পৃথার গহনা কাপড় আবার তেমনি বাক্স বন্ধ হয়ে পড়ে রইল, সুলতা কিন্তু চলে গেল। চারুবালা হরিশ্চন্দ্র সোমনাথের স্ত্রী সন্ধ্যা শোকের অন্ধকারে বসে আকুল হয়ে কাঁদেন।

সোমনাথ চুপ করে বসে নিজের মাথার চুলগুলোকে নির্মম ভাবে টানে আর অভিমান পরিপূর্ণ অন্তরে মনে মনে বলে—"আমি ত কখন ভাবিনি তুমি আমাকে আবার বিশেষ করে মাকে কাকাবাবুকে এমন করে কষ্ট দেবে! আমি তোমার পথ চেয়ে ছিলাম তার কি এই পুরস্কার!"

আকাঙ্ক্ষা

শ্রীনীর বালা মিত্র

মাথা মোর নত হ'য়ে লুটাইতে চায়,
বাহু চায় সেবিবারে সে দু'টি চরণ।
হৃদি মোর "স্নিগ্ধহৃদি" পরশন মাগে।
সৌম্য মুরতি সদা অন্তরেতে জাগে॥

—০—

চির-বিচ্ছেদ

শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে লঘু চম্পক পদ ফেলে
দেখা দেয় যবে তারা-বধূ নভে রূপালী আঁচল মেলে,
সন্ধ্যা বালিকা তুলসীর তলে দাঁড়ায় নীরবে আসি,
চয়ন করিয়া মোর লাগি' বেলা চামেলী কুসুম রাশি,
তখনও বাঁধার হয় না সময় চূর্ণ অলকগুলি,
অযতনে মোর বক্ষে, কপোলে, লুটায় বাঁধন খুলি'।

"তুলে লহ" ব'লে চির আদরের নীলশাড়ি মোরে সাধে
দেরাজে বন্দী কাঁকন নিত্য মুক্তির লাগি' কাঁদে।
চাঁদের সুষমা ফিরে নতমুখে রুদ্ধ জানালা ধারে,
আমার নয়ন ভারী হ'য়ে উঠে গৃহকোণে জল-ভারে।
কীসের এ ব্যথা, জমে উঠে কোথা, বুঝিতে পারিনা হায়।
চির-বিচ্ছেদ তব প্রিয়তম, বল' একি সহা যায়?

আশ্রয়

শ্রীহাসিরাশি দেবী

['আলেয়ার আলো'তে আঁধার রাতে পথ ভুলাইয়া চেনা পথেও মানুষকে অচিরে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে। এখন আলেয়ার আলো এক পথিককে বিভ্রান্ত করিয়া কি ভাবে আঁধার রাতে আশ্রয় দিয়াছিল তাহারই চমকপ্রদ একটি কাহিনী এই 'আশ্রয়' গল্পে সুলেখিকা হাসি রাশি দেবী ফুটাইয়াছেন।]

গভীর রাত্রির বুকে মুহ্যমান বাংলার একপাশে একটি পল্লীর পথ।

সরু পথ—বড় জোর দুইজন পাশাপাশি ক'রে যাওয়া যায়। পথের দু'পাশে হাত দুই উঁচু জঙ্গল, মাঝে বড় বড় গাছ, হাওয়ায় তা'র পাতা নড়ার সর সর শব্দ আর তার সঙ্গে মিলিত ঝিল্লীর ঐক্য তান কানে আসছে।

পথ স্তব্ধ নয়, কিন্তু নির্জ্জন; জন-মানবের সাড়া নাই,—আলোর চিহ্নও দেখা যায়না—শুধু অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার, আর তারই মধ্যে দিয়ে চলেছে—একজন পথিক।

এই অন্ধকারটাকেই দু'ভাগে বিভক্ত করে মাঝে মাঝে তার হাতের উজ্জ্বল টর্চ্চের আলো জ্বলে উঠছে, কিন্তু সে বেশীক্ষণের জন্য নয়,—আলো জ্বলবার মুহূর্ত্তে সে থামছে,—বোধহয় পথ চিনে নিচ্ছে, তারপরে আবার সেই নির্জন বন-প্রান্তর মুখরিত করে তার ভারী জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে—ঘস্ ঘস্। হাওয়া বইছে খুব ধীরে, যেন রাত্রির নিশ্বাস পড়ছে—মুমূর্ষ রোগীর মত—মানুষের সাড়া পেয়ে নিশাচর জীব জন্তুগুলো সর সর করে সরে যাচ্ছে, দূরে গিয়ে সচকিত কণ্ঠস্বরে চারিদিক প্রতিধ্বনিত ক'রে তুলছে,—কিন্তু তাতেও পথিকের গতিরোধ হচ্ছে না, সে চ'লেছে—এখনও কত পথ চ'ললে তবে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পারবে তা কে জানে? কিন্তু ঐ,—অনেক দূরে—একটা আলো জ্ব'লতে দেখা যাচ্ছে না?—হ্যাঁ আলোই তো। কিন্তু ও আলো স্থির নয়,—গতিমান; চ'লছে, ফিরছে, অদৃশ্য হচ্ছে, আবার দেখা যাচ্ছে বেশ স্পষ্ট ভাবে। পথিক চ'ললো সেই আলো লক্ষ্য করে, কারণ, সে আসছে অনেকদূর থেকে, সারাদিন পথ চলার পরিশ্রমে ক্লান্ত,—ক্ষুধিত তৃষিতও বটে, আবার লাইটের ব্যাটারীও ফুরিয়ে এসেছে, তবু সে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পারলেনা, আজ সারারাত চ'ললেও পৌঁছাতে পারবে কিনা সন্দেহ! বোধহয় পারবেনা, হ্যাঁ, নিশ্চয় পারবে না, কারণ এ পথের যেন পার নাই,—এ অপরিচিত পথে সে আজ প্রায় সমস্ত দিনই চলছে।

চারিদিকে এত অন্ধকার যে কোলের কাছও লক্ষ্য হয়না, আলোর আয়ুও ফুরিয়ে এসেছে,—আকাশেও চাঁদ তারা শূন্য।

এখনও হাতের আলোর আয়ু একটু আছে, এইটুকু থাকতে থাকতে যেমন ক'রেই হোক ঐ আলোর কাছে পৌঁছাতে হবে।

আলো দেখা যাচ্ছে—আলোক ধারীর অস্পষ্ট অবয়বও যেন চোখে পড়ছে,—ওর কাছে পৌঁছাতেই হবে। পথিক অজানিতের উদ্দেশ্যে হাঁক দিলে একটু দাঁড়িও হে—"

সে শব্দ তরঙ্গ বাতাসের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই আলোর গতিরোধ হ'লো, অস্পষ্ট অবয়ব যেন পথিকের লক্ষ্য স্থির রাখবার জন্যেই দুইহাতে আলোটা উঁচু ক'রে ধরলো, সেই আলোকের আভায় পথিক দেখলে পথ নির্দ্দেশকারীর দেহ দীর্ঘ, ঋজু,—পরিধানে বৈরাগী বাবাজীর মত গলা থেকে পা পর্য্যন্ত ঝুলের জামা। দ্রুত পদে নিকটস্থ হ'তেই গম্ভীর স্বরে—প্রশ্ন হ'লো—"কে তুমি?—

"আমি পথিক।"

'কোথা থেকে আসছো? যাবে কোথায়?"

"আসছি অনেক দূর থেকে, যাব আকুন্দে' গ্রামের সনাতন সা'র বাড়ী, বিশেষ দরকার।"

"কিন্তু, সে গ্রাম তো এখানে নয়,—অনেক দূরে ফেলে এসেছো।"

"তবে?"

পথিক আর্ত্তভাবে উত্তরদাতার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রলো। সে প্রশ্ন ক'রলে—

"এখন যাবে ?—"

শ্রান্ত স্বরে পথিক উত্তর দিলে—

"ইচ্ছে ছিল, কিন্তু শক্তি নেই, সারাদিন পথ হেঁটে আর এখন এক পাও নড়তে পারছিনে, ক্ষুধা তৃষ্ণাতেও কাতর,—আজ রাত্রের মত একটু আশ্রয় দিতে পারনা ? একটু আশ্রয় প্রার্থনা করছি—"

তার কণ্ঠস্বর করুণ আকুতি পূর্ণ। ব'ললে—

"কাল ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার পথ চ'লতে সুরু করবো, কারণ বড় দরকার। কিন্তু আজ রাত্রের মত—"

কণ্ঠ অশ্রু রুদ্ধ...

আলোকধারী নীরব

আবার সেই প্রার্থনা—

"পার না"

উত্তর এলো—

"আচ্ছা—সঙ্গে এস—"

\+ + +

কিছুক্ষণ চলার পরে ওরা একটা মাটির ভাঙা ঘরের সম্মুখে এসে থামলো—

লণ্ঠনের ম্লান আলোকে বাঁশের দুয়োর বাইরে থেকে দড়ী দিয়ে বন্ধ করা দেখা যায়,—আর দেখা যায় দেওয়ালের বড় বড় ফাটলগুলো,—চাল থেকে মেঝে পর্য্যন্ত লম্বিত—মাকড়সার জাল, চামচিকের বাসা।

দরোজার বাঁধন খুলে প্রবেশ ক'রলো। মেঝের ওপরে একখানি অল্প ছেঁড়া চাটাই পাতা। পথিক তারই ওপোরে ব'সে প'ড়লো বড় শ্রান্ত ভাবে, যেন সারাদিন পথ চ'লতে চ'লতে সে এই আশ্রয়টাই প্রার্থনা করেছে, কিন্তু পায় নাই।

"আঃ" বড় আরামেই একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে হাতের জিনিষটা পাশে রেখে—জুতো খুলে শুয়ে প'ড়লো।—

\+ + +

কিছুক্ষণ পরে এক বাটী ঠাণ্ডা জল ও কিছু মুড়ি মুড়কী সামনে রেখে দিয়ে পথিকের উদ্দেশ্যে গৃহী ব'ললে "কিছু খেয়ে নাও।"

পথিক একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে গৃহীর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রলে কিন্তু তার মুখ স্পষ্ট দেখতে পেলনা,—সে আলোর আড়ালে দাঁড়িয়েছে। ধন্যবাদ দেওয়া দরকার, কিন্তু সে ভাষাও তার মুখে এল'না, শুধু দুর্ভিক্ষ পীড়িতের মত উঠে বসে—কোনও রকমে তাড়াতাড়ি গিলতে সুরু ক'রে দিলে; খাবার সময়ও একবার মনে প'ড়লো না আজ সারা দিনের প্রখর রৌদ্র তার মাথার ওপোর দিয়ে কেটেছে, বিশ্রামের অবকাশ ছিলনা, এবং এখনও নাই, কারণ গন্তব্যস্থানে এখনও সে পৌছাতে পারে নাই,—কখন পৌছাবে তাও জানেনা.—তবু যাত্রা করতে হবেই।

× × ×

খাওয়ার পালা শেষ করে সে চাটাইয়ের একধারে একটু কাত হয়ে শুয়ে পড়লো, উদ্দেশ্য শ্রান্তি লাঘব করা। অন্য পাশে শায়িত গৃহী;

বালিশ বিছানার আড়ম্বর শূন্য, বিশেষ কিছু আসবাবও নাই,—কিন্তু তবুও ও এই ঘরেই বাস করে এবং অতিথিকে আশ্রয় দেবার সাহসও রাখে।

\+ + +

দুইজনেই শায়িত, নিতান্ত অবসন্ন ভাবে; কারো চোখেই ঘুম নাই।

আলোটা জ্বলছে খুব অল্প দমে, তাও পাছে চোখে আলো লাগে ব'লে এইদিকে আড়াল করা।

চারিদিকের ক্ষীণ আলো—বাঁশের দরোজায়, ঘরের চালে পড়ে চিক চিক করছে; থেকে থেকে টিকটিকি ডেকে উঠছে; বাইরের ঝিল্লীর ডাকও ডুবিয়ে দিয়ে নিশাচর পশু পাখীর কণ্ঠস্বর, পদশব্দ শোনা যাচ্ছে, আর কানে আসছে গাছের পাতা নড়ার শব্দ, বোধ হয় হাওয়া এসে দোল দিয়ে যাচ্ছে, যেন রাত্রির দীর্ঘশ্বাস।

× × ×

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা;—

পথিক গৃহীকে প্রশ্ন করলে "আকুন্দেপুর এখান থেকে কতদূর ?"

গৃহী বললে "সে অনেক, প্রায় ছয় সাত কোশ হবে।"

"এখান থেকে তোর নাগাত বার হ'লে বেলা নয়টা সাড়েনয়টার মধ্যে পৌছাতে পারবো না ?

"তা জোর পায়ে হেঁটে গেলে পারবে বৈকি, নিশ্চয়ই পারবে। কেন ? বিশেষ কোন দরকার আছে বুঝি ? কার বাড়ী যাবে বললে ?"

"সনাতন—সা—র।"

"তোমার নাম ?—"

"শ্রীগুরুচরণ পোদ্দার। নিবাস পাকপাড়া গ্রামে। কিন্তু তোমার পরিচয়টা তো নেওয়া হ'লোনা!—কি নাম তোমার—"

"শ্রীযুক্ত অনাথ বন্ধু মোদক"

"কি কাজ করা হয় ?—"

"দোকানদারী; ওতেই কোন রকমে দিন কেটে যায় বলে আর গ্রামের বার হইনি,—বুঝলে না ভায়া।" সে হাসলো,—

বিদ্যুতের স্পর্শের মত সে কণ্ঠস্বর গুরুচরণের বুকের মধ্যে পৌছাল কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। গুরুচরণ প্রশ্ন করলে—

"কাউকে তো দেখছিনে, একাই থাকা হয় বুঝি।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনাথ বন্ধু বললে "এখন তাই বটে, কিন্তু ছিল সবাই; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মা, বোন, সবই ছিল; কিন্তু এখন আর কেউ নেই। সে বছর গাঁয়ে এলো, ওলাউটো রোগ, গ্রামকে গ্রাম যে ওজোড়ে সাবাড় ক'রে দিলে, সেই সঙ্গে আমারও সব গেল, শুধু রইলাম একা আমি।"

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস যেন ওর বুকের সমস্ত পাঁজর কয়খানা কাঁপিয়ে দিয়ে বার হয়ে গেল।

পুনরায় প্রশ্ন করলে—

"তোমার কে কে আছে ?—"

"আমার! সে কথা আর বল কেন ভাই, সে অনেক; খেতে দেবার আয় নেই, কিন্তু পুষ্যি দিন দিন বেড়ে চলেইছে, ওর আর বিরাম বিশ্রাম নাই। তা ছাড়াও সংসারের অশান্তি! দিন রাত বৌ আর মায়েতে ঝগড়া, আর চুলোচুলি বাধছে। অশান্তি! অশান্তি! প্রাণ বেরিয়ে গেল ভাই—; আবার এদিকে বড় মেয়েটাও বিবাহ যোগ্যা হ'য়ে উঠেছে,—তাই এবার স্থির করেছি ওকে সঙ্গে নিয়ে গলায় দড়ী দিয়ে এ জ্বালার হাত এড়াব; আর সইতে পারছিনে।—"

একটা আর্ত্ত-আকুতি তার কণ্ঠস্বর ব্যক্ত হ'য়ে উঠলো।

\+ \+ \+

আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতায় কাটলো।

মাঝে মাঝে রাত্রিচরের কণ্ঠস্বর কানে আসছে। ঝাঁপের দরোজা ভেতর থেকে ভেজান, তবু খোলা জানালা দিয়ে হাওয়া আসছে, বেশ ঠাণ্ডা ওর স্পর্শ। খোলা জানালা দিয়ে পূর্ব্বাকাশে শুকতারা দেখা যাচ্ছে,—যেন একটা প্রকাণ্ড হীরা—। রাত বোধহয় বেশী নেই। বোধহয় একটু তন্দ্রা এসেছিল।

হঠাৎ হাওয়ার স্পর্শে একটু বেশী ঠাণ্ডা অনুভব করতেই ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে গুরুচরণ শুনলে কোন দূর গ্রামে একটা কুকুর ডাকছে।

কপালের ওপোরে এসে পড়া রুক্ষ, অবিন্যস্ত চুল গুলোকে হাত দিয়ে সরিয়ে সে উঠে বসলো—অনাথবন্ধু তখনও তেমনি ভাবে,—মুখের ওপোরে একখানা শীর্ণ হাত ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ে আছে, দেখে জাগ্রত মনে হলো না; তবুও প্রশ্ন করলে—

"জেগে আছ ?"

স্পষ্টস্বরে অনাথ বন্ধু উত্তর দিলে—

"হ্যাঁ।"

"রাত কত হবে ?"

"বোধহয় শেষ হয়ে এলো—দেখ আকাশের দিকে।"

গুরুচরণ উঠে দূরের দিকে তাকিয়ে দেখলো—সত্যই পূবের আকাশের যেন শেষ সীমায় একটা অস্পষ্ট সাদা আভা দেখা যাচ্ছে। বললে—

"এইবার তাহলে আমি আসি বন্ধু, তুমি দরোজা দিয়ে শুয়ে পড়; আজ সারারাত তো আমিই তোমায় জাগিয়ে তোগালুম।—

একটু থেমে ব'ললে—

"কিন্তু এ উপকার আমার চিরদিন মনে থাকবে; কখোনও ভুলবোনা।—"

হাতের পুটুলীটা তুলে নিয়ে সে হুকো [illegible]

আবার ডাকলে—

"বন্ধু—"

বন্ধু নিরুত্তর।

গুরুচরণ বললে—

"তোমার ভাবনার আর কোনও কারণ নেই,—এবার ঠিক আমি পথ চিনে নিতে পারবো,—আর ফরশাও তো হ'য়ে এলো; দু'চার পা চলতে চলতেই চারদিক আলো হ'য়ে উঠবে।" বন্ধু নীরব; যেন এইমাত্র সে গভীর নিদ্রামগ্ন হ'য়ে পড়েছে। আলোটা তখনও তেমনি কমে আলো দিচ্ছিল; কি একটা সন্দেহের বশে তার দম বাড়িয়ে দিয়ে গুরুচরণ অনাথবন্ধুর কাছে এসে দাঁড়ালো, কিন্তু অনাথ-বন্ধুর হাতখানা মুখের ওপোরে তখনও ঠিক তেমনি ভাবে ঢাকা দেওয়া। আর একবার ডেকেও উত্তর না পেয়ে হাত-খানা স্পর্শ কোরতেই গুরুচরণ চমকে উঠলো—ঠিক সেই সময়ে বরফের মত শীতল সে হাতখানা গুরুচরণের স্পর্শে সরে যেতেই সে দেখলে অনাথবন্ধু যেন নিঃশব্দে হাসছে—সে মুখ বিকৃত, চোখ যেন অক্ষি-কোঠর থেকে বার হ'য়ে আসছে,—সে মুখমণ্ডল রক্ত-লেশ-হীন।

হাত থেকে কাঁপতে কাঁপতে আলোটা মাটিতে পড়ে যেতেই গুরুচরণ একছুটে সে ঘর ছেড়ে বার হ'য়ে পড়লো।

হাওয়ার স্পর্শ তখনও তেমনি স্নেহময়—শীতল; কুকুরটা তখনও ডাকছে।

শিউলি

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

রাতের বুকে আমারে তুমি ফুটালে যবে প্রিয়
আপন রূপ পড়েনি চোখে মম,
জানি নি আমি জনম মম হল কি স্মরণীয়?
জেনেছি—তুমি জানো হে প্রিয়তম।
দিনের আলো দাও নি আমায়,
আঁধার দেছ ঢালি,
দিয়েছ দুটি চারটী তারা
রাখিতে দীপ জ্বালি;
সে দীপালোকে আঁধারই বাড়ে, পাই যে বড় ভয়,
চাহিনি আমি নিজের পানে কভু,
আঁধারে ফুটি, আবার পুন, আঁধারে পাবে লয়,
দিনের আলো দাও নি আমায় প্রভু।

\+ + +

রাতের হাওয়া দুলিয়ে চলে আমার দেহখানি,
কানে কানে আমার বাণী বলে,
কাঁদিয়া কহি,—"কহিছ যাহা জানিনে তাহা জানি;"
আমারে ঘেরি নৃত্য তাহাদের চলে।
যখন দুটি—[illegible] না জানে
তাহাদের কথা হাসি,
আঁধার বুকে আঁধার স্রোত
চলেছে শুধু ভাসি।
কাহারে ডাকি জানাব ব্যথা, গড়িল কেবা মোরে,
তাহার দেখা কোথায় আমি পাই,
সুধাব তারে—জনম মম আঁধারে কেন তরে
দিল সে ধাতা,—জানিতে শুধু চাই।
পূবের আলো পরশে যবে আঁধার ধরা মুখ,
আমার তখন যাওয়ার বেলা আসে,
রাতের স্মৃতিই বুকেতে শুধু জাগায় ক্ষণিক সুখ,
দিনের আলোক আঁধার সম ভাসে।
প্রভাতে হাওয়া কাঁপন লাগায়—
মাটিতে পড়ি ঝরে,
মাটির বুকই আমার নীরব
ব্যথায় ওঠে ভরে।
দিনের আলোক নয়কো আমার, জানি গো তাহা জানি,
আমায় কেবল রাতের আঁধার পাওয়া
দিন দিলে না নিঠুর, ওগো,—আঁধার দিলেই আনি
রইল সে গান—আর হল না গাওয়া।

নব্য রুশিয়ার শিশু আন্দোলন

কুমারী ছায়া দেবী

[সন্তান ধারণ, পালন ও তাহাদের সুশিক্ষা বিধান নারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। সুস্থ সবল যোগ্য নাগরিক গড়িতে হইলে রাষ্ট্রেরও শিশুদের ও জননীদের সুশিক্ষার দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার—বর্ত্তমান রুশিয়ার কি ভাবে শিশু আন্দোলন চলিতেছে সুলেখিকা ছায়াদেবী বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই বলিয়াছেন।]

কোন একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে শিশু সৌন্দর্য্যের উপর। সুস্থ শিশু হইল সুস্থ জাতির প্রতীক্। যে জাতির ভিতর যত সুস্থকায় শিশু দেখিতে পাওয়া যাইবে সে জাতির ভবিষ্যৎ ততো আশাপ্রদ। বর্ত্তমান যুগে স্বাধীনদেশ মাত্রেই অল্পবিস্তর শিশু আন্দোলন চলিয়াছে। যাহারা জাতির কল্যাণ কামনা করেন, জাতির মঙ্গল হৃদয়ে পোষণ করেন তাহাদের সুস্থ শিশু আন্দোলন করিতেই হইবে। কারণ শিশুর উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

শিশু আন্দোলনের ভিতর রুশিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমান রুশিয়া মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছে যে প্রাণবন্ত জাতি হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে হৃষ্ট-পুষ্ট শিশুর প্রয়োজন সর্ব্বপ্রথম। সেইজন্য রুশিয়ার শিশু আন্দোলন শিক্ষার বস্তু। স্বাধীন জাতি না হইলে উৎকৃষ্ট বৃত্তির বিকাশ হয় না। শুধু স্বাধীন জাতি হইলে হয় না তৎসাথে হৃদয়বান নেতার আবশ্যক। স্বার্থপর নেতা সার্ব্বজনীন কল্যাণ প্রার্থনা করিতে পারে না। শিশুর জীবন নির্ভর করে শিশু-জননীর উপর। স্বাস্থ্যবান শিশুর প্রয়োজন হইলে জননীর স্বাস্থ্যের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হইবে নচেৎ সুস্থকায় শিশু পাওয়া কঠিন। সে বিষয়ে রুশিয়া খরদৃষ্টি রাখিয়াছে। যে সমস্ত মনিষীরা বর্ত্তমানে জগৎ পরিভ্রমণ করিয়াছেন তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, রুশিয়ার স্বাস্থ্যবান শিশুর ন্যায় শিশু কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার হেতু কি? ইহার একমাত্র কারণ হইতেছে তাহারা সার্ব্বজনীন মঙ্গল কামনা করিতেছে। তাহারা নূতন সভ্যতার পত্তন করিতে চলিয়াছে। সে সভ্যতার মূলমন্ত্র হইল অর্থনৈতিক সাম্যবাদ। পতিতদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। দরিদ্রের আত্মচেতনা ও আত্মবিকাশ।

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই জানেন সুস্থ শিশুর প্রয়োজন হইলে স্বাস্থ্যবতী জননী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ জননীর স্বাস্থ্যের উপর সন্তানের স্বাস্থ্য বহু পরিমাণে নির্ভর করে। সেইজন্য গর্ভবতী নারী সম্বন্ধে বর্ত্তমান রুশিয়াতে নানা রাষ্ট্র নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। নারী গর্ভবতী হইলে তাহাকে প্রায়ই ক্লিনিকম্ এ যাইবার জন্য উৎসাহিত করা হয়। কারণ তথায় তাহার দেহ পরীক্ষার পর উপযুক্ত চিকিৎসক তাহার গর্ভ সম্বন্ধে নানা সুপরামর্শ প্রদান করেন। যদি দেহ মধ্যে সামান্য কোন ব্যাধি উপস্থিত থাকে তাহা হইলে সেগুলি কি উপায়ে শীঘ্র নিরাময় হইতে পারে সে সম্বন্ধে সুচিন্তিত পরামর্শ দান করেন। এমন কি সময় সময় প্রয়োজন হইলে পথ্য পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। গর্ভাবস্থায় জননীর স্বাস্থ্য যত ব্যাধিমুক্ত থাকিবে ততই শিশু এবং জননীর কল্যাণপ্রদ। সেজন্য রুশিয়ায় নারী গর্ভবতী হইলেই যাহাতে সে সুস্থদেহে সন্তান প্রসব করিতে পারে তজ্জন্য সতত চেষ্টা চলিতেছে।

বর্ত্তমান রুশিয়ার সমাজ-বিন্যাস জানিবার পূর্ব্বে, তাহার সভ্যতার আদর্শ এবং গতি অনুধাবন করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেকের বিশেষভাবে একটি বিষয় জ্ঞাত হওয়া অতীব প্রয়োজন। বর্ত্তমান রুশিয়া দেব-দেবী, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ-নরক, ঈশ্বর-শয়তান প্রভৃতি ভাবরাজ্যের অস্তিত্ব একেবারে স্বীকার করে না। মোটা স্থূলচক্ষে যে জগৎ আমরা নিত্য দেখিতেছি তাহারা তাহাই বিশ্বাস করে। পরীক্ষা দ্বারা ডাক্তার যদি দেখিতে পান যে গর্ভবতী নারী যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত তাহা হইলে তাহাকে স্বতন্ত্র হাঁসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয় যাহাতে তিনি আশু রোগমুক্ত হইতে পারেন। কারণ জননীর দেহের কুব্যাধি বা অশুভ-পীড়া সন্তান গ্রহণ করিতে প্রায়ই বাধ্য ইহাতে শুধু যে সন্তান রোগগ্রস্ত হইল তাহা নহে সঙ্গে সঙ্গে সমাজ শরীর ও রাষ্ট্র জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সন্তান কেবলমাত্র জনক-জননীর নহে, সে যে রাষ্ট্রের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। পরীক্ষা দ্বারা এমন যদি দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন গর্ভবতী নারীর দেহে কতকগুলি কুব্যাধি

(venereal disease) প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই নারী দুই মাস গর্ভবতী তাহা হইলে তাহার গর্ভ নষ্ট করিয়া দিবার জন্য তাহাকে পরামর্শ দেওয়া হয়। নচেৎ মেটারনিটি হাঁসপাতালকে তাহার ব্যাধি সম্বন্ধে জানাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে তাহার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত হয়। সমাজ দেহে বা নর নারীর দেহে অনেক সময় সভ্যতার প্রশ্রয়ে নানা কুকার্য্য প্রবেশলাভ করে। রাজধানী মাত্রেই কুব্যাধির আকর। সেজন্য রুশিয়াতেও কুব্যাধির একসময় যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান নিয়ম পদ্ধতি অবলম্বনে বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। সহরে সকলেই প্রসূতিগারে সন্তান প্রসব করে। পূর্ব্বে শিশু মৃত্যুর হার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে গর্ভবতী নারীদের দেহ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনে শিশু মৃত্যুর হার যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে হাজার করা ২৮৫টি শিশু মারা যাইত; বর্ত্তমানে ১৩৭টি লেনিনগার্ডে এবং ১২৮টি মস্কোতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহা হইল ১৯২৮ সনের বিবরণ।

গর্ভবতী নারী সম্বন্ধে রুশিয়াতে নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে যে, প্রসবের সময় যে সব নারী শারীরিক কর্ম্ম করে তাহারা চারমাস ছুটি পাইবে; দু'মাস পূর্ব্বে এবং দু'মাস প্রসবের পর। যদি গর্ভবতী নারী নর্ত্তকী বা ধাত্রী বা নারী চিকিৎসক হন তা'হলে তিনিও চারমাস বিশ্রামের জন্য ছুটি পাইবেন। কিন্তু যাহারা আফিসে কর্ম্ম করেন তাহারা তিন মাস ছুটি পাইবেন। ছুটির সময় প্রত্যেকেই পূর্ণ মাহিনা পাইয়া থাকেন।

রুশিয়াতে ফ্যাক্টরিতে দিনে সাত ঘণ্টা করিয়া কর্ম্ম করিতে হয়। যখন পুনরায় এইসব নারী কর্ম্মে যোগদান করেন তখন তাহারা প্রত্যহ দেড় ঘণ্টা করিয়া ছুটি পায়। তাহাদের সন্তানদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রত্যেক ফ্যাক্টরির সঙ্গে স্বতন্ত্র ঘর আছে। ছুটির সময় তথায় জননীরা আসিয়া আপন আপন সন্তানকে যত্ন করেন। বেশীর ভাগ শিশুই কাজের সময় ক্রেচেসে (creches) লালিত পালিত হয়। প্রত্যেক কর্ম্মস্থলেই ক্রেচেস্ সংশ্লিষ্ট আছে। ফ্যাক্টরি আফিস, এবং এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়েও সহিত একটি করিয়া ক্রেচেস্ সংশ্লিষ্ট আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট থাকিবার একটু বিশেষ কারণ আছে। রুশিয়ার প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহযোগ শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত। সেইজন্য যদি কোন যুবক যুবতী পাঠ্যাবস্থায় সন্তান কামনা করে তাহা হইলে তথায় সে বাসনা দোষণীয় বস্তু নহে। পাঠ্যাবস্থায় তাহাদের সন্তান যাহাতে সুখে লালিত পালিত হইতে পারে তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ক্রেচেসের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ক্রেচেসে যে সন্তান রাখিতে হইবেই এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই, তবে প্রত্যেক জননীই শিশু কল্যাণ যাহাতে হয় যে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছে। এই শিশু সুখছায়া প্রত্যহ বেলা সাতটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত উন্মুক্ত থাকে।

শিশু সুখছায়া তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে দু মাস হইতে নয়মাস পর্য্যন্ত শিশুর পরিচর্য্যা হয়। প্রত্যেক ঘরে চারিটী করিয়া শিশু সাধারণতঃ বাস করে। কখন ইহার বেশীও একঘরে বাস করে; কিন্তু দশটির বেশী কখন একঘরে রাখা হয় না। ইহাদের জন্য ছোট ছোট ক্যান্‌ভাসের বিছানা আছে। তাহার উপর ইহারা শয়ন করে। গায়ে কেবল মাত্র একটি পরিষ্কার ধপধপে চাদর থাকে। প্রত্যেক বস্তুটি অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; কোনরূপে ময়লা থাকিবার উপায় নাই। নির্ম্মল বায়ু প্রবেশের জন্য সমস্ত দরজা জানালা সদাসর্ব্বদা খোলা থাকে, তাহাতে শিশুদেহের কোন অনিষ্ট হয় না।

মাতৃদুগ্ধ হইল শিশুদেহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর খাদ্য কিন্তু নানা কারণ বশতঃ সব সময় শিশুগণ মাতৃদুগ্ধ পান করিতে পায় না বলিয়া বিশুদ্ধ দুগ্ধ শিশুগণকে যথাসময়ে পান করান হয়। প্রথম শিশুদিগের জন্য দুগ্ধ সরবরাহ করিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয় তবে অন্যান্যরা পাইবে নচেৎ নহে। কারণ দুগ্ধই হইল শিশুর প্রাণ। টিউবারকুল বিহীন দুগ্ধ যাহাতে শিশুরা পান করিতে পায় সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।

দ্বিতীয় বিভাগ হইল নয় মাস হইতে আঠার মাস পর্য্যন্ত শিশুদিগের জন্য। এই বিভাগে শিশুদিগকে লাফালাফি, দৌড়ান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। ছোট ছোট নানা বর্ণের খেলা আছে। সেইগুলি শিশুদিগকে

খেলিবার জন্য দেওয়া হয়। যাহাতে তাহারা সদাসর্ব্বদা আনন্দভোগ করিতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয়।

তৃতীয় বিভাগ হইল আঠার মাস হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত। এই বিভাগে ছোট ছোট টেবিল চেয়ার আছে যাহাতে বসিয়া তাহারা খেলিতে বা গল্পগুজব করিতে পারে। এই খেলা; গল্প বা কথাবার্ত্তার দ্বারা তাহারা বাল্যকাল হইতে নাগরিক শিক্ষালাভ করিতে চেষ্টা করে; তাহাদের আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা মধুময় হইয়া উঠে।

ইহা ব্যতীত বিকলাঙ্গ প্রভৃতি শিশুদিগের জন্য স্বতন্ত্র ক্রেচেশ আছে। এরূপ যদি দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন কোন শিশুর অল্প বয়স হইতেই পানীয় পদার্থের উপর লালসা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

তিন বৎসর পর্য্যন্ত ক্রেচেসে বাস করিতে পারে তৎপরে কিণ্ডারগার্টেনে যাইতে হয়। কিণ্ডারগার্ডেনে তিন বৎসর হইতে সাত বৎসর পর্য্যন্ত থাকিতে হয়। ১৯৩১-৩২ সালে ছয় মিলিয়ন, তিন বৎসর হইতে সাত বৎসর পর্য্যন্ত বালক কিণ্ডারগার্টেনে ছিল।

সোভিয়েট রুশিয়ার শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। পুরাতনের সহিত তাহারা কোন সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছুক নহে। শিক্ষার দ্বারা নবীন ভাবের ভাবুক নরনারী সৃজন করিতে চাহে। তাহারা এমন সব শারীরিক মানসিক কর্ম্মঠ নরনারী চাহে যাহারা পুরাতন ধর্ম্মের ভক্ত না হইয়া উঠে। কারণ লেনিন বলিয়াছিলেন, Religion is the opium of the people অর্থাৎ ধর্ম্ম হইল মানব জীবনে আফিমের নেশা। সেই জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার শিক্ষাপদ্ধতিতে ধর্ম্মবস্তু চিরকালের মত নির্ব্বাসিত হইয়াছে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাহারা জগৎটাকে জানিতে চাহে। আকাশের উপর একজন বসিয়া আছে যে মৃত্যুর পর একদিন শাস্তি বিধান করিবে এইরূপ ভাবগ্রস্ত নরনারী হইতে তাহারা ইচ্ছুক নহে।

সংসার জীবনে সুখে বসবাস করিতে হইলে স্বাস্থ্য যে একান্ত প্রয়োজন এ জ্ঞান বাল্যকাল হইতে শিশু হৃদয়ে তাহারা প্রবেশ করাইয়া দেয়। শিশু যদি একবার অনুভব করে যে বিনা স্বাস্থ্যে জীবন সুখকর ও শান্তিপূর্ণ হয় না তাহা হইলে তাহারা অযথা কখন স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইবে না। শারীরিক পরিশ্রমের মূল্য তথায় অত্যধিক সেজন্য নাগরিকের স্বাস্থ্যের প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টি সুগভীর।

আর একটি শিক্ষাবস্তু রুশিয়ার চিন্তাশীলতাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। বাল্যকাল হইতে সকলের সাথে মিলেমিশে কর্ম্ম করিবার শক্তি এবং প্রত্যেকেই যে রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য কর্ম্ম করিতেছে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিতেছে। আমি রাষ্ট্রের সন্তান, আমার উপর রাষ্ট্রের ভালমন্দ নির্ভর করিতেছে এই জ্ঞান সোভিয়েট বালক বালিকারা বাল্যকাল হইতে শিক্ষার দ্বারা অর্জ্জন করিতেছে। ঠাকুরমার গল্প তথায় প্রচলিত হইবার কোন উপায় নাই, সোভিয়েট শিক্ষাপদ্ধতিতে ইহা একদম নিষেধ। ইহাদ্বারা মানব মন, শিশুমন বাল্যকাল হইতে বিষাক্ত হইয়া উঠে, বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া উঠে ইহাতে শিশুমনের গভীর অকল্যাণ হয়। প্রত্যেক বিষয় বস্তুর ভিতর সহযোগবৃত্তি দেদীপ্যমান। এমন কি শিশুরা ক্রেচে খেলাধূলা করিবে তাহাও সঙ্ঘবদ্ধভাবে করা চাই। বসবাস করিবার জন্য নিভৃত আলয় বা কক্ষ নাই। সঙ্ঘশক্তি যাহাতে শিশুমনে বাল্যকাল হইতে জাগ্রত হয় তাহার চেষ্টাই তাহারা সতত করিতেছে। কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা পদ্ধতিতে বালক বালিকাকে সদাসর্ব্বদা উৎসাহিত করা হয় যাহাতে তাহারা প্রত্যেকে শারীরিক পরিশ্রমে সহযোগে কর্ম্ম করিতে পারে। মাঝে মাঝে তাহাদের ফ্যাক্টরিতে লইয়া যাওয়া হয় সমস্ত জিনিষ চাক্ষুষ দেখাইবার জন্য।

সোভিয়েট রুশিয়াতে নারীরা অনেক কিছু শারীরিক পরিশ্রমের কর্ম্ম করিতেছে। ট্রামচালান, মটর চালন, পাউরুটি তৈয়ারি, দর্জ্জির দোকান প্রভৃতি কর্ম্মে সোভিয়েট নারীরা যথেষ্ট পারদর্শীতা দেখাইতেছে। ইহা ব্যতীত বড় বড় শারীরিক পরিশ্রমের কর্ম্মেও তাহারা সুদক্ষতা পরিপূর্ণভাবে দেখাইতেছে। না দেখাইবারতো কোন সুসঙ্গত কারণ নাই। সুবিধা ও সুযোগ ও সহানুভূতি পাইলে অনেকেই সামর্থ্য দেখাইতে পারে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

লেনিন একদিন সদর্পে বলিয়াছিলেন, "মূর্খতা রুশিয়া

হইতে চিরতরে নির্ব্বাসন করিব।" অতি অল্পদিবসের মধ্যে সোভিয়েট রুশিয়া শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে যে দৃঢ় নিশ্চয়তা দেখাইয়াছে তাহা জগতের প্রত্যেক সুধী ব্যক্তির নিকট নমস্য! অত বড় বিপুল জড়-মূর্খতাকে কেমন করিয়া অল্পদিনের ভিতর নির্ব্বাসন করিল তাহা একটি ভাবিবার বিষয়। শুধু ভাবিবার বস্তু নহে ইহা একটি বিপুল বিস্ময়! ১৯১৩ সালে সাড়ে সাত মিলিয়ন শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। ১৯৩২-৩৩ সালে বর্দ্ধিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে ২৫,০০০,০০০ শিশু সংখ্যা।

তথায় স্কুল দুইভাগে বিভক্ত প্রাইমারি ও সেকেণ্ডারি। প্রাইমারী স্কুলে ব্যায়াম ও সঙ্গীত ব্যতীত শিক্ষক অন্যান্য বিষয়গুলি অধ্যয়ন করান। সেকেণ্ডারি স্কুলে শিক্ষকেরা সেই বিষয়গুলিকে বিষদভাবে শিক্ষা দেন। ছোট ছোট বালক বালিকারা চারি ঘণ্টা করিয়া অধ্যয়ন করে এবং বড় বড় ছেলেমেয়েরা ছয় ঘণ্টা করিয়া পড়ে। বর্ত্তমানে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাগান তৈয়ারি, avaries, poultry এবং rabbit farms প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। যেখানে সুবিধা ও সুযোগ হইতেছে সেখানে ফ্যাক্টরির সহিত স্কুল স্থাপনা হইতেছে কারণ শিক্ষার্থীরা স্বচক্ষে বিষয় বস্তু দর্শন করিয়া সহজে জিনিষটি বুঝিতে পারিবে। রাষ্ট্র সদাসর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছে, যাহাতে কর্ম্মীর চক্ষু লইয়া নাগরিক জীবন গঠিত হয়। বর্ত্তমান রুশিয়াতে প্রত্যেকেই কর্ম্মী।

বৎসরের চারিমাস অত্যন্ত গ্রীষ্ম বলিয়া স্কুল সকল ছুটি থাকে। সেই সময় বেশীর ভাগ ছাত্রকে বনবিভাগীয় স্কুলে পাঠান হয়। কাহাকেও বা গ্রীষ্ম-তাঁবুতে রাখা হয়। তথায় তাহারা প্রায় উন্মুক্ত বাতাসে বাস করে এবং বৎসামান্য পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকে। প্রাকৃতিক শোভার সহিত তাহারা তথায় বিচরণ করে। যাহারা যাইতে পারিলনা সহরে রহিল তাহারা উদ্যানে বাস করিতে লাগিল। বর্ত্তমান সোভিয়েট রুশিয়া নানা প্রকার উদ্যান (park) তৈয়ারি করিয়াছে। ছাত্রদিগের জন্য অন্য প্রকার উদ্যান তৈয়ারি হইয়াছে যথায় গ্রীষ্মাবকাশে বাস করা যায়। তাহার ভিতর সুন্দর খেলিবার স্থানও ভোজনাগার আছে। সেই সকল উদ্যানে ছাত্ররা গ্রীষ্মের চারিমাস বাস করে। ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তথায় উপযুক্ত শিক্ষক আছে। ইহার ব্যয়ভার বহন করিবার সুন্দর নিয়ম হইয়াছে। ২৫ ভাগ ব্যয় পিতার ট্রেড ইউনিয়ন এবং বাদবাকি জনকবে বহন করিতে হয়। যে সমস্ত ছাত্রের জনকজননী অপারগ তাহাদের ব্যয়ভার স্বাস্থ্য বিভাগের কমিসারিয়েট বহন করে। ১৯৩২ সালে ১৫ মিলিয়ন বালক বালিকা এইভাবে গ্রীষ্মবকাশে আনন্দ উপভোগ করিয়াছে।

শুধু যে ছাত্রদিগকে স্কুলে পাঠাইলেই কর্ত্তব্য শেষ হইল এমত নহে। ছাত্রের সংস্কৃতির যাহাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় সে বিষয়ে তাহারা পূর্ণদৃষ্টি রাখিতেছে। নাট্যাভিনয়ের দ্বারা যাহাতে ছাত্র ছাত্রী রসবোধ সম্যক ভাবে জন্মায় তজ্জন্য তথায় রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ছোট ছোট বালক বালিকাদিগের জন্য ৬৫টি রঙ্গালয় আছে। কতকগুলি রঙ্গালয়ে গ্রামের গ্রাম্য ভাষায় নাটক অভিনীত হয় তাহাতে বালক বালিকারা সহজে বিষয় বস্তুর রসবোধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। এক মস্কো সহরে ছোট ছোট বালক বালিকাদের জন্য ছয়টি রঙ্গালয় বর্ত্তমান আছে। প্রবেশ পত্রের মূল্য এইসব শিশু রঙ্গালয়ে বৎসামান্য। শিক্ষাবিভাগীয় কমিশারিয়েট ও ট্রেড ইউনিয়নদ্বারা ইহার ব্যয়ভার বহন হয়। মস্কো ও লেনিনগার্ড শিশু রঙ্গালয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। লেনিনগার্ড শিশু-রঙ্গালয়ে বার'শ দর্শকের স্থান আছে। ইহারা অর্দ্ধ মিলিয়ন রুবল বাৎসরিক সাহায্য পায়। এমন শিশু রঙ্গালয় আছে যথায় প্রবেশপত্রের কোন মূল্য নাই। ইহাই হইল প্রাণবন্ত রাষ্ট্র। মস্কো শিশু রঙ্গালয় প্রায় ১২বৎসর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—এবং এই সময়ের ভিতর ৭১ টি নাটক অভিনীত হইয়াছে। এই সমস্ত নাটক অভিনয়ে দর্শকের একটি নূতন মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছে। নাটক অভিনীত হইবার পূর্ব্বে সকল দর্শকই নাটক লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করে কিন্তু অভিনয় শেষ হইলে তখন নাটক লইয়া আর আলোচনা করেনা, শুধু অভিনয় লইয়া

তীব্র সমালোচনা করে। Marionette রঙ্গালয়ও বালক বালিকাদিগের জন্য আছে। মস্কোতে ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গালয় বর্ত্তমান, ইহা ব্যতীত চারিটি Marionette ভ্রমণ রঙ্গালয়ও আছে। মাঝে মাঝে ইহারা নূতন পুতুলের প্রদর্শনী করে বলিয়া রাষ্ট্র পুস্তকালয় হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ইহাদ্বারা শিক্ষাবিভাগের প্রচার কার্য্য হয়। ইহা ব্যতীত শিশু-প্রফুল্লতার জন্য বা শিশু-সংস্কৃতির জন্য ১৫টি সিনেমা আছে। তথায় শিশুমনোপযোগী ছবি দেখান হয় এবং যে সমস্ত সাধারণ রূপবাণী আছে তথায়ও সময় সময় শিশুদের জন্য ছবি দেখাইতে হইবে, ইহা হইল রাষ্ট্র নিয়ম অন্যথা হইবার উপায় নাই।

শিশুচিত্তে সুকুমার শিল্পের উৎকর্ষতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিদান সোভিয়েট রুশিয়া করিয়াছেন। এইরূপ দেখা গিয়াছে যে নাচগান, মূর্ত্তিগঠন ও চিত্র অঙ্কনে বালক বালিকার সুকুমার শিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া তাহাদের সুকুমার বৃত্তি ব্যক্ত হয়। শীতকালে লেনিনগার্ডে এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। সেই প্রতিযোগিতায় ব্যজ পাইবার জন্য বালক বালিকা উৎসুক হইয়া উঠে। কতকগুলি ক্লাব পাঠাগার ও সহরে বালক বালিকা দিগের কেশরঞ্জনের জন্য সেলুন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বর্ত্তমান সোভিয়েট রুশিয়াতে নানা প্রকৃতির উদ্যান তৈয়ারি হইয়াছে। মস্কো সহরে শান্তি ও সংস্কৃতি (Park of culture and rest) একটী উদ্যান আছে। তাহার ভিতর একটি গ্রাম্য শিশু উদ্যান প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই শিশুউদ্যানে সন্তরণের জন্য পুকুর, খেলিবার স্থান নৌবিহার এবং ছোট ছোট রেলগাড়ী আছে। যেমন বড় বড় রেল পথে ষ্টেশন প্রভৃতি থাকে এইস্থানেও ঠিক তদ্রূপ সমস্ত ক্ষুদ্রাকারে আছে। শুধু ইহাই নহে মূর্ত্তিগঠন ও তারের কাজ শিখিবার জন্য ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর বর্ত্তমান আছে। এই সকল উদ্যানে অল্পব্যয়ে শিশু দিগের জন্য ভোজনের ব্যবস্থা আছে, এবং সেইস্থানে সমস্ত দিন আনন্দে অতিবাহিত করে। আনন্দদানই হইল শিশু শিক্ষার প্রথম স্তর, আনন্দের ভিতর দিয়া শিশুমন যত শীঘ্র উন্নত হইবে অন্য কোন পন্থাদ্বারা তাহা হইবার উপায় নাই। নরনারী চিত্তে শিশুমূর্ত্তি যেমন আনন্দদায়ক তাহার শিক্ষাও সেইরূপ আনন্দ নিকেতন করা কর্ত্তব্য। সোভিয়েট রুশিয়া ইহা মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছে বলিয়া তাই নবপদ্ধতিতে শিশু আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ার শিশু আন্দোলন প্রত্যেক জাতির অনুকরণীয় ইহা তাহাদের শ্লাঘা ও গৌরবের বস্তু।

আবাহনী

গান—শ্রীমতী বেলারাণী বিশ্বাস

সুর—সাহানামিশ্র। তাল—একতালা।

ওগো, অচেনা—অতিথি। তুমি এস, তুমি এস।।
কোন্ সুদূরের অচিন্ দেশেতে,
কোন্ সাগরের পরপার হ'তে,
কোন্ অজানা পরদেশী এলে, পেতেছি আসন, বোস।
তুমি এস, তুমি এস।।

ওগো—যাত্রা তোমার সজল সাঁঝে
এলে—বৃষ্টি বাদল ঝড়ের মাঝে গো,—
এস—স্বরগের চাঁদ মুখে হাসি লয়ে,
ঘোর—আঁধার আলয় আলোকে ভাবায়ে,
(আজি) হউক উজল নিরালা এ পুরী, পূজিব তোমারে এস।
তুমি এস, তুমি এস।।

সঙ্গীত বিভাগ

আধুনিক বনাম ওস্তাদী গান

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

আমাদের দেশে আজকাল গানের আদর হয়েছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশনে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে সঙ্গীতের স্থান দিবার প্রস্তাব করেছেন।

মেয়েদের মধ্যে গান শিক্ষার এতটা আগ্রহ কয়েক বৎসর আগে বোধ হয় ছিল না। গানের মত নির্মল আনন্দের জিনিষ আর নাই। প্রত্যেক মেয়েরই গান শেখা উচিত।

প্রাচীনকালে এদেশে সঙ্গীতের স্থান ছিল অনেক উচ্চে। গানকে সাধনার মধ্যে ধরা হয়েছিল।

রূপকোটী গুণং ধ্যানং ধ্যানকোটী গুণো লয়ঃ
লয়কোটী গুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি।

সঙ্গীত যে আবার তার পুরাতন গৌরব ফিরে পাবে তার সূচনা দেখা দিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও টেক্সট্ বুক কমিটি গানের যে সিলেবাস্ তৈয়ারী করেছেন তাহাতে প্রাচীন বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর উপরই বেশী ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা ঠিকই হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। ছবি আঁকবার আগে যেমন রঙ চেনা দরকার, তেমনি বৈজ্ঞানিকভাবে গান শিখতে হলে প্রথমে রাগ রাগিণীগুলির সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার। ব্যাকরণ না শিখেও যেমন লিখিতে পারা যায়, তেমনি রাগরাগিণী না জেনেও গান গাওয়া যায়, কিন্তু সেটা ঠিক পথ নয়।

আজকাল বাঙ্গালা গান ও হিন্দুস্থানী ওস্তাদী গানের মধ্যে পার্থক্য বেড়ে চলেছে। হিন্দুস্থানী গানের যে আনন্দ তাহা intellectual—বুঝতে বুদ্ধিবৃত্তির দরকার। সে যেন ব্যাকরণগত-প্রাণ পণ্ডিতের রচনা। কিন্তু ব্যাকরণই সব নয়। শিক্ষার্থীর পক্ষে ব্যাকরণ পড়া দরকার; কিন্তু সাহিত্য যেমন ব্যাকরণ অনুসরণ করেনা—ব্যাকরণই সৃষ্টি হয় সাহিত্য হইতে, তেমনি রাগরাগিণীই প্রধান নয়—প্রধান গানের ভাব। কীর্তন ও আধুনিক বাঙ্গালা গান এইখানে প্রাণহীন ওস্তাদী গানের চেয়ে অনেক বড়। তথাকথিত ওস্তাদের হাতে পড়ে, বাঙ্গালা গানকে কি দুর্দশাগ্রস্ত ও হাস্যকর হয় তা। যিনি শুনেছেন তিনিই স্বীকার করবেন।

আধুনিক বাঙ্গালা গান বেশীভাগ ভাবগত (emotional)। রবীন্দ্রনাথ, অতুল প্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুলের গানগুলি ভাব ও সুরের বৈচিত্র্যে অনুপম।

বিভিন্ন বর্ণসম্পাতে যেমন চিত্রকর সুন্দর ছবি সৃষ্টি করেন, তেমনি রাগ-রাগিণীর মিশ্রনে নূতন নূতন সুরের সৃষ্টি হয়। রাগ-রাগিণীগুলি খাঁটি না রাখিলে যে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে এই ধারণা কোন কোন লোকের আছে। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে যতদিন হিন্দু সঙ্গীতে সত্যকার স্রষ্টা ছিলেন, তাঁরা বিভিন্ন রাগিণীর মিশ্রনে নূতন নূতন রাগ রাগিণীর সৃষ্টি করিয়া হিন্দু সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। অবশ্য মিশাইতে জানা চাই। কতকগুলি রাগিণীর মধ্যে পরস্পর এমন সম্বন্ধ আছে যাহাতে একের সহিত অন্য একটী মিশাইলে মিষ্ট শুনায়। সঙ্গীতে পাণ্ডিত্য না থাকিলে কেহ এ ভাবে মিশ্রিত রাগিণী সৃষ্টি করিতে পারে না।

আজকাল বাঙ্গালা গানে বিলাতী সুর দিবার চেষ্টা হইতেছে। এইভাবে বিদেশী সুর ও রাগিণী হিন্দু সঙ্গীতে পূর্ব্বেও আসিয়াছে, সুতরাং ইহাতে হিন্দু সঙ্গীতের জাতি হারাইবার ভয় নাই। ইমন পারস্যদেশের রাগ; আমীর খসরু ইহা ভারতবর্ষে প্রচলিত করেন। সাহানা, আড়ানা, বাহার, আলাহিয়া প্রভৃতিও মুসলমানদের সময় সংগৃহীত হইয়াছিল।

বিলাতী সুর যদি লইতেই হয় তাহা দেশীয় ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে। বিলাতী সুর বাঙ্গালা গানে প্রথম দেন দ্বিজেন্দ্র লাল রায়। তাঁহার "আমার জন্মভূমি" গান আজো বাঙ্গালীর প্রাণকে মাতাইয়া তুলে। এটা বিলাতী সুর—দেশীয় রাগিণীর ছাঁচে ঢালা। যে দেশের যাহা ভাল তাহা লইতে বাধা নাই। সুর যে সময় জীবন্ত জিনিষ ছিল ভারতবাসীর প্রতিভা তখন ছাঁচে ঢালা কতকগুলি রাগ রাগিণী লইয়া পরিতৃপ্ত থাকিত না। এখন যে সব রাগরাগিণী দেখি সেগুলির রূপও চিরদিন এখনকার মত ছিল না। প্রাচীনের কাঠামোর উপর নূতন গড়িয়া উঠুক ইহাই আমাদের কামনা।

স্বরলিপি

[সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালীর গৌরব। কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়ের রচিত এই গানখানিতে তিনি যে সুর দিয়াছেন তাহা ভাব ও মাধুর্য্যে অনুপম হইয়াছে।]

সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীত নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বর সরস্বতী

ভৈরবী—একতালা

এস মা আজি এস গো।
মুছায়ে ব্যথা, নয়ননীর,
ভালবেসে হেসে চেয়ো গো।
এনো মা লক্ষ্মী, বিদ্যা বুদ্ধি,
এনো গণপতি—কর্ম্মে সিদ্ধি,
সংসারেতে জয়, এনো মা অভয়,
দুর্ব্বলতা অরি নাশ গো।
দিয়ো গো সুখ, মুখে হাসি;
দিয়োনা ক্রন্দন, দুঃখ রাশি;
শক্তি স্বরূপা, সন্তানে তব
শক্তি কণাটুকু দিও গো।

কথা—কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

আস্থায়ী

০			১			২´			৩		
{ সা	দা	পা |	মা	জ্ঞা	মা |	জ্ঞা	ঋা	সা |	-া	-া	-া }
{ এ	স	মা |	০	আ	জি |	এ	স	গো |	০	০	০ }

০			১			২´			৩		
ণা	সা	সা |	দা	দা	দা |	পা	দা	মপা |	পা	দা	পা
মু	ছা	য়ে |	০	ব্য	থা |	ন	য়	ন০ |	০	নী	র

০			১			২			৩		
জ্ঞা	পা	দা |	জ্ঞা	মজ্ঞা	মা |	জ্ঞমা	জ্ঞা	সঋা |	জ্ঞঋা	সণ্‌া	সা ||
ভা	ল	বে |	সে	হে০	সে |	চে০	য়ো	গো০ |	০০	০০	০ ||

অন্তরা

০ ১ ২´ ৩
{ দা দা মা | দা -া ণা | দণা সা ণা | র্সা -া সা |
এ নো মা | ল ০ ক্ষ্মী | বি০ ০ দ্যা | বু ০ দ্ধি |

০ ১ ২´ ৩
দা ণা র্সা | জ্ঞা ঋা র্সা | ণর্সা ঋা র্সা | ণদা -া পা }
এ নো গ | ণ প তি | ক০ ০ র্ম্মে | সি০ ০ দ্ধি

০ ১ ২ ৩
জ্ঞা -া পা | পা পা পা | দা র্সা ণধা | ণা দা পা |
সং ০ সা | রে জ য় | এ নো মা০ | অ ভ য় |

০ ১ ২ ৩
জ্ঞা পা পা | পা দা পা | মা ক্ষা জ্ঞমা | জ্ঞঋা সণ্ সা ||
দু র্ব্ব ল | তা অ রি | না শ গো০ | ০০ ০০ ০ ||

২য় অন্তরা

০ ১ ২´ ৩
{ জ্ঞা মা দণা | র্সা র্সা র্সা | র্সা ণদা ণর্সা | ঋণা র্সা র্সা |
দি য়ো গো০ | ০ সু খ | মু খে০ ০০ | ০০ হা সি |

০ ১ ২ ৩
দা ণা র্সঋা | জ্ঞা ঋা র্সা | র্সা ঋা র্সা | ণা দা পা }
দি য়ো না০ | ০ ক্র ০ | ন্দ ন দু | খ রা শি

০ ১ ২ ৩
জ্ঞা -া পা | পা পা পা | পদা ণর্সা ণধা | ণা দা পা |
শ ০ ক্ত | স্ব রূ পা | স০ ০০ স্বা০ | নে ত্র য় |

০ ১ ২ ৩
জ্ঞা পা পা | পা দা পা | মা মা পমা | জ্ঞঋা সণ্ সা ||
শ ক্তি ক | ণা টু কু | দি ও গো০ | ০০ ০০ ০ ||

তান

০ ১ ২ ৩
১। ণসা জ্ঞমা পদা | ণর্সা ঋর্জ্ঞা ঋর্সা | ণদা পণা দপা | মজ্ঞা ঋসা ণ্সা |
০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ |

০ ১ ২´ ৩
২। জ্ঞঋা র্সঋা র্সণা | সণা দণা দপা | মজ্ঞা মপা দপা | মজ্ঞা ঋসা ণ্সা |
০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ |

স্বরলিপি

স্বরলিপি—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস

[শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ দাস বর্ত্তমানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় গায়ক। রেডিওতে ও রেকর্ডে তাঁহার সুললিত সঙ্গীত সকলেই শুনিয়াছেন। এ গানখানির রচনা সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও গায়ক শ্রীযুত হীরেন্দ্র কুমার বসুর]

আগমনী—দাদ্‌রা

আজ আগমনীর আবাহনে কি সুর উঠেছে বেজে।
দোয়েল শ্যামা ডাক দিল তাই বরণের এয়ো সেজে॥
ভরা ভাদরের ভরা নদী কলকল ছোটে নিরবধি।
সে সুর গীতালি দেয় করতালি, নাচে তরঙ্গ দোলনে যে।
পূরব দীপক আরতির দীপ শত ছটা মেঘ জালে
দিক বালা তাই আলতা গুলেছে রক্ত আকাশ থালে;
ঘাসের বুকেতে শিশির নীর ধোয়াবে ও রাঙ্গা চরণ ধীর,
সবুজ আঁচলে মুছে নেবে বলে ধরণী শ্যামল সেজে যে।

+ ০ + ০
জ্ঞমা পণা পা | মা মা পা | রা জ্ঞা রা | সা -া -া |
আ০ ০জ আ | গ ম নীর | আ বা হ | নে ০ ০ |

পা সা সা | সরা সরা ণ্‌া | সা জ্ঞা মা | পা া া |
কি সু র | উ০ ঠে০ ছে | বে ০ ০ | জে ০ ০ |

পণা ণধপা পা | পধা া ধমা | পধা ণর্সা ণা | ধা পা পা |
দো০ য়ে০০ ল | শ্যা০ ০ মা০ | ডা০ ০ক দি | ল তা ই |

পা পা পা | দা মা পা | মা গমা া | পা (সা সা) |
ব র ণে | র এ য়ো | সে ০০ ০ | জে আ জ |

"আজ আগমনীর আবাহনে" ইত্যাদি

ণধা ধপা পা | মা জ্ঞমা জ্ঞমা | ণা ধা মা | পা র্সা া |
ভ০ রা০ ভা | দ রে০ ০র | ভ রা ন | দী ০ ০ |

নৃত্য

কুমারী আভাময়ী বসু

সেকালে আমাদের দেশে মহিলাদের মধ্যে নৃত্যের খুব আদর ছিল ; এখন সে সব গল্প কথা হইয়া পড়িয়াছে। বিরাট রাজার অন্তঃপুরে অর্জ্জুন বৃহন্নলা নামে ছদ্মবেশে নাচ শিখাইতেন। এখনো গুজরাটে ভদ্রমহিলাদের নাচ বিখ্যাত। বাঙ্গালাদেশেও বিবাহের বাসরে কখন কখন মেয়েদের নাচের কৌশল দেখাইতে দেখা যায়।

প্রলয়ের সন্ধ্যায় প্রচণ্ড বিষাণে মহামৃত্যু সঙ্গীতের তালে তালে মহাদেব নাচিয়াছিলেন, সে নৃত্য তাণ্ডব নৃত্য। রবীন্দ্রনাথের তাণ্ডব নৃত্যের বর্ণনা সুন্দর—

'প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে, হে নটরাজ,
নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে।
জাহ্নবী তার মুক্ত ধারা
উন্মাদিনী দিশে-হারা
সঙ্গীতে তার তরঙ্গ দল উঠ্‌ল দুলে।
রবির আলো সাড়া দিল
আকাশ পরে শুনিয়ে দিল
অভয়বাণী ঘর ছাড়ায়ে
আপন স্রোতে আপনি মাতে
সাথী হল আপন সাথে
সব হারা সে সব পেলে তার কূলে কূলে।'

নটরাজ তাণ্ডব নৃত্য আবিষ্কার করেন; সেই নাচ ব্রহ্মার উপদেশে তণ্ডু (নন্দী) শেখান ভরতকে। তণ্ডুর নাম হইতে এই নৃত্যের নাম হইয়াছে তাণ্ডব নৃত্য। ভগবতী সুকুমার লাস্য নৃত্য আবিষ্কার করেন।

সেকালে নৃত্যের কত আদর ছিল তাহা নিম্নলিখিত শাস্ত্রের বচন হইতে বুঝা যায়—

যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা ভাবে বহুসু ভক্তিতঃ।
সনির্দ্দহতি পাপানি জন্মান্তর শতৈরপি

(দ্বারকা মাহাত্ম্য)

যিনি আনন্দিত মনে অত্যন্ত ভক্তিযুক্ত হইয়া নৃত্য করেন, তিনি শতজন্মের পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন।

নৃত্য ও গান প্রায় একই জিনিষ। সঙ্গীত শাস্ত্রকে এজন্য দৃশ্য ও শ্রাব্য ভেদে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছিল। দৃশ্য সঙ্গীতই নৃত্য। কণ্ঠদ্বারা গান বা কণ্ঠসঙ্গীত হয়। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়া নৃত্য হয়।

মেয়েদের মধ্যে আবার নাচের প্রচলনে দেখা যাইতেছে ; এটা খুব আনন্দের বিষয়। নৃত্য যে শুধু মনকেই প্রফুল্ল করে তাহা নয়। মেয়েদের পক্ষে নৃত্যই একমাত্র স্বাভাবিক ব্যায়াম।

উদয় শঙ্কর

নৃত্যে শুধু হস্তপদ নয়, দেহের সর্ব্বাঙ্গের ব্যায়াম হয়। আমাদের দেশে মেয়েরা অল্পবয়সেই বৃদ্ধা হইয়া পড়ে—তার একটী কারণ মুক্ত বায়ু ও উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাব। ছোট ছোট মেয়েদের মধ্যে নৃত্যের প্রচলন এইজন্যই আনন্দের বিষয়।

ছায়াচিত্র

নর্ম্মা শিয়ারার

কুমারী প্রতিমা চক্রবর্ত্তী

নর্ম্মা শিয়ারার আজ ছায়াছবির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠেছেন এবং সেখান থেকে তিনি যে সহজে স্থানচ্যুত হবেন না তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি তাঁর প্রত্যেক ছবিতে। কিন্তু এই সেদিনই নর্ম্মাকে রাস্তায় রাস্তায় কাজের চেষ্টায় অনাহারে ঘুরতে দেখা গেছে। এখন নর্ম্মা মেট্রো গোলডউইন মেয়ার কোম্পানীর বড় কর্ত্তা আরভিং থ্যালবার্গের পত্নী। অনেকেই মনে করেন নর্ম্মার এত নামডাক সম্ভব হয়েছে তিনি বড় কর্ত্তার পত্নী বলে। কিন্তু তাঁরা যদি নর্ম্মার জীবনী পড়েন তা'হলে এই ভুল ধারণা চলে যাবে। আমরা আজ নর্ম্মা শিয়ারের জীবন সম্বন্ধে একটু আলোচনা ক'রব।

১৯০৩ সালের ১০ই আগষ্ট ক্যানাডার মন্ট্রিল সহরে নর্ম্মা শিয়ারার জন্ম হয়। নর্ম্মার বাবা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ

NORMA SHEARER

ছিলেন। দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে নিয়ে তিনি ওয়েষ্ট মাউণ্টে যান। সেখানেই নর্ম্মার পড়াশোনা হয় ডোমিনিয়ন পাবলিক স্কুলে। নর্ম্মার ভাই ডগলাস্ এখন মেট্রো কোম্পানীর শব্দযন্ত্রী।

ছেলেবেলায় নর্ম্মা বেশীর ভাগ সময় ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতেন এবং লড়াই ক'রে অনেক সময় তাদের হারিয়েও দিতেন। জন্তু জানোয়ারের উপর অত্যাচার নর্ম্মার মোটেই সহ্য হ'ত না। একদিন কয়েকটি ছেলে একটা কাঠবিড়ালীর ল্যাজ ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে তাকে মারছিল। ছোট্ট নর্ম্মা খানিকক্ষণ চুপ করে দেখলে—তারপর দৌড়ে গিয়ে দু'হাতে ছেলেদের ঘুষি মারতে লাগল। ছেলেরা অবাক হ'য়ে এবং ভয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ জন্তুটাকে ছেড়ে দিলে এবং সেইদিন থেকে তাদের সঙ্গে নর্ম্মার খুব ভাব হ'য়ে গেল, কারণ নর্ম্মার সাহসে তারা মুগ্ধ হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে 'প্রাইভেট লাইভস্' এর একটা দৃশ্যের কথা মনে প'ড়ে। এ জায়গাটায় নর্ম্মার সঙ্গে রবার্ট মণ্টগোমারীর মারামারি হচ্ছিল। হঠাৎ একবার নর্ম্মা (সম্ভবতঃ পূর্ব্বস্মৃতি ফিরে আসায়) রবার্টকে একটি দুষ্টু ছেলে মনে ক'রে এমন জোরে চড় মারলেন যে রবার্ট পড়ে গিয়ে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেন নর্ম্মার দিকে। নর্ম্মাও খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ দৃশ্যটা এত চমৎকার হয়েছিল যে এ জায়গাটা বাদ দেওয়া হল না যদিও রবার্টের গাল এবং নর্ম্মার হাত ভয়ানক জ্বালা করছিল।

ছেলে বেলায় নর্ম্মার ইচ্ছা ছিল যে তিনি একজন নামকরা সাঁতারু বা দৌড়বাজ হবেন। কিন্তু তাঁর বয়স যখন বছর চৌদ্দ নর্ম্মার ইচ্ছা হ'ল ফিল্মের কাজে যোগ দেন। কিন্তু মা বাবা একথা শোনামাত্রই মেয়েকে খুব বকুনি দিলেন। কিন্তু নর্ম্মা দমবার পাত্রী নন্। শেষে মা বাবার মত হ'ল। ঠিক হ'ল যে নর্ম্মার বোন এ্যাথোল এবং তাদের মা সঙ্গে যাবেন। নর্ম্মার বাবা কিছু টাকা ধরে দিলেন নর্ম্মার হাতে এবং কথা হ'ল যে এই টাকা ফুরিয়ে গেলে আর তিনি দেবেন না আর এই সময়ের মধ্যে কোন কাজ না পেলে অভিনেত্রী হওয়ার সখটা ত্যাগ করে নর্ম্মাকে বাড়ী ফিরতে হবে।

তারপর একদিন মিসেস্ শিয়ারার দু'টি মেয়েকে নিয়ে নিউ ইয়র্কের ট্রেণে চড়ে বসলেন।

নিউ ইয়র্কে যখন গেলেন তখন নর্ম্মার বয়স ১৭ বৎসর। একটি ছোট ফ্ল্যাট নিয়ে নর্ম্মা মাকে সংসারের সব জিনিষ গুছিয়ে দিয়ে চাকরীর চেষ্টায় বেড়িয়ে পড়লেন।

নর্ম্মা আগে কখনো ফিল্ম বা ষ্টেজে কাজ করেন নি। তাই যেখানেই যান, আগেকার অভিজ্ঞতা নেই ব'লে

বিদায় করে দেয়। সেই সময় তিনি কোথাও ভাল ছবি থাকলেই একটা কমদামী টিকিট কিনে যেয়ে বসতেন এবং মন দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত দেখে বাড়ী এসে একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ষ্টারদের নকল করতেন। কিন্তু এত চেষ্টাতেও কোন ফল হ'ল না।

এইভাবে কিছুদিন গেল। নর্ম্মার মা ও বোন সব আশা ছেড়ে দিয়ে বাড়ী ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন।

হঠাৎ নর্ম্মার বরাত খুলে গেল। একটা নূতন ফিল্ম কোম্পানী একটা ছবির জন্যে লোক সংগ্রহ করছিল। বারো জন মেয়ে দরকার। নর্ম্মা ও এ্যাথেল গিয়ে ষ্টুডিওতে উপস্থিত হ'লেন। এক অ্যাসিষ্ট্যান্ট ডিরেক্টারের সামনে মেয়েদের ভীষণ ভীড়। এগোতে পারা গেল না। ক্রমে ক্রমে এগারো জন মেয়ে নেওয়া হয়ে গেল। তখন উপায়হীন হয়ে একবার জোরে নর্ম্মা একটু কেসে উঠলেন। অ্যাসিষ্ট্যান্ট ডিরেক্টার তাকাতেই নর্ম্মা একটু মুচকে হাসলেন। সে নর্ম্মার নামটা লিখে নিলে। তখন নর্ম্মা তাকে আধঘণ্টা ধরে কথা বলে বুঝিয়ে দিলেন সেই মায়ের অংশটিতে এ্যাথেলকে চমৎকার মানাবে। সে নর্ম্মার কথার তোড়ের সামনে দাঁড়াতে না পেরে এ্যাথেলেরও নাম লিখে নিলে। দু'জন মিলে কাজটার জন্যে সাড়ে চার পাউণ্ড পেলেন।

এরপর থেকে নর্ম্মা ছোটখাটো কাজ পেতে লাগলেন। 'দি ষ্টিলারস্' ও 'চ্যানিং অফ দি নর্থ ওয়েষ্ট'—ছবি দুটিতে তাঁর বেশ নাম হ'ল। এই ছবিটি তোলার ফলেই তাঁর হলিউডে যাওয়া হ'ল। আরভিং আলবার্গ—সে সময়ে ইউনিভার্সালের জেনারাল ম্যানেজার—এই ছবি দুটিতে নর্ম্মাকে দেখে তাঁর সঙ্গে কনট্রাক্ট করতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু নর্ম্মা রাজী না হ'য়ে চুক্তিপত্র ফেরৎ দিলেন।

কিন্তু অ্যালবার্গ ছাড়বার পাত্র নন। এর কিছুদিন পরেই আবার নতুন কনট্রাক্ট এল। নর্ম্মা এটাতে রাজী হবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় মেয়ার কোম্পাণী (পরে মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার কোম্পাণী) থেকে কন্ট্রাক্ট এসে হাজির। নর্ম্মা শেষোক্ত কোম্পাণীর সঙ্গে লেখাপড়া করে ফেললেন।

নর্ম্মা হলিউডে এলেন মা ও বোনের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে অ্যালবার্গের প্রথম পরিচয় বাস্তবিকই ভারী মজার। মেয়ার ষ্টুডিওতে হাজির হলে নর্ম্মাকে একটা ঘরে বসান হ'ল। সেখানে তিনি দেখেলেন সুশ্রী একটী যুবক দাঁড়িয়ে। নর্ম্মা ঠিক করলেন ছেলেটি হচ্ছে অফিসের চাকর এবং তাঁকে বললেন জেনারেল ম্যানেজারকে খবর দিতে। নামটা নর্ম্মা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলেন। ছেলেটি গম্ভীর ভাবে নর্ম্মাকে একটি প্রকাণ্ড ঘরে নিয়ে গিয়ে নিজে টেবিলের বড় চেয়ারটি দখল করে বসলেন। নর্ম্মা তখন বুঝলেন যে চাকরটী আর কেউ নয়, ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং এবং তিনিই আরভিং অ্যালবার্গ।

অ্যালবার্গের কাছে এখনও একটি ছোটো নোটবই আছে। তাতে তিনি ভবিষ্যতে নাম করতে পারবে এমন অভিনেতা অভিনেত্রীর নাম লিখে রাখেন। নর্ম্মা শিয়ারের নাম তা'তে লেখা আছে দু'টী ফিগুর নামের পাশে—দি ষ্টিলারস্ ও চ্যানিং অফ দি নর্থ ওয়েষ্ট। এর থেকেই বোঝা যায় যে নর্ম্মা নিজের ক্ষমতাতেই বড় হয়েছেন—বড় কর্ত্তার স্ত্রী বলে নয়।

অ্যালবার্গের সাহায্যে নর্ম্মা ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন। পাঁচ বছরের একটী কনট্রাক্ট হ'ল মেয়ার কোম্পাণীর সঙ্গে। এই পাঁচ বছর নর্ম্মা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং তাঁর সঙ্গে আরভিংও খাটেন। এই সময়েই তাঁদের ভালবাসার সূচনা হয় যদিও এন্‌গেজমেণ্টের কয়েক সপ্তাহ আগেও নর্ম্মা এক বন্ধুকে বলেন যে তাঁর বিবাহের কোন সম্ভাবনাই নেই।

নর্ম্মা হলিউডে আসার তিন বছর পরে একজন ষ্টার ব'লে গণ্য হলেন। ষ্টার হওয়ার পর থেকে নর্ম্মা ও আরভিংএর ঘনিষ্টতা বেড়ে গেল। তারপর ২৯।৯।২৭ তারিখে নর্ম্মা শিয়ারার 'মিসেস্ আরভিং অ্যালবার্গ' হ'লেন। তাঁর স্বামীর প্রতি ভালবাসার গভীরতা এই থেকে বোঝা যায় যে পাছে পরে কোন বিরোধ হয় এই ভয়ে বিবাহের সময় খৃষ্ট ধর্ম্ম ত্যাগ করে 'জু' ধর্ম নিয়েছিলেন।

কিছুদিন পরেই 'দি ডিভোরসি' ছবিতে অভিনয় ক'রে নর্ম্মা দি একাডেমি অফ মোশান পিকচার্সের প্রাইজ পেয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ব'লে পরিচিত হ'লেন। ১৯৩০ সালের ২৫শে আগষ্ট ছোট্ট আরভিং পৃথিবীতে এল। সবাই মনে করেছিল নর্ম্মার যশের দিন ফুরাইয়া গেল। কিন্তু পরের ছবিগুলিতে দেখা যাচ্ছে ক্রমশঃই তাঁর অভিনয় ভাল হচ্ছে। স্মাইলিং থ্রু ও ষ্ট্রেঞ্জ ইণ্টারল্যুড্ ছবি দু'খানি দেখে আমরা বুঝতে পারি যে, যিনি এত সুন্দর অভিনয় করতে পারেন তিনি কখনই স্বামীর প্রতিপত্তিতে নাম করেন নি।

নর্ম্মা এখন খুব সুখী। উপযুক্ত স্বামী ও সুন্দর ছেলেটিকে নিয়ে তিনি মহানন্দে আছেন। তবে তাঁর কাজ বন্ধ হয়নি। তাঁর নতুন ছবি 'রিপ টাইড' শোনা যাচ্ছে খুব ভাল হয়েছে। নর্ম্মার সঙ্গে এতে আছেন হারবার্ট মার্শাল, রবার্ট মণ্ট গোমারী ও মর্নীয়া লিলিয়ান ট্যাশম্যান। নর্ম্মার পরের ছবি কবি ব্রাউনিং ও তাঁর পত্নী এলিজাবেথ ব্যারেট্ ব্রাউনিংএর প্রণয় কাহিনী নিয়ে। ছবির নাম হবে—'ব্যারেটস অফ উইমপোল ষ্ট্রীট'। আশা করি এ ছবিটিও খুব ভাল হবে আর নর্ম্মা শিয়ারার ও অ্যালবার্গের খ্যাতি উত্তরোত্তর বাড়ুক।

উপন্যাস—

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

[বর্ত্তমানে যে সব মহিলারা গল্প-উপন্যাসে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন শ্রীমতী পূর্ণশশী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 'দিশেহারা' তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ উপন্যাস। 'নিশীথ বাদল' উপন্যাস পাঠেও পাঠক-পাঠিকারা আনন্দিত হবেন বলেই আশা করি।]

(১)

—মাসীমা! মিনু আজ স্কুলে গেল না যে? ব্যাপার কি?—বলতে বলতে শুভ্রা মিনতিদের ড্রয়িংরুমের দরজায় গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সেখানে মিনতির মা করুণাদেবী, যে সুশ্রী সুবেশ যুবকটীর সঙ্গে কথা বলছিল, তিনি শুভ্রার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

—কে রে—শুভ্রা? ঘরে আয় না মা! লজ্জা কি? প্রেমেশ তো ঘরের ছেলে—

করুণা দেবীর সাদর আহ্বানে শুভ্রা ঈষৎ কুণ্ঠার সহিত ভেতরে এসে, অপরিচিতের পানে চকিতে একবার তাকিয়ে, ছোট একটি নমস্কার ক'রে মাসিমার পাশে এসে দাঁড়াল।

করুণা তার হাত ধরে প্রেমেশের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে বললেন—এ মেয়েটীকে তুমি চেনো না প্রেমেশ, মিনতির একজন বিশেষ বন্ধু এ, এক সঙ্গেই পড়ে, গলায় গলায় ভাব দুজনার, একদিন না দেখলে...

প্রেমেশ প্রতি নমস্কার করে' সেই অপরিচিতা তরুণীর দিকে এতক্ষণ চেয়েছিল—কেমন বিস্ময়-বিমূঢ়ের মত, এবার অপ্রতিভ ভাবে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সে শুধু বললে—ও!

শুভ্রা করুণাদেবীর দিকে ফিরে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে—মিনু কোথায় মাসিমা?

—সে, এই যে কাজ ভাজতে গেল বুঝি! বস্ না শুভ্রা!

—আসছি মাসিমা, মিনুকে ডেকে আনি—

শুভ্রার সঙ্গে সঙ্গে করুণা দেবী বাইরে এলেন, শুভ্রা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে—উনি কে মাসিমা? আপনাদের আত্মীয় বুঝি?

—হ্যাঁ, আত্মীয় এখনো হয় নি, তবে শীগগির হবার আশা করা যায়—। আচ্ছা ছেলেটিকে দেখে কেমন বোধ হয়?

করুণার সাহাস্য প্রশ্নের উত্তরে শুভ্রা একটুকু বিস্মিত হয়ে বললে—কেন বলুন দেখি? ভালই তো দেখলুম। বেশ সুশ্রী চেহারা—

কেবল চেহারাই নয়, এ দিকেও ভাল। বেশ মোটা মাইনের চাকরী নিয়ে এসেছে, ইলেক্‌ট্রীক ইঞ্জিনীয়ার, সজ্জাতিপরও বটে। তাই আমাদের ইচ্ছে ..

বাকি কথাটা করুণা শুভ্রার কাণে কাণে বললেন—শুভ্রার মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পুলকিত স্বরে—বাঃ! সে তো ভালই হবে মাসিমা! খুব ভাল হবে—বলে সে ছুটে গেল মিনতির সন্ধানে।

মিনতি ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ বিন্যাস করছিল, শুভ্রা সেথায় গিয়ে তার যত্নরচিত বেণীটা দিলে একটান্—

—পোড়ারমুখি! রোজ রোজ স্কুল কামাই করে এই কীর্ত্তি করা হচ্ছে বুঝি?

—উঃ হু হু! লাগেরে!—

মিনতি মুখ ফিরিয়ে ফিক করে হেসে ফেললে।

শুভ্রা হাসির উচ্ছ্বাস চেপে নিয়ে ভুরু কুঁচকে বললে—আ গেল যাঃ! আবার হাসে? লজ্জা করে না হাসতে?

মিনতি তবু হাসতে হাসতেই বললে—বাবারে বাবা! এত রাগ কেন শুভ্রাদি? অপরাধ?

—অপরাধ? এতবড় একটা ব্যাপার লুকিয়ে রাখা...

—ওঃ হো! বুঝেছি এবার, রাগ হবার কথাই বটে! কিন্তু ব্যাপারটা যে নিতান্ত আকস্মিক ভাই! আমার দোষ কি? আমি কি জানতুম হঠাৎ এমন করে···

—ওরে আমার নেকীরে!—মিনতির হিমানী মাখা নরম গালদুটী আদরে টিপে দিয়ে শুভ্রা সকৌতুকে বলে উঠল—তুমি তো কিছুই জানতে না গো! ওদিকে লুকিয়ে লুকিয়ে কোর্টশিপ চালানো হচ্ছে তো বেশ! কেন আমাকে জানালে আমি কেড়ে নিতুম নাকি?

—তা কে জানে? বিশ্বাস কি? এই 'সঞ্চারিণী দীপ-শিখা'টীর কাছে আমাকে কি রকম বিশ্রী...দেখনা!—

মিনতি সখীকে বাহুবেষ্টনে জড়িয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। দুজনার প্রতিচ্ছায়া পাশাপাশি পড়ল—দর্পণের প্রশস্ত স্বচ্ছ বুকে।

শুভ্রা সুন্দরী, গৌরী, তার প্রদীপ্ত রূপের ছটায় পার্শ্ববর্তিনী মিনতির যত্ন-প্রসাধিত কমনীয় সুকুমার শ্যামল-শ্রী নিষ্প্রভ, ম্লান হয়ে পড়েছে যেন।

মনে মনে একটুকু ক্ষুব্ধ হ'লেও মিনতি প্রফুল্ল ভাবে বললে—দেখলে শুভ্রাদি? তোমার পাশে আমাকে কি কুৎসিত...না ভাই, তুমি সামনে থাকলে আমার 'চান্স' নেই মোটে! সত্যি—

—অতএব তুমি বিদায় হও! বলনা!—থামলি কেন? আচ্ছা ভাই, আমি চলে যাচ্ছি,—দরকার কি?

শুভ্রা মিনতিকে সরিয়ে দিয়ে রাগের ভান করে' চলে যাচ্ছিল, মিনতি তাকে ধরে' ফেলে খিল খিল করে হেসে উঠল। বললে—

—বারে! পালালে তো চলবে না, আমার 'বর'টীকে যাচাই করতে হবে যে! তামাসা নয় শুভ্রাদি, সত্যি—মানুষটাকে তোমার কেমন লাগল বলো দেখি?

—তা কেমন করে বলি? কতটুকুই বা দেখলুম? শুধু চেহারাখানি......

—তাই তো বলছি, চলো না, ভাল করে দেখবে। মানুষের চেহারাই তো সব নয়, অন্তরটাও···

—অন্তরের পরীক্ষা নিলেই তো পারিস্—

—সময় পাচ্ছি কই? মা যে বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ও রত্ন পাছে হাতছাড়া হয়ে যায়! বাবার ও নেহাত্ ইচ্ছে—

আর তোর?—

—আমার?—আমার ইচ্ছে অনিচ্ছে কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি এখনো, তাই তো বল্‌ছি—

করুণা ডাক দিলেন—মিনু! হ'ল তোর?

দুই সখী হাত ধরাধরি করে ঘরে ঢুকতে প্রেমেশের প্রশংসমান ব্যগ্র দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল প্রথমে শুভ্রার দিকেই। সাজ শয্যার বাহুল্য নেই, একখানি মিলের কালাপেড়ে ধোওয়া শাড়ী আর ফিকে বাদামী রংয়ের ব্লাউজ পরা, কাণে দুটী নীল চুনীর টপ, সরু সরু সোণার চুড়ী ক'গাছি হাতের রংয়ে মিশে গিয়েছে যেন। চুলগুলো আল্‌গা ভাবে জড়িয়ে রাখা শুধু। সুগঠিত ঈষৎ দীর্ঘ ঋজু দেহ। একটা লীলা-চঞ্চল চটুল ভাব তা'র সুন্দর মুখ ও উজ্জ্বল চোখ দুটীকে অতি মনোরম করে তুলেছে।

তার পাশে মিনতি—যেন আলোর পাশে ছায়া।

মিনতি—

'ক'টা বাজল?—

বলে' নিষ্পলক প্রেমেশের দিকে চাইতেই সে ত্বরিতে চোখদুটো ঘড়ীর দিকে ফিরিয়ে বল্লে—

—পাঁচটা পঁয়ত্রিশ—এখনো সময় আছে যথেষ্ট। ছ'টার পর বেরোলেইতো চলবে। ততক্ষণ গল্প করা যাক্, আপনি বসুন না।

শেষ কথাটা শুভ্রাকেই লক্ষ্য করে বলা হ'ল। মিনতি নিজের পাশের চেয়ারে শুভ্রাকে বসিয়ে, বল্লে—হাঁ্যা মা! শুভ্রাদিকেও নিয়ে যাই যদি···

করুণাদেবী উত্তর দেবার আগেই প্রেমেশ ব্যগ্রতার সহিত বলে উঠল—

—বেশ তো? উনি ও চলুন না আমাদের সঙ্গে—তাহলে···

কিন্তু কথাটা শেষ করতে না দিয়ে করুণাদেবী সব্যস্তে বল্লেন—

—তা কেমন করে হয় ? শুভ্রার সময় হবে কি ?

শুভ্রা জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় মাসিমা ? কোথায় যাবার কথা হচ্ছে ?—

'টকিতে' কোন্ একটা নূতন উর্দ্দু 'ফিল্ম' দিয়েছে খুব ভাল নাকি ? যাবে শুভ্রাদি ?

প্রেমেশ মিনতির কথায় সায় দিয়ে—শুভ্রার মুখপানে তাকিয়ে অনুরোধের সুরে বল্লে—

—চলুন না।

কথাটা শুধু শিষ্টাচার রক্ষার জন্যই নয়—প্রেমেশের কণ্ঠস্বরে যথার্থ একটা আগ্রহ ছিল বুঝি।

শুভ্রা একটু বিব্রত ভাবে ইতস্ততঃ করে বল্লে—মাপ করবেন, আমার যাওয়া আজ সম্ভব নয়, বাবার শরীর অসুস্থ।

করুণাদেবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লেন এবার। প্রসন্নমুখে তিনি বল্লেন—

আমি তো আগেই বলেছি। ও বেচারীর সময় কোথায় ? সংসারে নেহাৎ একলাটী, তার ওপর বাপের নিত্য অসুখ, ওরি মধ্যে লেখাপড়া করছে যে এই ওর বাহাদুরী বল্‌তে হয়।

আরো দু'চারটে অবান্তর কথার পর শুভ্রা ঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে পড়ল—

ছ'টা বেজে গিয়েছে,—আমি চলি এবার। কাল তো রবিবার, পরশু স্কুলে যাবি তো ? নাকি সেদিন ও...

শুভ্রা মিনতির কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে কি বল্লে, তার চোখে মুখে চাপা হাসির আভাস,—মিনতি আরক্ত মুখে তার হাতে একটা চাপ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল।

সখীর কাছে বিদায় নিয়ে শুভ্রা রাস্তায় নেমেছে দু'চার পা চলেওছে, সেই সময় তার কানে গেল মিনতির আহ্বান—

—শুভ্রাদি ! শোনো—

শুভ্রা ফিরে দেখলে মিনতি ও প্রেমেশ মোটরের [illegible] দাঁড়িয়ে, কাছে যেতেই মিনতি বল্লে—

—হেঁটে আর যাবে কেন ? আমাদের সঙ্গেই চলো না, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমরা—

—আহা ! এইটুকু তো পথ তা আবার মোটরে করে—

তাতে কি হয়েছে ? এ পথটুকুনি আমাদের সঙ্গে গেলেই বা ? আসুন—

মিনতি শুভ্রার হাত ধরে মোটরে উঠে পড়ল। আপত্তি করবার অবকাশই পেলে না সে।

শুভ্রাদের বাসা খুব কাছে না হলেও দূর ও নয়। পাঁচ মিনিট ও লাগল না পৌঁছতে, তার মধ্যে আর কথা বলবার সুযোগ প্রেমেশ পেলেনা, কিন্তু শুভ্রা যখন মোটর থেকে নামছে তখন সে আর থাকতে না পেরে বলে ফেল্লে—দয়া করে মধ্যে মধ্যে আসেন যদি—বড় সুখী হব—

—আসবেন তো ?

উত্তরে শুভ্রা কি যে বল্লে তা শোনা গেল না, মোটর 'ষ্টার্ট' করার বিকট শব্দে।

প্রেমেশ কেমন বিমনা হয়ে পড়ল। একান্তে—অভীপ্সিতা তরুণী সঙ্গিনীর পাশে বসে ও সে চুপ করে রইল স্বপ্নাবিষ্টের মত।

তার এ ভাবান্তর সরলা মিনতি লক্ষ্যও করেনি বোধ হয়।

২

আকৃতি প্রকৃতি ও অবস্থাগত বিশেষ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মিনতির মত অন্তরঙ্গ বন্ধু শুভ্রার কেউ ছিলনা আর। তাদের সৌহার্দ্দ আজকের নয় প্রায় দুবছর আগে। শুভ্রা মিনতি অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়।

মিনতির পিতা উমাচরণ ঘোষ সেক্রেটেরিয়েটের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, দেশে পৈতৃক বিষয় সম্পত্তিও কিছু আছে, সুতরাং অবস্থা বেশ স্বচ্ছল তাঁ'র।

বড় ছেলেটীকে বিলাত পাঠিয়েছেন শিক্ষার জন্য। বড় মেয়েটীর বিবাহ দিয়েছেন ভাল ঘরেই। ছোট মেয়ে মিনতিও তার কোলের ভাই খুনু এখানেই স্কুলে পড়ে।

উমাচরণবাবুকে কার্য্যানুরোধে রকমের মধ্যে [illegible]

দিল্লী এবং ছয়মাস শিমলায় থাকতে হ'লেও স্থায়ী সংসার রাখতে হয় দিল্লীতে এই ছেলে মেয়ে দুটীর লেখাপড়ার জন্য।

শুভ্রার পিতা দেবেন্দ্রনাথ দত্ত স্থানীয় সরকারী স্কুলে হেডমাষ্টার ছিলেন, ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য অসময়ে পেন্সন নিতে হয়েছে তাঁকে। মাতৃহীনা শুভ্রাই তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন, এই মেয়েটীর জন্যই ভদ্রলোকের যা চিন্তা, নহিলে শান্তির সংসারে তাঁর অভাবও নেই অভিযোগও নেই কিছু।

দেবেনবাবু দ্বিতলের বারান্দায় ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, শুভ্রাকে দেখে কাগজখানা রেখে দিয়ে বল্লেন—

—এত শীগগির ফিরলে যে,—কেমন দেখলে তোমার বন্ধুকে? ভাল তো।

—হ্যাঁ—

পিতার পাশে বসে শুভ্রা স্মিত প্রফুল্ল মুখে বল্লে—মিনুর সম্বন্ধ হচ্ছে বাবা, বিয়ে খুব শীগগিরি হবে বোধ হয়।

—তাই নাকি? পাত্রটী কেমন? কোথায়…

—এইখানেই কাজ করেন, ইলেক্‌ট্রিক্ ইঞ্জিনীয়ার, দেখতে শুনতে সব রকমেই ভাল। আমি যে ওদের সঙ্গেই এলুম, আমাকে নামিয়ে দিয়ে ওরা দুজনে 'টকিতে' গেল।

—বেশ বেশ! অমনি একটি সুপাত্র আমিও পেতুম যদি…

দেবেনবাবু জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেল্লেন, সে নিঃশ্বাসের অর্থ বুঝে শুভ্রা একটুখানি ক্ষুব্ধ অথচ মধুর হাসি হেসে বল্লে—বাবার খালি এই চিন্তা।

দেবেনবাবু আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ক্ষোভের সহিত বল্লেন—

—হাঁা মা, বাস্তবিক,—শরীরে যে পর্য্যন্ত ভাঙ্গন ধরেছে, ওই চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠছে আমার। সংসারে আত্মীয়ের মত আত্মীয় যদি কেউ থাকত, যাকে তোমার ভার দিয়ে—আমি নিশ্চিন্ত হয়ে—

—থাক্ বাবা, ওসব ভেবে অনর্থক মন খারাপ করে কেন? নিজের ভার নিজে বইবার ক্ষমতা ভগবান্ মানুষ মাত্রেকেই দিয়েছেন বোধহয়। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই কি আমার কিছু…

কথার শেষটা শুভ্রার মুখে বেধে গেল যেন। কণ্ঠস্বরে তার বেদনার আভাস সুস্পষ্ট,—সে ব্যথা অভিমানের কি?

পরিণয়ের প্রসঙ্গ শুভ্রাকে কেন যে উন্মনা করে তোলে, তার সঠিক্ নিদান দেবেনবাবু হয়তো অনবগত, তবু মেয়ের আনন্দ-লেশ-হীন উদাস মুখের পানে মমতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দুঃখিত ভাবে তিনি বল্লেন—

—কি করা যায়, এযে ভগবানের নিয়ম মা! মেয়ে জাতকে তিনি দুর্ব্বল করে সৃষ্টি করেছেন বলেই তো…

—না বাবা, এ নিয়ম মানুষের তৈরী, ভগবানের নয়। পুরুষত্বের গর্ব্ব খর্ব্ব হবার আশঙ্কায় নারীশক্তিকে পঙ্গু করে রাখতে চায় যারা এ বিধান সৃষ্টি করেছিল তারাই। কিন্তু আর তো সেদিন নেই, এখন যুগধর্ম্ম মেয়েদের নিষ্পেষিত সুপ্ত শক্তি জাগ্রত করে তুলেছে, তারা আজ বুঝেছে…

পিতার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় শুভ্রা সহসা চুপ করে গেল কি ভেবে কি জানি।

একমুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে, উত্তেজনা-রক্ত মুখখানি মধুর স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়ে সে অকাল-বার্দ্ধক্য গ্রস্ত পিতার কাঁচাপাকা চুলগুলি গুছিয়ে দিতে দিতে বললে—আচ্ছা আমার এ বাবাটীর ভার কে নেবে বলতো? আমাকে যদি সত্যি সত্যি বিদায় হতেই হয়…না বাবা, কাজ নেই ও সব ঝঞ্ঝাটে—বেশ তো রয়েছি আমরা,—এর মধ্যে খামখাই একটা উপদ্রব জুটিয়ে দরকার কি?

—পাগলী! কিছু বোঝে না,—এমনি করেই কি চির-জীবন যাবে রে?

—যতদিন চলছে, চলুক না! পরে কি হ'বে না হবে ভেবে মনকে উত্যক্ত করে কোনো লাভ নেই তো? আমি দেখছি তুমি আজকাল বড্ড বেশী ভাবো, সেই জন্যেই রোগা হয়ে যাচ্ছ দিনের দিন। কণ্ঠার হাড় গুলো কি রকম বেরিয়েছে!…

শুভ্রার প্রফুল্ল মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল। প্রবাসী

বেশী দূর অগ্রসর হবার ভয়ে দেবেন বাবু তাড়াতাড়ি বললেন—ও বুড়ো হলেই অমন হয়ে থাকে। মানুষের দেহ কি আর চিরদিন একরকম...আচ্ছা বন্ধুর বিয়েতে তুমি উপহার কি দেবে বলো দেখি? একখানা ভাল কাপড় কি ছোট খাটো কিছু গহনা—

শুভ্রা খুসী হয়ে বললে—ও: ! সে পরে ভেবে ঠিক করা যাবে, যেমন সুবিধে হয়। দিনস্থির তো হয় নি এখনো। হঁ্যা, কাল যে রবিবার ছুটীর দিন, তুমি কি খাবে বলতো? রোজ তাড়াতাড়িতে কিছু পেরে উঠি না, কাল নতুন একরকম মাংস রান্না করব আমাদের স্কুলে একটী কাশ্মীরি মেয়ের কাছে শিখেছি, আর 'সেমই'য়ের পায়েস তুমি ভালবাস, তাই করে' দেব কেমন?

দেবেন বাবু আদর করে মেয়ের পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন—বা: বা: ! তা হলে কালকের খাওয়াটা তো খুব ভালই হবে মা! আমার শুনেই যে ক্ষিদে পেয়ে যাচ্ছে!

(৩)

সকালের দিকে ঝিকে বাজারে পাঠিয়ে শুভ্রা নীচে রান্না ঘরের সামনে বসে তরকারী কুটছিল, বাইরের দরজায় কে কড়া নাড়া দিলে।

শুভ্রা জিজ্ঞাসা করলে—কে?

—আমি,—দেবেন বাবু আছেন?

প্রশ্নকারীর গলার স্বরটা যেন পরিচিত।

শুভ্রা শশব্যস্তে উঠে, কপাটের ফাঁক দিয়ে একবারটী দেখেই দোর খুলে সহর্ষে বলে উঠল—

—আরে! তপন দা যে!

আগন্তুক ভেতরে এসে শুভ্রার আপাদ মস্তক সাগ্রহ, সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে উৎফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে

—ভাল আছ তো শুভ্রা। বা:! তুমি এরি মধ্যে এত বড়টী হ'য়ে গেছ......

তপনকে প্রণাম করে শুভ্রা সলাজ স্মিত আননে বললে —এরি মধ্যে? কতদিন পরে দেখছ বলো দেখি? দু'বছর —না—তারও বেশী হবে। কলকেতা থেকে আসছ বাকি?

—হ্যাঁ, কাকাবাবু কই?

—ওপরে। তুমি ওপরেই চলো তপনদা, বাবার শরীর বড় খারাপ, ওঁকে নিয়ে বড় ভাবনায় পড়ে গেছি, সত্যি।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে শুভ্রা তপনের দিকে ফিরে বললে—

—হঁ্যা, তোমার সঙ্গের জিনিষ পত্র—

—হোটেলে রয়েছে সব।

—ও—তুমি হোটেলে নেমেছ বুঝি?

—হঁ্যা—

—কেন? আমাদের বাসা তুমি জানোনা এমন তো নয়? সব জেনে শুনে...বাবা তোমাকে খুব বকবেন দেখো!

তপন হেসে বল্লে—বকুনী খাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি শুভ্রা! তবু ভয় করছে ওঁর সামনে যেতে—

—বারে! ভয় কিসের? বাবা তোমাকে 'পর' মনে করেন না তো? তোমার জন্যে কত আপশোষ করেন তিনি আজও—

দীর্ঘদিন অ-দেখার সঙ্কোচটুকু এইখানেই ঝেড়ে ফেলে শুভ্রা তপনের হাত ধরে একরকম টেনে নিয়ে গিয়ে বলে—ও বাবা! কে এসেছে দেখো—

তপনকে এতদিন পরে অভাবিত রূপে কাছে পেয়ে দেবেন্দ্র বাবু যথার্থই খুসী হলেন। তপন সসঙ্কোচে প্রণাম করতেই ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

এই তপনের সঙ্গে তার জীবনের অনেকখানি বিজড়িত ছিল। একদিন এই পিতৃমাতৃহীন সচ্চরিত্র প্রিয়দর্শন ছেলেটীকে কেন্দ্র করে দেবেনবাবু মনে মনে কত আশার স্বপ্ন গড়ে তুলেছিলেন, সে স্বপ্ন তাঁর সফল হয়নি অবশ্য—তবু তপনের প্রতি স্নেহের লাঘব হয়নি বুঝি এখনো।

তপনের সাথে প্রথম আলাপ তাঁদের কলিকাতায়। তপন তখন স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছে।

দেবেন্দ্রবাবু গ্রীষ্মের ছুটির সঙ্গে আরো মাসখানেকের অবকাশ নিয়ে কলিকাতায় গেছলেন সেবার বিশেষ একটা প্রয়োজনে। সেই স্বল্পকালের পরিচয়ই এমন ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে যে অ-সাক্ষাতে পরস্পরের আদান প্রদান ও চলত, এবং পরের বছর কলেজের বন্ধে উভয় পক্ষের আগ্রহেই

তপন দিল্লীতে এলো যখন, তখন সমস্ত ছুটীটা তার এই বাড়ীতেই কাটে।

দেবেন বাবু সেই সময় তাঁর মনোগত ইচ্ছাটা প্রকাশ করবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু তপনের আর্থিক অস্বচ্ছল অবস্থা—এবং অসমাপ্ত শিক্ষা তাঁকে বাধা দিয়েছিল।

শুভ্রার বিবাহের বয়সও তখনো হয়নি ঠিক, তাড়া ছিলনা কিছু তাই। দিল্লী থেকে ফিরে যাবার মাস কতক বাদে তপন দেবেনবাবুকে চিঠি দেয় যে কলেজে পড়া তারপক্ষে সম্ভব হয়না আর, কোনো একটা কাজের সন্ধান করতে পারেন যদি......

উত্তরে দেবেনবাবু তাকে লেখেন—

কেবল আর্থিক অনটনই যদি শিক্ষার অন্তরায় হয় তার, তাহলে সাধ্যমত সাহায্য করতে তিনি প্রস্তুত—হঠাৎ কলেজ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কোনোরকমে বি,এটা পাশ করলে কাজের দিকেও সুবিধা হ'তে পারে।

সে চিঠির উত্তর আর আসেনি।

তার কিছুদিন পরে দেবেনবাবু খবরের কাগজে দেখতে পান তপন ঢাকা ও বরিশাল নিবাসী কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছে একটা বোমার মামলায়। বিচারের ফলে তার কারাদণ্ড হয় ছয় মাসের জন্য, তাও জেনেছিলেন, তারপর তপনের আর কোনই উদ্দেশ পাওয়া যায়নি, বিস্তর অনুসন্ধান করা সত্বেও।

সেই তপনের অপ্রত্যাশিত আগমনে দেবেনবাবুর আনন্দিত হবারই কথা, কিন্তু তাঁর আনন্দ শুভ্রার অকুণ্ঠিত নয়। তাই শুভ্রা যখন অনুযোগ করে মিষ্ট আবদারের সুরে বললে—তপনদার কি অন্যায় দেখতো বাবা, এতদিন পরে এলেন যদি তা নামতে গেলেন হোটেলে। সোজা এখানে এলেই তো হত। তা নয়—

তখন দেবেনবাবু একটু ইতস্ততঃ করেই বললেন—বটেই তো! এটা তোমার ঠিক হয়নি তপন। আমরা এখানে আছি না আছি একবার দেখলেই পারতে।

শুভ্রা এবার খুসী হ'য়ে বললে—আচ্ছা এখন একটা কুলি করে তোমার আসবাব পত্র হোটেল থেকে আনিয়ে নাও, বুঝলে? ওধারের ছোট ঘরখানা তো অমনিই পড়ে রয়েছে......

শুভ্রাকে এমন প্রফুল্ল দেবেনবাবু অনেকদিন দেখেননি। তার আগ্রহ ও আনন্দের পরিমাণ দেখে তাঁকে বলতেই হ'ল—

—বেশ, তাই করো তবে। এখন কিছুদিন তুমি থাকবে তো তপন?

তপন কুণ্ঠিতস্বরে উত্তর করলে—আজ্ঞে মনে তো করছি, এখানেই যদি একটা কাজ টাজ পেয়ে যাই—

—বেশ কথা, তাহলে আর আলাদা বাসা করবার কি? এ বাড়ীতে তোমার কিছু অসুবিধা হবেনা বোধহয়—

—না, অসুবিধে আবার কিসের? হ্যাঁ তপন দা?

প্রদীপ্ত চোখদুটিতে অধীর আগ্রহ নিয়ে শুভ্রা তপনের মুখপানে চেয়ে রইল—রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। তথাপি তপনকে নিরুত্তর দেখে দেবেনবাবু বললেন—

তোমার আপত্তি থাকে যদি তবে...

—না, আপত্তির কারণ আমার কিছুই নেই কাকাবাবু কিন্তু আপনাদের থাকতে পারে তো? আমার নিগ্রহের কথা...

—ও! সে আমরা জানি, খবরের কাগজে দেখেছিলুম, অন্য কজন ছেলের সঙ্গে তোমাকেও—

শুভ্রা অপ্রস্তুত হয়ে বলে উঠল—

—তাতে কি?—

তপন ম্লান হেসে বললে—

শুধু তাই নয় তারপর আরো কত ভোগান্তিক গেল! নিতান্ত অসহ্য হয়েই বাংলা দেশই ছাড়তে হ'ল এবা —

—ভালই করেছ, তোমার আর কোনো খানে গিয়ে কাজ নেই, আমাদের কাছেই থাকো এখন, কি বলো বাবা?—হ্যাঁ, তাহলে খাওয়া দাওয়া করে তারপর গিয়ে —না, তার আগেই...আজ রান্না করতে আমার একটু দেরী হবে কিনা —তাড়াতাড়ি একটু চা করে দিই—

চা আমি খেয়েছি শুভ্রা।

—তবে আর দেরী করছ কেন? যাও, তোমার তোরাঙাভাঙা সব চট পট এনে ফেলো—। আমিও রান্নাটা সেরে নিই গে—।

শুভ্রা ও তপন চলে গেলে দেবেনবাবু অনেকক্ষণ বিমর্ষ হয়ে বসে রইলেন হতবুদ্ধির মত।

এতদিন পরে তপনের আবির্ভাব বিশেষ করে এই বাড়ীতেই থাকাটা তিনি যেন কিছুতেই ভাল মনে গ্রহণ করতে পারছিলেন না, কারণ তপন কেবল রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে দণ্ডিত বলেই নয়, কন্যার ভবিষ্যত সম্বন্ধে একটা বিষম দুশ্চিন্তা তা'কে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। এই দীর্ঘ কালের ব্যবধানেও তপনের প্রতি তার স্নেহ ও অনুরাগ এতটুকু হ্রাস বা শিথিল হয়নি—আশ্চর্য্য!

৪

—আচ্ছা তপনদা, তুমি দিনরাত এত কি ভাবো বলতো? যখনই দেখি...

চিন্তাবিষ্ট তপন ফেলে রাখা বই খানা ত্রস্তে তুলে নিয়ে প্রশ্নকারিণীকে প্রশ্ন করলে

—তোমাদের ছুটী হয়ে গেল বুঝি?

—ক-খন্! আমি তো বাবার কাছে ছিলুম। বাবা বলেন "তপন আর সে তপন নেই" সত্যি, তুমি একেবারেই বদলে গিয়েছে তপন দা'!

তপন ক্ষুদ্র একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—

—তা হবে। কিন্তু এ বদলানোর জন্যে আশ্চর্য্য হবার তো কিছু নেই শুভ্রা। নিষ্ফলতার আঘাতে মানুষের যত পরিবর্ত্তন আনতে পারে, এমন আর কিছুতেই—

—কিসের নিষ্ফলতা? কলেজে পড়ার সুবিধে হল না তাই? তা অমন তো কত লোকের...এই আমারই কি হয়ে উঠবে? রামঃ। বাবার শরীরের অবস্থা যা হচ্ছে দিনে দিনে, কোনো রকমে ম্যাট্রিকের পরীক্ষা দিতে পারি সেই যথেষ্ট।

সরলা শুভ্রার সেই আন্তরিকতা পূর্ণ সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস তপনের অনুতপ্ত চিত্তে নূতন করে একটা হর্ষ ও বেদনার অনুভূতি জাগিয়ে তুললে।

সে বিমর্ষ মুখে একটুকু হাসি এনে বললে—

—তুমি ছেলেমানুষ—বুঝবেনা, আমার জীবনটা যে কি ভাবে ব্যর্থ হয়েছে—

—আবার!

শুভ্রা আহত সুরে বলে উঠল—

—তাহলে দেশের কাজ যাঁ'রা করছেন তাঁ'দের জীবন ব্যর্থ হয়েছে বলতে চাও?

—দেশের কাজ? না শুভ্রা, ঠিক তা তো নয়। আমি যে দিকভ্রান্ত হয়ে ভুল পথে চলেছিলুম, তাই শুধু আঘাত খেয়েই ফিরতে হ'ল—

তপনের কণ্ঠস্বর বেদনা করুণ।

—ভুল মানুষ মাত্রেই করে থাকে অল্প বিস্তর, চেষ্টা করলে তা শোধরানোও যায় ত? ইচ্ছে করলে তুমি যে এখনো এ খাপছাড়া জীবনের গতি...

—খাপ ছাড়া? না ছন্ন ছাড়া?

শুষ্ক অধরে জোর করে একটু হাসি ফুটিয়ে তপন বললে

—আমার জন্যে এমন করে কেউ ভাবে না শুভ্রা, যথার্থ 'আপন' আমার কেউ তো নেই, আত্মীয় বলতে যাঁ'রা আছেন তাঁ'দের আত্মীয়তার পরিচয় এবার ভাল মতেই পেয়ে গেছি। যাক্ তুমি স্কুলের পড়া শেষ করে তারপর—

—সে দেখা যাবে'খন; পাশই করি আগে। হ্যাঁ তপন দা! ভাল কথা—কাল তোমাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে হবে কিন্তু মিনতিদের বাড়ীতে...

—সে আবার কে?

—মিনতি আমার বন্ধু গো! মেয়েটী এত ভাল— কি বলব! আমাকে এত ভাল বাসে ...

—সে তো ভাল কথা, কিন্তু তোমার বন্ধুর বাড়ীতে আমাকে যেতে হবে কেন?

—বারে! ওদের বাড়ী কাল একটা পার্টি আছে যে, মিনতি স্কুলেই বলে দিয়েছে, আবার এখানেও আসবে নেমন্তন্ন করতে বাড়ী সুদ্ধকেই...

কিন্তু,—আমি তো আর বাড়ীর লোক নই!

—যাও! তুমি যে কী হয়ে গেছ!—আমাদের 'পরে তোমার আর মায়া মমতা কিছু নেই তপন দা, সত্যি!—

অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে ছল ছল চোখে শুভ্রা বললে —থাকগে! আমারও যেয়ে কাজ নেই তাহলে—খামখা মিথ্যেবাদী হতে...

—কী পাগল! তুমি আমার কথা কেন বললে গেলেন তাঁ'দের? জানা নেই, শোনা নেই—

—তা নাই বা থাকল? মিনতি তোমাকে দেখেনি, কিন্তু জানে ভাল করেই। তোমার এক একটী কথা সে শুনেছে আমার কাছে। তুমি যে গাইতে পারো, কবিতা লেখো···

—আরে বাস্‌রে! কিছুই বাকি রাখোনি তাহলে—অ্যাঁ তপনদা'র কীর্ত্তিকাহিনী সমস্তই···

শুভ্রার অপ্রতিভ মুখের পানে চেয়ে তপন সকৌতুকে হেসে উঠল। শুভ্রা তার হাত ধরে সাগ্রহে মিনতির সুরে বললে—না, তামাসা নয় তপনদা! তোমাকে যেতেই হবে, না গেলে আমাকে ভারি লজ্জায় পড়তে হবে কিন্তু, যাবে তো?—

আচ্ছা, সে দেখা যাবে, তোমার বন্ধু যদি নেমন্তন্ন করতে—

সে তো আস্‌বেই গো! তোমার গান বাজনা শোন্‌বার জন্তে তার এত আগ্রহ···হ্যাঁ, তপনদা! গান টান গুলো মনে আছে না ভুলে গেছ সব? কবিতা লেখা—

—ভুলে গেছি শুভ্রা, সব ভুলে গেছি! কবিতা যে কত দিন লিখিনি, তা মনেও পড়ে না—

—বেশ! এমন সুন্দর লিখতে! আমার কাছে যে ক'টা কবিতা ছিল যত্ন করে রেখে দিয়েছি, মিনু কত প্রশংসা করে তার—ওকি? কোথায় চললে তপনদা?

তপন কোটটা গায়ে দিতে দিতে বললে—

—একবার বাইরে বেরোতে হবে—দরকার আছে।

—কিন্তু মিনতি এর মধ্যে আসে যদি তোমাকে বলতে তাহলে···

—বলে দিও— যদি সুবিধে হয় যাব।

সিঁড়ির দু তিন ধাপ্ নেমেই তপনকে আস্‌তে হ'ল। মিনতি তার ছোট ভাই বুলুকে নিয়ে ওপরে উঠছিল—

—শুভ্রাদি!—

—শুভ্রা ওপরে···যান্—

বলে' তপন ওদের যাবার পথ ছেড়ে দিয়ে একপাশে দাঁড়াল। মিনতি গতি স্থগিত করে' আয়ত শান্ত আঁখি দুটীর চকিত দৃষ্টি তপনের মুখের দিকে তুলে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি—কি—

—আমি তপন।—

মিনতি হাত দুখানি কপালে ঠেকিয়ে কুণ্ঠা-নম্র মধুর কণ্ঠে বললে—

—কাল শুভ্রাদি'র সঙ্গে আপনিও যাবেন দয়া করে আমাদের বাড়ী—

'বুলু' ও সায় দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল

—হ্যাঁ, নিশ্চয় যাবেন আপনি,—না গেলে আমরা ভারি দুঃখিত হ'ব কিন্তু—

তপন ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললে—

—আচ্ছা,যাব—এর জন্যে এত উপরোধ কেন?

জানি না কেন—তরুণী মিনতির সেই ক্ষণিকের দেখা লাজ-নম্র লাবণ্য ঢল ঢল মুখখানি, আর বন হরিণীর মত সরল স্বচ্ছ ভাসা ভাসা চোখ দুটীর মধুর ছবি তপনের মুগ্ধ অন্তরে অকারণে একটা দাগ কেটে গেল। মনে হ'ল এ যেন তার—কতদিনকার চেনা!

মিনতিও একটু বিস্মিত হয়ে ভাবছিল—শুভ্রাদি' মিছে বলেনিতো—ওর তপনদা বাস্তবিক গর্ব্ব করবার উপযুক্তই বটে!—কি মিষ্টি কথা—আর হাসিটুকু····

ছয়

পার্টিটার উপলক্ষ্যটা বিশেষ কিছু নয়।

ভাবী জামাতা প্রেমেশকে নিয়ে একটুকু আমোদ প্রমোদ করাই উদ্দেশ্য।

মিনতির পিতা উমাচরণ বাবু এখনো শিম্‌লায়, সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন, আমন্ত্রিতের আদর অভ্যর্থনা করছিলেন করুণা দেবীই।

প্রেমেশ বসু অতি আধুনিক ফ্যাশানের জাঁকালো শুট পরে ব্যস্ততার সহিত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন কারণে অকারণে, এ বাড়ীতে তাঁর নব লব্ধ অধিকার জানাবার জন্যই হয়তো। তাঁর উৎসুক দৃষ্টি অভ্যাগতদের মধ্যে ঘুরে ফিরে যেন কা'কে অন্বেষণ করছিল। সে দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল শুভ্রার আগমনে।—

—শুভ্রাদেবী! এত দেরী করা আপনার উচিৎ হয় নি····

বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে প্রেমেশ সহসা থমকে দাঁড়াল শুভ্রার পাশে তপনকে দেখে।

শুভ্রার কাছে এসে তপনের দিকে চোখের একটা ইসারা করে' সে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—ইনি—

—ইনি আমার তপন দা'—

তপন দা' ?—ওহো !—মিনতি এর কথা বলছিল বটে শুনে বড় আগ্রহ হয়েছে এঁর সাথে আলাপ করতে—

প্রেমেশ মৌখিক আনন্দ ও সৌজন্য প্রকাশ করলেও তপনকে দেখে সে যে বাস্তবিক সন্তুষ্ট হয়নি, তা ওর মুখ চোখের অপ্রসন্ন ভঙ্গীতেই বোঝা যায় বেশ।

দু'চার কথায় শিষ্টাচার জানিয়ে তপনকে অভ্যাগতের দলে ভিড়িয়ে দিয়ে প্রেমেশ আস্তে আস্তে সরে পড়ল—যেখানে সুপ্রশস্ত কক্ষের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে শুভ্রা ও মিনতি কি বলাবলি করছিল চুপি চুপি। প্রেমেশ সেদিকে আসতেই তাদের গল্প বন্ধ হয়ে গেল।

প্রেমেশ মিনতিকে বললে—

—তপন বাবুকে আমি বসিয়ে এলুম মিনতি, তুমি একটু দেখ গিয়ে—।

মিনতি চলে গেলে সে শুভ্রার পাশে এসে একটু ইতস্তত: করে' বললে—

—শুভ্রাদেবী। একটা কথা—আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি। যদি কিছু মনে না করেন......

শুভ্রা উৎসুক ভাবে প্রেমেশের দিকে চাইল, প্রেমেশ ধীরে ধীরে বললে—

—এই তপন বাবু কি আপনাদের বাস্তবিক কোনো আত্মীয়—

শুভ্রা উত্তরে দৃষ্টি নত করে ঘাড় নাড়লে শুধু। সুগৌর মুখখানি তার লাল হয়ে উঠল পলকে—সদ্য ফোটা গোলাপ ফুলের মত। সে মুখের পানে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে প্রেমেশ আবার কি বলতে যাচ্ছিল— কিন্তু তার আগেই করুণা দেবী এসে পড়লেন সেখানে।

শুভ্রাকে কুশল প্রশ্ন করে তিনি বললেন—

—তোমার বাবা এসেছেন শুভ্রা ?

—না মাসিমা, বাবা আসতে পারলেন না, তাঁর হাঁপানিটা কাল থেকেই বেড়ে রয়েছে, তাই বলে দিলেন কিছু মনে না করতে।

—আর সেই ছেলেটি—

—কে তপন দা' ? তিনিতো এসেছেন।

—কই ?—চলতো দেখি—

শুভ্রাকে নিয়ে করুণাদেবী অন্যদিকে চলে গেলেন। প্রেমেশের ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

মিনতি তপনের সাথে আলাপ করছিল বসে'। সংকোচের ভাব তখনো কাটেনি, তা'দের কথা বার্ত্তা অল্প কিন্তু আগ্রহ ও তন্ময়তা এত বেশী যে সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

করুণাদেবী নবাগত তপনকে মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করে অন্যত্র যেতেই শুভ্রা হাসতে হাসতে বললে

—আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করলে তপনদা ? মেয়েটি কি রকম দুষ্টু বলতো।

—তোমার চাইতে বেশী কি ?

বলে হাসি মুখে তপন মিনতির মুখপানে তাকালো—এমন ভাবের গভীর মধুর চাহনী সে চোখে শুভ্রা আর কোনো দিন দেখেছে বলে মনে পড়ে না।

সে একটু আশ্চর্য্য বোধ করল, এবং নিজের অজ্ঞাতে একটু ক্ষুব্ধও হল না।

যখন মিনতি শুভ্রাকে বললে—

—তপনদাকে গান করতে বলোনা শুভ্রাদি। উনি যে খুব ভাল গাইতে পারেন শুনেছি—

তখন শুভ্রা অনাগ্রহের ভাবে বললে—

হ্যাঁ পারেন তো, কিন্তু তুই-ই বলনা কেন ? আমি বললে উনি শুনবেন না হয়তো···

কথাটার মধ্যে তার অভিমান সুস্পষ্ট। তপন সেটুকু লক্ষ্য করেনি বুঝি। সে—

—গাইতে আমি পারি অবশ্য তবে সে গানকে 'খুব' তো নয়ই—শুধু 'ভাল' বলাও চলে না বোধহয়—

বলে অর্গানের কাছে গিয়ে বসল, আর দ্বিতীয় বার অনুরোধের অপেক্ষা না রেখে।

অথচ সে এবার আসা পর্য্যন্তই শুভ্রা একবার নয়, কতবার সেধেছে একটা গান করবার জন্য। বলে —ভুলে গেছি।

কিন্তু— এখন তো এক কথাতেই......

তপন অর্গানে সুর দিয়ে মিনতির দিকে স্নিগ্ধদৃষ্টিপাত করে বললে—

—এরপরে আপনাকেও গাইতে হবে কিন্তু — আপনার সুখ্যাতিও আমি শুনেছি—

মিনতি সলজ্জ মৃদু হাসিতে সে কথার উত্তর দিলে।

তপন গান ধরল—

"পথের ধারে আসন কেন
পাত ওগো সাথী!
ফুলের বনে মালা কেন
গাঁথ ওগো সাথী।

তপন বাস্তবিক সুগায়ক, তার মিষ্ট কণ্ঠের মোহময় সুরে গানের মধুর শব্দগুলি মধুরতম হ'য়ে শ্রোতাদের বিমুগ্ধ ক'রে তুললে। বিশেষতঃ মিনতি,—তার চোখের পলক যেন পরেনা আর—।

তপন যখন তন্ময় হ'য়ে গাইছিল—

"পথিক মোরা, কোথায় আছে ঘর
মিথ্যে সেথা খুঁজবি অবসর
চলতে পথে আসবে যদি ঝড়
ধরিও মোর হাত—ওগো সাথী!"

তখন শুভ্রা দেখলে মিনতির ভাবাবেশে ঢল ঢল নিমেশ-হারা আঁখিদুটী যেন চক্ চক্ করছে, সরসীর স্বচ্ছ কালো জলে চাঁদের আলো পরার মত। সে চোখের মধুর ভাবে মুগ্ধ হয়েই গায়কের উৎসাহ ও তন্ময়তা বেড়ে চলেছে যেন।

* * *

গানের আসর জমে উঠেছে বেশ।

শুভ্রা কোন ফাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল একলাটী। সেখানে আলো ছিলনা, ঘরের আলোই খানিকটা এসে পড়েছিল খোলা দুয়োর দিয়ে।

শ্রাবণের আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গিয়েছে,—নিবিড় কাজল-কালো, তার কোথাও কোনো একটী ফাঁকে একটি দুটী শুভ্র নক্ষত্র ঝিক্‌মিক্ করছে, সীমাহারা আঁধার প্রান্তরে অতি ক্ষুদ্র এক দীপ-শিখার মত।

বর্ষার উতল বাতাস ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে হাস্নুহানার আবেশ ঘন সুমিষ্ট সৌরভে।

ঘরের মধ্যে মিনতি এস্রাজ বাজিয়ে গান করছিল একটী হিন্দী বর্ষার গান

"—শাওন কে ঋত—ঘন ঘেরি আয়ে বদরা,
পিয়া কে মিলন কো—ভিজি মোরি অঁচরা।"

বড় মধুর লাগছিল শুনতে। এমনি কোনো বর্ষা-নিবিড়-রাতে অবিরাম ঝরা চোখের জলে কার আঁচল খানি ভিজেছিল কি জানি! সে গানে আজ শুভ্রার চোখের পাতাই বা অকস্মাৎ ভিজে উঠল যে কেন—তাও বলা যায় না।

সজল চোখ দুটী অন্ধকারে মেলে দিয়ে শুভ্রা দাঁড়িয়েছিল কেমন বিহ্বল হয়ে, ধীরে কে ডাকলে—তার নাম ধরে।

সচকিত হ'য়ে শুভ্রা দেখলে —প্রেমেশ!

প্রেমেশ তার কাছ ঘেসে এসে কোমল কণ্ঠে বললে—আপনি এখানে—একালাটী যে?

শুভ্রা নিজেকে একটু বিব্রত বোধ করলেও শান্ত ভাবেই উত্তর করলে—

—এমনি—বড় গরম বোধ হচ্ছিল ঘরে।

—তাহলে এখানেই বসুন না একটু। আমিও বসি, বেশ ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে।

বারান্দার কোণের দিকে রাখা একখানা বেতের চেয়ার ও মোড়া এগিয়ে এনে প্রেমেশ বললে—

—বসুন, দাঁড়িয়ে থাকবেন—কতক্ষণ?

একান্তে, একজন স্বল্প-পরিচিত যুবকের পাশে বসতে মনে দ্বিধা ও সঙ্কোচ অনুভব করলেও শিষ্টাচার রক্ষার জন্য শুভ্রাকে বসতে হল—চেয়ারখানা একটুকু তফাৎ করে নিয়ে।

—সেই থেকে—আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলব যে সুস্থির হ'য়ে, এমন অবকাশ পাইনি—

স্বল্প-স্তিমিত আলোয় শুভ্রার নির্ব্বাক মুখের পানে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, প্রেমেশ আবার বললে—

—শুভ্রা দেবী! একটা কথা জানবার জন্যে যেন ভারি আগ্রহ হচ্ছে, জানি, এ আগ্রহ অনুচিত—তবু দয়া করে যদি......

শুভ্রা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে—

কি কথা প্রেমেশবাবু?

—ওই যে ভদ্রলোকটী—তপনবাবু, ওঁর সাথে কি আপনি—

একটু থেমে গিয়ে প্রেমেশ বাধ বাধ ভাবে বললে—মানে ওঁর সঙ্গে আপনি কি এন্‌গেজড্‌?

শুভ্রার বুকের স্পন্দন দ্রুত হ'য়ে উঠল। একটা গাঢ় নিঃশ্বাস জোর করে ফেলে নিয়ে সে আস্তে বললে—

—না প্রেমেশবাবু, সে সব নয়, ওর সাথে আত্মীয়তাও কিছু নেই আমাদের, তবু—উনি আমার—আত্মীয়ের অধিক—বন্ধু।

শুভ্রার কণ্ঠস্বর কম্পিত, করুণ।

প্রেমেশ সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত না হলেও কতকটা আশ্বস্ত হ'য়ে যেন বললে—

—শুনে সুখী হলুম, সংসারে প্রকৃত বন্ধুত্ব বড় দুর্লভ বস্তু,—বিশেষ যে আপনার মত····ওকি? উঠছেন যে, আর একটু বসুন—।

—না তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতে হবে। বৃষ্টি আসছে, বাবার শরীরটাও ভাল নয়।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে প্রেমেশ উঠিল, শুভ্রার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দিকে যেতে যেতে সে ব্যগ্রতার সহিত বললে—

—আচ্ছা, আমি যদি মধ্যে মধ্যে আপনাদের বাড়ী যাই, সেটা আপনাদের পক্ষে বিরক্তির কারণ হবে কি?

—সেকি কথা! গরীবের ঘরে আপনার পায়ের ধূলো পড়বে, সেটাতো আমাদের সৌভাগ্য—

শুভ্রাকে একথা বলতে হ'ল কেবল ভদ্রতার অনুরোধে। প্রেমেশের সান্নিধ্য তার পক্ষে প্রীতি জনক তো নয়ই বরং কেমন অস্বস্তিকর লাগছিল।

সাত

রাত হ'য়ে গেল ফিরতে।

দেবেনবাবু অসুস্থতা জন্য সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলেন।

শুভ্রা পিতাকে নিদ্রিত দেখে আস্তে আস্তে বারান্দার আলো নিয়ে বসল ইস্কুলের পড়া করতে। দিনে সময় পায়না কাজেই—

কিন্তু আজ শুভ্রার মন লাগছিল না কিছুতে। কিসের একটা অকথিত অজ্ঞাত বেদনা ও অহেতুক উত্তেজনা তার চিত্তকে চঞ্চল বিক্ষিপ্ত করে তুলছিল ক্ষণে ক্ষণে।

কোনো মতে ট্র্যান্সলেশন গুলো শেষ করেই সে খাতা পত্র সব তুলে ফেললে। আলোটাও নিভিয়ে দিলে। কিন্তু ঘুম আসা এখন অসম্ভব।

শুভ্রা অন্ধকারে পায়চারী করতে করতে—আনমনা হয়ে ভাবছিল হয়তো আজকের পার্টির কথাই—

মিনতি, প্রেমেশ, তপন সব মিলে তার মনের মধ্যে একটা গোলমাল বাধিয়ে তুলেছে যেন। মিনতির কাছে তপন বিদায় নিলে তখনকার......ওকি?

কিসের একটা শব্দে চমক ভাঙ্গা হয়ে শুভ্রা দেখে তপনের ঘরের এধারে জানালাটা খোলা, ভেতরে আলো জ্বলছে,—এবং দেয়ালে তপনের চলন্ত ছায়া দুলছে।

তপন তাহলে ঘুমোয়নি এখনো, শোয়ওনি—তার অনিদ্রার হেতু......কোনো দরকার ছিল না, তবু কেমন একটু কৌতুহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে শুভ্রা টিপি টিপি বৃষ্টির মধ্যেই মাঝ খানের ছাদটুকু পেরিয়ে গেল সেই জানালার কাছে। দেখতে পেলে তপন আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং গানও করছে আপন মনে গুন গুন করে

—"আজকে শুধু শুনাও মোরে গান,
সেই সে হোক পরম অবদান,
চলার ধ্বনি আকাশে যাক্ সরে'
সুরের গীতি উঠুক সেথা ভরে,'
অশ্রুভরা আসরে আঁখি পাতে
করিও আঁখি পাত---ওগো সাথী।"

ধীরে গাইলে ও সে গানের সুরে সত্যকার প্রাণের স্পর্শ ও আবেগ ছিল, ব্যাকুলতাও ছিল। চোখ দুটিতে তার যেন স্বপ্নের ঘোর, অধরে বিহ্বলতা।

গাইতে গাইতে জানালার কাছে এসে শুভ্রাকে হঠাৎ দেখতে পেয়েই সে বলে উঠল—

কে, শুভ্রা? ওখানে ভিজছ কেন? ভেতরে এসে...

—না আমি শুতে যাই এবার।

তপন তাড়াতাড়ি দোর খুলে, গমনোদ্যতা শুভ্রাকে ডেকে বললে—

—একটা কথা শুনে যাও শুভ্রা!

শুভ্রা যেন অনিচ্ছুক চরণে ঘরে এসে দাঁড়াল—বললে, কি?

—বলছিলুম—এঃ! তুমি যে বেশ ভিজেছ দেখছি! আমাকে একটু ডাকলেই হত।

শুভ্রা আঁচল দিয়ে মাথার চুলে ঝরে পড়া বৃষ্টির জলের ফোঁটা গুলো মুছতে মুছতে বললে—

—ডাকতে তো আমি আসিনি,—ঘরে আলো জলছে দেখলুম তাই...

—আমি বলি তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ—

—না, স্কুলের পড়া করছিলাম যে—, যাই এবার—

—ঘুম পাচ্ছে! আচ্ছা, পাঁচামনিট সবুর করো, একটা খবর আছে, সুখবর—

—ওঃ! সে আমি জানি। মিনতির বিয়ে যে এই শ্রাবণেই—

—এই দেখ! সেটা তোমার পক্ষে সুসংবাদ হতে পারে, কিন্তু আমার কি?

তপনের মুখে বিরক্তি চিহ্ন প্রকটিত হল। শুভ্রা একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পাশের ট্রাঙ্কের ওপর বসে জিজ্ঞাসা করলে —তাহলে তোমার সুসংবাদটা কি শুনি?

—আগে হরিলুটটা কি রকম দেবে শুনি? সেদিন যে বলছিলে—

—তপন শুভ্রার মুখপানে তাকিয়ে সাহাস্যে বললে।

শুভ্রা পুলকিত কণ্ঠে বলে উঠলো—

—ওঃ! বুঝেছি!—তোমার কাজ হয়েছে,—না? সত্যি তপনদা?

—হ্যাঁ, খুব সম্ভব, এই পয়লা থেকে—। মাইনে এখন অল্পই দেবে, পরে যোগ্যতা দেখে—

শুভ্রা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে—

—তা হোক, অল্পেই আমাদের চলে...

বলতে বলতে থেমে গেল। তার গাল দুটিতে ফুটে উঠল রক্ত করবীর লালিমা। কথাটা ফিরিয়ে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি বললে—

—একলা মানুষ তুমি, তোমার অল্পেই চলে যাবে, বেশ ক'রে। বাবা শুনেছেন?

—না, বলতে ভুলেই গেছলুম যে, নেমন্তন্নের ধুমে—

—আবার আর একদিন নেমন্তন্ন পাওয়া যাবে শীগগিরী। সেদিন তোমাকে অনেক গান করতে হবে কিন্তু, তোমার গান ভাল লেগেছে সকলেরই, তাই মিনতি বলছিল—

—কেন? গান গাইবার লোকের তো অভাব নাই এ দিল্লী সহরে এক সে এক গাইয়ে রয়েছে।

বিস্মিত হয়ে শুভ্রা তপনের মুখপানে তাকালো, সে মুখের আনন্দ দীপ্তি নিভে গিয়েছে নিঃশেষে।

—যাও এবার শুয়ে পড়ো গে, আমারও ঘুম পাচ্ছে।

শুভ্রা চলে গেল।

একটা গভীর নিঃশ্বাস তার বুক কাঁপিয়ে ঝরে পড়ল নিঃশব্দে।

+ + ×

ঘুম আসে কি ক'রে?

পুলক ও বেদনায় বিচিত্র অনুভূতি গঙ্গা যমুনার ধারার মত শুভ্রার হৃদয় তটের কূলে কূলে ছাপিয়ে টলমল করছিল, তার বেগে সে নিজেকে সামলে রাখতে পারছিলনা আর।

তপনের এই ভাবান্তর—হ্যাঁ ভাবান্তর বইকি! তার আজকের ভাবভঙ্গী, কথাবার্তায় যে কিসের একটা রহস্যময় গূঢ় গোপন ইঙ্গিত ছিল, যা শুভ্রা বুঝেও বুঝতে পারছেনা যেন।

এ যদি কেবল সন্দেহ কি অনুমান না হয়, যদি যথার্থই ...কিন্তু...তা হলেই বা কি? যে জিনিষ শুভ্রা পায়নি, কখনো পাবে কিনা, তারও স্থির নিশ্চয়তা নেই কিছু, তারি জন্যে এত......এ পাগলামী নয় কি? কিন্তু এই পাগলামিই যে শুভ্রাকে পেয়ে বসেছে আজ। তার বুকের বীণায় সেই সুরই শুধু বাজছে—

—"অশ্রু ভরা আমার আঁখির পাতে
করিও আঁখি পাত—ওগো সাথী!"

বাইরে তখন বৃষ্টি চেপে এসেছে। বাদলের উচ্ছ্বসিত আকুল অশ্রুধারা অবিশ্রান্ত ঝরে পড়ছে ধরণীর বুকে—

ঝম্ ঝম্ ঝম্।—

এ যেন আকাশের বুক ফাটা অন্তহীন রোদন।

রাস্তার ধারের বড় নালাটা জলে ভরে গিয়ে কল্ কল্ ছল্ ছল্ করছে, পৃথিবীর অট্টহাসির মত। হাসি কান্নার একি বিচিত্র সম্মিলন!

একজনের কান্নায় আর একজনের হাসি আসে কেমন করে কে!

আট

—হ্যাঁরে মিনু! তোদের কাণ্ডখানা কি বল দেখি!

মায়ের বিরক্তি তিক্ত কণ্ঠস্বরে মিনতি শঙ্কিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে ...

—কি মা? কি হ'য়েছে?

—হবে আবার কি?—আমার মাথা! দিনক্ষণ সব স্থির হ'য়ে গেল, এখন প্রেমেশ বলে কিনা—শ্রাবণে হওয়া অসম্ভব। এত শীগগির যোগাড় হতে পারবে না নাকি? কিন্তু একথা আগে বললেই তো হ'ত। ওর তাড়া দেখেই না লিখেপড়ে সব ঠিক করে ফেললুম, এখন গোলমাল করছে যে কেন?

মিনতি চোখদুটো মাটীর দিকে নামিয়ে আস্তে বললে—

—তা আমি কি করব বলো? আমার ওপর রাগ করছ কেন?

মেয়ের ক্ষুব্ধ মুখের পানে তাকিয়ে করুণা দেবী নরম ভাবে বললেন—

—রাগ তো করিনি মা, তবে ভাবনা হয়েছে এক··· শ্রাবণে না হ'লে সেই অঘ্রাণের আগে যে দিনই নেই আর। তিন তিনটে মাস এর মধ্যে প্রেমেশের মত যদি বদলেই গেল—বিশ্বাস কি? মানুষের মন—তাতে আবার পুরুষের—

—বদলে যায়—যাবে, তার জন্যে এত ভাববার, এত হা হুতাশ করবার দরকার কি মা? তুমি তো এমন করছ যে কি সর্বনাশ উপস্থিত—

—এই এক পাগল! ওরে আমার যে কি জ্বালা তা তুই কি বুঝবি বল? আমার যে ভাবনায় আহার নিদ্রা ত্যাগ হয়েছে। সত্যি, প্রেমেশ যে এমন করবে......

করুণা দেবী একমুহূর্ত নীরব থেকে আবার বললেন—

—আচ্ছা মিনু! এই যে বিয়ের দিন পেছিয়ে দেবার কারণটা কি প্রেমেশ তোকেও স্পষ্ট করে বলেনি কিছু?

—না মা!

—তুই জিজ্ঞাসা করেছিলি?

মিনতি মাথা নেড়ে বললে—

—উহুঁ,—

—বেশ!—

করুণা দেবীর মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি মেয়ের মুখপানে খানিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে অপ্রসন্ন স্বরে বলে উঠলেন—

—তুই ভয়ানক বোকা মেয়ে মিনু! বাস্তবিক—এরকম বোকা হলে কিন্তু সংসারে পদে পদে ঠকতে হয়।

—বা রে বাবা! কি বোকামো করলুম বল তো? যার মতি গতির এতটুকু স্থিরতা নেই তারই জন্যে...... ওঁকে আমি কি বেহায়ার মত জিজ্ঞাসা করতে যাব— হ্যাগো, বিয়ে পেছিয়ে দিলে কেন?

—আহা! আমি কি তাই বলছি নাকি? তবে......

করুণা দেবী একটুখানি ভেবে বললেন—

—আমার বোধহয় এর মধ্যে...আচ্ছা, প্রেমেশ শুভ্রাদের বাড়ী যায়,—না?

—কি জানি, হ্যাঁ শুভ্রাদি সেদিন বলছিল বটে, এক এক দিন যান, শুভ্রাদির বাবার সঙ্গে গল্প করতে ওঁর খুব ভাল লাগে নাকি!

—ছাই! আমি জানি ও কিসের জন্যে ওখানে......

করুণা দেবী এদিক ওদিক চেয়ে আস্তে বললেন—

—যে যাই বলুক—আমার কিন্তু সন্দেহ হয় মিনু!

—কিসের সন্দেহ?—

—এই যে বিয়ের দিন পেছিয়ে দেওয়া এর মধ্যে শুভ্রার কোনো যোগাযোগ......

—কি বলছ মা?

বাধা দিয়ে মিনতি জোরে বলে উঠল—

—ছি ছি! এরকম সন্দেহ তোমার মনে এলো কেমন করে...! তুমি তো নিজেই কতবার বলেছ—শুভ্রার মত মেয়ে আর হয় না। তারপর শুভ্রাদি আমাকে ভালবাসে, আমায় বড় স্নে—

—কিন্তু এরকম জায়গায় বন্ধুত্ব যে টেঁকে না মা। মানুষের স্বার্থ যে ভয়ানক জিনিষ। শুভ্রা যদি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে প্রেমেশকে… ..

—ওকথা বলোনা মা! একজন নির্দ্দোষকে…সন্দেহের কারণ যদি কিছু ঘটে থাকে তাহলে সেটা ওনারি দোষ, শুভ্রাদির নয়, শুভ্রাদিকে আমি যতটা জানি, এতটা আর কেউই জানে না, আমার কাছে তার লুকোনো কিছুই নেই।

—এই দেখ! তোকে বোকা বলি কি সাধেরে? শুভ্রা কি তোকে বলতে যাবে যে প্রেমেশ কে সে চায়?

—এটা তোমার ভুল ধারণা মা,—একেবারে ভুল। শুভ্রা যে কাকে চায় তা আমি ভাল করেই জানি, তার তুলনায় প্রেমেশবাবু যে কিছুই নয়।

—কে? তপনের কথা বলছিস? আহা! কার সাথে কার তুলনা করছিস মিনু? প্রেমেশ আমাদের সোণার চাঁদ ছেলে,—তার কাছে কি তপন—

—কেন? তপনবাবু ওঁর কাছে খাটো হলেন কিসে? রূপে না গুণে? পয়সা রোজগার করতে পারলেই মানুষ বড় হয় না মা অন্ততঃ আমি তো স্বীকার করিনা তা, আমার তো মনে হয়, তোমার ওই সোনার চাঁদের তপনদার পায়ের কাছে দাঁড়াবার যোগ্যতা ও—

—আঃ থাম মিনু! যা নয় তাই—

কথাগুলো যে শুধু মুখের কথাই নয় মিনতির অন্তরের উক্তি তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তার উত্তেজনা-রক্ত-মুখের পানে ক্ষণকাল নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে থেকে করুণাদেবী উদ্বিগ্ন স্বরে বিরক্তির সহিত বললেন—

—যাক্ গে, এই নিয়ে তর্কবিতর্ক করে' কোনো লাভ নেই তো? তবে তোমার উচিত এখন সতর্ক হওয়া। মানে প্রেমেশের গতি বিধির দিকে একটুকু লক্ষ্য…

—সে আমি পারব না মা! ওরকম 'স্পাই' হয়ে… না,সে আমার দ্বারায় হবে না,—কারো পায়ে ধরে' সাধতেও আমি পারব না, যার যা খুসী তাই করুক গে। আর —বিয়ে যে আমাকে করতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই তো!

মুখখানা ভার করে' মিনতি চলে গেল। করুণাদেবীর উদ্বেগ আরো বেড়ে গেল আজ। তিনি অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগলেন—এ কি গণ্ডগোলের ব্যাপার। তপনের প্রতি কন্যার এই অসম্ভব পক্ষপাতিতা…এতটা তো ভাল নয়। তপনকে ও দেখেছেই বা ক'দিন?

নয়

—প্রেমেশ কদিন থেকে আর আসেনা—কেন কি জানি?

শুভ্রার দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে দেবেনবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন—মিনতির সাথে স্কুলে তোমার দেখা হয়তো?

শুভ্রার পিতার জন্য মোজা বুনছিল, মুখ না তুলেই সে উত্তর দিলে—

—কই? মিনু তো কদিন স্কুলে যাচ্ছেই না, তার পড়া শোনায় এবার ইতি হয়ে গেল বোধহয়।

—এই শ্রাবণেই ওদের বিয়ে ঠিক—না?

—হ্যাঁ, সেই কথাই তো শুনছিলুম, তার পরে আর দেখাই হয়নি ওদের সঙ্গে।

—না, প্রেমেশ এলে……সে যে কেন আসছে না, একবার খবর নিলে হয়—

—কি দরকার বাবা? কোনো কাজ তো আমাদের আটকে নেই তার না আসার জন্যে—

—না, তাতো নেই, তবে প্রায় রোজই আসত কি না, তাই বলছিলুম, একবার খোঁজ নিলে হ'ত।

—থাক গে বাবা! ওঁর ইচ্ছে হয় আসবেন, পেড়াপিড়ি করবার দরকার নেই কিছু। আর আমরা গরীব মানুষ ওসব বড় লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশী না করাই ভাল।

দেবেনবাবু একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বললেন—

—কিন্তু প্রেমেশ তো সে প্রকৃতির লোক নয়। কেমন বিনয়ী, কি সুন্দর কথাবার্ত্তা। একটুকু অহঙ্কার নেই মনে, দিব্যি ছেলেটা!

শুভ্রা কিছু না বলে বোনায় মন দিলে।

দেবেনবাবু খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন—

—তপন কাজে গিয়েছে না?

—হ্যাঁ, কাল থেকেই তো যাচ্ছেন।

—যাক, কাজটা জমে করতে পারে এখন—তবেই...তোমার কি মনে হয় ও পারবে?

—কেনই বা পারবে না? তপনদার এতটুকু যোগ্যতাও নেই কি?

—আহা, যোগ্যতা থাকবে না কেন? কিন্তু ও ছেলেটি যে খামখেয়ালী কিনা? শুধু শুধু কি একটা ঝোঁকের মাথায় ক'বছর বৃথাই নষ্ট করলে ছন্নছাড়ার মত, ও রকম মানুষের কিছু ঠিক আছে কি? ও যে মাথা ঠিক রেখে কাজ কর্ম্ম করবে, সংসারী হবে আমার তো বিশ্বাস হয় না তা।'

শুভ্রা চুপ করে রইল।

দেবেনবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—

—কি জানি, কিছুই বুঝতে পারছিনা—

তার মুখ চোখের ভাব দেখেই বোঝা যায়, নিরীহ ভদ্রলোক ভারি একটা সমস্যায় পড়ে গেছেন।

পিতার এই ব্যাকুলতা ও উদ্বেগের হেতু শুভ্রার অবিদিত ছিল না, কিন্তু সে কি বলবে? এই রকম একটা দুশ্চিন্তা সংশয় ও বেদনা তাকেও যে পীড়িত করছে অহরহ! জীবনের অসফল স্বপ্ন সফল হবার আশা কি তার...

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে দেবেনবাবু বললেন—

—কে এলো দেখতো? প্রেমেশ বুঝি?

শুভ্রা বোনাটা রেখে শশব্যস্তে উঠে পড়ল।

আজকাল প্রেমেশের আসার কথা শুনলেই তার বুকটা কেঁপে ওঠে যেন। এ কম্পন পুলকের নয়, কেমন একটা শঙ্কার ভাব...

লোকটার হাবভাব, কথাবার্ত্তা, শিষ্টাচার সম্মত হলেও শুভ্রার ভাল লাগেনা। কেন কি জানি?

—হয়তো—তপনের প্রতি প্রেমেশের একটুকু বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ পায় বলেই,—এ বিদ্বেষ যে অহেতুক নয়, এমন একটা সন্দেহও যেন মনে তার মাথা তুলে জাগছিল ধীরে ধীরে।

যে এলো সে প্রেমেশ নয়, মিনতি।

শুভ্রা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে খুসী হয়ে বললে—

—তবু ভাল যে মনে পড়েছে আজ—'সুইটহার্ট' কে ছেড়ে গরীবের কাছে আসতে...

বলতে বলতে সে থেমে গেল মিনতির মুখের দিকে চেয়ে, সে মুখে ব্যথার ছায়া!

শুভ্রা হাত ধরে তাকে ঘরে এনে শশব্যস্তে বললে—

—কি হয়েছে মিনু! তোর মুখখানি অমন বিরস কেন?

আমরা কাল শিমলায় যাচ্ছি শুভ্রাদি! তাই বলতে এলুম।

—সেকি? এখন তো পাহাড় থেকে নামবার সময়, মেসোমশাই শীগগিরি আসবেন শুনলুম তবে—

—কে জানে, মা'র ইচ্ছে—

—মাসিমার হঠাৎ এ ইচ্ছে হল যে! কে কে যাচ্ছে?

—আমরা সকলেই।

—সকলেই মানে? সুইটহার্টও?

মিনতি শুভ্রাকে ঠেলে দিয়ে উদাস ভাবে বললে—

—যাও ভাই! আমার এখন ভাল লাগছে না কিছু, সত্যি!

—কেন? ভাল না লাগার কারণ? বেশতো—পাহাড়ে গিয়ে কোর্টশিপ আরো জমবে ভাল। তবে বিয়ের পর একেবারে 'হনিমুনে' গেলেই ঠিক হ'ত না।

মিনতি অধর কোণে ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়ে বললে

—তাতো হ'ত কিন্তু বিয়েটাই যে উল্টে যাচ্ছে কিনা?

—সে আবার কি? এই তো শুনলুম সাতাশে শ্রাবণেই—

—না, তা আর হচ্ছে না। বিয়ে হয় যদি তো সেই অঘ্রাণে—

—'যদি' মানে? এখনো সন্দেহ আছে নাকি? তোর ও হেঁয়ালী ছেড়ে সোজা কথা বল মিনু! বিয়েটা পেছিয়ে দিচ্ছে কে?

—যিনি দয়া করে আমাকে গ্রহণ করছেন!

—প্রেমেশ বাবু? কিন্তু আগ্রহটা যে তাঁর দিক থেকেই ছিল বেশী, এখন হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন হ'ল যে?

—তা কি জানি? মা'ও এই কথা জিজ্ঞাসা করছেন, আমাকে—কিন্তু কারুর মনের কথা আমি কি করে জানব ভাই?

—এযে আশ্চর্য্য কথা মিনু! যাকে আজ বাদে কাল বরণ করতে চলেছিস্ জীবনের চিরসাথী করে—তার মনের সন্ধান পেলি না এখনো!

—না শুভ্রাদি! তা পাবার জন্যে বিশেষ আগ্রহও নেই আমার। কারণ আমার বিশ্বাস মনের ওপর জোর জবরদস্তি চলে না কারো, আর সেটা উচিতও নয়।

শুভ্রার সুন্দর মুখে কুটিল ভ্রূকুটী জেগে উঠল। এতো শুধু অভিমানের কথা নয়। একেবারে খাঁটি সত্য এ সিদ্ধান্ত মিনতি তার অন্তরের অনুভূতি দিয়েই করেছে নিশ্চয়!

শুভ্রার বাক্যহারা গভীর মুখে উৎসুক দৃষ্টি স্থাপিত করে মিনতি সাগ্রহে বললে—

—কি হল শুভ্রাদি? তুমিও রাগ করলে? মা'তো খালি আমাকেই বকছেন, কিন্তু আমার কি দোষ বলতো? উনি যদি বিয়ে পেছিয়ে দেন কি ভেঙেই দেন...

—না না তাও কি হয়? এতদূর এগিয়ে এখন...

—অসম্ভব কিছুই নয় শুভ্রাদি! মানুষের মনের পরিবর্ত্তন হ'তে এক মুহূর্ত্ত দেরী লাগেনা। সেজন্যে আপশোষ করবার তো কিছু দেখি না...

—আহা! মিথ্যে কথা কেন বলিস মিনু? তোর মনে যে কত দুঃখ হচ্ছে......

—একটুও নয়। কেবল মা, বাবার কষ্টের কথা ভেবেই মনটা যেন খুঁৎ খুঁৎ করছে, তা ছাড়া নিজের দিক থেকে আর কেনই বা হবে বলো? তোমার মত লভ ম্যারেজ তো হচ্ছে না আমার? বাপ মা দেখে শুনে যার হাতে দিচ্ছেন তাকেই...। আচ্ছা, তোমাদের এরমধ্যে কতদূর কি হল শুনি? শুভ-মিলনটা হচ্ছে কবে?

—কি করে বলি? এজীবনে হবে কিনা তাই বা কে জানে?

—ওকি কথা শুভ্রাদি? তোমাদের এতদিনকার ভালবাসা—

এই 'ভালবাসা' শব্দটা শুভ্রার বুকের মাঝখানটীতে আঘাত করল সজোরে।

হায়! তার ভালবাসার দেবতাকে সে যে শুধু ভালই বেসেছে, নারী হৃদয়ের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে, মুখ ফুটে কখনো জানতে যায়নি, অন্তর দিয়ে অনুভব করতেও হয়তো পারেনি প্রতিদানে ঠিক সেই জিনিষটাই পেয়েছে কিনা!

শুভ্রার মৌনতায় অধীর হয়ে মিনতি বললে

—কি? চুপ করে গেলে যে? বলোনা ভাই!

শুভ্রা মলিন ভাবে একটু হেসে বললে

—কি করে বলব ভাই? যা নিজেই জানি না...... প্রেমেশবাবু তো ইঞ্জিনীয়ার খাঁটি বাস্তব জগতের লোক তাঁকেই তুই বুঝতে পারলি না, আর উনিতো কবি, ভাব রাজ্যের প্রাণী...

—শুভ্রা!

তপন দরজার বাইরে থেকে ডাক দিল।

শুভ্রা চকিত হয়ে বললে—

এইযে, ভেতরে এসো তপনদা, ও মিনতি—

ঘরে পদার্পণ করতেই মিনতির সাথে তপনের চোখা-চোখি হ'য়ে গেল পলকে। চোখের পাতা নামিয়ে নিলে দুজনেই।

শুভ্রা বললে

মিনতিরা চলে যাচ্ছে তপনদা!

তপন যেন চমকে উঠল—

কেন? কোথায়?

শিমলায়, প্রেমেশবাবুও যাবেন—

তপনের মুখশ্রী বিবর্ণ হয়ে গেল। নিমিষে শুষ্ককণ্ঠে সে তাহলে সেইখানেই কি.........

বলতে বলতে থমকে কথাটা ফিরিয়ে নিয়ে বললে—

পাহাড়ে যাবার 'সিজন' তো আর নেই, সেখানে এখন ঘোর বর্ষা। স্বাস্থ্য ও ভাল নয়।

মিনতি এবার মুখ তুলে ধীরে বললে—অল্প দিনের জন্যেই যাওয়া হচ্ছে আমাদের, শুধু বেড়াতে—

শুভ্রা বললে—আচ্ছা, তোমরা গল্প করো তপনদা, আমি একটু চা করে আনি ঋপ্ করে—মিনু তো কাল চলে যাচ্ছে। বোস মিনু!—

খানিক বাদেই মিনতি যখন রান্নাঘরে চলে এলো তখন শুভ্রা দেখলে মিনতির চোখ মুখ যেন জ্বল জ্বল করছে।

হায়! একে ভুল বলা যায় কেমন করে? এ যে সত্য, পরম সত্য!

দশ

দেবেনবাবুর শরীর অত্যন্ত খারাপ। হাঁপানীতো আছেই, তাছাড়া বাত অজীর্ণ, নানান্ উপসর্গ—রোগতো তাঁর একটা নয়।

শুভ্রা ও তপন দুজনে মিলে রোগীর সুশ্রূষা করছে, ক'দিন থেকে অসুখের একটু উপশম হয়েছে যেন।

দুপুর বেলা শুভ্রা পিতার বুকে মালিশ করে দিচ্ছিল। তপন কাজে বেরিয়েছে।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনে শুভ্রা—বললে তপনদা এঁরি মধ্যে ফিরে এলেন যে?

—কেন বাপু! রোজ রোজ কাজের ক্ষতি করে, কত করে ওই চাক্‌রীটুকু জুটল যদি......

দেবেনবাবুর কথাটা শেষ না হতেই গট্ গট্ করে চলে এলো প্রেমেশ। দেবেনবাবুকে নমস্কার করে সে ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করলে—একি! আপনার অসুখ করেছে নাকি?

—হ্যাঁ, বাবা। খুব একচোট ভুগিয়ে নিলে, এখনো জ্বর মেটেনি।—বসো না, ওই চেয়ারখানা টেনে নিয়ে। ওঁরা সবাই এসেছেন?

—নাঃ, আমিই চলে এলুম, কাজ রয়েছে আমার—তাছাড়া ভাল ও লাগছিল না আর, ক্রমাগত বৃষ্টি...

আপনি ভাল ছিলেন তো শুভ্রাদেবী?

শুভ্রা শিশি থেকে হাতে তেল ঢালতে ঢালতে উত্তর দিলে—হ্যাঁ, মিনতি কবে আসবে?

—ঠিক নেই কিছু, সে তো আস্‌বার জন্যে অস্থির। সেখানে মনই লাগছে না তার...

প্রেমেশ শুভ্রার মুখের পানে তাকিয়ে মুখটিপে হাসলে একটু, সে হাসি ও কটাক্ষ অর্থপূর্ণ।

শুভ্রা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মালিস করতে লাগল।

এগারো

দেবেনবাবু ভাল আছেন এখন।

প্রেমেশ নিত্যই আসে, ব্যতিক্রম হয় না একদিনও। আর [illegible] আত্মীয়তা [illegible] অসহ্য হয়ে উঠলেও শুভ্রা পিতার [illegible] সখী মিনতির [illegible] মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। প্রেমেশকে তফাতে রেখেই সে চলতে চেষ্টা করে সাধ্যমত।

মিনতির চিঠি এসেছে, শীঘ্রই ফিরবে তারা।

শুক্লা সপ্তমীর স্নিগ্ধ চাঁদের আলোয়, খোলা ছাদে একখানা মাদুর পেতে তপন শুয়েছিল, হাত দুখানা বুকের ওপর রেখে চুপটী করে। উদাস দৃষ্টি তার উধাও হয়ে গিয়েছিল উর্দ্ধে—যেখানে শুভ্র স্বচ্ছ হাল্‌কা মেঘের স্তর গুলি মৃদু লঘু গতিতে ভেসে চলেছে আপন মনে—কোথায় কে জানে!

তাকে খাবার জন্যে ডাকতে এসে শুভ্রা খানিক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর ধীরে ডাক্‌লে—

তপনদা! খাবে চলো—

তপন যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে বললে—

খাবার হয়ে গেছে? কাকাবাবু খেয়েছেন—

হ্যাঁ, বাবাকে আগেই খাইয়ে দিয়েছি, গরম গরম সুজি রুটী করে—

বেশ করেছ। তাহলে এখন আমি আর [illegible] যাক? কটা বাজল?

আটটা কি সাড়ে আটটার বেশী হবে না।

ওঃ! তবে তো রাত হয়নি— বসবে একটু?

শুভ্রা বসল।

তার মুখে, গায়ে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ল অবাধে—শুভ্র সুন্দর মুখখানি শুভ্র চাঁদের আলোয় বড় চমৎকার দেখাচ্ছিল। একটু তরল বিষাদের ছায়া—ওই স্বচ্ছ মেঘ খণ্ডের মত পড়ে সে মুখের বিকসিত সৌন্দর্য্য করুণ করে তুলেছে যেন।

তপন নিস্পলকে খানিক চেয়ে থেকে গাঢ়-স্বরে ডাকল —শুভ্রা!

—কি?

তপন নীরব। শুভ্রা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি বলছিলে তপনদা?

তপন বাধ বাধ ভাবে বললে—

একটা কথা বলি বলি করেও বলতে পারছি না শুভ্রা! ভারি সঙ্কোচ লাগে— কিন্তু না বলেও চলছে না আর—

কী এমন কথা? শোনবার জন্যে শুভ্রা [illegible] চেয়ে রইল তপনের দিকে।

তপন একমুহূর্ত স্তব্ধ থেকে একটু ইতস্ততঃ করে বললে—কাকাবাবু সেদিন আমাকে বলছিলেন—একটা কথা—মানে—উনি একটু নিশ্চিন্ত হতে চান আর কি? তোমার ভার আমার হাতে দিয়ে, কিন্তু তার উত্তর আমি আজও দিতে পারলুম না, কেমন কুণ্ঠা বোধ হয়, লজ্জাও করে—

শুভ্রার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন এত দ্রুত যে তার শব্দ যেন কাণে এসে লাগে। আশা, নিরাশায় দুলতে দুলতে সে অস্ফুট স্বরে শুধু বললে—কেন? এ কুণ্ঠার হেতু—

—হেতু আছে বই কি? এ যে নিতান্তই অকৃতজ্ঞের মত—উঃ! কাকাবাবু আমাকে কি রকম স্নেহ করেন! যখন আমার অতি-আপন-জনেরা আশ্রয় দেওয়া দূরে থাক্—আমার মূর্ত্তি দেখেই চমকে সরে গেছেন, সেই সময় উনি আমাকে আদর করে যত্ন করে ঘরের ছেলের মত—পরের জন্তে এতটা কে করে বলতো! সত্যি, তোমাদের স্নেহের ঋণ আমি এ জীবনে পরিশোধ করতে পারব না শুভ্রা! বল্‌তে বল্‌তে তপনের কম্পিত কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো।

—শুধু স্নেহ! শুধু কৃতজ্ঞতা! আর কিছুই নয় কি! হায়!...একটা গভীর গাঢ় দীর্ঘশ্বাসে শুভ্রার বুকখানা কেঁপে, দুলে উঠল।

তপন সেদিকে লক্ষ্য না করে আবার বলতে লাগল—কাকাবাবুকে কেমন করে বলি? কি মনে করবেন তিনি শুনে?—তাই তোমাকে অনুরোধ করি শুভ্রা, তুমি যদি তাঁকে বুঝিয়ে বলে দাও...

—কি বলব?

—বলো আমার অতি বড় দুর্ভাগ্য যে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারলুম না, এ আমার সাধ্যাতীত—

—কেন?

এ প্রশ্নটা অজ্ঞাতসারেই শুভ্রার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল অতর্কিতে। তার বেদনার্ত্ত বিবর্ণ মুখের পানে চেয়ে তপন ব্যথানত ভাবে বললে—এ 'কেন'র উত্তর, আমি কি আর দেব শুভ্রা? তুমি তো সব জানো—আমি যে কি হতভাগা! এ ছন্নছাড়া জীবনের সাথে জড়িত করে আর একটা আশাপূর্ণ তরুণ প্রাণ নিষ্ফল করবো...না, সে অধিকার আমার নেই—ইচ্ছেও নেই—তাই...

—কিন্তু...এ আমি বিশ্বাস করি না, আমি বুঝেছি, আমি জানি, তুমি কিসের জন্তে...

শুভ্রা উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ দমন করতে না পেরেই হয়তো থেমে গেল। তপন চকিত বিস্ময়ে শুভ্রার ব্যথাভরা চোখ দুটীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—

—কি? কি তুমি জানো শুভ্রা?

শুভ্রা নীরব নিস্পন্দ।

তার দিকে বিহ্বল ভাবে খানিক তাকিয়ে থেকে তপন সুগভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—

—এখানে থাকা আর পোষাবে না। আমাকে শীগগিরি যেতে হচ্ছে—।

শুভ্রা চমকে উঠল—

—সেকি? তুমি কোথায় যাবে তপনদা?

...যেখানে সুবিধে ঘটে—

—কিসের সুবিধে? কাজ কর্ম্মের? সেতো এখানেই পেয়েছ; আবার মিছে কেন...

—একাজ করে কি হবে শুভ্রা? আমি যাই এ তুচ্ছ ব্যর্থ জীবনটাকে একটুকু সার্থক করতে দেশের কাজে, দশের কাজে...

—আর সংসারে যারা তোমার মুখ চেয়ে রয়েছে, তাদের প্রতি তোমার কোনো কর্ত্তব্যই কি নেই তপনদা?

শুভ্রার উত্তেজিত অধীর কণ্ঠস্বর বেপথু, আর্দ্র হয়ে হয়ে এলো শেষের দিকে।

তপন এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল অভিভূতের মত—তারপরে শুভ্রার কম্পিত পেলব কর হাতের মুঠোয় ধরে সে কোমল কণ্ঠে আবেগ ভরে বললে—

—আমায় তুমি ক্ষমা করো শুভ্রা। আমি......আমি নিতান্ত অযোগ্য...

বড় বড় দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু তপনের প্রসারিত বাহুর পরে ঝরে পড়ল টপ টপ করে।

—শুভ্রা!

তপন সে অশ্রুস্পর্শে চকিত হ'য়ে শুভ্রার আনত মুখের পানে তাকালো।

তাকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে হাত ছাড়িয়ে শুভ্রা ত্বরিতে উঠে গেল সেখান থেকে। উচ্ছ্বসিত বক্ষের তটে তটে ছাপিয়ে পড়া উদ্বেগের বেগ রোধ করতে বুঝি!

তপন স্তম্ভিত, বিমূঢ়। তার পলকহারা নয়নের ভ্রান্ত দৃষ্টি আবার ছুটে গেল সেইখানে, যেখানে একটা ঘন কালো মেঘের টুক্‌রো ধীরে ধীরে জেগে উঠে জ্যোৎস্না হসিত দিগন্তকে ব্যথাতুর করে তুলেছে।

বারো

—দুঃখ করে আর কি হবে মা? ওরকম খামখেয়ালী মানুষের কাছে আমাদের আশা করাটাই যে ভুল হয়েছিল। আমার মনে কিন্তু সন্দেহ ছিল বরাবর, তবে হঠাৎ এমন ভাবে যে চলে যাবে, না বলে কয়ে নেহাত অকৃতজ্ঞের মত…

অকৃতজ্ঞ? না, বাস্তবিক তা তো নয়, কিন্তু একথার প্রতিবাদ করবার উপায়ও নেই যে। তপন যে কেন গেছে, আশা—আশ্বাস হীন কি নিগূঢ় বেদনা প্রাণে নিয়ে সে নীরবে চলে গেছে তা কেবল শুভ্রাই জানে আর কেউ নয়।

যার জন্যে এ বেদনা সেও তো জানেনা, তাকে জানাতেও তপন চায় না—তাই তার সঙ্গে একবার দেখা না করেই সে চলে গেল, দেখা করার সাহস ছিল না বলেই…এতে সন্দেহ করবার কি আছে আর? এ যে দিব্যলোকের মতই সুস্পষ্ট!

শুভ্রার সাড়া না পেয়ে দেবেনবাবু অন্ধকারেই তার মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন

—আচ্ছা, তপন যাবার কথা তোমাকে এরমধ্যে কোনো সময় বলেছিল কি? মনে করে দেখ দেখি।

শুভ্রা চোখের জল গোপন করবার ব্যর্থ প্রয়াসে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে আস্তে বললে—

—না, হ্যাঁ, একদিন বলেছিলেন বটে, কিন্তু আমি জানতুম না যে সত্যি সত্যি…

—তাই নাকি? কি বলছিল?

—[illegible] জীবনটাকে [illegible] উৎসর্গ করতে পারলে…

—ওই গো! ও রোগ কি সহজে ছাড়ে? আমাদের তখনই সাবধান হওয়া উচিত ছিল শুভ্রা! বড় ভুল হ'য়ে গেছে। যাক 'গতস্য শোচনা নাস্তি'—আমরা তাঁর মঙ্গলের জন্যে কম চেষ্টা করিনি তো? আর কি করা বলো? কোথায় গেছে জানলেও কোনো উপায় করা যেত, তাও যে জানিনা। একেবারে বেমালুম।

একটা উতল আর্ত্ত দীর্ঘশ্বাসের বেগে দেবেনবাবুর শীর্ণ বুকের পাঁজর গুলো দুলে উঠল।

—থাকগে, ওসব কথা আর না তোলাই ভাল। তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করো বাবা,—আর একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?

—নাঃ, তুমি শুয়ে পড়ো মা, রাত হয়েছে।

কতক্ষণ পরে বিনিদ্র শুভ্রাকে ক্রমাগত এ পাশ ও পাশ করতে দেখে দেবেনবাবু ডাকলেন—

—শুভ্রা!

শুভ্রা চোখদুটো ত্রস্তে মুছে ফেলে ধরা গলায় উত্তর দিলে—কি বাবা? কি চাই?

—চাই না কিছু,—একটা কথা মনে পড়ে গেল, কিন্তু বলতে ভরসা হয় না মা, অথচ না বলেও শান্তি পাচ্ছি না—প্রাণটা যেন ছট্ ফট্ করছে সেই থেকে—

—কি এমন কথা বাবা?

—এই প্রেমেশ কাল বল্লে—কথাটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না কিন্তু,—সে নাকি মিনতিকে বিয়ে করবে না।—

সেকি? কেন?

শুভ্রা বিছানায় উঠে বসলে শশব্যস্তে—

—মিনতি তাহলে তো…

—মিনতিও রাজি নয় নাকি। কিন্তু এ যে আশ্চর্য্যের কথা! সব ঠিক হয়ে এখন এরকম গোলমাল হয়ে গেল।

শুভ্রা আশ্চর্য্য হল না, দুঃখিত এবং শঙ্কিতও হল তার প্রিয় সুহৃদ মিনতির পরিণাম কল্পনা করে'—এ যে ধরা ছোঁওয়ার বাইরে,—এ যে মরীচিকার মায়া শুধু!

দেবেনবাবু খানিক চুপ করে থেকে আবার [illegible]

—শুধু এইটেই নয়, প্রেমেশ আর এক [illegible] সরল হতে পারে যে কেমন করে তাই ভাবছি।

—কিসের প্রস্তাব বাবা ?

—প্রেমেশ মিনতিকে চায় না, সে চায় তোমাকে—
শুভ্রার সর্ব্ব শরীরে কে যেন আগুণ ছড়িয়ে দিলে আহত তীব্র কণ্ঠে সে বলে উঠল—

—প্রেমেশবাবুর এ ভারি অন্যায় সত্যি! একজনকে কথা দিয়ে—

—এর চেয়েও অন্যায় হয়ে থাকে মা, বিয়ের রাতে কত সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়—সামান্য একটা কারণে—

—সেটা কি ভাল? সেটা কি ভদ্রতা? এ প্রস্তাবটা শুনলে মিনতি—মা, বাবা, কি মনে করবেন বলতো?

—এতে আর মনে করবার কি আছে শুভ্রা? ওদের মেয়েই যদি রাজি না হয় তাহলে···প্রেমেশের মত ছেলের বিয়ে আটকে থাকবে নাকি? যাক—আমি তাকে বলে দেব—এ অসম্ভব। শুনে বেচারা দুঃখিত হবে নিশ্চয়।

দেবেনবাবু আবার একটা ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেললেন। প্রেমেশ যত দুঃখিত হোক না হোক দেবেনবাবু যে কত খানি দুঃখিত হয়েছেন তা কথার ভাবেই বোঝা গেল তাঁর।—

কিন্তু প্রতিকারের উপায় নেই।

শুভ্রা প্রেমেশকে কেন—সংসারে কোনো পুরুষকেই বরণ করতে পারবে না বুঝি!

তেরো

বৈকালের দিকে—

মিনতি তার ভাই বুলুর হাতে লিখে পাঠালে দু'ছত্রের একখানি চিঠি—

"শুভ্রাদি, ভাই, একবারটি এসো! আমার মন বড় খারাপ, শরীরও...

তুমি কেমন করেই যে ভুলে রয়েছ, আমি তাই ভাবি। এসো অবশ্য—"

সে চিঠি পড়ে শুভ্রা আর থাকতে পারলে না বুলুর সাথেই সে গেল।

দেখলে প্রেমেশের কথা একবর্ণও মিথ্যা নয়।

মিনতি যথার্থই বড় কাতর হয়ে পড়েছে।

গোলগাল দেহখানা তার শীর্ণ, ডাগর ডাগর চোখ দুটীর কোলে কালির রেখা পড়ে সেই প্রস্ফুট শতদলের মত লাবণ্য চল চল মুখখানি বিরস শ্রীহীন করে তুলেছে।

সখীকে দেখেই সে তার গলা জড়িয়ে ধরলে—

—তুমি রাগ করেছ শুভ্রাদি? কিন্তু আমার কি অপরাধ বলো দেখি?

শুভ্রার বিমুখ কঠিন চিত্ত আর্দ্র হয়ে উঠল এক নিমেষে, ওদের দু'জনার ব্যথার উৎস যে একইখানে।

কণ্ঠস্বরে দরদ ঢেলে সে সমবেদনা ভরে বললে

—অপরাধ তোর একার নয় মিনু, আমারও যে! এ সব গণ্ডগোল হ'ল আমার জন্যেই না?

—তোমার জন্যে?

—হাঁ, তা বই কি। আমার জন্যে না হ'লে..সত্যি, মাসিমা কি মনে করছেন কি জানি, এ বিয়েটা ভেঙ্গে যাওয়ার জন্যে তিনি আমাকেই নিমিত্তের ভাগী করে... ছি ছি! আমার যেন মুখ দেখাতেই লজ্জা করছে তাঁকে!

—না, শুভ্রাদি, মা যদি তাই মনে করে থাকেন তাহলে সেটা তাঁর ভুল। যা সত্যি, তা আমি বেশ জানি, মনের অগোচর পাপ নেই তো?

একটুখানি থেমে, একটা ক্ষোভের নিঃশ্বাস ফেলে মিনতি আবার বললে—

যাক্‌গে. এ বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ায় আমার নিজের মনে এতটুকু দুঃখ ক্ষোভ নাই শুভ্রাদি। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা, কিন্তু বাস্তবিক, আমি যেন শান্তি অনুভব করছি এতে—

—কি বলিস মিনু? তবে কি প্রেমেশ বাবুকে তুই ভাল বাসতিস......

—না শুভ্রাদি, ভালবাসতে পারলে কি আর আমার এই দশা হয়?

মিনতির আনত আঁখির পাতা দু'খানি ভিজে উঠল অশ্রুর আভাসে। সেই জলভরা ছল ছল চোখের পানে দৃষ্টি স্থির করে শুভ্রা বললে

—আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি মিনু, সত্যি করে বলবি?

—কি কথা ভাই ?

—তুই তপনদাকে ভালবেসেছিস্, না ? আমার কাছে লুকোস নি মিনু, আমি তো জেনে গেছি, অনেক আগেই, যেদিন প্রথম তপনদার সাথে তোর আলাপ—

মিনতি অধোমুখে খানিক গুম হয়ে বসে রইল, তারপর আকুল স্বরে—

—তুমি আমাকে ক্ষমা করো শুভ্রাদি ! আমার ভুল হয়েছে, সাংঘাতিক ভুল,

বলতে বলতে সে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল অবোধ বালিকার মত।

হায় ! আর তো দ্বিধা নেই, সংশয় নেই কণামাত্র ! এযে সত্য, নির্ঘাত নির্মম সত্য !

শুভ্রার আলোভরা চোখ দুটি এবার সিক্ত, আর্দ্র হ'য়ে গেল উদ্গত অশ্রুজলে।

ত্বরিতে চক্ষু মুছে ফেলে সে কাতরা, বিমুগ্ধা মিনতিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে

—ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়ে থাকে মিনু, এ ভুল সংশোধন হতে পারে এখনো, যদি তপনদার খোঁজ পাওয়া যায়। তিনি তো অপাত্র নয় ?

মাসিমাকে হাতে পায়ে ধরে আমি রাজি করে নেব, আমি চেষ্টা করব......

—তুমি ? তুমি চেষ্টা করবে, শুভ্রাদি ? যাকে তুমি এতদিন ধরে ভালবেসেছ প্রাণ দিয়ে, তাকেই পরের হাতে তুলে দিতে......

শুভ্রার তখন বুক ফেটে যাচ্ছিল—তবু শুষ্ক অধরে চকিত হাসির রেখা ফুটিয়ে সে তাড়াতাড়ি বললে—

—আহা ! 'পর'কে কেন রে ? আমার বন্ধুকে, আমার আদরের মিনুকে !—কি বোকা তুই মিনু ! তুই মনে করিস বুঝি মেয়ে পুরুষে ভালবাসার ওই একটাই সম্বন্ধ আছে শুধু ? স্নেহ বলে, বন্ধুত্ব বলে কিছু থাকতে নেই কি ?

মিনতি এক মুহূর্ত বিস্মিত ব্যগ্র দৃষ্টিতে শুভ্রার দিকে চেয়ে রইল। তার মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায়না। চোখদুটো যেন পাথরের চোখ, তাতে না সুখ, না দুঃখ কোনো ভাবই নেই।

সে ব্যাকুল ভাবে বললে

—না শুভ্রাদি, এ আমি বিশ্বাস করতে পারব না, মেয়ে পুরুষে ভালবাসার অন্য সম্বন্ধ থাকতে পারে, একথা আমি অস্বীকার করছিনা, কিন্তু তাই বলে...যার জন্যে তুমি এতদিন প্রতীক্ষা করেছ--

—আঃ আবার ! কিসের প্রতীক্ষা ? তপনদা অমন করে লক্ষ্যহীন ভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন সেই জন্যেই... যাকে স্নেহ করা যায় আন্তরিক—তার মঙ্গল কামনা কে করে না কে বলতো ? ও আত্মভোলা মানুষটা বিয়ে থাওয়া করে সংসারী হয়, সুখী হয়, এই চেষ্টাই আমি করছি আর বলেছি বরাবর, তাছাড়া আমার নিজের কোনো স্বার্থ...

ওঃ ! আশ্চর্য্য ! ভারি আশ্চর্য্যের কথা এ যে ! সত্যি, তুমি আমাকে একেবারেই বোকা বানাতে চাও শুভ্রাদি ! আচ্ছা, তাই যদি হয়, তাহলে তুমি বিয়ে করতে অনিচ্ছুক কেন ? তোমার বাবা এত করে বলছেন.....

—বিয়ে করব কাকে ?

কেন ? প্রেমেশবাবু কি তোমার অযোগ্য ? উনি তোমাকে এত ভালবাসেন......

দূর দূর ! ভালবাসতে ওরা জানে নাকি ? না মিনু, পুরুষের ভালবাসায় আমার শ্রদ্ধাও নেই আকাঙ্ক্ষাও নেই এতটুকু, সত্যি বলছি, ও জাতটাই মহা...মহা অকৃতজ্ঞ ! নইলে...এখন দেখি, তোর বনের পাখীকে ধরে দিতে পারি যদি।

বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল, তবু হাসিমুখে শুভ্রা মিনতিকে আশ্বাস দিয়ে এলো, তপনকে সে খুঁজে বার করবে, কিন্তু...কোথায় পাবে তার সন্ধান ?

...আজ কোথায় ? কতদূরে সে ?

চৌদ্দ

দিনের পর দিন যায়, রাতের পর রাত—ক্লান্ত অলস গতিতে, দুটী নারীর সুগোপন মরম-বেদনা, অধীর ব্যাকুলতা উপেক্ষা করে দিয়ে।—

তপনের উদ্দেশ নেই।

দেবেনবাবু আবার অসুখে পড়েছিলেন, সামলে উঠতে পারেন নি এখনো।

প্রেমেশের সাহায্য না পেলে এ যাত্রা তাঁর জীবন রক্ষা কঠিন দুষ্কর ছিল।

মিনতির অবস্থা শোচনীয়। সে এখন শয্যাগত। মনের দারুণ অশান্তি জটিল ব্যাধির সৃষ্টি করে'—সেই সুকুমার তনুখানিকে বিশীর্ণ হতশ্রী করে' তুলছে দিনে দিনে,—কীট ভ্রষ্ট কোমল পুষ্পকোরকের মত।

চিকিৎসা শুশ্রূষার ত্রুটি নেই, তবু শান্তি হচ্ছে না এতটুকু।

উদ্বিগ্ন পিতা স্নেহাতুর নয়নে মেয়ের বিবর্ণ মুখের পানে চেয়ে চেয়ে অক্ষমতায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন—এ কী হল? কেন হ'ল?

মা আকুল হয়ে ভগবানকে ডাকেন, ভাবেন এখনো—এখনো তপনের সন্ধান পাওয়া যায় যদি!

শুভ্রার কাছে তিনি জেনেছেন সমস্তই। দুহিতার এ ব্যাধির উৎপত্তি যে কোথায় তা' ও বুঝেছেন, কিন্তু…প্রতিকার করা যায় কি করে?

শুভ্রা উদ্বিগ্ন, ব্যস্ত।—এই দুর্ঘটনার জন্য সে নিজেকেই অপরাধী মনে করছে।

মিনতির কষ্ট চোখে দেখা যায় না যেন।

পিতার শোচনীয় অবস্থা দেখে মন তার অনুশোচনায় ভরে ওঠে, তাঁর উৎকণ্ঠা ও অশান্তির মূল সে-ই তো? যা থেকে এ রোগের উদ্ভব…

অসুখটা যখন বাড়াবাড়ি, তখন দেবেনবাবু একদিন মুখ ফুটেই বলছিলেন

—প্রেমেশের প্রস্তাবে যদি রাজি হ'তিস্ মা! তাহ'লে আমার আয়ু হয়তো দশ বৎসর বেড়ে যে'ত!

কথাটা শুভ্রার অন্তরে এখনো বিঁধে রয়েছে তীক্ষ্ণধার কাঁটার মত।

প্রেমেশের প্রতি তার সে বিরাগ বা বিদ্বেষের ভাব নেই আর, ওকে শুভ্রার এখন একজন প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুই মনে হয়। কিন্তু বন্ধুত্ব ও প্রেম তো এক বস্তু নয়!

জীবনের পুণ্য প্রভাতে, অনাঘ্রাত, পবিত্র কুমারী হৃদয়ের প্রথম পুষ্পাঞ্জলি সে যার চরণে ঢেলে দিয়েছিল নিঃশেষে, তাকে ভুলে আবার অন্যপুরুষের আরাধনা করবে সে কোন প্রাণে?

দুপুর বেলা, নিদ্রিত পিতার পাশে বসে শুভ্রা তার এই ভাগ্য বিড়ম্বনার কথাই ভাবছিল বুঝি—।

প্রেমেশ পা টিপে আস্তে আস্তে দরজার কাছে এসে হাত ছানি দিয়ে ডাকলে তাকে।

শুভ্রা নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো। প্রেমেশের প্রফুল্ল ভাব দেখে সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে—

কি খবর প্রেমেশবাবু? মিনতি ভাল তো?—

বলতে পারি না,—আমি সেথায় যেতে সময় পাইনি এখনো। একটা সুসংবাদ পেলুম, তাই তোমাকে বলতে এসেছি শুভ্রা!

—কিসের সুসংবাদ?

—তপনবাবুর পাত্তা পাওয়া গেছে।

—কোথায়?—কোথায় আছেন তিনি?

শুভ্রা রুদ্ধনিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে।

প্রেমেশ বললে

—কাছেই,—গুরগাঁওয়ে সেবা সমিতির দলে ভিড়েছেন, সেখানে ভয়ানক কলেরা হচ্ছে কিনা! আবার বসন্তও একেবারে মহামারী ব্যাপার—। আমি তো বলেছি দেশে সে যায়নি কাছেই কোথাও…কিন্তু ওঁকে এখন ফেরানো যায় কি করে বলতো? আমি যাব নাকি?

কথাটা এতই অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত যে শুভ্রা হঠাৎ বিশ্বাস করতে পারলে না।

বিস্মিত, ব্যগ্র দৃষ্টিতে সে প্রেমেশের মুখপানে তাকাল, সে মুখে ছলনা কি পরিহাসের লেশ মাত্র নেই—

লোকটার উদারতা ও মহত্ব অনুভব করে' শুভ্রার কৃতজ্ঞ চিত্ত শ্রদ্ধায় ভরে' উঠল।

ব্যগ্র ব্যাকুল-স্বরে সে বললে—

—পারবেন আপনি যেতে! যদি পারেন…

—পারব না কেন শুভ্রা! আমি তো এই মুহূর্তে যেতে প্রস্তুত। তবে আমি গেলে—কাজ হবে কিনা সেটা সন্দেহস্থল। তাঁকে ফেরাতে হ'লে তোমাকে যেতে হয়—

—আমি! আমি কেমন করে যাই প্রেমেশবাবু! আমাকে কে নিয়ে যাবে!

—কেন? আমি নিয়ে যাব—যদি [illegible] করো যদি—

—ও কথা বলবেন না প্রেমেশবাবু। আপনাকে যদি বিশ্বাস করতে না পারি তবে আর কা'কে…

আপনি ছাড়া আমাদের সুহৃদ বন্ধু আর কে আছে বলুন। আপনার সহায়তা না পেলে…

শুভ্রার গাঢ় বেদনাতুর কণ্ঠস্বর প্রেমেশের উদ্বেল চিত্তকে ক্ষুব্ধ ব্যথিত করে' তুললে। কিন্তু…শুধু সুহৃদ বন্ধু,—আর কোনই আশাই নেই।

একটা মর্ম্ম-বিমথিত করা আকুল দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে সে বল্লে—

—তা'হলে চলো,—আর দেরী করা ঠিক নয়। ওকে যেতে হলে শীগগিরী যাওয়া যাই।

—আমিতো এখনি যেতে পারি, কিন্তু বাবা যদি রাজি না হ'ন—

পনেরো

মিনতি আরোগ্যের দিকে—জ্বরটা ছেড়েছে। অন্য উপসর্গও নেই আর। শুধু দুর্ব্বলতা, দীর্ঘদিনের রোগ ক্লিষ্ট ক্ষীণ তনু তা'র বিছানায় মিশে গিয়েছে যেন।

অপরাহ্ন বেলায় মিনতি জানালার দিকে মুখ করে শুয়েছিল চুপটি করে।

জানালার ওধারে সামনের বাড়ীর বারান্দায় বসে একটী হিন্দুস্থানী ছেলে নিজের মনেই গান করছিল বড় করুণ মিষ্টি সে গান—

"রাতদিন লয়লা পড়ি রহেতি হ্যায় ইয়ো
অর্পটন পহেলু মেঁ দবায়ে দবায়ে দরদে দিল্"

মিনতির চোখে জল ভরে এলো—হায়। লয়লা… অভাগী লয়লা বুকের ব্যথা বুকে চেপে পড়ে থাকে আর কত…কতদিন?

তার প্রিয়তম মজনু আর কোথায়? কতদূরে? সে কি আর আসবে না?

মিনতি!

[illegible]

[illegible]

তপন উচ্ছ্বসিত চিত্তাবেগ সংযত করে তার মাথায় হাত রেখে ধীরে, স্নিগ্ধ কোমল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে …কেমন আছ মিনতি?

মিনতির পাণ্ডুর মুখে রক্তিমা জেগে উঠল পলকে। সরমে সুখে চোখের পাতা নামিয়ে নিয়ে মিষ্ট অভিমানের সুরে সে বললে…কোথায় চলে গেছলেন না বলে কয়ে?

…গেছলুম একটা কাজে, তোমার এত অসুখ জানতুম না তো! শুভ্রার মুখে শুনেই…

…শুভ্রা…শুভ্রাদিই তোমাকে ডেকে এনেছে

হ্যাঁ:! শুভ্রাদিরই যত মাথা ব্যথা কি না?

শুভ্রা মিনতির কাছে এসে মুখটিপে হেসে বললে… বনের পাখী ধরে এনে দিলুম মিনু! এখন ও যাতে আর পালাতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্বাস তো নেই ও জাতকে। তাই বলছি তুই শীগগির করে সেরে ওঠ, মাসিমাকে বলে মাসের প্রথম শুভদিনেই…

বিমূঢ় তপন বিভ্রান্ত, আহত স্বরে ডাক্‌লে… শুভ্রা!

শুভ্রা তখন সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

\+ \+ \+

আজ শুভ্রার ফুলশয্যা

উৎসব রজনীর আনন্দ কোলাহল শান্ত হয়ে গেলে প্রেমেশ যখন—

—আমার কাছে এস শুভ্রা, আরো কাছে! তোমাকে যে সত্যিই পেয়েছি! আমি এ কথা এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না যে।

বলে ব্যাকুল আবেগে তার বাঞ্ছিতা প্রিয়াকে বুকে টেনে নিতে গেল, তখন শুভ্রা নীরবে, মুক্ত বাতায়ন পথে উদাস শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়েছিল নৈশ আকাশের দিকে, অন্ধকারে কোথায় যেন মেঘ জমেছে, অতি গোপন নিঝুম, অন্তর্নিগূঢ় বেদনার মত।

নিশীথ-রাতের-বাদল নীরবে নিবিড় আঁধারে ধীরে ধীরে কখন জমেছে সে কখন ঝরবে তা কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না।

শেষ

পূজার বাজার

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল লেবরেটরি লিমিটেড

ঔষধ ও ইনজেকসনের ব্যবসায়ে বাঙ্গালাদেশ এখনো ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছে। বাঙ্গালা-দেশে যে কয়টী বিরাট ঔষধের প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের মধ্যে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল লেবরেটরি অন্যতম। ইহাদের আফিস ৪৪নং বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইহাদের ঔষধ, ইনজেকসন ও ভ্যাক্সিন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ডাক্তারদের দ্বারা ও হাসপাতালে ব্যবহার হয়। সাধারণের জন্য ইহাদের পেটেন্ট ঔষধও আছে; সেগুলি শিক্ষিত ডাক্তার ও অভিজ্ঞ রাসায়নিকদের দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত। বাজারের হাতুড়ের ঔষধ খাইয়া শরীর ও অর্থ নষ্ট না করিয়া, এই লেবরেটরির ঔষধগুলি ব্যবহার করা ভাল। ইহাদের 'গৃহচিকিৎসা' পুস্তকখানি গৃহস্থের উপকারে আসিবে। ইহাদের পত্র লিখিলেই উহা বিনামূল্যে পাইবেন।

ডোয়ার্কিন্ এণ্ড সন্

ডোয়ার্কিন এণ্ড সনের বাদ্যযন্ত্রের দোকান বাঙ্গালার অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে দ্বারিকানাথ ঘোষ এই দোকান প্রতিষ্ঠা করেন এবং অর্দ্ধশতাব্দীর উপর ইহাদের বাদ্যযন্ত্র, সুখ্যাতির সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে যেসব বিদেশী হার্ম্মনি-ফ্লুট বা ফ্লুটিনা-এক্কোর্ডিয়ন আসিত সেগুলি এদেশের আবহাওয়ায় বেশীদিন স্থায়ী হইত না এবং তাহাদের বেলোও ভাল ছিল না। দ্বারিকানাথের চেষ্টায় প্রথম উৎকৃষ্ট বক্স হারমোনিয়ম প্রস্তুত হয়। ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম মিষ্ট সুর এবং স্থায়িত্বের জন্য বিখ্যাত। এবৎসর পূজা উপলক্ষ্যে ইহারা সমস্ত জিনিষেরই মূল্য কমাইয়াছেন।

পারুল ও মাতোয়ারা

পারুল কেশতৈল ও মাতোয়ারা এসেন্স পূজার উপহারের একটী শ্রেষ্ঠ সামগ্রী—গুণে ও গন্ধে সুন্দর। এন্ ব্যানার্জি সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায়ে বহুদিন যাবৎ নি[illegible] রহিয়াছেন। ইহাদের প্রসাধনের জিনিষগুলি আ[illegible] সকলকে ব্যবহার করিয়া দেখিতে বলি।

বান্ধব মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

পূজায় বিবাহে বা অন্য কাজকর্ম্মে বান্ধবের খা[illegible] নিশ্চিন্তমনে ব্যবহার করা যায়। এত রকম র[illegible] তৃপ্তিকর অথচ স্বাস্থ্যকর খাবার খুব কম দোকা[illegible] পাওয়া যায়।

ফাইন আর্ট জুয়েলারি ওয়ার্কস

এই সুপ্রতিষ্ঠিত গহনার দোকান হইতে আ[illegible] অনেকবার গহনা তৈয়ারী করিয়াছি। ইহাদের তৈ[illegible] অলঙ্কারের গঠন সুন্দর ও আধুনিক রুচিসম্মত। দোকানের স্বত্বাধিকারী শ্রীশরৎচন্দ্র চৌধুরী অবসর [illegible] গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী।

গোল্ড বিশপ কোং

আমরা "গোল্ড বিশপ" কোং এর কারখানা পরি[illegible] করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। উক্ত কোম্প[illegible] গৌর বাবুর তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনে আসিয়া অ[illegible] অত্যন্ত দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। উ[illegible] কোম্পানি রূপার ও রূপার উপর নানাবিধ মিনার [illegible] অতি নিখুঁত ভাবে নির্ম্মাণ করিতেছেন ও বাজার [illegible] সস্তাদরে বিক্রয় করিতেছেন। আমরা অবগত [illegible] যে উক্ত কোম্পানি শীঘ্রই বিলাত হইতে [illegible] একজন রোল্ডগোল্ড বিশেষজ্ঞকে ইহাদের [illegible] বিভাগে নিযুক্ত করিতেছেন। আমরা উক্ত [illegible] উত্তরোত্তর সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।